বঙ্গশ্রী

মাসিক পত্রিকা

অষ্টাদশ বর্ষ—দ্বিতীয় খণ্ড
পৌষ ১৩৫৭—জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৮

ষাণ্মাসিক সূচীপত্র

RAMAKRISHNA MISSION INSTITUTE OF CULTURE LIBRARY CALCUTTA

সম্পাদক
শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

মেট্রোপলিটান প্রিণ্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস লিমিটেড
৯০, লোয়ার সারকুলার রোড, কলিকাতা।

বিষয় ও লেখক-সূচী

প্রবন্ধ

বিষয়	লেখক	
অভিনয়ের মিলন প্রসঙ্গ—একটি প্রশ্ন	শ্রীসুনীল দাশগুপ্ত	২৬৮
অমৃতলালের প্রহসন	শ্রীকালিদাস রায়	২১৭
অসুখ হয় কেন ?	ক্যাপ্টেন ফণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	১১৭
আঁদ্রে জিদ (সচিত্র)	শ্রীপ্রভাতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	৪০৬
আসামের নারী শিল্প	শ্রীবিজয়ভূষণ ঘোষচৌধুরী, প্রাচ্যতত্ত্বসাগর	৫৫০
ঋগ্বেদে ও এড্ডায় সৃষ্টির কথা	শ্রীগিরিধারী রায়চৌধুরী	১৯১
ইস্‌লামিক সংস্কৃতি ও বর্ত্তমান বিশ্ব-প্রগতি	আজ্‌হার উদ্দীন খান	১৭৩, ২২৬, ৩৩১
কন্যাকুমারী (সচিত্র ভ্রমণ)	শ্রীমতী জ্যোতির্ম্ময়ী ঘোষ	৪৩০
কপালকুণ্ডলা ও চৈত্রে কাঁথিতে বঙ্কিম মেলা (সচিত্র)	—	৩৪৭
কাব্যে চিত্তরঞ্জন	শ্রীজ্যোতিঃপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৬৭
কি শিখিলাম (সচিত্র)	শ্রীহরিহর শেঠ	৪৪৫
কান্ত কবি রজনীকান্ত	শ্রীকালিদাস রায়	৫২৯
গুপ্তিপাড়া (সচিত্র)	শ্রীসুধীরকুমার মিত্র	১৬১
গ্রীক-দর্শন	শ্রীতারকচন্দ্র রায়	৭৯, ১১৫, ২৫৪
শ্রীগীতগোবিন্দ	শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	৪৮৩
শ্রীমদ্ভাগবত	শ্রীসুরেশ বিশ্বাস	৫৭০
তিব্বতের রাজধানী লাসা (সচিত্র)	শ্রীদীপঙ্কর	২৪৫
'নবজাতকের কবি' রবীন্দ্রনাথ (সচিত্র)	শ্রীসচ্চিদানন্দ চক্রবর্ত্তী	৪৫৪
নাট্যাচার্য্য অমৃতলাল বসু (সচিত্র)	শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত	৪২১, ৫৩৫
নিরুক্ত	ডাঃ শ্রীঅমরেশ্বর ঠাকুর	৪০, ৩৪৫
নীলের গান ও পূর্ব্ববঙ্গ	শ্রীচিত্তরঞ্জন দেব	৩৬৮
'পথের পাঁচালী'র দুর্গা	শ্রীনমিতা গুহ	১৭
পিঠে পুলি (উদ্ধৃতি)	৺উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব	৮
ভারতীয় জাহাজ শিল্প	শ্রীহিমাংশু রায়	৫১৬
মনীষী হীরেন্দ্রনাথ দত্ত	শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত	১১৫
মুদ্রামূল্যাবনয়নের পশ্চাতে পাক-ভারত বাণিজ্য	শ্রীযতীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	২৯১
বঙ্কিমচন্দ্রের 'লরেন্স ফষ্টর' চরিত্র কাল্পনিক নয়—বাস্তব	—	৩৮৯
বঙ্গবীর শ্যামাকান্ত	শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত	২০৫
বাংলা নাট্যমঞ্চের দুঃখের পাঁচালী	শ্রীচাঁদমোহন চক্রবর্ত্তী	২৭৬
বার্ণার্ড শ' ও বিরস নাটক (সচিত্র)	শ্রীসচ্চিদানন্দ চক্রবর্ত্তী	৫২, ১৩৪
বিনোদিনী দাসী (সচিত্র)	শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত	৩০৩
বৈদ্যনাথে সাতদিন	শ্রীসুধীরকুমার মিত্র	৫৫৬
শ' এর তিনটি নাটক	অধ্যাপিকা হিমা চক্রবর্ত্তী	৬২

বিষয়	লেখক	
শঙ্করাচার্য্য ও আধুনিক বিজ্ঞান	শ্রীনিবারণচন্দ্রন	১১৯
শ্রীত-সমাগমে (সচিত্র)	—	১৮৩
শ্রীঅরবিন্দ	বেলা দে	৭৭
শ্রীঅরবিন্দ	শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	৯৯
শ্রীঅরবিন্দ ও মানবের সনাতন প্রশ্ন	শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	২৬২
সাহিত্যরথী আচার্য্য দেবেন্দ্রনাথ বসু (সচিত্র)	শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত	২০
সাহিত্য সমাজ	শান্তি রায়	২৩৯
সভ্যতার অভিসম্পাত	ক্যাপ্টেন ফণীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৫৬৭
স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রসংস্থা	শ্রীযতীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	১
বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী'		৪৯৯

উপন্যাস

নবগঙ্গা	রণজিৎকুমার সেন	৪৩, ১৪৫, ২৩১, ৩[illegible], ৪৩৫, ৫১৯
পরিব্রাজক কামনীত (কার্ল গিয়েলারফ)-	অনুবাদ—শুদ্ধোধন সেন	৮[illegible], ১৭১, ৩৭২
মায়ের প্রাণ	শ্রীগোপালদাস চৌধুরী	৬৯, ১৫৮, ২৫৬, ৩[illegible]৬, ৪৬২, ৫৪৭
রায়বাঘিনী	শ্রীচুনিলাল মুখোপাধ্যায়	৪৬৬, ৫৭১

গল্প

অপয়া	শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়	১০৪
অবচেতন	শুদ্ধসত্ত্ব বসু	২৯৮
একটা থেকে দু'টো	রথীন্দ্রকৃষ্ণ দেব	১৬৫

বিষয়	লেখক	
ঐ—ঐ—ঐ	ভূপেন্দ্রনাথ দাস	২৬৩
চণ্ডুলা তালাও	শ্রীঅতুলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	১২৭
চিঠি	শ্রীচাঁদমোহন চক্রবর্ত্তী	৪৬৮
চিঠি	পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়	৫১৩
জাতীয় সম্পদ	আশা দেবী	৩০২
জোঁক	সুরুচি সেনগুপ্তা	২২২
দুর্গতির একদিন	শ্রীরমাপতি দাস	৩৬২
নূতন দিন	শক্তিপদ রাজগুরু	৪৯২
পরিচয়	শ্রীচারুচন্দ্র সেন	৫৬৩
পথের সন্ধান	শ্রীঊষা বিশ্বাস	৪১১
পূর্ব্বজন্মের ইতিবৃত্ত	গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য	৩১
প্রতিধ্বনি	ডাঃ শচীন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত	৫৫৫
ভাগ্যচক্র মুন্সী প্রেমচন্দ	অনুবাদ—পারুল ঘোষ	১৯৫
বহুরূপী	শ্রীমতী টুনু ঘোষাল	২৪৮
শৃঙ্খল-মুক্তি	শঙ্কর বসু	৯
সাধুর কবলে	শ্রীচাঁদমোহন চক্রবর্ত্তী	৭৪
সাহিত্যিক	শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়	৩৯৭
স্বর্ণ-দিগন্ত	সুভাষ সমাজদার	৩২৭

কবিতা

অনলাভিসার	শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত	৪২০
অস্বীকার	কল্যাণ কুমার সেনগুপ্ত	৩৫৫
আমি তার ধরি হাত	শ্রীলক্ষ্মণ কুমার বিশ্বাস	৪৫৩
ঋক্-প্রার্থনা	শ্রীবিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত	৫৩৪
গান	শ্রীমতী শান্তা ঘোষ	৫৪৬
চিরন্তনী	শ্রীআশুতোষ সান্যাল	২৭৩
চিহ্ন	শ্রীবিভূতি ভূষণ ভট্টাচার্য্য	৪৪৪
জাগো স্বপ্নান্তা	বটকৃষ্ণ দে	৩৪৪
ঝড় এলো	শ্রীঅসীমকুমার সোম	৫১৫
টুকরো কথার মালা	সুনীল কুমার গুপ্ত	১৪৪
তোমায় আমি ডাক দিয়েছি	শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত	২২৫

বিষয়	লেখক	
দিব্য আঁখির রশ্মিকুসুম	শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত	৬৬
নিরীক্ষা	শ্রীকল্যাণকুমার দাশগুপ্ত	৫৩৪
পরিত্যক্ত	অনিলেন্দু চক্রবর্ত্তী	২৫৫
প্রতিধ্বনি	শ্রীশিবদাস চক্রবর্ত্তী	৩৮৭
প্রদীপ	শ্রীমমতা ঘোষ	৪২০
প্রশ্নবান	শ্রীশিবদাস চক্রবর্ত্তী	২৪৭
ফাঁকি	জ্যোতির্ম্ময় ভড়	১৫৪
ফাল্গুনায়ন	অরুণ চৌধুরী	৩৫৫
ভাড়াটে ভাঁড়	মণি দাশগুপ্ত	১৭০
যৌবনের সেনা	শ্রীকৃতান্তনাথ বাগচী	৪১০
বন্দনা	শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়	২৫৩
বাণী-কীর্ত্তন	হরিপদ দত্ত	১৬৬
বালু বলাকা বেলা বিষণ্ণ বন্দর	শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য	১৪৪
বিস্মরণ	সুনীলকুমার নন্দী	২৬৭
বেলাভূমি	আব্দুর রশীদ খান	৩৭৫
ব্যবধান	সন্তোষকুমার অধিকারী	২৩০
মিলনের শেষ-মিলনে	মন্মথনাথ কাব্যভারতী	৪৯১
সূর্য্য-স্বপ্ন	শ্রীসুধীর গুপ্ত	৩২৬
হে ভারত	শ্রীঅমলেন্দু দত্ত	৩০১

পুস্তক ও আলোচনা

৮৬, ১৮৪, ৩৭৬, ৪৭২

সম্পাদকীয়

৮৭, ১৮৫, ২৭৭, ৩৭৭, ৪৭৩ ৫৭৩

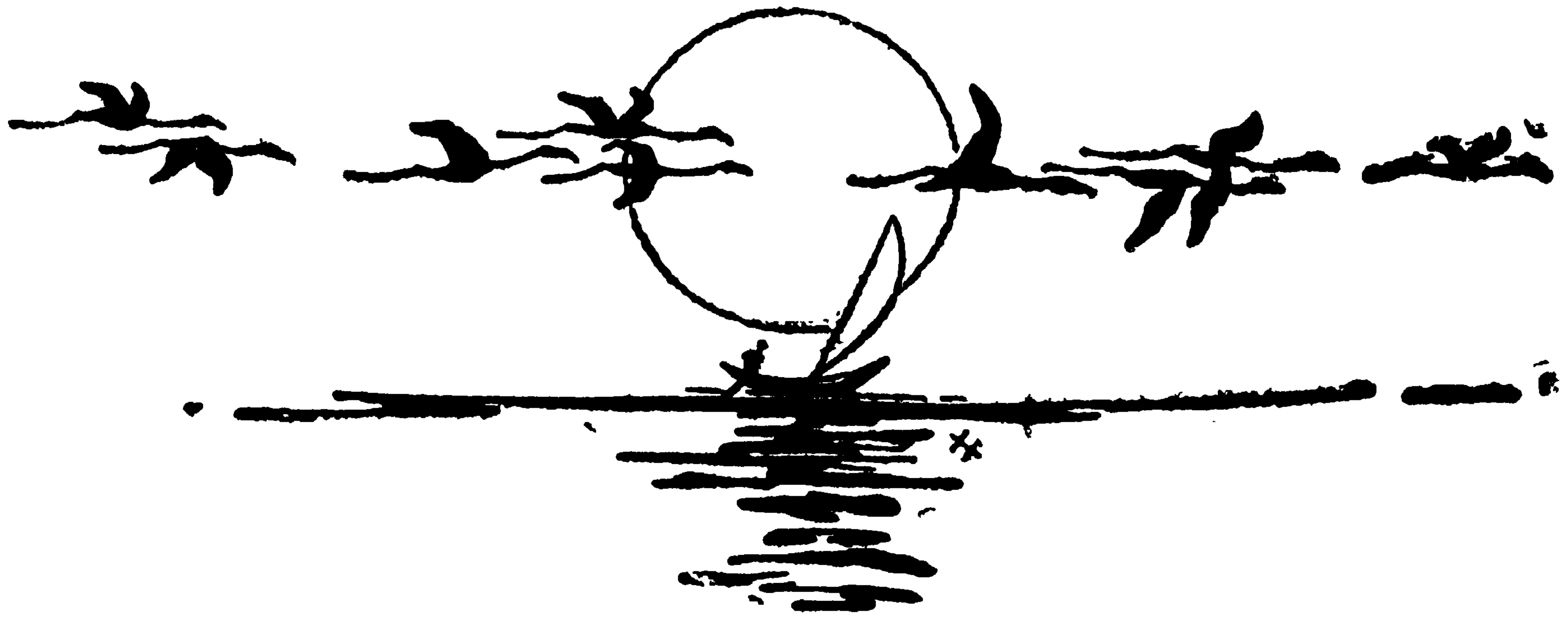

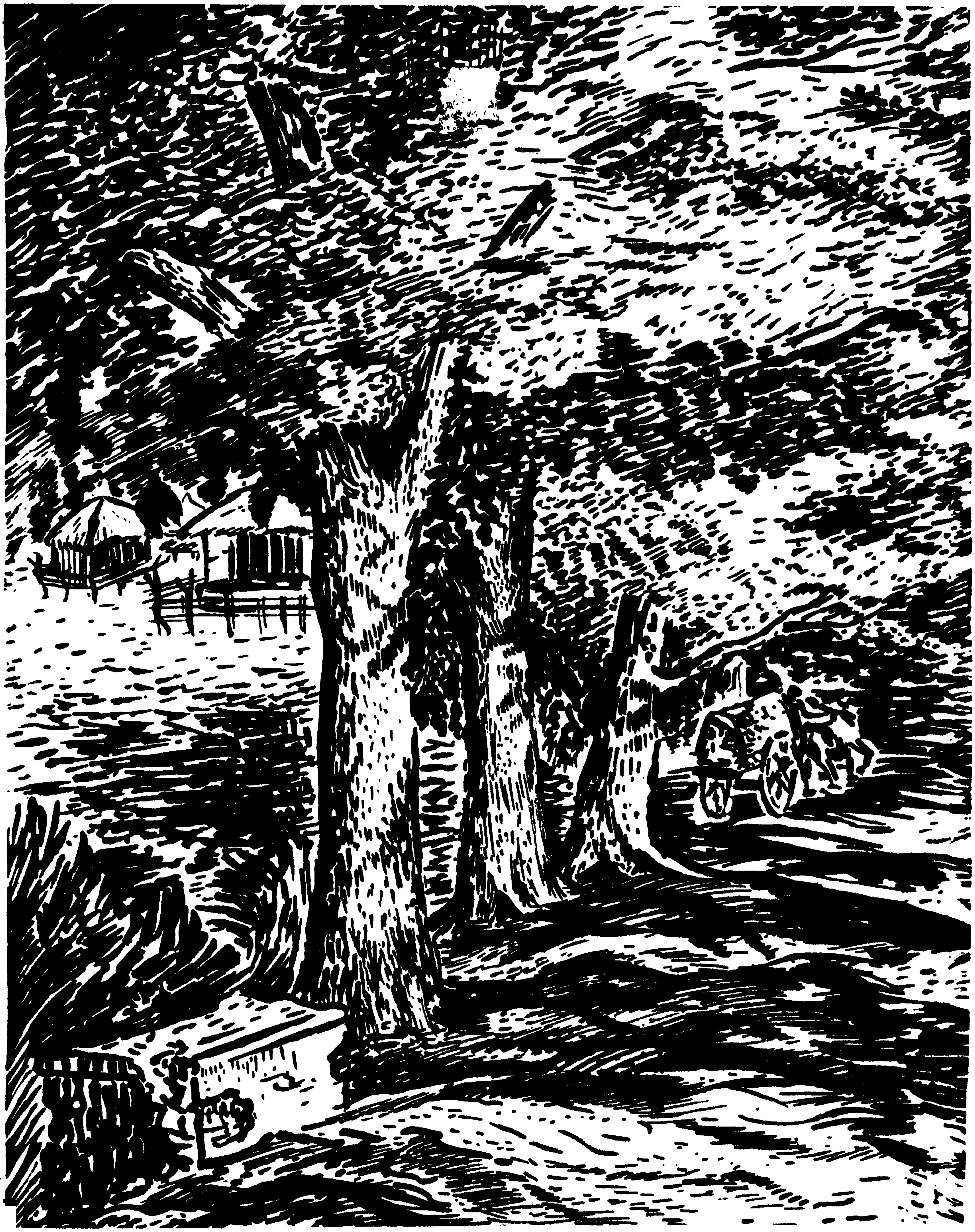

বনানী শিল্পী—অজয় চট্টোপাধ্যায়

স্নানের জন্য—

পাইলট

সুগন্ধি গায়ে মাখা সাবান

বঙ্গলক্ষ্মী সোপ ওয়ার্কস্ লিমিটেড

হেড অফিস—৭, চৌরঙ্গী রোড,

কলিকাতা।

বঙ্গশ্রীর নিয়মাবলী

গ্রাহক ঃ বঙ্গশ্রীর বার্ষিক মূল্য সডাক ৬॥০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৩।০ টাকা। ভি পি খরচ স্বতন্ত্র। প্রতি সংখ্যার মূল্য নয় আনা।

আষাঢ় হইতে বঙ্গশ্রীর বর্ষারম্ভ। বৎসরের যে-কোন মাস হইতেই গ্রাহক হওয়া চলে।

প্রতি বাংলা মাসের প্রথম সপ্তাহে বঙ্গশ্রী প্রকাশিত হয়। সাধারণত সার্টিফিকেট-অব-পোষ্টিং-এ পত্রিকা পাঠান হয়।

জমা-টাকা নিঃশেষ হইলে গ্রাহকদের নিকট হইতে বিশেষ নিষেধাজ্ঞা না পাইলে পরবর্ত্তী সংখ্যা ভি পি করা হয়। মানি-অর্ডারে টাকা পাঠানোই সুবিধাজনক, খরচও কম।

নূতন গ্রাহক হইবার সময় গ্রাহকগণ অনুগ্রহ করিয়া মানি-অর্ডার-কুপনে অথবা নির্দ্দেশ-পত্রে "নূতন" কথাটি লিখিয়া দিবেন। পুরাতন গ্রাহকগণ টাকা অথবা পত্র পাঠাইবার সময় তাঁহাদের গ্রাহক-সংখ্যাটি উল্লেখ করিবেন।

রচনা ঃ রচনা ও সেই সম্বন্ধীয় পত্রাদি 'সম্পাদক, বঙ্গশ্রী', এই নামে পাঠাইতে হইবে। উত্তরের জন্য ডাক-টিকিট দেওয়া না থাকিলে সকল পত্রের উত্তর দেওয়া সম্ভব হয় না।

লেখকগণ অনুগ্রহ করিয়া নকল রাখিয়া লেখা পাঠাইবেন। রচনাদি ফেরতের জন্য উপযুক্ত ডাক-মাশুল দেওয়া না থাকিলে অমনোনীত লেখা ফেরত পাঠান সম্ভব হয় না।

বিজ্ঞাপন ঃ বিজ্ঞাপনের সর্ত্তাদি পত্রদ্বারা জ্ঞাতব্য। পুরাতন বিজ্ঞাপনের পরিবর্ত্তনের নির্দ্দেশ ১০ তারিখের মধ্যে না আসিলে সেই অনুসারে কার্য্য করা সম্ভব হয় না। চল্‌তি বিজ্ঞাপন বন্ধ করিতে হইলেও ঐ তারিখের মধ্যেই জানানো দরকার।

ম্যানেজার—বঙ্গশ্রী,

৯০, লোয়ার সারকুলার রোড, কলিকাতা ১৪।

বাংলা ভাষায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্য পত্রিকা

গল্প-ভারতী

সম্পাদক—শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

অগ্রহায়ণ (১৩৫৮) সংখ্যা বাহির হইল

এই সংখ্যায় লিখিয়াছেন শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, ভাস্কর, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, আশাপূর্ণা দেবী, রামপদ মুখোপাধ্যায়, সুধীর কর, অপর্ণা সেন, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ প্রভৃতি।

গল্প-ভারতী অতি অল্প দিনের মধ্যে সমসাময়িক সাহিত্য-জগতে যে প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়াছে তাহা অভূতপূর্ব্ব।

গল্প-ভারতী বাংলা সাহিত্যের প্রত্যেক শ্রেণীর শ্রেষ্ঠ লেখকবৃন্দের মিলন-কেন্দ্র।

গল্প-ভারতী সরস সাহিত্যের মধ্য দিয়া আজকের জাতির অন্তরের ব্যথা বেদনা ও কথা আপনার নিকট পৌঁছাইয়া দিতেছে।

গল্প-ভারতী নূতন যুগের চিন্তার দ্বারকে উন্মোচন করিয়া দিয়াছে।

গল্প-ভারতী অনুবাদ-সাহিত্যে নূতন ঐতিহ্য সৃষ্টি করিয়াছে।

গল্প-ভারতী বাংলা সাহিত্যে ছোট গল্পের মান উন্নীত করিয়াছে।

গল্প-ভারতীর প্রত্যেক পাতা স্থায়ী সাহিত্যের দাবী করে।

গল্প-ভারতীর গ্রাহক হওয়া মানে বাংলা সাহিত্যের অগ্রগতির সাহায্য করা।

যদি গ্রাহক না হইয়া থাকেন, আজই গ্রাহক হউন।

বার্ষিক চাঁদা সডাক—১৫৲, ষাণ্মাসিক চাঁদা সডাক—৭॥০ টাকা।

গল্প-ভারতী

২১৯বি, চিত্তরঞ্জন এভিনু্য, কলিকাতা-৬

উনবিংশ বর্ষ | পৌষ—১৩৫৮ | ২য় খণ্ড—১ম সংখ্যা

LIBRARY

শিক্ষা-সংস্কার

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

ভারতবর্ষ ভারতরাষ্ট্র ও পাকিস্তান দুই ভাগে বিভক্ত হইবার পরে পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষা বিষয়ক কয়টি পরিবর্ত্তন প্রবর্ত্তিত হইয়াছে:

(১) প্রবেশিকা পরীক্ষায় বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃত্ব লোপ করিয়া তাহা "সেকেণ্ডারী এডুকেশন বোর্ডের" পরিচালনাধীন করিয়া "ম্যাট্রিকুলেশন" পরীক্ষার নূতন নামকরণ হইয়াছে—"স্কুল ফাইন্যাল" পরীক্ষা।

(২) মধ্য-ইংরেজী ("মাইনর") বিদ্যালয়ের নাম পশ্চিমবঙ্গ "জুনিয়ার হাই স্কুল" করা হইয়াছে।

(৩) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে নূতন আইন বিধিবদ্ধ করা হইয়াছে।

পরীক্ষার ও বিদ্যালয়ের নাম-পরিবর্ত্তন তুচ্ছ ব্যাপার। কিন্তু ঐ পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে পাঠ্য-ব্যবস্থারও পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে। তাহা উল্লেখযোগ্য।

এ দেশে ইংরেজী শিক্ষাদানের বিদ্যালয়ের ইতিহাসে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা—

(১) ১৮১৪ খৃষ্টাব্দ হইতে নানা আলোচনার পরে ১৮১৭ খৃষ্টাব্দের ২০শে জানুয়ারী কলিকাতায় স্কুল স্থাপিত হয়। ইহাই ক্রমে হিন্দু কলেজে পরিণত হয়।

(২) এ দেশে ইংরেজীকে উচ্চ শিক্ষার বাহন করা সঙ্গত কি না, সেই বিষয়ে রামমোহন রায় ১৮২২ খৃষ্টাব্দে

লর্ড আমহার্ষ্টকে পত্র লিখিয়া ইংরেজীর পক্ষ সমর্থন করেন।

(৩) ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে হিন্দু কলেজের গৃহ নির্ম্মিত হয়।

(৪) ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।

কলিকাতায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই নানা স্থানে ব্যক্তিবিশেষের বা পরিবার-বিশেষের দানে উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সেই সকল শাখা নদীর মত বিশ্ববিদ্যালয়ের পুষ্টি সাধন করিয়া তাহার উদ্দেশ্য—জ্ঞানোন্নতি-সাধন সিদ্ধ করিবার কারণ হয়।

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইবার পর কিছুদিন প্রদত্ত শিক্ষার কোন বিরুদ্ধ সমালোচনা হয় নাই—নবপ্রবর্ত্তিত শিক্ষাপদ্ধতির পরীক্ষা চলিতে থাকে।

ইংরেজের অধিকৃত ভারতের ইতিহাস-লেখক হাণ্টার স্বীকার করিয়াছেন, ইংরেজ ভারতে যে ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্ত্তিত করেন, তাহার উদ্দেশ্য—তাঁহাদিগের শাসন ও শোষণ পরিচালনে ব্যয়ের যথাসম্ভব স্বল্পতা সাধন। সেই জন্য সেই শিক্ষায় বিরাট কেরাণী সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়। তখনই প্রশ্ন উঠে—এই যে কর্ম্মঠ শিক্ষিতের দল উদ্ভূত হইতেছে, ভবিষ্যতে ইহারা কি করিবে? বিশেষ ইংরেজ এ দেশে যে শিক্ষা প্রবর্ত্তিত করেন, তাহাতে মানবের তিনটি অতি প্রয়োজনীয় বিষয় অবজ্ঞাত হইয়াছিল—

(১) শৃঙ্খলা

(২) সন্তোষ

(৩) ধর্ম্ম।

ইহার ফলে দেশে যে বিরাট শিক্ষিত বেকার সম্প্রদায়ের সমস্যা দেখা দেয়, তাহা দিন দিন প্রবল হয় এবং শেষে সার জন এণ্ডারশন বলেন, দলে দলে ছাত্র ও ছাত্রী যখন শিক্ষা লাভের পরে লব্ধ শিক্ষা প্রযুক্ত করিবার কোন উপায় পায় না—বেকার-বাহিনী পুষ্ট করে—তখন তাহারা যে মনোভাব পোষণ করে তাহার ফলে সন্ত্রাসবাদ দেখা দেয়।

দেশের লোক প্রদত্ত শিক্ষার ত্রুটি সম্বন্ধে সচেতন হইয়া অনুভব করে, সে শিক্ষার সহিত শিক্ষার্থীর ধাতুগত সম্পর্ক না থাকায়, তাহা ঈপ্সিত ফল দিতেছে না। বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন—এই শিক্ষার ফলে দেশে শিক্ষিত ও অশিক্ষিত দুই সম্প্রদায়ে সহানুভূতির অভাব ঘটিতেছে এবং দুই সম্প্রদায়ে প্রভেদ বর্দ্ধিত হইতেছে। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন, এই শিক্ষা অর্থকরী হইতে পারে, কিন্তু ইহাতে আমাদিগের মনের খাদ্য পাইবার উপায় নাই। রামেন্দ্রসুন্দর এই শিক্ষাকে "যন্ত্রবদ্ধ" বলিয়া অভিহিত করেন—ইহার স্বরূপ তাহাতেই সপ্রকাশ হয়। আর শ্রীঅরবিন্দ যখন জাতীয় শিক্ষার প্রবর্ত্তন-প্রয়োজন প্রতিপন্ন করেন, তখন তিনি বলেন—"যেরূপ অবস্থায় এ দেশে শিক্ষা প্রদত্ত হয়, তাহাতে আমরা অসন্তুষ্ট—এই শিক্ষার দৈন্য ও অসম্পূর্ণতা যেমন সুস্পষ্ট, ইহার জাতীয়তা-বিরোধী তেমনই দেদীপ্যমান ইহার দ্বারা বিদেশী সরকারের আনুগত্য ও দেশপ্রেমের অনিষ্ট সাধিত হয়।" এই জন্যই জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের প্রতিষ্ঠা করা হয়।

ইংরেজ শাসকরা এই শিক্ষার বিরোধী হইয়া উঠেন। তাঁহারা লক্ষ্য করেন, এই শিক্ষার ফলে দেশের লোক বিদেশী শাসন ও শোষণের বিরোধী হইয়া উঠিতেছে। বহু বৎসর পূর্ব্বে যখন এ দেশে ইংরেজী শিক্ষা প্রথম প্রচলিত হয়, তখনই সিমার্ডস নামক একজন দূরদর্শী ইংরেজ বলিয়াছিলেন—জ্ঞানই শক্তি; জ্ঞান বিস্তার এ দেশে হিন্দুদিগের মধ্যে দ্রুত হইতেছে ও হইবে; লোক বুঝিবে, শাসককে কতকগুলি দায়িত্ব স্বীকার করিতে হয়, তাহা না হইলে রাজ্যের পতন অনিবার্য্য। তখন ইংরেজ শাসকরা সে কথায় মনোযোগ দেন নাই, তাঁহারা সেই "হনোজ দিল্লী দূর অস্ত" মনোভাব লইয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন। যখন তাঁহাদিগের সে ভাবে আঘাত লাগিল, তখন তাঁহারা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইলেন; কিন্তু ব্যাধির নিদান নির্ণয়ে অসক্ত হইয়া যে ঔষধ প্রযুক্ত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তাহা বিজ্ঞ ও অভিজ্ঞ চিকিৎসকের ঔষধ নহে—"হাতুড়ে"র "টোটকা"। তাঁহারা মনে করিলেন না—

"তোমায় ধরেছে যে রোগে,
সে রোগ যা'বে নাক মুষ্টিযোগে।"

দেশব্যাপী অসন্তোষের সম্মুখীন হইয়া ইংরেজ শাসকরা তাহার কারণ সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন—ভ্যালেনটাইন

চিরল শিক্ষা-পদ্ধতিকে দায়ী করিতে চাহিলেন। লর্ড কার্জ্জনের নিযুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন শিক্ষা-পদ্ধতির পরিবর্ত্তন করিবার উদ্দেশ্যে নিযুক্ত করা হইয়াছিল। তিনি যে পরিবর্ত্তন করিতে চাহিলেন, তাহাতে দেশবাসী শিক্ষার আদর্শ ক্ষুণ্ণ হইবার সম্ভাবনা লক্ষ্য করিলেন। সেই চেষ্টা যে লর্ড কার্জ্জনের এ দেশের লোকের নিকট অপ্রিয় হইবার অন্যতম প্রধান কারণ, তাহা ফ্রেজার বলিয়াছেন। তাহার পরে আবার কমিশন নিযুক্ত করা হয়—সেই স্যাডলার কমিশনেও ফল হয় নাই। কারণ, তাহার নির্দ্ধারণেও শিক্ষা-পদ্ধতির আবশ্যক পরিবর্ত্তন-সাধন করিয়া শিক্ষা জনগণের প্রয়োজনোপযোগী করার ব্যবস্থা হয় নাই।

এই প্রসঙ্গে আর একটি বিষয় লক্ষ্য করা কর্ত্তব্য। দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় দেশে শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করিবার জন্য উৎসুক হইয়াছিলেন। সেই ঔৎসুক্য বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভায় গোপালকৃষ্ণ গোখলে কর্ত্তৃক উত্থাপিত একটি প্রস্তাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। গোখলে রাজনীতিক্ষেত্রে "মডারেট" ছিলেন। সেই জন্য ইংরেজ সরকারের নিকট তাঁহার আদর ছিল। কিন্তু তিনি যে প্রস্তাব করেন, তাহাও বৃটিশ সরকার গ্রহণ করিতে অসম্মত হয়েন। তিনি চাহিয়াছিলেন, দেশে প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করিবার বিষয় বিবেচনা করিবার জন্য একটি কমিটী গঠন করা হউক।

তিনি ও তাঁহার সমর্থনকারীরা জাপানের বিষয় বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়াছিলেন। বাঙ্গালী কবি হেমচন্দ্র জাপানকে "অসভ্য" বলিয়াছিলেন। সেই জাপান যে সে রুশিয়াকে যুদ্ধে পরাভূত করিয়াছিল, তাহার কারণ তাঁহারা সন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। জাপান শিক্ষা-বিস্তারের প্রয়োজন অনুভব করিলে সম্রাট ঘোষণা করেন—জাপান সরকারের অভিপ্রায়, সমগ্র দেশের কোনও গ্রামে যেন একটিও অশিক্ষিত ও কোন পরিবারে যেন একজনও অশিক্ষিত লোক না থাকে। সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার জন্য জাপানে যে প্রথা অবলম্বিত হয়, তাহার ফলে সে দেশে দ্রুত শিক্ষা-বিস্তার হয়।

যখন গোখলের সেই মৃদু প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হয় তখন আশুতোষ মুখোপাধ্যায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনে অনেকটা ক্ষমতা লাভ করিয়াছেন। তিনি স্থির করেন, সিংহদ্বারে প্রবেশ নিষিদ্ধ হইলেও পশ্চাতে দ্বারপথে প্রবেশ করা যাইতে পারে। বিশেষ—

"দিবস বিকাশে যবে পূরবের গবাক্ষে কেবল
প্রবেশিয়া রবিকর কক্ষমধ্য করে না উজ্জ্বল;
পূরবে তপন করে ধীরে—অতি ধীরে আরোহণ,
পশ্চাতে ধরণী হাসে মাখি তা'র কনক-কিরণ।"

তিনি পরীক্ষার মান খর্ব্ব করিয়া ছাত্রদিগকে বিশ্ববিদ্যালয়ে আকৃষ্ট করিতে প্রচেষ্ট হইলেন; আর সঙ্গে সঙ্গে উচ্চতর শিক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে "পোষ্টগ্রাজুয়েট শিক্ষার ব্যবস্থা করিলেন; একদিকে যেমন শিক্ষা-বিস্তার হইতে লাগিল, আর একদিকে তেমনই গবেষণার সুযোগ প্রদত্ত হইল।

আজ দেশের রাজনীতিক অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এখনও যদি শিক্ষার ব্যবস্থা জাতীয়—দেশবাসীর ধাতুসহ এবং প্রকৃতির ও প্রয়োজনের সহিত সামঞ্জস্য সম্পন্ন না হয়, তবে আমাদিগের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির পথ বিঘ্নকঙ্করকণ্টকিত থাকিবে। এখন সেই পদ্ধতির সামান্য সামান্য পরিবর্ত্তন না করিয়া তাহার পুনর্গঠনই প্রয়োজন ও কর্ত্তব্য। প্রাথমিক শিক্ষা হইতে আরম্ভ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাকেও সবল আদর্শে গঠিত করিতে হইবে। শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে। সে উদ্দেশ্য মানসিক বৃত্তির বিকাশ, সত্যের সন্ধান, কল্যাণের জন্য আগ্রহ।

দেশের রাজনীতির অবস্থার পরিবর্ত্তনে শিক্ষা যখন জাতীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন, তখন প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক হইবার পথে কোন বাধা থাকিতে পারে না—থাকিলে তাহা অতিক্রম করিতে হইবে। প্রাথমিক শিক্ষা যদি অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক হয়, তবে ছাত্র আকৃষ্ট করিবার জন্য পরীক্ষার মান খর্ব্ব করিবার কোন কারণ থাকিবে না। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার অল্পদিন পরে যখন উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রদিগের সংখ্যাল্পতা লইয়া আন্দোলন

ইয়াছিল, তখন তৎকালীন ভাইস চ্যান্সেলার বলিয়াছিলেন—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি এমন হওয়া প্রয়োজন যে, ছাত্ররা তাহা লাভ করিবার জন্য পরিশ্রম করিবে এবং উপাধি লাভের জন্য আগ্রহশীল হইবে।

বাস্তবিক উপাধি সুলভ করিবার প্রয়োজন বা সার্থকতা থাকিবার কোন সঙ্গত কারণ থাকিতে পারে না। উপাধি লাভ করিলেই যে চাকরী পাওয়া যায়, তাহা নহে; এমন কি উপাধি পাইলেই যে ব্যবসায় সম্বন্ধীয় অধ্যয়নের সুযোগ লাভ করা যায়, তাহাও নহে। উপাধি যোগ্যতার পুরস্কার হইবে, ইহাই অভিপ্রেত।

আমরা শিক্ষা সম্বন্ধীয় কয়টি বিষয়ে সরকারের ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোযোগ আকৃষ্ট করিতে ইচ্ছা করি—

(১) মাতৃভাষায় শিক্ষাদান—যে শিক্ষা মাতৃভাষায় প্রদত্ত হয় না, তাহা অনায়াসে অধিকার করা যায় না এবং তাহা আয়ত্ত করিতে বহু শ্রমের ও সময়ের প্রয়োজন হয়। সুতরাং প্রাথমিক শিক্ষা যেমন—উচ্চ শিক্ষাও তেমনই যথাসম্ভব মাতৃভাষার দ্বারা প্রদত্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কিছুদিন পূর্ব্বে চিকিৎসা-বিদ্যায় শিক্ষাদানের প্রথা পরিবর্ত্তিত করা হইয়াছিল—ইংরেজীর দ্বারাই সে কাজ হইতেছে। ইহার কারণ কি? যখন এ দেশে প্রথম এলোপ্যাথি মতে চিকিৎসা-শিক্ষাদান আরম্ভ হয়, তখন মেডিক্যাল কলেজের দুইটি বিভাগ ছিল—দেশীয় ভাষার ও ইংরেজীর। তখন বাঙ্গালা বলিতে বাঙ্গালা (সমগ্র), বিহার ও উড়িষ্যা বুঝাইত। সেই সময় কলিকাতায়, ঢাকায়, পাটনায় ও কটকে মেডিক্যাল স্কুল সরকারের দ্বারা পরিচালিত হইত। সেই সকলের প্রয়োজনে আবশ্যক পুস্তকও লিখিত হইয়াছিল। দুর্গাদাস করের 'মেটিরিয়ামেডিকা', লালমাধব মুখোপাধ্যায়ের চক্ষু চিকিৎসা বিষয়ক পাঠ্য পুস্তক, মহিরুদ্দীন আহম্মদের 'সার্জ্জারী' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। কানাইলাল দে প্রভৃতিও সেই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। দুঃখের বিষয়, পরে সরকারী মেডিক্যাল স্কুলেও ইংরেজীতে পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা হয় এবং স্কুল কয়টি কলেজে পরিণত করিয়া শেষে সরকারী ও বে-সরকারী ডাক্তারী স্কুলগুলির বিলোপসাধন করা হইয়াছে। ইহার ফলে বাঙ্গালীর ব্যাধিবহুল গ্রামাঞ্চলে যে চিকিৎসকের অভাব হইয়াছে, কেবল তাহাই নহে—সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালায় ডাক্তারী পুস্তক রচনাও আর হইতেছে না। স্কুলগুলিতে যদি শিক্ষার ত্রুটি থাকিয়া থাকে, তবে সে সকল ত্রুটি সংশোধন করাই সঙ্গত। সংস্কার না করিয়া সংহার সমর্থিত হইতে পারে না। লোকমত সরকারকে অবাঞ্ছিত নীতি পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য করিবে। রসায়ন শাস্ত্র, পদার্থবিদ্যা, মনস্তত্ত্ব প্রভৃতি যদি বাঙ্গালায় শিক্ষা দেওয়া যায়, তবে ডাক্তারী কেন যাইবে না, বুঝা যায় না। যদি মাতৃভাষায় সকল বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া না হয়, তবে তাহা জাতির দুঃখের কারণ হইবে।

(২) রাষ্ট্রভাষা শিক্ষা—স্বায়ত্ত-শাসনশীল ভারত-রাষ্ট্রে ইংরেজী অবশ্যই রাষ্ট্রভাষা থাকিতে পারে না। কিন্তু ভাষার সমৃদ্ধি যদি তাহার রাষ্ট্রভাষা হইবার কারণ হয়, তবে যে বাঙ্গালা ভাষার দাবী উপেক্ষিত হইতে পারে না, তাহা আমরা অবশ্যই বলিব। ভারত রাষ্ট্রের আর কোন ভাষা বাঙ্গলার মত আনন্দে উচ্ছসিত, বিষাদে বিকুণ্ঠিত, দ্বিধায় বিচলিত, ঘৃণায় বিকুঞ্চিত, দয়ায় উদ্বেলিত হয় না। ভারত রাষ্ট্রের কোন দেশীয় ভাষাই সর্ব্বত্র ব্যবহৃত নহে। তথাপি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক লোক হিন্দী বুঝে বলিয়া হিন্দীতেই রাষ্ট্রভাষা করা হইয়াছে। বাঙ্গালী ইহাতে দুঃখিত হইতে পারে, কিন্তু আপত্তি করিবে না। বিহারে যখন প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের ব্যবস্থা করিবার ভার ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের উপর অর্পিত হইয়াছিল, তখন বিহারে হিন্দীই একমাত্র ব্যবহৃত ভাষা ছিল না; পরন্তু বাঙ্গালা, হিন্দী, মৈথিলী, ব্রজবুলি, মাগধী পাঁচটি ভাষা প্রচলিত ছিল। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক লোক হিন্দী বুঝিত বলিয়া—শিক্ষা-বিস্তারের বিষয় বিবেচনা করিয়া ভূদেববাবু তথায় হিন্দীকেই প্রাথমিক শিক্ষার বাহন করিয়াছিলেন। তখন হিন্দীতে উপযুক্ত পাঠ্য পুস্তক না থাকায় তিনি বাঙ্গালা পাঠ্য পুস্তকের হিন্দী অনুবাদের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। গান্ধীজী মুসলমানদিগকে তুষ্ট করিবার জন্য হিন্দীকে রাষ্ট্র-ভাষা না করিয়া হিন্দুস্থানীকে সম্মান দিতে চাহিয়াছিলেন—চেষ্টাও করিয়াছিলেন। হিন্দী মাদ্রাজীরা বুঝে না।

তবে হিন্দী বাঙ্গালার মত সংস্কৃতের দুহিতা। হিন্দী রাষ্ট্রভাষা হইলেও বাঙ্গালীর মাতৃভাষা হইবে না; সুতরাং ইংরেজের শাসনকালে ইংরেজী যেমন ছিল, তেমনই থাকিলে তাহাই সঙ্গত হইবে। বাঙ্গালায় বাঙ্গালাই শিক্ষার বাহন থাকিবে। বাঙ্গালী যেমন ইংরেজী ব্যবহারে, তেমনই হিন্দী ব্যবহারেও পটুত্ব অর্জ্জন করিয়াছে, কিন্তু বাঙ্গালারই আদর করিয়াছে। যে বালমুকুন্দ গুপ্তের রচনা হিন্দী সাহিত্যের গৌরব তিনি প্রথম হিন্দী সংবাদপত্র 'হিন্দী বঙ্গবাসী'র বাঙ্গালী সম্পাদক অমৃতলাল চক্রবর্ত্তীর নিকট হিন্দী রচনা শিক্ষা করিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র রমেশচন্দ্র দত্তকে বলিয়াছিলেন, বাঙ্গালী যত ভাল ইংরেজীই কেন লিখুন না, ইংরেজী রচনায় বাঙ্গালীর যশ স্থায়ী হইবে না। তিনি বাঙ্গালীর ইংরেজী শিক্ষা সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা অবশ্য-স্বীকার্য্য—

"সমগ্র বাঙ্গালীর উন্নতি না হইলে দেশের কোন মঙ্গল নাই। সমস্ত দেশের লোক ইংরেজী বুঝে না, কস্মিন-কালে বুঝিবে এমন প্রত্যাশা করা যায় না। * * যে কথা দেশের সকল লোক বুঝে না বা শুনে না, সে কথায় সামাজিক বিশেষ কোন উন্নতির সম্ভাবনা নাই।"

হিন্দী যদি রাষ্ট্রভাষা হইয়া সর্ব্বভাবপ্রকাশক্ষম হয়, তবে সমগ্র ভারত-রাষ্ট্র যে কথার শ্রোতা হওয়া উচিত, তাহা প্রকাশ করিতে হিন্দীর ব্যবহার প্রয়োজন হইবে। কিন্তু সেজন্য প্রয়োজনাতিরিক্ত সময় বা উদ্যম ব্যয় করার প্রয়োজন নাই।

(৩) ইংরেজী শিক্ষা—বাঙ্গালী বাঙ্গালাকে শিক্ষার বাহন করিতে চাহিয়াছে—বাঙ্গালা ভাষাকে ভারতের সকল প্রচলিত ভাষার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সমৃদ্ধিশালী করিয়াছে—কিন্তু ইংরেজীকে অনাদর করে নাই। তাহার কারণ, সমগ্র সভ্য জগতের সহিত সম্বন্ধ রক্ষার প্রয়োজন বাঙ্গালী কখন উপেক্ষা করে নাই। আজও আন্তর্জ্জাতিক ব্যাপারে ইংরেজী ভাষা উপেক্ষা করা যায় না। বিজ্ঞানের নূতন নূতন আবিষ্কারের ফলে পৃথিবীতে দূরত্ব যেন লোপ পাইতেছে। আন্তর্জ্জাতিক ব্যাপার উপেক্ষা করিয়া কোন দেশ স্বতন্ত্র থাকিতে পারে না। সুতরাং ইংরেজী শিক্ষা বর্জ্জন করিলে বাঙ্গালী ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।

এই অবস্থায় শিক্ষার্থীর পক্ষে ভার যাহাতে দুর্ব্ব না হয়, সে দিকে লক্ষ্য রাখিয়া এবং মাতৃভাষা বাঙ্গালা দাবী অক্ষুণ্ণ রাখিয়া হিন্দী ও ইংরেজী শিক্ষার ব্যবস্থা ক আজ প্রয়োজন ও কর্ত্তব্য।

শিক্ষাকে রাজনীতি হইতে স্বতন্ত্র না রাখিলে শিক্ষ অনিষ্ট ঘটিবে। প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থায় যে কংগ্রেসে প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে, তাহাতে ভোট সংগ্রহে জন্য শিক্ষকদিগকে প্রযুক্ত করিবার সুবিধা হইতে পা কিন্তু তাহাতে শিক্ষার আদর্শ বিকৃত করা হয়। তেমন আবার বিশ্ববিদ্যালয়কে যদি সরকারের তাঁবেদার ক হয়, তবে উচ্চ শিক্ষার ক্ষতি হয়।

সর্ব্বোপরি শিক্ষা যাহাতে জাতীয়তার পরিপোষক জ্ঞানদায়ক হয়, সে দিকে দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন।

আমরা দেখিয়াছি, ইংরেজ এ দেশে যে শিক্ষা প্রবর্ত্তি করিয়াছিল, সে তাহার আপনার স্বার্থের প্রতি ল রাখিয়া। বাঙ্গালীর মনীষা বহুক্ষেত্রে তাহার সেই উদ্দে ব্যর্থ করিয়াছিল এবং বহুক্ষেত্রে মৌলিক গবেষণা গৌরব অর্জ্জন করিয়াছিল। যাহা ব্যতিক্রম তাহাই (সকল ক্ষেত্রে নিয়ম হইয়াছিল। তাহা ইংরেজের যেম বিস্ময়, তেমনই বিরক্তি উৎপাদন করিয়াছিল।

আজ সেই মনীষা যাহাতে পূর্ণ বিকাশের সক সুযোগ লাভ করিতে পারে, সেইরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা ক জাতীয় সরকারের কর্ত্তব্য। সেজন্য যাঁহারা শিক্ষা-ব্যবস্থ করিবেন, তাঁহাদিগকে দেশের লোকের কেব সহানুভূতি নহে সহযোগও লাভ করিতে হইবে।

আমরা পূর্ব্বেই নানাস্থানে ব্যক্তিবিশেষের ও পরিবার বিশেষের দ্বারা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কথার উল্লেখ করিয়াছি কলিকাতায় মতিলাল শীলের অবৈতনিক কলেজ এক জনের দানের সাক্ষ্য দিতেছে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগ যেমন কলেজের প্রতিষ্ঠাতা, রাধাগোবিন্দ কর তেমনই একটি মেডিক্যাল কলেজের প্রতিষ্ঠাতা বলিলে এব যামিনীভূষণ রায় তেমনই একটি আয়ুর্ব্বেদীয় কলেজে প্রতিষ্ঠাতা বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পার্শী প্রেমচাঁদ রায়চাঁদের দান যেমন বিশেষ-বিদিত—প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রাসবিহারী ঘোষ, তারকনাথ পালিত প্রভৃতির দান তেমনই উল্লেখযোগ্য। আর যে শিক্ষাব্রতী আজ পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল সেই ডক্টর হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় যে এ পর্য্যন্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ৫লক্ষ ৮৩ হাজার টাকা দান করিয়াছেন, তাহার গৌরব অসাধারণ।

১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বলিয়াছিলেন—পূর্ব্ববর্ত্তী ৪ বৎসরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রায় ১৬ লক্ষ টাকা দান হিসাবে পাইয়াছিলেন; ইহার মধ্যে ২৫ হাজার টাকা এক জন ভারতীয় খৃষ্টানের (ডক্টর হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়) দান; পূর্ব্ববর্ত্তী ৫ বৎসরে মুসলমান দাতার নিকট হইতে মাত্র মোট ৬ শত টাকা পাওয়া গিয়াছিল। ইহাতেই হিন্দুদিগের শিক্ষা সম্বন্ধে আগ্রহের পরিচয় পাওয়া যায়।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে ও ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে এডাম এ দেশে দেশীয় ভাষায় শিক্ষা সম্বন্ধে যে বিস্তৃত রিপোর্ট সরকারে দাখিল করিয়াছিলেন, তাহাতে এ দেশে, বিশেষ বাঙ্গালায়, শিক্ষার অবস্থা বুঝিতে পারা যায়। তখন এ দেশে শিক্ষা লাভে আগ্রহের অভাব ছিল না। তবে তখন শিক্ষা অন্যরূপ ছিল। কিন্তু সে শিক্ষা যে সমাজের উপযোগী ও উপকারী ছিল, তাহাও লক্ষ্য করিবার বিষয়। বৃটেনে প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক হইবার পূর্ব্বের অবস্থার তুলনায় তখন বাঙ্গলার অবস্থা অনেক উন্নত ছিল, সন্দেহ নাই। তখন শিক্ষা যে স্থলে পুস্তকের সাহায্যে প্রদত্ত হইত না, সে স্থানে যাত্রা—কথকতা প্রভৃতির সাহায্যে ব্যাপ্তি লাভ করিত।

এখন মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্যে পুস্তক প্রকাশের সুবিধায় গাস্তর প্রবর্ত্তিত হইয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। শিক্ষালাভের আগ্রহ সমাজের সকল স্তরে বিদ্যমান। তরাং সরকার যদি তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য সম্পাদন করেন, তাহা হইলে দেশবাসী আবশ্যক শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া অল্প দিনেই—জাপানে যেমন হইয়াছিল তেমনই—জাতিকে উন্নতির পথে অগ্রসর করিতে পারিবে। সে বিষয়ে সরকারের আগ্রহ প্রয়োজন।

দুঃখের বিষয়, ভারত সরকার ও পশ্চিমবঙ্গ সরকার এখনও গতানুগতিকের ন্যায় ইংরেজের প্রবর্ত্তিত প্রথায় নিবদ্ধ রহিয়াছেন—কলুর বলদ যেমন ঘানী বেষ্টন করিয়াই ঘুরিতে থাকে, তেমনই ইংরেজ-প্রবর্ত্তিত প্রথা বেষ্টন করিয়া কাজ করিতেছেন—দেশের শিক্ষা-পদ্ধতির আমূল পরিবর্ত্তন করিয়া তাহা অবস্থার উপযোগী করিয়া তুলিতে পারেন নাই। রুশিয়া তাহা করিয়াছে এবং করিয়াছে বলিয়াই অল্প দিনের মধ্যে নিরক্ষরতা দূর করিয়া—যে অঞ্চলে যেরূপ শিক্ষার সুবিধা, সে অঞ্চলে সেইরূপ শিক্ষা প্রসারের ব্যবস্থা করিতে পারিয়াছে। রুশিয়ার দ্রুত উন্নতির তাহা অন্যতম কারণ।

এখানে ওখানে সামান্য সংশোধন, পরিবর্ত্তন, পরিবর্শন, পরিবর্দ্ধন এ দেশে বিদেশীর প্রবর্ত্তিত শিক্ষা-পদ্ধতিকে দেশের ও জাতির প্রয়োজনের উপযুক্ত করিয়া তুলিতে পারিবে না। সে জন্য যে ব্যবস্থার প্রয়োজন সেই ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার উৎসাহ, উদ্যম ও সাহস সরকারের থাকা প্রয়োজন। শিক্ষার জন্য ব্যয়-কার্পণ্যে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। শিক্ষার ব্যবস্থা স্থির করিবার যোগ্যতা সরকারের কর্ম্মচারী ব্যতীত আর কাহারও নাই মনে করিলে ভুল হইবে। উপযুক্ত লোককে শিক্ষা-মন্ত্রী ও শিক্ষা-সচিব করিতে হইবে।

আজ যদি স্বায়ত্ত-শাসনশীল সরকার এ সকল বিষয় বিবেচনায় আগ্রহশীল হইতে ভয় করেন, তবে তাহা দেশের দুর্ভাগ্যই হইবে এবং তাহা হইলে দীর্ঘ দিনের চেষ্টায়, রক্তপাতে ও অশ্রুপাতে—প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়াও আমরা যে স্বায়ত্ত শাসন পাইয়াছি, তাহা রক্ষা করিয়া তাহাকে প্রকৃত স্বাধীনতায় পরিণত করা সহজসাধ্য হইবে না।

অনুপাত

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

ট্রেনের কামরায় আলাপের শুরু, কিন্তু কামরাতেই শেষ হ'লো না। এলাহাবাদ ষ্টেশনে নামতেই ভদ্রলোক দুটো হাত আঁকড়ে ধরলেন।—আলাপ যখন হ'লো তখন কোন হোটেলে গিয়ে উঠলে চলবে না। গরীবের বাড়ীতে এ কটা দিন কাটাতেই হবে।

স্ত্রীর দিকে চাইলাম। অনুমতির অপেক্ষায়। 'মিছামিছি ভদ্রলোককে বিব্রত করা।' আপত্তি জানালেন। কিন্তু টিঁকলো না। ভদ্রলোক আমার হাত ছেড়ে দিয়ে নিজের দুটো হাত জোড় করলেন,'অমন কথা বলবেন না। আপনাদের মত অতিথি পাওয়া কতো ভাগ্যের কথা।' তারপর আর আমাদের কোন কথা শুনলেন না। হাঁক ডাক ক'রে টাঙ্গা ডেকে মালপত্র তুলে নিজে বসলেন গাড়োয়ানের পাশে। অবশ্য আমাদের দু'জনকে উঠিয়ে।

এতটা করার কোন প্রয়োজন ছিলো না। ছুটকো কথায় সামান্য আলাপ। সঙ্গে আনা খাবারের অংশ দিয়েছিলাম। সরকারী কলেজে পড়াই সে কথা বলে-ছিলাম। তাতেই ভদ্রলোকের ভক্তির মাত্রা বেড়ে গিয়েছিল।

উচ্ছ্বসিত গলায় বলেছিলেন, পণ্ডিত লোক আপনারা। আপনাদের সার্থক জীবন। লেখাপড়া নিয়ে আছেন। আমাদের মতন মুখ্যু নন। ক অক্ষর গোমাংস। কোন রকমে আনি আর খাই।

তারপরে আনা আর খাওয়ার যে বিবরণ শুনেছিলাম তাতে হতবাক হবার পালা আমার। এলাহাবাদ আর মির্জ্জাপুরে দু দুটো দোকান। মোটর পার্টস্‌এর। সেই উপলক্ষ্যেই ক'লকাতায় যাওয়া। তার ওপর টেগোর টাউনে গোটা তিনেক বাড়ী। নিজে থাকেন চকে।

মনে মনে ভাবলাম, জন্ম জন্ম ক অক্ষর গোমাংস থাক, মাটন হ'য়ে আর দরকার নেই। রোজ পাঁচ ঘণ্টা থুথু ওঠা চীৎকারের বদলে মাসান্তে যা পাই তা আর ভদ্র সমাজে বলবার নয়। সরকারী কলেজ। নিয়মিত টাকা ক'টা পাই, এই যা। তারপর পরীক্ষার খাতা দেখা নোটস্ লেখা এই সব উপরি আয়ের ওপর ভর ক'রে সংসার চালাতে হয় মাসের পর মাস। জীবন ধারণ নয় জীবন সংগ্রাম। অস্ত্রচিহ্ন সর্ব্বাঙ্গে।

কাজেই ভদ্রলোকের বাড়ীতে থাকার প্রস্তাবে মনে মনে খুশীই হলাম।

ভদ্রলোকের চেয়ে ভদ্রলোকের স্ত্রী আরো অমায়িক। চাকর-বাকর থাকা সত্ত্বেও সর্ব্বদা সংগে সংগে রইলেন। ছেলেপুলে হয়নি শুনে আফশোষ করলেন। নিজের তিনটি। দুটি ছেলে, একটি মেয়ে। ছেলে দুটি বাপের দোকানেই বসে। মেয়েটির বিয়ে দিয়েছেন বছর খানেক। বেনারসে। কলেজের ছুটিতে বেরিয়েছিলাম। উদ্দেশ্য কলকাতার ভীড় থেকে কয়েকদিনের জন্যও অন্ততঃ সরে থাকা। পুণ্য অর্জ্জনের ইচ্ছাটা যে একেবারে ছিলো না এমন নয়। সেই উদ্দেশ্যেই বেছে বেছে এলাহাবাদে আসা।

ফোর্ট, গঙ্গাযমুনা সঙ্গম, সিভিল লাইন্‌স সবই দেখা হয়ে গেলো। হয় ভদ্রলোক নয় তাঁর স্ত্রী রইলেন সঙ্গে। কোন অসুবিধা না হয় আমাদের।

ফিরে আসার প্রায় মুখে। ভদ্রলোকের দোকানে গিয়ে উঠলাম। এদিক ওদিক বেরিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়ে-ছিলাম, ভাবলাম দোকান বন্ধ হলে এক সঙ্গেই বাড়ী ফিরবো। স্ত্রী বেরেনি নি। যাওয়ার গোছগাছ নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন।

দোকান বন্ধ হতে দুজনেই উঠে পড়লাম। বাড়ীর টাঙ্গা। মোটর পার্টস্‌এর দোকান, কিন্তু ভদ্রলোক মোটর রাখেন নি। ময়রার মিষ্টি না খাওয়ার পুরাণো উদাহরণ বোধ হয়।

টেগোর টাউনে ঢোকার মুখেই ভদ্রলোক চালককে বললেন, 'মেরা অবনী বাবুকা কোঠিমে ঘুমকে যানা।'

এ ক'দিনেই ভদ্রলোকের আলাপী জনকয়েকের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিলো ভদ্রলোকেরই মাধ্যমে, কিন্তু তার মধ্যে অবনী বাবু ছিলেন না। তাঁর নামও শুনিনি।

নির্জ্জন রাস্তা। ভাঙাচোরা এক বাড়ীর সামনে টাঙ্গা থামলো। আশে পাশে ঝিঁঝির ডাক। বহুদিন চুণের প্রলেপ পড়ে নি বাড়ীটায়। জায়গায় জায়গায় পাঁজর বেরিয়ে পড়েছে।

ভদ্রলোক নেমে বাড়ীর সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। আস্তে ডাকলেন, 'বনমালী, বনমালী।'

বার তিন চার। তার পরেই বুড়োগোছের একটি লোক বেরিয়ে এলো। চেহারা আর পোষাকে চাকর বলেই মনে হলো।

'তোমার বাবু কেমন আছেন?'

'সেই রকমই।'

'কলকাতা থেকে আনা তেলটায় কোন উপকার হয় নি।'

বনমালী ঘাড় নাড়লো।

'একবার ভেতরে যাবো।' কথার সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রলোক এগিয়ে গেলেন। বনমালী সরে দাঁড়ালো। আমার এগোনো উচিত হবে কি না ভাববার মুখে বাধা পেলাম। ভদ্রলোক ঘাড় ফিরিয়ে ডাকলেন, "আসুন। আসুন।'

ডান দিকের ঘরে কালো পর্দ্দা টাঙানো। ম্লান বাতি। সব কিছু আবছা। একবারে জানালার ধারে একটি ভদ্রলোক বেতের চেয়ারে বসে রয়েছেন বাইরের দিকে চেয়ে।

'কেমন আছ অবনী'? ভদ্রলোক জোর গলায় জিজ্ঞাসা করলেন।'

দু এক মিনিট। কোন সাড়া শব্দ নেই। শুধু বাইরে বাতাসে গাছের পাতা কাঁপছে খস খস ক'রে।

'অবনী'! ভদ্রলোক আরো দু পা এগিয়ে আরো চড়ালেন গলার আওয়াজ।

বেতের চেয়ার সজোরে পেছনে ঠেলে অবনীবাবু উঠে দাঁড়ালেন, 'আরে এসো। কতক্ষণ এসেছো?'

'এই মাত্র। তারপর তুমি কেমন আছো বলো?'

'আমি, ভালো। আরে সায়ানাইড হজম করে ফেললাম, আমার আবার কি হবে।' কথা শেষ হবার আগেই অবনীবাবু সরে এসে ভদ্রলোকের একটি হাত ঝাঁপটে ধরলেন, 'বিশ্বাস করো, কেউ বিশ্বাস করে না, কিন্তু তুমি এ কথা বিশ্বাস না করলে ভারী কষ্ট হবে আমার।'

'আমি বিশ্বাস করছি অবনী, সত্যি বিশ্বাস করছি।'

অবনীবাবু একটু থামলেন। চোখ দুটো কুঁচকে ভদ্রলোকের মুখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন। তারপর সবেগে ঘাড় নেড়ে বললেন, 'না, না, তুমি মুচকি হাসছো, আমি বুঝতে পারছি তুমিও অবিশ্বাস করছো আমায়। কিন্তু সত্যি বলছি, আমি সে রাতে সমস্তটা চুমুক দিয়ে খেয়েছিলাম। একটুও ফেলে রাখিনি। দেখছো না, বিষের জ্বালায় এখনো গলাটা নীল হ'য়ে রয়েছে। উঃ কি অসহ্য যন্ত্রণা। কিন্তু শুধু কয়েক মিনিটের জন্য, তারপরেই অনন্ত শান্তি।'

অবনীবাবু দুটো হাত বুকের ওপর রেখে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলেন।

সেই অবসরে আমি ভালো ক'রে অবনীবাবুকে একবার দেখে নিলাম। সুখী পুরুষ। দীর্ঘ বলিষ্ঠ চেহারা। যৌবনের মনোরম গোধূলী।

অবনীবাবু চোখ খুললেন। আরক্ত দুটি চোখ। ঠোঁট দুটো কেঁপে কেঁপে উঠলো। মুষ্টিবদ্ধ হ'য়ে এলো হাত। হঠাৎ চীৎকার ক'রে উঠলেন, 'তোমরা মজা দেখতে এসেছো, বুঝতে পেরেছি। চুপি চুপি উঁকি মেরে দেখতে এসেছো আমি সত্যি মরেছি কি না। বেরিয়ে যাও, বেরিয়ে যাও সব।'

বনমালী বাইরেই কোথাও অপেক্ষা করছিলো; ছুটে এসে অবনীবাবুকে ধ'রে সাবধানে বেতের চেয়ারে বসিয়ে দিলো। আমি আগেই বাগানে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। একটু পরেই ভদ্রলোকটি আমার পিছনে এসে দাঁড়ালেন। চুপচাপ। কোন কথা নেই। টাঙ্গার গতিও মন্থর।

আচমকা ভদ্রলোক বললেন, 'অবনী আমার ছেলেবেলার বন্ধু। খুব ছেলেবেলার।'

কিছু একটা উত্তর দেওয়া দরকার মনে করে বললাম, 'মাথায় একটু গোলমাল হ'য়েছে মনে হ'লো।'

'একটু নয়, বেশ। চিকিৎসাপত্তর, কবচ, শাস্তিজল কত রকমই হ'লো। কিন্তু কোন উপকার হ'লো না। মাঝে মাঝে সুস্থ থাকে, কিছু বোঝবার উপায় নেই। সাধারণ মানুষ। চমৎকার কথাবার্তা। আবার হঠাৎ ক্ষেপে ওঠে এক সময়ে।

'কারণটা কি? বংশানুক্রমিক না কি?'

'উঁহু' ভদ্রলোক মাথা নাড়লেন, 'সে এক অদ্ভুত ব্যাপার।' তারপর গলার সুর নামিয়ে বললেন, 'চলুন গঙ্গার ধারে একটু বসা যাক। কালই তো যাচ্ছেন। আবার কবে দেখা হবে।'

টাঙ্গা থেকে নেমে এগিয়ে গেলাম। বিস্তীর্ণ গঙ্গা। ঢেউয়ের কলরোল। পাড় ঘেঁষে দু জনে বসলাম। পাশাপাশি।

আমি মনে করিয়ে দিলাম, 'অদ্ভুত ব্যাপার কি বলছিলেন?'

'হ্যাঁ' ভদ্রলোক পকেট হাতড়ে সিগারেট বের ক'রে ধরালেন। আমার ও নেশা নেই আগেই জানা ছিলো। দু একবার টান দিয়ে বললেন, 'বছর দশেক আগের কথা। অবনী ক'লকাতায় এম, এ পড়ছে। আমার বিদ্যে স্কুল অবধি। আমরা এখানে এক স্কুলে পড়তাম। এক ক্লাসে। মাঝে মাঝে ক'লকাতায় যেতাম। ছোট্ট ব্যবসা শুরু করেছিলাম, যেতাম জিনিষ কেনাকাটার ব্যাপারে। অবনীর মেসে গিয়েই উঠতাম। একবার গিয়ে শুনলাম, অবনী এক মেয়েছেলেকে বুঝি পড়াতে আরম্ভ করেছে। বড় লোকের মেয়ে। মাইনে ভালো। তখনি ব্যাপারটা আমার কেমন ভালো লাগে নি। অবনীকে বলেছিলাম, 'এই মাষ্টারী তুই ছেড়ে দে। আগুন আর ঘি দরকার নেই পাশাপাশি থেকে।' অবনী মুচকি হেসেছিলো। বলেছিলো, 'তুই অন্ততঃ একটা শতাব্দী আগে জন্মালে পারতিস। এ যুগে তুই বেমানান।'

তর্ক করি নি। চুপচাপ চলে এসেছিলাম। তারপরে বছর খানেকের মধ্যেই ঘটে গেল ব্যাপারটা।

ভদ্রলোক থেমে হাতের সিগারেটটা ছুঁড়ে জলে ফেলে দিলেন। নড়ে চড়ে ঠিক হ'য়ে বসলেন, তারপর বললেন, 'মেয়েটি কায়স্থ, অবনী ব্রাহ্মণ। ব্যাপারটা যখন অনেকখানি এগিয়েছে, তখন খেয়াল হ'লো, হিন্দুমতে বিয়ে সম্ভব নয়। অবশ্য অবনীর দিক থেকে আপত্তি করার মতন কেউ ছিলো না। এক বুড়ী দিদিমা, তাকে সে আমলই দিতো না। কিন্তু আপত্তির কারণ ছিলো মেয়েটির দিক থেকে। সে কথা মেয়েটিই বুঝি একদিন বললো মুখ ফুটে। অবনী তখন মরীয়া। দিকবিদিক জ্ঞান নেই। মেয়েটির হাত চেপে ধ'রে বললো, 'চলো পালাবো তোমাকে নিয়ে, তোমায় ছাড়া বাঁচতে পারবো না।'

মেয়েটিও অবনীকে ছেড়ে বাঁচতে পারবে না এমন কথা বলেছিলো, কিন্তু পালানোতে তার ঘোর আপত্তি। আত্মীয় স্বজনের চোখ এড়িয়ে সেটা সম্ভব নয়।

তারপর চরম প্রস্তাব এলো। অবনীর দিক থেকেই। ইতিমধ্যে মেয়েটি বুঝি আভাষে তার বাপকে কথাটা জানিয়েছিলো। বাপ অগ্নিশর্ম্মা। অবনীর সে বাড়ীতে যাওয়া বন্ধ হ'য়ে গেলো। কিন্তু লুকিয়ে চুরিয়ে দেখা সাক্ষাৎ ঠিক চলতে লাগলো দু'জনের। অবনী সায়ানাইড যোগাড় করলো। ভাগাভাগি করলো দু'জনে। এক রাতে খাবে ঠিক হ'লো। একসময়ে এ জন্মে মিলনে বাধা, কিন্তু পরজন্মে তো কোন অন্তরায় থাকবে না।

দু'জনে যে যার বাড়ীতে ফিরে গেলো।

এইখানে আমি একটু বাধা দিলাম, 'আপনি এত জানলেন কার কাছ থেকে?'

'অবনীর কাছ থেকে। ঘটনার বছর দু'য়েক পর পর্য্যন্ত ওর অবস্থা ঠিক এমন হয়নি। অবশ্য এক জায়গায় থাকতে পারতো না। দেশবিদেশে ক'রে বেড়াতো। মাঝে মাঝে হয়রাণ হ'য়ে এসে এলাহাবাদে ফিরতো। কিন্তু সর্ব্বদাই উন্মনা। বিড় বিড় ক'রে একলা থাকলেই কি সব বকতো। ওর মুখে খুটিনাটি সব কিছু শুনেছি।'

'তারপর ?'

তারপর ভদ্রলোকটি প্যাকেট খুলে আর একটা সিগারেট ধরালেন। আবার জোরে জোরে বার দু'এক টান, কি বুঝি ভাবলেন কিছুক্ষণ, তারপর শুরু করলেন, 'সে রাত্রে তো ছাড়াছাড়ি হলো। অবনী মেসে ঢুকে তিনতলায় নিজের কোণের ঘরের দিকে ঢুকলো। কিছু খাবেনা সে কথা ঠাকুরকে আগেই বলে এসেছিলো। কাজেই ঘরে ঢুকে দরজায় খিল এঁটে দিলো। চেয়ারটা টেনে জানলার কাছ বরাবর এসে বসলো। সায়ানাইড রইলো টেবিলের ওপর।

আলোয় সাজানো কলকাতার গলি। লোকের বিরাম নেই, কোলাহলেরও। ট্যাক্সি, রিক্সা, ট্রামের মিলিত শব্দ। ওর মনে হ'লো জীবনের সঙ্গীত। থামা নেই, বিরতি নেই, কেবল চলা, পা ফেলে ফেলে এগিয়ে চলা জীবনের পথে।

নিজের কথা ভাবলো। চোখ মোছবার মতন কেউ নেই, এক বুড়ী দিদিমা ছাড়া। আর হয়তো দু'একজন বন্ধুবান্ধব দীর্ঘশ্বাস ফেলতে পারে, এই যা।

ক্রমে রাত গভীর হ'য়ে এলো। সমস্ত নিস্তব্ধ। সরে এসে অবনী টেবিলে মাথা দিয়ে চুপচাপ বসে রইলো। ঠিক রাত দুটোয় দুজনের একসঙ্গে সায়ানাইড খাবার কথা। পরের দিন কাগজে লেখালেখি হবে। মেসে হৈ চৈ, ওদের বাড়ীতেও। পৃথিবী থেকে দু'জনে নিঃশেষে মুছে যাবে।

মেয়েটির কথা মনে হ'লো। সত্যি যদি পালিয়ে যাওয়া যেতো। আত্মীয় স্বজনের আওতা ছাড়িয়ে অনেক দূরে কোথাও। শুধু দুজনে। ছোট্ট বাবুইয়ের বাসা। ওদের সুখ দুঃখ আশা আনন্দ, শুধু ওদেরই।'

ভদ্রলোকের বলার ধরণে আমি একটু বিচলিত হ'য়ে উঠলাম। প্রায় সাড়ে দশটা। রাত হয়েছে, আবার কাল ভোরে রওনা হ'তে হবে। জিনিষপত্তর গোছাতেও সময় নেবে কিছু।

নিচু হ'য়ে হাতঘড়িটা দেখার চেষ্টা করতেই ভদ্রলোক ইঙ্গিতটা বুঝলেন। ব্যস্ত হ'য়ে বললেন, 'দেরী হ'য়ে যাচ্ছে, না ? আচ্ছা আমি তাড়াতাড়ি শেষ ক'রে ফেলছি।'

অপ্রস্তুত হলাম, বললাম, 'না, এমন আর কি রাত। আপনি বলুন। ভারি ভালো লাগছে শুনতে।'

—'টেবিলে মাথা রেখে অবনী অনেকক্ষণ ধ'রে ভাবলো। একটা মানুষের এলোমেলো অন্তিম চিন্তা।

'তারপর সর্ব্বনাশ হ'লো। এখন অবশ্য তাই মনে হয়। অবনীর এভাবে বেঁচে থাকার চেয়ে, সেদিনের মরণই ভালো ছিলো। যখন অবনীর তন্দ্রা ভাঙলো, তখন ভোর ছ'টা। জানালা দিয়ে রোদ এসে প'ড়েছে বিছানায়। ভোর বেলার নরম মিষ্টি রোদ। সেদিকে চেয়ে চেয়ে অবনীর ভারি ভালো লাগলো। তারপর কথাটা মনে পড়তেই সে চমকে টেবিলের দিকে চোখ ফেরালো। গ্লাসটা চুরমার হ'য়ে প'ড়ে রয়েছে, সেই সংগে বুঝি অবনীর ভাবী দিনগুলোও। ভাঙা কাঁচের টুকরোগুলো নাড়াচাড়া করতে করতে সহজ নির্ম্মম সত্যটা প্রকট হয়ে উঠলো। ও হয়তো মরতে পারলো না কিন্তু মেয়েটির কি হ'লো ? সে হয়তো শপথ পালন ক'রেছে। নিজেকে নিঃশেষ ক'রে ফেলেছে নিজেরই হাতে।

সেই অবস্থাতেই ছুটে গেলো মেয়েটির কাছে। অবশ্য বাড়ীতে ঢুকতে সাহস হ'লো না। চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো গলির মোড়ে, মেয়েটির বাড়ীর দিকে চোখ রেখে। না, কোন কান্নার আওয়াজ তো ভোরের বাতাসে ভেসে আসছে না, হৈ চৈ চীৎকারও নয়। কিন্তু অল্পক্ষণ। তারপরই অবনীর সারা শরীর থর থর ক'রে কেঁপে উঠলো। এক পা দু'পা ক'রে সে আস্তে আস্তে মোড়ের চায়ের দোকানে গিয়ে ঢুকলো। উস্কো-খুস্কো চুল, অবিন্যস্ত সাজ-পোষাক মেয়েটির ভাই দ্রুতপায়ে বাড়ী থেকে বেরিয়ে এলো। উর্দ্ধশ্বাসে চলতে শুরু করলো পথ দিয়ে। এদিক-ওদিক চোখ তুলে চাইলো না পর্য্যন্ত।

আর অপেক্ষা করতে সাহস হ'লো না। বাঁচাবার শেষ চেষ্টা চলেছে। একটু পরেই ভোরের আকাশ চিরে আর্ত্তকণ্ঠ জেগে উঠবে মা-বাপ-ভাই-বোনের সম্মিলিত

চীৎকার। কোন রকমে হাতছানি দিয়ে একটা রিক্সা ডেকে অবনী মেসে ফিরে এলো।

মেসে ফিরে এলো বটে, কিন্তু সেখানে বোধ হয় ঘণ্টা তিনেকের বেশী রইলো না। নিজের বিছানাপত্তর বেঁধে নিয়ে সোজা হাওড়া ষ্টেশনে রওনা হ'লো। বইয়ের গোছা আর টুকিটাকি জিনিষ মেসের কামরাতেই প'ড়ে রইলো। অবনীর জীবনে তাদের প্রয়োজন ফুরিয়েছিলো।'

ভদ্রলোক একটানা এতক্ষণ ব'লে একটু দম নিলেন। কিছুক্ষণ পরে আমার মুখের দিকে চেয়ে বললেন, 'আপনার হয়তো এমন একটা কাহিনী শুনতে ভালোই লাগছে না, কিন্তু বিশ্বাস করুন এর প্রত্যেকটি বর্ণ সত্যি। আমি একটুও বাড়িয়ে বলছি না। অবশ্য ব্যাপারটা জানাজানি হ'লো অনেক পরে। অবনীর দিদিমা কেঁদে এসে প'ড়লো আমার কাছে। মাসখানেক অবনীর কোন খবর নেই। প্রতিবেশীকে দিয়ে চিঠিও লিখেছিলেন, কিন্তু সে চিঠিও ফিরে এসেছে।

'পরের দিনই আমি ক'লকাতায় চ'লে গেলাম। মেসে গিয়ে শুনলাম মেসের পাওনা সব মিটিয়ে দিয়ে অবনী চ'লে গেছে। ব'লে গেছে কোথায় বুঝি চাকরী পেয়ে গেছে একটা, তাই পড়াশোনার এখানেই ইতি।

ফিরে এলাম এলাহাবাদে। বুড়ী দিদিমা আকাশ ফাটিয়ে চীৎকার করতে শুরু ক'রলো। অবনী সন্ন্যাসী হ'য়ে গেছে। এ আর দেখতে হবে না।

মাস চারেক পরে হঠাৎ একদিন শুনলাম অবনী ফিরে এসেছে। হাজির হলাম গিয়ে। চেনবার যো নেই, এমন হ'য়েছে চেহারা। এক মুখ দাড়ি, শুকনো দেহ। যেন চিতা থেকেই উঠে এলো।

সেই সময়েই একটু একটু ক'রে সব শুনলাম অবনীর কাছ থেকে, খুঁটিনাটি সব।

ভদ্রলোক দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন। ঘড়িতে এগারোটা বাজে। সে কথা বলতেই লাফিয়ে উঠলেন, 'সর্ব্বনাশ বড্ড রাত হ'য়ে গেলো তো। চলুন, চলুন, আর এক মিনিটও নয়।'

টাঙায় উঠলাম। নির্জ্জন পথ। ঘোড়ার খুরের শব্দ। মাঝে মাঝে দু'একটা কুকুরের চীৎকার।

আমিই বললাম, 'সে মেয়েটির বাড়ী আর খোঁজ করেননি।'

'হুঁ, করেছিলাম বই কি। ক'লকাতায় গিয়েছিলাম সেই জন্য। কিন্তু তাঁরা বাসা বদলেছেন। আশে পাশের লোকেরা আর কিছু খবর দিতে পারলো না।'

বাড়ী পৌছলাম প্রায় সাড়ে এগারোটা। সকলেই একটু চিন্তিত হ'য়ে পড়েছিলো। বিশেষতঃ আমার জন্য। নতুন মানুষ, অচেনা জায়গা। দোকানে লোক পাঠানো হ'য়েছিলো।

খাওয়া-দাওয়ার পর আরামকেদারায় পা ছড়িয়ে চুপচাপ বসে আছি, স্ত্রী এসে ঢুকলেন, 'বেশ লোক যা হোক, কোথায় গিয়েছিলে? আমরা ভেবে মরি।'

অন্য দিন হ'লে হালকা রসিকতার চেষ্টা করতাম, কিংবা সময়োচিত কোন উত্তর। কিন্তু ভালো লাগলো না। কেবল অবনীবাবুর দীর্ঘ চেহারাটা চোখের সামনে ভাসতে লাগলো। মুষ্টিবদ্ধ দু'টি হাত, আরক্ত চোখ, আর্ত্ত কণ্ঠস্বর। অবিশ্বাসের স্তবকে মোড়া প্রত্যেকটি মানুষ। কেউ বিশ্বাস করতে চায় না ওর কথা। সবাই সন্দেহ করে।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে স্ত্রী আবার বললেন, 'অন্য জিনিষগুলো আমি অনেক কষ্টে গুছিয়ে নিয়েছি, কিন্তু ওই মোটা বিছানা বাধা বাপু আমার সাধ্যি নয়।'

এরপর আর বসে থাকা সম্ভব হ'লো না। অবশ্য চাকরবাকরদের বললে তারাই সব ক'রে দিতো, কিন্তু কত আর অত্যাচার করা যায় ভদ্রলোকের ওপর!

বিছানাটা গুটিয়ে স্ত্রীর হাত থেকে দড়িটা নিতে গিয়েই থেমে গেলাম। নিটোল পেলব হাত। শঙ্খ-ধবল। মুখ তুলতেই নজরে পড়লো আয়ত দু'টি চোখ, পাতলা লালচে ওষ্ঠাধর। কিন্তু প্রিয়া নয়, নিষাদীর ছাপ সারা মুখে।

সেই মুহূর্ত্তে মনে হ'লো কোন রকমে যদি মাধবীকে টেনে নিয়ে যাওয়া যায় অবনীবাবুর সামনে। যৌবনের হিংস্র খেলার স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত ক'রে দেওয়া যায়, হয়তো অবনীবাবু প্রকৃতিস্থ হ'য়ে যাবেন, কিংবা বলা যায়, সামলাতে পারবেন না এ আঘাত, চীৎকার ক'রে মাটিতে লুটিয়ে পড়বেন চিরদিনের জন্য।

আত্মোন্নয়নে ভারতের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা

সন্তোষকুমার অধিকা

নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কোন দেশ বা জাতিকে সব দিক দিয়ে উন্নত বা অগ্রসর করে তুলতে হ'লে নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মসূচির প্রয়োজন হয়। এই কর্ম্মসূচি যাঁরা প্রণয়ন করেন তাঁদের কতকগুলি জিনিসের ওপর বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হয়। যথা: তাঁদেরকে পরিচিত হ'তে হয় দেশের ও জনসাধারণের অবস্থা, আর্থিক সমতা ও বৈষম্যের সঙ্গে। জনসাধারণের সাধারণ অভাব অভিযোগ তাঁদেরকে পর্য্যালোচনা করতে হয়, জানতে হয় সামাজিক পরিবেষ্টনী ও সমাজ কল্যাণের যথার্থ রূপকে।

দেশের সত্যকার কল্যাণের রূপটি অনুধাবন করতে হ'লে প্রয়োজন হয় বাস্তব ও বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গীর। বর্ত্তমান পরিকল্পনার খসড়াটি যাঁরা রচনা করেছেন তাঁদের মধ্যে এই বাস্তব ও বৈপ্লবিক দৃষ্টির পরিচয় মেলে কি না তাই আমাদের বিচার্য্য বিষয়। গত বিশ বছরের মধ্যে অনেক পরিকল্পনার জন্ম ও মৃত্যু এদেশের লোক দেখেছে। অর্থ ঝংকারের মাদকতা এখন আর কারুকে আকৃষ্ট করবে না। বোম্বাই পরিকল্পনার মত দশ হাজার কোটি মুদ্রা ব্যয়ের ক্ষমতা আমাদের নেই। বর্ত্তমান পরিকল্পনাকারীদের সুউচ্চ নিনাদও অবশ্য নেই যাতে আমরা নতুন করে বিভ্রান্ত হ'তে পারি। বরং অর্থ ব্যয়ে ও গন্তব্য লক্ষ্যের দিকে চেয়ে মনে সন্দেহ জাগে, সত্যিই দেশকে Progressive বা স্বয়ম্ সম্পূর্ণ করে গড়ে তোলার মত আন্তরিকতা তাঁদের আছে কিনা। কারণ বর্ত্তমান প্ল্যানিং কমিশন গোড়াতেই স্বীকার করেছেন যে এই পরিকল্পনা সার্থক হ'লে যুদ্ধপূর্ব্ব ভারতের জনসাধারণের জীবন ধারণের মান যে পর্য্যায়ে ছিলো—আমরা সেই পর্য্যায়ে পৌঁছোতে পারবো। কমিশন আরও স্বীকার করেছেন যে ১৯৫২ সালের মধ্যে খাদ্যে স্বয়ম্পূর্ণ হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। আগামী পাঁচ বছর খাদ্যে আমদানী নীতিকে বলবৎ রাখতেই হ'বে। অর্থাৎ পাঁচ বছরেও ভারতবর্ষকে ৩০ লক্ষ টন হিসেবে খাদ্যশস্য আমদানী করতে হ'বে।

আরও পরিষ্কার ভাষায় বলা চলে, দেশ দ্রুত গতিতে যে ক্ষয় ও ধ্বংসের দিকে এগিয়ে চলেছে বর্ত্তমান পরিকল্পনা সেই ক্ষয়কে রোধ করে ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষের আর্থিক মানকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে পারবে—এই মাত্র।

পরিকল্পনার প্রথমাংশের জন্য প্রয়োজন ১৪৯৩ কোটি টাকা। এই ১৪৯৩ কোটি টাকা যে কিভাবে সংগ্রহ করা যাবে তাও একরকম দুশ্চিন্তার বিষয় হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। অবশ্য অর্থ সংগ্রহের জন্য কমিশন কতকগুলি উপায় নির্দ্ধারণ করেছেন, সেগুলি পরে আলোচনা করা যাবে। আপাত দৃষ্টিতে মনে হয় যে বিষয় নিয়ে কমিশন সবচেয়ে বেশী মাথা ঘামিয়েছেন তা হচ্ছে দেশের শোচনীয় খাদ্য পরিস্থিতি ও জনসংখ্যার ক্রমবর্দ্ধমানতা। এ দেশের কৃষি ব্যবস্থা যে অত্যন্ত অধঃপতিত আর কৃষি ও উৎপাদনকে উন্নত করার ব্যবস্থা ছাড়া যে দেশকে বাঁচানো যাবে না, এই সত্য প্রণয়নকারীরা অস্বীকার করেন নি। কিন্তু তাঁরা এমন কোন আশ্বাস আমাদের দিতে পারেন নি যাতে এই সমস্যার দ্রুত সুরাহা হ'বে। বরং গতানুগতিক জমিদারী ও দায়ভাগ প্রথাকে স্বীকার করে নিয়ে শুধু সেচ ব্যবস্থার উন্নতি, ভালো সার ও বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি সরবরাহ করে উৎপাদন বৃদ্ধির যে পন্থা দেখিয়েছেন তাঁরা, তাতে পাঁচ বছর পরেও যে পর্য্যাপ্ত শস্য দেশে পাওয়া সম্ভব হ'বে এমন আশ্বাস কোথাও নেই। পাঁচ বছর ধরে বিপুল অর্থব্যয় করে এমন একটা এক্সপেরিমেণ্ট করার মত ক্ষমতা আমাদের আছে কি না তাও এঁরা ভেবে দেখেননি। আমাদের সমাজ ও ভূমি ব্যবস্থার যে চলিত রূপ—তাকেই বজায় রাখার ইচ্ছা কমিশনের সদস্যদের প্রবল। কাজেই সহজেই মনে হ'তে পারে যে, এঁরা দেশের অগণ্য জনসাধারণ ও শতকরা

৭০ জন কৃষক বা চাষীর ভাগ্যকে সমদৃষ্টিতে দেখতে পারেন নি।

পরিকল্পনার প্রথম অংশের খসড়া হিসেবের একটি তালিকা নীচে দেওয়া গেলো।

কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন	১৯১'৭০	কোটি	টাকা
সেচ ব্যবস্থা ও শক্তি উৎপাদন	৪৫০'২৬	"	"
পরিবহন ও যোগাযোগ	৩৮৮'২০	"	"
সমাজ কল্যাণ	২৫৪'০৮	"	"
শিল্প, কুটিরশিল্প ও কলকারখানা	১০০'৯০	"	"
পুনর্ব্বসতি	৭৯'০০	"	"
বিবিধ	২৮'৫৫	"	"
	১৪৯২'৬৯	"	"

প্রকৃতপক্ষে এই পরিকল্পনা কলম্বোপরিকল্পনার একটি পরিণতরূপ মাত্র। কলম্বো পরিকল্পনাটির মেয়াদ ছ'বছর ব্যাপী ও তাতে ব্যয়ের বরাদ্দ ছিলো ১৮৩৯ কোটি টাকা। সমালোচকরা বলেন যে, এই উত্তম পরিকল্পনারই উদ্দেশ্য দেশকে বিদেশী শিল্পপতিদের কাঁচামালের জোগানদার ক'রে গড়ে তোলা। তবে একথা সহজেই বলা চলে যে পরিকল্পনায় ইণ্ডাষ্ট্রি বা শিল্পনৈতিক দিকটি একান্ত উপেক্ষিত। যে অর্থ দেশে শিল্পের প্রসারের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে তা অত্যন্ত সামান্য। কারণ কমিশন শিল্পপরিচালনার ব্যবস্থাকে ব্যক্তিগত উদ্যমের ওপর ছেড়ে দিতে চান। তাঁদের মতে শিল্পব্যবস্থাকে রাষ্ট্রায়ত্ত করা অসম্ভব। এত অর্থ রাষ্ট্রের ভাণ্ডারে নেই। আর রাষ্ট্রের কর্ম্মচারিবৃন্দও এত কর্ম্মদক্ষ ও কর্ম্মনিষ্ঠ নয়। কমিশন শিল্পপরিচালনাকে ব্যক্তিমালিকানার হাতে ছেড়ে দিতে চান ও বলেন যে সম্পদকে নিয়োজিত করতে হ'বে কৃষি, সেচ ও বিদ্যুৎশক্তির উন্নয়নে। এই সকল দিকে লক্ষ্য দেওয়ার পর হাতে যথেষ্ট অর্থও থাকে না। কাজেই ব্যক্তিমালিকানা ও ব্যক্তিগত উদ্যমের ওপর নির্ভর না করেও উপায় নেই। কিন্তু শিল্প উন্নয়ন বিষয়টি অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ দ্বারা গঠিত উন্নয়ন পরিষদের হাতে রাখতে হ'বে।

পরিকল্পনাটির কার্য্যকালে দেশের শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে যে ফাঁক রয়ে গেছে তাকে সংশোধন ক'রে চালু করা, প্রয়োজনমত মেসিনারির পরিবর্ত্তন বা পরিবর্দ্ধনের দ্বারা কলকারখানাগুলির উৎপাদনশক্তিকে বাড়িয়ে তোলা—প্রভৃতির জন্য কমিশন নির্দ্দিষ্ট সাহায্যের ব্যবস্থা করেছেন। পণ্যদ্রব্যের উৎপাদন দ্রুত না বাড়ালে পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রিত করা যাবে না। তাই উৎপাদন বাড়িয়ে তুলতেই হবে। কমিশন স্বীকার করেছেন যে, "In private sector the installed capacity of 14 out of 15 listed industries is to be raised". যথা—এ্যালুমিনিয়াম-এর উৎপাদন শক্তি ৪০০০টন থেকে ২৫০০০ টনে, ষ্টীল (finished steel) দশলক্ষ থেকে ১৭ লক্ষ টনে বাড়িয়ে তুলতে হবে। কমিশন বিশেষ ভাবে জোর দিয়েছেন মোটর, টেক্সটাইল, সিমেণ্ট্ প্রভৃতি উৎপাদনের ওপর। এই সমস্ত শিল্পপ্রসারে ও যন্ত্রপাতির ক্ষয়পূরণে যে অর্থের প্রয়োজন তার পরিমাণ হচ্ছে ২০০—২৫০ কোটি টাকা। এর মধ্যে আনুমানিক ১৫০ কোটি টাকা শুধু মেসিনারি ক্রয় করার জন্য প্রয়োজন হবে। কমিশন মনে করেন এই টাকা আসবে,—

২৫ কোটি রাজ্যসরকারদের কাছ থেকে
১৫ " নতুন মূলধনের লগ্নিতে
২০০ " ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ফাইন্যান্স কর্পোরেশনের কাছে।

এছাড়া শিল্পোন্নয়নের কাজে আরও কিভাবে অর্থসংগ্রহ করা যেতে পারে কমিশন তারও উপায় নির্দ্দেশ করেছেন। যথা—মৃত্যুকর বা মৃতব্যক্তির সম্পত্তির ওপর করধার্য্য করা, বিক্রয়কর ও যানবাহনের ওপর ধার্য্য করকে আরও ব্যাপক করা, শ্রমিকের বেতনের হারকে নির্দ্দিষ্ট করা ও অতিরিক্ত মুনাফার অংশকে শিল্পে পুনর্নিয়োগ করা।

পরিকল্পনায় জলসেচ ও শক্তি উৎপাদনের ওপর অত্যন্ত জোর দেওয়া হয়েছে। অবশ্য একথা স্বীকার ক'রে নেওয়া যায় যে বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গে তার চাহিদারও বিস্তৃতি ঘটে। কিন্তু শিল্পায়নের দায়িত্বট পুরোপুরি শিল্পপতিদের শুভবুদ্ধির ওপর ছেড়ে দেওয়ার পর এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকে। কোন্ পরিকল্পনাতে কি এই পরোক্ষ নীতি বা Indirect method কার্য্যকরী হয়? কুটির শিল্প ও ক্ষুদ্রশিল্পগুলিকে গড়ে তোলার দায়িত্ব পরিকল্পনায় স্বীকার করা হয়েছে; কিন্তু এ জন্য বরাদ্দ টাকা মাত্র ১৬ কোটি। যখন এই নিরঃ

বেকার দেশে দ্রুত কোন সমাধানের ইচ্ছা বা উপায় পরিকল্পনায় স্থান পায়নি, তখন ক্ষুদ্র শিল্পগুলির প্রসারে অবস্থার গুরুত্ব কিছুটা লঘু হ'তে পারতো। কিন্তু এর জন্য প্রয়োজন ব্যাপক অর্থ সাহায্য। মধ্যবর্তী দালাল পুঁজি-পতিদের রাজত্বের অবসান ঘটিয়ে ক্রেতা ও উৎপাদকের মধ্যে সম্বন্ধ ঘটাতে না পারলে কুটিরশিল্প উন্নত হ'তে পারেনা। কমিশন সুপারিশ করেছেন সমবায় ব্যবস্থার। কিন্তু এই ব্যবস্থা সরকারের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপে হওয়া দরকার ও এর জন্য প্রয়োজন অর্থসাহায্যের। অন্যথায় দরিদ্র ও বিত্তহীন কারিগর শ্রেণী পূর্ব্বের মতই প্রবঞ্চিত হতে থাকবে। ক্ষুদ্র শিল্পগুলিও প্রসারিত হ'বে না।

আমাদের দেশের জনসাধারণের বড় অংশটিই কৃষির ওপর নির্ভর করে বেঁচে থাকে। অথচ কৃষি একটি লোকের পুরোবৎসরের কর্ম্মসংস্থান করতে পারে না। কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্র থেকে কিছু লোককে টেনে আনতে না পারলে জমীর ওপর চাপ কমবে না। শিল্পায়নের ক্ষেত্রে যেভাবে বিদেশী মূলধনকে আমন্ত্রণ করা হ'য়েছে তাতে মনে সন্দেহ জাগে একদিন এদেশটি বিদেশী বনিকদের মুনাফালাভের উৎস হ'য়ে দাঁড়াবে—অথচ মুদ্রাস্ফীতি রোধ, পণ্যদ্রব্যের মূল্য হ্রাস, বেকার সমস্যার সমাধান কোন সমস্যারই নিশ্চিত প্রতিকারের আশা নেই। যাঁরা পরিকল্পনার স্রষ্টা তাঁদের মধ্যেও যদি এত দ্বিধা ও সংশয় থাকে তবে সাধারণ লোক যে হতাশায় ভরে উঠ্‌বে সেকথা বলা বাহুল্য।

কমিশন বলেছেন যে পরিকল্পনা কার্য্যকরী হ'লে প্রথমে অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধির গতিকে রোধ করা হবে। দ্বিতীয় অবস্থায় রেশন ব্যবস্থা চালু রেখে ও পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ ক'রে উৎপাদন বৃদ্ধির উপায়কে সুগম রাখা হবে। তৃতীয় অবস্থায় (?) পণ্যমূল্যকে কমিয়ে আনা যাবে।

একটু বিস্তৃত আলোচনা করা যাক। কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে দেশরক্ষা খাতে বরাদ্দ ব্যয়কে সঙ্কুচিত করা কোনক্রমেই সম্ভব নয়। কারণ দেশকে অরক্ষিত রেখে কোন ব্যবস্থাই চলতে পারে না। বর্ত্তমান শাসন ব্যবস্থায় যে নিদারুণ অপব্যয় ও উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীদের বেতন ও সফর বাবদ যে বিপুল অর্থব্যয়—তাও কমিয়ে আনা সরকারের অভিপ্রেত নয়। বার্ষিক ত্রিশলক্ষ টন খাদ্যশস্য আমদানীর টাকাও মজুত রাখতেই হবে। এরপর পরিকল্পনার প্রথম দু'বছরে ৬৫৪ কোটি, ৮৪ লক্ষ, ৯৯ হাজার টাকা ব্যয়িত হবে ব'লে স্থির করা হ'য়েছে। বে-সরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিও এই সময়ে ১৫০ কোটি টাকা ব্যয় করবে ব'লে নির্দ্দেশ দেওয়া হ'য়েছে। এই ব্যয়িত মুদ্রার কিছু অংশ আসবে সঞ্চিত অর্থ থেকে, কিছু ঋণ গ্রহণাদির দ্বারা, বাকী অংশ কেন্দ্রীয় সরকার নোট ছাপিয়ে সংগ্রহ করবেন। কাজেই নিঃসন্দেহে বলা চলে প্রথম দুই বছরে মুদ্রা বৃদ্ধিজনিত মূল্য বৃদ্ধি ঘটবেই। অথচ এই সময়ের মধ্যেই পণ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে—এমন কোন আশ্বাস পরিকল্পনায় নেই।

কেন্দ্রীয় সরকার মুদ্রাস্ফীতিরোধের জন্য বহুভাবে চেষ্টা করছেন সত্য। কিন্তু এই প্রচেষ্টাগুলি আন্তরিকতা-মণ্ডিত নয়, এমন সন্দেহ অনেকেই করেন। একটা উদাহরণ ধরা যাক—প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ করবৃদ্ধির সমস্ত চাপ বহন করছে মধ্যবিত্ত, নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণী বা দরিদ্র শ্রেণী; কিন্তু মৃত্যুকর প্রবর্ত্তনের কোন চেষ্টা আজও সরকার করেন নি। জমিদারী প্রথা বিলোপের সংকল্প ফাইলের স্তূপেই চাপা রয়েছে বা রইবে। বিদেশ থেকে ঋণ পাওয়ার আশা কতখানি আছে জানি না, কিন্তু দেশ থেকে যদি নির্ব্বিচারে করধার্য্য ক'রে মুদ্রা টেনে নেওয়ার চেষ্টা করা হয়, তবে তার পরিণাম হয়ত মারাত্মক হ'তে পারে। শ্রেণীবিশেষের লোকেরা যে ভাবে প্রকাশ্যে লক্ষ লক্ষ টাকার আয়কর ফাঁকি দিচ্ছে, তাতে সরকারের অন্তর্নিহিত দুর্ব্বলতাই প্রকট হয়ে ওঠে। দরিদ্র সাধারণের হাতের অন্ন করভারে কুড়িয়ে নিতে সরকার ব্যস্ত, কিন্তু কোটিপতি ব্যক্তিদের সঞ্চিত অলস অর্থ আটক করতে (freeze) সরকারের একান্ত আপত্তি।

মোটকথা দেশের উন্নয়ন বিষয়ক যে কোন পরিকল্পনাকে কার্য্যকরী করতে হ'লে বৈপ্লবিক মনোবৃত্তির প্রয়োজন। আর এ কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, সরকার যদি এখনও বাস্তবদৃষ্টি নিয়ে অবস্থার পর্য্যালোচনা না করেন, এই অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধিকে সঙ্কুচিত করে, পণ্য-দ্রব্যের সরবরাহকে পর্য্যাপ্ত করতে না পারেন, তবে জনসাধারণের একটি বড় অংশ একেবারেই বিলুপ্ত হবে।

আলো

শক্তিপদ রাজগুরু

অন্ধকার মনোরাজ্যের প্রহরী একা সুমন্ত, সারা জগতের কল্পনা তার অচল অন্ধকারের স্পর্শ দিয়ে ভরা, রং, রস, রূপ সব কিছু তার তলিয়ে গেছে ওই কালো সমুদ্রের অতলে—তার কূল নাই, কিনারা নাই, শেষ নাই।

জন্মান্ধ সে! কলকাতার বনেদী পরিবারের একমাত্র সন্তান, মিঃ সেন আজ তার পূর্ব্বপুরুষের বহু সম্পদ নিজের দেশযোড়া ব্যারিষ্টারীর খ্যাতি—সম্মান প্রতিপত্তি সব কিছু দিয়েও একমাত্র সন্তানকে দিতে প'রেন নি তার দৃষ্টিশক্তি! সারা পৃথিবীর আলো বর্ণসুষমা আকাশের জাফরানী রংএর মেঘের ইসারা সব কিছু নিঃশেষ হয়ে গেছে ওই বন্ধ দুচোখের সামনে। ছেলের দিকে তাকাতে পারেন না তিনি। মনে হয় মাঝে মাঝে ওকে পৃথিবীতে এনে কোন মুক্ত আত্মাকে বন্দী করে তুলেছেন তিনি। ওর মুক্তি নাই।

দোতালার কোণের ঘরে বড় বড় কাঁচের সার্সি-গুলোতে সকালের প্রথম আলো ঝলমল করে ওঠে—বাগানের কেয়ারিতে মালি জল দেয়—আলো তুলে আনে ভোরের রজনীগন্ধা—ভুঁইচাপা একরাশ। টেবিলের উপর ফুলদানিতে সাজিয়ে রেখে দেয় ওগুলোকে।

—"কে—নার্স!"

—"হ্যাঁ।"

—"জানলাগুলো একটু খুলে দাও না—একটু হাওয়া আসুক—বড্ড গরম।"

সারা ঘর ভরে যায় সকালের আলোয়। বিছানায় এসে পড়ে—নার্স সুমন্তকে তুলে এনে বসাল ডেকচেয়ার-টাতে। কার পায়ের শব্দ শুনে মুখ তুলে চাইল সে: ওই একটি শব্দকে সে জানে অতি আপন বলে, অন্ধকার মনের সামনে কোন এক আলোকোজ্জ্বল স্নেহময়ী নারীমূর্ত্তি তাকে ঘিরে রয়েছে, সারা মনে এক স্বপ্নজগত—ফুলে ফলে প্রীতিতে ভরা কোন কোকিলের গানে ভরপুর এক রাজ্য!

মা!···মাকে নিয়ে সুমন্তর কেটেছে দীর্ঘ বাইশটা বছর! জন্ম থেকে মায়ের দেহের স্পর্শ তার মনকে ভরিয়ে রেখেছে—অন্ধকার পারে কোন আলোর নিশানার মত একখানা মুখ। প্রতিটি রেখা তার পরিচিত। চোখের চাহনি যেন কোন সবুজের মত স্নিগ্ধ শ্যামল! হাতের স্পর্শে সমস্ত দুঃখ বেদনা সে ভুলে যায়।

মা পাশে বসে ছেলেকে খাওয়াতে থাকে!

"স্যাণ্ডুইচটা খা···এই যে একটা মাত্র আপেল—এটা খাবিনা?"

মা অন্ধ পুত্রের দৈনন্দিন সঙ্গিনী। আপনভোলা স্বামী আর অন্ধপুত্র এই নিয়েই সুরুচি দেবীর সংসার। দীর্ঘ বহু বৎসরের প্রতিটি দিনের কর্ম্মতালিকা এক হয়ে চলে আসছে! কর্ম্মব্যস্ত আপনভোলা স্বামী যেমন অসহায়—অন্ধ পুত্রও তাই। নিজে আর সামলাতে পারেন না বলেই নার্সকে রেখেছেন মাত্র কয়েক মাস। —তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার কাজকর্ম্ম দেখে আসছেন, মনে হয় কাযের মেয়ে বটে আলো! ঘড়ির কাঁটার মত ভোর পাঁচটা হতে উঠে রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত নিপুণ হাতে সব কিছু পরিচর্য্যা করে চলে! কখন নাওয়ান-খাওয়ান, ওষুধ দেওয়া, মার হাত ধরে নীচের বাগানে বেড়াতে নিয়ে যাওয়া পর্য্যন্ত সে যথারীতি করে চলে!

আলো এবাড়ীতে নার্স হয়ে এসেছে মাত্র কয়েক মাস। এরি মধ্যে সে বেশ খানিকটা নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে নিয়েছে। শান্তির সংসার—অশান্তি কেবল এই একমাত্র অন্ধ পুত্রকে নিয়ে। সুমন্ত বোঝে সব—অনুভব করে বাবার পায়ের গুরুগম্ভীর শব্দে বাবার মনে চিন্তার গভীরতা! নীচে বসবার ঘরে মক্কেল বন্ধুদের সঙ্গে কথা, উচ্চহাসির টুকরো— সব কিছু ভেসে আসে তার ঘরে! বাবা

তখন অন্য মানুষ। মায়ের পায়ের শব্দ শোনে সে—মা যখন ঘরে ঢোকেন, সে হালকা পায়ের শব্দ মিলিয়ে যায়, মনের সমস্ত ব্যথা বেদনা পায়ের ছন্দে প্রকাশ হয়ে পরে। সারা ঘরখানায় তার যেন কেন এক অশরীরী আত্মা বেদনায় মূর্ত্তিময়ী হয়ে জুড়ে বসে রয়েছে—যাকে সুমন্ত দেখতে পায় সারা অন্তরের দুচোখ দিয়ে।

ঘরের ছন্দে শিহরণ তোলে সে একটি মাত্র প্রাণী ওই আলো। পায়ে তার হালকা সুরের রেশ! সারা মনে তার খুসির জোয়ার, একা নার্সই যেন তার ঘরের স্থবিরতার মাঝে এনেছে নতুন প্রাণের স্পন্দন, গানের ছন্দ, চেয়ারে বসে বসে কল্পনার জাল বোনে সুমন্ত—সুরে সুরে শিহরণ তোলে আলো তার সারা মনে।

মনে পড়ে আলোর অতীতের কাহিনী! সামান্য মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে সমাজ সংসারের কঠোর শাসন এড়িয়ে নিশ্চিত মৃত্যু এবং অপমানের হাত হতে রক্ষা করেছিল সে নিজেকে নার্সের ট্রেনিং নিয়ে।

একটি লোককে সে ভুলতে পারে না, ডাঃ তরফদার। বৃদ্ধ তাকে স্নেহ করেন মেয়ের মত। চোখের ডাক্তার হিসাবে তাঁর জুড়ি নাই। তিনিই হাসপাতাল থেকে নিয়ে আসেন—চাকরী দেন তাকে তাঁর নিজস্ব চেম্বারে। সেইখানে আলো চিনতে শেখে অন্ধকে—সারা পৃথিবীর মহাসম্পদের সন্ধান যার পায়নি—রবাহুত রইল যারা জীবনের মধুমেলার আমন্ত্রণে।

কি একটা থিসিস নিয়ে রিসার্চ্চ করতে চলে গেলেন ডাঃ তরফদার আমেরিকায়। তিনিই রেখে গেলেন আলোকে মিঃ সেনের স্পেশাল নার্স করে।

বৈকালে বাগানে চায়ের আসর বসেছে: মিঃ সেন কোর্ট হতে ফিরে বাগানেই চা খান, সুরুচী দেবী সেই সময়টা স্বামীকে নিয়েই ব্যস্ত থাকেন! তাঁর পোষাক বদলান, চা জলখাবারের জোগার করা; বাগানে টেবিল চেয়ার পাঠান, এই সব নিয়েই ব্যস্ত থাকেন।

মিঃ সেনের হাসির শব্দে সারা বাগানটা ভরে ওঠে: বলেন তিনি—"সে এক মজার কেস! মা আর ছেলেতে মামলা—মা বলেন ও মেয়ে আমার ছেলের স্ত্রী নয়—আর ছেলে বলে বাঃ ও যে আমার স্ত্রী আমি চিনি না!"

সুরুচির মনে কেমন যেন দ্বিধা আসে, বলে ওঠেন—"মায়ের অমতে ছেলে কেন বিয়ে করল?"

—'সে তুমি ঠিক বুঝবে না! তোমার ছেলে বিয়ে করবে তার মতে—তোমার আমার মতে নয়—আজকালকার এই নিয়ম।"

'ছাই নিয়ম!"

বিরক্ত হয়ে ওঠেন সুরুচি দেবী! স্বামীর মামলার ব্রিফ শুনে শুনে বিরক্তি ধরে গেছে সমাজের উপর। সব নোংরামিতে ভরা।

হঠাৎ বাগানের ও-পাশের দিকে চাইতে থেমে যায় মিঃ সেনের হাসি! নার্স-এর সঙ্গে আসছে সুমন্ত এইদিকেই! গম্ভীর হয়ে যায় দু'জনেই! থমকে দাঁড়াল সুমন্ত!

"চলুন!"

নার্স-এর কথায় সুমন্তর চমক ভাঙ্গে—না, উপরে যাব, নিয়ে চলুন!

বাবা-মায়ের হাসিউচ্ছল জীবন যাত্রার মাঝে সে গিয়ে বাধা হতে চায় না, ওদের জীবনে বহু দুঃখ সে এনেছে, আবার কেন বোঝা বাড়ান!

ধীরে ধীরে ফিরে গেল সুমন্ত, নার্সকেও ফিরতে হল!

বাবা-মা একটু বিস্মিত হয়ে ওঠেন! তাঁদের হাসি আনন্দ কথাবার্ত্তা আর জমলনা!

সন্ধ্যা নেমে আসছে: দূরে রেল লাইনের ওপরে কচি কচি দেবদারু গাছের মাথায় দিনের শেষ আলো মলিন হয়ে আসে। লেকের জলে লুটিয়ে পড়ে বিদায়ী আলোর ম্লান আভা। ট্রেনখানা ছুটে চলেছে সিটি দিয়ে বজবজের দিকে।

"সন্ধ্যা হয়ে এল না?"

দিনের মধ্যে এই সময়টায় রাস্তার লোকজনের কোলাহল, গাড়ীর ভিড়, ট্রেনখানার শব্দ কানে আসে সুমন্তের। সব কিছু শব্দ দিয়ে সময়ের হিসাব তার মাপা হয়ে গেছে। হাসনুহানার গন্ধ সবে ভরে তুলছে সন্ধ্যার আকাশ—পাখীর ডাকে নেমে এল সন্ধ্যা! অন্ধ

সুমন্তর শব্দমুখর জগত একদিনের হিসাব লিখে রাখে নিঃস্ব মনের দেওয়া নেওয়ার খাতায়।

চুপ করে বসে থাকে। বৈকালের মা-বাবার পরিবর্ত্তনটা মনে আসে! তাকে ওরা হয়ত সহ্য করতে পারে না। মা কেন তা হলে থেমে গেল?

"কি ভাবছেন?"

চমকে ওঠে সুমন্ত নার্সের কথায়—"ওঃ না: কিছু না! এমনি।"

বিকালের হঠাৎ ফিরে আসার ব্যাপারটা নজর এড়ায় নি আলোর। কোথায় যেন আঘাত লেগেছে ওর মনে। ফিরে চাইল আলো সুমন্তর কথায়—"আচ্ছা অন্ধ মানুষকে লোকে সহ্য করতে পারে না, না?"

"কেন?"

"যাদের সঙ্গে আমি প্রাণ খুলে মিশতে পারি না, তারা আমাকে চিরদিন সহ্য করবে কেমন করে?"

এ প্রশ্নের জবাব দিতে পারে না নার্স। হয়ত বা সুমন্তর অনুমান সত্যি! অন্ধকে বন্ধু বলে মেনে নিতে পারে না মানুষ, তার সমাজ অন্ধকে দেখে দয়ার পাত্র হিসেবে।

হঠাৎ একটা সুর—আলো আনমনে অর্গানটায় একটা সুর তুলতে থাকে।—ধীর পদে এগিয়ে আসে সুমন্ত। পুরবীর একটা তান! সুমন্ত সুরটা লক্ষ্য করে এগিয়ে আসে।

"আপনি গাইতে পারেন?"

"—না, বিশেষ নয়। মাঝে মাঝে একটু আলাপের চেষ্টা করি মাত্র!"

সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এসেছে সারা ঘরে। আলোটা জ্বালা হয়নি। সুরটা আলাপ করে চলেছে নার্স...সুমন্ত দাঁড়িয়ে রয়েছে অর্গানের পাশে স্বপ্নাবিষ্টের মত। অন্ধকার আকাশে উজ্জ্বল তারকার ম্লান আভার মত স্নিগ্ধ জ্যোতিতে অন্ধের সারা জগৎ যেন ভরিয়ে তুলেছে কোন মহাকাশের ইসারায়! সারা মন দিয়ে অনুভব করে সুমন্ত কোন এক অপূর্ব্ব আবেশের!

...হঠাৎ কার পায়ের শব্দ এগিয়ে আসে ঘরের দিকে: মা!...হ্যাঁ—এ মায়েরই পদধ্বনি। উজ্জ্বল আকাশের কোলে যেন কোন এক মহিমাময়ী নারীমূর্ত্তির আবির্ভাব—আলোয় ভরে ওঠে অন্ধকার!

"মা—! মা—!" এগিয়ে যায় সুমন্ত হাত বাড়িয়ে!

"মা তুমি রাগ করেছ—কতক্ষণ আসনি এ ঘরে! আমি বাগানে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ কেমন যেন ভালো লাগল না, চলে এলাম!"

মা উত্তর দেন না কথার। সন্ধ্যা হয়ে গেছে—এখনও পর্দ্দাগুলো ফেলে দিল না—আলো জ্বালা হল না। গান গাইছে কিনা নার্স—তারই ছেলেকে গান শোনাচ্ছে! মনটা যেন কেমন খিঁচড়ে যায় তার।

নার্স ও-গান বন্ধ করে উঠে দাঁড়ায় মাকে আসতে দেখে! এগিয়ে আসে মা—"এখনও কিছুই করনি! গান গাইছ?"

"বেশ চমৎকার গান জানেন মা উনি!"

"ওঁকে গান গাইবার জন্য এখানে রাখা হয়নি! ওঁর অন্য অনেক কাজ আছে, সেটা উনি যেন ভুলে না যান!"

মা বার হয়ে গেলেন। স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে সুমন্ত। আলোর সারা মনে যেন একটা জ্বালা! মুখ নামিয়ে রয়েছে সে! কোথায় কি যেন একটা অন্যায় সে করে ফেলেছে।

গান গাইতে বসে কি সে অন্যায় করেছে! কিন্তু কই তার ত স্মরণ হয় না!

মা নার্সের এই ব্যবহার ঠিক বরদাস্ত করতে পারেননি। নার্স সে চাকরী করতে এসেছে, পারিবারিক ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাবার প্রয়োজন তার কেন হয়! আজ বৈকালে সুমন্ত দিনকার মত চায়ের আসরে আসতে গিয়ে থেমে চলে গেল!

অন্ধকার ঘরে—নির্জ্জনে নার্স অতি ঘনিষ্ট ভাবে তাঁর একমাত্র ছেলেকে গান শোনাচ্ছে—এই দৃশ্যও তাঁকে দেখে চুপ করে সরে চলে আসতে হবে—এ তিনি সহ্য করবেন না! যত কঠিন হতে হয় হবেন তিনি, দরকার হয় এই নার্সকে জবাব দেবেন, তবু এ সব অনাচার—মা ছেলের মধ্যে বিভেদের প্রাচীর তুলবার প্রচেষ্টা তিনি সহ্য করবেন না! তাঁর এতদিনের স্নেহ প্রীতি অন্তরের সর্ব্বস্ব দিয়ে মানুষ করা ছেলেকে আর একজন বদলে

দেবে—তাঁর কাছ হতে ছিনিয়ে নেবে অন্যায়ভাবে, এ তিনি সহ্য করবেন না। সনাতন নারীত্বে তার আঘাত দেবে অন্য নারী, তাই মায়ের মাতৃত্ব আর নারীত্ব তার-স্বরে প্রতিবাদ করে তার! এ তিনি কিছুতেই হতে দেবেন না।

...রাত্রি হয়ে আসে। ঘরটা নীরব নিস্তব্ধ। কেউ নাই। একা সুমন্ত বসে রয়েছে জানলার ওপাশে। নীল আলোয় ঘরটার স্তব্ধতা যেন বুকে চেয়ে আসে।

হঠাৎ কার পায়ের শব্দে চমকে ওঠে।

"মা।" মা এগিয়ে আসেন—ছেলের মাথায় আলতো ভাবে হাত বুলোতে থাকেন। ঝি ওদিকে খাবারগুলো টেবিলে সাজাতে থাকে। দুচোখ বুজে মায়ের স্নিগ্ধ স্পর্শ অনুভব করতে থাকে সুমন্ত!

আকাশে কখন এক টুকরো মেঘ জমেছিল। বৈশাখের কালো মেঘ, রাতের আলোয় দিগন্তশীর্ষে রং ধরে। দূর-দূরান্তরের নারকেল কুঞ্জে লাগে ঝড়ের লাস্য, আকাশের বুক চিরে খেলে যায় বিজলীর আভা। অন্ধকারময় ধরিত্রী কেঁপে ওঠে মেঘের ডাকে।

"ঝড় উঠেছে না মা?"

"হ্যাঁ বাবা।" মা উঠে যান জানালাগুলো বন্ধ করতে।

"জানালাগুলো খোলা থাক মা।... একটু নিয়ে চল না জানালার ধারে।"

বাইরের আকাশে বাতাসে ঝড়ের মাতামাতি। সারা পৃথিবী কেঁপে উঠেছে। বিদ্যুতের আভা দিকদিগন্তের অন্ধকার চিরে প্রকাশ করে দেয় নিজের অস্তিত্ব বিশাল জগতের মাঝে! খোলা জানলা দিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে মাতামাতি সুরু করেছে ঝড়ো হাওয়া। বন্ধ দুচোখ বাড়িয়ে অন্ধ খুঁজে বেড়ায় বিরাট বিশ্বে কোথায় কি মাতন চলেছে। বিদ্যুতের তীব্র আভা তার বন্ধ চোখে কোথাও স্পর্শ জাগায় কিনা?

আলোর মনে চলেছে ওমনি ঝড়ের মাতন! সুরুচি-দেবীর কথাগুলো তার মনে বেজেছে কোন্ অন্তস্থলে তা সে বেশই অনুভব করে। অন্যায় সে করেনি, তবু কেন এই অভিযোগ সে জানে। মায়ের মাতৃত্ব ছাড়িয়ে সে নারীর নারীত্বে আঘাত হেনেছে যা কোন নারীই কোন দিন সহ্য করবে না।

কদিন হতে অনুভব করে সুমন্ত নার্স আর বড় একটা আসেনা, আসে যখন নেহাৎ কোন কায করতে, অন্য সমস্ত কায চাকর বাকরেই করে—মা নিজের হাতে খাবার নিয়ে আসেন—খাওয়ান তিনিই! মাঝে মাঝে মনে হয় মাকে জিজ্ঞাসা করবে—নার্স কোথায়—?

কিন্তু কোথায় যেন বাধে, পারেনা সে জিজ্ঞাসা করতে।

বর্ষা এসেছে।

আকাশে আকাশে কালো মেঘের আনাগোনা। দিক-দিগন্ত ভরে ওঠে কোন দানবের বজ্র নির্ঘোষে! লেকের তীর জনহীন নিস্তব্ধ হয়ে আসে, দেবদারু ঝাউ আমগাছের মাথায় ঝরে অঝোরে বৃষ্টির ধারা। জানলার কাছে বসে রয়েছে সুমন্ত—মায়ের সঙ্গে গল্প করছে।

চারদিকে বৃষ্টির শব্দ! দিগ্‌জোড়া লেকের জলে বৃষ্টির ধারা ধ্বনি প্রতিধ্বনি তোলে! বড় ইচ্ছা হয় বৃষ্টি বর্ষা কেমন লাগে কিছু জানতে।

মা ছেলেকে শুনিয়ে চলেছেন—সারা আকাশ মেঘে কালো হয়ে ওঠে, গাছগুলো মাথা নাড়ে বাতাসের বেগে—আর ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ে মাটির বুকে—জলের উপর! ওই যে ঝম্ ঝম্ শব্দ উঠছে!

কান পেতে শোনবার চেষ্টা করে সুমন্ত! মা তাকে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে পৃথিবীর সঙ্গে! নিজেই ছেলের চোখ হয়ে উঠেছেন, তাকে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন প্রকৃতির সঙ্গে।

—"একটু বৃষ্টিতে নিয়ে চল না মা?"

"পাগল ছেলে—" মা হাসতে থাকেন।

একটা দীর্ঘশ্বাস বার হয়ে আসে সুমন্তের বুক চিরে! পৃথিবীর আলো বাতাস, শ্যামল দিগন্ত, ফুলে ফলে ভরা কোন মধুমাস, বর্ষার সজল সমারোহ—সব কিছু হতে সে নির্বাসিত, কোন অধিকার তার নাই!

মা ছেলের মুখের দিকে চেয়েই হাসি বন্ধ করে দেন, স্তব্ধ হয়ে যান তিনি।

"আচ্ছা মা, আমার সামনে তোমরা কেউ হাস না, কেমন গম্ভীর হয়ে যাও, আমি বেশ বুঝতে পারি—এখানে আমার ঘরে যখনই কেউ তোমরা আস—একেবারে অন্য মানুষ! আচ্ছা তোমাদের হাসি আমি দেখতে পাই না, হাসতেও পারি না, তাই বোধ হয় তোমরা কেউ হাস না আমার সামনে! যেটুকু ভালবাস দয়া করে—"

মায়ের মনটা নাড়া দিয়ে ওঠে, "সুমন্ত—বাবা!"

"আমি জানি মা, হাসতে আমি পারি না, হাসি হয়ত আমার কান্না হয়ে ওঠে, আমি নিজে ত সে আর দেখতে পাই না!"

ব্যথায় তার কণ্ঠস্বর যেন বন্ধ হয়ে আসে। মা স্তম্ভিতের মত হয়ে যান! হঠাৎ নীচে মিঃ সেনের হাসির দরাজ শব্দ উপরে ভেসে আসে—বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে বর্ষার দিনে তিনি হয়ত আসর জমিয়েছেন। মা উঠে বার হয়ে যান।

এতদিন ধরে আলো চেষ্টা করছিল অন্যত্র একটা ভাল চাকরী পেলেই সে এ বাড়ী ছেড়ে চলে যাবে। এখানে তার কি মায়া আছে! তা ছাড়া নার্সের কোন দরকারই নাই। সুবিধা মত একটা চাকরী জুটিয়ে নিয়েছে, কালই সে চলে যাবে।

রাত্রি বেড়ে চলেছে। নীল আলোটা বর্ষার পরিবেশে যেন এক মায়াজাল রচনা করেছে সুমন্তর ঘরে! জানলাগুলো সব খোলা, বৃষ্টির শব্দ কমে' এসেছে। দূরে অন্ধকার লেকের পারে দু' একটা আলো জনহীন পথটাকে ভরিয়ে রেখেছে। নারকেল গাছ হতে দমকা বাতাসে ঝরে পড়ে বৃষ্টির সঞ্চিত জলধারা। বাগানে রজনীগন্ধার ঝাড়গুলো হতে ভেসে আসে মৃদু সুরভীর সামান্য রেশ।

দরজার সামনে থমকে দাঁড়ায় আলো। অস্পষ্ট আলোতে সুমন্তর দিকে চেয়ে থাকে। নিস্পন্দ হয়ে বসে রয়েছে সে; চুলে কপালে, গালের নীচে টুকরো টুকরো আলো-আঁধারি মিলে যেন কোন-এক অপরূপ সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করেছে।

পায়ের শব্দ পেয়ে যেন সুমন্তর চমক ভাঙ্গে!—"কে—নার্স?"

এগিয়ে যায় আলো—"হ্যাঁ, আমি! কাল চলে যাচ্ছি।"

"কেন?"

"ভাল একটা চান্স্ পেয়েছি।"

নীরবে বসে থাকে সুমন্ত। চাদরটা পা অবধি ঢাকা, মাথার চুলে নীল আলো পড়ে যেন একটা মহামৌনতার সৃষ্টি করেছে। সুমন্তর কথাগুলো নীরবে শুনে যায় আলো।

"কেন চলে যাচ্ছেন তা আমি জানি! বেশ—যান, চোখে আপনাকে দেখতে পাই না; তবে মনে যে ছবিটুকু রয়েছে, তাতে মনে হয় আপনি অত্যন্ত শান্ত, তাই গোলমাল না করে নীরবেই চলে যাচ্ছেন।"

"আমাকে ভুল বুঝবেন না আপনি। আমার জন্য আপনাদের পারিবারিক শান্তি বিপন্ন হোক, এ আমি চাই না—আর চাই না বলেই সরে যাচ্ছি।"

সুমন্ত কথা কয়না!...কোন অনুরোধও করেনা—জানে হয়ত থাকবে না! অন্ধের ভাবপ্রবণ মনে বেশ আঘাত করে—আলো চলে যাবে!

একি! সারা শরীরে সুমন্তর একটা শিহরণ খেলে যায়,—"চাদরখানা পড়ে গেছে কি না—তুলে দিচ্ছি!"

কিন্তু আলো জানে এ তার মনের কথা নয়। সারা মন আজ বিদায়ের সময় একটু স্পর্শলাভের জন্যও ব্যাকুল হয়ে উঠে, এ দুর্ব্বলতা অন্ধ সুমন্তর মনকেও এড়াতে পারে না। কিন্তু সামান্য ক্ষণিকের একটু পাওয়ার সান্ত্বনা দিয়ে মস্ত হারানকে সে সইয়ে নিতে চায় না।

কোন সাড়াই সে দিল না আলোর মনের এ আহ্বানে।

মিঃ সেন বহুদিন পর ডাঃ তরফদারকে দেখে যেন আশান্বিত হয়ে ওঠেন, দীর্ঘদিন পর তিনি ফিরে এসেছেন আমেরিকা হতে, এসেই দেখতে এসেছেন সুমন্তকে, একবার শেষ চেষ্টা তিনি করবেন।

রেটিনার উপর যদি সাবধানে অপারেশন চালাতে পারেন, হয়ত আবার দৃষ্টিশক্তি ফিরে আসতে পারে—এ রকম কয়েকটা কেস শিকাগো হাসপাতালে তিনি

দেখে এসেছেন—নিজেও বেশ কিছু পড়াশোনা করেছেন। কৃতকার্য্য হবেন এ বিশ্বাস তাঁর আছে।

আলো চলে যাচ্ছে—কিন্তু ডাঃ তরফদারের সঙ্গে দেখা হতেই মত বদলাতে হয় তাকে। চলে যাবার আসল কারণটা ব্যক্ত করতে পারে না, এ বাড়ীতে ঠিক তার থাকা চলছেনা—

কিন্তু ডাক্তারের সন্ধানী দৃষ্টি এড়ায় না—আসল জায়গাতেই তিনি আঘাত করেন।

—"যাও অন্ধ, ওর দিকটা একটু দেখ; যদি তোমার সেবা-যত্নে ও দৃষ্টি ফিরে পায়, এতে কি তুমি একটুও সুখী হবে না?"

মুখ নামিয়ে থাকে আলো। সুরুচি দেবী এগিয়ে আসেন; তিনি মা—ছেলে যদি সেরে ওঠে, দৃষ্টিশক্তি পায়, তার জন্য তিনি আজ অনুরোধ করেন, "থেকে যাও মা! বড় অপারেশন হচ্ছে—তুমি থাকলে ও বেচারা একটু ভাল থাকবে। অপারেশন হয়ে গেলে যদি ইচ্ছে হয় চলে যেও, আমি বাধা দেব না।

আলোর মনে জাগে সহানুভূতি সুমন্তের প্রতি। মায়ের স্বার্থপরতাময় অনুরোধে নয়—যদি থাকে সে, তার মনের সায়েই থাকবে সে।

বড্ড অসহায়—মনে পড়ে গত রাত্রের কথা, থাকতে অনুরোধ করেনি—তবু তাকে বিদায় দেবার সময় অন্ধের বন্ধচোখের কোল যেন অকারণেই সজল হয়ে উঠেছিল। এর দাম সে দেবে।

অপারেশনের ব্যবস্থা সব ঠিক করে ফেলেন ডাঃ তরফদার! কিন্তু অপারেশন কলকাতাতে হবে না, হবে এখান হতে বহু দূরে সমুদ্রের তীরে, সামনে কেবল থাকবে নীল সমুদ্র! গাঢ় নীল রং আকাশ আর সমুদ্র! নোতুন চোখ—সমস্ত নার্ভ যেন কোন প্রখর আলোর স্পর্শ না পায়—চোখ মেলে সে দিনের পর দিন দেখবে নীল রং—সমুদ্র আর আসমানি রং-এর আকাশ! প্রকৃতির শ্যামল রূপ—বিশ্বের সৌন্দর্য্যের ভাণ্ডারে সে প্রার্থনা করবে তার নবজাতক দৃষ্টিশক্তি!

মিঃ সেন—মা—ডাঃ তরফদার—নার্স আলো আরও লোকজন সহকারী নিয়ে তারা বেরিয়ে পরলেন কলকাতা হতে! সুমন্ত যন্ত্রচালিতের মতই চলেছে তাদের সঙ্গে!

"সারা আকাশ বাতাস জুড়ে ও কিসের শব্দ আলো?" সুমন্তর কথায় ফিরে চাইল আলো, ফুড তৈরী করছিল সে! এগিয়ে আসে! সারা ঘরখানাতে সমুদ্রের জলো হাওয়া মাতামাতি করে। নীচে বালুবেলার পরই সমুদ্রের জলকল্লোলসীমা! আছড়ে পড়ে ঢেউগুলো একটার পর একটা—বহু দূরের বালি ভিজে যায়—পিছিয়ে গেল ঢেউ—আবার আসে সমুদ্রের বুক হতে আর একটা ঢেউ—একটার পর একটা! চলেছে অনবরত জলরাশির উন্মাদনা!

—"ও সমুদ্রের গর্জ্জন!"

"লেকের চেয়ে অনেক বড়, না?"

"নিজের চোখেই দেখবেন।"

মলিন ক্লিষ্ট বেদনাতুর হাসিতে সারা মুখখানা ভরে ওঠে সুমন্তের।

রাত্রি হয়ে আসে! নির্জ্জন সমুদ্রতীরে মিঃ সেন বেড়াতে বার হয়েছেন, সুরুচি দেবীর মনে কেমন যেন একটা চিন্তা! নার্সটাকে তার মোটেই ভাল লাগে না—চাকরী করতে এসেছে কিন্তু অমন কেন? অন্য নার্স কি আর পাওয়া যেত না!

···আকাশে বাতাসে সমুদ্রের রুদ্ধ আক্রোশ ধ্বনি! কোন কথা শোনা যায় না—কেবল সীমাহীন সমুদ্রের অট্টহাস্য, উঁচু উঁচু ঢেউ-এর মাথা ঝলমল করে রাত্রির অন্ধকারে! ফস্‌ফরাসেণ্টের নীল আভা—দূর—বহু দূরের নীল সমুদ্র ভরিয়ে রেখেছে আলো-আঁধারির মায়ায়

পরশু অপারেশন!

রোগীকে যেমন করে হোক প্রফুল্ল রাখতে হবে। ডাঃ তরফদার এ কাযের জন্য আলোকেই রেখেছেন!

আলোর এ অভিনয় ভালো লাগে না। সারা মন জুড়ে মাঝে মাঝে প্রতিবাদ ওঠে—একি জালে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছে সে—তবুও সান্ত্বনা পায়—যদি ওর দৃষ্টি ফিরে আসে—ওর জন্ম সফল হবে!

গান গাইছে—সারা প্রকৃতির বুক ভরিয়ে রেখেছে সমুদ্রের গর্জ্জন—তারাকিনী রাত্রির আঁচলে যেন কোন

মহাসম্পদের সন্ধান পেয়েছে সে—তাই ছিনিয়ে নেবার জন্ত বারিধির এই দুর্ব্বার প্রয়াস।

সুমন্ত নীরবে শুনে চলেছে গানটা।

"কি মনে হয় জানো আলো।"

এগিয়ে আসে আলো তার পাশে। অজ্ঞাতেই তার হাতখানা এসে গেছে সুমন্তর হাতে।

জিজ্ঞাসা করে আলো—"কি মনে হয়

"চোখ ফিরে পেলে তুমি হয়ত চলে যাবে, তাই ভাবি না দেখতে পেলেও তোমাকেও ত পাব কাছে।'

"কিযে বলেন আপনি?"—আলোর সারা মন যেন চলে গেছে ওই অন্ধকার কুহেলীরহস্ত ভেদ করে বহু দূরে কোন অজানা সমুদ্রে রাঙ্গা বাসা বোনা প্রবাল দ্বীপের সন্ধানে।

—মা ফিরছিলেন বেড়িয়ে—দরজা দিয়ে দৃশুটা দেখে চমকে ওঠেন—ঘরে ঢুকতে যাবেন, মিঃ সেন তাকে টেনে সরিয়ে নিয়ে যান।

"ছিঃ কি করছ সু।"

"এই সব চুপ করে সহ্য করতে হবে—তখনই বলেছিলাম ও মেয়েটাকে এনো না তোমরা—"

"আঃ...চলে এস ওখান হতে।"

কোন রকমে তাকে টানতে টানতে নিয়ে চলে যান মিঃ সেন।

মায়ের কাছ হতে সন্তানকে দূরে সরিয়ে নেবে নারী এ তার কাছে অত্যন্ত অপমান! যে সন্তানকে তিনি পৃথিবী চিনিয়েছেন—যার মনে তিনি পৃথিবীর শ্যামল রূপ—বর্ষার সমারোহে সবকিছু সৌন্দর্য্য বোধ জাগিয়ে তুলেছেন, সে সৌন্দর্য্য বোধ থাকবে একমাত্র তাকে—সেই নারীকে ঘিরে! যখনই তার ব্যতিক্রম ঘটে—মা এবং সাধারণ কোন নারীতে আর কোন প্রভেদ থাকে না!

সুরুচি দেবীর সারা মন তেমনি কোন আক্রোশে গুমরে ওঠে! ও কাঁটা তিনি দূর করবেনই!

—আলো অভিনয় করতে করতে মাঝে মাঝে নিজেকে ধরা দিয়ে ফেলে! যে জাল হতে নিজেকে মুক্ত করতে চায়—নিজের অজ্ঞাতেই সে জড়িয়ে পড়ে বার বারউর্ণনাভের মত নিজেরই জালে।

..ভোর বেলায় আলো ঘুমভাঙ্গায় সুমন্তের। জানলাগুলো খুলে দেয়, সমুদ্রের মধ্যখান হতে সূর্য্য উঠবার সময় হয়ে ওঠে। ফাগের রং-এ রঙ্গীন হয়ে ওঠে সারা আকাশ—কোন মহাদেবতার আগমনী—শান্ত স্থির হয়ে পড়ে থাকে সমুদ্র—মহাদেবতার চরণে নুইয়ে পড়ে যেন প্রণতি জানায়। এ দৃশু দেখাতে পারে না—বোঝাতে পারে না—বর্ণনা করতে পারে না আলো সুমন্তের কাছে। প্রণতি জানায় মহাদেবতার কাছে—ওকে তোমার আশীর্ব্বাদ কর—তোমাকে দেখতে পাক ও।

ক'দিন কোন কাজকর্ম্ম নাই। নীরবে চুপচাপ শুয়ে থাকা। সুমন্তর অপারেশন হ'য়ে গেছে। ডাঃ তরফদার নিজে আশা করছেন দৃষ্টি ফিরে পেতে পারে। ক'দিন কিন্তু কোন নড়াচড়া চলবে না—স্থির হ'য়ে শুয়ে থাকতে হবে। কোন উত্তেজনা বা কোনরকম সামান্যতম চাঞ্চল্যও সমস্ত আশাভরসা নিঃশেষ ক'রে দেবে।

নীরবে আসে আলো—শুয়ে শুয়েই কোন রকমে খেতে হয় সুমন্তকে। মা মাঝে মাঝে দূর হ'তে দেখে যান ছেলেকে। নিজের ছেলে—তাকে কথা বলবার—এসে ব'সে গল্প ক'রবার দাবীও এখন নাই

আলোই সব করে—গা পঞ্চ করা থেকে ওষুধ খাওয়ান এমনকি সময় অসময় গানও শোনাতে হয়।

মায়ের সারা মন বিষিয়ে ওঠে। এমনি ক'রে তাকে দূরে দূরে সরিয়ে রেখে তাঁর নিজের ছেলেকে নিয়ে এ কি প্রহসন!

...দিনের আলো আসে—বালুঝড় ওঠে—দিগন্ত ভরে যায় বালুকণায়। জানলার পারে চাঁদের আলো সমুদ্রের জল-হাওয়ায় মিশে শয়ন বিছায় দূর সমুদ্রের বুকে—! আবার সকাল হয়—দিনের পর দিন আসে

দু' সপ্তাহ কেটে গেল।

...মায়ের মনে আশার আলো—সকাল হ'তো আলোর বুক দুরু দুরু করে—, সুমন্ত হাসে—

"আমার চেয়ে তুমিই যে ভাবছ বেশী! যদি দেখতে না পাই?" মুখ ঝামটা দিয়ে ওঠে আলো, "এইসব বলবেন ত আমি চলে যাব।"

...হাসে সুমন্ত—মলিনক্লিষ্ট হাসি

THE RAMAKRISHNA MISSION INSTITUTE OF CULTURE LIBRARY
31649

দিনের রোদ প'ড়ে আসছে! ম্লান হ'য়ে আসে সূর্য্যের আলো—নীল সমুদ্র শান্ত স্থির হয়ে রয়েছে—ঢেউগুলো যেন কোথায় বেড়াতে গেছে কোন দূর দ্বীপে!

ডাঃ তরফদার সুমন্তকে জানলার সামনে বসিয়ে সার্সি বন্ধ ক'রে ব্যাণ্ডেজটা খুলে চলেছেন! ওপাশে মা-বাবা দাঁড়িয়ে—আলো জানলার একটা শিক ধ'রে দাঁড়িয়ে রয়েছে রুদ্ধ নিঃশ্বাসে!

…অস্পষ্ট কেমন যেন দাগ—সব যেন একটা চলমান পদার্থ! ধীরে ধীরে সুমন্ত চোখ মেলবার চেষ্টা করে! এক ফালি আলো—হঠাৎ সে চীৎকার ক'রে ওঠে—ওকি—ওকি!

সারা চোখজুড়ে যেন একটা প্রকাণ্ড পদার্থ এগিয়ে আসছে!! ওই যে সামনে!

সান্ত্বনা দেন ডাক্তার—না না কোনো ভয় নাই—ওটা একটা চড়াই পাখী!

"চোখের লেন্সে এখনও আলো ঠিকমত পড়েনি, তাই …অকারণে ওটা বড় দেখাচ্ছে।"

মা এগিয়ে আসতে যাবেন, বাধা দেন ডাক্তার।

ধীরে ধীরে আলো আসতে থাকে—সুমন্তর চোখের পর্দ্দায় ধীরে ধীরে ফুটে ওঠে নীল আভা, ছোট ছোট ঢেউ, সাদা বালুবেলা।

'ওই যে সমুদ্র!' বিস্ময়ে আনন্দে চীৎকার করে ওঠে সুমন্ত! স্বপ্নাবিষ্টের মত চেয়ে থাকে সে!

"মা মা! একি!" আর্ত্তনাদ করে ওঠে সুমন্ত! কেমন সব মুছে যায় তার চোখ হতে! আর কিছুই সে দেখতে পায় না—আবার সেই চির অন্ধকারের সেই যবনিকা—তবে কি—তবে কি এক মুহূর্ত্তের জন্য পৃথিবীর আলোছায়ার স্বাদ পেয়ে আবার সে বঞ্চিত হবে চির-দিনের জন্য!

মা এগিয়ে আসেন।

অন্ধকার হয়ে গেছে। দিনের আলো নিঃশেষে মুছে গেছে—কিন্তু অন্ধের কাছে এ যেন চির তিমির রাত্রি।

হঠাৎ অন্ধকার ভেদ করে একটা যেন আলোর নিশানা দেখা যায়। স্থির বিস্মিত দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে সুমন্ত, আলোর রেখাটা এগিয়ে আসছে।

মোমবাতি নিয়ে আসছে আলো নিজেই। অন্ধকার ঘরটা স্বপ্নালোকে ভরে ওঠে। আবার সুমন্ত ফিরে পায় তার দৃষ্টি।

"মা।"

আলোতে তার মা—কতদিনের চেনা মাকে দেখতে পায়।

কিন্তু একি! এই তার মা? না না এ যে তার মনের ছবির সঙ্গে কোথাও মেলে না—কোথায় সেই হাস্যময়ী স্নেহময়ী এক মূর্ত্তি সে রচনা করেছিল দেবীরূপে—তা নয়, একি!

সারা মাথার কালো চুলের রাশি সাদা হয়ে গেছে—মুখে কুঞ্চন রেখা—এ যেন এক অন্য নারী। এ যেন তার সেই কল্পনার মা নয়।

হঠাৎ পাশের দিকে চাইতেই বিস্মিত হয়ে যায় সে। মোমবাতির আলো পড়েছে আলোর সারা মুখে—দু' চোখে তার হাসির আভা—মধুর শান্তিময়ী কোন নারী মূর্ত্তি। চোখের কালো তারায় তারায় টলটলে মুক্তোর মত দু'ফোটা অশ্রু।

"তুমি—তুমি আলো?"

আলোর দু'চোখ বয়ে ঝরে অশ্রুরেখা। সুমন্ত এক দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

সুমন্ত দৃষ্টি ফিরে পেয়েছে। পেয়েছে সে পৃথিবীর অপরূপ সৌন্দর্য্যের সন্ধান। সে দুনিয়ার আলো বাতাস, শ্যামল ধরিত্রীর স্নেহময়ী রূপ; বর্ষার সজল সমারোহ, বসন্তের ফুলদল আর সব কিছুতেই তার অধিকার। মধু-মেলার প্রাঙ্গণে প্রাঙ্গণে আজ তার নবীন মনের নিমন্ত্রণ।

আলোর ব্রত পূর্ণ হয়েছে।

সুমন্ত ঘুমিয়ে পড়েছে। রাত্রি দেড়টার সময় ট্রেন। তাকে চলে যেতে হবে এই ট্রেনেই। নেমে আসছে—হঠাৎ মায়ের ডাকে ফিরে চাইল আলো! এগিয়ে এসে তিনি তার হাতে তুলে দেন কয়েকখানা একশ টাকার নোট। দয়া করে তিনি দিচ্ছেন আলোকে বক্‌শিস!

টাকাটা সেইখানেই নামিয়ে দিয়ে বার হয়ে আসে আলো। কিন্তু একি? চোখে তার অশ্রু কেন? সে ত জানত বিদায় তাকে নিতেই হবে, তবু কেন এ মিথ্যা মায়া?

ট্রেনখানা চলছে কলকাতার দিকে ফিরে। ফিরছে আলো একা, সঙ্গে তার কেউ নাই! কয়েকদিন আগে গিয়েছিল এই পথে সমুদ্রের পানে সুমন্তের সঙ্গে।

আজ সুমন্ত সন্ধান পেয়েছে বিরাট বিশ্বের। আলোর প্রয়োজন আর নাই।

সঙ্গীতে দর্শনের অভিব্যক্তি

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

'দর্শন'-এর কথায় সাধারণ মানুষ একটু ভয় পায়, কেন না সহজ-সরল মনের চেয়ে শুষ্ক বুদ্ধির লুকোচুরি ও জটিলতারই সেখানে নাকি খেলা। কিন্তু সেটা যে সম্পূর্ণ ভুল, এর নূতন অবতারণা এখানে না করাই ভাল। ভারতবর্ষে শুধু কেন, পৃথিবীর সকল দেশেই 'দর্শন' কথাটির সাথে অধ্যাত্ম অনুভূতির সম্পূর্ণ যোগাযোগ আছে, তাই ভগবানের দর্শন অথবা আত্মচৈতন্যের প্রত্যক্ষ অনুভূতিকেই ঠিকঠিক ভাবে 'দর্শন' নামে অভিহিত করা হয়। তবে একথা ঠিক যে, একমাত্র ভারতের মতন দেশেই দর্শনকে প্রত্যক্ষ অনুভূতি বলে, মন-বুদ্ধির চাতুরী এখানে হার মানে; কিন্তু পাশ্চাত্ত্য ও অপরাপর দেশে বুদ্ধিকে উচ্চাসন দেওয়া হ'য়েছে।

দর্শন তথা জ্ঞানানুভূতির কথা সকল বিষয়ের পিছনে আছে। বিচারশাস্ত্র, বিজ্ঞান, ইতিহাস, সাহিত্য, কাব্য, শিল্প, সঙ্গীত সব বিষয়ের শেষ সিদ্ধান্তই অপার্থিব আনন্দের অনুভূতি লাভ করা; দর্শনে সৎ, চিৎ ও আনন্দের অবতারণা তারি জন্যে। তবে শিল্পে ও সঙ্গীতে সুন্দরের উপাসনা প্রধান। সুন্দর বলতে বুঝি শান্তি ও আনন্দের অধিষ্ঠানরূপী ভগবান্, এঁরই প্রত্যক্ষ দর্শনে হয় মুক্তি।

সঙ্গীতের ভাব অথবা দৃষ্টিভঙ্গীকে দু'রকম ভাবে ভাগ করা যায়; একটি ভাব বা বিজ্ঞানমূলক (Idealistic) ও অপরটি বস্তুমূলক (Realistic)। ভাব (বিজ্ঞান) ও বস্তুতান্ত্রিকতা পার্থিব সকল জিনিসেরই আছে, তবে এ' দু'য়ের বিচার ও নির্ধারণে সাধক, দ্রষ্টা বা শিল্পীর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গীই মাধ্যম। বস্তুতান্ত্রিকতা (Realism) আগে, কেননা সৃষ্টির মানুষ পৃথিবীর চাক্ষুষ জিনিষকে সত্য বোলেই গ্রহণ করে, সেটাকে ছেড়ে বা সেটাকে পরিবর্তনশীল ভেবে তার কারণ অনুসন্ধান করে না। ঋগ্বেদের গোড়াকার মণ্ডলগুলিতে সকল প্রার্থনাসূক্তেই ঐহিক সুখ ও সত্তাকে সত্য বোলে গ্রহণ করা হয়েছে। সেখানে সহজ সরল সমাজবাসীরা ইন্দ্র, বরুণ, সূর্য্য, পূষা প্রভৃতি দেবতাদের কাছে ঐহিক সম্পদের স্বচ্ছলতা ও প্রাচুর্য্য প্রার্থনা করছে, পৃথিবীর পরপারের কোন কথার অবতারণা তাঁরা করেননি। পরবর্ত্তীকালে লিখিত দশম মণ্ডলের কথা ভিন্ন। ছান্দোগ্য উপনিষদে গোড়াকার দিকেও বস্তুতান্ত্রিকতার কথাই বেশী, নারদ-সনৎকুমার সংবাদেই যা তার ব্যতিক্রম হয়েছে। অবশ্য একথা সত্য যে, বস্তুতান্ত্রিকতা থাকলেই তার পাশে বিজ্ঞানতান্ত্রিকতার সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক। সঙ্গীতের বেলায়ও তাই। সঙ্গীতে বস্তুতান্ত্রিকতার দিক হোল: সঙ্গীতবিকাশের গোড়াকার দিকে বেশ কয়েক শতাব্দী ধরে স্বর, শ্রুতি, অলংকার, মূর্চ্ছনা, তান, তাল, রাগ ইত্যাদি নিয়ে শিল্পী ও শাস্ত্রকারেরা আলোচনা করেছেন। স্বরের, সুরের বা রাগের মূল বা অধিষ্ঠান কি, স্থূলের পিছনে সূক্ষ্মের কোন অস্তিত্ব আছে কিনা এ সব নিয়ে তাঁরা সময়ক্ষেপ করেন নি। স্বর বৈদিক ও লৌকিক—প্রথম, দ্বিতীয়াদি ও ষড়জ, ঋষভাদি সূক্ষ্মস্বর শ্রুতির সমষ্টি, স্বর থেকে মূর্চ্ছনা ও অলংকারের উৎপত্তি হয়েছে আরোহণ-অবরোহণ গতিতে এবং স্বরের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থিতি থেকে, স্বরের সমাবেশে মেল বা ঠাটের উৎপত্তি, ঠাট থেকে রাগের সৃষ্টি—এ সকল আলোচনাই করা হয়েছে, কিন্তু স্বরের তথা সাঙ্গীতিক শব্দসমষ্টির আদি-কারণ কি, তার বিকাশ-রহস্যের পিছনে আধ্যাত্মিকতার কোন ছোঁয়াচ আছে কিনা, রাগগুলি মাত্র ভিন্ন ভিন্ন স্বরেরই সমাবেশ কিনা—এসকল তত্ত্বের কোন অবতারণা করা হয়নি। এই সব তত্ত্বের অনুশীলন শিল্পীরা করেছিলেন অনেক পরে—স্থূলকে ত্যাগ কোরে তাদের দৃষ্টি যখন অপার্থিব রাজ্যের আশায় ছুটেছিল। অবশ্য এরহস্যেরই আলোচনা আমরা করব ঐতিহাসিক প্রমাণের নজিরে।

বিচারের মাপকাটিতে দর্শনশাস্ত্র আলোচনা করলে আমরা দেখি, বস্তুতান্ত্রিকতা ও বিজ্ঞানমূলক ধারণার সৃষ্টি হয়েছে দেহ ও মনকে অথবা ইহলোক ও পরলোককে কেন্দ্র কোরে। পরলোক বলতে প্রেতলোক বুঝায়, কিন্তু এখানে বুঝতে হবে ঈশ্বর বা ভগবান। পাশ্চাত্য দার্শনিকেরা তাই জড় ও চৈতন্য—spirit ও matter থেকে ঐ দু'টি ধারণা-সৃষ্টির কথা স্বীকার ক'রেছেন। সঙ্গীত-শিল্পীরা চাক্ষুস স্বর, তাল, বাদ্য, রাগ প্রভৃতির অনুশীলন করেন ইহজীবনেই স্বাচ্ছন্দ্য ও শান্তি লাভের জন্য, পৃথিবীর প্রতি মমতাই তাঁদের ষোল আনা, সৃষ্টির পারে স্রষ্টার খোঁজখবর নিতে তাঁরা সচেষ্ট নন। কিন্তু বুদ্ধি ও বিচারের ক্রমবিকাশের সাথে সাথে জ্ঞানেরও বিকাশ হয়েছিল, জড়ের সেবা অপরিহার্য্য হোলেও বিরাগের ও অনুসন্ধিৎসার বশে চৈতন্যের সন্ধান নিতে ক্রমশঃ তাঁরা উন্মুখ হয়েছিলেন, তাই বস্তুর পাশে ভাবের, দেহের পাশে মনের অথবা জড়ের পিছনে চৈতন্যের পরিচয়ও তাঁরা পেয়েছিলেন। অনুসন্ধানী বৃত্তিই সাধনার আকারে না-জানার অন্ধকারে জ্বেলে দেয় জ্ঞানের আলো, পৃথিবীর পাশে স্বর্গের কল্পনালোক হয় তাই সৃষ্টি; সুতরাং একই মানুষের মধ্যে জাগে জড় ও চেতনাগামী দু'টি দৃষ্টি সকল দেশে প্রায় সকল সময়েই।

নবম শতাব্দীর আগেকার সঙ্গীত সাহিত্যগুলিতে বস্তুতান্ত্রিকতার দৃষ্টি ছিল প্রধান; অন্ততঃ স্বর, শ্রুতি, রাগ, মূর্চ্ছনা ও অলঙ্কারাদির আলোচনার বেলায়। নবম শতাব্দীতে অথবা তার কিছু আগে মতঙ্গ তার 'বৃহদ্দেশী' বইয়ে বোধ হয় সর্ব্বপ্রথম স্বরের কারণ ও অধিষ্ঠান যে নাদ এবং তার উৎপত্তি আমাদের শরীরের মধ্যে মূলাধার নামক স্থানে—একথা উল্লেখ করেছেন। তবে শিক্ষাকার নারদের (২য়—৩য় শতাব্দী) অবদানও বিশেষ লক্ষ্য করার বিষয়। নারদ তাঁর নারদী শিক্ষায় সূক্ষ্ম নাদতত্ত্বের অবতারণা না করলেও সাতটি স্বর ও শ্রুতিগুলি যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র, অথবা দেব, মানব ও রাক্ষস তথা আর্য্য ও অনার্য্য জাতি ও শ্রেণীর মধ্যে বিভক্ত ছিল, স্বরগুলির যে বর্ণ ছিল ও শরীরের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে আহত হোয়ে স্থূলরূপে সৃষ্টি হয়েছে, একথার উল্লেখ করেছেন। যেমন তিনি বলেছেন,

"পদ্মপত্রপ্রভঃ ষড়্‌জ ঋষভং শুকপিঞ্জরঃ।
কনকাভস্তু গান্ধারো মধ্যমঃ কুন্দসপ্রভঃ॥
পঞ্চমস্তু ভবেৎ কৃষ্ণঃ পীতকং ধৈবতং বিদুঃ।
নিষাদঃ সর্ব্ববর্ণঃ স্যাদিত্যেতাঃ স্বরবর্ণতাঃ॥
পঞ্চমো মধ্যমঃ ষড়জইত্যত্যেতে ব্রাহ্মণাঃ স্মৃতাঃ।
ঋষভো ধৈবতশ্চাপীত্যেতৌ ক্ষত্রিয়াবুভৌ॥
গান্ধারশ্চ নিষাদশ্চ বৈশ্যার্দ্ধেনবৈ স্মৃতৌ।
শূদ্রত্বং বিদ্ধি চার্দ্ধেন পতিতত্বান্ন সংশয়ঃ॥"

সাত স্বরের জন্মবৃত্তান্তের বর্ণনাচ্ছলে উল্লেখ করেছেন,

"বায়ুঃ সমুত্থিতো নাভেঃ কণ্ঠশীর্ষসমাহতঃ!
* * *
বায়ু সমুচ্ছ্রিতো নাভেরুরো হৃদি সমাহতঃ॥"
ইত্যাদি

শিক্ষাকার নারদের দৃষ্টিভঙ্গী বস্তুতান্ত্রিকই, কেননা স্বরের শ্রেণী, বর্ণ বিভাগ ও সৃষ্টিকথা স্থূল বর্ণনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ, শরীরকে অতিক্রম কোরে শরীরী আত্মার কোন সংকেত তাঁর বর্ণনায় পাওয়া যায় না। অথচ তাঁর সাঙ্গীতিক অনুশীলনে বৈদিক আবহাওয়ার ভাব সুস্পষ্ট। তিনি কারণের অনুসন্ধান দিয়েছেন, কিন্তু কারণের সীমা পৃথিবীর মাটিতেই নিবদ্ধ, বাইরের উপাদান অতিক্রম কোরে অন্তরে প্রবেশ করে নি।

নারদের পর দত্তিল ও ভরত কেউই শ্রুতি, স্বর, অলংকার, মূর্চ্ছনা ও রাগের অপার্থিব কারণের অনুসন্ধানে যত্নশীল নন। একমাত্র নবম শতাব্দীতে মতঙ্গ তাঁর বৃহদ্দেশীতে কারণ শব্দ 'নাদ' তথা নাদব্রহ্মের পরিচয় দেবার চেষ্টা করেছেন।

সঙ্গীতে 'নাদ' শব্দটি নাদব্রহ্মের পরিচায়ক। অবশ্য 'ব্রহ্ম' শব্দটি রহস্যের কুজ্ঝটিকাজালে আবৃত; সাধারণ মন বা বুদ্ধি তার কোন হদিশই দিতে পারে না। তাই বেশীর ভাগ লোক 'ব্রহ্ম' শব্দটিকে যেমন শ্রদ্ধাও করে ভয়ও তেমনি করে। অবশ্য ভয় করার প্রকৃত অর্থ—ব্রহ্ম বলতে সত্যিকারের কি বুঝায় তা অধিকাংশ লোক জানে না, ভাবে মানুষের জ্ঞানের অগম্য কোনও একটি

কিম্ভূতকিমাকার পদার্থ, তার সীমানায় না গিয়েও মানুষ সংসারে সুখে বাস করতে পারে। কিন্তু শাস্ত্রকারেরা সে সব ধারণার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছেন; তাঁরা বলেছেন ব্রহ্ম পরম চৈতন্য, মানুষের সত্তা ও আনন্দ সেই কারণ—চৈতন্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত, তাই ব্রহ্ম বা কারণ চৈতন্যকে ছেড়ে মানুষ কেন, কোন প্রাণীই পৃথিবীতে বাস করতে পারে না। সুতরাং ব্রহ্ম সম্বন্ধে রহস্য আমাদের ভেদ করতে হবে। তাঁকে জেনে আমাদের পার্থিব দুঃখময় জীবনকে আনন্দপ্লাবিত করতে হবে এবং মৃত্যুময় সংসারে অমৃতত্ব লাভ করতে হবে।

সঙ্গীত স্থূলভাবে শব্দের সমষ্টি বা শব্দময়, এজন্যে সঙ্গীতের আশ্রয়রূপী ভগবান বা ব্রহ্মকে 'নাদতনু' বলা হয়েছে। সঙ্গীত শ্রুতি, স্বর, মূর্চ্ছনা, অলংকার, তান, তাল, রাগ প্রভৃতি নিয়ে সার্থক। আবার মূর্চ্ছনা, অলংকার, তান রাগ এ সকল রূপায়িত হয় স্বরকে নিয়ে; প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় প্রভৃতি বৈদিক অথবা ষড়জ, ঋষভ, গান্ধার ইত্যাদি লৌকিক সাত স্বরই তাদের অধিষ্ঠান। সাত স্বর বাইশটি সূক্ষ্ম স্বর 'তথা শ্রুতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। শ্রুতি কম্পনেরই পরিণতি। আজকাল পাশ্চাত্য মনীষীরা স্বরের কম্পন সংখ্যা নির্ণয় করেছেন, যেমন—

সা	রি	গা	মা	পা	ধা	নি
C	D	E	F	G	A	B
২৪০	২৭০	৩০০	৩২০	৩৬০	৪০৫	৪৫০

সাতটি স্বরের শ্রুতি সংস্থান যেমন—

সা	রি	গা	মা	পা	ধা	নি
৪	৩	২	৪	৪	৩	২

মোটকথা শ্রুতি ও কম্পন স্বরেরই, অন্য কোন কিছুর নয়। যতগুলি কম্পন একত্রিত হোলে মানুষ শুনতে পায়, তাদেরকে 'শ্রুতি' বলে। সঙ্গীতশাস্ত্রকারগণ ও সাধকেরা এই কম্পন, শ্রুতি ও স্বরের কারণ স্বর হিসাবে 'নাদ'-এর বর্ণনা করেছেন। সঙ্গীতে যাকে 'নাদ' বলে, বেদান্তে তা-ই ব্রহ্ম। ঈশ্বর শুদ্ধ চৈতন্য, সাংখ্যে পুরুষ, তন্ত্রে কামকলা- কালী বা মহামায়া। উপনিষদে বলা হয়েছে যে, এক মাটিকে জানলে যেমন মাটির তৈরী সমস্ত জিনিসকেই জানা হয়, তেমনি সঙ্গীতে নাদ, কারণ শব্দ বা নাদব্রহ্মের তত্ত্ব জানলে সঙ্গীতের পরম উদ্দেশ্য মুক্তি লাভের সকল রহস্য অবগত হওয়া যায়। প্রত্যেক জিনিসের পিছনে থাকে কোন-না-কোন উদ্দেশ্য। সঙ্গীতের উদ্দেশ্য সুর-সাধনার মাধ্যমে সুর-ভগবান নাদরূপী ব্রহ্মের রহস্য নির্ণয় করা এবং এই রহস্য নির্ণিত হোলে মরণশীল মানুষ পার্থিব শরীর নিয়েই হয় অমর ও দেবতা।

গোড়াকার দিকে সঙ্গীতগুণীরা সূক্ষ্মতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা না করলেও অষ্টম কি নবম শতাব্দীর সঙ্গীতসমাজ সেই অনুশীলনকে সঙ্গীতসাধনা থেকে মোটেই বাদ দিলেন না, তার বৌদ্ধিক ও আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণের সাথে সাথে ব্যবহারিক উপযোগীতাকেও প্রমাণ করলেন। তারপর দার্শনিক ভাবের ক্রমাভিব্যক্তির স্তরে স্তরে সঙ্গীত জগতে রস, ভাব, রূপ, ধ্যান ও বিচিত্র অনুভূতির ধারারও সৃষ্টি হয়েছিল। পঞ্চদশ থেকে ষোড়শ শতাব্দীর সাধকেরা স্বর ও রাগকে প্রাণবান দেবতার আসনে অধিষ্ঠিত করেছিলেন, যার ফলে ভারতীয় সঙ্গীত আজ বিশ্বের সমাজে চিরবরণীয় ও মহান হোয়ে রয়েছে।

বৃহদ্দেশীকার মতঙ্গ সম্ভবত বৈয়াকরণিক ও বৈদান্তিক ছিলেন। তিনি সঙ্গীতের আশ্রয় ধ্বনিরূপী বর্ণের পরিচয়ই প্রথমে দেবার চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেছেন, ধ্বনি, বিন্দু, নাদ ও মাত্রার ক্রমিক স্তরে অভিব্যক্ত হয়েছে। ধ্বনি দু'রকম—স্বর ও ব্যঞ্জন। তবে ধ্বনির পরিবর্তে মতঙ্গ স্বর ও ব্যঞ্জনের অখণ্ড রূপকে বলেছেন 'মাত্রা'—"মাত্রকা দ্বিবিধা মতাঃ"। স্বর ও ব্যঞ্জনকে তিনি শিব-শক্তি-রূপে জগৎ-সৃষ্টির কারণও বলেছেন। পদ, বাক্য, অর্থ এ সমস্তই বর্ণকে উপলক্ষ্য কোরে থাকে। বর্ণ যখন ব্যক্ত হয় তখন তা ধ্বনির (শব্দের) আকারে প্রকাশ পায়। এই ধ্বনিই আবার সঙ্গীতের মূল কারণ "ধ্বনির্যোনিঃ পরা জ্ঞেয়া ধ্বনিঃ সর্বস্য কারণম্, আক্রান্তং ধ্বনিনা সর্বং জগৎ স্থাবরজঙ্গমম্"। এই ধ্বনিই নাদ। ধ্বনি অথবা নাদ দু'রকম—ব্যক্ত ও অব্যক্ত, আহত ও অনাহত—"ধ্বনিস্তু দ্বিবিধঃ প্রোক্তো ব্যক্তাব্যক্তবিভাগতঃ"।১ আহত নাদই সঙ্গীতের আকারে প্রকাশ পায়।

১। বৃহদ্দেশী (ত্রিবেন্দ্রম সংস্করণ), পৃঃ ১—২।

ঐ সকল কিছুর অবতারণা কোরে মতঙ্গ "ইদানীং সম্প্রবক্ষ্যামি নাদলক্ষণমুত্তমম্" (।১৬)—নাদ বা কারণশব্দ তথা শব্দ ব্রহ্মের পরিচয় দিয়েছেন। তাছাড়া নাদ বা কারণশব্দের মাহাত্ম্য বর্ণনা কোরে তিনি স্তুতিও করেছেন, কেননা নাদ নৃত্য-গীত-বাদ্য এই তিন রূপেই প্রকাশ পায়; নাদ সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা, নারায়ণ, শিব, পরাশক্তি প্রভৃতি। তিনি কারণশব্দের (causal sound) স্থান নির্দ্দেশ করেছেন ব্রহ্মগ্রন্থিতে। মতঙ্গের ব্যাখ্যানপ্রণালী দেখে মনে হয়, তিনি যোগশাস্ত্রের পক্ষপাতী ছিলেন। প্রাণবায়ুর উপযোগীতা তিনি বিশেষভাবে মেনেছেন। ব্রহ্মগ্রন্থি তথা মূলাধারে প্রাণবায়ু আহত হোয়ে কিভাবে অগ্নির সৃষ্টি করে, অগ্নি (তাপ) ও প্রাণবায়ুর সংঘর্ষে কিভাবে নাদের উৎপত্তি হয়, সেসবেরও বিবরণ তিনি দিয়েছেন। এ সমস্তই যোগশাস্ত্রসম্মত ব্যাখ্যা, তা আগেই বলেছি। মতঙ্গের মনোবৈজ্ঞানিকী দৃষ্টিভঙ্গীরও পরিচয় পাওয়া যায় যখন তিনি "পঞ্চবিধো ভবেৎ" বোলে নাদ বা কারণশব্দকে সূক্ষ্ম, অতি সূক্ষ্ম, ব্যক্ত, অব্যক্ত ও কৃত্রিম এই পাঁচ ভাগে ভাগ করেছেন।

এ'ছাড়া রাগের বিকাশের সাথে সাথে তাদের রস ও ভাবের অভিব্যক্তির পরিচয়ও মতঙ্গ দিয়েছেন। অবশ্য এ'বিষয়ে তিনি ভরতকে অনুসরণ করেছেন। ভরত তাঁর নাট্যশাস্ত্রে (৩য়—৫ম শতাব্দী) জাতিগান বা জাতি-রাগের প্রকাশে রস ও ভাবের আশ্রয় নিয়েছেন। তিনি বলেছেন—"জাতয়ো রসসংশ্রয়াঃ" (৩১।১৬)। ভরত আটটি রসের পরিচয় দিয়েছেন যেমন—

"শৃংগারহাস্যকরুণরৌদ্রবীরভয়ানকাঃ।
বীভৎসাদ্ভুতসংজ্ঞৌ চেত্যষ্টৌ রসঃ স্মৃতাঃ॥"

এই রস থেকে সৃষ্ট ভাবের পরিচয় দিতে গিয়ে তিনি উল্লেখ করেছেন—

"রতির্হাসশ্চ শোকশ্চ ক্রোধোৎসাহৌ ভয়ং তথা।
জুগুপ্সা বিস্ময়শ্চেতি স্থায়িভাবাঃ প্রকীর্তিতাঃ॥"

শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস ও অদ্ভুত এই আটটি রসের অনুযায়ী আটটি স্থায়ীভাব রতি, হাস, শোক, ক্রোধ, উৎসাহ, ভয়, জুগুপ্সা ও বিস্ময়ের পরিচয়ও ভরত দিয়েছেন। অভিনয় বা নাট্যকলায় রস ও ভাবের একান্ত উপযোগীতা আছে। ভরত নাটকের খাতিরে সঙ্গীত তথা জাতিরাগের বর্ণনায় রস ও ভাবের উল্লেখ করেছেন। উপনিষদে রসকে ভগবানরূপে কল্পনা করেছে। মধুসূদন সরস্বতী তাঁর "ভক্তিরসায়ন" গ্রন্থে রসকে বলেছেন পরমানন্দ—"ভগবান পরমানন্দস্বরূপ হি * * রসতামেতি"।২ সঙ্গীতের শিল্পী সাধক, তিনি সুর-সৌন্দর্য্যের সাধনা করেন সত্য-শিব-সুন্দর ভগবানকে লাভ করার জন্যে। ভগবানের অনুভূতিকে নিয়ে সঙ্গীত সার্থক; শিল্পী এই সার্থকতার ভিখারী। এই সার্থকতা অধ্যাত্মক্ষেত্রের সামগ্রী; অধ্যাত্মভূমিতেই জ্ঞানের আলোক লাভ করা যায়। জ্ঞানের মাধুর্য্য দেখায় দর্শন। সঙ্গীতে জ্ঞান ও প্রেমের মিলন থাকায় সঙ্গীত দর্শনের অনুগামী আর সেজন্যেই দর্শনের অনুপ্রবেশ সঙ্গীতের ক্ষেত্রে সম্ভব হয়েছে।

মতঙ্গের পর পার্শ্বদেব তাঁর সঙ্গীতসময়সারে, নারদ তাঁর সঙ্গীতমকরন্দে, শার্ঙ্গদেব রত্নাকরে, সোমনাথ রাগবিরোধে, অহোবল পারিজাতে, দামোদর তাঁর সঙ্গীতদর্পণে নাদতত্ত্ব ও সঙ্গীতের অধ্যাত্মচিন্তা সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন।

শার্ঙ্গদেব সঙ্গীত রত্নাকরে উল্লেখ করেছেন—"ধর্ম্মার্থ-কামমোক্ষাণামিদং এবৈকসাধনম্" (১।১.৩০); অর্থাৎ সঙ্গীতসাধনার দ্বারা মানুষ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ সকল কিছুই লাভ করতে পারে। প্রথম স্বরাধ্যায়ে তিনি শুদ্ধ ও বিকৃত স্বরগুলির কুল, জাতি, বর্ণ, দেবতা, ছন্দ প্রভৃতির নির্ণয় করেছেন। কারণ শব্দ নাদ সম্বন্ধে তিনি বলেছেন—"অস্তি ব্রহ্ম চিদানন্দং স্বয়ংজ্যোতির্নিরঞ্জনম্, ঈশ্বরং লিঙ্গমিত্যুক্তং অদ্বিতীয়মজং বিভু। নির্ব্বিকারং নিরাকারং" প্রভৃতি; অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তি নাদ এবং প্রাণিগণ তাঁর অংশ। এই বর্ণনায় যোগ, বেদান্ত, তন্ত্র সকল-কিছু শাস্ত্রের সমন্বয় সাধন করা হয়েছে। তবে শার্ঙ্গদেব অদ্বৈতবেদান্তেরই পক্ষপাতী, কেননা নাদরূপী

২। রস ও ভাবের বিস্তৃত পরিচয় ও তাদের অভিব্যক্তির কথা গ্রন্থকার তাঁর "রাগ ও রূপ" বইয়ে (পৃঃ ৮১-৮৬) দিয়েছেন।

তাঁর "নির্ব্বিকারং নিরাকারং" ব্রহ্ম অদ্বিতীয়, অথচ 'জীব-জগতের সাথে তিনি অভিন্ন'—"তে জীবা নাত্মনো ভিন্না-ভিন্নং বা নাত্মনো-জগৎ"। কুণ্ডল প্রভৃতি যেমন সুবর্ণ থেকে ভিন্ন নয়, পরমাত্মাও তেমনি জীব-জগৎ থেকে অভিন্ন। ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করেছেন আপনা থেকে ভিন্ন কোরে নয়, বরং তিনি নিজেই জীব-জগৎ-রূপে বিবর্ত্তিত হয়েছেন। অবিদ্যাই অবশ্য এই বিবর্ত্তনের কারণ। তাই শার্ঙ্গদেব উল্লেখ করেছেন—"সৃজত্যবিদ্যয়েত্যন্তে যথা রজ্জুর্ভুজঙ্গমম্" (১।২।১২) কালিনাথ এটির টীকায় বলেছেন,—"তত্র দৃষ্টান্তঃ যথা রজ্জুর্ভুজঙ্গগমমিতি। এতেন প্রপঞ্চস্য অতত্ত্বতোঽন্যথাভাবাদ্ ব্রহ্মবিবর্ত্তত্বং দর্শিতম্"।

শার্ঙ্গদেব রত্নাকরে সৃষ্টিতত্ত্ব সাংখ্য-দর্শন অনুযায়ী বর্ণনা করেছেন। তবে তৈত্তিরীয় উপনিষদের সৃষ্টিরহস্যের ক্রমকেও তিনি একেবারে অগ্রাহ্য করেননি। তিনি বলেছেন, আত্মা থেকে আকাশ, তা থেকে অগ্নি এবং ক্রমশঃ জল, বায়ু ও পৃথিবীর সৃষ্টি হয়েছে। দ্বিতীয় পিণ্ডোৎপত্তি প্রকরণে তিনি বিস্তৃতভাবে সৃষ্টিরহস্যের পরিচয় দিয়েছেন। অন্ন, ওষধী ও প্রজাসৃষ্টির বেলায় তিনি ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক উপনিষদের প্রণালীকে গ্রহণ করেছেন। মূলাধার স্বাধিষ্ঠান প্রভৃতি চক্রের পরিচয় দিতে গিয়ে তিনি তন্ত্রোক্ত যোগশাস্ত্রের পথ অনুসরণ করেছেন। মোটকথা, সপ্তস্বরের সৃষ্টিকথা বল্‌তে গিয়ে শার্ঙ্গদেব বিচিত্র দর্শনের অবতারণা করেছেন এবং সে অবতারণার পিছনে আছে দিব্য আত্মানুভূতি, যা সঙ্গীতসাধনার ভিতর দিয়েও চাক্ষুসভাবে লাভ করা যায়।

সঙ্গীতের জগতে যোড়শ শতাব্দী একটী নবজাগরণের যুগ। এই সময়ে রাগের মধ্যে পুরুষ প্রকৃতি ভাবের বিকাশ লাভ করে শিব ও শক্তির ধারণাকে অবলম্বন কোরে। শার্ঙ্গদেব ও তাঁর পরেকার গুণীরা রাগসৃষ্টির প্রসঙ্গে শুদ্ধ, সালগ ও সংকীর্ণ শ্রেণীর নামোল্লেখ করেছেন। যেমন শাস্ত্রী উমাপতি বলেছেন—

"শুদ্ধং তু শিবরূপেণ শক্তিরূপেণ সালগম্
দ্বয়োর্মিশ্রং তু সংকীর্ণমতস্তে ত্রিবিধা মতাঃ॥"

শার্ঙ্গদেবের সিদ্ধান্তেও তাই। রাগশ্রেণীর বিভাগে শিব-শক্তির উল্লেখ তান্ত্রিকী মনোভাবেরই পরিচায়ক এবং রাগ ও তাদের সাধনা যে অধ্যাত্ম বিদ্যার অভিন্নরূপ, শিব ও শক্তির ভূমিকায় 'সে' রহস্যই প্রকাশ করা হয়েছে।

যোড়শ কি সপ্তদশ শতাব্দীর সঙ্গীতগুণী সোমনাথ তাঁর 'রাগবিবোধে' রাগের ধ্যানরূপের পরিচয় দিয়েছেন। অবশ্য এই ধ্যানরূপের পরিণতির পিছনে বিরাট একটি ঐতিহ্য লুকানো আছে। ভরত জাতিরাগের মধ্যে দেবতাতত্ত্ব বা দেবত্বের কোন আরোপ করেন নি। দত্তিলও তাই। নবম শতাব্দীতে মতঙ্গ জাতিরাগ ও গ্রামরাগদের বর্ণনা করেছেন রস ও ভাবের প্রেরণা দিয়ে, কিন্তু জীবন্ত দেবতার কোন পরিচয় রাগের মধ্যে তিনি পান নি। মকরন্দে নারদের অবস্থাও তাই। শার্ঙ্গদেব রাগ-প্রকাশের সময় নির্ণয় করেছেন যে, রাগে রস ও ভাবের প্রাচুর্য্য আছে। আলাপ ও আলাপ্তিকে তিনি শিব-শক্তির প্রতীক বলেছেন, কিন্তু রাগগুলিকে জাগ্রত দেবতা বলার সাহস তাঁর হয় নি। কিন্তু সোমনাথ এই বিষয়ের পথ-প্রদর্শক এবং স্বাধীন প্রতিভারও তিনি পরিচয় দিয়েছেন। তিনি রাগের রূপ-বর্ণনা করেছেন সাবলীল ছন্দে। রাগগুলি স্বরের সমাবেশ হোলেও মাত্র জড় উপাদান নয়, পরন্তু প্রাণবান, প্রদীপ্ত ও জাগ্রত প্রেরণার তারা প্রতীক। যেমন শংকরাভরণরাগের রূপ বর্ণনার সময় সোমনাথ উল্লেখ করেছেন—

"গলরাজিকমলরাজির্ভালে ভসিতীরতঃ সদা নৃত্যে।
সুন্দরগৌরঃ শোণাম্বরধরণঃ শংকরাভরণঃ॥"

শংকরাভরণ পুরুষরাগ। তাঁর গলায় প্রস্ফুটিত পদ্মের মালা, ললাটে ভস্ম লেপিত। সর্ব্বদা তিনি নৃত্য করছেন এবং গৌরবর্ণ ও রক্তবস্ত্র পরিধান কোরে আছেন।

আবার বেলাবলীরাগের ধ্যান বর্ণনায় তিনি বলেছেন—

"বেলাবলী বিনীলা তালী বনচারিণী তরলহারা।
তরুণান্বেষকরুণং করতলতন্দলাভরণা॥"

বেলাবলী রাগিণী। তিনি নীলবর্ণা, স্বামীর অন্বেষণে তৎপরা। তিনি তালবনে বিচরণ করছেন, তাই তার

গলার হার আন্দোলিত, হাতে তালপত্রনির্ম্মিত একটি আভরণ ও শোভা পাচ্ছে। তিনি নায়িকা।

অবশ্য সোমনাথের সমসাময়িক ও পরবর্ত্তী সঙ্গীত-শাস্ত্রীরা সকলেই রাগ ও রাগিণীগুলিকে দেবতার আসনে অধিষ্ঠিত করেছেন। অবশ্য সাধনার অন্তর্দৃষ্টিই এই সব ধ্যান রূপকে সৃষ্টি করেছে, এরা মনের বিলাস বা নিছক কল্পনার সামগ্রী নয়। সাধক রামপ্রসাদের কাছে আদ্যা-শক্তি দেবী জগদীশ্বরী যেমন মিথ্যা নন, সঙ্গীত সাধকদের ধ্যানপ্রসূত রাগ-রাগিণীদের রূপও তেমনি সত্য। সঙ্গীতে দর্শনের এখানে পূর্ণপরিণতি সাধিত হয়েছে। অবশ্য অদ্বৈতবাদের দৃষ্টিতে এই রূপ দর্শন বোধ হয় দেবতাসিদ্ধি নামে পরিগণিত হবে, কিন্তু অধ্যাত্ম সাধনার জগতে এ দর্শনেরও সার্থকতা আছে। সাকার নিরাকারেরই অন্য দিক, বরফ জলেরই ভিন্ন রূপ; রূপভেদই এখানে প্রবল, বস্তুভেদ নয়। সঙ্গীতসাধকেরা এ'তত্ত্ব মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝেছিলেন, তাই তাঁরা অরূপ ভগবানকে রূপের মধ্যে দেখেও কৃতকৃতার্থ হয়েছেন, সাকারকে মোটেই অবজ্ঞা করেননি নাদ বা কারণশব্দ তাই তাঁদের কাছে শব্দ-রূপী ব্রহ্ম জড় শব্দসমষ্টির প্রতীক নাদ নয়, পরন্তু তা চৈতন্যস্বরূপ। নাদ বা কারণস্বরকে তাই তাঁরা মূলাধারে শক্তিরূপে কল্পনা করেছেন। বেদান্তের তিনি প্রজ্ঞা ও ঈশ্বর, তন্ত্রের তিনি কালী ও বিদ্যামায়া। অদ্বৈত দৃষ্টিতে মহামায়া অজ্ঞানের সীমাভুক্ত হোলেও শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন—মহামায়াই পথ দেখিয়ে নিয়ে যান সাধককে পরব্রহ্মের মন্দিরে; তাঁর নিজের যাবার সামর্থ্য না থাকলেও পরমসত্যের পথ দেখান এক তিনিই।

সঙ্গীতদর্পণকার দামোদরও রাগগুলির ধ্যান বর্ণনা করেছেন। যেমন ভৈরবের স্বররূপের পরিচয় দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন—

"ধৈবতাংশগ্রহন্যাসো রিপহীনত্বমাগতঃ।
ভৈরবঃ স তু বিজ্ঞেয়ো ধৈবতাদিকমূর্চ্ছনঃ।
বিকৃতো ধৈবতো যত্র ঊড়বঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥"

ভৈরব কবে থেকে আদিরাগের পর্য্যায়ে উঠে আর্য্য-সমাজের শ্রদ্ধার প্রণতি পেয়েছেন তার ইতিহাস কৌতুকপ্রদ। রূপ বিবর্ত্তনও তার যথেষ্ট হয়েছে। দামোদর এ'সকল কথার অবতারণা না কোরে ভৈরব-রাগের স্বরমূর্ত্তি এঁকেছেন এই ভাবে যে, ভৈরবরাগের অংশ বা আদী ধৈবত, প্রারম্ভ ও সমাপ্তি স্বরও ধৈবত, ঋষভ-পঞ্চম-বর্জ্জিত, ধৈবতস্বর থেকে মূর্চ্ছনার আরম্ভ ও রাগ ঔড়বজাতির অন্তর্গত।

তারপর ধ্যানরূপের বর্ণনা করেছেন তিনি এই ভাবে—

"গঙ্গাধরঃ শশিকলাতিলকস্ত্রিনেত্রঃ
সর্পৈর্বৃতঃ
ভাস্বত্রিশূলকর এষ নৃমুণ্ডধারী
শুভ্রাম্বরো জয়তি ভৈরব আদিরাগঃ॥"

ভৈরব ভোলানাথ মহাদেব। পুরাণে শিব ধ্বংসের অবতার হোলেও সঙ্গীতে তিনি প্রাণ, প্রেরণা ও সৌন্দর্য্যের নিয়ামক। দর্শনের দৃষ্টিতে তিনি মুক্তি ও শান্তির বিধাতা। সঙ্গীতসাধকেরা এই দৃষ্টিভঙ্গী দিয়েই ভৈরবকে দেখেছেন। ভৈরবরাগে তিনটি রসের সমাবেশ আছে—শান্ত, ভয়ানক ও করুণ। শান্তরসের ভাব শম বা স্থৈর্য্য। এই স্থৈর্য্যের ভাব প্রকাশ পায় নির্ব্বেদ বা নিরাসক্তি এলে। ভৈরবরাগের শান্তরসে তাই বৈরাগ্যের পূর্ণ অভিব্যক্তি হয়, শিল্পীর মনে ভগবদ্‌ভাবের অমৃতধারা প্রবাহিত করে। ভয়ানক রসে ভয়ের সঞ্চার হয়। কিন্তু এই ভয় আসে গাম্ভীর্য্যের জন্য। যেমন চিরতুহীন উত্তুঙ্গ আকাশচুম্বি হিমালয়গিরিশৃঙ্গ গৌরীশংকরকে দেখে লোকে স্তব্ধ হয় শ্রদ্ধায় তার গাম্ভীর্য্যকে লক্ষ্য কোরে, ভৈরবরাগে ভয়ানক রসের বিকাশও তাই; ভয় আসে এই রাগে শ্রদ্ধায়। করুণরসের বিকাশ হয় শোকে। কিন্তু ভৈরবরাগে শোক বা অশ্রুর নামগন্ধ থাকে না, থাকে উদাসীনতার সুনির্ম্মল ভাব, ভগবদ্মিলনের আকুলতা ও আকাঙ্ক্ষা। ভৈরবরাগের করুণরস তাই শ্রদ্ধাযুক্ত আকুল ভাবকে জাগ্রত করে। সাধক ভৈরব-রাগের সাধনায় তাই শ্রদ্ধা ও আকুলতার ভিতর দিয়ে নির্ব্বেদ ও শান্তিকে লাভ করে। ভৈরব নির্ব্বাসনার মূর্ত্ত প্রতীক। নির্ব্বাসনার অপর নাম জ্ঞান বা শান্তি। ভৈরবের আলাপে ও সাধনায় সঙ্গীতশিল্পী পার্থিব মনের পারে অপার্থিব অমৃতের সন্ধান লাভ করে।

ছ'টি রাগের জন্মকথার পিছনেও দার্শনিকত্বের চরম নিদর্শন দেখান হয়েছে। শিবমতে বলা হয়েছে, শিবের পঞ্চমুখ থেকে শ্রীরাগ, বসন্ত, ভৈরব, পঞ্চম ও মেঘ রাগের জন্ম এবং পার্ব্বতীর মুখকমল থেকে নটনারায়ণ বা বৃহন্নট্ রাগের সৃষ্টি হয়েছে। শিবের মুখ একটি নয়—পাঁচটি এবং তাদের নাম সদ্যোজাত, বামদেব, অঘোর, তৎপুরুষ ও ঈশান। উপনিষদে শিবের সাতটি মুখেরও কল্পনা করা হয়েছে। শিব আসলে সূর্য্য। বৈদিক যুগে আকাশ (বরুণ) অথবা সূর্য্যকে (পূষা) শিবের অভিন্ন মূর্ত্তি বলা হোত। পৌরাণিক যুগে বাঘাম্বর পরিহিত পঞ্চবদনযুক্ত শিবে পরিণত হয়েছেন বরুণ বা সূর্য্য। বৈদিক সৃষ্টির তৃতীয় যুগে অগ্নি সূর্য্যের প্রতিভূরূপে কল্পিত হন, এ জন্য অগ্নিকেও শিবরূপে চিন্তা করা হয়। মোট কথা অগ্নি পৃথিবীস্থ সূর্য্য এই অগ্নি ভিন্ন ভিন্ন আকারে সৃষ্টির সমস্ত উপাদানেই আছে। প্রাণীদের শরীরেও অগ্নির স্থান নির্দ্দেশ করা হয়েছে। প্রাণবায়ু ও অগ্নির সংস্পর্শে কারণশব্দরূপী নাদের সৃষ্টি হয়েছে এ কথা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। শার্ঙ্গদেব তাঁর রত্নাকরে (১.৩.৩-৬) উল্লেখ করেছেন—

"দেহস্থং বহ্নিমাহন্তি স প্রেরয়তি মারুতম্।

নকারং প্রাণনামানং দকারমনলং বিদুঃ।

জাতঃ প্রাণাগ্নিসংযোগাত্তেন নাদোঽভিধীয়তে॥"

তন্ত্রের দৃষ্টিতে অগ্নি কামকলা কুণ্ডলিনী। যোগশাস্ত্রে কুণ্ডলিনীকে সর্পরূপে চিন্তা করা হয়েছে। তিনি মূলাধারে স্বয়ম্ভু শিবকে বেষ্টিত কোরে নিদ্রিত, কিন্তু প্রাণবায়ু ও অগ্নির সংস্পর্শে জাগ্রত হন। এই জাগরণকেই নাদসৃষ্টি বলে। সঙ্গীতশাস্ত্রীরা রূপকে শিবের পঞ্চমুখ থেকে শ্রীরাগাদি পাঁচটি রাগের বিকাশের কাহিনী উল্লেখ করেছেন। আসলে শ্রীরাগ, বসন্ত, ভৈরব, পঞ্চম, মেঘ, বৃহন্নট এরা সূর্য্য বা অগ্নিরূপী শিব তথা নাদ বা কারণ শব্দ থেকেই জন্মলাভ করেছে। রাগগুলি এবং পরবর্ত্তী সমস্ত রাগ ও রাগিণীরা এক অব্যক্ত নাদের বিচিত্ররূপ—অগ্নিস্ফুলিঙ্গ যেমন এক অগ্নিরই ভিন্ন ভিন্ন রূপ বা মূর্ত্তি।৩

সঙ্গীতশাস্ত্রে এ জন্য রাগ-রাগিণীদের আলাপ ও অনুশীলন বলতে নাদেরই উপাসনা বুঝায়। সঙ্গীতে নাদের উপাসনায় যে প্রাণায়ামের প্রয়োজন হয়, তাকে "ভ্রামরী" বলে। প্রাচীনকালে ষড়্জ-মধ্যম-পঞ্চম এই তিনটি স্বরকে অবলম্বন কোরে ভ্রামরী প্রণায়মের প্রচলন ছিল। পারিজাতকার পণ্ডিত অহোবল এই ষড়জ মধ্যম পঞ্চম বা 'সমপ' স্বর তিনটিকে স্বয়ম্ভু স্বর বলেছেন—"কিং চ স্বভুবঃ সমপ।" যোগশাস্ত্রে প্রাণায়ামের সার্থকতা বুঝানো হয়েছে প্রাণবায়ুকে আয়ত্তে আনার জন্যে, (প্রাণ) প্রাণবায়ু+আয়াম—আয়ত্তে আনা (to control.)। প্রাণবায়ুকে নিয়মিত (regulate) করার অর্থ মনকে বা মনোবৃত্তিকে সুসংযত করা। দর্শনশাস্ত্রে মনকেই উচ্চাসন দেওয়া হয়েছে। যোগবাশিষ্টকার মন থেকেই জগতের উৎপত্তি স্বীকার করেছেন, অর্থাৎ মনের বিলাসই সংসার। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবাদী (Idealist) দার্শনিকদের সিদ্ধান্তও তাই। সঙ্গীত সাধনার উদ্দেশ্য রাগের আরোহণ ও অবরোহণের মারফতে স্বর ও সুরের কসরৎ দেখানো নয়; অথবা আলাপ-মাধুর্য্যে প্রশংসা অর্জ্জন করা নয়। সঙ্গীতেরও উদ্দেশ্য মনের পারে যাওয়া, সংসারে শান্তি লাভ করা। অন্যান্য মোক্ষশাস্ত্রের মতন সঙ্গীত সত্যিকারের শান্তিলাভের আদর্শই শিক্ষা দেয়, এজন্য পরবর্ত্তীকালে সঙ্গীতের এই বোলে প্রশংসা করা হয়েছে যে, সঙ্গীতের চেয়ে বড় বিদ্যা আর নাই। বড়বিদ্যা এজন্যে বলা হয় যে, মনঃসংযম (concentration) এত বেশী আর কোন বিদ্যা কোন উপায়েই হয় না। মনোবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ (psychological analysis) করলে সঙ্গীত সম্বন্ধে এ'কথা স্বীকার করা ছাড়া উপায় নাই। ষোড়শ শতাব্দীর পর থেকে সঙ্গীতকে শুধু শিল্পীরাই নয়, সমাজের সকলেই পবিত্রতার আসনে বসিয়ে আধ্যাত্মিকী দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে দেখতে শিখেছেন। অবশ্য সম্রাট অওরঙ্জেবের মতন সঙ্গীতকে সমাধি দেবার

৩। এই সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা লেখক প্রণীত 'রাগ ও রূপ' পুস্তক (পৃঃ ২০—২২) দ্রষ্টব্য।

মনোবৃত্তি যে কোন কোন শ্রেণীর লোকের ছিল না অথবা এখনো নেই একথা আমি বল্‌ছি না। আলোকের মতন অন্ধকারও জগতে সকল যুগে সকল সময়েই ছিল, এখনও আছে। কিন্তু তাহলেও সুন্দর যা, উন্নত যা, তার সমাদর কোনদিনই ম্লান হবে না, অন্তত: সত্যিকারের গুণীদের কাছে। তবে আজকাল শিল্পীসমাজের ভিতর সঙ্গীতকে দার্শনিকী দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে দেখার দৈন্য কিছুটা সুপরিস্ফুট বলেই মনে হয়। দর্শনের ছোঁয়াচ অনেকের কাছে আবার পৌরাণিকী কাহিনীর অবতারণা হিসাবে প্রতীত হয়, যেটা মোটেই প্রশংসনীয় নয়। সঙ্গীত সাধনা একথা যদি আমরা স্বীকার করি তবে তার পিছনে অধ্যাত্ম আলোকের অস্তিত্ব অবশ্যই আমাদের স্বীকার করতে হবে, মুক্তির সেটিও একটি সোপান—একথা মান্‌তে হবে। অন্যথা সঙ্গীত হবে উদ্দেশ্যহীন অনুশীলন। কিন্তু সঙ্গীত-শাস্ত্রী ও সত্যিকারের সঙ্গীত সাধকেরা সে কথা মোটেই বলেন না। তাঁদের মতে সঙ্গীত শাশ্বত শান্তি লাভের একটি শ্রেষ্ঠ উপায়, সুর-সাধনার মাধ্যমেও ভগবানের করুণা মানুষ লাভ করতে পারে। সুতরাং সঙ্গীতে দার্শনিকী দৃষ্টিভঙ্গীর প্রয়োজনীয়তা আছে এবং সঙ্গীতের শিল্পীমাত্রেই সঙ্গীতকে দেখ্‌বেন তাই অধ্যাত্ম অনুভূতি-লাভের উপায় রূপে। 31649

●

সত্য শান্তম্ ব'লেই শিবম্। শান্তম্ ব'লেই তিনি সকলকে ধারণ করেন, রক্ষা করেন, সকলেই তাঁতে ধ্রুব আশ্রয় পেয়েছে। আমরাও যেখানে সংযত না হ'য়েছি, অর্থাৎ যেখানে সত্যকে জানিনি এবং সত্যের সঙ্গে সত্যরক্ষা ক'রে চলিনি, সেখানে আমাদের অন্তরে বাহিরে অশান্তি এবং সেই অশান্তিই অমঙ্গল—নিয়মের সঙ্গে নিয়মের বিচ্ছেদই অশিব। যিনি শিবম্ তাঁর মধ্যেই অদ্বৈতম্ প্রকাশমান। সত্য যেখানে শিব-স্বরূপ সেইখানেই তিনি আনন্দময়, প্রেমময়; সেইখানেই তাঁর সকলের সঙ্গে মিলন। মঙ্গলের মধ্যে ছাড়া মিলন নেই; অমঙ্গলই হ'চ্ছে বিরোধ-বিচ্ছেদের অপদেবতা।

—রবীন্দ্রনাথ

নবগঙ্গা

রণজিৎ কুমার সেন

ছাব্বিশ

সকালে যখন ঘুম ভাঙলো, সূর্য্য তখন আকাশের অনেক দূর অবধি ঠেলে উঠেছে। নির্ম্মলা কয়েকবার এসে ডেকে ডেকে ফিরে গেছেন। ঘুম ভেঙেও অবসন্নতা কাটছিল না বিজনের। উঠে মুখ ধুয়ে ঘরে এসে বস্‌তেই নির্ম্মলা একবাটি গরম দুধ এনে তার সাম্‌নে তুলে ধ'রলেন। ছেলের মুখের দিকে লক্ষ্য ক'রেই তার শরীরের অবস্থাটাকে বুঝে নিয়েছিলেন নির্ম্মলা। বল্‌লেন, 'সারা দিন এত পরিশ্রম ক'রেও যদি আবার রাত্রি জাগিস্‌, তবে শীরর রাখ্‌বি কি ক'রে বাবা? চারদিকে অসুখ বিসুখের অন্ত নেই; তোকে নিয়ে একটা দিনও যদি আমি নিশ্চিন্ত হ'তে পারলাম বিজু! নে, ধর, দুধটুকু খেয়ে নে। আজ থেকে রাত্রে যদি তুই বই ছুঁয়েছিস্‌ তো আমার মাথা খাস।"

হেসে বিজন ব'ল্‌লো, 'মাথা তো তোমার রোজই খাচ্ছি মা। কিন্তু দোহাই তোমার, অমন দিব্বি কখনও দিয়ো না। বই ছেড়েও নাকি আবার থাকতে পারে মানুষ!'

এবারে কিছুটা অভিভাবকত্বের সুর স্পষ্ট হ'য়ে উঠলো নির্ম্মলার কণ্ঠে। ব'ল্‌লেন, 'এমন নয় যে প'ড়ে তোকে পরীক্ষা দিতে যেতে হ'চ্চে, এতইবা কেন! আজ থেকে মিছিমিছি সারা রাত অমনি ক'রে হ্যারিকেনের তেল পোড়াতে পাবি নে, ব'লে রাখ্‌ছি।'

—'বেশ, আজ থেকে তবে আর ঘরে হ্যারিকেন জ্বাল্‌বো না।' অভিমানের কণ্ঠে কথাটা উচ্চারণ ক'রলো বিজন। আসলে মনটাকে নিয়ে-যে সে নিজের মধ্যে প্রতি-মুহূর্ত্তে দগ্ধ হ'য়ে ম'র্‌ছে, এ কথা সে কেমন ক'রে বোঝাবে মাকে? ব'ল্‌লো, 'আজ থেকে রাত্রে আমার ভাত ঢাকা দিয়ে রেখো, কাজকর্ম্ম সেরে আমি দেরী ক'রেই ফির্‌বো।'

—'অম্‌নি রাগ হ'লো তো? আজকাল তোর কি হ'য়েছে, বল্‌ তো বিজু?' থেমে নির্ম্মলা ব'ল্‌লেন, 'কোনো কথাকেই আজকাল তুই সহজভাবে নিস্‌ নে। সংসারে আমি কার জন্যে প'ড়ে আছি, বল্‌তো?'

অভিমান চাপা প'ড়ে গেল মনের আড়ালে। মাকে এম্‌নি ক'রে কোনোদিন কথা ব'ল্‌তে শোনেনি বিজন। সংসারে মা ছাড়া তার কেই বা আছে? মায়ের বুকে তাই দুঃখ দিতে চায় না সে। ব'ল্‌লো, 'সব কথাকেই আমি বাঁকা অর্থ ক'রে ধরি, এই বা তুমি কেমন ক'রে বুঝ্‌লে মা? আমি না থাক্‌লে তুমি যে এতদিনে কাশী-বাসী হ'তে, তাও কি আমি জানিনে? চলো, বরং দু'জনেই বেরিয়ে পড়ি; সংসারের এই কোলাহল আমারও আর ভালো লাগে না মা।'

বিস্ময়ের কণ্ঠে নির্ম্মলা একবার ব'ল্‌তে গেলেন, 'এ তুই কি ব'ল্‌ছিস্‌ বাবা, সাম্‌নে যে তোর অফুরন্ত ভবিষ্যৎ! পিতৃ পুরুষের ভিটা আগ্‌লে বংশে বাতি দিতে হবে যে তোকেই।' কিন্তু পারলেন না, মুখে এসেও বেধে গেল নির্ম্মলার। থেমে ব'ল্‌লেন, 'যাবি, নিয়ে যাবি আমাকে একবার বাবা বিশ্বনাথের দুয়োরে? কতদিনের সাধ; বাবা বিশ্বনাথের পায়ে গিয়ে তবে শেষ নিঃশ্বাস ফেল্‌তে পারতুম।'

তৎক্ষণাৎই কিছু একটা উত্তর দেওয়া সম্ভব হ'লো না বিজনের পক্ষে। কিছুক্ষণ সে অপলক নেত্রে মায়ের মুখের পানে তাকিয়ে রইল, তারপর ছোট্ট ক'রে ব'ল্লো, 'অদৃষ্টে যদি তোমার সত্যিই বিশ্বনাথ দর্শন থাকে, তবে আমি না নিয়ে গেলেও তোমাকে যেতেই হবে মা। তার-জন্মে ব্যস্ত হ'য়ো না। কিন্তু একটা কথা আমাকে সত্যি ক'রে ব'ল্বে?'

—'কি, বল্?'

—'আমার উপর রাগ ক'রেছ তুমি?'

—'তোর উপর আমি কখনও রাগ ক'রতে পারি বাবা? আমি যে তোর মা, কত তপস্যা ক'রে তবে তোকে পেয়েছিলাম। পাগ্লা ছেলে, মাথা থেকে তোর পাগ্লামী যাবে কবে, বল্তো?' ব'লে দুই বাহুর মধ্যে আকর্ষণ ক'রে বুকে টেনে নিলেন নির্ম্মলা ছেলেকে।

অদ্ভুত শান্তি। পৃথিবীর সমস্ত জ্বালা যেন এই বুক-খানির মধ্যে এলে জুড়িয়ে যায়। থেমে সহাস্যে বিজন ব'ল্লো, 'এ পাগ্লামী আমার আর এ জীবনে ঘুচ্বে না মা। তুমি যেন তাই ব'লে রাগ কোরো না, তবে আর আমার দাঁড়াবার জায়গাটুকুও থাক্বে না।'

উত্তরে নির্ম্মলা আর একটি কথাও ব'ল্তে পারলেন না। শুধু ছেলের মুখখানিকে আরও জোরে আরও নিবিড় ক'রে বুকখানির মধ্যে চেপে ধ'রলেন তিনি।...

বিকেলে আবার সেই উন্মুক্ত প্রকৃতির কোলে পাঠশালার তপস্যা। মাঠের কাজে সারাটা দুপুর চাষীদের সাথে ঘুরে ঘুরে কাটাবার পর সহজ শান্ত নিষ্পাপ শিশুদের প্রাণের সান্নিধ্যে এইটুকুই যা আনন্দের অবকাশ। ধীরে ধীরে সূর্য্য নেমে যায় অস্তাচলে, দিনের ক্লান্ত পাখীরা ফেরে ঘরে; অপরাহ্নের শান্ত ছায়ায় ঘেরা পাঠশালার পরিবেশটা আশ্রমের রূপ নিয়ে দাঁড়ায়। তার মধ্য থেকে কচিকণ্ঠে মন্ত্র উচ্চারিত হ'য়ে ওঠে: না ব'লে কেউ কারুর জিনিষ নেবো না, কেউ কাউকে আঘাত ক'রবো না, মিথ্যা বা কটু কথা ব'ল্বো না, গুরুজনকে ভক্তি ক'রবো, পরের সাহায্যে এ জীবন ব্যয় ক'রবো, নিজের মতো ক'রে ভালোবাস্বো সকলকে; সকলেই আমাদের আপন, সকলেই আমাদের ভাই।...

বিজন স্পষ্ট লক্ষ্য ক'রলো—কথা ধীরে ধীরে মার্জ্জিত হ'য়ে উঠচে, জিহ্বার আড়ষ্টতা ক্রমে ভেঙে আস্চে, শিষ্টাচারে আর নম্রতায় ক্রমে ভদ্র হ'য়ে উঠ্চে ছাত্রেরা। প্রথম ভাগ শেষ ক'রে দ্বিতীয় ভাগের পাঠ ধরাতে বড়-জোর আর এক মাস। আশ্চর্য্য এদের স্মরণশক্তি। গ্রামের জমিদার মহাজনেরা এতদিন আফিং খাইয়ে এদের ঘুম পাড়িয়ে রেখেছিল, সেই ঘুম থেকে ধীরে ধীরে জেগে উঠ্ছে সিংহ-শিশু। তার হুঙ্কারে একদিন আকাশ প্রকম্পিত হ'য়ে উঠবে। ঘুচে যাবে সেদিন এই মিথ্যে মহাজনীতন্ত্র।

কড়াকিয়া আর গণ্ডাকিয়া শেষ হ'য়ে যোগ-বিয়োগের পাঠ সুরু হ'য়েছিল। শুভঙ্করীর শুভাশীষ পেয়ে এগিয়ে এসেছে ছাত্রেরা। মুখে মুখে নতুন একটা যোগ অঙ্ক ব'লে গেল বিজন, সঙ্গে সঙ্গে ছেলেরা শ্লেটে লিখে নিয়ে ধ্যানস্থের মতো ব'সে গেল যোগফল নামাতে। কারুর-বা তার মধ্যেই পাশের ছেলের শ্লেট থেকে নকল ক'রবার প্রয়াস।

গলা বাড়িয়ে নিজে থেকেই একবার কথালো হ'য়ে উঠলো বিজন। – 'ওটা কি হ'চ্চে হারুণ, ও অভ্যাস ভালো নয়। পরের জিনিষ যেমন না ব'লে নিলে চুরি করা হয়, তেম্নি অন্যের শ্লেট থেকে অজান্তে টুকে নিলে তাকেও চুরি করাই বলে। যদি না মেলাতে পারো, তবে এদিকে এস, বুঝিয়ে দেবো।'

ছেলেটি লজ্জায় আর মাথা তুল্তে পারলো না। মনে মনে যথেষ্ট ভয় পোষণ ক'রেই নিঃশব্দে উঠে এলো বিজনের সাম্নে। এক হাতে তার শ্লেট আর পেন্সিল, অন্য হাতে শক্ত ক'রে নিজের কান ধরা।

হাসি পেলো বিজনের। মারের ভয়ে আগে থেকেই নিজের হাতে নিজের কান ধ'রে অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত ক'রেছে হারুণ। হাসি গোপন ক'রে বিজন জিজ্ঞেস্ ক'রলো, 'এটা কি ব্যাপার, কান ধ'রে আছ কেন?'

অস্ফুট কণ্ঠে হারুণ ব'ল্লো, 'অন্যায় হইছে মাষ্টার সা'ব।'

মাষ্টার সা'ব। সম্বোধনটা আজ এই নতুন শুনলো বিজন। ব'ললো, 'অন্যায় তা হ'লে বুঝ্‌তে পেরেছ?'

জবাব নেই হারুণের কণ্ঠে।

—'মাষ্টার সা'ব ব'লে ডাকতে শিখ্‌লে কোত্থেকে? কে ব'লেছে মাষ্টার সা'ব ব'লে ডাকতে?' কৌতূহলের দৃষ্টিতে খানিকটা চাঞ্চল্য খেলে গেল বিজনের।

তেম্‌নি অস্ফুট কণ্ঠেই হারুণ ব'ললো, 'বা-জান।'

—'কে তোমার বাবা, আজহার উদ্দীন?'

—'আইজ্ঞা।'

ছেলেরা ততক্ষণে যোগফল নামিয়ে বিজনকে এসে চারপাশ থেকে ঘিরে ধ'রেছে। কে আগে শ্লেট এগিয়ে দেবে, তাই নিয়ে প্রতিযোগিতা। সাধনক্ষেত্রে সবাই কিছু-একটা যোগসিদ্ধ পুরুষ নয়, অনেকেই ভুল ক'রে ব'সেছে যোগফলে। মুখের অঙ্ক শ্লেটে লিখে লিখে শেষ পর্য্যন্ত বুঝিয়ে দিল সবাইকে বিজন। জিজ্ঞেস্ ক'রলো, 'মোনা কোথায়, মোনাকে যে দেখ্‌ছি না?'

কে একটি ছেলে ব'লে উঠ্‌লো: 'মোনা আজ পড়তে আসে নাই।'

জানা গেল—ছেলেটি তসর আলীর পাশের বাড়ীর ছেলে। সকালে পান্তা খেতে দেখেছে সে মোনাকে, তারপর আর কোনো খোঁজ রাখেনি।

বিজন ব'ললো, মোনার বাবাকে গিয়ে ব'ল্‌বে, সে যেন রাত্রে একবার আমার সঙ্গে দেখা করে।'

নীরবে ঘাড় নেড়ে ছেলেটি দু'পা স'রে গিয়ে দাঁড়ালো।

শ্রাবণের আকাশ, কখন্ আকাশ কালি ক'রে চকিতে মেঘ জ'মে উঠেছিল, এতক্ষণ সেদিকে কারুরই দৃষ্টি ছিল না। মেঘের ডাক কানে আসতেই ঊর্দ্ধাকাশের দিকে একবার দৃষ্টি তুলে ধ'রলো বিজন। দেখ্‌লো—এখুনি হয়ত চেপে বৃষ্টি নাম্‌বে।

ছুটি হ'য়ে গেল পাঠশালা। হল্লা ক'রে দলে দলে ছুটে প'ড়লো ছেলেরা। কিন্তু সবার অলক্ষ্যে হারুণ তখনও ঠিক একই ভাবে দাঁড়িয়ে আছে। সে এখনও ছুটি পায়নি তার মাষ্টার সাহেবের কাছ থেকে। এবারে কাছে ডেকে তাকে খানিকটা আদর ক'রে দিল বিজন। ব'ললো, 'আমরা তো সাহেব নই, আমরা বাঙালী, তোমার বাবাকে গিয়ে বোলো। আর কখনও অম্‌নি ক'রে পরের শ্লেটে উঁকি দিতে যেয়ো না। যাও, বাড়ী যাও এখন।'

কিছুক্ষণ স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইল হারুণ, তারপর এক দৌড়ে কোথায় যে অদৃশ্য হ'য়ে গেল, চোখে প'ড়লো না।

মেঘ ডাকছে গুম্ গুম্ ক'রে। গাছের পাতায় পাতায় বাতাসের ঢেউ ব'য়ে যাচ্ছে। প্রেমের শান্ত প্রবাহের মতই বেশ লাগ্‌ছে এই বাতাসকে। এক নিমেষে যেন দেহের সমস্ত তাপ জুড়িয়ে দিয়ে গেল। কিন্তু মন, মনের তাপ জুড়াবে কে? পাঠশালায় নিঃসঙ্গ ফাঁকা পরিবেশের মধ্যে প্রকৃতির এই লীলামুখরতাকে কেন্দ্র ক'রে অনেকক্ষণ একাকী ব'সে রইল বিজন। মনে প'ড়লো নিজের স্কুল-জীবনের কথা। কত ফাঁকি আর কত লুকোচুরি দিয়েই না ঘেরা ছিল সেই দিনগুলি! অঙ্কে কি তার নিজেরই ছাই মাথা ছিল? তবু মাথা খেলাতে হ'য়েছে তাকে, মাথা খেলাতে হ'য়েছে স্কুলে মাষ্টারকে ফাঁকি দিয়ে বাসায় এসে মাকে এড়িয়ে চ'লতে। হাসি পায় আজ সেই দিনগুলির কথা মনে প'ড়লে। তার সেই দুষ্টুমির কাছে আজ হারুণের অপরাধ দাঁড়াতেই পারে না। এরা অনেক সংযত, অনেক হিসেবী। হারুণকে কেন্দ্র ক'রে তার সহপাঠী সকলের জন্য একটা গভীর মমতায় সহসা সারা বুকখানি আচ্ছন্ন হ'য়ে গেল বিজনের। কতক্ষণ যে সে একই অবস্থায় ব'সে রইল, তা সে নিজেই বুঝ্‌তে পারলো না। গাছের ডালে ডালে ততক্ষণে বাতাসের মাতামাতি সুরু হ'য়ে গেছে। শ্রাবণ এগিয়ে চ'লেছে ভরা ভাদ্রের দিকে। দু'টো দিনও আর বাকী নেই শ্রাবণ সংক্রান্তির। নবগঙ্গার উত্তাল তরঙ্গচঞ্চল ভরা-যৌবনের উপর দিয়ে এসময়ে মৌসুমীর লীলা চলে সমস্তটা মাগুরায়। পাগ্‌লা হাওয়ায় মেঘ ছড়িয়ে পড়ে আকাশের স্তরে স্তরে, তারপরই নেমে আসে ধারা; সমস্তটা মাগুরা সেই ধারায় স্নান ক'রে ওঠে।

একসময় উঠে প'ড়লো বিজন। নইলে এরপর হয়ত ভিজতে হবে। কিন্তু যত গর্জ্জালো মেঘ, তত

বর্ষালো না। বাতাসে উড়িয়ে নিয়ে গেল মেঘ। নবগঙ্গার পাড়ে এসে একসময় থম্‌কে দাঁড়িয়ে প'ড়লো বিজন। বাতাসের ক্ষীপ্রতায় আবর্ত্তিত হ'য়ে উঠেছে জলরাশি। বর্ষায় নবগঙ্গার এ রূপ একেবারেই স্বতন্ত্র। যৌবনভারে কামোন্মাদ হ'য়ে ওঠে সে, একুল ওকুল ভাসিয়ে দিয়ে ছুটে চলে সে জীবন-দয়িতের সন্ধানে। ইল্‌শেগুড়ির মতো এক ঝলক বৃষ্টি এসে রূপালীসজ্জায় সাজিয়ে দিয়ে গেল নবগঙ্গাকে। মুগ্ধ আবেশে একবার উচ্চারণ ক'রলো বিজন: 'তোমাকে নমস্কার। এ জীবনে কত বৈচিত্রের মধ্যে কত রূপেই না তোমাকে দর্শন ক'রলাম! তোমার অনন্তকান্তি পরম মহিমার উদ্দেশ্যে প্রণাম।' তারপর সোজা পা চালিয়ে দিল বাড়ীর দিকে।

তসর আলীকে গিয়ে খবর দিতে হয় নি, পথেই তার দেখা পাওয়া গেল। উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়ে এসে সেলাম ক'রে দাঁড়ালো সে বিজনের সাম্‌নে। ব'ল্‌লো, 'মেহেরবাণী কইরা যদি আমার ঘরে গিয়া একবার পায়ের ধুলা দেন দাদাবাবু, তবে নিশ্চিন্দি হই। মোনা আজ পাঠশালায় যাতি পারে নাই, সারা গা ভইরা তার ঘ্যান্ কি সব দেখা দিছে, বড় অস্থিরে আছি, একটা মাত্তর পোলা, মুখ্যু লোক, কিসে কি হয়—কিছুই যে জানি না, একবার মেহেরবাণী কইরা যদি আসেন দাদাবাবু!'

এতক্ষণে তবে মোনার আজ পাঠশালায় না আসার কারণ বোঝা গেল। বিজন ভাবলো, হয়তো হাম উঠে থাক্‌বে গায়ে! কোনোদিন হামের সঙ্গে পরিচয় নেই ব'লেই এতখানি উতলা হ'য়ে উঠেছে তসর আলী। বললো, 'মোনার অসুখ? একটু আগেই যে ছেলেদের কাছে জিজ্ঞেস ক'রছিলাম মোনার কথা। মোনাকে দেখ্‌তে যাবো না, তাও কি হয়! ব্যস্ত হ'য়ো না তুমি, অসুখ হ'য়েছে, দু'দিনেই আবার সেরে উঠবে! মোনাকে উপলক্ষ্য ক'রেই যে আমার পাঠশালা প্রতিষ্ঠা! কিছু ভয় নেই, চলো।"

বাড়ীর পথ ছেড়ে তসর আলীর সঙ্গে এবারে ভিন্ন পথ ধ'রলো বিজন। কিন্তু তাতেই দুশ্চিন্তা কাটবার নয় তসর আলীর। ব'ল্‌লো, "মোনাকে যে আপনি কত ভালোবাসেন, সে কি কিছু জানি না দাদাবাবু! মুখ্যু ছোটলোকের পোলাদের আপনি বুকে তুইল্যা নিছেন, আপনি যে দেব্‌তা দাদাবাবু।"

কথাটা এড়িয়ে গেল বিজন। খানিকটা পথ এগিয়ে এসে একসময় ব'ল্‌লো, "বৃষ্টিটা শেষপর্য্যন্ত আর এলো না, এলে ধরণী শীতল হ'তো।"

কিন্তু বিজনের একথার জবাব দেবার মতো মন নেই তখন তসর আলীর। একটা অজানা ভয় আর অশ্বস্তি মিলে সমস্ত বুকখানিকে তার তোলপাড় ক'রে নিচ্ছিল। ব'ল্‌লো, 'আমাদের পাঁচু মাইতিকে বলাতে সে বল্‌লো—দরগায় গিয়া সিন্নি দাও, আল্লার নেক্-নজর প'ড়ছে মোনার উপর, তাই গুটি উঠছে গায়ে।"

বিজন ব'ল্‌লো, "পাঁচু মাইতি জানে না, তাই ওকথা ব'লেছে। সংসারে সবাই যদি আমরা আল্লার সন্তান, তবে পিতা হ'য়ে সন্তানের উপর কি কখনও নেক্-নজর দিতে পারেন তিনি? আসলে তুমি বড্ড মুষ্‌ড়ে প'ড়েছ তসর; এটা খারাপ।"

মনে মনে তসর আলী একবার ব'ল্‌লো—পাঁচু মাইতির কথাটা সত্যিই যেন মিথ্যা হয়। দর্‌গায় গিয়ে তবে সে সত্যিই সিন্নি দেবে।

বিজন এসে দেখলো—তসর আলীর বর্ণিত পাঁচু মাইতির কথাই যথার্থ। বেশ বড় হামই উঠেছে মোনার গায়ে। বসন্ত। সারা গা পুড়ে যাচ্ছে জ্বরের তাপে, সেই উত্তপ্ত দেহের চাম্‌ড়া ভেদ ক'রে ঠেলে উঠেছে বসন্তের গুটি। একটা দারুণ অস্থিরতায় অনবরত ছট্‌ফট্ ক'রছে মোনা। তার কান্না থামাতে হিম্‌সিম্ খেয়ে উঠছে তার মা। পথে আস্‌তে আস্‌তে যত কথা ব'লে বিজন এতক্ষণ সান্ত্বনা দিয়েছে তসর আলীকে, এতক্ষণে তা নিজের কাছেই তার অলীক বলে বোধ হ'লো। এ রোগে শুধু সান্ত্বনাটাই যথেষ্ট নয়। জিজ্ঞেস্ ক'রলো, 'জ্বর এসেছে কখন্?'

শুষ্ক কণ্ঠে জবাব দিল তসর আলী, "কাল শেষ রাত্তিরের দিকে।"

—"তবু ভোরে উঠেই ছেলেকে একরাশ পান্তা গিলিয়েছ তো?"

—"আইজ্ঞা, ও তো আমাদের বারো মাস তিরিশ দিনের অভ্যাস, ওতে আমাদের কিছু হয় না দাদাবাবু।"

—"এই হয়না হয়না ক'রেই তোমরা নিজেরা মরো আর পরকে মারো।" ব'লতে গিয়ে গলার স্বরে এবারে খানিকটা ক্রোধ স্পষ্ট হ'য়ে উঠলো বিজনের।

মোনার কান্না এতক্ষণে দ্বিগুণ চ'ড়েছে। তার কপালের উপর দিয়ে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে স্নেহের কণ্ঠে বিজন ব'ললো, 'কাঁদবার কি হ'য়েছে, অসুখ হ'য়েছে, সেরে যাবে। লক্ষ্মী, ভালো, এবারে একটু ঘুমোতে চেষ্টা করো দিকি তুমি। কাল সকালে তোমার জন্যে অনেকগুলো লজেন্স আর বিস্কুট নিয়ে আসবো। না কেঁদে এবারে ঘুমোও দিকি কেমন পারো?"

কথাটা যেন অষুধের মতো কাজ ক'রলো। কান্না থেমে গেল মোনার। চোখ বুজে সত্যিই সে এবারে ঘুমোতে চেষ্টা ক'রলো।

তসর আলী আর তার স্ত্রীকে অভয় দিয়ে উপস্থিত মতো বিদায় নিয়ে এলো বিজন। পরদিন যথাসময়েই লজেন্স আর বিস্কুট নিয়ে আবার এসে ব'সলো সে মোনার শিয়রে। হাতে পেয়ে মোনার সে কি আনন্দ! এমনি ক'রে কোনোদিন কেউ তাকে বিস্কুট আর লজেন্স দেয় নি। কি অপূর্ব্ব স্বাদ! বড়লোকের ছেলেরা এই লজেন্স আর বিস্কুট খেয়েই বুঝি বড় হ'য়ে ওঠে, গ'ড়ে ওঠে তাদের অমন চমৎকার স্বাস্থ্য! এতটুকুও হিংসা হ'লো না মোনার। আনন্দে আহ্লাদে অনেকক্ষণ ধ'রে সে হাতের মুঠোর মধ্যে নাড়াচাড়া ক'রতে লাগলো লজেন্স আর বিস্কুটগুলোকে, তারপর একটা লজেন্সকে গালের মধ্যে পুরে নিয়ে প্রাণপণ উৎসাহে চুষতে সুরু ক'রে দিল। কি অপূর্ব্ব স্বাদ। এ জিনিষ ফেলে কেউ আবার সাগু বার্লি খায়! বমি আসে সাগু গিলতে।

কিন্তু দিন দু'তিন কেটে গেলে সেই অপূর্ব্ব স্বাদের লজেন্স আর বিস্কুটও বিকৃত হ'য়ে উঠলো মোনার মুখে। গুটি ফেটে গিয়ে এবারে ঘায়ে পরিণত হ'য়েছে। আপাদমস্তক ঢাকা প'ড়ে গেছে সেই ঘায়ে। চেনা কঠিন হ'য়ে উঠেছে মোনাকে। মুখে স্বাদ নেই, যা মুখে নিতে যায়, অমনি উগড়ে আসে। নিজের শরীরের দিকে তাকাতে গিয়ে ভয়ে চিৎকার ক'রে কেঁদে ওঠে মোনা। অবুঝের মতো পাশে ব'সে ডুক্‌রে ডুক্‌রে কাঁদে তার মা। মোনা তাদের একমাত্র সন্তান। খোদাতাল্লা তাকেও বুঝি বুক থেকে ছিনিয়ে নেন্!

এ'ক'দিন ধ'রে একটা মুহূর্ত্তের জন্যও বিশ্রাম পায়নি বিজন। মোনার শিয়রে ব'সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিয়েছে, কব্‌রেজ ডেকে অষুধের ব্যবস্থা ক'রেছে, ভাঁড়ে ক'রে ডাব আর মেথি ভেজানো জল একটু একটু ক'রে খাইয়ে দিয়েছে মোনাকে, প্রবোধ দিয়ে বলেছে, 'কেঁদ না, তোমার মতো বীরপুরুষের এটুকু কষ্টতে কি হয়? আর দু'এক দিনেই ঘা শুকিয়ে যাবে, ভাল হ'য়ে উঠে ভাত খাবে তুমি। আমি সুতোভর্ত্তি লাটাই আর ঘুড়ি কিনে দেবো, পানকৌড়ি ঘুড়ি, অবাক হ'য়ে সবাই চেয়ে থাক্‌বে তোমার ঘুড়ির দিকে।'

মুহূর্ত্তের জন্য হ'লেও শরীরের যন্ত্রনা মনের অতলে কোথায় চাপা প'ড়ে গেছে, কান্না থামিয়ে স্বপ্নে বিভোর হ'য়ে উঠেছে মোনা: সপ্তদিগন্ত জুড়ে উড়ছে তার পানকৌড়ি, নানা রঙের পানকৌড়ি ঘুড়ি তার। অবাক বিস্ময়ে সারা মাগুরার লোক তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে তার দিগন্তবিসারী পানকৌড়িকে। পাঠশালার বন্ধুরা এসে তার লাটাই আর মাজনদেওয়া সুতো পরীক্ষা ক'রে দেখচে তাদের হাতের স্পর্শ দিয়ে, বিরক্ত কণ্ঠে তাদের দূরে সরিয়ে দিচ্ছে মোনা। রাত্রে ঘুমের মধ্যেই একবার চিৎকার ক'রে ওঠে সে নিজের অজান্তে: 'কবে আমি ভালো হবো, কবে ভাত খাবো আমি, কবে মাঠে গিয়া ঘুড়ি উড়াতে পারবো?'

কিন্তু বিজন তখন আর তার শিয়রে ব'সে নেই। নিজের ঘরে শুয়ে তখন সে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হ'য়ে প'ড়েছে। ক'দিন ধ'রে তারও শরীরটা যেন কেমন ম্যাজ্‌ম্যাজ্ ক'রছিল; বর্ষায় আবহাওয়াটা স্যাঁতসেঁতে হ'য়ে উঠেছে; জোলো হাওয়ায় সর্দ্দি লেগে শরীরটা কেমন অবসন্ন হ'য়ে প'ড়ছিল তার। ভ্রূক্ষেপ করেনি সেদিকে বিজন। কিন্তু একটা জিনিষ সে স্পষ্ট লক্ষ্য ক'রেছে—আজকাল আর আগেকার মতো সেই কর্ম্মক্ষমতা নেই, অল্পেই ক্লান্ত হ'য়ে পড়ে, অবসন্ন হ'য়ে আসে

দেহ। বুঝতে পারে না সে—কোন্ দেবতার অভিশাপ এসে আজ তাকে এম্‌নি ক'রে বিঁধছে? নিষ্ক্রিয় জীবন নিয়ে একটা দিনও বাঁচতে চায় না সে সংসারে। সে বড় দুঃসহ, সে বড় জ্বালা। ক্লান্তিতে সারা মন তার আচ্ছন্ন হ'য়ে যায়, রুদ্র দেবতার সন্ধান ক'রতে গিয়ে জান্‌তেও পারে না সে—অলক্ষ্যে কখন্ ঘুমের দেবতা তার দু' চোখের উপর দিয়ে স্নেহাঞ্চল বুলিয়ে নিয়ে যায়। ঘুমিয়ে পড়ে বিজন। আজও তেম্‌নি ক'রেই নিজের ঘরে সে নিদ্রাক্লান্ত।

মোনার কথার জবাব দিতে উঠে ব'স্‌তে হয় তসর আলীকে। কিন্তু কি জবাব দেবে খুঁজে পায় না, শুধু ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে চেয়ে থাকে ছেলের মুখের দিকে।

ক্রমে রাত্রি কেটে গিয়ে উষার আলোয় আঙিনা ভ'রে ওঠে। বাইরের পথে ধান খুঁটে খেতে খেতে একদল মুর্গী সমস্বরে ডেকে ওঠে—কক্করক্ কক্ কক্—। প্রতিদিন ভোরের কাজে বেরোবার আগে এ সময়ে একবার নামাজ প'ড়ে নেয় তসর আলী। কিন্তু আজ আর সে-অবকাশ হ'লো না। মনে মনে খোদাতাল্লার দোয়া মেগে একবার প্রার্থনা জানালো সে: 'মুখ তুইল্লা চাও খোদা, মোনারে আমার ভালো কইরা ছাও, দর্‌গায় গিয়া তোমার নামে সিন্নি দিব আমি, মেহেরবাণী করো খোদা।'

সাতাশ

তসর আলীর খোদাতাল্লা শেষ পর্য্যন্ত সত্যি সত্যিই মুখ তুলে তাকালেন। ধীরে ধীরে আবার চাঙ্গা হ'য়ে উঠলো মোনা। দর্‌গায় গিয়ে একদিন নগদ পাঁচশিকে পয়সা খরচ ক'রে আল্লার নামে সিন্নি দিয়ে এলো তসর আলী। কিন্তু তার খোদাতাল্লা যে বিজনের প্রতি এত-খানি বিমুখ হবেন, এ কথা কল্পনাও ক'রতে পারেনি সে। শ্রাবণ পেড়িয়ে ভাদ্রের আকাশ ঝ'ল্‌কে উঠলো। রোগের বীজাণু এ সময়ে বর্ষার ধারায় ধুয়ে যায়। কিন্তু এবারে বর্ষার গোড়া থেকেই তার ব্যতিক্রম দেখা দিয়েছে। বিশেষ ক'রে চাষি-পাড়াতেই রোগের প্রাবিক্যটা এবারে প্রবল হ'য়ে উঠেছে। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত বিজনও সেই রোগের করালগ্রাস থেকে মুক্তি পেলো না। ক'দিন থেকেই শরীরটা তার কেমন ম্যাজ্ ম্যাজ্ ক'রছিল, এবারে তাকে একেবারেই শয্যা নিতে হ'লো। মোনাকে সে সুস্থ ক'রে তুল্‌তে পেরেছে, এটা তার কাছে কম বড় সান্ত্বনা ছিল না, কিন্তু শেষ অবধি মোনার রোগটাই যে তার উপরে এসে ভর ক'রবে, এ তার কল্পনারও অতীত ছিল। দু'একটা দিন কেটে যেতেই প্রচণ্ড তাপ উঠলো শরীরে, গুটি দেখা দিল দু' একটা ক'রে। এতদিন যে দেহটার প্রতি বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ করে নি বিজন, আজ সেই দেহটা নিয়েই তার মস্তবড় জ্বালা হ'লো।

ভয়ে নিজের মধ্যে কাঠ হ'য়ে গেলেন নির্ম্মলা। ব'ল্‌লেন, 'এতদিন কত ক'রে নিষেধ ক'রেছি, কথা কানে তুলিস নি বিজু; এতদিনে নিলি তো বাধিয়ে একটা কিছু!'

কথা ব'ল্‌লো না বিজন। আসলে সে নিজের কাছেই এ কথার কিছু একটা জবাব খুঁজে পেলো না।

থেমে নির্ম্মলা ব'ল্‌লেন, 'এমন রোগ নয় যে, পাড়ার পাঁচজনকে যখন-তখন ডাকা যাবে। এ রোগের নাম শুন্‌লে কেউ কি সে-বাড়ীর ত্রিসীমানারও পা দেয়! ক'দিন ধ'রেই কেমন যেন মনে হ'চ্ছিল—মা শীতলার একটা পূজো দিলে হয় না! কিন্তু এমনই অদৃষ্ট যে, পূজো নেবার আগেই মা কৃপা ক'রে ব'স্‌লেন। সংসারে একা মেয়েমানুষ হ'য়ে এখন আমি কি করি, বল্‌তো বাবা?'

নিজের শরীরের অবস্থা চিন্তা ক'রে বিজন নিজেও বড়-বেশী ভরসা পাচ্ছিল না। তবু মাকে একরকম-প্রবোধ দিয়েই সে ব'ল্‌লো, 'কিচ্ছু তোমাকে ক'রতে হবে না মা, তুমি নিশ্চিন্ত থাকো। মোনার তুলনায় এ তো আমার কিছুই ওঠে নি গায়ে, দু'দিনেই শুকিয়ে যাবে। এ নিয়ে পাড়ার পাঁচজনকে আর খবরদারী ক'রতে হবে না তোমাকে।'

কিন্তু মায়ের প্রাণ তাতেই কি প্রবোধ মানে? পাড়ার পাঁচজনকে গিয়ে খবরদারী ক'রতে না হ'লেও পাড়ায় তখন কানপাতা ভার হ'য়ে উঠেছে। গ্রামের চক্রবর্ত্তী বাচস্পতিরা মুখিয়ে উঠেছে এই নিয়ে।

গল্পমুখর তাম্রকুটের আসরে হুঁকোয় ধূম-উদ্গীরণ ক'রে একসময় ভবানী চক্রবর্ত্তীই কথাটা পাড়লো।— 'বলি, বিজু ছোকরার কাণ্ডখানা দেখ্‌লে তো? ওর বাপ ছিল সাত্ত্বিক বাড়ুয্যে, আর বিজুটা হ'য়েছে একটা চাড়াল। চাষা-ভুষোকে নিয়ে তো মাত্‌লি, এখন ঘর সাম্‌লায় কে? ধম্ম ক'রে সেবা ক'রে এদিকে তো পাড়াকে পাড়া জ্বালিয়ে দিতে ব'স্‌লি, গুষ্টিশুদ্ধ মরুক এখন গাঁয়ের লোক!'

হুঁকোটাকে হাতে পাবার প্রত্যাশায় এতক্ষণ হা-পিত্তেশের মতো হা ক'রেই ছিল জনার্দ্দন বাচস্পতি, উত্তরে ঈষৎ টিপ্পনি কেটে ব'ল্‌লো, 'বাপ না থাক্‌লে সংসারে যা হয়, ও ছোক্‌ড়ার হ'য়েছে তাই। দু'পাতা ইংরেজি শিখে ক'ল্‌কাতা ঘুরে এসে ছোক্‌রা ডেঁপো হ'য়ে গেছে।'

পাশ থেকে হরি মুখুজ্জে ব'ল্‌লো, 'আমি আজই ওর মাকে জানিয়ে দিচ্ছি—ছেলের এই রোগ নিয়ে এ ভাবে পাড়ায় বাস করা চলে না। ছোঁয়াচে রোগ, কখন্‌ কাকে গিয়ে ভর করে, তার কি কিছু ঠিক্‌ আছে?'

সুখদা ততক্ষণে একেবারে নির্ম্মলার মুখোমুখি গিয়ে দাঁড়িয়েছে। —'গাঁ'য়ের পাঁচজনে যেমন ক'রে ব'ল্‌ছে, তাতে তোমাকে একটু সাবধানেই থাক্‌তে হবে বাড়ুজ্জে-বৌ। হাজার হোক্‌, ছেলে, ফেল্‌তে তো আর পারো না; কিন্তু চাষী-বাগ্‌দিদের নিয়ে এ ভাবে ওর নাচানাচি করাটা ঠিক হয় নি। এখন নিজে ভোগান্তির মধ্যে প'ড়ে সবাইকে তটস্থ ক'রে তুল্‌লো তো!'

কথাটা নির্ম্মলার কোথায় গিয়ে যেন বড় আঘাত ক'রলো। ব'ল্‌লেন, 'বিজু বিছানায় প'ড়ে না থাক্‌লে গাঁয়ের পাঁচজনের এসব কথার জবাব সে নিজের মুখেই দিত। বলি, তাদের ঘরেও কি ছেলেপুলে নেই, না তাদের কখনও অসুখ-বিসুখ হয় না? তাই নিয়ে এমন ষাঁড়ী ব'য়ে এসেই বা এত সাবধান ক'রবার কি হ'য়েছে?'

কথাটা নিয়ে তর্ক ক'রতে পারতো সুখদা, কিন্তু তা ক'রলো না। বরং শান্ত কণ্ঠেই ব'ল্‌লো, 'যাই বলো, সাবধানের মার নেই বাড়ুজ্জে-বৌ। এ রোগ ছড়িয়ে প'ড়লে গাঁয়ে কারুর বাস করা চ'ল্‌বে না। তুমি বুদ্ধিমতী ব'লেই তোমাকে দু'কথা খুলে ব'ল্‌লাম।'—বিন্দুমাত্র আর অপেক্ষা ক'রলো না সুখদা।—'আসি এখন, খোঁজ নিয়ে যাবো মাঝে মাঝে'—ব'লে যে-পথ দিয়ে এসেছিল, আবার সেই পথেই দ্রুত পা চালিয়ে দিল সুখদা।

অনড়ভাবে কতক্ষণ যে একই অবস্থায় দাঁড়িয়ে রইলেন নির্ম্মলা, তা তিনি নিজেও জান্‌তে পারলেন না। রাগে দুঃখে কেমন একটা তিক্ততায় সমস্তটা মন তাঁর জ্ব'লে যাচ্ছিল ভিতরে ভিতরে।

রোগশয্যায় শুয়ে এতক্ষণ সুখদার সঙ্গে মা'র কথা কাটাকাটির সমস্তটাই বিজনের কানে গিয়েছিল। এবারে কাছে ডেকে মাকে সে জিজ্ঞেস ক'রলো, 'হঠাৎ সুখদা ঠাক্‌রুণের গাত্রদাহ উপস্থিত হবার কারণ কি মা?'

—'কারণ আমার অদৃষ্ট।' থেমে নির্ম্মলা ব'ল্‌লেন, 'তোকে নিয়ে মানুষের কাছে আর কত অপমান সইব, বল্‌তো বাবা?'

শান্তকণ্ঠে বিজন ব'ল্‌লো, 'যেদিন তোমার বিজু হ'য়ে এ পৃথিবীতে এলাম, সে'দিন থেকেই যে তোমার চূড়ান্ত অপমান মা! এ অপমান জীবনে তোমার ঘুচবে না। তা যাক্‌। ভবিষ্যতে ঐ সুখদা ঠাক্‌রুণটিকে তোমার বাড়ীতে আর ঢুক্‌তে দিও না, এইটুকু শুধু তোমার কাছে অনুরোধ।'

কেন যেন ছেলের উপর বেশীক্ষণ রাগ ক'রে থাক্‌তে পারলেন না নির্ম্মলা। শিয়রে ব'সে বিজনের চুলের ভিতর দিয়ে ধীরে ধীরে স্নেহের আঙুল বুলিয়ে দিতে দিতে ব'ল্‌লেন, 'সকলের সঙ্গে ঝগ্‌ড়া ক'রে শেষ পর্য্যন্ত একঘরে হ'য়ে প'চে মরি, এই তোর ইচ্ছে?'

বিজন ব'ল্‌লো, 'বাজে লোকের সংশ্রবের চাইতে নিজের ঘরে নিজের সুখ-দুঃখ নিয়ে থাকা অনেক ভালো। একঘরে হবার দুঃখ তোমাকে সইতে হবে না মা, এ বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাকো।'

নিশ্চিন্ত হ'তে না পারলেও আপাতত এই নিয়ে আর কথা কাট্‌তে গেলেন না নির্ম্মলা। পরে একসময় ব'ল্‌লেন, 'সেই কখন্‌ খেয়েছিস্‌, এতক্ষণে তোর নিশ্চয়ই ক্ষিদে পেয়েছে; পথ্য এনে দি, খেয়ে চোখ বুজে একটু ঘুমোতে চেষ্টা কর্‌ তো বাবা!'

একটা দুর্ব্বল চাহনিতে মায়ের চোখের দিকে দৃষ্টি তুলে ধ'রে বিজন জিজ্ঞেস্ ক'রলো, 'কি পথ্য দেবে, বলো?'

নির্ম্মলা ব'ল্লেন, 'গায়ে জ্বর র'য়েছে, দুধ-বার্লি ভিন্ন আর কি দিতে পারি, বল্?'

—'ঘোড়ার ডিম।' ব'লে ঠোঁট উল্টালো বিজন। বল্লো, 'জানো শুধু বাটিভর্ত্তি বার্লি এনে মুখের সামনে ধ'রতে!'

নির্ম্মলা বল্লেন, 'এ দেশের ঘোড়াগুলিও তেম্নি, হাঁসের মতো ওরা যদি সত্যিই ডিম পাড়তো, তবে আমারই কি উনুনের আগুনে ব'সে এম্নি ক'রে বার্লি জ্বাল দিতে হ'তো!' অলক্ষ্যে একবার মুখ টিপে হাসলেন নির্ম্মলা।

বিজনও হাসি চেপে রাখতে পারলো না। শরীরের গ্লানিতে কষ্ট বোধ হ'লেও মুখে মৃদু চাপা হাসি টেনে মায়ের দিকে একবার হাত দু'খানিকে ছুঁড়ে দিতে চেষ্টা ক'রে বল্লো, 'তুমি কী বলো তো, কি আরম্ভ করেছ তুমি? যাও, উঠে নিজের কাজে যাও; আমার একটুও ক্ষিদে পায়নি, কিচ্ছু খাবো না আমি। এই আমি ঘুমোলাম।' ব'লে চোখ বুজলো বিজন।

নির্ম্মলাও আর ব'সে রইলেন না। মুখে শুধু একবার উচ্চারণ করলেন—'দুষ্টু ছেলে', তারপর বোধ করি হেঁসেল ঘরের দিকেই উঠে গেলেন।...

সন্ধ্যার দিকে তসর আলী এসে একসময় ঘরের দাওয়ায় বস্লো।—'আমার দাদাবাবু কেমন আছেন, দাদাবাবু?' ব্যাকুল কণ্ঠের চকিত জিজ্ঞাসা। বিজনের অসুখ সম্পর্কে তসর আলীর জান্তে বিলম্ব হয়নি। সেই থেকেই সে মনে মনে অনুশোচনায় দগ্ধ হ'য়েছে। এমন দেবতুল্য মানুষেরও নাকি আবার এই রোগ এসে শরীর আশ্রয় করে! তারা না হয় ছোট লোক, নোংরা জীবনে রোগ-বীজাণুর অভাব নেই, তাই ব'লে দাদাবাবুর মতো মানুষের জীবনে আবার এ কি উপগ্রহ? কিন্তু কেন এই উপগ্রহ, সেটুকু তাঁর বুঝতে বাকী ছিল না। বুঝেই সে আরও বেশী অনুশোচনায় দগ্ধ হচ্ছিল।

নির্ম্মলা বল্লেন, 'কেমন আর থাকবে বলো? গুটি-গুলো এখনও ভালো ক'রে বেরোয়নি, ব্যথা আছে সারা গায়ে, শরীরের তাপও কিছু কম নয়। কি আছে অদৃষ্টে, কি জানি!'

এবারে কেন যেন নতুন ক'রে কিছু একটা আর প্রশ্ন ক'রতে পারলো না তসর আলী। সঙ্গে মাঝারি দেখে কচি দু'টো ডাব-নারকেল এনেছিল, নীরবে সেই দু'টোকে সাম্‌নে এগিয়ে ধ'রে শুধু সে বল্লো, 'এ রোগে ডাবের জল উপকারী, মোনাকে দাদাবাবু দিতেন; এই দুইটা য্যান্ দাদাবাবু খান।'

নির্ম্মলা বল্লেন, 'এ কেন আবার তুমি আন্তে গেলে তসর? অভাবের সংসার, তার উপর আবার এসব কি খরচা!'

তসর আলীকে যে কিনে আন্তে হয়নি, এ যে তার নিজের গাছেরই ফল, সে কথা উল্লেখ ক'রে শান্ত কণ্ঠেই সে বল্লো, 'আপনারা যে পূজা-পার্ব্বন করেন মাঠাকরুণ, তাতে জিনিষ কিন্‌তি হয় না? দাদাবাবু আমার দেবতা, তাকে দিতে আমার যদি খরচাই লাগে কিছু, তাতে দোষের কি? এইতেই কি আমার অভাব ঘুচতো?'

নির্ম্মলার কণ্ঠ এবারে কেমন যেন হঠাৎ স্তব্ধ হ'য়ে গেল। এ কথার জবাব দেবার মতো ভাষা খুঁজে পেলেন না তিনি। মনে মনে শুধু বল্লেন—সুখদা ঠাক্‌রুণের দল এসে একবার দেখে যাক্, মানুষ কাকে বলে!

একসময় শিয়রের বালিশের উপর মুখ তুলে কাতর-কণ্ঠে বিজন জিজ্ঞেস ক'রলো, 'মোনা কেমন আছে তসর?'

তসর আলী বল্লো, 'শরীলে বেশী বল পায় না, হাট্‌তি পারে না বেশী, তা ছাড়া আছে একরকম।'

—'লক্ষ্য রেখো ওর শরীরের দিকে।' থেমে পুনরায় কাতরোক্তি ক'রলো বিজন, 'আমি যে কবে সুস্থ হ'য়ে উঠ্‌বো, কিছুই জানিনে। ওদের পাঠশালার খুব ক্ষতি হ'লো। ওরা যেন তা-ব'লে বই বন্ধ ক'রে থাকে না, তবে সব ভুলে যাবে।'

মৃদু হেসে তসর আলী ব'ল্লো, 'কড়া শাসন না পেলি পরে ওদের নেকাপড়ায় গরজ হবে বইল্যা বিশ্বাস কম। ওদের এখন গুরুমশাইর অসুখের ছুটি।'

কথা শুনে কৌতুক বোধ ক'রলো বিজন। ব'ল্‌লো, 'কেন, আমি কি খুব কড়া শাসন করি ?'

—'আপনার আদরই আপনার শাসন। আপনার ঐ আদরকেই ওরা সমীহ করে।' ব'লে পুনরায় মুখে হাসি টান্‌লো তসর আলী।

কেমন একটা অজানা খুসীতে এবারে মনটা ভ'রে উঠ্‌লো বিজনের। তার আদরই তার শাসন : একটা নতুন অনুভূতির কথা শুন্‌তে পেলো সে আজ নীরবে বহুক্ষণ আচ্ছন্নের মতো প'ড়ে থেকে পরে একসময় জিজ্ঞেস ক'রলো বিজন, 'জল আজ কতটা বাড়লো তসর ?'

—'ধানী জমিতে আইজ এক কড় আন্দাজ অনুমান হইল।' থেমে তসর আলী ব'ল্‌লো, 'নদীর জল থই থই করে, খ্যাপা ঢেউ, বুঝা যায় না।'

পাশ থেকে নির্ম্মলা জিজ্ঞেস ক'রলেন, 'ধান কিছু ঘরে উঠবে তো ?'

উপরের দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ ক'রে তসর আলী ব'ল্‌লো, 'খোদার মর্জ্জি মা ঠাক্‌রুণ, , নদীতে বান ডাকলি সব ভেসে যাবে।'

আকাশটা তখন কালো হ'য়ে উঠেছে। ভাদ্রের মেঘের ছায়ায় মাঝে মাঝে আকাশটা বড় বেশী কালো হ'য়ে ওঠে, গুম্ গুম্ ক'রে মেঘ ডাকে আকাশে।

থেমে তসর আলী বল্‌লো, 'মেঘের গতিকও য্যান্ ভালো বইল্যা মনে হয় না মাঠাক্‌রুণ। খোদা ভরসা। ঘরে ধান না উঠ্‌লি যে আমিই মরবো আগে।'

এতকাল তসর আলীদের সঙ্গে প্রয়োজনের সম্পর্ক থাক্‌লেও তারা সবাই ছিল দূরের মানুষ। আজ কিন্তু তসর আলী অন্ততঃ হৃদয়ের কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়েছে। উত্তরে নির্ম্মলার মুখ থেকে হঠাৎই বেরিয়ে এলো—'বালাই, ষাট, মর্‌বে কেন তসর ? বিপদ এলে সকলে তা এক সঙ্গেই ভোগ ক'রবো। মরার কথা কি মুখে আন্‌তে আছে ?' ব'লে নিজের কাজেই কোথায় একদিকে উঠে গেলেন নির্ম্মলা।

তসর আলীও আর বেশীক্ষণ অপেক্ষা ক'রলো না। একসময় বিদায় নিয়ে সেও দাওয়া ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। কিন্তু এত তাড়াতাড়িই তাকে বিদায় দিতে ইচ্ছা ছিলনা বিজনের। অসুখে প'ড়ে অবধি মনটা কেবলই বহির্ম্মুখী হ'য়ে উঠেছে। বাইরের মানুষ ঘরে পেলে তাই খুসীর অন্ত থাকে না। সংসারের চাপে প'ড়ে ছন্দা আজকাল আসা-যাওয়া একেবারেই কমিয়ে দিয়েছে। বিছানায় শুয়ে অবধি বাইরের জগৎটা অনেকখানিই সরে' গেছে তার কাছ থেকে। প্রতিমুহূর্ত্তেই মনটা তার হাহাকার ক'রে ওঠে ছন্দার জন্য। কিন্তু নিগ্রহ কি তাকেই কম সহ্য ক'রতে হ'চ্ছে ?—বিছানায় শুয়ে অবধি মনের এই গ্লানির মধ্যে তসর আলী ব'য়ে নিয়ে এলো বহিঃপ্রকৃতির স্পর্শ। কিন্তু আবার সেই একাকিত্বের তাপ-দগ্ধ মরুভূমি। কি দুঃসহ এই রোগক্লান্ত মুহূর্ত্তগুলি, কি দুঃসহ প্রতি মুহূর্ত্তের জন্য এম্‌নি ক'রে শয্যার বুকে বন্দী হ'য়ে থাকা! কেমন একটা বিশ্রী অস্বস্তিতে হঠাৎ নিজের মধ্যে অধীর হ'য়ে উঠলো বিজন! দেহ আর মন নিয়ে তার সঙ্গে এ আজ কি খেলা খেল্‌ছেন ভগবান ?

খেলাই বটে! শেষ রাত্রির দিকে হঠাৎ জ্বরের তাপ বেড়ে গিয়ে আরও অস্থির ক'রে তুল্‌লো বিজনকে। নির্ম্মলার চোখে ঘুম ছিল না, বিজন শয্যা নিয়ে অবধি ঘুম তাঁর দু'চোখ থেকে অন্তর্হিত হ'য়েছে। কোনো একটা মুহূর্ত্তের জন্যও নিশ্চিন্তে কাটাতে পারছেন না তিনি। মাতৃহৃদয়ের ব্যথা কোথায়, উৎকণ্ঠা কোথায়, কে বুঝ্‌বে তা সংসারে ? বিজনের শিয়রে ব'সে তিনি ন্যাক্‌ড়া ভিজিয়ে জলপটি দিয়ে দিতে লাগ্‌লেন তার কপালে। জিজ্ঞেস ক'রলেন, 'খুব কষ্ট হ'চ্ছে, তাই না বাবা ?'

অস্ফুট কণ্ঠে একবার ককিয়ে উঠ্‌লো বিজন : 'কপালের দু'পাশের রগ দু'টো বড় যন্ত্রণা দিচ্ছে মা। জলপটি রেখে তুমি বরং কপালটা একবার টিপে দাও।'

নির্ম্মলা তা-ই ক'রলেন।

কিছুটা উপশম বোধ হ'লে বিজন একসময় তেম্‌নি অস্ফুট কণ্ঠে ব'ল্‌লো, 'ছন্দাকে দেখ্‌তে পাই না কতদিন।'

আরও হয়ত কিছু একটা ব'লবার ছিল, কিন্তু সেটুকু আর খুলে ব'ল্‌তে পারলো না সে।

নির্ম্মলা ব'ল্‌লেন, 'এ সময়ে তাকে আর আসা দিয়ে দরকার নেই এখানে। রোগটা তো ভালো নয়, আগে তুই ভালো হ'য়ে ওঠ্ বাবা।'

উত্তরে ভালোমন্দ কিছু একটাও আর ব'ললো না বিজন। প্রসঙ্গটাকে সে ইচ্ছে ক'রেই চেপে গিয়ে শুধু ব'ল্‌লো, 'আমার জন্যে কষ্টের তোমার শেষ রইলনা মা। ভাবচি, এরপর তুমি আবার অসুখে না পরো!'

এ কথার কিছু একটাও জবাব দিলেন না নির্ম্মলা।

ধীরে ধীরে রাত্রি প্রভাত হ'লো। তরুণ উষার অরুনিমায় ছেয়ে গেল দিগাঙ্গন। এম্‌নি ক'রে আরও দু'টো প্রভাতের উদার অভ্যুদয়ে রাত্রির তমসা কেটে গেল।

একসময় জ্বরের বিচ্ছেদ ঘ'টলো বিজনের। শরীরেও আর নতুন গুটি দেখা দেয়নি। সামান্য কয়টি যা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল, এবারে তা শুকোতে সুরু ক'রলো।

কিন্তু নির্ম্মলার আর এমন সাধ্য রইলনা যে, মাথা তুলে ব'স্‌তে পারেন। ক্রমাগত কয়েকদিনের রাত্রি জাগরণে শরীর তাঁর নিস্তেজ হ'য়ে প'ড়েছিল। বিজন মনে মনে যে আশঙ্কা ক'রছিল, অবশেষে তা-ই সত্য হলো। শয্যা গ্রহণ করলেন নির্ম্মলা। বহুদিন থেকেই শরীর ভাল যাচ্ছিল না। হার্টের রোগ দেখা দিয়েছিল, তার সঙ্গে এবারে শিরঃপীড়ায় একেবারেই ভেঙে প'ড়লেন তিনি।

একসময় বিজন ব'ল্‌লো, 'এতদিন আমার দিকে তাকাতেই তোমার বেলা ফুরিয়ে গেছে, এবার তোমাকে দেখবে কে মা?'

—'সংসারে যিনি সকলের সব কিছু দেখেন, তিনিই দেখবেন বাবা।' ব'লে নিজের মধ্যে একটা দীর্ঘশ্বাস গোপন ক'রে নিলেন নির্ম্মলা।

ঠিক এই সময়ে দরজার সাম্‌নে এসে দাঁড়ালো ছন্দা।

বিস্ময়ে এবং আশঙ্কায় নির্ম্মলা হঠাৎ যেন কেমনই হয়ে গেলেন। ব'ল্‌লেন, 'ঘরে ঢুকিস্‌নে মা, বিজুর রোগটা কি জানিস্‌ তো? এসময়ে কাছে আসতে নেই।'

—'আপনি যে কাছে র'য়েছেন!' ছন্দা ব'ল্‌লো, 'রোগটা জানি ব'লেই তো পালিয়ে এলাম! সে কি শুধু এ ভাবে দুয়োর থেকে ফিরে যাবো ব'লে?'

নির্ম্মলার বারণ টিক্‌লো না। ছন্দা এসে তাঁর পাশ ঘেঁষে ব'সে প'ড়লো।

নির্ম্মলা ব'ল্‌লেন, 'আমি নিজেও আজ আর মাথা খাড়া ক'রতে পারছি না। বিজুর এই অসুখ, এতদিন দিন-রাত্রির দিকে তাকাই নি, ওর শিয়রে ব'সে ব'সে শুধু ভগবানকে ডেকেছি। কিন্তু অদৃষ্টের এমনি পরিহাস যে, আজ আর এক দণ্ডও ওর কাছে গিয়ে ব'স্‌তে পারছি না। ওর যে কত কষ্ট হ'চ্চে!'

মনের গ্লানি মনের মধ্যেই গুমরে ম'রছিল এতদিন। এবারে ব'ল্‌বার মানুষ পেয়ে চোখের কোল বেয়ে দু' ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়লো নির্ম্মলার। চেষ্টা করেও সেটুকু রোধ ক'রতে পারলেন না তিনি।

ছন্দা তা নিজের আঁচলে মুছে নিয়ে ব'ল্‌লো, 'ঘরে এই অবস্থা, অথচ চেষ্টা ক'রে আমাকে কি সামান্য একটা খবরও পৌছে দিতে পারলেন না মাসিমা?'

—'তোকে ডেকে আনবার মতো যে রোগ নয় মা!' থেমে নির্ম্মলা ব'ল্‌লেন, 'একেই পাড়া-প্রতিবেশীর শাসানীর অন্ত নেই, তারপর তোর কিছু একটা হ'লে আমার যে সংসারে আর মুখ ঢাকবারও জায়গা থাক্‌তো না মা। এসে তুই অন্যায় ক'রেছিস্‌।

—'সংসারে অন্যায়টাও ন্যায়ের কোঠাতেই পড়ে, আজ অন্ততঃ এটুকু বুঝ্‌তে শিখেছি মাসিমা। আমার জন্যে আপনি ভাববেন না, আমার কিছু হবে না।' ব'লে দ্বিধাহীন চিত্তেই নীরবে একসময় উঠে এসে বিজনের শিয়রের পাশে ব'স্‌লো ছন্দা। বোধ করি কিছুটা তন্দ্রার মতই এসেছিল বিজনের, নিমিলিত চক্ষে অবসন্নের মতো প'ড়ে থেকে সম্ভবতঃ কি একটা দুঃস্বপ্ন দেখেই বোবা কান্নার মতো ককিয়ে উঠতে যাচ্ছিল, সহসা ললাটে হাতের স্পর্শ পেয়ে চোখ মেলে তাকাতেই ছন্দার সঙ্গে চোখাচোখি হ'য়ে গেল তার।

ছন্দা জিজ্ঞেস্‌ ক'রলো, 'কেমন বোধ ক'রছো এখন বিজুদা?'

—'দেহে কিছু দুর্ব্বল হ'য়ে প'ড়েছি, এই যা—। তা' ছাড়া অন্য কোনো উপসর্গ আপাতত বোধ ক'রছি

না।' থেমে বিজন ব'ললো, 'তুই যে কথা নেই বার্ত্তা নেই হঠাৎ এসে আমাকে বড় ছুঁয়ে ফেল্‌লি ?'

—'কেন, আমি কি অচ্ছুৎ, হরিজন যে, ছোঁয়া পেয়ে তোমার ব্রাহ্মণত্ব নষ্ট হবে ?'

কথাটা গিয়ে কোথায় যেন বিঁধলো বিজনের। এত-দিন প্রতি মুহূর্ত্তে সে আশা ক'রছিল ছন্দাকে, এ কথাটুকু যেমন সে খুলে ব'ল্‌তে পারলো না তার কাছে, তেম্‌নি যে কথা দিয়ে কথার সূত্রপাত টান্‌লো সে, তারও অসারতা ও অনুপযোগিতা কল্পনা ক'রে তেম্‌নি সুখী হ'তে পারলো না বিজন। কিছুক্ষণ ছন্দার মুখের দিকে নির্ব্বাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে পরে সে ব'ল্‌লো, 'তুই কোন্ দুঃখে অচ্ছুৎ হ'তে যাবি ছন্দা ? বামুনের ঘরে জন্ম হ'লেই লোকে বামুন হয় না, আমিও বোধকরি হ'তে পারি নি! চাষাভুষো নিয়ে কাটাই ব'লে গাঁয়ের লোকের চোখে আমিই আজ অচ্ছুৎ হ'য়ে গেছি, নইলে বাড়ী ব'য়ে এসে তারা মাকে শাসিয়ে যাবে কেন ?'

উত্তরে কেমন একটা বেদনাক্লান্ত কণ্ঠে ছন্দা শুধু ব'ল্‌লো, 'মাসিমার মুখে শুনেছি।'

থেমে বিজন ব'ল্‌লো, 'তুই বরং মেঝেয় নেমে কোথাও ব'স্ ছন্দা। গুটিগুলো কেবল শুকিয়ে আস্‌চে, এ সময়েই নাকি রোগ ছড়াবার ভয়। দু'দিন বাদে তো চানই ক'রবো, মিথ্যে এই দু'দিনের জন্যে কেন ঘাঁটাঘাঁটি ক'রবি তুই ?'

এবারও ছন্দা এ কথার যথাযথ কিছু একটা জবাব না দিয়ে শুধু ব'ল্‌লো, 'বুঝলাম।' তারপর উঠে এসে নির্ম্মলার কাছ থেকে রান্নাঘরের চাবি চেয়ে নিয়ে অল্প সময়ের মধ্যেই মাসিমা ও বিজুদার উপযুক্ত পথ্য প্রস্তুত ক'রে খাইয়ে-দাইয়ে তবে সে বাড়ী রওনা হ'লো। বাড়ী তো নয়, কণ্টকাকীর্ণ একটা আস্তাকুঁড়।

বিস্ময়ে আনন্দে ও স্নেহে অভিভূত হ'য়ে গেলেন নির্ম্মলা। বিপদের দিনে এম্‌নি ক'রেই ভগবান মানুষী রূপ নিয়ে এসে পাশে দাঁড়ান। ছন্দার এই যত্ন ভিন্ন আজ আর পথ খুঁজে পাচ্ছিলেন না নির্ম্মলা। নিজের কোঠায় শুয়ে শুয়েই একসময় সাধ্যমত গলা তুল্‌লেন তিনি: 'বিজু, বাবা আমার, কেমন আছিস এখন ?'

পাশের কোঠা থেকে বিজন ব'ল্‌লো, 'ভালো আছি মা। তোমার তো কোনো কষ্ট হ'চ্চে না ?'

—'আর কষ্ট কি বাবা, ছন্দা যে আমার সকল কষ্টের ভার তার নিজের হাতে তুলে নিয়ে আমাকে মুক্তি দিয়ে গেল।' থেমে নির্ম্মলা ব'ল্‌লেন, 'জন্মান্তর ব'লে সত্যিই যদি কিছু থাকে, তবে হয়ত আবার আমাকে জন্ম নিতে হবে, সে শুধু ওর ঋণ শোধ ক'রবার জন্যে। আমি আর একটুও কষ্টবোধ ক'রছি না বাবা।'

কেমন একটা গভীর আবেশে ধীরে ধীরে ক্লান্ত চোখ দু'টি বুজে এলো নির্ম্মলার।

[আগামী বারে সমাপ্য

বিক্রমপুরের নানাকথা

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

যুগে যুগে রাষ্ট্র পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। সেই সুদূর অতীত হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত কত পরিবর্ত্তনই না ঘটিল। শাসনতান্ত্রিক দিক হইতে বাঙ্গলা দেশ দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। এইরূপ বিভাগ এই প্রথম নয়। সে বিভাগও ব্রিটিশ আমলে হইয়াছিল, এ-বিভাগও ইংরাজের কূট-কৌশলেই হইল। তবে ইহার মূলে রহিয়াছে স্বাধীনতার গৌরব। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট তারিখ ভারতবর্ষের পরাধীনতার গ্লানি অপসারিত হইল। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্টের সেই পুণ্যদিনে ভারত স্বাধীন হইল বটে, কিন্তু ভারতবর্ষ দ্বিখণ্ডিত হইল—ভারতরাষ্ট্র ও পাকিস্তান রাষ্ট্র। পূর্ব্ববঙ্গ ও উত্তর বঙ্গ পাকিস্তান রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পূর্ব্ব পাকিস্তান নাম ধারণ করিল। পূর্ব্ব বঙ্গ ও উত্তরবঙ্গবাসী দেশ ছাড়িল। ঘরবাড়ী, কীর্ত্তি, মঠ, মন্দির, বিগ্রহ সব পড়িয়া রহিল, তাহারা 'উদ্বাস্তু' নামে পরিচিত হইলেন। দেশ নাই, বাড়ী নাই, ঘর নাই গৃহহারা অসহায় নরনারী কেহ বিটপীতলে, কেহ উন্মুক্ত প্রান্তরে স্থান গ্রহণ করিল। তাহারা স্বাধীনতার আনন্দ উপলব্ধি করিতে পারে নাই, কবে পারিবে তাহাও ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত। পূর্ব্ববঙ্গের অধিবাসীরা ব্রিটিশ শাসনকালে স্বদেশের স্বাধীনতাকামী হইয়া লাঞ্ছনা ও নিপীড়ন সহিয়াও স্থানভ্রষ্ট হয় নাই, প্রিয় পরিজনসহ মুসলমান প্রতিবেশীদের সহিত সুখে-দুঃখে, ব্যবসায়-বাণিজ্যে, সাহিত্য ও সমাজসেবায় একমন প্রাণ হইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়াছে—বর্ত্তমান স্বাধীনতা লাভের পরে—সংখ্যা-গরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের কাছে সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের পাল পার্ব্বণ, পূজা উপাসনা, অবাধ গতি ব্যহত হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে হইবার আশঙ্কায়ই স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে তাহারা দেশ ছাড়িয়া আসিয়াছে, নিজ বাসভূমে তাহারা পরবাসী। আত্মীয় স্বজন হইতে বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন নূতন করিয়া প্রতিষ্ঠিত হইবার সন্ধানে তাহারা ছুটিয়া চলিয়াছে। সুদূর ভবিষ্যতে হয়ত আবার তাহারা নূতন উপনিবেশে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া বৃহৎ বাঙ্গালী সমাজ ও রাষ্ট্র গড়িয়া তুলিবে। যাহারা আসিল না, এবং নানা কারণে আসা অসম্ভব হইয়া রহিল তাহাদের সুদূর ভবিষ্যতে সংখ্যা-গরিষ্ঠ-সম্প্রদায়ের সহিত একত্রিভূত হইবার আশঙ্কা অমূলক মনে হয় না, আমার মনে হয় তাহাই হইবে স্বতঃসিদ্ধ ঘটনা।

এরূপ স্থলে যদি প্রাচীনকাল হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত যে বিক্রমপুরের কীর্ত্তি চিহ্ন উত্তর ও দক্ষিণ বিক্রম-পুরে। তাহারা ফেলিয়া আসিয়াছে তাহার পরিচয় যদি দেই মনে হয় তাহা সকলেরই প্রীতিকর হইবে এবং মনে পড়িবে সেই পদ্মা—সেই মেঘনার কলকল্লোল ধ্বনি. এবং পল্লীগ্রামের শান্ত শীতল সুকোমল পরিবেশের কথা, মনে পড়িবে, সেই পাখীডাকা ছায়ায় ঢাকা শ্যামল কানন-তল, সেই খাল—বিল—জল, সেই সবুজ ধানের ক্ষেতে ঢেউয়ের দোলা, শ্রেণীবদ্ধ কুটির-শ্রেণী, গ্রাম-প্রান্তস্থিত মঠ ও মন্দিরের উচ্চ চূড়া, হাট, বাজার, দেবায়তন, সেতু, ডিঙ্গি নৌকার বর্ষার খালে-বিলে মাঠে অপূর্ব্ব দ্রুত গতি। এ সকল মধুর স্মৃতি—আজ দারুণ অভিশাপের মত তাহাদের মনের মধ্যে আঘাত করিবে।

বিক্রমপুরের অতীত ঐশ্বর্য্যের কথা প্রথমে বলিতেছি।

পূর্ব্ববঙ্গের সর্ব্বত্র বিশেষতঃ বিক্রমপুর অঞ্চলে মঠ ও মন্দিরের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক। রাজাবাড়ীর মঠ, রাজ-নগরের নবরত্ন মঠ প্রভৃতির কথা এখন ইতিহাসের পৃষ্ঠায়ই থাকিবে। সে সব কথা সংক্ষেপে বলিতেছি। বিক্রম-পুরে সময় সময় যে সব প্রাকৃতিক বিপ্লব ও দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি হইয়াছে, সে সকলের সম্বন্ধে অনেক কথা পুরাণো সাময়িক পত্রিকার পৃষ্ঠায়ও পাওয়া যায়। সেদিন পুরাণো কাগজপত্র নাড়াচাড়া করিতে করিতে ১২৮৬ সালের ৮ই আষাঢ় (ইংরাজী ২১শে-জুন, ১৮৭৯) তারিখে প্রকাশিত

বিক্রমপুরে দুর্ভিক্ষ নামে একটি কবিতা পাইলাম, এখানে তাহা অপ্রাসঙ্গিক হইবে বলিয়া মনে করি না। কবিতাটি এখানে উদ্ধৃত করিলাম :

বিক্রমপুরে দুর্ভিক্ষ

১

হায়রে কি শুনি আজি, এ বিক্রমপুরে
চতুর্দ্দিক ঘুরিতেছে হাহাকার স্বরে,
দারুণ দুর্ভিক্ষানল, জ্বলি উঠে সুপ্রবল,
দাহন করিল বুঝি না দেখি উপায়।
স্বর্ণভূমি হায় বুঝি হল ভস্মপ্রায়॥

২

অনশনে আহা কত দীন হীন জন
বালক বালিকা নিয়ে করিছে রোদন,
পেটের জ্বালায় কেহ, ধরি হায় জীর্ণ দেহ,
একেবারে হারাইছে জীবন রতন।
কেহ নাই হায় হায় করিতে বারণ॥

৩

ঐ শুন শিশুদের ক্রন্দনের ধ্বনি,
"অন্ন দে মা, বলি তারা ধরিছে জননী,
হায় মাতা নিরুপায়, বিদরিছে হৃদি তার
আত্মহত্যা হায় হায় ত্যজিছে জীবন।
নিজ অঙ্কে সন্তানেরে করিয়ে ধারণ॥

৪

ঐ দেখ অন্নাভাবে কত দীনজন
সুচির নিদ্রায় তারা হয়েছে মগন,
আর নাহি দুনয়ন, করি তারা উন্মীলন
হেরিবারে স্বদেশের দৃশ্য মনোহর।
আর নাহি পূর্ণ হবে আনন্দে অন্তর॥

৫

অহে বঙ্গবাসিগণ হও সচেতন,
বিলম্ব ঔদাস্য আর সাজে কি এখন,
দান করি স্ব স্ব ধন, করি সবে প্রাণপণ,
সোণার বিক্রমপুর করহে উদ্ধার
এতে ধর্ম্ম কীর্ত্তি লাভ হইবে আবার॥

বিক্রমপুরবাসী।

এই দুর্ভিক্ষের কথা খুব বেশী দিনের নয়, ইংরাজী ১৮৭৯ সালের কথা আশী বৎসর পূর্ব্বের দুর্ভিক্ষের কাহিনী।

মাইজপাড়ার কালীমূর্ত্তি

বিক্রমপুরের পল্লীগ্রামসমূহে যখন ভ্রমণ করিয়াছি, তখন বহু পল্লীতেই প্রাচীন ও আধুনিক অট্টালিকা, মঠ, মন্দির, মণ্ডপ, ঘাটলা, সেতু, মসজিদ ও জুম্মাঘর দেখিয়াছি। কোন কোন মন্দিরের গায়ে পোড়া ইটের বৃহৎ ফলকে দেব দেবীর খোদিত মূর্ত্তি দেখিয়াছি। বর্ত্তমানে ভাগ্যকুল কুণ্ডু বাবুদের বালাসুর বাড়ীতে পাশ্চাত্য আদর্শে বিরাট অট্টালিকা নির্ম্মিত হইয়াছিল। ভাগ্যকুল, বালাসুর, বাঘরা, রাড়ীখাল, মাইজ পাড়া, ব্রাহ্মণগাঁ, তেওটিয়া, কোরহাটি, হলদিয়া, কুমারভোগ, কাজির পাগলা, কোলাপাড়া, কাহেত্তোরা, ষোলঘর, হাসাড়া, কেওটখালি, সেখরনগর, রাজনগর, বাড়ৈখালি, বজ্রযোগিনী, মুন্সীগঞ্জ, মালখানগর, ফুরসাইল, আউটসাহী, সোণারঙ্গ, কামার খাড়া, মূলচর, ইছাপুর, মধ্যপাড়া, জৈনসার, পশ্চিমপাড়, আট-

পাড়া, আড়িয়াল, মসদ গাঁও, আটিগাঁও, বয়রাগাদী, দক্ষিণ বিক্রমপুরের পালং, নড়িয়া, ভোজেশ্বর, কোমরপুর, ধামুকা, অপসা, নগর, পণ্ডিতসার, কেদারপুর প্রভৃতি বিবিধ পল্লীতে প্রাচীনকালের ও বর্ত্তমান কালের অনেক মঠ, মন্দির ও মূর্ত্তি বিরাজমান ছিল। এখন এই রাষ্ট্র-বিভাগে নানা বিভিন্ন স্থানে সে সমুদয় স্থানান্তরিত হইয়াছে।

প্রথমে মঠের কথা বলিব। বর্ত্তমান সময়ে শ্যামসিদ্ধির মঠটি সর্ব্বোচ্চ বলা যাইতে পারে। ইহার স্থাপত্য কার্য্য উল্লেখযোগ্য। মঠটি খুব বেশী দিনের পুরাতন নয়। শম্ভুনাথের বাসার্থ মঠ। শকাব্দ ১৭৫৮। সন ১২৪৩।

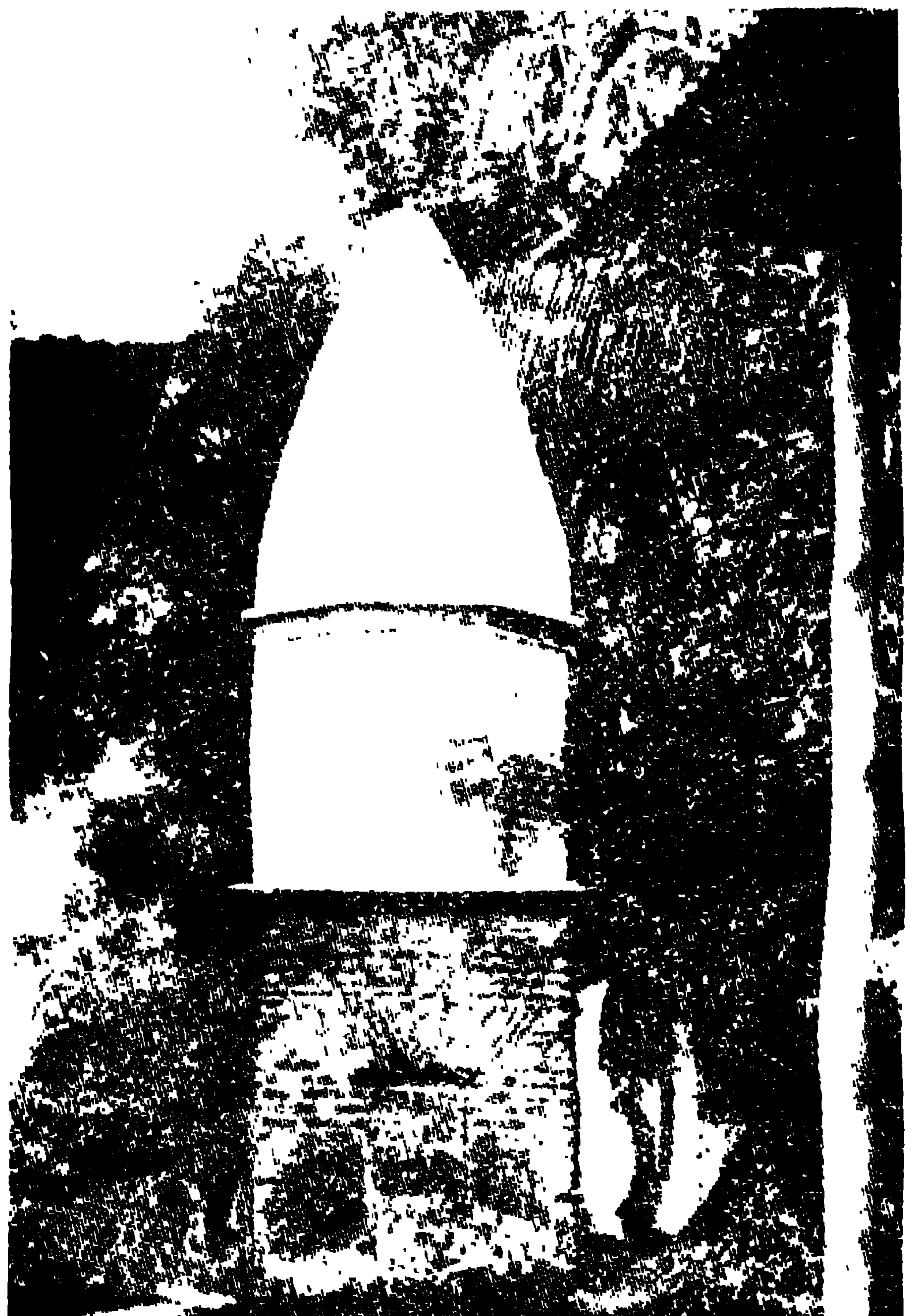

কুকুটিয়ার প্রাচীন মঠ

১১৫ বৎসরের পুরাতন। ৺শম্ভুনাথ মজুমদার এই মঠ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তাঁহার পৌত্র শ্রীযুক্ত কুমুদিনী-কান্ত মজুমদার ওয়ারিসসূত্রে অধিকারী হইয়া পূজা-কার্য্যাদি নির্ব্বাহ করিতেন। দাস শ্রীউপেন্দ্রনাথ মজুমদার ওরফে কালু। সন ১৩৩৬, ১৯শে আষাঢ়। এই মঠে ৩ ফুট উচ্চ শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। এত বড় শিবলিঙ্গ সচরাচর দেখা যায় না।

মাইজপাড়া ভাঙ্গা মঠ। রায়দের স্থাপিত কুলিন, অনৈকা বিধবা তদীয় স্বামীর শ্মশানে মঠ প্রতিষ্ঠা করেন। চূড়ার নিম্নভাগে কিছু কাজ অসমাপ্ত থাকিতেই তাঁহার মৃত্যু হয়, এ জন্য মঠটি অসম্পূর্ণ রহিয়াছে। এ জন্য ইহা ভাঙ্গা মঠ নামে পরিচিত হইয়া আসিতেছে। এ গ্রামে প্রস্তরময়ী কালীমূর্ত্তি আছে।

ভাওয়ার নামক পল্লীতে ৺কালী সিকদার তাঁহার মাতার শ্মশানে একটি মঠ বা নবরত্ন মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ঐ মন্দিরের উচ্চতা প্রায় ৫০ ফুট, নবরত্ন মন্দিরের গায়ের চারিদিকের চূড়াগুলির কোনটির উচ্চতা পাঁচ ফুট, আট ফুট এইরূপ ছিল। বাংলা ১৩৩৫ সনের শ্রাবণ মাসে উহা পদ্মার কুক্ষিগত হইয়াছে। কোরহাটি গ্রামে একটি সুন্দর মঠ আছে। নির্ম্মাতা—দ্বারিক ঘোষ। দুয়ালী গ্রাম এক সময়ে বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল। ঐ গ্রামে, ব্রাহ্মণ, কায়স্থ প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ বাস করিতেন। এ গ্রামের দুইটি অতি সুন্দর কারুকার্য্যখচিত মঠ ছিল, তাহার একটি পদ্মাগর্ভে বিলীয়মান হইয়াছে। অপর মঠটির ছবি এখানে দেওয়া গেল। এখনও পদ্মার বুক হইতে এই মঠটি দেখিতে পাওয়া যায়। একটি পুষ্করিণীর তীরে উচ্চ ভূমিতে ইহা প্রতিষ্ঠিত। এই গ্রাম এক সময়ে শিল্প সমৃদ্ধে বিশেষ বিখ্যাত ছিল। এ পল্লীর ভরণকর নামে এক শ্রেণীর শিল্পী ছিলেন, তাঁহারা ব্রোঞ্জ ধাতুর দ্বারা সুন্দর সুন্দর দেবমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিতেন অন্যান্য বিচিত্র ও সুন্দর শিল্পকার্য্যেও তাঁহাদের দক্ষতা ছিল অসাধারণ, ঢাকা, ফরিদপুর, ময়মনসিংহ প্রভৃতি নানা জেলায় তাঁহাদের নির্ম্মিত দেবমূর্ত্তি, ব্যবহার্য্য সৌখিন দ্রব্যাদি এক সময়ে আদরের সহিত গৃহীত হইত। দুঃখের বিষয় ব্রাহ্মণ হইয়া তাঁহারা এইরূপ কার্য্য করেন বলিয়া সমাজে পতিত হইয়াছিলেন। যে মঠটির ছবি দেওয়া গেল তাহা একজন গোপ সম্প্রদায়ের ব্যক্তি, তাঁহার পিতামাতার শ্মশানোপরি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

পানিয়া—গ্রামে একটি প্রাচীন মঠ আছে। ঐ গ্রামের ৺ভারতচন্দ্র দে ভৌমিকের বাড়ীতে ইহা অবস্থিত। ছবি সংগ্রহ করিতে পারি নাই।

কনকসার, কুকুটিয়া, দক্ষিণ পাক্‌সা, ককাজির পাগলা গ্রামের মঠগুলি উল্লেখযোগ্য। কুকুটিয়ার মঠটিও প্রাচীন বলিয়া খ্যাত। মঠগুলি অধিকাংশই শ্মশানভূমির উপর নির্ম্মিত।

বিক্রমপুরের প্রায় প্রতি গ্রামে দেবায়তন, বা দেবালয় আছে। হলদিয়া গ্রামের কালী মন্দির অতি প্রাচীন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে মন্দির নূতন করিয়া গঠিত হইয়াছে। মন্দিরের ভিত্তি শ্বেত মর্ম্মর প্রস্তর নির্ম্মিত। মন্দিরে একটি শিলা ফলকে নিম্নলিখিত খোদিত লিপি আছে

ওঁ

শ্রীশ্রী আনন্দময়ী জয়তি

শাকে ষষ্ঠ নবেগ্রাচন্দ্র বিমিতে কুম্ভেতে ভানৌ মুদা
কালীকাল ভয়ার্ত্ত ভক্ত শরণং দেবী চতুর্ব্বর্গদা ॥
মাতানন্দময়ী পরাৎপরতরা ব্রহ্মাদি সম্পূজিতা।
বিদ্যা ব্রহ্মময়ী প্রসন্ন বদনা শ্রীদক্ষিণা স্থাপিতা ॥
সুসেবিতা চ কল্যাণী শ্রীরাধাকান্ত শর্ম্মণা।
সানুজেন চ যত্নেন ভক্ত্যা গঙ্গাধরেণ চ।’

বিক্রমপুরের বহর একটি প্রসিদ্ধ পল্লী। পদ্মানদীর প্রকোপে উহা বিনষ্ট হইলেও উহার নাম এখনও প্রচলিত। ষ্টীমার ষ্টেসন বহর এই নামটি যখন যে গ্রামেই ষ্টীমার ষ্টেসন স্থানান্তরিত হউক না কেন, সেই বহর নামেই অভিহিত হইয়া থাকে। বহর গ্রামের চৌধুরীরা শুধু বিক্রমপুরের নয় বিক্রমপুরের বাহিরেও বাঙ্গালা দেশে জমিদার বলিয়া এবং শিক্ষিত বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া আসিতেছেন। এই গ্রামের রাজরাজেশ্বরী বিগ্রহ বিশেষ প্রসিদ্ধ। বিগ্রহ একটি শিলাখণ্ডমাত্র। উহা এখনও পূজিতা হইয়া আসিতেছেন। বর্ত্তমানে কোথাও স্থানান্তরিত হইয়া থাকিলে -কোথায় আছেন, জ্ঞাত নহি। রাজরাজেশ্বরীর পুরাতন মন্দির বিলুপ্ত হইয়াছে। সেই মন্দির বা ত্রিকুটি দলানের গায়ে পোড়াইটের ফলকে বিবিধ দেবমূর্ত্তি খোদিত ছিল, প্রস্তর ফলক ও মাঝে মাঝে ছিল, একান্ত দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে তাহার কোনো ফটো আমি সংগ্রহ করিতে পারি নাই। আশা করি বহরবাসী কেহ বা বহরের চৌধুরী বংশীয় কেহ আমাকে এ বিষয়ে সাহায্য করিবেন।

পাইকারা গ্রামে—(লৌহজঙ্গথানার অন্তর্ভুক্ত) একটি মনসাবাড়ী আছে। মন্দির ইষ্টক নির্ম্মিত। ঘট পূজিত হইত।

কনকসার—বিক্রমপুরের একটি প্রসিদ্ধ পল্লী; গ্রামে একটি পুরাতন মঠ আছে। এই ‘মঠ’ হইতে “মঠবাড়ী” বা মঠ পাড়া নাম হইয়াছে।

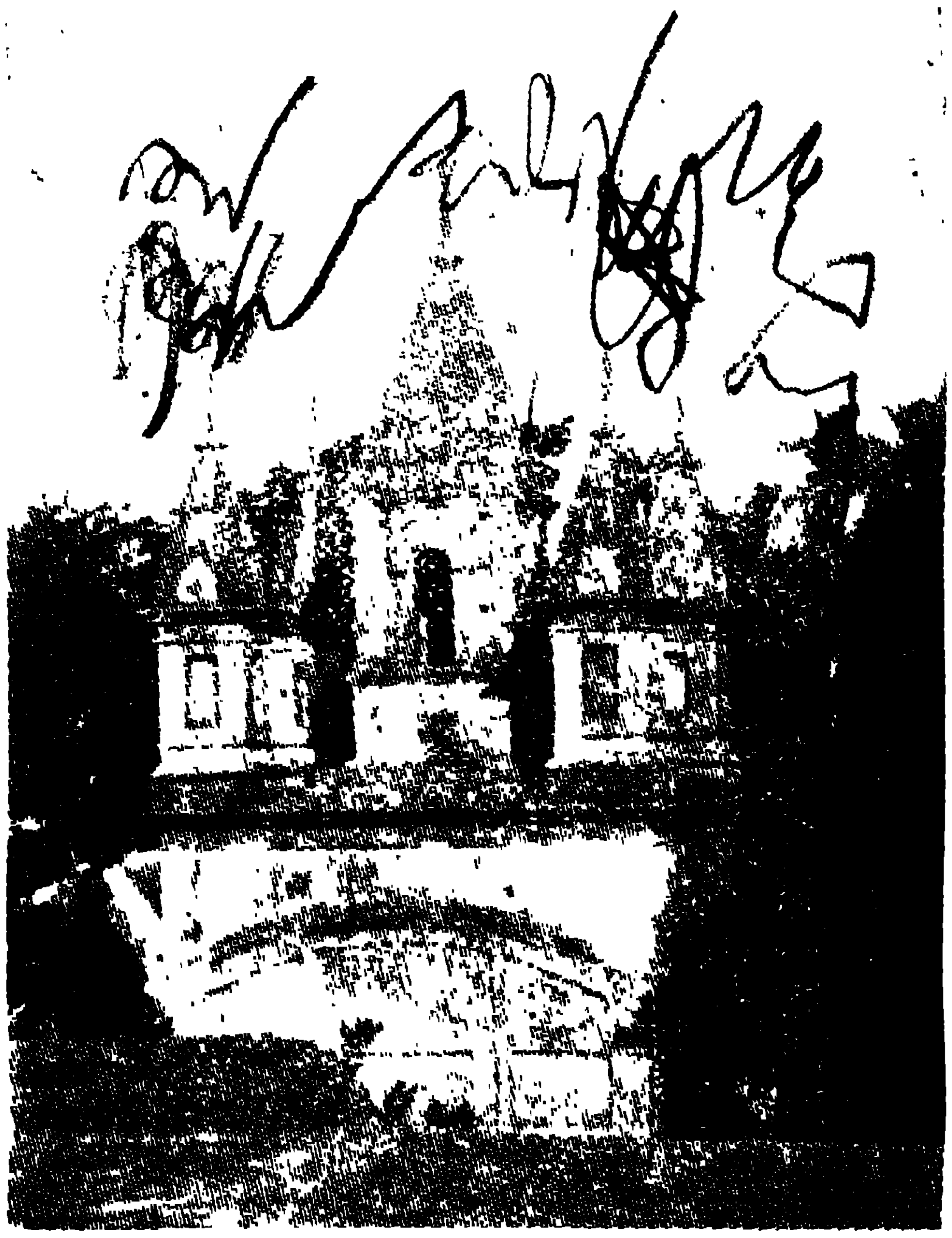

ইছাপুরা গ্রামের পঞ্চরত্ন মঠ

মঠটি কালবশে নিতান্ত জরাজীর্ণ এবং বৃহৎ বট-অশ্বত্থ প্রভৃতি বৃক্ষদ্বারা আচ্ছাদিত হইয়াছিল। মন্দির মধ্যে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত। জনশ্রুতি এই পূর্ব্বে শিবের দ্বারে দুইটি অজগর সর্প মঠ মধ্যে বাস করিত। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে একটি নিহত হয়, অন্যটির সন্ধান জানা যায় না। এই সব কাহিনীর কোন মূল্য নাই। মঠবাড়ী বা মঠপাড়ার পূর্ব্বাধিকারী কাশ্যপ গোত্রপ্রভব কৃষ্ণবল্লভ চক্রবর্ত্তী রাজারাম ও রামগোবিন্দ নামে দুই পুত্র বর্ত্তমান রাখিয়া

পরলোক গমন করেন। রাজারামেরও তিন পুত্র যথা—রামনারায়ণ, লক্ষ্মীনারায়ণ ও রূপনারায়ণ। লক্ষ্মীনারায়ণ 'মঠ' প্রতিষ্ঠাতা নিঃসন্তান। ৺লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্ত্তী তদীয় মাতৃদেবীর শ্মশানোপরি এই মঠটি নির্ম্মাণ করেন। মঠটির বয়স দুইশত বৎসরের উপর। মঠটির মধ্যে একটি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত। এই গ্রামেই বিখ্যাত ডাক্তার পণ্ডিত সূর্য্যকুমার চক্রবর্ত্তী জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার কথা বারান্তরে বলিব

দুয়াল্লীর মঠ

ইছাপুরা গ্রামের পঞ্চরত্ন মঠ—ইছাপুরা গ্রামের পঞ্চরত্ন মঠটি সুন্দর কারুকার্য্যখচিত ও দর্শনীয় বটে। বঙ্গাব্দ ১১৬৫ সনে ইহা প্রতিষ্ঠিত। প্রায় দুইশত বৎসরের পুরাতন। এই মঠটি সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত গঙ্গাধর তর্কালঙ্কার কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই বংশ দুইশত বৎসরে পূর্ব্ব হইতে ইছাপুরা গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। গঙ্গাধর তর্কালঙ্কারের পিতা স্বর্গীয় মণিরাম বন্দ্যোপাধ্যায় ইছাপুরা গ্রামে আসিয়া বাস করিতে থাকেন। ইহাদের আদি নিবাস ছিল কালীপাড়া। এ বংশের পূর্ব্বপুরুষগণ শাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্য প্রকাশ করায় 'ভট্টাচার্য্য' এই আখ্যায় অভিহিত হইয়াছিলেন। তর্কালঙ্কার মহাশয় তৎকালে ন্যায়শাস্ত্রে বিক্রমপুরের একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন। মহারাজা রাজবল্লভের তখন অখণ্ড প্রতাপ, সর্ব্বোপরি তিনি ছিলেন অত্যন্ত বিদ্যোৎসাহী। দেশের প্রখ্যাতনামা পণ্ডিতবর্গের প্রতি তাঁহার অসাধারণ শ্রদ্ধা ও ভক্তি ছিল, বহু পণ্ডিতই তাঁহার অর্থসাহায্যে পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছিলেন এবং ধনে জনে সমাজে শ্রেষ্ঠ স্থান লাভ করিতে পারিয়াছিলেন। মহারাজা রাজবল্লভ পণ্ডিত মহাশয়ের শাস্ত্রজ্ঞানে এতদূর সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন যে, তাঁহার বাস্তবাটি নির্ম্মাণ করিবার জন্য বহু জমি এবং প্রায় ত্রিশচল্লিশ বিঘা নাল জমি ব্রহ্মোত্তর নিষ্কর দান করেন। পরে তাঁহার উত্তরাধিকারিগণকেও একটি চতুষ্পাঠী বাড়ী নির্ম্মাণ করিবার জন্য দশখানা বাড়ী ও পাঁচখানা নালজমি নিষ্কর ব্রহ্মোত্তর দান করেন। তর্কালঙ্কার মহাশয়ের প্রতি মহারাজা রাজবল্লভের এইরূপ শ্রদ্ধার ভাব ছিল যে, তিনি তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তৎকালীন মাসিক ৩০০৲ তিনশত টাকা আয়ের সম্পত্তি নিষ্কর ব্রহ্মোত্তর দিতে চাহিয়াছিলেন। তর্কালঙ্কার মহাশয় মহারাজার এই দানের কথা শুনিয়া বলিয়াছিলেন: "যদি আমি এইরূপ দান গ্রহণ করিয়া আমার ভবিষ্যদ্বংশীয়দের জন্য ধন-সম্পত্তি রাখিয়া যাই, তাহা হইলে তাহারা ঐশ্বর্য্য গর্ব্বে স্ফীত হইয়া অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় মনোযোগী হইবে না।" অপর একজন প্রখ্যাতনামা ধনী ব্যক্তি তাঁহার পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার বাটীতে একখানা দালান নির্ম্মাণ করিয়া দিতে চাহিয়াছিলেন, তদুত্তরে তর্কালঙ্কার মহাশয় বলিয়াছিলেন, "পণ্ডিত ব্যক্তির রাজসিক ঐশ্বর্য্যের কোনও প্রয়োজন নাই। পর্ণকুটিরই উপযুক্ত স্থান। আপনি দালান নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন বটে, কিন্তু আমার মৃত্যুর পর যখন বংশধরগণের মধ্যে উহা লইয়া বিষম কলহ বাঁধিবে, তখন কে সেই গোলযোগ নিষ্পত্তি করিবে? ঐশ্বর্য্যের প্রলোভন বড় ভয়ঙ্কর। আপনার এ মহত্ত্বের জন্য আমি আপনাকে আশীর্ব্বাদ করিতেছি ও ধন্যবাদ দিতেছি। আপনি ক্ষুণ্ণ হইবেন না। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরূপে থাকাই ভাল।"

তর্কালঙ্কার মহাশয় একদিকে যেমন মহা সাধু পণ্ডিত ছিলেন, তদ্রূপ চরিত্র গুণেও অতিশয় আদর্শ পুরুষ ছিলেন। একবার তাঁহার বাড়ী ডাকাতে আক্রমণ করে, সে সময় তিনি পঞ্চরত্ন মঠটি নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে শিবলিঙ্গ স্থাপন করিয়াছেন। ডাকাতদল কোনরূপেই

বেতকার কালীমন্দির

বাড়ীতে প্রবেশ করিতে পারিতেছে না, যে দিকে যায় সেই দিকেই কণ্টকময় রুদ্ধ পথ। পরদিন প্রভাত হইলে ডাকাতগণ চীৎকার করিয়া বলিয়া গেল, "তোদের দেবতা -সাধন আছে, তাই আজ রক্ষা পাইলি। চাল, ডাল দান করিস্। ঐ সময় হইতেই তর্কালঙ্কার মহাশয় স্বোপার্জ্জিত 'নাগর ভানা', 'বাইরগাও' প্রভৃতি মহাল বার্ষিক অতিথিসেবা ও দেবদেবীর পূজার জন্য নির্দ্দেশ করিয়া যান।

গঙ্গাধরের পুত্র গৌরীকান্ত তর্কবাগীশ ন্যায়শাস্ত্রে বড় পণ্ডিত ও তৎপুত্র কমলাকান্ত তর্কসিদ্ধান্ত ও রুক্মিণীকান্ত তর্কচূড়ামণি ও কাশীকান্ত ন্যায়পঞ্চানন ন্যায়শাস্ত্রে বড় পণ্ডিত ছিলেন। এই মঠের প্রতিষ্ঠাকালের সম্পর্কে একটি খোদিত লিপি আছে।

বেত্কা একসময়ে একটি প্রসিদ্ধ পল্লী ছিল। এই গ্রামে অনেক খ্যাতিমান্ ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এখানে সেকথা নয়। এই গ্রামে একটিমাত্র দেবালয় আছে। সেইটি হইতেছে কালীবাড়ী। প্রায় দ্বিশত বৎসর পূর্ব্বে এই মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কথিত আছে ৺বারাণসী ধাম হইতে কোন এক ব্যক্তি প্রস্তরময়ী তিনটি কালীমূর্ত্তি এদেশে বিক্রয়ার্থ আনয়ন করেন। তিনি অতি সহজে দুইটি মূর্ত্তি বিক্রয় করিয়া অপর মূর্ত্তিটি কোন প্রকারেই বিক্রয় করিতে সমর্থ হন না। অবশেষে তাঁহার প্রতি স্বপ্নাদেশ হয় "তুমি বেতকা নিবাসী আমার ভক্ত কালিদাস চাটাতির নিকট আমাকে রাখিয়া আইস, আমি তাহার নিত্য পূজায় বিশেষ সন্তোষলাভ করিব। এইরূপ স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া ঐ ব্যক্তি ৺কালিদাস চাটাতির নিকট উপস্থিত হইয়া স্বপ্ন বিবরণ প্রকাশ করিলে চাটাতি মহাশয় অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া বলিলেন, "আমি গরিব ব্রাহ্মণ, মাত্র ৩৲ টাকা বেতনে চাকুরি করি, আমি মার নিত্য সেবা কিরূপে চালাইব? এইরূপ বলিয়া দেবমূর্ত্তি গ্রহণে অস্বীকার করিলে তাঁহার প্রতিও নাকি স্বপ্নাদেশ হয়। অতঃপর কালিদাস চাটাতি মহাশয় মূর্ত্তি প্রদাতাকে ৭৲ সাতটাকা প্রদান করিয়া অতিশয় ভক্তি ও যত্নসহকারে দেবীমূর্ত্তিসহ দেশে আগমন করেন এবং স্বপ্নাদেশ অনুসারে একটি পুষ্করিণী খনন করান, কথিত আছে তিনি ঐ পুকুরে

বেদগাঁওয়ের কালীমন্দির

গণেশ, কালভৈরব ও একটি শিবলিঙ্গ ও কিছু ধন প্রাপ্ত হন। উল্লিখিত ধন দ্বারায় তিনি তাঁহার পিতৃ ও মাতৃ শ্মশানোপরি দুইটি ক্ষুদ্র ইষ্টক মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া তাহার একটির মধ্যে শিবলিঙ্গ ও অপরটির মধ্যে কালিকা দেবীমূর্ত্তি ও প্রাপ্ত অপর দেবমূর্ত্তিসকল স্থাপন করিয়া জীবিতকাল পর্য্যন্ত নিজে পূজা করিতেন। চাটাতি মহাশয় অতিশয় ভক্ত ও ধার্ম্মিক ছিলেন, তাঁহার সন্তান-

সন্ততি কেহই ছিল না। তিনি তাঁহার ভদ্রাসন বাড়ী পর্য্যন্ত কালিকাদেবীর নামে উৎসর্গ করিয়া যান।

কালক্রমে চাটাতি মহাশয়ের নির্ম্মিত মন্দির ভগ্ন হইলে ৺মহিমচন্দ্র মুখুটি মহাশয় বিশেষ উদ্যোগ করিয়া বিজনীরাজ-দুহিতা বগড়ীবাড়ীর জমিদার পত্নী ৺ভদ্রেশ্বরী চৌধুরাণীর নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহপূর্ব্বক নূতন মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। স্থানীয় ব্যক্তিগণের অভিপ্রায়ানুসারে ঐ নব নির্ম্মিত দালানের এক প্রকোষ্ঠে শিবলিঙ্গ ও অপর প্রকোষ্ঠে অপরাপর দেবমূর্ত্তিসহ কালিকাদেবীর মূর্ত্তি সংস্থাপিত করেন। উক্ত মন্দির গাত্রে প্রস্তর ফলকে নিম্নলিখিত শ্লোকদ্বয় উজ্জ্বল অক্ষরে লিপিবদ্ধ থাকিয়া ৺ভদ্রেশ্বরী চৌধুরাণীর দানশীলতার পরিচয় প্রদান করিতেছে।

"আসাম দেশে শিববংশজাতো।
বীজনীশ্বরোভূপ বাহাদুরোয়ঃ॥
ইন্দ্রাদি নারায়ণ দেব আসীৎ।
সাক্ষাৎ দিবেন্দ্রস্তনব্যবতারঃ॥

ভদ্রেশ্বরী দেবীচৌধুরাণী শ্রীমতী—শ্রীমতিঃ সদা। পর্ব্বজ্জোয়ায় বাস্তব্যা তৎ কন্যা ভক্তি ভাবতঃ। কাল্যাঃ কৈবল্যদায়িন্যাঃ শাক মৈতেন্দ্র সম্মিতে। নির্ম্মায় মন্দির মিদং প্রতিষ্ঠিত মথাকারিণ॥

বেজগাঁ গ্রামের প্রস্তরময়ী কালী মূর্ত্তি বহু দিনের প্রাচীন। এ গ্রাম বহু কৃতী সন্তানের জন্মভূমি। কালী মন্দিরটির অবস্থা ভাল। ভগ্ন ও জীর্ণ নহে। বেশ সুরক্ষিত। এ গ্রামের সতীঠাকরুণের মঠ সম্বন্ধে ইংরাজী ও বাংলা সাময়িক পত্রে বহুবার আলোচনা করিয়াছি। অন্যান্য প্রাচীন কালী মন্দিরের মধ্যে ক্ষিতির পাড়া, মুন্সীগঞ্জ, বজ্রযোগিনী, যোলঘর, বেতকা, ফেগুনাসার, দ্বিপাড়া চাচরতলা প্রভৃতি প্রসিদ্ধ। চাচরতলার কালীবাড়ী পদ্মাগর্ভে বিলীন হইয়াছে।

বিক্রমপুরের কার্ত্তিকবারুণীর মেলা এক সময়ে বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল। বহু বৎসর হইল তাহার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়াছে। নদীর গতি পরিবর্ত্তন, সময়ের পরিবর্ত্তন, নূতন বন্দর ও সহর গড়িয়া উঠাও তাঁহার অন্যতম কারণ।

কাউয়ামারার মেলা এক সময়ে বিক্রমপুরে বিশেষ বিখ্যাত ছিল। কাউয়া মারা (কাউয়া কাক) স্নান মেলার সময় অন্যুন দশ বারো হাজার লোক সমবেত হইত। "কর্দ্দম সলিল-স্নাত ভক্তজনের ধর্ম্মোন্মাদনা, সাধু-সন্ন্যাসীদের ভগবৎ-গুণানুকীর্ত্তন, হরিধ্বনিসহকৃত মুহুর্মুহুঃ হুলুধ্বনি অত্যল্পকালের জন্য স্থানটিকে স্বর্গীয় সম্পদে পরিপ্লুত করিয়া তুলিত। সময়োপযোগী রুচিসম্মত আমোদ-প্রমোদের অনুষ্ঠান এবং নানা প্রকার প্রয়োজনীয় ও উপভোগ্য দ্রব্য সামগ্রীর সমবায়ে স্নানের মেলাটি জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকল শ্রেণীর নরনারীগণের মনোহারিণী হইত। তখন মেলাক্ষেত্রে সর্ব্বত্র যেন একটা জীবন্ত উৎসাহের প্রস্রবণ বহিতে থাকিত।"

বিক্রমপুরে কালাপাহাড়তলা নামে প্রসিদ্ধ দুই একটি স্থান দেখা যায়। কলমা গ্রামের প্রসিদ্ধ কালাপাহাড়তলা একটি বিশালকায় প্রাচীন বট গাছের, নিম্ন ভাগকে বলা হয়। কিছুদিন হইল মূল বৃক্ষটি মরিয়া গিয়াছে।

এখানে সংক্ষেপে কিছু কিছু পরিচয় দিলাম, ক্রমশঃ আরও দিব। বিক্রমপুরবাসী যে যেখানেই থাকুন না কেন, নিজ নিজ গ্রামের গৌরব মঠ, মন্দির, দেবায়তন প্রভৃতির পরিচয় পাঠাইলে উপকৃত হইব।

সংঘাত

শ্রীতপন দাশ

ট্রেণটা একটানা এতক্ষণ ছুটেই বোধহয় অত্যন্ত হাঁপিয়ে পড়েছিল, আর তাই বোধহয় থেমে পড়ল। আধ ঘণ্টার মত বিশ্রাম নিতে সময় লাগবে। বেশ লাগছিল এতক্ষণ, অন্ধকারের বুক চিরে অজগরের মত বেপরোয়া, একগুঁয়ে ছুটছিল আর জানালার সরু ফাঁক দিয়ে প্রবেশ করছিল শীতের ধারালো হাওয়া। যদিও গায়ে ছিল অনেকগুলো, ভেতরে সেমিজ- তার ওপর সার্জ্জের ব্লাউজ, শাড়ী, উপরন্তু একটা মোটা স্কার্ফ; এতেও তেমন সুবিধে হয়নি, হাড়ের ভেতর পর্য্যন্ত কন্‌কন্ করছিল।

ট্রেণটা যখন থামলোই, তখন বসে না থেকে আপাতত উদর পূর্ত্তির ব্যবস্থাটা সমাধা করলে মন্দ হয় না। সেই কখন দুপুরে খেয়েছিল, তারপর বিদেশ যাত্রার আনন্দে খাওয়ার কথা মনেই নেই। বার্থের ওপর থেকে টিফিন কেরিয়ারটা নামিয়ে নিল শ্রীমতী। এক ভাঁড় চা'ও সংগ্রহ করল যথারীতি।

এক হাট লোকের সুমুখে নির্লজ্জের মত গোগ্রাসে গিলে যাওয়া বড় মর্ম্মান্তিক লজ্জাকর শ্রীমতীর কাছে। কিন্তু নিরুপায়! কামরার এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পর্য্যন্ত একবার দৃষ্টিটা বুলিয়ে নিলে শ্রীমতী। যাত্রীদের মধ্যে অনেকে ঘুমন্ত অথবা অর্দ্ধ-জাগ্রত। শুধু ওপাশের দেওয়ালের ধার ঘেঁসে একটি লোক বসেছিল র‍্যাপারে আপাদ-মস্তক ঢেকে, নাক আর চোখ দুটো ছিল শ্রীমতীর দিকে। যেন নিখুঁত ভাবে শ্রীমতীকে পর্য্যবেক্ষণ করছিল। ভাল লাগলো না শ্রীমতীর লোকটাকে, তা ছাড়া লোকটার জন্যে ভাববার বয়ে গেছে তার। হোক লজ্জাকর; এদিকে পেটের মধ্যে বাপান্ত সুরু হয়ে গেছে। যত আজে-বাজে ভাবতে ভাবতে চা'টাও জুড়িয়ে গেল। লৌকিক লজ্জাটাকে বিসর্জ্জন দিয়ে শ্রীমতী তখন সেদ্ধ ডিমটাতে একটা কামড় বসিয়ে দিয়েছে।

ট্রেণ ছাড়বার সময়ও হয়ে এলো।

মেল ট্রেণের স্পীড কতো শ্রীমতীর তা জানা নেই, তবে আন্দাজে যতদূর মনে হয়, পঞ্চাশ থেকে ষাট মাইলের মতো হবে। গাড়ীর দোলানিতে ঘুম পেয়ে যায়। কোলকাতা থেকে কত দূরে চলে এসেছে কে জানে! কোলকাতার কথা মনে হতেই মনটা হু হু ক'রে উঠল আর পিসিমার জন্যে চোখ দুটো এলো ছলছলিয়ে, আসবার সময় পিসিমা বলেছিলেন "বিদেশ-বিভুয়ে যাচ্ছিস, সাবধানে থাকবি। কি পোড়া ভাগ্যি নিয়েই জন্মেছিলি, মেয়েছেলে হয়ে এই কাঁচা বয়েসে চাক্‌রীর জন্যে বিদেশ পাঠাতে কি আমার ইচ্ছে?" বলতে বলতে পিসিমার দু'চোখে নেমেছিল ফল্গুধারা। এতক্ষণে পিসিমা হয়ত শুয়ে শুয়ে তারই কথা ভাবছেন আর চোখের জলে মাথার বালিস ভিজছে; আজ রাতে আর ঘুমই হবে না পিসিমার। সেই একরত্তি বয়েস থেকেই পিসিমার কোলে-পীঠে মানুষ হয়েছে শ্রীমতী, জ্ঞান হবার আগেই মা স্বর্গলাভ করেছিলেন, তারপর আর কিছুদিন পরেই বাবাও। সংসারের মধ্যে রইল শুধু ঐ বিধবা পিসিমা। কেবল বাবার ইচ্ছাতেই শ্রীমতীর লেখা-পড়ার দিকটা স্কুলের গণ্ডি পেরিয়ে কলেজের চৌকাঠ মাড়িয়েছিল; একদিন তাও শেষ হয়ে গেল। সামান্য গচ্ছিত পোষ্ট-আপিসের কয়েকটি টাকায় সামান্য ক'টা দিনের মতো চললো। এরপর তাও গেল ফুরিয়ে, সামনে তখন উপবাস ছাড়া গত্যন্তর নেই। চিন্তার অবিরাম আবর্ত্তের প্যাঁচে পড়ে শ্রীমতীর চেহারা দু'দিনে ফ্যাকাসে হয়ে গেল। অন্ধকারে ক্ষীণ আলোর মতো একটা কথা মনে পড়েছিল শ্রীমতীর। মনে পড়েছিল ঘাটশীলার বনশ্রীকে। কোন এক পশ্চিমের পাহাড়ী জায়গায় সে একটা শিক্ষা-নিবাসে চাকরী করত। কলেজের বন্ধুদের মধ্যে বনশ্রীই ছিল শ্রীমতীর একান্ত অন্তরঙ্গ। ঠিকানাটা মনে ছিল; তাই লিখেও দিয়েছিল একটা চিঠি, দুঃখের সমস্ত কথাই

ব্যক্ত করেছিল চিঠির মধ্যে। ভগবান বোধহয় ভাগ্যের রাশটা একটু আল্‌গা করেই ধরেছিলেন সেই সময়। চিঠির জবাব এল সাতদিন পরেই। জরুরী তলব, চাক্‌রী একটা খালি আছে। মাইনে প্রথমে শ'খানেক টাকা, আর খাওয়া-থাকার সমস্ত ব্যবস্থাই আছে। ভাগ্যের জোর বলতে হবে। শ্রীমতী চিঠি পেল সকালে আর দুপুর না গড়াতেই মনস্থির ক'রে ফেলল, আজই রওনা দিতে হবে। শুভস্য শীঘ্রম্! অগত্যা নিজেকে প্রস্তুত ক'রে নিতে দেরী হ'ল না।

ট্রেণটা বোধ হয় কোন সেতুর উপর দিয়ে চল্‌ছিল। গম্ গম্ শব্দে শ্রীমতীর চমক ভাঙল; মনে হ'ল এতক্ষণ বোধ হয় সে ঘুমিয়ে প'ড়েছিল। সামনের সেই লোকটাও ঘুমিয়ে পড়েছে, এ পাশের থেকে অবিশ্রান্ত নাক ডাকার শব্দ শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। কত রাত এখন? হয়ত দুটো অথবা আড়াইটে হবে। ছোট্ট এ্যাচাটি কেসটা নিজের কোলের মধ্যে টেনে নিয়ে দু' হাঁটুর ওপর থুতনীটা আলতো ভাবে স্থাপন করে চোখ বুজল শ্রীমতী। ঘুমিয়ে পড়ল।

ট্রেণটা একটা বিরাট ঝাঁকানি খেয়ে থেমে গেল। সকালটা তখন অনেকটা ঘনো হয়ে গেছে। শ্রীমতীর ঘুম ভাঙলো; জানালার সরু ফাঁকটা দিয়ে এক চিলতে উজ্জ্বল হল্‌দে রোদ্দুর এসে লাগলো শ্রীমতীর চোখে। সকালের উষ্ণ রোদ। হাতের উল্টো পীঠ দিয়ে চোখ দুটো রগড়ে নিয়ে আড়মোড়া ভেঙে নিল।

—তাই ত, কোন্ ষ্টেশন এটা?

—বাইরের দিকে চেয়ে শ্রীমতী ইতস্ততঃ অন্বেষণ করল কয়েকবার, তারপর নজরে পড়ল প্ল্যাট ফরমে বিলিতি মাটির বাধানো ফলকটার ওপর। এক পলক নজর দিয়েই শিরদাঁড়া সোজা করে উঠে দাঁড়াল। ভগবানকে ধন্যবাদ দিল ঠিক সময়ে ঘুম ভাঙার জন্যে। গন্তব্য জায়গায় পৌছে গেল শ্রীমতী। এ্যাটাচি কেসটা তুলে নিয়ে নেমে পড়ল তাড়াতাড়ি।

—শ্রীমতীর চোখে সমস্তই আনকোরা মনে হ'ল। মাটি, আকাশ—সমস্ত।

—ষ্টেশন থেকে মাইল ছ'য়েকের পথ। পাথুরে লাল মাটির রাস্তা, দূরে—ধোঁয়াটে পাহাড়ের শ্রেণী। ধূ ধূ প্রান্তর, গায়গাটার নাম মৌ-পাহাড়ী। দুল্‌কি চালে চলছিল গরুর গাড়ীটা, গাড়োয়ান তালু আর ওষ্ঠের সংযোগে উৎসাহ দিচ্ছিল বলদ জোড়াকে, গলায় বাঁধা পেতলের ঘণ্টা বাজছিল ঠুন্ ঠুন্......শ্রীমতী বসেছিল হাঁটু দুটোকে জড়িয়ে সঙ্কির্ণ হয়ে। অনেক—অনেক দূরে আকাশটা দুমড়ে মিশে গেছে মাটির সঙ্গে, ঐ আকাশের ওপাশেই আছে হয় ত তার পুরাণো ধূসর দিনগুলো। কোলকাতার মণি মিত্র লেনের সঙ্কির্ণ খুপরী ধূলো ধোঁয়া আর কোলাহল। পিসিমা, রান্নাঘরের সেই ঝুলপড়া ইলেকট্রিক বাল্‌বটা, যেটা অন্ধকারে ভূতের চোখের মতো জ্বলতো, সেই পারাওঠা আয়নাটা রোজ যেটাতে তাকে সকালে নতুন করে আবিষ্কার করতে হ'ত ব্যক্তিগত অস্তিত্ব। আর সেই কলেজের পুরাণো ছেঁড়া বইগুলো, ছেঁড়া ক্যালেণ্ডারের মলিন রবীন্দ্রনাথ আর রামকৃষ্ণ। অসংখ্য পেরেকের দাগে ক্ষতবিক্ষত দেওয়ালে পেন্সিলে লেখা কোন এক আধুনিক কবির কয়েকটা ছত্র—লাইনটা শ্রীমতীর মনে আছে—"কতো না কথার ঢেউ, কতো না রঙিণ ছলোছলো ভালবাসা দিয়েছে সে নীরবে ঝরিয়ে—তোমার মনের দ্বীপে"। কোন কাগজে যেন বেরিয়েছিলো?—কে জানে কেন ভাল লেগেছিল ছত্রটা; ছেঁড়া কাগজের টুক্‌রো থেকে তাই লিখে রেখেছিল দেওয়ালে।

—অনেকটা পথ পার হয়ে এসেছে ইতিমধ্যে। ফাঁকা মাঠের হাওয়াটা কাণের পাতায় ধাকা দিচ্ছে পাইনের পাতার ঘর্ষণে—মনে হচ্ছে এর সঙ্গে যেন মিশে আছে প্রান্তরের গান, যেটুকু দীর্ঘশ্বাসে ভরা। মাঠের বুকে যেন সমুদ্র গর্জিয়ে উঠল হঠাৎ। উঁচু নীচু সবুজের ঢেউ, আন্দোলিত যবের শীষে শ্রীমতীর চোখে সমুদ্রের ভ্রম হয়েছিল। একটা আত্মনীপিড়নের উদগ্র উত্তেজনায় শ্রীমতীর শরীর কেঁপে উঠলো। কাগজ কলম পেলে এখুনি সে আস্ত একটা কবিতা লিখতে পারে। সেই

মুহূর্তে নিজেকে ভাবুক বলে মনে হোল। মিথ্যে মনে হোল জীবনের সমস্ত অভাব অভিযোগ, কিন্তু কি ছাই লিখবে! সমারোহের আতিশয্যে সব যাবে ঘুলিয়ে। আনন্দে শ্রীমতী গান গেয়ে উঠল। রবি ঠাকুরের এক-খানা গান।

—পাড়োয়ানটা কি ভাবছে কে জানে!

—ছবিতে আগে অনেক দৃশ্য দেখা গেছে বটে, কিন্তু সে শুধু ছবিই। সেলুলয়েড অথবা ক্যান্‌ভাসে ধরা পড়ে মরে ম্যমি হয়ে গেছে সেগুলো। এর কাছে কতো তুচ্ছ তা। আকাশ পাতাল! যেন এক টুকরো কার্পাস তুলোর মতো হাল্কা মনে হচ্ছে নিজেকে।

পাশ দিয়েই চলে গেছে সাউথ্‌ হিল রোড, সোজা চলে গেছে কুচবিহার। ছোট ছোট কয়েকটা ম্যাস্‌-বেষ্টারের ছাউনি আর পাকা দেওয়ালের আলাদা আলাদা ঘর— আর কিছু দূরেই ঐ একই ধাঁচে গড়া অপেক্ষাকৃত কিছু বড় বাড়ীটাই বিদ্যাভবন, বিভিন্ন ধনীর মাসিক আর বাৎসরিক দানের ওপর নির্ভর করেই চলে ওটা। হিসেব পত্তর দেখার জন্যে আছেন এক সিন্ধি ভদ্রলোক, বয়েসটা প্রৌঢ়ত্বে পৌছলেও জল-হাওয়ার গুণে শরীরে যথেষ্ট বাঁধুনি বর্তমান। পরিষ্কার ইংরেজী আর চালিয়ে নেবার মতো ভাঙা বাংলা বলতে পারেন। মনের দিক থেকে তিনি উদার, অমায়িক; ব্যবহারিক ভাবে কথা বলেন অল্প। ভদ্রলোকের বই পড়ার ঝোঁক ভীষণ! পৃথিবীর অধিকাংশ সাহিত্যিক দার্শনিক আর কবির বইয়ের একটা ছোটেখাটো লাইব্রেরী তিনি গড়ে তুলেছিলেন। প্রত্যেকের নিজস্ব একটি করে আলাদা ঘর। সিন্ধি ভদ্র-লোকের নাম মোহন চন্দ্র। তাঁর বাসার পেছন দিকে যে উত্তরমুখো ঘরখানা ওটাতে থাকেন সুপারিন্‌-টেন্‌ডেণ্ট শিখা বোস। দক্ষিণেরটা—বনশ্রীর। প্রথম দিন এসে পশ্চিমে বাঙালী প্রীতিতে শ্রীমতী অবাক্‌। বনশ্রীর ঘরখানা সত্যিই লোভনীয়। দক্ষিণের চওড়া জানালাটা খুলে দিলেই নজরে পড়ে ছবির মতো তিন পাহাড়ীর চুড়োটা—পাইনের জঙ্গল, মসৃণ মাঠ!

একটা ইজি চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে শ্রীমতী তাকিয়ে ছিল জানালার ফ্রেমের মধ্যে দিয়ে বাইরে, দৃষ্টিটাকে প্রসারিত করে দিয়েছিলো দূরের ইউক্যালিপটাসের সরু মাথাগুলোর মধ্যে দিয়ে যেখানে অস্তমান সূর্য্যের শেষ কমলা রঙ আকাশটাকে রাঙিয়ে দিয়েছিল, প্রকৃতির রঙিন প্রচ্ছদপটে ব্যাকগ্রাউণ্ড সৃষ্টি করেছিল পাহাড়ের ধূসর ফলাটা। ম্রিয়মান আলোক অপূর্ব্ব লাগছিল। বনশ্রী বসেছিল হাতলটার ওপরে।

—"যাই বলিস, তোর এই ঘরখানা আমাকে একান্ত ভাবে কায়েমী করতে হবে"—শ্রীমতী বলল। উচ্ছ্বাস প্রকাশ পেল কথার সুরে।

—"ইস, তাই নাকি?" উজ্জ্বলতা প্রকাশ করল বনশ্রীর বলার ভঙ্গিটা। "কি রকম লাগছে তোর?"

—"অপূর্ব্ব!" আবেগ ঝরল এবার শ্রীমতীর কথায়। "আসলে খুব ভালো, অতি সুন্দর—এই রকম বিশেষ প্রকাশ করে উচ্ছ্বাস জানালে মিথ্যে বলা না হলেও বাজে কথা হবে। আমি ভালবেসে ফেলেছি এ জায়গাটাকে।"

—"তার মানে প্রেমে পড়েছিস?" কথার ভঙ্গিতে দুজনেই হেসে ফেলল

—কি একটা কাজে বনশ্রী বেরিয়ে গেল।

—শুধু পিসিমার জন্যে মন খারাপ হয়ে যায় মাঝে মাঝে।

—একটু পরেই মোহনচন্দ্র এলেন, শ্রীমতী তখন কি একটা বইয়ের প্রতি মনোযোগ দিয়েছিল।

"কি বই পড়ছেন?" মোহনচন্দ্র বসলেন সামনের বেতের মোড়াটায়।

—"এটা মোঁপাসার একটা বই।" শ্রীমতী বইখানা পাশে রাখল। সৌজন্যপূর্ণ হেসে নমস্কার করল শ্রীমতী। প্রতিনমস্কার করল মোহনচন্দ্র।

—"ফরাসী সাহিত্য আমারও পড়ার ঝোঁক আছে; সাহিত্যের দিক দিয়ে ফরাসী সাহিত্যের দানই বোধ হয় পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম। কিছু বই আমার সংগ্রহের মধ্যেও আছে, দরকার হলে পেতে পারেন। সমজদারের অভাবে আলোচনা সরস হয় না।"

—"অশেষ ধন্যবাদ।" কথার মধ্যে কৃতজ্ঞতা মিশিয়ে শ্রীমতী বলল। "নিঃসঙ্গ জীবনে বই একমাত্র একাকিত্বের অবসান ঘটাতে পারে।"

—"কথাটা নির্জ্জলা সত্যি।" কথার মোড় অন্যদিকে ঘুরিয়ে মোহন চন্দ্র বললেন—"কর্ম্মক্ষেত্র লাগছে কেমন?" নতুন জায়গায় প্রথম প্রথম অসুবিধে হবে। তবে দরকার মাফিক যখন যা চাই তা জানাতে ভুলবেন না। বনশ্রী দেবী একরকম মানিয়ে নিয়েছেন।"

—"একটু আগেই ও· সম্বন্ধে আমাদের কথা হচ্ছিল, কোন অসুবিধেই নেই আমার"—শ্রীমতী বলল।

—একটি বছর চৌদ্দ বয়সের ছেলে ট্রেতে চা নিয়ে এল।

—ছেলেটি খুব চটপটে। টিপয়ের ওপর ট্রে নামিয়ে রাখল।

—সূর্য্য তখন পাহাড়ের আড়ালে সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয়ে গেছে। ঈষৎ আভাটা এখনো আকাশের কয়েক টুকরো মেঘের স্তরে ছড়িয়ে আছে।

দূর থেকে অস্পষ্টভাবে কিসের একটা শব্দ যেন ক্রমশঃ এগিয়ে আসছে বলে মনে হোল। কান খাড়া করে শব্দটাকে অনুধাবন করে শ্রীমতী বলল, "বোধ হয় ঘোড়ার খুরের শব্দ? তাই না?"

—"হ্যাঁ, ওটা তাই বটে; নিঃশেষিত চায়ের পেয়ালাটা নামিয়ে মোহন চন্দ্র বললেন—"ভদ্রলোক বাঙালী, যুবক। ছিটগ্রস্থ—আর অদ্ভুৎ রহস্যজনক। খাম·খেয়ালী।"

"ছিটগ্রস্থ! ভদ্রলোক পাগল নাকি?" শ্রীমতীর কথা বলার ভঙ্গিতে এক সঙ্গে কৌতুক আর কৌতূহল দুটোই প্রকাশ পেল। মোহন চন্দ্র হাসলেন।

—"তা নয় ত কি! রাত নেই দিন নেই, সময় অসময় নেই, যখন খুসী ঘোড়া ছুটিয়ে বেড়ান, কখনো কখনো গভীর রাত্রে কুকুর নিয়ে পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে বেড়ান আর নিজের মনে আবোল তাবোল কি সব বলেন। তাইতে বেশ সন্দেহ হয় মস্তিষ্ক সম্বন্ধে!"

—"ভারি আশ্চর্য্য ত'।" শ্রীমতীর কৌতূহলটা শেষ হয়নি তখনো।

—ইতিমধ্যে বনশ্রী ফিরে এল। মোহনচন্দ্র নমস্কার জানিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

—"তোদের এই পাণ্ডব-বর্জ্জিত দেশে রূপকথার রাজপুত্রের সন্ধানও মিলে যায় কখনো কখনো।" শ্রীমতী বনশ্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে বলল কথাটা।

—"হটাৎ রাজপুত্র প্রসঙ্গ?—খোয়াব দেখতে সুরু করলি নাকি জেগে জেগে?"

—"না খোয়াব নয়—তায় আবার উন্মাদ রাজপুত্র ঘোড়া ছুটিয়ে রাজকন্যাকে খুঁজে বেড়ান রাত বিরেতে। বেচারা রাজপুত্র বোধ হয় রাজকন্যার বিরহেই পাগল হয়ে গেছে।" অসমাপ্ত কথার জের টেনেই শ্রীমতী হেসে উঠল খিল খিল করে।

—কতকটা আন্দাজে বুঝল বনশ্রী—"ও—তুই সৌরাংশু বাবুর কথা বলছিস্? তা ভদ্রলোক উন্মাদ ত' বটেই, তায় আবার রহস্য জনক!'

—অত্যন্ত অবাক হয়ে শ্রীমতী বলল—"তুই দেখছি আদ্যোপান্ত জেনেছিস্?"

কতকটা অবহেলার ভঙ্গিতে বনশ্রী বলল, "ঠিক আদ্যোপান্ত নয়, যেটুকু জানি তা ওপর থেকে ভাসা ভাসা। আমাদের বুড়ো চাকর সুখন আগে ওর কাছেই কাজ করত।"

—"ভদ্রলোক তবে খুব ইণ্টারেষ্টিং?"

—"গুণ আছে শুনেছি। ভদ্রলোক ভাল গীটার বাজাতে পারেন। রহস্যজনক আখ্যাটার পেছনে আছে বিক্ষিপ্ত কতকগুলো ঘটনা, যা সত্যিই করুণ, সময় মতো সুখনের কাছ থেকে শুনবি একদিন।"

—"ভদ্রলোক বোধ করি একাই থাকেন,বাংলোটায়?"

—"ঠিক একা নয়, সঙ্গে আরও একজন থাকেন, তিনি ডাক্তার। সুখন শুনেছে, অনেক রাত্রে ভদ্রলোক বাতাসের সঙ্গে কথা বলেন, কাঁদেন। ভূতের ভয়ে সুখন পালিয়ে এখানে চাকরি নেয়।"

—"ঠিক যেন রহস্যোপন্যাসের একটা অধ্যায়।"

—ততক্ষণে অন্ধকারে ছেয়ে গেছে চারদিক।

—"নে—আলোটা জেলে দে, বড্ডো অন্ধকার। আর কি হাড় কাঁপানো পাহাড়ে শীত!"—শ্রীমতী উঠে জানালার পাল্লাটা বন্ধ করে দিল।

—এরপর একটি মাস কেটে গেছে। পরিবেশটার পরিচিতি শ্রীমতীর কাছে অনেকটা পুরনো হয়ে গেছে। পাইনের বন, নুড়ি-পাথর, ইউক্যালিপটাস, বিদ্যাভবনের ছেলেমেয়ে, সুখন—সবাই পুরোনো হয়ে গেছে। প্রথম মাসের টাকা আর তিন পাতা সারগর্ভ চিঠি পাঠিয়ে দিয়েছে পিসিমাকে। মোহন চন্দ্রের অমূল্য-সংগ্রহগুলো একের পর এক শ্রীমতীর জ্ঞান বৃত্তটাকে ক্রমশঃ বাড়িয়ে দিচ্ছে। মোটের ওপর ভালভাবেই কেটে যাচ্ছে দিনগুলো।

—পাথুরে অপরিসর রাস্তাটা পাহাড়টাকে বেড় দিয়ে ক্রমাগত ওপর দিকে উঠে গেছে, পাশে অতল খাদের গভীরতাটুকু অন্ধকারে গেছে হারিয়ে। শ্রীমতী একাই বেড়িয়ে পড়েছিল দুপুরে। একা উদ্‌ভ্রান্তের মত ঘুরে বেড়াতে তার ভালো লাগে, গুঁড়ো গুঁড়ো ধুলো বাতাসের সঙ্গে সিল্কের কাপড়ের রঙটাকে গৈরীক করে দিয়েছে। একটু জিরিয়ে নেবার জন্যে পথের ধারে একটা ছিটকে পড়া গ্র্যানাইটের টুকরোর ওপর বসে পড়ল শ্রীমতী। মাথার ওপর পাহাড়ে একটা অংশ ঝুলে রয়েছে ছাউনির মতো। ভয় পেল শ্রীমতী। যেন ওটা এখুনি ভেঙ্গে পড়বে, তাকিয়ে রইল অনেকক্ষণ ওপর দিকে। একবার মনে হোল সত্যি যদি ভেঙে পড়ে তা' হলে কি হবে?—হবে আবার কি! মিশিয়ে যাবে। ধুলো হয়ে যাবে। কয়েক দিনের জন্যে রক্তের দাগ থাকবে, তারপর রোদে জলে তাও যাবে ধূসর হয়ে। এমনি করে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, বাতাসে মিশে থাকবে সামান্য একটু স্মৃতির গন্ধ।—যত সব আজে বাজে মরবিড্ ভাবনায় পেয়ে বসেছে তাকে…তার চেয়ে…?

চোখ ফিরিয়ে সামনের দিকে তাকাতেই যেন শ্রীমতীর বুকের হাড়গুলো এক সঙ্গে সরকে গেল; বিরাট একটা আলসেসিয়ান কুকুরের গলায় চেন লাগিয়ে যে মূর্ত্তিটাকে সামনে দেখতে পেল, ইতিপূর্ব্বে তার বৃত্তান্ত সে শুনেছিল, চাক্ষুষ দর্শন এই প্রথম। কুকুরটা আধহাত জিভ বের করে হাঁপাচ্ছে। আর কুকুরের রাশ ধরে যে লোকটি পলকহীন দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে শরীরের গঠন তার সুঠাম, দৃপ্ত মুখের দিকে তাকালে বলিষ্ঠ ইঙ্গিতের সুষ্ঠুভাব দেখা যায়, আবার দুটো চোখের খামখেয়ালীতে মনে হয় উন্মাদ! একটা অস্বস্তিকর পরিস্থিতি।

—শ্রীমতী যেন সম্মোহিত হয়ে গেছে, চোখের পলক পড়ছে না তার। লোকটি এগিয়ে আসছে ক্রমশঃ তার দিকে। অনেক কাছে এবার।—শ্রীমতী বুঝি চিৎকার করে উঠবে আর নয় ত মূর্চ্ছা যাবে।

—শ্রীমতী সমস্ত শক্তি দিয়ে কথা বলতে চেষ্টা করল —"কে আপনি?"—অস্বাভাবিক চিৎকারের মতো শোনাল, প্রতিধ্বনি হলো পাহাড়ে পাহাড়ে।

—স্পষ্ট শুনতে পেল—লোকটি বলছে—"চিনতে পেরেছি তোমাকে। প্রথম দিনেই চিনেছিলাম; আমি জানতাম তুমি ঠিক আসবে। কোন দিন ভুলতে পারবে না আমাকে, এই পাহাড়কে। ঐ গ্র্যানাইটের টুকরোটায় এর আগে কতবার তুমি বসেছ আর আমি তোমাকে গীটার শুনিয়েছি। সুদীর্ঘ সাত বছর তোমার প্রতীক্ষা করছি।"—কথার আর বিরাম নেই, অনর্গল বলেই চলেছে লোকটি। আর শ্রীমতীর অজ্ঞাতে তার হাতখানা টেনে নিয়েছে।

সম্বিৎ ফিরে আসতেই চকিতে হাতখানা টেনে নিয়ে শ্রীমতী উঠে দাঁড়াল। এক মুহূর্ত্তে বেপরোয়া হয়ে উঠল যেন। উত্তেজনায় সারা শরীর তখন কাঁপছে—এক রকম জোর গলাতেই শ্রীমতী বলে উঠল—"পাগলামি রাখুন; পথ ছেড়ে দিন, অভদ্র কোথাকার!"

—কিছুটা পেছিয়ে দাঁড়াল লোকটি, তারপর বলল, "আশ্চর্য্য, সাতবছরের ব্যবধানে তোমার স্মৃতিশক্তি এতটা ভোতা হয়ে গেছে, জানতাম না বাসন্তি।"—আমি গৌরাংশু। লক্ষ্মীটি একটু মনে করবার চেষ্টা কর।"

—"আগাগোড়াই ভুল চিনেছেন, আমি আপনার বাসন্তী নই, আমি শ্রীমতী গোস্বামী। কোলকাতায়

বাসিন্দা, এখানে চাকরীর জন্যে এসেছি। আর আপনার বাসন্তী সাত বছর আগে পাহাড়ের খাদে পড়ে মরে ভূত হয়ে গেছে, যার কোন অস্তিত্বই আজ নেই।"

পাশ কাটিয়ে যাবার চেষ্টা করল।

—লোকটি তখনও অনর্গল বলে চলেছে—"ভুল আমার হয়নি···। তোমাকে ভুল হবার নয়।"

সামান্য একটু অমনোযোগের সুযোগে শ্রীমতী তীরের মতো ঢালু পাহাড়ের রাস্তা দিয়ে নামতে লাগলো। একবার ভাবলোও না, পা ফস্কালে খাদের অতলে তলিয়ে যাবে। কিন্তু যেমন করেই হোক পালাতে হবে।

—স্কুলের কাজ শেষ হয় সন্ধ্যের আগেই, তারপর ছেলেরা যে যার চলে যায়। বনশ্রীকে নিয়ে শ্রীমতী খানিকটা বেড়িয়ে তাড়াতাড়ি ফিরে পড়ে। সেদিনের ঘটনাটা বনশ্রীকে সমস্ত খুলে বলেছে শ্রীমতী। শুনে হেসে উঠেছে বনশ্রী, ঠাট্টা করেছে—বলেছে, "বাসন্তী বলে ভুল করে তোর প্রেমে পড়তে চায় লোকটা"।

—ভয়ে বুক দুরদুর করে উঠেছে।—বাসন্তীর অতৃপ্ত আত্মা এখানের বাতাসে মিশিয়ে আছে। সৌরাংশুর ধারণা বাসন্তি ফিরে আসবে।

—অনেক রাত্রে বাইরে বাসন্তীর নাম ধরে কে যেন তারই দরজায় বারবার টোকা দিয়েছে, ঘুম ভেঙে গেছে দরজায় আঁচড়ানোর শব্দে। কুকুরের চিৎকারে রাতের নিস্তব্ধতা ভেঙে খান্ খান্ হয়ে গেছে। শ্রীমতীকে নিয়ে ঘোরালো হয়ে উঠেছে সব কিছু।

—"বনশ্রী, আর এখানে টিকতে পারছি না, বার বারই আমার মনে হয়েছে, কে যেন আমাকে নেপথ্যে শাসন করছে।"

—বনশ্রী বলে এটা তার অহেতুক ভয়। শ্রীমতীর তবুও ভয় ঘোচে না। ইচ্ছে হয় এই মুহূর্তে সে চলে যাবে। ফিরে যাবে মণি মিত্রের গলিতে। পিসিমার চিঠির কোন উত্তরও আসেনি। কি খবর কে জানে?

—অদ্ভুত রকমের একটা চিন্তায় পেয়ে বসেছে শ্রীমতীকে।

—এই মুহূর্তে শ্রীমতী সব পারে,—বিয়ে করে ফেলতে পারে সৌরাংশুকে।—একেবারে পাগল ত' নয়। অনেক টাকা আছে সৌরাংশুর। পিসিমাকে তার বিয়ের ভাবনা থেকে মুক্তি দিতে পারে। টেবিলের ওপর বাসন্তীর একখানা ফটোগ্রাফ।

—মোহনচন্দ্র সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন সেদিন এক ভদ্রলোককে। সৌরাংশুর মানসিক রোগের ডাক্তার তিনি। শ্রীমতীর কাছে তাঁর সমস্ত আবেদন ব্যর্থ হয়ে গেছে। ফটোগ্রাফটা দেখে বনশ্রীও চম্‌কে উঠেছিল, শ্রীমতীর ফটো বলে ভুল করেছিলো। বাসন্তীর সঙ্গে অদ্ভুত সাদৃশ্য শ্রীমতীর।

—ওটা বাসন্তীর ফটো,—সাত বছর আগে যে খাদ থেকে পড়ে মরে গেছে। সৌরাংশুর ভুল করা অস্বাভাবিক নয়।

—"মা, তুমিই পার সৌরাংশুকে ভাল করে তুলতে, তুমি হুবহু বাসন্তীর মতো, তোমাকে দেখার পর থেকেই আশাতিরিক্ত রকম পরিবর্তন দেখা গেছে সৌরাংশুর মধ্যে।"

—ডাক্তারের অনুনয়ের জবাবে শ্রীমতীর কণ্ঠে জোরাল রকম ভাষা বেরিয়েছিলো—গর্জ্জে উঠেছিলো শ্রীমতী।

"একটা পাগলের জন্যে জীবনটাকে বলি দিতে হবে নাকি? বেরিয়ে যান আপনারা।"

—বনশ্রীর মনে হয়েছিলো শ্রীমতীও পাগল হয়ে গেছে বুঝি। বেচারা শ্রীমতী!

—ঘরে এসে শ্রীমতী ফুঁপিয়ে কেঁদেছিলো।

—মানসিক দিক থেকে শ্রীমতী কেমন যেন হয়ে গেল ক'দিনে। আগের সে উজ্জ্বল শ্রীমতী যেন মরে গেছে। ওর জন্যে বনশ্রীর চিন্তাও কম নয়। মাঝে মাঝে অকারণে শ্রীমতী কেঁদে ওঠে। বাইরে বেরুতে চায় না। কেমন যেন একটা ভয় ভয় ভাব। আগের মত জানালা খুলে দিলে তাড়াতাড়ি বন্ধ করে দেয়।

—সেদিন অনেক রাত্রে চিৎকার শুনে বনশ্রীর ঘুম ভেঙে গেল, শ্রীমতীর চোখ দুটো তখন ভয়ে বড় বড় হয়ে

উঠেছে। কি ব্যাপার? শ্রীমতী কাঁচের শার্সি'র দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, "ওই খানে এইমাত্র একটা ছায়া দেখা গেল।"

—ভয় হোল বনশ্রীরও ; তবুও মুখে বলল, "ও কিছু নয়।"

—স্কুলের ছুটির পর সন্ধ্যের সময় শ্রীমতী ফিরছিল, একেবারে মুখোমুখী দেখা হয়ে গেল সৌরাংশুর সঙ্গে। শ্রীমতীর ভয় করল না, মনের দিক থেকে সৌরাংশু বড্ডো ছেলে মানুষ। ইদানীং শ্রীমতীর সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখা হয়ে যায়। সৌরাংশুই কারণে অকারণে ঘোরা ফেরা করে—সাউথহিল রোডের আশেপাসে।—মোহন চন্দ্র পেছনে এসে পড়লেন—"সৌরাংশু বোধ হয় কিছু বলত।"

—মোহন চন্দ্র বল্লেন, "চলে আসুন, কোন ভয় নেই"।

"হ্যাঁ চলুন।"

"আশ্চর্য্য মানুষের মন—" মোহন চন্দ্র চলতে চলতে কথা বলতে লাগলেন। "মানুষের মন সম্বন্ধে বহু গবেষণা আজো পর্য্যন্ত হচ্ছে,—উন্মাদের লক্ষণ দেখে মানসিক ডাক্তাররা সাইকোএনালেসিস করে রোগের চিকিৎসা করেন। একটি ছেলে আর একটি মেয়ের মধ্যে গভীর ভালবাসা, ছোট্ট একটি সুখের নীড় বেঁধে তারা আরম্ভ করলো সংসার। একে অপরকে সামান্য সময়ের জন্যেও চোখের আড়াল করত না। কিন্তু—ভাগ্যের বিবর্ত্তনে দুর্ঘটনায় দুজনের মধ্যে মেয়েটি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল পৃথিবী থেকে।"

—এমনি কথার ছলেই মেয়েটি বোধ হয় বলেছিলো—"আমি যেখানে যতদূরেই যাই, তোমাকে ছেড়ে থাকতে পারব না, ফিরে আসব। ফিরে আসার এই মিথ্যে প্রতিশ্রুতিটাই ছেলেটির মনে দাগ কেটে যায়। তার প্রতীক্ষা ফুরোয় না, সে আসবে এই চিন্তাটায় তাঁর মানসিক তন্ত্রীতে মাকড়সাড় জাল বুনতে থাকে"—মোহন চন্দ্র থামলেন।

—"আপনি পারেন ইচ্ছে করলে সৌরাংশুকে মুক্তি দিতে।"

"না না—এ অসম্ভব। বাসন্তীর অতৃপ্ত আত্মা কোন দিন ক্ষমা করবে না তাহলে। কি যেন একটা ঘটে গেল। শ্রীমতী দুহাতে কান ঢেকে ছুটে অদৃশ্য হয়ে গেল তার ঘরের মধ্যে।

—হতবাক মোহন চন্দ্র একটা দীর্ঘশ্বাস ফেল্লেন।

—"শ্রীমতীর জন্যে যেন ওত পেতে ছিল জায়গাটা।"

—সেদিন অনেক রাত পর্য্যন্ত ঘুম হ'ল না শ্রীমতীর। বণশ্রীর সঙ্গে আজে-বাজে অসংলগ্ন কথা বলল কিছুক্ষণ।

—এক সময় শ্রীমতী বলল—"ধর যদি তোদের এই উন্মাদ রাজপুত্রকে আমি বিয়ে করি, তা'হলে?"

– বণশ্রী অবাক হোল—"মনের দিক থেকে তুই কতটা সাহসী জানি না, তবে বিয়ে করলে নিতান্ত ঠকবি না।"

—"তোদের শ্রীমতীকে কিন্তু এ পৃথিবীতে মুছে যেতে হবে! নতুন ক'রে জন্ম নিতে হবে বাসন্তী হয়ে।"

—"ওসব ভাবনা পরে ভাবিস, আপাতত ঘুমিয়ে পড়।" বণশ্রী পাশ ফিরে শুলো।

—সকালে বাইরে ইজি-চেয়ারে ব'সে প্রথম রোদ্দুরটাকে উপভোগ করছিলো শ্রীমতী। অন্য দিনের চাইতে আজ সম্পূর্ণ ভিন্ন লাগছিল শ্রীমতীকে।

—হন্তদন্ত হয়ে মোহনচন্দ্র এসে উপস্থিত হলেন।

—একটা দুঃসংবাদ!

—গত রাত্রে তিন পাহাড়ীর খাদ থেকে ঘোড়া সমেত পড়ে মরে গেছে সৌরাংশু।

—পিওন এসে চিঠি দিয়ে গেল; শ্রীমতীর চিঠি।

—পিসিমার আজ দু'দিন প্রবল জ্বর হচ্ছে।

—শ্রীমতীর চোখে-মুখে কোন পরিবর্ত্তন নেই। যেন পাথরের বোবা মূর্ত্তি একটা।

—ঘরের মধ্যে এসে বাসন্তীর ফটোখানা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো ক'রে ফেলল শ্রীমতী।

—বনশ্রী'র দিকে তাকিয়ে এক সময় বলল—"কোলকাতার গাড়ী ক'টায় বল'ত?"

কবি আশুতোষ চৌধুরী

ডক্টর শ্রীযতীন্দ্র বিমল চৌধুরী

চট্টল জননীর কৃতি কবি সন্তানদের মধ্যে ৺আশুতোষ চৌধুরী অন্যতম। নবীনচন্দ্র সেন, নবীনচন্দ্র দাস, শশাঙ্কমোহন, জীবেন্দ্রমোহন, বিপিনবিহারী, হেমন্তবালার কবিপ্রতিভা ও কাব্যরসিকতার বিশিষ্ট উত্তরাধিকারী ছিলেন ৺আশুতোষ চৌধুরী। কর্ণফুলী, শঙ্খ, মাথামৌরী প্রভৃতি নদী চট্টগ্রাম জেলার বহুল স্থল রাখে চির সজল ও সরস; নদীর উভয় পাড়ে দিগ্‌দিগন্তব্যাপী সবুজ ক্ষেত। উত্তুঙ্গ শৈলরাজির প্রস্তরবক্ষ ভেদ করে খরস্রোতে নেমে আসছে অজস্র স্রোতস্বিনীর ক্ষুদ্র, বৃহৎ রজত ধারা। এ দৃশ্য দূর থেকে মনে হয়—প্রতি মুহূর্তে "স্বপ্নো নু, মায়া নু, মতিভ্রমো নু।" নদ-নদীতে, সাগরে, পর্ব্বতে এরূপ অপরূপ বৈচিত্র্য-সমৃদ্ধ স্থল কেবল বঙ্গদেশে কেন, সমগ্র ভারতেও বিরল। শৈলকিরীটিনী, কাননমেখলা, সাগরকুন্তলা চট্টল জননী প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। এ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যরাণীর অনবদ্য সুত ছিলেন কবি ও কাব্যরসিক ৺আশুতোষ চৌধুরী।

আশুতোষ ছিলেন অত্যন্ত দরদী হৃদয়ের লোক—খোলামনে খোলাপ্রাণে মেলামেশা করতেন তিনি আমাদের নিজের গ্রাম কঠুরখীল ও চট্টগ্রামের অন্যান্য সকল জায়গার হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ প্রভৃতির সকলের সঙ্গে। তাঁর মায়ার পরশে অভিভূত হতো সর্ব্বজাতির সর্ব্ব বয়সের লোকের হৃদয়। চূড়ান্ত ভাবে মিশে যেতে পারতেন তিনি চাষীদের, জেলেদের, নৌকার মাঝিমাল্লা প্রভৃতি সকলের সঙ্গে তাদেরই একজন হয়ে। কোনও ভেদ থাকতো না। সেজন্য তাঁর কাব্যের সুর গ্রাম্যগীতির সুর, ভাষা গ্রাম্য কবির ভাষা। জীবনে অনন্যকর্ম্মা হ'য়ে অত্যুচ্চ প্রতিভার অধিকার নিয়ে তিনি এ কার্য্যে আত্মনিয়োগ করেছিলেন; ফলে, সিদ্ধিও তাঁর অনিবার্য আকারে আত্মপ্রকাশ করেছিল তরুণ বয়সে। ৺দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁর বঙ্গভাষা ও সাহিত্য গ্রন্থের ভূমিকায় গ্রাম্যগাথা সঙ্কলনের বিশিষ্ট সহায়করূপে তাঁর গরিষ্ঠ প্রশংসা করে গেছেন।

আশুতোষের অগ্রজদ্বয় এখনও জীবিত। মাত্র ৫৫ বৎসর বয়সে ৭ বৎসর পূর্ব্বে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে ভাষা জননীকে চিরতরে দরিদ্রা করে গেছেন। "গ্রাম্যগীতি" রচনায় ছিলেন আশুতোষ সিদ্ধহস্ত। সংগ্রহেও ছিলেন তিনি অনন্যসদৃশ। তাঁর রচিত গ্রাম্যগীতির বহুল প্রচার বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র না হলেও, কবি তাঁর জীবদ্দশায় পূর্ব্ববঙ্গের বহুল অঞ্চলে প্রভূত কীর্ত্তি অর্জ্জন করে গেছেন। এ সব গীতির কিঞ্চিদ্ দিগ্‌দর্শন করার চেষ্টা এখন করছি।

কবির "গীতিকা" নামক গীতি-গুচ্ছে যে সকল গ্রাম্য গীতি মুদ্রিত হয়েছে, তা' ছাড়াও অনেক গ্রাম্য-গীতি তাঁর চট্টগ্রামের পাঞ্চজন্য, পূরবী * ও অন্যান্য স্থানের মাসিক পত্রিকাদিতে প্রকাশিত হয়েছিল। শিশুসাহিত্য রচনায় তিনি পূর্ব্ববঙ্গে অগ্রণী ছিলেন। তাঁর লিখিত গ্রন্থ ছেলেদের চট্টভূমি, ত্রিপুরার কথা (ভূগোল), শতকথা, শিশুরঞ্জন, শিশুমঙ্গল, সাধারণিকা, ধর্ম্মাচার শিক্ষা, বর্ণ ও বানান শিক্ষা, গল্পের ত্রিধারা (ইতিহাস প্রভৃতি ছাত্রদের অতি আদরের সামগ্রী)। আশুতোষের স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের আজ শ্রেষ্ঠ উপায়—ঐ সকল গীতি ও তাঁর অন্যান্য লেখা সংগ্রহ করে রসিক পাঠকমণ্ডলীর হস্তে সমর্পণ।

আশুতোষের "গীতিকা"র একটী অপরূপ সৌন্দর্য—গ্রাম্যকথার কোনও রূপ পরিবর্ত্তন না করে রূপে রসে অবিকৃতভাবে সহৃদয় কাব্য রসিকদের আনন্দ পরিবেশ সৃষ্টি। উদাহরণক্রমে উদ্ধৃত করছি তাঁর "পুষ মাস্যা শীতের কাল" শীর্ষক চট্টগ্রামী ভাষায় রচিত গীতি।

* দিদারুল ইসলাম ও আশুতোষ চৌধুরী মহাশয়ের সম্পাদনায় এই পত্রিকা কয়েক বৎসর মাসিক প্রকাশিত হতো।

"পুষমাস্যা শীতের কাল
আঁচুরি বাইলাম 'টেঁইয়া' জাল—
জালে বাজিল 'ইচা', 'বাইলা'
'কোড়াল', বোয়াল।
'বেইন' জাল বোসাইলাম রাইতে—
দেরী হইল খাইতে দাইতে,
উজান গাঙে নাও বাইতে
ভাইঙা গেল হাল।
কাঁইচার মুখে ডুবাচর—
সেই জায়গাতে মাছের ঘর,
হুরাহুরী পৈড়া গেলে
ছিড়া যায়গো জাল॥
কুতুবদিয়ার উত্তর বাঁকে
'তাইল্যা', 'ফোইস্যা' জাগ্‌দি থাকে—
লড়া পাইলে এক্কিকারে
ফালের উপর ফাল।

এই গানটীর কয়েকটী লক্ষণীয় বিষয় আছে! শব্দ প্রয়োগ, অর্থগাম্ভীর্য্য ও ধ্বনি। এই গানের প্রত্যেকটী শব্দ চট্টগ্রামী ভাষায় নিত্য-নৈমত্তিক ব্যবহৃত হয়; কিন্তু কবির অতুলনীয় তুলিকার মায়াপ্রভাবে এই শব্দগুলি এতই মায়াবিষ্ট যে তারা তাদের প্রকৃতরূপেই নিখিল বঙ্গবাসীর ভোগের সামগ্রী হয়ে দাঁড়িয়েছে। যে কোনও সুরসিক পাঠককে 'টেঁইয়া', 'ইচা', 'বেইন' ও 'কাঁইচা', 'তাইল্যা', 'ফাইস্যা'র নির্দ্দিষ্ট প্রকৃত অর্থ বলে না দিলেও, এগুলি খাটি চট্টগ্রামী কথা হলেও—এর একটী অপরূপ রূপ ও অর্থ পরিগ্রহ করতে কারো নিমেষের জন্য দেরী হয় না। 'লড়া' ও 'ফালের' সঙ্গে তাঁদের মনও নাড়া পেয়ে লাফাতে থাকে।

দ্বিতীয়তঃ, কবি শীতের রাতে জাগতিক সব কষ্ট সহ্য করেও যে জাল পাতলেন, তাতে চিংড়ি থেকে আরম্ভ করে বোয়াল মাছ পর্য্যন্ত সর্ব্বপ্রকার মাছের যোগান দিলেন ভগবান্—বিধাতা কোনও কার্পণ্য করলেন না; কিন্তু রাত্রের 'বেইন' জাল জীবনের পথে অগ্রসর হতে তাঁর দেরী করিয়ে দিল; সমস্ত গেল ওলট পালট হয়ে—নদীতে উজান স্রোতে নৌকা নিয়ে অগ্রসর হতে গিয়ে তাঁর জীবনের হাল গেল ভেঙে। 'কাঁইচা' নদী কর্ণফুলী নদীর আদরের ডাক নাম—চট্টগ্রাম পল্লীপ্রাণ ঐ নামেই খরস্রোতা কর্ণফুলীকে সম্বোধন করে, ধ্যান-নিমীলিত নেত্রে তার অনবদ্য নামসুধা পান করে। কর্ণফুলীর সঙ্গে যেখানে সমুদ্রের সঙ্গম, সেখানেই সমস্ত মাছের বাসা; কিন্তু ঐ স্রোতবহুল কষ্ট-সীমানায় কবির আর যাবার ক্ষমতা নাই, দেহতরণী থাক্‌লেও হালও নাই, মৎস্য ধরার জালও নাই। পরমাত্মার সৎ, চিৎ, আনন্দরূপ তাঁর সুপরিজ্ঞাত; কিন্তু বিধাতা আজ নিজে জীবনরস সঞ্চারিত করে না দিলে কবির আর চলাফেলার ও জীবিকা অর্জ্জনের কোনও উপায় নাই। "পৌষ মাসের শীত" তাঁর জীবনগ্রন্থি শিথিল করে দিয়েছে; এখন পার্থ সারথিই তাঁর একমাত্র ভরসা। কিন্তু সাধের 'কাঁইচা' পার হয়ে কবি যখন সমুদ্রপথে কুতুবদিয়া পৌঁছাবেন, তখন তাঁর আনন্দের সীমা থাকবে না। সেই সুখেই মন তাঁর ভরপুর। শত শত তাইল্যা, ফোইস্যা মাছ সেখানে সর্ব্বদা জমে আছে, কেবল সেখানে পৌঁছিলেই হয়।

তৃতীয়তঃ, এই গানটীর ভিতরে আরো একটী ধ্বনি আছে—সেটি হচ্ছে, যদিও কবি চিরাভ্যস্ত সংযম বশতঃ, শীতকালের চট্টগ্রামী সোয়াস্তির উপকরণ, ২১৪টি 'আল্যা', হাল্যা, 'হুক্কা', 'চুলা', টেনে এনে গানের পদবৃদ্ধি করেন নি—তা' হলেও রসবেত্তা মাত্রেরই মন ঐ শীত-কালের "আল্যা" ও 'চুলার'র জন্য চঞ্চল হয়ে ওঠে। কবির অশান্ত মনের সঙ্গে 'পুষমাস্যা শীতের কালে' পাঠকদের মনও "কাঁইচা", "শঙ্খ" প্রভৃতি নদীর বাঁকে-বাঁকে আরো অন্যান্য ঝাঁই জাল, ছটকি জাল প্রভৃতি হাতে 'ইচা', 'বাইলা', 'কোড়াল' মাছ কুড়িয়ে বেড়ায় তো বটেই, সঙ্গে সঙ্গে আব্‌দুল্লা কাকা, বুধা হাঁড়িয়ার প্রাতরাশ ও সান্ধ্য আহারের সন্ধান করে বিশ্বজননীর পদে নিরন্তর নতি নিবেদন করে—অপূর্ব্ব রসসৌরভে।

কবির 'মন পোবনার নাও' গীতি তাঁর জীবদ্দশাতেই দেশবাসীকে প্রভূত আনন্দ প্রদান করেছিল। তাঁর "মন পোবনার নাও" হেলে দুলে চল্‌ছে—সম্বল, ভবের মাঝির অশেষ কৃপা। উত্তর-পশ্চিম কোণে মেঘের উপর মেঘ

জমে আছে, গুড়ুম গুড়ুম বজ্রনাদে কর্ণকুহর খিন্ন, মুহুর্মুহু বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে—, কবির "মন পবন নৌকার" পাশের রশি এখন কষে বেঁধে রাখার সময়। কিন্তু যাঁর মানস চক্ষে নিরন্তর ভেসে উঠছে কুলকিনারাহীন অসীম রূপা-সমুদ্র, তাঁর ভয় কি?

"হাইরা কোণে বইয়ার মেঘ
তার উপরে দেবা;
ঝিল্কি ঠাডার লৈয়ারে তান্
আস্মানেতে খেবা।
ভিড়া বাঁধো পালের রশি
ফিরা গেছে ভাও।
বেবাম দরিয়ার মাঝে
ঢেউ-এর কোলাকুলি;
মন পোবনার নাওরে আমার
চলে হেলি দুলি।
পার কর্হে ভবের মাঝি
ধরি তোমার পাও॥"

কবির 'গুরু কও কও কও' কবিতাটিও অপূর্ব্ব কাব্য-রসে সিঞ্চিত। শিষ্যের কাতর প্রশ্নের ভেতর লুকায়িত আছে সৃষ্টির প্রগাঢ় রহস্য। এবং আরো রয়েছে গুরুর প্রকৃষ্ট আনন্দ সংবাদ—হিন্দু-মুসলমান সকলেই শিষ্যের কাছে এক—এত কাছাকাছি থেকে, ভাইয়ের মত পাশা-পাশি থেকে বেইমানি সহনীয় হতে পারে না। কবির ভাষায় বলি—

"ধানেতে ধুয়ারা গুরু শস্যার মাঝে তেল।
ওরে ডিম্বার ভিতর বাচ্চা রৈল—প্রাণি কেমতে গেল॥
গুরু কও কও কও—
আসমান কালা জমিন কালা,
কালা নদীর পানি;
সকল থাইক্যা অধিক কালা আখের বেইমানি রে—
আখের বেইমানি।
হেঁদু ভাই মইরা গেলে নিব গাঙের ভাটি;
মুছুলমান ভাই মইরা গেলে পাইতা দিব মাটি;
অসার দুনিয়ার শেষে আখেরের ইন্ছাপ রে—
আখেরের ইন্ ছাপ॥
জন্মাবধির গুণা গুরু তুমি কর মাপ॥"

ভাটিগাঙ বেয়ে যে মাঝি মাইয়া'র বাপের দেশে যাচ্ছে, তার মারফতে বাপের বাড়ীতে মাইয়ার নাইয়র যাওয়ার জন্য মিনতি নিবেদন অপূর্ব্ব ফুটে উঠেছে কবির "মা বাপেরে কইও" কবিতায়। বাপের বাড়ীর আম-জাম, ঢাকনিওয়ালা জোড়া কলসীর পানিই এ সোহাগের দুলালীর একান্ত কাম্য, ধন-দৌলত নয়। বাপের বাড়ীর মাইয়া'র সব চেয়ে কাম্য—

"ঘাটার আগার তেঁতই গাছটার তেঁতই বেঁকা বেঁকা;
পাড়াল্যা মা ভৈনের সঙ্গে আর নি হৈব দেখারে;
বাপের বাড়ীর মাইয়া—
আমি বাপের বাড়ীর মাইয়া।"

গ্রাম্য কবির ধরণে কবির গ্রাম্য ভাষা প্রয়োগ অতি নিখুঁত। এবং অপরূপ সৌন্দর্য্যে কবির হৃদয়ের মর্ম্মগাথা উৎসারিত হয়েছে তার মধ্য দিয়ে। নদী স্থলে নন্দী, স্নানের স্থানে মৈলান, পাক্ষী স্থলে পঙ্খী, ক্ষমা—ক্ষেমা, কন্যা—কইন্যা, চক্ষ—চৈক্ষ, যৌবন—যৈবন, কবুতর—কইতর, কোটর—খোরল, চারি—চাইর, থেকে—থাইক্যা প্রভৃতির যথাযথ প্রয়োগ সৃষ্টি মাহাত্মের প্রকৃষ্ট অগ্রদূতরূপে দেখা দিয়েছে কবির মায়াবিষ্ট রসরচনায়। কবির গদ্দু—নউকার নাইয়ার সঙ্গে বাইসার সারি গেয়ে ভক্ত রসিক মাত্রেই ভবসাগরে পাড়ি দিতে রাজি; তবে কবির মত গাঙের কৈতর হয়ে কয়দিন উড়তে পারে, সেইটী চিন্তার বিষয়।

"আমার বঁধুর গদ্দু নউকা
বাঁকে বাঁকে ঘুরে;
গাঙের কৈতর হৈতাম যদি
যাইতাম উড়ে উড়ে।"

কেচ্ছা-সাহিত্যের অন্তর্গত কবির আদম আশক শীর্ষক গীতিময়ী কবিতা ভাবে ও ভাষায় অসাধারণ। কবি এ একটী মাত্র কবিতায় নারী চরিত্রের দুর্ব্বলতা চিত্রিত করেছেন; তাঁর অন্যান্য সব কবিতায় পুরুষেরাই দুঃসহ প্রেমনির্যাতনের জন্য দায়ী।

কবির "ব্যথার বাণী" গাঁথাচিত্র বড়ই করুণ। বাঁশী শুনে কন্যা মজে গেল; কিন্তু উদাসী ফিরেও তাকালো না। বাঁশী, উদাসী, কন্যা সকলেই সলিল সমাধি প্রাপ্ত

হলো ; এক-তরফা প্রেমের কি বিষদগ্ধ পরিণতি। "হিজল গাছের বিরল পাতা" তার সাক্ষী হয়ে আছে।

মদন ও ময়নার কাহিনী আরও করুণ। মদন ময়নাকে ঘরছাড়া করেছে—জীবনের তরুণ প্রভাতে সেই একদিন ময়নাকে বলেছিল—

"ময়নারে তুই কেম্নে এমন হৈলি—
আজ যে দেখি ফোটা ফুল
কাইল দেইখাছি কলি।
তুই কেম্নে এমন হৈলি॥"

নাতিদীর্ঘ কায়ের উপর সুদীর্ঘ কেশপাশের বিস্তৃতি মহিমা ভ্রমর-গুঞ্জনে সেই একদিন ময়নার কাছে ঘোষণা করেছিল—

"দেখতে যে তুই বাডি গুডি
মাথায় দীঘল কেশ ;
তোরে লইয়া ওরে ময়না
ছাইড়া যাইবো দেশ।
তুই কেম্নে এমন হৈলি॥"

বাডি-গুডি ময়না কলি থেকে বিকসিত হওয়ার সংবাদ পেয়ে আনন্দিত ; কিন্তু তড়িদ্ গতিতে ফোটার সংবাদের আবশ্যকতা সে নিজচিত্তে অনুভব করে নি। কিন্তু সত্যি যেদিন সে কুল বিসর্জ্জন দিল, সেদিন বিধাতা অলক্ষ্যে তার এই সরলা দুহিতার জন্য উষ্ণ অশ্রু বিসর্জ্জন করলেন। দু'মাস পরে বৃদ্ধ চাষী পালক পিতা মদনের দ্বিতীয় বিবাহের খবর এনে দিল তাকে। নিজের চোখে যখন সে সব দেখ্‌লে, তখন আর মিথ্যা কথা বলে নিজের মনকে প্রবোধ দিতে সে পারলোনা, তখন নদীর যে ঘাটে তাদের প্রাণ-বিনিময় হয়েছিল, সেখানে উপস্থিত হলো—সেখানেই তার শেষ গীতি আঁধারে বিলীন হয়ে গেল—

"আসমানেতে তারার দল মিটমিটিয়ে হাসে।
এই না নদীর তলা দিয়া মরণ আমার আসে,
বন্ধু…মরণ আমার আসে।"

তবু মদনের বিরুদ্ধে তার কোনও অভিযোগ নাই ; বিধি তার প্রতি বাম— মদন তা'তে কি করতে পারে ? সে যেন অভাগিনীর নাম আর না নেয়, এই ময়নার শেষ প্রার্থনা—

"যাইরে তবে যাইরে এখন
বিধি মোরে বাম,
না লইও না লইও বন্ধু
অভাগিনীর নাম ;
বন্ধু অভাগিনীর নাম॥"

অভাগিনী ময়না! অভাগিনী এরূপ আরো শত শত কন্যার করুণ কাহিনী বিচিত্র চির প্রাণমাতানো গ্রাম্য সুরে যে কবি বঙ্গবাসীকে পল্লীগীতির মাধ্যমে শোনাচ্ছিলেন, সেই আদরের আশুদা'র জীবন-দীপ অকালে নির্ব্বাপিত করে ভগবান বঙ্গ জননীর বদন-মণ্ডল মসীমাখা করে দিলেন কেন—আজ কেবল এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বেড়াই।

আর একটী কথাও আজ বারে বারে মনে হচ্ছে। বিধাতার অমোঘ বিধানে আজ চট্টলবাসী অনেকেই গৃহহারা, চিরতরে নির্ব্বাসিত। খাঁটি চট্টগ্রামের ভাষায়, চট্টল জননীর যে অপূর্ব্ব সুন্দর রূপটী—তাঁরি মাঝি-মাল্লা, চাষী-মজুর প্রভৃতি অসংখ্য পল্লীসন্তানদের দৈনন্দিন জীবনের অনুপম মহিমা—যে মরমী দরদী কবি এমন প্রাণবন্তভাবে আমাদের সামনে ধরে দিয়েছিলেন, তাঁর রচিত পল্লীগীতি আমাদের পক্ষে আজ বিশেষভাবে মূল্যবান। কারণ, আজ অনেক দূর থেকেও, এ গ্রাম্য গীতিকার মাধ্যমে, আমরা চিরকাল জননীর সেই শাশ্বত শান্ত-স্নিগ্ধ মহনীয় বরণীয় রূপমাধুরী পান করে ধন্য হব।

অভিনয়

অলকা মুখোপাধ্যায়

ছোট সহর, বড় দোকান, 'রেড ক্রশ' কেমিষ্টস্, অ্যাণ্ড ড্রুগিষ্টস্—দোকানের অ্যাটেণ্ডিং ফিজিসিয়ান ডাক্তার প্রশান্ত চৌধুরী। প্রশান্ত চৌধুরীর নাম আছে, ডাক্তার ভালো, লোক আরও ভালো। সারা সহরে তাঁর পশার; যখন যার বাড়ীতে শক্ত রোগ, তখন তার বাড়ীতে ওঁর আনাগোনা। ষোল টাকা ভিজিট দেবার ক্ষমতা সকলের নেই তাই ছোটখাটো অসুখে সবাই ডিস্পেন্সারি যায়। সকাল আটটা থেকে বেলা একটা পর্য্যন্ত লোক ওঁর দরজায় ধন্না দেয়—আট টাকায় কাজ সারে।

সাড়ে আটটায় দেখা যাবে ওয়েটিং রুম ভর্ত্তি লোক, সার সার বসে আছে, পর পর যেমন ডাক পড়ে তেমন উঠে যায়। ওঁর কামরায় উনি বসেন এক কোনে প্রকাণ্ড মেহাগনি কাঠের সেক্রেটেরিয়ট টেবিলের ওপাশে; মুখে ওঁর নামের বাহুল্য, সৌম্য শান্ত চেহারায় পরিব্যাপ্ত প্রশান্তি। সর্ব্বদা হাসছেন, সামান্য কথা বলছেন, হাসতে হাসতেই ভাবছেন, আর একটার পর একটা প্রেস্ক্রিপসন লিখে চলছেন। লোকে বলে ডাক্তার তো প্রশস্ত চৌধুরী, চেহারা দেখলেই রোগ পালায়। খুব সত্যি কথা, এত বয়স হলে কি হয়, বয়সের বলি-রেখা পড়েনি কোথাও। যৌবন এখনও যেন যাই যাই করেও যেতে পারেনি। সারা সকাল উনি রোগী দেখেন, তারপর জার্ণালের পাতা ওল্টান, একটার সময় রাস্তার ওধারের প্রকাণ্ড রেস্তোরা "আইসল্যাণ্ডে" বসে চা খান, গরম কালে আইসক্রিম, তারপর বাড়ী যান। বিকেলে রোগী দেখেন বাড়ী বাড়ী ঘুরে।

আইসল্যাণ্ডে নিয়মিত চা খেতে যাবার একটা করুণ ইতিহাস আছে। দোকানটা যেবার নতুন খুলল প্রায় ছ'বছর আগে, তখন ওঁর আট বছরের ফুটফুটে সুন্দর মেয়ে মিনতি নিয়ম করে ওকে টেনে নিয়ে যেত রোজ সকালে আইসক্রিম খেতে। বছর চারেক হল মেয়েটি মারা গেছে কিন্তু ওর দোকানে যাওয়া বন্ধ হয়নি। বলেন বটে অভ্যাস, আসলে কিন্তু তা নয়। মিনতি ওর মন জুড়ে আছে আজও তাই নিয়মিত দোকানে গিয়ে উনি ছোট ছেলে-মেয়েদের আনন্দবিজড়িত কোলাহলে মিনতির স্মৃতিটুকু বাঁচিয়ে রাখেন। বোধ হয় ঐ কোলাহলের মধ্যেই আছে মিনতির আনন্দের সুরঝঙ্কার স্মৃতির ঐশ্বর্য্য হয়ে।

মিনতির জন্যই হ'ক কিম্বা নিজের সন্তান নেই বলেই হক, ছেলেমেয়েদের উনি বড় ভালোবাসেন। ওঁর ব্যস্ততার মধ্যেও তাদের জন্য অপর্য্যাপ্ত সময়।

এই জন্যে পাড়ার অন্যান্য ডাক্তাররা ওকে বলে পাগল। বলা বাহুল্য ওঁর দোকানের পাশেই আরও তিনজন ডাক্তার আছেন তাঁদের ডিস্পেন্সারী নিয়ে।

সেদিন কিসের একটা ছুটি। গরম পড়েছে, বেশ অনুভব করা যায়। রোদ্দুরে প্রচণ্ড তেজ। বেলা প্রায় এগারোটার সময় ওঁর ঘর ভর্ত্তি লোকের মাঝখানে একটি ছোট্ট মেয়ে এসে বসল, কোলে তার প্রকাণ্ড একটা ডলি পুতুল। মেয়েটির বয়স বোধ হয় ন বছর—দশও হোতে পারে। টানাটানা তার চোখ দুটোয় করুণতা মাখানো। মেয়েটির পাশেই বসেছিলেন প্রবীন অধ্যাপক মন্মথ ঘোষাল, বললেন, "খুকী এখানে কি চাও?"

মেয়েটি বললে, "ডাক্তার দেখাব!"

"নাম কি?"

বললে, "মিনতি মজুমদার।"

ঘোষাল মহাশয় বহুদিন বাতে ভুগছেন, ডাক পড়ল, কোঁতাতে কোঁতাতে উঠে গেলেন। কিছুক্ষণ প'রে কোঁতাতে কোঁতাতেই বেরিয়ে গেলেন।

এবার মিনতির পালা।

ডাক্তারবাবু কি লিখছিলেন, মুখ না তুলেই বললেন, "বসুন!"

মিনতি চেয়ারটাতে বসে পড়ল, নিজের ডলি পুতুলটিকে টেবিলের ওপর দিল শুইয়ে।

এবার মুখ তুলে প্রশান্ত চৌধুরী দেখলেন মিনতিকে। এ ধরণের রোগী একলা আগে কখনও আসেনি, ওঁর ষোল বছরের প্র্যাক্‌টিসে। মিনতি মিনতিতে লুটিয়ে প'ড়ে বল্‌ল—"ডাক্তারবাবু, আমার ছেলের ভয়ানক জ্বর আজ সাতদিন, চোখ তুলে চাইতেও পারে না।"

বেশ মজা লাগল ডাক্তার চৌধুরীর। কি করুণ মেয়েটির চাউনি, যেন সত্যিই মাতৃত্ব উছলে পড়ছে ওর চাওয়ার ভঙ্গিমায়। ওঁর মন কিছুতেই মানতে চাইল না যে মেয়েটি অভিনয় করছে।

চেয়ার ছেড়ে উঠে উনি পুতুলটিকে সযত্নে তুলে নিয়ে শোওয়ালেন রোগী দেখার টেবিলে। হাতটা তুলে নাড়ি দেখার ভান করলেন, ষ্টেথোসকপ্‌ বুকে লাগিয়ে পরীক্ষা করলেন, চোখের তলায় আঙুল দিয়ে চোখ পরীক্ষা করলেন, ঠিক যেমন আসল রোগী দেখে উনি করেন, তারপর বললেন, "ব্রনকাইটিস্‌!"

মেয়েটি বলল, "আপনি ঠিক বুঝতে পারছেন না, নিউমোনিয়া হয়েছে!"

ডাক্তার চৌধুরী হাসলেন, বললেন, "আরও দু'তিন দিন না গেলে বোঝা যাবে না

মেয়েটি কাঁদো-কাঁদো হ'য়ে বললে, "কি হবে ডাক্তারবাবু আমার ডলি বাঁচবে তো?"

ডাক্তার চৌধুরী কণ্ঠে ডাক্তারী সুর লাগিয়ে বললেন, "ভয়ের কিছু নেই, আমি ওষুধ দিয়ে দিচ্ছি তিন দিন খাওয়ালেই সেরে যাবে, না যদি কমে তা'হলে ওষুধ বদলাতে হবে।"

উনি টেবিলে ফিরে এলেন, মেয়েটি ডলি পুতুলটিকে সযত্নে কোলে তুলে নিয়ে আবার নিজের চেয়ারে এসে বসল। ডাক্তারবাবু কাগজে প্রেস্ক্রিপসন্‌ লিখলেন, মেয়েটিকে দিয়ে বললেন, কম্পাউণ্ডারকে দাও, সে তোমাকে ওষুধ দিয়ে দেবে!"

মেয়েটি গদ গদ কণ্ঠে বললে, "আপনিই ভরসা, তা'হলে কি যে হত! বাবা বলেছেন আর কিনে দেবেন না, তাই এত ভয়!" ডাক্তারবাবু বললেন, "না ভয়ের কিছু নেই!"

মেয়েটি ডলি পুতুলটিকে টেবিলে শুইয়ে দিল, তারপর নিজের ছোট্ট ব্যাগ থেকে কাগজের টুকরো বের করতে করতে জিজ্ঞেস করলে, "আপনার ভিজিট কত ডাক্তার বাবু?"

বিনা দ্বিধায় ডাক্তার বাবু বললেন—"আট টাকা।"

মেয়েটি কাগজের রঙিন টুকরোটি টেবিলে রেখে বললে, "এই নিন!"

ডাক্তারবাবু ঠিক সহজ ভাবেই কাগজের টুকরোটি তুলে নিলেন বললেন, "ধন্যবাদ!"

মেয়েটি চুপ করে বসে রইল, ডাক্তারবাবু বেশ একটু মুস্কিলেই পড়লেন।

মেয়েটি ওঁর মুখের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে বল্‌লে, "আপনি যে বললেন আট টাকা!"

ডাক্তারবাবু অপ্রস্তুত হ'য়ে বললেন, "হ্যাঁ, তাই তো!"

মিনতি নিঃসঙ্কোচে বললে, "আমি যে আপনাকে দশ টাকার নোট দিলুম, আপনি দু'টাকা ফেরৎ দিলেন না?"

আবার খানিকটা অপ্রস্তুত হ'য়ে ডাক্তারবাবু বললেন, "দেখলেন, কিরকম ভুল হয়ে গেছে—আমি খেয়ালই করিনি!"

দু'টাকার একটা নোট উনি পকেট থেকে বের ক'রে টেবিলের ওপর রাখলেন, মেয়েটি সেটি ব্যাগে রাখল তারপর ডলি পুতুলটিকে সযত্নে তুলে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

ডাক্তার চৌধুরী আনমনা হয়ে বসে রইলেন। বার বার তার মনে পড়ল মেয়েটির মুখটি—কি সরল এই শিশুরা। কথায়, ভঙ্গিমায়, কোথাও কোন জড়তা নেই—মাতৃত্ব যেন রন্ধ্রে রন্ধ্রে উবছে পড়ছে। মেয়েটির সারল্যে মনটা ওর ভিজে গেছে। সেদিন আর রোগী দেখা হল না।

বাড়ী ফেরার আগে আইসল্যাণ্ডে ঢুকলেন, এক কাপ চা খেয়ে নেবেন, প্রাত্যহিক নিয়মে।

ঢুকেই দেখলেন বাঁ দিকের কোণে ছেলেমেয়েদের ভীড়। আনন্দে সকলে ডগমগ করছে। সকলের হাতে আইসক্রিম, সবাই মহাআনন্দে আইসক্রিম খাচ্ছে আর চোখ বড় বড় করে গল্প শুনছে। মাঝখানের টেবিলের ওপর ব'সে মিনতি বলছে, "এমনি নেকা ভাই, যেমনি বললাম আপনি দু'টাকা ফেরৎ দিলেন না, অমনি পকেট থেকে টাকা বের ক'রে দিল!"—আজকে তো হোল আইসক্রিম খাওয়া, কালকে আবার দেখা যাবে!"

একজন বললে, "কাল কোথায় পাবি টাকা?"

মেয়েটি বলল, "কাল যাব ডাক্তার ঘোষের ওখানে "...

আর শুনতে পারলেন না ডাক্তার চৌধুরী, পথে বেরিয়ে এলেন!

প্রতারণা

শ্রীভুবনেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

যাত্রার পথে সমুদ্রমাঝে উঠেছে ঝড়
ক্ষুব্ধ বাতাসে উর্ম্মিমালায় আর্ত্ত স্বর,
জানি না ক আর দেখা হবে কি না হয়ত নয়
দূরবীনে দেখি তটরেখা সে যে অনেক দূর।

মত্ত মাতাল জাহাজখানার নেই ক হুঁস,
লক্ষ্য হারিয়ে অলক্ষ্যে কোন যাত্রা তার,
জানি না ক আর দেখা হবে কি না হয়ত নয়
ভারবাহী তার অসহ্য লাগে কঠিন ভার।

আতংকে যার ভয়ে জড়সড় যাত্রীদল
হাহুতাস করে চিৎকার ছাড়ে প্রাণপণে,
জানি না ক আর হবে কি না দেখা হয় ত নয়
ভালোবাসা আর আশার যা কিছু থাক মনে।

রুদ্ধ দুয়ার ধাক্কার চোটে ভেংগে গেল
পথ পেয়ে গেছে শেষের কথাটি এইবারে,
তোমারে করেছি প্রতারণা আমি বলেছি যে
যাবনা কোথাও ফিরিব আবার তব দ্বারে।

প্রস্তাবনা

অরুণ চৌধুরী

ললিত ছন্দে কাব্যময়তা থাক্
নরম মোমের পুতুলের মত ভাষা,
জীবন আকাশে করুক নৃত্য বৈশাখ
আগ্নেয়তার দিনগুলি দুর্বাসা।

হৃদয়শাখার সব পাতা যাক্ ঝরে
অনাদরে তারা লুটোক ধূলার মাঝে
ক্ষতি নেই তা'তে পাপিয়ার মিঠে স্বরে
যদি নামে মনে প্রিয়ার বিরহ বাজে।

নীরব নিশীথে ঝিম্ ঝিম্ বরিষণে
জল-সারেঙের সুরেতে মিলিয়ে সুর
যদিনা হৃদয় বলে ওঠে ক্ষণে ক্ষণে
(ক্ষতি নেই তাতে),—প্রিয়ে তুমি কতদূর

স্ফুটের মত প্রদীপ্ত এক আশ্বাসে
একক স্বপ্নকীর্তিনাশার কূলে
জেগে থাক্ শুধু দুর্ম্মর এক বিশ্বাসে :
সাজবে ধরণী ফাল্গুনে ফের ফুলে।

রায়বাঘিনী

শ্রীচুণিলাল মুখোপাধ্যায়

তৃতীয় অঙ্ক

—তৃতীয় দৃশ্য—

[কাটশকড়া মন্দির সম্মুখস্থ প্রাঙ্গনে বিশাল মণ্ডপ —পূজা—হোম—মন্ত্র পাঠ হইতেছে—দূরাগত শানাইয়ের সুর—পূজাস্থানে চন্দন—হরিদেব —রাজারাণী—সুমিত্রা নিজ নিজ কর্ত্তব্য করিতেছেন। অন্যত্র নিমন্ত্রিত অতিথিগণ আসিয়া স্ব স্ব আসন গ্রহণ করিতেছেন। মন্ত্রী এবং দীননাথ সকলকে অভ্যর্থনা করিতেছেন—রাজপুত্রের অন্নপ্রাশন উৎসবে সকলেই ব্যস্ত—একস্থানে বিশিষ্ট যোদ্ধাগণ সমাসীন। সেখানে চতুর্ভুজ সব দেখাশুনা করিতেছেন। কালুসর্দ্দার, জগাই, রমাই, গজপতিসহ বসিয়া আছেন।]

চন্দন—(স্বস্তি বচন)

চারণের গান।

জয় ভগবান জগৎ পালন
করুণায় তব জীবের কল্যাণ,
স্তুতিগান গাহি আমরা চারণ
লহ দেব পূজারীর ক্ষুদ্র নিবেদন
নমঃ নমঃ নারায়ণ
আশীষ করহ বরিষণ,
কোরক হিয়ায় ফুটিয়ে দাও
অমল জাগরণ।

(রাজারাণী, হরিদেব নিজ নিজ আসনে বসিলেন)

হরিদেব—ভুরসুটের বীর সন্তানগণ! আজ ভুরসুটের একটা স্মরণীয় দিন। দেবাদিদেবের মন্দিরে আমাদের রাজপুত্রের আজ অন্নপ্রাশন উৎসব! রাজ্যের শান্তি বিধ্বস্ত করতে শত্রুরা এসেছিল, তারা উচিত শিক্ষা পেয়ে গেছে আমাদের বীর যোদ্ধাগণের কাছে। কুমার দীর্ঘায়ু হউক। রাজবংশের এবং রাজ্যের গৌরব বৃদ্ধি করুক! ভগবানের কাছে আমি সকলের পক্ষে এই প্রার্থনা করি। গণনায় কুমারের নাম প্রতাপ নারায়ণ নির্দ্দেশিত হয়েছে।

(বসিলেন)

রুদ্রনারায়ণ—পূজনীয় গুরুদেব! আমার অতীব প্রিয় ভুরসুটবাসী! ধন্যবাদ সকলকে। আমার যে সব বীর সেনানী শত্রু নিধন কর্ত্তে প্রাণ দিয়েছে, তাদের মহান আদর্শ এই শুভানুষ্ঠানের মর্য্যাদা শতগুণে বর্দ্ধিত করেছে। যারা মরে অমর হয়েছে আমরা সকলে যেন মায়ের পূজায় তাদের সে গৌরব অক্ষুন্ন রাখতে পারি। সৈনিকগণ! শত্রু তোমাদের শক্তির পরিচয় পেয়ে গেছে। আবার তারা আসবে। সকলে প্রস্তুত থেক। রাজা-রাণী সবাই তোমাদেরই সাহস ও বলবীর্য্যের মুখ চেয়ে থাকে।

(বসিলেন ও জয়ধ্বনি)

(কুনাল নৃত্যঅন্তে দুইটি মালা রাজা ও রাণীর পদতলে দিতে গেলে তাঁহারা হাতে করিয়া উহা গ্রহণ করিলেন। জয়ধ্বনি)

[অপরদিকে ভোজনের আয়োজন চলিল—কিছু দূরে এক বালক কোলে ভিখারিণীর প্রবেশ। আহার্য্য চায়, ছেলেটি খাবার জন্য ব্যাকুল। দ্বারপাল নির্য্যাতন করিতে উদ্যত হইলে রাজার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। রাজা সিংহাসন ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া হাত তুলিলে দ্বারপাল আস্তে সরিয়া গেল—রাজা ভিখারিণীর নিকট গিয়া] কি চাও মা। শিশু কাঁদছে কেন?

(দ্বারপাল কি বলিতে গেলে রাজা তাহাকে নিরস্ত করিলেন।)

নারী—(ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া) রাজা! আমার ছেলে অজ্ঞান- বোঝেনা—কিছু আহার্য্য চায়। মা আমি,

কখনও খাওয়াতে পারি নি—তাই মহারাজ কিছু ভিক্ষা চেয়েছি। ছেলেটার কান্না, রাজা! আমায় পাগল করে দেয়। রাজা, মাপ করুন আমার বাছা—সে যে শিশু।

(বলিয়া বালককে বুকে চাপিয়া ধরিয়া রক্ষা করিতে লাগিল)

রাজা—(অগ্রসর হইয়া) জননী! করুণাময় তোমার হাতে আমার আশীর্ব্বাদ দিয়ে ধন্য করেছেন। দে মা! দে! দে! (শিশুকে বক্ষে লইয়া অজস্রধারায় শিশুকে সিক্ত করিয়া) গুরুদেব! মন্ত্রী! দেবতার আশীর্ব্বাদ—রাণী! পুণ্যবতী! এই দেখ ভুরসুটের ভবিষ্যৎ রাজ-বংশধরকে আশীর্ব্বাদ করতে শ্রেষ্ঠ অতিথি এসেছেন—বালকরূপে নারায়ণ এসেছেন—দেবী সুমিত্রা! রাণী! শ্রেষ্ঠ আহার্য্য নিয়ে এস—

(রাণী সুমিত্রা ও হরিদেব সকলের চোখে জল—রাজা ও রাণী বালককে নিকটে বসাইলেন—সুমিত্রা দেবী বালককে নানাপ্রকার আহার্য্য দিলেন—বালক খাইতে লাগিল)

ভিখারিণী—(আনন্দে ও তৃপ্তিতে হাসিকান্নায়. সকলকে মাতাইয়া কহিলেন) হে মহান্ রাজা! আমার বাছা কেমন খাচ্ছে দেখুন!

(মণ্ডপস্থ সকলের আনন্দধ্বনি—মন্ত্রী এবং দীননাথ সকলকে আহারস্থানে আমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যাইতে লাগিলেন। বালকের আহার শেষ হইলে রাণী, সুমিত্রা, হরিদেব ও পূজারী-সহ মন্দিরে গমন করিলেন। রাজা বালককে মাতৃ কোলে দিলে চরণদাস আরও মিষ্টান্ন আনিয়া ভিখারিণীকে দিয়া প্রস্থান—অপর দিকে ভিখারিণীর প্রস্থান—রাজা দাঁড়াইয়া—তাঁহার মুখমণ্ডল স্বর্গীয় ভক্তিতে উদ্ভাসিত—সন্ন্যাসীর প্রবেশ—মুখমণ্ডল অপূর্ব্ব জ্যোতিপূর্ণ—স্বর্গীয় আনন্দোদ্ভাসিত।)

সন্ন্যাসী—মহাপ্রাণ রাজা! আমায় ভিক্ষা দেবে!

রুদ্র—(চমকিত হইয়া ফিরিলেন এবং সম্মুখে অপূর্ব্ব মূর্ত্তি দেখিয়া বিস্ময় বিমোহিত দৃষ্টি—মুখে ভাষা নাই।)

সন্ন্যাসী—রাজা! ভিক্ষা দাও—তোমার এত দয়া—অন্তর তোমার এমন দেববাঞ্ছিত করুণার আধার—আমায় ভিক্ষা দাও মহাত্মন্। আমি ক্ষুধার্ত্ত—আমায় খেতে দাও—

রুদ্র—(সম্বিত ফিরিয়া পাইয়া প্রণামান্তে) আসুন দেব আমি দীন—আমি আপনাকে কি দেব? মহাপুরুষ আপনি, আপনাকে আমার কি আছে—কোন্ ঐশ্বর্য্যের ভিখারী আপনি—আমি আপনাকে ভিক্ষা দেবো?

সন্ন্যাসী—এত বড় রাজ্যের রাজা—ভিক্ষার অভাব তোমার। এত বড় আয়োজন—এমন তোমার প্রাণ—তোমার কাছে ভিক্ষা নাই—কত বড় ভিক্ষা তুমি দিলে রাজা! আমার ভিক্ষা রাজা এই পেয়েছি। (ভিখারী বালকের অভুক্ত উচ্ছিষ্ট উঠাইতে গেলেন)

রুদ্র—(আত্মহারা হইয়া) প্রভু! আমায় দোষী—গুরুদেব! রাণী!! (হরিদেব—শঙ্করী—সুমিত্রা—চন্দন—মন্দির হইতে নিষ্ক্রান্ত সকলে বিস্মিত হইয়া দেখিতেছেন) অপূর্ব্ব ভিখারী এসেছেন দেব! আমি কি করি - কি দেব!—

(সন্ন্যাসীর দিকে অগ্রসর)

(হরিদেব—শঙ্করী—সুমিত্রা ভক্তি আপ্লুত হইয়া অগ্রসর)

সন্ন্যাসী (স্মিত হাস্যে) প্রিয় বৎস! বাংলার গৌরব! আজ তোমার স্নেহের স্পর্শে আমি মোহিত হয়েছি। স্নেহের কাঙাল ঠাকুর আমার এসেছিল তোমার দ্বারে—হরিদেব! মা শঙ্করী! দেখোনি তোমরা? কেমন খেলে হ্যাংলা ঠাকুর আমার। (উচ্ছিষ্ট উঠাইয়া) রাজা! এইত আমার ভিক্ষা—

(রাজা বিস্মিত হইয়া সন্ন্যাসীর দিকে চাহিয়া আছে)

হরিদেব—রাজা! বৎস! আমার গুরুদেব। ভারতের অলৌকিক সন্ন্যাসী আজ শুভদিন সার্থক হোল। গুরুদেব—(সকলের প্রণাম)

শঙ্করী—দেব! এসেছেন—অপার করুণা আপনার। আমার পুত্রের—

সন্ন্যাসী—(রাজাকে সস্নেহে উঠাইয়া) মা শঙ্করী! আসবো বলেছিলাম আমি এসেছি—তোমার সন্তানকে

আশীর্ব্বাদ কর্ত্তে মা! ভুরসুটের এমন উৎসবের দিনে আমি এলাম—চুপ ক'রে থাকতে পারি না।

রুদ্র—রাণী! আজ সৌভাগ্য আমাদের। কি কোর্ব্ব বলুন—আপনাকে তুষ্ট করি কি আছে আমাদের?

সন্ন্যাসী—বাংলা মায়ের পূজা করো রাজা। দেখছো না দেবাদিদেব পাগলা ভোলা আমার মার পূজা করছেন। মা শঙ্করী! তোমাদের রাজ্যে শক্তিপূজার বোধন বসেছে—পাঠান তার পরিচয় পেয়ে গেছে। আমি সব জানি—দিল্লীর সম্রাট সব শুনেছেন। এ রাজ্যে অখণ্ড শান্তি! মা! তাই আজ আবার এলাম আশীর্ব্বাদ কর্ত্তে। হরিদেব! আজ যে প্রাণের পরিচয় পেয়েছি—তোমাদের অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন এবার আমি যাই—

শঙ্করী। মহান্ সন্ন্যাসী! আপনাকে ধরে রাখার শক্তি নাই—তবে আপনারই দয়া—তারই একটু ভিক্ষা—

রুদ্র—মহাত্মন্! আজ এমন দিনে একটু সেবা কোরবো—গুরুদেব!

সন্ন্যাসী—রাজা! চলো—তোমাকে অদেয় আমার কিছু নেই। তোমার মহান হৃদয় ভগবানের আশীষ পূরিত, অশেষ ভাগ্যবান মহাপুরুষ! বাংলার অদ্বিতীয় সন্তান হবে তোমার পুত্র,—সমস্ত বাংলা তার কীর্ত্তি গাইবে—চলো রাজা—তাকে আশীর্ব্বাদ করি—

(সকলের প্রস্থান)

—চতুর্থ দৃশ্য—

দিল্লীর প্রাসাদ

(মানসিংহ, তোডরমল্ল ও বীরবল বসিয়া)

মানসিংহ—সম্রাট আজ এখনও আসছেন না কেন? তোমার কি মনে হয় বীরবল?

বীরবল—আমার মনে হয় তাঁর আসার ইচ্ছা নেই।

তোডরমল্ল—আমার মনে হয় তাঁর শরীর আজ অসুস্থ।

মানসিংহ—তোমাদের অনুমান হয়ত কোনটিই সত্য নয়।

বীরবল—আপনার অনুমানটা কি?

মানসিংহ—সম্রাট এলে বলবো।

বীরবল—আপনার অনুমানের তবে ত দাম আছে। দেখুন এবার থেকে অম্বরপতি একটা কাজ কর্ব্বেন—লড়াই শেষ হয়ে গেলে সৈন্য চালনার মতলব কর্ব্বেন। কেন না তা' হলেই সব জেনে নিয়ে সৈন্য সমাবেশ করতে পার্ব্বেন।

মানসিংহ—কি রকম?

বীরবল—যেমন সম্রাট এলে তাঁর কাছে আসার বিলম্বের কারণ জেনে তবে আপনার অনুমান জানাবেন। আচ্ছা মহারাজ! চিতোরের রাণা প্রতাপটা আপনার মত নয় কেন?

মানসিংহ—(গম্ভীর হইয়া) তাঁকেই জিজ্ঞাসা কর্ব্বেন।

বীরবল—ঐ ত আপনার দোষ। সব ভাল হঠাৎ গম্ভীর হয়ে পড়লে আমার সব গুলিয়ে যায়। রাণা প্রতাপকে জিজ্ঞাসা কর্ব্বার আমার সুবিধা আর হচ্ছে কই? তোডরমল্লজী আপনি মীমাংসা করুন ত! এই ধরুন অম্বরপতি আছেন—আমি আছি—আপনি আছেন—আরও কত সব আছেন এই সভায়। এর মধ্যে রাণা প্রতাপ থাকলে কেমন মানাত? এর উত্তরটা উনি দেবেন না।

মানসিংহ—(কিছু উষ্মার সহিত) বীরবল! হয় ত সে তোমার-আমার চেয়ে বোঝে কম কিম্বা বড় গোঁয়ার—আর না হয়ত আমরা তাকে বোঝাতে পারি নি।

(সম্রাটের প্রবেশ, সকলের অভিবাদন)

আকবর—আমি সব শুনেছি। তোমার শেষের কথাটিই ঠিক। আমরা চিতোরের রাণাকে বোঝাতে পারিনি কিন্তু যদি পারতাম—ভারতের কত বড় সম্পদ হোত! আপনাদের মত তাঁকেও যদি পেতাম—সত্য বলছি মানসিংহ—আমার অন্তরের বাণী পূর্ব্বের গৌরব বুঝি আর ম্লান হতো না—পশ্চিম আকাশে সে ঢলে পড়তো না। অখণ্ড ভারতের শক্তি। আমি ভাবতে পারি না বীরবল—তোডরমল্লজী-এর তুলনা হয় না।

বীরবল। সম্রাট আপনি এত ভাবেন—আমার ত সব গুলিয়ে যায়—

আকবর—(কিছুক্ষণ চিন্তামগ্ন থাকিয়া) ভারতের মানচিত্র মনে কর দেখি। কি নেই এখানে। আমার ত

মনে হয় না এমন কোনও দেশ—যার আকর্ষণ এমন দুর্ব্বার। বীরবল! জাতির পর জাতি এসেছে—দুর্দ্ধর্ষ গ্রীক—শক—হুন—পাঠান—মোগল। এসেছিল তারা যুদ্ধ করতে—এর অঙ্গ থেকে ঐশ্বর্য্য ছিঁড়ে নিতে—কি হলো তাদের? এই দেশটাই তার অমোঘ শক্তি দিয়ে তাদের নিলে টেনে—বৃদ্ধি হলো ভারতের ঐশ্বর্য্য নানা দিকে। ভারত দিলে বিশ্বে সভ্যতার নব নব ছবি—বিশ্বকে করলে মোহিত। (স্থির দৃষ্টি দূরে নিবদ্ধ)

মানসিংহ—মহান্ সম্রাট! আপনার দৃষ্টি অদ্ভুত—আপনার অন্তর বিরাট।

তোডরমল্ল—সম্রাট! এত বড় ভূখণ্ড—এত বড় শক্তি—তবু কেন এর প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হয় না?

বীরবল—ভারতের প্রাণশক্তি জাগিয়ে তুলতে হবে। এতবড় সভ্যতার জন্মস্থান তার আসল আদর্শ হারিয়ে ফেল্লে কিছুতেই সে জাগবে না।

আকবর—ঠিক বলেছ জ্ঞানী! ক্ষুদ্র ভাবের বৈষম্য ছেয়ে ফেলেছে এর আকাশ-বাতাস। আমি চাই, ভারতের শাশ্বত সুন্দর বিকাশ—প্রতাপও চায়। তাই তবু কেন দ্বন্দ্ব হয় জান? মানুষের মজ্জাগত "অহংবাদ"। আমার দেওয়া ঐশ্বর্য্য-সুখ-শান্তি যদি মানুষ না নিলে তবে তার ধ্বংস—সব কীর্ত্তির ধ্বংস—দেশে জ্বলে উঠবে অশান্তির আগুনে। অম্বরপতি! বাংলার খবর বহুদিন পাই নি। একবার রামসিংহ, হঁ্যা তাঁকেই একবার—(দূরে খোজা কুর্ণিশ করিল) কিরে কি চাস তুই?

খোজা—সর্দ্দার রামসিংহ—

আকবর—(ইঙ্গিতে আসিতে বলিলে—রামসিংহ আসিলেন) আপনারই কথা বলছিলাম সর্দ্দার। বাংলার খবর বহুকাল পাইনি—বাংলার খবর সব পাচ্ছেন ত? ভুরসুট—যশোহর—আর আর সব—

মানসিংহ—শাহন্ শাহ। সেই খবর দিতেই আমি এসেছি? ভুরসুটের—

আকবর—ভুরসুট—ভরিশ্রেষ্ঠ—তার রাজা, তার মন্ত্রী দুর্ল্লভ দত্ত বেশ বুদ্ধিমান—হ্যাঁ ভুরসুট পাঠানকে তারা ত বিতাড়িত করেছিল—তার পর মহারাজ মানসিংহ। এই ভুরসুটের দিকে লক্ষ্য রেখো—হ্যাঁ রামসিংহ বলো।

রামসিংহ—পাঠানকে তারা বিদূরিত করেছিল সত্য। কিন্তু ভুরসুট রাজ কিছুকাল পূর্ব্বে একটি নাবালক পুত্র রেখে মারা গেছেন।

আকবর—কি বললে রামসিংহ—কি বললে? রাজা রুদ্রনারায়ণ মারা গেছেন? নাবালক রাজপুত্র—ভুরসুট রাজ্য—রাজসিংহাসন, তাইত মানসিংহ? নাবালক রাজপুত্র—পাঠানরা চতুর্দ্দিকে—

রামসিংহ—ভুরসুটের রাণী—অসামান্যা গুণবতী কিন্তু স্বামীর মৃত্যুতে তিনি রাজকার্য্যে সম্পূর্ণ উদাসীন—রাজ্য চালাচ্ছেন সেনাপতি আর মন্ত্রী।

আকবর—মানসিংহ বীরবল—গোলমাল হয়ে গেল—ভুরসুট রক্ষকবিহীন—চিন্তার বিষয়—

রামসিংহ—যশোহরেও গোলমাল—প্রতাপাদিত্য শক্তি সঞ্চয় করছে।

আকবর। কেন? কেন? তার পিতা—খুল্লতাত রাজা বসন্ত রায়—দেখলে বীরবল বৈষম্য—বাধা অবিশ্বাস—অমন সোনার বাংলা—বীর সন্তান আর জ্ঞানী—মেধাবী—কৌশলী। সব গোলমাল হয়ে গেল। আচ্ছা সর্দ্দার রামসিংহ যান আপনি। (রামসিংহের প্রস্থান ও সম্রাট নিজ আসন হইতে উঠিয়া কিছুক্ষণ গম্ভীর চিন্তায় পরিক্রমণ করিয়া) তোডরমল্লজী! সুবা বাংলার রাজস্ব—বেশ ভালই?

তোডরমল্ল—হঁ্যা—

আকবর—অম্বরপতি, আমি বড় চিন্তায় পড়লুম—আমার কল্পনা কেমন সরল-সুন্দর পথ ধরে চলেছিল—এখন তার গতি হলো রুদ্ধ—এখন সব অন্ধকার—আমি চাই শান্ত স্নেহের বন্ধনে—সাম্যের আধিপত্য বিস্তার কর্ত্তে—খোদা আমায় নিয়ে যাবেন শান্তির চালনায়—একি খেলা খোদা! আল্লা! তোমার মর্জ্জি—তোমার ইচ্ছা—মানুষ কি পারে, বীরবল, তার অন্যথা করতে? (চিন্তা করিয়া) মানসিংহ! প্রস্তুত রেখো সব—বাংলার দিকে দৃষ্টি রেখো, বীরবল, চল বন্ধু যাই ভেবে দেখি।

(সম্রাট ও বীরবলের প্রস্থান।)

মানসিংহ—সম্রাট এত চঞ্চল হলেন কেন?

তোডরমল্ল—বোঝা যায় না ভাই—বোধ হয় সম্রাটের একটা বড় আশা ভেঙ্গে গেছে। চল আর—

মানসিংহ—না—চল যাই— (উভয়ের প্রস্থান।)

[ক্রমশঃ

কবি ঈশ্বর গুপ্ত

রামেন্দ্র দেশমুখ্য

কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের প্রশংসা করিতে হয়। কবি হিসাবে তেমন প্রশংসা করি না কিন্তু প্রশংসা করি অন্য কারণে। আপনাতে তিনি নূতন যুগের ছায়া প্রতিফলিত করিয়াছিলেন, এবং এই কারণেই তিনি প্রশংসাভাজন। কবিতা তিনি অনেক লিখিয়াছেন, কিন্তু সেইগুলি যথার্থ কাব্য-রসোত্তীর্ণ হইয়াছে কিনা, দেখা উচিত। সাধারণ লোকেরা কালকে কাব্য বিচারের কষ্টিপাথর মনে করেন। এই দিক হইতে দেখা যায়—ঈশ্বর গুপ্তের কাব্যযশ মহাকালের (খণ্ড কালের যাহাই হউক) মনোহরণ করিতে পারে নাই। মধুসূদনের যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া ইদানীন্তন কাল পর্য্যন্ত কাব্যের জগতে বহু দিগন্ত উন্মেষিত হইয়াছে। ঈশ্বর গুপ্ত এখন পুরাতন—তিনি আধুনিক মানুষের মনোজয়ে অক্ষম।

বঙ্কিমচন্দ্র মানুষ ঈশ্বর গুপ্তের প্রশংসা করিয়াছেন, কিন্তু কবি ঈশ্বর গুপ্তের তেমন প্রশংসা করেন নাই। বঙ্কিম লিখিয়াছেন—"স্থূলকথা, তাঁর কবিতার অপেক্ষা তিনি অনেক বড় ছিলেন। তাঁহার প্রকৃত পরিচয় তাঁহার কবিতায় নাই। যাঁহারা বিশেষ প্রতিভাশালী, তাঁহারা প্রায়ই আপন সময়ের অগ্রবর্ত্তী। ঈশ্বর গুপ্তও আপন সময়ের অগ্রবর্ত্তী ছিলেন।" বঙ্কিমের এই কথা আমরাও স্বীকার করি। বঙ্কিম বিচার করিয়া দেখাইয়াছেন—ঈশ্বর গুপ্ত পরম দেশবৎসল ছিলেন। ধর্ম্ম সম্বন্ধে গুপ্তকবি যথেষ্ট সংস্কার-বিমুক্ত ছিলেন। রাজনীতির ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন উদারপন্থী। এই সব বিশেষ বিশেষ গুণে ও কারণে তিনি আপনার সৃষ্ট কবিতা হইতেও বড়ো ছিলেন। বঙ্কিমবাবু নিজেই বলিয়াছেন—"ঈশ্বর গুপ্ত যত পদ্য লিখিয়াছেন, এত আর কোন বাঙ্গালী লিখে নাই। গোপালবাবুর অনুমান, তিনি প্রায় পঞ্চাশ হাজার ছত্র পদ্য লিখিয়াছেন।" আশ্চর্য্য, এতো পদ্য লিখিয়াও ঈশ্বর গুপ্ত প্রতিভাবান কবি বলিয়া বিবেচিত হইলেন না।

বঙ্কিমবাবু পদ্য ও কবিতার মধ্যে কতোটা তফাৎবাদ আছে বলিয়া ধারণা করিতেন—জানি না। কিন্তু ঈশ্বর গুপ্ত সম্বন্ধে উপসংহারে যে পদ্য লেখার কথাটা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা আধুনিক্ কাব্য বিচারকের বিবেচ্য। ঈশ্বর গুপ্ত মিল দিয়া ছন্দের মন বাজাইয়া পদ্যই লিখিয়াছেন, কিন্তু যে সূক্ষ্ম রসবোধ থাকিলে কাব্যসৃষ্টি সম্ভব হয়, তাহা তাঁহার ছিল না। আমরা আধুনিক যুগে পদ্য ও কবিতার মধ্যে স্পষ্টতই একটা সীমারেখা টানিয়া লই। ঈশ্বর গুপ্ত আমাদের বিচারে মুখ্যতো পদ্য লেখক।

রবীন্দ্রনাথ বিহারীলালের প্রতিভাকে মর্য্যাদামণ্ডিত করিয়াছেন, কিন্তু ঈশ্বর গুপ্তকে তেমন করিয়াছেন কি? আধুনিক যুগ তো ঈশ্বর গুপ্তকে ভুলিতেই চলিয়াছে। কিন্তু ঈশ্বর গুপ্তকে একেবারে অস্বীকার করিলে যে চলে না—তাহাই এই প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয়।

প্রথমে ঈশ্বর গুপ্তের সময় বিচার্য্য। পণ্ডিতেরা বলেন, গুপ্তমহাশয় নূতন ও পুরাতন যুগের সন্ধিসময়ের কবি। ভারতচন্দ্রের পরে পাঁচালীর যুগ। গুপ্তকবি এই পাঁচালীর যুগে বর্ত্তমান। তিনি নিজে পাঁচালীকারও। ঈশ্বর গুপ্তের পরে যে নূতন কাব্যযুগের কথা বলিতেছি, তাহার উদ্গাতা মধুসূদন। প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক বঙ্কিম ইতিপূর্ব্বে কাব্য লেখা খানিকটা অভ্যাস করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহা মধুসূদনের সহিত বিচারে উল্লেখযোগ্য নয়। বঙ্কিমের সেই লেখা গুপ্তকবি দ্বারা প্রভাবিত এবং সেই জন্য পদ্যের অভিশপ্ত চক্রকে ছাড়াইয়া উঠিতে পারে নাই।

ঈশ্বর গুপ্ত নূতন ও পুরাতন যুগের মধ্যস্থ ছিলেন। এক শতাব্দীর মতো সময়ের পরে আমরা মধ্যস্থ মানুষটিকে ভুলিতে চলিয়াছি। কিন্তু ইতিহাসের সহিত যোগ রাখিয়া যাঁহারা বিচারক্ষম মন লইয়া কাব্য পাঠ করেন, তাঁহাদের এই মধ্যস্থ মানুষটিকে ভুলা উচিত নয়।

একটা কথা স্বতঃই মনে হয়। ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা কিছুমাত্রও আবেগবাহী নয় কেন? এতো ছড়া আর পদ্যের মালা তিনি গাঁথিলেন, অথচ কোনো বিশেষ মুহূর্ত্তে, নিভৃত অবসরে তাহা আবৃত্তিযোগ্য বা মনে মনে উদ্ধারযোগ্য হইল না। এই দেশে সংস্কৃত যুগের কবিরা কতো চমৎকার কাব্য সৃষ্টি করিলেন। না-হয়, সে যুগকেও ভুলিয়া গেলাম। কিন্তু চৈতন্যোত্তর বঙ্গে বৈষ্ণব পদাবলী তো মানুষের মনে অপরূপ অনুভূতি সঞ্চারিত করিয়াছে। পাঁচালীকারেরাও কম করিয়া হউক কোমল ও করুণভাবের সাধনা করিয়াছেন। কিন্তু ঈশ্বর গুপ্ত তেমন সতোৎসারিত কই—তাঁহার কবিতা তেমন তড়িৎভাবসঞ্চারী কোথায়? একটা জিনিষ চোখে পড়ে। মধুসূদন, বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ সকলেই বৈষ্ণব-কাব্যের যথেষ্ট অনুশীলন করিয়া গিয়াছেন—তাহার প্রমাণ আছে। মনের গভীরে ইঁহারা বৈষ্ণব কাব্য হইতে রসনির্য্যাস আস্বাদন করিয়াছিলেন। কিন্তু ঈশ্বর গুপ্ত বোধ করি তেমন করেন নাই—করিবার তেমন সুযোগ পাইয়াছিলেন কি না, কে জানে! গুপ্তকবি পাঁচালীযুগের অনুশীলন করিলেন। এবং ভারতচন্দ্রের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বৈষ্ণব কাব্যের সৌন্দর্য্যের ও মাধুর্য্যের কথা ভুলিলেন। শুধু অলঙ্কারের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া তিনি শব্দ চয়ন করিলেন, কিন্তু শব্দের রসগত যাদুশক্তিকে মোটেই পরীক্ষা করিয়া লইলেন না। শ্রুতিকেই শুধু সন্তুষ্ট করিলেন, কিন্তু আমাদের রসপিপাসু অন্তরসত্তাকে ভুলিলেন।

'সংবাদপ্রভাকর' পত্রিকা প্রকাশ গুপ্তকবির শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তিসমূহের একতম বটে। সংবাদপ্রভাকরে তিনি একদিকে যেমন কবি—অন্যদিকে তেমনি কাব্যবিচারক। অনেকে নামে-বেনামীতে এই পত্রিকায় পদ্য লেখা (ছড়া?) অভ্যাস করিতেন। ঈশ্বর গুপ্ত সেই সবের উপর টীকা-টিপ্পনী কাটিতেন। তিনি কাব্যোৎসাহী ছিলেন, এই কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

ঈশ্বর গুপ্তের যিনি আদর্শ ছিলেন, তিনি ছিলেন আরো এক শতাব্দীর আগের লোক। সভাকবি ভারতচন্দ্র ছাড়া প্রথিতনামা অন্য এমন কেউই ছিলেন না, যিনি গুপ্তকবির আদর্শ হইতে পারেন। পশ্চাৎ ফিরিতে ফিরিতে এই ভারতচন্দ্রকেই চোখে পড়ে। ঈশ্বর গুপ্তের আদর্শ ভারতচন্দ্রে স্থাপিত হইলেও তিনি বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতকে ভুলেন নাই। তিনি কাব্যনির্ম্মাতা হিসাবে একটা বিশেষ দায়িত্ব অনুভব করিতেন। সে দায়িত্ব হইল ভাবী লেখক প্রস্তুতির। সেই কারণেই তিনি পাঁচালী যুগের গহ্বর হইতে সাহিত্যের গড্ডালিকা-স্রোতের অব্যাহতি দিবার জন্য সংবাদপ্রভাকরে ইংরাজীর অনুবাদ, কাব্যভঙ্গীর অনুবাদ, কাব্যরূপের অনুবাদ করিতে তৎকালীন লেখকগোষ্ঠীকে উৎসাহিত করিতেন। বাংলা সাহিত্যে নানান ছন্দের প্রবর্ত্তনা এবং সম্ভাবনার প্রাচীন ইতিহাস অনেকটা এইখানেই সংরক্ষিত। আর অনেকটা বৈষ্ণব কবিদের পদাবলী কাব্যে নিহিত।

গুপ্তকবি একদিকে যেমন ভারতচন্দ্র ও পাঁচালীর যুগ হইতে মধুসূদনের যুগ পর্য্যন্ত কাব্যের সেতু-নির্ম্মাতা, অন্যদিকে তিনি সংস্কৃতানুগ এবং আধুনিক প্রচলিত ভাষার মাঝামাঝি, অর্থাৎ, কাব্য ও ভাষা—এই দুইয়ের ব্যাপারেই তিনি মধ্যস্থ। গদ্যের ভাষা স্রষ্টা হিসাবে টেকচাঁদ যেমন মধ্যস্থ, সেইরূপ। ইহার কারণ অনুসন্ধেয়। দেশে ইংরাজী শিক্ষার প্রবর্ত্তন হইয়াছে। টোল, মক্তব প্রভৃতি ক্লাসিকেল ও পুরাতন ভাষায় শিক্ষাদানের কার্য্যের গতি অনেকটা মন্থর। অন্যদিকে ইংরাজীর ছায়ায় পুষ্ট নূতন সাহিত্যের সম্ভাবনার আকাঙ্ক্ষা লেখকগোষ্ঠীর মনের চেতনে বা অবচেতনে ছায়া ফেলিয়াছে। সুতরাং ঈশ্বর গুপ্তের এইপ্রকার ভাব ও ভাষায় মাধ্যমিকতা তেমন অদ্ভুত কিছু নয়। এই যুগকে ধারণ করিতে হইবে বলিয়াই গুপ্তকবিকে মধ্যস্থ হইতে হইল।

মাঝে মাঝে ভাবি, ইংরেজেরা এদেশে না-আসিলে বাংলাভাষা কি রূপ পাইত! অন্ততঃ গদ্যটা কি রূপ পাইত? কাব্য যে একটা বিশিষ্টরূপ নিয়াছিল, তাহা বৈষ্ণব পদাবলী নিঃসন্দেহে প্রমাণ করিবে। এবং এই সঙ্গে স্বতঃই মনে হয় যে, ইংরেজের আগমনে বাংলাকাব্য মধুসূদনের কাল পর্য্যন্ত খানিকটা পিছাইয়া পড়িয়া পুনরায় অগ্রসর হইয়াছে। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিতেরা সংস্কৃত-ফার্সী ভাষার অত্যধিক পরিমাণে আরব

মিশাইয়া ফেলিয়াছিলেন। অবশেষে অনেক বছর পরে খানিকটা বিদ্যাসাগরে, অক্ষয়চন্দ্রে এবং বঙ্কিম ও সঞ্জীবচন্দ্রে বাংলাভাষা আত্মস্থ হইল। আগে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা স্পষ্টতই সত্য যে, পশ্চাতের বৈষ্ণব পদকাব্যের যুগকে যিনি ধারণ করিতে পারিয়াছেন তিনিই বাংলা ভাষার ও কাব্যের গতি, সৌন্দর্য্য ও কাঠামো ধরিতে পারিয়াছেন। প্রমাণ, মধুসূদন বঙ্কিম—রবীন্দ্রনাথ।

রাম বসু, হরু ঠাকুরের পাঁচালী গান দেশের জনসাধারণকে মুগ্ধ করিয়াছিল। কিন্তু গুপ্তকবি আসরের কবি নন। সেই হিসাবেও তিনি গুপ্ত বটে। কমবেশী যে তিনি ইন্‌ট্যালাকচুয়েল ছিলেন, এ কথা আমরা স্বীকার করি। এ কথা মনে রাখিতে হইবে যে, তিনি দীনবন্ধু, বঙ্কিম এবং দ্বারকানাথের সাহিত্যক গুরু। তিনি নেতার আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। কিন্তু তথাপি তিনি গুপ্তকবি।

কোথায় এমন কি যেন রহিয়াছিল, যাহাতে তিনি সম্পূর্ণ বিকশিত হইতে পারেন নাই। সমস্ত জীবনে যিনি এতো মালার পর মালা গাঁথিয়া 'মন্দকবিযশঃপ্রার্থী' হইলেন, তাঁহার এই আজীবনের শ্রম এবং আকাজ্ক্ষা কোথায় কি দোষে যেন নষ্ট হইয়া গেল! একটা সকরুণ ব্যর্থতা এবং ভ্রষ্ট হইবার ইতিহাস। ঈশ্বর গুপ্তের কবিতায় এতো অনুপ্রাস—যমকের ছটা, এতো নুপুরনিক্কণ, এ শুধু এক প্রাচীন আমলকে স্মরণ করায়, আর মনে ব্যর্থ কবির জন্য বেদনা আনে।

গুপ্তকবির কাব্যের বিষয়বস্তু প্রচুর। দেশবাৎসল্য—ধর্ম্ম—রাজনীতি, ঋতুবর্ণনা, নীতিকথা, ঈশ্বরভক্তি সমস্তই তাঁহার কাব্যের উপজীব্য। সব কিছুতেই কবিতা হয়, তিনি ধারণা করিয়াছিলেন। ধারণাটা ইদানীং গদ্যকবিতার যুগে হয়তো সত্য হইতে চলিয়াছে। কিন্তু সব কিছুতে কবিতা হইবার ব্যাপারে আর একটা জিনিষ পরিবেশন করা চাই, যাহা তিনি করিতে পারেন নাই। এক কথায় কাব্যের রসসত্তাকে তিনি জাগাইতে পারেন নাই। বর্ণনা না হয় তিনি হুবহু করিলেন, কিন্তু আর্টের কাজ তো ফটোগ্রাফির কাজ নয়। সেই জন্যই তিনি ব্যর্থ।

সাধারণ জিনিষের উপর তিনি বহু গম্ভীর কথা বলিয়াছেন। ব্যঙ্গ-রচনার মধ্য দিয়া হাস্যরসের আমদানী করিয়াছেন। হাস্যে ও করুণে, কোমলে ও কঠিনে, হাল্‌কা ও গম্ভীরে তিনি বহু ভাবের স্রষ্টা। বহু স্থলে তিনি রসাভাসের সৃষ্টি করিয়াছেন—টাল সামলাইতে পারেন নাই। কিন্তু তবু পরবর্ত্তী যুগের লেখকদের লাভ হইয়াছে। গুপ্তকবির এক্সপেরিমেণ্টকে নূতন লেখকেরা নূতন সম্ভাবনার পথে অগ্রসারী করিতে পারিলেন। একটা কথা সত্য, যেমন ইদানীং যুগে রবীন্দ্রজীবনে সত্য যে—কবির জীবনে বহুর প্রকাশ হইয়াছিল। তিনি জার্নালিষ্ট, নীতিবিদ্, নাট্যকার, নিবন্ধলেখক, দেশপ্রেমিক, রাজনীতিবিদ্, ভক্ত এবং গীতিলেখক ও কবি। (আবার একেবারে একান্ত আধুনিক যুগে প্রায় লেখকেরই এই সমস্ত গুণ আছে।)

তিনি শব্দকুশলী কবি, সন্দেহ নাই। সৌন্দর্য্যবোধও যে কমবেশী ছিল, এ কথা স্বীকার্য্য। অনেক স্থানে ভাষা প্রকৃতজনের মৌখিক আলাপের কাছাকাছি গিয়াছে বলিয়া কাব্যের ভাষাগঠনে তাঁহার আংশিক কৃতিত্ব স্বীকার করি। ছন্দ নির্ম্মাণেও কুশলতা আছে। তথাপি একটি 'কিন্তু' রহিয়া গেল। অর্থাৎ গুপ্তকবির কাব্যে তত্ত্ব আছে, তথ্য আছে, কিন্তু কাব্যসত্যটুকু কোথায় যেন গুপ্ত রহিয়াছে।

এইবার ঈশ্বর গুপ্তের কবিমানস সংক্ষেপে বিচার্য্য। ঈশ্বর গুপ্ত ভক্ত এবং ধার্ম্মিক। তিনি পরমার্থের উপর কবিতা লিখিয়াছেন। সমস্ত কাব্যসৃষ্টির অন্তরালে একটা ধর্ম্মসন্ধানী মনোবৃত্তিকে আমরা অস্বীকার করিতে পারি না। বঙ্কিম বাবু জনাইয়াছেন, ঈশ্বর গুপ্ত এক সময়ে ব্রাহ্ম ছিলেন এবং তিনি যথেষ্ট মনোযোগ সহকারে শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করিতেন। 'সংবাদপ্রভাকরে' গুপ্তকবির প্রচারক মনোবৃত্তির সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছি। আমরা দেখিয়াছি, ঈশ্বর গুপ্ত যুক্তিবাদী। একান্ত তুচ্ছ এবং রিয়াল জিনিষের উপর তিনি কাব্য সৃষ্টির চেষ্টা করিয়াছেন এবং এই হিসাবে রিয়ালিষ্ট। অতঃপর পণ্ডিতদের মতে মত মিলাইয়া আমি বলিতে চাই—ঈশ্বর গুপ্তের জীবনে নানান দ্বন্দ্ব জটিল হইয়া বিরাজ

করিত। দ্বন্দ্ব—নূতন ও পুরাতন আদর্শের, দ্বন্দ্ব—আইডিয়াল ও রিয়ালের। কবি এই দ্বন্দ্বকে অতিক্রম করিতে পারেন নাই। এই জন্যই তিনি শুধু কবিতার পরীক্ষা লইয়া জীবন কাটাইলেন। নূতন শব্দ প্রয়োগ করিলেন। অপাংক্তেয় শব্দকে পাংক্তেয় করিলেন। নূতন ছন্দ লইয়া নাড়াচাড়া করিলেন। আবার অন্যদিকে তিনি পূর্ব্ববর্ত্তী কবিদের নষ্ট রচনা উদ্ধার করিলেন। ভারতচন্দ্রের কবিতার প্রতি অত্যধিক অনুরাগবশতঃ "কবিবর ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের জীবনবৃত্তান্ত" লিখিলেন। রামপ্রসাদের কালীকীর্ত্তনও প্রকাশ করিলেন। সংস্কৃত নাটক 'প্রবোধচন্দ্রোদয়" অবলম্বনে "বোধেন্দুবিকাশ" প্রণয়ন করিলেন। জীবন ব্যয়িত হইল পুরাতন ও নূতন যুগের মালমশলা সংগ্রহে এবং সৃষ্টিতে।

শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেন বলেন, "মধুসূদন ছিলেন বড়ো নির্ম্মাতা, ভারতচন্দ্র ছিলেন বড়ো নির্ম্মাতা এবং পণ্ডিত, আর ঈশ্বর গুপ্ত ছিলেন আসল সমজদার। ঈশ্বর গুপ্ত বেশী কিছু করে উঠতে পারেন নি। কিন্তু বুঝেছিলেন প্রচুর। ঈশ্বর গুপ্তের একটি সমগ্র দৃষ্টি ছিল। তিনি ছিলেন সাহিত্যের অর্গেনাইজার। গুপ্তকবি সাহিত্যে নেতৃত্বের প্রয়োজন সাধন করেছিলেন।"

ঈশ্বর গুপ্তের অধিকাংশ পদ্যই ছড়াজাতীয়। আনারস সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন—

বন হতে এল এক টিয়ে মনোহর।
সোনার টোপর শোভে মাথার উপর ॥
এমন মোহন সৃষ্টি দেখিতে না পাই।
অপরূপ চারুরূপ অনুরূপ নাই ॥

এ যেন একেবারে ছেলে ভুলানো ছড়া হইয়া গিয়াছে।

সত্যকার কাব্যে একটা জিনিষ বিশেষ লক্ষণীয়। কবিতা যে ভাব বহন করে, তাহার জন্য উপযুক্ত শব্দও নিয়োজিত হয়। তপোবনে দুষ্মন্ত যখন শকুন্তলার সহিত অনুরাগাত্মক কথা বলিবেন, তখন তাহার জন্য কালিদাস উপযুক্ত শব্দও তৈয়ারী করিয়া রাখিবেন। ঈশ্বর গুপ্তের যমক অনুপ্রাস ভাবের পরিপূরক হয় নাই। মাঝে মাঝে মনে হয়, গুপ্তকবি শুধু অনর্থক শব্দের কচ্‌কচি সৃষ্টি করিতেছেন। এ ছাড়া মাঝে মাঝে এমন কবিতারও সাক্ষাৎ মিলে যেখানে মনে হয় আমরা শুধু মামুলি নীতিকথাত্মক ছড়া শুনিতেছি।

উপসংহারে এই কথা বলিতে চাই যে—ঈশ্বরগুপ্তের পদ্য লইয়া বিশেষতঃ ছন্দ লইয়া কিছু আলোচনা অবশ্যই চলিতে পারে। কিন্তু ভয়ে ভয়ে তাহা বাদ দিতেছি, কেননা গোড়াতেই তাঁহাকে কবি বলিয়া স্বীকার করি নাই। দ্বিতীয়ত, ঈশ্বর গুপ্তের পদ্য লইয়া এবম্বিধ আলোচনা করিলে পাঠকদের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিতে পারে।

কামারখানা

শ্রীজনরঞ্জন রায়

গয়ায় একটা সরাই, শহরে ঢুকিতেই পাঁচমাথা রাস্তার উপর। তা'র পাশেই একটা কামারখানা। তা'তে সাইনবোর্ড ঝুলিতেছে 'সেনেজ ওয়েল্ডিং' লেখা—কাঁচা হাতে, ভুল বানানে, ইংরেজি হরফে। গয়ায় ঢোকে যত বাস্-ট্রাক্, তার ড্রাইভার ক্লীনার থেকে কন্‌ডক্টার—সবাই রাত্রে আড্ডা দেয় এখানে। রাত দুপুর পর্য্যন্ত হৈ-হল্লা করিয়া শুইয়া পড়ে এইসব শুকনো চেহারা হটকা শিখ-পাঞ্জাবী-বিহারী পাগড়ীধারীর দল। রাত শেষে কে কোথায় পাড়ি দেয়। ফেলিয়া যায় বেমেরামত কোন কোন গাড়ি। যেগুলোর মেরামত চলে গোটা দিনটা ঐ কামারখানায়। তাই কাজ প্রায়ই পড়িয়া থাকে না। কোন ড্রাইভারও বড় একটা আটকাইয়া পড়ে না অনিলের গাফেলতিতে। তবে কিছুদিন থেকেই একটা আধ টনের লরী ভেলা গাছের তলায় যেন বোরখা আঁটিয়া পড়িয়া আছে। তার একটা দুমড়াইয়া যাওয়া নল না'কি অনিল মেরামত করিয়া উঠিতে পারিতেছে না—কত খাদের ঝাল দিলে জোড়া যাইবে তাহার হদিস্ মিলিতেছে না। তাই লরীর মালিকরা আটকাইয়া পড়িয়াছে। তারা কিন্তু গা ঢাকা দিয়া রাত কাটায়। দিনে যখন সরাইটা ফাঁকা হইয়া যায়, তখন কোথা থেকে গুটি-গুটি বাহির হইয়া সরাইয়ের মাটকোঠার দোতলায় জমায়েৎ হয়। ডিমসিদ্ধ, রুটি-মাখন বাহির করে···প্রাতরাশের সময় অনিল আসিয়া পড়িলেও তা'কে কমরেড্ বলিয়া সম্বোধন করে··কামার বলিয়া ঘৃণা না করিয়া নিজেরা যা' খায় তা'কেও ডিস-পেয়ালায় সাজাইয়া তা' দেয়।

—আশ্চর্য্য হইয়া যায় অনিল। সে মনে মনে ভাবে, তা'র আভিজাত্য তো কিছুই এখন নাই—সব ধুইয়া মুছিয়া গিয়াছে কোথায় কোনদিন, পেটের দায়ে সে না করিয়াছে কি? শেষে হাতুড়ি-পেটা শিখিয়াছে···দারুণ মূর্খ সে। বাঁচিতে হইবে এই শুধু তাঁর পণ। রূপ হয়তো ছিল···আগুণের হাপরের আঁচে তামাটে হইয়া গিয়াছে গা-মুখ।...মাংসপেশীগুলো লোহার মত শক্ত হইয়া গিয়াছে। যৌবন আছে···কিন্তু চোখে যৌবনের স্বপ্ন নাই।—তবুও সাহেবগুলো কি দেখিল তা'র মধ্যে যা'র আদর করে! একদিন সে মেয়টিকে জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল—তা'র কোন গুণ নেই তবু তাঁরা কেন তা'কে ভাইয়ের মতো দেখেন? উত্তরে মেম বলিল—যে বাঁচতে চায় তা'কে আমরা বেশি আদর করি··· তোমরা দু'ভাই সারাদিন হাড়ভাঙা খাটো···লেখাপড়া জাননা ব'লে ছোট হয়ে থাকো কেন? ইঞ্জিনীয়ারের ছেলে তোমরা···কত সহজে কলকব্জা সারিয়ে ফেল। আমরা তারিফ করি তোমাদের। বাঁচবে দুনিয়ায় যা'রা, তোমরা সেই দলের লোক। নিয়ে যাবো আমরা তোমায় সেই দেশে যেখানে জীয়ন্ত জাত গড়ে' উঠছে··· সেখান থেকে ফিরে এসে তুমি তোমার দেশের ভাইদের জীয়ন্ত করবে।—যাবে সে দেশে আমাদের সঙ্গে? অনিল না বুঝিয়াই ঘাড় নাড়িয়া জানায়, যাবে।

এ'দের দলের পাঁচজনের মধ্যে একজন মেয়ে। পুরুষ চারজনের চেয়ে সেই যেন বেশি জানে-শোনে। সেপাইদের মতোই পোষাক আঁটা···মিলিটারী ব্যাগ পাঁচ-ছয়টা ঝুলিতেছে বুকে-পিঠে। ঘরের টেবিলে ফটো-নক্‌সা-স্কেল-কম্পাস লইয়া খুব মাথা ঘামায়। নিজের দেশের ভাষায় কত কি বলে, অন্য কেহই বোঝে না। কখন কখন অনিলের কামারখানায় আসিয়া বসে··· তা'রা দুই ভাইয়ে কূল-কিনারা করিতে পারে না যে সব কলকব্জার সারানি কাজের, চোখের নিমেষে সেগুলোর কর্ম্মকৌশল হাতে-কলমে শিখাইয়া দেয়।

সেদিন ভোর না হইতেই মিশিরের আবির্ভাব হইল অনিলের কামারখানায়। অনেক দিন সে আসে নাই। সে প্রথমে ছিল অনিলের মহাজন, এখন সেই এই

কারখানার মালিক। যদিও কাগজে-কলমে নয়। সে টাকা ধার দিতে দিতে মালিকানার দাবি করে গয়া থেকে পাটনা পর্য্যন্ত এইরূপ একটানা অনেকগুলি ওয়েল্ডিং দোকানের। অনিলের বাপের অধীনে রেলের কামারশালার মিস্ত্রী ছিল এই শিউশঙ্কর মিশির। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে দুনিয়াশুদ্ধ যখন পুরাতন বাস-ট্রাকে ছাইয়া গেল, মিশির তখন সস্তা দরে একখানা এক টনী ট্রাক্ কেনে। তাহাতে হরেক জিনিষ লেন-দেন করিয়া লাভ হয় প্রচুর। তখন আরও এক জোড়া ট্রাক কিনিল···তাহার পরেও দুইজোড়া কেনে। এগুলোর খরচায় সারানো হয় তার এইসব ওয়েল্ডিং দোকান-গুলোয়। মিশিরকে অনিল যাহা দেয় তাহাতে সুদের সুদ পোষাইয়া যায়—এই জন্যই অনিলের দোকানের মালিকানা নিয়া মিশির ঘাঁটাঘাঁটি করে না। অনিল যে তাহার এক সময়ের মনিবপুত্র, তাই কৃতজ্ঞতার জন্য মিশির এইরূপ করে না। যখন ইঞ্জিনীয়ার মদ খাইয়া মারা গেল···বাপের গয়া দিতে আসিয়া পেটের দায়ে এই কামারখানার বুড়ো কামারের কাছে কচি ভাইটিকে নিয়া অনিল হাতুড়ি পিটাইতে লাগিয়া গেল···তখনো মিশির তাকাইয়া দেখে নাই। তারপর বুড়ো কামার মরিয়া গেল...চলে না তাদের সংসার। অনিল মতলব আঁটিল। মা'কে বলিল কে তোমার কোথায় আত্মীয় আছে···কুমীরের মতো চোখের জল ফেলে যাহারা, তাহাদের ঠিকানা দাও তো···দেখে আসি কে কেমন লোক। শুধু হাতে সে বাহির হইয়া পড়ে সেই কামারখানায় মা-ভাইকে রাখিয়া। মা মরিয়া গিয়াছে···কাচা পড়িয়া ঘোরে বিনা টিকিটে বাঙলা-বিহার উড়িষ্যা। খড়্গপুরের মাসী বোনের জন্য কাঁদে-কাটে বেশী।···সেই সুযোগে ক্যাস্ বাক্স থেকে তার সোনার চুড়ি লইয়া পিতলের চুড়ি রাখিয়া পাড়ি দেয় অনিল কলিকাতায়।···টিকেট চেকার ধরে।···কিন্তু রাত ভালো—ধনরত্নের সঙ্গে স্ত্রীরত্ন সঙ্গে নিয়া ফেরে।

আবার আসিয়া সে কামারখানা গড়ে···কিন্তু চলে খুব দমিয়া। হঠাৎ আরো সুযোগ আসিয়া যায়—যখন মিশির তাহাকে বলে, সব যন্ত্রপাতি সেই কিনিয়া দিবে··· সে হইবে মালিক···অনিল ম্যানেজার। ধূর্ত্ত অনিল এক কথায় রাজি হয়। তারপর মিশিরের ভাগ্য খুলিয়া গিয়াছে···সে এখন বড় রকমের কালোবাজারী। তাহার ট্রাকগুলো হর-হামেসা ছুটাছুটি করে চোরা সওদা লইয়া। তাহার পুরা কংগ্রেসী পোষাক—খদ্দর,গান্ধীটুপি,স্যাণ্ডেল। কিন্তু সে এক চোখ টিপিয়া, আর একটা চোখ বড় করিয়া ভ্রূ কুঁচকাইয়া চাহিয়া দেখিতেছে ঐ সাহেবগুলোকে। তার ভঙ্গি দেখিয়া অনিল ঘাবড়াইয়া গেল। মিশির খুঁটাইয়া খুঁটাইয়া লক্ষ্য করিয়াছে সায়েবদের সব কিছু। তাহার সঙ্গে আবার মির বাহাদুরও সব লক্ষ্য করিতেছে। মির বাহাদুর নেপালী, লড়াই ফেরত সেপাই। সে-ই মিশিরের দেহরক্ষী। সর্ব্বদা মিশিরের সঙ্গে থাকে। মিশির প্রথমেই লক্ষ্য করিল অনিলের কামারখানার চেহারা কী বদলাইয়াছে? দেখিল পাশের সরাইটিতে মাটকোঠার দোতলা হইয়াছে। সেই সরাইটির নীচের তলায় একটি খাবারের দোকান, একটি মনোহারী দোকান —সবকিছু চালায় অনিলের অন্দরের মেয়েরা। সরাইয়ের পিছনদিকটা অন্দর। অনিলরা থাকে সেখানে। দূরে পাহাড় টিলায় খোলার ঘরে আর তা'রা থাকে না। সেখানে সায়েবদের গোপন নিবাস। সায়েবরা দিনে সরাইয়ের মাটকোঠায় আসিলে অনিলের ছোট ছেলেমেয়ে দুইটিকে কত চুমো খায় কত বিস্কুট দেয়। মিশির যেন মনে মনে ঠিক করিয়া লইয়াছে কে এ'রা···কি করিতে হইবে এ'দের জন্য। অনিল দেখে মির বাহাদুর তাহার অন্দরের দিকে ঘোরে। অনিল খুব অস্বস্তি পায়।

তৃতীয় দিনে সন্ধ্যার পর অনিল দেখিল মিশির সরিয়া পড়িবার যোগাড় করিতেছে। এই তিন দিন গোপনে গোপনে সে তার ট্রাক নিয়া কত কারবার করিল। আজ ট্রাক বোঝাই মাল, ত্রিপল ঢাকা, কাছি দিয়া বাঁধা। কালো স্থূলকায় মিশির—পেটের ভুঁড়িটা খোলাই থাকে· ভুঁড়ির নীচে লম্বা থলেতে নোট বোঝাই, কোমরের সঙ্গে বাঁধা। ট্রাকে একটা কামরা আছে, তাহাতেই রাত কাটায়। পাশে থাকে মির বাহাদুর। আজ সন্ধ্যা লাগিতেই মিশির তা'র ট্রাকের কামরায় ঢুকিল। মির বাহাদুরকে ফিস্ ফিস্ করিয়া কি বলিল। তাহাদের ভঙ্গি হইতে অনিল বুঝিল সেই রাত্রেই তাহারা পলাইবার মতলব করিতেছে। তার-

পর কালাচাঁদের ঘোরে ঢুলিতে ঢুলিতে অঘোরে নাক ডাকাইতে লাগিল মিশির। তার হাত দুইটা নোটের থলির উপর...একবার পড়িতেছে, আবার উঠিতেছে। মির বাহাদুর অভ্যাসমতো গাড়ীখানার চারিদিকে সজাগ পাহাড়া দিতেছে। পোষাক আঁটা, বুট পায়ে, মাথায় মিলিটারী ক্যাপ। নিশীথ রাতে খট্-খট্-খট্—সমান তালে তাহার বুটের শব্দ শোনা যাইতেছে। অনিল অন্দরের দিকে শুইতে যাইতেছিল, শুনিতে পাইল মিশিরের ড্রাইভার মির বাহাদুরকে বলিতেছে—আজ এক ঘুমের পরেই হাওলা, অমুক দিকে। ড্রাইভার অনুযোগ করে—এই ঘুট্‌ঘুটে রাতে, ঐ রাস্তায়...শুধু খারাপ রাস্তা নয়, ডাকাতের আড্ডা ওদিকে! মির বাহাদুর উত্তর দেয়—চোরাকারবারী তবে কি দিনে যাবে...সদর রাস্তা দিয়ে? ড্রাইভার বলিল—এমন ঝুঁকির কাজে মানুষ থাকে...চোর বেটার ভুঁড়ি ফুলছে...আর দশ-পাঁচ টাকা বেশী মাইনের জন্যে আমরা সর্ব্বদা চলেছি প্রাণ হাতে করে! ...তারপর স্বগত বলে—তোমার তো মরবার ভয় নেই বুনো নেপালী!—মির বাহাদুর যেন শুনিয়াও শুনিল না শেষের কথাগুলো।

রোঁদ্ দিতে-দিতে মির বাহাদুর কি যেন একটা মতলব ভাঁজিতেছে...ঘাড় চালিতেছে...হাত ছুঁড়িতেছে ...মুখভঙ্গি করিতেছে। অনিলের অন্দরের দিকে চাহিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিল মির বাহাদুর। সে ধীরে ধীরে কামারখানায় গেল। এখনও হাপরের আগুণ নিভে নাই। কুলুপ ঝুলিতেছে কারখানা ঘরে। তার সামনেই খাটিয়ায় অনিলের ভাই সুনীল নিশ্চিন্তে ঘুমাইতেছে। কামারখানার পাশেই অনিলের ভাবি গ্যারেজ আর পেট্রোল-পাম্প তৈয়ারীর মাল-মশলা গাদা হইয়া আছে। সেখান হইতে মির বাহাদুর সরাইয়ের দিকে আসিল, শিখ আর পাঞ্জাবীগুলো কে কোথায় নিজেদের গাড়ীতে পড়িয়া ঘুমাইতেছে। তারপর দেখিল অনিল তাহার অন্দরের খিড়কী দরজা দিয়া বাহির হইতেছে। সে বাহির হইতে দরজায় শিকলটা তুলিয়া দিল। মির বাহাদুর তাড়াতাড়ি আড়ালে গা ঢাকা দিল। সেখান হইতে লক্ষ্য করিল অনিল চলিয়াছে ঐ পাহাড় টিলায় খোলার ঘরটারদিকে, যেখানে সায়েবগুলো থাকে। ভাবিল ডাকিয়া বলে—বোনাহি ও-পথে বেশী আগাইও না...ও'রা সব দুষমন! মির বাহাদুর ইদানীং মিশিরের সঙ্গে আসিলেই অনিলকে বোনাহি বলিয়া ডাকিত। কিন্তু এবার ডাকিতে পারিল না। অনিল একেবারে দৃষ্টির আড়ালে গেলে মির বাহাদুর চারিদিকে ভাল করিয়া চাহিল। নাঃ—কোথাও কেহ জাগিয়া নাই, তবে একটু কাকজ্যোৎস্না উঠিয়াছে। সে আস্তে-আস্তে খিড়কীতে আসিয়া শিকলটা খুলিল। দরজাটা ঠেলিয়া দিল। শব্দ হইল একটু। তাই সে অপেক্ষা করিল। তারপর অন্দরে ঢুকিল।

তাহার পা যেন জড়াইয়া আসিতেছে। কি জানি কোনো বিভ্রাট ঘটিয়া না যায় এইরূপ দ্বিধা আসিল তাহার মনে। তবুও সাহস করিয়া পা বাড়াইল। চত্বরে অনিলের স্ত্রী নীহার লেপ মুড়ি দিয়া একখানা খাটিয়ায় ঘুমাইতেছে, পাশে দুইটি ছোট ছেলেকে লইয়া। ভিতরের একটা ঘর হইতে নাক ডাকার শব্দ আসিতেছে অনিলের মায়ের। নীহারের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া দেখিল। ভাবিল তাহাকে জাগাইয়া সব কথা বলিবে। তারপর তাহার মনে আসিল—যদি কিছু না করিতে পারি...। ধীরে ধীরে সে বাহির হইয়া আসিল। বাহিরে আসিয়া দরজায় শিকল তুলিয়া দিল।

মিশিরের ট্রাকের কাছে আসিয়া কব্জি ঘুরাইয়া সে হাতঘড়িটা দেখিল। রাত সাড়ে বারোটা। হাসিয়া মনে মনে বলিল—খুরকি আঁটা...বুট পোষাক পরা...ভার্দুন ফেরতা গোর্খা সেপাই আমি মির বাহাদুর... বাঙলা কথা ভুলে গিয়েছি কবে...আমার এতো মায়া কেন? মিশিরের দিকে চাহিয়া সে কাঁপিয়া উঠিল। হঠাৎ তাহার দৃষ্টি পড়িল সরাইয়ের কাঠের খুঁটিতে শিকলে বাঁধা একখানা সাইকেলের দিকে। শিকলে লাগানো কুলুপটা মুচড়াইয়া সাইকেলটার বাঁধন খুলিয়া ফেলিল। সেখানাকে লইয়া ট্রাকে বাঁধা কাছি দড়ির মধ্যে গুঁজিয়া দিল। তারপর সরু চড়া সুরে ড্রাইভারের কানের কাছে আসিয়া ডাক্ দিল।

মিশিরের ট্রাক্ চলিয়াছে। পাহাড় পথে হেলিছে দুলিছে, টোকর খাইতেছে; ড্রাইভার জোর হেডলাইট

দুইটা জ্বালাইয়া দিল। বাহাদুর হাঁ-হাঁ করিয়া উঠিল—করো কি—করো কি, সবাই দেখতে পাবে। ড্রাইভার বলিল, ভীষণ উৎরাই অন্ধকারে গাড়ি সামলানো যাবে না। কিন্তু বাহাদুর বাধা দেওয়ায় আলো নিভাইতেই হইল। গাড়ি কাৎ হইয়া চলিয়াছে। ড্রাইভার বলিল, ভুল পথে এসেছি···পিছানো অসম্ভব···রাস্তা ভারি ঢালু। ব্রেক্ কশিল···গাড়ি থামে না। গেল গেল চিৎকার করিল ড্রাইভার। জোরে গিয়া ধাক্কা খাইল পাহাড়ের গায়ে। উল্টাইয়া গেল গাড়ি। ছিটকাইয়া পড়িল মিশির, বাহাদুর ও সাইকেলখানা, ড্রাইভার ক্লীনারকে দেখা গেল না।

একটু পরে মির বাহাদুর গা ঝাড়িয়া উঠিয়া বসিল। বলিল, যা' চেয়েছিলাম তাই যখন হোলো তখন কাজটা সেরে ফেলি। মাথা ফাটা অচৈতন্য মিশিরের নিকট যাইয়া সে খুরকি দিয়া নোটের থলিটা তাহার কোমর হইতে কাটিয়া লইল। সাবধানে নিজের চামড়ার বেল্টের তলায় সেটাকে গুঁজিয়া নিল। তারপর সাইকেলটায় চড়িয়া চলিল গয়ারদিকে। তাহাকে চড়াই পথে হিসাব করিয়া চলিতে হইতেছে টর্চ্চলাইটের সাহায্যে।

সে প্রাণপণ করিয়া দৌড়িতেছে। আসিয়া পড়িল অনিলের সরাই বাড়ির খিড়কিতে। চারিদিকে একবার টর্চ্চলাইট ফেলিয়া দেখিল। তারপর অন্দরে ঢুকিল। তখনও একভাবে ঘুমাইতেছে অনিলের স্ত্রী। মির বাহাদুর তাহার হাত ঘড়িটা দেখিল। ঘড়ির কাঁচটা ফাটিয়া গিয়াছে, তবে ঘড়ি চলিতেছে রাত্রি দুইটা। ভাবিল জাগাইলে চীৎকার করিবে না তো আমায় দেখিয়া? কিন্তু উপায় কি? সে গায়ে হাত দিয়া ডাকিল—নীহার...নীহার, বাহিন্···চেঁচিও না···দেখো তোমার ভাই এসেছে মিহির···তোমাকে কিছু দিয়ে চলে যাবে...এই নাও লম্বা থলেটা নোটে ভরা।

নীহার উঠিয়া বসিল।

মিহির বলিতে লাগিল—গোপনে রেখো টাকাটা। আর বলে যাই শোনো আমাদের বংশের ইতিহাসটা, হয়তো আর বলাই হবে না। শুনেছিলাম এই কথাগুলো বাবার কাছে লড়াইয়ে গিয়ে ভার্দ্দুন যুদ্ধে যখন নিশ্চিত মৃত্যু তখন। তার আগে বাবা বলেন নি এসব। বাবা মারা গেলেন জার্ম্মান গোলায়। তিনি কি বলেছিলেন শোনো—তিনি ছিলেন বাঙালী···এক মহাজনের সঙ্গে তিনি নেপালে কাটমণ্ডুতে আসেন।···আমাদের মার কোনো পরিচয় তিনি দেন নি। মনে হয় কোনো পাহাড়ী সুন্দরীকে তিনি বিয়ে করেন···তাঁর নমুনা তুমি আর আমি। বাবা যখন রেলপুলিশে কাজ করছেন, তখন বিনাটিকিটে যাচ্ছিল বলে অনিল ধরা পড়ে। অনিল শেষে রেলপুলিশের জিম্বায় আসে। সে তার নাম বলে অনিল সেন, ইঞ্জিনীয়ারের ছেলে, গয়ায় থাকে। বাবা যেন হাতে চাঁদ পান্। বাঙালী, আবার সেন। তিনি বলেন আমরা একজাত, তুমি আমার মেয়েকে বিয়ে করো, আমি তোমায় বাঁচিয়ে দিচ্ছি। সে রাজি হোলো। গার্ডকে বললেন বাবা—এ আমার জামাই—একে ছেড়ে দাও···আমার মেয়ে জামাইকে গয়ায় নামিয়ে দিও। বাবা তোমাদের পাঠিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হলেন। তারপর লড়াইয়ে যাবার সুযোগ পেতেই আমাকে নিয়ে তিনি চলে যান। আমি তোমার সেই দাদা মিহির···কাজ করি অনিলের মহাজন মিশিরের কাছে, নাম নিয়েছি মির বাহাদুর। আরও শোনো—চোরাকারবারী মিশির গাড়ি উল্‌টে পড়ে গেছে পাহাড়ের পথে···তার কোমরে বাঁধা টাকার থলেটা কেটে নিয়ে তোমায় দিয়ে গেলাম। হয়তো সে বেঁচে নেই, তবু আমি তার কাছে যাবো। টাকার দায়ে ধরা পড়তে হয়, আমিই পড়বো, তোমরা পড়বে না। তবে যাবার আগে অনিলের বিষয়ে তোমায় খুব সাবধান কোরে দিয়ে যাচ্ছি। ঐ সায়েবগুলো সোবাইয়েৎ···শুনেছি ওরা দুশমন···ভারি মায়া জানে··· ওরা গুম্ কোরে ফেলবে অনিলকে। রোজ রাত্রে অনিল তোমাদের ফেলে ওদের কাছে পালায়···গুম্ কোরবে, ওরা গুম্ কোরবে অনিলকে!

চীৎকার করিয়া উঠে নীহার—বাঁচাও দাদা, ওঁকে বাঁচাও দুশমনদের হাত থেকে···তুমি ওঁকে বাঁচাও··· আমার সাধ্য নেই দাদা।

কিন্তু তখন সেখানে আর মিহির নাই···সে ফাঁড়িতে খবর দিতে ছুটিয়াছে সাইকেল চাপিয়া। খবর দিবে তাহার

মনিবের গাড়ি উল্‌টাইয়াছে, মালপত্র ছিটাইয়া গিয়াছে, পুলিশ গিয়া হেপাজত লউক। কিন্তু ফাঁড়িতে রাত্রি তিন প্রহরে কাহারও সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। একটা পুলিশ পাহারা আছে। সে ভাং খাইয়া বেঘোরে ঘুমাইতেছে।

মিহির আর দাঁড়াইল না তাড়াতাড়ি সাইকেল হাঁকাইয়া অন্য পথে চলিয়া গেল।

অনিলের শিশু দুইটি জাগিয়া উঠিয়া কাঁদিতেছে। অনিলের মা সাড়া দিলেন। তাঁহার নিকটে আসিয়া নীহার বলিল, নিন তো নোটের থলেটা...লুকিয়ে রাখুন তক্তাপোষের গা-বাক্সে চাবি দিয়ে···দুশমনরা গুম্ কোরব ওঁকে···দাঁড়াতে পাচ্ছিনা আমি।

সে পাগলের মত ছুটিল পাহাড় টিলায় তাহাদের সেই খোলার ঘরের দিকে। মুখে বলিতে বলিতে চলিয়াছে—গুম্ কোরবে দুশমনরা···ঐ সোবাইয়েৎ দুশমনরা।

তখন পাহাড় টিলায় ঐ ঘরের মধ্যে মেম সাহেবটি বলিতেছে—সেন্টিমেণ্ট ছাড়ো কমরেড রায়—তোমার পরিবার কাঁদবে তা'তে আসে যায় কি দুনিয়ার?··· গণমুক্তি বড় কথা···দুনিয়ার লোককে বাঁচতে হবে।··· তা'ছাড়া আমরা তো তোমার ছেলে-পরিবারের জন্যে তৈরী কোরে দিয়ে যাচ্ছি তোমার গ্যারেজ, পেট্রোল ডিপো। তা'তে বহু আয় হবে?···তোমার ভাইও থাকলো। তুমি কোমিনফরম থেকে নতুন দীক্ষা নিয়ে ফিরে আসবে—সেই বাণী প্রচার কোরবে দেশে এসে··· বুকের দুর্ব্বলতা ছাড়ো···সর্ব্বনাশ করে সেন্টিমেণ্টে।

এই সময় ঝড়ের বেগে সেখানে আসিয়া ঢুকিল নীহার। তখনো মুখে বলিতেছে—সোবাইয়েৎ দুশমন গুম্ কোরবে।

সম্মুখে সন্‌সন্ শব্দে ঘুরিতে ঘুরিতে আসিতেছে একটা খুরকি। বিঁধিয়া ফেলে আর কি মেমের বুকটা। মেম বসিয়া পড়িল···বসিয়া রিফলভার ছুড়িল···পাহাড়তলিতে কি একটা ভারি জিনিষ গড়াইয়া পড়িল। ওদিকে অনিলের দুইহাতের মধ্যে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেল তাহার স্ত্রী নীহার। ক্ষীণ কণ্ঠে বলিতেছে—ফিরে চলো দুশমনদের কাছ থেকে·· গুম্ করবে তোমায় সোবাইয়েৎ দুশমনরা।

দাঁত কড়কড় করিতেছে অনিলের···চোখ দুইটি তাহার লাল হইয়া গিয়াছে।

আবার একখানা খুরকি খোলা দরজা দিয়ে ঘুরিতে ঘুরিতে ঢুকিল···বিঁধিল মেমের বুকে। সাইকেল ছুটাইয়া আততায়ী পালাইতেছে। ···দড়াম দড়াম শব্দে গুলী ছুড়িতেছে সাহেবগুলো।

মিহির সাইকেল লইয়া ছুটিয়াছে মিশির যেখানে পড়িয়া আছে সেই দিকে। সেখানে সে যখন পৌছিল তখনও রাত পোহায় নাই। সে তাড়াতাড়ি ঠিক করিয়া লইল কি করিবে। সে নিজের কোটটা খুলিয়া ট্রাকের কামরায় ঢুকাইয়া দিল। হওয়া পাইয়া তার হাতে-মুখে যত আঁচড় লাগিয়াছিল ট্রাক হইতে পড়িয়া, সে গুলি জ্বালা করিতে লাগিল। সে একটু হাসিল। এই ক্ষুদ্র আঘাতে ভার্দুনের যমপুরী হইতে যে ফিরিয়াছে তাহার বিচলিত হওয়া চলে না। তাহাছাড়া তাহার তো জীবনের কাজ সারা হইয়াছে···আর বাঁচিবার সাধ কেন? একমাত্র বোনের আখেরের সম্বল কিছু জোগাড় করিয়া দিয়া আসিয়াছে···অবশ্য মনিবের টাকা। কিন্তু চোরাকার-বারীর পাপের ধন সেটা—মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া মোটেই তা রোজগার নয়। তবে সোবাইয়েৎ দুশমনরা কি করে অনিলের—ভাবনার কথা নিশ্চয়। কিন্তু ভাবিবার আর সময় কই তাহার? লোকজন আসিয়া পড়িবে, পুলিশ আসিয়া পড়িবে। তাহার আগে এমন কিছু করিতে হইবে যাহাতে নোটের থলি চুরীর সন্দেহ তাহার উপর না-আসে। সে বিনা দ্বিধায় তাহার ডান বুকে জার্ম্মান বুলেটের দাগের উপর নিজের খুরকি দিয়া নির্দ্দয়-ভাবে গভীর ক্ষত করিল। তাহারপর মিশিরের পাশে গিয়া চোখ বুঁজিয়া শুইয়া পড়িল। প্রবল রক্তক্ষয়ের জন্য সে অল্পক্ষণ মধ্যেই জ্ঞান হারাইল। ক্রমে বহু লোকজন জুটিল···পুলিশ আসিল···ডাক্তার আসিল। প্রাথমিক সাহায্য দিতে মিশিরের জ্ঞান হইল। ড্রাইভার ও ক্লীনার ট্রাকের কলের সঙ্গে পিশিয়া মারা গিয়াছে। দীর্ঘ দিন হাঁসপাতালে থাকিয়া মিহির বাঁচিল। ভারি বিশ্বাসী চাকর, মনিবের জন্য প্রাণ দিতে গিয়াছিল। তাই সে পুলিশে হাবিলদার হইল।

—

বাংলাসাহিত্যের আগামী পঞ্চাশ বৎসর

রম্যাংশুশেখর দাশ

বিংশ শতাব্দীর অর্দ্ধ সমাপ্তি বহু প্রশ্ন উত্থাপন করে: গত পঞ্চাশ বছর বাংলাসাহিত্য কী করেছে? আর তাতে কী সম্ভাবনা নিহিত রয়েছে বাকি অর্দ্ধ শতাব্দীর জন্যে? আর বিগত এক শতাব্দীর সঙ্গেই বা যোগ কিরূপ? এই সব প্রশ্নের মীমাংসা হতে পারে একটি পদ্ধতি অবলম্বন করে। সেই পদ্ধতি ব্যক্তিগত বিচারের ভিত্তিতে গঠিত হতে পারে তবে তাই এখানে আলোচ্য বিষয়! সাহিত্য ও আর্টে পরিবর্ত্তন আসে মুখ্যত নিজের ঐতিহ্যের ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ায়।

১৮৫০ সাল থেকে ১৯৫০ সাল পর্য্যন্ত বাংলাসাহিত্যে এবং আর্টে এক পরিবর্ত্তন এসেছে। সেই পরিবর্ত্তনের ভিত্তি পশ্চিম ইউরোপে প্রবর্ত্তিত টেকনিকেল আবিষ্ক্রিয়া এবং তার পৃথিবীব্যাপি ফলাফল। সেই সঙ্গে চিন্তা ও সাহিত্যরাজ্যেও আসে পরিবর্ত্তন। কিন্তু তার পটভূমিকা অষ্টাদশ শতাব্দীতেই সুরু হয় ফ্রান্সে, আমেরিকায় এবং তখনই ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশ বিদেশী বণিকসম্প্রদায়ের করতলগত হয়।

বণিক সম্প্রদায়ের এই অভ্যুত্থানের ও প্রসারের ফলে তাদের জ্ঞান-বিজ্ঞানেরও প্রসার ঘটে এবং সেই প্রসার বাংলাদেশে বিশেষভাবে অনুভূত হয় উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে।

বাংলাসাহিত্যের ইতিহাসে এই পরিবর্ত্তন প্রথম নয়। বৌদ্ধযুগের প্রভাব ছিল বাংলাসাহিত্যে নাথ-গীতিকায়। মুসলমান যুগে ভারতীয় সভ্যতা কূর্ম্মবৃত্তি অবলম্বন করায় সাহিত্যে প্রগাঢ় পরিবর্ত্তন আসতে পারে নি। অপরপক্ষে ব্যাপক ধ্বংসলীলার ফলে সাহিত্য-সংস্কৃতি সমগ্র উত্তর ভারতে লুপ্ত হতে বসেছিল।

মুসলমানযুগের শেষাংশে যখন ভারতীয় সভ্যতার পুনরুত্থান ঘটে, তখন মারাঠা দেশে শিবাজী যেমন রাষ্ট্রীক বিদ্রোহ ঘটান তখন বাংলাদেশে নৈতিক বোধ আসে চৈতন্যের ব্যাপক প্রয়াসে। তিনি ভারতীয় মনে নৈতিক সাহস আনয়নে সমর্থ হয়েছিলেন এবং বৈষ্ণব সাহিত্যে নূতন আবর্ত্তন আসে। বাংলা সাহিত্য বৈষ্ণব কাব্যের মাধুর্য্যে পরিপূর্ণ ছিল, বাংলা রামায়ণ মহাভারতে বা মঙ্গল কাব্যের সহিত বৈষ্ণব কবিতার ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল।

জনসাধারণের মানসিক আবহাওয়া থেকেই এই সব সাহিত্যের সৃষ্টি। রাষ্ট্রিক পরিবর্ত্তনের সহিত সাহিত্য-স্রষ্টার নূতন গ্রহণশীলতা ও সৃষ্টিশীলতাও লক্ষ্য করা যেতে পারে! তবে এই সাহিত্যের যোগ জনসাধারণের প্রাণগত ছিল।

কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে যে পরিবর্ত্তন আসে, সেটা বড় রকমের। তাতে পৃথিবীব্যাপীই সমাজের এক বিরাট পরিবর্ত্তন আসে।

সেই পরিবর্ত্তন বাংলাদেশে নূতন গুরুত্ব গ্রহণ করে। এতকাল ভারতবর্ষের ভদ্রভাষা ছিল সংস্কৃত। শ্রেষ্ঠ গুণীগনের গ্রাহ্য ছিল সেই ভাষা। সুতরাং সেই অর্থে বাংলাসাহিত্যে এতকাল গুণীজনের ভাষা ছিল। তার স্থান কিঞ্চিৎ উচ্চতর হয় বৈষ্ণবযুগে; কিন্তু তাও সবিশেষ নয়।

কিন্তু বৃটিশ আমলে ইউরোপীয় ও বিদেশী সাহিত্যে বাংলার লোক বিশেষ রুচি প্রদর্শন করেন এবং এখানে গুণীসম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়। সাহিত্য বা আর্টের জন্মকালে গুণীসম্প্রদায়ের নাম অতি উচ্চে।

সেই গুণীসম্প্রদায়ের নেতা হিসাবে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রামমোহন রায় ভাষাকে সহজবোধ্য ও গুণীজন গ্রাহ্য করার চেষ্টার সূত্রপাত করেন। কিন্তু কাব্যপ্রাণ বাংলা সাহিত্যে সত্যিকারের পরিবর্ত্তন নিয়ে আসেন মধুসূদন দত্ত। তিনি আবিষ্কার করেন বাংলার সাহিত্যিক ভাণ্ডারের অজস্র সম্পদ। কিন্তু পুনরাবৃত্তিও শিল্পী নয়, অর্থ নয়। তাঁ'র মনে এল ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে

প্রতিক্রিয়া। তিনি চাইলেন বাংলা ভাষাকে গুণীজনের ভাষা করতে। তাঁর মনে প্রতিক্রিয়া এল কেবল মাধুর্য্যের বিরুদ্ধে, কেবল জনপ্রিয়তার বিরুদ্ধে। তাঁর বৈদেশিক জ্ঞানভাণ্ডার নিয়ে তিনি দিলেন নূতন প্রাণ। এই ঐতিহ্যের প্রতি ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সাহিত্যের জীবনে প্রচণ্ড শক্তি। কেবল সাহিত্যে নয়—আর্টেও।

বাংলার সাহিত্য জগতে-আর্ট মাইকেল উৎস ধারার মত প্রচণ্ড শক্তি। তাঁর বিরুদ্ধে তখনকার সময় থেকেই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সুরু হয়। প্রবল বিরুদ্ধতা বিদ্রূপ সুরু হয় সঙ্গে সঙ্গে নূতন সাহিত্যেরও। এই সৃষ্টিশীলতাই তাঁর দান। তাঁর চিন্তাধারার বিরুদ্ধে বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন সাহিত্যিক প্রতিক্রিয়ায়। তাঁর বিদ্রূপ সমালোচনা ক'রেছেন রবীন্দ্রনাথ জীবনের প্রথম প্রবন্ধে। তবে তাঁদের শিক্ষার গোড়াপত্তন সেখানেই।

এ-কথা স্মরণ রাখা যেতে পারে যে, মাইকেল নিজেকে বাংলায় সীমাবদ্ধ রাখেন নি। তিনি নিজেকে ভারতীয় সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী হিসাবেই কল্পনা করেছেন। সোমনাথ মন্দিরের ধ্বংস যুগ থেকে যে মুসলীম স্বৈরাচার ভারতীয় কৃষ্টিকে ডুবিয়ে রেখেছিল বাংলাদেশে নূতন গুণী ও স্রষ্টাসমাজের অভ্যুত্থানের ফলে তার গতি পুনরায় আরব্ধ করা হ'ল। মাইকেলের ঔদ্ধত্য যাই থাক, বাল্মীকির কল্পনাকে নূতন রূপ দিতে গিয়ে তিনি আত্মসচেষ্ট ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন এবং বাংলায় নূতন কৃষ্টির প্রবর্ত্তন করেন। মাইকেলের নাটক ভারতীয় নাটকেরই নূতন রূপ; পূর্ব্বতন কৃষ্টির প্রতিক্রিয়ায় নূতন সৃষ্টি। তিনি ভারতীয় পটভূমিকাকে নিজস্ব ক'রে নূতন সৃষ্টি ক'রেছেন। মাইকেলের প্রতিক্রিয়ায় রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত রচনা ক'রেছেন। বঙ্কিমের মধ্যে মাইকেলের আইডিয়ার প্রতিক্রিয়া ছিল; তিনি এক একনিষ্ঠ ভারতীয় ব্রাহ্মণ। বঙ্কিমের প্রতিক্রিয়ায় উপন্যাস সৃষ্টি করেন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বঙ্কিমের আইডিয়ার প্রতি-ক্রিয়া শরৎচন্দ্রে ছিল কিন্তু তাঁর মধ্যে রবীন্দ্রনাথের ব্রাহ্ম-সমাজের ও ভাষার প্রতিক্রিয়াও ছিল। শরৎচন্দ্রের প্রতি-ক্রিয়ায় ও কিছুটা রবীন্দ্রনাথের প্রতিক্রিয়ায় প্রমথ চৌধুরী অতিমাত্রায় ইনটেলেকচুয়াল। তিনি এঁদের ভাবালুতার বিরোধী। শরৎচন্দ্র বাংলার সাহিত্যে গুণী ও সাধারণকে সমভাবে আলোড়িত ক'রেছিলেন আরেকজন নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের মত। এ-কথা স্মরণযোগ্য যে, বঙ্কিম আনন্দ মঠে যে মুসলমান বিরোধীতা দেখিয়েছেন সেটা অন্ধতা নয়, সেটা ভারতীয় কৃষ্টি-বিরোধী কার্য্যের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া।

'কল্লোল' পত্রিকার বা 'পরিচয়' পত্রিকার যুগে শরৎচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়া প্রচণ্ডতম হয়ে উঠেছিল। তাঁদের প্রভাব থেকে মুক্তির আপ্রাণ চেষ্টা বহু গল্প লেখক ও কবি ক'রেছেন। কিন্তু প্রতিক্রিয়া স্থানে স্থানে সীমা ছেড়ে যাওয়াতে তাঁদের স্বকীয় আসন বিশেষ প্রতিষ্ঠিত হয় নি। তাঁরাও চেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ বা শরৎচন্দ্রের মান ও প্রতিপত্তি। কিন্তু সেটা লাভে সক্ষম হন নি। বরং ট্রেডিসন ছেড়ে বেশী দূর চলে যাওয়াতে কিছুই লাভ হয় নি। তবে শরৎচন্দ্রের প্রতিক্রিয়ায় যাঁরা লিখেছেন যেমন বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের বা মনোজ বসুর গ্রামের চিত্র—সেটা স্বপ্রতিষ্ঠিত।

এখন আমরা যখন বাকী অর্দ্ধ শতাব্দীর কথা কল্পনা করব তখন এই প্রতিক্রিয়ার বিচারই করব। আমরা মোটামুটি দু'টি ধারা লক্ষ্য ক'রেছি। প্রথম বাংলাদেশে নূতন গুণীসমাজ সৃষ্টি হওয়ায় বাংলা সাহিত্যিক নিজেকে সংস্কৃত সাহিত্যের উত্তরাধিকারী কল্পনা ক'রেছেন। দ্বিতীয়ত, বাংলা সাহিত্যের অগ্রগতি ঐতিহ্যের প্রতি-ক্রিয়ায় চলেছে। এখন এই প্রতিক্রিয়া কী রূপ নেবে? স্পষ্টতঃ দেখতে পাচ্ছি, যে সকল লেখক রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে ছিলেন তাঁরাই সর্ব্বাপেক্ষা জনপ্রিয়তা হারিয়েছেন। যে ভিত্তি মাইকেল গ্রহণ ক'রেছিলেন অর্থাৎ ভারতীয় সাহিত্যের ঐতিহ্য এটা ত্যাগ ক'রে বা অতিমাত্রায় বীত-শ্রদ্ধ হয়ে তাঁরা সহজ পথ ত্যাগ ক'রেছিলেন। সুতরাং এখন সেই ভিত্তিস্থাপনের পুনরায় প্রচেষ্টা দেখা যেতে পারে। এখানে কতকগুলি বিষয় স্পষ্ট ক'রে বলা ভাল। ১৯১৪ সালের প্রথম যুদ্ধের পর থেকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পর্য্যন্ত পৃথিবীর দূরত্ব, রাজনীতিক ও অর্থনীতিক স্থায়ীত্ব ঘুচেছে। সংযোগ স্থাপনের ব্যবস্থা ও দেশগত রেগু-লেসনের বিচ্ছেদও বেড়েছে। এই অনিশ্চয়তাবোধ

পশ্চিম ইউরোপকে বহিরাক্রমণের অসহায় ক্রীড়নক ক'রে রেখেছে। সেই অনিশ্চয়তায় মাথা খুঁড়ে পশ্চিম ইউরোপের লেখক কম্যুনিষ্ট হয়ে আশ্রয় চেয়েছিলেন, পান নি। এখন কোয়েসলার প্রভৃতি স্থির হয়ে অন্ধকার ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে আছেন। শেষ আশা কম্যুনিষ্ট তাঁদের ত্যাগ ক'রেছে। মার্টার নূতন আলো খুঁজছেন।

বাংলাদেশেও সেই পৃথিবীব্যাপী সংস্থার তরঙ্গাঘাত আসে। রাষ্ট্রিক ও আর্থিক অনিশ্চয়তার সঙ্গে অর্দ্ধেক বাংলায় পাকিস্থান প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় সেই অনিশ্চয়তা বেড়েছে।

এ-কথা সত্য যে, রাজনীতিক উত্থান-পতনের সহিত সাহিত্য, আর্ট বিজড়িত। আবার জাতির উত্থানপথেও সাহিত্যিক পথচালনা কার্য্যকরী হয়। যেমন বঙ্কিমচন্দ্রের বা মাইকেলের দান।

পশ্চিম ইউরোপের সঙ্গে ভারতবর্ষের পার্থক্য রয়েছে। পশ্চিম ইউরোপের ভিত্তি ছিল বাণিজ্যিক সুবিধালাভ তথাকথিত অনগ্রসর জগতের উপর। যে সকল জাতি নিজেদের অর্থনীতি গ'ড়ে তুলতে পারে তাদের সেই জীবন দর্শনের প্রয়োজন হয়। পরনির্ভরশীল আর্থিক ও রাষ্ট্রিক কাঠামো ভেঙ্গে পড়ার পর যে নৈরাশ্য আসে সেটার বিস্তৃতি আমাদের দেশে লজ্জাজনক। তাতে এটাই প্রমাণিত হয় যে, বাংলা সাহিত্য প্রতিভা-সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রের পর স্বাধীন চিন্তা হারিয়েছিল।

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় অর্দ্ধে তার ঐতিহ্য ফিরে পাওয়াই সব চেয়ে বড় প্রশ্ন। নিজের সাহিত্য নিয়ে নিজে যদি আলোচনা না ক'রে পশ্চিম ইউরোপের দুঃখকে নিজের বলে কল্পনা করে সেটা আত্মঘাতী নীতি। সেই আত্মঘাতী নীতি থেকে পরিত্রাণ আসবে স্বাধীন অনুশীলনের পথে। এটা প্রকাশকদের অভিযোগ যে, বাঙালী সাহিত্যিক ইংরেজী বই পড়ে আইডিয়া সংগ্রহ করেন, বাংলা বই পড়েন না। যে কেউ যে কোন ভাষা পড়তে পারেন কিন্তু নিজেকে অবমাননা ক'রে নিজের সৃষ্টি সম্ভব নয়।

যে সাহিত্যিক দল বাংলা দেশে কম্যুনিজমকে সহায়তা করেছিলেন বা সমর্থন করেছিলেন তাঁদের নিজের উপর মাইকেলের মত প্রতীতি ছিল না। গভীর চিন্তা ও ভাবশক্তিও ছিল না। তাঁদের প্রতিভা ছিল ভাষা, বর্ণনা ও সস্তম অনুসরণ। সেই অন্ধ আত্মাবমাননা আজ বাংলা সাহিত্যকে নির্জ্জীব ক'রে রেখেছে। তাঁরা যে উত্তরাধিকারীত্ব পেয়েছিলেন সাহিত্য পত্রিকায় তা পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মত ভরে যাচ্ছে, কিন্তু তাঁদের দেশেও তাঁদের যে প্রতিপত্তি, আমাদের সাহিত্যিক তা থেকেও বঞ্চিত। সেটা আক্ষেপের বিষয়। সেটা তাঁদের কল্পনা ও আদর্শের অভাব।

সাহিত্যিক যখন লেখক-বিশেষকে অনুকরণ করতে থাকে, কল্পনায় দেউলে হয়ে যায় তখন তাদের আর কিছু দেবার থাকে না। না স্বদেশকে না বিদেশকে।

বাংলার মাসিক পত্রিকাগুলি স্থূল বিজ্ঞাপনবাহী ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। সাহিত্যিকরা যাঁরা পেরেছেন রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দকে ধরেছেন কিন্তু অন্ধতা সর্ব্বক্ষেত্রেই বিপদজনক। সক্রিয় ভক্তি সাফল্য আনে, অন্ধভক্তি ভার বিশেষ।

দ্বিধা বিভক্ত দুঃস্থ বাংলা দেশে বসে বাংলা সাহিত্যিক মাইকেল, বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথের মত বাল্মিকী, কালিদাসের অনুগামী নিজেদেরে বিবেচনা হয়ত করেন না। রবীন্দ্রনাথ 'শেষের কবিতা'য় চেরাপুঞ্জী যাত্রী অমিতকে যক্ষের সঙ্গে তুলনা করেছেন বিংশ শতাব্দীর পরিবির্ত্তিত পটভূমিকায়। রবীন্দ্রনাথের স্পর্শ বাঁচাবার জন্য বিদেশী কবিতার অনুকরণ প্রচুর হয়েছে কিন্তু মাইকেলের বলিষ্ঠ ঔদ্ধত্য নেই, আছে অনুকরণপ্রিয় কেরানীর মনোবৃত্তি, উৎসাহহীন অথচ বিদেশী কাগজে প্রশংসার লোভ।

পশ্চিম ইউরোপ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর অর্থনীতির, রাষ্ট্রনীতির দিক থেকে অসহায়। যে কোন মুহূর্ত্তে কম্যুনিষ্ট রাশ্যার প্রভাবে চলে যেতে পারে, আমেরিকার প্রভাব ত আছেই বেঁচে থাকার জন্য। মার্সাল সাহায্যে আমেরিকার আর্থিক সাহায্য প্রচুর পেয়েছে। কিন্তু তবু আশ্রয়প্রার্থী সমস্যা, আর্থিক পুনর্গঠন হয় নি। জার্ম্মানী যুদ্ধকালে সমগ্র ইউরোপকে করতলগত করেছিল;

সম্পাদকীয়

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ও ব্যাঙ্ক রেট্

স্বাধীন দেশে সেই দেশের অর্থ-নীতি পরিচালনা করিবার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠান হিসাবে একটী ব্যাঙ্ক থাকা প্রয়োজন হয়। এই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠান সেই দেশের সাধারণ ব্যাঙ্কগুলিতে কি ভাবে অর্থের লেনদেন হইবে তাহা নির্দ্দিষ্ট করেন, এবং এই নির্দ্দিষ্ট ব্যবস্থার উপরেই সেই দেশের মূল্যের হার নির্দ্ধারিত হয়। ইংলণ্ডে ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ড (Bank of England) এইরূপ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠান, এবং ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ড কি হারে অন্যান্য ব্যাঙ্ককে টাকা ধার দিবেন তাহাই 'ব্যাঙ্ক রেট' নামে খ্যাত। ব্যাঙ্ক রেট কথাটি ক্রমশ সমস্ত দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠান কি হারে সেই দেশীয় অন্যান্য ব্যাঙ্ককে টাকা ধার দিবেন তাহা বুঝাইবার জন্য প্রজোয্য হইয়াছে। জাহাজের হাল যেমন জাহাজ কোন্ দিকে যাইবে তাহা নিয়ন্ত্রণ করে, ব্যাঙ্ক রেট ঠিক তেমনি দেশীয় অর্থের লেনদেন কি ভাবে হইবে তাহা স্থির করিয়া দেয়। ব্যাঙ্ক রেট যখন বাড়ে তখন ফাট্কা বাজার দমিয়া যায় এবং ব্যাঙ্ক রেট যখন কমে তখন ফাট্কা বাজার সুবিধা পায়। ইহার কারণ, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যখন বেশী সুদের হার ছাড়া টাকা ধার দেন না তখন অন্যান্য ব্যাঙ্কগুলির বাজারে টাকা ধার দিবার ক্ষমতা অপেক্ষাকৃত কমিয়া যাওয়াতে বাজারে চল্‌তি টাকার পরিমাণ কমিয়া যায় এবং ফলে ফাট্কা বাজার নরম হইয়া পড়ে। গবর্ণমেন্টের কাগজের বিক্রয় মূল্য কমিয়া যায় এবং সমস্ত দ্রব্যাদির—বিশেষ করিয়া শস্যাদি, তুলা, রবার, লোহা, টিন এবং এইরূপ সমস্ত দ্রব্য যাহাদের ভবিষ্যত মূল্য লইয়া ফাটকা বাজারে খেলা চলিতে পারে—তাহাদের মূল্য কমিয়া যায়। অপরপক্ষে যখন কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক অল্প সুদেই টাকা ধার দিতে আরম্ভ করেন তখন ঠিক ইহার বিপরীত ফল ফলে। সোজা ভাষায় বলিতে গেলে—ব্যাঙ্ক রেট বৃদ্ধি পাইলেই বাজারে দ্রব্যের মূল্য কমিবার প্রয়াশ পায় এবং ব্যাঙ্ক রেট কমিলেই বাজারে দ্রব্যের মূল্য অধিকতর হইবার আশঙ্কা দেখা দেয়। ইহা ছাড়াও ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ডের ব্যাঙ্ক রেট ইংলণ্ডের বহির্ব্বাণিজ্যের অবস্থাও নির্দ্ধারণ করিত। যখন ব্যাঙ্ক রেট বৃদ্ধি পাইত, তখন অন্যান্য দেশীয় লোকেরা বেশী লাভের আশায় ইংলণ্ডে টাকা ধার দিবার জন্য ইংলণ্ডে টাকা পাঠাইবার চেষ্টা করিতেন—ফলে পাউণ্ডের চাহিদা বাড়িয়া যাইত এবং পাউণ্ডের হারাহারি মূল্য বাড়িত। অপরপক্ষে যখন ব্যাঙ্ক রেট কমিত তখন পাউণ্ডের হারাহারি দর কমিয়া যাইত। এই দরের উপর বাণিজ্যের আমদানী ও রপ্তানী এই দুইটিই বিশেষ ভাবে নির্ভরশীল।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, ব্যাঙ্ক রেট-এর সহিত অধুনাতন অর্থ-নীতি ও বাণিজ্য-ব্যবস্থা বহুলাংশে জড়িত।

আমাদের দেশে স্বাধীনতা লাভের পর হইতে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া (Reserve Bank of India) এই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানের কাজ করিয়া আসিতেছে। ব্যাঙ্ক রেট বলিতে আমাদের দেশে

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কি হারে দেশীয় অন্যান্য ব্যাঙ্কগুলিকে ধার দিবার জন্য প্রস্তুত রহিয়াছেন তাহাই বুঝায়। স্বাধীনতার পূর্ব্বে ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ডের ব্যাঙ্ক-রেট-এর সঙ্গে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক-এর রেট একটা অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাধা ছিল। তখন ভারতের আমদানী, রপ্তানী বা অন্যান্য সুখ সুবিধা ইংলণ্ডের সঙ্গে একসূত্রে গ্রথিত ছিল বলিয়াই তদানীন্তন রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ডের অনুসরণশীল কার্য্যের বিরুদ্ধে বিশেষ কিছু বলিবার ছিল না। কিন্তু স্বাধীন ভারতে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাজও স্বাধীন দেশের মত নিজ নিজ স্বার্থের উপর গুরুত্ব দিয়াই করা উচিত হইবে। যদিও আজও আমাদের বাণিজ্য, জাহাজে মাল চলাচলের স্থানের সুবিধার ব্যবস্থা ও সমর সম্ভার সম্বন্ধীয় উপকরণাদির ব্যবস্থা বহু অংশে ইংলণ্ডের সঙ্গে যোগসূত্রেই করা হইয়া থাকে তথাপি ইহা স্মরণ রাখা দরকার যে, আমরা এই সম্পর্কে ততখানিই ইংলণ্ডকে অনুসরণ করিয়া চলিব যতখানি আজও আমাদের দেশের স্বার্থের পক্ষে মঙ্গলজনক। নচেৎ ক্রমশ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ভিন্ন অস্তিত্ব লোপ পাইবে এবং ভারতের অর্থনীতি ইংলণ্ডের অর্থনীতির উপরে নির্ভরশীল থাকিয়া অবশেষে ভারত ও ইংলণ্ড এই উভয় দেশেরই ক্ষতির কারণ হইবে।

আমাদের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, প্রকৃতভাবে দেখিতে হইলে, এখনও পর্য্যন্ত দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠান হিসাবে সম্পূর্ণরূপে কার্য্যকরী হয়েন নাই। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানের কর্ত্তব্য দেশের অন্যান্য ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানগুলিকে পালন করা, রক্ষা করা ও তাহাদের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করা। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এখন পর্য্যন্ত এই কার্য্য প্রকৃতরূপে করিতে আরম্ভ করেন নাই। এখনও আমাদের দেশের ব্যাঙ্কগুলির শ্রীবৃদ্ধি সাধনের চেষ্টা ত দূরের কথা, পালন অথবা রক্ষা, ইহার কোন কার্য্যই সম্যকরূপে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক দায়ীত্ব লইয়া করেন না। সম্প্রতি নূতন ব্যাঙ্ক আইন পাশ হওয়ার পর হইতে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কিছু কিছু শাসনের ব্যবস্থা হাতে লইয়াছেন বটে, কিন্তু সেই শাসন শুধু ব্যাঙ্কগুলির দোষ দেখাইবার জন্য। ব্যাঙ্ক-কলেবরে যে কোথায় কি গ্লানি আছে, প্রকৃত চিকিৎসকের মত সেই গ্লানি বাহির করিয়া কি উপায়ে সেই গ্লানি দূর হইয়া আবার সমাজের মঙ্গল সাধকরূপে নব কলেবরে ব্যাঙ্কগুলি বাঁচিতে পারে, এই শাসনের রূপ সেইরূপ নহে।

কিছুদিন পূর্ব্বে সাধারণ নির্ব্বাচনের পরক্ষণেই ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ড তাহার ব্যাঙ্ক রেট্ শতকরা ১০ শিলিং বর্দ্ধিত করিলেন। বর্দ্ধিত করিবার সম্যক কারণ হিসাবে দেখা যায় যে, দেশের দ্রব্যাদির মূল্যবৃদ্ধিকে নিয়ন্ত্রণ করিয়া সাধারণ লোককে সুবিধা দান করা। কিন্তু ইংলণ্ড তাহার ব্যাঙ্ক রেট্ শুধু এই জন্যই বর্দ্ধিত করেন নাই। আজ ইংলণ্ড আবার নূতন ভাবে সমরোপকরণ তৈয়ারী করিয়া সমরসজ্জায় সাজিয়া যে কোন বিপদের যেন সম্মুখীন হইতে পারেন তাহার জন্য নূতন নূতন প্রচেষ্টা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এই সমস্ত প্রচেষ্টা করিতে হইলে সরকারী দপ্তর হইতে খরচ আরম্ভ করিতে হয়। এম্‌নিই জিনিষপত্রের দাম উর্দ্ধগামী, তাহার উপরে যদি সমরসজ্জার জন্য আরও অর্থ বাজারে প্রবেশ লাভ করে তাহা হইলে দেশের মূল্যমাণ অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইবে, সুতরাং অর্থমন্ত্রী একদিকে যেমন অর্থ ব্যয়ের দ্বারা বাজার গরম রাখিবেন অপর পক্ষে ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ড ব্যাঙ্ক রেট্ বাড়াইয়া বাজারকে নরম করিবেন। ফলে ব্যয়বহুল সমরসজ্জার কাজ হইতে থাকিলেও, দেশের মূল্যাদি নিয়ন্ত্রিত থাকিবে এবং সাধারণ লোক বিশেষভাবে ক্লিষ্ট হইবে না। এতদ্ব্যতীতও ব্যাঙ্ক রেট ইংলণ্ডকে বাড়াইতে হইয়াছে বিদেশের কাছে পাউণ্ডকে আরও লোভনীয় করিয়া তুলিবার জন্য যাহাতে বিদেশের অর্থ অধিক সুদের লোভে বৃটেনে আমদানী হয় এবং তদ্দারা

বৃটেনের পরিকল্পনার সহায়তা হয়। এই দিক হইতে দেখিতে গেলেও ইংলণ্ডে ব্যাঙ্ক রেট বৃদ্ধি তাহার সাধারণ লোকের পক্ষে উপকারজনক, কারণ বিদেশী অর্থ আমদানী হইলে সমূহ ট্যাক্স বৃদ্ধির জন্য তাহাদের অত্যন্ত বেগ পাইতে হইবে না।

কিন্তু আমাদের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক তাহার কিছুদিন পরেই তাহার ব্যাঙ্ক রেটও শতকরা আট আনা হারে বাড়াইয়া দিলেন। অবশ্য রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, এই বৃদ্ধির সঙ্গে ইংলণ্ডের ব্যাঙ্ক রেট বৃদ্ধির কোনও সম্পর্ক নাই। কিন্তু ইস্তাহারের কথা কথাচ্ছলে মানিয়া লইলেও প্রকৃত মানিয়া লওয়া কঠিন। কারণ আমাদের দেশের অবস্থা উপরিল্লিখিত ইংলণ্ডের অবস্থার ন্যায় নহে। বরঞ্চ অনেকাংশেই অন্যপ্রকার। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক তাহার ইস্তাহারে জানাইয়াছে যে, বাজারে চল্‌তি টাকা বাড়িয়া যাইতেছে —সুতরাং মূল্যবৃদ্ধি না হয় সেই জন্য রেট বাড়ান দরকার। কিন্তু রিজার্ভ ব্যাঙ্কের এই কথা গ্রহণ করা মুস্কিল। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক জোর করিয়া স্বাভাবিক অবস্থা হইতে মূল্য অনেকদিন ধরিয়া নামাইয়া রাখিতে পারেন না। একদিকে গবর্ণমেণ্ট খাদ্য-দ্রব্যের দাম বাড়াইবার জন্য যত্নবান হইতেছেন কারণ যে মূল্যে তাঁহারা খাদ্য ক্রয় করেন তাহা আরও বাড়াইবেন বলিয়া চিন্তা করিতেছেন। প্রধান ও প্রয়োজনীয় খাদ্য-দ্রব্যের মূল্য যদি বাড়ে, তবে অন্যান্য সামগ্রীর মূল্য নিম্নে নামাইয়া রাখা প্রায় অসম্ভব। এমতাবস্থায় মূল্য কমাইবার প্রচেষ্টার জন্য ব্যাঙ্ক রেট বাড়াইতে হইয়াছে একথা বিশ্বাস করা কঠিন।

দ্বিতীয়তঃ আজ আমাদের দেশে নূতন ব্যাঙ্ক আইন ও বীমা আইন দ্বারা ব্যাঙ্ক ও বীমা কোম্পানী-গুলির যেরূপ অসুবিধার অবস্থা পরিলক্ষিত হইতেছে, ঠিক সেই সময়েই এই ব্যাঙ্ক রেট বাড়াইবার জন্য তাহাদের লগ্নীগুলির দাম পড়িয়া যাওয়াতে তাহারা আরও বিব্রত হইবে ; কারণ প্রত্যেকেরই সম্পত্তির পরিমাণ কমিয়া যাইবে। সম্পত্তির পরিমাণ কমা অর্থ আরও গরীব হইয়া যাওয়া। গরীব দেশের পক্ষে কি এইরূপ কার্য্যোদ্দেশ্য ঠিক হইবে ? দেশের জনসাধারণের একমাত্র কল্যাণকর প্রতিষ্ঠান হিসাবে দেশীয় ব্যাঙ্ক ও বীমা কোম্পানীগুলি খ্যাত। তাহাদের গায়ে আচড় না লাগাইয়া যাহাতে তাহারা আরও সুষ্ঠুভাবে গড়িয়া উঠিতে পারেন সেই দিকেই ত দেশীয় কেন্দ্রীয় অর্থপ্রতিষ্ঠানের প্রচেষ্টা হওয়া উচিত।

তৃতীয়তঃ ব্যাঙ্ক রেট বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে স্বভাবতই সরকার যে সমস্ত বড় বড় কাজে হাত দিয়াছেন তাহার গতিও অপেক্ষাকৃত মন্থর হইয়া আসিবে। দেশকে ক্রমশ যান্ত্রিক ও বৈদ্যুতিক-শক্তি সম্পন্ন করিয়া তুলিবার যে প্রচেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে তাহাতে বাধা পড়িবার আশঙ্কা আছে। এদিক হইতে দেখিতে গেলেও আমাদের পাঁচ বৎসরের পরিকল্পনা এই ব্যবস্থার দ্বারা যে কোনরূপ সুবিধা পাইবে তাহা মনে হয় না।

এই সমস্ত দিক হইতে দেখিলে মনে হইবে যে, পাউণ্ড-ষ্টার্লিংএর সঙ্গে যোগাযোগ অবিচ্ছিন্ন রাখাই আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য এবং তাহার সঙ্গে খানিকটা মিশ্রিত আছে বিদেশীয় অর্থ আমদানীর সুবিধার দিক। কোনও দিন ছিল যখন পাউণ্ড-ষ্টার্লিং সম্পূর্ণ স্থিতিবান মুদ্রা ছিল। তাহার সঙ্গে যোগসূত্রের অর্থ ছিল স্থিতির জন্য প্রচেষ্টা। কিন্তু আজ পাউণ্ড-ষ্টার্লিংএর সে দিন নাই। ইংলণ্ডের এই মুদ্রার স্থিতি কিছুতেই

ইংলণ্ড রক্ষা করিতে পারিতেছেন না। এমতাবস্থায় তাহার সঙ্গে যোগ-ব্যবস্থার স্থিরতা রাখাই যে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের পক্ষে দেশের স্বাস্থ্যপ্রদ কাজ হইবে তাহা মনে করিবার আজ কোন কারণ নাই।

আমরা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গবর্ণর সাহেবকে এই সমস্ত বিষয়ে অবহিত হইতে বলি।

শান্তি ও নিরস্ত্রীকরণ সমস্যা

যুদ্ধের নেতাগণ আজ শান্তি চাহেন। যুদ্ধের আবহাওয়ায় তাঁহাদের শ্রান্তি আসিয়াছে। তাঁহাদের দেশের জনসাধারণ অশান্তি ও অসন্তুষ্টিতে কষ্ট পাইতেছে। এই অবস্থা আর কাহারও কাম্য নহে। শান্তির জন্য ব্যাকুলতায় তাঁহারা বিশ্বরাষ্ট্র-সংঘের জেনারেল এসেম্বলীতে (General Assembly) শান্তির কথা কহিতেছেন—কি করিলে বিশ্বে শান্তি আসিতে পারে তাহার বিচার ও আলোচনা করিতেছেন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে যুক্ত-জয়ী পক্ষ আমেরিকা, রাশিয়া, ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও চীন। আজও তাঁহারাই যুদ্ধের নেতা। সুতরাং শান্তি আনিবার জন্য প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান নিরস্ত্রীকরণের প্রস্তাব আনিয়াছেন। তাঁহার মতে প্রথমতঃ, রাষ্ট্রপুঞ্জের অধীনে একদল পরিদর্শক সমস্ত সশস্ত্র সেনা ও নূতন নূতন অস্ত্রসমূহ পরীক্ষা করিতে থাকিবেন; দ্বিতীয়তঃ, এই পরীক্ষা-কার্য্য যখন চলিতে থাকিবে, তখন অস্ত্রসমূহ এবং সশস্ত্র-বাহিনী কি ভাবে কার্য্যত হ্রাস করা যায়, তাহার সুনির্দ্দিষ্ট পন্থা বাহির করিতে হইবে এবং তৃতীয়তঃ, সম্পূর্ণ জ্ঞাতসারে এবং ন্যায়-বিচারসম্ভূত উপায়ে এই পন্থায় অস্ত্র ও সেনাদল হ্রাসের ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই প্রসঙ্গে তিনি অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, অনুসন্ধান চলিবার সময়ে আণবিক অস্ত্র-সম্পর্কিত তথ্যাবলী প্রকাশ পাইবে এবং আণবিক অস্ত্রসমূহের ব্যবহারও আন্তর্জ্জাতিক পরিকল্পনা অনুসারে নিয়ন্ত্রিত করা হইবে।

প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের বিশ্বশান্তি-ব্যবস্থার বাণী প্রকাশিত হইবার পরে ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র—এই তিনটি বৃহৎ রাষ্ট্রশক্তি একত্রে তাঁহাদের নিরস্ত্রীকরণ পরিকল্পনা ঘোষণা করিয়াছেন। এই ঘোষণায় তাঁহারা বিবৃত করিয়াছেন যে, তাঁহারা শান্তিকামী কিন্তু তাঁহাদের নিজেদের তথা বিশ্বের অন্যান্য দেশের নিরাপত্তার জন্য যতক্ষণ পর্য্যন্ত সর্ব্ব-দেশ-স্বীকৃত উপায়ে নিরস্ত্রীকরণের ব্যবস্থা-চুক্তি সম্পাদিত না হয় ততক্ষণ তাঁহারা প্রয়োজনীয় অস্ত্র ও বাহিনী-শক্তি গড়িয়া তোলার প্রচেষ্টা চালাইয়া যাইবেন। তাঁহারা মনে করেন নিরস্ত্রীকরণ সর্ব্ব-জাতি-সম্মত উপায়ে করা সম্ভব এবং সকল দেশের পক্ষেই মঙ্গলজনক। নিরস্ত্রীকরণের উপায় হিসাবে তাঁহাদের যুক্ত-মত প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান সাহেবের বাণীর অনুরূপ।

এই ঘোষণার উত্তরে সোভিয়েট পররাষ্ট্র-মন্ত্রী মঃ ভিশিনস্কি আগামী জুন মাসের মধ্যে চীন-সহ পঞ্চ-শক্তির এক বৈঠক এবং আন্তর্জ্জাতিক নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন হিসাবে একটি সভা আহ্বানের প্রস্তাব করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বিনাসর্ত্তে এবং দ্ব্যর্থহীনভাবে আণবিক অস্ত্র সর্ব্বপ্রকারে নিষিদ্ধ করার এবং সমস্ত সঞ্চিত আণবিক অস্ত্রাদি ধ্বংস করার দাবী জানান। তাঁহার মতে আণবিক অস্ত্র নিয়ন্ত্রণের দ্বারা কোন সুফলই ফলিবে না। আণবিক অস্ত্র ব্যবহার সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করিতে হইবে। মঃ ভিশিনস্কির মতে বৃটেন, ফ্রান্স

ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সম্মিলিত সামরিক শক্তি রাশিয়ার সামরিক শক্তির দ্বিগুণেরও বেশী। তিনি বলেন যে, নিরস্ত্রীকরণ পরিকল্পনায় নিম্নলিখিত দফাগুলি থাকা একান্ত আবশ্যক ; যথা—

(১) সকল প্রকার আণবিক অস্ত্র নিষিদ্ধকরণ,

(২) সকল রকম অস্ত্র নিষিদ্ধ করার জন্য একটি চুক্তি-পত্রের খসরা রচনার জন্য আন্তর্জ্জাতিক সভা গঠন,

(৩) গচ্ছিত আণবিক অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ ও অস্ত্র-শস্ত্র হ্রাস করার উপর আন্তর্জ্জাতিক বৈঠক আহ্বান ও

(৪) রাষ্ট্রসঙ্ঘ-কর্ত্তৃক অস্ত্র-শস্ত্র ও সৈন্যবাহিনীর হিসাব সংগ্রহের ব্যবস্থা।

একটু চিন্তা করিলেই পরিষ্কার হইয়া যাইবে যে, ট্রুম্যান সাহেবের ব্যবস্থায় বা ভিশিন্স্কি সাহেবের উত্তরে নিরস্ত্রীকরণের যে উপায়ের কথা বলা হইয়াছে তাহা সত্য সত্যই কার্য্যকরী হওয়া সম্ভব নহে। কারণ নিরস্ত্রীকরণ তখনই সত্য সত্যই সম্ভব হইবে যখন সমর-সজ্জিত দেশগুলি বুঝিবে যে অস্ত্রবৃদ্ধি করায় তাঁহাদের বিশেষ কোন লাভ নাই। অধিকন্তু যে কারণে অস্ত্র-শস্ত্রের প্রয়োজনীয়তা তাঁহারা বোধ করিতেন সেই কারণগুলি অস্ত্রের সাহায্য ছাড়াই লাভ করা সম্ভব হইতেছে।

অস্ত্র-শস্ত্রের বৃদ্ধির মূলে রহিয়াছে কয়েকটি লোক বা প্রতিষ্ঠানের লাভের আশা। এবং সেই লাভের আশা কার্য্যকরী হইতেছে সাধারণ লোকের দুঃখ, দুর্ভাগ্য ও অভাবের তাড়নায়। ইহা সত্য যে, অল্পাধিক পরিমাণে প্রত্যেক লোকের হৃদয়েই দ্বন্দ্ব ও কলহের প্রবৃত্তি বর্ত্তমান থাকে। এই অবস্থা সাধারণতঃ কখনও ভীষণ আকার ধারণ করে না। ভীষণ আকার ধারণ করে শুধু তখনই যখন এই দ্বন্দ্ব কলহের প্রবৃত্তি জাগ্রত হয় এবং জাগ্রত দ্বন্দ্ব কলহের প্রবৃত্তি মানুষকে মোহগ্রস্ত করিয়া মারণশীল করিয়া তোলে। বহু সংখ্যক মানুষের এইরূপ ভয়ানক অবস্থা তখনই হওয়া সম্ভব হয়, যখন বহু সংখ্যক মানুষ তাহাদের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হয় ; যখন তাহারা মনুষ্যোচিত জীবনের আস্বাদ হইতে বঞ্চিত হয় ; যখন তাহারা সাধারণ কাম্য অবস্থা পর্য্যন্ত পাইতে পারে না। আরও পরিষ্কার করিয়া বলিতে গেলে বলিতে হয় যে, মানুষের সাধারণ কাম্য প্রধানত ছয় প্রকার, যথা—অর্থ, স্বাস্থ্য, শান্তি, সন্তুষ্টি, দীর্ঘ যৌবন ও দীর্ঘ জীবন। এই কাম্য বিষয়গুলি যখন ক্রমে ক্রমে অধিকাংশ লোকের কাছে পাওয়া অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায় তখন তাহারা সহজেই উত্তেজিত অবস্থায় আসিয়া উপনীত হয়। এবং এই অবস্থায় যদি নেতৃবর্গের মধ্যে কেহ কেহ তাহাদের বুঝাইতে পারেন যে দ্বন্দ্ব, কলহ ও মারামারির দ্বারা সুফল লাভের আশা আছে তাহা হইলে সহজেই তাঁহারা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে স্বীকৃত হন ও নেতৃবর্গের লাভের লালসায় জীবন বিসর্জ্জন দিয়া এই জীবনের দুঃখ হইতে মুক্তিলাভ করেন।

ইতিহাসের পাতা উল্টাইলে দেখা যাইবে যে, পূর্ব্বে যে সমস্ত যুদ্ধের উল্লেখ রহিয়াছে তাহা আজ-কালকার যুদ্ধের পরিমাণে নিতান্তই নগণ্য ছিল। এই সমস্ত যুদ্ধে ছিল, হয় ধর্ম্মমূলক প্রমত্ততা অথবা কাহারও রাজ-চক্রবর্ত্তী হইবার বাসনা। এই যুদ্ধের বিশেষত্ব ছিল যে লোকে লোকে যুদ্ধ হইত না—যুদ্ধ হইত যোদ্ধায় যোদ্ধায়। এবং অধিকাংশ সময়ে রাজ-বদল হইয়া গেলেও সাধারণ লোক তাহা জানিতেই পারিতেন না। গত একশত বৎসর ধরিয়া যন্ত্র-শিল্পের প্রচলনের পর হইতে এই যুদ্ধের রীতি ও নীতি দুইই যথেষ্ট পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। এবং আজ যুদ্ধ সামান্যতেই মহাযুদ্ধে পরিণত হয় এবং এই মহাযুদ্ধে

মানুষের হাহাকার, অশান্তি, অসন্তুষ্টি, ও অকালমৃত্যু এত ভীষণ আকারে বৰ্দ্ধিত হয় যে একদিকে প্রলয়ঙ্করী মহাযুদ্ধের নামে সাধারণ মনুষ্য-সমাজ টলটলায়মান এবং অপর দিকে এই মহাযুদ্ধের ভয় দেখাইয়া কয়েকজন দেশ-নেতা তাঁহাদের ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করাইয়া লইবার চাপ দেন।

এই অবস্থায় শুধু নিরস্ত্রীকরণ দ্বারাই যুদ্ধের প্রমত্ততা নিবারণ করা যাইবে না। এবং দুঃখ, দৈন্যের যে ছায়া আজ সারা দুনিয়ায় পরিব্যাপ্ত তাহাতে নিরস্ত্রীকরণ শুধু প্রস্তাব পাশ করিয়া সভা করিলেই সম্ভব হইবে না। নিরস্ত্রীকরণ তখনই করা সম্ভব হইবে যখন সকল দেশ একত্রে তাহাদের জনসাধারণের দুঃখ মোচনের জন্য সত্য সত্যই:ব্রতী হইবেন। মঃ ভিশিনস্কি সাহেব শুনাইয়াছেন যে, রাশিয়ার শান্তি নীতি ও সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণকারীদের কাজে বাস্তবিকই তফাৎ রহিয়াছে। সাম্রাজ্যবাদীরা দুনিয়ার উপর আধিপত্য লাভের নেশায় মশগুল হইয়া আছে। রাশিয়ায় অপর পক্ষে বিরাট শিল্প গড়িয়া তোলা হইতেছে। আমরা বলি, যদি মঃ ভিশিন্স্কি সাহেবের এই উক্তির কোন সত্যতা থাকে এবং যদি এই বিরাট শিল্প রাশিয়া ও তথা দুনিয়ার লোকের অভাব মোচনের প্রকৃত সহায়তা করে, তবে নিরস্ত্রীকরণের ব্যবস্থা লইয়া তর্কের আর প্রয়োজন কি? কিন্তু যদি রাশিয়ার গড়া বিরাট শিল্প অন্যত্র গড়া সাম্রাজ্যবাদের মত জনসাধারণের সুখ-সুবিধা হরণ করিয়া মুষ্টিমেয় লোকের সুবিধার জন্যই সৃষ্ট হইয়া থাকে, তবে এই উভয়ের মধ্যে প্রবৃত্তির কি প্রভেদ তাহা আমরা ঠিক বুঝি না।

আজ পঞ্চ বৃহৎ শক্তির চিন্তা করিবার সময় আসিয়াছে যে, যুদ্ধ যথেষ্ট প্রবলভাবেই তাঁহারা করিয়া দেখিয়াছেন; এমন কি আণবিক বোমার দ্বারা দেশের অংশবিশেষকে নিশ্চিহ্ন করিয়া দেখিয়াছেন—কিন্তু তথাপি শান্তি আসে নাই। তথাপি দ্বন্দ্ব কলহের প্রবৃত্তি দূর হয় নাই; তথাপি অনশনক্লিষ্ট জনসাধারণের ভগ্ন স্বাস্থ্যের ক্ষণভঙ্গুর অস্তিত্বের কোনও উপশম ঘটে নাই। যুদ্ধ বা যুদ্ধ প্রবৃত্তির দ্বারা শান্তি আসে না। শান্তির পথ ভিন্ন। সেই পথে জনসাধারণের অবস্থার দিকে দৃক্‌পাত করিবার প্রয়োজন হয়। সেই পথে এই চিন্তা দ্বারা ব্যাকুল হইতে হয় যে, কি করিলে সাধারণের স্বাভাবিক কাম্যগুলি তাহারা লাভ করিয়া মানুষের মত জীবন যাপন করিতে পারেন। যুদ্ধ প্রয়াসে যে মহান শক্তির আবাহনে যে বৃহৎ কর্ম্ম-প্রচেষ্টা তাঁহারা দেখাইয়াছেন, সেই প্রচেষ্টা যদি এই চিন্তা এবং তাহার সুফল লাভের কর্ম্মধারার দিকে তাঁহারা ব্যয় করেন তবে আমাদের বিশ্বাস যে সমস্ত দুনিয়ার সমস্ত লোক আবার সুখে, শান্তিতে ও সমৃদ্ধিতে বাস করিতে পারিবে—আবার এই দুনিয়া ফুলে, ফলে সুশোভিত হইয়া উঠিবে—মায়ের মুখে আবার সেই ঐশী হাসিরাশি ফুটিয়া উঠিবে।

ইরাক

গত পাঁচ বৎসর যাবতই ইরাক চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন যে কি করিয়া তাঁহাদের চুক্তি নূতন করিয়া পরিবর্ত্তন করা যায় এবং কি ভাবে তাহাদের তেলের রাজস্ব আরও পরিবর্দ্ধন করা সম্ভব হয়। এই দুইটি ব্যাপার লইয়া ইরাকের অর্থ-সমৃদ্ধি ও দেশাত্মবোধ দুইই বিশেষ করিয়া জড়িত হইয়া আছে। বৃটেনের ও ইরাকের স্বার্থ এই দুই ব্যাপারেই বিভিন্ন এবং এই বিপরীত স্বার্থ কোথায় যাইয়া শেষ পর্য্যন্ত

দাঁড়াইবে, তাহা খুবই চিন্তার বিষয়। যুদ্ধের অনিচ্ছা ও শান্তির জন্য আগ্রহই তাহাদের এখনও এ বিষয়ে চিন্তাশীল করিয়া রাখিয়াছে। নচেত অবস্থা গুরুতর আকার ধারণ করিত সন্দেহ নাই।

যদিও এযাবৎ কাল ইরাক ও ইজিপ্টের সম্বন্ধ প্রীতিপূর্ণ ছিল না, তথাপি ইংরাজ-ইজিপ্ট গোলমালে ইরাক ইজিপ্টকেই সহানুভূতি জ্ঞাপন করিয়াছে এবং প্রয়োজন হইলে নাহাশ পাশাকে সাহায্য করিবে এমন আভাষও দিয়াছে। তদুপরি আজ ইরাকের জনমণ্ডলীর বিতৃষ্ণার ভাব যে তিক্ত আকার ধারণ করিয়াছে তাহাতে ইংরাজ-ইজিপ্ট চুক্তির সময় হইতেও ছয় বৎসর পূর্ব্বে তাহাদের সঙ্গে কি চুক্তি হইয়াছিল তাহা স্থিরভাবে ভাবিবার অবস্থা তাহাদের আজ নাই। ইরাণের গণ্ডগোল ও যুদ্ধপ্রবৃত্তির হাওয়ায় ইরাককে যে কি পরিমাণে প্রভাবান্বিত করিবে তাহাও স্থির বলা চলে না।

কিন্তু এখন পর্য্যন্ত সংবাদপত্রে যাহা উল্লিখিত হইয়াছে তাহাতে মনে হয় যে ইরাকের অবস্থা তেহেরান বা কায়রোর মত এখনো ঘোরালো হইয়া উঠে নাই। ইরাকের নুরি-সৈয়দ ইংরাজের প্রতি আস্থাবান। গত ত্রিশ বৎসর যাবৎ যে মেলামেশা ও সাহচর্য্য বিদ্যমান আছে তাহাতে অঘটন ঘটিবার পূর্ব্বে কোন ব্যবস্থা করা সম্ভব হওয়া উচিত।

এ্যাংলো-ইজিপ্ট চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছিল মুসোলিনির যুদ্ধ-প্রবৃত্তির চাপে পড়িয়া ; কিন্তু ইরাকের সঙ্গে ১৯৩০ সালের চুক্তির পিছনে এমন কোন বিপর্য্যয়ের অবস্থা ছিল না। এই চুক্তি আজ ২০ বৎসর ধরিয়া রক্ষিত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু তথাপি ইহা ভুলিলে চলিবে না যে, যখন ১৯৩০ সালের এই চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছিল তখন ইরাক ইংরাজের ম্যাণ্ডেটারী (mandatory) অধিকারভুক্ত ছিল। তাই এই চুক্তি শুধু তৈলচুক্তি ছিল না—এই চুক্তির দ্বারা ইংরাজ বহু সুবিধা আদায় করিয়া লইয়াছিল। ইংরাজের সামরিক ঘাঁটি প্রতিষ্ঠার সুবিধা, রেলপথ চলাচলে ইংরাজের কর্তৃত্ব, ইংরাজ প্রতিনিধির (ambassador) বিশিষ্ট সম্মান ও অধিকার এবং প্রয়োজন থাকুক আর নাই থাকুক, ভাবীযুদ্ধে ইংরাজকে বাধ্যতামূলক-ভাবে সহায়তা করার প্রতিশ্রুতি—এই সমস্তই এই চুক্তিতে স্বীকার করাইয়া লওয়া হইয়াছিল।

এই চুক্তি যাহাতে রদ-বদল হয় তাহার জন্য ১৯৩০-৩৯ পর্য্যন্ত নানাভাবে চেষ্টা হইয়াছে এবং ১৯৪১ সালে রসিদ আলি ও তাঁহার সেনাপতিরা ইহার জন্য গোলযোগ সৃষ্টিও করিয়াছিলেন। এমতাবস্থায় যুদ্ধের পরেই যে এই চুক্তি নূতনতর করিবার জন্য দাবী করা হইবে ইহাতে বিচিত্র কিছুই নাই। কিছুদিন কথাবার্ত্তার পরে ১৯৪৮ সালে মিঃ বেভিন ও তদানীন্তন ইরাকী গবর্ণমেণ্টের মধ্যে পোর্টসমাথের চুক্তি-পত্র (Treaty of Portsmouth) স্বাক্ষরিত হয়। কিন্তু চুক্তি-পত্র স্বাক্ষরিত হইতে না হইতেই, বোগদাদের উন্মত্ত জনতা যে কাণ্ড বাধাইয়া তুলিল তাহাতে ইরাকের মন্ত্রীরা প্রাণভয়ে পলায়ন করিলেন এবং প্রায় ৪।৫ মাস অশান্তির পরে ইরাকে নূতন দল রাজ্যভার গ্রহণ করিলেন। এ কথা সত্য যে নূতন চুক্তি করিবার সময় তদানীন্তন ইরাক গবর্ণমেণ্ট অন্যান্য দলীয় নেতাদের মত গ্রহণ করেন নাই। ইহাও সত্য যে সালি জাবর সাহেবের গবর্ণমেণ্ট উপযুক্ত না থাকায় দুর্ব্বল শাসনে দেশে নানারূপ দুর্নীতির সৃষ্টি হইয়াছিল। কিন্তু যে চুক্তির পিছনে জন-মণ্ডলীর আস্থা না থাকে, যে চুক্তিকে জনগণ স্বদেশের অমর্য্যাদার কারণ বলিয়া মনে করেন, সেই চুক্তি সম্পাদিত হইলে কি ভীষণ পরিণতি ঘটিতে পারে তাহা ইরাকের এই সময়ের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়।

হইতে পারে যে, ইংরাজ এই সমস্ত সুযোগ ও সুবিধার কোন যথেচ্ছ ব্যবহার করেন নাই—বরঞ্চ যাহাতে গবর্ণমেন্ট ও জন-মণ্ডলীর মধ্যে মতের বৈষম্য না থাকে, বা যেখানে যখন প্রয়োজন সেখানে যেন ঠিক ভাবে রেল চলাচলের ব্যবস্থা থাকিতে পারে, বা তৈলের খনি যাহাতে কোনও বিশিষ্ট নীতি দ্বারা কার্য্যকরী হইতে পারে, এই সবের জন্যই চেষ্টা করিতেছিলেন। কিন্তু সমর-ঘাঁটি সংস্থাপন লইয়াই যত গোলযোগের সৃষ্টি। অধুনাতন ইরাকীগণ ইংরাজী ঘাঁটিকে সুচক্ষে দেখেন না—দেখিতে পারেন না। অন্ততঃ যদি সমর ঘাঁটিগুলি ইরাকী ও ইংরাজের মিশ্রণে সংগঠিত কোনও গোষ্ঠীর দ্বারা পরিচালিত হইত—তাহা হইলে হয়ত বা ইরাকীরা অপেক্ষাকৃত সুনজরে দেখিতে পারিতেন। হাবিলিয়া এবং সৈবা সমর-ঘাঁটিতে ইংরাজ যে জোর করিয়া থাকিবার মতলব করিতেছেন তাহাতে এমন গোলমালের সৃষ্টি হওয়া সম্ভব যে অচিরে ইরাক ইজিপ্টে পরিণত হইতে পারে।

আজ যদি ইংরাজ ও ইজিপ্টে সত্যই যুদ্ধ বাধিয়া উঠে তবে ইরাক ও অন্যান্য আরব দেশ যে কি করিবে তাহা বলা খুব কঠিন নয়। ইজিপ্টের সঙ্গে চরম নিষ্পত্তি হইবার পূর্ব্বেই ইরাকের সঙ্গে ইংরাজ কোনও নূতন চুক্তিতে আবদ্ধ হইতে পারিবেন কিনা তাহা বলাও কষ্টকর। তবে একথা পরিষ্কার করিয়া বলা চলে যে, আজিকার দুনিয়াতে ভ্রাতৃভাবাপন্ন ও সহৃদয়তাব্যাঞ্জক দৃষ্টি-ভঙ্গি লইয়া না অগ্রসর হইলে, শুধু নীতির নিষ্প্রভ নির্ণয়ের দ্বারা সুফল লাভ করা একপ্রকার অসম্ভব। সাধারণের মতের সঙ্গে একত্রিত হইয়া যদি চলা না যায়, তবে যত বড় কৃতবিদ্য মন্ত্রীই তিনি হউন না কেন, শীঘ্রই তাহাকে গবর্ণমেন্টের কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিতে হইবে।

আজ ইরাকের সাধারণ লোকের সাধারণ অবস্থা যে শ্রেণীর তাহাতে স্বতঃই তাহাদের মনে অশান্তি ও অসন্তুষ্টির উদ্রেক হইতে পারে। তদুপরি নেতৃবৃন্দ, সংবাদ-পত্র ও সভা-সমিতিতে যদি এই কথাই বড় হইয়া উঠে যে জনসাধারণের অবস্থার উন্নতির জন্য চেষ্টা করা অসম্ভব যদি না ইরাক-পেট্রোলিয়াম কোম্পানী আরও অর্থ দিতে স্বীকার করেন তাহা হইলে জনসাধারণের মন আরও তিক্ত হইয়া যাইবে ইহা আর বিচিত্র কি? ইরাকী জনসাধারণ স্বভাবতঃই ইহা বুঝিবেন যে যদি তাঁহারা তাঁহাদের দেশের জন্য তাঁহাদের দেশের লোক দিয়া এই তৈল-খনি পরিচালনা করিতে পারিতেন, তবে নিশ্চয়ই অনেক বেশী লাভ হইত এবং তাঁহারা অনেক সুখে সমৃদ্ধিতে বাস করিতে পারিতেন। ঠিক এই সময়ে তাঁহারা দেখিতেছেন প্রতিবেশী ইরাণের প্রচেষ্টা ও মশেদ্দিক সাহেবের ইংরাজের কর্ত্তৃত্ব সম্বন্ধে মনোভাব।

জাতির জনসাধারণ যখন এই ভাবে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে এবং তাহার পশ্চাতে যখন রহিয়াছে তাহাদের দুঃখ, কষ্ট, অনাহার ও দারিদ্র্যের বোঝা, তখন শুধু ন্যায়ের শীতল কঠিন বিধানের দোহাই দিয়া অবস্থার পরিবর্ত্তন করা যায় না। সাধারণ লোকের প্রয়োজনের দিকে তখন বড় করিয়া নজর করা একান্ত কর্ত্তব্য। ইহা সত্য যে ১৯৫০ সালে তৈল-কর টনে ৪ শিলিং হইতে ৬ শিলিং-এ বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। ১৯৫১ সালে লভ্যাংশের সমান সমান ভাগের নীতিও গৃহীত হইয়াছে—কিন্তু এই দুর্ব্বল পদ-বিক্ষেপ যথেষ্ট হইবে কি?

বাংলার মধ্যবিত্ত সমাজ ও ডাঃ রায়

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ শ্রীবিধানচন্দ্র রায় বাংলার মধ্যবিত্ত সমাজের দুঃখ-দুর্দ্দশা ও সরকারী তরফ হইতে তাহার প্রতিকারের পন্থা সম্পর্কে একটি সুপরিকল্পিত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিয়া বাংলার ভাবী অক্ষুন্নতা সম্পর্কে আশাবাদ ব্যক্ত করিয়াছেন। অনেকে তাঁহার এই বিজ্ঞপ্তিকে 'ইলেক্‌শনি চাল' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু আশু ইলেক্‌শনের সঙ্গে ডাঃ রায়ের বিজ্ঞপ্তির সম্পর্ক একেবারেই কম। বিজ্ঞপ্তির গোড়াতেই তিনি বলিয়াছেন : 'কয়েকদিন পূর্ব্বে এক সাংবাদিক সম্মেলনে আমি বাংলা মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের বিশেষত তাহাদের মধ্যে অল্প আয়ের লোকদের বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থার উল্লেখ করিয়াছিলাম। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের অবস্থার উন্নতির জন্য বর্ত্তমান সরকার কি কর্ম্মপন্থা অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা জনসমক্ষে উত্থাপিত করার প্রতিশ্রুতি আমি দিয়াছিলাম।' আলোচ্য বিজ্ঞপ্তিতে তিনি সেই প্রতিশ্রুতিই মাত্র পালন করিয়াছেন। অতএব 'It is not the stunt to stand Election but the selection of the West Bengal Government,' অর্থাৎ ইহা 'ইলেক্‌শনি চাল' নয়, ইহা হইতেছে পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেন্টের একটি কার্য্যকরী ব্যবস্থা-মনোনয়ন।

ডাঃ রায় দেখাইয়াছেন : গত একশত বৎসরে এই রাজ্যের সহর ও পল্লী অঞ্চল কোন পরিকল্পনা ব্যতীতই যদৃচ্ছাক্রমে গড়িয়া উঠিয়াছে। উহাকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে সুসংহত করার কোন ব্যবস্থা হয় নাই। ইতিহাস হইতে জানিতে পারা যায় যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথা প্রবর্ত্তিত হইবার অব্যবহিত পরেই বাংলার লোক জমির দিকে অধিকতর মনোযোগ দেয়। উহার অর্থ হইল এই যে, মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়কে প্রধানত জমির আয়ের উপরেই নির্ভরশীল হইতে হইল। তখন ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ভাবে গ্রাম গড়িয়া উঠিতে লাগিল। বাংলার জমির অবস্থা ক্রমশ খারাপ হইয়া পড়িতে লাগিল। কারণ, কৃষকগণ পুরাতন পদ্ধতি ও সরঞ্জামের দ্বারাই কৃষিকাজ চালাইয়া যাইতে লাগিল। ভাল ফসলের জন্য তাহাদের আবহাওয়ার উপর নির্ভর করা ব্যতীত উপায় ছিল না। ভূমি বণ্টন ব্যবস্থা এবং অপর কতকগুলি কারণে বর্ত্তমানে এক একজন চাষীর জমির পরিমাণ খুবই কম। উহাতে তাহার এমন লাভ হয় না যাহাতে সে জমির জন্য ভাল বীজ ও সার ক্রয় করিতে পারে। জমিতে যে ফসল উৎপন্ন হয়, তাহা সাধারণত দালালের মারফৎ বিক্রয় হয়। সাধারণত দেখা যায় যে, যে ব্যক্তি চাষীকে ফসল বন্ধক রাখিয়া চাষের জন্য অগ্রিম টাকা দিয়াছে, তাহার মারফৎই চাষীর উৎপন্ন ফসল বাজারে বিক্রয় হয়। এইসব কারণে অধিকাংশ চাষী প্রকৃতি ও মানুষের খেয়ালের নিকট নিজেকে অসহায় মনে করে। তাহাদের মধ্যে যাহারা সমর্থ ব্যক্তি, তাহারা কি ভাবে উন্নতি ও সুখস্বাচ্ছন্দ্যের আশায় সহরে চলিয়া আসিয়াছে, তাহা উপলব্ধি করা কঠিন নয়। গ্রামবাসীদের মধ্যে যাহাদের সামর্থ্য কম, তাহাদের উপরই কৃষিকার্য্যের ভার ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।

অপর পক্ষে সহরগুলিও বিক্ষিপ্তভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে। সহরগুলির জনসংখ্যা খুব বেশী এবং পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামাঞ্চল হইতে আগত লোকদের বাসেরও উপযোগী নয়। সহরের ময়লা, অস্বাস্থ্যকর বাসস্থান ও বস্তিগুলি রোগ ও মহামারীর উৎপত্তি স্থল। এই সকল সহরে লোকদের বহু কষ্ট সহ্য করিতে এবং কৃত্রিম জীবনযাপন করিতে হয়। সেখানে টাট্‌কা ও খাঁটি খাদ্যদ্রব্য এবং পানীয় জলও পাওয়া যায় না।

এই কারণে নগরবাসী পুষ্টিকর খাদ্য পায় না এবং ইহার ফলে বাঁচিবার জন্য সংগ্রামের সম্মুখীন হইতেও তাহারা অসমর্থ হইয়া পড়ে।

নগর ও গ্রামের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করিয়া ডাঃ রায় বলেন যে, প্রথমে নূতন সহরগুলির সঙ্গে গ্রামগুলির উন্নতি এমন ভাবে করিতে হইবে যাহাতে গ্রামবাসীরা সহরে উৎপন্ন দ্রব্যাদি ক্রয় করিতে সমর্থ হয় এবং নূতন নগরগুলিকে এমন ভাবে গড়িয়া তুলিতে হইবে যাহাতে নগর ও গ্রামের উৎপাদন ও দ্রব্যাদি বণ্টন পরস্পরের সহিত খাপ খাওয়াইয়া লওয়া যাইতে পারে। এই উদ্দেশ্যে পরিকল্পনা কমিশন উন্নয়ন পরিকল্পনানুযায়ী জনপদ গঠনের প্রস্তাব করিয়াছেন বলিয়া ডাঃ রায় উল্লেখ করেন। পরিকল্পনা কমিশন ৩০।৬০টি গ্রাম লইয়া উন্নয়ন পরিকল্পনানুযায়ী একটি গ্রামসমষ্টি গঠনের সুপারিশ করিয়াছেন। উক্ত সুপারিশে ইহাও আছে যে, প্রত্যেক রাজ্য প্রথমে প্রত্যেক জেলায় অন্তত একটি করিয়া ঐরূপ গ্রামসমষ্টি গঠন করিবেন। পশ্চিমবঙ্গের বর্ত্তমান জনসংখ্যা বিচার করিয়া বলা যায় যে, ঐরূপ এক একটি গ্রামসমষ্টিতে ৩০।৪০ হাজার লোক থাকিবে এবং উহার পরিধি হইবে আনুমানিক ৭৫ বর্গ মাইল। প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও কারিগরী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও স্কুল খুলিয়া সহর ও গ্রামবাসীদের চিকিৎসা ব্যবস্থা, প্রতিবেশী গ্রামসমূহের কৃষিজীবীদের যাহাতে সাহায্যে আসিতে পারে, তজ্জন্য কৃষি-শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা দান, গ্রামবাসীদের অর্থ জোগাইবার জন্য সমবায় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা, যথোপযুক্ত সেচ ব্যবস্থা, সহর ও পল্লী অঞ্চলে উৎপন্ন পণ্যের সহজ বিক্রয় ব্যবস্থা, সহর ও চতুষ্পার্শ্বস্থ গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা এবং গ্রামবাসীদের প্রয়োজনীয় বীজ, সার প্রভৃতি সরবরাহের জন্য গুদাম ও সংস্থা স্থাপন করিয়া বসবাস ব্যবস্থা কায়েম করিতে সরকারকে সাহায্য করিতে হইবে। ইহার সঙ্গে যুক্ত আছে—ময়ূরাক্ষী ও দামোদর বাঁধ পরিকল্পনা, অন্যান্য বিভিন্ন অঞ্চলের সেচ ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ সরবরাহ পরিকল্পনা, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ব্যবস্থা।

কার্য্য নির্ব্বাহের আনুমানিক হিসাব সম্পর্কে ডাঃ রায় বলেন যে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার আগামী পাঁচ বৎসরে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে অন্তত ২০টি ক্ষুদ্র সহর স্থাপন করিতে সক্ষম হইবেন। প্রত্যেকটি সহর উন্নয়নের জন্য মোট ৪০ লক্ষ টাকার প্রয়োজন হইবে বলিয়া আশা করা যায়। রাজ্য সরকার ঋণ বাবদ ইহার একাংশ দিবেন এবং অবশিষ্ট অংশ ব্যক্তি বিশেষ অথবা দল বিশেষের নিকট হইতে তোলা হইবে। গ্রামগুলির যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির জন্য ও অন্যান্য প্রয়োজনে আরও ২০ লক্ষ টাকা ব্যয় করা প্রয়োজন।

আদর্শ নগর নির্ম্মাণের জন্য প্রধান প্রধান ব্যয় হইবে—

(১) ৫ শত একর জমি দখল (একর প্রতি ২০০ শত টাকা)

—১ লক্ষ টাকা

(২) ১ হাজার গৃহ নির্ম্মাণ (প্রত্যেকটি দেড় হাজার টাকা মূল্যে)

—১৫ লক্ষ টাকা

(৩) পথঘাট, জল ও বিদ্যুৎ সরবরাহ ও পয়ঃপ্রণালী	— ৫ লক্ষ টাকা
(৪) ১ হাজার লোককে বিভিন্ন ব্যবসায়ে শিক্ষাদান (প্রত্যেকের পিছনে ৭৫০৲ টাকা ব্যয় করা হইলে)	— ৭ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা
(৫) কলকারখানা নির্ম্মাণ	— ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা
(৬) ৬ মাসের কলকারখানার সাজসরঞ্জামের ব্যয়	— ৮ লক্ষ টাকা
(৭) বিবিধ ব্যয়	— ২ লক্ষ টাকা
	মোট ৪০ লক্ষ টাকা

৬০টি গ্রামের উন্নয়নের জন্য ব্যয় হইবে—

(১) রাস্তা ২০ মাইল পাকা ও ১২০ মাইল কাঁচা রাস্তা	১২ লক্ষ টাকা
(২) স্কুল ও চিকিৎসালয় স্থাপন	২ লক্ষ টাকা
(৩) গ্রামগুলির জন্য খাল খনন	১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা
(৪) মাথা পিছু ৭৫৲ টাকা হারে ৬ হাজার গ্রামবাসীকে কৃষি সাহায্য	৪ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা
	মোট ২০ লক্ষ টাকা

ডাঃ রায় বলেন—'এই অর্থ আদৌ বেশী মনে হইবে না—যখন দেখা যাইবে যে, ইহার ফলে অন্তত ১ লক্ষ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক ও ৬ লক্ষ গ্রামবাসীর উন্নতি সাধন করিতে আমরা সক্ষম হইব।' বাংলার ভাবী অক্ষুণ্ণতা সম্পর্কে তিনি বলেন: 'ভবিষ্যৎ ভারত গঠনে বাংলা এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিবে বলিয়া আমার বিশ্বাস। বাংলার তরুণ-তরুণীদের কি আমি একটি প্রশ্ন করিতে পারি? দেশের মুক্তি সংগ্রামে ভারতীয়দের মধ্যে কাহারা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী আত্মত্যাগ করিয়াছে? ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলন কাহারা আরম্ভ করেন? কাহারা দীর্ঘদিন ধরিয়া দুঃখ-দুর্দ্দশা ভোগ করিয়াছেন? এইসব কার্য্যের একমাত্র উদ্যোক্তা হইল বাঙালী ও বাঙালী মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়। এই শ্রেণী বাঙালী সমাজের মস্তিষ্ক-স্বরূপ। যদি এই শ্রেণীর ধ্বংস হয়, তাহা হইলে বাংলা ধ্বংস হইবে। এই সঙ্গে ভারতের ধ্বংসও অনিবার্য্য। বাংলার যুবক সম্প্রদায় যেমন বিদেশী শাসকবর্গের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিল, সেই রকম দারিদ্র্য, বেকারী ও দুঃখকষ্টের বিরুদ্ধে তাহাদের সংগ্রাম করিতে আহ্বান জানান যাইতেছে।'

এ আহ্বান বীরের আহ্বান, আশাবাদের বিপুল স্বাক্ষর—সন্দেহ নাই; কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত গোটা স্কিমটা কাগজে পত্রেই থাকিয়া যায় কি না, তাহাই বিবেচ্য বিষয়। সামান্য মিউনিসিপ্যাল ব্যবস্থাই যেখানে কলিকাতা নগরীর পক্ষে অনুকূল না হইয়া দুঃসহ হইয়া উঠিয়াছে, সেখানে এত বড় স্কিমের পরি-পূরক হিসাবে সরকারী ব্যবস্থা কত দিনে এবং কি ভাবে কার্য্যকরী রূপ লইয়া দেখা দিবে, ইহাই সমস্যা। এই সমস্যা সম্পর্কে সচেতন হইয়াই অনেকে তাই ইহাকে 'ইলেক্‌শান চাল' বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে চাহিতেছেন। আসলে মধ্যবিত্তের সমস্যা দেশের সব চাইতে গুরুতর সমস্যা। ডাঃ রায় সে সম্বন্ধে এত বেশী সচেতন এবং এত বিস্তৃতভাবে তিনি ইহার রূপ দিয়াছেন যে, এ সম্পর্কে কিছু বলিতে গেলে পুনরাবৃত্তিই ঘটিবে। কিন্তু এ সম্পর্কে স্কিম এক বস্তু, কার্য্যকারীতা অন্য বস্তু।

আমরা বাঙালী ভাব-প্রবণ জাতি। সুন্দর ও সস্তা কথা শুনিতে ও বলিতে বেশ ভালবাসি। কার্য্যকরী করিয়া তুলিবার সংগ্রাম ও ক্লেশ বহন করিতে আমরা সাধারণত নারাজ। ডাঃ রায় আমাদের প্রধান মন্ত্রী। সুন্দর এবং ভাবপ্রবণ কথা বলিতে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি তাঁহার যে থাকিবে এ বিষয়ে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই।

সহর তৈয়ারী, সহর ও গ্রামের সহযোগী অবস্থান, সহর ও গ্রামের বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে সৃষ্টি—এ সমস্তই আমরা বিশদ ভাবে শুনিয়াছি বটে কিন্তু প্রকৃতরূপে কার্য্যকরী করিয়া তুলিবার পাল্লা বাটখারায় যখন এগুলি ওজন করিয়া দেখিব তখন দেখিব যে এ সবই কথার ঝুড়ি বাদে আর কিছুই নয়।

আজ বিভক্ত বাঙলা দেশ ও প্রত্যাখ্যাত বাঙালী নানাভাবে বিপর্য্যস্ত। মনে রাখিতে হইবে যে, এই বিপর্য্যস্ত মনুষ্যবর্গকে আবার মানুষের মত বাঁচিবার সুযোগ দিয়া ধীরে ধীরে গড়িয়া তুলিবার সমস্যাই আজ আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও কঠিন সমস্যা। এই সমস্যার সমাধান সহর ও গ্রাম গড়িয়া তুলিবার কথা ভাবিলেই হইবে না। এবং এই সমস্যাকে বাদ দিয়া শ্মশান পৃষ্ঠে সহর ও গ্রাম গড়িয়া তোলা যায় না।

তাহা ছাড়া যদি ডাঃ রায় ভাবিয়া দেখেন যে, কেন গ্রাম হইতে সহরের সৃষ্টি হইয়াছিল এবং সহর সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে আমরা অর্থনীতির কোন পর্য্যায় হইতে কোন পর্য্যায়ে যাইতে বাধ্য হইয়াছি—তাহা হইলে তিনি সহজেই বুঝিতে পারিবেন যে, আজ নূতন করিয়া এই পথকে ঘুরাইতে হইলে শুধু বাঙলাদেশের মুষ্টিমেয় গ্রাম-সম্বলিত অঞ্চল লইয়া চেষ্টা করিলেই তাহা সফল হইবে না। পটের উপরে তুলির অঙ্কণে যাহা সুন্দর দেখায় তাহার ছবি দেওয়ালে ঝুলাইয়া রাখা চলে কিন্তু সেই রাস্তার গঠন-মূলক কাজে আগুয়াণ হওয়া যায় কিনা তাহা ভাবিয়া দেখিতে হইবে।

খুলনায় দুর্ভিক্ষ

কিছুদিন পূর্ব্বে আমরা পূর্ব্ব-পাকিস্থানে লবণ দুর্ভিক্ষের কথা উল্লেখ করিয়াছি। উহার ঠিক মাসাধিক কালের মধ্যেই খুলনা জিলায় ব্যাপক দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। অথচ এ সম্পর্কে পূর্ব্ব-পাকিস্থান সরকার তথা পূর্ব্ব-পাকিস্থানের সংবাদপত্রসমূহ একেবারেই নীরব। দুর্ভিক্ষ হঠাৎ কখনও কোথাও দেখা দেয় না। ১৯৪৩ সালে অবিভক্ত বাংলায় যে দুর্ভিক্ষের সূত্রপাত, বিভক্ত বাংলার খুলনা জিলায় আজ তাহারই একটি আংশিক খাণ্ডবদাহন লক্ষ্য করিতেছি। লবণ, সরিষার তৈল, লঙ্কা প্রভৃতির ন্যায় নিত্য-ব্যবহার্য্য বস্তুগুলির মূল্য অনেক দিন হইতেই ধীরে ধীরে চড়িতেছিল। ইহার পিছনে ছিল এক শ্রেণীর মানুষের কালোবাজারী বৃত্তি এবং সরকারী দপ্তরের দুর্ব্বলতা। তাহারই সুযোগ লইয়া সমগ্র পূর্ব্ব-পাকিস্থানের প্রাণসত্তা আসিয়া ভাঙিয়া পড়িল খুলনা জিলায়। দশ সহস্র লোকের অনশন-মৃত্যুতে প্লাবিত হইয়া গেল খুলনার মাটি। ইহা আমাদের অনুমান মাত্র নয়। পূর্ব্ববঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য মিঃ আব্দুল সাবুরই বলিয়াছেন—খুলনার দুর্ভিক্ষ-পীড়িত অঞ্চলে আট হইতে দশ সহস্র লোক অনশনে মারা গিয়াছে। তিনি এই বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন যে, কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিম পাঞ্জাবের বন্যা-পীড়িত দুই লক্ষ লোকের জন্য দুই কোটি টাকা ব্যয় করিয়াছেন, অথচ এখানে দুর্ভিক্ষ কবলিত ১২ লক্ষ লোক সম্পর্কে দমনানীতি অনুসরণ করিতেছেন। বর্ত্তমান দুঃখ-দুর্দ্দশার কারণ বিবৃত করিয়া মিঃ সাবুর

বলেন: অতীতে অজন্মা হইলে লোকে মধু, জ্বালানি কাঠ, মাদুর, ঝাড়ু প্রভৃতি বনজ দ্রব্য বিক্রয় করিয়া বাঁচিত, কিন্তু দেশ বিভাগের পর এই ব্যবস্থা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। যে এক লক্ষ মাঝি তাহাদের ২০ সহস্র নৌকায় করিয়া এই সমস্ত দ্রব্য ও অন্যান্য জিনিষ কলিকাতায় চালান দিত, তাহারা আজ বেকার বসিয়া আছে।

কিন্তু কেন তাহারা বেকার বসিয়া আছে, কেন আজ এই দুর্ভিক্ষের প্রাদুর্ভাব—ইহা কি একবারও পূর্ব্ব-পাকিস্থান সরকার তলাইয়া দেখিয়াছেন? খুলনা জিলার মতো বন্দর-প্রধান স্থানে যেখানে কৃষি-শিল্পের অভাব নাই, বলিতে গেলে কোনো জিনিষেরই অভাব নাই, সেখানে এই দুর্ভিক্ষজনিত দশ সহস্র লোকের মৃত্যু নিতান্তই যে দৈব দুর্ঘটনা নয়, ইহা সামান্য বালকেও বুঝিবে। মৃত্যুজনিত ক্ষতিপূরণ দিয়া জীবনকে আশ্বস্ত করা যায় না। পূর্ব্ব-পাকিস্থান সরকার তাঁহার জনগণের কাছে ইহার কি উত্তর দিবেন?

পরলোকে শিল্পাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বাংলার দুঃখময় দুর্দ্দিনে তাহার ভাগ্যাকাশ হইতে অকস্মাৎ আর একটি তারা নিবিয়া গেল। প্রাচী ও সমৃদ্ধ ভারতের রূপশিল্পের মহামহিমান্বিত পুরোধা জগদ্‌বরেণ্য শিল্পাচার্য্য ডাঃ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথাই বলিতেছি। বিগত ৫ই ডিসেম্বর তাঁহার বারাক-পুর ট্রাঙ্ক্ রোডস্থ 'গুপ্ত নিবাস' ভবনে রাত্রি সাড়ে দশ ঘটিকায় তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ৮১ বৎসরের সাধনলব্ধ সুদীর্ঘ জীবনের উপর অকস্মাৎ যবনিকা পড়িল। অর্দ্ধ শতাব্দীরও অধিক কাল অক্লান্ত প্রয়াসে যিনি তাঁহার অতুলনীয় স্বর্গ তুলিকার প্রাণস্পর্শে ভারতের হৃত-চেতন কলালক্ষ্মীকে যুগ যুগান্ত পরে পুনরায় জাগরিত করিয়া বিশ্বের মানব-সমাজে পরিপূর্ণ মর্য্যাদার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, আর তাঁহাকে ফিরিয়া পাইব না। স্বপ্ন হইয়া, স্মৃতি হইয়া, ছায়া হইয়া তিনি শুধু আমাদের মধ্যে বিচরণ করিবেন। পূতসলিলা ভাগীরথীর তীরবর্ত্তী আলমবাজার শ্মশানঘাটে তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

বাংলার বিখ্যাত ঠাকুর পরিবারে তাঁহার জন্ম। কলিকাতার সুবিখ্যাত স্বর্গত দ্বারকানাথ ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র স্বর্গত গণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের তিনি কনিষ্ঠ পুত্র। ১৮৭১ সালের ৭ই আগষ্ট শুভ জন্মাষ্টমী দিনে জোড়াসাঁকো ভবনে অবনীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতামহ স্বর্গত গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং পিতা গণেন্দ্রনাথ

ঠাকুর উভয়েরই শিল্পকলার প্রতি গভীর অনুরাগ ছিল। অবনীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গগণেন্দ্রনাথ নিজেও একজন কৃতী শিল্পী ছিলেন। বাল্যকাল হইতেই অবনীন্দ্রনাথের চিত্রবিদ্যায় গভীর অনুরাগ জন্মে। তাঁহার ৮।৯ বৎসর বয়সে ফরাসী চন্দননগরের সন্নিকটে চাঁপদানীর একটী বাগানবাড়ীতে তাঁহাদের পরিবারবর্গ গিয়া বাস করিতে থাকেন। এইখানে অবনীন্দ্রনাথের শিল্প-চর্চ্চার অনুরাগ পরিবর্দ্ধিত হয়। ইহার কিছুদিন পূর্ব্বে তিনি কলিকাতার একটি নরম্যাল স্কুলের পাঠ সমাপ্ত করেন। এই স্কুলে অবনীন্দ্রনাথ তাঁহার এক শিক্ষকের উচ্চারিত একটি ইংরাজী কথার উচ্চারণ ভুল হইয়াছে বলিয়া উল্লেখ করিয়া উহা সংশোধন করিতে চাহেন। ইহাতে শিক্ষক রুষ্ট হন এবং শেষ পর্য্যন্ত অবনীন্দ্রনাথ স্কুল ছাড়িয়া দেন। চাঁপদানীর বাগানবাড়ীতে প্রকৃতির অজস্র সম্পদের মধ্যে বসিয়া এবং সম্মুখে পুণ্যতোয়া ভাগীরথীর বীচিভঙ্গ দেখিতে দেখিতে বালক অবনীন্দ্রনাথের মনে শিল্পানুরাগ বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং উহা তাঁহার তুলির মুখে চিত্রকলায় রূপায়িত হইতে থাকে। তিনি শুধু শ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পীই ছিলেন না, বাংলা ও সংস্কৃত সাহিত্যেও তিনি সবিশেষ অনুরাগী ছিলেন। অনেক মাসিক পত্রিকায় তাঁহার প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইয়া বাংলা ভাষাকে নূতন নূতন অবদানে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়াছে। কিছুকালের জন্য তিনি গবর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ ছিলেন। ১৯১৩ সালে রবীন্দ্রনাথ যেমন নোবেল পুরস্কার লাভ করেন, তেম্নি অবনীন্দ্রনাথও সি. আই. ই. উপাধি লাভ করেন। এতদ্ব্যতীত বহুদিন তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাবিদ্যার অধ্যাপক ছিলেন। শিশু-সাহিত্যিক হিসাবে তিনি সমধিক খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। শিশু-সাহিত্যে তাঁহার বহু গ্রন্থ স্মরণীয় হইয়া আছে। তন্মধ্যে 'শকুন্তলা', 'ক্ষীরের পুতুল', 'রাজকাহিনী', 'ভূতপত্রী', 'নহুষ' ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁহার অঙ্কিত অনবদ্য ও অননুকরণীয় চিত্রগুলির মধ্যে 'অভিসারিকা' (১৮৯২), 'শাহজাহানের মৃত্যু' (১৯০০), 'বুদ্ধ ও সুজাতা' (১৯০১), 'কৃষ্ণলীলা' সম্পর্কিত বিভিন্ন চিত্র (১৯০১ হইতে ১৯০৩), 'বিরহী যক্ষ' (১৯০৪), কালিদাসের ঋতুসংহারে বর্ণিত গ্রীষ্মের একখানি চিত্র (১৯০৫), 'কচ ও দেবযানী' (১৯০৮), 'ওমর খৈয়াম' (১৯০৯), 'বাঁশীর ডাক' (১৯১০), 'দেবদাসী' (১৯১২), 'পুষ্পরাধা' (১৯১২), 'যমুনা পুলিনে শ্রীরাধা' (১৯১৩), 'মুসৌরী পাহাড়ে' (১৯১৬), 'ফাল্গুনী'তে কবির বাউল নৃত্য (১৯১৬), 'পুরীর সমুদ্র সৈকতে চৈতন্য' (১৯২৫), 'বাবা গণেশ' (১৯৩৭), 'বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র বসুর আলেখ্য' প্রভৃতি বিশেষ কীর্ত্তিস্বরূপ।

অমৃতলোকে চিরবিশ্রামের মধ্য দিয়া তাঁহার আত্মা চিরশান্তি লাভ করুক।

শ্রীকে. ভি. আপ্পারাও কর্ত্তৃক মেট্রোপলিটান প্রিণ্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস্ লিমিটেড
৯০, লোয়ার সারকুলার রোড, কলিকাতা ১৪ হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

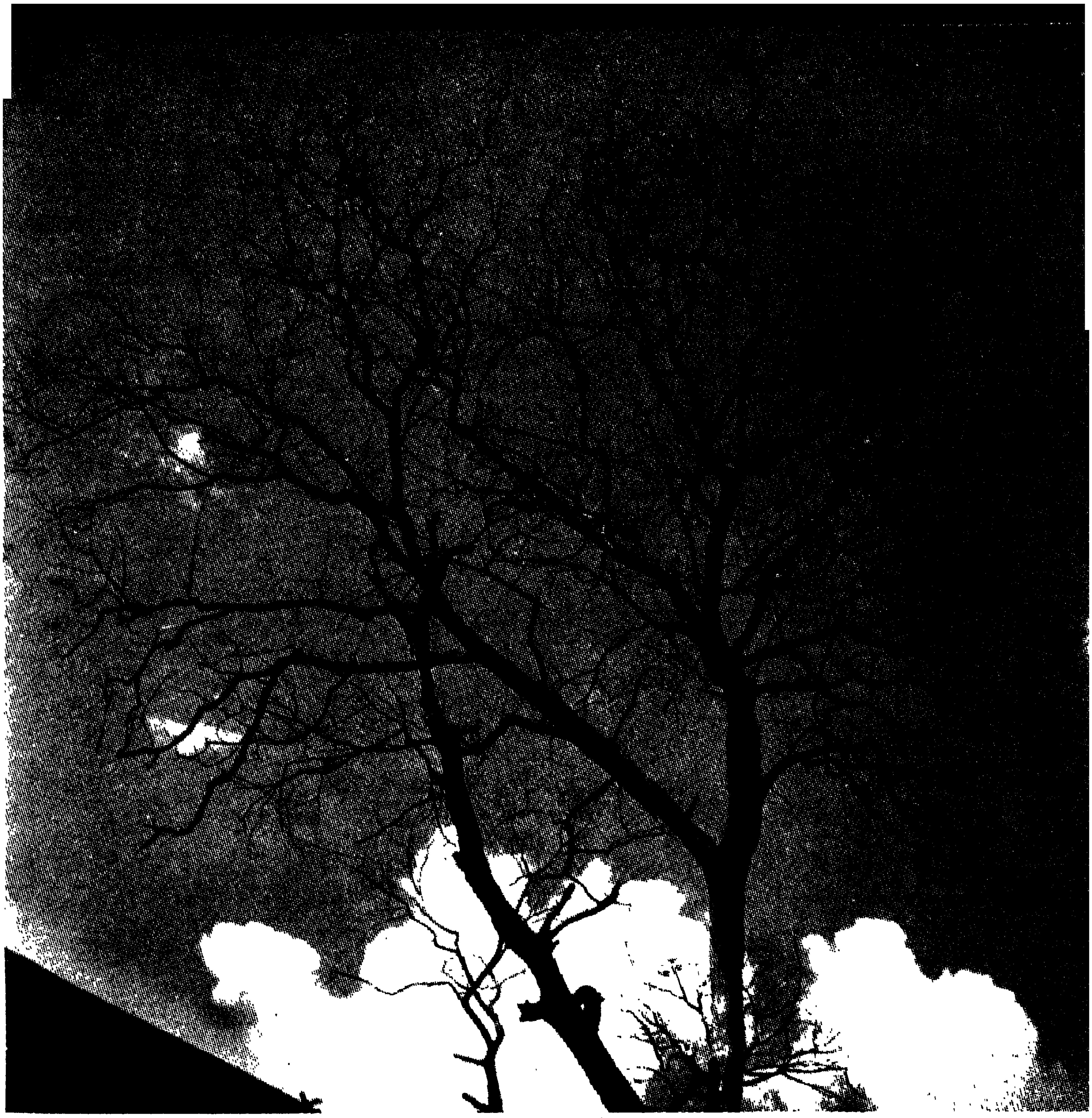

ীত ফোটো—শিবপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

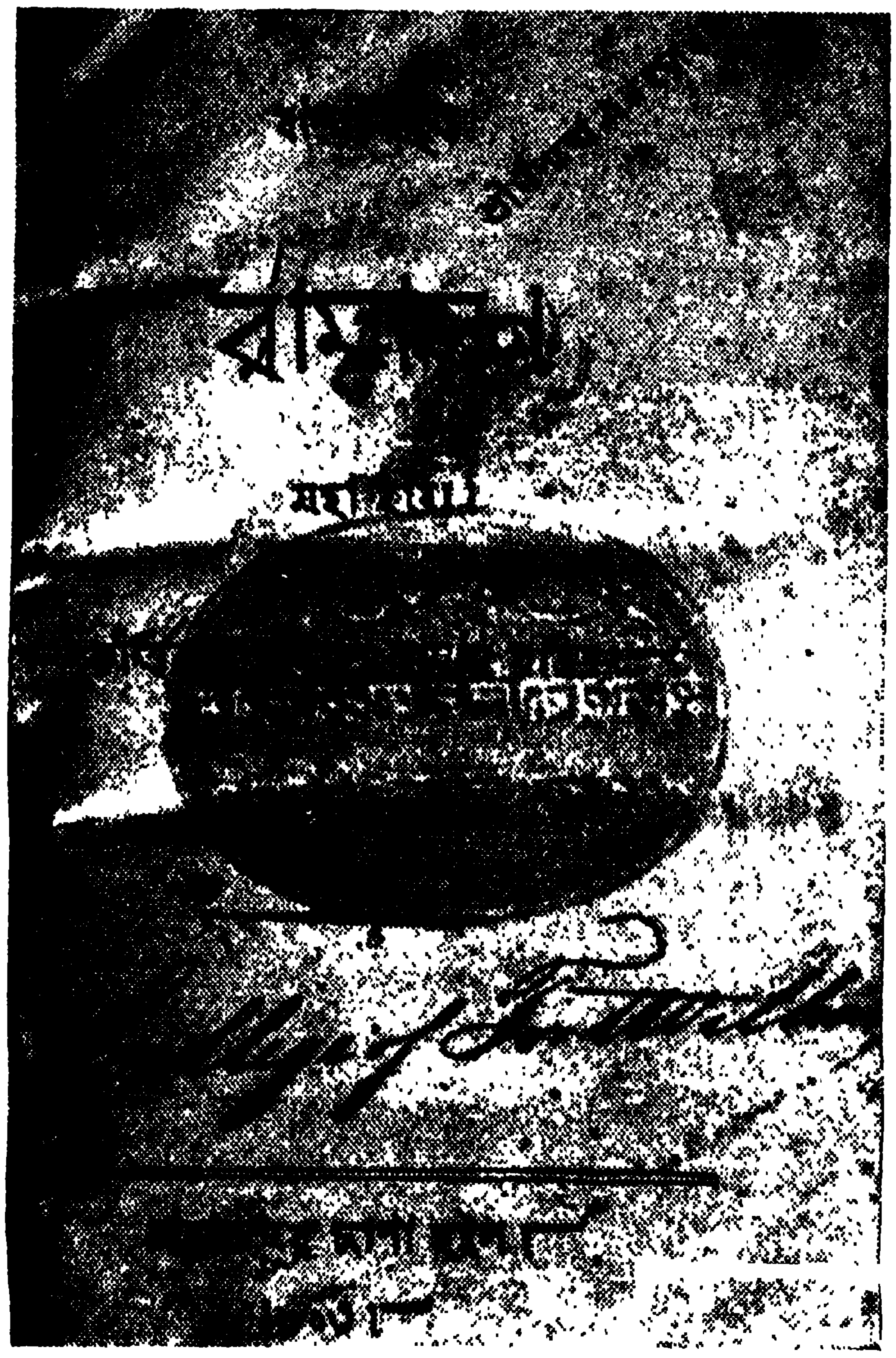

১৮০৩ খৃষ্টাব্দে উইলিয়ম কেরী সম্পাদিত
কৃত্তিবাসী রামায়ণের টাইটেল পেজ।

ফুলিয়াতে প্রতিষ্ঠিত মহাকবি কৃত্তিবাসের স্মৃতিস্তম্ভ।

উনবিংশ বর্ষ মাঘ—১৩৫৮ ২য় খণ্ড—২য় সংখ্যা

মহাকবি কৃত্তিবাস

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ

অর্দ্ধসহস্র বৎসর পূর্ব্বে, পুণ্য মাঘ মাসে শ্রীপঞ্চমীর শুভদিনে, যখন সমগ্র বঙ্গদেশ কুন্দেন্দু-তুষারধবলা শ্বেতপদ্মাসনা, বীণাবরদণ্ড-মণ্ডিত-ভুজা, শুভ্রবস্ত্রাবৃতা বাগ্দেবীকে ভক্তিভরে অর্চ্চনা করিতেছিল, যাজ্ঞবল্ক্যের ভাষায় প্রাণের কামনা নিবেদন করিতেছিল—

"লুপ্তং সর্ব্বং দৈববশাৎ নবীভূতং পুনঃ কুরু।
যথাঙ্কুরং ভস্মানি চ করোতি দেবতা পুনঃ ॥"
"সকলি গিয়াছে মোর দৈবের বিপাকে,
নূতন করিয়া তাই দাও মা আমাকে,
ভস্মের ভিতর হ'তে দেবতা যেমন
নিজবলে ক'রে দেন অঙ্কুর রচন।"

তখন শঙ্খ ঘণ্টাধ্বনির মধ্যে দেবীর প্রসন্ন দৃষ্টি তাঁহার চিরপ্রিয় বঙ্গভূমির উপর পতিত হইল, তিনি তাঁহার স্বর্ণবীণাসহ তাঁহার মানসপুত্র কৃত্তিবাসকে তাহার ক্রোড়ে প্রেরণ করিলেন।

আদি কবি বাল্মীকির কাব্যামৃতরসাস্বাদ তখন কেবল কতিপয় সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতই উপভোগ করিতেন, বিজাতীয় শাসকগণের অনাদরে সাধারণের মধ্যে সংস্কৃত চর্চ্চার সুযোগ হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছিল। সুতরাং জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহাকাব্য রামায়ণ—যাহাতে মহাকবি বাল্মীকি পিতৃসত্য পালনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, ভ্রাতৃবৎসল, পত্নীপ্রেমিক বীরশ্রেষ্ঠ, প্রজারঞ্জক শ্রীরামচন্দ্রের আদর্শ চিত্র অতুলনীয় ভাষার বর্ণে অঙ্কিত করিয়াছেন, যাহাতে তিনি ভ্রাতৃবৎসল আত্মত্যাগী ভরত লক্ষ্মণাদির চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, পতি-গতপ্রাণা সতীকুলাগ্রগণ্যা সীতার, প্রভুভক্ত হনুমানের, বন্ধুবৎসল সুগ্রীব বিভীষণাদির চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন.

যাহা জনসাধারণের দৃষ্টির অগোচরে চলিয়া যাইতেছিল, বাণীর বরপুত্র কৃত্তিবাসের দ্বারা বাগ্দেবী নূতন করিয়া আমাদিগকে তাহা প্রদান করিলেন।

বাঙ্গালাদেশ শত দুর্ব্বিপাকে, পরাধীনতার মধ্যেও কবিশূন্য হয় নাই।

"কবি রঙ্গভূমি এই না সে দেশ ?
ঋষি বাক্যরূপ লহরী অশেষ
বহিছে যেখানে—যেখানে দিনেশ
অতুল উষাতে উদয় হয় ?
যেখানে সরসী কমলে নলিনী,
যামিনী ভুলায় যেথা কুমুদিনী
যেথানে শরৎ চাঁদের চাঁদিনী
গগন ললাট ভাষায়ে বয় ?"

এই বঙ্গদেশেই কেন্দুবিল্ব পবিত্র করিয়া দ্বাদশ শতাব্দীতে—

"ললিত-লবঙ্গলতা-পরিশীলন কোমল মলয়-সমীরে
মধুকর-নিকর-করম্বিত কোকিল কুজিত কুঞ্জ কুটীরে—"

গীত গোবিন্দের মহাকবি শ্রীজয়দেব গোস্বামীর মধুর-কোমল-কান্ত পদাবলী রসিকজনকে অভূতপূর্ব্ব রাধাকৃষ্ণ প্রেমরসে আপ্লুত করিয়াছিল। এই বঙ্গদেশেই চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে বিদ্যাপতির কোকিল-বাণী শ্রুত হইয়াছিল, তিনি প্রেমের যে রূপ দেখাইয়াছিলেন, অমৃত-কণ্ঠে যে মধুর বোল শুনাইয়াছিলেন, রসিকজন অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা লইয়া আজিও সে রূপ দর্শন করিতেছে, সেই মধুর বোল শ্রবণ করিতেছে। "জনম অবধি হাম রূপ নেহারনু, নয়ন না তিরপিত ভেল, সোই মধুর বোল, শ্রবনহি শুনলু, শ্রুতিপথে পরশ না গেল।" বিদ্যাপতির সমকালেই নান্নুরের চণ্ডীদাস তাঁহার সুমধুর পদাবলীতে যে গান বঙ্গবাসীকে শুনাইলেন, তাহা বিদগ্ধজনের "কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল", "আকুল করিল" তার প্রাণ। বাস্তবিক গীতিকবিতার ক্ষেত্রে ইঁহারা যে প্রতিভা দেখাইয়াছেন, অদ্যাপি তাহার তুলনা কোন সাহিত্যে দেখা যায় না। কিন্তু প্রাক্‌চৈতন্যযুগের এই সকল পদাবলী কতিপয় সাধকের মনে যত আনন্দের সঞ্চার করিয়াছিল, তাঁহাদের সাধন মার্গে সিদ্ধির পথে সহায়তা করিয়াছিল, অজ্ঞ জনসাধারণের মধ্যে কি ততটা করিয়াছিল ? যোড়শ শতাব্দীতে শ্রীশ্রীমহাপ্রভু ও তদনুচর বৈষ্ণব গুরুগণের আবির্ভাব ও অসংখ্য বৈষ্ণব পদাবলীকারগণ কর্ত্তৃক গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মের বহুল প্রচারের পূর্ব্বে জনসাধারণের জীবন-পথে উহা কতদূর প্রভাব সঞ্চার করিয়াছিল ?

সুতরাং মুসলমানগণের শাসনকালে হিন্দুর সংস্কৃতি ও সভ্যতা রক্ষার জন্য, তাহাদের নৈতিক অধোগতি নিবারণের জন্য, তাহাদের জীবন-পথ সুগম করিবার জন্য, জনসাধারণের কবির প্রয়োজন হইয়াছিল।

সেইজন্য পঞ্চদশ শতাব্দীতে পুণ্যতোয়া ভাগীরথীর একপার্শ্বে শান্তিপুর-সন্নিহিত ফুলিয়া গ্রামে, এবং অপর পার্শ্বে কাটোয়ার সন্নিহিত সিঙ্গীগ্রামে বাণীর বরপুত্র কৃত্তিবাস ও কাশীরামের আবির্ভাব হইল। অর্দ্ধ সহস্র বৎসর বঙ্গবাসী রামায়ণ ও মহাভারতের অমৃত সমান কথা শ্রবণ করিতেছে। অর্দ্ধ সহস্র বৎসর কি শিক্ষিত কি অশিক্ষিত, কি ধনী কি নির্ধন আবালবৃদ্ধবণিতা এই মহা-গ্রন্থদ্বয় শ্রদ্ধার সহিত পড়িয়া আসিতেছেন বা উহার পাঠ শ্রবণ করিয়া আসিতেছেন, এবং তদ্দ্বারা উপকৃত হইতেছেন। সংস্কৃত মহাভারত ও রামায়ণ আদ্যোপান্ত কয়জন পড়িয়াছেন ? কিন্তু কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীরামের মহাভারত আজিও প্রতিবৎসরে লক্ষাধিক সংখ্যা বিক্রীত ও পঠিত হইতেছে। দিবাকর যেমন দীনের কুটীরে ও ধনীর প্রাসাদে সমভাবে আলোক বিতরণ করে, কৃত্তিবাস ও কাশীরামও বাঙ্গালার সকল কোণের অন্ধকার বিদূরিত করিয়া পুণ্যজ্যোতিঃতে দেশবাসীর হৃদয় উদ্ভাসিত করিতেছেন এবং চিরদিন করিবেন। ইঁহাদের আবির্ভাব না হইলে হয়ত বাল্মীকির ও বেদব্যাসের মহাকাব্যগুলির আদর্শচরিত্র দেবমানবগণের সহিত সাধারণে চিরদিন অপরিচিত থাকিত। প্রজাপালক শ্রীরামচন্দ্র, পতিব্রতা সীতা, ভ্রাতৃবৎসল ভরত লক্ষ্মণাদি, প্রভুভক্ত হনুমান, বন্ধুবৎসল সুগ্রীবাদি, সত্যব্রত ভীষ্ম, ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির, বীর ভীমার্জ্জুন, তেজস্বিনী দ্রৌপদী, দাতা কর্ণ প্রভৃতির আদর্শ জনসাধারণের নিকট প্রকাশিত হইত না, তাহাদের চরিত্রগঠনে ও জীবনের লক্ষ্য নির্দ্ধারণে কেহই সহায়তা

করিত না। চিন্তাশীল লেখক রাজনারায়ণ বসু মহাশয় যথার্থই বলিয়াছেন, "রামায়ণ ও মহাভারত আমাদিগের দেশের ধর্ম্মনীতি রক্ষা করিয়াছে। আমাদিগের দেশের ইতর লেখকেরা আহাক্তি গোরার ন্যায় কাণ্ডজ্ঞানশূন্য পশু নহে; ইহার প্রধান কারণ এই যে, তাহারা বাল্যকাল অবধি রামায়ণ ও মহাভারত পাঠ শুনিয়া থাকে। কোন ইউরোপীয় গ্রন্থকর্ত্তা বলেন যে, ইউরোপে যে কাজ বাইবেল, সংবাদ পত্র ও সাধারণ পুস্তকাগার এই তিনের দ্বারা সম্পাদিত হয় তাহা বঙ্গদেশে কেবল রামায়ণ ও মহাভারত দ্বারা সম্পাদিত হয়।" শতবর্ষ পূর্ব্বে মুদী বা শ্রমিকগণ অবসর কালে যেরূপ ভক্তি ও আনন্দের সহিত কৃত্তিবাসী রামায়ণ পড়িত, আজিও বাঙ্গালা দেশে সেইরূপ দেখা যায়। বাঙ্গালার বধূগণ, বর্ষীয়সী রমণীগণ তখনও যেমন সসম্ভ্রমে অবসরকালে এই গ্রন্থ পাঠ করিতেন বা পাঠ শ্রবণ করিতেন, এখনও সেইরূপ করেন। দরিদ্র, মধ্যবিত্ত ও ধনী সংসারে একই প্রথা। বাঙ্গালা মুদ্রাযন্ত্র প্রবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্বে সর্বত্র কথকগণের নিকট পুঁথির নকল থাকিত এবং কথকতা ভক্তিভরে শ্রবণ করিয়া হিন্দু নরনারী আনন্দিত ও উপকৃত হইতেন। এই কথকতা দ্বারা কিরূপে লোক শিক্ষা, ধর্ম্ম ও নীতিজ্ঞান বিস্তার করা হইত, বিশেষতঃ নারীগণের ধর্ম্মশিক্ষা হইত, তৎসম্বন্ধে একটী ঘটনার উল্লেখ করিতেছি।

১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে ২৫শে মার্চ্চ হাবড়ায় ক্যানিং ইনষ্টিটিউট নামক য়ুরোপীয় ও দেশীয় শিক্ষিত ভদ্রব্যক্তিগণের একটি সাহিত্য-সভায় হাইকোর্টের তদানীন্তন বিচারপতি স্যর জন বাড ফিয়ার এতদ্দেশীয় নারীগণের কৃষ্টি সম্বন্ধে একটি বক্তৃতায় নারীগণের মানসিক ও নৈতিক অবস্থার অতি হীন চিত্র প্রদর্শিত করেন। আমার পূজ্যপাদ পিতামহদেব, 'বেঙ্গলী' নামক সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজী সংবাদপত্রের প্রবর্ত্তক ও প্রথম সম্পাদক, বিখ্যাত ইংরেজী লেখক ও বাগ্মী গিরিশ-চন্দ্র ঘোষ মহাশয় এই বক্তৃতার ওজস্বী প্রতিবাদ করিয়া বলেন যে, "বক্তা বলিতে চাহেন যেন হিন্দুনারীগণের কোনও শিক্ষা বা কৃষ্টি নাই। য়ুরোপীয়দের ধারণা যে হিন্দুনারীরা একেবারে অশিক্ষিত—তাহাদের আদৌ কোন শিক্ষা নাই,—বিন্দুমাত্র চিন্তাশক্তি নাই এবং বক্তৃতাটি এই ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু এ ধারণা সত্য নহে। তিনি নিজ অভিজ্ঞতা হইতে বলিতে পারেন বর্ত্তমান কালে হিন্দুনারীগণ অতি উচ্চ শ্রেণীর শিক্ষা ও কৃষ্টির অধিকারিণী। হিন্দুনারীগণকে শিক্ষাদান করা হয় না ইহা অত্যন্ত ভুল ধারণা; য়ুরোপীয়েরা জানেন না কিসের মাধ্যমে তাঁহাদিগকে শিক্ষা প্রদত্ত হয়। স্ত্রীলোক-দিগের শিক্ষার জন্য হিন্দুদের বিশেষ প্রতিষ্ঠান আছে এবং এই প্রতিষ্ঠান হইতে সময়ে সময়ে শিক্ষাদান করা হয়। তাঁহার বিশ্বাস এ প্রতিষ্ঠানের বিষয়টি—অজ্ঞাত আছে। হিন্দু নারীগণের মানসিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষার জন্য প্রায়ই গৃহের প্রাঙ্গণে একজন বিচক্ষণ পূজনীয় ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক রামায়ণ মহাভারত এবং অন্যান্য ধর্ম্মগ্রন্থ পঠিত হইয়া থাকে। সে সময়ে গৃহদেবতাকেও তথায় আনয়ন করা হয় এবং এই সকল বিদ্বৎসভায় অসংখ্য নারীর সমাগম হয়। সতীত্ব ও ধর্ম্মনিষ্ঠা সম্বন্ধে যে সকল অমূল্য উপদেশ এই সকল সভায় যেরূপ সুদৃঢ়ভাবে মনোমধ্যে অঙ্কিত করিয়া দেওয়া হয়, তাহা কোন ইংরেজের ধর্ম্মমন্দিরে সেরূপ ভাবে প্রদত্ত হয় কিনা সন্দেহ। ইত্যাদি।" আমার পিতামহদেবের বিশেষ স্নেহভাজন বন্ধু বঙ্কিমচন্দ্র কয়েক বৎসর পরে 'লোকশিক্ষা' নামক প্রবন্ধেও এইরূপ কথকতার দ্বারা কিরূপ লোকশিক্ষা বিস্তার করা হইত তাহা বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত করিয়াছেন।

বলা বাহুল্য, কৃত্তিবাসের রামায়ণ প্রধানতঃ কথকতার জন্যই রচিত হইয়াছিল এবং এই জন্য মূল রচনায় কথকগণ অনেক নূতন নূতন কথা নিবেশিত করিয়াছেন, এবং ভাষাও ক্রমশঃ রূপান্তরিত হইয়াছে। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাঙ্গালার অধ্যাপক উইলিয়ম কেরী শ্রীরামপুর হইতে কৃত্তিবাস রামায়ণ সর্ব্বপ্রথম মুদ্রিত করেন। এই গ্রন্থ আমার নিকট আছে। এই রামায়ণ পরে সংস্কৃত কলেজের সাহিত্যাধ্যাপক জয়গোপাল তর্কালঙ্কার কর্ত্তৃক পরিশোধিত হইয়া এবং পরে বটতলার বিভিন্ন সংস্করণের সম্পাদকগণের সম্পাদনার ফলে যে আকার পরিগ্রহ করিয়াছে, তাহার সহিত কেরীর সম্পাদিত গ্রন্থেরই এত পার্থক্য দৃষ্ট হয় যে, মূলের সহিত বর্ত্তমান প্রচলিত সংস্করণের গ্রন্থগুলির যে কতদূর পার্থক্য

আছে, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয়ের ভাষায় আমরা বলিতে পারি মূল কীর্ত্তিবাসী রামায়ণ ও বর্ত্তমান সংস্করণের রামায়ণ "উভয়ের মাংসযোজনা বিষয়ে বৈলক্ষণ্য থাকিলেও অস্থি-ভাগের কিছুমাত্র পরিবর্ত্ত হয় নাই। কবিত্ব সেই অস্থিগত।"

কৃত্তিবাসের স্বরচিত আত্মপরিচয় হইতে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, তিনি এক সম্ভ্রান্তকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ নরসিংহ ওঝা বা উপাধ্যায় দনুজ মহারাজের পাত্র ছিলেন এবং রাষ্ট্রীয় উপদ্রবে নির্য্যাতিত হইয়া ফুলিয়া গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। ইঁহার পৌত্র মুরারি ওঝা সম্বন্ধে কৃত্তিবাস লিখিয়াছেন —

"মহাপুরুষ মুরারি জগতে বাখানি।
ধর্ম্মচর্চ্চায় রত মহান্ত যে মানী॥
মদরহিত ওঝা সুন্দর মুরতি।
মার্কণ্ড ব্যাসসম শাস্ত্রে অবগতি॥"

মুরারির পুত্র বনমালীর ঔরসে এবং মালিনী দেবীর গর্ভে কৃত্তিবাস জন্ম গ্রহণ করেন। রামায়ণে তিনি স্বীয় বংশ পরিচয়ে বলিয়াছেন—

"কৃত্তিবাস পণ্ডিত মুরারি ওঝার নাতি।
যার কণ্ঠে সদা কেলি করেন ভারতী॥
মালিনী নামেতে মাতা, বাপ বনমালী
ছয় ভাই উপজিলাম সংসারে গুণশালী॥"

তাঁহার জন্ম তারিখ সম্বন্ধে মতভেদ আছে। তিনি লিখিয়াছেন—

"আদিত্যবার শ্রীপঞ্চমী পূর্ণ (পুণ্য ?) মাঘমাস
তথিমধ্যে জন্ম লইলাম কৃত্তিবাস॥"

জ্যোতিষিক গণনার দ্বারা শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয় স্থির করিয়াছেন যে ১৪৩২ খৃষ্টাব্দে ২৯শে মাঘ কবি জন্মগ্রহণ করেন।*

"এগার নিবড়ে যখন বারতে প্রবেশ।
হেনকালে পড়িতে গেলাম উত্তর দেশ॥
বৃহস্পতিবারে উষা পোহালে শুক্রবার।
পাঠের নিমিত্ত গেলাম বড় গঙ্গাপার॥"

রায় মহাশয়ের মতে ১৪৪৩ খৃষ্টাব্দে (১৩৬৫ শকের ৪ঠা ফাল্গুন) কৃত্তিবাস বিদ্যাশিক্ষার জন্য গুরু-গৃহে যাত্রা করেন। তাঁহার শিক্ষা ও শিক্ষাগুরু সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন—

"তথায় করিলাম আমি বিদ্যার উদ্ধার।
যথা তথা যাই তথা বিদ্যার বিচার॥
সরস্বতী অধিষ্ঠান আমার শরীরে।
নানা ছন্দে নানা ভাষা আপনা হৈতে স্ফুরে॥

* * *

ব্যাস বশিষ্ঠ যেন বাল্মীকি চ্যবন।
হেন গুরুর ঠাঁই আমার বিদ্যা সমাপন॥
ব্রহ্মার সদৃশ গুরু বড় উদ্মাকার।
হেন গুরুর ঠাঁই আমার বিদ্যার উদ্ধার॥
গুরুস্থানে মেলানি লইলাম মঙ্গলবার দিবসে।
গুরু প্রশংসিলা মোরে অশেষ বিশেষে॥"

এইরূপে উপযুক্ত অধ্যাপকের নিকট উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়া কৃত্তিবাস "গৌড়েশ্বর দয়া কৈলে গুণের হয় পূজা" বলিয়া রাজ সম্মান লাভের জন্য যাত্রা করিলেন।

"রাজপণ্ডিত হব মনে আশা করে
পঞ্চশ্লোক ভেটিলাম রাজা গৌড়েশ্বরে॥"

রাজা শ্লোক পাঠ করিয়া প্রীত হইয়া সভামধ্যে তাঁহাকে আহ্বান করিলেন। তিনি আরও ৭টি শ্লোক উপহার দিলে সভায় ভূয়সী প্রশংসা লাভ করিলেন। মহারাজ খুসি হইয়া পুষ্পমাল্য পাঠাইয়া দিলেন, কেদার খাঁ শিরে

* ফুলিয়ায় কৃত্তিবাসের স্মৃতিস্তম্ভ-গাত্রে লিখিত আছে—
"মহাকবি কৃত্তিবাসের আবির্ভাব—১৪৪০ খৃষ্টাব্দ, মাঘ মাস শ্রীপঞ্চমী, রবিবার।

হেথা দ্বিজোত্তম
আদি কবি বাঙ্গালার ভাষা রামায়ণকার
কৃত্তিবাস লভিলা জনম,
সুরভিত সুকবিত্বে ফুলিয়ার পুণ্যতীর্থে
হে পথিক, সম্ভ্রমে প্রণম।

শ্রীযুক্ত স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বতী কর্ত্তৃক ভিত্তি স্থাপিত হইল। ২৭শে চৈত্র, ১৩২২ বঙ্গাব্দ।"

চন্দনের ছড়া ঢালিলেন, রাজা তাঁহাকে পট্টবস্ত্র উপহার দিলেন।

"রাজা গৌড়েশ্বর বলে কিবা দিব দান।
পাত্র মিত্র বলে রাজা যা হয় বিধান।"

পাত্র মিত্র কৃত্তিবাসকে যাহা ইচ্ছা পুরস্কার চাহিতে পরামর্শ দিলেন।

"পাত্র মিত্র সবে বলে শুন দ্বিজরাজে—
যাহা ইচ্ছা হয় তাহা চাহ মহারাজে।'

কিন্তু যিনি সরস্বতীর প্রসাদ লাভ করিয়াছেন, তিনি কমলার 'মণিময় ধূলিরাশি' চাহিবেন কেন? তিনি কবিজনোচিত স্পর্দ্ধিত উত্তরই দিলেন—

"কারো কিছু নাহি লই করি পরিহার।
যথা যাই তথায় গৌরব মাত্র সার॥
যত যত মহাপণ্ডিত আছয়ে সংসারে।
আমার কবিতা কেহ নিন্দিতে না পারে॥"

তখন— "সন্তুষ্ট হইয়া রাজা দিলেন সন্তোষ।
রামায়ণ রচিতে করিলে অনুরোধ॥"

তিনি এই মহাকার্য্যের ভার প্রাপ্ত হইয়া যখন রাজসভা হইতে বহির্গত হইলেন, তখন অপূর্ব্ব অভিনন্দন লাভ করিলেন—

"প্রসাদ পাইয়া বাহির হৈলাম সত্বরে।
অপূর্ব্ব জ্ঞানে ধায় লোক আমা দেখিবারে॥
চন্দনে ভূষিত আমি লোক আনন্দিত।
সবে বলে ধন্য ধন্য ফুলিয়া পণ্ডিত॥
মুনি মধ্যে বাখানি বাল্মীকি মহামুনি।
পণ্ডিতের মধ্যে কৃত্তিবাস গুণী॥"

অতঃপর কৃত্তিবাস "সরস্বতী বরে লোক বুঝাবার তরে", জনসাধারণের বোধগম্য সরল প্রাঞ্জল ভাষায় তাঁহার অপূর্ব্ব রামায়ণ গ্রন্থ রচনা করিলেন—

"বাপ মায়ের আশীর্ব্বাদে গুরু আজ্ঞা দান
রাজাজ্ঞায় রচে গীত সপ্তকাণ্ড গান॥
সপ্তকাণ্ড কথা হয় দেবের সৃজিত।
লোক বুঝাবার তরে কৃত্তিবাস পণ্ডিত॥
রঘুবংশের কীর্ত্তি কেবা বর্ণিবারে পারে।
কৃত্তিবাস রচে গীত সরস্বতী-বরে॥

রামায়ণ ব্যতীত কৃত্তিবাস "যোগাভার বন্দনা", "শিবরামের যুদ্ধ", "রুক্মাঙ্গদের একাদশী" প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

কৃত্তিবাস সম্বন্ধে সকল দিক দিয়া আলোচনা করা বর্ত্তমান প্রবন্ধে সম্ভব নহে। তাঁহার কয়েকটি বিশেষত্ব সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা বলিব।

১। ভাষার সরলতা ও প্রাঞ্জলতা

কৃত্তিবাসের ভাষার মত সহজ ও প্রাঞ্জল ভাষা, যাহা পড়িলে বা শুনিলে সামান্য শিক্ষিত বা অশিক্ষিত আবাল বৃদ্ধ বনিতা বুঝিতে পারে—বঙ্গসাহিত্যে দুর্লভ। তিনি যথার্থই জনসাধারণের কবি এবং উদ্দেশ্য ও সফলতা বিবেচনা করিলে তাঁহার রামায়ণের তুলনা নাই। তাঁহার পরে অনেকেই ভাষায় রামায়ণ রচনা করিয়াছেন, কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কোনটাই টিকিয়া থাকিতে পারে নাই। রামগতি ন্যায়রত্ন প্রভৃতি কোন কোন লেখক তাঁহার সহজ ও সরল বাঙ্গালা ভাষা ব্যবহার দেখিয়া এবং তাঁহার কোন কোন উক্তি যথা—

"কৃত্তিবাস পণ্ডিত বিদিত সর্ব্বলোকে
পুরাণ শুনিয়া গীত গাইল কৌতুকে॥'

এবং "গীত রামায়ণ করিল রচন ভাষাকবি কৃত্তিবাস" দেখিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, ভাষাকবি কৃত্তিবাস পুরাণের কথকতা শুনিয়া রামায়ণ রচনা করিয়াছেন, তিনি সংস্কৃতাভিজ্ঞ ছিলেন না। কিন্তু পূর্ব্বে তাঁহার যে আত্মচরিতের পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা হইতে প্রতীয়মান হয় যে, সংস্কৃত ভাষায় তিনি যথেষ্ট অধিকার লাভ করিয়াছিলেন; তাঁহার রচনা হইতে ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখানো যাইতে পারে যে, তিনি কেবল বাল্মীকি নহে, ভর্তৃহরি, কালিদাস, মহাভারত, মহানাটক, মনুসংহিতা প্রভৃতি বহু জগৎপ্রসিদ্ধ সংস্কৃত কবি ও কাব্যের অংশ বিশেষের প্রাঞ্জল অনুবাদ তাঁহার গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করিয়াছিলেন।

তাঁহার সহজ ভাষা যে কতদূর হৃদয়গ্রাহিণী ছিল তাহা ব্যক্তিগত ভাবে আমি উপলব্ধি করিয়াছি। আমার শৈশবে আমি আমাদের গৃহে মাতৃদেবীকে উহা পাঠ করিতে শুনিয়া আনন্দলাভ করিয়াছি। আমার ৬ বৎসর বয়সে যখন বটতলার একখানি কৃত্তিবাস রামায়ণ লইয়া

অংশ বিশেষ পাঠ করিতাম, অনেক অংশই বেশ বুঝিতে পারিতাম এবং কেহ বাটীতে আসিলে আমার মাতৃদেবী আমি কিরূপ রামায়ণ পড়িতে পারি তাহা তাঁহাদিগকে শুনাইতেন। বোধ হয় ৯ বৎসর বয়সে আমি বিদেশে পিতৃদেবের কর্ম্মস্থলে সমবয়স্ক বন্ধুর অভাবে এই গ্রন্থখানিকেই একমাত্র বন্ধু করিয়া লইয়াছিলাম, উহার আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়াছিলাম। আজকাল বালক বালিকাগণের দুর্ভাগ্য—শিশুরঞ্জন রামায়ণ, ছেলেদের রামায়ণ, ছোটদের রামায়ণ প্রভৃতি অসংখ্য পুস্তক হইতেই তাহারা এই গ্রন্থের পরিচয় লয় এবং পরে ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস ও অন্যান্য গল্পগ্রন্থের চাপে তাহারা কৃত্তিবাসের পরিচয় লইবার অবসর পায় না। কৃত্তিবাসের যে গ্রন্থ পূর্ব্বে ৮।৯ বৎসর বয়সের বালক হইতে ৮০।৯০ বৎসরের বৃদ্ধের পর্য্যন্ত আদরের সামগ্রী ছিল, শিক্ষার উপাদান, আনন্দের উপকরণ যোগাইত, আজ সে গ্রন্থ কেবল পুস্তকাগারের শোভা বর্দ্ধনই করিতেছে। আমাদের বাল্যকালে কৃত্তিবাসের আজিকালিকার মত এত সচিত্র শোভন সংস্করণ প্রকাশিত হয় নাই, দুই একখানি উডব্লকসহ বটতলার রামায়ণেরই প্রচার ছিল। সেই গ্রন্থই কত আদরের ছিল। এখনও কৃত্তিবাসের রামায়ণ, কাশীরামের মহাভারত এবং শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা বৎসরে লক্ষাধিক বিক্রয় হয় এবং কোন প্রকাশককে বোধ হয় ইহার জন্য ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয় না। এই জন্য হিন্দু দেবদেবী-বিদ্বেষী সম্পাদকও রামায়ণ সম্পাদিত করিয়া প্রভূত অর্থোপার্জ্জন করিতে কুণ্ঠিত হন নাই।

(২) তবে অনেক সম্পাদকই কৃত্তিবাসের উপর কলম চালাইয়াছেন। কৃত্তিবাস নাকি অশ্লীল কথা লিখিয়াছেন, সেগুলি নাকি পরিবর্জ্জন না করিলে উহা পাঠকসমাজে উপস্থিত করা যায় না। কৃত্তিবাসের সমসাময়িক কেন, উঁহার পরেও সেক্ষপীয়র প্রভৃতির রচনায় কি অশ্লীলতা নাই? Rape of Lucrecea, Venus and Adonis কি এখনও ছাপা হইতেছে না? কালিদাসের রচনায় কি অশ্লীলতা নাই? আমরা বাল্যকালে যখন রামায়ণ পড়িয়াছিলাম, তখন Expurgated Edition ছিল না, কিন্তু তখন কি শ্লীল কি অশ্লীল তাহা বুঝিবারও ক্ষমতা ছিল না। সমগ্র গ্রন্থ পড়িয়া উঠিয়া মন ত কোন নীচভাবের দ্বারা সঙ্কুচিত হইয়া উঠে নাই, পরন্তু, রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, সীতা, হনুমান প্রভৃতির আদর্শ চরিত্র-কথা শ্রবণে মন কত উচ্চে উন্নীত হইয়াছিল। ভাগীরথীর স্রোতে কত মল কত আবর্জ্জনা ভাসিয়া যায় তথাপি ভাগীরথীর জল পবিত্র, স্নিগ্ধকর, স্বাস্থ্যকর। কৃত্তিবাসের ভাষায় যদি কোথাও একটু অশ্লীলতা থাকে তাহা সেইরূপ কোথায় ভাসিয়া যায়, পাঠকের মনে পবিত্র ভাবেরই উদয় হয়। পূর্ব্বে বলিয়াছি কথকগণ এবং পুঁথীর নকলকারিগণ মধ্যে মধ্যে অনেক অংশ নিবেশিত করিয়াছেন এবং যদি দেশকাল পাত্রানুযায়ী আদর্শের অনুসরণে মূল হইতে বর্ত্তমান গ্রন্থ পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে, সুপণ্ডিত শাস্ত্রজ্ঞ কৃত্তিবাসকে তজ্জন্য দোষী করা অনুচিত।

(৩) কেরী সম্পাদিত কৃত্তিবাসের রামায়ণের শিরোদেশে লিখিত আছে "বাল্মীকিকৃত রামায়ণ মহাকাব্য, কীর্ত্তিবাস বাঙ্গালিভাষায় রচিল।" কিন্তু কৃত্তিবাস বাল্মীকি হইতে অনুবাদ ত করেনই নাই, কেবল বাল্মীকির উপর নির্ভরও করেন নাই। তিনি লিখিয়াছেন বটে—

বাল্মীকি বন্দিয়া কৃত্তিবাস বিচক্ষণ
লোকত্রাণ হেতু রচিলেন রামায়ণ॥

কিন্তু তিনি 'জৈমিনী-ভারত' 'অধ্যাত্ম রামায়ণ' 'অদ্ভুত রামায়ণ', পুরাণ, উপপুরাণ, কথকতা ও জনশ্রুতি হইতেও তাঁহার গ্রন্থের উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন—

ইহার প্রমাণ তাঁহার উক্তি। উত্তরকাণ্ডে রামলক্ষ্মণাদির পুনর্জীবন জৈমিনি-ভারত হইতে গ্রহণ করিয়া তিনি বলিতেছেন—

"এসব গাইল গীত জৈমিনি-ভারতে।
সম্প্রতি যে কিছু গাই বাল্মীকির মতে॥"

অন্যত্র যখন হনুমান গন্ধমাদন হইতে ঔষধ আনিতে যান,

"নাহিক এসব কথা বাল্মীকি-রচনে
বিস্তারিত লিখিত অদ্ভুত রামায়ণে॥"

(৪) কৃত্তিবাসের মৌলিকতা—কৃত্তিবাস বাল্মীকি বা কোনও গ্রন্থের অনুবাদ করেন নাই। কৃত্তিবাসের রামায়ণ একখানি মৌলিক গ্রন্থ। ইহাতে বাল্মীকির অনেক আখ্যান পরিত্যক্ত হইয়াছে, অনেক নূতন ঘটনা

সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। তাঁহার কল্পনাপ্রসূত ঘটনাগুলির মধ্যে তরণীসেন, বীরবাহু, হনুমান কর্তৃক সূর্য্যকে কক্ষে ধারণ, মহীরাবণ, অহীরাবণ ও দেবীপূজার পদ্মহরণ প্রধান। ইহাতে করুণ রস, হাস্যরস, বীররস প্রভৃতি তিনি অসাধারণ নিপুণতা সহকারে প্রদর্শন করিয়াছেন। সমালোচকশ্রেষ্ঠ বঙ্কিমচন্দ্র "তরণী সেন বধ" অংশটীর যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছেন।

(৫) বাঙ্গালার জাতীয় ভাব—জাতীয় আদি কবি কৃত্তিবাস বাঙ্গালীর জাতীয় ভাব তাঁহার সৃষ্ট চরিত্রসমূহে চিত্রিত করিয়াছেন।

বাল্মীকির লক্ষ্মণের উক্তি—

"হনিষ্যে পিতরং বৃদ্ধং কৈকয্যাসক্তমানসম্"

তিনি পিতৃভক্ত বাঙ্গালী বালকের নিকট শুনাইয়া তাহাকে জাতিগত আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট করেন নাই। কৃত্তিবাসের সীতা বাল্মীকির মানস-দুহিতা সীতার ন্যায় তেজস্বিনী নহেন, নিতান্তই "বাংলার বধূ. বুকে যার মধু"। যাঁহারা বাল্মীকি বর্ণিত "সীতার বিবাহ" অংশটীর সহিত কৃত্তিবাস রচিত "সীতার বিবাহ" বর্ণনা তুলনা করিবেন, তাঁহারা দেখিবেন, কৃত্তিবাস আধুনিক বাঙ্গালীর মেয়ের বিবাহের বর্ণনা করিয়াছেন, কন্যাটি মিথিলাবাসিনী নহেন। বাস্তবিক কৃত্তিবাস বাঙ্গালী ঘরের যাহা উপযোগী, যাহাতে বাঙ্গালা দেশের সামাজিক, রাজনীতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি হইতে পারে, তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। সংস্কৃত সাহিত্যে অগাধ পাণ্ডিত্য থাকা সত্ত্বেও তিনি বাঙ্গালীর হৃদয়গ্রাহিণী সরল ভাষায় সহজ ভঙ্গীতে বাঙ্গালী নরনারীর হৃদয়ে তাঁহার অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

(৬) রামায়ণের সর্ব্বত্রই অনুপ্রাস ও অন্যান্য অলঙ্কারের প্রয়োগ আছে, কিন্তু পাণ্ডিত্যের দাম্ভিকতা নাই। তাঁহার অনেক বাক্য বাঙ্গালার সুভাষিত সংগ্রহে চিররক্ষিত হইবার যোগ্য।

(৭) প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া যাইতেছে, আমরা তাঁহার সহৃদয়তা ও উদারতার উল্লেখ মাত্র করিব।

তাঁহার ধর্ম্মমত অত্যন্ত উদার ছিল এবং যদিও রামায়ণে বৈষ্ণবভাবই বিশেষভাবে দৃষ্ট হয়, তিনি শৈব ও শাক্ত ধর্ম্মের প্রতিও শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। 'শিবরামের যুদ্ধ' 'যোগাদ্যার বন্দনা' প্রভৃতির রচয়িতার শৈব ও শাক্ত ধর্ম্মের প্রতি যে শ্রদ্ধা ছিল এ কথা বলা বাহুল্য। বাল্মীকিতে না থাকিলেও কৃত্তিবাস কৌশল্যা দেবীর "শিব-শিবার চরণ পূজা", শ্রীরামের "চণ্ডীপূজা" প্রভৃতি বর্ণিত করিয়া শৈব ও শাক্ত ধর্ম্মের প্রাধান্য দেখাইয়াছেন। কিন্তু তিনি প্রকৃত বৈষ্ণব ছিলেন এবং সাম্প্রদায়িক কলহ নিবৃত্ত করিবার জন্যই বোধ হয় তিনি এমন ভাবে জাতীয় মহাকাব্যখানি রচনা করিয়াছিলেন যাহাতে উহা সকল সম্প্রদায়ের প্রিয় ধর্ম্মগ্রন্থরূপে গৃহীত হইতে পারে। ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন যথার্থই লিখিয়াছেন—

"রামায়ণে সর্ব্বত্রই বৈষ্ণব প্রভাব বিশেষরূপে দৃষ্ট হয়। …কোন কোন রাক্ষসবীরের উপর জগাই-মাধাই প্রভৃতি দুর্ব্বৃত্তের ছায়া এরূপ গাঢ়রূপে পড়িয়াছে যে, মনে হয় যেন সেই সকল কথা চৈতন্য দেবের পরে রচিত হইয়াছে। জগাই, মাধাই, নরোজি, ভীলপন্থ প্রভৃতি ব্যক্তিগণের অনুতাপ ও ভক্তিস্তুতির ভাষায় রাক্ষসবীরগণ স্তব পাঠ করিতেছেন এবং রাম লক্ষ্মণ রণস্থলে বসিয়া চৈতন্য ও নিত্যানন্দের অভিনয় করিতেছেন। কথায় কথায় প্রেম ও ক্ষমার বন্যা উথলিয়া উঠিতেছে। তরণী সেন স্বীয় অঙ্গে রামনামের ছাপ মারিয়া রামের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে গিয়াছেন, তাঁহার রথের পতাকায়ও সেই রামনামের ছাপ পড়িয়াছে এবং তাঁহার রণবাদ্য "রামজয়" শব্দ বাজাইয়া রামের সঙ্গে আশ্চর্য্য বিপক্ষতার সূচনা করিতেছে! বীরবাহু রামকে "রাক্ষস বিনাশকারী ভুবন মোহন" বলিয়া স্তব পড়িতেছেন, রাক্ষস বধ করিয়া রামচন্দ্র রাক্ষসের প্রশংসা লাভ করিতেছেন। এই রণক্ষেত্র, প্রেমক্ষেত্র বা অনুতাপক্ষেত্রে রাবণ দাঁড়াইয়া

জন্মিয়া ভারতভূমে আমি দুরাচার।
করেছি পাতক বহু সংখ্যা নাহি তার॥

বলিয়া আক্ষেপ করিতেছেন ও তাঁহার কুড়ি চক্ষু হইতে গড়াইয়া গড়াইয়া জল পড়িয়া রাজপরিচ্ছেদ সিক্ত করিতেছে।

এ সকল বর্ণনায় রণক্ষেত্রের ধুলি কীর্ত্তনভূমির রেণুর মত পবিত্র হইয়া গিয়াছে এবং দামামা-দগড়ায় কাঠি যত

উচ্চ রবে বাজিয়া উঠিতেছে, ততই যেন তাহাদের বাজে মৃদঙ্গের মধুর নিনাদের ঝাঁজ উঠিতেছে।"

আমাদের দেশের জনসাধারণের উপর কাশীরাম ও কৃত্তিবাসের প্রভাব অনন্যসাধারণ এবং ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক সযত্নে ও সংগোপনে রক্ষিত শাস্ত্রসাগর মন্থন করিয়া ইঁহারা জনসাধারণের মধ্যে অমৃত বণ্টন করিয়া দিয়াছিলেন। তাই রক্ষণশীল ব্রাহ্মণগণের নিন্দাবাক্য—

"কৃত্তিবাসে কাশী দেসে আর বামুন ঘেঁষে—
এই তিন সর্ব্বনেশে শাস্ত্র খেলে চুষে"

আজ প্রশংসা বাণীতে পরিণত হইয়াছে।

বাঙ্গালা দেশের এক মহাদুর্দ্দিনে কাশীরামের মহাভারত, কৃত্তিবাসের রামায়ণ এবং বৈষ্ণব মহাজনগণের কীর্ত্তন ও নামগান একদিন দেশবাসীকে অসাধুতা, দুর্নীতি, লোভ ও পরবশতা হইতে রক্ষা করিয়াছিল এবং তাহারই ফলে শতাব্দীর পর শতাব্দী অতিক্রান্ত হইলেও এ দেশের দরিদ্রতম অধিবাসীও দেশের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য স্মরণ করিয়া অন্যান্য দেশের সমাবস্থাপন্ন ব্যক্তিগণ অপেক্ষা উচ্চ নৈতিক আদর্শে আস্থাবান ও ধর্ম্মপ্রবণ হইয়াছিল। আজিকার এই দুর্দ্দিনে যদি জনসাধারণকে নৈতিক অবনতি হইতে রক্ষা করিতে হয়, তাহাদের সমক্ষে সাধুতার উচ্চ আদর্শ সমুপস্থিত করিতে হয়, তাহা হইলে তাহা রাজনৈতিক নেতাদের কার্য্যসিদ্ধিমূলক বক্তৃতা, বেতার ভাষণ বা প্রচার বিভাগের বিজ্ঞপ্তির দ্বারা হইবে না, উহা একমাত্র সম্ভব হইতে পারে যদি পূর্ব্বের ন্যায় সুদূর গ্রামে গ্রামে আবার রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতির কথকতা বহুলভাবে পুনঃ প্রচারিত করা হয়, নামসংকীর্ত্তন দ্বারা নরনারীর মনে ধর্ম্মবুদ্ধি উদ্রিক্ত করিয়া দেওয়া হয়। জাতীয় মহাকবি কৃত্তিবাস কাশীরামের প্রভাব দেশবাসীর উপর কখনও বিলুপ্ত হইবার নহে, সমুদ্র-সৈকতে বালুকার উপর তাঁহারা তাঁহাদের কীর্ত্তিস্তম্ভ রচনা করেন নাই। মহাকবি মধুসূদনের ভাষায় তাই বলিতে ইচ্ছা হয়—

"জনক জননী তব দিলা শুভক্ষণে
কৃত্তিবাস নাম তোমা!—কীর্ত্তির বসতি
সতত তোমার নামে সুবঙ্গ ভবনে,
কোকিলের কণ্ঠে যথা স্বর, কবিপতি,
নয়ন-রঞ্জন-রূপ কুসুম-যৌবনে,
রশ্মি মাণিকের দেহে!"

বিতাড়ন

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

ভীমরুল তাড়াইল বিলকুল মধুপে,
শশিতারা হারা নভ আলোকিবে খধুপে।
গেল ফল-ছায়া-তরু-আরও দুখ বেশীরে
রেখে গেল সেয়াকুল আলকুশী তে শিরে।
অসতেরা ব্যূহ রচে খেদাইল সৎকে,
বিছুটি ও কাঁটা গাছ ঢেকে দিল পথকে।

ধর্ম্মের নামে বহি' স্বার্থের পসারা
রুধিরের ব্যাঙ্কের নেতা হ'ল মশারা।
পলানো কমল-দল, করিবে কি কার্য্য?
পানিফলই চালাইবে বরুণের রাজ্য।
পাপ সেথা পুণ্যের গৌরব নিতেছে,
অন্যায় কাছে ন্যায় নাক-খৎ দিতেছে।

থেমে গেছে শুক তোতা ময়নার বকুনি,
সোর গোল করিতেছে চিল বাজ শকুনি

লোকসান

আশাপূর্ণা দেবী

ট্রেণে আসতে আসতেই দুঃসংবাদটা শোনা হয়ে গিয়েছিলো। ডেলি প্যাসেঞ্জার রমেশ বাগচী পাশের গাড়ী থেকে এ গাড়ীতে উঠে এসে শুনিয়ে গিয়েছিলো।

বরাবরই লক্ষ্য করেছি এ বিষয়ে রীতিমত একটা উৎসাহ আছে রমেশ বাগচীর, ভগ্নদূতের পেশাটা ওর পছন্দসই।...কিন্তু—শুধুই কি রমেশের? অধিকাংশ মানুষেরই কি নয়? আমার মৃত্যু সংবাদটা আপনার কানে তোলবার জন্যে কে না 'মুখিয়ে' থাকে? আলাপ-আলোচনার ক্ষেত্রে—এমন শাঁসালো বিষয়বস্তু আর কি আছে অপরের দুর্গতির কাহিনীর মতো?

বাড়ী ঢুকতে ঢুকতেই মাও তো সেই সংবাদই পরিবেশন করেন।...

—প্রবোধ ঠাকুরপোর বাড়ীর খবর শুনেছিস অরুণ?...শুনেছিস? কে বললে?

—রমেশ বাগচী।

—রমেশ? ওঃ ওতো জানবেই, রোজ যাওয়া আসা করছে। তোদের—হপ্তায় একদিন বাড়ী আসা—তার মধ্যে কতোকাণ্ডই ঘটে যায় দেশে! উঃ কী সর্ব্বনাশই হয়ে গেলো! যাকে বলে বিনামেঘে বজ্রাঘাত!

আমি বলি—সত্যি! ভাবা যায় না যেন! প্রভাসদার মতো ছেলে—

—কি বলিস! অমন ছেলে গাঁয়ে আর একটা ছিলো? ইদানীং তো হাজার টাকা মাইনে পাচ্ছিলো। তার ওপর আবার আফিসের বড় কর্ত্তা না কি যেন হবার কথা ছিলো শীগ্‌গির, হলে চোদ্দ পনেরোশো টাকা মাইনে হতো—অমন ছেলেও যায় মানুষের! উঃ ভগবানের কি অবিচার! নৈবিদ্যির চুড়োর সন্দেশটির ওপরই কি তাঁর যতো লোভ! বলা উচিৎ নয় অবিশ্যি—বেঁচে থাকুক—দুর্গা, দুর্গা...তবে "অগা বগা" আরোও দুটো তো ছিলো? খাবার মুখগুলি রইলো—দেবার হাতটি গেলো। শুনতে খারাপ হলেও কথাটা সত্যি বৈ কি!

উপার্জ্জনশীল ব্যক্তি বলতে একমাত্র প্রভাসদাই ছিলেন পরিবারের মধ্যে। অবশ্য থাকতেন সুদূর বিদেশে মীরাটে। আসা যাওয়া খুবই কম ছিলো। কালে কস্মিনে পুজোর ছুটিতে আসতেন এদিকে, কলকাতার শ্বশুর বাড়ীতে বৌ ছেলেকে নামিয়ে দিয়ে দু' এক দিনের জন্যে দেশে বেড়িয়ে যেতেন; সে যাই হোক, মাসের প্রথম দিকেই তাঁর প্রেরিত মোটা অঙ্কের মণিঅর্ডারটিই তো ছিলো প্রবোধ কাকার একমাত্র ভরসা। আর এ বিষয়ে সত্যিই আদর্শ ছেলে বলতে হতো প্রভাসদাকে, কখনো কোনো অজুহাতেই দু'টাকা কম কি দুটোদিন দেরী হতো না।

সেই ছেলে গেলো!

মা অনেক হা-হুতাশের পর নির্দ্দেশ দিলেন—যা হবার তা' তো হয়েই গেছে, এখন দু'দণ্ড জিরিয়ে নিয়ে যা একবার দেখা করে আয়। আহা, মানুষটাকে দেখলে বুকটা ফেটে যায় যেন।

বুকটুক না ফাটুক, মনটা আমারও সত্যি খুব খারাপ হয়ে গিয়েছিলো, কিন্তু মার প্রস্তাবে সভয়ে বলি—যেতে হবে? কিন্তু—কি করে মুখ দেখাবো—তাই ভাবছি। ...বলবোই বা কি?

—শোনো কথা ছেলের—মা অবাক বিস্ময়ে বলেন—তুই কি অপরাধ করেছিস যে মুখ দেখাতে পারবি না? মানুষের বিপদে আপদে শোকে দুঃখে গিয়ে দুটো ভালো কথা বলে সান্ত্বনা দিতে না পারলে আবার আত্মীয় বলেছে কেন? আমি তো যখন শুনলাম, সবে তখন রান্না চাপিয়েছি, হাতের কাজ হাত থেকে ফেলে ছুটে চলে গেলাম।...এ পর্য্যন্ত কখনো কথাটথা তো কইনি প্রবোধ ঠাকুরপোর সঙ্গে, কিন্তু এমন বিপদের সময় কি আর মুখ বুজে থাকা চলে? কথা কয়ে দুটো ভাল মন্দ বুঝ

দিয়ে সেই কতোবেলায় ফিরলাম। লেখাপড়া শিখে—কলকাতায় বাস করে তুই যে এতো মুখচোরা কেন, তাই ভাবি।

'কেন' সে কথাতো আমিও ভাবি, কিন্তু 'চোরামি' ঘোচে কই ?

কিন্তু মা ছাড়লে তো ?

শেষ পর্য্যন্ত ঠেলে পাঠালেনই ওপাড়ায়।

আহা সত্যিই ভারী দুঃখ হলো বেচারা প্রবোধ কাকাকে দেখে। যদিও আমাদের নিতান্তই দূরসম্পর্কের কাকা, কিন্তু এক গ্রামে বাস করার জন্যে আত্মীয়তা ছিলো। বিশেষ করে—কর্ম্মক্ষেত্রে প্রভাসদার পদোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে প্রবোধ কাকারও যেন সমাজে পদোন্নতি হয়েছিল। বেশ কিছু অহঙ্কারও যে তার না হয়েছিলো তা নয়। সামনে সমীহ করলেও—নির্ব্বোধ গ্রাম্য বৃদ্ধের সেই অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্য-গর্ব্বের সুস্পষ্ট অহঙ্কার আমাদের উপভোগ্য ও আলোচনার বস্তু ছিলো।···কিন্তু সে কথা থাক- আজ প্রবোধ কাকার সব কিছু ভেঙে চুরে চুরমার হয়ে গেছে। আজ আর সমীহ করবার দরকার নেই, পিঠে হাত বুলিয়ে সহানুভূতি জানালেই চলবে।

প্রথম দর্শনেই একবার হাহাকার করে উঠলেন কাকা, তারপর ধীরে ধীরে অনেক কথাই হলো।···কী ছেলে ছিলো তাঁর, কী প্রতিপত্তি ছিলো অফিসে, বড়োসাহেব নাকি প্রভাসদার কথায় উঠতো বসতো, নিজে ভুল ভুল ইংরিজি লিখে সংশোধন করাতে দিতো প্রভাসদার কাছে। প্রভাসদার মতো নির্ভুল আর নিশ্ছিদ্র ইংরিজি কথা চালিয়ে যাবার ক্ষমতা সারা অফিসে একজনেরও ছিলো না। বেঁচে থাকলে যে ভয়ানক একটা কেষ্ট বিষ্টু কিছু হতেন সন্দেহ নেই—এই সব নানা কথা।

সত্যিই ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল ছিলো বেচারার।

নিয়তির মতো এমন নিষ্ঠুর পরিহাস রসিক আর কে আছে ?

উঠি উঠি করছি—হঠাৎ তীব্র আর তীক্ষ্ণ একটা চীৎকারের শব্দে চমকে উঠলাম। এ চীৎকারের স্বরূপ চিনতে অন্ততঃ বাঙালীর ছেলের ভুল হয় না।—চিরন্তনী সুর!···শোক প্রকাশের উদ্দাম উন্মাদ পন্থা।

প্রথমে একটা তীক্ষ্ণ চীৎকার আছড়ে এসে আঘাত করলো কানের পর্দ্দাকে, তারপর হৃৎপিণ্ডটাকে যেন মোচড় দিয়ে দিয়ে ধ্বনিত হ'তে থাকে করুণ কাতর অবুঝ বিলাপবাণী।···যা হবে না, যা হয় না, যা বিধাতার রাজ্যে একমাত্র অসম্ভব ব্যাপার, সেইটার জন্যেই বুদ্ধিহীন প্রার্থনার আকুলি বিকুলি।···পলাতক প্রিয়জনের উদ্দেশে অন্ততঃ "একটী বারের জন্যও" ফিরে আসবার ব্যর্থ সেই অনুরোধ, সমস্ত শব্দ জগৎ থেকে চয়ন করা সকরুণ শব্দ-রাশিতে গঠিত সেই অন্তহীন মিনতি তরঙ্গের পর তরঙ্গে ছড়িয়ে পড়লো আকাশে বাতাসে···শিহরণ ধরিয়ে দিলো সমস্ত স্নায়ুতন্ত্রীতে।

এ শব্দ চিনতে ভুল হয় না।—

কিন্তু এ শব্দ তো প্রবোধ কাকার বাড়ীর ভিতর থেকে আসছে না! খানিকটা দূর থেকে যেন!—

আবার কার কি হলো!

কোথায় কোন প্রবাসে গচ্ছিত ছিলো কার বুকের কলজে ? কার কোন সৌভাগ্যবতী কন্যা নিশ্চিন্ত সুখে দিন কাটাচ্ছিলো পতিগৃহে ?

একটা টেলিগ্রাম এসে উপড়ে দিয়ে গেলো বুকের শিরা ? ছিঁড়ে দিয়ে গেলো কলজের যোগসূত্র ? না কি একখানা পোষ্টকার্ড এসে জানিয়ে দিয়ে গেলো সৌভাগ্য-বতীর সমস্ত গর্ব্ব ধূলিসাৎ হওয়ার সংবাদ ?

এ যে নতুন শোক বলেই মনে হচ্ছে।

আতঙ্কিত দৃষ্টিতে প্রবোধকাকার দিকে তাকালাম, কিন্তু কই উনি তো চমকালেন না ? শুনতে পাননি ? তা' কি সম্ভব ? না কি নিজের শোকে এতোই আচ্ছন্ন যে কানের সীমানা ছাড়িয়ে মনে প্রবেশ করেনি ?

আর একবার কান খাড়া করে ব্যাপারটা অনুধাবন করতে চেষ্টা করি, কিন্তু কণ্ঠস্বর বুঝতে পারিনা। কে ? কে ?

প্রশ্ন না করে পারিনা,—অজ্ঞাতসারেই প্রশ্ন করি—ওকি ? প্রবোধকাকা হতাশ বৈরাগ্যের নির্ব্বিকার হাসি

হেসে বলেন—আর কি! ও বাড়ীর নতুন বৌমার চেঁচানি! মেয়েমানুষ, তবু খানিকটা হাউচাউ করে বুকের ভার লাঘব করে

প্রবোধ কাকার ভাষ্যে অন্ধকার থেকে আরো অন্ধকারে পড়ে যাই। 'নতুনবৌমা' অর্থাৎ নতুনখুড়ি প্রবোধ কাকার মৃত বৈমাত্রেয় ভ্রাতার বিধবা। বহুদিনাবধিই হাঁড়ি এবং বাড়ী দুইই আলাদা। আর নতুন খুড়িতো প্রায় প্রভাসদারই সমবয়সী!

প্রভাসদার মৃত্যুশোক জনিত "বুকের ভার" লাঘব করবার জন্যে তাঁর এই বুকফাঁটা চীৎকারটা বেশ স্বাভবিক কি? প্রবোধ খুড়িমাতো পৃথিবীর জ্বালা জুড়িয়ে অনেক কাল চলে গেছেন, তাঁর অভাবে গৃহস্থের 'লক্ষ্মী ষষ্টি ঘেঁটু মনসা'র দায়টা না হয় নতুন খুড়িই ঘারে করে নিয়েছেন রীতি বজায় রাখতে। তাই বলে—তাঁর পুত্রশোকের কান্নার ভারটাও নেবেন?

প্রবোধকাকা বোধ হয় আমার 'অন্ধকার অবস্থাটা' কিছু বুঝতে পারেন, তাই ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে বলেন—তুমি বুঝি ওবাড়ীর খবরটা শোনোনি?

—না তো!

প্রবোধকাকা ম্লান হাসি হেসে বলেন—শোনোনি? শুনবেই বা কি? বলতেও ধিকার আসে লোকের—সুব্‌লোটাও তো গেলো!

'সুব্‌লো'! অর্থাৎ সুবল!

সেই হৃষ্টপুষ্ট জোয়ান ছেলেট 'গেলো' মানে? মারা গেলো?

স্তম্ভিত বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যাই। নতুন খুড়িমার একমাত্র সন্তান যে! আর সে কি যাবার ছেলে? অবিশ্যি 'হীরের টুক্‌রো'ও নয়, পাড়ার সেরা রত্নও নয়, আকাট মুখ্যু গোঁয়ার গবিন্দ ছেলেটা, কিন্তু স্বাস্থ্যটা যে দেখবার মতো ছিলো ছেলেটার! গেলো রবিবারেও যে দেখে গেছি—'কালীতলার' ওখানে বসে আড্ডা দিচ্ছে পাড়ার গুণ্ডামার্কা ছেলেগুলোর সঙ্গে। সেই আড়ে-দীর্ঘে প্রকাণ্ড দেহটা কর্পূরের মতো উপে গেলো?

মিনিট দুই চুপ করে থেকে প্রশ্ন করি—কি হয়েছিলো?

—কিছুই নয়, একদিনের জ্বরে। ডাক্তার বদ্যি দেখাতেও সময় পেলো না। হতভাগা হোক—যাই হোক—নতুনবৌমার ওই একটাই ছিলো, এই বড়ো কষ্টের কথা।

খুবই বিষাদপূর্ণ মমতার সঙ্গে কথাগুলো উচ্চারণ করেন বটে প্রবোধকাকা, তবু মনে হয় কোথায় যেন লুকোনো রয়েছে সূক্ষ্ম অবহেলা। যেন আপশোষ নয়—শুধু করুণা। পুত্রশোকাতুরা বিধবা ভ্রাতৃবধুর প্রতি একটু করুণা করলেই যথেষ্ট। তার পুত্রশোকের তুলনা করা যায় না নিজের সঙ্গে।

আর সত্যিই তো—প্রবোধকাকার বিরাট ক্ষতির কাছে নতুন খুড়িমার ক্ষতিটুকু? তুলনা সম্ভব? সমুদ্রের সঙ্গে গোষ্পদের তুলনা হয়?...প্রভাসদার সঙ্গে সুবলোর? যে ছেলে জন্মে একমুঠো ভাত মাকে দিতে পারতো কিনা সন্দেহ!

ধীরে ধীরে উঠে পড়ি।

প্রবোধকাকা বলেন—উঠলে? এসো বাবা আবার আসছে রবিবারে। তবু তোমাদের দেখলেও একটু শান্তি হয়।...ওবাড়ীতেও ঘুরে যাবে নাকি একবার? অবিশ্যি রাত বিস্তর হয়ে গেছে। না হয়—পারতো কাল সকালে। আর গিয়েই বা করবে কি, শুনতে পাই নাকি অতিরিক্ত অধীর হয়েছেন বৌমা, যে যাচ্ছে, তার সামনে কেঁদে কেটে বুকচাপড়ে একাকার করছেন একেবারে। মেয়েজাতের স্বধর্ম্ম।

বলেন বটে "মেয়ে জাতের স্বধর্ম্ম", তবু কথার ধরণে স্পষ্টই ধরা পড়ে নতুন খুড়িমার অধীরতাটা অসঙ্গত বাড়াবাড়ি। সুবলের মতো ছেলের জন্য এতোটা করা শোভা পায় না।

—হয়তো প্রবোধকাকার হিসেবই ঠিক। বাড়ী ফিরে ঠিক ওই কথাই তো শুনলাম!

এই নতুন খবরটা আবার মাকে কি করে দেবো তাই ভাবতে ভাবতে সারাপথ আসছি, কি ভাবে আরম্ভ করা

যাবে কথাটা? যে রকমই ভেবে ঠিক করি—বলে ফেললাম বাড়ী ঢুকেই ধাঁ করে। বললাম—পাড়ায় এসব কি হতে আরম্ভ করলো মা? আরও কী কাণ্ড হয়ে গেছে ওপাড়ায় জানো?

মা চমকে ওঠেন না, সুস্থির ভাবে বলেন—সুবলের কথা বলছিস?

—শুনেছো?

—শুনবোনা না তো আর যাবো কোথায়? ওতো আগেই গেছে। সুবল মারা গেলো মঙ্গলবার ভোরে আর প্রভাসের খবর এলো পশু—বেস্পতির সকালে।

মিনিটখানেক চুপ করে থেকে বলি—কই একথা তো বলোনি আমাকে? নতুন খুড়িমার সঙ্গে দেখা করা হোল না। রাত হয়ে গেলো—

—আর দেখা করা! করেই বা কি হবে ছাই! দেখা করা তো আমারও হয়নি, সেদিনকে ষষ্টি ছিলো—নানান কাজ, পরদিন কি বিষ্টি! বাড়ীর চৌকাঠ পেরোনো গেলো না, তারপর দিনই তো প্রবোধ ঠাকুরপোর বাড়ী ওই বজ্রপাত!

কথাটা শুনে কেমন ভালো লাগলো না, বোধ হয় একটু বিরক্তির সঙ্গেই বলি—তা' ওখানে তো গিয়েছিলে, হাতের কাজ ফেলে—তক্ষুণি ওখান থেকে নতুন খুড়ির বাড়ীটা তো পঞ্চাশ গজ দূরও নয় বোধ হয়।

—তা'তো বুঝলাম, কিন্তু সব ছিষ্টি ফেলে ছড়ে বৌমার ঘাড়ে দিয়ে চলে গেছি—কচি ছেলের মা, ছেলে কাঁদিয়ে কাজ করা, আর দেরী করতে পারি?

যেন "বৌ-মার ঘাড়ে সব ছিষ্টি চাপিয়ে দিয়ে" বেরোনো তাঁর এই প্রথম! যেন "কচি ছেলে কাঁদিয়ে" কাজ করার দৃষ্টান্তটা নিতান্তই বিরল।

—যাওয়া উচিৎ ছিলো—গম্ভীর ভাবে বলি।

বলাবাহুল্য এ গাম্ভীর্য্যে লেশমাত্র অপ্রতিভ করা যায় না মাকে। অবহেলাভরে উত্তর দেন—হয়েছে, তোমার আর আমাকে উচিৎ অনুচিৎ শেখাতে আসতে হবে না। ...একটু সুস্থির হোক, যাবো অখন একদিন। শুনছি নাকি এই পাঁচদিন ধরে চেঁচানির তিলার্দ্ধ বিরাম নেই। পাড়ার পাঁচজনে ঢের বলেছে—উঠে নাইতে, জল মুখে দিতে। শুনবে না—কাঠকবুল। কদিন চালাবি এ রকম? পাঁচদিন পারবি—ছ' দিন পারবি—ছ' মাস তো পারবি না? তবে?...আর দেখেও তো শিক্ষা হওয়া উচিৎ? কী রাজা ব্যাটা গেলো তোর ভানুয়ের, কই কতো অধৈর্য্য হচ্ছে? ধীর স্থির শান্ত।...তুই অতো অধৈর্য্যপণা করলে লোকেরই বা ভালো লাগবে কেন? পাড়ার লোকের ওপরই তো ভরসা? সংসারে তোর আছে কে? ভূত বাঁদর যাই হোক, যেটুকু ছিলো তাও তো গেলো!

আহতভাবে বলি—নতুন খুড়িমার ওই একমাত্র সন্তান মা, রাজা বাদশা না হলেও নতুন খুড়িমার প্রাণে কিছু কম লাগেনি। মায়ের প্রাণ--

—তা জানি—মা বিরস ভাবে বলেন—সে কথা আর হুঁস করিয়ে দিতে হবে না আমাকে। তবু—এও বলি সন্তানের কর্ত্তব্য করলে তবেই না সন্তান? ও ছেলের কাছে আর কি পিত্যেস ছিলো নতুন বৌয়ের?—মরলে মুখে আগুনটুকু ছাড়া? মায়ের মুখে এক গরস ভাত তুলে দেবার ক্ষ্যামতা ওর কখনো হতো?...অবিশ্যি 'নাড়ীর জ্বালা' যাবে কোথায়, তবু লোকসানের কম বেশী আছে বৈকি। প্রবোধ ঠাকুরপোর কথাটা ভাব দিকিন? কী রাজার হালে ছিলেন ইদানীং? সবই তো ওই প্রভাসের দৌলতে। মাস গেলে চারশো সাড়ে চারশো-খানি টাকা বিনাবাক্যে পাঠিয়েছে। ঠাকুরপোর 'ক্ষেতি'র তুলনা হয়?

আর কিছু বলতে পারি না।

বলবার কিছু ছিলও না। সত্যি সে ক্ষতির পরিমাপ না করে কেবলমাত্র হৃদয়বৃত্তির বশে চলতে চাইলে—পাঁচজনে সহ্য করবে কেন? কি করতে তবে 'আদিখ্যেতা' শব্দটার সৃষ্টি হয়েছিলো?...পুঁতির মালা হারিয়ে সোনা হারানোর খেদ করা শিশুর পক্ষে শোভন হতে পারে, সংসারী জীবের পক্ষে অমার্জ্জনীয়—অশোভন।

বেকার বাউণ্ডুলে ছেলেটাকে শুধু চীৎকারের জোরে হাজার বারোশোর ওপর তুলে ধরা যায় কখনো?

তোমার শোকের গভীরত্ব কেউ তোমার বুক চাপড়ানোর বহর দিয়ে মাপবে না।

হাজার বারোশোর স্বপ্নও কখনো দেখিনি, পৌনে দু'শোটা দু'শোয় গিয়ে ঠেকলেই পরমার্থ লাভ হয় এমনই একটা ধারণা আছে মনে মনে, কিন্তু নিজের দামটা তো কখনো কসে দেখিনি! খেয়ালই হয়নি।

প্রশ্ন করে দেখবো—সেই পৌনে দু'শোর জন্যে কতোটুকু অধীর হওয়া শোভন? সীমারেখাটা টানা হবে কোথায়?

কিন্তু না থাক!

গ্রীণরুমের ভিতর উঁকি মারবার প্রয়োজন কি? আমাদের কাজ তো আলকোজ্জ্বল মঞ্চটুকু নিয়ে। জেনে ফেলে লাভ কি—কার কতোটুকু রং নিজস্ব, কার গোঁফ-চুল ভাড়া করা!

মোহভঙ্গের লোকসানটা কি সোজা?

সূর্য্যোদয়

ওয়াল্ট হুইটম্যান

অনুবাদক: মৃণালকান্তি মুখোপাধ্যায়

রাত্রির শেষে
একটি শিশু তার পিতার পাশে দাঁড়িয়ে
ব্যগ্র দৃষ্টি নিয়ে দেখছে শরতের পূর্ব্বাকাশ,
শরতের সূর্য্যোদয়।
নিকষ অন্ধকারে চারিদিক ঢাকা
অভিশপ্ত জনতার চারপাশে মৃত্যু-মলিন মেঘরাশি,
ওপরে নীচে তার ক্ষুধার্ত্ত চক্রান্ত।
পূর্ব্বাকাশের স্বচ্ছ মেঘস্তরের আনাচে-কানাচে
অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে শান্ত মৌন বিরাট
বৃহস্পতির দ্যুতি
রাতের অকোশে একটু দূরে,
যেন হাতের কাছেই দেখা যায় সপ্তর্ষিমণ্ডল।
পিতার দিকে হাত বাড়িয়ে অসহায় শিশু
ধূসর তারকাদের মৃত্যু দেখে
ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো অসহ্য ব্যথায়।

না, না, কেঁদো না,
ওগো শিশু, কেঁদো না তুমি;
চুম্বনে চুম্বনে ধুয়ে দেবো তোমার ব্যথা।
এই সব কালো মেঘ দীর্ঘস্থায়ী নয়,
আকাশের বুকে এদের স্থায়িত্ব ক্ষণিকের জন্যে,
এরা শুধু প্রেতের মতো অল্পক্ষণের জন্যে
গ্রহমণ্ডলীকে গ্রাস করে,
বৃহস্পতি আবার দেখা দেবে, ধৈর্য্য ধরো—
অপেক্ষা করো আগামী রাত্রির জন্যে,
আবার দেখা যাবে—
পূর্ণ গৌরবে সপ্তর্ষিমণ্ডলের আবির্ভাব।
তারা চিরদিনের, এইসব সোণালী-রূপালী তারার দল
আবার ভবিষ্যতের আকাশে নিজের তেজে
জলজ্বল করবে।

প্রাচীন ভারতে গণিত-বিদ্যা

শ্রীবিনয়কুমার রায়

বিজ্ঞান অর্থাৎ বিশেষ জ্ঞানের চর্চা আমাদের দেশে বহু প্রাচীনকাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে। সুদূর যুগ হইতে ভারতে বিজ্ঞানের যে উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল উহা যথার্থই প্রণিধানযোগ্য। প্রাচীন ভারতের তৎকালীন আবিষ্কারের কোন কোনটি আজিও সুধীজন দ্বারা স্বীকৃত রহিয়াছে। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ভারতের অবদানের কথা বিচার করিলে ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, বিজ্ঞান ভারতের নিকট কোন নূতন জ্ঞানের বস্তু বা বিষয় নয়। জগতের বিভিন্ন অংশ যখন অসভ্যতা, অজ্ঞতা, মূঢ়তা এবং বর্ব্বরতার গাঢ় তিমিরাচ্ছন্ন, সেই সুদূর অতীত হইতেই ভারতবর্ষের মনীষীরা বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতি সাধন করিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমানের তথাকথিত সভ্যজাতিবৃন্দ তখন বৃক্ষের এক শাখা হইতে অন্য শাখায় লম্ফ প্রদান করিয়া কৃতিত্বের পরিচয় দিতেছিলেন এবং খাদ্যান্বেষণে বিকট চীৎকার করিয়া বনভূমি কাঁপাইয়া সগৌরবে আপনাদিগের অস্তিত্বের কথা জগতকে জানাইতে ছিলেন। সেই অতি—অতি প্রাচীনকালে ভারত চরম উন্নতির শিখরে আরোহণ করিয়াছিল। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও ভারতের অসাধারণ উৎকর্ষ লাভ পৃথিবীর ইতিহাসে একান্ত বিরল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ভারতীয় জ্ঞানবৃদ্ধ মুনিঋষিরা তৎকালে যে সমস্ত বিষয় আবিষ্কার করিয়াছিলেন, উহা আজিও বিদ্বজ্জনসমাজের শ্লাঘার বস্তু।

ঋষি কণাদই সর্ব্বপ্রথম কণিকাবাদের পর্য্যালোচনা এবং প্রচার করেন। এই কণিকাবাদ সমস্ত জাগতিক পদার্থের সৃষ্টির মূল। কণাদ মুনির মতবাদই উত্তরকালে বহু বৈজ্ঞানিকের দ্বারা সংশোধিত হয়। গ্রীস দেশের প্রাচীন মনীষীরা ইহা সমর্থন করেন। এ সম্পর্কে নূতন কোন আবিষ্কার তাঁহারা করিতে পারেন নাই। পরবর্ত্তী কালে ইংরাজ বৈজ্ঞানিক (John Dalton) জন ডাল্টন মোটামুটি এই মতবাদই গ্রহণ করেন। অবশ্য তিনি ইহাতে প্রয়োজনীয় পরিবর্ত্তন সাধন করেন। বর্ত্তমানে উহা ডাল্টনের কণিকাবাদ বা পরমাণুবাদ নামে সুপরিচিত (Dalton's Atomic Theory), সর্ব্বসম্মতিক্রমে ইহা স্বীকৃত হইয়াছে যে, মতবাদ ও উহার জ্ঞানের দিক হইতে (theoretical knowledge) বিজ্ঞানে ভারতের অবদান অতুলনীয়।

সেই অতি প্রাচীনকালে হিন্দু বৈজ্ঞানিকগণ 'আকাশ' বলিয়া একটি বিশিষ্ট পদার্থের কল্পনা করিতেন।১ এই 'আকাশ'ই বর্ত্তমানের 'ইথর' নামক পদার্থ (ether)। তাঁহাদের মতে আকাশ পদার্থটি সর্ব্বব্যাপী—সমস্ত পৃথিবী জুড়িয়া রহিয়াছে, সমস্ত জাগতিক পদার্থনিচয়ে বর্ত্তমান। পদার্থের গুণাবলীর সহিত ইহার সাদৃশ্য নাই, বরং জড়তাই (inertness) ইহার বৈশিষ্ট্য। অতএব 'আকাশ' বস্তুটিকে আধুনিক জগতের অন্যতম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আবিষ্ক্রিয়া ইথরের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। অতি উচ্চ শ্রেণীর পরীক্ষামূলক বৈজ্ঞানিক গবেষণা বহু প্রাচীনকালেও ভারতে সাধিত হইত। ইহাতেও ভারতের কৃতিত্ব ছিল অসাধারণ।

৩

শুধু প্রাকৃত-বিজ্ঞানে (Natural Philosophy) নয়, গণিত-বিজ্ঞানেও ভারতের অবদান অতুলনীয়। হিন্দু-গণিতবিদ্‌দিগকে জগতে গণিতশাস্ত্রের একাধারে প্রবর্ত্তক

---

১ "Kanada's conception of 'akasa' is that of a subtle substance which transmits sound and which is infinite, one and eternal. Like 'akasa', time and space are indivisible, eternal and infinite."

—Epochs of Civilisation, P. N. Bose.

এবং শিক্ষক বলা যায়। একথা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত যে ভারতবর্ষে সর্ব্বপ্রথম সংখ্যালিখন প্রণালীর উদ্ভব হয়।২ বস্তুতঃ আরবরা সংখ্যাগুলিকে হিন্দের সংখ্যা (figures of Hind) বা হিন্দ্‌শা নামে অভিহিত করে।

ভারতীয় গণিতবিদ্‌গণই দশমিক ভগ্নাংশ আবিষ্কার করেন।৩ জগৎবিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ও আবিষ্কারক গণিতবিদ্ আর্য্যভট্ট, সুবিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ বরাহমিহির, ব্রহ্মগুপ্ত, শ্রীপতি, লল্ল প্রমুখ বহু ভারতীয় বৈজ্ঞানিক গণিত শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহাদের বিভিন্ন আবিষ্ক্রিয়া বিজ্ঞানে তৎকালীন ভারতের অসাধারণ নৈপুণ্যলাভ ও অতুলনীয় উৎকর্ষ সাধনের কথাই সগৌরবে ঘোষণা করে। নারী বৈজ্ঞানিক লীলাবতীর অসামান্য প্রতিভার জন্য তাঁহাকে প্রচীন ভারতের মাদাম কুরী আখ্যায় ভূষিত করা যাইতে পারে। সুপ্রসিদ্ধ জ্যোতিষী খনার আবিষ্কারগুলিও নিতান্ত নগণ্য বলিয়া তুচ্ছ করিবার বস্তু নয়।

মনীষীশ্রেষ্ঠ আর্য্যভট্টই বিশ্বে সর্ব্বপ্রথম ঘোষণা করেন যে পৃথিবী গোলাকার—তিনি এ বিষয়ে গুণমূলক প্রমাণ (qualitative) দান করেন। তিনি বলেন—"নক্ষত্রগুলি স্থির হইয়া রহিয়াছে; পৃথিবীর আবর্ত্তন-হেতুই তাহাদের উদয়াস্ত হয়।" তাঁহার জন্মের বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ঋক্‌বেদে বলা হইয়াছে, "নিরবলম্ব পৃথিবী মহাশূন্যে অবস্থিত॥" আর্য্যভট্ট গণিতের সাহায্যে ঐ মতবাদ উত্তমরূপে সংশোধিত এবং পরিবর্দ্ধিত করিয়া বিশ্বসমক্ষে ঘোষণা করিলেন—"চলাপৃথ্বী স্থিরা ভাতি।"৪ তিনি প্রচার করেন যে পৃথিবী দিবারাত্র অন্তহীন অনন্তে ঘূর্ণমান। তিনি আরও বলেন, "গোলাকার পৃথিবী মহাশূন্যে ঘুরিতেছে এবং কদম্বপুষ্পের ন্যায় জলজ স্থলজ পদার্থনিচয় পৃথিবীর সহিত সংলগ্ন রহিয়াছে। আর্য্যভট্টের এই সূত্রে আমরা মাধ্যাকর্ষণতত্ত্ব (Gravitation) ও কেন্দ্রানুনিগশক্তির (Centripetal force) পরিচয় পাই। কোপার্ণিকাস (Copernicus) পৃথিবীর গোলাকার সম্বন্ধে পাশ্চাত্য জগতে যে কথা প্রথম বলিয়াছিলেন, উহার বহু শতাব্দী পূর্ব্বে মনীষী আর্য্যভট্ট সে বিষয়ে বহু সমস্যার সমাধান করিয়া জগতে কীর্ত্তিলাভ করিয়াছেন। অবশ্য ইহারও বহুকাল পূর্ব্বে বৈদিকযুগেই এ বিষয় আর্য্যদের জ্ঞাত ছিল।

সুপ্রসিদ্ধ গণিতবিদ্ আর্য্যভট্টের অতুলনীয় প্রতিভাই জগতে বীজগণিত প্রচারের কারণ হয়। তিনি প্রায় সমস্ত প্রাথমিক প্রতিজ্ঞাগুলি রচনা করেন ও সেইরূপ প্রমাণ করেন। এ ছাড়া বহু উচ্চতর কঠিন কঠিন প্রতিজ্ঞা ইত্যাদিরও তিনি সৃজন করেন। Theory of Quadratic Equations তন্মধ্যে অন্যতম। পরবর্ত্তীকালে নিউটন (Sir Isaac Newton) প্রভৃতি গণিতবিদ্ উহার উন্নতি সাধন করেন। খ্রীষ্টিয় ৫ম শতাব্দীতে আর্য্যভট্ট বীজগণিত আবিষ্কার করেন। আরব পণ্ডিত আল-জিবরের নাম (Al Geber) হইতেই বীজগণিত ক্রমে Algebraয় পরিণত হয়। উত্তরকালে আরবগণ ভারতীয়দের নিকট ঐ সমস্ত জ্ঞান বিজ্ঞানলাভ করে এবং পরবর্ত্তীকালে

২ "Bahaluddin ascribes the invention of the numerical figures in the decimal scale to the Indians as the proof commonly given of the Indians being the inventors of these figures is only an extract from the prefaceof Arabic poems, it may be as well to mention that all the Arabic and Persian books of Arithmetic ascribe the invention to the Indians."
pp. 184, Vol. XII, Asiatic Researches.

৩ "The Hindus are distinguishd in Arithmetic by the acknowledged invention of the decimal notation,"
p. 142, Eliphiastones History of India Cowell's Edn.

"The adoption of zero the decimal place-value system of India unbarred the gates of the mind to rapid progress in Arithmetic and Algebra." —Rf in Discovery of India, Jawahar Lal Nehru
History of Hindu Mathematics—B. Dutta & A. N. Singh

৪ "The stars are fixed ; it is the rotation of the earth that causes the daily rising and setting of the stars." —pp 17, Elements of Astronomy—D N M

তাঁহাদের দ্বারাই ভারতীয় গণিত দেশ দেশান্তরে প্রচারিত হয়। সেই হেতু বহু পাশ্চাত্য পণ্ডিত আরবকেই উহাদের স্রষ্টা বলিয়া মনে করেন। কিন্তু বর্ত্তমানে ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে প্রাচীন হিন্দুগণই উহাদের আবিষ্কর্ত্তা; আরববাসীর মধ্যবর্ত্তিতায় এই জ্ঞানসম্ভার পাশ্চাত্য দেশে বিস্তার লাভ করে।৫ হিন্দু বৈজ্ঞানিকেরা পাটীগণিতের ন্যায় বীজগণিত সম্বন্ধীয় নানা মৌলিক গবেষণা করেন। তাঁহাদের ব্যবহৃত অনেক পারিভাষিক শব্দ আধুনিক বীজগণিতেও ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়।

ইউক্লিডের জন্মের বহু বৎসর পূর্ব্বে যে ভারতে জ্যামিতি বিদ্যার চর্চ্চা ছিল, একথা বেদ ও অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থ পাঠে অবগত হওয়া যায়। অধুনা ইহা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত যে, বহু প্রাচীন কাল হইতেই এদেশে জ্যামিতি বিদ্যার চর্চ্চা চলিয়া আসিতেছে।৬ ইহা বৈদিক কল্পসূত্রের অন্তর্গত। ভারতীয় শুল্ব-সূত্রে, নানাবিধ জ্যামিতিক তথ্যের পর্য্যালোচনা দেখিতে পাওয়া যায়। এই শুল্ব কথাটি কোনপ্রকার পরিমাণ বুঝায়, অর্থাৎ ইহা পরিমাণ-বাচক।৭ জ্যামিতি বিদ্যার বহুপ্রসারী আলোচনা ও উহাদের ব্যবহারিক প্রয়োগও ছিল ভারতবর্ষে। যজ্ঞের নিমিত্ত বেদী ইত্যাদি নির্ম্মাণ করিতে নানাপ্রকার জ্যামিতিক চিত্রের প্রয়োজন হইত। রমেশচন্দ্র দত্ত তাঁহার Civilisation in Ancient India (Vol I, p 270) গ্রন্থে Journal of the Asiatic Society of Bengal (1875, p227) এ Thibant লিখিত বিবরণ হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন, "Squares had to be found which would be equal to the difference of two given squares ; oblongs had to be turned into squares and squares into oblongs ; and so on. The lost task, and not the least, was that of finding a circle, the area of which might equal as closele as possible that of a given square." প্রাচ্যবিদ্যায় সুপণ্ডিত Colebrooke এই মতই পোষণ করিতেন। বরাহমিহির, ব্রহ্মগুপ্ত, ভাস্করাচার্য্য প্রভৃতি এই বিজ্ঞানের চর্চ্চা করিয়া গিয়াছেন। তৎকালীন ভারতে স্বীয় মত প্রকাশের স্বাধীনতা এবং স্বাধীন চিন্তা বা ঘোষণার পথে কোন বাধা ছিল না। সত্য তখন সর্ব্বোচ্চ—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, পবিত্রতম অর্চ্চনার বস্তু ছিল। সত্যকে দেবতার মত পূজা করা হইত।

ভারতে ত্রিকোণমিতিরও বিশেষ চর্চ্চা ছিল। বস্তুতঃ ত্রিকোণমিতি (Trigonometry) গণিতের এই বিভাগটি আবিষ্কার এবং অধ্যয়ন উভয়ই সর্ব্বপ্রথম আমাদের দেশেই ঘটে। পরে অন্যান্য আবিষ্ক্রিয়ার মত ইহাও আরবদেশে প্রসার লাভ করে। এ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল ভারতে। তবে বর্ত্তমান লেখকের পক্ষে উহার বিশদ বিবরণ দেওয়া সম্ভবপর নয়।

মহামণীষী আর্য্যভট্ট এই বিষয়েও সবিশেষ মৌলিকতার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মতে বৃত্তের ব্যাস (Diameter) + পরিধি (Circumference) ; অর্থাৎ ব্যাস : পরিধি =৩·১৪১··· । যে কেহ ইহা হইতেই বুঝিতে পারিবেন যে আর্য্যভট্টের আবিষ্কৃত মানের (value) সহিত বর্ত্তমানের Π এর প্রভেদ কত অল্প।৮ ইহা হইতে স্পষ্ট

৫ In 1579 Bombelli published a treatise on algebra in which he says that he and a lecturer at Rome, whom he names has translated part of Diaphantus adding, "that they had found that in the said work, the Indian authors are often cited, by which they learnt that this science (Algebra-Math) was known among the Indians before the Arabians had it."

—pp161, Vol XII, Asiatic Researches.

৬ In ancient India discussions of the science of Geometry began from the sacrificia altars. Geometry was absolutely essential in those sacrificial rites. The Gemetrical 'sutras' or laws that were introduced in the Vedic period are known as Sulvasutra (শুল্বসূত্র)—Modern Geometry, K.P.Bose

৭ "শুল্বয়তি রেখা পৃথিবীং পরিমাতি স্বজতি বা ইত্যর্থঃ"—দুর্গাদাসকৃত, "ধাতুদীপিকা"

৮ "... ...,' Π is evaluated as 3·1416···" Rf Discovery of India—J.L. Nehru.

—In History of Hindu Mathematics B. Dutta and A.N. Singh (1933)

প্রতীয়মান হয়, প্রাচীন ভারতীয়েরা কতদূর পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন ত্রিকোণমিতিতে। এ ছাড়া ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ত্রিকোণমিতির প্রয়োগেও তাঁহারা যথেষ্ট পারদর্শিতা দেখাইয়াছিলেন। Construction of Sines সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক ভাস্করাচার্য্যের কৃতিত্ব বিশেষ প্রশংসনীয়।

গণিতবিদ্যায় ভারতের মৌলিক-প্রতিভার কথা উল্লেখ করিয়া মনীষী Colebrooke বলিয়াছেন—

"The points in which the Hindu Algebra of Bramha Gupta and Bhascara appear distinguished from the Greek are besides a better and more convenient logarithm,

(1) the management of equations involving more than one quantity which is unknown.

(2) The resolution of the equations of a higher order in which if the Hindus achieved a little they had atleast the merit of the attempt. (3) The general method for the solution of intermediate problems of the first and second degrees, in which they went far beyond Diaphontus and anticipated discoveries of modern algebraists.

(4) The application of Algebra to astronomical and demonstrations in which they also hit upon some matters which have been reinvented in more modern times".*

ভাস্করাচার্য্যকে যথার্থই Differential Calculus— গণিতের এই বিভাগে নিউটনের পূর্ব্বাচার্য্য বলা যাইতে পারে। সত্যই নিউটনের জন্মের অনেককাল পূর্ব্বেই ভাস্করাচার্য্য উহার যথেষ্ট উৎকর্ষ সাধন করেন এবং উহাকে জ্যোতিবিদ্যা প্রভৃতি শাস্ত্রের ব্যবহারে লাগাইতে সক্ষম হন। অধ্যাপক Colebrooke-এর মতে, "There are good grounds for considering Bhascaracharya as the precursor of Newton in the discovery of the principle of differential Calculus as well as in its application to astronomical problems and computation'. গণিতের বিভিন্ন শাখায় ভারতের এই অভূতপূর্ব্ব নৈপুণ্যের কথা শুনিয়া চমৎকৃত হইতে হয়। স্বাধীন হিন্দু ভারতের এই অগ্রগতি বাস্তবিক বিস্ময়ের উদ্রেক করে!

---

* Algebra of Bramha Gupta & Bhascaracharya

H. T. Colebrooke (1817), ppXXVIII-XXIX.

সনেট

কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত

বসে আছি একা একা ; পাগোল দুপুর
মুঠো মুঠো চারিধারে আগুন ছড়ায়
অবসন্ন-চোখে জাগে স্বপনের সুর
গুহা-মন-অন্ধকার সুদূরে মিলায়।
অনিমিখ আঁখি দুটি চেয়ে থাকে দূরে—
আঁকা-বাঁকা রক্তবর্ণ মেঠোপথ বেয়ে
অজন্তার ছন্দে চলে সাঁওতাল মেয়ে,-
আমি তারি গান গাই স্মরণের সুরে।
সবুজ-সাগর থেকে দূরে চলে এসে
বসে আছি পদ্মরাগ-মৃত্তিকার মাঝে।
মনের মাধুরী মোর মাটিতেই মেশে!
স্মরণের বেণু আহা হৃদয়েতে বাজে!
চোখে কেন দুপুরের নামে অবসাদ ?
কাঁপে কেন হৃদয়ের থরোথরো সাধ ?

অপরাধ

বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়

আজো কোনো খোঁজ-খবর নেই তারানাথের। গোটা পনেরো দিন ধরে সারা শহর তোলপাড় ক'রে ফেললে এতোগুলো লোক, কিন্তু এতোটুকু হদিস কেউ তার পেলে না। আশ্চর্য্য! লোকটা যেন কর্পূরের মতো উবে গেল। শুধু উবে গেল না—পার্ব্বতীবাবুকেও বেশ খানিকটা শিক্ষা দিয়ে গেল। এতো দিনের পরিচয়, এতো দিনের বিশ্বাস এক মুহূর্ত্তেই লোকটা যেন পা দিয়ে দলে পিষে বেরিয়ে গেল। জীবনে ঠিক এই ধরণের প্রতারণার অভিজ্ঞতা ছিল না পার্ব্বতীবাবুর। এর পর তো আর কাউকেই বিশ্বাস করা চলে না। তিরিশ বছরের পুরোনো কর্ম্মচারী তারানাথই যখন বিশ্বাসের কোনো মর্য্যাদা রাখলে না, তখন দুনিয়ায় আর কাকে বিশ্বাস করবেন পার্ব্বতীবাবু? নাঃ, মানুষ চেনার ব্যাপারে আজো নাবালোক তিনি। মনে মনে একটা রীতিমত অহংকার ছিল তাঁর, ভাবতেন—সুদীর্ঘ পঞ্চান্ন বছর ধরে অগণিত মানুষের সঙ্গে মেলামেশা ক'রে মনুষ্যচরিত্র পাঠে বুঝি দক্ষ হ'য়ে গেছেন তিনি। কিন্তু এখন দেখছেন, নাঃ, সে বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ তিনি! মানুষের চরিত্র বড়ই জটিল। তারানাথ তাঁর ধারণার গতি বদলে দিয়ে গেছে।

বড়বাজারের খেংরাপটির বিখ্যাত মশলা ব্যবসায়ী পার্ব্বতীচরণ বক্সী তাঁর গদীতে বসে গড়গড়া টান্‌তে টান্‌তে ভাবছিলেন। ভাবছিলেন তাঁর তিরিশ বছরের পুরোনো কর্ম্মচারী তারানাথের বিশ্বাসঘাতকতার কথা। সেই তারানাথ, যাকে দীর্ঘ তিরিশ বছর ধরে প্রত্যহ দেখে এসেছেন তিনি! সেই আনম্র বিনীতস্বভাব তারানাথ শেষে কিনা এতোবড় বিশ্বাসহন্তার কাজ করলে!

বাস্তবিকই ঘটনাটি যেমন অপ্রত্যাশিত তেমনি অভাবনীয়। তিরিশ বছরের বিশ্বাসী কর্ম্মচারী তারানাথ যে হঠাৎ এমনটা করবে এ যেন ভাবাই যায় না। অথচ এমন কিছু বেশি টাকা নয়—মাত্র সাড়ে পাঁচ হাজার টাকা! ইতিপূর্ব্বে এর চেয়ে কতো বেশি টাকাই তো সে নিয়ে গেছে, নিয়ে এসেছে! একটি পয়সার তো এদিক ওদিক হয়নি কোনো দিন! আর আজ এই সামান্য ক'হাজার টাকার লোভ সামলাতে পারলে না সে!

পার্ব্বতীবাবুর ছোট ভাই উমাপ্রসন্নবাবু নাকি গোড়া থেকেই লোকটাকে সন্দেহ করতেন, শুধু দাদার জন্যে কিছু বলতে সাহস করতেন না। দাদা একেবারে তারানাথ বলতে অজ্ঞান। এখন বুঝুন কেমন লোক তাঁর ওই মিটমিটে শয়তান তারানাথ!

ক্যাশিয়ার কৃষ্ণধন কয়ালের দিকে তাকিয়ে উমাপ্রসন্ন বলেন: দেখলে তো কেষ্ট, কাণ্ডটা একবার দেখলে তো? কমসে কম হাজার বার আমি দাদাকে সাবধান করে দিয়েছি—কতোবার বলেছি, দাদা অতোটা বিশ্বাস করা ভালো নয় লোককে। তারানাথ গরীব লোক, অভাবী লোক—টাকার লোভ সামলানো সব সময়ে তার পক্ষে সম্ভব নাও হ'তে পারে! কিন্তু দাদা আমার একেবারে নির্বিকার। তারানাথ না হলে তাঁর কাজই চলবে না। হাজার হাজার টাকার মাল কিনতে যাবে তারানাথ - মহাজনের পাওনা মেটাতে যাবে তারানাথ—পাওনা আদায় করতে যাবে তারানাথ। এখন হ'ল তো? ফললো তো আমার কথা?-বিজ্ঞের মতো একটু হাসেন উমাপ্রসন্ন, তারপর বলেন: ব্যবসা-বুদ্ধি দাদার মতো নেই অবিশ্যি আমার, কিন্তু মানুষ চিনতে পারি। শাইকলজীর সম্বন্ধে কিছুটা জ্ঞান আছে—বিষয়টা ভালো করেই পড়েছি।

কৃষ্ণধন কয়াল আড় চোখে একবার দেখে নেন অনতিদূরে উপবিষ্ট পার্ব্বতীবাবুর চিন্তাক্লিষ্ট গম্ভীর মুখের

দিকে। তারপর আস্তে আস্তে বলেন: কিন্তু এতোকাল তো অবিশ্বাসের কোনো কাজ করেনি তারানাথ। কাজেই, কি ক'রে আর—

—বুঝবো যে সে এমন বেইমানি করবে? কেমন এই তো বলবে?—উমাপ্রসন্ন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিটা একবার দাদার মুখে বুলিয়ে নিয়ে একটু মুরুব্বির হাসি হেসে বলেন: তাখ কেষ্ট, কোনো জিনিসটা তলিয়ে ভাববার চেষ্টা করো না, এই তোমাদের বড় দোষ। আরে এতোকাল তার টিকি যে বাঁধা ছিল আমাদের এখানে? টাকা মেরে পালাবার কি যো ছিল! তার দেশের জমি জায়গা ঘর বাড়ি মায় বউএর গায়ের গয়নাগুলো পর্য্যন্ত বাঁধা ছিল এখানে। তা ছাড়া তার বড় শালা চাকরি করতো এখানে- তার কি পালাবার উপায় ছিল কোথাও? শালা মরে গিয়ে এবার তার চুরি করে সরে পড়বার পথ পরিষ্কার হ'য়ে গেছে, আর ওদিকেও সে-বছর মেয়ের বিয়ে উপলক্ষে দাদা তার গয়নাগুলোও ফিরিয়ে দিলেন দেনা মাফ্ করে। আর যায় কোথা—

—কিন্তু তার বিষয় সম্পত্তির দলিল-দস্তাবেজ সবই তো এখনো আমাদের কাছে। তার দামও তো পাঁচ সাত হাজারের কম নয়।—পার্ব্বতীবাবুর মুখের ভাবে কেমন যেন একটু সাহস সঞ্চয় ক'রে ব'লে ওঠেন কৃষ্ণধন।

সঙ্গে সঙ্গে ধমক দিয়ে ওঠেন উমাপ্রসন্ন: থামো—বোকার মতো যা তা বক বক কোরো না।—বিকৃত স্বরে বলেন: বিষয় সম্পত্তি দলিল-দস্তাবেজ! কি দাম আছে তার দলিল-দস্তাবেজের? কতকগুলো বাজে কাগজ বইতো নয়।

—বাজে কাগজ!

এতোক্ষণে পার্ব্বতীবাবু সজাগ হ'য়ে ওঠেন। ভ্রূ-কুঁচকে প্রশ্ন করেন: বাজে কাগজ কি রকম? আমি নিজে দেখে শুনে—

—যখন দেখে শুনে ক'রেছিলেন তখন দাম ছিল অবশ্যই, কিন্তু এখন বাজে কাগজ ছাড়া আর কিছু নয়।

—তার মানে?

—মানে?—অদ্ভুত একটা হাসি মুখে ফুটিয়ে উমাপ্রসন্ন বলেন: মানে হ'চ্ছে পাকিস্তান। পাকিস্তানের সম্পত্তি আপনার কি কাজে লাগবে? না পারবেন বেচতে, না পারবেন দু' পয়সা খাজনা আদায় করতে। কাজেই ওগুলো বাজে কাগজ ছাড়া কি বলবো।

চমকে উঠেছিলেন পার্ব্বতীবাবু: ঠিকই তো—ঠিকই তো! এ কথাটা তো মাথায় আসে নি। —হঠাৎ যেন তারানাথের অভাবিত আচরণের একটা হেতু আবিষ্কৃত হ'য়ে গিয়েছিল পার্ব্বতীচরণের কাছে। চোখ দুটো অস্বাভাবিক রকম রাঙা হ'য়ে উঠেছিল রাগে। উত্তেজনায় সমস্ত শরীর বার বার কেঁপে উঠেছিল। দাঁতে দাঁতে ঘর্ষণ করতে করতে তিনি গর্জ্জন ক'রে উঠেছিলেন। কিন্তু এর প্রতিশোধ আমি নেবোই। আমি দেখিয়ে দেবো তারানাথকে যে আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করার ফল কী! পার্ব্বতী বক্সীর টাকা হজম করা অতো সোজা নয়। পাঁচ হাজারের জন্যে পনেরো হাজার খরচ করতে হয় তাও স্বীকার। আমি তারানাথকে একবার দেখবো। —এই কে আছিস—আমার গাড়ী বার করতে বল, থানায় যাবো।

অকস্মাৎ এতোটা উত্তেজিত হয়ে পড়বেন পার্ব্বতী বাবু, কেউই ভাবতে পারে নি—উমাপ্রসন্নও নয়। তাঁর সেই অস্বাভাবিক রাগ দেখে তটস্থ হ'য়ে পড়েছিল বক্সী কোম্পানীর প্রত্যেকটি লোক। এমন ভাবে সহসা তিনি যে রেগে উঠতে পারেন—এ না দেখলে কেউ কল্পনাই করতে পারতো না। চিরদিন সবাই তাঁকে দেখে এসেছে শান্ত নিরীহ ভালোমানুষ—রাগতে তাঁকে কেউ কোনোদিন দেখেনি। সকলেই এতোদিন বলতো পার্ব্বতীবাবু স্বভাব-বৈষ্ণব মানুষ! রাগ ওঁর শরীরে নেই।—কিন্তু সেই স্বভাব-বৈষ্ণব মানুষ যে এমন ভয়ংকর রেগে যেতে পারেন এ কারো ধারণাই ছিল না। মনে হয় সেই সময় তারানাথ কাছে এসে পড়লে তিনি তাকে গুলী ক'রে মেরে ফেলতেন।

তারপর পনরো দিন কেটে গেছে। ইতিমধ্যে বাকী কিছু রাখেন নি পার্ব্বতীবাবু। তারানাথকে তার চাই—

যেমন ক'রে হোক। বেশ কিছু খরচাও ক'রে ফেলেছেন তিনি ক'দিনে। পুলিশ লাগিয়ে সারা শহর তোলপাড় ক'রে ফেলেছেন। একটা বডি-ওয়ারেন্টও তারানাথের নামে বের ক'রে দিয়েছেন। কিন্তু তাতেও কোনো ফল পাওয়া যাচ্ছে না। তারানাথের বেলগেছের বাসায় খোঁজ নেওয়া হয়েছে। বাসার লোকেরা জানিয়েছে—তারানাথের কোনো খোঁজ-খবর তারা জানে না এবং তারাও অত্যন্ত ব্যাকুল হ'য়ে আছে তার খবরের জন্যে। এমন কি তারানাথের স্ত্রী নাওয়া-খাওয়া পরিত্যাগ ক'রে ক'দিন খালি কান্নাকাটি ক'রে কাটাচ্ছে। তারানাথের বড় ছেলে বনমালী সম্ভব অসম্ভব নানা জায়গায় বাপের সন্ধান ক'রে ফিরছিল রাতদিন সেই থেকে। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, গত পরশু থেকে সে ছেলেটারও আর কোনো খবর পাওয়া যাচ্ছে না। তারানাথের স্ত্রী তাতেই আরো অস্থির হ'য়ে প'ড়েছে।

বক্সী কোম্পানীর গদীতে নিত্যই তারানাথের বাড়ীর খবরাখবর পৌঁছ্‌ছিল। বনমালীর অন্তর্ধানের খবরও পৌঁছলো। পার্ব্বতীবাবু একটু ভ্রুকুটি করলেন। উমাপ্রসন্ন ঠোঁটের কোণায় একটু বিদ্রূপের হাসি ফুটিয়ে বললেন: এ আমি আগেই জানতুম। এই জন্যেই তখন আমি ব'লে-ছিলুম অতো ক'রে যে, দাদা ছেলেটাকে আটকাও। ছেলেটা সব জানে। শুধু ছেলেটা কেন ওর বাড়ীর সবাই জানে। ব্যাটা কি কম ঘোড়েল নাকি! ভেবেছিল কিছু-দিন গা ঢাকা দিয়ে থেকে আমাদের হালচাল দেখবে। তারপর যা হয় একটা কিছু ব্যবস্থা করে ফেলবে। সাড়ে পাঁচ হাজার তো বড় কম টাকা নয়।

সব শুনেও কোন কথা বলেন না পার্ব্বতী বাবু; নিরুত্তরে গড়গড়া টেনে যেতে লাগলেন।

ব্যাপারটা যা ঘটেছিল গোড়ায়, তা এই: বক্সী কোম্পানীর একটি ছোট শাখা আছে কাশীতে। পার্ব্বতী বাবুর এক আত্মীয় সেই শাখার কাজ চালান। সেখানে হঠাৎ কি একটা জরুরী প্রয়োজনে সাড়ে পাঁচ হাজার টাকা পাঠানোর দরকার হ'য়ে পড়ে। পার্ব্বতী বাবু, তিরিশ বছরের পুরোনো কর্ম্মচারী তারানাথের ওপরই সেই ভার অর্পণ করেন। সে আজ পনেরো বিশদিন আগেকার খবর। তারানাথ সেই যে সাড়ে পাঁচ হাজার কাঁচা টাকা নিয়ে কাশীর উদ্দেশে গদি থেকে বেরিয়ে গেছে, আর কোনো খবর পাওয়া যায়নি তার। কাশীতেও যায়নি সে। কারণ কাশীর গদি থেকে ক'দিন আগেও খবর এসেছে, তারানাথের কোন সন্ধান নেই।

যে জন্যে কাশীর গদীতে টাকার দরকার প'ড়েছিল এবং কলকাতার গদী থেকে তারানাথের মারফৎ টাকা পাঠানো হয়েছিল, সে দরকার মেটেনি। ফলে কারবারের একটা মোটা রকমের ক্ষতি হ'য়ে গেছে। কিন্তু এই বিরাট লোকসানের জন্যে দায়ী কে? তারানাথ।

লোকটা এতোবড় জোচ্চোর! অথচ দীর্ঘ তিরিশ বছর কতো বিশ্বাসের সঙ্গে কাজ ক'রে এসেছে। বক্সী কোম্পানীর মালিক পার্ব্বতীচরণ গদিতে ব'সেছিলেন একটা মোটা বিপুলকায় তাকিয়ায় ঠেশ দিয়ে। বসে বসে অর্দ্ধ-নিমীলিত চক্ষে গড়গড়ায় ধূমপান করছিলেন আর ভাবছিলেন তারানাথের কথা। ভাবছিলেন এই সাড়ে পাঁচ হাজার টাকায় তারানাথের কী উদ্দেশ্য সাধিত হ'তে পারে! লোকটা বাস্তবিকই অদ্ভুত! আচ্ছা গেল কোথায় সে? নিশ্চয় কলকাতাতেই কোথায়ও ঘাপটি মেরে আছে! বোধ হয় গোড়ায় ভাবতেই পারেনি সে তিনি এতোটা কঠিন হয়ে উঠবেন। এখন তার পক্ষে আত্মপ্রকাশ করা আর সহজ নয়। বডি-ওয়ারেণ্ট? ধরা নিশ্চয়ই পড়তে হবে তাকে। কতদিন আর গা ঢাকা দিয়ে থাকা সম্ভব। কিন্তু তার ছেলেটাই বা হঠাৎ গেল কোথায়?—নাঃ, উমাপ্রসন্ন ঠিকই বলেছে—সবাই ওরা জানে ব্যাপারটা—ষড় আছে ওদের। তবে তাঁরও প্রতিজ্ঞা তিনি তারানাথকে ধরবেনই যেমন করে হোক, শাস্তি তিনি দেবেনই তাকে।—কী যেন ভেবে হঠাৎ সোজা হয়ে বসলেন তিনি। ডাক দিলেন গম্ভীর স্বরে—ওখানে কে আছিস? একবার উমাপ্রসন্নকে ডেকে দে তো।

কিছুক্ষণ পরেই উমাপ্রসন্ন এসে তাঁর সামনে দাঁড়ালেন।

—কি হ'ল? কোনো খবর পাওয়া গেল?—পার্ব্বতী বাবু জিজ্ঞাসা করলেন উমাপ্রসন্নর দিকে চেয়ে।

—না। তবে—উমাপ্রসন্ন বললেন: খানিকটা আশা হয়েছে। একজন প্রাইভেট ডিটেকটিভ বলেছেন যে পনেরো দিনের মধ্যে নিশ্চয় সন্ধান করে দেবেন।

—ত্থাখো যদি পারেন।

—কিন্তু—কি একটা বলতে গিয়ে থেমে গেলেন উমাপ্রসন্ন। কেমন যেন সংকোচ হ'ল। পার্ব্বতী বাবু ভুরু কুঁচকোলেন।

—কিন্তু কী?

—না, এমন কিছু না। তিনি—মানে সেই প্রাইভেট ডিটেকটিভ কিছু টাকা চান।

—তাতো চাইবেনই। তাঁদের ওই ব্যবসা তো। কতো টাকা চান?

—এক হাজার।

—দেবো। কিন্তু আগে তারানাথকে ধরে দিতে হবে। তারানাথকে আমার চাই-ই চাই—অকস্মাৎ ভীষণ উত্তেজিত হয়ে উঠলেন আবার পার্ব্বতী বাবু।—আমি একবার সেই নেমখারামটাকে দেখবো, কতো বড় শয়তান সে। এক হাজার কেন, আমি পাঁচ হাজার টাকা দেবো যে সেই রাস্কেলটাকে ধরে দিতে পারবে। তারপর হঠাৎ ঠেলা দরজাটার বাইরে দৃষ্টি পড়ায় সীমাহীন বিস্ময়ে সোজা হয়ে বসলেন তিনি। চীৎকার করে উঠলেন: কে—কে—ওখানে কে? উমাপ্রসন্ন ত্থাখো তো কে দাঁড়িয়ে ওখানে? তারানাথের ছেলে নয়!

—আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি বনমালী।—ঠেলা দরজাটা ঈষৎ ফাঁক করে সসংকোচে মুখ বাড়ালে বনমালী। চোখে তার অশ্রুর দাগ লেগে রয়েছে, মুখখানা বিবর্ণ। সারা দেহে একটা সত্ত শোকের ছায়া। গলায় উত্তরীয়, পরিধানে অশৌচ-বাস।

—একি? কী হয়েছে? কে মারা গেল তোমার? —পার্ব্বতীবাবু চমকে উঠলেন: ভেতরে এসো—ভেতরে এসো।

উমাপ্রসন্ন ভ্রুকুটি করলেন। কঠিন স্বরে বললেন: ঘোড়ার ডিম হ'য়েছে—সব শয়তানি। ধরা পরবার ভয়ে কী একটা মৎলব খাটিয়ে ছোঁড়াটাকে সাজিয়ে গুছিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছে আর কি!

বনমালী করুণ চোখে একবার তাঁর দিকে তাকালে। তারপর আস্তে আস্তে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করেই ভ্যাক্ করে কেঁদে ফেললে।

—বড়বাবু, আমার বাবা নেই।

—নেই! কোথা গেল?—পার্ব্বতীবাবু চক্ষু বিস্ফারিত ক'রে তার দিকে তাকালেন।

—মারা গেছেন।

—মারা গেছে? কবে? কোথায়?

—পরশু রাত্তিরে, কাশীর হাসপাতালে।

একটা বজ্রাঘাত হ'ল যেন ঘরের মাঝখানে। কিছুক্ষণ কারো মুখে কোনো কথা নেই। কেবল বনমালীর বুক-চাপা কান্নার ফোঁস ফোঁসানি ছাড়া কিছুক্ষণ কিছুই শোনা গেল না। তারপর পার্ব্বতীবাবু সনিশ্বাসে বললেন: হুঁ। কি হয়েছিল তার? তুমি খবর পেলে কবে?

—পরশুদিন বিকালে আমি বাড়ির রাস্তাটার মোড়ে দাঁড়িয়েছিলুম, পিয়ন টেলিগ্রামটা দিয়ে গেল। আমি তখুনি—

বাধা দিলেন উমাপ্রসন্ন।

—তোর মাকে কিছু বলে যাসনি?

—না। মা তখন বাড়ি ছিল না—কাদের বাড়ি যেন গিছল। আমার অপেক্ষা করারও সময় ছিল না। পাশের বাড়ির ছেলেটাকে ব'লে গিছলুম: আমি এক ঠাঁই যাচ্ছি—ফিরতে দু'চার দিন দেরি হবে—মাকে বলিস।

—হুঁ। তারপর?

—তারপর আমি পরশু কাশীতে পৌঁছলুম সকালে আর রাত্রে বাবা মারা গেলেন।

—কি হয়েছিল?

—ঠিক জানি না। শুনলুম মোটরের ধাক্কা লেগে বুকের হাড় ভেঙে গেছলো—মাথাও ফেটে গেছল। ইষ্টিশান থেকে দশাশ্বমেধ যাবার পথেই নাকি অ্যাক্সিডেন্টটা হয়। রাস্তার ওপরই বাবা মড়ার মতো পড়েছিলেন, একটা পুলিশ দেখতে পেয়ে হাসপাতালে দিয়ে আসে। বারো দিন কোনো জ্ঞানই ছিল না। মারা যাবার

আগের দিন মিনিট কয়েকের জন্যে জ্ঞান একটু হয়েছিল। সেই সময়েই আমায় তার করতে বলেন।

আবার কিছুক্ষণ সকলেই নীরব। কিছুক্ষণ পরে উমাপ্রসন্ন বললেন: ব্যাপারটা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। কেমন যেন সন্দেহ হচ্ছে।

হঠাৎ যেন সচেতন হ'য়ে উঠলো বনমালী। কী যেন একটা মনে পড়ে গেল। তাড়াতাড়ি গায়ে জড়ানো ওড়নার ভেতর থেকে একটা পুঁটলি বার করলে, আর একটা ছোট্ট চামড়ার ব্যাগ। বললে: সেই জ্ঞান হবার সময় বাবা হাসপাতালের লোকেদের আমায় তার করতে বলেছিলেন আর বলেছিলেন এই ব্যাগটা আপনার কাছে পৌছে দিতে। আমি তাই ট্রেন থেকে নেমেই এখানে আসছি।

—কি আছে এতে?—হাত বাড়িয়ে ব্যাগটা নিয়ে প্রশ্ন করলেন পার্ব্বতীবাবু। কিন্তু ব্যাগটা হাতে পড়তেই নিজের প্রশ্নের জবাব পেলেন তিনি। এই ব্যাগেতে করেই তারানাথ সেই সাড়ে পাঁচ হাজার টাকা নিয়ে কাশী রওনা হয়েছিল। ব্যাগটা তুব্‌ড়ে তাব্‌ড়ে গেছে—কাদা আর রক্তের দাগ স্থানে স্থানে লেগে আছে।

উমাপ্রসন্ন সেইদিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলে: কি আছে ওটাতে?

—এটাতে?—পার্ব্বতীবাবুর কাছে ডুপ লিকেট একটা চাবি ছিল ব্যাগটার। তাড়াতাড়ি সেটা খুলে ফেললেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হ'য়ে গেলেন—সমস্ত টাকাই তার মধ্যে বর্ত্তমান।

—কিসের টাকা ও?—উমাপ্রসন্ন জিজ্ঞাসা করলেন।

পার্ব্বতীচরণ আস্তে আস্তে চোখ তুলে তাকালেন তাঁর দিকে। চোখ দুটো সহসা জ্বালা ক'রে উঠলো তাঁর। চোখের কোণে টল টল করে উঠলো জমে ওঠা দু' কোঁটা অশ্রু। একটা অতি ম্লান হাসি মুখে ফুটিয়ে তিনি বললেন: তিরিশ বছর এক সঙ্গে কাজ ক'রেও লোকটাকে চিনতে পারবো না—এও কি কখনো হয় উমাপ্রসন্ন! হঠাৎ তোমাদের কথায় ভুল বুঝেছিলাম তাকে। সে গরীব, সে অভাগা, কিন্তু সে জোচ্চোর ছিল না—বিশ্বাসঘাতকতা করেনি। এই নাও তোমাদের কোম্পানীর টাকা।

বিস্ফারিত চক্ষে তাঁর পানে চেয়ে রইলেন উমাপ্রসন্ন। সমস্ত ঘরটার মধ্যে একটা প্রগাঢ় স্তব্ধতা নেমে এলো যেন। যেন একটা গুরু অপরাধের ভারে থমথম করতে লাগলো ঘরের আবহাওয়া।

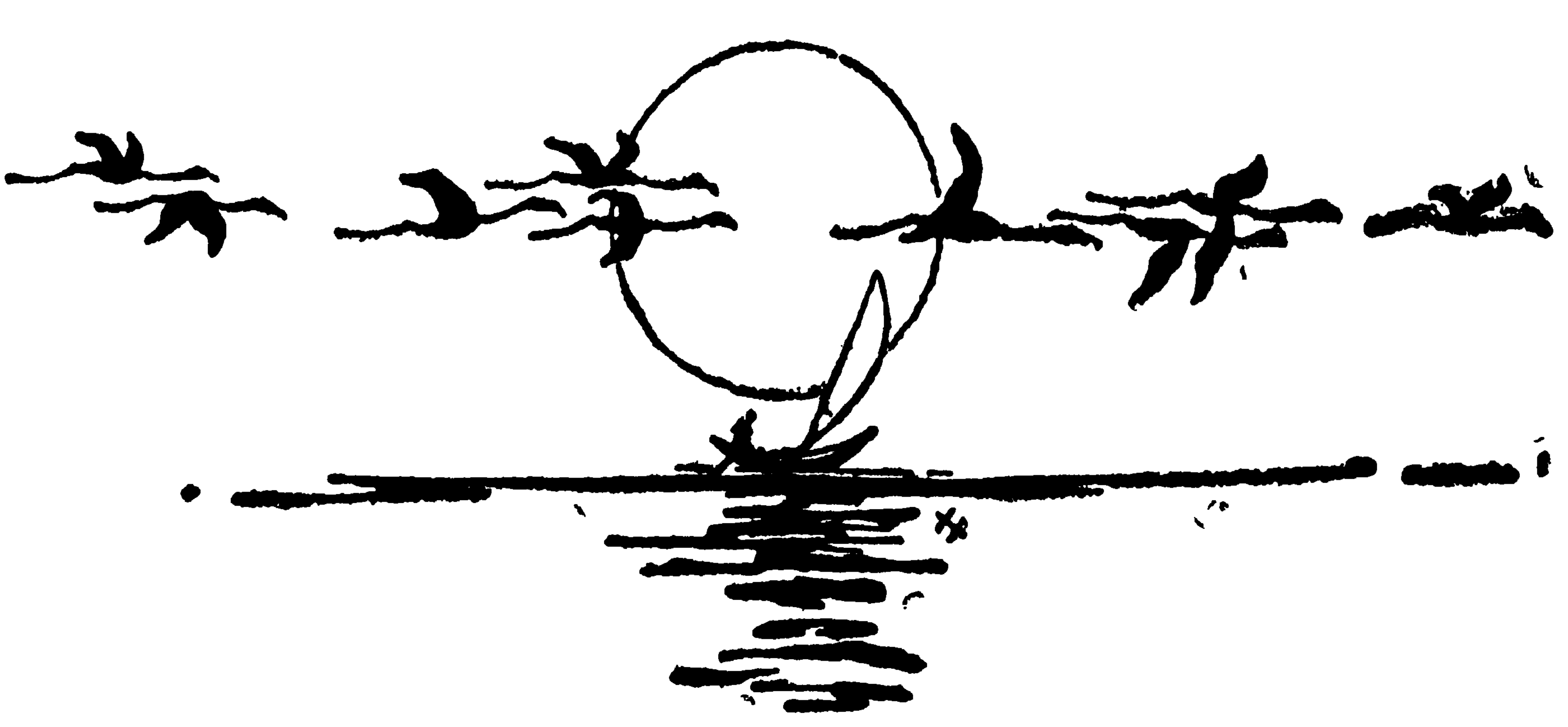

কুটির শিল্প ও বাংলার নারীসমাজ

শ্রীঊষা বিশ্বাস

আজ এই যান্ত্রিক সভ্যতার যুগে যন্ত্রশিল্পের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় এবং কতকটা বিদেশী বণিক সম্প্রদায়ের চক্রান্তে আমাদের দেশের অনেকগুলি কুটির শিল্পই ক্রমশঃ চর্চ্চার অভাবে লোপ পেতে ব'সেছে। তা'তে ক'রে আর্ট বা শিল্পকলার দিক থেকেও দেশের যে অপূরণীয় ক্ষতি হ'চ্ছে, সেবিষয়ে সন্দেহ নেই। তা ছাড়া দেশের এই নিদারুণ অর্থ-সংকটের দিনে অর্থ-নৈতিক দিক থেকেও সেগুলির পুনরুদ্ধার ও পুনঃ প্রচলনের একান্ত প্রয়োজন হ'য়ে প'ড়েছে। দেশের উৎপাদনশক্তি না বাড়ালে তার অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান যে কোনও ক্রমেই সম্ভবপর নয়, সেকথা ভারতের নেতৃস্থানীয়েরা সকলেই উপলব্ধি ক'রছেন। ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ—কৃষিই এ দেশের প্রায় শতকরা আশীজন লোকের উপজীবিকার প্রধান উপায় এবং অবলম্বন। কিন্তু চাষীদের সাধারণতঃ বৎসরে ৪ মাস ক্ষেতে কাজ করতে হয়। বৎসরের বাকী মাস কয়টি তারা মাটির কাজ, বেতের কাজ,, কাঠের কাজ ইত্যাদি কুটির শিল্পকে অনায়াসেই দ্বিতীয় বৃত্তি বা পেশা রূপে অবলম্বন ক'রে কিছু কিছু অর্থ উপার্জ্জন করতে পারে। তাহলে তাদের অর্থসংস্থানের কিছু উপায় হয় এবং আয়ও বাড়ে। সম্প্রতি ভারতের কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট দেশের কুটির শিল্পগুলিকে একটি বিশিষ্ট স্থান দিতে চেষ্টা করছেন। এ অত্যন্ত সুখের বিষয়। এমন একদিন ছিল যেদিন ভারতের কয়েকটি কুটিরশিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদা ও সমাদর ইউরোপের সুসভ্য দেশগুলিতেও ছিল। বাংলার মসলিন বস্ত্র ও কাশ্মীরের শাল একদিন জগদ্বিখ্যাত ছিল। এককালে ভারতবর্ষ তার কুটিরশিল্পগুলির জন্যেই ভোগ্য পণ্য ও বিলাসদ্রব্যাদির দিক থেকে স্বয়ং সম্পূর্ণ এবং আত্মনির্ভরশীল ছিল। যখন এদেশে যন্ত্রশিল্পের বিশেষ প্রসার হয়নি তখন তার কুটিরশিল্পগুলিই তার যাবতীয় প্রয়োজন মিটিয়েছে। প্রায় দু' শ' বছরের পরাধীনতার পরে ভারত আজ স্বাধীন হ'য়েছে। কিন্তু এখনও সে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা লাভে সক্ষম হয়নি। দেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতার সঙ্গে তার অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত, একথা সবাই জানেন। আজ সময় এসেছে দেশকে নতুন করে সুন্দর করে গড়ে তুলবার। তাই দেশের শ্রী ও সম্পদ বৃদ্ধির দিকে আমাদের সকলেরই তীক্ষ্ণ সজাগ দৃষ্টি থাকা দরকার। আজকের দিনে আমাদের দেশের কৃষি ও শিল্পকে উন্নত করতে চেষ্টা করতে হবে। আজ আমাদের যতদূর সম্ভব সর্ব্ববিষয়ে স্বাবলম্বী হ'তে শিখতে হবে। এখন আর আমাদের অন্নবস্ত্রের জন্য পরমুখাপেক্ষা হ'য়ে থাকলে চলবে না। এই জন্যেই মহাত্মা গান্ধী তাঁর দেশবাসীদের গ্রামে ফিরে যেতে ব'লেছিলেন—ব'লেছিলেন চরকাই দেশের স্বরাজ আনবে। তাঁর স্বরাজের আদর্শ ছিল—ভারত সর্ব্ববিষয়ে স্বাবলম্বী ও স্বয়ংসম্পূর্ণ হবে। আজ আমরা স্বাধীন দেশের নাগরিক। স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসাবে আমাদের সুগভীর দায়িত্ব ভুললে চলবে না। প্রত্যেক নরনারীর উপর দেশের দাবী আছে। এতদিন পর্য্যন্ত আমাদের সব কিছু দারিদ্র্য, অভাব, অশিক্ষা ও অবিচারের জন্যে আমরা আমাদের দেশের বিদেশী শাসকদেরই দায়ী করে এসেছি। আজ আর তা' করলে চলবে না।

আজ দেশের এই ঘোর অর্থসংকটের দিনে বাঙালী মধ্যবিত্ত পরিবারগুলির অবস্থাই সবচেয়ে শোচনীয় হ'য়েছে। তাদের জীবিকাসমস্যা ক্রমশঃই কঠিন থেকে কঠিনতর হ'চ্ছে। আজ মধ্যবিত্ত পরিবারে শুধু পুরুষদের আয়ে সংসার চালানো অত্যন্ত দুরূহ হ'য়ে পড়ছে। জীবন-যাত্রার মানও নানাকারণে ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে। সংসারের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের দামও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাতে ক'রে বাঙালী মধ্যবিত্ত পরিবারগুলির পক্ষে আয় ব্যয়ের সমতা রক্ষা অত্যন্ত

কঠিন হ'য়ে উঠছে। তাই আজকাল মধ্যবিত্ত পরিবারের অনেক বাঙালী মেয়েকেই সংসার পরিচালনার আংশিক বা সম্পূর্ণ দায়িত্ব বহন করতে হচ্ছে। অনেক মেয়েই আজ চাকুরী ক'রে স্বাবলম্বী হ'তে চেষ্টা করছে। বাপ-মায়েদেরও কতকটা বাধ্য হ'য়েই তা'তে সম্মতি দিতে হচ্ছে। সমাজে বরপণ প্রথা এখনও কার্য্যতঃ রহিত করা সম্ভবপর হয় নি। মধ্যবিত্ত পরিবারের কন্যার বিবাহের ব্যয়ভার নির্ব্বাহ করা অনেক পিতামাতার পক্ষেই দুঃসাধ্য হ'য়ে পড়ে। সেজন্যে অনেক বাপমাই চান মেয়েদের বিবাহ না হ'লে তা'রা লেখাপড়া শিখে স্বাবলম্বী হবে। আজকের দিনে অনেক বিবাহিতা পতি-পুত্রবতী শিক্ষিতা মেয়েও চাকুরী ক'রে সংসারের আয় বাড়াবার চেষ্টা করছেন। এখন আর শিক্ষিত সমাজে বিবাহিতা মেয়েদের কাজ করা দোষনীয় বা নিন্দনীয় ব'লে বিবেচিত হয় না। মধ্যবিত্ত সংসারে আজ আর পরনির্ভরশীলা, অবলা নারীর স্থান নেই—মেয়েদের আজ আর ব্রীড়াবনতা, লজ্জাশীলা, অবগুণ্ঠনবতী, অন্তঃপুরিকা হ'য়ে থাকলেই চলবে না। আজ এই দুর্দ্দিনে তাদের জীবনসংগ্রামে পুরুষদের পাশে এসে দাঁড়াতে হবে। আজকাল স্থল-বিশেষে কর্ম্মক্ষেত্রে মেয়েদের পুরুষদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা ও সহযোগিতাও করতে হ'চ্ছে। দেশের অর্থনৈতিক দিক থেকেও হিটলারের—"Back to the kitchen" নীতিকে আমাদের দেশের মেয়েদের সর্ব্বতোভাবে মেনে নেওয়া আজ হয়তো সম্ভব নয়। আজকের দিনে আমাদের রাষ্ট্রও নারীর সহজ মনুষ্যত্বকে মেনে নিয়েছেন, যা'তে ক'রে দেশের নতুন শাসনতন্ত্রে নর ও নারীর সমান অধিকার ঘোষিত হ'য়েছে। যে সব কাজ এতদিন কেবল পুরুষদেরই একচেটিয়া ব'লে বিবেচিত হ'তো, আজ সমানযোগ্যতাসম্পন্না মেয়েরাও সেইসব কাজ করবার অধিকারিণী হ'য়েছেন। আজকের দিনে জগতের সমস্ত সভ্যদেশগুলিতে নারী শুধু পুরুষদের নর্ম্মসহচরীই নয়। সে তাদের কর্ম্ম-সহচরী হবারও অধিকার অর্জ্জন ক'রেছে। তাই আজকাল অনেকে শংকিত হ'চ্ছেন কর্ম্ম-ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের প্রতিযোগিতার ফলে পুরুষদের বেকার সমস্যা আরও কঠিন হ'য়ে উঠবে। অথচ দেশের অর্থনৈতিক দিক থেকেও মেয়েদের কাজ করা আজ নিতান্ত দরকার হ'য়ে প'ড়েছে। শুধু পাশ্চাত্য দেশ-গুলিতেই নয়, প্রাচ্যের অনেক দেশেও মেয়েদের পুরুষদের মতোই বাইরে কাজ করবার প্রথা প্রচলিত আছে। তবে বাংলাদেশের মেয়েরাই বা কেন নিতান্ত দুরবস্থায় না প'ড়লে অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা করবে না? বিহারী, নেপালী, ভুটানী, খাসিয়া, বর্ম্মী, জাপানী প্রভৃতি প্রাচ্যদেশীয়া মেয়েরাও পুরুষদের মতোই বাইরে যথেষ্ট শ্রমসাধ্য কাজ ক'রে থাকে। পার্ব্বত্য জাতীয়দের মধ্যে পুরুষদেরই বেশী শ্রমবিমুখ ও অলস হ'তে দেখা যায়।

এখন প্রশ্ন হ'চ্ছে মেয়েরাও যদি পুরুষদের মতো বাইরে কাজ করতে বেরিয়ে যায়, তবে সন্তান পালন ও ঘর-গৃহস্থালীর কাজ কে করবে? দরিদ্র সংসারে এ-সব কাজ করবার জন্যে দাসদাসী রাখাও সম্ভব নয়। সেই জন্যেই অনেক সময়ে অনেক মেয়ের পক্ষেই বাইরে কাজ করতে যাওয়া সম্ভবপর নয়। বেশী শ্রমসাধ্য কাজ করা মেয়েদের দৈহিক স্বাস্থ্যের দিক থেকেও সমীচীন নয়। আবার অফিসে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রভৃতিতে কাজ করবার যোগ্যতাও আমাদের দেশের খুব অল্পসংখ্যক মেয়েরই আছে। উচ্চশিক্ষিতা অথবা মধ্যশিক্ষিতা মেয়ের সংখ্যা বাংলাদেশে এখন পর্য্যন্ত খুব বেশী নয়। তা'ছাড়া বাস্তবিকই যদি সব মেয়েদের পুরুষদের মতো বাইরে কাজ করতে যেতে হয়, তাহলে হয়তো তারা মাতা ও গৃহিণীর কর্ত্তব্যে অবহেলা করতে অনেক সময়েই বাধ্য হবে। এক্ষেত্রে মেয়েদের অর্থ উপার্জ্জনের পথ কি একেবারেই বন্ধ হয়ে যাবে? সংসারের কাজ ক'রেও মেয়েদের দ্বিপ্রহরে কিছু অবসর থাকে—যে সময়টার সদ্ব্যবহার সব সময়ে তারা করে না। এই সময়টা তারা অনেকেই দিবা নিদ্রায় কিংবা মুখরোচক পরনিন্দা পরচর্চ্চায় অতিবাহিত করে। যাঁরা হয়তো একটু আধটু লেখাপড়া জানেন তাঁরা অবসর বিনোদনের জন্যে কখনও কখনও কুপাঠ্য নাটক নভেল প'ড়েও সময় কাটান। অনেকের মতে বই পড়া নাকি নিদ্রাকর্ষণের একটি সহজ উপায়। দেশের অনেকগুলি কুটির শিল্প আছে যেগুলিতে মেয়েদের সহজেই নিয়োযিত করা যায়। তাতে ক'রে

এই দুর্দ্দিনে তাদের অর্থাগমের পথও সুগম হয় এবং অবসর সময়েরও সদ্ব্যবহার হয়। কুটিরশিল্পের জন্যে বেশী কারিগর, যন্ত্রপাতি বা মূলধনের প্রয়োজন হয় না। কাজেই উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা হ'লে মেয়েরা ঘরে ব'সে সহজেই একাজ করতে পারে। সেদিন পর্য্যন্ত পূর্ব্ববঙ্গে ঢাকাই শাড়ীর উপর বুটি তোলা ও কুসীদার কাজ (একরকম সূচী শিল্প) বাঁশ ও বেতের কাজ ইত্যাদি কতকটা মেয়েদেরই একচেটিয়া ছিল। আসামীয়া মেয়েরা সকলেই প্রায় তাঁতশিল্পে সুনিপুণা। চীনা রমণীরা অনেকেই সূচীকর্ম্মে পটু এবং অবসর সময়ে তাঁরা যথেষ্ট সূচীকর্ম্ম করে থাকেন। আগে আমাদের বাংলা দেশে অনেক প্রাচীনারা অবসরকালে তকলীতে সুতো কাটতেন, পৈতের সুতো তুলতেন। এই সব কাজ করে তাঁরা কিছু কিছু অর্থ উপার্জ্জনও করতেন। অবসর সময়ে অনেকেই কাঁথা সেলাই, ভাঙা পাথরের উপর খোদাই করে সন্দেশের ছাঁচ ইত্যাদি তৈরী করতেন। প্রাচীনাদের মধ্যে বিশেষ ক'রে কাঁথা সেলাইএর খুবই প্রচলন ছিল। কিন্তু আজকাল আমাদের দেশের মেয়েরা এই সব শিল্প প্রায় ভুলতে বসেছেন। শিল্পকলার দিক থেকেও এগুলির পুনঃ প্রচলন দরকার।

দেশের কুটিরশিল্পগুলির উপযুক্ত সম্প্রসারণ করতে হ'লে মেয়েদেরও এই কাজে নিযুক্ত করা আবশ্যক। তা না হ'লে ব্যাপকভাবে এই শিল্পগুলির চর্চ্চা হওয়া সম্ভব নয়। অনেকগুলি কুটিরশিল্পই মেয়েদের পক্ষে বেশ উপযোগী—যেমন তাঁতশিল্প, (নানাবিধ বস্ত্রবয়ন, গালিচা আসন ইত্যাদি বয়ন), চরকা ও তকলীতে সুতো কাটা, নানারকম খেলনা প্রস্তুত করণ, মৃৎশিল্প এবং মাটির জিনিষের উপর রঙ দিয়ে নানাপ্রকার নক্সা অঙ্কন, হস্ত নির্ম্মিত কাগজ, নারিকেলের ছোবড়া দিয়ে দড়ি, পাপোষ ইত্যাদি তৈরী করা, বাস্কেট বোনা এবং বেত, বাঁশ ও কাঠের কাজ, চামড়ার কাজ, বোতাম তৈরী. সাবান প্রস্তুত করণ, বই বাঁধাই, কলে মোজা গেঞ্জি বোনা, পিতলের উপর খোদাই করা, রঞ্জনশিল্প (dyeing), ছাপা (printing), জামার কাটছাট, সূচীকর্ম্ম, লেশ ও পশম বুনন, জ্যাম, জেলি, মোরব্বা, আচার, পাঁপর, বড়ি ইত্যাদি তৈরী করণ, পশু ও হাঁস মুরগী পালন, দুগ্ধ বা দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি উৎপাদন ইত্যাদি কাজ। এইসব শিল্পের জন্য যন্ত্রপাতি, কারিগর এবং মূলধনও খুব কম লাগে। আজ-কাল বিদেশী পণ্যদ্রব্যের আমদানী কমে যাওয়াতে কতকগুলি কুটিরশিল্পের প্রতি বেশী মনোযোগ দেওয়া বিশেষ দরকার হয়ে পড়েছে।

এই সব কুটির শিল্প শিক্ষা দেবার জন্যে উপযুক্ত সংখ্যক শিক্ষা কেন্দ্রও খোলা আবশ্যক। সুখের বিষয়, কলিকাতায় অনেকগুলি নারী কল্যাণ প্রতিষ্ঠান এইরকম কেন্দ্র খুলেছেন। তা'তে ভদ্রঘরের অনেক দুঃস্থা এবং নিঃসম্বলা মেয়ে শিল্প শিক্ষা করবার সুযোগ ও সুবিধা পাচ্ছেন। কিন্তু এখনও বাংলার মফঃস্বল শহরগুলিতে এবং গ্রামাঞ্চলে এই শিল্প শিক্ষাকেন্দ্রগুলির খুবই অভাব। অবিলম্বে ব্যাপক-ভাবে পশ্চিম বঙ্গের গ্রামে গ্রামে এই রকম শিল্প-শিক্ষাকেন্দ্র খোলা দরকার। কতকগুলি কুটির-শিল্প গ্রামবাসীদের পক্ষে বিশেষ উপযোগী, যথা—পশু ও হাঁস. মুরগী পালন, দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি উৎপাদন. বাঁশ ও বেতের কাজ, মৃৎশিল্প, তাঁতশিল্প ও সুতো কাটা, জ্যাম জেলি আচার বড়ি ইত্যাদি তৈরী করা, দড়ি পাপোষ ইত্যাদি তৈরী করা। বর্ত্তমানে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অনুযায়ী অনেকগুলি জনশিক্ষা কেন্দ্র খুলবার কথা আছে। বাংলাদেশের বয়স্কা মেয়েদের এই কেন্দ্র-গুলিতে শিক্ষালাভের জন্যে আকৃষ্ট করতে হ'লে সর্ব্ব-প্রথমে শিল্প শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করতে হবে। শিল্প-শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে যদি লিখন পঠন ও অন্যান্য বিষয়ও শিক্ষা দেওয়া যায়, তবেই বয়স্কা মেয়েদের এই শিক্ষাকেন্দ্র-গুলিতে যোগদান করবার আগ্রহ জন্মাবে। সাধারণতঃ হস্তশিল্প ও সূচী কর্ম্মের প্রতি মেয়েদের স্বাভাবিক আগ্রহ ও অনুরাগ থাকে। শিল্প শিক্ষা করতে গেলেই মেয়েদের কিছু কিছু লেখাপড়া শেখার প্রয়োজনও হবে। তখন তারা স্বতঃই লেখাপড়া শিখবার জন্যে আগ্রহান্বিতা হবে। সেই সঙ্গে তাদের অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয়ও শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে, যাতে করে তারা দেশের উপযুক্ত নাগরিক হবার শিক্ষাও পায়।

শুধু বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রগুলিতেই এই রকম শিল্প শিক্ষা-দেবার ব্যবস্থা করলেই যথেষ্ট হবে না। বর্ত্তমানে প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতিতে পুস্তকলব্ধ বা পুঁথিগত বিদ্যার উপরই বেশী জোর দেওয়া হ'য়েছে। এইটাই বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতির একটি বিশেষ ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতা বলে মনে হয়। এই শিক্ষাপদ্ধতির পরিবর্ত্তন করা অদূর ভবিষ্যতে একান্ত দরকার হয়ে পড়েছে। সুখের বিষয়, মহাত্মা গান্ধী পরিকল্পিত এবং প্রবর্ত্তিত বুনিয়াদী শিক্ষার ভিত্তি কর্ম্মের উপরই প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করা হয়েছে। বর্ত্তমানে বিদ্যালয়ের কাজের সঙ্গে ছাত্র ছাত্রীদের প্রাত্যাহিক জীবনের দৈনন্দিন কাজের কোন সামঞ্জস্য নেই। তাই ছাত্রছাত্রীরা বিদ্যালয়ে যে শিক্ষা লাভ করে, তার উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তা তারা বুঝতেই পারে না। কর্ম্মকেন্দ্রিক শিক্ষার আবশ্যকতা আজকাল সকল শিক্ষাবিদরাই অনুভব করছেন। সেই জন্যেই বর্ত্তমান বিদ্যালয়সমূহে হস্ত সম্পাদ্য কার্য্যশিক্ষা দেওয়া নিতান্ত দরকার হ'য়ে পড়েছে। সম্ভব হলে প্রত্যেক বালিকা বিদ্যালয়েই একটি শিল্প-বিভাগ খোলা প্রয়োজন। তাতে মেয়েদের শিল্প শিখবার আগ্রহ জন্মাবে। অনেক মেয়ের হয়তো শিল্পের দিকে বিশেষ ঝোঁক আছে, কিন্তু উপযুক্ত শিক্ষা এবং সুযোগের অভাবে তাদের সুপ্তশক্তির পরিস্ফুরণ হতে পারে না। বিদ্যালয়ে শিল্প শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা থাকলে মেয়েদের অঙ্গুলি চালনায় দক্ষতা জন্মাবে—তাদের আঙুলের জড়তা দূর হবে—হস্তের ও চক্ষুর পেশীসমূহের চালনার সমন্বয়ও সাধিত হবে। তাদের পর্য্যবেক্ষণ-শক্তি এবং সৌন্দর্য্য বোধের অনুশীলন হবে। তারা শ্রমের মর্য্যাদা বুঝতে শিখবে। অনেক মেয়ে যাদের হয় তো লেখাপড়ায় তেমন মনোযোগ নেই কিংবা মেধাও নেই তারা নানারকম হাতের কাজ শিখে ভবিষ্যৎ জীবিকার পথ প্রস্তুত করতে সক্ষম হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষা লাভের সুযোগ ও যোগ্যতা সকল ছাত্রীরই থাকতে পারে না। পড়াশুনায় যে সব মেয়ে বেশী অগ্রসর হতে পারবে না অথবা বুদ্ধিমূলক কাজে যারা অপর মেধাবিনী ছাত্রীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পেরে উঠবে না, তাদের মনে স্বতঃই নিজেদের অক্ষমতাজনিত লজ্জা ও ক্ষোভের সঞ্চার হওয়া স্বাভাবিক। অনেক সময়ে তাদের নিজ জীবনের সফলতা সম্বন্ধে নিরাশ হতেও দেখা যায়। এই সব মেয়েরা অনেক সময়ে হাতের কাজে ভালো হতে পারে। এই উপায়ে তাদের জীবনের সফলতার আর একটি পথও উন্মুক্ত হওয়া সম্ভব। বিদ্যালয়গুলির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এই শিল্পবিভাগগুলিতে যদি শিক্ষাশেষে ডিপ্লোমা দেবার ব্যবস্থা করা যায়, তা'হলে মেয়েদের শিখবার উৎসাহ তো বাড়েই। উপরন্তু অনেক মেয়ের অর্থাগমের উপায়ও সহজ-সাধ্য হয়। ডিপ্লোমা দেবার ব্যবস্থা থাকলে ঐরকম শিক্ষাকে উপযুক্ত মর্যাদাও দেওয়া হয়। অনেক মেয়ের হয়তো শিল্পে স্বাভাবিক অনুরাগ ও নৈপুণ্য থাকে। কিন্তু উপযুক্ত সুযোগ ও শিক্ষার অভাবে অনেক সময়ে তারা তাদের নিজেদের স্বাভাবিক শক্তির অস্তিত্বই জানতে পারে না। মেয়েদের এইরকম ভাবে শিল্প শিক্ষা দিলে তারা ঘরে বসেই হাতের কাজ করে কিছু অর্থ উপার্জ্জন করতে পারবে।

উপযুক্ত মূল্যে মেয়েদের প্রস্তুত জিনিষগুলির বিক্রয়ের ব্যবস্থা করাও দরকার। বর্ত্তমানে অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই তৈরী জিনিষগুলির বিক্রয়ের সুবিধা করে উঠতে পারেন না। এই জন্যে তাঁদের মাঝে মাঝে প্রদর্শনীর আয়োজন করতে হয়। প্রদর্শনীর সময়ে অনেক লোক সমাগম হয় এবং অনেক জিনিষ বেশ বেশী দামেই বিক্রী হয়। সেই জন্যে কোনও কোনও প্রতিষ্ঠানে অর্ডার অনুযায়ী কাজ করানো হয়, যাতে মেয়েদের পরিশ্রম পণ্ড না হয়। কলিকাতা শহরের এই শিল্পশিক্ষা কেন্দ্রগুলির যথেষ্ট বিজ্ঞপ্তি ও প্রচারেরও অভাব। বিভিন্ন কেন্দ্রে প্রস্তুত জিনিষগুলির বিক্রয়ের সুবিধার জন্যে সমবায় সমিতি গঠন করা নিতান্ত আবশ্যক। কিন্তু এবিষয়ে বর্ত্তমানে অনেক প্রতিষ্ঠানের আগ্রহ এবং উৎসাহের বিশেষ অভাব পরিলক্ষিত হয়। সমবায় সমিতি গঠনের বাধাগুলি অবিলম্বে দূর করা দরকার। ক্রমে ক্রমে যখন এই শিল্প দ্রব্যগুলির চাহিদ ও সমাদর বাড়তে থাকবে, তখন সেই অনুপাতে জিনিষ-গুলির দামও সস্তা করতে হবে। আজকাল বাংলাদেশের

এক শ্রেণীর লোকের ক্রয়ক্ষমতা অনেক পরিমাণে বেড়ে গিয়েছে। কিন্তু শুধু তাদের উপর নির্ভর করেই জিনিষের মূল্য নির্দ্ধারণ করা উচিত নয়।

বর্ত্তমান যুগই হ'চ্ছে যান্ত্রিকসভ্যতার যুগ। সুতরাং এখনকার দিনে যন্ত্রশিল্পের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় দেশের কুটিরশিল্পের টিঁকে থাকাই কঠিন। এই কারণেই সরকারী সাহায্যের বিশেষ প্রয়োজন। অবিলম্বে ব্যাপক সমবায় ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন ও প্রসার হওয়া দরকার। আশা করি, অদূর ভবিষ্যতে এ বিষয়ে আমাদের জাতীয় গভর্ণমেণ্ট আরও বেশী অবহিত হবেন। মূলধন ও কুটিরশিল্পগুলির উপযুক্ত সংগঠনের জন্যেও রাষ্ট্রের সাহায্য আবশ্যক। অনেকগুলি কারণে ভারতের কুটিরশিল্পগুলির বিশেষ উন্নতি এখন পর্য্যন্ত সম্ভব হয় নি। সুচিন্তিত পরিকল্পনা ও যন্ত্রপাতির অভাব, সংগঠন ব্যবস্থার ত্রুটি, অবশ্য প্রয়োজনীয় কারিগরী শিক্ষার অভাব, কাঁচামাল সংগ্রহ করবার এবং উৎপন্ন দ্রব্যাদি বাজারজাত করবার অসুবিধা ইত্যাদি এই কারণগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বর্ত্তমানে ভারতের যন্ত্রশিল্পের সম্প্রসারণের যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। কিন্তু তবুও দেশের কুটিরশিল্পগুলিকে অবহেলা করা আদৌ সমীচীন নয়। পণ্যদ্রব্যাদির বিপুল চাহিদা মিটাবার সাধ্য কেবলমাত্র যন্ত্রশিল্পের নেই, বিশেষ করে যখন বর্ত্তমানে বিদেশী দ্রব্যের আমদানী হ্রাসের সম্ভাবনা আছে। এদেশে কৃষকদের দ্বিতীয় বৃত্তি হিসাবেও কুটিরশিল্পের আবশ্যকতা আছে। জাপানের মতো শিল্পসমৃদ্ধ দেশেও কুটিরশিল্প অনাদৃত হয়নি। আমাদের দেশেও কুটিরশিল্প অগণিত জনগণের অন্ন সংস্থানের একটি বিশেষ উপায় হতে পারে। ভারতের পল্লী অঞ্চলে এখন পর্য্যন্ত যানবাহন ও যোগাযোগের বিশেষ সুবিধা নেই। সেইদিক থেকেও কুটির শিল্প সেই সব অঞ্চলের অনেক প্রয়োজন মিটাতে পারে। আজ তাই ব্যাপক সমবায় ব্যবস্থার দ্বারা দেশের কুটির শিল্পের যথাসম্ভব উন্নতি করা বিশেষ দরকার হয়ে প'ড়েছে। বিভিন্ন বে-সরকারী শিল্প শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে উপযুক্ত পরিমাণে সরকারী সাহায্য দেওয়া আবশ্যক। নতুবা অর্থের অভাবে কতকগুলি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের উদ্যম ব্যর্থ হয়েও যেতে পারে।

ধর্ম্ম-বিচার

শ্রীঅমূল্য সরকার

তর্কবাগীশ শিরোমণি, বন্ধ কর বেদ-গীতা,
উপনিষদ ভাগবত আর পুরাণ মনুসংহিতা।
পৈতা টিকি শাস্ত্র মাঝে যদিই ভগবান্ থাকে,
না দেয় সাড়া দীন পতিত আর হীন মানবের
ক্ষীণ ডাকে!
পুড়িয়ে ফেল তেমন ধর্ম্ম, মন্দিরেতে দাও তালা,
বন্দী কর সে ঈশ্বরে—ঘুচুক ভবের সব জ্বালা!
হে মৌলভী, করছো কেন খোদার নামে সয়তানী?
বন্ধ কর কোরাণ কিতাব গরু জবাই—কোরবানী,
দূর দাড়ী আর লুঙ্গি টুপি—অজু কিম্বা নামাজে
যে খোদা তোর হয়রে তুষ্ট গোস্ত রসুণ পিয়াজে—
বিজাতিরে হিংসা করে—সে ধর্ম্ম তোর দূরেই থাক্
ভেঙ্গে দাও ঐ মজিদ বাড়ী, সে আল্লাকে দাও তালাক্।
পাদ্রী সাহেব কি হবে লাভ খৃষ্টে ভজে বাইবেলে?
এত কিছু করেও প্রাণে শান্তি যদি নাই পেলে—
ক্ষুধা তোমার নরহত্যা, তৃষ্ণা তোমার রাজ্য জয়ঃ
ধর্ম্ম তোমার অপকর্ম্ম—অন্যায়েরে নাইকো ভয়।
যীশুর নামে পশুলীলা করলে সারা জীবন ভর,
এমন ধর্ম্ম দাও ডুবিয়ে—বন্ধ কর গীর্জ্জা ঘর।
হিংসা ধর্ম্ম বিভেদ ধর্ম্ম, পুঁথির ধর্ম্ম যাক্ মরে,
বিশ্বমানব মিলন ধর্ম্ম—উঠুক ফুটে অন্তরে

রূপান্তর

শ্রীজগদীশচন্দ্র ঘোষ

এক

শ্মশান। গ্রামের উপান্তে নদীর ধারে, জনবিরল, আশশেওড়া আর বাবলা গাছে ঘেরা—ইতস্ততঃ মড়ার মাথার খুলি আর হাতে পায়ের হাড়, পোড়া কাঠ, ভাঙা কলসী, ছেঁড়া মাদুর কাঁথা ছড়ান শ্মশান নয়—একেবারে মহানগরীর বুকের উপরের শ্মশান। তবে মহাশ্মশান বলতেই হবে—দিবারাত্রি বিরামহীন দুই-চারিটী চুল্লী অনবরত জ্বল্‌ছেই। চারপাশে দেওয়াল দিয়ে ঘেরা—তারই মাঝে খানিকটা জায়গা—দরকার হ'লে এরই মাঝে ১০।১২টী মৃতদেহ একসঙ্গে দাহ করা চলে। পূর্ব্বদিকে কয়েকজন স্বনামধন্য মহাপুরুষের স্মৃতিমন্দির, পশ্চিমে আদি গঙ্গা। চারপাশে নিকটে দূরে—মহানগরীর সৌধমালা আকাশের দিকে মাথা উঁচু ক'রে উদ্ধতভাবে—দাঁড়িয়ে আছে। চারিদিকের রাস্তায় জনসমুদ্র। ইট-কাঠ জড় ক'রে আলো আর আলেয়ার সৃষ্টি ক'রে মানুষ বুঝি মহাকালের মহাযাত্রাকে ফাঁকি দিতে চেয়েছিল। দেহের পচাক্ষত যেমনি মানুষের মনকে পুঁয আর রক্তের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়—এ শ্মশানটীও যেন তেমনি মানুষের ঔদ্ধত্যের উপরে ভেংচী কাট্‌ছে—এ যেন নীরব ইসারায় বল্‌ছে—এই যে ইট, কাঠ, পাথর—এই যে বিলাস-ব্যসনের সামগ্রী—সব মিছে "সব ঝুট হ্যায়"। আদি গঙ্গার ঠিক পারের উপরে শ্মশানের দেয়ালের পাশে খান-চারেক খোলার ঘর—এই ঘরগুলিতে যারা বাস করে তা'রাই এই শ্মশানের রক্ষক। এরই একপাশে বুধোয়ার ঘর। বুধোয়ার ঠাকুর্দ্দা বাঙ্‌লাদেশে এসে এই শ্মশানে চাক্‌রী নিয়েছিল—ঠাকুর্দ্দাকে বুধোয়ার একটু একটু মনে আছে। বুধোয়া এই শ্মশানেই জন্মেছে—এতটুকু বেলা থেকে ধীরে ধীরে এখানেই বড় হ'য়ে উঠেছে। ছোটবেলায় তার মা মারা যায়—তার বাবা হরিয়াও আজ বছর পাঁচেক হ'লো এখানেই শেষ নিশ্বাস ফেলেছে। বুধোয়া বাপ-ঠাকুর্দ্দার মৌরসীপাট্টার চাকরী নিয়ে বেশ সুখেই সেই খোলার ঘরে দিন কাটাচ্ছিল। বয়স তার এই সবে আঠাশ। গত বৎসর নিমতলা শ্মশানের দৌবারিক ডোমের মেয়ে মুংরীর সঙ্গে বিয়ে হয়েছে বুধোয়ার। বিয়ে অবশ্য খুব সহজে হয় নাই—অত্যন্ত বেগ পেতে হ'য়েছিল বুধোয়াকে—নিমতলার ভিক্ষু মুংরীর বাপকে আট কুড়ি টাকা, একটা শূয়ার, দু' বোতল মদ দেবে ব'লে লোভ দেখিয়েছিল। মুংরীর বাপ তার দিকেই ঢ'লে প'ড়েছিল আর কি! বুধোয়ার অত টাকা নাই—সর্ব্ব সাকুল্যে পাঁচকুড়ি টাকা তখন তার হাতে—কিন্তু মুংরীর বাপের তাতে মন উঠ্‌লো না। অবশেষে মুংরী যখন জোর ক'রে একদিন বুধোয়ার সঙ্গে পালিয়ে তার ঘরে এসে উঠ্‌লো—তখন আর কি করে—তার বাপ বুধোয়ার কাছ থেকে সেই পাঁচকুড়ি টাকা নিয়ে বিয়ের মন্তর পড়িয়ে দিল। দু'টো শূয়োর আর বোতল পাঁচেক দেশী মদ কিনে আত্মীয় স্বজনের ভোজ দেওয়া হলো।

পূর্ব্ব থেকেই মুংরী আর বুধোয়ার ভেতর ভালবাসা-বাসি চলছিল। বুধোয়ার এক মাসী-বাড়ী ছিল নিমতলায়, একবার মাসীর বাড়ী বেড়াতে গিয়ে মুংরীর সঙ্গে তার ভাব হয়ে গেল। সেই থেকে প্রায়ই মাসীর বাড়ী আনা-গোনা চলতো বুধোয়ার। রোজ সন্ধ্যাবেলা মুংরী তেল মেখে পরিপাটী করে চুল আঁচড়ে—একখানা ফর্সা কাপড় পরে তার জন্যে অপেক্ষা করতো—বুধোয়ার সঙ্গে চোখোচোখি হতেই সে ফিক্ করে হেসে মুখ ফিরিয়ে নিত। তারপর কোন একটা নির্জ্জন জায়গা বেছে নিয়ে তারা দু'জন গিয়ে বসতো। বুধোয়া কোন দিন কাঁচের চুড়ি, কোন দিন বা ছোট্ট আয়না তাকে উপহার দিত। নইলে আট কুড়ি টাকা ঠেলে ফেলে বাপের অমতে পালিয়ে এসে, অন্যের ঘরে ওঠা কি এমনি সোজা!

বছর দুই পরের কথা। চৈত্র মাস, সহরে খুব কলেরা লেগেছে—রোজ সকালে, সন্ধ্যায়, রাত্রে, বিরামহীন মরা এসে জমছে শ্মশানে—সবগুলি চুল্লী অনবরত জলেও শেষ করতে পারছে না—দুই চারটী করে সব সময় মজুদ থেকেই যাচ্ছে। বুধোয়াদের আর বিরাম নাই—খুব খাটুনি পড়েছে আজকাল। সেদিন সারারাত কাজ করে সকালবেলা বুধোয়া ঘরে ফিরে এলো। মুংরী তখনও ঘুমিয়ে। সে তাকে নাড়া দিয়ে বল্ল—এই ওঠ শীগ্‌গির—দেখ দেখি চেয়ে। মুংরী চোখ মেলতেই সে হাত মেলে তার চোখের সামনে সুন্দর দুটো সোনার দুল ধরলো। মুংরী চট্ করে উঠে বসে জিজ্ঞেস করলো—কোথায় পেলি বলতো?

—জানিস, আজ অনেক রাতে একটা মড়া এসেছিল—ছোট্ট একটা বউ—সোন্দর টুকটুকে চেহারা—মনে হচ্ছিল যে ঘুমুচ্ছে। স্বামীটা চুপ করে এক পাশে বসেছিল—চিতেয় তোলবার সময় কান থেকে দুল দুটো খুলে কে একজন তার হাতে দিতে গেল, কিন্তু সে হাতে নিল না—আমি হাত পেতে দাঁড়ালাম—লোকটা দুল দুটো আমার হাতে ফেলে দিল, আমি চট্ করে কোমরে গুঁজে ফেল্লাম, কেউ দেখতে পায়নি।

মুংরী বারে বারে দুল দু'টী ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে ভারী খুশী হয়ে উঠলো। কিছুক্ষণ পরে জিজ্ঞেস করলো—আচ্ছা বউটার কি হয়েছিল রে?

—ছেলে হতে মারা গেল। ছোট্ট এতটুকু একটা ছেলে, আর মা, এক সঙ্গে করে চিতেয় তুলে দিল। হঠাৎ মুংরী বলে বসলো—চল্ না, একবার দেখে আসি। বুধোয়া বল্লো—কি পাগল, সেকি এখনও আছে নাকি—কখন পুড়ে শেষ হয়ে গেছে। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে মুংরী বল্লো—বস্, তোকে খেতে দি। একখানা কলাই করা লোহার থালায় করে পান্তাভাত আর অনেকখানি শুয়োরের মাংস বুধোয়ার সামনে ধরে দিল। এলোমেলো বাতাসে চিতার ধূঁয়া এসে জানালা দিয়ে ঘরে ঢুকছিল—তারই মাঝে বুধোয়া পরম সন্তোষ সহকারে খেয়ে চলছিল। কিন্তু মুংরী তার খাটে বসে একমনে সেই বউটার কথাই ভেবে চলছিল—হঠাৎ বলে বসলো—বউটা খুব কষ্ট পেয়ে মারা গেছে, নারে?

বুধোয়া বিরক্ত হয়ে বল্লো—তা'কি আমি দেখতে গেছি নাকি? কিন্তু মনে মনে সে বুঝতে পারলে—কাজটা ভাল হয়নি—বউটার কথা মুংরীকে না জানালেই ভাল হতো। মুংরীর ছেলে-পেলে হবে—এই সাত মাস।

আহারাদি সেরে বুধোয়া ঘুমিয়ে পড়লে—মুংরী আয়না নিয়ে দুল দু'টী কানে পড়লো। বেশ সুন্দর দুল দুটী—ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে মুংরীকে। সে খুব খুশী হয়ে উঠলো। তারপর উঠে ঘর ঝাঁট দিল—আদিগঙ্গায় নেমে বুধোয়ার এটো বাসন মেজে নিয়ে এলো। কিন্তু এ কি, কাজকর্ম্ম করতে যখনই দুলদুটো নড়ে ওঠে, তখনই মুংরীর মনে হয় সেই বউটার কথা। আহা, ছেলেপেলে হতে কত না কষ্ট পেয়েছিল বউটা। অবশেষে ছেলেও তো হলো, কিন্তু ছেলেটার মুখ দেখা আর তার ভাগ্যে ঘটলো না। মা আর ছেলেকে এক চিতেয় পুড়িয়ে রেখে গেল। কিছুতেই ঘটনাটা সে ভুলতে পারে না। অবশেষে সে ভাবলো—না: এ দুল তার কানে পরা উচিত হয়নি। অনেক ভেবে সে দুলদুটী খুলে তুলে রেখে দিল।

রাত্রে বুধোয়া তাকে নিজের বুকের কাছে টেনে নিয়ে আদর করতে গিয়ে হঠাৎ এক সময় প্রশ্ন করলো—তোর দুল কি হলোরে?

মুংরী বল্লো—সে আমি খুলে রেখে দিয়েছি।

—কেনরে?

—না, আমার ভাল লাগে না। তারপর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে এক সময় মুংরী প্রশ্ন করলো—আচ্ছা ছেলে-পেলে হতে খুব কষ্ট হয়, নারে? বুধোয়া বিরক্ত হয়ে জবাব দিল—তার আমি কি জানি! আবার কিছুক্ষণ পরে সে হঠাৎ প্রশ্ন করে বসলো—আচ্ছা, আমি যদি ঐ বউটার মতো মরে যাই!

বুধোয়া রাগ করে বল্লো—তোর যতসব বাজে কথা, চুপ করে থাক্ বলছি।

—না বাপু, ঐ দুল জোড়া দেখলে আমার ভয় করে—ও আর আমি কানে দেব না।

—কে বল্‌ছে তোকে কানে দিতে! ডোমের মেয়ের এত কাঁচা মন হ'লে চলে! রাগ ক'রে বুধোয়া পাশ ফিরে শুলো—কিন্তু মোটেই ঘুমুতে পারলো না—বারে বারে মনে হ'তে লাগলো—বড় অন্যায় ক'রেছে সে দুল জোড়া এনে মুংরীকে দিয়ে।

—আর দিলও যদি বা—বউটীর কথা তাকে বল্লো কেন! সকালবেলা মুংরী বাইরে গেলে—বুধোয়া খুঁজে খুঁজে দুলজোড়া বের ক'রে ফেল্লো—তারপর আদি গঙ্গার দিকে এগিয়ে গিয়ে ছুঁড়ে একেবারে জলের ভেতরে ফেলে দিয়ে ফিরে এলো।

দুই

মাস দুই এমনি ক'রে কেটে গেল। মুংরীর যেন কি হ'য়েছে—তার সে স্বাভাবিক স্ফুর্ত্তি আর নাই—সব সময় যেন কেমন মনমরা হ'য়ে থাকে। এসব বুধোয়ার চোখ এড়ায় না—কি ক'রে মুংরী ভাল থাকবে—কি ক'রলে সে সুখী হবে—এই তার চিন্তা। কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। একদিন ভোর রাত্রে হঠাৎ মুংরীর বারে বারে ফিট হ'তে লাগলো—ধনুকের মতো বাঁকা হয়ে, মুখে ফেনা উঠে, সে যায় যায় অবস্থা আর কি। সব্বাই বল্লো—দেওতা ভর ক'রেছে। সারাটা দিন বুধোয়া দুই তিনজন গুণীর বাড়ী দৌড়াদৌড়ি করে—তেল পড়া, জল পড়া এনে দিল—কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না—শেষ রাত্রের দিকে মুংরী বিদায় নিয়ে চ'লে গেল। ব্যাপারটী বুধোয়া প্রথমে ধারণা করতেই পারে নি। মানুষ যে চিরকাল বেঁচে থাকে না—মৃত্যু যে একদিন না একদিন হয়ই—সে তো প্রতিদিন তা চোখের উপরেই দেখতে পাচ্ছে। কিন্তু তাই ব'লে মুংরী মারা যাবে—তাও এমনি করে—এ কথা স্বয়ং ভগবান এসে বল্লেও তো সে বিশ্বাস করতো না। সবাই মিলে চিতে সাজিয়ে—মুংরীকে চিতেয় তুলে দিয়ে আগুন ধরিয়ে দিল। দাউ দাউ ক'রে আগুন জলে মুংরীর দেহ পুড়িয়ে দিতে লাগলো। এখন তো আর অবিশ্বাস করা চলে না। একটু পরে মুংরীর দেহ বল্‌তে তো আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। বুধোয়া একপাশে সেইদিকে চেয়ে চুপ ক'রে ব'সেছিল—কয়েকবার চীৎকার ক'রে কাঁদ্‌তে চেষ্টা ক'রেছিল—কিন্তু মুখ দিয়ে কোন শব্দ বেরুল না। বারে বারে তার মনে হ'তে লাগলো—চোখের সামনে যা সব ঘট্‌ছে, সব বুঝি মিছে—এ যেন একটা স্বপ্ন দেখছে সে। আগুনে পুড়ে পুড়ে এক সময় মুংরীর পেটের সন্তানটী ফুটে বেরিয়ে এলো—আগুনের ভিতর দেখা গেল ছোট্ট একটী রবারের পুতুলের মতো। কালিয়া একখানা বাঁশ দিয়ে সেটীকে আগুনের ভিতরে চেপে ধরতে লাগলো। চেয়ে চেয়ে দেখলো বুধোয়া—তার সন্তানকে কালিয়া বাঁশ দিয়ে চেপে ধরে আগুন দিয়ে পোড়াচ্ছে—তবুও তো সে কিছুই বলছে না—দুটো ঘুঁসি মেরে কালিয়ার মাথাটা ভেঙে দিতে ছুটে যাচ্ছে না। দাহ শেষ হলে কালিয়া তার কাছে এসে বল্লো—নে, এখন ওঠ বুধোয়া—অমন করে আছিস কেন?—ডোমের ছেলের এমনি কাঁচা মন হলে চলে? শ্মশান থেকে উঠে এসে বুধোয়া আদি গঙ্গায় একটা ডুব দিয়ে এলো। নিজের ঘরে ঢুকে একবার চারদিক চেয়ে নিল। পেটের নাড়ীগুলো তখন একেবারে চোঁ চোঁ করছিল—ইচ্ছে হচ্ছিল যা হোক কিছু খায়। কিন্তু ঘরে এসে আর তার খাওয়া হলো না। এ কি, ঘরের যেদিকে চায়—সেই দিকেই যে মুংরীর স্মৃতি একেবারে জড়ানো—ঐ যে মুংরীর কয়খানা ধোওয়া কাপড়—দুটো জামা, এক পাশে কয়েকটা হাঁড়ি কুঁড়ি, এগুলি মুংরী নিজের হাতে সাজিয়ে রেখেছিল। দেয়ালে কি সব হিজি-বিজি আলপনা দেয়া। বুধোয়ার খাওয়া হলো না—ঘরে সে আর দাঁড়াতেই পারলো না। বাইরে এসে উঠানের যে জায়গাটায় চারা বটগাছটার ছায়া এসে পড়েছে—সেখানে চুপ করে বসে পড়লো। আদিগঙ্গায় তখন জোয়ার—দুকূল ছাপিয়ে জল ছুটে চলেছে উল্টো মুখে। একটা শূয়োর পোষা কুকুরের মতো তার চারধারে ঘুরতে লাগলো আর গা শুঁকে বারে বারে ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দ করতে লাগলো। সে সন্ধ্যা অবধি ঠায় বসেছিল। কালিয়া শ্মশান থেকে কাজ সেরে এসে বল্লো—তোর হলো কি বলতো? খাবিনে আজ, আয় উঠে আয়, বলে তার হাত ধরে নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে খেতে দিল।

রাত্রে কালিয়ার ঘরেই সে শুয়ে রইলো। পরের দিন সকালেও সে কোন কাজ করলো না শ্মশানের দক্ষিণ দিকটার দালানের সিঁড়ির উপরে চুপ করে বসে রইলো। সারাটা দিনে কতকগুলো মরা এলো—দাহ হলো—সব সে বসে বসে দেখলো। এমনি করে মানুষের দেহ পুড়ে ছাই হয়ে যায়। একটুও লাগে না—কেন লাগে না? একটা চিমটি কাটলে আজ ব্যথা করে—একটা কাঁটা ফুটলে সহ্য হয় না—সেই দেহ আগুনে পুড়িয়ে ফেলা হয়। মুংরীকেও তো ওরা কাল এমনি করেই পুড়িয়েছে। সেও তো একদিন মরবে—তার দেহও তো এমনি করে আর পাঁচ জনে আগুনের ভিতরে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে পুড়িয়ে ফেলবে, মানুষ মরে কেন, মুংরী মরলো কেন—সেই বা মরবে কেন? বুধোয়ার মাথা বন্ বন্ করে ঘুরতে লাগলো। সে টলতে টলতে সেখান থেকে উঠে এলো। নাঃ, আর এখানে না—এ শ্মশানে থাকলে সে পাগল হয়ে যাবে। তিন পুরুষ ধরে শবদাহ করা যার ব্যবসা, নিজে যে শত শত মৃতদেহ দাহন করা দেখেছে—আজ হঠাৎ একি তার পরিবর্ত্তন?

তিন

কয়েকটা দিন এমনি করে কাটলো। কালিয়ার ঘরেই সে দুই বেলা আহারাদি করে আর চুপ করে বসে থাকে। সেদিন আদিগঙ্গার কাঠের পুলটার এক পাশে চুপ করে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ ধরে দূর আকাশের দিকে তাকিয়ে ছিল। সন্ধ্যা তখন হয়ে গিয়েছে—অগুণতি লোক কাঠের পুলের উপর দিয়ে পারা-পার করছে—কত রকমের কথাবার্ত্তা কত, বেশভূষার বিচিত্র মানুষ! কিন্তু কোন দিকেই বুধোয়ার খেয়াল নাই। এক সময় কে যেন তার পাশে এসে দাঁড়াল। বুধোয়া চেয়ে দেখে—কালিয়ার বোন মতিয়া।

মতিয়া বল্লো—এই ভর সন্ধ্যে বেলা এমনি করে এখানে দাঁড়িয়ে আছিস্? তারপর তার একখানা হাত নিজের হাতের ভিতরে টেনে নিয়ে খুব দরদ দিয়ে বল্লো—আয়, খাবি আয়। বুধোয়া কথা না বলে তার সঙ্গে ফিরে গিয়ে খেতে বসলো।

মতিয়ার বয়স এই বছর বাইশেক হবে। বৎসর খানেক হলো সে বিধবা হয়েছে—আজ কয়েক মাস কালিয়ার কাছে এসে আছে। এই কয়টা দিন, মতিয়া বুধোয়াকে খুব আদর যত্ন করছে—তার খাবার যোগাড় করা—তাকে নানা গল্প বলে ভুলিয়ে রাখা—সব বিষয়ে তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। এমনি করে আরও কয়েকটা দিন কেটে গেল। সেদিন সন্ধ্যার পর নিজের ঘরে চৌকীর উপরে বুধোয়া শুয়ে ছিল। মতিয়া এসে ঘরে ঢুকলো। বুধোয়ার খাটের একপাশে বসে পড়ে ধীরে ধীরে তার একখানি হাত নিজের হাতের ভিতরে তুলে নিল। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ডাকলো-বুধোয়া!

বুধোয়া জবাব দিল—কেন রে?

—তুই এমনি করে থাকলে তো বাঁচবিনে তোর কষ্ট দেখলে আমার বুক ফেটে যায়—আমি তোকে ভালবাসি।

বুধোয়া কিন্তু সহসা কোন জবাব দিতে পারলো না। মতিয়া পুনরায় বল্লো—চল, আমরা এখান থেকে চলে যাই। বুধোয়া—মেদিনীপুর জেলায় আমার মামা আছে, তার ওখানে গিয়ে আমরা সাঙা করবো—তাদের কাছে থাকবো। শ্মশানে আর তোর চাকরী করে কাজ নাই—সেখানে গিয়ে ডালা কুলো তৈরী করবো, তাতেই দুজনের চলে যাবে। যাবি বুধোয়া?

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বুধোয়া বল্লো—আজ নয় মতিয়া, কাল বলবো।

না, মতিয়াকে সে ভাল বাসেনা। কোন দিন যে তাকে সে সাঙা করবে, এ কথা সে ভাবেও নাই। আর মতিয়া কেন—কাউকেই সে আর ভালবাসতে পারবে না। কি হবে ভাল বেসে—আর কয়দিনই বা? সেও তো মুংরীর মতোই একদিন মরে যাবে। রাত্রে বুধোয়া ঘুমোতে পারে না—শববাহকদের চীৎকারে বারে বারে চমকে ওঠে—তার গা ছম্ ছম্ করে। মড়া পোড়ার দুর্গন্ধ আর যেন সে সহ্য করতে পারে না। প্রতি মুহূর্ত্তে এমনি করে মরণ-ভীতি তাকে চেপে ধরতে লাগলো। মুংরীর কথা আর সে ভাবে না—সে এখন ভাবছে শুধু নিজের

কথা। না, এমনি করে সে বাঁচবে না। মতিয়ার সঙ্গেই সে পালিয়ে যাবে এখান থেকে অনেক দূরে—যেখানে শ্মশান নাই—শবদাহকারীদের চীৎকার নাই।

পরের দিন সকালে মতিয়া এলে বল্লো—চল মতিয়া, আজই আমরা পালিয়ে যাই তোর সেই মামার বাড়ী—এখানে আর আমি থাক্‌তে পারছি না।

মতিয়া হেসে বল্লো—বেশ চল। তুই আমায় ভাল বাসিস বুধোয়া?

বুধোয়া সহসা কোন জবাব দিতে পারলো না। কিন্তু চট্‌ করে মতিয়ার একখানা হাত নিজের হাতের ভিতরে টেনে নিয়ে বল্লো—তা আমি বল্‌তে পারবো না মতিয়া—কিন্তু আমি যে আর এখানে থাক্‌তে পারছিনে। তুই আমাকে এখান থেকে নিয়ে চল—নইলে আমি আর বাঁচবো না।

মতিয়ার চোখ ছল্‌ ছল্‌ করে উঠলো—বল্লো—ভাল না বাসিস—না বসিস—আমি তো তোকে ভালবাসি। চল, আজই চলে যাই।

সেই দিনই বিকাল বেলা শ্মশান ছেড়ে বুধোয়া আর মতিয়া বেরিয়ে পড়লো—মেদিনীপুর জেলার কোন এক গ্রামের উদ্দেশ্যে—পিছনে পড়ে রইলো বুধোয়ার তিন পুরুষের শ্মশানের চাক্‌রী—তার এই আঠাশ বৎসর বয়সের মড়া ঘাঁটা কঠিন মন।

বিনিদ্র রাত্রির শিয়রে

সুনীলকুমার নন্দী

কি হলো দু'চোখে নামে না তো আর শীতল ঘুম
শিশিরের মতো টিপি টিপি পায়ে মুছে নিতে
এলোমেলো কথা সারা মন থেকে? রাত নিঝুম;
আমি শুধু হায় একা জেগে জেগে স্মৃতি-ফিতে

খুলে চলি। আহা সারাদিন ধ'রে পথে ঘুরে
সারা দেহ মনে ক্লান্তি জড়িয়ে ঘরে ফিরে
আসি আশা নিয়ে হয়তো দু'চোখে মিহি সুরে
ক্লান্তিই টেনে আনবে ঘুমকে স্মৃতি চিরে—

হায়রে কী আশা! ঘুমের শিয়রে মাথা খুঁড়ে
মরি কতো ভাবে তবু ঘুম নেই, পাখা মেলে
কান্না ঝরানো পুরোণো স্বপ্ন মন জুড়ে
ঘুরে ঘুরে কাঁপা-ভীরু কথা বোনে। কীবা বোনে

হায়রে স্বপ্ন, মুখর স্বপ্ন, এক-ই কথা
দু'হাতে ছড়িয়ে নির্জন মনে? চোখে নেমে
বৃষ্টির মতো এসে ভিজে ঘুম ধূসরতা
হয়তো ঝরাতো, তাকেও হারালে। আহা থেমে

অবুঝ স্বপ্ন, কিছুতেই তুমি দেবে নাকি
একটু শান্তি? হু হু করে মন; কতো পারি
স্মৃতির জাবর কেটে কেটে আর? নীল পাখি
তুমিতো দেখিয়ে রূপোলি ইসারা কতো বারই

বাঁকা চোরা পথে অনেক ঘুরালে, ছলো ছলো
ম্লান চোখ নিয়ে আর কতো জাগি বলো বলো!

রোম

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত

ভারতের দিল্লী এবং য়ুরোপের রোম দেখেছে—

পতন-অভ্যুদয় বন্ধুর পন্থা

যুগ যুগ ধাবিত যাত্রী—

এরা এই যুগ-যুগান্তরের অভিজ্ঞতা নিয়ে কৌতুক-কাতর কণ্ঠে বল্‌তে পারে—

তুমি চির-সারথী তব রথচক্রে

মুখরিত পথ দিনরাত্রি।

কত গ্রাম সহর হল, কত জলা-ভূমি দিগন্ত প্রসার অট্টালিকায় পূর্ণ হ'ল, কত নগ-নগরী কালের কবলে ধ্বংস হ'ল, কিন্তু বহু আবর্ত্তন বিবর্ত্তনের মাঝে রূপ বদলে আজও বিদ্যমান দিল্লী ও রোম। পরিবর্ত্তনের বিশেষত্ব এই যে, এ দুই নগর নতুনের মাঝে পুরাতনের বহু নিদর্শন নিজ নিজ অঙ্গে ধারণ করে রেখেছে। এ বিষয়ে দিল্লী হতে রোমের কৃতিত্ব অধিক। তাই ইতালীয় রোমকে বলে—অনন্ত নগর।

আমরা এবৎসর রোমে পৌঁছেছিলাম ২০শে শ্রাবণ। তার পূর্ব্বে ছিলাম পীসায় যার লিনিং টাওয়ার প্রসিদ্ধ। পীশা মীনারের অপরূপ ঢলে-পড়া গঠনের কথাই বেশী শোনা যায়। তার সংলগ্ন গির্জ্জার অভ্যন্তরীন সুন্দর সাজ যে কত মনোরম তা বুঝলাম তার প্রাচীরে আঁকা চিত্র এবং সুশোভন প্রস্তর-মূর্ত্তি দেখে। মর্ম্মর পাথর সংগ্রহের কারখানা কারারা পীশার সন্নিকটে।

ইতালীর শোভা শিল্পকলার প্রাচুর্য্যে। গ্রামের পর গ্রাম তার বুকে একটি ক'রে প্রার্থনা-মন্দির ধারণ ক'রে রেখেছে, তার অন্তর বাহির সাজিয়ে রেখেছে চারুশিল্পে। ধনী গৃহস্থের আবাস এবং বহু কুটীরের অঙ্গে আঁকা চারু চিত্র, শিরে প্রস্তর মূর্ত্তি।

রোমে আমরা ছিলাম হোটেল কুইরিনালেতে। প্রাচীন রোম তথাকথিত সাত-পাহাড়ের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল—কুইরিনালে সে প্রসিদ্ধ সাতের এক পাহাড়। কিন্তু

ভারতের নয়—ভিটেব্রোর ধর্ম্ম-ভবন

এর ত্রিসীমায় পাহাড়ের কোন চিহ্ন নাই। বাকী ছয়টির অবস্থাও তদনুরূপ। প্রাচীন রোমের লীলাভূমির জীর্ণ অট্টালিকা, স্তম্ভ, মূর্ত্তি বা মন্দিরের অবশেষ আজ সহরের যে ভাগে বহুল পরিমাণে বিদ্যমান, সে অংশ হ'তে কোনো পল্লী উঁচু, কোনো পল্লী নিচু তা' বুঝতে পারা যায় পথের মৃদু গড়ানো ভাব থেকে। কিন্তু সপ্তশৈলের কোনো পাহাড়ী ভাব দৃষ্টিপথে পড়ে না। যুগ যুগান্তর মানুষ সে গুলিকে চেঁচে ছুলে দেশকে মসৃণ ও যথাসম্ভব সমতল করেছে।

আমরা রোমে প্রবেশ করেছিলাম মোটর গাড়িতে। কাজেই সকল পথ, সকল অট্টালিকা, প্রাচীন ও আধুনিক সকল সম্পদ ও সমারোহ একে একে আত্ম-প্রকাশ করেছিল আমাদের চোখের সামনে। এর পূর্ব্বে আমি রোমে নেমেছিলাম এরোপ্লেন হ'তে। উপর হ'তে বোঝা যায় রোম অসমতল। কিন্তু আকাশ হতে বা

ভূমি হতে তথায় পৌঁছবার বহু-পূর্ব্বে দৃষ্টিপথে পড়ে সেণ্ট পিটার্স কেথিড্রল ধর্ম্ম-ভবন। ইতালীয় ভাষায় সেণ্ট পিটারকে বলে সন্ পায়েট্রো বা পায়েত্রো। সন্ সেণ্ট সন্ত, সান্তা, সান্তোর রূপান্তর আমাদের সন্ত। নিশ্চয় শান্তির সঙ্গে সকলগুলির ভাষাগত সম্পর্ক আছে। যে গির্জ্জার প্রধান পুরোহিত কোনো বিশপ বা আর্চবিশপ, ইংরাজেরা তাকে বলে কেথিড্রল—লাটিন কেথিড্রা মানে আসন। রোমক ভাষায় তাকে বলে বসিলিক। তাই এই সুবৃহৎ ধর্ম্ম-ভবনের নাম—বসিলিক সান্ পায়েত্রো। এর প্রধান পুরোহিতও ক্যাথলিক জগতের সশ্রদ্ধ নায়ক—স্বয়ং পোপ।

বসিলিক যেমন প্রকাণ্ড, তেমনি তার সম্মুখের পাথর বাঁধান প্রঙ্গন বা প্যাজা সুবিস্তৃত। এটি বাদামী আকারের, ২৮৪টি সু-দৃশ্য স্তম্ভ ঘেরা। প্রাঙ্গনের বারান্দার ছাদে ১৪০টি প্রস্তর মূর্ত্তি। উঠানের মাঝে ৮০ ফুট উচ্চ এক মিশরী স্তম্ভ ফলক—দুদিকে ফোয়ারা। তারপর ধর্ম্ম-ভবনের প্রবেশ পথ সোজা। থাম ঘেরা, প্রবেশ পথের পর বারান্দা। প্রশস্ত বারান্দায় প্রাচীন সুইস-গার্ডের পোষাক পরিহিত প্রতিহারী দ্বার রক্ষায় নিযুক্ত।

বিশাল গির্জ্জা। চারদিকে সুন্দর মূর্ত্তি। ছাদে কারুকার্য্য। পাঁচটি প্রকাণ্ড ব্রোঞ্জের দরজা। অমাদের দেশের পুরাতন অট্টালিকায় বা সকল মন্দিরে এমনি ধাতু মোড়া কারুকার্য্যের দ্বার আজও দেখা যায়।

পোপ জুলিয়সের আদেশে ১৫০৬ সালে শিল্পী ব্রামান্টি এর ভিত্তি স্থাপন করেন। একশো বছর পরে প্রসিদ্ধ মাইকেল এঞ্জেলোর পরিকল্পনায় বসিলিক সম্পাদিত হয়। বহু শিল্পী এর সম্পাদনে সাহায্যতা করেছে। রোমের পোপের আয়ত্বাধীন এই বসিলিক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। ক্যাথলিক ধর্ম্মমত চায় মানুষ নিজের পাপ স্বীকার ক'রে অনুতাপের অগ্নিতে বিশুদ্ধি লাভ করে। সনপায়েত্রোর গির্জ্জার মধ্যে স্পেন, পর্ত্তুগাল, ফ্রান্স, ইংলণ্ড—অবশ্য ইতালী প্রভৃতি দেশের ভাষায় দোষ স্বীকারের এক একটি কাঠের কুটুরী বিদ্যমান।

সন্ পায়েত্রোর গির্জ্জা য়ুরোপের মধ্যে কেন, পৃথিবীতে সর্ব্বাপেক্ষা বড় গির্জ্জা। এটি লম্বে—৭০০ফুট, প্রস্থে ৯২ ফুট। মোট আয়তন ক্ষেত্রফল—৪৮,৫০০ বর্গ ফুট, ইংলণ্ডের সেণ্ট পলের ক্ষেত্রফল—৭৮৭৫ বর্গফুট। প্যারিসের নোটারাডমের আয়তন ৫৯৯৫ বর্গফুট। এর গঠনে প্রাচীন রোমক ধর্ম্মভবন ও স্নানাগার বিলাস ভবনের কতকটা নাকি আমেজ আছে।

সেণ্ট পিটারের ভিতরের সাজসজ্জা মনোরম। প্রবেশ ক'রে দেখা যায় গায়ে পবিত্র ক্রশ আঁকবার জলের বাসন ধরে আছে দুটি ছেলে। দূর থেকে শিশুর আকার, কিন্তু নিকটে গেলে প্রতীয়মান হয় মূর্ত্তি দুটি বেশ বড়। গির্জ্জার ভিতর প্রথমেই একদিকে সার্লিমেন সম্রাটের মূর্ত্তি, অন্য দিকে কন্‌স্টানটিনোর। তারপর একটি খাটালে আছে প্রসিদ্ধ মাইকেল এঞ্জেলোর পিয়েটা—অর্থাৎ মাতৃক্রোড়ে ক্রশ হ'তে নামানো যীশু। যেমন মূর্ত্তি জননীর, তেমনি মূর্ত্তি মহাপুরুষের। মনে হয় কঠিন প্রাণকে পাষাণের প্রাণ বলা পাথরের অপমান। কারণ পাষাণেও এমন করুণ কোমল মূর্ত্তি রচিত হওয়া সম্ভব। হেথায় বহু রাজা রাণীর মূর্ত্তি আছে—তার মধ্যে—বারনিনির টাসমানীর কাউণ্টেস মাটিল্‌ডা বড় প্রাণবন্ত।

কেন্দ্রস্থলের সমাধি-স্মৃতির সন্নিকটে সন্ত পায়েত্রোর এক ব্রোঞ্জ মূর্ত্তি আছে। ভক্তেরা চুম্বন ক'রে প্রায় চরণটিকে ক্ষয় করেছে, সাধুকে পঙ্গু করেছে। সকল চিত্র ও মূর্ত্তির পরিচয় দেওয়া এ প্রবন্ধে সম্ভব নয়। বহু পোপ ও সেণ্ট প্রভৃতির মূর্ত্তি এবং বাইবেলের বহু ঘটনাকে ষোলো শতক হ'তে আধুনিক সময় অবধি সজীব ক'রে রেখেছে চিত্র-শিল্পী ও ভাস্কর এই ধর্ম্মভবনের অভ্যন্তরে।

আমরা যখন রোমে ছিলাম, দেশ বেশ গরম। আমাদের প্রথম চৈত্রের মত উত্তাপ। অবশ্য আমরা হাতকাটা সার্ট ও হাল্কা প্যাণ্ট পরতাম। বহু নারী—দেশের নয় ভ্রমণকারিণী—স্বল্পাদপি স্বল্প পাজামা এবং সার্ট ভূষিতা। একটি বিজ্ঞপ্তিতে বলা হ'য়েছিল যে গির্জ্জায় প্রবেশ করবার সময় সংযত পোষাক পরা কর্ত্তব্য। তাই মেয়েরা দু'একজন বাইরের প্রাঙ্গনে ভ্রাম্যমানের পরিচ্ছদে ঘুরলেও, গির্জ্জার মধ্যে হাঁটু ঢাকা গাউন ব্যবহার করত। ল্যাটিন দেশের ক্যাথলিক মেয়েরা

প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তির সাথে ক্যাথিড্রলে প্রবেশ করে, পবিত্র জলে দেহে ক্রশ আঁকে এবং নতজানু হয়।

এস্থলে ইতালীয় স্থাপত্যের কথা বলা প্রয়োজন। য়ুরোপের সভ্যতা একদিন রোমকে আদর্শ করেছিল সর্ব্ব বিষয়ে। রোমের বলবীর্য্য সাম্রাজ্য-লালসা, রক্ত-পিপাসা নিজস্ব। কিন্তু সে তার নগ্ন ক্ষাত্রবৃত্তিকে সদাই সৌন্দর্য্যে আবরিত করতে চাইত। গ্রীক সুন্দরের উপাসক ছিল। হিন্দুর মত সুন্দরের ভিতর দিয়ে অন্তরের শাশ্বত শিব সুন্দরকে পটে আঁকতে বা পাথরে কুঁদতে তার বাসনা ছিল না। সে বিশ্বের প্রকাশকেই সুন্দর ভাবতো। তাই সবল মাংশপেশী, সুশ্রী নারীর অঙ্গ, বেগবান পশুর গতি তার শিল্প-রাজ্যের দরবারে শ্রদ্ধালাভ করত। রোম গ্রীসের সৌন্দর্য্যের আদর্শ নিলে, কিন্তু তার সকল কার্য্য, বিশাল ব্যাপ্তির প্রয়াস তার সে প্রবৃত্তিকে খর্ব্ব করলে না। তাই রোমের পথ, ঘাট, ইমারত ও সাম্রাজ্য সবই ছিল প্রকাণ্ড।

গ্রীক প্রথায় রোমক নিজেদের অট্টালিকায় ডোরিক, আয়োনিক এবং করিন্থীয় থাম দিত, বড় গোল খিলান নির্ম্মাণ করত দ্বার, ত্রিভুজ তোরণ শিরে শোভিত করত। পঞ্চম শতাব্দীতে উত্তর য়ুরোপ হতে বর্ব্বর জাতিরা এসে রোমক সভ্যতার উপর নিজেদের ছাপ দিল। তাদের গড়া সৌধের গঠনপ্রকারের নাম গথিক। আমাদের ক'লকাতার হাইকোর্ট ঐ প্রণালীতে নির্ম্মিত। কোনা খিলান, অনেকগুলো ছোট ছোট থামকে একত্র ক'রে একটা মোটা থাম, দরজা স্তম্ভগুচ্ছের অন্তরালে। আমাদের দেশের পূজার দালানের এমন গড়ন বহুল পরিমাণে দেখা যায়। আমার পূর্ব্বে ধারণা ছিল যে, বাঙলা বাঁশের জন্মভূমি; অনেকগুলো বাঁশকে গোছা করে বাঁধলে যেমন দেখতে হয়, এ থামগুলা তার অনুরূপ। কিন্তু কি জানি আজকাল মনে কেন সন্দেহ হয় যে, বুঝিবা এ ধরণটা আমদানী। তাতে লজ্জা পাবার কিছু নাই, বরং অন্যায় স্থিতিশীলতার কলঙ্ক হ'তে আমরা মুক্ত হতে পারি।

তারপর যখন মধ্য-যুগে রেনাসাঁ বা জাগরণের যুগ এলো, য়ুরোপ রোমের আদর্শে ফিরে গেল সৌধ-গঠনের আয়োজনে। আবার এলো গোল খিলান, যবন স্তম্ভ। রোমের দেড় হাজার বছর পূর্ব্বের তৈরি কলিজিয়ম প্যানথিয়ন ও বাস্তা বা ভেষ্টা মন্দির তখনও বিদ্যমান। ষোলো শতকে প্রসিদ্ধ চিত্রকর, ভাস্কর, গৃহ-নির্ম্মাতা ও শিল্প-সম্রাট মাইকেল এঞ্জেলো বললেন—আমি প্যানথিয়নকে আকাশে তুলে সন্ত পায়েত্রোর চূড়া গড়ব। সেই অবধি ঐ রকম পীপার উপর গম্বুজ-মাথা সৌধাংশ বড় বড় গির্জ্জার উপর উঠল। লণ্ডনের সেণ্ট পলের গম্বুজ ঐ প্রথায় গঠিত। আমাদের বড় ডাকঘরের উন্নতশিরও ঐ প্রণালীর নিদর্শন।

বসিলিক প্রাচীন রোমের বিচারগৃহের নাম। লম্বা বাড়ি, শেষের দিকে গোল, কম পরিসরের চাতাল। তার উপর বিচারকের আসন থাকত। একে বলে আপসে। সকল গির্জ্জার গঠন প্রাচীন পেগান রোমের স্থাপত্য-বিদ্যাকে আঁকড়ে আছে।

একদিন একটি সুন্দরী এক শিশুকে সঙ্গে নিয়ে প্রার্থনা-গৃহে নানা দ্রষ্টব্য পদার্থ দেখাচ্ছিলেন। চেহারা আমাদের দেশের শ্বেতাভ এংলো ইণ্ডিয়ানের মত। ছেলেটির বাদামী চোখ। আমাকে ইংরাজীতে জিজ্ঞাসা করলেন,

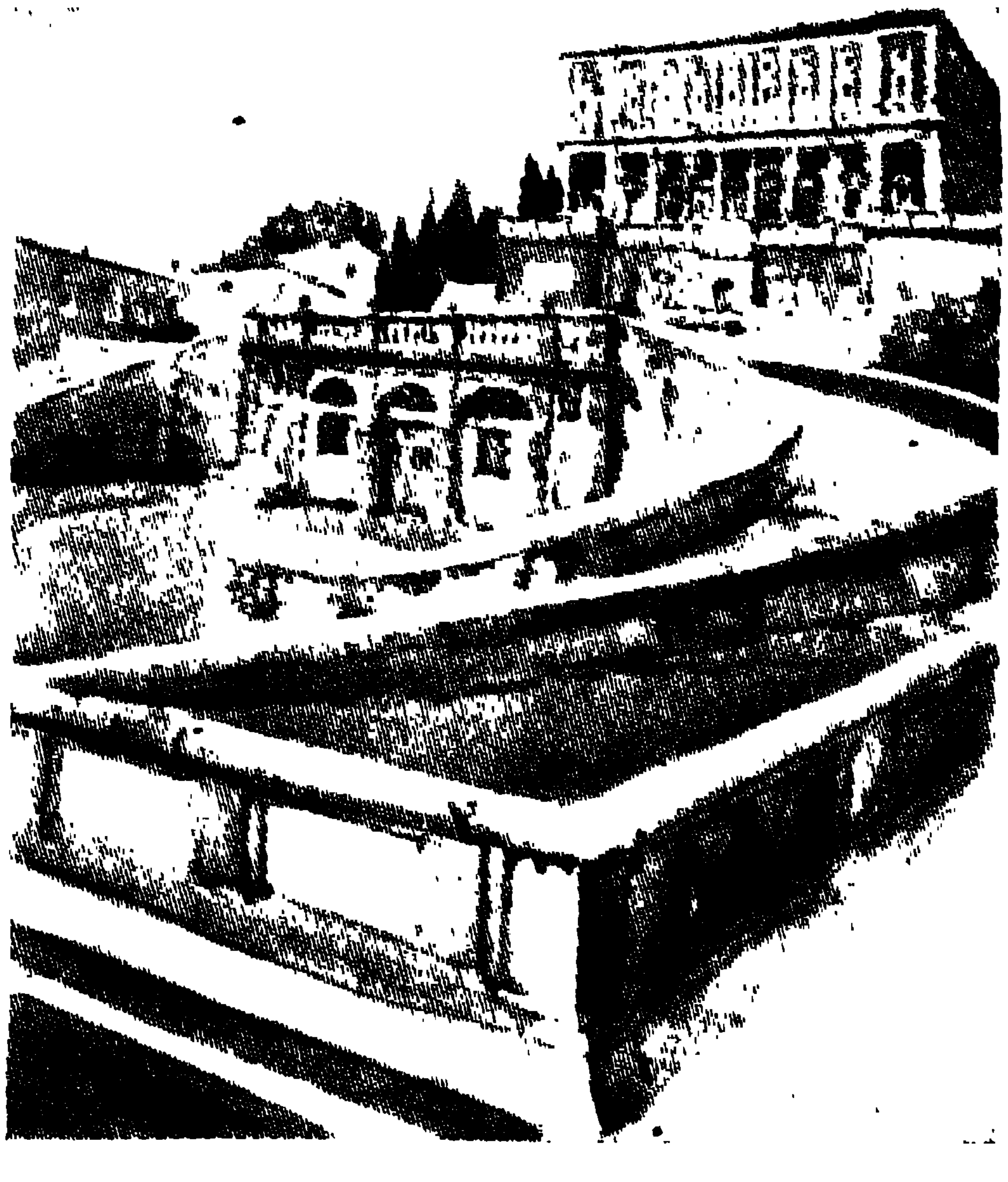

ভারতের নয়—ইতালীর প্রাসাদ

পর্ত্তুগীজ কন্‌ফেসনল কোনটা? নিজের পর্ত্তুগীজ পরিচয় দিলেন।

তিনি পূর্ব্বে বাস করতেন পিকিঙে। কিন্তু চীনা বিপ্লবের হাঙ্গামায় টাকাকড়ি নিয়ে সপরিবারে লিসবনে এসে গৃহস্থালী করছেন। অবশ্য কম্যুনিষ্ট সম্বন্ধে তাঁর বিরাগ প্রচুর।

তিনি কি এমন অন্যায় করেছেন যার জন্য এই প্রকাণ্ড গির্জ্জায় দোষ স্বীকার আবশ্যক?

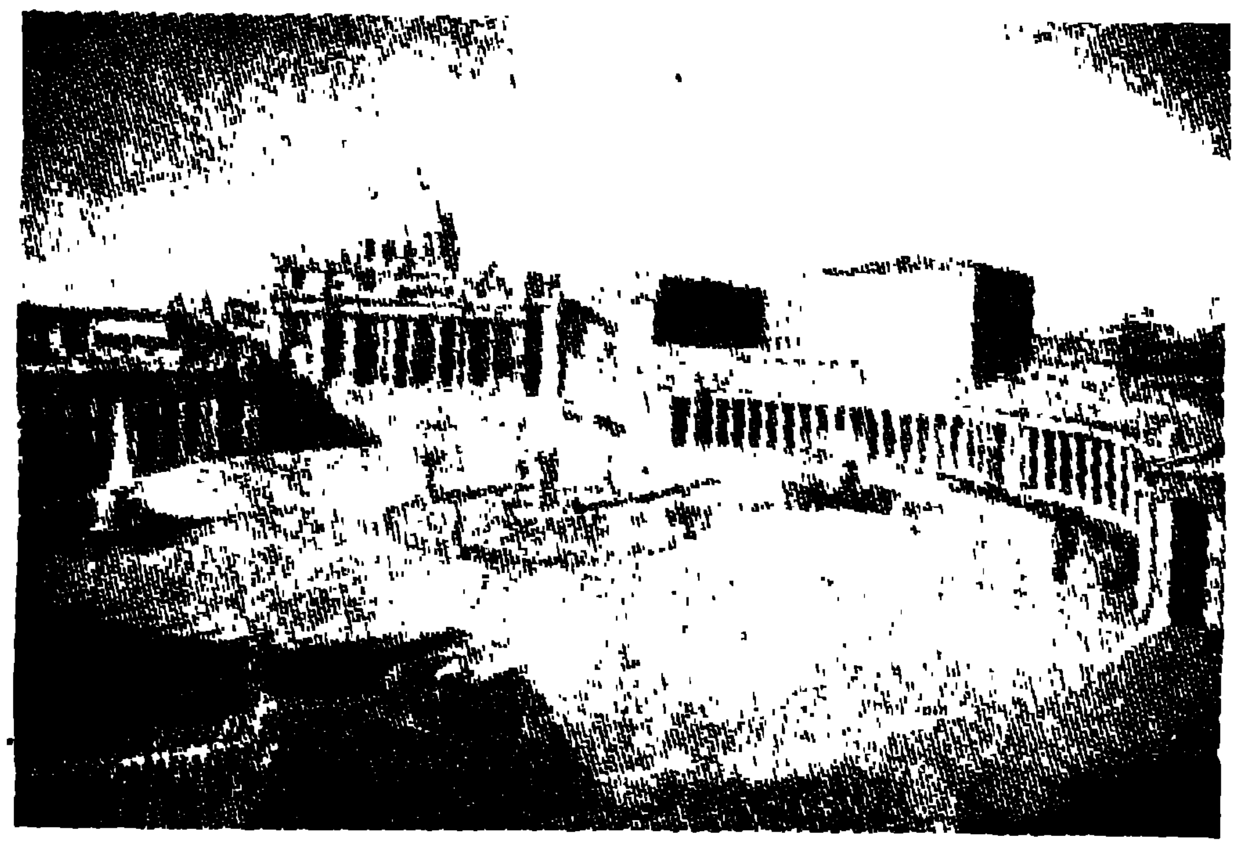

সেণ্ট্ পিটার্স

ভদ্রমহিলা হেসে বোঝালেন। রোমে তীর্থ করতে এসেছেন। সেণ্ট পিটারের অভ্যন্তরে দোষ স্বীকার চরম প্রায়শ্চিত্ত। তিনি কাল অনুতাপ করবেন। আজ পুত্রের পালা।

ছেলেটি ছ বছরের। জিজ্ঞাসা করলাম—কি করছে?

তার মা হেসে বল্লেন—কাল একটা কুকুরকে ইঁট মেরেছিল। অবশ্য লাগেনি।

মহিলার পাপের কথা জিজ্ঞাসা করবার সাহস হ'ল না। তবু বিদ্রূপ করে বললাম—আর আপনার বুঝি ঐ মহিলাটির মত পোষাক পরবার সখ হয়েছে?

এবার তাঁর হাসির বেগ হল পর্য্যাপ্ত। তিনি বললেন, আপনি মনের কথা বলতে পারেন। ও মহিলার নয়, ঐটির।

যাঁকে দেখালেন তিনি সুন্দরী ও বিমোহন সাজে সজ্জিতা।

মোট কথা যাঁরা হিন্দুকে কুসংস্কার ব্যাধিগ্রস্ত বলেন, তাঁদের উচিত রোমান ক্যাথলিক গির্জ্জায় প্রবেশ ক'রে কার্য্যাবলী দেখা। প্রবেশদ্বারের সন্নিকটে থাকে পবিত্র জল। ক্যাথলিক গির্জ্জায় প্রবেশ করে সেই জলে বুকে ও কপালে ক্রশ আঁকে। অনেক কুলঙ্গী চাতাল ও খাটাল থাকে গির্জ্জায়। তাদের মধ্যে বিরাজ করেন এক একটি সন্তের মূর্ত্তি বা তাঁদের প্রতীক। ধুপ ধুনা বাতি এবং প্রচুর ফুল দিয়ে বেদী সাজানো হয়। নরনারী প্রত্যেকের নিজ নিজ প্রিয় কুল-সন্তের বেদী পাদমূলে প্রার্থনা করে। ফরাসী ও ইতালীর দেশে ক্যাথলিক গির্জ্জায় আমি সকল সময় দেখেছি মানুষ, বিশেষ, মহিলা, প্রার্থনায় রত। আমাদের দেশে ব্যাণ্ডেল গির্জ্জায় গেলেও সে দৃশ্য দেখা যায়। এমন কি জার্ম্মানীতেও পল্লীপথে মাঝে মাঝে ক্রশে যীশুমূর্ত্তি দেখতে পাওয়া যায়—ল্যাটিন জাতীয়দের দেশের তো কথাই নাই। লোকে দোকান খোলার পূর্ব্বে বা কর্ম্মস্থলে যাবার পথে একবার গির্জ্জায় প্রবেশ করে নিজের আরাধ্য সন্তের আশীর্ব্বাদ ভিক্ষার জন্য। ফ্রান্স ইতালীর লোক অসভ্য হেয় নয়। তারা পূর্ব্বপুরুষের ধর্ম্মকে আঁকড়ে রেখেছে। ভারত রাখেনি এ কথা বলা চলে না। তবে চক্ষু-লজ্জার ভয়ে নবীন ভারত দেবদেবীর মন্দিরে প্রকাশ্যভাবে পূজা বন্দনায় আত্মনিয়োগ করে না। বারোয়ারী পূজা হয়—কিন্তু তার অন্তরালে যে সব কাণ্ড থাকে তার বিশ্লেষণ এ প্রবন্ধে অবান্তর।

রোমের প্রাচীন ধর্ম্ম খৃষ্টধর্ম্মের সঙ্গে তিন চারশত বৎসর দ্বন্দ্ব করেছিল। প্রথমটা তার ফলে খৃষ্টবিশ্বাসী ভীষণ উৎপীড়ন সহ্য করেছিল। তারপর সমাধির পাতাল সুরঙ্গে গোপনে উপাসনা করত। সেখানেও দৌরাত্ম পৌঁছত। সে ক্যাটাকোম্ব আজও বিদ্যমান। মাটির তলায় ভীষণ গহ্বর, তাতে থাক—সেইগুলিতে শব রক্ষিত হত। মাঝে অন্ধকার পথ। বহুদূর বিস্তৃত সুরঙ্গ। আজ তার মধ্যে কোনও মৃতের কঙ্কাল নাই। পাদরীরা দলে দলে যাত্রীদের নিয়ে মশালের আলোকে সেই বিভীষিকা দেখায়। আমি শিশুদের উপরে রেখে পুত্র ও পুত্রবধূকে নিয়ে অন্য যাত্রীর সঙ্গে সেই সমাধি গহ্বরে ঘুরেছিলাম।

একদিকে জানবার ও দেখবার বাসনা, অন্যদিকে অন্তরের পালাই-পালাই ধ্বনি। কিন্তু এ তো বাস্তবের লীলাভূমি—ইতিহাসের এক নির্ম্মম অধ্যায়ের কর্ম্মভূমি। এ ক্যাটাকুম্বকে স্বীকার না করলে মানব-সভ্যতার ইতিহাস রচিত হবে কেমন করে?

খৃষ্টধর্ম্ম যখন ধীরে ধীরে আত্ম-প্রতিষ্ঠা করছিল, রোমের সম্রাট কন্‌ষ্টানষ্টাইন ৩১২ খৃষ্টাব্দে রোম সাম্রাজ্যর এক অংশ দখল করেছিলেন। তারপর কন্‌ষ্টান্টিনোপল প্রতিষ্ঠা করে রোম সাম্রাজ্যের প্রাচ্যাংশের বৈজনসিয়ম নাম দেন। তাঁর পক্ষে খৃষ্টধর্ম্মকে উপেক্ষা করা হয়েছিল অসম্ভব। কাজেই খৃষ্টধর্ম্ম হ'ল পাশ্চাত্য রোমক সাম্রাজ্যের স্বীকৃত ধর্ম্ম।

প্রাচীন দেব দেবী পূজা কি ছাড়তে পারে মানুষ? অথচ রোমক দেশভক্ত। দেশের কল্যাণ ও শান্তির জন্য সে ধর্ম্ম পরিবর্ত্তন করতে অস্বীকার করলে না।

কিন্তু জাতির অন্তরাত্মা চাচ্ছিল প্রাচীন ও নবীনের সমন্বয় ও ঐক্য। তাই প্রায় একশত বৎসরের ফলে খৃষ্টধর্ম্ম ও পেগান ধর্ম্ম [illegible] হয়ে যে আনুষ্ঠানিক ধর্ম্ম গড়ে উঠেছিল—তারই বিরুদ্ধে প্রোটেষ্টাণ্ট বিদ্রোহ। মার্টিন লুথারের সংশোধন ও সংস্কারের ফলে খৃষ্টীয় য়ুরোপ নির্য্যাতন ও গৃহ-বিবাদের লীলাভূমি হ'য়েছিল। এ সব ঐতিহাসিক কাহিনী আজ ছাত্র মাত্রেরই বিদিত। কিন্তু ক্যাথলিক গির্জ্জায় সাধুসন্তের পূজা এবং পূজার অনুষ্ঠানের মধ্যে যে পেগান-মতকে শান্ত করবার প্রচেষ্টার প্রমাণ বিদ্যমান—একথা সহজে মনে পড়ে না—পূজা পার্ব্বণ না দেখলে। একটি মন্দিরের বর্ণনা এবং আলোচনা হতে এ কথা বোঝা যাবে। সেটি প্যানথিয়ন।

একটা কথা বলি। আমি মোটেই আনুষ্ঠানিক ক্যাথলিক ধর্ম্মের নিন্দা করছি না। বরং যা বলছি তা থেকে তার উদারতার পরিচয় পাওয়া যাবে। বিশ্বাস স্তরে স্তরে উচ্চ ভক্তি ও একপ্রাণতায় পর্য্যবসিত হয়। মানুষের চাই পূজা ও অজানা সৃষ্টি শক্তির কাছে নত মাথা। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বলেছেন—

যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ
তেঽপিমামেব কৌন্তেয় যজন্ত্য বিধিপূর্ব্বকম।

হে কৌন্তেয়, অন্য দেবতাদের ভক্তেরা শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে যখন পূজা করে, তারা না জেনে আমাকেই পূজা করে। প্রাচীন বা আধুনিক কোনো সম্প্রদায় আর্য্য হিন্দুর এ উদারতা গ্রহণ করতে পারেনি। কিন্তু প্রত্যেক আর্য্য জাতিই সব যুগে সমন্বয়ের চেষ্টা করেছে। হিন্দু নাগ-দেবতার মত বহু দেবতার নাম পরিবর্ত্তন করে তাদের নিজের দেব শ্রেণীর মাঝে স্বীকার করেছে।

বলছি প্যানথিয়নের কথা। ল্যাটিন ভাষায় প্যানথিয়ন

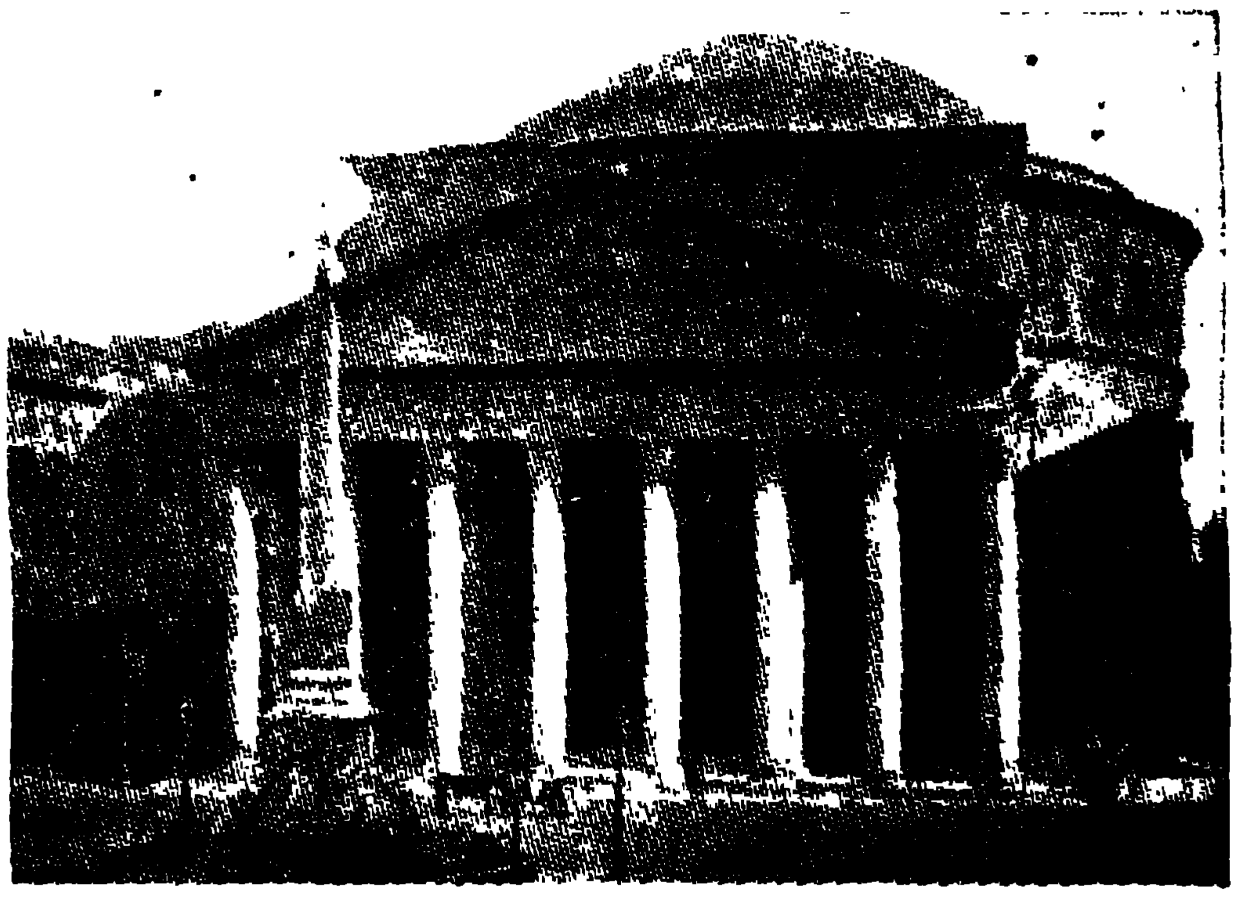

প্যান্‌থিয়ন

মানে—সর্ব্ব দেবতা। রোমের প্যানথিয়ন এক প্রসিদ্ধ প্রাচীন ধর্ম্মভবন। প্রথমে খৃষ্টপূর্ব্ব ৬৭ খৃষ্টাব্দে এখানে যে সর্ব্বদেবতার মন্দির নির্ম্মিত হয়েছিল, তারই স্থলে ২০২ খৃঃ অব্দে সম্রাট হাড্রিয়ান এই সুদৃশ্য পাথরের মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেন। তখনই এই মন্দিরের সাতটি কুলঙ্গীতে সপ্তগ্রহের মূর্ত্তি ছিল। বড় বেদী বোধ হয় রোমের প্রধান দেবতার পূজার জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল। কেউ বলেন—তথায় সূর্য্যের মূর্ত্তি ছিল। মোট কথা মন্দির ছিল পেগান দেবতাদের। কিন্তু রোম যখন খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করলে, তখন এ মন্দিরকে অকস্মাৎ নিরাকার চৈতন্য স্বরূপ ঈশ্বরের উপাসনা-গৃহ বা গির্জ্জায় পরিণত করা হল না, কারণ রোমক নাগরিকের চিত্ত হতে এ মন্দিরের জাঁকজমক, পূজা ও দেবতার সাথে মানুষের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ মুছে ফেলা সম্ভবপর হয় নি। সেই ভজনার ঘরে পাথরের সুদৃশ্য থাম ঘেরা আটটি চাতালে আটটি সেণ্টের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হ'ল। তাদের পূজায় মানুষ মনের দেবতার সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপনের

আনন্দ পেলে এবং ধর্ম্মভবনও য় ধর্ম্মে দীক্ষিত হ'ল। ধর্ম্মস্থান অধিকার ক'রে নিজের ধর্ম্ম-ভবনে পরিণত করেছে বিজয়ীর প্রতাপে ইসলাম বহুক্ষেত্রে। কন্সটান্টি-নোপলের প্রসিদ্ধ মসজিদ পূর্ব্বে ছিল খৃষ্টীয়ের গির্জ্জা। বিদেশী এমন কাজ করে জোরে। কিন্তু দেশের ধর্ম্ম পরিবর্ত্তনের সঙ্গে যখন ধর্ম্ম-ভবনের উদ্দেশ্য বদলাতে হয়, তখন স্বদেশবাসীর মনস্তুষ্টির ব্যবস্থার প্রয়োজন জন্মে।

দর্শকের পক্ষে প্যানথিয়নের রূপ অপরূপ। সমস্ত ভবনটি গোল। তার সামনের প্রবেশ দালান ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দালানের মত বড় বড় থামের উপর তিন কোনা (আরকিট্রেভ) তোরণ শির। বলাবাহুল্য, এ স্থাপত্য গ্রীক দেশের। পরে রোম ও অন্যান্য সভ্য দেশে তার বিস্তার। ষোলটি পাথরের কোরিন্থীয় স্তম্ভের উপর এই শির-স্থাপত্য। ঠিক তার পশ্চাতে সম্পূর্ণ গোল অট্টালিকা। এর খ্যাতি জগতব্যাপী। আমার কিন্তু চক্রাকার অট্টালিকার সামনের এই থামে ঘেরা ১১ ফুট লম্বা ৪৪ ফুট চওড়া আয়ত ক্ষেত্র আর তার ওপর ত্রিকোণ গাঁথনী অসঙ্গত মনে হ'য়েছিল। বৃত্তাকার অট্টালিকা অতি-সুদৃশ্য। নিচু হতে প্রাচীর যত উচ্চ—প্রাচীরের উপর হতে গোল গম্বুজের শিরটি তত উঁচু। আর একেবারে উপরে গোল ছিদ্র—আয়তনে তার ব্যাস পাঁচ ফুট। তার ভিতর দিয়ে সূর্য্যের আলোক এসে মন্দিরটিকে সমুজ্জ্বল করে। আর বোধ হয় সেই ফাঁক দিয়ে সূর্য্য-দর্শনও তীর্থ-দর্শনের অঙ্গ ছিল। মন্দিরের ভিতরে শান্ত ভাব, ভানুর কিরণ, সন্তদের মূর্ত্তি মনোরম। মাত্র একটি দ্বার, গবাক্ষ নাই।

এখন ওর মধ্যে ইটালীর রাজাদের সমাধি হয়। পূর্ব্বেও কতকগুলি বিশিষ্ট কর্ম্মী ও শিল্পীর শেষ বিশ্রাম-স্থল এই প্রাচীন মন্দিরে। প্রসিদ্ধ শিল্পী র‍্যাফেলের কবর আছে হেথায়। তাঁর স্মৃতি-ফলকে লিখিত আছে—এখানে শায়িত র‍্যাফেল। তাঁর জীবদ্দশায় প্রকৃতি তাঁর দ্বারা পরাজিত হবার ভয়ে ত্রস্ত ছিল। এখন তাঁর মৃত্যুর সাথে প্রকৃতিরও মৃত্যু হবে, এই তার ভীতি।

এ গদ্য কবিতা রচনা করেছিলেন কার্ডিনাল বেম্বো। র‍্যাফেলের জীবিতকাল ১৪৮৩ হতে ১৫২০ খৃঃ অব্দ।

মিশরের লম্বা পাথরের স্তম্ভ তখনকার দিনে বিজয়ী য়ুরোপের বড় প্রিয় ছিল। প্যানিথনের সম্মুখে তেমনি একটি উচ্চ ফলক আছে। মসানপায়েত্রোর প্রাঙ্গনের তেমন ফলকের কথা বলেছি। উত্তর যুগে ফরাসী এবং ইংরাজও তেমন পাথরের স্তম্ভ এনে নিজেদের সহর সাজিয়েছে। লণ্ডনের ক্লিওপেট্রার সূচ ঐ শ্রেণীর এক পাষাণ স্তম্ভ।

আর একটা কথা এস্থলে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। ইতালীর বহু অট্টালিকার সঙ্গে আমাদের দেশের বাড়ির সাদৃশ্য অত্যধিক। প্রচীন রোমের স্থাপত্য ক্রমে যেরূপ রেনাসা প্রভৃতি যুগে নিয়েছিল, তার নিদর্শন মাত্র ইতালীতে নয়, ভারতেও বহুল মাত্রায় পাওয়া যায়। কে কার নকল করেছে, সে দুরূহ প্রত্নতত্ত্বের গোলক ধাঁধায় প্রবেশ করব না। এ প্রবন্ধে কয়েকখানি চিত্র দিয়ে তার চাক্ষুষ প্রমাণ দিলাম মাত্র।

নবগঙ্গা

রণজিৎ কুমার সেন

আঠাশ

অঞ্জনা অনেকক্ষণ থেকেই মনে মনে জ্বলছিলেন। মিণ্টু আর জিতু স্কুল থেকে ফিরে এসে রুটি খাবে, অথচ আটাটুকুও মেখে রাখেনি ছন্দা। এদিকে উনুনের আগুণ নিভন্তপ্রায়। উনুনই কি রাবনের চিতার মতো সারাদিন জ্বলবে? এদিকে সারা মাসের হিসেব কষতে গেলে চোখ কপালে ওঠে। সংসারে একটা মেয়ের পিছনেই কি খরচটা কম? এই বাজারেও কম ক'রে ত্রিশ টাকা। অথচ নির্ব্বিবাদে সব ব্যবস্থা ক'রতে হ'চ্ছে তাঁকে; তাতেও অবশ্য দুঃখ ছিল না, কাজকর্ম্মের জন্য দেখে-শুনে কাউকে এনে সংসারে বহাল ক'রলেও এর চাইতে কম খরচা নয় তার পিছনে, কিন্তু আজকাল কাজে যেন প্রায়ই ঔদাসীন্য লক্ষ্যে পড়ে ছন্দার। অঞ্জনার পক্ষে তা বরদাস্ত করা কঠিন।

ছন্দা এসে ঘরের দাওয়ায় পা দিতেই অমনি মারমুখো হ'য়ে উঠলেন তিনি।—'দিব্বি তো পাড়া বেড়িয়ে দিন কাটছে, এদিকে যে উনুনের আঁচ ব'সে থাকে না, সে খেয়াল আছে কি! হতচ্ছারী পোড়ারমুখীকে এত ব'লে ব'লেও যদি পারি! বলি এরপর মিণ্টু আর জিতু এসে কি আথার ছাই চিবিয়ে খাবে?'

—'ছাই কেন খেতে যাবে, রুটিই খাবে তারা।' ব'লে এক মুহূর্ত্তও আর বিলম্ব না ক'রে দ্রুত পায়ে নিজের কাজে গিয়ে যোগ দিল ছন্দা।

অঞ্জনা কিন্তু দম্‌লেন না। পরোক্ষে ছন্দার উদ্দেশ্যে নানারকম উক্তি ক'রে বাড়ীটাকে মাথায় ক'রে নিলেন তিনি। বাইরের ঘরে ব'সে রসিকলালের কানে গিয়ে সবটুকুই তার বিঁধলো, ইচ্ছে হ'লো—ঘর ছেড়ে সামনের নদী-তীর দিয়ে খানিক্ষণ পায়চারি ক'রে আসেন তিনি; কিন্তু অক্ষম, বাতের কঠিন আক্রমণে আজ তিনি একেবারেই পঙ্গু হ'য়ে প'ড়েছেন। নইলে ইচ্ছে হয় না অঞ্জনার এই চীৎকারের মুহূর্ত্তগুলিতে ঘরে ব'সে থাকেন। আপিসে প্রাকটিশ আজকাল একেবারেই বন্ধ হ'য়েছে, বন্ধ না হ'য়ে উপায় কি? আপিসে গিয়ে হাকিমের সাম্‌নে দাঁড়াতে পারলে তবে তো পয়সা! পুরনো মক্কেল আর জুনিয়ার উকীল কেউ কেউ বাড়ী ব'য়ে এসে বুদ্ধি-পরামর্শ ক'রে যায় ব'লে দু'চার পয়সা যা ঘরে আসে। নইলে সে পথও বন্ধ। মনের এই অর্থনৈতিক চাপের মধ্যে স্ত্রীর এই অশোভন রূঢ়তা পুড়িয়ে মারছে তাঁকে প্রতি মুহূর্ত্তে। সব দিক থেকে একটা দারুণ অস্থিরতায় আজ বিষিয়ে উঠেছেন তিনি নিজের মধ্যে।

মনে মনে একবার অদৃষ্ট-দেবতাকে স্মরণ ক'রলেন রসিকলাল, তারপর আপন মনেই একসময় নিমিলিত চক্ষে রামপ্রসাদী একটা সুর ভাঁজতে লাগলেন কণ্ঠে—'আসার আসা ভবে আসা—।'

অঞ্জনা ততক্ষণে পিছনের খিরকি দুয়ার দিয়ে কোথায় অন্তর্দ্ধান হ'য়েছেন। এ সব মুহূর্ত্তে খুব বেশী দূর যান না তিনি। কাছাকাছিই কোনো বাড়ীর গৃহিণীর কাছে ব'সে এ-কথায় সে-কথায় নিজের অদৃষ্টকে খাড়া ক'রে সহানুভূতি আদায়ের অবকাশ খোঁজেন। আজও তাই ক'রলেন।

কিন্তু যাকে নিয়ে সংসারে তাঁর এত জ্বালা, সে কিন্তু আজ আর অঞ্জনার এত-কিছুতেও নিজের কর্ত্তব্য থেকে বিরত থাকৃতে পারলো না। বিজুদা আজ কঠিন অসুখে শয্যাগত, মাসীমা নির্ম্মলাও সেই সঙ্গে শয্যা নিয়েছেন, আজ আর তাঁদের মুখে এক ফোঁটা জল দিতে পর্য্যন্ত কেউ নেই; চোখের সাম্‌নে এ দৃশ্য দেখে কোন্ প্রাণে দূরে স'রে থাকৃবে ছন্দা? তার এই তাপদগ্ধ জীবনে আশা-আনন্দের একমাত্র আধার যে তাঁরাই! তাঁদের মুখ চেয়েই তো তার এই প্রতিদিনের দুঃখ-স্বীকৃতি, নইলে মাগুরার এই নবগঙ্গা-বিধৌত মাটিতে তার জন্য একবিন্দু স্নেহও কি কোথাও অবশিষ্ট আছে? কাকাবাবু আজ সংসারে থেকেও নেই, তাঁর স্নেহ-ছায়ায় গিয়ে এক দণ্ডের জন্যও বস্‌বার অবকাশ পেলো না সে কোনোদিন। কি নিয়ে কোন্ আশায় তবে মাগুরার প্রেমে সে অন্ধ হ'য়ে রইল? সে ঐ বিজুদা আর মাসীমা নির্ম্মলা। তাঁদের জন্য প্রাণ দিতেও তার আনন্দ।

গৃহের যাবতীয় কাজকর্ম্ম চুকিয়ে আবার এসে এক-সময় ব'স্‌লো সে নির্ম্মলার শিয়রে। মুখের উপর থেকে তখনও তার কালো ছায়াটুকু মিলিয়ে যায় নি। সেটুকু লক্ষ্য ক'রে শিথিল কণ্ঠে একসময় নির্ম্মলা জিজ্ঞেস্ ক'রলেন, 'আবার কিছু-একটা নিয়ে অঞ্জনা নিশ্চয়ই গলা তুলেছে, তাই না মা? কি হ'য়েছে খুলে বল্ দিকি!'

সহানুভূতির ছোঁয়া পেয়ে চোখ ফেটে এবারে জল এলো ছন্দার। অতি কষ্টে সেটুকু সম্বরণ ক'রে নিয়ে সে ব'ল্‌লো, 'এমন অদৃষ্ট ক'রেই এসেছিলাম মাসীমা যে, আপনার আর বিজুদার এই অসুখের সময়েও সর্ব্বক্ষণের জন্যে আপনাদের কাছে থেকে উপযুক্ত শুশ্রূষা ক'রতে পারছি না। সংসারে মানুষ কবে মানুষকে তার ন্যায্য মর্য্যাদা দিয়ে কথা ব'ল্‌তে শিখ্‌বে, ব'ল্‌তে পারেন মাসীমা?'

অনুমান মিথ্যে নয় নির্ম্মলার। ব'ল্‌লেন, 'ওটা যে আমারও প্রশ্ন মা। এ প্রশ্নের হয়ত সত্যিই জবাব নেই।' তারপর থেমে ব'ল্‌লেন, 'আমাদের জন্যে তুই যা ক'রছিস্, তার কি সত্যিই তুলনা আছে মা? সারাক্ষণ কাছে না থাকলেই কি শুশ্রূষা হ'লো না! এ যে আমি পাবার চাইতেও অধিক পেয়েছি সংসারের দিক থেকে দুঃখ করিস নে ছন্দা; অন্যায়ের শাস্তি ভগবান তাঁর নিজের হাতে দেন, অঞ্জনাকেও একদিন সে শাস্তি ভোগ ক'রতে হবে।'

বোধকরি প্রসঙ্গটা চেপে যাবার জন্যই এবারে নতুন কথার অবতারণা ক'রলো ছন্দা। বাইরে আকাশটা সকাল থেকেই মেঘাচ্ছন্ন হ'য়ে ছিল, সাম্‌নের দরজার দিকে ঝুঁকে সেদিকে একবার লক্ষ্য ক'রে সে ব'ল্‌লো, 'এখনই বোধকরি চেপে বৃষ্টি আসবে মাসীমা। যাই, বিজুদাকে একবার দেখে তাড়াতাড়ি কাজ সেরে পালাই। নইলে ওদিকে হয়ত আবার শ্মশান জ্ব'ল্‌বে।'

বাধা দিলেন না নির্ম্মলা। ব'ল্‌লেন, 'তাই যা মা।'

বিজন জেগেই ছিল। কাছে এসে ছন্দা জিজ্ঞেস্ ক'রলো, 'অনেকটা সুস্থবোধ ক'রছো তো বিজুদা?'

—'পুরোপুরিই তো সুস্থ হ'য়ে উঠেছি।' থেমে বিজন ব'ল্‌লো, 'এমন কল্যাণময়ীর সেবার হাত যেখানে প্রসারিত, সেখানে রোগ ব'লে কিছু থাকৃতে পারে? তুই না থাকলে আমার কি হ'তো, আমি শুধু সেই কথাটাই ভাবচি।'

—'অম্‌নি ক'রে বোলোনা বিজুদা। তোমার সুস্থ হ'য়ে উঠবার পিছনে আমার যে কাণাকড়িও কিছু নেই, সে কি আমিই জানিনে! পারলুম কোথায় আকাঙ্ক্ষা মিটিয়ে প্রাণ ভ'রে সেবা ক'রতে, ভগবান সে সুযোগ আমাকে দেন নি। আজ আর সংসারে আমার দুঃখ ঢেকে রাখ্‌বার জায়গা নেই বিজুদা।' ব'ল্‌তে গিয়ে চোখ দু'টো সহসা ছল্ ছল্ ক'রে উঠ্‌লো ছন্দার। মুখ ফিরিয়ে বাইরের দিকে লক্ষ্য ক'রতে গিয়ে সে দেখলো—একটু আগে যা আশঙ্কা ক'রেছিল, তা-ই হ'লো। ভাদ্রের আকাশ ভেঙে ধারা নেমে এলো সহসা। একটা দুরন্ত ভয়ে বুকখানি একবার দুর-দুর ক'রে কেঁপে উঠলো তার। দুয়ারে হয়ত অপেক্ষা ক'রে থাকবেন কাকিমা। রুদ্র ভয়াল সেই চোখের দৃষ্টি। দুর্ব্বাসার চাইতেও তা তীক্ষ্ণ—জ্বলন্ত।

বিজন ব'ল্‌লো, 'সংসার মানেই দুঃখের ক্ষেত্র। দুঃখের অনলে পুড়ে পুড়েই সুখের স্বপ্ন দেখে যেতে হবে।' নিজের অলক্ষ্যেই ছন্দার একখানি হাত নিজের রোগশীর্ণ

হাতের মুঠোয় টেনে নিয়ে পুনরায় বিজন ব'ল্‌লো, 'যা একদিন অতি স্বাভাবিক ভাবেই হ'তে পারতো, ভাগ্য সেখানে কি নিষ্ঠুর খেলাই না খেল্‌লো! মনে পড়ে সেই দিনটির কথা ছন্দা, মাগুরার এই মাটি ছেড়ে যাবার আগে যেদিন তুই আমাকে চিঠি লিখ্‌লি দৌলতপুরে। সমুদ্রে ঝড় বইলে প্রচণ্ড ঢেউ যেমন আছাড় খেয়ে পড়ে, আমার মনটাও সেদিন ঠিক তেম্‌নিই হ'য়েছিল। আজ তা ঠিক খুলে ব'ল্‌তে পারবো না। তুই যে আমার, চিরকালের আমার, এ কথা কি একটি মুহূর্ত্তের জন্যেও ভুল্‌তে পারলাম!'

ছন্দা এবারে কেন যেন আরও অনেকখানি চঞ্চল হ'য়ে উঠলো। বিজনের হাত থেকে নিজের হাতখানিকে মুক্ত ক'রে নিয়ে ব'ল্‌লো, 'ছিঃ, ছিঃ, ওকথা মুখে এনো না বিজুদা। ওতে আমার স্বামীর আত্মার অকল্যাণ হবে, ভগবান অভিশাপ দেবেন।'

—'সে অভিশাপ তোর হ'য়ে আমিই মাথা পেতে গ্রহণ ক'রবো। শ্যামলকান্তির আত্মার কল্যাণ—সে কি আমিই কম কামনা ক'রছি দিনরাত?' কেমন একটা বিহ্বল দৃষ্টিতে চোখ দুটোকে তুলে ধ'রলো বিজন ছন্দার চোখের দিকে।

বাইরে তখনও অবিশ্রাম বর্ষণ চ'লেছে। সত্যিই বড় বিশ্রীভাবে আটকে প'ড়তে হ'লো ছন্দাকে। কথাটাকে চাপা দেবার জন্যই এবারে সে ব'ল্‌লো, 'শুনেছি রেবারা ক'ল্‌কাতায় আছে। তুমি যে এতকাল ক'ল্‌কাতায় কাটিয়ে এলে, দেখা হয়নি রেবার সঙ্গে?'

সমস্তটা চেতনার মধ্য দিয়ে কেমন একটা অধীর চাঞ্চল্য খেলে গেল এবারে বিজনের। ব'ল্‌লো, 'যা ভুলে গিয়েছিলাম, অন্ততঃ যা ভুলে থাক্‌তে চেয়েছিলাম, তাকেই তুই খুঁচিয়ে তুল্‌লি ছন্দা? ভুল ক'রে একদিন তার ভালোবাসা পেতে গিয়েছিলাম; সে ভুলের প্রায়শ্চিত্ত আমার হ'য়েছে। ব্যারিষ্টার দিলীপ দত্তের সে প্রাণ-লক্ষ্মী। এতদিনে তাদের বিয়ে হ'য়ে যাওয়া উচিৎ।'

ছন্দা কিন্তু বিজনের কথায় এতটুকুও কিছু মনে ক'রলো না। এ কথা জেনেই এমন অকপটে বিজন ব'ল্‌তে পারলো তাকে কথাটা। উত্তরে ছন্দা শুধু ব'ল্‌লো, 'চিরায়ুষ্মতী হোক্ রেবা।' তারপর থেমে ব'ল্‌লো, 'মেঘে মেঘে তো কম বেলা হ'লো না! তোমারও কিন্তু এতদিনে দেখে শুনে কাউকে ঘরে আনা উচিৎ ছিল। মাসীমার আজ কত কষ্ট হ'চ্ছে, বলো তো? তাঁরই কি কিছু-একটা সাধ আহ্লাদ নেই? এবারে সুস্থ হ'য়ে উঠে ঘরে বউ আনো তুমি বিজুদা, দেখে আমিও চোখ জুড়োই।'

—'ঘরে না এলেও মনে যে তার প্রতিষ্ঠা হ'য়ে গেছে অনেক আগেই।' ভাব-বিহ্বল কণ্ঠে বিজন ব'ল্‌লো, 'ঘরের এই ছোট কোঠায় যার স্থান হ'লো না, মনের মণি-কোঠায় সে যে রাজেন্দ্রাণী হ'য়ে আছে! আমার মনের মধ্যে একবার তাকিয়ে দেখ, দেখ—সত্যিই চোখ জুড়োয় কি না!'

কথাটার অর্থ বুঝতে বেগ পেতে হ'লো না ছন্দাকে। দেখ্‌তে দেখ্‌তে মুখখানি তার অস্বাভাবিক লাল হ'য়ে উঠ্‌লো। এতক্ষণ যত সহজভাবে সে ব'সে থাক্‌তে পেরেছিল, এবারে তার পক্ষে তা কঠিন হ'য়ে উঠ্‌লো। বৃষ্টির বেগ ঈষৎ ক'মে এসেছিল মাত্র। সেদিকে আর-একবার লক্ষ্য ক'রে শুধু সে ব'ল্‌লো, 'উঠি বিজুদা, বেশী দেরী ক'রলে বাসায় গিয়ে আর রক্ষা থাক্‌বে না।' বিন্দুমাত্র আর অপেক্ষা না ক'রে বৃষ্টির মধ্যেই বেরিয়ে প'ড়লো ছন্দা।

বাধা দিতে গেল বিজন, কিন্তু টিক্‌লো না; উঠোন পেরিয়ে ততক্ষণে দৃষ্টির আড়ালে চ'লে গেছে ছন্দা।

এম্‌নি ক'রে আরও দু'টো দিন কেটে গেল। অসুখ নিয়ে যা ভয় ছিল বিজনের, এবারে তা থেকে সে মুক্ত হ'য়ে বাঁচলো। নিমপাতা আর কাঁচা হলুদ-বাটা সাবানের মতো ক'রে সারা গায়ে মেখে সাধ মিটিয়ে স্নান ক'রলো সে। এতদিন এই স্নানটুকুর অভাবে কেমন বিশ্রী লাগ্‌ছিল তার। স্নানে যে কী আনন্দ, আজ তা নতুন ক'রে সে উপলব্ধি ক'রলো। তাই ব'লে শরীরের অবসন্নতা কিন্তু হঠাৎই কাট্‌লো না। অন্নপথ্য সে দু'দিন আগেই ক'রেছিল, সেদিকে ত্রুটি রাখেনি ছন্দা, কিন্তু ত্রুট থেকে গেল স্নায়ুতন্ত্রীতে। আজ আর আগেকার

মতো তেমন স্বাচ্ছন্দ্য নেই দেহে। অথচ একটি বেলাও আজ আর ঘরে বন্দী হ'য়ে থাকতে মন চাচ্ছে না। অসংখ্য কাজ ছড়িয়ে র'য়েছে তার বাইরে, কে তার সেই কাজের ভার নিয়ে দাঁড়াবে? ব'ল্‌তে গেলে সমস্তটা গ্রামই আজ রুখে দাঁড়িয়েছে তার বিরুদ্ধে; সন্ধ্যার তাম্রকুটে টিকি-বিলাসীরা গ্রামের ঐতিহ্য নিয়ে বড়-বেশী মেতে উঠেছে, তাদের ক্ষমতা সম্পর্কে চোখে আঙ্গুল দিয়ে কিছু একটা বুঝিয়ে দেওয়া দরকার। সমাজ শুধু এক-জনকে নিয়ে নয়, সকলকে নিয়েই সমাজ। গ্রামের টিকি-বিলাসীদের সেটুকু বুঝিয়ে দেওয়া প্রয়োজন বৈ কি!

কেমন একটা বিশ্রী অস্বস্তিতে সমস্ত মনটা হঠাৎ বড় তিক্ত হ'য়ে উঠ্‌লো বিজনের।

এ ক'দিনে কতকটা শুধ্‌রে উঠেছিলেন নির্ম্মলা। মাথা খাড়া ক'রে কিছু সময়ের জন্যও অন্ততঃ ব'স্‌তে পারলেন। একসময় কাছে ডেকে নিয়ে দু'বাহু দিয়ে ছেলেকে জড়িয়ে ধ'রে ভাবাবেগে অনেকক্ষণ তন্ময় হ'য়ে ব'সে রইলেন তিনি। মায়ের প্রাণ, প্রবোধ মানেনি এতদিন। ব'ল্‌লেন, 'ইস্‌, এ ক'দিনেই শরীর শুকিয়ে তোর কী হ'য়ে গেছে বাবা! নিজের শরীরটা নিয়ে এ ক'দিনের মধ্যে একটি ক্ষণের জন্যেও যদি গিয়ে ব'স্‌তে পারলাম তোর পাশে!' বিজনের পিঠের উপর দিয়ে ধীরে ধীরে স্নেহের হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন নির্ম্মলা।

বিজন ব'ল্‌লো, 'আমিই কি ছাই পেরেছি একদণ্ডের জন্যেও তোমার শিয়রে এসে ব'স্‌তে! মন তাতে প্রবোধ মানেনি মা। নাও, বেশীক্ষণ ব'সে না থেকে এবারে শুয়ে পড়ো দিকি! এরপর আবার মাথা ঘুরোতে সুরু ক'রবে।'

আপত্তি ক'রলেন না নির্ম্মলা। ঈষৎ কাৎ হ'য়ে শুয়ে প'ড়ে ব'ল্‌লেন, 'তুই যেন তাড়াতাড়িই আবার উঠে যাস্‌নে বাবা। কিছুক্ষণ আমার কাছে ব'স্‌ বিজু।'

এ ক'দিন ছন্দা এসে যথানিয়মেই কর্ত্তব্য পালন ক'রে গেছে, কিন্তু বোধ করি ইচ্ছে ক'রেই বিজনের সান্নিধ্য থেকে দূরে দূরে কাটিয়েছে সে। তাতে যে শান্তি পেয়েছে, তা নয়; কিন্তু মুখোমুখি ব'সে তার চোখের দিকে চোখ দু'টো তুলে ধ'রতে যেতেও যে কম অশান্তি নয়! ইচ্ছে ক'রেই তাই স্বাস্থ্য সম্পর্কে নির্ম্মলার সঙ্গে দু'একটা কথা ব'লে নিজের প্রয়োজনীয় কাজগুলো সেরে নীরবে আবার ঘরে ফিরে গেছে ছন্দা। কিন্তু এম্‌নি ক'রেও সে বড়-বেশীদিন পারলো না। পরের দিনই আবার এসে সে সহজভাবেই বিজনের সাম্‌নে দাঁড়ালো। জিজ্ঞেস্‌ ক'রলো, 'আজ কেমন বোধ ক'রছো, বিজুদা? দুর্ব্বলতা ক'মেছে একটুও?'

—কিছুটা।' থেমে বিজন ব'ল্‌লো, 'দিন কতক তো কেবল গা ঢাকা দিয়েই রইলি, এ ক'দিন তো কই এম্‌নি ক'রে জিজ্ঞেস্‌ করিস্‌ নি?'

ছন্দা বুঝলো—অভিমান ক'রেছে বিজুদা। নীরবে তাই কাছে এগিয়ে এসে তেম্‌নি সহজভাবেই তার শিয়রের পাশে ব'সে প'ড়লো সে। ব'ল্‌লো, 'তোমার মতো মানুষের সঙ্গে কারুকে আবার কথা ব'ল্‌তে আছে, বড্ড অসভ্য তুমি।'

কথাটা ছন্দার মনের কথা নয়। তবু মুখে এসে গেল।

বিজন বুঝ্‌লো—নিজেকে খুলে ধ'রবার বিপদ কোথায়! ব'ল্‌লো, 'এতদিনে তবে এই কথাটাই বড় হ'লো?'

—'অম্‌নি রাগ ক'রলে তো?' অনুরাগের কণ্ঠেই কথাটা ব'ল্‌লো ছন্দা।

বিজন ব'ল্‌লো, 'তোর উপর কখনও রাগ ক'রতে পারি?'

—'কেন, আমি কি যে, রাগ ক'রতে পারো না?'

—'তুই যা ঠিক তা-ই।'

অলক্ষ্যে মৃদু একটুকরো হাসি গোপন ক'রে নিল ছন্দা, কিন্তু এই নিয়ে দ্বিতীয়বার আর কিছু একটাও প্রশ্ন তুলতে পারলো না।

থেমে বিজন ব'ল্‌লো, 'এ ক'দিন যে অমানুষিক পরিশ্রম করলি তুই, তা ভাবলে বিস্মিত হ'তে হয়। কবে শিখ্‌লি তুই এত, বল্‌ তো?'

—'কাজ কখনও শিখ্‌তে হয় না মেয়েদের, এটা তাদের সহজাত বৃত্তি।' ছন্দা ব'ল্‌লো, 'কিন্তু সত্যিই

কি পরিশ্রম ক'রতে পেরেছি বিজুদা, পারলে বোধ করি শান্তি পেতাম।'

স্মিতহাস্যে বিজন ব'ল্‌লো, 'তেমন শান্তি হয়ত সত্যিই তোর কপালে লেখা নেই! তা যাক্, এ ক'দিন তো রোগের সঙ্গেই যুদ্ধ ক'রে কাট্‌লো, এবারে আর ব'সে থাক্‌তে পারছি না। ভেবেছি কালই বেরোবো

—'কোথায়, লাঙল ধ'রতে?' ঠাট্টার সুরে কতকটা কৌতুক প্রকাশ পেলো ছন্দার কণ্ঠে।

বিজন ব'ল্‌লো, 'প্রয়োজন হ'লে তাও ধ'রতে হবে বৈ কি! লাঙল যার জমি তার, জানিস তো? দেশের জমিকে যদি উর্ব্বর ক'রে তোলাই না গেল, তবে বাঁচ্‌বে কেমন ক'রে দেশের লোক? তাছাড়া পাঠশালাটাও বন্ধ হ'তে ব'সেছে। ছোট ছোট ঐ শিশুরা একদিন মানুষ হ'য়ে দেশকে রক্ষা ক'রবে প্রাণ দিয়ে। দেশে সত্যিকারের কৃষক-রাজের প্রতিষ্ঠা সেদিন। ভাবতেও কি ভালো লাগে না ছন্দা?'

সহসা এ কথার কিছু একটা জবাব দিতে পারলো না ছন্দা। পরে একসময় ব'ল্‌লো, 'আমি ভাবচি, দেশের সকলে কেন তোমার মতো হয় না বিজুদা?'

—'হবে, সবাই দেশের জন্যে একদিন প্রাণ দিয়ে কাজ ক'রবে। দেশের মানুষের সেই শুভবুদ্ধি একদিন জাগ্‌তেই হবে, নইলে তারাও যে বাঁচ্‌বে না। দেশের মানুষ যে এখনো দেশকে কাছে পায়নি! গ্রহণ লেগে যেমন সূর্য্য ঢাকা প'ড়ে যায়, আমাদেরও হ'য়েছে তা-ই।' ব'লে একটা বড় রকমের নিঃশ্বাস চেপে নিল নিজের মধ্যে বিজন।

থেমে ছন্দা ব'ল্‌লো, 'কিন্তু কালই যে তুমি বেরোতে পারো না বিজুদা! শরীর এখনও ভালো ক'রে শোধরায় নি তোমার; এই শরীর নিয়ে কাজে বেরোলে আবার তুমি অসুখে প'ড়বে।' বিজনের চুলের ভিতর দিয়ে নরম হাতে ধীরে ধীরে আঙুল বুলিয়ে দিতে লাগলো ছন্দা।

ইতিমধ্যে কখন্ সাম্‌নের দাওয়ায় এসে সুখদা ঠাকরুণ দাঁড়িয়েছে, তা কারুরই নজরে পড়েনি। ছন্দার ঘরের দিকটা প্রথম দৃষ্টিতেই তার লক্ষ্যে প'ড়েছিল, কিন্তু গা ঢাকা দিয়ে নির্ম্মলার ঘরের সামনের দিকে এগিয়ে এসে এবারে সে ডাক্‌লো, 'কৈ গো বাড়ুজ্জে-বৌ, খবর কি তোমাদের, বিজু কেমন আছে?'

নিজের শয্যা থেকেই ঈষৎ মাথা তুলে নির্ম্মলা ব'ল্‌লেন, 'বিজু যাহোক্ তবু কিছুটা সুস্থ হ'য়ে উঠ্‌তে পেরেছে, গাঁয়ের পাঁচজনের আর ভয় নেই ওকে নিয়ে; কিন্তু আমার আজ আর এমন শক্তি নেই যে মাথা তুলে বেশীক্ষণ ব'স্‌তে পারি।'

—'কেন গো, তোমার আবার কি হ'লো? উৎকণ্ঠার দৃষ্টিতে খানিকটা আত্মীয়তার ভাব টান্‌তে চেষ্টা ক'রলো সুখদা।

কাতরকণ্ঠে নির্ম্মলা ব'ল্‌লেন, 'বিধাতার বোধ করি ইচ্ছে নয় যে, আমি আর বেশীদিন সংসারে থাকি। মাথার রোগটা এবারে বড় বেশী বেড়েছে। উঠে এসে যে পিঁড়িখানাও এগিয়ে দেবো, এমন সাধ্য নেই।'

—'না, না, সে কি কথা, পিঁড়ি কেন এগিয়ে দিতে হবে! আমার কি ব'স্‌বার সময় আছে—না ম'রবার সময় আছে! এক্ষুণি না গেলে আবার ওদিকে সব রসাতলে যাবে। সংসার তো করি না, নরকের পিণ্ডি চট্‌কাই।' থেমে সুখদা ব'ল্‌লো, 'মাথার রোগ তো ভালো নয়, আমার ভাসুরপোকে এই নিয়ে একবার রাঁচি পর্য্যন্ত দৌড়োতে হ'য়েছিল; তুমি বরং শরীরের দিকে একটু বেশী যত্ন নিয়েই তাড়াতাড়ি সুস্থ হ'য়ে উঠতে চেষ্টা করো।'

—'আর সুস্থ হ'য়েছি,—এখন তাড়াতাড়ি চোখ বুজে যেতে পারলে বাঁচি।' ব'লে আবার বালিশের উপর মাথা রাখলেন নির্ম্মলা।

সুখদা ব'ল্‌লো, 'ছিঃ, ছিঃ, ও কি কথা, ও কথা মুখেও আন্‌তে নেই বাড়ুজ্জে-বৌ। সংসারে কার কতদিন পের্‌যাই, সে কি কিছু বলা যায়! তাড়াতাড়িই তুমি সুস্থ হ'য়ে উঠ্‌বে, এই আমি আশীর্ব্বাদ ক'রে যাচ্ছি।' ঘরের চৌকাঠের সাম্‌নে দাঁড়িয়ে আশীর্ব্বাদের ভঙ্গীতে দক্ষিণ হাতখানিকে একবার সাম্‌নের দিকে প্রসারিত ক'রলো সুখদা, তারপর বিদায় নিয়ে তক্ষুণি আবার দাওয়া থেকে নেমে উঠোনের একদিকে অদৃশ্য হ'য়ে গেল।

অনেকক্ষণ থেকেই কেমন একটা দারুণ অস্বস্তি বোধ ক'রছিলেন নির্ম্মলা, সেটা যে সুখদা ঠাক্রুণের এই আকস্মিক উপস্থিতির জন্যই—তাতে সন্দেহ নেই, এবারে সেই অস্বস্তি অনুশোচনার জ্বালা হ'য়ে কেবলই তাঁকে বিদ্ধ ক'রতে লাগ্‌লো।

ছন্দার কথার জবাবে কি একটা ব'ল্‌তে গিয়ে হঠাৎ কথা হারিয়ে ফেলেছিল বিজন। সুখদার প্রতি দৃষ্টি না গেলেও তার কণ্ঠস্বরকে অনায়াসে সে চিনে নিতে পেরেছিল। পেরেছিল ব'লেই মনে মনে সে ক্রুদ্ধ হ'য়ে উঠ্‌ছিল সুখদা ঠাক্রুণের উপর। ছন্দার কথার জবাবে তাই সে কিছু একটাও ব'লে উঠতে পারছিল না; বরং সেও নির্ম্মলার মতই কেমন একটা দারুণ অস্বস্তিতে নিজের মধ্যে অনবরতই দুঃসহ একটা জ্বালা বোধ ক'রছিল।

ছন্দা কিন্তু সেটুকু আদৌ বুঝ্‌তে পারলো না। স্বাভাবিক কণ্ঠেই সে ব'ল্‌লো, 'পাপ বিদেয় হ'লো যা হোক্। এবারে উঠি বিজুদা। বলো, আমার কথা রাখলে? পুরোপুরি সুস্থ না হওয়া অবধি তুমি কিছুতেই ঘর ছেড়ে বেরোতে পারবে না। তা ছাড়া মাসীমার এই অবস্থা, কখন্ কোন্‌টুকু প্রয়োজন হয়, সেটুকুও তো দেখ্‌তে হবে?'

বিজন এ কথার কিছু একটাও জবাব দিতে পারলো না, শুধু ছন্দার মুখের দিকে কিছুক্ষণের জন্য অপলক নেত্রে তাকিয়ে থেকে চোখ নামিয়ে নিল মাত্র।

নীরবে তার পাশ থেকে একসময় উঠে প'ড়ে বাড়ীর পথে পা বাড়ালো ছন্দা।···

নির্ম্মলার উঠোন পেরিয়ে পথে নেমে আস্‌তে গিয়ে সুখদা ঠাক্রুণের কিন্তু পিত্ত জ্ব'লে যাচ্ছিল। ছিঃ, ছিঃ, ছিঃ, পরের ঘরের সোমত্ত বিধবা মেয়েটা কিনা নির্ব্বিবাদে এসে আইবুড়ো ছোঁড়াটার অসুখের সুযোগ নিয়ে তার সাথে রঙ্গ-পীড়িত ক'রছে! ঘেন্নায় গা জ্ব'লে যায় দেখলে। ঘরে এসে হরি মুখুজ্জের কানে কথাটা না তুলে পারলো না সে।

হরি মুখুজ্জে ব'ল্‌লেন, 'বলো কি পিসি? শুধু চাষি-মজুরই নয়, শেষ পর্য্যন্ত রসিকের বিধবা ভাইঝিটিকে অবধি হাত ক'রেছে বিজু? ছোটবেলায় ওরা একসঙ্গে খেল্‌তো কি না, গায়ে বসন্ত লেগে মনে আজ তাই বাল্যপ্রেম হঠাৎ উথ্‌লে উঠেছে। গাঁয়ে বাস ক'রে শেষ পর্য্যন্ত ভাঁহা একটা কেলেঙ্কারী দেখ্‌তে হবে আমাদের।'

খুসীতে খানিকটা উচ্ছল হ'য়ে উঠলো এবারে সুখদা। —'তা—যা ব'লেছ। কিন্তু ব্যাপারটা কি চেপে যাওয়া ভালো?'

—'কিছুমাত্র না। রসিকের স্ত্রীকে সাবধান ক'রে দেওয়া দরকার—ঘরের মেয়েকে যদি তারা সাম্‌লাতে না পারে তো গ্রামে তাদের একঘরে হ'য়ে থাক্‌তে হবে।'

কথাবার্ত্তায় আগাগোড়াই চট্‌পটে হরি মুখুজ্জে। কিছু একটা সিদ্ধান্ত প্রকাশ ক'রতে তাই তাঁর বেগ পেতে হ'লো না।

সুখদাও এম্‌নি একটা জবাবই প্রত্যাশা ক'রেছিল। মনে মনে এবারে তাই আশ্বস্ত হ'লো সে।

সন্ধ্যায় চক্রবর্ত্তী-বাচস্পতিদের হুঁকোর আসরটা এই নিয়ে গরম হ'য়ে উঠলো।

—'তুমি তো তবে জব্বর মজার খবর পরিবেশন ক'রলে হে মুখুজ্জে!'

—'মজা ব'ল্‌তে মজা, একেবারে রসালো ব্যাপার।' ব'লে খানিকটা অর্থপূর্ণ হাসি হাস্‌লেন হরি মুখুজ্জে।

—'খাও খাও, তুমি বরং দু'ছিলিম বেশী তামুকই আজ টানো; রসালো সংবাদে কিছু রসের জোগান চাই তো বটেই!' ব'লে হাতের হুঁকোটা সাম্‌নের দিকে এগিয়ে ধ'রলো ভবানী চক্রবর্ত্তী।

নির্ব্বিবাদে সেটাকে নিজের হাতে টেনে নিয়ে আচ্ছা ক'রে একটা দম ক'ষলেন হরি মুখুজ্জে। সাজা তামাকে টান দিতেই ধোঁয়ার আধিক্য ঘ'ট্‌লো। সামান্য একটা ফুৎকারেই তা বায়ুমণ্ডলকে আচ্ছন্ন ক'রে ফেল্‌লো। সেইদিকে তাকিয়ে একটা আরামের নিঃশ্বাস ফেল্‌লেন হরি মুখুজ্জে: 'আঃ—!'

বিষয়টা সেদিনের মতো এখানেই সমাপ্ত হ'লো।

কিন্তু সুখদা ঠাক্রুণের তাই ব'লে উদ্যমের ত্রুটি ছিল না। সে ইতিমধ্যেই বার দুয়েক গিয়ে রসিকলালের

বহির্দ্বার দিয়ে ঘুরে এসেছে, কিন্তু অঞ্জনার দেখা মেলেনি। দু'দণ্ড তার সঙ্গে নির্জ্জনে না ব'সতে পারলে বিষয়টা ভালো ক'রে তার কানে তোলা যাবে না।

পরের দিন সমস্ত বেলাটাই হরি মুখুজ্জে তাকে আটকে রাখলেন। নবগঙ্গার উত্তাল স্রোতে নদীর দক্ষিণ পাড়ের একটা দিক একেবারেই ধ্বংসে প'ড়েছে। নবগঙ্গা আরও কিছুটা এগিয়ে এলে হরি মুখুজ্জের ভয়ের কারণ আছে। তাঁর মোকুরশি জমি নিয়ে তবে টান দেবে নবগঙ্গা। এই নিয়ে উৎকণ্ঠায় উদ্বেগে সারাদিন ঘর আর বার ক'রলেন হরি মুখুজ্জে। ঘরের পহুরিদার একমাত্র তাঁর পিসী, অতএব সুখদা ঠাকরুণকে একরকম বাধ্য হ'য়েই উৎকণ্ঠিত থাকতে হ'লো তার ভাইপোটিকে নিয়ে।

কিন্তু নবগঙ্গা যদি সত্যিই হরি মুখুজ্জের দিকে করাল মুখব্যাদন করে, তবে মাগুরার দুর্দ্ধর্ষ পুরুষসিংহ হ'য়েও হরি মুখুজ্জের সাধ্য কি নবগঙ্গার সেই রুদ্র গ্রাস থেকে পরিত্রাণ পাবার?

সন্ধ্যায় আজ তাঁর হুঁকোর আসরটা তাই একেবারেই বরবাদ হ'য়ে গেল। উপযাচক হ'য়ে বরং ভবানী চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি এসে তাঁকে খানিকটা আশ্বস্ত ক'রে গেল। রাত্রে নির্ব্বিঘ্ন নিদ্রার ব্যাঘাত ঘ'টলেও ভোরে উঠে তাই সমস্ত ব্যাপারটাকে একরকম অদৃষ্টের উপর ছেড়ে দিয়েই খানিকটা নিশ্চিন্ত হ'তে চাইলেন হরি মুখুজ্জে।

সুখদা ঠাকরুণও হাঁপ ছেড়ে বাঁচলো। একটা দিনের গৃহবন্ধ জীবনে ক্ষতির পরিমাণটা তার নিতান্ত সামান্য নয়। রসিকলালের বাড়ী অবধি গিয়ে তাকে আর খাওয়া ক'রতে হ'লো না, মাঝপথেই একসময় অঞ্জনার সঙ্গে তার দেখা হ'য়ে গেল। ব'ল্লো, 'তোমার কাছেই যাচ্ছিলাম সবির মা।'

সবিতার পরিচয়েই অঞ্জনাকে সবি'র মা ব'লে ডাকে সুখদা।

ঈষৎ ঠোঁট বেঁকিয়ে অঞ্জনা ব'ল্লেন, 'তবু ভাগ্যি যে অভাগীকে মনে প'ড়লো

—'মনে কি পড়ে না, নইলে যাচ্ছিলাম কি ক'রে!' থেমে আসল বক্তব্যের সূত্র টেনে সুখদা ব'ল্লো, 'তবে কি জানো সবির মা, নিজের চোখের উপর তোমাদের আইবুড়ি বিধবা মেয়েটার নষ্টামি ফষ্টামি দেখে তোমার ওখানে যেতে বড় বেশী আর মন সরে না।' ব'লে মনে মনে খানিকটা আত্মতৃপ্তির হাসি হাস্‌লো সুখদা, কিন্তু মুখে তার ফুটে উঠ্‌লো কেমন একটা অস্বস্তির চিহ্ন।

কথাটা শুনেই ব্রহ্মতালুতে আগুন জ্ব'লে উঠ্‌লো অঞ্জনার। ব'ল্লেন, 'কেন, কি ব্যাপার, খুলেই বলোনা কেন শুনি?'

—'ব'ল্‌বো কি, ব'ল্‌তে যে নিজেই লজ্জায় ম'রে যাই।' সুখদা ব'ল্লো, 'বলি—রঙ্গরস করবি, করার তো আর বয়স যায়নি, বুঝি, কিন্তু তাও কি গাঁয়ে থেকে ভর দুপুরে ঐ বিজু ছোঁড়াটার সঙ্গে? তাও তো গায়ে বসন্তের গুটি! বলি ভয় ডর ব'লেও কি কিছু নেই? একেই তো সারা গাঁ তটস্থ হ'য়ে র'য়েছে, এরপর ধরো ছন্দার আঁচল ধ'রে মা শীতলার অধম বাহন যদি একবার তোমার সংসারে ঢুকে পড়ে, তবে কি হবে বলো দিকি?'

কিন্তু অঞ্জনার মুখে তখন আর কোনো প্রশ্নই নেই। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রাগে নিজের মধ্যে নিজে জ্ব'ল্‌ছেন তিনি।

স্বল্প থেমে পুনরায় গলা তুল্‌লো সুখদা ঠাকরুণ: 'ভাবলাম অনেক কাল বাড়ুজ্জে-বউয়ের খোঁজখবর রাখিনি, দেখে আসি কেমন আছে! গিয়ে দেখি—শুয়ে শুয়ে কাত্‌রাচ্ছে বাড়ুজ্জে-বউ, পাশের ঘরে শুয়ে-ব'সে রঙ্গ-তামাসা ক'রছে বিজু আর ছন্দা। এই নিয়ে গাঁয়ের পাঁচজনে যদি পাঁচ কথা বলে, তবে অপমানটা তো তোমারই! বুঝেছ সবির মা, দেখে নিজেই ঘেন্নায় ম'রে গেলাম। এখনও ও মেয়েকে তোমার সাম্‌লাও বল্‌ছি। নইলে কবে দেখবে—তোমার সংসারের মুখে চুন-কালি দিয়ে একদিন ভেগে প'ড়েছে মেয়ে।'

চুন-কালি কি এখনই কম প'ড়লো অঞ্জনার মুখে? রাগে সারা মুখ তখন তাঁর লাল হ'য়ে উঠেছে। সুখদাকে যে নতুন কিছু একটাও প্রশ্ন ক'রবেন, এমন কোনো কথাও আপাতত খুঁজে পেলেন না তিনি। তবু কণ্ঠস্বরের উপর যথাশক্তি জোর দিয়েই সুখদার কথার পৃষ্ঠে একবার প্রশ্ন

তুল্‌লেন অঞ্জনা : 'তুমি দেখেছ, নিজের চোখে তবে তুমি স্পষ্ট দেখেছ, দিদি-ঠাক্‌রুণ ?'

—'ও মা, তবে কি ব'ল্‌ছি !' মুখের একটা বিচিত্র ভঙ্গী ক'রে চোখ কপালে তুল্‌লো সুখদা। ব'ল্‌লো, 'আমার কি খেয়ে না খেয়ে কাজ নেই, মিথ্যে বানিয়ে ব'ল্‌ছি এসে তোমাকে ? মেয়েরও তোমার জিদের বলিহারী, আমাকে দেখেও ন'ড়লে না তবু বিজুর কাছ থেকে !'

আর কথা বা সাক্ষী-প্রমাণের প্রয়োজন নেই অঞ্জনার। মনে মনে তবে এই নিয়েই গাঁয়ে ফিরে এসে কেবল বাইরে বাইরে ঘুর-ঘুর মন হ'য়েছে ছন্দার! অঞ্জনার চোখে কোনো কিছুই এড়ায় না। তিনি ঠিকই ধ'রতে পেরেছিলেন, কিন্তু এতখানি বুঝতে পারেন নি। সুখদার কথায় এবারে তা পরিষ্কার হ'য়ে গেল। নিজেকে এবারে আর তাই কিছুতেই সম্বরণ ক'রতে পারছিলেন না অঞ্জনা। মাথার উপরে প্রখর সূর্য্য না থাক্‌লেও সূর্য্য-শিখার মতই ব্রহ্মতালু তাঁর তেতে পুড়ে যাচ্ছে। কি মনে ক'রে আকাশের দিকে একবার তাকাতে গিয়ে দেখলেন—পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘে ভাদ্রের আকাশ ঢাকা প'ড়ে গেছে। বিন্দুমাত্র আর অপেক্ষা ক'রলেন না অঞ্জনা, ব'ল্‌লেন, 'কথাটা ব'লে তুমি ভালো ক'রলে দিদি-ঠাক্‌রুণ।' তারপর সোজা বাড়ীর দিকেই দ্রুত পা চালিয়ে দিলেন তিনি।

এতক্ষণে তবে সুখদা ঠাক্‌রুণের মাথার বোঝা কিছু নাম্‌লো। অনেকক্ষণ ধ'রে সে একাগ্র চোখে অঞ্জনার চলা-পথের দিকে তাকিয়ে থেকে নিজের মধ্যে একবার স্বস্তির নিশ্বাস চেপে নিল, তারপর নিজেও আর বড়বেশী অপেক্ষা না ক'রে একসময় বাড়ীর পথ ধ'রলো সুখদা ঠাক্‌রুণ।

বেলা ব'সে ছিল না। ঘড়ির কাঁটা তখন অনেক দূর এগিয়ে গেছে। রসিকলালের স্নানের জন্য তাঁর বৈঠকখানা ঘরের সাম্‌নে বাল্‌তিতে ক'রে গরম আর ঠাণ্ডা জল দু'ভাগে ভাগ ক'রে রাখা হ'য়েছে। উঠতে ব'স্‌তে কষ্ট হয় ব'লে স্নানে আজকাল সময় লাগে রসিকলালের। জল রেখে ছন্দা তাই যথাসময়েই উঠবার জন্য তাড়া দিয়ে গেছে কাকাবাবুকে। উঠবারই উদ্যোগ ক'র্‌ছিলেন রসিকলাল।

ইতিমধ্যে তাঁর মুখোমুখী এসে দাঁড়ালেন অঞ্জনা। এসেই ফেটে প'ড়লেন তিনি : 'বাতে শয্যা নিয়ে এদিকে তো কানের মাথা খেয়ে ব'সে আছ, বলি—পাড়ায় পাড়ায় তোমার সংসার নিয়ে আজ যে ঢি ঢি প'ড়ে গেছে, একবারও কি কান পর্য্যন্ত এসে পৌঁছেচে ?'

অঞ্জনার এ মূর্ত্তি নতুন নয় রসিকলালের কাছে। তাই বিচলিত না হ'য়ে স্বাভাবিক কণ্ঠেই জিজ্ঞেস ক'রলেন : 'কেন, মিন্টু আর জিতু গিয়ে কোথাও কিছু ক'রে এসেছে নাকি যে, ঢি ঢি প'ড়ে গেছে ?'

—'হ্যাঁ, মিন্টু আর জিতুই তো ক'রবে, ওরা যে তোমার সাতজন্মের শত্রু !' গলার ঝাঁঝ না ক'মে এবারে বরং আরও কিছু বাড়লো অঞ্জনার। ব'ল্‌লেন, 'সোহাগের পাত্রীটি তোমার ভেজা বিড়াল কিনা, মাছটি পর্য্যন্ত উল্টে খেতে জানেন না ; ওদিকে তো বাড়ুজ্জেদের বিজুর সঙ্গে পীরিতে ঢল ঢল। লোকেরই বা দোষ কি, তারা তো আর অন্ধ বা কানা নয়, যা তারা দেখে—তাই এসে বলে।'

স্ত্রীর মুখের পানে চোখের দৃষ্টি একবার নিবদ্ধ ক'রতে গিয়ে নিজের মধ্যেই কেমন জ্বালা বোধ ক'রলেন রসিকলাল। ছন্দার মতো মেয়ে এতদিনে বিজুর মতো চরিত্রবান ছেলের অসুখের মধ্যে তার সঙ্গে গিয়ে প্রণয়-সম্বন্ধ পাতিয়ে মুখর হ'য়ে উঠেছে—এ বলে কি অঞ্জনা ? এতদিনে মেয়েটার নিষ্কলুষ জীবনের উপর কলঙ্ক আরোপ ক'রে তবে কি খুশী হ'তে চায় অঞ্জনা ? আর সে খুসীকে লালন ক'রছে পাড়া-প্রতিবেশিনীরা ! এ কথা উচ্চারণ ক'রতেও যে লজ্জায় জিভ আড়ষ্ট হ'য়ে যায়। অঞ্জনার কি ধর্ম্মভয় ব'লেও কিছু নেই ?

আরও কী একটা ব'লতে যাচ্ছিলেন অঞ্জনা, বাধা দিয়ে বিরক্তির কণ্ঠে রসিকলাল ব'ল্‌লেন, 'মানুষের বাজে কথায় তুমি বড্ড কান দাও, ছিঃ, তুমি না মা, তুমি না কাকীমা ?'

—'হ্যাঁ, মা তিন্ন কি ! অমন মেয়ে গর্ভে ধারণ ক'র্‌লে কেটে কবে দু'খানা ক'রে ফেলতাম।' গায়ের

জ্বালায় চিৎকার ক'রে উঠলেন অঞ্জনা : 'কই, সবি যে এতোখানিটা বড় হ'য়ে তবে শ্বশুরের ঘর ক'র্‌তে গেল, তাকে নিয়ে তো কোনোদিন কেউ টু-শব্দটি তোলেনি! যাও না, এতকাল তো দিব্বি ওকালতি ক'রে গলা বাজিয়ে আদালত ফাটিয়েছ, পারতো এবারে গিয়ে পাড়ার মানুষের মুখ বন্ধ করো না! মানুষ যেন সকলেই ওনার হুকুমের চাকর আর কি? তাদের কি মগজ নেই, না চোখ নেই?'

দুঃখে আর বিরক্তিতে সারা গা রী রী ক'র্‌ছিল এতক্ষণ রসিকলালের। এবারে শ্লেষের কণ্ঠেই তিনি ব'ল্‌লেন, 'আছে, চোখ-কান-বিচারবুদ্ধি সব আছে তাদের; যাও, এবারে নিজের কাজে যাও তুমি।'

—'দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যখন বক্তৃতা ক'রতে আসিনি, তখন যাবো ভিন্ন কি! কিন্তু পাড়াপ্রতিবেশীর চোখ-রাঙানিটা নিজে দেখলেই তো পারো, আমাকে এমন আপদ নিয়ে কেন দিনরাত ম'রতে হয়?'

অঞ্জনা ভেবেছিলেন—এবারও কিছু একটা উত্তর দেবেন রসিকলাল, কিন্তু রসিকলাল আর একটি কথাও ব'ল্‌লেন না।

বাধ্য হ'য়ে এবারে তাই স'রে আস্‌তে হ'লো অঞ্জনাকে।

কাকিমার সমস্ত কথাই এতক্ষণ বাইরের বেড়া ডিঙিয়ে ছন্দার কানে এসে পৌঁছেছিল। কথার ঝাঁঝ এবং বিষয়-বস্তুর দিকে লক্ষ্য ক'রে নিজের মধ্যে তাই ভেঙে প'ড়ছিল সে। আকাশে কর্‌-কর্‌ শব্দে একবার অশনি-সঙ্কেত হ'লো। সাম্‌নেই কোথাও হয়ত একটা বজ্রপাত ঘ'টে থাকবে! আকাশের অবস্থা ভাল নয়।

কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ ক'রবার অবকাশ নেই। হেঁসেল নিকোনো থেকে সুরু ক'রে ময়লা জামাকাপড়-গুলোকে সাবান-কাচা করা পর্য্যন্ত অজস্র কাজ এখনও বাকী প'ড়ে আছে। এতক্ষণে কেবল রান্না শেষ হ'লো। রান্নাও এক ভাগে নয়, আমিষ আর নিরামিষ মিলিয়ে দু'ভাগে। নিরামিষের স্বতন্ত্র ব্যবস্থা অবশ্য তার নিজের জন্যই। তা' নিয়ে অন্ততঃ কাকিমার মাথা ব্যথা নেই সংসারে। তা না থাক্‌, তবু তাকে অন্ন গ্রহণ ক'রতে হয়। ক্ষিদেয় পেটের নাড়ি অনেকক্ষণ থেকেই পাক দিয়ে উঠচে। এমন ক্ষিদে কিন্তু রোজ পায় না! কিন্তু নিজের ক্ষিদেটাই এ-সংসারে তার বড় নয়। পাঁচজনের ক্ষিদে মিটিয়ে তবে তার নিজের ব্যবস্থা। হেঁসেলে শিকল এঁটে তাই ঘরের ময়লা জামাকাপড়গুলো নিয়ে এসে বস্‌লো সে ইঁদারার পাশে। এগুলোকে সাবান-কাচা ক'রে তবে তার নিজের খাবার ব্যবস্থা। তাতে অবশ্য দুঃখ ছিল না, সে দুঃখকে নিজে থেকেই জয় ক'রে নিয়েছে সে। কিন্তু বহির্ব্বাটিতে কাকাবাবুকে লক্ষ্য ক'রে তার সম্পর্কে কাকিমার পরোক্ষ উক্তিগুলো বার বার এসে তাকে দগ্ধ ক'রতে লাগ্‌লো। এত নীচ আর এত নৃশংসও হ'তে পারে মানুষ? মাসিমা নির্ম্মলা আর বিজুদাকে একবার স্মরণ ক'রলো সে মনে মনে। কোথায় স্বর্গ আর কোথায় এই নরকের কদর্য্যতা! তা যাক্‌, কিন্তু সত্যিই বড় অপরাধ ক'রে ফেলেছে ছন্দা। আজ দু'দিন ধ'রে একটি মুহূর্ত্তের জন্যও গিয়ে খোঁজ নিয়ে আসা সম্ভব হয়নি মাসিমা আর বিজুদাকে। বিজুদা কতকটা সুস্থ হ'য়ে উঠলেও এখনও তাঁর শরীর শোধরায় নি। মাসিমা তো শয্যাগতই! একই সঙ্গে এমন বিপদও মানুষের আসে?

কিন্তু উপস্থিত মতো বিপদটা ছন্দারও কম এলো না। আকাশের ঘন-ঘটাচ্ছন্ন মেঘের মতই চমকিত বিদ্যুৎবেগে সে বিপদ এসে অকস্মাৎ আলোড়িত ক'রে তুল্‌লো তাকে। অতীতের ইতিহাসের পৃষ্ঠাগুলো অলক্ষিত একটা মুহূর্ত্তে একেবারেই কখন্‌ উল্টে গেল।

ক্রোধ সম্বরণ ক'রে নেবার মতো মানুষ নন্‌ অঞ্জনা। স্বামীর সঙ্গে ঝগ্‌ড়া ক'রে এতক্ষণ তাঁর গায়ের জ্বালা মেটেনি। বাড়ীর উঠোনে এসে পা দিয়ে এবারে তিনি প্রত্যক্ষভাবে আক্রমণ ক'রলেন ছন্দাকে। অপাঙ্গে একবার কাকিমাকে লক্ষ্য ক'রে আপন মনেই আবার ছন্দা জামাকাপড়গুলোকে সাবান-কাচা ক'রতে ব্যস্ত হ'য়ে উঠলো। কাকিমার সংসারেরই নোংরা জামাকাপড় সব, মিন্টু আর জিতুর পরিধেয়ই অধিকাংশ। তার নিজের প্রয়োজনে একটুকরো সাবান ব্যবহারেরও

অধিকার নেই এখানে; আগে আগে এই নিয়ে দুর্ভাবনা হ'তো, এখন সে দুর্ভাবনাকেও অতিক্রম ক'রে উঠেছে সে। কিন্তু তাতেই কি স্বস্তি আছে? আশ্বস্ত হ'তে চেয়ে বরং প্রতিবারই বিপর্য্যস্ত হ'য়েছে ছন্দা। তবু এই মাটি তার কাছে স্বর্ণভূমি, তার বাল্য, কৈশোর আর যৌবনের সহস্র কামনায় পল্লবিত মাগুরার এই বন-প্রকৃতি, নবগঙ্গার জোয়ার-ভাটায় মিশে আছে তার দুঃখ-সুখের ইতিহাস। এ মাটিকে ত্যাগ ক'রে রাজসাহীর নিশ্চিন্ত জীবনে ফিরে গিয়ে নিঃশ্বাস নিতে আজও সে ভয়ে শিউরে ওঠে। জীবন নিয়ে তাইতো আজও তার এমন কৃচ্ছ্রসাধনা!

অঞ্জনার ক্ষুরধার জিহ্বা কিন্তু তাই ব'লে এতটুকুও প্রশমিত হ'লো না। চিৎকার ক'রে সারা বাড়ীটাকে মাথায় ক'রে নিলেন তিনি।—'তিন কুলে কাঁটা দিয়ে তো ম'রতে এলি এখানে, এবারে আমাকেও নির্ব্বংশ ক'রে স্বাধ্ পারিস কিনা বেরোতে! রাজেন্দ্রানীর জন্যে তো বাড়ুজ্জেদের ঘরে বরণকুলো সাজানই র'য়েছে, লোকের চোখে ধুলো দিয়ে তবে আর ঢলাঢলি কেন? এবারে অনুগ্রহ ক'রে সাতপাকের ব্যবস্থা ক'রে পীরিতের শয্যা গিয়ে পেতে বস্‌লেই তো হ'লো! হতচ্ছাড়ী, স্বামী-খেকো, রাক্ষুসী কোথাকার। ভেবেছিস—ডুবে ডুবে জল খাচ্ছিস, শিবঠাকুরের বাবাও টের পায় না?'

ক্রোধ চণ্ড। রাগে দাঁতগুলো একবার কড়্মড়্ ক'রে আওয়াজ হ'য়ে উঠলো অঞ্জনার।

সাবান-মাখা জামাকাপড়গুলো আছড়াতে গিয়ে অকস্মাৎ হাত দু'খানি থেমে গেল ছন্দার। বুকের মধ্যে মনে হলো—হাতুড়ীর এক একটা প্রচণ্ড ঘা এসে পড়ছে তার। এ আঘাত আজকের নতুন নয়, আঘাত স'য়ে স'য়েই তো প্রতিমুহূর্ত্তে সে নিজের মৃত্যুকামনা ক'রছে। কিন্তু আজকের আঘাতটা আরও বেশী তীব্র, বিশেষ একটা অর্থবাচক। নিজের অদৃষ্ট-দেবতাকে তাই মনে মনে একবার স্মরণ ক'রলো ছন্দা।

অঞ্জনার শাণিত কণ্ঠ ততক্ষণে আবার ফেটে প'ড়েছে।—'তাই তো ভাবি, বাড়ুজ্জে-বাড়ীর অসুখে দুনিয়ার এত মানুষ থাক্‌তে মেয়ের আমাদের এত দরদ কেন! মেয়ে তো নয়, ডাইনী। রোগের বীজ এনে আমার ঘরে না ছড়ালে আমরা মরি কি ক'রে! হারামজাদী, বজ্জাতি, কুলটা কোথাকার, পেটে পেটে এতখানি নিয়ে তবে তুই পাড়া বেড়িয়েছিস এতকাল?'

মুহূর্ত্তে মনে হলো—সমস্তটা বাড়ীর মধ্য দিয়ে যেন অকস্মাৎ একটা ভূমিকম্প ব'য়ে গেল। বহির্ব্বাটিতে ব'সে রসিকলাল পর্য্যন্ত সে কম্প স্পষ্ট বোধ ক'রলেন। কিন্তু অক্ষম, হতমান তিনি। স্নানের গরম জল তাঁর ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা হ'য়ে গেল, কিন্তু স্নানের উন্মাদনা তিনি অনেকক্ষণ আগেই হারিয়ে ফেলেছেন। মাথার তালুতে শুধু একবার জলের হাত বুলিয়ে নিয়ে নিজেকে নিয়ে খানিকটা আত্মবিশ্লেষণের মধ্যে মগ্ন হ'য়ে গেলেন রসিকলাল।

নিজেকে এতক্ষণ যথেষ্ট সংযত ক'রে রেখেছিল ছন্দা। কিন্তু ধৈর্য্যের বাঁধ অলক্ষ্যেই কখন্ চূর্ণ বিচূর্ণ হ'য়ে গেল। আজ তাকে কুলটা আখ্যাও পেতে হ'লো কাকিমার কাছ থেকে? এ কথা শুনবার আগে তার মৃত্যু হলো না কেন? দু'মুঠো গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা ক'রে আজ তার চরিত্রের উপর এত বড় একটা কলঙ্ক আরোপ ক'রেও নিশ্চিন্ত হ'তে পারলেন কাকিমা? সংসারে কি কাকা জীবিত নেই? সহসা কাকাবাবুর জন্য মনটা একবার হু হু ক'রে উঠলো ছন্দার। আজ তিনি বেঁচে থেকেও জীবন্মৃত হ'য়ে আছেন, কাকিমার ঔদ্ধত্য তাই গিরিশৃঙ্গকেও অতিক্রম ক'রে উঠেছে। হাতের সাবান-কাচা রেখে সহসা একবার মুখ তুলে তাকালো ছন্দা অঞ্জনার মুখের দিকে: 'কি বল্‌লেন, কুলটা? আমি কুলটা?'—ব'ল্‌তে গিয়ে অশ্রুভারে দুচোখ ঝাপ্‌সা হ'য়ে গেল ছন্দার।

সক্রোধে ঠোঁট উল্টালেন অঞ্জনা: 'না, কুলটা নয়, সতী সাবিত্রী আমার! বলি আমার চোখে ধুলো দিলেও পাড়াপ্রতিবেশীর তো চোখ আছে! তারাই তো জয়-ঢাক পিটিয়ে গেল তোমার সতীপনার। ওলো আমার সতী লো! মেয়ে তো নয়, ঘরে আমি দুধ-কলা দিয়ে সাপ পুষছি।'

আর ব'সে থাকা সম্ভব হ'লো না ছন্দার পক্ষে।

এভাবে ব'সে থাকা কারুর পক্ষেই সম্ভব নয়। হাতের সাবান-কাচা রেখে উঠে দাঁড়ালো ছন্দা, তারপর নিজের ঘরের দিকে পা চালাতে যেতেই আর-একবার থ'মকে দাঁড়িয়ে প'ড়তে হ'লো তাকে।

অঞ্জনা ব'ল্লেন, 'যা, দূর হ'য়ে যা আমার চোখের সাম্‌নে থেকে, সংসারটা তবু আমার বাঁচবে।'

—'দূর হ'য়েই যাবো, আর আমাকে নিয়ে আপনাকে পাড়াপ্রতিবেশীর কাছে ছোট হ'তে হবে না কাকিমা। কাকাবাবুর সংসারে কলঙ্ক প'ড়বে, এ কি আমিই জীবন থাক্‌তে সহ্য ক'রতে পারবো?' ব'লে ঘরের দিকে অগ্রসর হ'তে গেল ছন্দা।

কিন্তু কথাটা তার কোথায় গিয়ে যেন অপমানের সঙ্গে বিঁধলো অঞ্জনাকে। কণ্ঠের সুর একই পর্দ্দায় রেখে আর একবার চেঁচিয়ে উঠলেন তিনি: 'সবাই এসে শুনে যাও মেয়ের কথা। কথার জাহাজ আর কাকে বলে! বলি—স্বামীকে খেয়ে তার ঘরই যদি আগ্‌লাতে পারবি তো এখানে এসে এতকাল এই ঘেন্নাপিত্তি ছড়ানো কেন? পোড়ারমুখীর কথা শোনো, আর পাড়াপ্রতিবেশীর কাছে আপনাকে ছোট হ'তে হবে না! ছোট ক'রতে বাকীই রেখেছিস!' রাগের উত্তেজনায় হন্ হন্ ক'রে খানিকটা সাম্‌নে এগিয়ে এসে শক্ত-হাতে হঠাৎ আঘাত ক'রে ব'সলেন তিনি ছন্দাকে, ব'ল্লেন, 'আদিখ্যেতা তো যথেষ্ট দেখালি, এবারে মর গিয়ে যেখানে পারিস। হতচ্ছাড়ী, নচ্ছার, বজ্জাতি কোথাকার!'

আকাশটাকে বিদীর্ণ ক'রে সহসা যেন একটা বাজ প'ড়লো কোথায়! বন-প্রকৃতিতে ঝড়ের হাওয়া বইছে শন্ শন্ ক'রে। সেদিকে বোধ করি অঞ্জনার বড় একটা নজর গেল না।

আঘাতের টাল সাম্‌লাতে না পেরে একটা খুঁটির গায়ে গিয়ে অছেড়ে প'ড়লো ছন্দা। গালের একটা পাশ কেটে গিয়ে রক্তে সারা মুখখানি তার ভেসে গেল। হাতের তেলোয় ক্ষতস্থানটা চেপে ধ'রে নিজের ঘরে গিয়ে খিল এঁটে মেঝের ঠাণ্ডা মাটিতে শুয়ে প'ড়লো ছন্দা। ভালোবাস্‌লে আঘাত পেতে হয়, সে জানে। মাণ্ডবাকে ভালোবাসার পিছনে এই আঘাতই এতদিন তার জন্য অপেক্ষা ক'রে ছিল। বোধ করি আজ তার শেষ অধ্যায় ঘ'টে গেল। ঘ'টে গেল কাকাবাবুর অলক্ষ্যেই। কাকিমার কণ্ঠই হয়ত তাঁর কান অবধি গিয়ে পৌছেচে, তার অধিক নয়। মিণ্টু আর জিতু খেয়ে-দেয়ে এগারোটা না বাজতেই স্কুলে ছুটেছে। আকাশের অবস্থা দেখে ঘর থেকে আজ তাদের বেরোতে বারণ ক'রেছিলেন কাকিমা, কিন্তু সে কথা তারা কানে নেয়নি। সাম্‌নেই হাফ্-ইয়ার্লি পরীক্ষা, মাষ্টারের কড়া শাসন র'য়েছে স্কুলে, তাই ছাতা হাতে নিয়ে একসঙ্গেই বেরিয়ে প'ড়েছে দু'জনে। নইলে এতক্ষণে তারাও কিছু-একটা মজা দেখে অলক্ষ্যে দাঁড়িয়ে হয়ত খিল্-খিল্ ক'রে হাসতো। সবদিক থেকেই কেমন একটা উষ্মা আর উপেক্ষা! জীবনে আজ তার সত্যিই প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে। সহসা মাসিমা নির্ম্মলার জন্য মনটা একবার বড় বেশী ব্যাকুল হ'য়ে উঠ্‌লো। মিথ্যে কথা বলেন নি তিনি সেদিন: 'জানিস তো—এ সংসারে বিধবার কি জ্বালা! কোথাও তার মাথা উঁচু ক'রে কথা ব'ল্‌বার অধিকার নেই।' প্রতি-দিনের জীবন দিয়ে সে-কথা প্রতিমুহূর্ত্তেই সে উপলব্ধি ক'রেছে। আর মৃত্যু কামনা ক'রেছে নিজের। মৃত্যুই তো তার শ্রেয়! সমস্ত জ্বালার অবসান। 'মরণ রে তুঁহু মম শ্যাম সমান': বিজুদাই একদিন 'সঞ্চয়িতা'র পৃষ্ঠা খুলে প'ড়ে শুনিয়েছিল তাকে। জীবনে সেদিন স্বপ্ন ছিল, রং ছিল, আশা ছিল, সুখী হ'তে চেয়েছিল সে সেদিন একান্ত ভাবে। আজ সাম্‌নে তার শুধু অন্ধকার, বিভীষিকার চকিত পদসঞ্চার এসে অনবরত তার কানে আঘাত ক'রছে। সত্যিই ফুরিয়ে গেছে সে, ম'রে গেছে সে আশাদীপ্ত অতীতের ইতিহাস থেকে।...

দেখ্‌তে দেখ্‌তে ঘড়ির কাঁটায় ক্রমে দু'টো, তিনটে, চারটে বেজে গেল। বাইরে ক্রমেই ঝড়ের বেগ বাড়ছে। ক্রুর্ ক্রুর্ ক'রে শব্দ হ'য়ে উঠছে মেঘের। হাতের তেলোয় আর একবার ক্ষতস্থানটাকে মুছে নিল ছন্দা। যেম্‌নি ক্ষুধায় পেটের নাড়ী পাক দিয়ে উঠচে, তেম্‌নি ব্যথায় টন্ টন্ ক'রছে গালের ক্ষতস্থানটা। কিন্তু মনের দাহর কাছে এ দাহ কতটুকু? দেখতে দেখতে ক্রমে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হ'য়ে গেল। মুখে এক ফোঁটা জল অবধি আজ আর

প'ড়তে পেলোনা তার। একটি বারের জন্যও খাবার কথা ব'লে কেউ তাকে এসে ডাকলো না। যিনি ডাকতেন, তিনি কাকাবাবু। নিজেকে সম্পূর্ণ আড়াল ক'রে রেখেছেন তিনি সংসার থেকে। এ সংসারের কোনো কিছুতেই আজ আর তিনি যুক্ত নন্। যিনি সর্ব্বত্র সব কাজে প্রত্যক্ষ, তিনি আজ স্পষ্টই জবাব দিয়ে দিলেন তাকে। জীবন-সত্তার সমস্ত দিক থেকেই পাওনা ছুটি তার মিলে গেছে। অতএব মৃত্যুতে আর দুঃখ নেই। একটা স্পষ্ট অঙ্গীকারে হঠাৎ যেন কেমন নিজের মধ্যে জ্ব'লে উঠলো ছন্দা। মৃত্যু। একেবারে নিশ্চিহ্ন হ'য়ে যাওয়া সংসার থেকে। এ ভিন্ন আজ আর পথ নেই তার সাম্‌নে। সোজা সরল রেখার মতো পথ। কেউ দেখবে না, কেউ জানতে আস্‌বে না এই দুর্য্যোগের ঘন অন্ধকারে। মৃত্যুর ডাক শুন্‌তে পাচ্ছে সে স্পষ্ট কানে। অদৃশ্য-লোক থেকে ডাক পাঠিয়েছে তাকে শ্যামলকান্তি। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে সে, স্পষ্ট শুন্‌তে পাচ্ছে তার আহ্বান। স্বামীর আহ্বান তার স্ত্রীকে, মৃত্যুর আহ্বান জীবনকে। মৃত্যু : মনে মনে আর-একবার উচ্চারণ ক'রলো ছন্দা শব্দটাকে। তার মৃত্যুর জন্যই যেন প্রকৃতি আজ এমন ঝঞ্ঝার সৃষ্টি ক'রে সমস্ত:দিককে আগ্‌লে রেখেছে! এমন সুন্দর মুহূর্ত্ত আর তার জীবনে আস্‌বে না। সোজা সরল রেখার মতো পথ। ছোট্ট এই গৃহপ্রকোষ্ঠ থেকে নবগঙ্গা। তারপর তার আবর্ত্ত-সঙ্কুল জলরাশির মধ্যে ঝুপ্‌ ক'রে শুধু একটা শব্দ। সকল জ্বালার অবসান, সকল সমস্যার পরিসমাপ্তি।

নিজের অলক্ষ্যেই একসময় মেঝের উপর উঠে ব'স্‌লো ছন্দা। মনটা লাগামহীন ঘোড়ার মতো, কোথাও সে স্থির হ'য়ে ব'সে থাক্‌তে চায় না। ঝড়ের গতিতে ছুটে চলে মনের ঘোড়া। লক্ষ্যহীন তার গতি। সেই অলক্ষ্যের পথ থেকেই হঠাৎ কখন্ তার হৃদয়ের সাম্‌নে সে লক্ষ্য ক'র্‌লো বিজুদা আর মাসিমা নির্ম্মলার উপস্থিতি। মৃত্যুর পরেও নাকি জীবন আছে, বিদেহী জীবন। সে-জীবনেও কি ভুল্‌তে পারবে ছন্দা মাসিমা আর বিজুদাকে? মাসিমার স্নেহ আর বিজুদার ভালবাসা -তা যে অক্ষয় হ'য়ে রইল তার জীবনে! কাল যখন ভোরে উঠে বিজুদা তার এই কৃতকর্ম্মের সংবাদ পাবে, তখন না-জানি কত দুঃখেই সে ভেঙে প'ড়্‌বে! তাকে সান্ত্বনা দেবার মতো প্রাণীটিও যে আর পৃথিবীতে থাক্‌বে না!

কর্‌ কর্‌ শব্দে আর একবার অশনি-সঙ্কেত হ'লো আকাশে। বিদ্যুৎ চম্‌কাচ্ছে ঘন ঘন।

রেসের ঘোড়ার মতো লাগামহীন মনের ঘোড়ার খুড়ের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে—টক্‌···টক্‌···টক্‌। দ্রুত, আরও দ্রুত। ভাবীকালের পসরা নিয়ে আলস্যের আবরণে জড়িয়ে থাক্‌বার অবকাশ নেই। দুর্য্যোগের ঘনঘটায় প্রকৃতি আচ্ছন্ন। মায়া মিথ্যে, জীবন মিথ্যে: কলঙ্কিত জীবনে নির্য্যাতনের বোঝা ব'য়ে আর কেন? মিথ্যে হোক ভাবী কাল, মিথ্যে হোক্ দুঃস্বপ্ন, মিথ্যে হোক্ আত্মার ললিত বিলাপ! ধিক্কারে ধিক্কারে আত্মা তার বিষে নীল হ'য়ে গেছে। আর এক মুহূর্ত্তও নয় এই সংসারচক্রে।—সোজা উঠে দাঁড়িয়ে প'ড়লো ছন্দা। পা তার এতটুকুও ট'ল্‌ছে না, এতটুকুও আর দ্বিধা নেই তার মনে। অশ্রু মুছে গিয়ে কঠোর শপথে জ্বল্‌ জ্বল্‌ ক'র্‌ছে চোখ দু'টি। একটি মুহূর্ত্তও আর অপেক্ষা নয়। নিঃশব্দে একসময় দরজার খিল খুলে উন্মাদিনীর মতো দুর্য্যোগের অন্ধকারে অলক্ষ্যে কোথায় মিশে গেল ছন্দা।···

নবগঙ্গার গতি আজ প্রচণ্ড। উচ্ছ্বসিত জলপ্রবাহে এ-কূল ও-কূল তার উপ্‌চে প'ড়ছে। প্রতি বছরই এ-সময়ে নবগঙ্গা ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করে। ভরা যৌবনের জোয়ার আসে তার এ-সময়ে; প্রাণ-বল্লভের অভিসারে ছড়িয়ে পড়ে তার দেহ-সুষমা। এ মূর্ত্তি প্রচণ্ড মূর্ত্তি, হরি মুখুজ্জের মতো ডাকসাঁইটে লোকও তার এ মূর্ত্তিকে ভয় করে। স্রোতের প্রচণ্ড বেগে ধ্ব'সে পড়ে এ-পার ও-পার। কূলপ্লাবি জলরাশিতে মাঠ-ঘাট ডুবে যায়, তার উপর দিয়ে নৃত্যমুখরা নবগঙ্গা আপন লাস্যে থই থই ক'রে ব'য়ে চলে। ঝড় এলে তার খ্যাপামি আর বাধ মানে না। আজকের দুর্য্যোগে তার সেই খ্যাপামির লীলা সুরু হ'য়েছে।

নিজের শয্যায় ব'সে পাশের উন্মুক্ত জানালা দিয়ে কেমন একটা অন্যমনস্ক দৃষ্টি তুলে ধ'রে নবগঙ্গার এই

ভরা যৌবনের রূপ দেখ্‌ছিল বিজন। বিবেকের বিরুদ্ধে লড়াই ক'রে মনটা কখন্ থেকে যেন ক্ষেপে উঠেছিল, ভালো লাগ্‌ছিল না কিছুই। শারীরিক অসুস্থতা নিয়েও তাই খোলা জানালার পাশে ব'সে বাইরের এই ঝড়ের ঝাপ্টা সম্পর্কে তার এই ঔদাসীন্য। জানালা দিয়ে তাকালে নবগঙ্গার পাড়টা ছবির মতো স্পষ্ট ভেসে ওঠে দু'চোখে। খণ্ড খণ্ড অলস মুহূর্ত্তগুলো কেটেছে তার এই জানালা-পথেই নবগঙ্গার রূপ দেখে দেখে। কাব্যলক্ষ্মীর সুর-ঝঙ্কার শুন্‌তে পেয়েছে সে তখন মনে মনে, অম্‌নি অলক্ষ্যে কখন্ শাদা খাতার পৃষ্ঠার উপর কলমটা বড় বেশী সজাগ হ'য়ে উঠেছে তার হাতের আঙুলে। সুরু হ'য়েছে কবিতা। কিন্তু সে দিনও নেই, সে কবিতাও নেই আজ আর তার জীবনে। কেমন একটা দুঃসহ গ্লানিতে আজ নানা দিক দিয়ে জীবনটা ভ'রে উঠেছে। ঘরে ব'সে ক্রমেই আজ অধীর হ'য়ে উঠেছে সে। এমন নিষ্ক্রিয় ভাবেও মানুষ ব'সে থাকতে পারে? কিন্তু ছন্দার কথা সে উপেক্ষা ক'রতে পারেনি। পুরোপুরি সুস্থ হ'য়ে উঠতে কি সত্যিই সে পেরেছে? কেমন একটা অবসন্নতায় আজও সারা দেহ তার ক্লান্ত। মনের ইচ্ছার সঙ্গে দেহের অনুমতি ব'লেও তো একটা বস্তু আছে! সেখানে যে এখনও সে পিছিয়ে র'য়েছে। ছন্দার অনুরোধ তাকে বাধ্য হ'য়েই পালন ক'রতে হ'য়েছে বৈ কি

বিদ্যুৎ-ঝলকে দুর্য্যোগের প্রলয়-মাতন স্পষ্ট হ'য়ে চোখে ধরা দিচ্ছে। হু হু ক'রে বাতাস এসে বিঁধ্‌ছে গায়ে, তার সঙ্গে ঠাণ্ডা বরফের মতো বৃষ্টির ঝাপ্টা। অন্য সময় হ'লে শীতবোধ হ'তো বিজনের। কিন্তু আজ কেন যেন মনের অস্বস্তির কাছে সে বোধটুকুও চাপা প'ড়ে গেছে।

সকালের দিকে মা'র সঙ্গে কথা হচ্ছিল ছন্দাকে নিয়ে। নির্ম্মলাই কথাটা তুলেছিলেন। যে মেয়ে রোজ দু'বেলা এসে শত লাঞ্ছনা স'য়েও এত পরিচর্য্যা ক'রে গেল, আজ ক'দিন ধ'রে তার দেখা নেই। অসুখ বিসুখ হ'লো কি না, একটা খবর নেওয়াও তো প্রয়োজন!

উত্তরে বিজন ব'লেছিল, 'সে প্রয়োজনের পথ কি কোথাও খোলা আছে মা? জানি না ওর অদৃষ্ট ওকে কোথায় নিয়ে দাঁড় করাবে!'

জবাবে কিছু-একটাও আর ব'ল্‌তে পারেন নি নির্ম্মলা।

কিছুক্ষণ থেমে পুনরায় বিজন জিজ্ঞেস ক'রেছে, 'আচ্ছা মা, ওর সম্বন্ধে আমাদের কি কিছুই ক'রবার নেই, আমরা কি কিছুই বিহিত ক'রতে পারি না ওর?'

—'বিহিত?' শব্দটা উচ্চারণ ক'রে একবার দুঃখের হাসি হেসেছেন মাত্র নির্ম্মলা, আর কিছু-একটাও বলেন নি। ব'ল্‌বার নেই ব'লেই বলেন নি। কিন্তু মনটাও কি তাই ব'লে স্তব্ধ ছিল? তা নয়। রোগ-শয্যায় শুয়ে প্রতি-মুহূর্ত্তেই তিনি ছন্দার অভাব বোধ ক'রছেন।

অভাব বোধ কি বিজনেরও কিছু কম? কিন্তু এ কথা কি একটি বারও সে মুখ ফুটে ব'ল্‌তে পারলো? তার প্রথম কৈশোরের স্বপ্ন, তার ব্যর্থ যৌবনের স্মৃতি। বুক-খানিকে খুলে দেখাতে পারছে কাকে সে সংসারে?

সকালে তার কথার জবাব দেওয়া সম্ভব হয় নি নির্ম্মলার। এ-কথায় সে-কথায় আসল কথা চাপা দিয়ে শেষে শুধু ব'লেছেন, 'বাইরে আজ যেমন দুর্য্যোগ, শরীরে যেন ঠাণ্ডা লাগাস্ নে বিজু। ঝড় উঠবে ব'লে মনে হ'চ্ছে। জানালায় খিল এঁটে ভিতর দিয়ে চট কি কাপড় কিছু-একটা গুঁজে নিস্।'

নির্ম্মলার এ সাবধানতা চিরকালের।

শেষ পর্য্যন্ত সেই ঝড় সত্যিই এলো। কিন্তু মা'র কথা-মতো জানালা বন্ধ ক'রে ঠাণ্ডা থেকে নিজেকে রক্ষা ক'রতে পারলো কই বিজন? সকালের কথা সকালেই ফুরিয়ে গিয়েছিল। মনের অস্বস্তির কাছে কখন্‌ই তলিয়ে গেছে সারা সকাল আর দুপুরটা। বাইরে ঝড়ের বেগ যত বেড়েছে, মনের বেগও তেম্‌নি থার্ম্মোমিটারের ডিগ্রীর মতো একে একে চ'ড়েছে। জানালাটা বন্ধ করা তার পক্ষে আর হ'য়ে ওঠে নি। মন আর প্রকৃতি কখন্ একাকার হ'য়ে গেছে! উদাস-চিত্তে তাইতো প্রকৃতিকে এমন ক'রে উপলব্ধি ক'রবার অবকাশ।

মেঘ ডাক্‌ছে। গুম্ গুম্ শব্দে ফেটে প'ড়ছে আকাশ। মুহুর্মুহু বিদ্যুৎ-ঝলকে ঝিকিয়ে উঠছে সমস্তটা বহি-

প্র'কৃতি। ঝম্ ঝম্ ক'রে বৃষ্টি ঝ'রে পড়ছে মেঘমেদুর আকাশকে বিদীর্ণ ক'রে।

অধীর চিত্তে সহসা একবার চঞ্চল হ'য়ে উঠলো বিজন। বিদ্যুৎ-ঝলকে হঠাৎ যেন একটি শ্বেতবসনা নারী-মূর্ত্তি ভেসে উঠলো দু'চোখে। উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে গিয়ে অকস্মাৎ থ'ম্কে দাঁড়িয়ে প'ড়লো সে নবগঙ্গার তীরে। আশ্চর্য্য এবং বিস্ময়কর। এমন দারুণ দুর্য্যোগেও কোনো মানুষ ঘরের বার হ'তে পারে? ঔদাসীন্য কাটিয়ে উঠে খানিকটা সচেতন হ'য়ে ব'স্লো বিজন। জীবনে এমন রহস্যের সঙ্গে তার পরিচয় ঘটে নি কোনোদিন। কিন্তু সত্যিই কি রহস্য?

বিদ্যুৎ-ঝলকে এক একটা মুহূর্ত্ত জ্যোৎস্নার মতো স্বচ্ছ হ'য়ে উঠচে। বাত্যাহত একটা ভিজে কাককেও দৃষ্টি প্রসারিত ক'রলে স্পষ্ট চেনা যায়। মানুষ তো বৃহত্তর জীব!

অকস্মাৎ নিজের অলক্ষ্যেই একবার অধীর চাঞ্চল্যে উচ্চারণ ক'রে উঠলো বিজন: 'সে কি, ছন্দা নয় তো?' চিরদিনের এত পরিচিত জনকে ভুল হবার কথা নয় বিজনের। মুহূর্ত্তের মধ্যে সমস্ত ইতিহাসটা যেন মাথার রক্ত-কণিকাগুলিকে কেন্দ্র ক'রে একবার আবর্ত্তিত হ'য়ে উঠলো। হয়ত আত্মহত্যার পথই তবে শেষ পর্য্যন্ত বেছে নিয়েছে ছন্দা। তার এই দু'দিনের অনুপস্থিতির পিছনে হয়ত ছিল এই প্রস্তুতি। একেবারে প্রস্তুত হ'য়েই তবে সে বেরিয়েছে। কুলপ্লাবি নবগঙ্গা পারবে কি ধ'রে রাখতে তার প্রাণকে?

ত্রস্তে উঠে প'ড়লো বিজন। আর এক মিনিটও অপেক্ষা নয়। তার চোখকে সে অবিশ্বাস ক'রতে পারে না। নিশ্চিত দেখেছে সে ছন্দাকে। আত্মহত্যা: কথাটা আর-একবার মনে আস্তেই সমস্ত শরীরের মধ্য দিয়ে কেমন একটা বিদ্যুৎ খেলে গেল তার। সে অন্ততঃ এভাবে ছন্দাকে ম'রতে দিতে প্রস্তুত নয়। দুর্য্যোগের কথা অলক্ষ্যেই কখন্ মনের অতলে চাপা প'ড়ে গেল। চৌকাঠ পেরিয়ে দ্রুত পা চালালো বিজন বাইরে।

আতঙ্কে একবার চেঁচিয়ে উঠতে গেলেন নির্ম্মলা: 'তুই কি পাগল হ'লি বিজু? এই ঝড়-জলে এমন খালি মাথায় তুই কোথায় বেরোচ্ছিস্?'

কিন্তু বিজন ততক্ষণে ঝড়ের আবর্ত্তে মিশে গেছে। বাতাসের হু-হু শ্বাসে শুধু তার ছোট্ট একটি কথা কেবল নির্ম্মলার কানে এসে বার বার ক'রে বিঁধতে লাগলো: 'জীবনে এই আমার শেষ পরীক্ষা মা।'

চকিতে উঠে একবার দরজার সাম্নে এসে দাঁড়ালেন নির্ম্মলা। কিন্তু ঝড়ের উদ্দাম মাতন ভিন্ন আর একটাও লক্ষ্যে প'ড়লো না।...

মেঘ ডাকছে। বিদ্যুৎ চম্‌কাচ্ছে। কুলু কুলু নাদে ভেঙে প'ড়ছে আবর্ত্তচঞ্চল নবগঙ্গা। মাগুরার মৃত্তিকার সঙ্গে এই আজ শেষ সম্পর্ক ছন্দার। শেষ বারের জন্য আর একবার স্মরণ ক'রলো সে শ্যামলকান্তিকে: 'নাও, আমাকে তুলে নাও তুমি। এ পৃথিবীর সকল যন্ত্রনার আমার অবসান হোক্।'

দেহটাকে সম্পূর্ণভাবে নবগঙ্গার বুকে এলিয়ে দিতে যেতেই অকস্মাৎ বাধা পেয়ে চ'ম্কে উঠলো ছন্দা।— 'কে, কে তুমি?'

বিজন ততক্ষণে দু'বাহুর বন্ধনের মধ্যে ছন্দাকে টেনে নিয়েছে। উত্তরে কিছু-একটাও আর মুখ ফুটে ব'লতে হ'লো না বিজনকে। বিদ্যুৎ-ঝলকে স্পষ্টই তাকে চিনে নিয়েছে ছন্দা। ব'ললো, 'বিজুদা, তুমি? তুমি কেন এলে বিজুদা? কেমন ক'রে জান্‌লে তুমি আমার এই পাপের কথা?'

বিজন ব'ল্‌লো, 'আত্মায় বিশ্বাস করিস তো তুই? তা যাক্। আত্মহত্যা ক'রে এ জীবনের অবসান ঘ'টাবি—এই তবে তোর মনে ছিল?'

—'সংসারে কোথাও যার স্থান নেই, নদীর জল তার র'য়েছে।' ব'লে বিজনের বাহু-বন্ধন থেকে নিজেকে একবার মুক্ত ক'রতে চেষ্টা ক'রলো ছন্দা। ব'ল্‌লো, 'ছেড়ে দাও, শান্তিতে ম'রতে দাও আমাকে তুমি বিজুদা। কেন তুমি এম্‌নি ক'রে এসে আমাকে বাধা দিলে?'

বিজন ব'ললো, 'ভগবান তো আত্মহত্যা ক'রবার জন্যে কাউকে পাঠান্ নি পৃথিবীতে! পাপ জেনেও আজ তবে কেন এই পাপের পথে তুই পা বাড়ালি?'

—'সে শুধু পৃথিবীর এই পুণ্যভূমি থেকে নিঃশেষে মুছে যাবার জন্যে। কাল সকালে ছন্দা ব'লে আর কেউ থাকবে না এ পৃথিবীতে।'

ঝড় কি শুধুই মাথার উপর দিয়ে ব'য়ে যাচ্ছে, উদ্দাম গতিতে সেই ঝড়ের প্রবাহ চ'লেছে ছন্দার সারা বুকের মধ্যে। শ্বাস প্রশ্বাসের মুহুর্মুহু আন্দোলনে মনে হ'চ্ছে বুকখানি এখনই ভেঙে গুঁড়িয়ে যাবে। শক্ত হাতে আর-একবার চেষ্টা ক'রলো সে বিজনের বাহুবন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত ক'রতে।

কিন্তু ব্যর্থ চেষ্টা।

দু'বাহুর মধ্যে আরও নিবিড় ক'রে ছন্দাকে আকড়ে ধ'রে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বিজন ব'ললো: 'ছিঃ ছন্দা, আর কারুর জন্যে না হোক্, আমার দিকে চেয়ে, আমার মার দিকে চেয়ে আজ তোকে বাঁচতে হবে। জীবনে আঘাত এলেই কি ম'রতে হয়? আঘাত দেবে মানুষকে নব-জীবনের প্রেরণা। যে দুঃখ কষ্ট তুই সারা জীবন পেলি, সব কিছুকে আজ ভুলে যা লক্ষ্মীটি। আয়, ছোটবেলার মতো আবার নতুন ক'রে আমাদের খেলাঘর রচনা করি। সেখানে আবার আমরা নতুন হ'য়ে ফুটে উঠি। একদিন যেমন ক'রে তোকে পেয়েছিলাম আমার সাথী, আজ থেকে ঠিক্ তেম্নি ক'রেই চির-সঙ্গিনী হ'য়ে থাক্ তুই আমার জীবনে। সমাজে নতুন ক'রে আবার নবজীবনের প্রতিষ্ঠা ক'রবো আমি। আমাদের যা কিছু আঘাত, আজকের এই ঝড়ের মেঘভাঙা জলে তা ধুয়ে যাক্। চল্, আমরা ঘরে ফিরে যাই লক্ষ্মীটি।'

ছন্দার মুখে আর একটি কথাও ফুটলো না। বিজুদাকে সে বাধা দেবে কেমন ক'রে? ঝঞ্ঝার লক্ষ্য-হীন দুরন্ত প্রবাহের মধ্যেও মুহূর্তের জন্য একবার চোখ দু'টিকে স্থিরলক্ষ্যে নিবদ্ধ ক'রতে চেষ্টা ক'রলো ছন্দা বিজনের চোখের দিকে। তারপর তার বুকে মুখ লুকিয়ে উচ্ছ্বসিত অশ্রুবন্যায় ভেঙে প'ড়লো সে। কেন এই অশ্রু, এ কি কৃতজ্ঞতার—না মৃত্যুহীন দুঃখের, তা সে নিজেই বুঝলো না।

দুঃসহ যৌবনভারে তখনও নবগঙ্গা ফুলে ফুলে উঠচে। আবর্তে তার ঝড়ের স্পর্শ, কুলপ্লাবি তার গতি।

সমাপ্ত

আদিমকালের পাপুয়া

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

একসময় বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বঙ্গশ্রীর তৎকালীন 'বিচিত্র জগৎ' বিভাগটি পরিচালনা করিতেন। উক্ত কাজে তখন তাঁহাকে নানা অঞ্চলে ঘুরিতে হয়। সেই ভ্রাম্যমান জীবনের বহু অভিজ্ঞতা বিভূতিভূষণের বহুতর রচনায় বিকীর্ণ হইয়া আছে। 'আদিমকালের পাপুয়া'র ইতিহাস তাহার মধ্যে একটি। 'বিচিত্র জগতেও' এ সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন। বর্ত্তমান রচনাটি যে কারণেই হউক্ এতকাল অপ্রকাশিত থাকে। রচনার মূল্য যথাকালেই অবশ্য লেখক গ্রহণ করিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয়, আজ তিনি এই বিচিত্র জগতের রহস্যে ঘেরা মৃত্তিকার ঊর্দ্ধে। তাঁহার সর্ব্বশেষ অপ্রকাশিত রচনা হিসাবে প্রবন্ধটি নিম্নে মুদ্রিত হইল।—বঃ সঃ

দিনের আলোয় খোলা রাস্তায় আজ যদি কোন লোক উলঙ্গ অবস্থায় বর্শা ঢাল কাঁধে নিয়ে আর শত্রুর মাথার খুলি নিয়ে এসে দাঁড়ায় তা হলে বাস্তবিক রাস্তায় রীতিমত ভাড় জমে যাবে। কেননা মানুষের মন থেকে আদিম-কালের অসভ্য এই মানুষের স্মৃতি এমনভাবে আধুনিক সভ্যতার প্রভাবে ধুয়ে মুছে গেছে যে আজ তাদের হঠাৎ দেখলে আমরা চমকে উঠি। যাদুঘরে এখনও তাদের কাহিনী বিদ্যমান দেখা যায়। সেই প্রস্তর যুগের আগেকার অসভ্য মানুষের তৈরি নৌকা দেখে আজও আমরা অবাক হয়ে যাই। আর সেই নৌকা তারা তৈরি করেছিল কেবল ধারাল পাথরের সাহায্যে। আজ যে কেবল যাদুঘরের কাচের মধ্যে তাদের স্মৃতিচিহ্ন বর্ত্তমান তাই নয়, পরন্তু তাদের জীবন্ত অবস্থায় অনেক গোপন যায়গায় তাদের আমরা দেখতে পাই। বন্য প্রকৃতির কোলে দুর্ভেদ্য অরণ্যরাজির অন্তরালে তাদের অপূর্ব্ব লীলাভূমি। তারা আজও নিঃশেষে বিলুপ্ত হয়ে যায় নি। সহস্র বৎসর পূর্ব্বে তারা ঠিক যেরূপভাবে জীবন যাপন করে-ছিল, আজও অবিকল সেইরূপে তাদের দিন কাটিয়ে দেয়। এই নরখাদকেরা আমাদের যখন ব্যোমযান থেকে নামতে দেখল তখন তো তারা আমাদের দেবতা বলে বোধ করেছিল। তারপর যখন তাদের এই ভয় দূর হয়ে গেলে তাদের জীবনধারা পদ্ধতি পর্য্যবেক্ষণ করবার সুযোগ হয়, তখন তারা তাদের বিজয় চিহ্নস্বরূপ শত্রুর মাথার খুলির বিনিময়ে আমাদের কাছ থেকে খুর বা সিগারেটের খালি টিনের বাক্স চাইতে লাগল। তারা আমাদের একটা প্রকাণ্ড বাজপাখী বলে গণ্য করেছিল। সভ্যজগতের মাঝখানে তাদের নগ্নমূর্ত্তি আমাদের চিত্তে যেরূপ বিস্ময় উদ্রেক করে, আমাদের এই পোষাক পরিচ্ছদ শোভিত আকৃতি তাদের সেই অরণ্যভূমিতে দেখে তাদেরও ঠিক সেইরূপ বিস্ময় জেগেছিল। হয়তো তার চেয়েও বেশি অবাক হয়েছিল তারা। কেননা শাদা মানুষ দেখা তো দূরের কথা, শাদামানুষের কথাই তারা জীবনে কখনও শোনে নি।

এক সপ্তাহ তাদের সঙ্গে বাস করার পর আমরা বুঝলাম যে আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা ঠিক কিরূপ ছিল, তাদের কি কঠিন কর্ম্মক্লান্ত জীবন যাপন করতে হয়েছিল, অসভ্যতার এই প্রথম ধাপ থেকে সভ্যতার শেষ ধাপে উঠতে তাদের কত না কষ্ট স্বীকার করতে হয়েছে।

পাপুয়া হচ্ছে নিউগিনিরই একটি অংশ বিশেষ। আর আয়তন হিসাবে নিউগিনি পৃথিবীর মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে। এর অনেক অংশই এখনও মানুষের অজ্ঞাত রয়ে গেছে। বিষুবরেখার দক্ষিণে আর অষ্ট্রেলিয়ার ঠিক ওপরে এই দ্বীপটি বিস্তৃত। এর দৈর্ঘ্য প্রায় পনের শ মাইল। এর পার্ব্বত্য নদীগুলিতে ঝড়-জলও হয় খুব এবং মিসিসিপির মত সগর্জ্জনে দেশ ভাসিয়ে দিতেও বেশ পটু। সমুদ্রের তীরে মাঝে মাঝে দু'একজন ব্যব-সায়ী যে বসবাস করে না তা' নয়। যদিও এই দ্বীপটি লণ্ডন ও সিডনির যাতায়াতের পথে পড়ে, তবুও এর অভ্যন্তরভাগ আজও আমাদের অজানা রয়ে গেছে।

নরখাদক মানুষ আর নারিকেলের এক অদ্ভুত দেশ এই পাপুয়া। নানাজাতির পাখী, পাহাড়, জলা-ভূমি, কুমীর, সাপ আর মশার সমবায়ে পাপুয়া বেশ রহস্যজনক দেশ।

আমেরিকার কৃষিবিভাগ থেকে আমাদের এখানে পাঠান হয়েছিল আকের পোকা মারবার ওষুধ খুঁজতে আর আমাদের দক্ষিণের রাষ্ট্রগুলিতে এদের চাষ আবার নতুন করে আরম্ভ করবার জন্যে।

পাপুয়ার রাজধানী পোর্ট মেরেশাবিতে গিয়ে আমরা দেখলাম যে সেখানকার বাড়িগুলি সব সমুদ্রের জলের ওপর তৈরি। নিষ্ঠুর পাহারী শত্রুর কাছ থেকে আত্মরক্ষা করবার জন্যই তাদের বাড়িগুলি এমনি ভাবে করা হয়েছিল। স্বাস্থ্য রক্ষার জন্যে আজকাল গভর্ণমেণ্টও এমনি বাড়ি করতে বলছে। প্রত্যেক বাড়িতে ছিল একটি করে ছোট্ট নৌকা। কে জানে কখন কি বিপদ আপদ ঘটবে। আমরা যখন যাই তখন পোর্ট মেরেশাবির শাদা মানুষের সংখ্যা ছিল তিন শ'। তারা হয় সরকারী কর্ম্মচারী কিংবা ব্যবসায়কারী। তার রপ্তানী জিনিষ হচ্ছে নারিকেলের শাঁস, রবার, তাম', রূপা, শামুক, মুক্তা ইত্যাদি।

প্রথম তিন সপ্তাহ আমরা নদীগুলির ব-দ্বীপে অভিযান সুরু করলাম। এখানকার সামাজিক ব্যবস্থা বেশ কৌতুকজনক। বংশ বৃদ্ধির জন্য এখানকার লোকে বিবাহ করে। বাপমাই ছেলে মেয়েদের বিবাহ দেয়। যদিচ তাদের এই কৈশোরের বিবাহ পরীক্ষামূলক তথাপি ইহাই ভবিষ্যতে পাত্রপাত্রীরও মতামত হয়ে যায়। বাগদানের পর ভবিষ্যতে যদি সত্য সত্যই বিবাহ না হয়, তা হলে পাত্রীপক্ষকে গহনাপত্র পাত্রদের ফিরিয়ে দিতে হয়। পাত্রীর জন্য যে মূল্য দিতে হয়, তা এমন কিছু বেশী নয়। এখানে স্ত্রী তার স্বামীকে ত্যাগ করতে পারে, তবে স্বামীত্যাগ করবার সময়ে স্ত্রীকে সমস্ত জিনিষপত্র ফিরিয়ে দিতে হয়। এখানে স্ত্রী-শিশু হত্যা করার প্রথা থাকার দরুণ এক একটি পুরুষ বহু বিবাহ করে বিবাহিত পুরুষের এক চতুর্থাংশের একটির বেশি আর অনেকের ছ' সাতটি পর্য্যন্ত পত্নী আছে। ফলে অবিবাহিত পুরুষের সংখ্যা বেড়ে গেছে। তারা "রাবি" বা আড্ডা ঘরে বাস করে। বিবাহিত পুরুষও মাঝে মাঝে শান্তি পাবার জন্য কিংবা উৎসবাদিতে যোগ দেবার জন্য আড্ডাঘরে যায়। এখানে জিনিষপত্র কেনা-বেচা হয় ঝিনুকের সাহায্যে। ঝিনুক কেটে বেশ হাতের গহনার মত করা হয়। এরা কাপড় পরার অভাব বোধ করে না। ছ' বছর পর্য্যন্ত তারা দিগম্বর হয়ে দিন কাটায়। পুরুষেরা শোকের দিনে মাথা কামিয়ে ফেলে। মাথা কামান এখানে ভীষণ কষ্টকর। একটি একটি ক'রে চুল ছিঁড়ে এখানে মাথা কামান হয়। যাকে কামান হয়, সে চিৎ হয়ে থাকে, আর নাপিত তার বুকের ওপর চেপে বসে। কাদা বা অন্যান্য অলঙ্কার দিয়ে দাড়ি সুসজ্জিত করা হয়। বিবাহের আগে মেয়েরা মাথায় লম্বা চুল রাখে; কিন্তু বিবাহের পর তাদের চুল

ছাটতে হয়। গৃহিণীরা মাথা পরিষ্কার কামিয়ে ফেলে কিংবা ববছাট দেয়। মাঝে মাঝে কয়েকটি গুচ্ছ রেখে দেওয়া হয় ঝিনুক বাঁধবার জন্যে।

এখানকার লোকেরা সব সময়েই তীর ধনুক নিয়ে চলা-ফেরা করে, সে কিবা নৌকা কিবা জঙ্গল। কারণ যে কোন মুহূর্ত্তে শূকরে আক্রমণ করতে পারে। শূকর এখানকার সব চেয়ে বিপজ্জনক প্রাণী। এখানে মেয়ে পুরুষ দু'জনেই মাছ ধরে। মাছ কিন্তু ধরা হয় তীর ধনুক দিয়ে। মাছ ধরা হয় সচরাচর রাত্রে। পাপুয়ার উপসাগরে অসংখ্য কাঁকড়া আছে। এই কাঁকড়া দিয়ে উপকূলবর্ত্তী লোকগুলি দেশের ভেতরকার অধিবাসীর কাছ থেকে তামাক নেয়।

আমরা প্রথম যখন সেখানে যাই, তখন কতকগুলি নরহত্যা হয়েছিল। 'গোয়ারিবাড়ীর' গ্রামবাসীরা ডুরামা নদীর তীরের অধিবাসীদের সঙ্গে বিবাদ করে। তাদের মধ্যে যে রক্তপিপাসা প্রবল পরিমাণে বর্ত্তমান, তা বেশ বোঝা যায়। তারপর এক বিবাহোৎসবে অসংখ্য নরহত্যা হয়, অসংখ্য মানুষের মাথা ছিনিয়ে নেওয়া হয় বিজয় চিহ্নস্বরূপ। তারপর সরকার পক্ষ থেকে এর এক তদন্ত আরম্ভ হয়।

এরা ধূমপান করে ভারী আশ্চর্য্য রকমে। এদের সিগারেটের পাইপটি লম্বায় প্রায় দু' তিন ফুট এবং তার ব্যাস প্রায় তিন চার ইঞ্চি। এর একদিক খোলা। সেখানে আর একটি সরু নল লম্বভাবে দেওয়া আছে। সিগারেট পাকিয়ে কলার পাতায় পুরে সেই সরু নলটাতে রাখা হয়। আমরা জানতাম যে ষোড়শ শতাব্দীতে রালের ধূমপানের পূর্ব্বে আমেরিকা ছাড়া তামাক মানুষের অজ্ঞাত ছিল; কিন্তু এখানে দেখলাম যে এই নিউগিনিতে তার বহু পূর্ব্বেই তামাকের প্রচলন ছিল।

পাপুয়ার অভ্যন্তরে কোন ব্যোমযান ইতিপূর্ব্বে প্রবেশ করে নাই। আমি প্রথমে তার নদনদী জলপ্রপাতের সঠিক মানচিত্র আঁকার দিকে মন দিলাম। আগে কিন্তু পূর্ব্ব উপদ্বীপে অভিযান সুরু হয়েছিল। তা' ছাড়া তার তীরভূমিও সকলেরই প্রায় জানা ছিল।

ইতিমধ্যে "বানাপা" নামে জাহাজখানা এসে পৌছাল। তাতে আমাদের প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র ছিল। সকলের সুসংবাদ শুনে আমরা খুব খুসী হলাম; কিন্তু সেই খুসীর মাত্রা বেড়ে গেল—যখন দেখলাম, সেই জাহাজেই দুইজন আমেরিকান মহিলা এসেছেন। তাঁদের একজন ছিলেন শিল্পী আর একজন ছিলেন তাঁর সঙ্গিনী। তাঁরা আসছেন ক্লীভল্যাণ্ড থেকে। সারা পৃথিবীর চিত্র সংগ্রহ করা তাঁদের উদ্দেশ্য। তাঁরা বললেন যে, তাঁরা আমাদের সঙ্গে যাবেন ফ্লাই নদীর অভিযানে। তবে এটাও ঠিক যে, তাঁদের প্রধান তাঁবু থেকে বেশী দূর নিয়ে যাওয়া যায় না। কাপ্তেন তাঁর সেই তাঁবুতে তাঁর এই অতিথিনীদের অভ্যর্থনা করলেন।

২১শে জুলাই আমরা ফ্লাই নদীর ক্যাম্পে গিয়ে পৌছালাম। প্রতিদিন রুটিন অনুযায়ী কাজ করা হ'তে লাগল। প্রথমে আমরা দস্তুরমত পাহাড়া দিতে লাগলাম। কি জানি কোন দুর্ঘটনা যদি ঘটে। তবে আদিম অধিবাসীদের মধ্যে শত্রুতার চিহ্ন পাওয়া যায় নি। তারা দু'বার আমাদের দেখে গেছল। প্রথমে তারা আসে মস্ত এক পাইথন সাপ নিয়ে। ভেবেছিল তাতে আমরা তুষ্ট হব। তারা সাপের মাংস খায়। দ্বিতীয়বার তারা এক মরার মত কুমীর আমাদের তাঁবুর সামনে এনেছিল। আমাদের পাইলট তো প্রথমে বিশ্বাসই করে নি। সে তার ওপর আরও দু'টি গুলী ছুড়েছিল। মরার ওপর খাঁড়ার ঘা। তারা কিন্তু তাকে নির্ভয়ে ও নিরুদ্বেগে বয়ে এনেছিল। সারারাত্রি সে একটু একটু নড়েছিল বটে, তবে কোন ক্ষতি করে নি।

তখন বর্ষাকাল শেষ হয়ে গেছল। মাটিও বেশ শুকিয়ে গেছে। স্যাঁৎ সেঁতে জমি ছাড়া আর সবই প্রায় শুক্‌নো। সেটা ছিল মশাদের ডিম পাড়বার সময়। সেখানে তিন প্রকারের এ্যানোফিলিস মশা দেখা যায়। মশার দৌরাত্ম্যে সূর্য্য অস্ত গেলেই বিছানায় শুতে যেতে হ'ত।

মারী হ্রদের তীরে একটি সমৃদ্ধিশালী গাঁয়ে আমরা গিয়ে পৌছালাম। এখানকার লোকেরা আমাদের দেখে তাদের জীবন নিয়ে পালাল জঙ্গলের মধ্যে। উত্তর-দক্ষিণে এই মারী হ্রদ। প্রায় চল্লিশ মাইল লম্বা। আমরা তখন তার

ধার দিয়ে যাচ্ছিলাম, তখন অসংখ্য রাজহাঁস, পাতিহাঁস আর বক জল থেকে উঠতে লাগল। পেক তাদের শীকার করতে চেষ্টা ক'রেছিল। আমাদের এই দীর্ঘ অভিযানে এ হ্রদের ধারে ছ'টি গ্রাম দেখেছিলাম। আমরা ঐ গ্রামবাসীদের দেখবার জন্যে একটু নীচে নেমেছিলাম; কিন্তু তারা আমাদের দেখেই পালিয়ে গেল। তাদের পদচিহ্ন ছাড়া আর কিছু পাওয়া গেল না। আমাদের তো তারা প্রথমে অলৌকিক ব'লেই ভেবেছিল। এখানকার সমস্ত অধিবাসীরাই ভূতকে দৃঢ় বিশ্বাস করে। তারা দুই শ্রেণীর ভূতে বিশ্বাস করে। প্রথম শ্রেণী মানুষের মঙ্গল করে আর দ্বিতীয় শ্রেণী মানুষের অকল্যাণ সাধন করে। অনেকে মৃত বন্ধু বা শত্রুর তুষ্টিসাধন করে তাদের দৌরাত্ম্যের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্যে।

অবশ্য সাগর তীরের লোকেরা সহজেই এই ব্যোমযানের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন ক'রে ফেলেছিল। সাদা মানুষের অসাধারণ শক্তি তারা তুচ্ছ ব'লেই বোধ করে। দাঁড় ও পাল ছাড়া নৌকা চলতে দেখে, কলের গানের কথা শুনে তারা সহজে কিছু আর অবিশ্বাস করে না। তারা ঘাড় নেড়ে যেন বলতে চায় যে নিউগিনির ফ্যাশনের সঙ্গে সাদা মানুষের ফ্যাশনের অনেক তফাৎ।

প্রথম যে গ্রামটা দেখেছিলাম আমরা, আবার সেই গ্রামের কাছ দিয়ে গেলাম। তার সামনেকার হ্রদের ওপর আমাদের ব্যোমযান নামল, কাছে গিয়ে গ্রামটা বেশ পরিষ্কার দেখা গেল। সেখানে 'ডুবু' বা বাড়ি বেশ ধরণের। যেমন লম্বা, ভেতরটা ঠিক তেমনি অন্ধকার। তাকের উপর মানুষের মাথার খুলি সাজান। অতিথিকে হয় তো সচকিত করে দেবার জন্যে। যদি তারা তার মধ্যে প্রবেশ করতে চায় তবে তাদেরও ঐ দুর্দশা ঘটবে। "ডুবু"গুলো হ্রদের দিকে মুখ করা ছিল। নারকেল এবং অন্যান্য গাছগাছড়ার মধ্যে তাদের বেশ দেখাচ্ছিল। জলের ধারে নৌকা বাঁধা ছিল। লম্বা ঘাসের মধ্যে দিয়ে খাড়াই কিনারা পর্য্যন্ত একটা সরুরাস্তা রয়ে গেছিল। কাউকে পালিয়ে যেতে দেখলাম না বটে তবে মনের মধ্যে বেশ অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম। কিরূপে তারা আমাদের অভ্যর্থনা করবে, না জানায়— উড়োজাহাজখানা পেছন করে তীরের দিকে ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়া হল। আমরা উড়োজাহাজ থেকে অবতরণ করে বন্ধুভাবে চীৎকার করতে করতে অগ্রসর হতে লাগলাম। কোন উত্তর পাওয়া গেল না। বুঝতে পারলাম না যে সেই নিরুত্তর শুভ চিহ্ন না অসভ্য মানুষেরা বহু দূরে পালিয়ে গেছে, এরই অভিব্যক্তি। আমাদের হাতে বন্দুক ছিল না। সেই বেটে মানুষগুলোর কাছে এই বন্দুক মস্ত লাঠির সামিল। আর খাপে ভর্ত্তি পিস্তল তার কাছে অলঙ্কার স্বরূপ। তারা বিশ্বাস করতে সাহস করে নি যে এইটুকু পিস্তলের মধ্যে মৃত্যু লুকিয়ে থাকতে পারে। আত্মরক্ষার একমাত্র অস্ত্র ছিল আমাদের প্রাণখোলা হাসি। আমরা যতই অগ্রসর হতে লাগলাম, ততই আমাদের আনন্দ প্রকাশ করতে আরম্ভ করলাম। তবুও এমন কিছু দুর্ঘটনা ঘটল না। হঠাৎ ডান দিকের ঘাস নড়ে উঠল। তবে কি ওর মধ্যে কোন যোদ্ধা আত্মগোপন করে আছে? একটু দাঁড়িয়ে যাওয়াই সুবিবেচনার কাজ বলে বোধ হল। তবুও আমরা চীৎকার করতে করতে এক এক পা করে অগ্রসর হতে লাগলাম। ভাবলাম আমরা বুঝি ঐ অসভ্য নরখাদক জাতির দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়েছি; কিন্তু কোন মানুষের আর চিহ্ন পাওয়া গেল না। ভাবলাম তবে এ নিশ্চয় বাতাসের কারসাজি। কিন্তু তাও সত্য নয়। অকস্মাৎ একজন লাফিয়ে আমাদের সামনে বার হয়ে এল। তার দাড়ি ছিল আর পরনে ছিল শাদা ঝিনুকের কাপড়। এক একবার পেছিয়ে যাচ্ছিল। তাকে রঙিন কাপড়ের লোভ দেখালাম তার সঙ্গে আলাপ করব বলে। পেক ইতিমধ্যে তার ফটো তুলে নিল। আরও ছ'জন এসে তার সঙ্গে যোগ দিল। তারা সকলে বেশ রীতিমত ভয় পেয়ে গেছল। তারা আমাদের খুব কাছে এগিয়ে যেতে দেয়নি। এমনি করে ত্রিশ চল্লিশ মিনিট গেল। তারপর এক মোড়ল সেই রঙিন কাপড় নিল। আমাদের সহযাত্রী পেম্বারটন লম্বা আখ দেখে সঙ্কেতে নিজের ক্ষুধা জানিয়ে তাদের আখ আনতে পাঠাল। শীঘ্রই তারা মুঠো মুঠো করে আখ নিয়ে এসে হাজির হল। এর সাহায্যে বেশ বিনিময় ব্যবস্থা হল। এই

ব্যবসায়ে জনতা বেশ শান্ত হল। কিন্তু তবুও সকলে বেশ দূরে দূরে রইল। দু'একজন অতিসাহসী আমাদের খাঁকি জামাকাপড় স্পর্শ করতে সাহস করেছিল। তারা তারপর মানুষের মাথার খুলি নিয়ে এল। এগুলি তাদের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। তারা ক্ষুর, বরশি, সিগারেটের খালি টিনের কৌটার বদলে তাদের ঐ সম্পদ দিতে চাইল।

এখানকার অনেক জায়গা আজও সরকারের অধীনে আসে নি। নরখাদক মানুষ হাজার বছর আগে যেমনটি ছিল, আজও তারা ঠিক তেমনি করে তাদের জীবন কাটাচ্ছে। পাপুয়ার লোকেরা এখন তাদের পূর্ব্ব-পুরুষদের আচার ব্যবহার এতটুকু ত্যাগ করে নি। তবে মানুষের মাথা তারা হামেসাই শিকার করে বেড়ায় না। তবে দেশের অভ্যন্তর ভাগের বহু লোকেরই এইরূপ ভাবে জীবনপাত হয়। বিরাট হত্যাকাণ্ড সব সময় বড় একটা হয় না, তবে ইতস্ততঃ ছোটখাটো নরহত্যা প্রায়ই হয়ে থাকে। ফ্লাই নদীর উত্তর এবং মধ্য অংশের অধিবাসীদের বিনা অস্ত্রে চলা-ফেরা করতে দেখা যায় না। এখানকার তীরের বেশ একটা বৈশিষ্ট্য আছে। সেগুলি ওয়াশিংটনের স্মিটশোনিয়ান ইন্‌ষ্টিটিউশনে রাখা হয়েছে। তীরগুলি সহজেই দেহের মধ্যে প্রবেশ করে, তবে তাদের বার করাই মুস্কিল।

মারী হ্রদের ধারের একটি লোক একটা বাঁশী চেয়ে বসল। এরা আমাদের উড়োজাহাজের ভেতরটা পরীক্ষা করবার জন্য ব্যাগ্র হয়ে গেল। তারা সবাই জাহাজ-খানার চারদিকে ভীড় করে দাঁড়িয়েছিল তাদেরকে ঠেলা দিয়ে সরিয়ে দিতে হল। এইখানেই প্রথমে আমরা মেয়েছেলে দেখতে পাই। ইতিপূর্ব্বে মেয়েদের আর ছেলেদের জঙ্গলের মধ্যে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল আমাদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্যে। এখানকার মেয়েদের অবস্থা বড় খারাপ। ঠিক পুরুষদের মত তারা নয়। পুরুষেরা বেশ লম্বা চওড়া এবং স্বাস্থ্যবান। তা' ছাড়া তারা ভাবে তারাই বুঝি পৃথিবীর মালিক। তাদের মধ্যে বেশ একটা আত্মপ্রত্যয়ের ভাব লক্ষ্য করেছিলাম। তাদের নাক ছিল বেশ পরিষ্কার। তাদের সেমিটিক জাতি বলে বোধ হয়। মেয়েরা কিন্তু ক্ষুদ্রাকৃতি। একজনকে একটি শূকরছানা আদর করতে দেখলাম। শূকর জননীকে হত্যা করলে এখানকার লোকেরা তাদের প্রিয়তমাকে দেয় সেই শূকরীর ছানা পুষতে।

ফ্লাই নদীর উত্তরাংশের লোকদের বলা হয় "ন্যেগ্রিটশ"। তাদের জাতি ক্রমে ক্রমে ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে। তারা এক বহু প্রাচীন বংশের শেষ পুরুষ। এই ক্ষুদ্র মানুষগুলোকে কিঞ্চিৎ দয়া করা প্রয়োজন। সভ্যতা বিস্তার আর তাদের রাজ্য হারানর সঙ্গে সঙ্গে তারা ধ্বংসের দিকে এগিয়ে চলেছে। তারা আধুনিক জগতের সঙ্গে আদৌ খাপ খায় না।

"এডেরিল অংসনের" একশ মাইল উত্তরে প্রায় দেশটা বেশ ঢালু হয়ে গেছে। সেখানকার বহু জঙ্গল খুবই গভীর। এখানে বাস করে বেটে পিগমিল। তারা মাটি থেকে প্রায় পঞ্চাশ ফুট উর্দ্ধে গাছের ওপর তাদের ঘর তৈরি করেছিল। আমরা উড়ে যাবার সময়ে এই গুপ্ত আবাসস্থলগুলি দেখেছিলাম।

পিগমিদের মধ্যে "জারেপ" বলে একটি লোকের দেখা পাওয়া গেছল। সে মালয়ের পুলিশ বিভাগে কাজ করত। সুতরাং সে মালয় ভাষা বলতে পারত। আর পেক আমাদের মালয় ভাষায় বেশ ওস্তাদ ছিল। তার কাছ থেকে আমরা সেখানকার নদী গ্রাম ইত্যাদির দেশীয় নামগুলি শিখলাম। সে বলল যে সেখানকার লোকেরা আমাদের এই অতিকায় বাজপাখীটিকে দেখে ভেবে নিয়েছিল যে, তাদের শেষ দিন বুঝি এসে গেছে। এখনই বুঝি একটা প্রলয়কাণ্ড হয়ে যাবে। তারা ভেবেছিল যে এই অতিকায় পাখীটা হয়তো এবার তাদের সকলকে খেয়ে ফেলবে। তারা সকলে ভয়ে মাটির মধ্যে মুখ লুকিয়ে ছিল। আমরা যখন সেখানে গেলাম তখন দেখলাম যে সবাই প্রাণ হাতে করে স্ত্রী পুত্র নিয়ে দূরে পালিয়ে যাচ্ছে।

প্রতীক্ষা

গী দ্য মোঁপাসা

অনুবাদ—চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়

একজন বুড়ো ভিখারী এসে হাত পেতে দাঁড়াল আমাদের কাছে। বন্ধু জোসেফ ওর হাতে পাঁচ ফ্রাঁক সঙ্গে সঙ্গে তুলে দিতেই অবাক হলাম। ভিখারী চলে গেল আশীর্ব্বাদ করতে করতে।

জোসেফ বলল, 'এই ভিখারীকে দেখে আমার পুরোণ একটা গল্প মনে পড়ল। সেটা যদি শুনতে চাও ত' তোমায় শোনাই। সেই গল্প আজও আমি ভুলতে পারি নি।'

সাগ্রহে সম্মতি দিই।

জোসেফ ব'ল্তে সুরু ক'রলো: ···তুমি জান আমাদের অবস্থা একেবারে ভাল ছিল না। কোন রকমে দিনগুলো কেটে যেত। বাবা অক্লান্ত পরিশ্রম করতেন অফিসে, অফিসের কাজে নিজেকে ক্লান্ত করে অবসন্ন হয়ে বাড়ী ফিরতেন, কিন্তু তার বদলে উপায় করতে না এমন কিছু! লা হাভ্রের নিম্নমধ্যবিত্ত সংসারে আমি মানুষ। আমি, আমার দু' বোন, মা, বাবা নিয়ে আমাদের দুঃখের সংসার।

মা এই দুরবস্থার জন্য কষ্ট পেতেন, মাঝে মাঝে বাবাকে ভর্ৎসনা করতেন। সেই ভর্ৎসনার সময় বাবার অবস্থা দেখে যা কষ্ট হত আমার! বুকটা যেন ফেটে যেত। ক্লান্ত ভঙ্গীতে, করুণ দৃষ্টিতে কপালে হাত বোলাতেন, কপালের ঘাম মুছ্ছেন যেন! উপলব্ধি করতে পারতাম তাঁর অসহ্য এই মনোবেদনা। কি অসহ্য যন্ত্রণায় তাঁর বুক খাক্ হয়ে যাচ্ছে, তা তাঁর এই অসহায় ভঙ্গীটুকুই আমাকে ছেলেবেলায় বুঝিয়ে দিত।

সংসারের খরচপত্র সাবধানে করা হত। কেউ ডিনা-রের নিমন্ত্রণ করতে এলে গ্রহণ করা হত না, পাছে তার ফিরতি দিতে হয়। সস্তা দামে বাজার থেকে খারাপ জিনিষ কেনা হত। বোনেরা আমার নিজেদের পোষাক নিজেরাই তৈরী করে নিত। সামান্য প্রসাধনের জিনিস নিয়ে ওদের অন্তহীন আলোচনা ফুটে উঠত, কত বঞ্চনাই না ওদের সহ্য করতে হচ্ছে।

প্রত্যেকদিন খাবার যা বখরা থাকত, তাতে মনে হত, এ ছাড়া অন্য জিনিস খেতেই রসনা বেশী ব্যাকুল, কিন্তু উপায় নেই, সামান্য ঝোল আর মাংস ছাড়া কিছু খাওয়া বিলাসিতা ছিল আমাদের। সামান্য একটা বোতাম হারালে বা ট্রাউজার ছিঁড়লে যে বিশ্রী দৃশ্যের অবতারণা হতো, সে কথা নাই বা শোনালাম।

কিন্তু তবু প্রত্যেক রবিবার বন্দরের পাশের রাস্তা দিয়ে আমরা বেড়াতে বেরোতাম, আমাদের সেই যাওয়ার মধ্যে সাপ্তাহিক সমস্ত দীনতা মুছে যেত যেন। বাবা কোট, টুপী আর দস্তানা পরে মায়ের হাত ধরে চলতেন। মা চলতেন যেন একটা বড় জাহাজের মত, আমরা ছোট ছোট জাহাজ তাঁর সঙ্গে বাঁধা।

যাবার সময়ের অনেক আগে থাকতেই বোনেরা যাবার জন্য প্রস্তুত, কিন্তু প্রত্যেকবারই ঠিক যাবার সময় বাবার কোটটায় কিছু অজানা দাগের আবিষ্কার বাধা হয়ে দাঁড়াত। ছোটাছুটি পড়ে যেত বেঞ্জিন দিয়ে দাগটা ওঠানোর জন্য।

বাবা মাথায় টুপী পরে খাড়া দাঁড়িয়ে থাকতেন, যতক্ষণ না ব্যাপারটা শেষ হয়। মা তাঁর ক্ষীণ দৃষ্টিসম্পন্ন চোখ দুটোর ওপর ঠিক করে লাগাতেন চশমাটা, হাতের দস্তানা খুলে, পাছে ও দুটো ময়লা হয়ে যায়।

আড়ম্বরের সঙ্গে আমরা যাত্রা করতাম। বোনেরা আমার হাত ধরাধরি করে আগে আগে চলত। ওদের তখন বিয়ের সময় হয়েছে, তাই অনিবার্য্য ভাবেই শহরের সকলের লক্ষ্যবস্তু হয়ে উঠেছে ওরা। আমি মায়ের বাঁ পাশে আর বাবা মায়ের ডান পাশ ধরে হাঁটতেন।

সাপ্তাহিক এই ভ্রমণের সময়, আমার বাবা মার অভিজাত চলন ভঙ্গিমার ছবিটুকু আজও মনে আছে। মার শরীরের মধ্য দিয়ে একটা দৃঢ়তার আভাস, তার মুখে আনন্দের ছোঁয়াচ মনে করিয়ে দিত, যেন আমরা অপূর্ব্ব একটা কাজে চলেছি।

প্রত্যেকবার বাবা বন্দরের পাশ দিয়ে যাবার সময় যখন বড় বড় জাহাজকে ঢুকতে দেখতেন, তখন সেই একই কথা বার বার বলতেন, 'জুলস যদি ওই জাহাজটায় থাকে, তা হলে কি বিস্ময়কর ব্যাপারই না হবে?

মনে আছে কাকা জুলস্ সে সময় আমাদের ক্ষয়িষ্ণু সংসারের একমাত্র আশা। কাকা এককালে বিভীষিকার মত ছিল যদিও, তবু সেদিন তাঁর আসাপথ চেয়েই বাবা মা দিন গুণছিলেন।

ওঁর সম্বন্ধে ছেলেবেলা থেকে কত কথাই না শুনেছি, মনে হত, বাবার আশা মত এক্ষণই যদি দেখা হয় ত' তাকে প্রথম দর্শনেই চিনতে পারব। যদিও তার সম্বন্ধে বাবা মার আলোচনা খুব বিরক্তি নিয়েই করা হত গোড়ার দিকে, তবু সেই বিরক্তিকর আলোচনার পথ ধরে' তাঁর আমেরিকা যাওয়ার সব কাহিনীটুকুই জেনে ফেলেছিলাম।

গরীব সংসারের টাকা নষ্ট করার অপরাধের তুলনা হয় না। বড়লোকের বাড়ীতে তাঁর কাজ হয়ত নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় ব'লে উড়িয়ে দেওয়া যেত, কিন্তু দরিদ্র সংসারে যে লোক টাকা নিয়ে ছিনিমিনি খেলে, তাকে গোল্লায় যাওয়ার অপরাধে গালাগাল দেওয়া ছাড়া কিছু করার নেই। কাকা পৈত্রিক সম্পত্তির শেষ কাণ্‌কড়ি পর্য্যন্ত নষ্ট করলেন—বাবার সমস্ত আশাকে ধূলিসাৎ ক'রে দিয়ে। তাই অনেকের মত কাকাকে নিউইয়র্কের পথে একটা জাহাজে তুলে দেওয়া হল, দুষ্কৃতির কলঙ্ক থেকে উদ্ধার পাবার জন্য।

কাকা জুলস্ সেখানে কিছু ব্যবসার পত্তন করে কিছু সুবিধা নিশ্চয় করেছিলেন, তাই তিনি একদিন নিজের দোষের জন্য ক্ষমা চেয়ে চিঠি লিখলেন, জানালেন বাবার টাকা তিনি শোধ করে দেবেন তাড়াতাড়ি।

এই একটা চিঠি তাঁর সম্বন্ধে সমস্ত বীতরাগ মুছে দিল সকলের মন থেকে। সামান্য খড়কুটোর চেয়ে যাকে মূল্যবান ভাবা হত না, সেই আমার কাকা আমাদের সকলের কাছে সাহসী, খাঁটি মানুষ হয়ে উঠলেন। তিনি যে তাঁর বংশের মুখ রেখেছেন, এতে খুশী হয়ে ওঠে সবাই।

জাহাজের একজন ক্যাপ্টেন এ ছাড়া আরও একটা খবর দেয় আমাদের যে, তিনি নিউইয়র্কে বিরাট একটা দোকান ঘর ভাড়া করে বেশ ব্যবসা চালাচ্ছেন।

দু'বছর পরে আবার কাকার চিঠি পেলেন আমার বাবা। তাঁর ব্যবসার অবস্থা নাকি খুবই ভাল। তাঁর শরীর সম্বন্ধে ভাববার প্রয়োজন নেই। বহুদিনের জন্য নাকি তিনি দক্ষিণ আমেরিকা যাচ্ছেন। সেই জন্য অনেকদিন হয়ত তিনি আর কোনো চিঠি লিখতে পারবেন না। তবে তিনি আশা করেন, তিনি প্রচুর ঐশ্বর্য্য নিয়ে লা হাভ্রেতে ফিরে যাবেন। আবার সুখে দিন কাটান যাবে সকলে মিলে।

এই দ্বিতীয় চিঠিটাই আমাদের সংসারের সম্পদ হয়ে উঠল। বার বার এটা পড়া হল, বার বার প্রত্যেককে এটা দেখান হল, যেন ঐশ্বর্য্যটা এসে গেছে আমাদের হাতের মুঠোয়।

দশ বছর ধরে কাকার কাছ থেকে আর কোন চিঠি পাওয়া যায়নি। কিন্তু যতই দিন যেতে লাগল, ততই বাবা স্থির নিশ্চয় হয়ে উঠলেন ঐশ্বর্য্য প্রাপ্তির সম্ভাবনায়। মা'ও মাঝে মাঝে বলতেন, জুলস্ যখন ফিরে আসবে তখন সব পাল্‌টে যাবে।

তাই স্বাভাবিক ভাবেই প্রত্যেক রবিবার বন্দরের ধারে দাঁড়িয়ে, অনেক দূরে সমুদ্রের বুকে জাহাজের আকাশের বুকে কালো সাপের মত কুণ্ডলী পাকিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে দেখলেই বলে উঠতেন বাবা সেই অতি পরিচিত কথাটা, 'জুলস্ যদি ওই জাহাজটায় থাকে, তা হলে কি বিস্ময়কর ব্যাপারই না হবে।'

আমরাও রুদ্ধশ্বাস হয়ে অপেক্ষা করতাম, এই বুঝি বাবা সাদা রুমাল উড়িয়ে কাকার অভ্যর্থনায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন।

কাকার ঐশ্বর্য্য নিয়ে প্রত্যাবর্ত্তন সম্বন্ধে কত গভীর আলোচনা হয়ে গেছে, হয়ে গেছে কত পরিকল্পনা। কাকার টাকা নিয়ে ইনগৌভিল্‌ পল্লীতে বাড়ী কেনা হবে। আমি এ কথা জোর গলায় বলতে পারি না, বাবা বাড়ী কেনার জন্ম ইতিমধ্যে কোন কথাবার্ত্তা চালান নি। ঐশ্বর্য্য প্রাপ্তি সম্বন্ধে এমনি তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস।

…আমার বড় বোনের বয়স তখন আঠাশ হবে, ছোট বোনের বয়স ছাব্বিশ। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের ব্যাপার, ওদের বিয়ে দেওয়া সম্ভব হয় নি।

ঠিক এই সময়ে ছোট বোনের প্রণয়াকাঙ্ক্ষী হয়ে এক সম্ভ্রান্ত কেরাণী প্রস্তাব করল বাবার কাছে। প্রথমতঃ ও ইতস্ততঃ করেছিল, আমাদের অবস্থার দৈন্য দেখে হয়ত, কিন্তু এক সন্ধ্যায় কাকার শেষ চিঠিটা তার মতস্থির করতে সাহায্য করেছে বলেই আমার বিশ্বাস।

কথাবার্ত্তা তাড়াতাড়ি স্থির হয়ে গেল। কথা হল, বিয়ের পর জার্সিতে আমরা সকলে বেড়াতে যাব।

গরীব লোকেদের পক্ষে জার্সি তখন বেড়াবার একমাত্র জায়গা। বেশী দূরও নয়, ছোট একটা ষ্টীমারে করে' সমুদ্র পারাপার করলেই বিদেশে যাওয়ার সমান কাজ হয়, কেননা জার্সি দ্বীপে ইংরাজ কর্ত্তৃত্ব। দু'ঘণ্টা জাহাজে ভ্রমণ করে নতুন বিদেশী প্রতিবেশীদের দেখতে পাওয়ার সৌভাগ্য গরীবদের পক্ষে কম কিসে!

সামান্য এই জার্সি দ্বীপ ভ্রমণের পরিকল্পনা আমাদের প্রতি মুহূর্ত্তের আশা, প্রতি মুহূর্ত্তের স্বপ্ন হয়ে উঠল; এই চিন্তায় মসগুল হয়ে রইলাম সবাই।

অবশেষে একদিন যাত্রা করলাম আজও সেদিনের ছবিটা আমার নিখুঁত মনে আছে—যেন কালই ঘটেছে সে ঘটনা। গ্রান্‌ভিল বন্দরে ছোট ষ্টীমার জলে আলোড়ন তুলে এগিয়ে আসছে। বাবা আমাদের তিনটী পুঁটলী তোলার তদারকে হাস্যকর ভাবে ব্যস্ত; মা উৎকণ্ঠা-ব্যাকুল হয়ে আমার অবিবাহিতা বোনের হাত ধরে দাঁড়িয়ে। সঙ্গী ছোট বোনের বিয়ে হয়ে যাওয়াতে দল ছাড়া অসহায়ের মত মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে আমার বড় বোন। আমাদের পেছনে নব বিবাহিত দম্পতি খালি পেছনে পড়ে যাচ্ছে দেখে, বাধ্য হয়ে ওদের ঘাড় ফিরিয়ে দেখতে হচ্ছে আমাকে।

জাহাজের বাঁশী একসময় বেজে উঠল। জাহাজে উঠলাম আমরা। জাহাজ জেটী ছেড়ে মার্ব্বেল পাথরের মত সবুজ মসৃণ জলের ওপর দিয়ে এগিয়ে চলল। ধীরে ধীরে আমাদের চোখের সামনে থেকে, তীরভূমি মিলিয়ে আসতে লাগল। যারা কখনও বাইরে বেরোতে পারে না, তাদেরই মত আমরা গর্ব্বিত হয়ে উঠলাম এ প্রমোদ যাত্রায়।

বাবার কোটের ভেতর থেকে এবার পেটটা উঁকি মারতে লাগল। কোট থেকে সমস্ত দাগ আজ বেনজিন দিয়ে সকালে উঠিয়ে ফেলা হয়েছে সযত্নে। বেনজিনের গন্ধ পাচ্ছি, মনে করিয়ে দিচ্ছে রবিবারের বন্দরের কাছ দিয়ে বেড়ানোর কথা।

বাবা হঠাৎ দেখলেন—দুটী অভিজাত ভদ্রমহিলা দুটী ভদ্রলোকের কাছ থেকে ঝিনুক নিচ্ছেন খেতে। একটা ছিন্নভিন্ন পোষাক পরিহিত বুড়ো নাবিক ছুরি দিয়ে ঝিনুকের খোলা চিরে ভদ্রলোকদের হাতে তুলে দিচ্ছে। ভদ্রলোকেরা ভদ্রমহিলাদের হাতে তুলে দিলে, তাঁরা সাবধানে রুমাল দিয়ে ধরে' সুন্দর ভঙ্গী করে মুখ এগিয়ে এনে, মুখে ঢেলে দেন ঝিনুকের জলে ভরা শাঁসটুকু—যাতে কাপড় চোপড় না নষ্ট হয়; তারপর খাওয়া হলে সমুদ্রে খোলাটা ফেলে দেন।

বাবা এঁদের খাওয়ার অভিজাত ধরণ দেখে মুগ্ধ হলেন। নিজেদের আভিজাত্য দেখাবার জন্য চঞ্চল হয়ে ছুটে এলেন মার কাছে।

—'তোমরা কেউ ঝিনুক খেতে চাও?'

মা ইতস্ততঃ করলেন খরচ হবার ভয়ে, কিন্তু আমার বোনেরা সঙ্গে সঙ্গে রাজী। মা বিরক্তি মেশানো কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'খেয়ে পেটের অসুখ বাঁধাই আর কি! ইচ্ছে হয় ওদের দিতে পার, তবে বেশী খাইওনা যেন, অসুখ না করে।' আমার দিকে চেয়ে মা হঠাৎ বললেন, 'জোসেফকে দিতে হবে না বুঝেছ, ছেলেদের অত প্রশ্রয় দেওয়া ঠিক নয়।'

মার এই অবিচার সহ্য করে মায়ের কাছে রইলাম, বাবা বোনেদের আর জামাইকে সমারোহের সঙ্গে সেই বুড়ো নাবিকের কাছে নিয়ে গেলেন।

ভদ্রমহিলা দুটি ইতিমধ্যে চলে গেছেন। বাবা আমাকে একটা ঝিনুক নিয়ে দেখাতে লাগলেন, কেমন করে কাপড় চোপড় নষ্ট না করে জিনিষটা খেতে হয়। কিন্তু ভদ্রমহিলাদের মত খেতে গিয়ে, বাবা কোট ভেজালেন আর মা বিরক্তিতে অস্ফুট স্বরে শব্দ করে উঠলেন, তাও শুনলাম।

কিন্তু হঠাৎ দেখলাম বাবা যেন অস্থির হয়ে পড়েছেন। দু'পা পিছিয়ে এসে তিনি বুড়ো নাবিকটার দিকে চেয়ে রইলেন এক দৃষ্টিতে, তারপর চলে এলেন আমাদের কাছে। বড় বিবর্ণ দেখাচ্ছে ওঁকে, চোখের দৃষ্টি কেমন-তরো। অস্ফুটস্বরে উনি মাকে বললেন, 'কি অদ্ভুত ওই লোকটাকে দেখতে ঠিক জুল্সের মত!'

মা অবাক হয়ে যান, 'কে বললে জুলস্?'

—'হ্যাঁ, যদি না শুনতাম ভাই আমার আমেরিকায় গিয়ে বড়লোক হয়েছে, তাহলে নিশ্চয় বিশ্বাস করতাম—ওই সেই।

মা বিস্ময়ে তোত্লাতে লাগলেন, 'কি বলছ তুমি, পাগল হলে নাকি, এঁ্যা! তুমিত' ভাল করেই জান যে, ও সে নয়, তবে এ রকম বোকার মত যা তা' বক্‌ছ কেন?'

বাবা জিদ করলেন, 'তবু তুমি একবার দেখে এস তোমার নিজের চোখে।'

মা এগিয়ে গেলেন মেয়েদের কাছে। আমিও মার সঙ্গে গিয়ে লোকটাকে ভাল ভাবে দেখলাম। বুড়ো, সারা মুখময় দুশ্চিন্তার ছাপ, সারা দেহ নোংরায় ভর্ত্তি। নিজের মনে কাজ করে চলেছে, আমাদের দিকে লক্ষ্যও নেই।

মা ফিরে এলেন কাঁপতে কাঁপতে, 'আমার ত' মনে হয় সেই, যাও তাড়াতাড়ি ক্যাপ্টেনের কাছ থেকে খবর নিয়ে এসো। দেখো সাবধান, ঘুণাক্ষরেও কেউ না জানতে পারে, শয়তানটা না আবার আমাদের ঘাড়ে চাপে!'

সমস্ত ব্যাপারটা আমাকে অভিভূত করে ফেলে। বাবা চললেন ক্যাপ্টেনের কাছে, আমিও তাঁকে অনুসরণ করলাম।

ক্যাপ্টেন রোগা লম্বা একজন ভদ্রলোক। মুখময় দাঁড়ি গোঁফে ভর্ত্তি। ভদ্রলোক বিরাট গাম্ভীর্য্য নিয়ে নিজের ঘরের সামনে খোলা পাটাতনে পায়চারী করছিলেন, যেন তিনি বিরাট জাহাজ একটা চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন।

বাবা সম্ভ্রম দেখিয়েই সম্ভাষণ করলেন তাঁকে, অভিনন্দন জানালেন সুব্যবস্থার জন্য। জিজ্ঞাসা করলেন, জার্সিতে কি কি তৈরী হয়, কত লোকসংখ্যা, লোকেদের রীতিনীতি, মাটির উর্ব্বরতা ইত্যাদি নানা প্রশ্ন। তাঁর প্রশ্নের ধরণ দেখলে মনে হবে যেন তিনি সুদূর আমেরিকার পথে পাড়ি জমিয়েছেন! জাহাজের কথা হল, জাহাজের নাবিকদের কথা হল। সবশেষে ভয়ে ভয়ে বাবা জিজ্ঞাসা করলেন অদ্ভুত বুড়ো নাবিকটার সম্বন্ধে ক্যাপ্টেন কিছু জানেন কি না!

ক্যাপ্টেন বিরক্ত হয়ে উঠেছেন ইতিমধ্যে, তাই তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন ওঁর প্রশ্ন এড়াবার জন্য, 'ও, ও একজন ফরাসী ভবঘুরে। গত বছরে আমেরিকা থেকে কুড়িয়ে আনি লা হাভ্রেতে ওকে নামিয়ে দেবার জন্য। শুনেছিলাম, ওর নাকি সেখানে আত্মীয় স্বজন আছে, কিন্তু টাকা ধার করেছে বলে, সেখানে ও যেতে চায় না মোটে। ওর নাম কি যেন, হাঁ, জুলস ডা:ভ্রানকে কি ডারভানকে এ রকমই হবে। এক সময়ে আমেরিকায় কিছু সম্পত্তি করেছিল এ রকমই গুজব, এখনত' ওই অবস্থা, দেখতেই পাচ্ছেন।'

ক্যাপ্টেনের কথা শুনে বাবা বিবর্ণ হয়ে গেলেন। আবেগে কণ্ঠনালী তাঁর ওঠানামা করছে, চোখ দুটোয় ভয় এসে যেন বাসা বেঁধেছে। তাড়াতাড়ি আমতা আমতা করে বলে উঠলেন বাবা, 'তাই নাকি, তা অবাক হওয়ার কি আছে, আচ্ছা ধন্যবাদ ক্যাপ্টেন।'

বাবা ফিরে এলেন, যাত্রীরা তাঁর দিকে বিস্ময়ে চেয়ে থাকে। মা বাবার মুখ চোখের অবস্থা দেখে বলে

উঠলেন, 'আঃ, বসে পড়ো না, লোকে যে হাঁ করে চেয়ে রয়েছে!'

বেঞ্চিতে হতাশ হ'য়ে ব'সে পড়লেন বাবা; তারপর তোতলাতে তোতলাতে বলতে লাগলেন, 'হ্যাঁ ওই সে, কি করব এখন?'

—'জোসেফ সব জানে, ও মেয়েদের ডেকে আনুক ওখান থেকে। আমাদের খুব সাবধানে থাকতে হবে, জামাই না কিছু টের পায়।' মা বলে উঠলেন।

বাবা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে বলে উঠলেন, 'উঃ কি বিপত্তি!'

মা রেগে যান হঠাৎ, বলে উঠলেন, 'আমি জানতাম, শয়তানটা কিছুই করে নি। আবার আমাদের ঘাড়ে চাপবার মতলবে আছে। তোমাদের বংশের লোকেদের কাছে কিছু আশা করাই বোকামী হয়েছিল আমার!' বাবা তাঁর কপালে হাত দিলেন, মনে পড়ে গেল মার ভৎর্সনা ক'রবার অসহায় ভঙ্গীটুকু।

মা ঝাঁঝিয়ে উঠলেন আবার. 'হাঁ করে বসে রইলে কেন, জোসেফকে দাম দাও, ও-ই দিয়ে আসুক। এখন ভিখারী বাউণ্ডুলেটা চিনতে পারে ত সোনায় সোহাগা, জাহাজে খুব সুন্দর দৃশ্য হবে তাহলে। তাড়াতাড়ি চল, জাহাজের এক কোণে চলে যাই, ওর না আবার মুখোমুখি হতে হয়।'

আমার হাতে পাঁচ ফ্রাঙ্ক দিয়ে ওঁরা তাড়াতাড়ি পালিয়ে গেলেন। আমার বোনেরা বাবার জন্য অপেক্ষা করছিল। একটু অবাকও হয়েছে তারা বাবার আকস্মিক অন্তর্দ্ধানে। ওদের বল্লাম কারণটা, মা সামুদ্রিক পীড়ায় কিছুটা কাবু হয়ে পড়েছেন, তাই। লোকটাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'মঁসিয়ে আপনার দাম হয়েছে কত?' ইচ্ছা হল, ওকে কাকা বলে ডাকি।

লোকটা উত্তর দেয়—'আড়াই ফ্রাঙ্ক।'

আমি ওর হাতে পাঁচ ফ্রাঙ্ক তুলে দিই, আড়াই ফ্রাঙ্ক ফেরত পেলাম ওর কাছ থেকে। ওর হাতের দিকে চাইলাম। কষ্টসহিষ্ণু নাবিকের হাতের ছাপ ওর হাতে। মুখের দিকে চাইলাম, করুণ বিষাদঘন সে চাহনিতে মন আমার উদ্বেল হয়ে উঠল। কাকা, আমার কাকা!

তাঁর হাতে আধ ফ্রাঙ্ক তুলে দিলাম। তিনি আমাকে ধন্যবাদ দেন, 'ভগবান, তোমার ভাল করুন খোকা।' তার এই কণ্ঠস্বরে ভিক্ষুকের আকুতি ফুটে ওঠে। ভাবলাম কাকা আমার আমেরিকার পথে পথে হয়ত ভিক্ষা করে বেড়িয়েছেন।

আমার দাক্ষিণ্যের বহর দেখে বোনেরা আমার দিকে অবাক হয়ে চেয়ে রয়েছে।

...ফিরে এসে যখন দু ফ্রাঙ্ক বাবাকে ফেরৎ দিলাম, মা অবাক হলেন, 'তিন ফ্রাঙ্ক খরচ, এত কি করে হল?'

বললাম দৃঢ় কণ্ঠে, 'আমি ওঁকে আধ ফ্রাঙ্ক বেশী দিয়েছি।' মা আমার চোখের দিকে চেয়ে বলে উঠলেন, 'তুই কি পাগল হ'লি নাকি, একটা বাউণ্ডুলে হতভাগাকে দয়া করা ছাড়া অন্য লোক পেলি না?' মা হঠাৎ চুপ করে গেলেন বাবার চোখের ইসারায়। জামাই কাছে দাঁড়িয়ে। সব চুপচাপ।

ধীরে ধীরে দিগন্তের বুকে, সমুদ্রের জলের ভেতর থেকে উঠে এল সূর্য্যাস্তের লাল রঙে রাঙান জার্সি দ্বীপ-খানি। জাহাজ যখন বন্দরের কাছে এগিয়ে আসতে লাগল, তখন ভয়ানক ইচ্ছা করতে লাগল, একবার যাই কাকা জুলসের কাছে, তাকে সান্ত্বনা দিয়ে আসি মিষ্টি কথা দুটী বলে।

কিন্তু এখন আর তাঁর কাছ থেকে কেউ ঝিনুক খাবে না, তাই সে চলে গেছে হয়ত নোঙর করা জাহাজটার তলায়।

মা আশঙ্কায় কাতর হয়ে পড়েছেন, তাই পাছে আবার দেখা হয়, ফেরবার পথে নৌকো করে ফেরা হল। তারপর থেকে কাকাকে আর দেখি নি।

...বন্ধু জোসেফ থামে।

—'মাঝে মাঝে তাই ভিখারীদের ভিক্ষা দেবার সময় নিজের অজ্ঞাতসারেই আমি পাঁচ ফ্রাঙ্ক দিয়ে ফেলি। তোমরা অবাক হও, না?'

...ম্লান হাসি হাসে বন্ধু জোসেফ ডাভ্রানকে।

ঈরাণের শিল্প ও সংস্কৃতি

শ্রীগুরুদাস সরকার

(ত   য় পর্ব্ব)

ধর্ম্ম ও সংস্কৃতি

প্রাচীন ইতিহাসের অনুশীলন করিলে দেখা যায় যে, ধর্ম্মের সহিত ঐতিহ্যের অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ, আর সংস্কৃতি গড়িয়া উঠে ঐতিহ্যের বনিয়াদের উপরে। তাই পারস্যের সংস্কৃতির প্রকৃত পরিচয় অবগত হইতে হইলে দ্বিতীয় কুরুষ যে ধর্ম্মের পবিত্রতা সংরক্ষণের জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন, সেই অহুরমজ্‌দার উপাসনামূলক ধর্ম্মের বিষয়ে কিছু আলোচনা প্রয়োজন।

ঈরাণীয়দিগের আদিম ধর্ম্ম বিশ্বাস

প্রথমে ঈরাণীয়দিগের বিভিন্ন কৌমে (tribe-এ) বিভিন্ন দেবতার উপাসনা প্রচলিত ছিল, এইরূপই অনুমিত হইয়াছে। কোনও পাশ্চাত্য পণ্ডিতের মতে, সমগ্র সৌরমণ্ডল তথা সৃষ্ট-জগতের নিয়ন্তা পরম প্রভু এক ও পরমেশ্বরের ধারণা, ব্যাবিলোনীয়দিগের জ্যোতিষিক পর্য্যবেক্ষণের ফলেই উদ্ভূত হইয়া থাকিবে। জ্যোতিষ্কসমূহের সুনিয়ন্ত্রিত গতির অন্তরালে পরম-পিতার ঐশীশক্তি বিরাজিত ও বিশ্বাস যে ক্রমেই বদ্ধমূল হইতে থাকিবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? সৌরজগতে গ্রহ ও উপগ্রহের গতি সুশৃঙ্খল ও নিয়মিত আর হামুরাব্বির (Hamurabbi-র) সুপ্রাচীন কাল হইতে যে সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবহার-বিধি সুসংবদ্ধ মানব সমাজে নিরাপত্তা আনিয়া-

অদ্বিতীয় পরমেশ্বরের ধারণা

ছিল, তাহার পশ্চাতেও ছিল এক অলঙ্ঘ্য নিয়মানুবর্ত্তিতা ও শৃঙ্খলা-রক্ষক শক্তি। রাজশক্তি সমর্থিত এই সুসংযত ব্যবহারবিধিও যে অদ্বিতীয় পরমেশ্বরের ধারণা পরিস্ফুরণ ও উহার পরিপূর্ণ উপলব্ধির সহায়তা করিয়া-ছিল, ইউরোপীয় পণ্ডিতের এ ধারণা তুচ্ছ বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না (১), বরং বলা যাইতে পারে যে, এশিয়ার এই অংশে রাজকীয় বিধানমালার অমোঘ-শক্তিমত্তার ধারণা সুসংমিলিত হইয়া ঐশীশক্তি বিষয়ক ভাবধারা অনুপ্রাণিত ও প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। হামুরাব্বির আইন (code of laws) অল্পাধিক পরিবর্ত্তিত হইয়া জরথুস্ত্রের কাল পর্য্যন্ত যে পারস্যে প্রচলিত ছিল, এইরূপই অনুমিত হইয়াছে। আনুমানিক ২১০০ অব্দে হামুরাব্বির ব্যবহার শাস্ত্র (code of laws) প্রণীত ও বিধিবদ্ধ হয়। ইহা সম্ভবতঃ সুমেরীয় ব্যবহার বিধি অবলম্বনে রচিত হইয়াছিল।

পূর্ব্বমত বিশোধন

ইতিহাসে প্রায়ই দৃষ্ট হইয়া থাকে যে, প্রাচীন যুগের ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠাতা মহামানবগণ (Propheto) আপন আপন ভাব ও আধ্যাত্মিক শক্তিনিবেশে পূর্ব্বেকার উপাস্য দেবতাগুলিকে বিশোধিত করিয়া লইয়াছেন এবং সমকালীন ধর্ম্মমত আপনাদিগের নৈতিক শক্তিতে শক্তিমন্ত (spiritualise) করিতে সমর্থ হইয়াছেন। ইহার ফলে উপাস্য ক্রমে উপাসকের নিজ ব্যক্তিগত উপাসনার (personal wor-ship-এর) বিষয়বস্তুতে পরিণত না হইয়া পারে নাই।(২)

ব্যক্তিগত উপাস্য

জোরোয়াস্ত্রীয় ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা জরথুস্ত্রের ক্ষেত্রেও ইহার ব্যতিক্রম ঘটে নাই। তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, অহুরমজ্‌দা তাঁহাকে ঈরাণীয় ধর্ম্ম হইতে বহুদেবতাবাদ, দানব ও অপদেবতা সমূহের উপাসনা, তন্ত্র, মন্ত্র, ইন্দ্রজাল এবং ক্রিয়াকাণ্ডবহুল

ঋষি জরথুস্ত্র

অনুষ্ঠানাদি বিদূরিত করার জন্যই ধরাধামে প্রেরণ করিয়াছেন। তাই বৈদিক আর্য্যদিগের দেবতা ও তাহাদিগের সহিত তুলনীয় সমধর্ম্মী কৌমী (tribal) দেবতানিচয় তাঁহার স্তোত্র-সমূহে দানব ও অপদেবতারাও বর্ণিত হইয়াছে। জরথুস্ত্র বলিয়াছেন যে, যে নিয়মানুধারায় বিশ্বজগৎ নিয়ন্ত্রিত

---

(১) Gordon childe, what happened in history, (pelican) p. 188.

(২) Ibid, p. 189.

হইতেছে, তাহা কেবল এক ঐশীশক্তির দ্বারাই বিধৃত। কোন কিছু কাম্যবস্তু লাভের জন্য যজ্ঞ ও ক্রিয়াকাণ্ডের অনুষ্ঠান তিনি বিশেষ দোষাবহ বলিয়াই নিন্দা করিয়াছেন।

ঋষি জরথুষ্ট্র (জরথুশত্র) জোরোয়াস্তার ও জরদুস্ত নামেও অভিহিত হইয়াছেন। গ্রীক গ্রন্থকার প্লুটর্কি ও প্লিনি উভয়েরই গ্রন্থে জরথুষ্ট্রের নামোল্লেখ আছে। পাশ্চাত্ত্য খণ্ডে তিনি জোরোয়াস্তার নামেই অধিক পরিচিত। গ্রীক লেখকেরা তাঁহাকে মাজীয় (Magiaus)-দিগের ধর্ম্মমতের প্রতিষ্ঠাতা মেগাস্ (Magus) বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে মাজীয়েরা ছিল একিমিনীয় যুগে ঈরাণের পশ্চিমাংশে প্রতিষ্ঠিত কয়েক দল উপনিবেশবাসী। জরথুষ্ট্রের প্রভাব ইহাদিগের নিকট ঠিকমত পৌঁছে নাই, কারণ যে অংশে জরথুষ্ট্র তাঁহার ধর্ম্মমত প্রচার করেন, সে অংশ হইতে ইহারা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। ইহারা প্রাচীন ঈরাণের প্রাকৃতিক উপাসনামূলক ধর্ম্মের (Nature Religian) সহিত জরথুষ্ট্রের ধর্ম্মমত কিছু কিছু জুড়িয়া দেয় এবং ফলিত জ্যোতিষের চর্চ্চা প্রভৃতিতে আকৃষ্ট হইয়া পড়ে। ক্রমে সাধারণের মধ্যে এ বিশ্বাস প্রচলিত হইতে থাকে যে, মাজীয়দিগের পুরোহিতেরা সকলেই যাদু-বিদ্যায় দক্ষ।

গ্রীকগ্রন্থে জরথুষ্ট্র

জরথুষ্ট্র যে বংশে জন্মগ্রহণ করেন, তাহা স্পিতাম্ (স্পিতিমা) অর্থাৎ শ্বেত নামে পরিচিত ছিল। কেহ কেহ জরথুষ্ট্র নামের অর্থ করেন, বৃদ্ধ (জরৎ) উষ্ট্র অথবা ধূসর বর্ণের উষ্ট্র। আবার জরথুষ্ট্র শব্দটি নামবাচক নহে, প্রধান পুরোহিতবাচক উপাধি মাত্র, আধুনিককালে এ মতবাদও প্রচলিত দেখা যায় (৩)।

জরথুষ্ট্রের জীবন-কথা

জরথুষ্ট্রের পিতার নাম পরুশস্পা ও মাতার নাম দোঘদু। তাঁহার মাতা কোনও পুরুষের স্পর্শ ব্যতিরেকে পঞ্চদশ বর্ষ বয়সে তাঁহাকে গর্ভে ধারণ করিয়াছিলেন এই জন-প্রবাদটি পরবর্ত্তীকালে বহুল প্রচারিত হইয়াছিল। চীনের বিখ্যাত দার্শনিক লাওৎসু (laotzu) বিদ্যমান ছিলেন আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ ৬৪০ অব্দে। তিনিও কুমারী-সম্ভব ছিলেন, এরূপ উক্তি অতি প্রাচীনকাল হইতে প্রচলিত আছে। সুতরাং প্রভু যীশু সম্পর্কেই যে এরূপ মতবাদ সর্ব্ব প্রথম প্রচারিত হইয়াছিল এ কথা বলা যায় না। জরথুষ্ট্রকে দেশ বিদেশে যাইতে হইয়াছিল পৃষ্ঠপোষকের অন্বেষণে (৪)। জরথুষ্ট্র জন্মিয়াছিলেন তাঁহার মাতুলালয় বলিয়া পরিচিত রাখাই নামক স্থানে, মতান্তরে দৈত্য (Daittya) বা দর্য্য (Daryya) নদীর তীরে অবস্থিত 'আইরিয়ানা বেজো' অথবা আর্য্যনাম বাইজোই তাঁহার প্রকৃত জন্মস্থান। ভেন্দিদাদের প্রথম অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে যে, অহুরমজ্‌দা প্রথমে যে উত্তম বাসযোগ্য স্থান নির্ম্মাণ করেন, তাহাই পার্থিব স্বর্গ বলিয়া পরিচিত আইরিয়ানা বেজো (৫)। আইরিয়ানা বেজো একেবারে কাল্পনিক বলিয়া বোধ হয় না। অনুমিত হইয়াছে, উহা মিদিয়ার উত্তর পশ্চিম সীমান্তে অবস্থিত আরাণ প্রদেশের অন্তর্গত এবং আরাস্‌সেস্ অথবা আরাস নামক নদীর তীরবর্ত্তী। জরথুষ্ট্র যে বালখ প্রদেশের অন্তর্গত কোনও স্থানে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ইহাই এক্ষণে পণ্ডিতদিগের সুচিন্তিত অভিমত। কিন্তু মাতুলালয় হউক বা না হউক, জরথুষ্ট্রের ধর্ম্ম ও রাজনীতি বিষয়ক আন্দোলনের প্রধান কেন্দ্র ছিল যে রাখাই, তাহাতে সন্দেহ নেই। জোরোয়াস্ত্রীয় ধর্ম্মগ্রন্থের গাথা অংশে যাহা কিছু সন্নিবিষ্ট আছে, তাহাই জরদুস্তের নিজ মুখে উচ্চারিত বাণী বলিয়াই বিবেচিত। গাথাগুলি যশ্নের অন্তর্গত। পাঁচটি পদ্যে রচিত গাথায় সতেরোটি মন্ত্রের উল্লেখ আছে। অধ্যাপক বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় যথার্থই বলিয়াছেন যে, গাথাগুলি ব্যাকরণের শাসন মানে (৬) এবং ইহার সহিত বৈদিক সাহিত্যের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক লক্ষিত হয়। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় পাণিনির সূত্র অবলম্বন করিয়া গাথা সমূহের এক সংস্কৃত অনুবাদ প্রকাশিত করিয়াছেন। তাঁহার অব-

জরথুষ্ট্রের জন্মস্থান

যশ্ন ও গাথা

(৩) প্রবাসী, পৌষ, ১৩৪৬, পৃঃ ২১৫।

(৪) যশ্ন, ৪৬।১। (৫) প্রবাসী, চৈত্র ১৩৫৩ পৃঃ ৫৪৯।
(৬) ভারতী, মাঘ, ১৩২৮ পৃঃ ৮৮৬।

লম্বিত পদ্ধতি সম্বন্ধে মতভেদ থাকিলেও বৈদিক সাহিত্যের সহিত নিকটসম্পর্ক স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। বেদ রচনার ঠিক পরবর্ত্তীকালেই গাথা সাহিত্যের উদ্ভব হইয়া থাকিবে। পারসীকদিগের গায়ত্রী নামে অভিহিত "আহুন বহ্‌র্য্য" নামক যে মন্ত্রটি জরথুষ্ট্র-ধর্ম্মাবলম্বীদিগকে সকল ধর্ম্মকার্য্যে, মুমূর্ষুর পক্ষে এবং অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ায় ও শ্রাদ্ধকালে বহুবার আবৃত্তি করিতে হয়, তাহা জরথুষ্ট্রের স্বরচিত বলিয়া সুবিদিত। তিনটি পাদে সমাপ্ত এই মন্ত্রটির যে অনুবাদ অশোকনাথ ভট্টাচার্য্য শাস্ত্রী কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইয়াছে (৭) তাহা, নিম্নে প্রদত্ত হইল—(১ম পাদ) যেমন নরপতি সর্ব্বশক্তিমান তেমনি 'রতু' (ঋষি) ও ঋত প্রভাববশতঃ নিশ্চয়ই (সর্ব্বশক্তিমান), (২য় পাদ)—পরমেশ্বরের অভিপ্রেত কর্ম্ম যাঁহারা করেন, তাঁহারাই সদন্তঃকরণের দান পাইবার অধিকারী (তাঁহাদেরও চিত্ত পূর্ণ প্রসন্নতা লাভ করে)।

(৩য় পাদ)—পারমেশ্বরের বল তাহারই জন্যে যিনি দরিদ্রকে সাহায্য করেন, অর্থাৎ দরিদ্রকে যিনি সাহায্য করেন, অহুরমজ্‌দের বীর্য্য তাঁহাকে বলান্বিত করে।

গাথার আকার ও বিষয়বস্তু

গাথাগুলি আকারে কতকটা উপনিষদ সংগ্রহের মত, ইহাতে স্তব, স্তোত্র, প্রার্থনা, উপদেশাদি একসঙ্গে সম্মিলিত রহিয়াছে। গাথায় পরলোকের শেষ বিচারের এবং আত্মার অমরত্বের কথা উল্লিখিত আছে। গাথায় ধর্ম্মবাদে সুপ্রকৃতি ও কুপ্রকৃতি মানবের ব্যক্তিগত বাস্তব ও স্বাভাবিক অস্তিত্বের প্রকারভেদ বলিয়াই বিবেচিত। গাথাগুলির সহিত পরবর্ত্তী কালের ধর্ম্মবিষয়ক রচনা একত্র সংযুক্ত হইয়া জেন্দাভেস্তায় পরিণত হইয়াছে। গাথার মধ্যে শুধু ধর্ম্ম নয়, রাজনীতিও নিরপেক্ষভাবে স্থান পাইয়াছে। পারিবারিক বিষয়েরও উল্লেখ দেখা যায় জরথুষ্ট্রের কন্যা পুরোচিস্তা অথবা পুরুণচিস্তের(৮) বিবাহ উপলক্ষে রচিত গাথায়। এইটী শেষ গাথা। এইটি ছাড়িয়া দিলে গাথা সমষ্টির মধ্যে তাঁহার ব্যক্তিগত ইতিহাসের বিশেষ কিছু বিশ্বাসযোগ্য উপকরণ পাওয়া যায় না। এই গাথাটীতে যে সকল ব্যক্তির নামোল্লেখ আছে মনে হয়, তাঁহারা জরথুষ্ট্রের সমসাময়িক এবং সম্ভবতঃ তাহারই প্রতিবেশী "স্পেন্দ্ নাস্ক্" নামক যে পুস্তকে জরথুষ্ট্রের জীবন বৃত্তান্ত লিখিত ছিল, তাহা লুপ্ত হইয়াছে। তাঁহার জীবনকথা সম্বলিত "দিন্ কর্দ্" নামক পুস্তকখানি খ্রীঃ নবম শতাব্দীতে এবং 'সাহনামা' ও "জরতুস্তনামা" খ্রীঃ ত্রয়োদশ শতাব্দে রচিত। ঐতিহাসিকতার দিক দিয়া এগুলির মূল্য অধিক নয়।

জরথুষ্ট্রবাদের মোট কথা

জরথুষ্ট্রের যে সময় ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক হিসাবে আবির্ভাব ঘটে, সে সময় কোনও অনার্য্য যাযাবর জাতি—হয় তো তাহারা তুরাণীয় অথবা মোঙ্গল হইবে—পারস্য দেশ আক্রমণ করিয়া গবাদি পালিত পশু বলপূর্ব্বক লুণ্ঠন করিয়া লইয়া যাইত। জরথুষ্ট্র এই সকল অত্যাচার প্রপীড়িত পশুপালকদিগের সহায়ক ও সমর্থকরূপেই হয় তো তাঁহার ধর্ম্ম আন্দোলন প্রথমতঃ আরম্ভ করিয়াছিলেন। তিনি নিম্নস্তরের বহু দেবোপাসনা পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র অহুরমজ্‌দার (অসুর মেধসের) উপাসনা করিতে এবং তাঁহারই উপর একান্তভাবে নির্ভর করিতে সাগ্রহে উপদেশ দিতে লাগিলেন। তিনি যে কৃষিকার্য্যেরও বিশেষ সমর্থক ছিলেন, তাহা বুঝা যায় তাঁহার এই একটি উক্তি হইতে। তিনি বলিতেন যে, সহস্রবার স্তব করিয়া যে পুণ্য অর্জ্জন করা যায়, তাহা অপেক্ষা অধিক পুণ্য লাভ হয় পরিশ্রম সহকারে ক্ষেত্রে বীজবপন করিলে[৯]। তাঁহার প্রভাবে জাতীয় জীবন যে কি ভাবে প্রভাবিত হইয়াছিল, আবেস্তাগ্রন্থের অলৌকিক ঘটনা সম্বলিত বিবরণ অপেক্ষা এই বিষয়টিই বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি শিষ্যবর্গকে কর্ম্মময় সংসারাশ্রম বর্জ্জন করিয়া যতিধর্ম্ম অবলম্বন করিতে উপদেশ দেন নাই, এই কথাই সমধিক স্মরণীয়। জরথুষ্ট্র ছিলেন নৈষ্ঠিক একেশ্বরবাদী। নানা স্থান

---

(৭) ভারতবর্ষ, শ্রাবণ ১৩০৩ পৃঃ ৩০৬—৩১০।

৮ পুরচিস্তা নামটি যে এখনও বোম্বাই প্রদেশে পারসীক রমণীদের মধ্যে প্রচলিত তাহা স্বর্গত সত্যেন্দ্র ঠাকুর মহাশয়ের উক্তি হইতে জানা যায়। বোম্বাই প্রবাস, পৃঃ ১০৪।

৯ Gibbon's Downfall of the Roman Empire, Ed I. H. Bury, Vol. I, p. 201.

পরিভ্রমণ করিয়া তিনি ঈরাণের পশ্চিমাংশ হইতে বাক্‌ত্রিয়া গিয়া পৌছেন এবং প্রবাদ মতে রাজা বিশতাস্পের (বিস্তাস্পের) সমর্থন লাভ করিয়া নিজ ধর্ম্মমত প্রচার করিতে থাকেন। গাথাখণ্ডে দার্শনিক তত্ত্ব নিহিত স্তোত্রাদি এবং বিবিধ আনুষ্ঠানিক নিয়মাবলী সন্নিবিষ্ট থাকিলেও ইহাও স্পষ্ট প্রতিভাত হয় যে, জরথুষ্ট্র রাজনৈতিক, সামরিক ও ধর্ম্মবিষয়ক ত্রিধাবিভক্ত আন্দোলনের মূলাধাররূপে অসঙ্কোচে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। বিরুদ্ধমতের সংঘাত ফলেই তিনি এই দুঃসাধ্য সংস্কার প্রয়াসে সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। ডাঃ হের্টসফেল্‌ড্‌ বলেন[১০] যে দেরিয়ুসের পিতা বিশ্‌তাস্পের নিকটই, অধুনা "কু-ই-খুজা নামে অভিহিত উষিদ পর্ব্বতে জরথুষ্ট্র আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। গাথায় ও আবেস্তাগ্রন্থের পূর্ব্বতম অংশে ঐতিহাসিক ব্যক্তিরূপে যে জরথুষ্ট্রের সাক্ষাৎ মিলে তাহাতে পরবর্ত্তীকালে অতিমানব সুলভ নানা অলৌকিক শক্তি আরোপিত হইয়াছে দেখিতে পাই। পরবর্ত্তী জোরোয়াস্ত্রীয় ধর্ম্মগ্রন্থে তাঁহাকে বিশেষ করিয়া অলৌকিক ক্ষমতাপন্ন মহাপুরুষরূপেই বর্ণনা করা হইয়াছে। শ্রদ্ধা ও ভক্তির যে প্রভামণ্ডলে তাঁহার বিশাল ব্যক্তিত্ব আবেষ্টিত ছিল, তাহাই তাঁহাকে মানবত্বের গণ্ডী ছাড়াইয়া উর্দ্ধে প্রায় দেবলোক সন্নিধানে উন্নিত করিয়াছে।

রাজা বিশতাস্পের সমর্থন ও রাজমন্ত্রী দ্বয়ের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন।

জগতের প্রধান প্রধান ধর্ম্মগুলির প্রবোজক যাঁহারা তাঁহাদের জীবনে দৈবীশক্তি জ্ঞাপক অলৌকিক ঘটনার সমাবেশ প্রায়শঃ দৃষ্ট হইয়া থাকে। জরদুস্ত নাকি জন্মিয়াই হাস্য করিয়াছিলেন। অন্যান্য সদ্যোজাত শিশুর ন্যায় ক্রন্দন করেন নাই। কথিত আছে, সমগ্র প্রকৃতি তাঁহার জন্মগ্রহণ হেতু উৎফুল্ল হইয়াছিল। কংস যেরূপ শিশু শ্রীকৃষ্ণকে এবং হেরোদ যেরূপ শিশু খ্রীষ্টকে হত্যা করার চেষ্টা করেন, সেইরূপ কোনও তুরাণীয় রাজা জরথুষ্ট্রকেও হত্যা করার চেষ্টা করিয়াছিলেন। ধ্যান ধারণার জন্য তিনি কিছুকাল লোকালয় হইতে দূরে, বনমধ্যে ও পার্ব্বত্য প্রদেশে বাস করেন। এই সময়ে দুগ্ধজাত পানিয়ই ছিল তাঁহার একমাত্র আহার্য্যদ্রব্য। সেই নির্জ্জন সাধনার স্থান হইতে প্রধান দেবদূত তাঁহাকে পরমেশ্বরের সান্নিধ্যে লইয়া যান এবং তিনি শ্রীভগবানের শ্রীমুখ হইতে কোনও প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত হন। তিনি যেশুধু দেবদূতদিগের সহিতই কথোপকথনে সমর্থ হইয়াছিলেন এরূপ নয় স্বয়ং অহুরমজদা অর্থাৎ পরমপ্রভু পরমেশ্বরের সহিত আলাপনের কথা জরথুষ্ট্র একাধিকবার উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি সসাগরা পৃথিবী "দিব" বা "দেও" নামক "অসুর"দিগের কবল হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন তাঁহার ঐশীশক্তির প্রভাবে। পাপের অধিপতি অঙ্গ্রমৈইন্যু বা অহ্রিমান তাঁহাকে প্রলোভিত করিতে গিয়া ব্যর্থকাম হয়। তিনি যে পর্ব্বতটিতে একান্তে বাস করিতেছিলেন, তাহা অগ্নিসংযোগহেতু দগ্ধ হইয়া যায়—কিন্তু যে অগ্নি নাকি তাঁহাকে স্পর্শও করিতে পারে নাই শ্রীকৃষ্ণ বাল্যকালেই অনেকগুলি অসুর বধ করিয়াছিলেন। বুদ্ধদেব বোধিদ্রুমতলে মার (শয়তান) কর্ত্তৃক প্রলোভিত হইয়াছিলেন; আব্রাহাম ও মহাপুরুষ মোহম্মদ উভয়েই সৃষ্টিকর্ত্তার সাক্ষাৎলাভ করিতে এবং তাঁহার সহিত কথোপকথনে সমর্থ হইয়াছিলেন। প্রাচ্য খণ্ডে এশিয়া মহাদেশের বিভিন্ন ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠাতাদিগের যে সকল বিবরণ পাওয়া যায়, তাহাতে এরূপ সাদৃশ্য কিম্বা আনুরূপ্যের অভাব নাই। লক্ষণীয় এই যে, অলৌকিক শক্তি বা ঘটনামালার সমাবেশ হেতু তাঁহার লৌকিক জীবনকে অতিপ্রাকৃত রূপ দিবার চেষ্টা করিলেও পারসীকেরা তাঁহাকে মহাপুরুষ (Prophet) ব্যতীত আর কিছুই বলেন নাই।

অলৌকিক ঘটনা বিষয়ক প্রবাদ

জরথুষ্ট্রের প্রবাদমূলক বিবরণ ও এশিয়ার অন্য কয়েকটি ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতার সহিত সাদৃশ্য।

জরথুষ্ট্রীয় ধর্ম্মের মূল তথ্যের বিচার করিতে গেলে, জরথুষ্ট্র ত্রিশ বৎসর বয়সে প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন কিনা এবং তিনি তিনবার দারপরিগ্রহ করিয়াছিলেন কিনা, এসকল কথা সত্যই অবান্তর হইয়া পড়ে।

জরথুষ্ট্রের যে কোনও মূর্ত্তি বা প্রতিকৃতি রচিত হইয়াছিল, এরূপ প্রমাণ এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই।

---

[১০] Herzfeld Iran in the Ancient East, p.291

সমকালীন শিল্পে ইহার কোনও নিদর্শন পাওয়া না গেলেও বহু পরবর্ত্তী মুসলমান যুগের একখানি সাহনামায় একত্র সমাসীন গুস্তাস্প্‌ ও জরথুস্ত্রের একখানি চিত্র স্থান পাইয়াছে, চেষ্টার (Chester Beatty) সংগ্রহের অন্তর্ভুক্ত সাহনামার এই পুঁথিখানি ৭৮০ হিজিরাব্দে লিখিত। জরথুস্ত্রের এ প্রতিকৃতি যে সম্পূর্ণ কল্পনামূলক, তাহা বলাই বাহুল্য।

জরথুস্ত্রের দেহরক্ষা

মহামানবগণের জন্মের ন্যায় তিরোভাবেরও নানা অলৌকিক বিবরণ প্রদত্ত হইয়া থাকে কিন্তু জরদুস্তের দেহরক্ষা সম্বন্ধে প্রাচীন পারসীক ধর্ম্মগ্রন্থে কোন কিছুরই উল্লেখ দেখা যায় না। সাহনামার বর্ণনা মতে বাহ্লীক অবরোধের সময় তিনি তুরণীয় শত্রুগণ কর্ত্তৃক অগ্নিবেদী সান্নিধ্যে নিহত হন। বাত্রাক্রোশ (Batrakrosh) নামক আর্জ্জাস্পের কোনও সৈন্যাধ্যক্ষ তীক্ষ্ণধার অস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া জরদুস্তকে হত্যা করে, কিন্তু সে ব্যক্তিও আপনার প্রাণ লইয়া পলাইতে পারে নাই। জরদুস্ত তাহাকে লক্ষ্য করিয়া তাঁহার যে জপমালা নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাহার আঘাতেই সে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। পরবর্ত্তী কালের গ্রন্থাদিতে নিবদ্ধ এ সকল কাহিনীর ঐতিহাসিক মূল্য যথাযথভাবে নির্দ্ধারণ করা সুসাধ্য নয়, তথাপি জনপ্রবাদের মূলে স্বল্প কিছু সত্য নিহিত থাকা সম্ভব বলিয়া এই ঘটনাটির উল্লেখ করা হইল।

পহ্লবী গ্রন্থে লিখিত আছে যে যখন জরথুস্ত্রের দেহান্ত ঘটে, তখন তাঁহার বয়স সপ্তসপ্ততি (৭৭) বৎসর। প্রবাদ মতে, ইহার অব্যবহিত পূর্ব্বেই রাজা গুস্তাস্পের পুত্র ইস্‌ফান্‌দিয়ার তুরাণ রাজ আর্জ্জাস্পকে পরাজিত করিতে সমর্থ হন। আর্জ্জাস্প নাকি দুইবার ঈরাণ আক্রমণ করেন, প্রথমবার ৬০১ খৃঃ পূঃ অব্দে আর দ্বিতীয় বার ৫৮৩ খ্রীঃ পূঃ অব্দে।[১১] জরথুস্ত্রের মৃত্যুর জন্যই, ঈরাণীয়-দিগের আনন্দ নিরানন্দে পরিণত হয়। সাহনামাকার লিখিয়াছেন যে, তুরাণের রাজা আর্জ্জাস্প জরদুস্তের মতের প্রধান বিরোধী ছিলেন। এই মতদ্বৈধ লইয়া যুদ্ধ বাধিলে আর্জ্জাস্প বহ্লীক অধিকার করিয়া গুস্তাস্পের পিতা বৃদ্ধ রাজা লোহ্‌রাস্প্‌কে হত্যা করেন। মনে হয় লোহরাস্প্‌ বলিয়া কোন রাজা সত্যই ঈরাণের কোন অংশে তৎকালে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকিলে, জরথুস্ত্রের ধর্ম্মের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা ব্যাপারে তাঁহার বিশেষ অংশ গ্রহণ করা অসম্ভব ছিল না। অন্ততঃ এইরূপ কোন জনপ্রবাদ প্রচলিত না থাকিলে ফিরদৌসি "লোহরাস্পের ধর্ম্ম নবজীবন গ্রহণ করুক" "(Let the faith of Lohrasp be rejuvenated)", এমন কথা লিখিতেন না।

[ক্রমশঃ]

১১ Jackson's Zoroaster. p. 123 referred to by T. Rezwi in op. cit. p. 25,

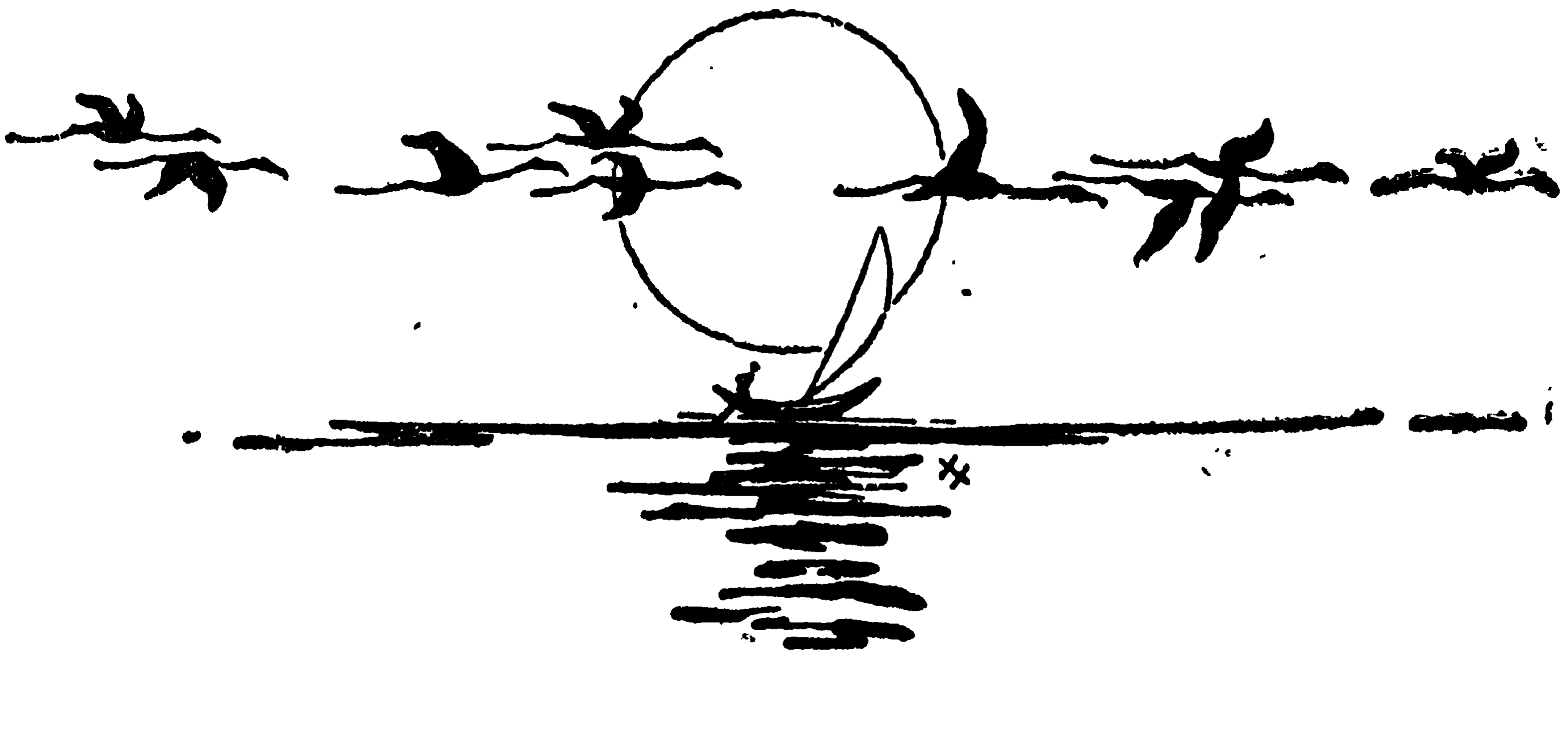

রিয়ালিষ্ট শরৎচন্দ্র

শ্রীঅমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

যুগে যুগে আমাদের মধ্যে এমন দুই একজন শিল্পী আবির্ভূত হন, যাঁহাদের মধ্য দিয়া সমগ্র জাতির আশা আকাঙ্ক্ষা, বাস্তব সাধনা-স্বপ্ন মূর্ত্ত হইয়া উঠে ; তাঁহাদের সুমহৎ ও অনির্ব্বাণ সৃজনী-প্রতিভার যাদুময় লেখনীর স্পর্শে সকল মানুষের সর্ব্বাঙ্গীণ প্রাণসত্তার পথটিকে আলোকিত করিয়া তুলে ; সমাজ-জীবনের বিভিন্ন পথে প্রবাহিত করিয়া দেন নবজীবনের নূতন দৃষ্টিভঙ্গিমার আলোক এবং রাজভয়, লোকভয়, সমাজভয় সকলেরই উর্দ্ধে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবার অপূর্ব্ব সঙ্কল্প ও প্রেরণা এবং শঙ্কাহীন মূলমন্ত্র ও দীক্ষা ! অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের মহাজন্মের লগ্ন বাঙালী জাতির ইতিহাসে এক মাহেন্দ্রক্ষণ !

জগৎ ও জীবনের সচেতন গভীরতম অনুভূতি ও নিগূঢ় প্রাণ-প্রবাহের বাস্তব ভাবব্যঞ্জনায় এবং রূপ-বৈচিত্র্যে শরৎসাহিত্য অপরূপ সৌন্দর্য্যসুষমা বক্ষে লইয়া বাঙালীর হৃদয়ে যুগযুগান্তর আদরণীয় হইয়া থাকিবে। এই মাটীর পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে যে বিস্ময়কর সুখ-দুঃখ-আনন্দ, হাসি-অশ্রুর কলোচ্ছ্বাস প্রতিনিয়ত স্পষ্টভাবে ফুটিয়া উঠিতেছে, বিদগ্ধ বাকচাতুর্য্যে, অপরূপ ভাষা ভঙ্গিমায়, তাহাকেই অবলম্বন করিয়া নিখুঁত বাস্তবের রূপায়নে অবাধে আপন সৃষ্ট উপন্যাসে সুমহান বৈতরণী-প্রবাহ-প্রাণ উজ্জীবিত করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার বাস্তবধর্ম্মী সাহিত্যিক স্বীকৃতি তাই বর্ত্তমান বঙ্গসমাজের সম্পর্কে এক বিরাট জিজ্ঞাসা ! প্রচলিত সমাজ-আদর্শ ও নীতি-রীতির বিরুদ্ধে স-রব বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া তিনি তাঁহার সৃষ্ট সাহিত্যে নিপীড়িত মানবের প্রাত্যহিক ঘাতপ্রতিঘাতের সঙ্ঘাতময় গভীর বাস্তবরূপটীই অনবদ্যরূপে উদ্ভাসিত করিয়া তুলিয়াছেন ! এই হিসাবে বস্তুতন্ত্রবাদের নিমিত্তই সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাঁহার যত নিন্দা ও প্রশংসার অভূতপূর্ব্ব সমাবেশ ! মমতাহীন ও ক্ষমাহীন সমাজের চক্ষে যে নারী ও পুরুষ অবাঞ্ছিতা ও অবাঞ্ছিত, সমাজ যাহাদিগকে কখনও মুহূর্ত্তের তরে ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখে নাই,—শরৎচন্দ্র সেই চরিত্রগুলিকে তাঁহার তুলি দ্বারা চিত্রিত করিয়া তুলিয়াছেন। অসুন্দর ও কদর্য্যতাকেই ভিত্তি করিয়া সমাজনীতির বিচারে যাহারা পতিত ও পতিতা, মানুষ ও মানুষী নামের অযোগ্য ও অযোগ্যা—তাহাদিগকেই তিনি অমর শিল্পতুলিকায় উচ্চ স্থান দিয়াছেন ! সাহিত্যে সত্য, সুন্দর ও মঙ্গলের আদর্শ প্রচ্ছন্নভাবে থাকিতে বাধ্য ! শ্রেয়োবোধ এবং প্রেয়োবোধের মধ্যে কোন বিরোধিতা থাকা কোন প্রকারেই বিধেয় নয়। মানুষের অবমানিত আত্মার লাঞ্ছনার সুরই মনুষ্যত্বের আত্মপরিচয় ও মূল-নীতিকে স্বীকার করিয়া পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বেকার সামাজিকতার অশ্লীলতা ও দুর্নীতিকে আশ্রয় করিয়াই তাঁহার রচনাবলী ব্যাপক ও প্রকট হইয়া পড়িয়াছে ! যুগের

পটপরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমরা লাভ করিয়াছি এক নবীন দৃষ্টিভঙ্গিমা ও সমাজের এক নূতন পথের পাথেয় ও চলার দাবী! তাই আজ শরৎ-সাহিত্যে আমরা পাঠ করি অপূর্ব্ব নারীধর্ম্মও আদর্শ সমাজচ্যুত পতিতার মধ্যে এবং মহত্তর মানবিকতা সমাজবিরোধী তথাকথিত প্রেমের মধ্যে! তাঁহার লেখনীপ্রসূত সাহিত্যগাথা অনাদি-কালের বুকে আবহমানকাল মানব জীবনের সূক্ষ্ম ও গভীরতম রহস্যের ছায়াপাত করিবে! দেশের প্রতি একটি অপরিমেয় মমত্ববোধ, লাঞ্ছিত, নির্য্যাতিত ও অপমানিতের জন্য সুগভীর মর্ম্মবেদনা, অন্তরের শিল্পী-সুলভ সদাচেতন স্পর্শকাতরতা তাঁহার রচনাবলীকে প্রাণের ও ভোগের বস্তু করিয়া তুলিয়াছে! কোথায় আমাদের পল্লীসমাজে পঙ্গু শীর্ণ ও নগ্ন বিকারগ্রস্তজীবনের গরল গজাইয়া উঠিতেছে, কোথায় "অরক্ষণীয়া" জ্ঞানদার অশ্রুজল সকলের দৃষ্টির অন্তরালে নীরবে ঝড়িতেছে, কোথায় বিরহী 'দেবদাস' তিলে তিলে ব্যর্থতার অপমৃত্যুকে আলিঙ্গন করিয়া লইতেছে, কোথায় সাবিত্রীর ন্যায় মহিমাময়ী নারীকে আমরা চরিত্রহীনা আখ্যা দিয়া সমাজ হইতে নির্ব্বাসিত করিতেছি এবং কোথায় 'নারায়ণী' ও 'বিন্দুর' মাতৃস্নেহ স্বর্গের অমৃতধারার মত পাত্রাপাত্র বিচার না করিয়া জাহ্নবী-সহস্রপ্রবাহে উৎসারিত হইতেছে, বাস্তববাদী শরৎ-সাহিত্যে আমরা সেই সকল আলোকচিত্রের নিখুঁত ইঙ্গিত পাইয়াছি! এই অভিশপ্ত দেশের বেদনাতুর নারীসমাজের মর্ম্মভেদী ব্যথার চিত্র একমাত্র শরৎচন্দ্র ব্যতীত দ্বিতীয় কোন শিল্পীর সাহিত্যে ওইরূপ প্রাণবস্তু ও অপরূপ সজীবতা লাভে সমর্থ হয় নাই। বাঙলা ও বাঙ্গালীর জীবনকে তিনি নবীন ছাঁচে গড়িয়াছেন, নূতন মর্য্যাদাবোধ দান করিয়াছেন! বস্তুতঃ তাঁহার সৃষ্ট কথাসাহিত্য তুষারমৌলি উত্তুঙ্গ হিমাদ্রিশৃঙ্গের ন্যায় নিজস্ব দীপ্ত মহিমায় বাস্তবতার মূর্ত্ত প্রতীক হিসাবে স্তব্ধ গম্ভীর হইয়া দাঁড়াইয়া আছে! হিমালয়-নিসৃত সহস্র নির্ঝরিণী ধারার মতই তাঁহার রচনার শক্তিমত্তা শতমুখিনী সাহিত্য-স্রোতস্বিনী বাঙালীর হৃদয়ে পরিপ্লাবিত হইয়া চলিয়াছে।

মানুষের সমাজ, জীবন এবং চিরন্তন মানুষের বিস্তৃতির উপরই সাহিত্যের প্রতিষ্ঠা! 'সমাজ' ব্যক্তি মানুষেরই প্রতিনিধি। তাই বাস্তববাদী শরৎচন্দ্র যে সমাজের মানুষ, তাঁহার সৃষ্ট সাহিত্যে সেই সমাজেরই ছায়াসম্পাত হইয়াছে। তাঁহার শিল্পসৃষ্টির সর্ব্বজনীনতায় অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে মানবসত্তার যথার্থ মিলন এবং হৃদয়ের অন্তরঙ্গ দিকটি যেখানে নেই বর্ণভেদ, ধর্ম্মভেদ ও জাতি-ভেদ! সমাজনিপীড়নে জর্জ্জরিত নরনারীর অতি সাধারণ বাস্তব জীবন-আলেখ্য অবলম্বন করিয়া শরৎচন্দ্র এক অভিনব ট্র্যাজিডিপর্ব্ব সৃষ্টি করিয়াছেন; কেবলমাত্র সমাজের বাহ্যিক মুখোসটাই উন্মোচন করিয়া তিনি ক্ষান্ত হন নাই, ইহার অন্ধ তলদেশটীকেও বাঙালী পাঠকের সম্মুখে অনর্গলিত করিয়া দেখাইয়াছেন! আর তাহারই পটভূমিকায় আমরা দেখি শত সহস্র ভয়াল, তৃষ্ণার্ত্ত ও নিষ্পেষিত করাল ছায়ামূর্ত্তি,—যাহারা দাবী জানায় প্রীতির, ভালবাসার ও মমতার! সমাজের চোখে যাহারা অকল্যাণ ও অপাংক্তেয়, লাঞ্ছিত ও ঘৃণিত, তাহারা ই তাঁহার সুতীব্র দরদী মানস-জগতে পক্ষপাতশূন্য দৃষ্টিতেই স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে! প্রাচীনপন্থীরা শরৎচন্দ্রের এই অতি বাস্তবতার রূপাশ্রিত মূর্ত্তিটীকে মনে প্রাণে গ্রহণ না করিয়া ভাবিলেন বুঝিবা আর্টের নামে তিনি প্রকাশ্যে দুর্নীতি, কুৎসা ও বিভীষিকার সৃষ্টি করিতেছেন! বঙ্কিমচন্দ্র যে Realismকে স্বীকার করেন নাই, রবীন্দ্রনাথ যাহাকে কোন প্রকারে স্বীকার করিয়া লইয়াও অত্যুচ্চ ভাব-কল্পনার রঙে রঞ্জিত করিয়া দুরারোহী কল্পলোকে উন্নীত করিয়াছেন, শরৎপ্রতিভা সেই Realismকেই জীবন্তরূপে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। তিনি বাস্তবকে মর্য্যাদা দিয়াছেন, সাহিত্যে রসোত্তীর্ণ করিয়া ফল্গুধারার স্রোত বহাইয়া দিয়াছেন বাঙালীর মর্ম্মকোষে,তাই তিনি আমাদের নিকট এত 'আপনার' বলিয়াই প্রতিভাত হন। নগ্নতা, কুশ্রীতা ও অশ্লীলতার নামে বর্ত্তমানে যে বাস্তববাদ বা Realism সাহিত্যে কোথাও কোথাও চলিতেছে, সেইপ্রকার বস্তুতন্ত্রবাদ শরৎসাহিত্যে দৃষ্ট হয় না। তাঁহার শিল্পসৃষ্টি কেবলমাত্র বাস্তবের অনুকৃতি নয়, কল্পনাসমৃদ্ধ—কাব্যিক ফটোগ্রাফও নয়—কেননা 'আর্ট ফর আর্টস সেক' সূত্রটী

তিনি নিজেও স্বীকার করেন নাই। বাস্তব সত্যের ভিতর দিয়া তিনি সুন্দরকে ধরিতে চাহিয়াছেন, শুধু বাস্তবের নিমিত্তই বস্তুতান্ত্রিকতাকে গ্রহণ করেন নাই। নারীজীবনের বহু সমস্যাগত ব্যথা-বেদনার বাণীহারা সকরুণ স্পর্শকাতরতা সুতীব্র বাস্তব অনুভূতির সাহায্যে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইয়া উঠিয়াছে। এই সম্পর্কে রিয়ালিষ্ট শরৎচন্দ্রের মুখে আমরা শুনিয়াছি: "যা অসুন্দর, যা immoral বা অকল্যাণ, কিছুতেই তা আর্ট নয়, ধর্ম্ম নয়। Art for Arts Sake কথাটা যদি সত্য হয়, তা' হলে কিছুতেই তা' immoral বা অকল্যাণকর হ'তে পারে না; অকল্যাণকর এবং immoral হলে 'Art for Art's Sake' কথাটা কিছুতেই সত্য নয়, শতসহস্র লোক তুমুল শব্দ ক'রে বললেও সত্য নয়—মানব জাতির মধ্যে যে বড় প্রাণটা আছে সে একে কোন মতেই গ্রহণ করে না।" বাস্তববাদী শরৎচন্দ্রের তীক্ষ্ণ প্রতিভা ও রচনাভঙ্গী বর্ত্তমান সাহিত্যক্ষেত্রে প্লাবিত করিয়া দিয়াছে এক নূতন রূপ-রস ধারার দুকূল-প্লাবী অফুরন্ত প্রাণের সমারোহ; আবেগের তীব্রতা শরৎচন্দ্রের বস্তুতান্ত্রিকতাকে এক প্রকারের আদর্শবাদে রূপান্তরিত করিয়াছে। তাঁহার রচনারীতির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই 'Style is the man' কথাটির অর্থও সম্যকরূপে উপলব্ধি করা যায়। এই প্রসঙ্গে সমালোচক রবার্ট্ লিণ্ডের কথা এ'স্থলে উল্লেখ না করিয়া পারা যায় না: 'Art, however, offers us not only escape from life but an escape into life and the first escape is of importance only if it leads to the second'. প্রত্যেক সার্থক সাহিত্যসৃষ্টির অন্তরালে বিরাজ করে এক বিশেষ সাহিত্য-প্রতিভা—মনের দৃষ্টি, বিশেষ ভাবকল্পনা, হৃদয়ের রং ও প্রাণের সুর সেই সৃষ্টির সাথে নাড়ীর যোগাযোগে জড়িত, সাহিত্যে বাস্তব অনেকটা রূপান্তরিত হইয়া শরৎ-সাহিত্যে এক উচ্চাঙ্গের রস-মাধুর্য্য সৃষ্টি হইয়া উঠিয়াছে।

জীবন

সন্তোষকুমার অধিকারী

পৃথিবীতে আছে এক উজ্জ্বল অরুণ সূর্য্য
সূর্য্য-নীল দিগন্ত আকাশ;
সে আকাশে রাত্রি নামে, মৃত্যু মুখোমুখী হয়,
জীবনকে মনে হয় শুধু প্রতারণা।

অজস্র মুহূর্ত্ত তার অবিচ্ছেদ্য গতির বন্ধনে
সীমা চায় প্রাত্যহিকতায়,—
যেথা রিক্ত দীনতার কুৎসিত লালসা আর
অন্যায়ের অকুণ্ঠ বিকাশ,
আর ঘৃণ্য কৃমি-কীট সরিসৃপ জীবের হৃদয়ে
সশব্দে নিঃশ্বাস টানে নির্লজ্জ জীবন,
জীবনের অকুণ্ঠ প্রকাশ যেথা
আলো আর অন্ধকারে
করুণা ও কুৎসিত ঘৃণায়।

আছে জানি অরণ্যের গোপন অন্তরে
ঘন অন্ধকার ঢাকা দুর্গন্ধ আবিল জলা,
আদিম হিংস্রতা আর
অজ্ঞতার দুর্জ্ঞেয় প্রকাশ।
পৃথিবীতে আরও আছে বিরাট আকাশ,
আছে মহাসাগরের মহত্ব অতল,—
প্রভাতসূর্য্যের দীপ্ত জ্যোতিষ্মান আগ্নেয়পরশে
জীবনকে মনে হয় বিচিত্র দুর্লভ।

রায়বাঘিনী

শ্রীচুণিলাল মুখোপাধ্যায়

তৃতীয় অঙ্ক

—পঞ্চম দৃশ্য—

কাটশাকড়া শিবমন্দির ও তৎপার্শ্বস্থিত শিবনিবাস।

[রাজা রুদ্রনারায়ণের মৃত্যু হইয়াছে। রাণী রাজ্য ছাড়িয়া এইখানেই সন্ন্যাসিনীর ন্যায় বাস করিতেছেন—পূজা, অর্চনা, কীর্ত্তন—স্তবস্তুতি এই সব লইয়া আছেন। রাণী শিবমন্দির সম্মুখস্থ চত্বরে শ্বেত পট্টবস্ত্র পরিহিতা মূর্ত্তির ন্যায় বসিয়া আছেন। তাঁকে দেখিলে মনে হয় শুভ্র পবিত্রতা তাঁর সর্ব্বাঙ্গ ছেয়ে আছে। শোকবিদ্ধ পবিত্র শান্ত মূর্ত্তি যেন তন্দ্রাচ্ছন্ন উষা—সূর্য্য অস্ত যাচ্ছে।]

কুনালের গীত

নীল গগনে কালোর লেখা
বজ্র হানে ধরার বুকে,
সুপ্ত মনের সোণার স্বপন
বিদ্ধ হয়ে চম্‌কে ওঠে।
প্রকৃতির এ শান্ত ছবি
অশরীরি সুরে ভরা,
দয়াল ধাতার ভক্ত ধারা
কোন্ অজানার মত্ত নেশা
কোন্ খেয়ালে চূর্ণ ক'রে
মরম ছোঁয়া কান্না দিয়ে
ডুবিয়ে দিলে বুকের আশা।

শঙ্করী। (তন্ময় হইয়া গান শুনিতেছেন—দৃষ্টি কোন সুদূরে স্থির হইল—গান থামিলে সেই অবস্থায়) কুনাল!

কুনাল। দিদি! (ধীরে ধীরে অগ্রসর)

শঙ্করী। (তদ্বৎ দৃষ্টি) তুমি যাবে না?

কুনাল। কোথায় যাবো?

শঙ্করী। বনে—

কুনাল। আর ভাল লাগে না—(দীর্ঘ নিশ্বাস)

শঙ্করী। (দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া) আমার ত কিছু হয় নি। বেশ আছি। আর কেন এবার যাও।

কুনাল। তুমিও চল।

শঙ্করী। (একটু হাসিল)…(ধীরে ধীরে হরিদেবের প্রবেশ)

হরিদেব। মা শঙ্করী!

শঙ্করী। গুরুদেব! (উঠিয়া প্রণাম করিলেন)

হরিদেব। মা! একি তোমার বেশ!

শঙ্করী। আমি বিধবা—

হরিদেব। না মা—তুমি রাণী—রাজমাতা। শিশু রাজা প্রতাপনারায়ণের সিংহাসন কে রক্ষা করবে মা?

শঙ্করী। কেন আপনি! সেনাপতি আর মন্ত্রীর হাতে রাজ্যের সমস্ত ভার আমি দিয়ে এসেছি। কুনাল আসন আনতে বল ত!

(কুনালের প্রস্থান—পরে পরিচারিকা আসন দিয়া প্রস্থান—উভয়ে স্ব স্ব আসনে বসিয়া)

হরিদেব। মা! আমি এই দিনে এভাবে রাজ্যের অবস্থায় নিশ্চিন্ত হতে পারি নি। সেনাপতি মন্ত্রী সকলেই ভাল। কিন্তু তুমি ত মা শুধু রাজার রাণী নও—তুমি ভুরস্থটের মা—সমস্ত প্রজার রক্ষয়িত্রী। তোমাকে অধিক আর কি বলবো! পাঠান আর মোগল উভয়েই চেষ্টা করবে ছলে বলে তাদের অধিকার বিস্তার করতে—ভুরস্থটকে রক্ষকহীন কোর না মা। প্রিয় প্রতাপের ভবিষ্যত মা হয়ে তুমি তমসাচ্ছন্ন কোর না।

শঙ্করী। গুরুদেব! আমি এ বেশ আছি। আমি রাজকার্য্যে—তার পরিচালনায় ফিরে যেতে পারবো না। আমি রাণী হলেও বিধবা নারী—যিনি ঐশ্বর্য্যের অধিকারিনী করেছিলেন, তিনি যখন গেছেন—আমার আর কিছু নেই। আমি ব্রহ্মচারিণী, আমায় সংযুক্তা হবার আদেশ দেননি—আমার বৈধব্যের ব্রত আমায় সাধন

করতে দিন। দেব! প্রিয় পুত্র আমার তাঁরই কাছে শিক্ষা পাবে যার পাদমূলে বসে তার মার শিক্ষালাভের সৌভাগ্য হয়েছিল—এর চেয়ে আর কোন আশাই আমি করি না।

হরিদেব। (কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া) মা! স্বামীর চিতায় জীবনাহুতি দেওয়া ব্রহ্মচারিণীর ব্রত গ্রহণ করা—সংসার বৈরাগ্য সব বিধান শাস্ত্রকারের দেওয়া—ঔষধের আবিষ্কার করেন একজন জ্ঞানী—কিন্তু মা, তার প্রয়োগ করেন পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ বৈদ্য। মা! ত্যাগ! অপার শক্তিশালিনী রাণী শঙ্করী! ভুরসুটের সাধনা-জ্ঞান-বলদাত্রী জননি! একবার চেয়ে দেখ শত সহস্র সন্তান তোমার মুখ চেয়ে আছে। শান্তি-রক্ষা-পালন তারা চায় তোমার কাছে—ভুরসুটের ত্যাগীবীরের আত্মা চাইছে তোমার চালনা—মা! এ ব্রত পালনে তোমার মুক্তি হবে, কিন্তু ভুরসুটের অগনিত সন্তান ধ্বংস হবে। আমি আর কি বোলব মা—জ্ঞানবুদ্ধির আধার তুমি।

শঙ্করী। আমি আমাকে বলি দেবো? আমার ব্রত—আমার ধর্ম্ম সব ত্যাগ কোরব—এইটাই কি—(চিন্তা)

হরিদেব। (মুখমণ্ডল এক অপূর্ব্ব জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হোল) হ্যাঁ! মা! তোমার কর্ত্তব্য—এই ত্যাগই পৃথিবীকে যুগে যুগে মূর্ত্ত করেছে।

(শ্যামার প্রবেশ)

শ্যামা। রাজধানী থেকে একজন দূত এসেছে—আবশ্যকীয় বার্ত্তা আছে।

হরিদেব। মা! (ইঙ্গিতে অনুমতি দিলে) এখানেই নিয়ে এস (শ্যামার প্রস্থান ও দূতসহ শ্যামার প্রবেশ—পরে শ্যামার প্রস্থান) কি খবর?

দূত—মন্ত্রী সন্দেহ করেন সেনাপতি পাঠানের সঙ্গে গুপ্ত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। আমতার নিকটে দ্বাদশজন অপরিচিত লোক—হিন্দু সন্ন্যাসীর বেশে দেখা গেছে—তারা প্রকৃত-পক্ষে পাঠান - তারা কাটশাকড়ায় অতিথিরূপে আসছে—আজই রাত্রে আসবে।

হরিদেব—আচ্ছা তুমি যাও (দূতের প্রস্থান) মা! কর্ত্তব্য স্থির করো।

শঙ্করী—(তাহার মুখমণ্ডলের প্রশান্তভাব অপসারিত হইয়াছে) গুরুদেব একি সত্য? সেনাপতি! সুমিত্রা!! —আমার বোন—সহচরী—একি সত্য?

(শ্যামাসহ সুমিত্রার প্রবেশ)

সুমিত্রা—সবই সত্য বোন—তাই আমি ছুটে এসেছি—তোমায় সব বলতে—গুরুদেব! আমার হতভাগা ভুরসুটকে রক্ষা করুন। (কাঁদিতে লাগিল)

শঙ্করী—(তাড়াতাড়ি উঠিয়া তাহাকে ধরিলেন) এসো মিত্রা আমার পাশে এসে দাঁড়াও—আমায় তুমি বলি দাও—

সুমিত্রা—আমি! আমায় তুমি বিশ্বাস করো—গুরুদেব!

হরিদেব—মা! নারীর কথা নারীই বোঝে—

শঙ্করী—(ধীরে ধীরে) গুরুদেব! আমার কর্ত্তব্য স্থির হয়ে গেছে। ভুরসুটকে বাঁচাব। রাজ্য আমি চালনা করবো। সুমিত্রা! বোন্! আমার নারীবাহিনী সব ঠিক করে দাও—হ্যাঁ গুরুদেব! আপনি ভবানী-পুরে যান! কয়জন পাঠানকে আমরাই বাধা দেব। শ্যামা আমার বর্ম্ম নিয়ে আয়। আমায় সাজিয়ে দে। পাঠন বুঝবে নারীর শক্তি! ব্রহ্মচারিণী আজ আবার রাণী হলো। ওসমান খাঁ! ব্রতচারিণী নারীর ব্রত ভঙ্গ করেছ। গুরুদেব! শক্তি—

(সন্ন্যাসীর প্রবেশ)

সন্ন্যাসী—এই নে মা—দেবী জয়দুর্গার শক্তিপূরিত অসি! তোরই জন্যে মা আমায় দিয়ে পাঠালেন। এ হাতে থাকলে মা তুমি অজেয়। (সকলে তাঁহাকে প্রণাম) যাই মা বড় তাড়া।

হরিদেব—শীঘ্র চল, মা জেগেছেন, আর ভয় নেই। মা! তোর মুখে আজ যে শক্তির দীপ্তি দেখেছি—সব শক্তি আজ তোর কাছে চূর্ণ হবে।

(সন্ন্যাসী ও হরিদেবের প্রস্থান—শ্যামা বর্ম্মাদি আনিলে মন্দির মধ্যে সকলের প্রবেশ।)

(কয়জন গ্রামবাসী স্ত্রী পুরুষের প্রবেশ)

১ম পুঃ—কই আজ কীর্ত্তনের কোন জোগাড় নেই কেন?

২য় পু—কই হে প্রসাদ কই ? কোনও ব্যবস্থা নেই। আচ্ছা রাণী কোথায় ?

১ম স্ত্রী—হ্যাঁ গা বাছা—তোমরা গোল কোরছ কেন ? আজ কিসের পালা ?

১ম পুঃ—যা ব্যবস্থা—পালার পালা দেখছি।

(শ্যামার প্রবেশ)

শ্যামা—ওগো, তোমরা শীগ্‌গির বাড়ী যাও—পাঠান আসছে গ্রামে।

১ম পুঃ—হ্যাঁ, পাঠন কি গো ? আমার বাড়ী যে অনেক দুর—পালাই বাবা— (প্রস্থান)

শ্যামা—সব যাও। এখুনি আলো নিববে। এখুনি যাও—

সকলে - হ্যাঁ গো যাচ্ছি—পাঠানের কেত্তনও আমরা শুন্‌বো না— (প্রস্থান)

(রাণীর প্রবেশ—যুদ্ধবেশ—হাতে সন্ন্যাসীদত্ত অসি—বর্ম্মের উপর পট্টবস্ত্র পরিহিতা।)

শঙ্করী—শ্যামা ! আলো নিবিয়ে দাও—আমার দেহরক্ষিণীদের ডাক (শ্যামা শঙ্খ বাজাইলে কয়জন দেহ-রক্ষিণী অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া প্রবেশ) তোমরা আজ আমায় রক্ষা কোর্ব্বে। পাঠান দস্যু আসছে অত্যাচার কোর্ত্তে—তোমরা সতর্ক থেকো। শ্যামা এদের যথাস্থানে প্রস্তুত রেখো। (প্রস্থান)

শ্যামা—তোমরা ভাই সব শুনলে ত—বারজন পাঠান আসছে—সঙ্গে ওসমান খাঁ নিজে—গোপনে ছদ্মবেশে—সন্ন্যাসী সেজে—তাদের এই শিবনিবাসের বাইরেই আমরা অতর্কিতে আক্রমণ কোর্ব্ব। তারা আজ যেন বুঝে যায় ভুরসুটের শক্তির একটু পরিচয়।

১ম নারী—দেবী ! তার বেশ ভাল ক'রে ব্যবস্থা করো।

২য় নারী—এমন শিক্ষা আজ তারা যেন পায় যে এই তস্করবৃত্তির আর কোনও আশ্রয় না লয়।

শ্যামা—তোমাদেরই হাতে আমাদের রাণীর মান। দেখো যেন এ সামান্য ব্যাপারে তাঁকে না অস্ত্র ধরতে হয়। (হঠাৎ থামিয়া) কিসের শব্দ শোনা যাচ্ছে—চল, সময় উপস্থিত। (সকলে বাহির হইয়া গেল—নিস্তব্ধ মন্দির চত্বর—আলো নির্ব্বাপিত—মন্দির-বিগ্রহের সম্মুখস্থ প্রদীপের ক্ষীণ রশ্মি চত্বরের কিয়দংশ আলোকিত করিল)

(কুনাল ও সুমিত্রার প্রবেশ)

কুনাল—আমার দিদি কই ?

সুমিত্রা—দেবাদিদেবের ধ্যানে নিমগ্না—

কুনাল—বিপদ ! দেবী সুমিত্রা ! কারা সব—?

সুমিত্রা—কুনাল ! তোমার দিদি শক্তির অংশরূপিণী ! দিদির তোমার বিপদ। যার এমন ভাই—সদা সতর্ক প্রহরী—ছায়ার ন্যায় তাঁর দেহ রক্ষা করছে—তার বিপদ ?

কুনাল—আরে আমায় যে নিষেধ করেছে মানুষ মারতে। কি ছাই সব কীর্ত্তন গাইতে শিখিয়েছে—কেবল হরিবোল আর হরিবোল। ব'লো দিদিকে আজ আমি আর পারবো না—আমি যাই—বলে দিও— (প্রস্থান)

(দূরে সৈনিকের চিৎকার শুনিয়া সুমিত্রার বাহিরে প্রস্থান)

(দূরে বৃক্ষতলে অন্তরালে গোপনে ওসমান খাঁর অবস্থান)

(শঙ্করীর মন্দির হইতে প্রবেশ)

শঙ্করী—একহাতে তার ঢাল—অপর হাতে দেবদত্ত অসি—দেবীর সে মূর্ত্তি মন্দির চত্বর উদ্ভাসিত করিল—দেবশক্তি—সম্পূরিত দেবীমূর্ত্তি—গম্ভীর স্থির—দূরে কি দেখিতে লাগিলেন—একজন নারী সৈনিকের প্রবেশ) দেখিস একজনও না ফেরে স্পর্দ্ধা পাঠানের—আমার পবিত্র দেব নিবাস কলুষিত করেছে ! আমি তোদের রাণী—এই অত্যাচার যদি এখানে হয়—গরীব দুর্ব্বল নিঃসহায়দের উপর কত অত্যাচারই না শয়তান করেছে—মার ! মেরে ফেল—

নারী সৈনিক—মা আমি যাই। সুমিত্রা দেবী পাঠিয়েছিলেন আপনি নিরাপদে আছেন কি না দেখতে। মা ! তিনি একাই অর্দ্ধেক পাঠানকে বিধ্বস্ত করেছেন—মা ! কি সে শক্তি !

শঙ্করী—(দূরে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া) ওরে যা—যা—তাকে রক্ষা কর সে আজ প্রাণ দেবে। ওরে সুমিত্রা যেন না প্রাণ দেয়—দেখিস্—যা—যা—(নারী সৈনিকের

প্রস্থান) বোন্! আমার ঔদাসিন্যের প্রায়শ্চিত্ত কোর্বে তুমি! (একটি তীর আসিয়া পদতলে পড়িল—তিনি তাড়াতাড়ি তাহা পরীক্ষা করিতেছেন—হাতে তরবারি—দৃঢ় মুষ্টিবদ্ধ—তীরটি দেখিয়া মৃদু হাসিল—দূরে একটি শব্দ—কুনালের প্রবেশ—অপর দিকে অগ্রসর)

শঙ্করী—কুনাল!

কুনাল—দিদি! পরে এসে ক্ষমা চেয়ে নেবো।

(প্রস্থান)

(শ্যামা ও অন্যান্য নারী সৈন্যের প্রবেশ)

শঙ্করী—সুমিত্রা কই? শ্যামা! তাকে ফেরাতে পারনি—

শ্যামা!—দেবী! তিনি বেঁচে আছেন মা! কি সে শক্তি! অমন শান্ত মূর্ত্তির ভেতর—এত শক্তি!

শঙ্করী—তাই তো ভয় হয় শ্যামা—তাকে হারাবো না তো? আমার জীবনের সঙ্গিনী—আমার একনিষ্ঠ পূজারিণী—একি ভাগ্যের খেলা?

শ্যামা—অর্দ্ধেক পাঠান মরেছে—বাকী পালিয়েছে। সুমিত্রা দেবী যে কোথায় অদৃশ্য হলেন বুঝতে পারলুম না। আমাদের মধ্যে সামান্য আঘাত দু একজন পেয়েছে।

শঙ্করী—আমি নিশ্চিন্ত। (কুনালের প্রবেশ—এক হাতে ধনুক অপর হাতে পাঠানের শিরোপা। কোন এক দুর্ব্বার ক্ষোভে তার শির মাটির সঙ্গে মিশে গেছে—শঙ্করী তাহাকে দেখিয়া) কুনাল কাছে এসো—তোমার হাতে কি? ভাই! তোমায় যদি ক্ষমা না করি—

কুনাল। (ধীরে ধীরে শিরোপাটি শঙ্করীর পদ নিয়ে রাখিয়া) দিদি! আমায় তাড়িয়ে দাও। আমি চলে যাই—নিশানা ভুলে গেছি। দিদি এই নাও শয়তানের পাগড়ীটা—মাথাটা বিঁধতে পারিনি। কেন জান দিদি? তোমার হরিবল। হাত কাঁপলো আর সয়তান পালালো ঐ গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে তোমায় দেখছিল—

(সকলে চমকাইল—শ্যামা পাগড়ীটা তুলিয়া লইয়া দেখিয়া)

শ্যামা—এ যে পাঠান সর্দ্দারের!! (সকলে সচকিত)

শঙ্করী—কুনাল! ভাই আমার—

কুনাল—আর এখানে নয় দিদি। দেখা হবে—এখানে নয়—বড় পালিয়েছে— (প্রস্থান)

(শঙ্করী তাহার দিকে চাহিয়া আছে—অপর দিক দিয়া এক সৈনিকের দ্রুত প্রবেশ—হাতে ক্ষত দিয়া রক্ত পড়ছে—রাণীকে প্রণাম)

সৈনিক—মা!

শঙ্করী—কে? কি চাই তোমার?

সৈনিক—পলাতক পাঠানদের বন্দী করেছি।

শঙ্করী—কে তোমাকে বললে?

সৈনিক—আমি একা নই—আমরা বারজন সেনাপতির আদেশে এখানে এসেছিলাম। পথে পলায়মান পাঠান সৈন্যগণ আমাদের আক্রমণ করে। তাদের বন্দী করে রাজধানীতে পাঠিয়ে এখানে আসছি।

শঙ্করী—সেনাপতি! চতুর্ভুজ!! সৈনিক! তুমি আঘাত পেয়েছ?

সৈনিক—(মস্তক অবনত) মা! ও কিছু নয়। মা! একটা কথা—দেবী সুমিত্রা কি এখানে এসেছিলেন?

শঙ্করী—হাঁ—কোথায় তিনি? তাঁকেইত আমি চাই— (ব্যাকুলতা)

সৈনিক—মা! তাঁকে বাঁচান—

শঙ্করী—(চিন্তিত হইয়া) শ্যামা! এর শুশ্রূষার ব্যবস্থা কর। একবার হতাহতের খোঁজ নাও। (উভয়ের প্রস্থান) আমার প্রাণের প্রিয় সহচরী! ভুরসুটের শ্রেষ্ঠ নারী! সব বুঝেছি!

ড্রপ

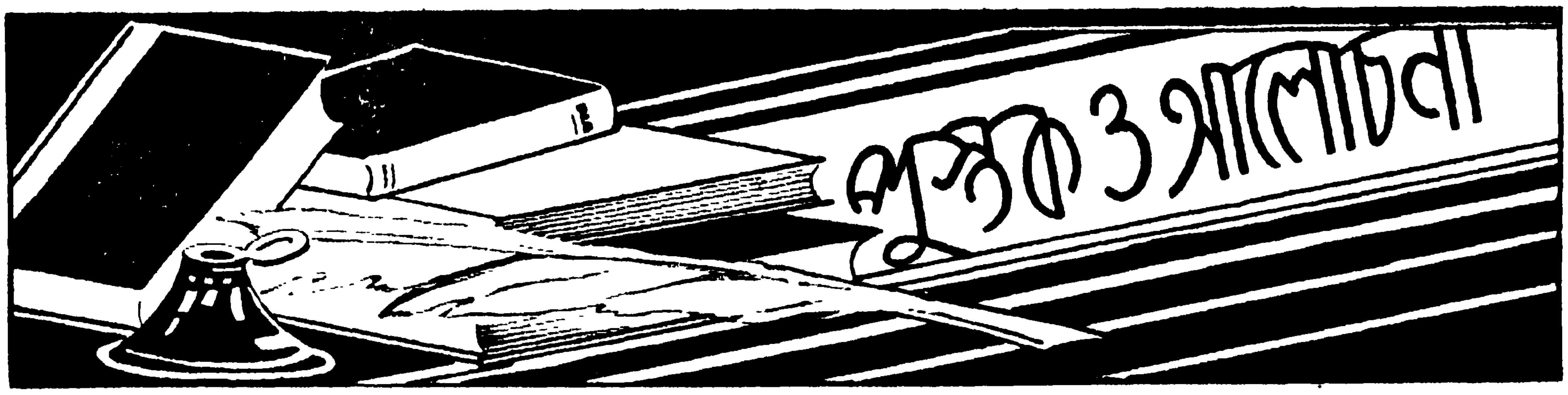

ধীরে বহে ডন (প্রথম খণ্ড—শান্তি) : মিখাইল শোলোখফ্। অনুবাদক—প্রফুল্ল চক্রবর্ত্তী। বেঙ্গল পাব্লিশার্স, ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য চার টাকা মাত্র।

ভিশেন্স্কায়ার মাত্র ৪৬ বৎসরের স্বল্পপরিসর জীবনের মানুষ মিখাইল্ শোলোখফ্। কিন্তু জীবনের অভিজ্ঞতা তাঁহার বহুবিস্তৃত। সেই অভিজ্ঞতাই স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে তাঁহার 'সয়েল আপ টার্ণড', 'এ্যাণ্ড কোয়ায়েট ফ্লোজ্ দি ডন' প্রভৃতি গ্রন্থে। 'ডন'-এর চমকপ্রদ কাহিনী ও লিপি-চাতুর্য্য শোলোখফ্কে বিশ্বখ্যাত করিয়াছে এবং পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হইয়া গ্রন্থখানি ইতিমধ্যেই বিদগ্ধ সমাজে এক নতুন রসসঞ্চার করিয়াছে। ইহার প্রধান কারণ শোলোখফের কাহিনীর মূল বিষয়বস্তু, ঘটনা সংস্থান ও চরিত্র সৃষ্টি। কজাক পরিবারে মানুষ হইয়া কৃষিজীবী কজাক জীবন হইতেই তিনি তাঁহার এই গ্রন্থের উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন। গ্রন্থখানির বাংলা অনুবাদ 'ধীরে বহে ডন' এতদিনে খণ্ডাকারে প্রকাশ পাইল, এদিক হইতে অনুবাদক এবং প্রকাশক উভয়েই প্রশংসনীয়।

মেলখফ্ পরিবারের ইতিহাস লইয়া আলোচ্য গ্রন্থের সুরু। এই পরিবারের অপ্রতিহত গতির সঙ্গে কোর-শুকফ্ ও মোখফ্ পরিবারের ইতিহাসও অঙ্গাঙ্গীসূত্রে কাহিনীর পরিণতির দিকে আগাইয়া চলিয়াছে। গ্রন্থের এই শান্তিপর্ব্বে প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত প্রধান চরিত্র গ্রীগরী। লেখক অফুরন্ত শক্তি ও সহানুভূতি দ্বারা এ-চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন, তাই বলিয়া পক্ষপাতিত্ব দোষে নিজেকে দুষ্ট করেন নাই। নিজের সৃষ্টি-বৈচিত্র্যেই চরিত্র তাহার আপন বিভায় ব্যাপ্ত ও উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। শুধু গ্রীগরীই নয়, কোনো চরিত্রের আপন ব্যাপ্তি সম্পর্কেই লেখক কোথাও রাশ টানেন নাই। ইহাতে প্রত্যেকটি চরিত্রই জীবন্ত ও সরব হইয়া উঠিয়াছে। সমগ্র কাহিনীটি লিপিবদ্ধ করা এখানে নিষ্প্রয়োজন। দুই একটি চরিত্রের উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে। যেমন আক্সিনিয়া। স্তেপানের পত্নী আক্সিনিয়ার উপর তাহার পিতার পাশবিক অত্যাচার এবং বিবাহিত জীবনে স্বামী কর্ত্তৃক তাহার অবহেলা আক্সিনিয়ার প্রতি পাঠকমাত্রেরই সহানুভূতির উদ্রেক করে। পরে গ্রীগরীর সঙ্গে তাহার সংযোগ একদিকে যেমন মধুর, অন্যদিকে তেম্নি করুন। স্তেপানের মনোবিশ্লেষণও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। গ্রীগরীর কষ্ট-সহিষ্ণুতা, চাষ-আবাদে কর্ম্মপটুতা এবং সর্ব্বোপরি কজাক-সুলভ পারদর্শিতা অন্য সকলের ন্যায় মিরণকেও বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে। গ্রীগরীর সঙ্গে অতঃপর তিনি কন্যা নাতালিয়ার বিবাহ দেন। গ্রীগরীর জীবনে আক্সিনিয়া ও নাতালিয়ার আবির্ভাব আকস্মিক না হইলেও চাঞ্চল্যকর। এই চাঞ্চল্যই কাহিনীর গোড়া হইতে শেষ পর্য্যন্ত পাঠকচিত্তকে ভাবাবিষ্ট করিয়া রাখে।

অনুবাদক কোথাও মূল গ্রন্থকে ইচ্ছানুরূপ ছাটাই বা অতিক্রম করিয়া যান নাই। তাঁহার প্রয়োগ নৈপুণ্য মনোরম এবং প্রকাশভঙ্গী সাবলীল। ভাষা অনেক স্থলে অনুবাদের বন্ধন কাটাইয়া ভাবঘন মৌলিকত্বে উন্নীত হইয়াছে। কিন্তু বাংলা প্রতিশব্দ হিসাবে 'ছিনাল' জাতীয় দুই একটি কথা কৃষ্টি-বিগর্হিত বলিয়াই মনে হইল। সৎসাহিত্যের ক্ষেত্রে উহা অশোভন। পরবর্ত্তী সংস্করণে উহার সংস্কার হইলে সুখকর হইবে। গ্রন্থের অঙ্গসজ্জা ও বাধাই প্রথম শ্রেণীর।

সম্পাদকীয়

শিক্ষা ও সংস্কৃতি

আমাদের দেশে আমরা শিক্ষিত বলিতে কি বুঝি? লোকে সাধারণতঃ কাহাদের শিক্ষিত বলিয়া বিবেচনা করেন? বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্র হইতে যিনি প্রত্যাগত না হইয়াছেন, তাঁহাকে আমরা শিক্ষিত বলিয়া কোন ক্রমেই মানিতে চাহি না। অথচ কোন প্রকারে বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা ছাপ পাইতে পারিলে আমাদের দেশে জন-সমাজে সবাই বিনা প্রশ্নে তাঁহাকে শিক্ষিত বলিয়া মানিয়া লইবেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ করা এবং শিক্ষিত হওয়া প্রায় একার্থক হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

কিছুদিন পূর্ব্বে পশ্চিমবঙ্গে দুইটী বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্ত্তন উৎসব হইয়া গিয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পৌরোহিত্য করিয়াছেন মধ্য প্রদেশের রাজ্যপাল শ্রীমঙ্গলদাস পাকবাশা এবং বিশ্ব-ভারতীতে পৌরোহিত্য করিয়াছেন ডাঃ রাধাকৃষ্ণণ।

শ্রীপাকবাশার নিকট হইতে আমরা শুনিয়াছি যে, যেখানে দেশের শাসন-ব্যবস্থার মূল ভিত্তি গণতান্ত্রিক,সেখানে রাষ্ট্র ব্যষ্টির স্বার্থসংরক্ষক এবং এইরূপ রাষ্ট্রে শিক্ষার লক্ষ্য ও পদ্ধতি এমন হওয়া উচিত—যাহাতে ব্যষ্টি তাহার ক্ষমতা উপলব্ধি করিতে ও যোগ্যতা বৃদ্ধি করিতে পারে। এ কথা বলার পরেই শ্রীপাকবাশার মনে সংশয় উপস্থিত হয় এবং পুনরায় তিনি বলেন—কিন্তু তৎসঙ্গে এমন শিক্ষা-পদ্ধতির উপরেও কি জোর দেওয়া উচিত নহে—যাহা মানুষের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বৃত্তি পরিপুষ্ট করিবে? কেননা, তাঁহার মতে যাহা মস্তিষ্ক-প্রসূত তাহা যদি হৃদয়বৃত্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত না হয়, তবে উহা সর্ব্বনাশের পথে লইয়া যাইতে পারে। অপর পক্ষে, ডাক্তার রাধাকৃষ্ণণ আমাদের শুনাইয়াছেন যে, বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের সন্ধান এবং বিরুদ্ধ শক্তিসমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধন প্রাচ্য সভ্যতার মূল কথা। অনাগত যুগে সমগ্র বিশ্বে এই আদর্শের প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। বিশ্ব-ভারতীর প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়া সমগ্র বিশ্বকে বুঝাইতে চাহিয়াছেন শান্তির প্রকৃত অর্থ কি? অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক প্রয়াসের মধ্য দিয়া শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব নহে। শান্তি প্রতিষ্ঠা একমাত্র বিশ্ববোধের মধ্য দিয়াই সম্ভব।

স্পষ্ট করিয়া বলিতে গেলে এ-কথা বলিতে হয় যে, উপরোক্ত দুইটি অভিভাষণে কথার গুরুত্ব যথেষ্ট আছে বটে, কিন্তু আজ আমাদের শিক্ষার গলদ কোথায়, কি ভাবে শিক্ষা আজ প্রবর্ত্তন করা উচিত হইবে এবং প্রকৃত শিক্ষা কাহাকে বলিব—ইত্যাদি কোন প্রশ্নেরই কোন উত্তর আমরা পাই নাই। কি ভাবে শিক্ষিত করিলে আজিকার এই দ্বন্দ্ব-কলহপূর্ণ পৃথিবী সত্য সত্যই শান্তির মাধ্যমে আত্ম-প্রতিষ্ঠা করিয়া মানবধর্ম্ম বিকশিত করিতে পারিবে, তাহাও আমরা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলাম না। ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রকৃত রূপ আমাদের কাছে ধরা পড়ে নাই। ব্যষ্টির স্বার্থ কি এবং কি ভাবে রাষ্ট্র তাহাকে সংরক্ষণ করিতে বাধ্য থাকিবেন, ইহাও আমাদের নিকট পরিস্ফুট হয় নাই।

এই প্রশ্নগুলি আমরা তুলিতে বাধ্য হইয়াছি, কারণ—সকল কার্য্যেরই একটা লক্ষ্য থাকা আবশ্যক। লক্ষ্যহীন জাতি কখনও অভ্যুদয়শালী ও কালজয়ী হইতে পারে না। লক্ষ্য স্থির রাখিতে পারিলে কিছুই অসম্ভব নহে ; এমন কি অতি দুষ্কর ও দুঃসাধ্য কার্য্যও সুসম্পন্ন করা যাইতে পারে। সুতরাং আমাদের শিক্ষার লক্ষ্য বা শিক্ষার উদ্দেশ্য স্থির করিয়া লওয়া একান্ত প্রয়োজনীয়। আরও মনে রাখিতে হইবে যে, শিক্ষার উদ্দেশ্য অনুযায়ীই শিক্ষনীয় বিষয়গুলি নির্ব্বাচন করিতে হইবে। যতক্ষণ শিক্ষার উদ্দেশ্য ঠিক না করা হইবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত শিক্ষনীয় বিষয় নির্ব্বাচনও হইতে পারে না এবং তজ্জন্যই কোন লোক-হিতকর শিক্ষা প্রদান করাও সম্ভব নহে।

শিক্ষার কি উদ্দেশ্য হওয়া উচিত, তাহা ঠিক করিতে হইলে মানুষ কেন শিক্ষা চায় বা বালক-বালিকাকে কেন শিক্ষিত করিয়া তুলিতে হইবে, তাহা বুঝিতে হইবে। সাধারণ ভাবে বলিতে গেলে বলিতে হয় যে, মানুষ সর্ব্বদা স্বীয় অভীষ্ট লাভ অথবা স্বীয় অভিলাষ পূরণ করিবার জন্য ব্যগ্র। যাহাতে এই অভীষ্ট লাভ বা অভিলাষ পূরণ করিবার ইচ্ছা পূর্ণ হইতে পারে, তজ্জন্যই শিক্ষার প্রয়োজন এবং তজ্জন্যই শিক্ষালাভ করাইবার জন্য এই ব্যগ্রতা।

মানুষের অভীষ্ট লাভ বা অভিলাষ পূরণ আপাতঃ-দৃষ্টিতে বহুধা বিভক্ত। কিন্তু একটু চিন্তা করিলেই স্পষ্ট হইবে যে, এগুলি যতই বিভিন্ন মনে হউক না কেন—এর প্রত্যেকটির পশ্চাতেই রহিয়াছে দুইটির যে কোন একটী উদ্দেশ্য—হয় মানুষ চায় তাহার জীবন-রক্ষা করিবার জন্য প্রয়োজনীয় অবস্থা এবং দ্রব্যাদি বা তাহার ইচ্ছা-লব্ধ কোন কার্য্য-ক্ষমতা বিকাশ করিবার অবকাশ ও সুযোগ। এই দুই প্রকারের ইচ্ছাকে সফল করিবার উদ্দেশ্যেই শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা, এবং এই শিক্ষা হইতে যে কৃষ্টির উৎপত্তি হয়, যাহা দ্বারা উপরোক্ত উভয় প্রকারের ইচ্ছাকে সফল করা যায়, তাহাই জাতির সংস্কৃতি। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, জাতীয় জীবনে শিক্ষার প্রবর্ত্তন ও এই শিক্ষা-লব্ধ সংস্কৃতি ব্যতিরেকে জাতীয়-জীবন পঙ্গু হইয়া যায়—কারণ যেখানে শিক্ষা নাই বা শি া-প্রথা ক্লেদযুক্ত, সেখানে সংস্কৃতির স্থলে দুর্নীতি প্রকাশ পায় এবং লোকসমূহ নানাভাবে দুঃখে ও কষ্টে জর্জ্জরিত হইয়া থাকেন।

কথা উঠিতে পারে যে, আমরা যখন দেখি যে প্রতি দেশেই দুঃখ ও দারিদ্র্যের প্রকোপ যথেষ্টই রাহয়াছে, তখন সম্ভবতঃ এমন শিক্ষা হওয়া সম্ভব নহে—যাহার সংস্কৃতির বলে প্রত্যেক লোকই দুঃখ ও অভাবের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারেন। এ-কথা সত্য হইলে, প্রত্যেক লোকের প্রয়োজনীয়তার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া শিক্ষার প্রবর্ত্তন করিবাব উদ্দেশ্যের কোন অর্থ থাকে না।

কিন্তু একথা সত্য নহে। সমাজের এমন ব্যবস্থা ও শিক্ষা হইতে পারে যাহা দ্বারা সমাজের প্রত্যেক লোকই দুঃখ ও অভাবের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারেন। আমরা যদি আমাদের দেশের পূর্ব্ব ইতিহাস পর্য্যালোচনা করি, তবে দেখিব যে—এই ভারতে এমন দিন ছিল যখন প্রত্যেক লোকই ছিলেন স্বাবলম্বী, নীরোগ, নিরপরাধ, সন্তুষ্ট এবং পরিণত-বয়স-প্রাপ্ত। ইহার ফলে ভারতের কোন লোকেরই দুঃখ বা দৈন্যবোধ ছিল না এবং তাঁহারা প্রত্যেকেই সর্ব্বদা পরের জন্য বাঁচিবার আনন্দ উপভোগ করিতেন।

এই প্রসঙ্গে আমরা বুঝাইতে চাই যে, দিন কেমন ভাবে ঘুরিয়াছে। এই ভারতে এমন একদিন ছিল যখন চাকুরী করিয়া কাহাকেও খাইতে হইত না। প্রত্যেকেই নিজের চেষ্টায় নিজ বুদ্ধিতে নিজ নিজ পরিবারের ভরণ-পোষণ করিতে পারিতেন, এমন ব্যবস্থা ছিল। ফলে প্রত্যেক লোক অপরের ছিলেন বন্ধু, সুহৃদ। অন্যের সহৃদয়তার দিকে তাকাইয়া যখন মানুষের দিনাতিপাত করিতে হইত না—তাহা কত বড় সুখের—তাহা আজ চাকুরিয়াগণ নিশ্চয়ই মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিবেন। আজ এমন হইয়াছে যে, যাঁহারা শিক্ষিত নামে পরিচিত, তাঁহারা সকলেই হয় চাকুরীজীবী অথবা কাহারও-না-কাহারও সহৃদয় চিন্তার উপর আশ্রিত। এবং যাহারা শিক্ষিত নহে—যেমন চাষী, কামার, কুমার, তাঁতী ইত্যাদি—তাহারাও নিজেদের কাজ নিজ ব্যবস্থায় চালাইতে পারেন না। তাহাদেরও অপরের মুখাপেক্ষী হইয়া বসিয়া থাকিতে হয়। যে সংস্কৃতির ব্যবস্থার প্রথমাঙ্ক ছিল স্বাবলম্বী হইয়া বাঁচা, তাহার স্থলে আজ অগণিত লোকশ্রেণী হইয়াছেন হয় পরমুখাপেক্ষী অথবা কার্য্যহীন।

আমাদের এই সুজলা সুফলা ভারতভূমিতে যে পূর্ব্বে নীরোগ লোকের সংখ্যাই ছিল সমধিক, তাহা প্রমাণ করিবার আজ আর প্রয়োজন নাই। রোগ ও শোক প্রতিদিন কিরূপ ভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহা প্রত্যেকেরই জানা আছে। আজ আমরা এমন অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছি যে, সামান্য শিশুকেও বলিতে শুনি যে—জন্ম যখন হইয়াছে, তখন রোগ ভোগ ত করিতেই হইবে। আজ একথা প্রায় চিন্তা করাই যায় না যে, এ দেশে ভগবান তথাগত গৃহত্যাগ করিলেন রোগীর দুঃখ দেখিয়া। রোগ হওয়া তখনকার দিনে এমনই আশ্চর্য্যের কথা ছিল। আমরা আজও আমাদের পিতৃ-পিতামহের দিকে তাকাইলে দেখিতে পাই যে, আমাদের চাইতে তাঁহারা কত বেশী স্বাস্থ্যবান! যখন হইতে ভারতবর্ষে শৃঙ্খলাবদ্ধ ভাবে লোক গণনা আরম্ভ হইয়াছে, তখন হইতে যদি ৩০ হইতে ৫৫ বৎসর পর্য্যন্ত বয়স্ক লোকের মৃত্যুর হার ঐ অঙ্কগুলি হইতে গণনা করা যায়, তবে দেখা যাইবে যে, ১৯০১-১১ এবং ১৯১১-২১ এবং ১৯২১-৩১ এবম্বিধ ভাবে মৃত্যুর হার অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। যে ভাবেই দেখা যাউক না কেন, আজ ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে—যে দেশের বলিষ্ঠতা ছিল তাহার অগণিত লোকশ্রেণীর নীরোগ জীবনযাপন করা, সেই দেশের প্রত্যেক বালক বালিকা শিশু পর্য্যন্ত আজ নানারূপ রোগগ্রস্ত হইয়া জাতীয় জীবনকে পঙ্গু করিয়া ফেলিয়াছে। আমাদের সংস্কৃতির দ্বিতীয়াঙ্কও একটী বিয়োগান্ত নাটকে পর্য্যবসিত হইয়াছে।

তৃতীয়তঃ, নিরপরাধ লোকের সংখ্যার তুলনামূলক সমালোচনা করিলে দেখা যাইবে—পূর্ব্বে আমাদের দেশে যেমন সহজ সরল কৃষিজীবী ও সাধারণ জনসাধারণ ছিল, আজ আর সেইরূপ নাই। শুধু যে যাহারা অশিক্ষিত তাহাদের মধ্যে অপরাধপ্রবৃত্তি বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহা নহে—যাঁহারা শিক্ষিত বলিয়া পরিচিত, তাঁহাদের মধ্যেও এই ব্যাধি গুরুতররূপে প্রকটিত হইতেছে। ফৌজদারী বিধি আইন যেন প্রতিদিনই অপরাধের বৈষম্য ও গুরুত্ব হিসাবে অযোগ্য হইয়া পড়িতেছে। নূতন নূতন আইন প্রণয়ণের কথাও চিন্তা করিতে হইতেছে।

এমন একদিন ছিল যখন আমাদের দেশে আপামর জনসাধারণ সন্তুষ্ট চিত্তে বাস করিতেন। কাহারও অন্যের কোন রোজগার বা প্রতিষ্ঠার প্রতি হিংসা বা দ্বেষ করিবার কোনও কারণ ছিল না। সমাজের এমন ব্যবস্থা ছিল যে, প্রত্যেকেই স্ব স্ব উপায়ে নিজেদের জন্য যথেষ্ট রোজগার করিতেন এবং সর্ব্ব

প্রকারের রোজগারের পন্থাতেই লোকের আয় প্রায় একই প্রকারের হইত। ইহাতে নিজ নিজ বৃত্তির দ্বারা লোকে শুধু যথেষ্ট রোজগার করিতে পারিতেন—তাহাই নহে, স্ব স্ব বৃত্তির উপরেও প্রত্যেক লোকের যথেষ্ট শ্রদ্ধা বা ভালবাসা ছিল। নিজ বৃত্তি ত্যাগ করিয়া অপরের বৃত্তি গ্রহণ করা বা গ্রহণ করিবার লিপ্সা দেখা যাইত না। ফলে তাঁহারা সন্তুষ্ট চিত্তে জীবন যাপন করিতে পারিতেন। কিন্তু আজ সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে আর সেই অবস্থা নাই। কোনও বৃত্তিতে যথেষ্ট আয় হইতেছে, আবার কোনও বৃত্তিতে আয় করা একেবারেই দুষ্কর হইয়া উঠিতেছে। ফলে স্ব স্ব বৃত্তির উপরে সেই শ্রদ্ধা অথবা ভালবাসা আজ আর নাই। সকলেই কয়েকটি বৃত্তিসম্পন্ন লোককে লোভ অথবা ভীতির চক্ষে দেখিয়া থাকেন। তদুপরি আজ বেশীর ভাগ কার্য্যেই লোকশানগ্রস্ত হইয়া পড়িতে হয়। সম্বৎসর নিশ্চিন্তমনে খাইয়া পরিয়া জীবন যাপন করা যাইতে পারে—এমন বৃত্তি আজ বিরল হইয়া পড়িয়াছে। ফলে ঈর্ষা, দ্বেষ, মারামারি, হানাহানি বৃদ্ধি পাইতেছে এবং অসন্তুষ্ট লোকের সংখ্যা ক্রমশঃই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। অধুনাতন জগতে সন্তুষ্ট লোকের সংখ্যা বিরল হইয়া পড়িয়াছে এবং সন্তুষ্টি যেন প্রতিদিনই অপার্থিব বস্তুতে পরিণত হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

যেমন সন্তুষ্টি নাই—ঠিক সেইরূপ পরিণত বয়ঃপ্রাপ্ত বৃদ্ধও আজ আর নাই বলিলেই চলে। অপরিণত বয়সে মৃত্যুর হার ক্রমাগত বাড়িয়াই চলিয়াছে। ফলে পথে ঘাটে আজ পরিণত বয়স্ক পক্ক-কেশ বৃদ্ধ প্রায় চোখেই পড়ে না। কিন্তু কিছুদিন পূর্ব্বেও যথেষ্ট পরিণত বয়স্ক লোক দেখা যাইত। সুতরাং মনুষ্য জীবনের আয়তন ক্রমেই যে ক্ষীণতর হইয়া আসিতেছে, তাহা স্পষ্টই উপলব্ধি হইতেছে। এই ভাবে অধিক দিন চলিলে শীঘ্রই এমন অবস্থা আসা সম্ভব যেদিন দেশে বাল-গোষ্ঠী ব্যতিরেকে অন্য লোক বিরল হইয়া পড়িবে। বয়সের শিক্ষা ও বয়স্কের সংস্কৃতির কথা চিন্তা করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, এই অবস্থা শিক্ষা ও সংস্কৃতির দিক দিয়া মোটেই বাঞ্ছনীয় নহে।

যদি একথা স্বীকার করা যায় যে, শিক্ষার উদ্দেশ্য এমন হওয়া চাই—যাহাতে মানুষকে অন্ততঃ স্বাবলম্বী, নীরোগ, নিরপরাধ, সন্তুষ্ট ও পরিণত বয়ঃপ্রাপ্ত করিতে পারে—তাহা হইলে একথা স্বীকার করিতেই হয় যে, আমাদের দেশে পূর্ব্বে যে শিক্ষা ছিল, তাহা তাহার উদ্দেশ্য সফল করিতে সক্ষম হইয়াছিল। সেই শিক্ষা হইতে যে সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিয়াছিল, এক কথায় তাহাকেই ভারতের ঐতিহ্য বলা যাইতে পারে। সেই যুগে ঐ শিক্ষার প্রেরণায় ভারতে একটী বলিষ্ঠ যুগের প্রবর্ত্তন হইয়াছিল—যাহা লইয়া সমস্ত দুনিয়া গর্ব্ব করিতে পারিত এবং যাহার সম্মুখে অন্য সমস্ত দেশই অবনত মস্তকে তাঁহাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি দিতেন। সেই শিক্ষা লাভ করিতে দূর দূরান্তর হইতে লোক আসিত এই ভারতে পর্য্যটক হিসাবে এবং এই স্থলে শিক্ষা লাভ করিয়া নিজেদের ও নিজ দেশকে ধন্য ও মহিমান্বিত করিয়া তুলিতেন। এই শিক্ষার প্রকৃত রূপ কি ছিল, তাহা আমাদের এই প্রবন্ধের বিষয়বস্তু নহে, কিন্তু আমরা শুধু দেখাইতে চাই যে, ভারতীয় ঐতিহ্য বলিতে আমরা যাহা বুঝি, আজ যাহা লইয়া কথায় কথায় আমরা নিজেদের গর্ব্বিত বোধ করি, সেই ঐতিহ্যের মূলে ছিল ভারতীয় শিক্ষা ও তল্লব্ধ সংস্কৃতি। সেই সংস্কৃতির ভারতীয়গণ শুধু নিজেদের স্বাবলম্বী, নীরোগ, নিরপরাধ, সন্তুষ্ট ও পরিণত বয়ঃপ্রাপ্ত করিয়া তোলেন নাই, তাঁহারা সারা দুনিয়াতে মানব-ধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করিয়া সর্ব্বত্রই এই কৃষ্টি-লাভের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

কিন্তু এই ভারতেই আজ স্বাবলম্বী হওয়া দূরের কথা, অধিকাংশ লোক অর্থাভাবে ও অন্নাভাবে জর্জ্জরিত, নীরোগতা ও নিরপরাধ স্বভাব অপার্থিব বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত এবং সন্তুষ্টি ও পরিণত বয়স লাভ করা শুধু বাসনায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। ইহাতে পরিষ্কার হইয়া যায় যে, ভারতের সেই শিক্ষা আমরা হারাইয়া ফেলিয়াছি, ভ্রান্ত হইয়া পথে পথে ঘুড়িয়া আমাদের সেই সংস্কৃতিকে ভাঙ্গিয়া টুকরা টুকরা করিয়া দানবের পদে জলাঞ্জলি দিয়াছি।

আমাদের মধ্যে কেহ কেহ বলেন যে, পাশ্চাত্ত্য আজ বড় হইয়াছে। তাহাদের নিকট হইতে আমাদের আবার নূতন করিয়া শিক্ষা করিতে হইবে। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এই যে, আমরা পাশ্চাত্ত্যের নিকট হইতেই বা আজ শিখিতে পারিতেছি কই? পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার বহিরাবরণকে জড়াইয়া ধরিলেই কি সেই শিক্ষা লাভ করা হইল? আজ যদি পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার দিকে আমরা লক্ষ্য করি, তাহা হইলে আমরা দেখিব যে, তাহাদের শিক্ষার মধ্যে প্রতিটি মানুষ স্বাবলম্বী হওয়ার স্থানে দেশ হিসাবে যাহাতে তাঁহারা স্বাবলম্বী হইতে পারেন, তাহার শিক্ষা ও প্রচেষ্টা রহিয়াছে; মানুষ হিসাবে বাঁচিতে হইলে যে নীরোগ দীর্ঘ-জীবন লাভ করিতে হইবে, ইহা তাঁহাদের শুধু কাম্য নহে—তাঁহারা ইহা লাভ করিয়া আমাদের চাইতে আজ এই বিষয়ে বহু ঊর্দ্ধে স্থান পাইয়াছেন। কিন্তু সন্তুষ্টি ও নিরপরাধ কি করিলে সমস্ত সমাজে আনা সম্ভব হয়, তাহা লইয়া তাঁহাদের শিক্ষায়তনগুলি নানা ভাবে চিন্তা করিতেছেন বটে—কিন্তু এখন পর্য্যন্ত এই দিকে তাঁহারা কোন সাফল্য লাভ করিতে পারেন নাই। একথা অবনত মস্তকে স্বীকার করিতে হইবে যে, পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় মানুষকে স্বাবলম্বী, বলিষ্ঠ ও দীর্ঘায়ু করিবার প্রযত্ন আছে এবং তাহার ফল সেই সব দেশে আজ বেশ পরিষ্কার হইয়া উঠিয়াছে। তাহাদের এই শিক্ষাগত সংস্কৃতিতে অবশ্য মানব-ধর্ম্ম কাহাকে বলে তাহা তাঁহারা অদ্যাপি বুঝিতে পারেন নাই, কিন্তু মানুষকে মানুষ হিসাবে গ্রহণ করিতে এবং মানুষকে নীচ বলিয়া ঘৃণা না করিতে তাঁহারা তাহাদের যুবদলকে যত্নের সহিত শিক্ষা দিতেছেন। তাই আজ দেশ দেশান্তরে যাইয়া তাঁহারা শুধু আধিপত্য বিস্তার নহে, তাঁহাদের জ্ঞানমতে মানুষের জন্য শুভ-কার্য্য যতটা করা সম্ভব, ততটার প্রচেষ্টা যে তাঁহাদের আছে, ইহা আমাদের স্বীকার করিতেই হইবে।

আজ বিপথে পড়িয়া আমরা হাবুডাবু খাইতেছি। আমাদের নিজেদের শিক্ষনীয় চিন্তাধারা আমরা হারাইয়া ফেলিয়াছি—সে পথ খুঁজিয়া লইতে আজ একান্তই অক্ষম। আবার পাশ্চাত্ত্যের পদ্ধতিকে গ্রহণ করিতেও আমরা পরাঙ্মুখ। এই উভয় দিকের খোলস লইয়া একটা অচল অবস্থার সৃষ্টি করিয়া আমরা সুন্দর ভারতকে নানাভাবে বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিয়াছি। আজ স্বাধীন ভারতে আমাদের শিক্ষার উদ্দেশ্য কি হওয়া উচিত এবং কি প্রকারে শিক্ষা দান করিলে সেই উদ্দেশ্য সফল হইতে পারে, তাহা আমাদের চিন্তা করিয়া বাহির করিতে হইবে। শিক্ষার উদ্দেশ্য ঠিক হইলে শিক্ষার ক্রম কি হইবে তাহা লইয়া চিন্তা করিতে হইবে, এবং শিক্ষার ক্রম স্থিরীকৃত হইলে সেই অনুযায়ী যাহাতে আমাদের দেশের প্রত্যেক লোক শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারেন, তাহারও ব্যবস্থা করিতে হইবে।

জয়পুর ঃ ঐতিহাসিক মিলন-কেন্দ্র

সম্প্রতি জয়পুরের ঐতিহাসিক সম্মেলন একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। জয়পুরের ন্যায় ইতিহাসপ্রসিদ্ধ নগরীর ঐতিহ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই বোধ করি এখানে এই সম্মেলনের উদ্যোগ। এইদিক হইতে সম্মেলনের উদ্যোক্তারা বিশেষ প্রশংসার্হ।

রাজপুতদের বিজয়কীর্ত্তির নিদর্শন স্বরূপ আজও উজ্জ্বল বিভায় দীপ্যমান সমগ্র রাজপুতানার মৃত্তিকা। আবু পাহাড় হইতে আরাবল্লীর ধূসর গৈরিক শিলা-পথে-পথে একদিন জাগিত অশ্বখুড়ের তীব্র ধ্বনি ; আজ তাহার সানুদেশ ঐতিহাসিক শিল্পিবৃন্দের কলকণ্ঠে মুখরিত। জয়পুর এই রাজপুতানারই একটি বৃহত্তর রাজ্য। ১৭২৮ খৃষ্টাব্দে মহারাজা সওয়াই জয়সিংহ কর্ত্তৃক জয়পুর রাজধানীর সহর স্থাপিত হয়। কথিত আছে যে, রামচন্দ্রের দ্বিতীয় পুত্র কুশ জয়পুর রাজবংশের আদি পুরুষ। বর্ত্তমান মহারাজা সওয়াই দ্বিতীয় মানসিংহ ১৪০তম অধস্তন পুরুষ। জয়পুর রাজ্যের আয়তন ১৫,৬১০ বর্গ মাইল। লোক সংখ্যা ন্যূনাধিক ৩০,৪০,৮৭৬ জন। এখানকার শতকরা ৫০ জনেরও অধিক সংখ্যক লোকের জীবন নির্ভর করে কৃষির উপর। বাৎসরিক রাজস্বের পরিমাণ—১ কোটি ৫৪ লক্ষ টাকা।

বৈচিত্র্যপূর্ণ ইতিহাস রাজপুতানার। এখানকার একাধিক অঞ্চল পুরাণপ্রসিদ্ধ। কত বীর সৈনিক ও বীরাঙ্গনা নারীর অপূর্ব্ব রণকৌশল ও ত্যাগে আজও উজ্জ্বল হইয়া আছে ইতিহাসের পৃষ্ঠা। মহারাণা প্রতাপের পুণ্য স্মৃতি কে বিস্মৃত হইতে পারে ? ভীলবীর ভামাসাহের দেশের জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগের ইতিহাসও তাহারই সঙ্গে একই ভাস্বর-রশ্মিতে দেদীপ্যমান হইয়া আছে। মহারাণা ফতেহ সিংহ ও বারহট কেশরী সিংহের ইতিহাসও আজ কাহারও অবিদিত নাই। এই বীরত্বময় ঐতিহাসিক পটক্ষেপের পাশে পাশে লক্ষ্যে পড়ে এখানকার চারুশিল্প ও কাব্যকলা। ললিতকলা এবং কাব্যশিল্পেরও একদিন পূর্ণ বিকাশ ঘটিয়াছিল এই স্থানে। চিত্র, স্থাপত্য এবং নৃত্যকলায় রাজপুতানার বৈশিষ্ট্য সুপরিচিত। সাহিত্যেরও একটা বিশেষ দিকের সন্ধান পাওয়া যায়। নৈসর্গিক, ঐতিহাসিক, ধার্ম্মিক, সামাজিক, ব্যবহারিক এবং আর্থিক প্রসঙ্গসমূহেরও বিস্তৃত আলোচনা চলিত এখানে। ভক্তি এবং ভাবোন্মত্ততার ক্ষেত্রেও রাজপুতানা পশ্চাতে ছিল না। লক্ষ্মী, সরস্বতী এবং ভবাণী—রাজপুতানা এই তিনেরই সঙ্গমক্ষেত্র।—চিতোর গড় এখানকার খ্যাতিমান সম্পদ। এতদ্ভিন্ন বহু ঝিল ও সংখ্যাতীত দুর্গ এ অঞ্চলে রহিয়াছে। পাহাড়ের কোলে, পর্ব্বতের শীর্ষচূড়ায় এবং পর্ব্বতবক্ষে স্থিত রাজমহলসমূহের ললিত রচনা দর্শনযোগ্য। অর্ব্বুদগিরি এবং উহার উপরিভাগে নির্ম্মিত বেল্‌ওয়োরা জৈন মন্দির আজও অতুলনীয়তার স্বাক্ষরস্বরূপ। বনৌষধিপূর্ণ আবু পাহাড় হইতে আরাবল্লী পর্ব্বতশ্রেণী আরম্ভ। বিরাট এবং মৎস্য প্রদেশ বর্ত্তমান আলোয়ার পর্য্যন্ত আরাবল্লী অঞ্চলের অংশবিশেষ। মালাবারের এ অঞ্চল বিরহীচিত্তে তৃপ্তিদান করে, তৃষিতের তৃষ্ণা নিবারণ করে, ভাবুক ও প্রেমিকের ভাবসংগ্রহের সহায়তা করে। এখানকার মীরাবাঈ একদিন যে অঞ্চলের প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধি করিয়াছিল, সেই সুন্দরতম নগরই ইতিহাসখ্যাত জয়পুর। স্বাধীন ভারতে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের পঞ্চপঞ্চাশৎ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় এই জয়পুরেই। তৎপর সাম্প্রতিক এই ঐতিহাসিক সম্মেলন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সৌন্দর্য্যের দিক হইতেও জয়পুর একটি অদ্ভুত প্রাকৃতিক ক্ষেত্র। রাজপুতানায় একটি প্রবাদ

প্রচলিত আছে যে, যে জয়পুর দেখে নাই, তাহার জীবনই বৃথা। বহু পর্য্যটক ইহাকে 'রূপময় দৃশ্যের লীলা-নিকেতন' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। অনেকে ইহাকে 'ময়ূরনগরী' নামেও অভিহিত করেন, এখানকার ময়ূরের প্রাদুর্ভাবই ইহার কারণ। রাস্তার উভয় পার্শ্বে সুশৃঙ্খল ও সুবিন্যস্ত সুরম্য গৃহের সারি দর্শক-মাত্রেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। জয়পুরের এই সৌন্দর্য্যের পিছনে রহিয়াছে ইহার প্রতিষ্ঠাতা মহারাজ জয় সিংহের পূর্ব্ব-পরিকল্পনামত নগর নির্ম্মাণের উদ্যোগ ও সার্থকতা। শিক্ষা, সংস্কৃতি, শিল্প ও রাজনীতির দিক হইতেও জয়পুর অন্যান্য স্থানাপেক্ষা অধিকতর উন্নত।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, মহারাজ জয়সিংহের মৃত্যুর পর তাঁহার সার্থক সৃষ্টি ধীরে ধীরে অবলুপ্ত হইয়া যাইতে বসে। ক্রমে অন্ধকার যুগের সৃষ্টি হয় এখানে। কিন্তু ইতিহাস কোথাও স্থির নয়। পরবর্ত্তীকালে কতিপয় দরদী অনুসন্ধিৎসু শিল্পী ঐতিহাসিকের প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার মধ্য দিয়া জয়পুরের প্রাচীন ঐতিহ্যের স্মারকগুলি পুনর্জ্জীবন লাভ করে—বর্ত্তমানকালে যাহার স্বাক্ষর জনসাধারণের কাছে স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। জয়পুরের এই প্রাচীন ঐতিহ্যের দিক হইতেই এখানে আজ এইরূপ একটি সম্মেলন আহ্বানের সার্থকতা স্বভাবতঃই সূচিত হইতেছে। শুধু জয়পুর নয়, জয়পুর একটি উদাহরণ মাত্র। যদি প্রত্নতাত্ত্বিক কার্য্য-পদ্ধতিতে গবেষণা করা যায়, তবে দেখা যাইবে—ভারতে এইরূপ ঐতিহ্য ও ঐশ্বর্য্যপূর্ণ নগরের অভাব নাই—যাহার কিছু বা ভগ্নস্তূপের স্বাক্ষর হইয়া আছে, কিছু বা এখনও ভূগর্ভে অন্তর্লীন রহিয়াছে। সোমনাথের পুনরুদ্ধার প্রচেষ্টা এইরূপ একটি নিদর্শন। আজ যে সমস্ত বিজ্ঞ ঐতিহাসিক জয়পুরে সমবেত হইয়াছেন—তাঁহাদিগকে এইদিকে বিশেষভাবে চিন্তা করিয়া কার্য্যে অবতীর্ণ হইতে হইবে। সম্পদশালী ভারতবর্ষ। প্রবাদ আছে—যাহা ভারতে নাই, তাহা পৃথিবীতে নাই। এ-কথা তাৎপর্য্যপূর্ণ। ভারতের বহু নগর ধ্বংস হইয়া গিয়াছে, বহু জনপদের ইতিহাস লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, তাহাকে পুনরুদ্ধার করিয়া ভারতকে আবার তাহার পূর্ব্ব গৌরবে উজ্জ্বল করিয়া তুলিবার কাজ হইতেছে প্রত্নতাত্ত্বিক ঐতিহাসিকের। কাজ দুরূহ হইলেও কীর্ত্তির—সন্দেহ নাই। ভারতের ঐতিহাসিকবৃন্দকে আমরা সেই কীর্ত্তির পথেই অগ্রসর হইতে অনুরোধ করি।

কাশ্মীর সমস্যা

কাশ্মীর গণ-পরিষদ গঠিত হইবার পর আশা করা গিয়াছিল, সর্ব্বদিক হইতেই সমস্যার একটা আশু সমাধানের পথ এবারে উন্মুক্ত হইবে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে দেখা গেল—সমস্যা ঠিক পূর্ব্বের অবস্থাতেই দাঁড়াইয়া আছে। ইতিমধ্যে পাকিস্থান কর্ত্তৃক শেখ আবদুল্লাকে চুরি করিয়া লইয়া যাইবারও একটা সক্রিয় প্রচেষ্টা বামাল ধরা পড়িয়া গিয়াছে। পাকিস্থান গভর্ণমেণ্ট যদি এই বিবেচনায় আসিয়া থাকেন যে, কাশ্মীর হইতে শেখ আবদুল্লাকে সরাইতে পারিলেই হনুমানের হাতে গন্ধমাদন পর্ব্বতের মতো কাশ্মীর তাঁহাদের করতলগত হইবে, তবে বলিতে হইবে—ইহা তাঁহাদের নিতান্তই বালকোচিত মনোভাব। ইহা দ্বারা আদৌ মূল সমস্যার সমাধান হইবে না। কাশ্মীর গণ-পরিষদের স্থায়ী অধ্যক্ষ জনাব গোলাম মহম্মদ

সাদিক এবং অস্থায়ী চেয়ারম্যান মৌলানা মাসুদী এ সম্পর্কে স্পষ্টাস্পষ্টিই জানাইয়া দিয়াছেন যে, কাশ্মীর সম্পর্কে অন্যের হস্তক্ষেপের ব্যাপারটি মোটেই সহজ নয়।

এই যখন অবস্থা, ঠিক ইহার সমসাময়িক সময়ে রাষ্ট্রপুঞ্জ কাশ্মীর প্রতিনিধি ডাঃ ফ্রাঙ্ক্ গ্রাহাম তাঁহার দ্বিতীয় দফা রিপোর্ট প্রকাশ করিয়া বলেন: '১২টি সর্ত্তযুক্ত যে নিরস্ত্রীকরণ পরিকল্পনা আমি প্রথম রচনা করিয়াছিলাম, উহার ৪টি প্যারাগ্রাফ সম্পর্কে কোনো মীমাংসা হয় নাই, অথচ ১২টি প্রস্তাবে যে অখণ্ড পরিকল্পনা প্রকাশ করা হইয়াছে, উহাকে কার্য্যে রূপ দিতে হইলে উক্ত ৪টি প্যারাগ্রাফ সম্পর্কে অবশ্যই মীমাংসা হওয়া প্রয়োজন।'

রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, রাষ্ট্রপুঞ্জ প্রতিনিধি সাধারণভাবে ভারত-পাকিস্থান সম্পর্ক, বিশেষ করিয়া কাশ্মীর সমস্যা সযত্নে বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছেন। উভয়পক্ষের বক্তব্যও তিনি সযত্নে অনুধাবন করিয়াছেন। সৈন্যাপসরণের সামগ্রিক পরিকল্পনার ১২টি প্রস্তাবের ভিত্তিতে তিনি উভয়পক্ষের অনৈক্য হ্রাস করিয়া আনিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এই পরিকল্পনা গত ১০ই নভেম্বর তারিখে নিরাপত্তা পরিষদের অনুমোদন লাভ করিয়াছিল।

মূল পরিকল্পনায় গণভোট পরিচালক নিয়োগ সম্পর্কে যে প্রস্তাব করা হইয়াছিল, সংশোধিত প্রস্তাবে ডাঃ গ্রাহাম তাহাই বজায় রাখিয়াছেন।

রিপোর্ট প্রকাশের ফলে পাকিস্থানের উষ্মা যে কতখানি বাড়িয়া গিয়াছে, তাহা পাকিস্থানের প্রধান মন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিনের উক্তি হইতেই প্রতীয়মান হইবে। কাশ্মীর সম্পর্কিত বিরোধ-নিষ্পত্তির ভার স্বস্তিপরিষদকে নিজের হাতে গ্রহণ করার দাবী তুলিয়া খাজা নাজিমুদ্দিন বলেন: 'কাশ্মীরের সমস্যা ভারত কিছুতেই আপোশে মীমাংসা করিতে প্রস্তুত নয়, ডাঃ গ্রাহামের দ্বিতীয় রিপোর্টে তাহা স্ফটিকের মত স্বচ্ছ হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে। সে যাহাই ঘটুক না কেন, আমরা আমাদের কাশ্মীরী বেরাদারদের আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকার আদায় করিব। যে পর্য্যন্ত আপোষের বিন্দুমাত্র আশা থাকিবে, সে পর্য্যন্ত যেন পাকিস্থানীরা কাশ্মীরবাসীদের স্বাধীন গণভোটের অধিকার আদায় করার চেষ্টা করে। নবজাত পাকিস্থান নিজেকে গড়িয়া তোলার জন্য শান্তি চায় বলিয়াই স্বস্তিপরিষদের প্রত্যেক সিদ্ধান্ত স্বেচ্ছায় মানিয়া লইতেছে, আর ভারত প্রতিবার তাহা অবজ্ঞা করিতেছে। অর্থাৎ স্বস্তিপরিষদ যেন আমাদের ধৈর্য্য পরীক্ষা করিতেছে, আর ভারত স্বস্তি পরিষদের ধৈর্য্য পরীক্ষা করিতেছে।'

অধিক উদ্ধৃতির প্রয়োজন নাই। বক্তব্যের উপসংহার টানিতে যাইয়া স্বস্তিপরিষদের আশ্রয়লাভের প্রত্যাশা করিয়া খাজা নাজিমুদ্দিন বলেন যে, গণভোট উপদেষ্টার কাজ আরম্ভ করার তারিখ নির্দ্ধারণের জন্য ডাঃ গ্রাহাম যে প্রস্তাব করিয়াছেন, ভারত তাহাও অগ্রাহ্য করিয়াছে। ডাঃ গ্রাহামের এই ব্যর্থতা অথবা ভারতের এই একগুঁয়েমির জন্য সভ্য জগৎ আক্ষেপ করিবে।'

ভারতের প্রতি এই বিষোদ্গার পাকিস্থান-গভর্ণমেণ্টের আজ নতুন নয়। এ সম্পর্কে নতুন কিছু মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। তবে ভারত সম্পর্কিত পাকিস্থান-গভর্ণমেণ্টের বিষোদ্গারে ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর উক্তিটি এখানে উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন: পাকিস্থানের প্রধান মন্ত্রী বা

পৃথিবীর যে কোনো দেশের প্রধান মন্ত্রী যদি মনে করিয়া থাকেন যে, কাশ্মীর সম্পর্কে যে কোন ব্যবস্থা ভারতের উপর চাপাইয়া দেওয়া সম্ভবপর হইবে, তাহা হইলে তাঁহারা মারাত্মক ভুল করিবেন। কাশ্মীরের ব্যাপারে আমরা ঐকান্তিকভাবে আগ্রহান্বিত। গণভোট গ্রহণ বা অন্যান্য সব কিছুই আমরা মানিয়া লইব। কিন্তু পৃথিবীর কোনো দেশের অযৌক্তিক মনোভাব বা হুম্‌কি আমরা বরদাস্ত করিব না। আমরা জানি, আমরা ঠিক পথেই চলিতেছি।.. পাকিস্থান কর্তৃক কাশ্মীর-আক্রমণ কাশ্মীর সমস্যার গোড়ার কথা। রাষ্ট্রপুঞ্জ কমিশনের চোখে ধরা না পড়া পর্য্যন্ত পাকিস্থান ইহা অস্বীকার করিয়া গিয়াছে। ভারতবর্ষ শান্তিবাদী। এই কারণে, পাকিস্থানের সহিত আমরা পাল্টা যুদ্ধ চাহি নাই। আমরা কিন্তু পাকিস্থানের মিথ্যা ভীতিপ্রদর্শন এবং জেহাদী কৌশল অনেক সহ্য করিয়াছি। অনেক সময় অন্যান্য দেশ পাকিস্থানকে এই ব্যাপারে সমর্থন করিয়াছে। আমরা অবশ্য একটি ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছি —যাহার ফলে পাকিস্থানের সহিত আর যুদ্ধ বাধে নাই। আমাদের সীমান্ত রক্ষার জন্য আমরা সৈন্য মোতায়েন করিয়াছি।'

পণ্ডিতজীর এই বলিষ্ঠ উক্তি ও অপ্রিয় সত্যভাষণের জন্য তিনি প্রশংসনীয়, সন্দেহ নাই। বোধ করি পাকিস্থান-প্রধানমন্ত্রী খাজা সাহেব ইহারও একটা পাল্টা জবাবের খসড়া ইতিমধ্যেই মনে মনে প্রস্তুত করিয়া ফেলিয়াছেন। কিন্তু তিনি কি পাকতুন্‌দের সম্পর্কে এ যাবৎ তাঁহার ইতিকর্ত্তব্য বিষয়ে বিশেষ কিছু প্রস্তুত হইতে পারিয়াছেন? তিনি নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে, পাখতুনগণ স্বাধীন পাকিস্থানের জন্য ডাঃ গ্রাহামের নিকট এক বিস্তৃত স্মারকলিপি পেশ করিয়াছে। ভৌগোলিক দিক দিয়া কাশ্মীর ও পাখ্‌তুনিস্থান যুক্ত এবং 'আক্রমণের পূর্ব্বের কাশ্মীরের' উত্তর সীমা পাখতুনিস্থানের উত্তর-পূর্ব্ব সীমার সন্নিহিত বলিয়া উল্লেখ করিয়া স্মারকলিপিতে বলা হইয়াছে যে, কাশ্মীর সমস্যার উপর পাখতুনিস্থান সমস্যা সমাধানের গুরুত্ব আছে। পাকিস্থান যদি পাখ্‌তুনদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের দাবী স্বীকার করিয়া লয়, তাহা হইলেই যে কাশ্মীর সমস্যা পাকিস্থানের আক্রমণাত্মক মনোভাবের ফলে অচল অবস্থায় উপনীত হইয়াছে, তাহার সমাধান করা সম্ভব হইতে পারে।

ডাঃ গ্রাহাম অবশ্য পাখ্‌তুনদের এই স্মারকলিপি সম্পর্কে তাঁহার রিপোর্টে কিছু উল্লেখ করেন নাই, কিন্তু বিষয়টাকে যে শেষ পর্য্যন্ত চাপিয়া রাখা যাইবে, তাহাও মনে হয়না। শক্তিশালী পাখ্‌তুনবাসী একবার যে রব তুলিয়াছে, তাহা যে সহজেই অবদমিত হইবে—একথা অনিশ্চিত। এক ভারতের সঙ্গে লড়িয়াই যদি পাকিস্থান গভর্ণমেণ্ট বিষোদ্গারের সৃষ্টি করিলেন, অতঃপর পাখ্‌তুনবাসীর চাপে পড়িয়া কি করিবেন, তাহাই চিন্তার বিষয়। অতএব ঝামেলা হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য কাশ্মীরকে কাশ্মীরের নিজের হাতেই ছাড়িয়া দিয়া পাকিস্থান-গভর্ণমেণ্টকে সরিয়া দাঁড়ানই কি পণ্ডিতজনোচিত কাজ নয়? কিন্তু খাজা সাহেব তাহা শুনিবেন কি?

পশ্চিমবঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড ঃ ছাত্র-বেতন ও শিক্ষক-বেতনের সর্ব্বনিম্নহার নির্দ্ধারণ

পশ্চিমবঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষা আইনের অধীনে রাজ্যের উচ্চ বিদ্যালয়সমূহকে মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড হইতে সাহায্য দানের সর্ত্তাদি সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল অনতিকালপূর্ব্বে এক নিয়মাবলী প্রণয়ন করেন। গত ২০শে ডিসেম্বরের কলিকাতা গেজেটে উহা প্রকাশিত হইয়াছে। নিয়মাবলীতে বলা হইয়াছে যে, কোনো উচ্চ বিদ্যালয়কে মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড হইতে সাহায্য লইতে হইলে সেই বিদ্যালয়ে অবশ্যই সন্তোষজনকভাবে নিয়মশৃঙ্খলা বজায় রাখিতে হইবে এবং ঐ বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ ও ছাত্রছাত্রীগণের মধ্যে সন্তোষজনক সম্পর্ক বজায় থাকা চাই। নিয়মাবলীতে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানের উচ্চ বিদ্যালয়গুলির মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ডের নিকট হইতে সাহায্য পাইতে হইলে কি কি সর্ত্ত অবশ্যই পূরণ করিতে হইবে, সেগুলি বিস্তারিতভাবে সন্নিবেশিত হইয়াছে। ঐ সর্ত্তগুলির মধ্যে বিভিন্ন উচ্চ বিদ্যালয়ে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীকে ছাত্রছাত্রীদের সর্ব্বনিম্ন বেতনের হার, বিভিন্ন বিদ্যালয়ে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর শিক্ষকগণের অবশ্য দেয় সর্ব্বনিম্ন বেতনের হার, ছাত্রছাত্রীর মোট সংখ্যা অনুযায়ী বিভিন্ন উচ্চ বিদ্যালয়ের স্তর বিভাগ প্রভৃতি সুনির্দ্দিষ্টভাবে বলিয়া দেওয়া হইয়াছে।

এই নিয়মাবলী অনুযায়ী কোনো উচ্চ বিদ্যালয়কে সাহায্য লইবার যোগ্যতা অর্জ্জন করিতে অথবা বাৎসরিক সাহায্য বজায় রাখিতে হইলে সেই বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের আবশ্যিক সর্ব্বনিম্ন মাসিক বেতনের হার ধার্য্য হইয়াছে—কলিকাতা এবং হাওড়া অঞ্চলের বিদ্যালয়গুলিতে ৫ম ও ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে ৫৲ টাকা, ৭ম ও ৮ম শ্রেণীতে ৫৷৹ টাকা; ৯ম ও ১০ম শ্রেণীতে ৬৲ টাকা। জেলা সহরগুলি এবং শিল্পাঞ্চলের বিদ্যালয়সমূহে ৫ম ও ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে ৪৲ টাকা, ৭ম ও ৮ম শ্রেণীতে ৭৷৹ টাকা এবং ৯ম ও ১০ম শ্রেণীতে ৫৲ টাকা। পল্লী অঞ্চলসমূহে ৫ম ও ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে ৩৲ টাকা, ৭ম ও ৮ম শ্রেণীতে ৩৷৹ আনা, এবং ৯ম ও ১০ম শ্রেণীতে ৪৷৹ টাকা।

মোট ছাত্রছাত্রীর সংখ্যানুযায়ী উচ্চ বিদ্যালয়গুলিকে ৪টি স্তরে বিভক্ত করা হইয়াছে এবং ঐ ৪টি স্তরের বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষকগণের সর্ব্বনিম্ন বেতনের হার বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে এইভাবে: প্রধান শিক্ষক 'ক' শ্রেণীর বিদ্যালয়ে ২০০৲—৪০০৲ টাকা, 'খ' শ্রেণীর বিদ্যালয়ে ১৭৫৲—৩২৫৲ টাকা, 'গ' শ্রেণীর বিদ্যালয়ে ১৫০—২৪০৲ টাকা এবং 'ঘ' শ্রেণীর বিদ্যালয়ে ১৫০৲—২০০৲ টাকা। সহকারী প্রধান শিক্ষকগণ—বি. টি. পাশ গ্রাজুয়েট শিক্ষকদের বেতনের হারের সমান হার; তদুপরি তাঁহাদের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত ভাতা দিতে হইবে—'ক' শ্রেণীর বিদ্যালয়ে ৫০৲ টাকা, 'খ' শ্রেণীর বিদ্যালয়ে ৩৫৲ টাকা এবং 'গ' শ্রেণীর বিদ্যালয়ে ২৫৲ টাকা। বি. টি. পাশ গ্রাজুয়েট শিক্ষকগণের জন্য—সমস্ত শ্রেণীর বিদ্যালয়ে ৭৫৲ টাকা হইতে ১৫০৲ টাকা; অনার্স গ্রাজুয়েট অথবা এম্-এ এবং এম্-এস্-সি পাশ শিক্ষকদের ঐ গ্রেডে প্রথমেই ৯০৲ টাকায় নিয়োগ করা চলিতে পারে। আণ্ডার গ্রাজুয়েট শিক্ষকগণের জন্য ৫০৲ টাকা হইতে ৮০৲ টাকা।

সরকারী অনুমোদিত এক উপাধিপ্রাপ্ত পাঁচ বৎসরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সংস্কৃত শিক্ষক সরকারী অনুমোদিত ২টি উপাধিপ্রাপ্ত তিন বৎসরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সংস্কৃত শিক্ষকের সমতুল বলিয়া পরিগণিত

হইবেন এবং ঐরূপ শ্রেণীর সংস্কৃত শিক্ষকদের বেতনের হারও ৬০৲ টাকা হইতে ১০০৲ টাকা হইবে। বিদ্যালয়গুলির শ্রেণী বিভাগের নিয়মে বলা হইয়াছে যে, যে সব উচ্চ বিদ্যালয়ে ছাত্র বা ছাত্রীদের সংখ্যা ৭১ -এর অধিক, সেই সকল বিদ্যালয়ের বাৎসরিক সাহায্য দানের কথা বিবেচ্য হইবে না। ঐ শ্রেণীর বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে বোর্ড বিবেচনামত এককালীন সাময়িক সাহায্য করিতে পারিবে। সাহায্য পাওয়ার যোগ্য বিদ্যালয়গুলিকে মোট ৪টি স্তরে ভাগ করা হইয়াছে: ছাত্রছাত্রী সংখ্যা ৫০১ হইতে ৭০০ পর্য্যন্ত হইলে উক্ত বিদ্যালয় 'ক' শ্রেণী বলিয়া পরিগণিত হইবে, ৩৫১ হইতে ৫০০ পর্য্যন্ত হইলে ঐ বিদ্যালয় 'খ' শ্রেণীর, ২ ০ হইতে ৩৫০ পর্য্যন্ত হইলে ঐ বিদ্যালয় 'গ' শ্রেণীর এবং সাধারণতঃ ছাত্রছাত্রী সংখ্যা ২০০-এর কম হইলে উক্ত বিদ্যালয় 'ঘ' শ্রেণীর বলিয়া বিবেচিত হইবে।

শ্রেণী নির্ব্বাচন সম্পর্কে নিয়মাবলীতে যাহা বলা হইয়াছে, তৎসম্পর্কে কিছু উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন, কিন্তু ছাত্রছাত্রীদের বেতনের হার যে নিয়মে ধরা হইয়াছে, তাহাতে যে তাহাদের তথা তাহাদের অভিভাবক শ্রেণীর উপর গুরুভারই চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহা অভিজ্ঞ ও ভুক্তভোগী ব্যক্তি-মাত্রেই স্বীকার করিবেন। গত মহাযুদ্ধের সময় পর্য্যন্তও কলেজসমূহে আই-এ, আই-এস্-সির বেতন ছাত্র-ছাত্রীর মাথা পিছু ৫৲ টাকা ৫॥০ টাকা হারের অধিক ছিল না। আলোচ্য নিয়মাবলীতে কলিকাতা ও হাওড়া অঞ্চলের ৫ম ও ৬ষ্ঠ শ্রেণীর মাহিয়ানাই ৫৲ টাকা হিসাবে ধার্য্য করা হইয়াছে। ইহার উপরে আছে পাঠ্যপুস্তকসমূহের বর্দ্ধিত মূল্য। এখনও এমন বহু সংখ্যক ছাত্রছাত্রী নানা বিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত রহিয়াছে—যাহাদের পক্ষে নিয়মিত মাহিয়ানা দেওয়া এবং উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তক ক্রয় করিয়া পাঠ অধ্যয়ন করা সম্ভব হইতেছে না। ইহা যে দেশবিভাগজনিত আকস্মিক আর্থিক অবনতিরই একমাত্র কারণ, তাহা নয়। এই আর্থিক অবনতি বাংলাদেশে দীর্ঘকাল ধরিয়াই চলিয়া আসিয়াছে। ফলে এরূপ অবস্থা দাঁড়াইয়াছে যে, অবস্থাপন্ন পরিবারের ছেলে মেয়ে ভিন্ন উপযুক্ত শিক্ষা গ্রহণের পথ অনেকেরই নিকট কঠিন ও দুঃসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। এদিকে গ্রন্থ মুদ্রণের কাগজ ও ছাপাখানার মুদ্রণের হার অতিরিক্ত চড়িয়া যাওয়ায় প্রকাশকেরাও পুস্তকের মূল্য পূর্ব্বের তুলনায় চতুর্গুণ বাড়াইতে বাধ্য হইয়াছেন। এইভাবে জনগণের সাধারণ শিক্ষা গ্রহণ ক্রমেই বিঘ্নিত ও সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিয়াছে। আজ বিশ্ববিদ্যালয় কিম্বা মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড যে নিয়মই করুন না কেন, তাহা যদি দেশের আপামর জনসাধারণের আর্থিক দিকে লক্ষ্য রাখিয়া না করা হয়, তবে দেশের শিক্ষা যে অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারিবে না—একথা ধ্রুব। দেশ স্বাধীন হইবার পর আজ সাড়ে চারি বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে, ইতিমধ্যে পঞ্চবার্ষিকী প্ল্যান জাতীয় নানা প্ল্যানের খসড়া সরকারী তরফ হইতে কাগজে পত্রে প্রকাশ করা হইয়াছে, কিন্তু একটা স্বাধীন দেশের সর্ব্বপ্রথম প্রয়োজন যে তাহার স্বাস্থ্য ও শিক্ষা—এ বোধ এখন পর্য্যন্ত আমাদের উচ্চতম সরকারী দপ্তরের জাগে নাই বলিলে খুবই কম বলা হয়। অথচ পাশ্চাত্ত্য দেশগুলির উদাহরণ তাঁহারা কথায় এবং বিবৃতিতে প্রায়শঃই ব্যবহার করিয়া থাকেন। আমরা দুঃখের সঙ্গেই এখানে অবৈতনিক শিক্ষানীতির কথা উল্লেখ করা হইতে আপাততঃ বিরত রহিলাম। আলোচ্য নিয়মাবলীতে ছাত্র-ছাত্রীদের মাহিয়ানার হার যে সংখ্যা-বাচক পদ্ধতিতে ধার্য্য করা হইয়াছে, দেশের অর্থনৈতিক দুর্দ্দশার দিকে চাহিয়া উক্ত হার যুক্তিপূর্ণভাবে অনেকাংশে কমানো সম্ভব কি না, সে সম্পর্কে আমরা মাননীয় রাজ্যপাল মহোদয়কে বিবেচনা করিয়া দেখিতে অনুরোধ করি।

'শাদা কালো' প্রশ্ন

দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের প্রতি ব্যবহারের প্রশ্নটি আজ নতুন নয়। বিগত শতাব্দীকাল ধরিয়া মানবিক কলঙ্করূপে ইতিহাসে ইহা কুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়া আসিতেছে; কিন্তু দুঃখের বিষয়—অদ্যাবধি তথাকার এই 'শাদা-কালো'র প্রশ্নটির কিছুমাত্র সমাধান হয় নাই। শ্বেতচর্ম্ম আফ্রিকানরা চিরকাল কৃষ্ণচর্ম্ম ভারতীয়দের উপর জুলুমবাজি ও অত্যাচার করিয়া তাহাদের নাগরিক অধিকারের সমস্ত সুখসুবিধা হইতে বঞ্চিত করিয়া আইনের বিধানে তাহাদিগকে উচ্ছেদ করিতে তৎপর হইয়াছে। মহাত্মা গান্ধী যখন প্রথম ব্যারিষ্টারী কার্য্যে আফ্রিকায় যান, তখন ভারতীয়দের প্রতি আফ্রিকানদের এই ঔদ্ধত্য তিনি নিজের জীবন দিয়া উপলব্ধি করেন এবং দুই চর্ম্মের এই 'শাদা-কালো' প্রশ্নটি ইতিহাসের পৃষ্ঠা হইতে চিরকালের জন্য মুছিয়া ফেলিবার জন্যই সক্রিয় সত্যাগ্রহ সুরু করেন। সত্যাগ্রহে যে কাজ না হইয়াছিল, তাহা নয়। কিন্তু মূল বিষবৃক্ষের শিকর তাহাতে উৎপাটিত হয় নাই। সত্যাগ্রহের ফলে ভারতীয়দের কিছু কিছু সুখ-সুবিধা আইনবদ্ধ হইল বটে, কিন্তু প্রশ্নটি একই ভাবে রহিয়া গেল। ফলে যতই অসন্তোষ ও আন্দোলন ধূমায়িত হইয়া উঠিতে লাগিল, ততই নানা দিক হইতে বিশৃঙ্খলার সূচনা দেখা দিল। গান্ধীজী তাঁহার সারা জীবনের অগ্নি পরীক্ষার দ্বারাও এই শাদা-কালোর সমস্যার শেষ সমাধান করিয়া যাইতে পারেন নাই। বরং বর্ণানুযায়ী অঞ্চল বিভাগের একটি প্রশ্ন নতুন করিয়া সমস্যাটিকে আরও ভারগ্রস্ত করিয়া তুলিয়াছে। সম্প্রতি এই দীর্ঘকাল স্থায়ী সমস্যাটি মিটাইয়া ফেলিবার জন্য ৮টি বিভিন্ন রাষ্ট্র দক্ষিণ-আফ্রিকা ইউনিয়নকে অনুরোধ করিয়াছেন। ব্রাজিলের প্রতিনিধি বলেন যে, যদি উদার ও মানবীয় দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া এবং রাষ্ট্র-পুঞ্জসনদের নীতি অনুসরণ করিয়া সমস্যাটি বিবেচনা করা হয়, তবে নিশ্চয়ই ইহার মীমাংসা হইতে পারে। পাকিস্থানের প্রতিনিধি দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণানুযায়ী অঞ্চল বিভাগ আইনের নিন্দা করিয়া বলেন যে, উহা অমানুষোচিত এবং মানব-মর্য্যাদার হানিকর। পারশ্যের প্রতিনিধি বলেন যে, প্রশ্নটি এখন আর শুধু ভারতীয়দের প্রশ্ন নহে, ইউরোপ বহির্ভূত সমস্ত দেশের জাতিকেই ইহা স্পর্শ করিয়াছে।

দুঃখের বিষয়, ইউরোপের রাষ্ট্রনায়কেরা আজও ইহা লইয়া পাশা-যজ্ঞের অবতারণা করিয়া চলিয়াছেন। এই জাতীয় খেলা তাঁহাদের নিকট নতুন বা অভিনব না হইলেও আর কতকাল পৃথিবীর সভ্যতার ইতিহাস ইহাকে বরদাস্ত করিয়া চলিবে, সেইটিই আজকের দিনের বড় প্রশ্ন।

স্বাধীন লিবিয়া

বিগত ২৪শে ডিসেম্বর প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান সরকারীভাবে লিবিয়াকে স্বাধীন রাজ্যরূপে স্বীকার করিয়া রাজা ইদ্রিস এল সেনুসির নিকট এক বাণীতে বলেন যে, রাষ্ট্রপুঞ্জের উদ্যোগে এই নূতন জাতির জন্ম লাভের একটি ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে। শুধু লিবিয়ার জনসাধারণের নিকটেই নয়, স্বাধীন জাতিগুলির নিকটও ইহার গুরুত্ব রহিয়াছে। ইরাক সরকারও লিবিয়ার এই নূতন স্বাধীন রাষ্ট্রকে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। মামুদ বে মস্তেশার লিবিয়ার প্রধান মন্ত্রী ও পররাষ্ট্র মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। রাজা ইদ্রিস আনুষ্ঠানিক ভাবে গত ২৪শে ডিসেম্বর স্বাধীন লিবিয়া রাজ্যের জন্মলাভের সংবাদ ঘোষণা করিয়াছেন। প্রাক্তন

ইতালীয় উপনিবেশ লিবিয়া। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ফ্যাসিষ্ট ইতালীর পতনের পর লিবিয়া রাষ্ট্রপুঞ্জের নির্দ্দেশ অনুযায়ী ইংরেজ ও ফরাসীর অছিগিরির অধীনে আসিতে বাধ্য হয়। কিন্তু তাহার নিজের পক্ষ হইতে পূর্ণ স্বাধীনতার সংগ্রাম তখনও নিঃশেষ হইয়া যায় নাই। রাষ্ট্রপুঞ্জের দরবারে পুনঃ পুনঃ সে তাহার পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী পেশ করিয়াছে এবং স্বাধীনতার পরিপোষক অন্যান্য রাষ্ট্রের নিকট হইতে শক্তিশালী সমর্থন লাভ করিয়াছে। রাষ্ট্রপুঞ্জ ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণ ব্যবস্থার অবসান ঘটাইবার যে আদর্শ পোষণ করেন, তাহারই সহিত সঙ্গতি রাখিয়া রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ সংসদ কর্ত্তৃক ১৯৪৯ সালে এই মর্ম্মে এক প্রস্তাব গৃহীত হয় যে, ১৯৫২ সালের ১লা জানুয়ারী তারিখের মধ্যে লিবিয়াকে পূর্ণ স্বাধীনতা দান করিতে হইবে। তৎপূর্ব্বে লিবিয়ার অস্থায়ী জাতীয় গভর্ণমেণ্টের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করিবার জন্য তথাকার বৃটিশ ও ফরাসী কর্ত্তৃপক্ষকে প্রস্তুত থাকিতে নির্দ্দেশ দেওয়া হয়। জাতীয় সরকার কর্ত্তৃক স্বাধীন লিবিয়া রাজ্যের যে শাসনতন্ত্র রচিত হইয়াছে, তদনুযায়ী স্থির হইয়াছে যে, সাইরেনাইকা, ত্রিপোলিতানিয়া ও ফেজান—এই তিনটি স্বতন্ত্র প্রদেশের সমবায়ে লিবিয়া যুক্তরাজ্য গঠিত হইবে এবং সাইরেনাইকার আমির হইবেন সে-যুক্তরাজ্যের রাজা। বৃটিশ ও ফরাসী শাসন কর্ত্তৃপক্ষ লিবিয়া সরকারের নিকট তাঁহাদের শাসন ক্ষমতা হস্তান্তরিত করিয়াছেন। নব রচিত শাসনতন্ত্র অনুযায়ী আগামী বসন্তকালে লিবিয়ার সাধারণ নির্ব্বাচন অনুষ্ঠিত হইবার পর জনসাধারণের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিগণ কর্ত্তৃক স্বাধীন লিবিয়ার প্রথম দায়িত্বশীল গভর্ণমেণ্ট গঠিত হইবে এবং স্বাধীন জাতিসমূহের সঙ্গে একত্রে লিবিয়া তাহার যথাযোগ্য সম্মান ও মর্য্যাদা ভোগ করিবে।

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র শিক্ষাশিবির

সম্প্রতি দমদম সাউথ সিঁথি রোডে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র শিক্ষা-শিবিরের নূতন ভবনে গৃহপ্রবেশ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে জনকল্যাণ ব্রতী দুইটি যুবকের অক্লান্ত চেষ্টায় এই কারিগরী শিক্ষাকেন্দ্রটি প্রতিষ্ঠিত হয়। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র জাতির জন্য জীবন ব্যয় করিয়া যে আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন, সেই আদর্শেই উদ্বুদ্ধ হইয়া যুবকদ্বয় এই মহৎ কার্য্যে অগ্রসর হইয়াছেন এবং ইহাকে সার্থক করিয়া তুলিয়াছেন। দেশের ছেলেরা যাহাতে তাহাদের সাধারণ লেখাপড়ার সঙ্গে কারিগরী শিক্ষালাভ করিয়া ভবিষ্যৎ জীবনে জীবিকার্জ্জনকে সুগম করিয়া তুলিতে পারে, এই পরিকল্পনা লইয়াই এই শিক্ষা-শিবিরের ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছে এবং প্রথমতঃ ৭৫টি ছেলেকে এই বিদ্যামন্দিরে অবৈতনিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হয়। ইহা যে প্রচুর অধ্যবসায় ও অর্থকৃচ্ছ্রতাসাপেক্ষ, তাহা সহজেই অনুমেয়। তাই ইহার সার্থকতার জন্য উদ্যোক্তাবৃন্দ দেশ ও জাতির প্রশংসাভাজন এবং ধন্যবাদার্হ। প্রতিষ্ঠানটির কার্য্যকারিতা উপলব্ধি করিয়া ইতিমধ্যেই বিজ্ঞানাচার্য্য শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত প্রমুখ ব্যক্তিবৃন্দ ইহাকে আর্থিক সাহায্য করিয়াছেন এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারও সাময়িক অর্থ সাহায্য করিয়া ভবিষ্যতেও করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। ৭ বিঘা জমিকে কেন্দ্র করিয়া এই প্রতিষ্ঠানটির নতুন ভবনের ভিত্তি রচিত হইয়াছে। ছায়া-শীতল প্রশান্ত পরিবেশে থাকিয়া দুইশত ছেলে যাহাতে অনায়াসে শিক্ষালাভ করিতে পারে, তাহারই

ব্যবস্থা হইয়াছে এই বিদ্যায়তনে। কোনো অবস্থাতেই দুই শতের বেশী ছাত্র গ্রহণ করা হইবে না। বিদ্যায়তনের সম্পাদক শ্রীগোরাচাঁদ মিত্র বলেন যে, বিদ্যায়তনটিকে ছাত্রবহুল না করিয়া প্রকৃত শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিতে পারিলেই সমাজ ও দেশের যথার্থ কল্যাণ হইবে। শিক্ষামন্ত্রী রায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী বলেন, যে-শিক্ষা মানুষকে সত্যিকারের মানুষ করিয়া তোলে, সেই শিক্ষাই এই বিদ্যায়তনে দেওয়া হইবে। বর্ত্তমান সমাজের গতানুগতিক শিক্ষার ধারা বদ্‌লাইয়া সত্যিকারের মানুষ তৈরীর কাজে এই বিদ্যা প্রতিষ্ঠান তথা প্রতিষ্ঠানের কর্ত্তৃপক্ষ যে পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা দেশের কাছে উদাহরণস্বরূপ। এইভাবে আরও বহু প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিলেই স্বাধীন ভারতের শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং সেই সঙ্গে জীবিকার্জ্জনের পথও সুগম ও প্রশস্ত হইবে। আমরা এইদিকে জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলন

গত ২৯শে ডিসেম্বর পাটনার হুইলার সেনেট হলে শ্রীযুক্ত অতুল গুপ্তের মূল সভাপতিত্বে প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের সপ্তবিংশতিতম অধিবেশন আরম্ভ হয়। সাহিত্য শাখার পৌরোহিত্য করেন আচার্য্য ক্ষিতিমোহন সেন। এতদ্ব্যতীত ডাঃ রমা চৌধুরী, ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র সরকার প্রভৃতি বিভিন্ন শাখার সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভায় বাংলা ভাষার উৎকর্ষ সাধন, প্রাদেশিকতা বর্জ্জিত নীতির ভিত্তিতে বাঙালী জীবন ও বাঙালী সংস্কৃতির সংরক্ষণ, ভারতের অন্যান্য ভাষাগোষ্ঠীর সমন্বয়ে নিখিল ভারতীয় ভাষা হিসাবে বাংলা ভাষার ঐতিহ্য বিশ্লেষণ প্রভৃতি বিষয়গুলির উপর বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়। শেষদিনে নিখিল ভারত সাহিত্য শাখার অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন প্রখ্যাত হিন্দি সাহিত্যিক শ্রীহাজারীপ্রসাদ দ্বিবেদী। ভারতের বিভিন্ন ভাষা-সাহিত্যের পারস্পরিক অনুবাদের দ্বারা যে একটি সর্ব্ব-ভারতীয় সংস্কৃতি সংস্থা গড়িয়া উঠিতে পারে, ইহার উপর জোর দিয়া বিভিন্ন বক্তা এ বিষয়ে জাতীয় সরকারকে সাহায্য করিতে দাবী জানান। এতদ্ব্যতীত আনন্দের বিষয় যে, এতদিন পর 'প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলন'-এর নাম পরিবর্ত্তন করিয়া এবারে ইহাকে 'নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন' নামকরণ করা হইল। বর্ত্তমান ভারতে 'প্রবাসী' শব্দটির সার্থকতা এবং উপযোগিতা যে আজ আর কিছুমাত্র নাই, ইহা আমরা পূর্ব্বেও একাধিকবার বলিয়াছি। সম্মেলনের বিগত অধিবেশনেও এই বিষয়ে আলোচনা উত্থাপিত হইয়াছিল, কিন্তু কার্য্যকরী হয় নাই। আগামী বৎসর হইতে ইহা যে কার্য্যকরীভাবে আত্ম-প্রকাশ করিবে—তাহা সংস্কৃতজ্ঞ বাঙ্গালী মাত্রের পক্ষেই আনন্দের বিষয়। বিগত দীর্ঘকাল ধরিয়া এই সম্মেলনকে সঞ্জীবিত করিয়াছেন কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ সেন, গীতিকবি অতুলপ্রসাদ সেন, নগেন্দ্রনাথ রক্ষিত প্রমুখ মণীষীবৃন্দ—যাহার পুরোধা ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। আজ তাঁহারা সকলেই লোকান্তরিত। ইংরাজ আমলের সেই সময়ে বাঙ্গালীর প্রবাস জীবনের প্রয়োজনীয়তাবশেই এই সম্মেলন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। স্বাধীন ভারতে আজ 'প্রবাসী' শব্দটি নিতান্তই অর্থহীন। এইদিক হইতে 'নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন' নামটি যথোপযুক্তই হইয়াছে। সমগ্র ভারতীয় সংস্থার বাংলা একটি অংশ, এবং বাংলা সাহিত্য অখণ্ড ভারতীয় প্রাণরসেরই একটি সমৃদ্ধ সম্পদ। নিজেকে বড় করিতে যাইয়া সে

যদি ভারত-আত্মাকে আঘাত করে, তবে সে-আঘাত হইতে সে নিজেকেও রক্ষা করিতে পারিবে না। এইদিকে অবহিত হইয়াই আজ বাঙ্গালীকে ভারত সংস্কৃতির জয়যাত্রার পথে অগ্রসর হইতে হইবে।

দুঃখের বিষয়, বাংলাদেশ হইতে বাংলা সাহিত্য সম্মেলনের প্রচেষ্টা আজ একেবারেই অবলুপ্ত হইয়াছে। এখানে দল উপদলের অন্ত নাই, তাঁহারা গৃহকোণে আবদ্ধ হইয়া শনির পাঁচালী পাঠের ন্যায় ছোটোখাটো সাহিত্যালোচনা করিয়াই বাংলা সাহিত্য তথা ভারতীয় সংস্কৃতির কার্য্য শেষ করিতে যত্নবান। ইহা দ্বারা যে বৃহত্তর দেশের মর্ম্ম স্পর্শ করা সম্ভব নয়, তাহা তাঁহাদিগকে বুঝাইবে কে? আসলে ব্যাপক রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের আধিক্য এখানে এত বেশী প্রবল হইয়া উঠিয়াছে যে, সাহিত্য বা সংস্কৃতি একেবারেই মন্দীভূত হইয়া পড়িয়াছে। দেশকে স্বাধীন চিন্তায় গড়িয়া তুলিতে হইলে তাহার সাহিত্যকেই যে আগে জাগাইয়া তুলিবার প্রয়োজন, তাহা বুঝিবার আজ সময় আসিয়াছে। সাহিত্য সৃষ্টি এখানে কোনো প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও ব্যাহত হয় নাই, এ কথা ধ্রুব; কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গে সম্মেলনেরও প্রয়োজন আছে বৈ কি! সে প্রয়োজন হইতেছে মানুষের সঙ্গে মানুষের, ভাবের সঙ্গে ভাবের, প্রাণের সঙ্গে প্রাণের সংযোগ সৃষ্টির। সে সংযোগ যেখানে ব্যাহত, সার্থক সাহিত্য সৃষ্টিও সেখানে ব্যাহত হইতে বাধ্য। বাংলার সাহিত্যরসিক মাত্রকেই এই কথাটি অন্তরের সঙ্গে উপলব্ধি করিতে অনুরোধ করি।

পাটনার বাংলা সাহিত্য সম্মেলনকে যাঁহারা সার্থক করিয়া তুলিয়াছেন, এই অবকাশে তাঁহাদিগকে আমাদের সাদর অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি।

পারস্যের তৈল সমস্যা

সম্প্রতি বিশ্বব্যাঙ্ক পারস্যের প্রধানমন্ত্রী ডাঃ মোসাদ্দিকের নিকট এক লিখিতপত্রে প্রস্তাব করিয়াছেন যে, (১) তৈলবোর্ডের পরিচালক ও কর্ম্মচারী নিয়োগ এবং তাহাদিগকে পদচ্যুত করার ক্ষমতা বিশ্বব্যাঙ্কের থাকিবে; (২) বৃটেনের সহিত চূড়ান্ত বুঝাপড়া সাপেক্ষে ব্যাঙ্ক্ সাময়িকভাবে সাহায্য করিবেন এবং তদ্দারা কোনো পক্ষেরই অধিকার ক্ষুণ্ণ হইবে না; (৩) আবাদান তৈল শোধনাগার পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ ব্যাঙ্ক্ই সরবরাহ করিবে; এবং (৪) বর্ত্তমান ব্যবস্থাসমূহের মাধ্যমেই তৈল বণ্টন করা হইবে।

বিশ্বব্যাঙ্কের দুইজন প্রতিনিধির সহিত এক সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে ডাঃ মোসাদ্দিক স্পষ্টতঃই বলিয়াছেন: যে কোন প্রস্তাবই উত্থাপন করা হউক্ না কেন, তাহা রাষ্ট্রায়ত্তকরণ আইনের আওতার মধ্যে থাকিয়াই করিতে হইবে। প্রসঙ্গতঃ বলা প্রয়োজন যে, ইংরেজ কারিগরগণকে কিছুতেই পুনরায় আবাদানে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে দেওয়া যায় না।

ইহার জবাবে বিশ্বব্যাঙ্ক কি উত্তর দেন, তাহা দেখিবার বিষয়।

জনসাধারণের স্মরণ থাকিতে পারে, গত ২২শে অক্টোবর ফিলাডেল্‌ফিয়ায় ডাঃ মোসাদ্দিক বলিয়াছিলেন: '....if the British are sincere in their acceptance of the principle of nationalization, the way lies open to negotiate for the purchase of oil from Persia. কিন্তু আজ প্রায় ৩ মাসের ব্যবধানেও বৃটিশ কর্ত্তৃক সে পন্থা গৃহীত হয় নাই। বরং ঋণদার মার্কিনের উপস্থিতি ও সহযোগিতায় বিষয়টি আরও অধিক দূর বিস্তৃতিলাভ করিয়াছে।

বিশ্বব্যাঙ্কের সাম্প্রতিক প্রস্তাব সম্পর্কে ডাঃ মোসাদ্দিক বলেন, 'ওয়াশিংটন্ হইতে এ সকল প্রস্তাবের বিস্তারিত ব্যাখ্যা না আসা পর্য্যন্ত আমি এগুলি গ্রহণ করিতে পারিতেছি না।' রাজদরবারের সংবাদে প্রকাশ যে, শাহ প্রধানমন্ত্রী ডাঃ মোসাদ্দিককে বলিয়াছেন—'আপনি এমন কোনো কাজ করিবেন না যাহাতে আমেরিকার বন্ধুত্ব হারাইতে হইতে পারে।' কিন্তু সর্ত্তাধীনে আমেরিকান সামরিক ও অর্থ নৈতিক সাহায্য গ্রহণের প্রস্তাব ডাঃ মোসাদ্দিক পুরাপুরি অস্বীকারই করিয়াছেন। ইহাও সংবাদে প্রকাশ যে, চেক এবং অন্যান্য কমিউনিষ্ট দেশসমূহে তৈল বিক্রয়ের জন্য ইতিমধ্যেই পারস্য প্রস্তুত হইয়াছে।

পাশাপাশি ইউ-পি-আই প্রচারিত হেগের একটি সংবাদও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আন্তর্জ্জাতিক কোর্ট অব জাষ্টিস এ্যাংলো-ইরানিয়ান তৈল সম্পর্কিত ব্যাপারে ইরানকে একটি পাল্টা মেমোরেণ্ডাম পরিবেশনের সুযোগ দিয়াছে। ইরানের ইচ্ছা—আন্তর্জ্জাতিক কোর্ট অব জাষ্টিস তৈল সম্পর্কিত ব্যাপারটির যা হোক ব্যবস্থা করুক। এই মর্ম্মে প্রধানমন্ত্রী ডাঃ মোসাদ্দিক বিষয়টির উপর তাঁহার নিজের কথা ব্যক্ত করিবেন বলিয়া জানাইয়াছেন।

এদিকে আন্তর্জ্জাতিক সমস্যায় ইঙ্গ-মার্কিন সহযোগিতা দ্রুত অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। এ কথা স্পষ্টই ঘোষিত হইয়াছে যে, পারস্য সম্পর্কে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চ্চিল ও প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান অচিরেই আলোচনা করিয়া একটা কিছু পাকাপাকি সিদ্ধান্তে আসিবেন।

ঘটনার দ্রুত গতির প্রতি লক্ষ্য করিয়া স্পষ্টই মনে হয়, শেষ পর্য্যন্ত তৈলে অগ্নিকাণ্ড ঘটিয়া বড় রকমের একটা কিছু অস্ত্র ব্যবহার সুরু হইয়া না যায়!

শোক-সংবাদ

ভুতপুর্ব্ব রুশ পররাষ্ট্র মন্ত্রী মঃ লিট্‌ভিনফ

সম্প্রতি ভুতপূর্ব্ব সোভিয়েট পররাষ্ট্র মন্ত্রী মঃ লিট্‌ভিনফের মৃত্যু বিশ্বরাজনীতিক্ষেত্রে একটি বৃহত্তর ক্ষতি। সোভিয়েট পররাষ্ট্রমন্ত্রিগণের তিনি ছিলেন পুরোধা স্বরূপ। রাশিয়ার পররাষ্ট্রনীতি সংক্রান্ত বিভিন্ন কঠিন সমস্যার সমাধানে তিনি যে অসামান্য সাফল্যের পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে তিনি আন্তর্জ্জাতিক খ্যাতিলাভ করিতে সক্ষম হইয়াছেন। অধুনা প্রস্তাবিত শান্তি আন্দোলনের পিছনে নিরস্ত্রীকরণ ও বিশ্বশান্তির জন্য তাঁহার অক্লান্ত চেষ্টাও মঃ লিট্‌ভিনফকে খ্যাতির আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। পূর্ব্ব ইউরোপের বিভিন্ন দেশের সহিত চুক্তি সম্পাদন করিয়া তিনি বিশ্বসমাজে রাশিয়ার প্রভাব বৃদ্ধি করিয়াছেন।

ইহুদী বংশোদ্ভূত তিনি। প্রথমতঃ তিনি নিজেকে ওয়ালেস নামে পরিচয় দেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় জার-শাসনের বিরুদ্ধে রুশিয় প্রজাসাধারণের যে বিপ্লববহ্নি প্রধুমিত হইয়া ওঠে, মঃ লিট্‌ভিনফ্ অপরিসীম উৎসাহের সঙ্গেই তাহাতে যোগদান করিয়া জার-শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধে দাঁড়ান। তৎপর

সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইলে ১৯১৮ সালের জানুয়ারী মাসে তিনি বৃটেনে রুশ-দূত নিযুক্ত হন। কিন্তু এ সময় রাশিয়ার বিপ্লবীদলের সরকারের সঙ্গে অকস্মাৎ গ্রেটবৃটেনের যুদ্ধ আরম্ভ হয়। রাশিয়ায় বৃটিশ প্রতিনিধিগণকে আটক করা হইলে প্রতিভূ হিসাবে মঁঃ লিট্‌ভিনফকেও লণ্ডনে গ্রেপ্তার করা হয়। কিন্তু ১৯১৯ সালের শেষাশেষি কূটনৈতিক বন্দীগণকে মুক্তিদানের জন্য উভয় সরকারের মধ্যে একটি বোঝাপড়া হয় এবং তাহার ফলে মঁঃ লিটভিনফ্‌কে মুক্তি দেওয়া হয়। এই বৎসরই ইউরোপীয় দেশসমূহের সহিত শান্তি আলোচনার কার্য্যে তিনি মুখ্য রুশ প্রতিনিধি নিযুক্ত হন। ইহার পর হইতেই সোভিয়েট পররাষ্ট্র-নীতির ক্ষেত্রে তাঁগার মর্য্যাদা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাইতে থাকে। নবগঠিত সোভিয়েটরাষ্ট্র যখন চতুর্দ্দিক হইতে শত্রু কর্ত্তৃক বেষ্টিত হইয়াছে, তখন লেনিনের মৃত্যুর পরেও মঁঃ ষ্ট্যালিনের পার্শ্বসহচর হিসাবে সর্ব্বদাই তিনি কাজ করিয়াছেন।

১৮৭৬ সালে বিয়েলষ্টকে তাঁহার জন্ম। তাঁহার পুরা নাম ম্যাক্সিম ম্যাক্সিভোমিচ লিট্‌ভিনফ। মাত্র ১৭ বৎসর বয়সে স্বেচ্ছাসৈন্যরূপে তিনি সেনাদলে যোগদান করেন। এই সময় হইতেই তিনি মার্কসীয় মতবাদে বিশ্বাসী হইয়া ওঠেন। ক্রমে সেনাদল ত্যাগ করিয়া তিনি কিয়েভে সোশ্যাল ডেমক্রেটিক পার্টিতে যোগদান করেন। ১৯০১ সালে উক্ত পার্টির অন্যান্য সদস্যগণের সহিত তিনিও গ্রেপ্তার হন। কিন্তু সান্ত্রীর কঠিন দৃষ্টি তাঁহাকে অবরোধ করিয়া রাখিতে পারে নাই; কারাগার হইতে পলায়ন করিয়া তিনি সুইজারল্যাণ্ডে চলিয়া যান। কিছুকালের জন্য সুইজারল্যাণ্ডই তাঁহার প্রধান কর্ম্মকেন্দ্র হইয়া ওঠে। ১৯০৩ সালে পুনরায় তিনি রাশিয়ায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং তদবধি তিনি রাশিয়াতেই ছিলেন।

১৯২৫ সালে মস্কোতে যে নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, উহাতে মঁঃ লিট্‌ভিনফ সভাপতিত্ব করেন এবং শান্তি ও নিরস্ত্রীকরণ সমস্যা সম্পর্কে সোভিয়েট মনোভাব বিশ্ব সমক্ষে ব্যক্ত করেন। ১৯২৭ সালে তিনি সোভিয়েট ইউনিয়নের অস্থায়ী পররাষ্ট্রমন্ত্রী নিযুক্ত হন। ১৯৩১ সালে সোভিয়েট পররাষ্ট্র মন্ত্রীরূপে তিনি ফিনল্যাণ্ড, ল্যাটাভিয়া, এস্তোনিয়া, ফ্রান্স ও পোল্যাণ্ডের সহিত অনাক্রমণচুক্তি সমাপ্ত করেন। পুঁজীবাদী দেশসমূহ ও রাশিয়ার মধ্যে যে শুষ্ক প্রাচীর গড়িয়া উঠিয়াছিল, উহা ভাঙ্গিয়া দিবার জন্য ১৯৩১ সালেই তিনি রাষ্ট্রসঙ্ঘের ইউরোপীয় কমিশনের বৈঠকে এক প্রস্তাব উত্থাপন করেন এবং ১৯৩২ সাল হইতে ১৯৩৪ সাল পর্য্যন্ত যে নিরস্ত্রীকরণ আলোচনা চলিতে থাকে, উহাতে তিনি সর্ব্বদাই পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণ ও বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে নিরাপত্তাচুক্তি সম্পাদনের অনুরোধ জানান। এ সময়ের মধ্যেই তিনি রুশ সীমান্তবর্ত্তী ক্ষুদ্রতর দেশ সমূহের সহিত অনাক্রমণ চুক্তি সম্পাদন করিয়া রাশিয়ার সীমান্তকে নিরাপদ করিয়া তোলেন। ১৯৩৪ সালে প্রধানতঃ তাঁহার চেষ্টার ফলেই আমেরিকা সোভিয়েট রাষ্ট্রকে স্বীকার করিয়া ল'ন। জার্ম্মানীতে নাৎসীবাদের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি বৃটেন ও ফ্রান্সের সহিত মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হইবার চেষ্টা করেন। কিন্তু ইউরোপের দুইটি প্রধান রাষ্ট্রের কর্ণধারগণ এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দেন। ফলে ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হয়। ১৯৩৭-৩৮ সালে হিট্‌লারী আক্রমণের বিরুদ্ধে সামরিক চুক্তিতে আবদ্ধ হইবার জন্য বৃটেন ও ফ্রান্সের নিকট তিনি যে আবেদন জানাইয়াছিলেন, তাহাতে যদি সেদিন কর্ণপাত করা হইত, তবে ইউরোপের এমন কি সমগ্র পৃথিবীর ইতিহাসের ধারা অন্য পথে বহিয়া চলিত।

১৯৩৯ সালের মে মাসে মঁঃ লিট্‌ভিনফ্‌ সোভিয়েট পররাষ্ট্রমন্ত্রীর পদ ত্যাগ করেন এবং মঁঃ মলোটভ্‌ উক্ত পদে নিযুক্ত হন। ১৯৪১ সালের নভেম্বর মাসে তিনি আমেরিকায় সোভিয়েট রাষ্ট্রদূত পদে নিযুক্ত হন এবং ১৯৪৩ সালের আগষ্ট মাস পর্য্যন্ত উক্ত পদে বহাল ছিলেন। অতঃপর তিনি সোভিয়েটের সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী নিযুক্ত হন এবং ১৯৪৬ সালের আগষ্ট মাসে উক্ত কার্য্যভার ত্যাগ করেন। তিনি অকৃতদার ছিলেন না। বিশিষ্ট ইংরাজ ব্যারিষ্টার স্যার সিডনী লো'র কন্যার সহিত মঁঃ লিট্‌ভিনফ্‌ বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হন। পারিবারিক জীবনেও তিনি আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন। ইতিহাসখ্যাত 'Peace undivided' কথাটি মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি তাঁহার শেষ এবং সার্থক স্বাক্ষর রূপে রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পরলোকগত অবিনশ্বর আত্মার চিরশান্তি ও কল্যাণ হউক্‌।

লর্ড লিন্‌লিথগো

বিগত ৫ই জানুয়ারী মাত্র ৬৪ বৎসর বয়সে ভারতের ভূতপূর্ব্ব বড়লাট ও ভাইস্‌রয় লর্ড লিন্‌লিথগো স্কট্‌ল্যাণ্ডে পরলোকগমন করিয়াছেন। কিন্তু তিনি আজও ভারতবাসীর মন হইতে মুছিয়া যান নাই। শুধু ভারতের ভাইস্‌রয় হিসাবেই নয়, ভারতীয় রাজনীতির এক গুরুত্বপূর্ণ সময়ে তিনি যে ভাবে তাঁহার কার্য্য-দপ্তর পরিচালনা করিয়াছেন এবং একই সঙ্গে ভারতীয় রাজনীতির সম্মুখীন হইয়াছেন—তাহাদ্বারা অন্ততঃ তিনি যে তাঁহার পূর্ব্ব সুরিদিগকে অতিক্রম করিয়াছিলেন—তাহা নিঃসন্দেহ। ভারতে ১৯৩৫ সালের শাসন-আইনে প্রভিন্সিয়াল অটোনমি বা প্রাদেশিক স্বায়ত্ব-শাসন প্রবর্ত্তনের ভার তাঁহার উপর ন্যস্ত হয়। অল ইণ্ডিয়া ফেডারেশনের ভিত্তিতে ভাইস্‌রয়ের কার্য্যের সুচারুতার দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই এই অটোনমি প্রবর্ত্তিত হয়। কিন্তু ইহার মধ্য দিয়াই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আভাষ স্পষ্ট হইয়া ওঠে। ইহাতে ভারতীয় কংগ্রেস তাহার আত্মনিয়ন্ত্রণাধীনের ভিত্তিতে মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে নিজেদের শক্তি দৃঢ় করে। এই সময়ে লর্ড লিন্‌লিথগোকে অত্যন্ত চাতুর্য্যের সঙ্গে উভয় দিকের দৃপ্ত পদক্ষেপের সঙ্গে মানাইয়া চলিতে হয়।

১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে লর্ড লিন্‌লিথগো জন্মগ্রহণ করেন। ভারতের সঙ্গে তাঁহার প্রথম সংযোগ ঘটে 'রয়াল কমিশন অন এগ্রিকাল্‌চার ইন ইণ্ডিয়া'র চেয়ারম্যান হিসাবে। ১৯২৬ সালে তিনি ভারতে আসেন। ভারতীয় কৃষির উন্নতির জন্য দীর্ঘকাল তিনি কাজ করেন। পরে ভারতের ভাইস্‌রয়ের ক্ষমতা তাঁহার হাতে আসায় উক্ত কমিশনের সুপারিশে 'ইম্পিরিয়াল কাউন্সিল অব এগ্রিকালচারের' পত্তন হয়। তাঁহার কৃষি-সাহায্য এবং 'অধিক দুগ্ধ পান কর' আন্দোলন বিশেষ সাড়া জাগায়। ১৯৩১ সালে ভারত সংস্কার সম্পর্কে 'হোয়াইট পেপার' প্রকাশিত হইলে পার্লামেণ্টের উভয় হাউসের এক সিলেক্ট কমিটি গঠিত হয়, চেয়ারম্যান হন লর্ড লিন্‌লিথগো। এইসূত্রে তিনি উক্ত কমিটিসংশ্লিষ্ট ভারতীয় ষ্টেট্‌স্‌ম্যান ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসেন। ইণ্ডিয়া বিল সম্পর্কিত আলোচনায় বাধার সৃষ্টি হইলে তখনও তিনি ইহাকে বিশেষ চাতুর্য্যের সঙ্গেই নির্ব্বাহ করেন। এইভাবে শাসন পরিচালনার দিক হইতে তাঁহার কূটনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী ও অপরিসীম কর্ম্মপ্রসূতা বিশেষ প্রশংসার রূপ লইয়া দেখা দেয়। তাঁহার কালে ভারতের সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ সময় ১৯৪২ সালের আন্দোলন। স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্‌সের মাধ্যমে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট্‌

ভারতকে যে স্বাধীনতার স্বর্ণপাত্র উপহার দিতে চাহিলেন—ভারতের পক্ষে তাহা গ্রহণ করা সম্ভব না হওয়ার ফলেই মহাত্মা গান্ধীর নির্দ্দেশে সারা ভারতে '৪২-এর আগষ্ট আন্দোলনের বহ্নি প্রধূমিত হইয়া ওঠে। ইতিপূর্ব্বেই মহাত্মাজীর সঙ্গে লর্ড লিন্‌লিথগোর সংযোগ ঘটিয়াছিল, কিন্তু ভারত-সমস্যার তাহাতে কিছুমাত্র সমাধান হয় নাই। কোনো কোনো সমালোচক এ সম্পর্কে লর্ড লিন্‌লিথগোর ঔদাসীন্যের উল্লেখ করিলেও তিনি ভারত-আন্দোলনের সমাধানে কম চেষ্টা করেন নাই। ভারতের স্বায়ত্তশাসনের জন্য তাঁহার একেবারেই আগ্রহ ছিল না বলিলে ভুল বলা হয়। তাঁহার এই আগ্রহের দিক হইতেই তাঁহার পরবর্ত্তী ভাইস্‌রয় লর্ড ওয়াভেলের পক্ষে কার্য্য পরিচালনায় সুবিধা হইয়াছিল।

ভারতে তাঁহার এই সুদীর্ঘ জীবনে তিনি কোথাও মসীর দাগ রাখিয়া যান নাই—শাসনকর্ত্তা হিসাবে এইখানেই তাঁহার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।

ভারতের বিখ্যাত ক্রিকেট খেলোয়ার পতৌদীর নবাব

ভারতীয় ক্রিকেটের বিখ্যাত খেলোয়ার পতৌদীর নবাব ইফ্‌তিকার আলী সাহেব সম্প্রতি হঠাৎ হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া উইলিংডন হাসপাতালে পরলোকগমন করেন। ক্রিকেটের ইতিহাসের সঙ্গে পরিচিত ব্যক্তিমাত্রের নিকটেই পতৌদীর নবাব সুপরিচিত। ইংলণ্ডের পক্ষ হইয়া তৃতীয় ভারতীয় ক্রিকেট খেলোয়ার হিসাবে খেলিবার সৌভাগ্য তিনি লাভ করেন। সুখের বিষয় যে, খেলায় যোগদান করিয়াই তিনি শতাধিক রাণ করিতে সমর্থ হন। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, ভগ্ন স্বাস্থ্যের জন্য অচিরেই তাঁহাকে খেলা হইতে অবসর গ্রহণ করিতে হয়। ১৯১০ সালের ১৭ই মার্চ্চ পতৌদীর নবাব জন্মগ্রহণ করেন এবং লাহোর এচিসন চিফস কলেজে বাল্যকালে অধ্যয়ন করেন। প্রবীণ অক্সফোর্ড 'ব্লু' মিঃ এম্. জি. সেটার এবং ফ্র্যাঙ্ক্ উলির নিকট তিনি প্রথম ক্রিকেট খেলার অনুপ্রেরণা লাভ করেন। ১৯৩১ সালে কেম্‌ব্রিজ ও অক্সফোর্ড আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেট খেলায় কে. ফারনেস এবং এফ্. আর. ব্রাউনের ন্যায় কৃতি বোলারদের বিরুদ্ধে খেলিয়া ২০১ রাণ করিরা নট আউট থাকেন এবং নিজের উন্নত ক্রীড়ানৈপুণ্যের পরিচয় দিয়া বিপক্ষ রাণ সংখ্যা অতিক্রম করিতে নিজ দলকে সাহায্য করেন। এইভাবে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে, ওরসেষ্টারের পক্ষে, সিডনীতে অষ্ট্রেলিয়া দলের বিরুদ্ধে এবং সর্ব্বশেষ ইংলণ্ড দলের বিরুদ্ধে দেখিয়া তিনি বিশেষ কৃতিত্বের অধিকারী হন। ১৯:৬ সালে ইংলণ্ড ভ্রমণকারী দলের অধিনায়কত্ব করিবার সম্মান তিনি লাভ করেন, কিন্তু অসুস্থতাবশতঃ উহা তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিতে হয়। প্রথম ভারতীয় হিসাবে ক্রিকেট, হকি এবং বিলিয়ার্ডস্ খেলায় তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনটি 'ব্লু' একত্রে লাভ করেন। ১৯৪৬ সালে ভারতীয় ক্রিকেট দলের অধিনায়ক হিসাবে পতৌদীর নবাব ইংলণ্ড যাত্রা করেন এবং ইংলণ্ডদলের বিরুদ্ধে খেলিয়া চারিটি সেঞ্চুরী করায় নিজের সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখেন। ১৯২১ সালের এপ্রিল মাসে ভূপালের নবাবের দ্বিতীয়া কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। মৃত্যুকালে পতৌদীর নবাবের মাত্র ৪১ বৎসর বয়স হইয়াছিল। ভারতীয় ক্রিকেটদল তাঁহাদের এই সুযোগ্য ও কৃতি বন্ধুটিকে হারাইয়া আজ এক অপূরণীয় ক্ষতির সম্মুখীন হইলেন।

নির্য্যাতিত দেশসেবক শ্রীঅনিল রায়

বিশিষ্ট ফরওয়ার্ড-ব্লক নেতা শ্রীঅনিল রায় দীর্ঘকাল দুরারোগ্য ক্যান্সার রোগে ভুগিয়া গত ৬ই জানুয়ারী কলিকাতা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পরলোকগমন করেন। তিনি ব্যারাকপুর নির্ব্বাচন কেন্দ্র হইতে লোকসভায় ফরওয়ার্ড-ব্লক মনোনীত নির্ব্বাচন প্রার্থী ছিলেন। ব্যক্তি হিসাবে তাঁহার চরিত্রের মাধুর্য্যের তুলনা ছিল না। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের আদর্শকে অনুসরণ করিয়া তিনি তাঁহার সহধর্ম্মিণী শ্রীযুক্তা লীলা রায়ের সহযোগে নতুন সমাজব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের প্রয়াসী ছিলেন। কিন্তু জীবনের বহুতর কাজ অসমাপ্ত থাকিতেই কালের কঠিন নিয়মে তাঁহাকে এ পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে হইল। মৃত্যুকালে তাঁহার মাত্র ৫০ বৎসর বয়স হইয়াছিল।

রাজনৈতিক নেতা হিসাবে তাঁহার জনপ্রিয়তা ছিল অপরিসীম। সঙ্গীত শাস্ত্রেও তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্ব ছিল। রাজনীতি এবং সঙ্গীত বিষয়ে তিনি একাধিক গ্রন্থ রচনা করেন। রাজনৈতিক জীবনে তিনি আগাগোড়াই বামপন্থী ছিলেন। স্কুল জীবন হইতেই শ্রীরায় বৈপ্লবিক দলের সংস্পর্শে থাকিয়া দেশোদ্ধারের কাজে আত্মনিয়োগ করেন এবং দেশমাতৃকার শৃঙ্খলমুক্তির আন্দোলনে যোগদান করিয়া একাধিকবার কারাবরণ করেন। এই ভাবে জীবনের সুদীর্ঘ প্রায় তের বৎসর কাল তিনি কারানির্য্যাতন ভোগ করেন।

শ্রীঅনিল রায় ১৯০২ সালে ঢাকা জেলার মানিকগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত বায়ারা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ৺অরুণচন্দ্র রায় সরকারের অধীনে শিক্ষা বিভাগে কাজ করিতেন। ১৯২২ সালে শ্রীরায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী সাহিত্যে এম-এ পাশ করেন। তৎপূর্ব্বেই তিনি 'শ্রীসঙ্ঘ' গঠন করিয়া ১৯২১ সালে উহাকে বৈপ্লবিক ভিত্তিতে স্থাপন করেন। ১৯২৮ সালে তিনি শ্রীলীলা নাগ (পরে সহধর্ম্মিণী), শ্রীললিত বর্ম্মণ, শ্রীরেবতী বর্ম্মণ, শ্রীঅনিল ঘোষ, ডাঃ শৈলেশ রায় প্রভৃতি রাজনৈতিক সহকর্ম্মীদের লইয়া সমাজবাদী গণতান্ত্রিক দল (সোস্যালিষ্ট ডিমোক্র্যাটিক পার্টি) গঠন করেন। অতঃপর নেতাজী সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে তিনি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে যোগদান করেন। পরে নেতাজী যখন নিখিল ভারত ফরোয়ার্ড ব্লক গঠন করেন, ঐ সময় শ্রীরায় উহাতে যোগদান করেন এবং ১৯৪৭ সালে ফরোয়ার্ড ব্লকের সহিত তিনিও কংগ্রেস হইতে বাহির হইয়া আসেন। ফরোয়ার্ড ব্লক দলের মধ্যে আদর্শগত অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দিলে ফরোয়ার্ড ব্লকের সংহতি যাহাতে ভাঙ্গিয়া না যায়, তজ্জন্য তিনি যথেষ্ট চেষ্টা করেন, কিন্তু ব্যর্থতাই শেষ পর্য্যন্ত তাঁহাকে বিশেষভাবে আঘাত করে। ফরোয়ার্ড ব্লক মার্ক্সবাদী ও সুভাষবাদী—এই দুই দলে বিভক্ত হইয়া পড়িলে তিনি শেষোক্ত দলেরই নেতৃত্ব গ্রহণ করেন।

রাজনীতি ও সাহিত্য বিষয়ক তাঁহার অজস্র রচনা তাঁহার সহধর্ম্মিণী-সম্পাদিত 'জয়শ্রী' পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যায় বিকীর্ণ হইয়া আছে। 'জয়শ্রী'র পরিচালক-সম্পাদক ছিলেন মূলতঃ তিনিই। তাঁহার অভাবে শুধু বাংলার রাজনৈতিক জগৎই ক্ষতিগ্রস্ত হইল না, ক্ষতিগ্রস্ত হইল বাংলার সঙ্গীত, সাহিত্য এবং এমন কি সাংবাদিক জগৎও। কেওড়াতলা শ্মশান ঘাটে তাঁহার জড় দেহের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

শ্রীকে. ভি. আপ্পারাও কর্ত্তৃক মেট্রোপলিটান প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস্ লিমিটেড
৯০, লোয়ার সারকুলার রোড, কলিকাতা ১৪ হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বসন্ত ফোটো—শিবপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যা

ঊনবিংশ বর্ষ ফাল্গুন—১৩৫৮ ২য় খণ্ড - ৩য় সংখ্যা

ভগবান ঈশা ও শাশ্বত ভারত

অধ্যাপক শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেন

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যদি চির কিশোর, ঈশনন্দন ঈশা তবে চিরশিশু ও চিরপ্রবীণ।

চিরশিশু ছিলেন বলেই শিশুদের এতো ভালোবাসতেন ঈশা। তাই তিনি বলেছেন—ছোট শিশুদের আমার কাছে আসতে দাও, কারণ স্বর্গরাজ্য তাদেরই। শিশুকে আমাদের এত মিষ্টি লাগে কেন? রবীন্দ্রনাথ তার কারণ নির্দ্দেশ করেছেন—শিশু আনন্দময় স্বর্গলোক থেকে সদ্য এসেছে, আর শিশুর মতো চিরন্তন কিছু নেই। সত্যি, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের কতো পরিবর্ত্তন ঘটে, কতো আচার-নিয়মের বন্ধনে আমরা নিজেদের জড়িয়ে ফেলি, বিশেষ একটি সমাজ-ব্যবস্থা, রাষ্ট্র ও ধর্ম্ম আমাদের ওপর কতো প্রভাব বিস্তার করে, কিন্তু মানবশিশু অনাদি কাল থেকে আজ পর্য্যন্ত একটুও বদলায়নি। কবি তাই বলেছেন—

'সে জানে না জাতিভেদ মানে না কোরাণ-বেদ
মানে না আচার-ধর্ম্ম মুনি-মৌলভীর,
সে এক সম্রাট প্রভু সে নহে অধীন কভু
সে করে চরণে চূর্ণ রীতি পৃথিবীর।'

বয়স্ক মানুষের পক্ষে শিশুত্বের ভেতর নবজন্ম লাভ করা কিন্তু সাধনা-সাপেক্ষ। শিশুর মতো সরলতা, পবিত্রতা, নিশ্চিন্ততা ও নির্ভরতা আমরা হারিয়ে ফেলি বলেই তো সহজ অবস্থা থেকে বিচ্যুত হই। শিশু যখন মাতা বা পিতার কোল আশ্রয় করে, তখন সে কী নিশ্চিন্ত কী নির্ভর! সমস্ত জগৎকে সে গ্রাহ্য করে না। ঈশাও তাঁর স্বর্গস্থ পিতার শরণ নিয়ে, তাঁর সঙ্গে নিজের অভেদ উপলব্ধি কোরে নিখিল জগতের প্রতিকূলতাকে গ্রাহ্য করেন নি। তাই বলছিলাম, ঈশনন্দন ঈশা ছিলেন চিরশিশু।

তাঁর ভেতর শুধু একটা দৃঢ় ও অবিচলিত আত্মপ্রত্যয়ই ছিল না, তিনি ছিলেন সত্য-দ্রষ্টা ও স্বপ্ন-দ্রষ্টা। সত্যদ্রষ্টা ঈশা ইহুদীধর্ম্মের আচার সর্ব্বস্বতা, ধর্ম্মান্ধতা ও পরধর্ম্মের প্রতি অসহিষ্ণুতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন, আর স্বপ্নদ্রষ্টা ঈশা পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য-প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেছিলেন। ইহুদীরা নিজেদের ঈশ্বরের বিশেষ অনুগৃহীত জাতি বলেই মনে কোর্‌তেন, তাই ঈশা তাঁদের ভেতর প্রচার কোর্‌লেন—তোমরা প্রতিবেশীকে নিজেরই মতো ভালোবাসবে, অর্থাৎ সে যে কোনো জাতি বা সম্প্রদায়ের লোকই হোক না কেন, তাঁকে আত্মবৎ দর্শন কোর্‌তে হবে। ধর্ম্ম যে শুষ্ক আচার-অনুষ্ঠানের ভেতরে নিহিত নয়, ভগবান্ যে অন্তর্যামীরূপে আমাদের হৃদয়ে বিরাজ কোর্‌চেন এবং তিনি যে ভাবগ্রাহী, এই সত্য ঈশা উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা কোর্‌লেন। অকুণ্ঠ, নির্ভীক ভাবে সত্যকে যিনি প্রচার কোর্‌লেন, তাঁর শিরে কণ্টকের মুকুট শোভা পেল,—ধরামাঝে মহত্তর নির্য্যাতনকে বরণ কোরে অমর জীবন লাভ কোর্‌লেন।

সূক্ষ্ম জটিল দার্শনিক তত্ত্ব তিনি প্রতিষ্ঠিত করেন নি, তথাপি তাঁর পূর্ব্বগামী ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক জরথুস্ত্র ও বুদ্ধদেবের বাণী ঈশার কর্ণে নতুনভাবে ধ্বনিত হোলো। জরথুস্ত্রের মতে চিদানন্দময় অসুরে বা ঈশ্বরে প্রীতি ও পাপের জন্য অনুতাপ ধর্ম্মসাধনার মূল কথা। আমরা বৌদ্ধধর্ম্মে পাই সাম্য, মৈত্রী ও করুণার আদর্শ। ভগবান্ ঈশার মতে কিন্তু ধর্ম্ম-সাধনার মূল কথা—স্বর্গস্থ পিতার প্রতি অনুরাগ ও সর্ব্ব মানবে প্রীতি। অনুতাপের অশ্রুজলে যিনি সিক্ত হন, অন্যায়কারীকে যিনি ক্ষমাসুন্দর চক্ষে দেখেন, তিনিই ধর্ম্মের মধ্যে নবজন্ম লাভ করেন। যিনি এই দ্বিজত্ব লাভ করেন না, স্বর্গরাজ্যে প্রবেশের অধিকারী তিনি কখনও হোতে পারেন না।

ঈশার আবির্ভাবের প্রায় সাড়ে পাঁচশো বৎসর পূর্ব্বে চীনদেশের আচার্য্য কনফুসিয়াস্ নির্দ্দেশ দিয়েছিলেন—অপরের কাছে যেমন ব্যবহার আশা করো, অপরের প্রতিও তেম্‌নি ব্যবহার কর্ব্বে। ভগবান্ ঈশার কণ্ঠেও আমরা এই বাণীটি শুনতে পাই। এই বাণীটি যে লোক-স্থিতির মূল, তা' আমরা সহজেই বুঝতে পারি। তবু এই নির্দ্দেশটি পদে পদে লঙ্ঘন কোরে আমরা কতই না অকল্যাণের সৃষ্টি করি।

ললিতবিস্তরে মারের সঙ্গে শাক্যমুনির সংগ্রামের বিস্তৃত বিবরণ রয়েছে। অবশ্যি, সমস্ত ব্যাপারটা যে রূপক, তা' বুঝতে আমাদের বিশেষ কষ্ট হয় না। বুদ্ধদেবের দুর্জ্জয় সঙ্কল্প ও দৃপ্ত তেজের পরিচয় পাই তাঁর উক্তির ভেতর দিয়ে। মদন-ভস্মের ব্যাপারেও সর্ব্বত্যাগী শঙ্করের রুদ্র রোষের ভেতর দিয়ে তাঁর দীপ্যমান মূর্ত্তিটিই আমাদের চোখে ভেসে ওঠে। অশিবের প্রতীক শয়তানের প্রতি ঈশার দৃপ্ত উক্তির ভেতর দিয়েও তাঁর জগদর্চ্চি তনুখানি যেন আমাদের চোখের সম্মুখে সুস্পষ্ট হোয়ে ওঠে। 'দূর হোয়ে যা আমার নিকট থেকে, তোর প্রলোভন কিছুতেই বিচলিত কোরতে পারবে না আমাকে'।—ঈশার কণ্ঠ থেকে এই বাণীই ধ্বনিত হোয়েছিল—শয়তানের উদ্দেশ্যে। ভগবান্ তথাগতের মতো ঈশাও তাঁর বাণী প্রচার কোর্‌তেন ছোট ছোট দৃষ্টান্তের সাহায্যে। তাঁর বাক হোতো অন্তরের অনুভূতি থেকে উৎসারিত। তাঁর ছিল স্বচ্ছ, তৃতীয় নয়ন তাঁর হোয়েছিল উন্মীলিত, আর এই জন্যেই অগণিত মানুষের জীবনে তিনি অপরিসীম প্রভাব বিস্তার কোরেছিলেন। কিন্তু তিনি বিশ্বমানব হোয়েও একান্ত ভাবেই ছিলেন শাশ্বত ভারতের বাণী-মূর্ত্তি। তিনি বাইরে সেমেটিক, আর অন্তরে ভারতীয় ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক। পর্ব্বতোপরি তিনি শিষ্যদের নিকট যে উপদেশামৃত পরিবেশন কোরেছেন, তার ভেতর একটি নির্দ্দেশ আমাদের নিকট বিশেষ অ । তিনি বলেছেন—

'ধন্য তাঁরা, অন্তর যাঁদের বিশুদ্ধ, কেননা, তাঁরা ভগবানের দর্শন লাভ কোর্ব্বেন।'

আমাদের শাস্ত্রসিন্ধু মন্থন কোরে অনুরূপ উপদেশ-রত্ন আহরণ করা যায়। আমরা এখানে শুধু মুণ্ডক-উপনিষদের একটি শ্লোক উদ্ধার কোর্ব্বো।

'সত্যেন লভ্যস্তপসা হ্যেষ আত্মা
সম্যগ্ জ্ঞানেন ব্রহ্মচর্য্যেণ নিত্যম্।

অন্তঃশরীরে জ্যোতির্ম্ময়ো হি শুভ্রো
যং পশ্যন্তি যতয়ঃ ক্ষীণ দোষাঃ।'

সত্য, তপস্যা, সম্যগ্ জ্ঞান ও নিত্য ব্রহ্মচর্য্যের (পবিত্রতার) দ্বারাই পরমাত্মাকে জানা যায়। অন্তঃশরীরে জ্যোতির্ম্ময় নিষ্কলঙ্ক ঈশ্বর বিরাজ করছেন, ক্ষীণ পাপ যতিগণই তাঁকে দর্শন করেন।

ঈশা ছিলেন প্রেম ও ক্ষমার মূর্ত্ত বিগ্রহ। ইহুদীধর্ম্মে শত্রুর প্রতি হিংসার বিধান ছিল, আর সেযুগে ইহুদীগণও মানবতার আদর্শ থেকে পরিভ্রষ্ট হোয়েছিল। তাই ঈশা উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করলেন—

'তোমরা শুনেছো এই প্রাচীন নীতি,—চক্ষুর বিনিময়ে চক্ষু ও দন্তের বিনিময়ে দন্ত, অর্থাৎ যে তোমার নেত্র বা দন্ত উৎপাটন কোর্ব্বে, তুমিও তার নেত্র বা দন্ত উৎপাটন কোরো।

কিন্তু আমি তোমাদের নির্দ্দেশ দিচ্ছি, অন্যায়ের প্রতিরোধ কোরো না,—যে তোমার দক্ষিণ গণ্ডে চপেটাঘাত কোর্ব্বে, বাম গণ্ড তাকে ফিরিয়ে দিও।'

ঈশা এম্নি কোরেই ক্ষমার আদর্শ প্রচার কোরেছিলেন। এই অহিংসা ও ক্ষমার আদর্শকে নিয়ে অনেকেই ব্যঙ্গ কোরে থাকেন, রক্তমাংসের দেহধারীর পক্ষে এরূপ একটি নির্দ্দেশ পালন করা সম্ভবপর কি না, সে বিষয়েও অনেকে সংশয় প্রকাশ করেন, আর যাঁরা ঈশার অনুবর্ত্তী বলে নিজেদের পরিচয় দেন, তাঁরা কেমন কোরে এই নির্দ্দেশের গৌরব রক্ষা করেন, সে কথা তো আর কাউকে বলে দিতে হবে না। কিন্তু ভগবান ঈশার আবির্ভাবেরও বহু পূর্ব্বে ভগবান তথাগত অহিংসা ও ক্ষমা, মৈত্রী, করুণা ও মুদিতার আদর্শ প্রচার কোরেছেন। তিনি বলেছেন—অক্রোধের দ্বারা জয় কোর্ব্বে ক্রোধকে, সাধুতার দ্বারা জয় কোর্ব্বে অসাধুতাকে, দানের দ্বারা পরাভূত কোর্ব্বে কৃপণকে, আর সত্যের দ্বারা বশীভূত কোর্ব্বে মিথ্যাবাদীকে।

মহর্ষি পতঞ্জলিও কায়মনোবাক্যে অহিংসার আদর্শ অনুসরণ কোর্তে বলেছেন। অহিংসায় যাঁরা প্রতিষ্ঠিত হোয়েছেন, তাঁদের কেমন কোরে চেনা যায়, সে কথাও তিনি বলেছেন। ভগবান ঈশা কোনো কোনো স্থানে স্বর্গরাজ্যে পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিলেও কোথাও অহিংসার ইহলৌকিক ফলশ্রুতির কথা বলেন নি। তিনি খুব স্পষ্ট ভাষায় মানবপ্রেমের আদর্শ প্রচার কোরেছেন—

'তোমরা সেই প্রাচীন নির্দ্দেশের কথা জানো, প্রতিবেশীকে ভালোবাসবে আর শত্রুকে ঘৃণা কোর্ব্বে।

কিন্তু আমি তোমাদের বল্‌চি—শত্রুকে ভালোবাস্‌বে, যারা তোমায় অভিশাপ দেয়, তাদের উদ্দেশ্যে আশীর্ব্বাণী উচ্চারণ কোর্‌বে, যারা তোমায় ঘৃণা করে, তাদের কল্যাণ সাধন কোর্‌বে, যারা তোমায় অবজ্ঞা বা নির্য্যাতন করে, তাদের জন্যেও প্রার্থনা কোর্‌বে।'

আমরা অনেকে ত্যাগ ও ভোগের ভেতর একটা আপোষ-রফা কোরতে চাই। সংসারের ধন সম্পদের প্রতি আকর্ষণ ত্যাগ কোরতে চাই নে, অথচ অল্প ক্লেশে ঈশ্বরকেও লাভ কোর্‌তে চাই। ঈশা কিন্তু স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন—

'কেউ এককালে দু'জন প্রভুর সেবা কোরতে পারে না,...তোমরাও একই কালে ঈশ্বরের ও ধন-দেবতার সেবা কোর্‌তে পারো না।'

ভক্ত কবি তুলসীদাসের একটি উক্তির সঙ্গে এই অংশের ভাবগত সাদৃশ্য রয়েছে। তুলসীদাস বলেছেন—

'যাঁহা রাম তাঁহা কাম নেহি, যাঁহা কাম তাঁহা নেহি রাম। রব রজনী দোনো নেহি বৈঠিয়ে এক ঠাম॥'

আমাদের দেশের ঋষিগণ সংযম বা ব্রহ্মচর্য্যকে ধর্ম্ম সাধনার প্রথম সোপান বলে নির্দ্দেশ কোরেছেন। তাঁরা বলেছেন—আমাদের যদি আত্মসাক্ষাৎকার লাভ কোরতে হয়, তবে 'কায়েন মনসা বাচা' সর্ব্বদা সর্ব্ব ভাবে ব্রহ্মচর্য্যকে আশ্রয় কোর্‌তে হবে। ঈশাও বলেছেন, মানুষ যেমন কর্ম্মের দ্বারা, তেম্নি মনের দ্বারাও ব্যভিচার কোরে থাকে। শিষ্যগণকে তিনি মানসিক সংযমের উপদেশ দিয়েছেন—

'তোমরা প্রাচীন নির্দ্দেশ শুনেছো—কখনো ব্যভিচার কোরো না।

কিন্তু আমি তোমাদের বল্‌চি—যে কেউ সকাম ভাবে কোনো নারীর প্রতি দৃকপাত কোর্‌বে, সেই অন্তরে তার সঙ্গে ব্যভিচারের অপরাধে অপরাধী হবে।'

বাস্তবিক ঈশা যে চরিত্র-নীতি প্রচার কোরেছেন, তাঁর মূল কথা—ইন্দ্রিয়সংযম, ত্যাগ, বৈরাগ্য, অপরিগ্রহ, অহিংসা, ক্ষমা, আত্মজিজ্ঞাসা। সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি—ভারতের ঋষিগণ যে বাণী প্রচার কোরেছেন, তিনি তারই মূর্ত্ত প্রতীক। বাস্তবিক তিনি অন্তরের অন্তরে ভারতীয় ঋষি ও সন্ন্যাসী, যোগী ও তপস্বী।

ঈশা তাঁর শিষ্যদের উদ্দেশ্যে বলেছেন—

'শূকরের সম্মুখে মুক্তা ছড়িয়ো না, তা' হোলে হয়তো তারা সেগুলো পদদলিত কোরে আবার তোমাদের দিকেই ধাবিত হবে ও দন্তের আঘাতে তোমাদের দীর্ণ কোরে ফেলবে।'

দেখা যাচ্ছে, এখানে ঈশা অধিকারবাদের ইঙ্গিত কোরেছেন। আর এই অধিকারবাদই হচ্ছে ভারতীয় ধর্ম্মসাধনার বৈশিষ্ট্য।

কঠোপনিষদে প্রেয়ের পথ ও শ্রেয়ের পথের পার্থক্য দেখানো হোয়েছে। যম নচিকেতাকে বলেছেন শ্রেয়ের পথ হচ্ছে ক্ষুরধারার মতো শাণিত, দুরতায় ও দুর্গম। আমরা ঈশার কণ্ঠেও এই ভাবের প্রতিধ্বনি শুনতে পাই। ঈশা বলেছেন—

'যে পথ মানুষকে ধ্বংসের (উপনিষদের ভাষায় মহতী বিনষ্টির) দিকে নিয়ে যায়, সে পথ অতি প্রশস্ত, তার দ্বারও প্রকাণ্ড, আর সে পথের পথিক হচ্ছে অগণিত।

যে পথ মানুষকে জীবনের দিকে নিয়ে যায়, সে পথ সংকীর্ণ,···খুব অল্প লোকেই সে পথের সন্ধান পায়।'

চৈতন্যচরিতামৃতে মহাপ্রভু সম্পর্কে যে কথাটি বলা হোয়েছে, ঈশা সম্পর্কেও সে কথাটি প্রযোজ্য—

'আপনি না কৈলে ধর্ম্ম শেখানো না যায়।
আপনি আচরি ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়'॥

এই জন্যেই ঈশার জীবনের অনুসরণের দ্বারা মানুষ পূর্ণতা লাভ কোরতে পারে। সাধু টমাস্. এ. কেম্পিস তাঁর Imitation of Christ বা ঈশানুকৃতি নামক গ্রন্থে যে আদর্শ স্থাপন কোরেছেন সে আদর্শ বিশ্বজনীন।

মহর্ষি পতঞ্জলি তাঁর যোগসূত্রে চিত্তকে একাগ্র করবার বহুবিধ উপায় নির্দ্দেশ কোরেছেন। তার ভেতর একটি হচ্ছে, যাঁদের চিত্ত বিষয়ে বীতরাগ হোয়েছে, তাঁদের ধ্যান করা। এর চাইতে উদারতর নির্দ্দেশ আর কিছু হোতে পারে না। এই সূত্র অনুসারে আমরা বল্‌তে পারি—যাঁরা সত্যই ঈশার অনুধ্যান করেন, তাঁরা বিষয়ে বীতরাগ হন,—তাই তাঁরা যোগী হয়ে যান।

ঈশা যে কালে আবির্ভূত হোয়েছিলেন, সে কালে যে ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হোয়েছিল, তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু তিনি দুস্কৃতদের বিনাশ করেন নি, তাঁদের পুঞ্জীভূত পাপের প্রায়শ্চিত্ত কোরেছিলেন মহত্তম আত্মত্যাগের দ্বারা। যে 'ক্রুশের' যূপকাষ্ঠে বিদ্ধ হোয়ে তিনি মহাপ্রয়াণ কোরেছিলেন, তা' হচ্ছে পরের মঙ্গলের জন্যে আত্মদানের প্রতীক, কিন্তু ক্ষোভের বিষয় এই যে, যাঁরা এই প্রতীক-চিহ্ন ধারণ কোরে আপনাদের বিশেষ একটি সম্প্রদায়ের গণ্ডির ভেতর আবদ্ধ রাখেন, তাঁরা এর প্রকৃত তাৎপর্য্য চিন্তা করেন না। 'ক্রুশের' প্রকৃত তাৎপর্য্য 'আত্মবিলোপ', ভগবানের নিকট পরিপূর্ণ আত্ম-সমর্পণ। আমাদের দেশের সাধক বলেছেন,—'আমি মলে ঘুচিবে জঞ্জাল'। ঈশাও প্রার্থনা কোরেছেন—'প্রভো, স্বর্গে, মর্ত্ত্যে তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক'। সুতরাং যাঁরা পরিপূর্ণ ভাবে 'অহং' এর বিলোপ সাধন না করতে পারেন বা পরের কল্যাণে আত্ম বিসর্জ্জনরূপ ব্রত যাঁরা গ্রহণ না করেন, তাঁরা ঈশার অনুবর্ত্তী হবার দাবী কোর্‌তে পারেন না। ঈশার মহান আদর্শে যাঁরা প্রভাবিত হোয়েছেন, তাঁদের জীবনের মূল মন্ত্রই হচ্ছে—দুর্গতের সেবা, দৈন্য, আর্ত্তি, শরণাগতি। তাই ঈশা নিখিল জগতের বন্দনীয় হোলেও তাঁর দিব্য কর্ম্ম ও জীবনের ভেতর আমরা সনাতন ভারতবর্ষের অন্তরাত্মারই রূপায়ন দেখতে পাই।

তৃষিত আত্মা

শ্রীজগদীশ গুপ্ত

সীতাপতি মারা গেলেন বড় হঠাৎ।

খামার বাড়ী হইতে বেলা অনুমান সাড়ে এগারটার সময় বাড়ী ফিরিয়া মণ্ডব ঘরে তক্তপোষের উপর বসিয়া যখন তিনি ভৃত্যকে তামাক দিতে বলিলেন তখনো তাঁর শরীরে বাহ্যিক কোনো গ্লানি ছিল না; কিন্তু তামাক সাজিয়া আনিতে যে অত্যল্প সময়টুকু লাগিল, তাহারই মধ্যে দেহের কোথায় কি যে কাণ্ড ঘটিয়া গেল, বোঝা গেল না। ভৃত্যের হাত হইতে হুঁকাটি লইয়াই প্রথমে তাঁর হাত পরে সর্ব্বাঙ্গ থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। হস্তচ্যুত হইয়া হুঁকা পড়িয়া যায় দেখিয়া ভৃত্য তাড়াতাড়ি হুঁকাটি লইয়া লোক ডাকিতে ডাকিতে সীতাপতিকে ধরিয়া শুয়াইয়া দিল, সীতাপতি অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। ইহার অল্পক্ষণ পরেই পুত্রপরিজন-বেষ্টিত সীতাপতি স্বর্গারোহণ করিলেন।

যে বহুকাল রোগে ভুগিয়া ভুগিয়া শয্যায় শুইয়া ক্রমে ক্রমে তিল তিল করিয়া ক্ষয় হইয়া প্রাণ ত্যাগ করে, তাহার মৃত্যুতে তাহার অধিকৃত স্থানটিই কেবল শূন্য হইয়া যায়—সে যেন নিশ্চিত এবং নিঃশেষ অনুপস্থিতি; কিন্তু যে মানুষ এই ছিল এই নাই সে কাছে না থাকিয়াও কোথায় যেন থাকে, তার অভাবে গৃহের প্রত্যেক কক্ষ, প্রত্যেক অঙ্গন, প্রত্যেক দ্বার, প্রত্যেক মোড়, প্রত্যেক অংশ—গৃহের সমগ্র মর্ম্মস্থলটিই যেন শূন্য হইয়া হা-হা করিতে থাকে; ঠিক সেই কারণেই আবার জীবিতের সচকিত ভীতির অন্ত থাকে না;—ঐ বুঝি সে আসনে বসিয়া, ঐ বুঝি সে দুয়ারে দাঁড়াইয়া, ঐ বুঝি তার কণ্ঠস্বর—এমনি ভুল সহস্রবার ঘটিয়া মনোরাজ্যের সীমা ছাড়াইয়া মৃতের দৈহিক অস্তিত্বের মৃণালটুকুর নিশ্চিহ্নরূপেও নিঃশেষে নিক্রান্ত হইয়া যাইতে বহু বিলম্ব ঘটে।

এটা বোধ হয় সাধারণ, কিন্তু সীতাপতির অকস্মাৎ মৃত্যুর পর পুত্রবধূ লক্ষ্মীর প্রাণে যে আতঙ্কের সঞ্চার হইল তাহা যেমন দুঃসহ প্রবল তেমনি নিরেট, অব্যক্ত, তাহা মুখ ফুটিয়া পরের কাছে বলিবার নয়, নিজেরই মনের সঙ্গে সে কথা লইয়া বুঝি তর্ক করাও চলে না।

প্রথম রাত্রি তার নির্ব্বিঘ্নেই কাটিল।

দ্বিতীয় দিন স্বামী মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া মৃৎপাত্রে বায়স ভোজ্য ক্ষীরোদক দিতেছেন,—তিন মাসের শিশুপুত্রটিকে কোলে করিয়া অদূরে বসিয়া উদকদান দেখিতে দেখিতে লক্ষ্মীর সহসা আশ্চর্য্য দৃষ্টিবিভ্রম ঘটিয়া গেল—সে দেখিল, —উদকাধারের ঊর্দ্ধস্থিত বায়ু যেন দৈবিক একটা আকার ধারণ করিতে করিতে একখানা স্বচ্ছ সুস্পষ্ট মুখাবয়বে রূপান্তরিত হইয়া শূন্যে ভাসিতে লাগিল; আর সে মুখখানা—

লক্ষ্মী সভয়ে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ফেলিল; ক্রোড়স্থ-শিশু কাঁদিয়া উঠিল; পরক্ষণেই চোখ মেলিয়া লক্ষ্মী দেখিল—মুখ অন্তর্হিত হইয়াছে।

ইহার পর দিনমান নিরুপদ্রবেই কাটিয়া গেল। কিন্তু লক্ষ্মীর প্রাণের উপর যে ছায়াপাত হইয়াছিল সেটা মুছিল না।

সন্ধ্যা অজ্ঞাতলোকের সমস্ত প্রচ্ছন্নতার কুহকপীড়ন লইয়া ঘনাইয়া আসিল; আবছায়া অন্ধকারের দিকে ভাল করিয়া চোখ মেলিয়া চাহিতেও ভয়ে লক্ষ্মীর গা ভারি হইয়া উঠিতে লাগিল। পল্লী-আবাসের চতুর্দ্দিকে অনিবিড় বিস্তৃত জঙ্গল অন্ধকারের বাঁধনে একাকার হইয়া ক্রমে জমাট কঠিন হইয়া উঠিল; তার ঊর্দ্ধেই আকাশের খানিকটা নক্ষত্রের দুর্ব্বল আলোকে আর বাষ্পের আবরণে রহস্য গভীর; দীর্ঘদেহ নারিকেল, সুপারি প্রভৃতি গাছের শ্রেণীবদ্ধ মাথাগুলি দুলিয়া-দুলিয়া পাতায় পাতায় একটা শির্ শির্ শব্দ উঠিতেছে—যেন কাদের কানে কানে ফিস্

ফিস কথা। বাড়ীর উত্তর কোণে ঘনপত্র বৃহদাকার একটি গাবগাছ—তাহার সর্ব্বাঙ্গে জোনাকি হাজারে হাজারে অদৃশ্য জীবের অসংখ্য চক্ষুর মত টিপ্ টিপ্ করিয়া নিবিয়া নিবিয়া জ্বলিতেছে, আলোকের ঐটুকু স্পর্শে সেই স্থানের অন্ধকার গাঢ়তর হইয়া আছে; সে যেন কি বলিতে চায়, কিন্তু না বলিতে পারিয়া প্রাণপণ ব্যাকুলতায় হাঁপাইতেছে।

লক্ষ্মীর স্নায়ুকেন্দ্র নিরতিশয় তীক্ষ্ণ হইয়া এই নিঃশব্দ অন্ধকারের ভিতর হইতে গুপ্ত অথচ অবিশ্রান্ত একটি চঞ্চলতার আঘাত গ্রহণ করিতে লাগিল। প্রত্যেক অলক্ষিত স্থানেই যেন একটা অতীন্দ্রিয় গতিবিধি চলিতেছে; কি একটা যেন গা ঢাকা দিয়া লুকাইয়া আছে—সে ছায়া নয়, বস্তু নয়, অথচ সে যেন ছায়া বস্তু দুইই; ঐ যে সরিয়া গেল, ঐ সে অগ্রসর হইতেছে; ঐ দেখা যায়, ঐ মিলাইয়া গেল—এমনি একটা লুকোচুরি লক্ষ্মীর চোখের সামনে অবিরাম চলিতে লাগিল।

লক্ষ্মী ধীরে ধীরে যাইয়া শ্বশ্রূর গা ঘেঁসিয়া বসিল। কিন্তু সে স্থান হইতেও ওদিক্‌কার শুইবার ঘরখানার ভিতর পর্য্যন্ত তাহার চোখে পড়িতেছিল। লক্ষ্মীর মনে হইল, সেখানেও একটা নড়াচড়া, চলাফেরা উঁকিঝুঁকি চলিতেছে—ঘরের বদ্ধ বাতাসে যেন কার মর্ম্মান্তিক দীর্ঘনিঃশ্বাসের তরঙ্গ বহিয়া চলিয়াছে।⋯ ⋯আর কোন দিকে না চাহিয়া সুমুখের প্রজ্জ্বলিত বাতিটার দিকে লক্ষ্মী অপলক নেত্রে চাহিয়া রহিল।

রাত্রে খুব সতর্ক হইয়া সকলে শয়ন করিলেন।

মানুষ মনে করে, পরলোকের যেস্তর পর্য্যন্ত সাংসারিক বন্ধন-মায়ার আকর্ষণলীলা চলিতে থাকে তাহার গণ্ডী অতিক্রম করিতে মৃতাত্মা সহজে পারে না; সুতরাং আসক্তির দুর্নিবার টানে তাহার পক্ষে নিকটতম প্রিয়তম জনের একান্ত সমীপবর্ত্তী হওয়া কিছুমাত্র অস্বাভাবিক নহে। কিন্তু অনেকগুলি তুক আছে—তাহারা নাকি মৃতাত্মাকে দূরে দূরে রাখে।

সে রাত্রি ও পরের দিবাভাগটি অমনিই কাটিল। কিন্তু চতুর্থ দিন সন্ধ্যায় সময় লক্ষ্মীর মনে হইল, বায়ুমণ্ডল যেন সেই অমানুষিক চঞ্চলতার তাড়সে চিড়্ খাইয়া কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে।

বাড়ীর অন্ধকার যেন ঠিক অন্ধকার নয়—যেন বিশাল পক্ষ একটা পক্ষী বাড়ীর এ প্রান্ত হইতে ও প্রান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত ডানায় ঢাকিয়া গোপন ও অগণ্য আনাগোনার একটা ষড়যন্ত্রের উপর হুমড়ি খাইয়া পড়িয়া আছে—সে যেন উঠি উঠি করিতেছে; সে উঠিয়া গেলেই ষড়যন্ত্রকারীরা ভগ্নস্তূপ ক্রিমির মত পৃথিবীময় ছড়াইয়া পড়িবে।⋯

এমনি ধারা ভয়ঙ্করের দুশ্চেষ্ট একটা মোহ আছে; সে যেন মনটাকে ফাঁদে জড়াইয়া ফেলে। আবিষ্ট বন্দী মনের প্রাণান্তকর ছটফটানির শেষ হয় কেবল তখন, যখন এই দুঃসহ শীতল আবহাওয়ার মধ্যে সে মূর্চ্ছিতের মত এলায়িত শ্লথ অসার হইয়া আসে।⋯লক্ষ্মীর মনও এমনি বাঁধা পড়িয়াছিল—হঠাৎ স্বামীর খক্ খক্ কাশীর প্রচণ্ড শব্দে তাহার মন একটানে বন্ধনজাল ছিঁড়িয়া স্বস্থানে ফিরিয়া আসিয়া ধক্ ধক্ শব্দে দুলিতে লাগিল। সে জোর করিয়া নিজেকে সবেগে টানিয়া লইয়া ঘরের মধ্যে ছেলের কাছে যাইয়া শুইয়া পড়িল। নিকটেই আড়ালে স্বামী ও শ্বশ্রূ বসিয়া শ্রাদ্ধসম্পর্কীয় কথাবার্ত্তা কহিতে-ছিলেন; কিন্তু তবু লক্ষ্মী ঘরের মধ্যে তিষ্টিতে পারিল না। অত্যল্পকাল পরেই সে ছেলেটিকে লইয়া তাড়াতাড়ি বারান্দায় আসিয়া শাশুড়ীর পাশে ঝুপ করিয়া বসিয়া পড়িল।

কাশীশ্বরী জিজ্ঞাসা করিলেন—কি বৌমা?

লক্ষ্মী কথা কহিতে পারিল না।

কাশীশ্বরী বলিলেন—অমন করে চলে এলে যে?

লক্ষ্মী কষ্টের সহিত বলিল, কিছু না মা, অমনি।

তাহার বুকের মধ্যে কি করিতেছিল, তাহা সেই জানে—ঘোমটার মধ্যের তাহার চোখের দু'পাতা যেন এক হইতে চাহিল না।

লক্ষ্মীর এই সন্ত্রাস পলায়ন অকারণ নহে। ছেলের পাশে শুইয়াই তাহার মনে হইতে লাগিল, ওদিককার খোলা জানাটীর ঠিক ওধারে আসিয়া কে যেন নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া আছে, সে কেবলি গলা বাড়াইয়া উঁকি মারিয়া

মারিয়া ঘরের ভিতর তাহাদেরই উপর দৃষ্টি ফেলিতেছে লক্ষ্মী মুখ তুলিয়া চাহিলেই দেখিতে পাইত জানালায় কেহই নাই ; কিন্তু এই নিদারুণ অনিশ্চিতকে ভালমন্দ যে কোনো প্রকার সুনিশ্চিতে পরিণত দেখিবার মত দৃঢ়তা তার অবশ মনে ছিল না। আতঙ্কটা উত্তরোত্তর উৎকট হইয়া লক্ষ্মীর শ্বাসপ্রশ্বাসের রন্ধ্র-পথটি চাপিয়া চাপিয়া তাহাকে যেন অজ্ঞান করিয়া ঠেলিয়া লইয়া বাহিরে ফেলিল।

কাশীশ্বরী মনে মনে বুঝিলেন, বধূ ভয় পাইয়াছে। তিনি লক্ষ্মীর পিঠের উপর সস্নেহে হাত রাখিয়া বলিলেন, "শ্রাদ্ধটা শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত সন্ধ্যার পর একলা কোথাও থেক না, মা।"

সীতাপতি শিশুর নাম রাখিয়াছিলেন আলো। সেই রাত্রে সীতাপতির কণ্ঠের শব্দে লক্ষ্মীর ঘুম ছ্যাঁৎ করিয়া ভাঙ্গিয়া গেল ; লক্ষ্মী যেন শুনিল, সীতাপতি বাহির হইতে গভীরস্বরে ডাকিতেছেন, আলো ? ঐ একটিবার মাত্র, লক্ষ্মী ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া আর্ত্তকণ্ঠে ডাকিল, মা ?

শাশুড়ী জবাব দিলেন,—কি বৌমা ?

—কে যেন খোকাকে ডাকলে, শোননি ?

—না, আমি তো শুনিনি, জেগেই তো আছি।

লক্ষ্মী বলিল, আলো বলে ডাকলে।

বাড়ীর অপরাপর সবাই শিশুকে খোকা বলিয়া ডাকে; কেবল সীতাপতি ডাকিতেন আলো বলিয়া। লক্ষ্মীর কথা শুনিয়া এবং তাহার অপরিচিত একটা উদ্বেলতা লক্ষ্য করিয়া কাশীশ্বরী উঠিয়া তেলের প্রদীপটি জ্বালিলেন, এবং দীপহস্তে লক্ষ্মীর শয্যাপ্রান্তে যাইয়া শিশুর মুখের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিলেন, শিশুরা যেমন ঘুমায় সেও তেমনি নিশ্চিত আরামে সুস্থ নিদ্রায় অভিভূত।

কাশীশ্বরী খোকার ও লক্ষ্মীর শিয়রে বসিয়া রহিলেন ; সে রাত্রি তাঁহাদের জাগিয়াই কাটিল।

পরদিন মধ্যাহ্নে হঠাৎ একবার শিশুর মুখের দিকে চাহিয়া কাশীশ্বরী চমকিয়া উঠিলেন ; শিশুর চোখে জ্ঞানের ধারণাশক্তির অভাবের যে সহজ স্বচ্ছ সরল নিস্তেজ দৃষ্টি থাকে খোকার চোখে তাহা নাই।—জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলি তার সম্যক বিকাশ প্রাপ্ত জাগ্রত কর্ম্মক্ষম হইয়া পৃথিবীর সঙ্গে শিশু আত্মাটির পরিচয় সম্পূর্ণ হইয়া গেছে, এমনি তার সজ্ঞান দৃষ্টি। দেখিয়া কাশীশ্বরী যেমন বিস্মিত হইলেন তেমনি ভীতও হইলেন; কিন্তু মুখে তিনি মনের ভয় ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ করিলেন না। সেই দিনই তিনি গোপনে একটি মাদুলি সংগ্রহ করিয়া শিশুর গলায় পরাইয়া দিলেন।

লক্ষ্মী জিজ্ঞাসা করিল—মাদুলী কিসের মা ?

কাশীশ্বরী নিঃস্পৃহ স্বরে বলিলেন—তুমি যে কাল ভয় পেয়েছিলে, বৌমা, তাই।

কথাটি ঠিক পরিষ্কার হইল না, কিন্তু লক্ষ্মী মনে মনে বুঝিল—অকল্যাণকর একটি ভয়ের ছায়াপাত শাশুড়ীর প্রাণেও হইয়াছে। বুকটা তার হঠাৎ কাঁপিয়া উঠিল।

রাত্রের প্রথম ভাগে লক্ষ্মীর চোখে ঘুম আসিল না। প্রবলবেগে বাতাস বহিতেছিল। রাত্রির অন্ধকার যেন এই দুর্দিনে তার অন্তরস্থ শূন্য ক্ষুধিত মহাগহ্বরটির মুখের আবরণ তুলিয়া ধরিয়াছে, আর পৃথিবীর কঠিন অকঠিন সমুদয় বস্তু বায়ুবেগে ক্ষয় হইয়া তাহারই মধ্যে হুহু শব্দে ঢালিয়া পড়িতেছে। দূরে কোথায় একটা কুকুর তারস্বরে চিৎকার করিয়া থামিয়া থামিয়া কাঁদিতেছিল—সে শব্দটা যেন আসন্ন অনিবার্য্য বিনাশের শঙ্কায় আতুরা ধরণীরই অবিরাম আর্ত্ত হা-হা রব!

ঘরের দীপশিখাটি নাচিতেছিল; সেদিকে চাহিয়া লক্ষ্মীর সহসা মনে হইল, যেন কাহার রক্তাক্ত লেলিহান জিহ্বা লক্-লক্ করিয়া বায়ুর স্তর-প্রান্ত লেহন করিতেছে।—লক্ষ্মী পাশ ফিরিয়া শুইল। ···শাশুরীর সঙ্গে কথা কহিতে কহিতে লক্ষ্মীর কখন ঈষৎ একটু তন্দ্রার ঘোর আসিয়াছিল—ঘোর ভাঙ্গিয়া হঠাৎ সে জাগিয়া দেখিল ঘরের প্রদীপ নিভিয়া গিয়াছে, এবং ঘোর অন্ধকারেও সে স্পষ্ট দেখিতে পাইল, কে যেন দ্বারের বাহির হইতে চৌকাঠের ফাঁক দিয়া হাত বাড়াইয়া ঘরের ভিতরকার মাটি হাতড়াইতেছে!···

মা, মাগো!

বধূর ভীত চীৎকারে কাশীশ্বরী 'কি হ'ল—কি হ'ল' বলিতে বলিতে শশব্যস্তে উঠিয়া বসিয়া প্রদীপ জ্বালিলেন;

দেখিলেন—বধূ উঠিয়া দাঁড়াইয়া পাতাটির মত হি হি করিয়া কাঁপিতেছে ; তাহার চক্ষু মুদ্রিত, মুখ বিবর্ণ, দাঁতে দাঁত ঠক্ ঠক্ করিয়া বাজিতেছে, শিশু নিদ্রামগ্ন।

কাশীশ্বরীর অধীর জিজ্ঞাসার উত্তরে লক্ষ্মী বলিল,—ঐ ফাঁক দিয়ে কে হাত বাড়িয়ে মাটি হাতড়াচ্ছিল ;—বলিয়া সে কম্পিত হস্তে চৌকাঠ দেখাইয়া দিয়া 'মাগো' বলিয়া বসিয়া পড়িল।

কাশীশ্বরী জানিতেন, ভয় তাড়াইবার উপায় তর্ক নয়। কাজেই বধূকে কিছু না বলিয়া তিনি ছেলেদের এই ঘরে ডাকিয়া আনিলেন। তাঁহারা দু'-ভাই আদি-অন্ত অবগত হইয়া একেবারেই হাসিয়া উঠিলেন। তাঁহারা যাহা বলিলেন, তাঁহার সংক্ষিপ্ত সার এই—স্ত্রী লোকের দুর্ব্বল মস্তিষ্কে সবই সম্ভব, বিভীষিকা দেখাও আশ্চর্য্য নয়। বাড়ীতে মৃত্যু ঘটিলে মানুষে ভয় পাইয়াছে—এ-কথা ইতিপূর্ব্বে শোনা গেছে। তারপর তাহারা উপসংহারে বলিলেন—ও সেরে যাবে।

সারিল বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ অন্যভাবে। কাশীশ্বরী বা তাঁর ছেলেরা বুঝিতেই পারেন নাই যে, আতঙ্কটা লক্ষ্মীর প্রাণে সব সময় দমকা হাওয়ার মত ছুটিয়া আসিয়া বহিয়া যাইত না—সেটা তার মস্তিষ্কের চারিপ্রান্ত জুড়িয়া অহরহ ঘূর্ণীর সৃষ্টি করিতেছিল। লক্ষ্মী দিবারাত্র বিভীষিকা দেখিতেই লাগিল। শেষে অবস্থা এমন দাঁড়াইল যে, চোখ বুজিলেই তাহার মনে হয়, কে যেন দ্বারের সহস্র ছিদ্রপথে অসংখ্য অঙ্গুলি প্রবেশ করাইয়া কি যেন টানিয়া টানিয়া লইতেছে।

ষষ্ঠ দিনে সকলেই লক্ষ্য করিল যে, শিশুর দেহ এক রাত্রেই যেন কাঠির মত শুষ্ক হইয়া গেছে। প্রাণপণে চুষিয়া অভ্যন্তরের সমস্ত রস বাহির করিয়া লইলে রসাল ফলটির যেমন আকৃতি হয়, শিশুর সর্ব্বাবয়বে আকৃতি ঠিক সেইরূপ বিকৃত—মাথাটি ছাড়া সর্ব্বাঙ্গ যেন নীরস হইয়া চুপসিয়া আয়তনে একেবারে অর্দ্ধেক হইয়া গেছে। কাশীশ্বরীও দেখিলেন, দেখিয়া তিনি মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন ; শিশুর অস্বাভাবিক উজ্জ্বল বিশাল চক্ষু দুইটির দিকে চাহিয়া কাশীশ্বরী ও লক্ষ্মীর বুকের ভিতর আগুন জ্বলিয়া উঠিল। এত বড় মর্ম্মান্তিক দুর্ঘটনা মানুষের জীবনে বুঝি দুটি ঘটিতে পারেনা ; চোখের উপর শিশু হনন চলিতেছে—অথচ ত্রিভুবনের কুত্রাপি তার প্রতিকারের কোনো উপায়ই মানুষের জানা নাই ; বাধা দিবার সাধ্য নাই ; সান্ত্বনা নাই। হেতু যতই অনির্দ্দেশ্য হোক্, ফল সম্বন্ধে কাহারও মনে তিলমাত্র সংশয় রহিল না। নিরুপায়ের অসহ্য যন্ত্রণায় কাশীশ্বরীর বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল ; তিনি অবিরাম কাঁদিতে লাগিলেন। পুত্রটিকে বুকে করিয়া লক্ষ্মী নির্ব্বাক্ স্তম্ভিত হইয়া রহিল।

সে রাত্রিতে কেহ কাহারও কাছ ছাড়া হইল না।···স্তিমিত প্রদীপটিকে ঘিরিয়া বসিয়া একটা অজ্ঞাত ত্রাসে সবাই নিঃশব্দ—রাত্রি নীরব, মানুষের কণ্ঠ নীরব। লক্ষ্মীর আর্ত্তনাদে সহসা সেই কঠিন নীরবতা বিদীর্ণ হইয়া মায়া-জগৎ ধূলিসাৎ হইয়া গেল ; কাশীশ্বরী কাঁপিয়া উঠিয়া শিশুর বুকের উপর হাত রাখিলেন ; দেখিলেন নিঃশেষিত তৈল শিশু-দীপটি কখন যেন নিভিয়া গেছে।

লক্ষ্মী মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।—

যখন তাহার মূর্চ্ছা ভাঙ্গিল, তখন প্রকৃতির অপ্রাকৃতিক সমস্ত সংক্ষোভ শান্ত হইয়া গেছে।

শরৎচন্দ্রের 'মেজদিদি'

শ্রীসচ্চিদানন্দ চক্রবর্ত্তী

শরৎচন্দ্রের ছোট গল্পগুলির মধ্যে 'মেজদিদি' একটি উপভোগ্য রচনা। অনেকে হয়তো শরৎচন্দ্রের এই সৃষ্টি-কর্ম্মটিকে তাঁর অন্যান্য ছোট গল্পের সহিত এক পর্য্যায়ভুক্ত করিতে সম্মত হইবেন না, কেন না ইহার পরিসর ঐ সকল ছোট গল্পের ন্যায় ক্ষুদ্র নয় অথবা ছোট গল্পের যাহা প্রধান বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ লেখকের সামান্যতম প্রচেষ্টায় উচ্চতম ভাব-চিন্তা পরিস্ফুট করা—তাহাও ইহার মধ্যে দৃষ্ট হয় না। তথাপি ইহাকে ছোট গল্প নামে অভিহিত করার কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে আমি এই কথাই স্মরণ করাইয়া দিব যে অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র যদি 'মেজদিদিকে' পূর্ণাঙ্গ উপন্যাসাকারে রূপায়িত করিতেন, তাহা হইলে কেবল ইহার বিষয় বস্তুরই পরিবর্ত্তন হইয়া যাইত না, সঙ্গে সঙ্গে গল্পের সূচনা এবং সমাপ্তিও ভিন্ন হইয়া যাইত। কেন না তখন একাধিক চরিত্র ও ঘটনা সন্নিবেশে ইহার কাহিনী নূতন রূপ পরিগ্রহ করিত। কিন্তু এ-কথা থাক।

'মেজদিদি' সম্বন্ধে আলোচনাকালে পাঠকগণকে দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর সামাজিক পরিবেশ এবং তৎপ্রসূত ভাবমণ্ডলের সাহায্যে ইহার রস উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিলে চলিবে না। তাঁহাদের খাঁটি বাঙালীর মনপ্রাণ ও খাঁটি বাঙালীর দৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্যে বিগত যুগের এক সমাজের কাহিনী বিচার বিশ্লেষণ করিতে হইবে। তবেই তাহা অভ্রান্ত ও নিরপেক্ষ সমালোচনা বলিয়া গ্রাহ্য হইবে। নতুবা তাহা শরৎ-সাহিত্যের রস বিশ্লেষণ না হইয়া তাহার একদেশদর্শী আলোচনা বলিয়াই গণ্য হইবে।

'মেজদিদি' গল্পে শরৎচন্দ্রের প্রতিভার স্থায়ী আলোক না থাকিলেও তাহার বিদ্যুৎ-চমকানি আছে। উৎকৃষ্ট ছোট গল্প মাত্রেরই বৈশিষ্ট্য এই যে, তাহা বিচিত্রধর্ম্মী এবং বহুরূপী। কিন্তু যিনি নিপুণ শিল্পী অথবা প্রথম শ্রেণীর রসস্রষ্টা, তিনি সেই বহু বিচিত্রের মধ্যে এমন একটিকে আবিষ্কার করেন যাহার স্থায়ী রসের আস্বাদনে আমাদের সংবেদনশীল মন আশ্বস্ত হয়। জীবনের নিত্যধারায় যে বিরামহীন তরঙ্গগুলি উঠিতেছে ও পড়িতেছে, যাহা আমাদের ন্যায় সাধারণ মানুষের চক্ষে দৃষ্ট হয় না, এখানে তাহারই একটিকে অতিশয় স্থির দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিয়া শরৎচন্দ্র আমাদের সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়াছেন। এই বিষয়ে বিশদ আলোচনার পূর্ব্বে 'মেজদিদির' কাহিনী সংক্ষেপে বিবৃত করিতেছি।

'মেজদিদি'র কাহিনী সুরু হইয়াছে কেষ্টধন নামক চতুর্দ্দশ বৎসরের বালককে লইয়া। অল্প বয়সে মাতৃহীন হইয়া (তাহার পিতা ইতিপূর্ব্বেই পরলোক গমন করিয়াছে) অসহায় ও নিঃসম্বল কেষ্ট তাহার বৈমাত্রেয় ভগিনী কাদম্বিনীর গৃহে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছে। কাদম্বিনী এমন একজন গ্রাম্য নারী যাহার চরিত্রে উদারতা, পরোপকারীতা, স্বজন-প্রীতি ইত্যাদির লেশমাত্র নাই। নিজের পরিবারের সুখ ও সুবিধার জন্য, নিজের স্বার্থ ষোল আনা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য সর্ব্বদাই সে উন্মুখ। অতএব কেষ্টর আগমনে যে তাহার মানসিক সাম্যের ব্যাঘাত ঘটিবে ইহা নিঃসন্দেহ। কেষ্টকে সে প্রথম দর্শনেই সমাদর ও সান্ত্বনার পরিবর্ত্তে কটূক্তি ও অপমানসূচক বাক্য দ্বারা অভিনন্দিত করিল। বৈকালে যখন সে (কাদম্বিনী) কেষ্টকে দিয়া গৃহস্থের পরিধেয় ময়লা কাপড়-গুলি পরিষ্কার করাইতেছিল, সেই সময় তাহার মেজজা হেমাঙ্গিনী পাশের বাড়ী হইতে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল এবং মনে মনে কাদম্বিনীর প্রতি ক্রুদ্ধ ও বিরক্ত হইয়া নিজের ভৃত্যকে ডাকাইয়া কেষ্টকে সেই কর্ম্ম হইতে অব্যাহতি দিল। অতঃপর কাদম্বিনী তাহাদের পরস্পরের পরিচয় করাইয়া দিলে হেমাঙ্গিনী এই অনাথ বালককে শুধু সস্নেহে আপনার বুকের কাছে টানিয়াই লইল না, উপরন্তু ঐ দিন সন্ধ্যাবেলায় তাহাকে নিজের গৃহে নিমন্ত্রণ

করিয়া সাদরে ভোজন করাইল। কেষ্টও এই মহীয়সী মহিলার আন্তরিকতাপূর্ণ আচরণে মুগ্ধ হইয়া শ্রদ্ধাবনত-চিত্তে তাহার নিকট আপনাকে সমর্পন করিল।

এদিকে কাদম্বিনী তাহাকে স্বামীর ধানচালের আড়তে ভৃত্যের কর্ম্মে বহাল করিল। 'সেখানে সে ওজন করে বিক্রী করে, চার-পাঁচ ক্রোশ পথ হাঁটিয়া নমুনা সংগ্রহ করিয়া আনে, দুপুর বেলা নবীন ভাত খাইতে আসিলে দোকান আগলায়।'

একদিন অতিরিক্ত বেলায় কেষ্ট অভুক্ত অবস্থায় নিদ্রিতা দিদির জাগরণের অপেক্ষায় বসিয়া থাকাকালে হেমাঙ্গিনী তাহাকে দেখিতে পাইয়া নীচে নামিয়া আসিল এবং কাদম্বিনীর কন্যার মুখে সকল কথা অবগত হইয়া, ব্যথিত চিত্তে ফিরিয়া গিয়া পরক্ষণেই তাহার জন্য এক বাটি দুধ আনিয়া দিল। ইহার পর হইতে তাহাদের স্নেহের সম্পর্ক গাঢ়তর আকার ধারণ করিল। হেমাঙ্গিনীর প্রতি কেষ্ট এরূপ অনুরক্ত হইয়া উঠিল যে তাহার জ্বরের খবর পাইলে সে তাহাকে অর্দ্ধপক্ব পেয়ারা দিয়া আসিল। কিন্তু এখানকার এই অকৃত্রিম স্নেহ প্রাপ্তি তাহার দিদির নিকট অসহ্য বোধ হইল। তাই দিদির নিকট তাহার ভাগ্যে পীড়ন পাওনা হইতে থাকিল। ইতিপূর্ব্বে কেষ্ট হেমাঙ্গিনীর নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল যে যখনই তাহার কোনও কিছুর প্রয়োজন হইবে, তখনই সে তাহা 'মেজ-দিদি'র নিকট চাহিয়া লইবে। এই প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করিয়া একদা অভুক্ত কেষ্ট তাহার মেজদিদির নিকট উপস্থিত হইয়া ক্ষুধার জ্বালা নিবারণ করিল। কিন্তু তাহার ভাগ্য এমনই মন্দ যে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া দুই জায়ের মধ্যে ভীষণ কলহ হইয়া গেল এবং কাদম্বিনী কর্ত্তৃক অর্দ্ধসত্য ও অসত্যের মিশ্রণে ইহা হেমাঙ্গিনীর স্বামী বিপিনের নিকট পরিবেশিত হইয়া এমন এক অবস্থার সৃষ্টি করিল যাহাতে বিপিন মনে মনে স্ত্রীর উপর ও বিশেষ করিয়া ঐ গলগ্রহ দুর্ভাগাটার উপর মর্ম্মান্তিক চটিয়া গেল। কিন্তু ইহার পরও কেষ্ট আত্মগোপনকারী পলাতকের ন্যায় হেমাঙ্গিনীর নিকট আসিয়া ক্ষুধিত অবস্থায় খাবার চাহিয়া লইতে ছাড়িল না। হেমাঙ্গিনী তাহাকে প্রথমে মৌখিক ভাবে ফিরাইয়া দিলেও আপনার স্নেহপূর্ণ স্বভাবের বশবর্ত্তী হইয়া পরক্ষণেই সকাতরে তাহাকে ডাকিয়া আপনার সম্মুখে আহার করিতে বসাইল। কিন্তু আহার সমাধা হইবার পূর্ব্বেই তথায় বিপিন আসিয়া উপস্থিত হইল। ফলে ভীত কেষ্ট অর্দ্ধভুক্ত অবস্থায় ছুটিয়া পলাইল। ইহার পর আরও একদিন কেষ্টকে উপলক্ষ্য করিয়া হেমাঙ্গিনীর সঙ্গে বিপিনের বিবাদ হইয়া গেল। হেমাঙ্গিনীও সেই সময় তাঁহাকে সম্মুখে পাইয়া মৃদু ভর্ৎসনা করিয়া প্রত্যহ তাহার নিকট আসিতে বারণ করিয়া দিল। তথাপি কেষ্ট তাহার মেজদিদিকে ছাড়িয়া বা তাহাকে না দেখিয়া স্থির থাকিতে পারিল না। তাই সে যখনই শুনিল যে হেমাঙ্গিনীর বুকে সর্দ্দি বসিয়া জ্বর হইয়াছে তৎক্ষণাৎ সে তাহার দিদির নিকট পুতুলনাচ দেখিবার অজুহাতে ছুটি লইয়া মেজদিদির শয্যাপার্শ্বে আসিয়া কাঁদিয়া ফেলিল এবং যাহাতে সত্বর সে নিরাময় হয় এই উদ্দেশ্যে গ্রামের জাগ্রতা বিশালাক্ষী ঠাকুরের নিকট যাইয়া পূজা প্রদানের প্রস্তাব করিল। কিন্তু তাহার এই সঙ্গোপনে আগমনের কথা কাদম্বিনীর জানিতে বাকী রহিলনা। ভগ্নীপতিও তাহার কর্ম্মে গাফিলতির জন্য বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে অমানুষিকভাবে প্রহার করিল। কিন্তু এত লাঞ্ছনা ও উৎপীড়নের পরও কেষ্টকে 'মেজদিদি'র প্রতি আকর্ষণ হইতে বিচ্যুত করিতে পারিল না। সে এই সকল অত্যাচার হইতে আত্মরক্ষার জন্য হেমাঙ্গিনীর গৃহেই ছুটিয়া আসিল। ক্ষোভে, দুঃখে, অভিমানে হেমাঙ্গিনীও তখন তাহাকে অভ্যর্থনা না করিয়া এক-প্রকার বিতাড়িত করিয়া দিল। ইহার পর অনুতপ্ত হেমাঙ্গিনী স্বামীর নিকট ব্যাকুলভাবে এই প্রার্থনা জানাইল যে,সে যেন কেষ্টকে তাহার আপনার করিয়া লইতে অনুমতি দেয়। তাহার স্বামী এই অনুরোধকে এড়াইয়া যাইবার উদ্দেশ্যে সঠিক কোন মতামত প্রকাশ করিল না। কিন্তু তাহার পরদিনই এমন এক অভাবনীয় ঘটনা ঘটিল যাহাতে কেষ্টর জীবনের সঙ্গে হেমাঙ্গিনীর জীবন চির-কালের জন্য অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা পড়িল। ঘটনাটি এই—হেমাঙ্গিনী দিনের বেলায় পথ্যের আয়োজন করিতেছিল। এমন সময় দেখিল তার জার পশ্চাতে কেষ্টকে কাণে ধরিয়া তাহার পুত্র পাঁচুগোপাল টানিয়া আনিতেছে এবং

তাহাদের পিছনে ভাসুর নবীন পর্য্যন্ত আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। অনেক বচসার পর তাহারা উচ্চকণ্ঠে এই কথাই প্রমাণ করিতে চাহিল যে, হেমাঙ্গিনীর অত্যধিক আদরের প্রশ্রয়েই কেষ্ট ভগ্নীপতির পাওয়া টাকা আদায় করিয়া তাহা খরচ করিতে সাহসী হইয়াছে। শুধু তাহাই নয়, তাহার হস্তস্থিত নির্ম্মাল্য ও প্রসাদ দেখাইয়া ইহাও তাহারা বুঝাইয়া দিল যে, কেষ্ট ঐ টাকা লইয়াই বিশালাক্ষীর পূজা অর্ঘ্য সমাপন করিয়াছে। কেষ্টর চৌর্য্যবৃত্তির জন্য হেমাঙ্গিনীই পরোক্ষভাবে দায়ী এই অভিযোগ শ্রবণ করিয়া সে তাহার প্রতি ক্রোধান্ধ হইয়া গেল এবং বিচার বিবেচনা জ্ঞান শূন্যা হইয়া কেষ্টর দুই গালে চড় বসাইয়া দিল এবং তাহার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আরোপ করিল যে নিশ্চয়ই চুরির মতলবেই সে তাহাদের বাড়ী যাতায়ত করে। কিন্তু কাদম্বিনী ও হেমাঙ্গিনী কেহই তখন বুঝিতে পারিল না যে ইহা তাহার অন্তরের কথা নয়। কেননা কেষ্টর প্রতি তাহার হৃদয়ে এমন স্নেহ সঞ্চিত হইয়াছে যাহা উন্মূলিত করা তাহার সাধ্যাতীত। তাই ঐদিন দুপুর বেলা ভাসুরের হস্তে কেষ্টর নির্দ্দয় প্রহার দেখিয়া সে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িল। সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিলে সে প্রথমেই স্বামীকে কেষ্টর সকল ভার তাহার উপর অর্পণ করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিল। পরদিন যখন শুনিল যে মার খাইয়া কেষ্টর জ্বর হইয়াছে তখন সে তাহাকে আপনার গৃহে লইয়া আসিবার প্রস্তাব করিল। কিন্তু সে প্রস্তাব যখন অনুমোদন লাভ করিল না তখন সে কেষ্টকে লইয়া গো-যানে আরোহণ করিয়া তাহার গ্রামের দিকে যাত্রা করিল। তখন হেমাঙ্গিনীর এই দৃঢ়তায় ভীত ও আশ্চর্য্যান্বিত বিপিন বাধ্য হইয়া কেষ্টর ভার গ্রহণ করিবার শপথ লইয়া মেজদিদিকে ফিরাইতে চলিল।

এবারে গল্পের অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক।

প্রথমতঃ 'মেজদিদি' এমন একটি গল্প যাহার ভাব-কল্পনায় একটি নিবিড় ঐক্যের সঙ্গে আছে করুণ এক রসের আবেদন। বস্তুতঃ এমন রসঘন গতিশীল কাহিনী শরৎচন্দ্রের খুব কম গল্পেই দেখা যায়। প্রথম হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত এই গল্পের গতি নাটকীয় অভিব্যক্তির ন্যায় আমাদের মনকে আবিষ্ট করে। ইহা যেন শরৎচন্দ্রের একটি তৃতীয় অঙ্কে-সম্পূর্ণ নাটক। অর্থাৎ আদি মধ্য অন্ত এই তিন অঙ্কের প্রচ্ছন্ন আঙ্গিকে ইহার কাহিনী গড়িয়া উঠিয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ ইহার গঠন কৌশলই কেবলমাত্র উৎকৃষ্ট নয়, ইহার চরিত্র তিনটিও নাটকীয় চরিত্রের ন্যায় বিকাশ লাভ করিয়াছে। কাদম্বিনী ও হেমাঙ্গিনী দুইটি টাইপ চরিত্র। এই জাতীয় চরিত্র রচনায় শরৎচন্দ্র যে কতখানি পারদর্শী তাহা এই গল্পের ক্ষুদ্র পরিসরেও প্রমাণিত হইয়াছে। কাদম্বিনী ও হেমাঙ্গিনী এই দুইটি চরিত্র বিপরীত ধর্ম্মী। অর্থাৎ একজন আর একজনের স্বভাব ও গুণাবলীর বিকল্প অধিকারিণী। তাই তাহাদের দ্বন্দ্ব সংঘাত যেমন অবশ্যম্ভাবীরূপে দেখা দিয়াছে, তেমনি সেই সংঘাতের পরিণাম যে-দারুণ অবস্থার সৃষ্টি করিতে পারে তাহাও লেখক সার্থকভাবে দেখাইয়াছেন। কেষ্টর দিদি কাদম্বিনী স্বার্থপরায়ণা গ্রাম্যবধূ। তাহার মধ্যে ঈর্ষা বিদ্বেষ অধিকমাত্রায় বর্ত্তমান। আত্মকেন্দ্রিক ও সীমাবদ্ধ জীবন যাপন করিতে করিতে তাহার চরিত্রের কোমলতা নারীহৃদয়ের সহজ সরল ভাবালুতা ইতিপূর্ব্বেই কঠিন আকার ধারণ করিয়াছিল। তাহার উপর আবার যখন বিনামেঘে বজ্রাঘাতের ন্যায় বৈমাত্রেয় ভ্রাতাকে তাহারই গলগ্রহ হইতে উদ্যত দেখিল তখন তাহার মনুষ্যত্বের স্বাভাবিক অনুভূতির শেষ বাষ্পটুকু পর্য্যন্ত হিংসা, ক্রোধ ও ঘৃণার মেঘরূপে মনের আকাশে উড়িয়া গেল। বৈমাত্রেয় ভাইকে দেখিয়া সৎমার উদ্দেশে তার যে-উক্তি প্রথমেই পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তাহা হইতে সহজেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, কাদম্বিনী-চরিত্রকে লেখক কোন্ ধাতুতে গড়িয়া তাহাদের সম্মুখে উপস্থাপিত করিতেছেন। সেই উক্তিটি এই—"বজ্জাৎ মাগী জ্যান্তে একদিন খোঁজ নিলে না, এখন মরে গিয়ে ছেলে পাঠিয়ে তত্ত্ব করেছেন।"

'নীলচক্ষু-দানবে'র (ঈর্ষার) দুরন্ত প্রভাব কেষ্টর প্রতি কাদম্বিনীর অনাদর ও অসহিষ্ণুতাই জাগাইয়া তুলে নাই, পরন্তু তাহার উপর অমানুষিক উৎপীড়নেরও অবিসম্বাদী অধিকার প্রদান করিয়াছিল। সে আরও বুঝিয়াছিল যে, নিরুপায় বৈমাত্রেয় ভাইকে অখ্যাতির ভয়ে

তাড়াইয়া দেওয়াও যায় না, বিলাইয়া দেওয়াও যায় না। সুতরাং যখন রাখিতেই হইবে, তখন যতদিন তাহার দেহ রহে, ততদিন কষিয়া খাটাইয়া লওয়া ঠিক।'

অপর পক্ষে হেমাঙ্গিনীর চরিত্র সারল্য, ঔদার্য্য, পরোপচিকীর্ষা বিচক্ষণতা ইত্যাদির আধার। অর্থাৎ কাদম্বিনীর ন্যায় আত্মস্বার্থানুসন্ধিনী, পরশ্রীকাতরতা ও কৃপণস্বভাবা স্ত্রীলোক সে নয়। তার পরিচয় প্রদান প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্র অল্প কথায় তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যটি সুন্দরভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন—"মেজ বৌ হেমাঙ্গিনী সহরের মেয়ে। পয়সা বাঁচাইয়া গরিবীচালে চলে না বলিয়াই বছর চারেক পূর্ব্বে দুই জায়ে কলহ করিয়া পৃথক হইয়াছিল। সেই অবধি পরস্পরের অনেক কলহ হইয়াছে এবং হয় তো এই কলহের মূলে হেমাঙ্গিনীই প্রথম অগ্রসর হইয়াছে তথাপি বড় জায়ের সহিত প্রত্যেক বার সেই আপোষরফা করিয়াছে। অর্থাৎ হেমাঙ্গিনী আপনার সংসারের সুখ সাচ্ছন্দ্য সম্বন্ধে বিশেষ ব্যগ্রতা বা ইচ্ছা প্রদর্শন করে না। তাহার মধ্যে ভোগ আকাঙ্ক্ষা অপেক্ষা ত্যাগের ইচ্ছাই প্রবল। 'ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা' উপনিষদের এই বাণী যেন তাহার জীবনেরও প্রধান ব্রত। তার চরিত্রের সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বিষয় তার নারীত্বের মহনীয়তা অর্থাৎ নারীর হৃদয়ের স্নেহ, প্রেম, দয়া, মায়া, ক্ষমা ইত্যাদি তাহার মধ্যে সমানভাবে বিদ্যমান। সর্ব্বোপরি তাহার সর্ব্বাশ্রয়ী মাতৃত্ববোধ যাহা সকল অবস্থায় সকল মানুষকে (আত্মীয় অনাত্মীয় ভেদে) আপনার স্থানে নিকটে টানিয়া লয়, সেই মহত্বের গৌরবময় মূর্ত্তি এই কাহিনীর উপর দিব্য আলোক প্রতিফলিত করিয়াছে। এই মাতৃত্বের সহজাত অনুভূতিই কেষ্টকে তাহার নিকটে টানিয়া আনিয়াছে। যৌবনে পদার্পণ করিবার পূর্ব্বে যে সরল অনভিজ্ঞ বালক পিতৃ-মাতৃহীন হইয়া সংসারের কঠিন বাস্তবের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হৃদয়ে প্রাণ ধারণের অন্য উপায় না দেখিয়া বৈমাত্রেয় ভগিনীর আশ্রয়ে আসিয়া বুঝিতে পারিল যে, সেখানেও তাহার দুরবস্থার উপশম হওয়া দূরে থাক বরং ফুটন্ত কড়াই হইতে জলন্ত অঙ্গারে লাফাইয়া পড়ার মত দুঃসাহসিক ও মূঢ় প্রচেষ্টায় তাহার দুঃখের পরিমাণ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়াই চলিয়াছে—সেই অভিমানক্ষুব্ধ আত্মধিকৃত, অপমানিত কিশোর যখন এমন একজনকে অবলম্বন পাইল যে তাহার ব্যথিত হৃদয়কে কেবল মৌখিক সান্ত্বনাই দেয় না, বরং তাহা দুঃখ ব্যথাকে আপনার মরমে উপলব্ধি করিয়া অপত্যস্নেহে আপনার অঙ্কে স্থান করিয়া দেয়, তখন তাহাকে সে মৃত্যুর চেয়েও ভয়ঙ্কর যে লাঞ্ছনা তাহারই হস্ত হইতে ত্রাণকর্ত্রীরূপে গ্রহণ করিল। অর্থাৎ মাতার মৃত্যুতে কেষ্টর জীবনে যে বিরাট গহ্বর সৃষ্টি করিয়াছিল হেমাঙ্গিনীর মাতৃস্নেহে তাহা পুনরায় পরিপূর্ণ হইয়া তাহার হতাশার ভগ্নোদ্যম হৃদয়কে নূতন আশায় উদ্দীপিত করিয়া তুলিল। জীবনে একবার মাতৃহারা হইয়া তাহাকে যে দুর্দ্দশায় পড়িতে হইয়াছিল, দ্বিতীয়বার যাহাতে তাহাকে সেই সঙ্কটাপন্ন অবস্থার সম্মুখীন না হইতে হয় সেই আশঙ্কায় সে মেজদিদির সামান্য অসুস্থতায় যেমন বিচলিত হইত, তেমনি অসুখ বৃদ্ধি পাইলে যাহাতে দেবতার অনুগ্রহে সে শীঘ্রই আরোগ্য লাভ করে, সে জন্যও কেষ্ট চিন্তিত থাকিত। কেননা মানুষ যত শক্তিরই অধিকারী হউক অথবা যত সুখই ভোগ করুক, শেষ পর্য্যন্ত তাহার ভাগ্য যে দৈবায়ত্তাধীন, অনেক দুঃখে কেষ্ট ইহা বুঝিতে শিখিয়াছিল। বস্তুতঃ কেষ্ট তখন স্বর্গের অভিশপ্ত এক দেবশিশু—দৈবরোষ যাহাকে অমরার সুখসম্পদ হইতে বঞ্চিত করিয়া ধূলার ধরণীতে ঠেলিয়া দিয়াছে মর্ত্ত্যবাসীর দুঃখে সমান অংশ গ্রহণ করিবার জন্য। অথবা তাহার দুঃখের অংশ হয়তো কিছু বেশী পরিমাণেই বলিয়া মনে হয়। কথায় বলে—অভাগা যেদিকে চায় সাগর শুকায়ে যায়। কেষ্টর জীবনেও এই প্রবচন প্রযোজ্য। হেমাঙ্গিনীকে লাভ করিয়া তাহার মুমূর্ষু প্রাণে নবজীবনের আশা জাগিল বটে, কিন্তু এই আশা মরিচীকা। কারণ মেজদিদির নিকট অকৃত্রিম স্নেহ লাভ করিলেও সে নিরবচ্ছিন্ন সুখ উপভোগ করিতে পারিল না। যে হস্ত তাহার ক্ষতে প্রলেপ লাগাইয়া দিতেছিল, তাহারই অনবধান চালনায় মাঝে মাঝে সেই ক্ষতের ভিতরকার বেদনা টন্ টন্ করিয়া উঠিতে লাগিল। তথাপি বাত্যান্দোলিত বৃক্ষচূড়স্থনীড়ে বিহঙ্গ যেমন পক্ষ মেলিয়া আপনার

শাবককে প্রাকৃতিক দুর্বিপাক হইতে রক্ষা করিতে চেষ্টা করে, তেমনি হেমাঙ্গিনীও বাহিরের সকল প্রতিকূলতা হইতে কেষ্টকে নিরাপদ রাখিতে যথেষ্ট ত্যাগ ও মহত্ত্বের পরিচয় দিয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে হেমাঙ্গিনীর অনমনীয় দৃঢ়তা, অন্যায়ের প্রতিবাদে দণ্ডায়মান হইবার সাহসিকতা তাহার চরিত্রকে এক অনবদ্য মহিমায় মহিমান্বিত করিয়াছে। কোন প্রকার অন্যায়কেই সে কখনও বরদাস্ত করিতে পারে না। যে কোনও ব্যক্তি অন্যায় করিলেই (তাহা সে হেমাঙ্গিনীর গুরুজন স্থানীয় হইলেও) অকপট তীক্ষ্ণতায় সে তাহার প্রতিবাদ করিত। কাদম্বিনী নিজের পুত্র পাঁচুগোপালের সঙ্গে কেষ্টর তুলনায় দেবতা ও বানরের তুলনা করিলে হেমাঙ্গিনী তৎক্ষণাৎ জবাবে বলিয়াছে, কে দেবতা, কে বাঁদর সে আমি জানি। কিন্তু আর আমি কিছুই বলব না দিদি, যদি বলিত এই যে তোমার মত নিষ্ঠুর, তোমার মত বেহায়া মেয়েমানুষ আর সংসারে নেই।' আবার কাদম্বিনী যখন কেষ্টকে অতিরিক্ত প্রশ্রয় দানের অভিযোগে হেমাঙ্গিনীকে দোষী সাব্যস্ত করিতেছে, তখনও সে ভাসুরের উপস্থিতিতেই বড় জাকে সম্বোধন করিয়া মৃদু অথচ কঠিন স্বরে বলিল, "তুমি এত বড় চামার যে, তোমার সঙ্গে কথা কইতেও আমার ঘৃণা বোধ হয়। তুমি এত বড় বেহায়া মেয়েমানুষ যে, ঐ ছোঁড়াটাকে ভাই বলেও পরিচয় দিচ্ছ। মানুষ জানোয়ার পুষলে তাকেও পেট ভরে খেতে দেয়, কিন্তু ঐ হতভাগাটাকে দিয়ে যতরকমের ছোট কাজ করিয়ে নিয়েও তোমরা আজ পর্য্যন্ত একদিন পেট ভরে খেতে দাও না। আমি না থাকলে এতদিনে ও না খেতে পেয়েই মরে যেত।"

স্বামীর প্রতি হেমাঙ্গিনীর অচলা ভক্তি কখনও ক্ষুণ্ণ হইতে দেখা যায় নাই। কিন্তু সেই স্বামী যখন অন্যপক্ষ অবলম্বন করিয়া অন্যায়কে সমর্থন করিয়াছে, তখন হেমাঙ্গিনী তাহার কর্তৃত্ব বা আদেশকে অগ্রাহ্য করিতে কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ করে নাই। একবার কাদম্বিনীর চক্রান্তে ভুলিয়া বিপিন তাহার নিকট গুরুজনের যথোচিত মানমর্য্যাদা লঙ্ঘনের অভিযোগ করিল বা ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিয়া স্বামীকে এই কথা শুনাইয়া দিল, "গুরুজন নিজের মান নিজে নিঃশেষ করে আনলে আমি কি দিয়ে ভর্ত্তি করব।"

হেমাঙ্গিনীর চারিত্রিক দৃঢ়তা এবং গাম্ভীর্য্য কাহিনীর শেষ পর্য্যন্ত সমানভাবে বর্তমান। তাহার অন্তরে কোন প্রকার কর্তৃত্বের আকাঙ্ক্ষা নাই—আছে এক অনমনীয় অভিমান। স্বামীর সহধর্ম্মিণীরূপে সংসারে তাহার সমান অধিকার থাকাই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু কোনদিন সে সেই অধিকারের দাবী উত্থাপন করে নাই। মাতৃহীন কেষ্টকে সে পুত্রের ন্যায় ভালবাসিয়াছিল এবং আশা করিয়াছিল তাহার স্বামীর সংসারে অন্যান্য পুত্রদের সঙ্গে ইহারও একটুকু স্থান হইয়া যাইবে। কিন্তু যখন অনেক অনুরোধ, কাকুতিমিনতির পরও দেখিল যে, তাহার স্বামী তাহার এই সামান্য আব্দার রক্ষা করিতে অরাজী তখন সে মর্ম্মাহত হইয়া গভীর বেদনায় কেষ্টকে লইয়া চিরকালের জন্য স্বামীর সংসার ত্যাগ করিয়া নিরুদ্দেশের পথে বাহির হইল। তাহার সেই অটল অকম্পিত মূর্তিকে লক্ষ্য করিয়াই বিপিনের এই কথা মনে পড়িয়াছিল—'এ মেজবৌ সে নয়, যাহাকে চোখ রাঙাইয়া টলান যায়।' 'মেজদিদি' সম্বন্ধে আলোচনাকালে স্বভাবতঃই পাঠকের মনে যে প্রশ্নের উদয় হয় তাহা হেমাঙ্গিনী চরিত্রের বাস্তব সত্যতা। অর্থাৎ পাঠকগণ এই গল্পের আনুপূর্ব্বিক রস-বৈচিত্র্য উপলব্ধি করার পর ইহার কাহিনীর অস্বাভাবিক পরিণতির প্রতি যথেষ্ট সন্দেহ প্রকাশ করেন। তাঁহাদের মতে মেজদিদির কেষ্টর জন্য স্বামীর গৃহ ত্যাগ করিয়া তাহারই গ্রামের দিকে যাত্রা করার ব্যাপারটি শুধু অভাবনীয় নহে, ইহা লেখকের দুর্ব্বল রচনারীতিরও পরিচায়ক। আমি অতঃপর সংক্ষেপে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিব।

প্রথম, হেমাঙ্গিনী চরিত্রের বাস্তব সত্যতা সম্বন্ধে যাঁহারা সন্দিহান হইবেন তাঁহাদের সম্বন্ধে একথা বলা যায় যে তাঁহারা শরৎচন্দ্রের সহমর্ম্মিতা লাভ করেন নাই। যে-গভীর রসানুভূতি ও ভাব-কল্পনা শরৎচন্দ্রকে এই চরিত্র রচনায় অনুপ্রাণিত করিয়াছিল তাহা নারীর সেই স্বাভাবিক হৃদয়াবেগ যাহা মাতৃস্নেহের নির্ঝর ধারায় প্রবাহিত হইয়া আমাদের সকল দুঃখ, সকল বেদনাকে

ধুইয়া মুছিয়া ফেলিয়া জীবনকে এক আনন্দময় শুভ্র ও সুন্দর মূর্ত্তিতে প্রকাশিত করে। শরৎচন্দ্র জীবনশিল্পী। অর্থাৎ জীবনের জয়গান করাই তাঁহার সাহিত্যের অন্যতম উদ্দেশ্য। যাহা প্রত্যক্ষ তাহাকে তিনি যে-দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন সে তাঁহার অতি সূক্ষ্ম ভাবদৃষ্টি বা কবি দৃষ্টি। এই দৃষ্টি সকল লেখকের থাকে না। যাঁহারা এই দৃষ্টির অধিকারী তাঁহাদের রসানুভূতি সাধারণের চেয়ে সূক্ষ্ম এবং তাঁহাদের অভিজ্ঞতা সাধারণের চেয়ে সুদূরপ্রসারী। সেক্সপীয়রের রাজপুত্র হ্যামলেট এই রসানুভূতির ও অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ করাইয়াই তাহার মিত্র ও সহচর হোরেশিওকে বলিয়াছিল—স্বর্গে এবং মর্ত্ত্যলোকে এমন অনেক ঘটনা ঘটে যাহা তোমার ধারণা বা বুদ্ধির অতীত। শরৎচন্দ্রের হেমাঙ্গিনী সম্বন্ধেও এই কথা প্রযোজ্য।

হেমাঙ্গিনীর সহিত কেষ্টর একটি সহজ মাতৃত্বের সম্পর্ক গড়িয়া উঠিয়াছিল। প্রথমে তাহা পরোক্ষভাবে থাকিয়া ধীরে ধীরে কাজ করিতেছিল। অর্থাৎ বাহিরের বাধা হেমাঙ্গিনীকে এই স্নেহের আকর্ষণ হইতে ছিন্ন করিবার চেষ্টা করিলেও সফলতা লাভ করে নাই। কিন্তু অন্তরের বাধা আসিয়া যে দিন তাহার পথ রোধ করিল তখন সে নিজেকে উন্মুক্ত করিয়া দিয়া করজোড়ে স্বামীর নিকট এই প্রার্থনা জানাইল—"তোমায় দিব্বি ক'রে বলছি, ওকে আমি পেটের ছেলের মত ভাল বেসেছি। দাও আমাকে—মানুষ করি—খাওয়াই, পরাই—তারপরে যা ইচ্ছে হয় তোমাদের, তাই ক'রো। বড় হ'লে আমি একটি কথাও ক'ব না।" এই সামান্য অনুরোধ যখন রক্ষিত হইল না, তখন তাহার সহনশীলতার ধৈর্য্যচ্যুতি হইল এবং সে নিরুদ্দেশের পথে পদচারণা করিল।

শরৎচন্দ্রের কোনও নারী স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া অন্যায়ের আশ্রয় লয় না। কিন্তু যাহাকে অন্যায় বলিয়া একবার জানিতে পারে তাহার নিকট পরাভব স্বীকার করা তাহাদের স্বভাববিরুদ্ধ। তাই হেমাঙ্গিনী কেষ্টকে সঙ্গে করিয়া বাহির হইলে অনুতপ্ত স্বামী যখন আসিয়া তাহাকে ফিরিয়া আসিবার সময় জিজ্ঞাসা করিল, তখন সে গম্ভীর দৃঢ় কণ্ঠে উত্তর দিল, "ভগবান যখন ফেরাবেন তখনই ফিরব।" তাহার এই প্রকার উত্তরে স্বামী বিস্ময় প্রকাশ করিলে সে পুনরায় কেষ্টকে দেখাইয়া বলিল, "কখন যদি কোথাও এর আশ্রয় জোটে, তবেই ত একা ফিরে আসতে পারব, না হয় একে নিয়েই থাকতে হবে।" ইহার উপর আর মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। অসহায় সন্তানকে ত্যাগ করিয়া কোন্ জননী বাঁচিয়া থাকিতে পারে? তাই যে কেষ্টর আশ্রয় তার স্বামীগৃহে মিলিল না, তাহাকে অন্য কোনও নিরাপদ ও নিরুপদ্রুত স্থানে লইয়া যাইতে হইলে হেমাঙ্গিনীর এই ত্যাগ করিয়া যাওয়া ভিন্ন আর কি উপায় হইতে পারে? সুতরাং এই দিক দিয়া বিচার করিলে শরৎচন্দ্রের কাহিনী যে স্বাভাবিক সমাপ্তি লাভ করিয়াছে, এ বিষয়ে দ্বিমত থাকিতে পারে না।

THE RAMAKRISHNA MISSION

LIBRARY
CALCUTTA

সম্মুখ সমরে

সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

হয়তো এমনিই হয়।

কতো কারণে কতো মানুষের বুকে ফুলে ফুলে ওঠে দীর্ঘশ্বাস। মোহ ঠিক নয়—মানুষের নতুন উপলব্ধি। তাই পুরাণো ঘর ভাঙে—দেশে দেশে গ'ড়ে ওঠে নতুন বাসর।

কিন্তু পিছন কি সহজে ছাড়ে!

পাড়ার নাম এলিফ্যাণ্ট এণ্ড ক্যাসেল। বেকার লু লাইনের টিউব ষ্টেশন। নাম জাঁকালো হ'লেও লণ্ডনের দীন অপরিচ্ছন্ন পল্লী। ইষ্ট এণ্ড বলা যায়। আদব-কায়দার ধার ধারে না এ পাড়ার লোক তাই দিন রাত গোলমাল লেগেই আছে।

এ পাড়ার কোনো বোমা-বিধ্বস্ত বড়ো বাড়ীর ছোট একটা ঘরে হরেন সরকারের সংগে অশোক থাকে। ওরা তেতলায় থাকে বলে ওদের সংগে দেখা পেতে চাইলে তিনবার কলিং বেল বাজাতে হয়।

খুব সকালে পোষ্টম্যান বাক্সে চিঠি ফেলে বেল্ টিপে জানিয়ে যায় যে—তোমাদের চিঠি আছে। আওয়াজ শুনেই হরেন সরকার ড্রেসিং গাউন গায়ে দিয়ে নিচে নেমে আসে। ভারতবর্ষ থেকে আসা এয়ার লেটার হ'লে নাম—ঠিকানা না পড়েই অশোকের হাতে দিয়ে বলে, তোর চিঠি।

সেদিন কিন্তু অশোক চিঠি খুললো না। উল্টে-পাল্টে হরেন সরকারকে বললো, এ চিঠি আমার নয়. আপনার—নিন।

আমার? অবাক হ'য়ে হরেন সরকার বললো, এয়ার লেটার? ভারতবর্ষ থেকে—

হ্যাঁ, হাত বাড়িয়ে চিঠিটা তার দিকে এগিয়ে দিয়ে অশোক বললো, ফ্রম্ বন্দনা ঘোষ।

সে কে? দে তো দেখি—

হরেন সরকার চিঠি পড়তে লাগলো। পড়তে পড়তে তার হাত কাঁপতে লাগলো, মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেলো। দীর্ণ স্বরে শুধু বললো, অশোক আমায় ধর, আমি—আমি বোধ হয় প'ড়ে যাবো—

ইষ্টএণ্ডের বোমা খাওয়া বাড়ীর ছোট্ট একটা ঘরে হরেন সরকারের সংগে অশোক থাকবে শুনে তার বন্ধু-বান্ধবরা অবাক হ'য়ে গিয়েছিলো। প্রথম কথা, ওই পাড়াতে সে লোককে নেমন্তন্ন করবে কেমন করে! ঠিকানা শুনেই তো সকলে নাক সিঁটকোবে। দ্বিতীয়ত, নিজে রেঁধেবেড়ে খেতে হবে যেটা অশোকের পক্ষে অসম্ভব। তৃতীয়ত, ওই বাড়ীতে ঘরে ঘরে নানা রকম লোকের বাস—বাথরুম মাত্র একটি, কার কি রোগ আছে ঠিক নেই। ইচ্ছে ক'রে অশোক বিপদ ডেকে আনছে।

কেউ কেউ বললো, শেষে কি বিদেশে থাইসীসে মরবে?

আর একজন বললো, ওটা গুণ্ডার পাড়া, মাথা ফাটবে যে।

—শোনো অশোক, শুনেছি হরেন সরকার লোক ভালো নয়।

এসব কথার উত্তরে হেসে অশোক বলেছিলো, সব জানি আমি। খুব সুখেই ছিলাম ইংরেজ পরিবারে। কিন্তু আমাকে এলিফ্যাণ্ট এণ্ড ক্যাসেলে যেতে হচ্ছে খরচ বাঁচাবার জন্যে। বাড়ী থেকে মাসে দেড়শো টাকার বেশী আর আসবে না। কাজেই যেমন অবস্থা তেমন ব্যবস্থা করতে হবে তো—

তারপর কোন এক রবিবারে একটা ট্যাক্সি ডেকে মালপত্র চাপিয়ে অশোক ড্রাইভারকে বললো, এলিফ্যাণ্ট প্লিজ—

ঘর সে আগেই দেখে গিয়েছিলো। তবু আজ সত্যি বাস করতে এসে আর একবার চারদিকে ভালো

ক'রে তাকিয়ে দেখলো। অবশ্য দেখবার বিশেষ কিছুই নেই। চারপাশে জমেছে পুরু ধুলো। ইতস্তত ছড়ানো এঁটো বাসন-পত্র। টেবিলের উপর বাটিতে রান্না করা মাংস। আলু কপি আর কাঁচা পেঁয়াজের ঝুড়ি ঝুলছে খাটের কাছে। ঘরে দু'টো খাট। আর একটা বোধ হয় হরেন সরকার বাড়ীওয়ালাকে ব'লে অশোকের জন্যে আনিয়েছে। কিন্তু এতো নোংরা যে সহজে অশোকের ঘুম আসবেনা। রাস্তা দিয়ে গাড়ী গেলে ঘর রীতিমতো কাঁপে।

—বসুন বসুন, হরেন সরকার বললো, মন খারাপ হ'য়ে গেলো নাকি?

—না না, এই বসছি।

—প্রথমে একটু মন খারাপ হবেই, তারপর দেখবেন সব ঠিক হ'য়ে যাবে। কুড়ি বছর রয়েছি লণ্ডনে, এতো সস্তায়, বুঝলেন অশোক বাবু, কোথাও থাকা যায় না। সিগ্রেট না খেলে অনায়াসে একশো টাকায় মাস চ'লে যাবে। দেশের সুসন্তান আপনারা—আমাদের গৌরব, কি হবে এখানে দেশের টাকা খরচ ক'রে? তার চেয়ে একটু কষ্ট করলে যদি একশো টাকায় চালানো যায়—কেমন কিনা?

—নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই।

—দু'জনে আমরা সুখেই থাকবো। আমি তো সকাল ন'টায় বেরিয়ে যাই, ঘর তো আপনি একাই ভোগ করবেন। তবে রান্নাবান্না করতে একটু অসুবিধা হবে আপনার।—একটু থেমে হরেন সরকার বললো, অসুবিধা আর কি, দু'জনে মিলে সব ঠিক ক'রে নেবো। বিলেতে আর রান্নার হাঙ্গামা কি, ঘরে গ্যাসের রিং রয়েছে—আধ-ঘণ্টার মধ্যে সব হ'য়ে যাবে।—তার কথা অশোক শুনছিলো কিনা ঠিক বোঝা গেলো না। চারপাশে তাকিয়ে ও যেন বেশ দ'মে গেছে। এই প্রায়ান্ধকার ঘরে ওর বোধ হয় হঠাৎ একদিন দম বন্ধ হ'য়ে যাবে আর এই নোংরার মধ্যে ভ্যাপসা গন্ধে ও পড়াশুনোই বা করবে কেমন ক'রে! এ ঘরে যে ওর খেতেও ইচ্ছে করবে না। এ কি করলো অশোক! কোথা থেকে কোথায়! ওর চোখ ঠেলে কান্না আসছিলো। কিন্তু না, এ সময় ছেলে-মানুষী মানায় না। বেশী টাকা আর সে পাবে না—খরচ কমাইতেই হবে।

তবু অনেক চেষ্টা করা সত্ত্বেও কিছুতেই সে-রাত্তিরে অশোকের ঘুম এলো না। কারণ এই ঘরে নোংরা বাসনে কিছুই সে খেতে পারেনি। চারপাশে তাকিয়ে তার গা গুলিয়ে উঠেছিলো। বিছানায় দারুণ গন্ধ, ওর নাকে জ্বালা ধ'রে গেলো। তার ওপর তাকে বাসন ধুতে যেতে হ'য়েছিলো বাথরুমে। কথাটা অশোক আগে জানতো না। অর্থাৎ যে টবে চান করা হয়, এ বাড়ীর প্রত্যেকটি ভাড়াটে সেই টবেই বাসন মাজে। হয়তো কোনোদিন চান করতে গিয়ে সে দেখবে টবের মধ্যে প'ড়ে আছে ছোট একটি হাড় কিংবা মাছের কয়েকটা কাঁটা—ভাবতেই অশোকের গা ঘিনঘিন ক'রে উঠলো। ওদিকে গাড়ীর আওয়াজে ঘর মিনিটে মিনিটে কাঁপছে। আর কে যেন হাতুড়ীর বাড়ী মারছে অশোকের মাথায়। অথচ, সে অবাক হ'লো, পাশের খাটে হরেন সরকার দিব্যি আরামে নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে। কেমন ক'রে মানুষ এখানে অমন ক'রে ঘুমোতে পারে সে কথা কিছুতেই সে ভেবে পেলো না। অসহায়ের মতো একটার পর একটা সিগ্রেট খেয়ে যেতে লাগলো শুধু।

রাত বোধ হয় অনেক হবে! তবু বাইরে হট্টগোলের বিরাম নেই। মাতালের দল রবিবার উপভোগ করছে। অশোকের মনে হ'লো সে কি সত্যি এখনো লণ্ডনে আছে! তবু সিগ্রেট শেষ ক'রে সে আর একবার ঘুমোবার চেষ্টা করলো।

তার সিগ্রেট নিভে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে খুট করে একটা শব্দ হলো। তারপর আবার খুট্—খুটুর—খুট্‌খুট্—

এ আবার কি! সেই শীতেও ঘেমে উঠলো অশোকের কপাল। ভূত না চোর? যেমন পাড়া আর যেমন পোড়ো বাড়ী—কিছুই অসম্ভব নয় এখানে। শব্দ বেড়েই যেতে লাগলো।

—মিঃ সরকার? অশোক ডাকলো, শুনছেন? সরকার মশাই—

—কি, কি, কি ব্যাপার? ধড়মড় করে উঠে বসলো হরেন সরকার।

কিসের শব্দ হচ্ছে এ ঘরে ?

শব্দ, কই ?

এখন থেমে গেছে, কিন্তু একটু পরেই আবার হবে, আমি আধঘন্টা ধরে শুনছি। একটু চুপ ক'রে থাকুন··· ওই···ওই শুনছেন ?

হরেন সরকার শব্দ শুনে আবার শুয়ে পড়লো, আরে দূর মশাই, ওতেই আপনি চমকে উঠছেন ?

হ্যাঁ হ্যাঁ, ও কিসের শব্দ ?

ইঁদুর মশাই ইঁদুর।

য়্যাঁ—বিলেতে ইঁদুর, কামড়াবে না তো ?

কি জানি, হরেন সরকার নিশ্চিন্ত হয়ে পাশ ফিরলো।

শেষ রাত্তিরে তবু ঘুম এসেছিলো অশোকের। কিন্তু বেশীক্ষণ নয়—হাঠাৎ তন্দ্রা ছুটে গেলো। হরেন সরকার উঠে বসে ভীষণভাবে হাঁপাচ্ছে।

ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলো অশোক, কি হলো মিঃ সরকার ?

ঘুম ভাঙিয়ে দিলাম আপনার, দুঃখিত। কিছু মনে করবেন না অশোক বাবু, হাঁপানি আছে কি না তাই মাঝে মাঝে বড়ো কষ্ট হয়—

এমনি ক'রেই সে রাত ভোর হলো।

ঠিক বলেছিলো হরেন সরকার। লণ্ডনের অন্য কোথাও এতো কম খরচে চালানো অসম্ভব। কষ্ট একটু প্রথম প্রথম হয় বটে, কিন্তু পরে সব ঠিক হয়ে যায়। আস্তে আস্তে এই ভাঙাচোরা পোড়োবাড়ীতেই ওর মন দিব্যি বসে গেলো। আজকাল আর অশোকের গা ঘিন ঘিন করে না, রেঁধে বেড়ে তৃপ্তির সঙ্গে খেয়ে মনের আনন্দে সে পড়াশুনো করে।

কিন্তু থেকে থেকে হরেন সরকারকে তার কেমন যেন রহস্যময় বলে মনে হয়। বেঁটে ছোটখাটো মানুষ। চোখে সস্তা চশমা। বয়স পঞ্চাশ পার হয়েছে। অশোকের মনে হয় তার মন যেন গভীর অভিমানে ভ'রে আছে। কোনোদিন কি সে দেশে ফিরবে না ? দেশে কি তার কেউ নেই, এমন কোনো আত্মীয় যারা প্রতিদিন বোধ করে তার অভাব। হয় তো নেই। কিন্তু তবুও চিরকাল সে কি কাটাবে এই সঙ্কীর্ণ গ্যারাটে। অশোক ভাবলো, একদিন সুযোগ বুঝে প্রশ্ন করতে হবে।

কি হে ভায়া, এখন আর খারাপ লাগে কি ? তালি দেওয়া কালো ড্রেসিং গাউন গায়ে দিয়ে রান্না করতে করতে একদিন সন্ধ্যেবেলা হরেন সরকার জিজ্ঞেস করলো।

কি যে বলেন সরকার মশাই, হেসে বললো অশোক, এমন আরামে স্বাধীনভাবে আর কোথায় থাকবো! ইংরেজ পরিবারের খাওয়ায় কি আমাদের পেট ভরে! আমি তো যে-কদিন লণ্ডনে আছি, এখান থেকে আর নড়ছি না।

আর কতোদিন থাকা হবে বিলেতে ?

বছর দুয়েক—আপনি ?

আমি ? যেন ভীষণ অবাক হলো হরেন সরকার। বোধ হয় আজকাল কেউ আর তাকে এ প্রশ্ন করে না। জোরে হেসে উঠে বললো, আমি যাবো কোথায় ?

কেন, দেশে ?

দেশ তোমাদের, আমার নয়।

কেন সরকার মশাই ?

কারণ—না থাক। আজ নয়। যদি কোনোদিন ইচ্ছে হয় তোমাকে বলবো—শুনো, সে এক আশ্চর্য্য গল্প—প্রাণপণে কি যেন বলবার চেষ্টা করলো হরেন সরকার, কিন্তু পারলো না, হাঁপাতে হাঁপাতে শুয়ে পড়লো।

বেশী দিন অপেক্ষা করতে হ'লো না অশোককে। এক তুষার রিমঝিম করা দিশাহারা সন্ধ্যায় সহসা মুখের বাঁধন খুলে গেলো হরেন সরকারের আর গল্প বলতে বলতে বার বার তার চোখ দু'টো ভারী হ'য়ে উঠছিলো —দেহ কেঁপে উঠছিলো সুতীব্র উত্তেজনায়।

ঠিক এমন ক'রে এই গ্যারাটে কুকুর—বেড়ালের মতো আমার থাকবার কথা নয় অশোক। আমি যদি জীবনের সত্যকে স্বীকার না ক'রে আর পাঁচজনের মতো শুধু অভিনয় ক'রে যেতে পারতাম, তা হ'লে একটি লোকও

আমাকে দোষ দিতো না। কিন্তু আর কেউ না মানুক আমি জানি কোনো অন্যায় আমি করি নি, আমি শুধু আমার সত্যকে মেনে নিয়েছি।

তুমি আমার চেয়ে বয়সে অনেক ছোটো— তোমাকে আমার প্রেমের ইতিহাস বলা শোভা পায় না। তবু বলবো, কারণ অন্ততঃ একটি লোকও জানুক যে, আমি কাউকে প্রবঞ্চনা করি নি, কাউকে অপমান করি নি—না, না, অশোক, আমার জীবনের দ্বিতীয় প্রেম অন্যায় নয়।

আজ থেকে বিশ বছর আগে আমার স্ত্রীর উৎসাহে আমি বিলেতে এসেছিলাম ব্যারিষ্টারী পড়তে। তার ইচ্ছে ছিলো জীবনে আমি প্রতিষ্ঠা লাভ করি—মানুষ হই। আর আমিও ঠিক ক'রেছিলাম আমার প্রত্যেকটি দিন সার্থক ক'রে তুলবো বিদেশে, তারপর দেশে ফিরে অন্যায়ের বিরুদ্ধে চালিয়ে যাবো সারা জীবনব্যাপী কঠিন সংগ্রাম। উদ্দেশ্য মহৎ—বুঝেছো অশোক?

হ্যাঁ, নিজেকে উন্নত করার নানা উদ্যমে আমি মন-প্রাণ সঁপে দিয়েছিলাম। বোধ হয় নিঃশ্বাস ফেলবারও আমার সময় ছিলো না। তারপর আস্তে আস্তে আমার সমস্ত গোলমাল হ'য়ে গেল। হঠাৎ ঘুম থেকে জেগে উঠে আমি দেখলাম, আমি যেন অন্য মানুষ হ'য়ে গেছি, আমার অতীত নিজের কাছে মিথ্যা ব'লে মনে হ'লো।

এইবার সেই কথাই বলি। তুমি খুব ভালো ক'রেই জানো এ দেশে মেয়েদের সংগে মেলামেশা করার প্রচুর সুযোগ। আমার অনেক বন্ধুবান্ধব—এমন কি যারা শ্বশুরের পয়সায় বিলেতে এসেছিলো—তারাও শুধু মেয়েদের সংগে মেশে নি, তাদের ঠকিয়েছে, ভালোবাসার অভিনয় ক'রে যথাসময়ে শ্বশুরের সুজামাতার মতো খেলা শেষ ক'রে দিয়ে দেশে ফিরে গেছে।

শুধু আমিও শেষ অবধি ফিরতে পারলাম না। কিন্তু তা'তে আমার এতোটুকুও দুঃখ নেই অশোক। জানি এই জঘন্য পল্লীতে হঠাৎ একদিন হাঁপাতে হাঁপা'তে আমার চোখের তারা বড়ো হবে—আমার দম বন্ধ হ'য়ে যাবে। না, এই বিদেশে বিভুঁয়ে কুকুরের মতো মরতে আমার লজ্জা নেই—সে আমার জীবনের সব চেয়ে সেরা আনন্দ। আর কিছু করতে পারি আর না পারি, অন্ততঃ আমি যে এমন ক'রে মরবো শুধু আমার সত্যের জন্যে, সে-কথা ভাবতেও আনন্দে মন ভ'রে ওঠে। জীবনের শেষ দিনে সেই তো আমার পরম লাভ। আমি সেই মহামরণের দিন গুনছি অশোক।

কিন্তু বার্থাও তো শেষ অবধি রইলো না। রইলো না বললে ভুল হবে, থাকতে পারলো না। আমার অন্যান্য বন্ধুরা শ্বশুরের পয়সায় এসেও মেয়েদের কাছে যেমন বিয়ের কথা চেপে যেতো, আমি ঠিক তেমনটি করতে পারি নি। আমার কথা আমার প্রত্যেকটি বন্ধুবান্ধব জানতো।

সব জেনে শুনেও বার্থা আমাকে ভালোবাসলো। আর আমিও প্রতিদান দিতে বাধ্য হলাম—তাকে কিছুতেই ফেরাতে পারলাম না।

তোমরা এ-কথা শুনে বলবে, আপনি অন্যায় ক'রেছেন। আবার ভালোবাসবার আপনার কোনো অধিকার ছিলো না—আপনার স্ত্রী আছে, আপনার মেয়ে আছে, তাদের কথা আপনি ভুললেন কেমন ক'রে? আপনার কি এতোটুকুও কর্ত্তব্যবোধ নেই? সামান্য দায়িত্বজ্ঞান নেই?

সবই আছে, সবই ছিলো, তোমাদের সব কথা আমি মানি অশোক। কিন্তু শুধু একটা কথা কিছুতেই তোমাদের বোঝাতে পারবো না যে, সত্যকে বাদ দিয়ে যন্ত্রের মতো আমি শুধু কর্ত্তব্য ক'রে যাবো কেমন ক'রে! নিজের সংগে দিনরাত সংগ্রাম ক'রে আমি বুঝেছিলাম আমার মনের দুর্ব্বার গতি রুদ্ধ করবার কোনো উপায় নেই—যেন অদৃশ্য শক্তির হাতে আমি একেবারে অসহায়। এই বয়সের কঠিন উপলব্ধি যে কখনও ভুল ব'লে মনে হবে না, সে-কথা স্পষ্ট বুঝেছিলাম। তাই ঠিক করলাম দেশে আর ফিরবো না—স্ত্রীর সংগে শুধু অভিনয় ক'রে তাকে অপমান করতে পারবো না।

গরীবের ছেলে আমি ছিলাম না অশোক। জানতাম আমার বাবার বাড়ীতে আমার স্ত্রী মেয়ের কোনো অভাব হবে না। তবু সত্য স্পষ্ট স্বীকার ক'রে আমার স্ত্রীকে সব কথা লিখলাম। কোনো উত্তর এলো না। এলো বাড়ী থেকে গুরুজনদের ঘন ঘন নানা রকম চিঠি আর মাসে মাসে টাকা আসা হঠাৎ এক সময় বন্ধ হয়ে গেলো। তবু নানা উপায়ে অনেক দিন পড়াশুনো চালিয়েছি, কিন্তু

কিছুতেই শেষ অবধি তরণী তীরে নিয়ে যেতে পারলাম না। পড়াশুনো ছেড়ে আমাকে ইংরেজ আপিসের কেরাণী হতে হলো। আজও তার জের টেনে চলেছি।

না অশোক, বার্থাকে আমি বিয়ে করি নি। কারণ বছরখানেক পর সে আবিষ্কার করলো যে আমার সম্বন্ধে তার আর কোনো কৌতূহল নেই। তাই সেও আমার সংগে প্রেমের অভিনয় না করে আমাকে ছেড়ে গেলো।

তুমি বলবে, তখন আপনি দেশে ফিরে গেলেন না কেন। কেন ফিরে যাবো? আমার স্ত্রীকে যদি আমি একদিন স্বীকার না করে থাকি, যদি বুঝে থাকি তাকে ভালোবাসিনি, তা হ'লে তার কাছে ফিরে যাওয়া কি তাকে সব চেয়ে বড়ো অপমান করা নয়? আমি তা করতে পারি নি।

আমি আজ আর বেশী কিছু বলতে পারবো না, কথা বলতে আমার কষ্ট হচ্ছে—এখুনি হাঁপানি সুরু হবে। শুধু খুব জোর দিয়ে তোমাকে আমি এই কথাই বলতে চাই যে, আমার কখনও নিজেকে অপরাধী মনে হয় না। কারুর প্রতি কোনো অন্যায়ই আমি করি নি। হ্যাঁ মাথা উঁচু করে চলবার ক্ষমতা আমার আছে। আমি মুক্ত কণ্ঠে শুধু আমার সত্যকে ঘোষণা করেছি প্রত্যেকের কাছে, মিথ্যার মুখোস প'রে কাউকে ছলনা করিনি, তাই আমার আর কাউকেই ভয় নেই—

ভারতবর্ষ থেকে আসা হরেন সরকারকে লেখা বন্দনা ঘোষের এয়ার লেটার—

শ্রীচরণেষু,

বাবি, তুমি আমাকে চিনতে পারবে না। তুমি যখন বিলেত যাও তখন আমার বয়স তিন বছর। তোমাকে আমার একটুও মনে নেই। তোমাকে বড়ো দেখতে ইচ্ছে করে। তাই আমি আর তোমার জামাই লণ্ডনে যাচ্ছি—সাত আটদিন থাকবো।

গত বছর আমার বিয়ে হয়েছে। তোমার জামাইএর নাম অচিন্ত্যকুমার ঘোষ। ও অফিসের কাজে আমেরিকা যাচ্ছে—সেখানে ছ'মাস থাকতে হবে। তোমার সঙ্গে দেখা করবার জন্তে আমরা লণ্ডন হয়ে যাচ্ছি।

আমাদের জাহাজের নাম সিলিসিয়া। বম্বে থেকে ছাড়বে বারোই সেপ্টেম্বর। সাতাশ কিংবা আটাশ তারিখে আমরা লণ্ডনে পৌঁছবো। তুমি ষ্টেশনে আসবে তো বাবি?

আমার বিয়ের তিন মাস পর মা মারা যান। তাঁর শরীর শেষের দিকে খুব খারাপ হয়ে পড়েছিলো। যাবার সময় আমার হাত ধরে তিনি বলে গেছেন, তোর বাবির সঙ্গে যেমন করে হোক একবার দেখা করিস খুকুমণি, বলিস—মা তোমাকে প্রণাম জানিয়ে ব'লে গেছেন—তাঁর মনে কোনো ক্ষোভ ছিলো না, তুমি যেন জীবনের শেষ দিন অবধি সুখী হতে পারো, এই প্রার্থনা করতে করতে তিনি শেষ নিশ্বাস ফেলেছেন।

আজ শেষ করি। তোমার সঙ্গে শীগ্‌গিরই দেখা হবে বলে খুব ভালো লাগছে। প্রণাম নিও। ইতি—

তোমার খুকুমণি

খোলা এয়ার লেটার হাতে নিয়ে হরেন সরকার কাঁপছিলো। অশোক যদি তখুনি বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে তাকে ধ'রে না ফেল্‌তো তা হ'লে হয় তো ঠাণ্ডা মেঝেতে সত্যি হরেন সরকার পড়ে যেতো।

কি হ'লো সরকার মশাই? কোনো খারাপ খবর নাকি? ব্যস্ত হয়ে অশোক জিজ্ঞাসা করলো, আপনি অমন করছেন কেন?

কোনো রকমে নিজেকে সামলে নিয়ে অশোকের দিকে চিঠিটা বাড়িয়ে দিয়ে সরকার বললো, পড়।

রুদ্ধ নিঃশ্বাসে চিঠি শেষ করলো অশোক। তারপর শান্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললো, আপনি অতো বিচলিত হচ্ছেন কেন সরকার মশাই?

আমার স্ত্রী মারা গেছে, থেমে থেমে হরেন সরকার বললো, কিন্তু অশোক তার চেয়েও খারাপ খবর হলো আমার মেয়ে জামাই সাতদিন পর এখানে আসছে।

—খারাপ খবর? কি বলছেন আপনি? তাদের দেখতে কি আপনার ইচ্ছে করে না?

করে। কিন্তু—কিন্তু আমি যে তাদের সামনে দাঁড়াতে পারবো না—কিছুতেই না—

সে কি কথা সরকার মশাই ?

ওরে অশোক আমি কিছু জানি না—কিছু বলতে পারবো না, কিন্তু আমাকে পালাতেই হবে।

এই নোংরা বাড়ীর কথা ভাবছেন ?

এখানে তাদের ওঠাবো না নিশ্চয়ই, ম্লান হেসে হরেন সরকার বললো, আমার একটা উপকার করবি অশোক ?

বলুন ?

তোকে যেতে হবে ষ্টেশনে ওদের আনতে, লণ্ডনের সব চেয়ে বড় হোটেলে তুলবি তাদের, আমি আজই ঘর ঠিক করে রাখবো, আমার যাকিছু সঞ্চয়, সব খরচ করবো তাদের জন্তে। তুই শুধু মা-মণিকে বলবি যে, আমি লণ্ডনে নেই, বিশেষ দরকারে বাইরে গেছি—যা হয় বলিস, আমি কিছুতেই পারবো না রে—

কিন্তু কেন সরকার মশাই ?

কিছু বলতে পারবো না। আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করিস না অশোক। আমি চ'লে যাবো—আমি পালিয়ে যাবো—কিছুতেই তাদের সামনে দাঁড়াতে পারবো না—বল, তুই ষ্টেশনে যাবি আর বলবি আমি এখানে নেই ?

হরেন সরকারের উত্তেজনা দেখে তাড়াতাড়ি অশোক মাথা নেড়ে জানালো যে—সে তা-ই করবে।

একটি লোকের শরীর মাত্র সাতদিনে যে এমন ক'রে ভেঙে পড়তে পারে, সেকথা হরেন সরকারকে চোখের সামনে না দেখলে অশোক হয়তো বিশ্বাসই করতে পারতো না। হাঁপানি বেড়ে গেলো তার, চুল আরও বেশী পাকলো, চোখের কোনে পড়লো কালি আর বলতে গেলে কথা বলা সে একেবারেই বন্ধ করলো।

আজ তাদের লণ্ডনে পৌছবার দিন। জাহাজ লাগবে সাউদাম্প্‌টন বন্দরে। সন্ধ্যেবেলা ওয়াটার লু ষ্টেশনে আসবে বোট স্পেশ্যাল।

এলিফ্যাণ্ট এণ্ড ক্যাসেল থেকে ওয়াটারলু ষ্টেশন বেশী দূরে নয়—মাত্র মিনিট কয়েকের পথ। অশোক যথা-সময় প্রস্তুত হ'য়ে নিলো। সরকার মশাইএর মেয়ে জামাইকে তোলা হবে শ্যাভয় হোটেলে—ষ্টেশন থেকে খুবই কাছে। নাম করা আমেরিকান হোটেল।

ওরে অশোক, স্তিমিত স্বরে বললো হরেন সরকার, দেখিস আমাকে যেন কিছুতেই না সামনে পড়তে হয়—

ঠিক আছে সরকার মশাই, কিন্তু আপনি এবার উঠে বসে কিছু খেয়ে নিন—কি চেহারা করেছেন দেখতে পান না ?

হাঁপাতে হাঁপাতে হরেন সরকার বললো, উঠবো কেমন ক'রে ? শরীরে যে কিছু নেই—

সব আছে, ডাক্তারের কাছে একবার গেলে এতো কষ্ট হ'তো না আপনার। কিছুতেই তো গেলেন না !

যাবো রে যাবো, ওরা চ'লে যাক। কিন্তু তুই এবার বেরিয়ে পড় অশোক, সময় হ'য়ে গেলো যে—

হ্যাঁ যাই, দরজার হুক থেকে ওভার কোটটা নিয়ে গায়ে দিয়ে অশোক ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো।

কিন্তু সে-ট্রেনে এলো না ওরা কেউ। অনেক প্যাসেঞ্জার নাকি এসেছে এ জাহাজে, তাই আর একটা ট্রেন আসবে ঘণ্টা দু'য়েক পর, আর সেই গাড়ীতে আসবে হরেন সরকারের মেয়ে জামাই।

এই শীতে ষ্টেশনে দু'ঘণ্টা অপেক্ষা না ক'রে অশোক ঠিক করলো বাড়ী ফিরে যাওয়াই ভালো। কাছেই তো! আবার ঠিক সময় ফিরে এলেই চলবে।

ভরা কুয়াশায় সেদিন থম থম করছে লণ্ডন শহর। রবিবার। তাই মদের দোকান থেকে ভেসে আসছে নরনারীর কোলাহল। আর এলিফ্যাণ্ট এণ্ড ক্যাসালে এসে অশোক দেখলো রাস্তায় উল্লাস করছে মাতাল পথিকের দল। হাতড়ে হাতড়ে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে সে দরজার হ্যাণ্ডেল ঘোরালো।

কে, কে, কে—ভয়ার্ত্ত চীৎকার করে উঠে বসবার চেষ্টা করতেই খাটের ওপর সশব্দে ট'লে পড়লো হরেন সরকার।

অশোক উত্তর দেবার অবকাশ পেলো না। তাড়া-তাড়ি ছুটে এলো খাটের কাছে। বিচলিত হয়ে হরেন সরকারের গায়ে হাত দিয়ে দেখলো—নিস্পন্দ তার দেহ, আর স্থির চোখের মণি। কিন্তু মুখের চারপাশে তখনও ফুটে রয়েছে ভয়ের সুস্পষ্ট রেখা।

লণ্ডনের সেই দীনতম পল্লীর জীর্ণ গ্যারেটে তখন শুধু কাঠের ভ্যাপসা গন্ধ। গাড়ীর আওয়াজে ফাটা দেয়াল কাঁপছে বার বার—তারই একটানা শব্দ। আর রাস্তায় মাতালের ক্লান্তিকর অবিশ্রাম চীৎকার।

'এশিয়ার মৃত হৃৎপিণ্ড'

মনোরঞ্জন বড়াল

চির রহস্যময় হিমালয়ের কটিদেশ তিব্বতও রহস্যের যাদুপুরী হিসাবে পৃথিবীর কাছে পরিচিত। বর্ত্তমান যুগের বুদ্ধের শিষ্যশ্রেষ্ঠদের ঘাঁটি তিব্বত দেশ। তা সত্ত্বেও তিব্বত হচ্ছে দারিদ্র্য ও অশিক্ষার আগার-বিশেষ। প্রায়-যাযাবর জাতিগুলির মর্যাদা প্রায় দাসত্ব প্রথার পর্য্যায়ে। আধুনিক বিজ্ঞানোন্নতির স্পর্শ প্রায় লাগেনি বল্লেই চলে। পার্ব্বত্যময় দেশ, খনিজ সম্পদের প্রাচুর্যে ভরপুর—অথচ এতটুকুও তার বিজ্ঞানের আয়ত্তে আসেনি।

বৃটিশ ভূবিজ্ঞানীদের ভাষায় তিব্বতকে বলা হয়—"এশিয়ার মৃত হৃৎপিণ্ড" (ডেড হার্ট অব এশিয়া)। কিন্তু এই মৃত হৃৎপিণ্ডের উপর বৃটিশের অবাধ নৃত্য চলেছে দু'শতাধিক বর্ষ ধরে; শেষ দিকে শোষণের আধুনিক শ্রেষ্ঠ মুরুব্বি আমেরিকার প্রধান্যই প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছিল। কৃষি সম্পদ, প্রধানত: পশুসম্পদ আহরণই হল অর্থনৈতিক শোষণের দিক। এ ছাড়া আর একটা দিক হ'ল রাজনৈতিক। বর্ত্তমানে দুই শিবিরে বিভক্ত পৃথিবীর দুই প্রধান শক্তি হল সোভিয়েট রুশিয়া এবং আমেরিকা। আমেরিকার নিজ ভূমি হতে অনেক দূরে এই তিব্বত হল সোভিয়েটের লাগোয়া দেশ। সুতরাং সোভিয়েটের বিরুদ্ধে তিব্বতে মার্কিন প্রাধান্য বিস্তার অপরিহার্য্য হয়ে উঠল আমেরিকার পক্ষে। কিন্তু নবজাগ্রত চীনের নতুন জাতীয় প্রেরণা সমগ্র চীনকে দিল প্রচণ্ড নাড়া। মহাচীনেরই অংশ তিব্বতেও সে সাড়া এসে লেগেছে। আজ নতুন মহাচীনের শক্তি রহস্যময় দুঃখের দেশ তিব্বতে আনতে চলেছে আধুনিকতম প্রাচুর্য্য—শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিজ্ঞানোন্নতি, যুক্তিপূর্ণ চিন্তাধারা। দুশো বৎসরাধিক কাল ধরে লামাতন্ত্রের আওতায় সামন্ত প্রথার সুযোগে সাম্রাজ্যবাদীদের যে লীলানিকেতন ছিল তা আজ হাতছাড়া হতে দেখে বিশ্বপ্রতিক্রিয়াশীল শোষকশক্তির চীৎকারও কম নয়। কিন্তু বিভিন্ন জাতি, ভাষা, বৈশিষ্ট্যের প্রায় পঞ্চাশ কোটি মানুষের দেশ চীনের জয়যাত্রার কাছে যে কোন বাধা তৃণের মত ভেসে যাবে—এবং যাচ্ছেও। বৃটিশ মার্কিণ প্রভাবমুক্ত হয়ে তিব্বতীরা আজ নিজ হাতে নিজেদের ভাগ্য গড়তে যাচ্ছে।

চীন-তিব্বত সম্পর্ক

মহাচীনের সঙ্গে তিব্বতের প্রথম যোগসূত্র স্থাপিত হয় ৪৬১ খৃষ্টাব্দে একটি পারিবারিক সম্পর্কের মধ্য দিয়ে। তখন চীনের এক রাজকন্যার সঙ্গে তিব্বতের রাজার বিয়ে হয়। তারপর অষ্টম শতাব্দীতে চীন ও তীব্বতের মিলন সাধনের এক চুক্তি হয়। আজও এই চুক্তির ধারা সম্বলিত একটি স্তম্ভ তিব্বতের রাজধানী লাসাতে বিদ্যমান। এই ধারার একটি কথা হল—"রাজ্য দুইটির পরস্পর মিলন সাধন।" এর পরে আসে ইতিহাসখ্যাত জেঙ্গিচ খানের পরবর্ত্তী কুবলাই খানের রাজত্বের যুগ ত্রয়োদশ শতাব্দী। তখন কুবলাই খান তার অধীনস্থ চারটি জাতির মধ্যে তিব্বতকে দ্বিতীয় স্থানীয় বলে ঘোষণা করেন। সা-ক্যা মঠের লামা কর্ত্তাকে তিব্বতের শাসন ভার অর্পণ করেন। "দালাই" কথার অর্থ হল রাজনৈতিক কর্ত্তা, এটি একটি মঙ্গোল শব্দ। এর পর থেকে তিব্বতের লামা প্রধানকে তাই দালাই লামা বলে পরিচয় দেওয়া হয়। কিন্তু তিব্বতসহ সমগ্র চীনের রাজস্ব কেন্দ্রীয় চীন সরকার কর্তৃকই নিয়ন্ত্রিত হত এবং দালাইলামা নির্ব্বাচনেও কেন্দ্রীয় চীন সরকারের কথাই মানা হত।

বর্ত্তমান যুগেও অনেকগুলি আন্তর্জ্জাতিক চুক্তি অনুসারে তিব্বতকে চীনের অংশ বলেই স্বীকার করা হয়েছে। ১৯০৭ সালে বৃটেন এবং জার-রুশিয়া যখন এক চুক্তি করে তখন তিব্বতকে চীনের অংশ বলেই উল্লেখ করা হয়েছে। এমন কি চীনের দুর্ব্বল সরকারকে ১৯১৩ সালে যখন সিমলাতে অপমানজনক সর্ত্তে স্বাক্ষর করতে

বাধ্য করা হয়, তখন অনেক বিষয়ে চীনের সার্ব্বভৌমত্বে আঘাত করা হলেও তিব্বতকে চীন থেকে আলাদা করার প্রস্তাব করতে সাহস করেনি। এর পরে যখন জাপানীরা বিজয় উন্মাদে চীনকে ২১ দফা সর্ত্ত আরোপ করে, তখন পর্য্যন্ত এই সিমলা চুক্তির অদল বদল করতে চীন এতটুকু নরম মনোভাব পর্য্যন্ত দেখায়নি। ডাঃ সান ইয়াৎ সেনের নেতৃত্বে চীন রিপাব্লিক গঠনের পর তিনি ঘোষণা করেন যে,মহাচীনের প্রধান পাঁচটি জাতির মধ্যে তিব্বতীরা একটি প্রতিক্রিয়াশীল চিয়াঙ-চক্রের কুশাসনের দুঃখের বৎসর গণিতেও চীনের অংশই ছিল তিব্বত। বর্ত্তমান দালাই লামা কেন্দ্রীয় চীনসরকার কর্ত্তৃকই ১৯৪০ সালে নির্ব্বাচিত হন এবং চীনের পাহারাধীনে তাকে লাসায় প্রতিষ্ঠিত করা হয়। ১৯৪৫ সালে এক চিঠিতে বৃটেনের পররাষ্ট্র সচিব পরিষ্কার ভাবে চিয়াঙ সরকারকে জানান যে আন্তর্জ্জাতিক আইনানুসারে তিব্বত চীনেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ।

১৯৪৯ সালে পিকিঙে যে রাজনৈতিক আলোচনা বৈঠক বসে, সেখানে তিব্বতের প্রতিনিধি উপস্থিত থেকে সভায় সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। সমগ্র চীনের মুক্তি সাধন এবং একতাবদ্ধ করার যে নীতি গ্রহণ করা হয়, তাতে তিব্বত প্রতিনিধিরা সাগ্রহে অংশ গ্রহণ করে তিব্বতের মুক্তিসাধনের পরিকল্পনা পর্য্যন্ত করেন।

রাজনৈতিক বিচার ছাড়াও যাতায়াত পথ, অর্থনৈতিক বন্ধন, ব্যবসা বানিজ্য সংস্কৃতি ও ধর্ম্মীয় সংস্কারের বন্ধন অনুসারেও তিব্বত চীনের অংশ। পর্ব্বত সংকুল মরুভূমির মধ্য দিয়ে উষ্ট্রপথ দ্বারা সিকাঙ, সিকিয়াঙ, চেঙহাই প্রভৃতির অংশের সহিত যুক্ত তিব্বতের আমদানী রপ্তানী ও ব্যবসা বানিজ্য চলে। তিব্বতের অনেক লামা ঐ সব প্রদেশে বসবাস করেন। পরবর্ত্তী কালে ভারতের সহিত যাতায়াত পথ সৃষ্টি হলেও তিব্বতে যেটুকু বহির্জ্জগতের প্রভাব যেত, তা মহাচীনের মারফৎই ; এমন কি বৌদ্ধধর্ম্মের জোয়ারও প্রথম তিব্বতে আসে চীনের বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাবের মধ্য দিয়ে।

এত সব সত্ত্বেও চীনকে ভিন্নদেশ বলে আন্তর্জ্জাতিক জগতে প্রমাণ করার যেটুকু চেষ্টা হয়েছে, তা হচ্ছে চীন মহাজাতির উপনিবেশে আধা উপনিবেশ থাকা কালীন অবস্থায়, প্রধানতঃ চীনের ঐক্যবদ্ধতার অভাবের সুযোগ নিয়ে এবং সাম্রাজ্যবাদী নিরঙ্কুশ শোষণের উদ্দেশ্যে।

সাম্রাজ্যবাদী কারসাজি

দুশো বছর ধরে ভারত মহাজাতির উপর বর্ব্বর শাসন ও শোষণ যন্ত্র ছলেবলে কৌশলে বৃটিশ জিইয়ে রাখতে পেরেছিল ভারতীয় বিভিন্ন জাতির অনৈক্যের সুযোগ নিয়ে এবং জঘন্য কুটনৈতিক চালে ভারতে অনৈক্য বিস্তার করে। এমন কি প্রত্যক্ষ শাসন গুটাবার সময় ভারতকে দ্বিধাবিভক্ত করে বিদায় নিল তারা। চীন-তিব্বতের ব্যাপারেও বৃটিশরা এই নীতি নিয়ে কম কুকাজ করেনি। ভারত ও ব্রহ্ম বিজয়ের পর ভারতগবর্ণর ওয়ারেন হেষ্টিংস তিব্বতের দিকে নজর দিল। বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের বিভিন্ন দলকে পরস্পরের বিরুদ্ধে উস্কানি দিয়ে তিব্বতে অনৈক্যের সৃষ্টি করল এবং তিব্বতের সামন্ত লামাদের প্রতিক্রিয়াশীলতার সুযোগ নিয়ে চীন-বিরোধী মনোভাব সৃষ্টির প্রয়াস পেল বৃটিশরা।

১৭৯০ সালে বৃটিশদের প্ররোচনায় নেপালী গুর্খারা তিব্বত আক্রমণ করে, কিন্তু চীন-তীব্বতের ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধে তারা ফিরে আসতে বাধ্য হয়। ১৮৮৮ সালে বৃটিশ সরকার পুনরায় তিব্বত আক্রমণ করে, এর আগেও নানা প্রকার প্রচেষ্টা সত্ত্বেও বিশেষ সুবিধা হয় না। তবে হিমালয়ের দক্ষিণস্থ সিকিম-ভুটান বৃটিশের বৈশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য হয়। রুশো-জাপানের যুদ্ধের সুযোগ বুঝে এবং দুর্ব্বল মাঞ্চু-সরকারের বেকায়দা বুঝে ১৯০৪ সালে পুনরায় বৃটিশ বাহিনী কর্ণেল ইয়ংহাজব্যাণ্ডের নেতৃত্বে তিব্বত আক্রমণ করে। উন্নত ধরণের অস্ত্রশস্ত্রের দ্বারা সজ্জিত বৃটিশ বাহিনীর বিরুদ্ধে তিব্বতীরা বীরত্বের সহিত বর্শাদি অস্ত্রদ্বারা প্রতিরোধ চালায়। কিন্তু অমিত বিক্রমে স্বদেশের জন্য লড়েও তিব্বতীরা পিছু হঠতে বাধ্য হয়। অত্যাচার, ধ্বংস ও লুণ্ঠন প্রভৃতি তৎকালীন বৃটিশ বিজয়াভিযানের বৈশিষ্ট্যগুলিসহ বৃটিশ বাহিনী লাসায় উপস্থিত হয়। লুণ্ঠিত ধনরত্নাদির কথা নিয়ে তখন বৃটিশ কাগজপত্রেও সমালোচনা হয়। স্বদেশপ্রেমিক তিব্বতীরা

কিন্তু বৃটিশকে বেশীদিন তিষ্ঠাতে দিল না। বিজয়ী ইয়ঙ-হাজব্যাণ্ড যে অপমানজনক চুক্তি তিব্বতীদের ঘাড়ে চাপিয়েছিল, দুই বৎসরের মধ্যে সেই চুক্তি প্রত্যাহার করে তিব্বত ব্যাপারে কেন্দ্রীয় চীন সরকারের সাথে আলোচনা করতে বাধ্য হয়। ১৯০৭ সালে রুশ-বৃটিশ চুক্তিতে মেনে নেওয়া হয় যে বৃটেন আর তিব্বতের ঘরোয়া ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবে না, তিব্বতে বিশেষ সুবিধার দাবী রাখবেনা এবং ভবিষ্যতে তিব্বত সম্বন্ধীয় যে কোন ব্যাপারে কেন্দ্রীয় চীন সরকারের সহিত কথা-বার্ত্তা হবে। অবশ্য বৃটিশেরা সুযোগ বুঝে পরবর্ত্তীকালে মাথা গলাতে কখনও বিরত থাকেনি। ১৯১০ সালের বিপ্লবের পর নতুন চীন রিপাব্লিক সরকারের দুর্ব্বলতার সুযোগ নিতে ছাড়ে নি। প্রতিক্রিয়াশীল কুওমিণ্টাঙ শাসনকালে তিব্বতের ডাক-তার বিভাগে কর্ত্তৃত্ব স্থাপন, গিয়াঙজি ও ইয়াতুঙএ সৈন্য বাহিনী রাখা প্রভৃতির ব্যবস্থা করে নেয়। তিব্বতের প্রতিক্রিয়াশীল সামন্ত জিইয়ে রাখতে বৃটিশ সৈন্য বাহিনী এবং ১৯৩৬ সালে রাজনৈতিক মিশন পাশাপাশিভাবে তিব্বতে আসন গাড়ে।

১৯৪৭ সালে ভারতকে "স্বাধীনতা" দেবার মারফৎ যেরূপভাবে সব বিষয়ে বৃটিশের কর্তৃত্ব বজায় রাখা হয়েছে, তেমনি তিব্বতের রাজনৈতিক মিশনও ভারত সরকারের হাতে অর্পণ করা হয়েছে—তবে এর প্রধান কর্ত্তারা হলেন এখনো বৃটিশ। অবশ্য এখন নামট' হয়েছে ভারতীয় মিশন।

মার্কিনের আগমন

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর যুগে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির শীর্ষস্থানীয় আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীর সব জায়গাতে মাথা ঢুকাতে আরম্ভ করে এবং তার অন্যান্য ডলার-বদ্ধ সঙ্গীদের সাথে মিলে নিজের প্রাধান্য বিস্তারে মনোযোগী হয়। তিব্বতের ব্যাপারেও দীর্ঘকালের বৃটিশশোষণের সঙ্গে যুক্ত হল মার্কিণ শোষণচক্র। ১৯৪৩ সালের বৃটিশ প্ররোচনায় লাসা কর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক সৃষ্ট "পররাষ্ট্র-ব্যুরো" মারফৎ ইঙ্গ-মার্কিণ চক্রের কাজ সুরু হয়। চীনের মুক্তিফৌজের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্নভাবে ইঙ্গ-মার্কিণ চক্র তিব্বতী লামাতন্ত্রকে ইঙ্গ-মার্কিণ আওতায় নিয়ে আসতে চেষ্টা করে। ১৯৪৭ সালে এই উপলক্ষে "বাণিজ্য-মিশনের" সৃষ্টি হয় এবং এই "বাণিজ্য মিশন" ভারতের মধ্য দিয়ে ইঙ্গ-মার্কিণ চক্রের সহিত যোগাযোগ রাখে। চীনে চিয়াঙ চক্রের দিন ঘনিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে ইঙ্গ-মার্কিণ আধিপত্য দৃঢ় করার চেষ্টা হয়। ১৯৪৯ সালের জুলাই মাসে তিব্বতের চীনা সরকারী কর্ম্মচারীদের বিতাড়িত করা হয়, চীনা পরিচালিত বেতার কেন্দ্র, স্কুলাদি বন্ধ করে দেওয়া হয়। এই সব কুকার্য্যের সাফাই হিসাবে 'কমিউনিষ্ট বিদ্রোহে'র দোহাই তোলা হয়।

ক্রমান্বয়ে মার্কিণ হস্তক্ষেপ আরও স্পষ্টভাবে ফুটে উঠতে আরম্ভ করে। "বেতার ঘোষক" লাওয়েল টমাস নামে জনৈক মার্কিণের উপস্থিতি দিয়ে এর সুরু। টোকিওতে ম্যাক-আর্থারের সঙ্গে আলোচনাও হয় এই ব্যাপারে। লাসা থেকে ফেরার পরে টমাস মিশন দিল্লীস্থ মার্কিণ দূতাবাসের সঙ্গে যোগ স্থাপন করে। তিনি নিউইয়র্কে তার তিব্বত ভ্রমণ প্রসঙ্গে ১৯৪৯-এর ১৭ই অক্টোবর বলেন, "তিব্বতের শাসকরা জানতে চাইছে, কমিউনিষ্ট অভিযান আরম্ভ হলে তারা যুক্তরাষ্ট্র থেকে সাহায্য পাবে কিনা; যদি সাহায্য পাওয়া যায় তবে তারা দুটো জিনিস চায়—গেরিলাযুদ্ধের উপদেষ্টা এবং আরও আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র।" ১৯৫০-এর ফেব্রুয়ারীতে তিব্বত প্রতিনিধিরা পিকিঙএর সঙ্গে শান্তিপূর্ণ আলোচনা চালাবার জন্য যাবার পথে ভারতে আসে। কিন্তু পিকিঙে যাবার পথে হঙকঙএর ছাড়পত্র নিয়ে তালবাহনা চলে। চীনের "পিপলস্ ডেইলী" পত্রিকা এই প্রসঙ্গে পূর্ণ দায়িত্ব নিয়ে মন্তব্য করেন যে, ভারতের অবস্থানকারী তিব্বতী প্রতিনিধিদল দিল্লীস্থ বৃটিশ হাই-কমিশনার স্যার আর্চিবেল্ড নাইএর প্ররোচনায় মীমাংসার পথে আসতে গড়িমসি করতে থাকে।

মুক্তির পথে তিব্বত

তিব্বতী কর্ত্তৃপক্ষকে পূর্ণ সুযোগ দেওয়ার পর এবং ইঙ্গ-মার্কিণ চক্রের ষড়যন্ত্র সম্বন্ধে সচেতন হয়ে চীনের মুক্তিফৌজ গত অক্টোবরে তিব্বত অভিযান আরম্ভ করে

তিব্বতী জনসাধারণ বিজয়ী চীন-জনতার প্রতি সাগ্রহ আবেদন জানায় যুগ যুগ সঞ্চিত অত্যাচার, শোষণ ও অজ্ঞানতার হাত থেকে মুক্ত করতে। প্রত্যেক জাতির প্রতি সমমর্য্যাদা, জাতীয় বৈশিষ্ট্যের পূর্ণ মর্য্যাদা, ধর্ম্মের স্বাধীনতা প্রভৃতি প্রকৃত স্বাধীনতার দ্যোতক অবশ্য পালনীয় সর্ত্ত ঘোষণা করে ও কাযে প্রতিফলিত করে আজ মুক্তিফৌজ তিব্বতের অভ্যন্তর প্রবেশ করেছে। অচিরেই হিমালয়ের পশ্চাতে রহস্যাবৃত নির্জীব তিব্বত মুক্তির আস্বাদ পেয়ে বিশ্বদরবারে প্রতিষ্ঠা লাভ করবে।

প্রসঙ্গতঃ বলা দরকার—এই তিব্বতে মুক্তি অভিযান নিয়েও মার্কিণ কারসাজি কম চলেনি। জাতিসঙ্ঘে চীনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বনের চেষ্টা হয়েছে আমেরিকান প্ররোচনায়। চীনের সাথে অকৃত্রিম বন্ধুত্বে দীর্ঘকাল বিজড়িত ভারতেও এই বিভ্রান্ত সৃষ্টির চেষ্টার ত্রুটি হয়নি। প্রথমত ইঙ্গ-মার্কিণ চক্রের প্রভাবে ভারত সরকার এই নিয়ে অপ্রীতিকর পথে অগ্রসর হতে চলেছিল—কিন্তু চীনের দৃঢ় ও বন্ধুত্বসূচক ব্যবহারে তা বেশীদূর গড়াতে পারেনি। বিশেষ করে সাম্রাজ্যবাদী শাসন ও শোষণে নিপীড়িত ভারতবাসীর চীনের বিজয়াভিযানের প্রতি সশ্রদ্ধ অভিনন্দন ও সাম্রাজ্যবাদী শোষণের বিরুদ্ধে সচেতনা বিশেষ লক্ষণীয়।

কোরিয়া যুদ্ধে মার্কিণের স্বরূপ খুলে যাবার পর আজ তিব্বতের জনসাধারণের মুক্তিপথের অগ্রসরকে তাই প্রতিটি ভারতবাসী অভিনন্দন জানাচ্ছে—পৃথিবীর স্থায়ী শান্তির প্রকৃত যোদ্ধা হিসাবে তিব্বতী জনসাধারণ তার যথোপযুক্ত ভূমিকা নেবে এ আশা নিঃসন্দেহে করা যেতে পারে।

চির প্রকাশ

শ্রীদিলীপকুমার রায়

দূরে বলি যারে—দূরে সে তো নয় নয়,
এত কাছে, বুঝি তাই দূর মনে হয়!
সুর সম্পাতে ছন্দে সে উঠে বেজে,
রূপরাসে সুখ-সুষমায় আসে সেজে,
কলভাষে আনে কথা···মৌনেও বিনিময়,
বিস্মরণে সে ব্যথা···স্বপনে সে বিস্ময়।

আশার বুকে সে অনাগত-যুগ-আলো
সঙ্গীতে সে-ই শিহরণ যে বিছালো!
দাহভরা দেহে সে সব-জুড়ানো তৃপ্তি,
যৌবনযাগে প্রাণগৌরবী মুক্তি,
ঝঞ্ঝায় আনে শঙ্কা·· বসন্তে কিশলয়,
বজ্রে বাজায় ডঙ্কা···মর্ম্মরে তন্ময়!

তারি চেতনায় চিন্ময় বিগ্রহ,
নিরাকারে তারি উদারের সমারোহ।
বন্ধনে সে-ই নিবিড়তা—সে অতনু,
কল্পনায় সে চঞ্চল জলধনু,
জীবনে সে জয়-অভিযান···মরণে সে বরাভয়;
মেঘ—শুধু তার অভিমান—রবি যার পরিচয়।

কঙ্কাল-দ্বীপ

শ্রীঅক্ষয়কুমার চক্রবর্ত্তী

ইংরাজি ২০৫১ সাল।

কলিকাতা সন্নিহিত 'কিং জর্জ্জ ডক্' হইতে একখানি খাদ্যবাহী জাহাজ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অভিমুখে অগ্রসর হইতেছিল। সাগর সঙ্গম ছাড়াইয়া খানিক অগ্রবর্ত্তী হইতেই জাহাজখানি হঠাৎ তলদেশে কোন কিছুর সহিত প্রচণ্ডভাবে ধাক্কা খাইয়া একেবারে নিশ্চল হইয়া গেল। বিপদসূচক ঘণ্টাধ্বনি হইতেই কলকব্জা সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল এবং মুহূর্ত্তে ক্যাপ্টেন হইতে আরম্ভ করিয়া সারেং, ক্রু ও অপর কর্ম্মচারীদের ব্যস্ত ছুটাছুটি আর চীৎকারে চারিদিক মুখর হইয়া উঠিল।

প্রায় তিনশত বৎসর যাবৎ এই পথে জাহাজ যাতায়াত করিয়া আসিতেছে। এইরূপ অভিনব ঘটনা কোনদিন বাস্তবে সম্ভব বলিয়া কাহারও ধারণায় আসে নাই। সমুদ্রতল সহসা উঁচু হইয়া জাহাজের গতিরোধ করে, এরূপ উদাহরণ কখনও পাওয়া যায় নাই। পরীক্ষায় দেখা গেল, নিচের মাটির সঙ্গে জাহাজখানি বেশ শক্তভাবে আবদ্ধ হইয়া গিয়াছে। পিছনে চালু করিয়া উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা করা গেল, কিন্তু তাহাতে জাহাজ একচুলও নড়ে না। অথচ, অল্পসময়ের মধ্যে টানিয়া ভাসান্-জলে নামাইতে না পারিলে জাহাজখানি আড় হইয়া পড়িয়া সমূহ বিপদ ঘটার সম্ভাবনা। গত্যন্তর না দেখিয়া ক্যাপ্টেন্ সাহেব জাহাজ খালি করিয়া ভাসাইবার জন্য খাদ্যবস্তু জলে ফেলিয়া দিবার আদেশ দিলেন। নিমেষ মধ্যে হাজার হাজার টন্ খাদ্যশস্য জলের তলে চলিয়া গিয়া বেশ খানিক হাল্কা হইতেই জাহাজ ভাসিয়া উঠিল। বিপদ কোন রকমে কাটিল এ যাত্রায়, কিন্তু এরূপ ডুবো পাহাড় বা দ্বীপের অস্তিত্ব সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া বিপদ নিবারণে সচেতন হওয়া কর্ত্তব্য, চতুর ক্যাপ্টেন্ এই বিবেচনায় অকুস্থানটি বিশেষভাবে চিহ্নিত করিয়া পুনরায় কলিকাতা অভিমুখে জাহাজের মুখ ঘুরাইয়া দিলেন।

১৯৫২ সাল হইতে আজ একশত বৎসর যাবৎ ভারতবর্ষ খাদ্য সম্পদে স্বয়ংসম্পূর্ণ হইতে পারিয়াছে। উপরন্তু প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ টন্ খাদ্য বিদেশে রপ্তানি করিয়া প্রভূত সম্পদের অধিকারী হইয়াছে। ব্যবসায়ের কল্যাণে এখন ভারত বহু কোটী ডলার ও ষ্টার্লিং-এর মালিক। একশত বৎসর পূর্ব্বে তাহার অবস্থা যে অতি শোচনীয় ছিল, ভারতের অগণিত জনগণ না খাইতে পাইয়া যে এককালে তিলে তিলে প্রাণ দিয়াছে, তাহা এখন স্বপ্ন-কাহিনী বলিয়া মনে হয়। ইতিহাসের পৃষ্ঠা ছাড়া সে-দুর্দ্দিনের সাক্ষ্য কিছু নাই। চাকা ঘুরিয়া গিয়া আবার এদিকে যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়াছে—অন্যান্য দেশ হইতে ঋণ লইয়া খাদ্য কিনিয়া আজও কোন রকমে স্বাধীন রাষ্ট্রের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া আসিতেছে বটে, কিন্তু মিত্রশক্তির অপর নায়ক ব্রিটিশ দেউলিয়া হইয়া বসিয়া আছে। উভয় দেশের যুদ্ধাস্ত্র প্রস্তুতের কারখানাগুলি বহুদিন বন্ধ হইয়া গিয়াছে—'যুদ্ধ' শব্দটি এখন অভিধান হইতে মুছিয়া দিবার সময় আসিয়াছে। উহাদের প্রধান প্রধান শিল্প-উৎপাদক প্রতিষ্ঠানগুলিও একে একে লালবাতি জ্বালিতেছে। ভারতীয় শিল্পগুলির সহিত প্রতিযোগিতায় এখন আর তাহারা আঁটিয়া উঠিতেছে না। এদিকে চীন-ভারত মৈত্রী দানা বাঁধিয়া 'এশিয়ান্ ফেডারেশন্' গঠিত হইয়াছে। কার্য্যতঃ তাহারাই এখন পৃথিবীর একচ্ছত্র নায়ক। এই ফেডারেশনের নিকট ইঙ্গ-মার্কিনের টিকিটি পর্য্যন্ত বাঁধা। আজ মাত্র ক'এক হাজার টন খাদ্য সমুদ্রতলে ডালি দিয়া ভারতের বিশেষ লোকসান্ না হইলেও যুক্তরাষ্ট্রের যে অপূরণীয় ক্ষতি হইল, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। এগুলির দিকে চাহিয়া দিন গণিতেছিল অগণিত বুভুক্ষু মার্কিণ জনগণ।

ক্যাপ্টেনের রিপোর্ট পাইয়া ভারত সরকার তৎক্ষণাৎ আর এক জাহাজ খাদ্য যুক্তরাষ্ট্রে পাঠাইবার বন্দোবস্ত করিয়া অজ্ঞাত ডুবো পাহাড় সম্বন্ধে তথ্য অনুসন্ধানের জন্য ক'একজন বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করিলেন। বিশেষজ্ঞগণ প্রায় দশবর্গ মাইল পরিমিত স্থান জরীপ্ করাইয়া পূর্ব্বেকার গভীরতার সহিত তুলনামূলক বিচার করিয়া দেখিলেন, মাত্র এই একশত বৎসরে সমুদ্রপৃষ্ঠ সেই স্থানে প্রায় এক মাইলের মত উঁচু হইয়া উঠিয়াছে। সমুদ্রগর্ভ সম্বন্ধে সচেতন না থাকার ফলে ক্রমে ক্রমে এখানে একটি দ্বীপের জন্ম হইতে চলিয়াছে। কিন্তু সে যাহা হউক, সমুদ্র মোহনায় এই দশবর্গ মাইল পরিমিত স্থান এরূপ উঁচু হইয়া উঠিবার একটা কারণ নিশ্চয় আছে। ভৌগোলিক নিয়মে ভূ-ত্বকের পরিবর্ত্তনের যে যে কারণ তাঁহাদের জানা আছে, তাহার কোনটিই এক্ষেত্রে প্রকট নয়। নিকটবর্ত্তী আলিপুর আবহাওয়া পর্য্যবেক্ষণাগারের সিজ্‌মোগ্রাফেও এত কাছাকাছি কোন ভূমিকম্পের রেকর্ড ইতিমধ্যে নাই। অথচ, এ কেমন করিয়া সম্ভব হইল?

বহু জল্পনা-কল্পনার পর অগত্যা বিশেষজ্ঞগণ নিচেকার মাটী সংগ্রহ করিয়া পরীক্ষার জন্য ক'একজন ডুবুরি নামাইয়া দিলেন। সেখানকার গভীরতা দশ-বারো হাতের বেশি হইবে না। স্বল্পক্ষণের মধ্যে ডুবুরিরা ধরাধরি করিয়া যাহা তুলিয়া আনিল, তাহা দেখিয়া বিশেষজ্ঞদের চক্ষু কপালে উঠিয়া গেল। প্রত্যেকের সংগৃহীত বস্তু মাটী নহে, পাথরও নহে—প্রত্যেকখানি পৃথক পাথরের মত শক্ত মনুষ্যাকৃতি এক একটি জমাট কংক্রীট্। তাঁহাদের অভিজ্ঞতায় এ এক অভাবনীয় ব্যাপার। তবুও, বিস্মিত হইলেই শুধু চলিবে না, এগুলির যথাযথ পরীক্ষা প্রয়োজন। অতীব যত্নে সেগুলিকে প্যাক্ করিয়া সরকারী পরীক্ষাগারে পাঠানো হইল। কিন্তু বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরও এ-সম্বন্ধে বিশেষ কোন আলোকপাত করিতে না পারিয়া বৈজ্ঞানিকগণ প্রায় হতাশ হইলেন। ভূতাত্ত্বিকগণ শেষ পর্য্যন্ত এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে, সমুদ্রস্রোতের টানে বা জলের ক্রমাগত ঘূর্ণ্যনের ফলে সামুদ্রিক পাহাড় ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া প্রত্যেকখানি পৃথক ভাবে ঐরূপ আকার ধারণ করিয়াছে। গণ্ডকী নদীর স্রোতে যেমন শিলাখণ্ড ক্রমাগত একই আকার প্রাপ্ত হয় এবং ভারতীয় শাস্ত্ররাশি যেমন তাহার সহিত এক কাল্পনিক-কাহিনী জুড়িয়া ঐ শিলাগুলিকে শালগ্রামরূপে পূজা করে, প্রাকৃতিক নিয়মে অনুরূপ কোন প্রক্রিয়ায় এক্ষেত্রেও ঐরূপ অবিশ্বাস্য বিপর্য্যয় ঘটাইতেছে।

এই মন্তব্য অবশ্য অনেকখানি যুক্তিসহ, তবু মনে সন্দেহের অবকাশ থাকে। কারণ, পরীক্ষায় ইহাও জানা গিয়াছে, ওগুলি একশত বৎসরের অধিককাল জলে ডুবিয়া নাই এবং এই সময় মধ্যে অমন শক্ত জিনিস স্রোতের টানে হাজারে হাজারে ঐরূপ আকার ধারণ করিতে পারে না। তাই, ভারত সরকারের অনুরোধক্রমে তখনকার দিনের শ্রেষ্ঠ ভূতত্ত্ববিদ্ স্বয়ং এই গবেষণার ভার গ্রহণ করিলেন। ভূতত্ত্ব ছাড়া বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখাতেও ইনি সুপণ্ডিত।

একদা বর্ষণমুখর রজনীতে বহুক্ষণ গবেষণার পর শ্রান্ত দেহে বাড়ি ফিরিয়া তিনি শয্যায় দেহ এলাইয়া দিলেন। আজ পর্য্যন্ত সমাধানের কোন সূত্রই খুঁজিয়া পান নাই। চিন্তায় স্বভাবতই মস্তিষ্ক উষ্ণ হইয়া আছে, চোখে সহজে ঘুম আসে না—বিছানায় পড়িয়া এপাশ-ওপাশ করাই সার হয়। মধ্যে একবার উঠিয়া খানিক ঠাণ্ডা জল পান করিয়া মাথার কাছে পাখাটিকে পুরা দমে ছাড়িয়া দিলেন। উত্তপ্ত মস্তিষ্ক কিঞ্চিৎ শীতল হইয়া সবেমাত্র চোখে নিদ্রার আমেজ আসিয়াছে, এমন সময় বাহিরে রাস্তায় এক শবযাত্রী দল 'বল হরি হরিবোল' শব্দে পাড়া উচ্চকিত করিয়া জিগির তুলিল। নিদ্রার আমেজ ছুটিয়া গেল, ঘুম আসিতে আবার বেশ খানিক সময় লাগিল। তরল নিদ্রার মধ্যে তিনি স্বপ্ন দেখিলেন।···

নিকট কোন আত্মীয়ের হঠাৎ বিয়োগে শবযাত্রার সাথী হইবার জন্য তাঁহার ডাক পড়িয়াছে। প্রস্তুত হইয়া তিনি পথে বাহির হইয়াছেন। কিন্তু যেন মনে হইল, এ শহর তাঁহার বিশেষ পরিচিত নয়। পথের বিজ্ঞাপনগুলি কলিকাতা শহরই নির্দ্দেশ করে, কিন্তু এই কলিকাতা কি তাঁহার পরিচিত? শহরের পথঘাট তাঁহার অপরিচিত নয়, পরিচিত সে-শহরের বিস্তীর্ণ পথের পাশে শ্রেণীবদ্ধ

পঁচিশ-ত্রিশ-তলা অট্টালিকার সারি বিরতিহীন, অজস্র বিজলী আলোর মায়া-সমুজ্জ্বল, জলস্রোতের মত অবিরাম মানুষ আর গাড়িঘোড়ার স্রোত। কিন্তু এ-কলিকাতা মাত্র চার পাঁচ তলা বাড়ির পাশে নোংরা বস্তিতে পূর্ণ, পূতিগন্ধময় তাহার বিষাক্ত-নিঃশ্বাস, পথে কাদার প্যাচ্-প্যাচ, সর্ব্বত্র আধা অন্ধকারময়। শতবর্ষের পুরানো কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন নাকি? যাহাই হউক, দলের সঙ্গী হইয়া তিনি নিমতলা ঘাটে আসিয়া পৌঁছিলেন। আত্মীয়ের বিয়োগ-ব্যথায় তিনি মুহ্যমান, বিশেষ করিয়া মৃতের তরুণী পত্নীর বুকফাটা আর্ত্তনাদ তাঁহাকে বিচলিত করিয়াছে—তবু উপায় নাই, কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতেই হইবে

যথারীতি চিতা প্রস্তুত করিয়া অগ্নিসংযোগ করা হইল। ধূ-ধূ করিয়া আগুন জ্বলিয়া উঠিতেই শবের উপরের চামড়াটি পুড়িয়া গুটাইয়া গিয়া খানিক জল বাহির হইয়া চিতা নিবাইয়া দিল। আবার কাঠ সাজাইয়া আগুন জ্বালিতে খানিক সময় গেল। এবার দাউ-দাউ করিয়া আগুন জ্বলিয়া উঠিল। কিন্তু আশ্চর্য্য, ঘণ্টার পর ঘণ্টা জ্বলিয়াও শবদেহের এতটুকু বিকৃতি হইল না। কঠিন পাথরের মত সোজা শুইয়া আছে শবটি—এতটুকু ক্ষয় নাই, পোড়ার লক্ষণ নাই। অমানুষী পরিশ্রমে তাহার এতটুকু অংশও কমানো যায় না, অথচ বেশ ক'একমণ কাঠ পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল। কেহ বলে, কলিতে চার পোয়া পাপ পূর্ণ হইয়াছে; আবার কাহারও মতে ভৌতিক ব্যাপার।

হট্টগোলের মধ্যে শ্মশানরক্ষক আসিয়া পরিস্থিতি জানিতে চাহিলেন। বিবরণ শুনিয়া তিনি বলিলেন, কিছুদিন যাবৎ অনুরূপ ঘটনা হামেসাই ঘটিতেছে। শব আর আজকাল কিছুতেই পোড়ে না, খানিক জল বাহির হইয়া চিতা নিবিয়া যায়, আর পড়িয়া থাকে পাথরের মত কঠিন নরদেহের বাকি অংশ। শত চেষ্টাতেও তাহার এতটুকু ক্ষয় করা যায় না। অন্যান্য ক্ষেত্রে যেরূপ হইয়া থাকে, সেইরূপই সমুদয় দেহটি গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপ করিতে তিনি উপদেশ দিয়া গেলেন।

বৈজ্ঞানিকের নূতন পরীক্ষাস্পৃহা সজাগ হইয়া উঠিল। গঙ্গাগর্ভে বিসর্জ্জন না দিয়া মৃতদেহটি পরীক্ষাগারে আনার ব্যবস্থা করিলেন। ক্ষীণ একটি আলোর রশ্মি যেন এতক্ষণে চোখে পড়িতেছে। সমুদ্র হইতে আনীত পাথর-গুলি এইরূপ নরকঙ্কাল হইলেও হইতে পারে। স্নানাহার বন্ধ করিয়া তিনি দিনরাত সমানে গবেষণা করিয়া চলিলেন এবং শেষে নরদেহটি বিশ্লেষণে ফল এইরূপ দাঁড়াইল—প্রোটিন্—৪%, ফ্যাট্—৩%, কার্ব্বো হাইড্রেট্—১%, ষ্টার্চ—·৫%, ক্যালসিয়াম্—·৫%, লবণ—৫%, ভিটামিন্—২%, শর্করা—২%, জল—৫% (এখন নাই)। এ ছাড়া, কাঁকর—৩৫%, সোপষ্টোন্—২০%, শেয়ালকাঁটা রস—২%, তেঁতুল বিচি—৫%, পাথর গুঁড়া—১০% আর জান্তব চর্ব্বি—৫% (বনস্পতি মিশ্রণে)।

এই সকল উপাদানের ক্রমাগত সংমিশ্রণে দেহযন্ত্রের রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় মনুষ্যদেহ এই অদ্ভুত শিলীভূত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহা অদাহ্য এবং অক্লেদ্য।...

ছ্যাৎ করিয়া ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। এ আবার কি স্বপ্ন?...

বুঝিলেন, গবেষণা বিষয়ক চিন্তায় নিমগ্নতা হেতু আজে-বাজে স্বপ্ন দেখিয়াছেন মাত্র। তবুও স্থির থাকিতে না পারিয়া তখনই পরীক্ষাগারে ছুটিলেন এবং ঐ আলোকে পরীক্ষায় মনোনিবেশ করিলেন। স্বপ্নদৃষ্ট সমাধান কি তাঁহাকে পথ দেখাইয়া দিল? কিন্তু একি, এ যে সত্যই—

বাস্তব সত্য প্রকট হইয়া চোখের সম্মুখে ধরা দিয়াছে। স্বপ্নদৃষ্ট ফলাফলের সহিত এখনকার সমাধান হুবহু মিলিয়া যাইতেছে। বিভিন্ন খাদ্য বস্তুর সহিত মনুষ্যদেহে কাঁকর, সোপষ্টোন্, শেয়ালকাঁটা রস, জান্তব চর্ব্বি, গুঁড়া পাথর, তেঁতুলবিচি প্রভৃতি এত অধিক পরিমাণে প্রবিষ্ট হইয়াছে যে, ঐ সকলের রাসায়নিক সংমিশ্রণে গ্রানাইট্ পাথরের মত কঠিন জীবাশ্ম গঠিত হইয়াছে এবং শতবর্ষ পূর্ব্বে সেগুলিকে ক্রমাগত গঙ্গাগর্ভে নিমজ্জনের ফলে সমুদ্রে বাহিত হইয়া একত্রে একস্থানে মিলিয়া প্রবাল দ্বীপের মত এই দ্বীপ সৃষ্টি করিয়াছে। আর সেই হেতুই ভূতাত্ত্বিক গবেষণায় এতদিন কোন ফল পাওয়া যায় নাই।

ভারত গভর্ণমেণ্টের দপ্তরে যথাসময়ে এই রিপোর্ট্ পেশ হইয়াছিল, কিন্তু ইহার মর্ম্ম কোনদিন সাধারণ্যে প্রচারিত হইয়াছিল বলিয়া আমাদের জানা নাই।

স্বপ্ন-সমাধি

শ্রীশিবদাস চক্রবর্ত্তী

কেমন করে এই কথাটি কইবো আমি লোকের মাঝে—
তুমি-হারা দিন এ বুকে ব্যথার মতো বিষম বাজে!
আকাশ পাতাল ভাবি বসে, কোনো কিছুর পাইনে দিশা,
আমার চোখে সমান আঁধার দুপুর দিবা, নিশীথ নিশা।
ভোরের আলোর মূর্চ্ছনাতে রাঙায় যখন আকাশখানি
মোর কাছে সে—অন্ধকারে যেন আলোর ব্যঙ্গ বাণী।
পূর্ণা রাতের জ্যোৎস্নাধারার আকাশ হেরি আলোয় আলো,
আমার ঘরে দীপ জ্বলে না, সবই নিবিড় কালোর কালো;
নীল আকাশের নিলাজ তারা চেয়ে আমার মুখের পানে
কী যে করে কানাকানি পরস্পরে—তারাই জানে।
মেঘ-মেদুর বাদল রাতের অসীম আঁধার আমার সাথে
চমক-চপল বিজুল-হাসে লজ্জাবিহীন ব্যঙ্গে মাতে।
হারিয়ে-যাওয়ার মহোৎসবের প্রাঙ্গণে আজ দাঁড়িয়ে একা
সজল চোখের চাউনি হানি' আপন কারও পাইনে দেখা।
যক্ষ হতেও নিঠুরতরো অভিশাপে মগ্ন আমি,—
তার বিরহ বর্ষ ব্যাপী, মোর বিরহ জীবনগামী।

বন্দী হয়ে রামগিরিতে বিরহেরি কারাগারে
কেমন করে দিন কাটে মোর সে-কথা কেউ বোঝে নারে।
বিলাস-বিভোল ভূকৈলাসে সখাবিহীন অলকাতে
আমার কথা ভেবে তোমার জল ঝরে কি আঁখিপাতে?

আমার নামে গান রচিয়া বীণা করে লয়ে তুলে
হয় তো কখন গাইতে গিয়ে মূর্চ্ছনা যাও ভুলে ভুলে;
হঠাৎ হাওয়ার চমকানিতে, উড়ো পাখির আলাপ শুনি'
বুকের মাঝে উথলে ওঠে অপার ব্যথার সুরধুনী।

বাস্তবে যে পাওয়ার অতীত তারেই চাওয়া কল্পনাতে,
তাই কি আমার সঙ্গসুখের মদির খোঁজো অর্দ্ধরাতে?
দেহের মায়া মুক্ত হয়ে নিশীথ রাতের অন্ধকারে
হে প্রাণময়ী, নিত্য আসো স্বপ্নে আমার অভিসারে।
হয় তো এ মোর ভাবনা-চপল পাগল মনের প্রগলভতা,
মন যা বলে সত্য ভেবে সে-ই তো শুধু সত্য কথা।
এমন দিনে সাথী হয়ে কাছে যদি থাকতে তুমি,
শ্যামলিমায় উঠতো ভরে আমার মনের মরুভূমি;
শুক্‌নো গাছের ডালে ডালে ধরতো আবার কাঁচা পাতা,
সাহারা-বুক বিদারিয়া কচি তৃণ তুলতো মাথা।
হারিয়ে-যাওয়ার দুঃখ যতো, না-পাওয়ারি লক্ষ গ্লানি
পরম পাওয়ার আনন্দে সব মিথ্যা হতো জানি জানি।
তুমি আমার ছিলে না কেউ, আজিও নও—সবাই জানে,
আপন কি সে হয় না! যেজন মন্ত্র বাঁধন নাহি মানে!

আমার চাওয়ার মতো হয়ে এসেছিলে আমার কাছে,
হৃদয় নেচে উঠেছিলো তোমার চপল চোখের নাচে;
গোলাপ-রঙীন অযুত ফাগুন বন-কোয়েলীর কলগীতে
এসেছিলো তোমার পিছে সবার চোখের অলক্ষ্যিতে।
হৃদয় বলে উঠেছিলো—এই তো পেলাম, খুঁজি যারে,
সুন্দরী,—সে এসেছে আজ সুন্দরেরি অভিসারে।
চেয়ে পেয়েই হারিয়ে ফেলে, এমনিতরো আমি কাঙাল,
আমার ভাগ্যে চিরতরে সইবে কেন রাজার এ হাল!
তাই সুখ-নীড় লক্ষ্য করে কাল বোশেখী করলো ধাওয়া,
এক নিমিষে মিথ্যা হলো সকল চাওয়া, সকল পাওয়া।
এমনি করেই মিষ্টি হাসি মিলায় হঠাৎ মুখের 'পরে,
পাখির কল কাকলি তান বিজন বন বনান্তরে।

ঈরাণের শিল্প ও সংস্কৃতি

শ্রীগুরুদাস সরকার

[পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর]

কাল-সূচীর দিকে লক্ষ্য রাখিয়া ঐতিহাসিক বিচারে প্রবৃত্ত হইলে জরথুষ্ট্রের প্রধান পৃষ্ঠপোষক বলিয়া বর্ণিত গুস্তাস্প নরপতির স্থান যে কোথায়, তাহা নির্ণয় করা সহজ নয়। ডাঃ, এ, বি, কিথ-এর (A. B. Keith-এর) মতে গুস্তাস্প ও কবি বিস্তাস্প হাইটাস্ পেজের (Hytaspes-এর) সহিত অভিন্ন নহেন (১২)।

ডাঃ কিথ বলিতে চাহেন যে, ইনি ছিলেন কিয়ানীয় বংশীয়, একিমিনীয় বংশের সহিত ইঁহার কোনও সম্পর্ক ছিল না। যে গুস্তাস্প নরপতির রাজসভায় ধর্ম্মমত ব্যাখ্যা করিয়া জরথুষ্ট্র তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাকে বিস্তাস্প বলিয়া ধরিয়া লইলে ঐতিহাসিক কালপর্য্যায়ের দিক দিয়া নাকি গোল বাধে। জরথুষ্ট্রের আবির্ভাবকাল না আগাইয়া দিয়া কয়েক শতক পিছাইয়া দিলেই সামঞ্জস্য বিধান অনেকটা সহজ হইয়া পড়ে। সকল দিক বিবেচনা করিয়া ডাঃ হের্টস ফেল্ড-এর মতই যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয়। জরথুষ্ট্র যে কৃষিজীবী ও পশুপালক জনসাধারণের চিত্তাকর্ষণ ও তাহাদিগের সম্পূর্ণ সমর্থন লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন তাহা কেবল কল্পনা বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না বটে, কিন্তু একথাও অনস্বীকার্য্য যে প্রচার কার্য্যে তাঁহার সফলতার মূলে ছিল রাজা কিম্বা ভূস্বামীর সহায়তা ও সহানুভূতি। শুধু তাহাই নহে, তিনি দুইজন রাজ অমাত্যের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করায় রাজসভায় যে তাঁহার প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ ছিল, ইহাও ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে।

১২ Indian Historical Quarterly, March 1923, ref. to by T. Reswi in his "Parsis, a people of the Book."

ইঁহাদের একজনের নাম ফ্রাসাওস্ত্র! ইনি ছিলেন জরথুষ্ট্রের শ্বশুর, আর অপর জন, যাঁহার নাম জমাস্প, তিনি ছিলেন তাঁহার জামাতা। ইহারই সহিত পুরোচিস্তার বিবাহ হয়। প্রবাদ মতে ইঁহারা উভয়েই বিস্তাস্পের রাজসভা অলংকৃত করিয়াছিলেন।

গুস্তাস্প লইয়া গোলযোগ

কিন্তু গুস্তাস্প লইয়া যে কিছু গোলযোগ রহিয়াছে। সাহনামার বর্ণনা মতে গুস্তাস্পের পিতা লোহ্রাস্প্ নৃপতি কাইকাউস কর্ত্তৃক রাজপদে মনোনীত হইয়াছিলেন। এদিকে হাইটাস্পেসের পূর্ব্ববর্ত্তী রাজার নাম আর্সামেস্, হাইটাস্পেস্ স্বয়ং রাজপদে অভিষিক্ত হন নাই। একিমিনীয় রাজাদিগের তালিকায় লোহ্রাস্প্ নামক কোনও নরপতির উল্লেখ নাই। সুতরাং এ ধার দিয়া লোহ্রাস্পের সঠিক সনাক্তকরণ যে সম্ভব নয়, ইহাই মানিয়া লইতে হয়। কথিত আছে যে, লোহ্রাস্প্ বার্দ্ধক্যে উপনীত হইতে না হইতেই গুস্তাস্প্কে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া স্বয়ং রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। গুস্তাস্প্ নাকি যথার্থই ভারতের সিন্ধুপ্রদেশ নিজ আয়ত্তে আনয়ন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। পারসীক ও আরবীয় গ্রন্থকারদিগের উক্তি হইতে অন্ততঃ এইরূপই একটা ধারণা জন্মে। অবৈজ্ঞানিক ইতিবৃত্তে দেরিয়ুস কর্ত্তৃক সিন্ধু বিজয়ের কথা কোনও পূর্ব্ববর্ত্তী অর্দ্ধকাল্পনিক রাজার প্রতি আরোপিত হওয়া অসম্ভব নয়। গুস্তাস্প নামে কোনও রাজা যদি সত্যই ঈরাণে রাজত্ব করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি যে পরাক্রান্ত প্রাচীন রাজ্যেশ্বরদিগের অন্যতম, তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু উপযুক্ত প্রমাণাভাবে এ সম্বন্ধে নিশ্চয় করিয়া কিছুই বলা যায় না। গুস্তাস্পকে জরথুষ্ট্রের সমর্থনের জন্য যে যুদ্ধ ব্যাপারে লিপ্ত হইতে হইয়াছিল এ কথা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। শুধু গুস্তাস্প

নহে, তৎপুত্র ইস্‌ফান্দিয়ারও ছিলেন নাকি জরথুষ্ট্রীয় ধর্ম্মে মেরুদণ্ড স্বরূপ। লোহরাস্প, গুস্তাস্প, ও ইস্‌ফান্দিয়ার সাইনামায়, পর পর এই তিনজন রাজা, জরথুষ্ট্রের পরম সহায়করূপে বর্ণিত হইয়াছে।

প্রবাদ মূলক কাহিনী হইতে একথা স্পষ্টই বুঝা যায় যে তুরাণীয়েরা প্রথমে বিরোধিতা করিলেও পরে তাহারা জরথুষ্ট্রের ধর্ম্মই গ্রহণ করে এবং পারসীকদিগের উপাসনা পদ্ধতি যে ক্রমে আর্ম্মেনিয়া কাপাডোসিয়া (এসিয়া মাইনর) এবং নিকট প্রাচীর (Near East-এর) সকলস্থানেই যে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল গ্রীক ঐতিহাসিক ষ্ট্রাবো তাহার সাক্ষ্য দিতেছেন।

তুরাণীয় বাধা অতিক্রম।

জরথুষ্ট্র যে খ্রীঃ পূঃ ১০০০ হইতে ১৫০০ অব্দের মধ্যে বিদ্যমান ছিলেন, জরথুষ্ট্রবাদী সুশিক্ষিত ভারতীয় পারসী-কেরা এখন এই মতই পোষণ করেন (১৩)। প্রাচ্যবিদ্যায় যাঁহারা বিশেষজ্ঞ বলিয়া পরিচিত, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ অনুমান করিয়াছেন যে, তিনি জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন খ্রীঃ পূঃ ১০০০ কি ১২০০ অব্দে কিম্বা তাহারই কাছাকাছি কোনও সময়ে। মোটের উপর বলা যাইতে পারে যে, তাঁহার আবির্ভাবকাল খ্রীঃ পূঃ ৬০০ কি ৫৫০ অব্দের এধারে আর পিছাইয়া লওয়া চলে না। খুব সম্ভবতঃ খ্রীঃ পূঃ ১০০০ হইতে খ্রীঃ পূঃ ৫০০ কি ৫৫০ অব্দের মধ্যবর্ত্তী কোনও সময়ে তিনি আবির্ভূত হন। পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতদিগের মধ্যে কেহ কেহ একেবারেই নিরঙ্কুশ। ডার্ম্মেটেষ্টার জরথুষ্ট্রের মানবীয় অস্তিত্ব একবারে উড়াইয়া দিয়া তাঁহাকে বাত্যার দেবতা (Storm God) রূপে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করিয়াছেন। কেহ বা তাঁহাকে ইহুদীদিগের পিতা আব্রাহামের সহিত অভিন্ন. আবার কেহ বা তাঁহাকে গ্রীক ব্যবহারবিদ্ সোলন্ (Solon) বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। প্রাচ্য ঐতিহাসিক-দিগের মধ্যে মুসলমান ঐতিহাসিক অল্ বেরুণী, মাসুদী ও তবারী-ই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিন জনেরই মতে

জরথুষ্ট্রের আবির্ভাব কাল ও তাঁহার সম্বন্ধে বিবিধ মতবাদ

জরথুষ্ট্র খ্রীকাধিকারের মাত্র আড়াই শত বৎসর পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন(১৪)। মহাবীর আলেক্‌জান্দর (Alexander the Great) পারস্য জয় সমাধা করেন ৩০০ খ্রীঃ পূঃ অব্দে, তাই ইঁহাদিগের কথা মানিয়া লইলে জরথুষ্ট্রের আবির্ভাব কাল ৫৫০ খ্রীঃ পূঃ অব্দে গিয়া পৌঁছে। এ মতটি, জরথুষ্ট্র যে সপ্তম শতাব্দীর শেষপাদে অথবা ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে বিদ্যমান ছিলেন, ডাঃ হের্টস্ ফেল্‌ডের এই অনুমান সমর্থন করে। "ত্রাবাদিন্ যাস্ত্" নামক পারসীকদিগের একখানি ধর্ম্মগ্রন্থে জরথুষ্ট্র যে বুদ্ধদেবের পরবর্ত্তী ছিলেন, এইরূপ লিখিত আছে বলিয়া জানা গিয়াছে(১৫)। এই মত গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে হয় না। পারসীকেরা যাস্তের এ উক্তিতে গুরুত্ব অর্পণ করেন না।

জরথুস্তের মতবাদ হইতে যতদূর জানা যায়, তিনি চাহিয়াছিলেন একটি পাপলেশহীন রাজ্য সংগঠন করিতে! সে রাজ্যের আইন কানুন ও তৎ-সংক্রান্ত বিধি নিষেধ এরূপ ভাবে রচিত হইবে যে, ঈরাণের ও তুরাণের লুণ্ঠনজীবী যাযাবর জাতিসমূহ পশুপালন ও কৃষিকার্য্য অবলম্বন করিয়া মিতব্যয়িতার দ্বারা সৎভাবে জীবনযাপন করিতে সমর্থ হয়।

ভেন্দিদাদ ও জরথুষ্ট্রের মতবাদ।

তখনকার কালে গৃহপালিত পশুর মধ্যে গোজাতিই ছিল শ্রেষ্ঠতম। উষ্ট্র মর্য্যাদায় ইহার পরবর্ত্তী স্থান অধিকার করিয়াছিল। আবেস্তায় অশ্বের, এবং প্রসঙ্গক্রমে ছাগের উল্লেখ আছে। কিন্তু গর্দ্দভের মাত্র একবার উল্লেখ দেখা যায়। মনে হয় পালিত পশুদিগের মধ্যে গর্দ্দভ সেরূপ উচ্চস্থান পায় নাই। কুক্কুর পবিত্র বলিয়া বিবেচিত হইত এবং ইহার কোনও রূপ হানি করা একেবারেই নিষিদ্ধ ছিল। কোনও কোনও ধর্ম্মানুষ্ঠানে কুক্কুরের প্রয়োজন হইত এবং কেহ মরিয়া গেলে মৃত ব্যক্তির শব কুক্কুরকে দেখান হইত(১৬)। ভেন্দিদাদে উক্ত

পালিত পশুর উল্লেখ

১৩ Prof. A. R. Wadia, Perspective, October 1945.

১৪ T. Rizwi, Persis, a people of the Book, p. 26.

১৫ প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৩, পৃঃ ১৪৭।

১৬ W. M. McGovern, The Early Empires of Central Asia. p. 76.

হইয়াছে যে, কৃষিকর্ম শুধু সততার সহিত জীবন যাত্রার উপায় মাত্র নয়, শ্রীবৃদ্ধি লাভেরও উপায় বটে। যাহা কিছু মন্দ তাহা সমগ্রভাবে পরিহার করিয়া যম ও নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া যাহাতে মানবেরা সৎপথে বিচরণ করিতে পারে, সেই সকল বিধিনিষেধই ভেন্দিদাদে প্রদত্ত হইয়াছে। ভেন্দিদাদ বৃহৎ গ্রন্থ, দ্বাবিংশ অধ্যায়ে সমাপ্ত।

ভেন্দিদাদের বিষয় বস্তু

দ্বৈতবাদমূলক সৃষ্টির বর্ণনা, যিমের রাজত্বকালীন স্বর্ণযুগের বিবরণ, হিমপাতজনিত সৃষ্টি ধ্বংসের কথা, স্মৃতি-শাস্ত্র বিষয়ক বিধিনির্দ্দেশ, অশৌচ ও শুদ্ধি প্রকরণ, এবং জরথুস্ত্রের ভবিষ্যদ্দৃষ্টি ও চিকিৎসা সম্পর্কিত কয়েকটি বিভিন্ন অধ্যায় ইহাতে সংযোজিত আছে(১৭)। কতকটা পরবর্ত্তীকালে রচিত হইলেও জোরোয়াস্ত্রীয় ধর্ম্মের মূল তথ্য ভেন্দিদাদেই নিহিত রহিয়াছে।

জোরোয়াস্ত্রীয় ধর্ম্মে হরমুজদ্, অহুরমাজদা, অথবা অরমাজদ্'ই ঈশ্বর স্থানীয়। এ নামটি জরথুস্ত্রের আবিষ্কার নয়। তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী একটি আসিরীয় (Assyrian) লিপিতে ইহা উল্লিখিত আছে বলিয়া জানা গিয়াছে। নক্স-ই-রুস্তমে হরমুজদ্ দেবের শিরোদেশ অঙ্কিত রহিয়াছে (১৮), আর তাঁহার সম্পূর্ণ মূর্ত্তিটি ক্ষোদিত আছে তাক্-ই-বোস্তানে, একখানি অভিষেক চিত্রের পশ্চাদ্ভাগে (১৯)। শ্রীরাম চন্দ্রের হরমুজদ্ও পরিকল্পিত হইয়াছেন আদর্শ প্রাচ্যদেশীয় নৃপতিরূপে। তাঁহার অহুর-মাজদা এই পুরা নামটি সংস্কৃতভাষায় রূপান্তরিত হইলে দাঁড়াইবে "অসুর মেধাস্"। মাজদা সত্য (ঋত), ও সুনীতির আধার স্বরূপ। পুণ্যবানকে তিনি পুরস্কার দেন ও পাপীর শাস্তি বিধান করেন। তাঁহাকে একক কিছুই করিতে হয় না। তাঁহার সহকারীরূপে "অমেষ শপেন্ত" (Amesha Spenta) নামক দেবতামণ্ডলী, কি বিরোধে কি শান্তিতে, সকল

হরমুজদ্ ও জোরোয়াস্ত্রীয় ধর্ম্মের দেবতা মণ্ডলী।

সময়েই, তাঁহাকে সাহায্য করিয়া থাকেন। ইঁহারা সংখ্যায় ছয় জন—"বহুমনঃ" (বসুমনাঃ), "অষ" (ঋত)" "খষথ্ বৈর্য্য" (ক্ষত্র বৈর্য্য), "হৌর্বতাৎ" (সর্ব্বতাৎ), ও "অমেরেতৎ"। অমেষশ পেন্তারা এক একটি বিশিষ্ট গুণের মূর্ত্তিমান বিগ্রহ স্বরূপ। "বহুমনঃ" জ্ঞান ও সচ্চিন্তার দেবতা, এক কথায় "শরীরী বিবেক ও সৎপ্রবৃত্তি"। অষের পুরানাম "অষ বহিষ্ত" অতি মঙ্গলময় ঋত (right) শক্তি। তৈত্তিরীয় উপনিষদের শিক্ষাবল্লী ও আনন্দ বল্লীর প্রথম অনুবাকে 'ঋত' ও সত্যের উল্লেখ রহিয়াছে দেখা যায় ("ঋতং বদিষ্যামি, সত্যং বদিষ্যামি")। টীকায় ঋতের অর্থ শাস্ত্র অনুসারে নির্দ্ধারিত বলিয়া প্রদত্ত হইয়াছে। শিক্ষা বল্লীর নবম অনুবাকের প্রারম্ভে "ঋতঞ্চ স্বাধ্যায় প্রবচনে চ" অংশের টীকায় ঋতের অর্থ করা হইয়াছে "শাস্ত্র বিহিত কর্ম্ম"। অষের সহিত উপনিষদের ঋতের কতটুকু সাদৃশ্য তাহা ইহা হইতেই প্রতীয়মান হইবে (২০)।

জরথুস্ত্রীয় ধর্ম্মে "অষ" অতি উচ্চস্থান লাভ করিয়াছেন। সূর্য্য ও নক্ষত্রগণ এবং দিবালোক বিধাতৃ ঊষা দেবতারা ইঁহার প্রভাবেই স্রষ্টার গুণকীর্ত্তন করিতে বিদ্যমান রহিয়াছেন (যশ্ন ৫০।১০)। হবনের যোগ্য দেবগণ অষ বহিষ্তের প্রভাবেই তাঁহাদের যোগ্যতালাভ করিয়াছেন।

অহুর-মাজদার সৃষ্টিতে, জল ও উদ্ভিদ, পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র জীবগণ, এবং সাধুসজ্জনবৃন্দ, ইহাদের সকলের মধ্যেই "অষ" দেবতার বীজ নিহিত আছে (যশ্ন ৮।৪)। মোটের উপর "অষ" বুঝাইত ন্যায়পরায়ণতা আর ইহার উল্টা "দ্রুজ্" বুঝাইত প্রতারণা, পাপ ও অন্যায়। কালক্রমে ঋত নৈতিক জগতের দম ও নিয়মরূপেও পরিগণিত হইয়াছিল (২১)। "খষথ্ বৈর্য্য" (বরণীয় ক্ষত্র বা রাজশক্তি) অহুরের সহিত সালোক্য, "অরমৈতি" (বৈদিক অরমতি) ভক্তি এবং "হৌর্বতাৎ" (হউরবতা)

১৭ ভারতী. মাঘ, ১৩২৮ পৃঃ ৮৮৭।

(১৮) Herzfeld, Iran in the Ancient East, Pl. CXI

(১৯) প্রবাসী, বৈশাখ, ১৩৪০, ১১৯ পৃঃ চিত্র।

(২০) শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সানুবাদ তৈত্তিরীয় উপনিষদের পৃঃ ১২৭, ১৪৬ দ্রষ্টব্য।

(২১) অধ্যাপক বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ সংবর্দ্ধন লেখ-মালা, পৃঃ ৯৬, ৯৭।

পূর্ণতাজ্ঞাপক। শ্রীযুক্ত ননীমাধব চৌধুরী মহাশয় দেখাইয়াছেন (২২) যে অরমৈতিই ঋগ্বেদে অরমতি নামে উক্ত হইয়াছেন। এ নামটির প্রকৃত অর্থ "ঐশী শক্তির প্রতি ভক্তি"। আবার ইনি জরথুষ্ট্রের কন্যা বলিয়াও উক্ত হইয়া থাকেন। জরথুষ্ট্র ভক্তিবাদের স্রষ্টা বলিয়া বিবেচিত হইলে ইহার একটা ন্যায়সঙ্গত অর্থ করা যায় বটে, নতুবা বলিতে হয় যে, বৈদিক দেবতার নামের সহিত তাঁহার নাম যখন মিলিয়া যায়, তখন অরমৈতি দেবী রূপে পূর্ব্ব হইতেই পরিচিতা ছিলেন এবং দেবতার নাম অনুসারে কন্যার নাম রাখাই এ ক্ষেত্রে অধিক সম্ভব বলিয়া মনে হয়। "হউরবতা" স্ত্রী দেবতা, পূর্ব্বে ইনি যে ভাবেই পরিকল্পিত হইয়া থাকুন, পরে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিলেন "স্বাস্থ্য বিধায়িত্রী জল দেবতায়। অধ্যাপক বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ইহাকে আমাদের "সর্ব্বমঙ্গলা" ও শীতলা স্থানীয়া বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন (২৩)। "অমেরেতাৎ" (অমেরেতা) নামে অমরত্ব অর্থই প্রতিপাদিত হইয়াছে। "অমেরেতাৎ" শেষ পর্য্যন্ত দাঁড়াইয়াছেন দীর্ঘজীবনের অধিষ্ঠাত্রী বৃক্ষদেবতা-রূপে (২৪)। এই ছয়জন ও রক্ষাদেবতা "শ্রওষ"। (Sraosha) অথবা শুশ্রূষাকে লইয়া সর্ব্বসমেত সাতজনে মিলিয়া এই দেব পরিষদ"। বসন্ত বাবু "শ্রওষাকে" দেবতাদিগের "পুলিশ কমিশনার" স্থানীয় বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত আর এক শ্রেণীর দেবযোনি আছেন যাঁহারা "যজত" নামে অভিহিত। ইঁহারা সকলেই পূজার্হ বলিয়া পরিগণিত। ইঁহাদিগের পূজাবিধি মাজদীয় ধর্ম্মে সন্নিবিষ্ট হওয়ায় জরথুষ্ট্র প্রবর্ত্তিত একেশ্বরবাদ অনেকাংশে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে।

জরথুষ্ট্রের ধর্ম্মে দ্বৈতবাদ

আদিতে একেশ্বরবাদের উপরই জোর দেওয়া হইলেও জরথুস্ত্রের ধর্ম্ম, পরে দ্বৈত ভাবমূলক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অরমাজদ্ জীবন ও আলোকের কেন্দ্র আর অহিমান্ মৃত্যু, অন্ধকার ও কলুষের প্রতীক, কিন্তু অহিমান্ অরমাজদের সহিত সমশক্তিসম্পন্নরূপে বিবেচিত হইতেন কিনা, সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ রহিয়াছে বলিয়াই মনে হয়। মঙ্গল ও অমঙ্গল এই উভয় শক্তিই অরমাজদের অধীনে ক্রিয়াশীল রহিয়াছে। "স্পেণ্ড মৈন্যু" অথবা "স্পেণ্ড মৈন্যুষ" মঙ্গল শক্তি, জ্যোতি ও সৌন্দর্য্যের আধার। যাহা কিছু সুখকর ও হিতপ্রসূ তাহা এই শক্তি হইতেই সমুদ্ভূত। অপর শক্তি অংগ্রোমৈন্যু" (আধুনিক নাম অহিমান্)। পাপচিন্তার প্রবর্ত্তক এবং দুঃখ ও অমঙ্গলের জনয়িতা। 'অংগ্রো মৈন্যু'র অধীনে সাতজন পুরুষ ও স্ত্রী দেবারি মিলিত হইয়া "দেব শক্র" পরিষদ গঠিত। ইহাদের মধ্যে ইন্দ্রের এবং শৌর্বের (শর্ব অর্থাৎ শিবের) নামও পাওয়া যায়। জরথুষ্ট্রীয় ধর্ম্মমতে পরস্পর বিরোধী এই দুই শক্তি, দিবা ও রাত্রির ন্যায় অবিচ্ছিন্নভাবে সংযুক্ত থাকিয়া সৃষ্টি সংরক্ষণে নিযুক্ত রহিয়াছে। আমাদিগের ধর্ম্মগ্রন্থে যাঁহারা "দেবারি" বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন, পারসীক ধর্ম্মশাস্ত্রে তাঁহারাই "দেও" অর্থাৎ দেবনামে অভিহিত। আর ভারতীয় আর্য্যগণের যাঁহারা দৈবতা, তাঁহাদিগের মধ্যে অনেক কয়টিই আবেস্তা গ্রন্থে দানব হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। [ক্রমশঃ

(২২) প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ. ১৩৫৩, পৃঃ ১৪৫।

(২৩) হরপ্রসাদ সংবর্দ্ধন লেখমালা, পৃঃ ৯৫।

(২৪) ঐ ঐ

বড় মা

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

এক

সাবিত্রী তাঁহার সুসজ্জিত শয়নকক্ষে শয্যায় শয়ন করিয়াছিলেন। তিনি ভাবিতেছিলেন আর মধ্যে মধ্যে রোদন করিতেছিলেন। হাসপাতালে একমাত্র কন্যা লীলার মৃত্যুর পর গত পরশ্ব গৃহে ফিরিয়া তিনি শয্যা লইয়াছেন। গত পরশ্ব ও গত কল্য স্বামী যোগেশচন্দ্র স্ত্রীর নিকটেই ছিলেন এবং তাঁহার নির্ব্বন্ধাতিশয়ে সাবিত্রীকে সামান্য পানীয় গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। আজ স্বামীকে আদালতে যাইতে হইয়াছে। তিনি বিখ্যাত ব্যারিষ্টার; একটি বড় মোকর্দ্দমায় নিযুক্ত আছেন—না যাইলে মক্কেলের ক্ষতি হইবে। মাদ্রাজী দাসী—"আয়া"—দুই বার আসিয়া সাবিত্রীকে জিজ্ঞাসা করিয়া গিয়াছে, সে কি কোন আহার্য্য বা পানীয় আনিবে? শেষ বার সে বলিয়া গিয়াছে—"সাহেব" বলিয়া গিয়াছেন, "মেম সাহেব" যেন উপবাসী না থাকেন। সাবিত্রী কেবল "না" বলিয়া তাহাকে বিদায় দিয়াছেন। তিনি ভাবিতেছিলেন।

সাবিত্রীর মনে হইতেছিল, তিনি একা—শূন্যতা তাঁহাকে পীড়িত করিতেছিল। পুত্র আশুতোষ কাছে নাই—বিদেশে; কন্যা লীলা প্রথম সন্তান প্রসবের সময় প্রাণ হারাইয়াছে। সংসারে স্বামী আর স্ত্রী। এতদিন স্বামীর মতে অবিচলিত শ্রদ্ধা ও স্বামীর প্রতি সর্ব্ববিষয়ে অসাধারণ নির্ভরশীলতার জন্য সাবিত্রী কিছুতেই মনে করিতে চাহেন নাই—তিনি কাহারও তুলনায় একা। স্বামী অধিক সন্তান ভালবাসেন না—তিনি বিলাত হইতে ব্যারিষ্টার হইয়া আসিবার পরে তাঁহার আর কোন সন্তান হয় নাই। সেই বিষয়ে সাবিত্রীর ভগিনীপতি এক দিন বলিয়াছিলেন, সে জন্য তাঁহার ভগিনী জয়ন্তী দুঃখ করিতে ছিলেন। সেই কথার উল্লেখ করিয়া যোগেশচন্দ্র স্ত্রীকে বলিয়াছিলেন, মানুষের মন এমনই যে কুসংস্কারকেও সংস্কারে পরিণত করে। তিনি বলিয়াছিলেন, "তোমার আর কোন সন্তান হয়নি ব'লে, তোমার দিদি দুঃখ করেছেন, এই কথা তাঁর স্বামী বলেছিলেন। তিনি শিক্ষিত লোক অথচ তিনি তাঁ'র স্ত্রীকে বলেননি, যেকালে সমাজে মানুষ বাড়ার প্রয়োজন ছিল, সেই কালের কথায় বাইবেলে আছে, যা'র সন্তানের সংখ্যা অধিক সে ধন্য, কেন না তা'র তূণীর বাণে পূর্ণ; সেই সময়ে ইহুদীরা মনে করত, মেয়েদের সন্তান না হওয়া নিন্দার কথা; আর আমাদের দেশের শাস্ত্রকথা—ছেলের জন্যই বিবাহ। যেন মানুষের আর কোন কামনা নাই! এখন অবস্থার পরিবর্ত্তন হয়েছে, লোক-সংখ্যার সঙ্গে ভূমির পরিমাণের সামঞ্জস্য রক্ষা করা দুষ্কর হয়ে উঠেছে—ছেলেদের উপযুক্ত ভাবে 'মানুষ' করাও ব্যয়সাধ্য।" শুনিয়া সাবিত্রী জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "শুনে তিনি কি বললেন?" স্বামী যোগেশচন্দ্র তাহাতে বলিয়াছিলেন, "এ বিষয় নিয়ে তাঁ'র সঙ্গে তর্ক করিনি; ঠাট্টা ক'রে বলেছি, 'ছেলে কেমন ক'রে হবে বলুন ত? ভগবানের একটা বাজেট আছে—বৎসরে এত ছেলে হবে। তা'র পরে ভাগ হবে—এশিয়ায় এত, ভারতবর্ষে এত, বাঙ্গালায় এত—ইত্যাদি। তা আপনারা জনকয়েকেই ত বাজেটের বরাদ্দ ফুরিয়ে দিয়েছেন; আপনার ত সাত আটটি।" শুনিয়া সাবিত্রী স্বামীর হাসিতে যোগ দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার মনে কেমন যেন অস্বস্তি অনুভূত হইয়াছিল, সেও সংস্কার—দিদির আটটি সন্তান—তাহার উল্লেখ না করিলেই ভাল হইত—যেন যাহাকে 'চোখ দেওয়া' বলে তাহাই করা হইয়াছে।

আজ সাবিত্রীর মনে হইতেছিল, তিনি একা। পুত্র আশুতোষ আজ চার বৎসর ইংলণ্ডে—লীলার বিবাহের সময়ে সে আসিতে পারে নাই—জার্ম্মানীর সহিত যুদ্ধকালে জাহাজে বা বিমানে যাত্রীর স্থান পাওয়া দুষ্কর ছিল; সে আসিবার ছাড় পায় নাই।

আজ শোক যেন সাবিত্রীর স্মৃতির রুদ্ধদ্বার মুক্ত করিয়া দিয়াছিল—কত কথাই তাহার মনে পড়িতেছিল।

দুই

সাবিত্রী ধনীর কন্যা নহেন; পিতা গোকুলচন্দ্র জিলার সদর সহরে চাকরী করিতেন। সাবিত্রী দেখিয়াছেন, তিনি প্রতি শনিবারে রেল ষ্টেশন হইতে দুই ক্রোশ দূরবর্ত্তী গ্রামে গৃহে আসিতেন এবং রবিবারটা গৃহে থাকিতেন; রবিবারটা তাহার ও তাহার দিদি জয়ন্তীর পক্ষে উৎসবের দিন হইত; কারণ, গোকুলচন্দ্র কন্যাদ্বয়ের জন্য কতকগুলি দ্রব্য না লইয়া আসিতেন না; আর সঙ্গে সঙ্গে সংসারের আবশ্যক দ্রব্যও আনিতেন, তবে সে সকলে দুই ভগিনীর মনোযোগ দেখা যাইত না। সাবিত্রী শুনিয়াছেন, তাঁহাদিগের জন্মের পূর্ব্বে যখন সেদিকে রেলপথ রচিত হয় নাই তখন গোকুলচন্দ্রের পক্ষে পাঁচ ক্রোশ দূরস্থ সহর হইতে সকল ঋতুতে প্রতি শনিবারে গৃহে আগমন সম্ভব হইত না। পল্লীগ্রামে বাড়ী বিশেষ বড় না হইলেও তাহা গোকুলচন্দ্রের একার ছিল না—কয়জন জ্ঞাতি ভ্রাতারও তাহাতে অংশ ছিল এবং সেই জন্য গোকুলচন্দ্রের অংশে মাত্র দুইখানি শয়ন-কক্ষ ছিল। সাবিত্রীর বয়স যখন পাঁচ বৎসর তখন স্থানের অভাবেও বটে আর পরস্পরের মধ্যে সদ্‌ভাবের অভাবেও বটে জ্ঞাতি ভ্রাতাদিগের মধ্যে এক জন সেই গৃহ বিভাগের প্রস্তাব করিয়াছিলেন। সেই সময় আর একটি ঘটনা ঘটে—গোকুলচন্দ্রের দশ বৎসরের বড় এক দিদি ছিলেন, তাঁহার পুত্রকন্যা কিছুই ছিল না এবং তিনি বিধবা। তাঁহার স্বামী মৃত্যুকালে ব্যবসায়ে লাভে প্রায় বিশ হাজার টাকা রাখিয়া গিয়াছিলেন। সেই টাকাটা পাইবার জন্য চেষ্টা করিয়া দেবর দুই জন যখন ব্যর্থকাম হয়েন, তখন ভ্রাতৃজায়ার প্রতি তাঁহাদিগের ভক্তি বিরক্তিতে পরিণত হইতে বিলম্ব হয় নাই। ভ্রাতৃজায়াও সেই অবস্থায় আর সে গৃহে না থাকিয়া পিতৃগৃহে আসিতে চাহিয়াছিলেন—'সুখের চেয়ে স্বস্তি ভাল।' তিনি গোকুলচন্দ্রকে বলেন, পৈতৃক গৃহ ভাগ করিলে তাহাতে কাহারও স্থান-সংকুলান হইবে না—গোকুলচন্দ্র তাঁহার অংশ বিক্রয় করিয়া সহরে চলুন, তিনি তথায় বাড়ী কিনিবেন। সেই ব্যবস্থাই হইয়াছিল এবং তদবধি গোকুলচন্দ্র সপরিবারে সেই সহরেই ছিলেন। বাড়ী অবশ্য পিসীমা'র; কিন্তু পাছে কেহ কোন দিন ভ্রাতাকে বলে, তিনি ভগিনীর বাড়ীতে বাস করেন, সেই জন্য পিসীমা কখন সে বাড়ী আপনার বলেন নাই; বলিতেন, তিনিই ভ্রাতার বাড়ীতে আছেন। পিসীমা'র আশা ও ইচ্ছা ছিল গোকুলচন্দ্রের পুত্র হইলে, সে-ই তাঁহার সব সম্পত্তি পাইবে এবং সেই জন্য তিনি স্বামীর ত্যক্ত ভূসম্পত্তির জন্য মামলা করিতে উদ্যত হইলে তাঁহার দেবরগণ কয়হাজার টাকা দিয়া সে সম্পত্তিতে তাঁহার 'জীবন স্বত্ব' কিনিয়া লইয়াছিলেন। তাহাতে পিসীমা'র টাকার অঙ্কটা বাড়িয়া গিয়াছিল। গোকুলচন্দ্রের আর কোন সন্তান হয় নাই এবং জয়ন্তী ও সাবিত্রীই তাঁহার স্নেহ সম্ভোগ করিয়া আসিয়াছেন। সেই সহরেই প্রথমে জয়ন্তীর ও তাহার পরে সাবিত্রীর বিবাহ হয়। জয়ন্তীর স্বামী শিশিরকুমার বিবাহের সময়ে সেই সহরে কলেজে অধ্যাপকের পদে পাইয়াছিলেন—ছোটখাট জমীদার পরিবারের সন্তান, বাস—সেই সহরেই। আর সাবিত্রীর স্বামী যোগেশচন্দ্র তখন ওকালতী পরীক্ষা দিয়াছেন—তাঁহারা দুই ভ্রাতা, পিতা সেই সহরেই উকীল—পশার মাঝামাঝি। সেও আজ অনেকদিনের কথা। তাহার পরে সংসারে কত পরিবর্ত্তিত হইয়াছে!

যোগেশচন্দ্র ওকালতী পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া সহরেই ওকালতী করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, হাইকোর্টে যাইয়া ওকালতী করিবেন এবং কিছু অর্থ সঞ্চয় করিয়া ইংলণ্ডে যাইয়া ব্যারিষ্টার হইয়া আসিবেন। কিন্তু অর্থের অভাবে তাঁহার সে ইচ্ছা পূর্ণ হইবার কোন সম্ভাবনা তিনি দেখিতে পাইতেছিলেন না এবং সেই জন্য ব্যর্থ উচ্চাকাঙ্ক্ষা তাঁহার মনে বিষাদের সঞ্চার করিয়াছিল। তিনি আপনার আকাঙ্ক্ষার বিষয় বিবেচনা করিয়া আপনি মনে করিতেন, তাঁহার পক্ষে সেরূপ আকাঙ্ক্ষা—"ছেঁড়া চাটাইয়ে শুয়ে দেখা লক্ষ টাকার স্বপন।" তাঁহার প্রথম সন্তান আশুতোষের জন্ম তাঁহার পরিবারে যেমন, তাঁহার শ্বশুরালয়ে পিসীমা'র কাছেও তেমনই বিশেষ আনন্দের কারণ হইয়াছিল। তাঁহার

পিতৃগৃহে তাঁহার পরে সে-ই প্রথম সন্তানের আবির্ভাব। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার কোন সন্তান হয় নাই। আর তাহার শ্বশুরালয়ে সাবিত্রীর পুত্র লাভের পূর্ব্বে জয়ন্তীর সন্তানলাভ হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাঁহার প্রথম সন্তান দুইটি কন্যা।

পিসীমা আশুতোষকে পাইয়া বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন; তিনিই তাহার নাম রাখিয়াছিলেন—আশুতোষ। তিনি একদিন সাবিত্রীকে জিজ্ঞাসা করেন, যোগেশচন্দ্রের মুখ দেখিয়া মনে হয়, সে যেন সর্ব্বদাই বিষণ্ণ; তাহার কারণ কি? সাবিত্রী সে কথা স্বামীকে বলিলে যোগেশচন্দ্র স্ত্রীকে সকল কথা বলেন—অর্থের অভাবে তিনি আপনিও সুখী হইতে পারিলেন না—আর সকলকেও সুখী করিতে পারিলেন না। সাবিত্রীর নিকট তাহা শুনিয়া পিসীমা ভাবিয়াছিলেন, সত্যই ত—অমন হীরার টুক্‌রা ছেলে—উহার ত উন্নতি হওয়াই সঙ্গত। তিনি ভ্রাতার সহিত পরামর্শ করেন—তাঁহাকে বলেন, "তোমার ত ঐ দুই মেয়ে; আমার যা' কিছু আছে, ওরাই সব পাবে—আমি শ্বশুর বাড়ীর যা'রা আমাকে ঠকাবার চেষ্টা করেছে, ত'াদের একটি পয়সাও দিব না। দেখ না, জামাইকে কলিকাতায় পাঠান যায় কি না?" তখন আলোচনা চলে। দেখা যায়, হাইকোর্টে কিছুদিন ওকালতী করিয়া ইংলণ্ডে যাইলে অল্পদিনেই যোগেশচন্দ্র ব্যারিষ্টার হইয়া আসিতে পারেন; ব্যয়ও অল্প হয়।

পিসীমা টাকা দিলে যোগেশচন্দ্র কলিকাতায় গমন করেন—তথা হইতে দ্বিতীয় বৎসরে ইংলণ্ডে যাইয়া ব্যারিষ্টার হইয়া ফিরেন। তাঁহার ইংলণ্ড যাত্রার অব্যবহিত পূর্ব্বে তাঁহার দ্বিতীয় সন্তান—কন্যা লীলা প্রসূত হয়।

তাহার পর বৎসরের পর বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে—আর কি পরিবর্ত্তনই হইয়াছে! সেই পরিবর্ত্তনের মধ্যে মৃত্যুর প্রভাব কত দ্রুত ও কত প্রবল হইয়াছে! প্রথমে—যোগেশচন্দ্র বিদেশে যাইবার অল্পদিন পরে তাঁহার পিতার মৃত্যু হয় এবং এক বৎসর না যাইতেই তাঁহার অগ্রজের লোকান্তর ঘটে। পিতার মৃত্যুশয্যায় শেষ কথা—"যোগেশ যখন বিদেশে যায়, তখনই মনে কেমন আশঙ্কা হয়েছিল, তা'র সঙ্গে আর আমার দেখা হ'ল না। তা'র মঙ্গল হ'ক।" তদবধি সাবিত্রীকে অনেক সময় শাশুড়ীর কাছে থাকিতে হইয়াছিল; যোগেশচন্দ্রের অগ্রজের মৃত্যুর পরে তাঁহার বিধবাকে তাঁহার মাতা ও ভ্রাতারা প্রায়ই তাঁহাদিগের নিকট লইয়া যাইতেন।

যতদিন যোগেশচন্দ্র বিদেশে ছিলেন, ততদিন পিসীমা ভ্রাতার সংসার যথাসম্ভব মিতব্যয়িতা সহকারে পরিচালিত করিতেন—জামাতা বিদেশে, কখন কি টাকার প্রয়োজন হয়। জামাতার শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার সংবাদ পাইয়া পিসীমা ভ্রাতাকে বলিয়াছিলেন, তিনি তীর্থ দর্শনে যাইবেন—ইহকালে যাহা হইবার হইয়াছে, এখন পরকালের ভাবনা ভাবিবেন; আর সংসারের পাঁক ঘাঁটিতে ইচ্ছা নাই। গোকুলচন্দ্র দিদির কথার প্রতিবাদ করিতে পারিতেন না, তবুও এক বার বলিয়াছিলেন, "দিদি, এখন কিন্তু 'পশ্চিমে' বড় প্লেগ হচ্ছে।" দিদি তাহাতে বলিয়াছিলেন, "তবেই হয়েছে! তা' হ'লে আমার আর তীর্থ করা হবে না। আমি ভাবছি, জামাই ফিরে আসবার আগেই ফিরব—এবার ত সাবিত্রী স্বামীর সঙ্গে চ'লে যাবে।" গোকুলচন্দ্র আর দ্বিরুক্তি করেন নাই। যাত্রার পূর্ব্বে তিনি জ্যেষ্ঠ জামাতাকে সম্পত্তির সব ভার দিয়া—তাঁহাকে আয়-ব্যয়-সঞ্চয়ের হিসাব বুঝাইয়া দিয়া গিয়াছিলেন। ভবিতব্য কি পূর্ব্বাহ্নে মানুষের মনে তাহার ছায়াপাত করে? কয়টি তীর্থস্থানে গমনের পরে পিসীমা ও গোকুলচন্দ্র যখন কাশীতে উপনীত হয়েন, তখন গোকুলচন্দ্রের জ্বর; কয়দিনে প্লেগেই তাঁহার মৃত্যু হয়। সংবাদ পাইয়া জ্যেষ্ঠ জামাতাকে লইয়া গোকুলচন্দ্রের বিধবা কাশী যাইতে উদ্যত হইয়াছিলেন—পিসীমা যাইতে দেন নাই; তিনি লিখিয়াছিলেন, "আমি ভাইকে মারিয়াছি; আবার কি আরও সর্ব্বনাশ করিব?" তিনি সমাজে আর মুখ দেখাইবেন না বলিয়া আর ফিরেন নাই। তিনি গোকুলচন্দ্রের বিধবাকে লিখিয়াছিলেন—"জামাই বিদেশে—সাবিত্রীর শ্বশুর নাই, তুমিই এখন তাহার অভিভাবক। তুমি আসিতে পার না।" জয়ন্তীর

স্বামীই সর্ব্বদা সব সংবাদ লইতেন—তিনিই পিসীমা'র ও গোকুলচন্দ্রের সম্পত্তির সব ব্যবস্থা করিতেন, তাহার আয় হইতে প্রতি মাসে পিসিমা'কে নির্দ্দিষ্ট টাকা পাঠাইতেন—ইত্যাদি।

তাহার পরে যোগেশচন্দ্র বিদেশ হইতে ফিরিয়া আসিলেন। প্রথম ছয় মাস তিনি কলিকাতায় থাকিলেন, আর সকলের সম্বন্ধে ব্যবস্থার কোন পরিবর্ত্তন করিলেন না; ছয় মাস পরে সাবিত্রীকে কলিকাতায় লইয়া যাইবার প্রস্তাব করিলেন। তিনি তাঁহার মাতার সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করিবেন, জয়ন্তীর স্বামী শিশিরকুমার জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, মা যেরূপ স্বধর্ম্মাচারনিষ্ঠ তাহাতে তাঁহার পক্ষে কলিকাতার পুত্রের গৃহে বাস কষ্টকর হইবে। তিনি স্বামীর গৃহেই থাকুন; বরং তাঁহার বিধবা পুত্রবধূ সৌদামিনী আসিয়া তাঁহার নিকট থাকিলে ভাল হয়। বিধবা বন্ধ্যা সৌদামিনী স্পষ্ট কথা অপ্রিয় হইলেও কখন তাহা বলিতে দ্বিধা বোধ করিতেন না; তিনি বলিলেন, "ঠাকুরপো আপনার চরকায় তেল দিন। তিনি মা'র ভার নিবেন না—তা-ই বলুন। আমার কি করলে ভাল হয় না হয়, সে উপদেশ তাকে দিতে হবে না।" তাহার পরে মা একবার কলিকাতায় গিয়াছিলেন—উপলক্ষ গঙ্গা-স্নান, আকাঙ্ক্ষা পুত্রকে ও পৌত্রপৌত্রীকে দেখিয়াও আসিবেন। পুত্রের গৃহের ব্যবস্থা দেখিয়া তিনি তথায় জলস্পর্শও করিতে পারেন নাই—ফিরিয়া যাইয়া স্বামীর গৃহ ভাড়া দিবার ব্যবস্থা করিয়া কাশীবাসী হইয়াছেন। তথায় পিসীমা ও তিনি একই গৃহে বাস করেন।

সাবিত্রীর মাতাও কাশীতে যাইতে চাহিলে পিসীমা প্রথমে তাহাতে আপত্তি করিয়াছিলেন—"মেয়ে জামাই, নাতি, নাতিনী—সকলের সম্বন্ধে তোমার কর্ত্তব্য আছে; কাহারও (ভগবান না করুন) অসুখ হইলে তোমাকে যাইতে হইবে। তুমি আসিবে কেন?" জ্যেষ্ঠ জামাতা শিশিরকুমার শাশুড়ীকে বলিয়াছিলেন, আপনি আপনার বড় মেয়ের কাছে চলুন—তাতে যদি আপনার আপত্তি থাকে, আমিই শ্বশুর বাড়ী আসি। আপনাকে ত একা থাকতে দিতে পারি না।" তাহার পরে জয়ন্তী ও সাবিত্রীর মাতাও কাশীতে গিয়াছেন। সৌদামিনী কলিকাতায় এক ভ্রাতার কাছে আছে আছেন। সাবিত্রীর সহিত তাঁহার অসদ্ভাব কখন হয় নাই; কিন্তু উভয়ে কলিকাতায় থাকিলেও প্রায় দেখা হয় না। তবে তিনি প্রায়ই সাবিত্রীর পুত্রকন্যার সংবাদ লইয়া থাকেন; বিদেশে যাইবার পূর্ব্বে আশুতোষ মধ্যে মধ্যে জ্যেঠাই মা'কে দেখিতে যাইত। তাহাও যোগেশচন্দ্রের নির্দ্দেশে নহে—সাবিত্রীর কথায় ও আপনার ইচ্ছায়।

কলিকাতায় আসিয়া সাবিত্রীকে একটা নূতন সমাজে থাকিবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইয়াছে; সেটা ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজ নামে পরিচিত—ব্যাস যেমন ব্যাসকাশী রচনা করিয়াছিলেন, তেমনই একদল ইংলণ্ড-প্রত্যাগত বাঙ্গালী এই সমাজ রচনা করিয়াছেন। ইহা ইংরেজের সমাজের হীন অনুকরণে গঠিত। এই সমাজের উপযোগী হইবার জন্য সাবিত্রীকে কেবল যে ইংরেজী শিখিতে হইয়াছিল, তাহাই নহে—অনেক সংস্কার বর্জ্জন করিতে বেদনানুভবও করিতে হইয়াছিল। মা ও শাশুড়ী উভয়েই বলিয়া দিয়াছিলেন—স্বামীর যাহা অভিপ্রেত সে যেন তাহাই করিতে দ্বিধানুভব না করে। সেই উপদেশানুসারে সাবিত্রী 'মেম সাহেব' হইয়াছে—অর্থাৎ সাজিয়াছে। স্বামী তাহাই চাহিয়াছেন।

শোকাতুরা সাবিত্রীর মনে হইতেছিল, চলচ্চিত্রের যবনিকার উপর যেমন দৃশ্যের পর দৃশ্য দ্রুত চলিয়া যায়, ঘটনার পর ঘটনার স্মৃতি তাঁহার মনে তেমনই চলিয়া যাইতেছে।

সহসা সেই যবনিকার উপর যে দৃশ্য দেখা গেল তাহা তাঁহাকে এমনই চঞ্চল করিল যে, তিনি যেন আপনার স্মৃতি হইতে আপনি অব্যাহতি লইবার জন্য, শয্যা ত্যাগ করিলেন। সে দৃশ্য লীলার মৃত্যুর দৃশ্য। আমাদিগের পরিচিত পরিবেষ্টনের সঙ্গে সর্ব্ববিধ সামঞ্জস্যশূন্য 'নার্সিং হোম'—শুশ্রূষাগার; তথায় শয্যায় লীলাকে ঔষধ দিয়া অজ্ঞান করিয়া রাখা হইয়াছে—তাহার সন্তানকে বাহির করিবার চেষ্টা হইতেছে—সহসা যিনি তাহার নাড়ী পরীক্ষা করিতেছিলেন, তিনি বলিয়া উঠিলেন—"শেষ।" তাহার পরে জীবিতকে মৃত করিয়া সেই মৃতকে আবার জীবিত করিবার জন্য বহু অস্বাভাবিক চেষ্টা। মা'র মনে

যে ক্রন্দন উত্থিত হইল, তাহা মুখে ফুটিল না; চিকিৎসাগার—তথায় কত লোক—কত প্রসবার্থিনী; তথায় ক্রন্দন নিষিদ্ধ।

সাবিত্রীর কি মনে হইল, তিনি একটি ছোট বাক্স আনিলেন। তাহাতে অনেকগুলি পত্র ছিল।

তিন

যোগেশচন্দ্র যথাসম্ভব শীঘ্রই আদালত হইতে ফিরিয়াছিলেন এবং ফিরিয়াই যখন সংবাদ লইয়া জানিলেন, সাবিত্রী জলস্পর্শও করেন নাই, তখন বেশ-পরিবর্ত্তনও না করিয়া শয়নকক্ষে আসিয়া স্ত্রীকে বলিলেন, "তুমি কিছুই খাও নি?"

সাবিত্রী কোন উত্তর দিলেন না; একবার স্বামীর দিকে চাহিয়া করধৃত পত্রখানি পড়িতে লাগিলেন।

যোগেশচন্দ্র বলিলেন, "কে পত্র লিখেছেন? সহানুভূতি জানিয়ে যেসব পত্র এসেছে, ক' দিন পরে একসঙ্গে সেগুলির উত্তর দিতে হ'বে।"

সহানুভূতি! তাঁহার দুঃখ কে বুঝিবে যে, তাহাতে সহানুভূতি বোধ করিবে? স্বামী কি তাঁহার দুঃখ বুঝিয়াছেন? তিনি যদি তাহা বুঝিতেন, তবে আজ কখন আন্তরিকতাহীন 'ছেঁদো কথায়' ব্যক্ত সহানুভূতি-প্রকাশক পত্রের উত্তর দিবার কথা উচ্চারণ করিতে পারিতেন না। সাবিত্রীর মনে হইতে লাগিল, তিনি কৃত্রিমতার যে পরিবেষ্টনে বাস করিয়া আসিয়াছেন, তাহা আজ ভূমিকম্পে জীর্ণ গৃহের মত তাঁহার উপর পতিত হইতেছে। তিনি আর আপনার অত্যন্ত সংযম রক্ষা করিতে পারিলেন না; স্বামীকে বলিলেন, "এ তোমার কোন বন্ধুর বা বান্ধবীর পত্র নহে। সে সব পত্র আমি চাহি না।"

সাবিত্রী পত্রখানি স্বামীকে দিলেন। লীলার প্রসবের ব্যবস্থা লইয়া তাহার—যোগেশচন্দ্রেরই মত বিদেশী ব্যবহারের অনুকারণকরী তাহার শ্বশুর পরিবারের দুশ্চিন্তার ও তাহাকে প্রসবের জন্য চিকিৎসাগারে প্রেরণের প্রস্তাবের বিষয় ভগিনীর পত্রে অবগত হইয়া ব্যস্ত হইয়া জয়ন্তী ভাগিনীকে লিখিয়াছিলেন:—

"তোমরা মানুষের একটা অত্যন্ত স্বাভাবিক ব্যাপারকে অস্বাভাবিক আতঙ্কের কারণ করিয়া তুলিতেছ কেন? তোমার ছেলে ও মেয়ে এবং আমার ছেলেমেয়েরা যে হইয়াছে, আমরা হাসপাতালেও যাই নাই, পিসীমা, মা, শাশুড়ী কেহ কখন কোনরূপ আশঙ্কা প্রকাশ করিয়া ভয়ও দেখান নাই, আতঙ্ক কেহই প্রকাশ করেন নাই—আনন্দই সকলের কথায় ও কাজে ফুটিয়া উঠিয়াছে। কোন বিপদ ত ভগবানের কৃপায় কখনও হয় নাই। তোমাদের সবই কি সৃষ্টি-ছাড়া অস্বাভাবিক ব্যাপার? মেয়েকে তোমার কাছে আনিয়া রাখ—ভয় দেখাইও না। স্বচ্ছন্দে প্রসব হইবে। হাসপাতাল! সেখানে লীলা কত কষ্ট-প্রসবের কথা শুনিবে—সে-ও ভয় পাইবে। অমন কাযও করিও না।"

পত্রের শেষে ছিল—

"আমি এই পত্র লিখা শেষ করিবার পরে সুষমা দিদি সুসংবাদ দিতে আসিলেন, তাঁহার বড় বধূটির একটি পুত্র হইয়াছে—সুপ্রসব হইয়াছে। বধূটির স্বাস্থ্য ভাল ছিল না—সেই জন্য সে বিষয়ে আশঙ্কা ছিল। ছেলে এখন বোম্বাই প্রদেশে এঞ্জিনীয়ার। তিনি সব শুনিয়া আমাকে বলিলেন, 'আমার বৌকে' তুমি আন—কতকগুলা ডাক্তার আর ধাই জড় ক'রে যেন ভয় ডেকে আনা না হয়। তুমি তা'কে আন—আমরা দেখব। ভগবান ভালই ক'রবেন।"

পাঠ করিয়া যোগেশচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাকে 'বৌ' ব'লেছেন?"

সাবিত্রী বলিলেন, "তুমি ভুলে গেছ—উনি আমার বাপের বাড়ীর পাশের বাড়ীর বড় বৌ। লীলাকে বড় ভালবাসতেন—বলতেন, ওঁর বড় ছেলের সঙ্গে আমার লীলার বিয়ে দিবেন—লীলাকে আদর ক'রে 'বৌ' ব'লেই ডাকতেন। ওঁর এক পত্রে লীলার কথায় 'বৌ' প'ড়ে তুমি বলেছিলে, 'ছেলেমানুষ মেয়ে—এখন থেকে বিয়ের কথা ব'লে মেয়েকে অকালপক্ক করা ভাল নয়।' সেই অবধি আমি আর ওঁকে বেশী পত্র লিখি নি; কিন্তু উনি দিদির কাছে সর্ব্বদাই আমাদের—বিশেষ লীলার সংবাদ নিতেন। ছেলে বড় হ'লেও অনেক দিন, লীলার সঙ্গে তা'র বিয়ে দিবেন ব'লে, অন্য সম্বন্ধ করেন নি।"

কথাটা যোগেশচন্দ্রের মনে পড়িল।

সাবিত্রী অন্যমনস্ক ভাবে বলিয়া ফেলিলেন, "যাচা সম্বন্ধ—আর কত আগ্রহ! যদি তা' অবজ্ঞা না করতাম, তবে হয়ত এমন হ'ত না।"

যোগেশচন্দ্র সে কথা শুনিলেন, স্ত্রীকে সান্ত্বনা দিবার ভাবে বলিলেন, "ডাক্তার, ঔষধ, শুশ্রূষা—সব ব্যবস্থা ত ভালর জন্যই করা হয়েছিল। আমাদের ভাগ্যে এই ছিল; তাই এমন হয়েছে।"

সাবিত্রী বলিলেন, "তা ত' বটেই। কিন্তু আমি যে কিছুতেই ভুলতে পারব না—যখন আমার লীলাকে অজ্ঞান ক'রে প্রসব করাবার কথা হচ্ছিল তখন—তার যন্ত্রণার মধ্যেও, সে দিদির ঐ কথা স্মরণ ক'রে বলেছিল, মা, কেন তুমি আমাকে তোমার কাছে রাখলে না? কেন মাসীমা'কে আনলে না? আমার বড় ভয় করছে।' সে কথা আমি কি কখন ভুলতে পারব?"

সাবিত্রী কাঁদিতে লাগিলেন।

যোগেশচন্দ্রও যেন অভিভূত হইয়া পড়িলেন। কন্যাটি তাঁহার বড় আদরের ছিল। পুত্রকে পালন সম্বন্ধে তাঁহার ধারণার বৈশিষ্ট্য ছিল—তাহাকে অধিক আদর দিতে নাই। কিন্তু মানুষ স্বভাবতঃই স্নেহশীল; সেইজন্য তাঁহার যে স্নেহের প্রকাশে তিনি পুত্রকে বঞ্চিত করিয়াছিলেন, তাহাই কন্যাকে দিয়াছিলেন। বিশেষ পুত্র তাঁহার অভিপ্রায়ানুরূপ ভাবে য়ুরোপীয় আচার-ব্যবহার অবলম্বনে আগ্রহ দেখায় নাই; কন্যা ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজের সব ব্যবহারে অভ্যস্ত হইয়াছিল।

যোগেশচন্দ্র বলিলেন, "কাশী হ'তে কাকেও আসতে বলা, কেবল কষ্ট দেওয়া, কিন্তু তোমার দিদি কি আসতে পারবেন না?"

সাবিত্রী বলিলেন, "না। তুমিত জান, দিদিকেও এ বাড়ীতে থাকতে বলা, কেবল তাঁকে কষ্ট দেওয়া।"

যোগেশচন্দ্র নিরুত্তর হইলেন। তাঁহার মনে পড়িল, যখন তাঁহার মাতা গঙ্গা স্নান উপলক্ষ করিয়া এক বার তাঁহার গৃহে আসিয়াছিলেন, তখন শাশুড়ীর আসিবার সংবাদ পাইয়া সাবিত্রী প্রস্তাব করিয়াছিলেন, বাড়ীর এক দিকে দুইটি ঘর আসবাবশূন্য করিয়া তাঁহার বাসের উপযোগী করা হউক—যোগেশচন্দ্র তাহাতে অনেক অসুবিধারই উল্লেখ করিয়াছিলেন। সাবিত্রী ইঙ্গ বঙ্গ সমাজের এক জনের—মিষ্টার রায়ের—নজির দেখাইয়াছিলেন, তাঁহার বিধবা মাসীমা চিকিৎসার্থ আসিলে তিনি কয়টি ঘরের দ্বার প্রাচীর তুলিয়া বন্ধ করিয়া বাড়ীর একটা অংশ তাঁহার জন্য পৃথক করিয়া দিয়াছিলেন। যোগেশচন্দ্র সে কায "লোক দেখান" বাড়াবাড়ি বলিয়াছিলেন।

চার

মানুষের শক্তির যে সীমা আছে—যাহারা জীবনে কেবল সাফল্যই লাভ করে তাহারা—তাহা ভুলিয়া যায় এবং ভুলিয়া যায় বলিয়াই ভুল করে। যোগেশচন্দ্র জীবনে সকল কার্য্যেই সাফল্যলাভ করিয়া আসিয়াছিলেন। ব্যবসায়ে অসাধারণ সাফল্য, পারিবারিক জীবনে অনাবিল সুখ, কোনরূপ দুশ্চিন্তার অভাব, সমাজে সম্মান—এ সব তিনি যেন স্বাভাবিক নিয়মে লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার মনে হইয়াছে, জীবনের উপবনে প্রস্ফুটিত কুসুমের চয়ন করিবার অধিকারই তাঁহার আছে। পুষ্পচয়নে তিনি কোনদিন একটিও কণ্টকের দংশন ভোগ করেন নাই। তিনি মনে করিয়া আসিয়াছেন—তাঁহার মনের দৃঢ়তার সীমা নাই, তিনি অভ্রান্ত। আজ তাঁহার উপলব্ধি হইতেছিল—তিনি আত্মম্ভরিতাহেতু ভুল বুঝিয়াছেন, কিন্তু সে ভুলের প্রতীকার করিবার উপায় আর নাই। আজ এক আঘাতে যেন তাঁহার অভিমান চূর্ণ হইয়া গিয়াছে—তিনি বজ্রাঘাতচ্ছিন্ন গিরিশৃঙ্গের মত ধূল্যবলুণ্ঠিত। আজ তিনি বুঝিয়াছেন, ব্যবসায়ে সাফল্যে সুখ—স্থায়ী সুখ নাই; পারিবারিক জীবনে যে পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গেল তাহার পরে তিনি আর কখন সুখ পাইবেন কি না সন্দেহ। তিনি কখন পরিবারের কোন ভাবনা ভাবেন নাই; সে বিষয়ে সাবিত্রী তাঁহাকে চিন্তামুক্ত করিয়া সব চিন্তার ভার আপনি গ্রহণ করিয়া স্বচ্ছন্দে বহন করিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু আজ সাবিত্রীর যে অবস্থা তাহাতে তিনি যে আর সে ভার বহন করিবেন, এমন মনে হয় না। বিশেষ এক জনকে হারাইলে মনে হয়—না জানি আরও কাহাকে হারাইব। আজ লীলাকে হারাইয়া তাঁহার

মনে হইতেছিল, না জানি অদৃষ্টে আর কি আছে! আজ তিনি দারুণ দুশ্চিন্তায় পীড়িত। সমাজে যে সম্মান কেবল অর্থের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত, তাহা কাঞ্চনকৌলিন্য—তাহার প্রকৃত মর্য্যাদা কি? অথচ তাহাই তিনি কাম্য বলিয়া মনে করিয়া আসিয়াছেন।

আজ যোগেশচন্দ্রের মনে হইল, তিনি ভুল করিয়াছেন। মানুষের মানুষকে প্রয়োজন আছে—সে প্রয়োজন সর্ব্বদা অনুভূত হয় না বটে, কিন্তু যখন তাহা অনুভূত হয় তখন সে অনুভূতি যেমন প্রবল তেমনই বেদনাদায়ক হয়। তাই আজ—শোকাতুরা সাবিত্রীর অবস্থা দেখিয়া তাঁহার মনে হইয়াছে, তাঁহাকে শোকে সান্ত্বনা প্রদান করিবার ও এই সময়ে তাঁহাকে যত্ন করিবার জন্য কি তাঁহার দিদিকে আসিতে বলা যায় না? তিনি অতি কুণ্ঠাসহকারেই সে প্রস্তাব সাবিত্রীর কাছে করিয়াছিলেন—সাবিত্রীর উত্তর তাঁহাকে কেবল নিরুত্তরই করে নাই, আঘাতও দিয়াছে। যোগেশচন্দ্রের মনে পড়িল, তাঁহার আত্মীয়-স্বজনের অভাব নাই—মা আছেন এবং তিনিই এখন মা'র একমাত্র সন্তান—মা'র স্নেহের অবলম্বন। তাঁহার অগ্রজের বিধবা আছেন। অগ্রজের বিধবা কোন দিন তাঁহার ও সাবিত্রীর সহিত কুব্যবহার করেন নাই—তাঁহার পুত্রকন্যাকে মাতৃস্নেহই দিয়া আসিয়াছেন। তিনি তাঁহার সহিত কোন সম্বন্ধ রাখেন নাই, বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তাঁহার মাতা একবার মাত্র—কয়দিন থাকিবেন মনে করিয়া—তাঁহার গৃহে আসিয়াছিলেন—থাকিতে পারেন নাই। অথচ তাঁহারই সে গৃহে গৃহিণী হইয়া সব ব্যবস্থা করিবার কথা! তাঁহাকে তাঁহার স্থানে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য সাবিত্রীর আগ্রহের অভাব ছিল না; তিনিই সেই আগ্রহের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। সাবিত্রীরও মাতা এবং যিনি—যোগেশচন্দ্রের পক্ষেও সাবিত্রীর মাতার অধিক কায করিয়াছেন সেই পিসিমা আছেন—কিন্তু তাঁহার ব্যবহারই আজ তাঁহাদিগকে দূরস্থ করিয়াছে। তবুও তাঁহাদিগের স্নেহের স্রোত যে সমভাবে প্রবাহিত তাহার পরিচয় তিনিও পাইয়াছেন। আশুতোষ যখন বিদেশ যাত্রার পূর্ব্বে একবার কাশীতে তাঁহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিল, তখন ফিরিয়া আসিয়া পিসীমা'র একপত্র ও একটি চন্দন কাঠের বাক্স সাবিত্রীকে দিয়াছিল। পত্রে পিসিমা লিখিয়াছিলেন :—

"আশু বিলাতে চলিল। আশীর্ব্বাদ করি, যে কাযের জন্য যাইতেছে, তাহাতে তাহার ও তোমাদিগের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হউক। আমার ইচ্ছা ছিল, বলি—ছেলের বিবাহ দিয়া তাহাকে বিলাতে পাঠাও। কিন্তু তাহা আর বলিলাম না; কারণ, দেখিতেছি, তোমরা এখনও লীলারই বিবাহ দিলে না। কালের প্রভাব এখন অন্যরূপ—আমাদিগের সময় যে বয়সে মেয়েরা 'ছেলে মানুষ' কমিত, এখন সে বয়সেও তাহারা 'ছেলে মানুষ'! জয়ন্তী লিখিয়াছে, তোমাদের বাপের বাড়ীর পাশের বাড়ীর সুষমা বড় আশা করিয়াছিল—লীলাকে পুত্রবধূ করিবে; তোমরা কিছুতেই সে কথায় কাণ দিলে না দেখিয়া এত দিনে ছেলের বিবাহ দিতেছে। হীরার টুকরা ছেলে; সব পরীক্ষায় প্রথম হইয়াছে—বড় চাকরী পাইয়াছে, চাকরীর কাযেই বিদেশে যাইতেছে, ফিরিলে আরও বড় চাকরী পাইবে।

"আশু কবে ফিরিবে, জানি না। আমার সঙ্গে হয়ত, আর তাহার দেখা হইবে না। তোমার শ্বশুর বাড়ীতে সে এক ছেলে, বাপের বাড়ীতে বড় নাতি। মধ্যে তোমার মা' এখানে আসিয়াছিল—সে বলিল, 'আমারও ত ছেলে বলিতে ও-ই'। আশুর কাছে আমার বালা জোড়া পাঠাইলাম। আশু যদি মেম বিবাহ করিয়া না আসে, তবে তাহার বধূকে দিও; 'সেকেলে' গহনা—পরে ভাঙ্গিয়া নূতন গহনা করিয়া দিতে পারিবে। আর সে যদি মেম বিবাহ করে, তবে উহা বিক্রয় করিয়া টাকাটা কোন হাসপাতালে দিও।

"তোমার মা, শাশুড়ী আর আমি—আমরা প্রতিদিন গঙ্গা-স্নান করিয়া বিশ্বনাথের চরণে তোমাদের কল্যাণ কামনা করি।

"তুমি জান, আমাদের দেখিবে বলিয়া শিশির তাহার বড় ছেলেকে এখানে বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠাইয়াছে, সে এ বার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল। তাহার পরের ছেলেটি গত বৎসর হইতে কাশীতেই পড়িতে আসিয়াছে।

"আশা করি, তোমরা সব ভাল আছ।"

আজ সেই পত্রের কথা যোগেশচন্দ্রের মনে পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে আশুতোষের সম্বন্ধে পিসীমার আশঙ্কা—যদি সে মেম বিবাহ করে—মনে করিয়া তিনি চঞ্চল হইলেন। সে আশঙ্কার বিষয় তিনি সাবিত্রীকেও বলেন নাই, আপনি তাহা অবজ্ঞা করিয়াই আসিয়াছেন, কিন্তু আজ বুঝিলেন, ভুলিতে পারেন নাই।

তিনি বুঝিলেন, তিনি আপনার ব্যবসা সম্পর্কিত কায লইয়া যে বেদনা ভুলিয়া থাকিবার চেষ্টা করিতেছেন, যখন তাহা ভুলিতে পারিতেছেন না, তখন সাবিত্রী কি লইয়া মাতৃ-হৃদয়ের সেই বেদনা ভুলিতে পারিবেন? সে কথা তিনি যতই ভাবিতে লাগিলেন, ততই শঙ্কিত হইতে লাগিলেন। আর সকলকে ত্যাগ করিয়া তিনি যে সংসার গড়িয়া তুলিয়াছেন, তাহা কি ভিত্তির ত্রুটিতেই ভাঙ্গিয়া পড়িবে? লীলার মৃত্যুই কি তাহার পরিচায়ক? তিনি শিহরিয়া উঠিলেন।

একবার যোগেশচন্দ্রের মনে হইল, আশুকে আসিতে তার করিবেন। লীলার বিবাহের সময়ে সে আসিতে পারে নাই—অনেক দিন তাঁহারা তাহাকে দেখেন নাই। তাঁহার মনে হইল, পিসীমা আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছিলেন, সে বিদেশিনী বিবাহ করিতেও পারে। সে আশঙ্কা কি সত্য হইতে পারে না? যদি হয়?

তিনি সাবিত্রীকে বলিলেন, "আমি আশুকে তার করি, সে একবার আসুক।"

সাবিত্রী বলিলেন, "না। তা'কে এ সংবাদও দিও না। তা'র পরীক্ষার আর অধিক বিলম্ব নাই; পরীক্ষার পরেই আসবে।"

যোগেশচন্দ্র ভাবিতে লাগিলেন।

সাবিত্রী বলিলেন, "আর একটি কথা—কাশীতে তুমি সংবাদ দিবে না, জানি; কিন্তু দুঃসংবাদ বাতাসে চলে। আজকাল দেখি, মানুষ মরতে না মরতে খবরের কাগজে সংবাদ আর ছবি ছাপা হয়। সেইটি বারণ ক'রে দিও; নইলে কেহ না কেহ তাঁ'দের সংবাদ দিয়ে কাটা ঘায় নুনের ছিটা দিয়া ফেলবে।"

যোগেশচন্দ্র কিছু বলিলেন না বটে, কিন্তু তিনি জানিতেন, সাবিত্রী যে অনিষ্টের আশঙ্কা করিতেছিলেন, তাহা ঘটিয়া গিয়াছে—লীলার শ্বশুরালয়-প্রদত্ত সংবাদ ও তাহার ছবি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি বুঝিলেন, সেই অতর্কিত সংবাদ কাশীতে তাঁহার মাতা ও পিসীমা সকলকেই পীড়িত করিবে।

যোগেশচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার দিদিকেও কি জানান হ'বে না?"

সাবিত্রী বলিলেন, "না। সংবাদ তিনি পাবেন এবং পেয়ে যে ছুটে আসবেন, তা' আমি জানি। কিন্তু আমরা কোন্ মুখে তাঁ'কে সংবাদ দেব?"

"সংবাদ না দিলে তিনি নিশ্চয়ই দুঃখ করবেন।"

সাবিত্রী একটু হাসিলেন—সে হাসির সহিত তাঁহার অবস্থার কি অসামঞ্জস্য! তিনি বলিলেন, "দিদি আর আমাদের কোন ব্যবহারে দুঃখ করবেন না—সে ব্যবহারে তিনি অভ্যস্ত হয়েছেন। তাঁর তিন মেয়ের মধ্যে কেবল বড় মেয়ের বিয়েয় আমি দু' দিনের জন্য গিয়াছিলাম—জামাইদের আমরা চিনি না। কিন্তু তিনি আমার লীলার বিয়েয় না এসে থাকতে পারেন নি—এ বাড়ীতে তাঁর স্নানাহারের কত অসুবিধা; কিন্তু তবুও এসেছিলেন; মেয়ে জামাইকে নিয়ে যেতেও চেয়েছিলেন—আমরাই সে কথায় কাণ দিই নি।"

যোগেশচন্দ্র জানিতেন, এ সবই সত্য এবং নিষ্ঠুর সত্যই বটে। কিন্তু সাবিত্রী কোন দিন তাঁহার কোন কথার প্রতিবাদ করেন নাই—তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কায করেন নাই। আজ তাঁহার উক্তিতে যে বেদনা আত্মপ্রকাশ করিয়াছে; তাহাও তিনি এই দীর্ঘ কাল মনের মধ্যে অবরুদ্ধই রাখিয়াছিলেন—বুঝি আগ্নেয়-গিরি এমনই ভাবে, যত দিন সম্ভব, তাহার অন্তরে অগ্নি অবরুদ্ধ রাখে। যোগেশচন্দ্রের মনে হইল, সাবিত্রীর পিসীমা সাবিত্রীর প্রতি স্নেহহেতু স্বতঃপ্রবৃত্তা হইয়া বিধবার সামান্য সঞ্চয় হইতে টাকা না দিলে তিনি আজ খ্যাতিপন্ন ব্যারিষ্টার হইয়া ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজে বিচরণ করিতে পারিতেন না; হয়ত তাঁহাকে মফঃস্বলের সেই সহরে পিতার মক্কেলদিগকে লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে হইত—এই

বাড়ী, এই গাড়ী, এই সম্মান, এই সম্ভ্রম, এই ঐশ্বর্য্য—এ সব স্বপ্নই থাকিত। এক বার তাঁহার মনে হইল, তাহাতে কি তিনি সন্তোষ লাভ করিতে পারিতেন? মনের মধ্য হইতে উত্তর আসিল—না।

কিন্তু আজ যখন কন্যার জন্য শোক তাঁহার মন কোমল করিয়াছে, তখন তিনি বুঝিলেন—তিনি যে মনে করিয়া আসিয়াছেন, বাড়ী, গাড়ী, সম্মান, ঐশ্বর্য্য এ সকলে তাঁহার মত সাবিত্রীও সুখী হইয়াছেন, তাহা ভুল। মাতার, শাশুড়ীর, পিসিমা'র, দিদির প্রতি যে ব্যবহার যোগেশচন্দ্র করিয়া আসিয়াছেন অর্থাৎ যে ব্যবহার ত্রুটি করিয়াছেন, তাহা সাবিত্রীর পক্ষে সুখের হয় নাই; তিনি কেবল স্বামীর তুষ্টি সাধনজন্য দুঃখ প্রকাশ করেন নাই।

তবুও যোগেশচন্দ্র জানিতেন না, সাবিত্রীর ব্যবহারই তাঁহাদিগের সকলের নিকট তাঁহার স্বামীর ত্রুটি যথাসম্ভব সংশোধন করিয়াছে; পিতৃকুলে ও শ্বশুরকুলে কেহই সাবিত্রীর প্রতি স্নেহশীল না হইয়া পারেন নাই এবং সকলেই মনে করিয়া আসিয়াছেন—স্ত্রীভাগ্যেই যোগেশচন্দ্রের সকল উন্নতি, শান্তি ও সুখ।

পাঁচ

স্ত্রীর অবস্থা দেখিয়া যোগেশচন্দ্র উত্তরোত্তর অধিক শঙ্কিত হইতে লাগিলেন। তিনি কি করিবেন, ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন না। তিনি যদি কতকগুলি মামলা লইয়া ব্যস্ত না থাকিতেন, তবে স্ত্রীকে লইয়া কোথাও যাইতেন।

সত্যই দুঃসংবাদ বাতাসে বাহিত হয়। সে সংবাদ শিশিরকুমার যে দিন পাইলেন, সেই দিনই জয়ন্তীকে লইয়া কলিকাতায় আসিলেন। তাঁহারা ট্রেণ হইতে নামিয়া প্রথমেই সাবিত্রীর মা' সৌদামিনীর ভ্রাতৃগৃহে গমন করিলেন। সৌদামিনীর ভ্রাতৃজায়া বলিলেন—ঘটনাক্রমে তিনি দুঃসংবাদ পাইয়াছিলেন। তাঁহার ভ্রাতার জ্যেষ্ঠপুত্র তাহার এক বন্ধুর শবানুগমন করিয়া শ্মশানে গিয়াছিল সে ফিরিয়া আসিয়া বলিয়াছিল, এক তরুণীর শব কি পরিমাণ ফুলে সাজাইয়া লইয়া গিয়াছে! শুনিয়া সৌদামিনী বলিয়াছিলেন—"কার সর্ব্বনাশ হ'ল?" ভ্রাতুষ্পুত্র অসাবধানতাহেতু মৃতার পিতার নাম করিয়া ফেলিয়াছিল। শুনিয়া সৌদামিনী আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিয়াছিলেন,—"ওরে আমারই সর্ব্বনাশ হয়েছে।" সে দিন দ্বাদশী; পূর্ব্বদিন উপবাসের পরে হইলেও অপরাহ্নের পূর্ব্বে তাঁহাকে জলস্পর্শ করান যায় নাই। তাহার পরে তিনি আপনাকে আপনি দৃঢ় করিয়া গড়িয়াছিলেন—মধ্যে মধ্যে দীর্ঘশ্বাস ফেলেন, আর লীলার কথা বলেন। ভ্রাতা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তিনি কি যা'কে দেখিতে যাইবেন? তিনি বলিয়াছিলেন, "না! আর গিয়ে কি হবে?"

জয়ন্তী যখন কাঁদিতে কাঁদিতে সৌদামিনীকে বলিলেন, তাঁহার একা যাইতে 'পা সরিতেছে' না—তিনিও চলুন, তখন সৌদামিনী বলিলেন, "চল অভাগীটা হয়ত একাই পড়ে আছে—ছেলেও বিদেশে, বাড়ীতে স্ত্রীলোক নাই। তা'র কথা ভেবেই যেতে হচ্ছে। নইলে যেতে ইচ্ছা করে না।"

যোগেশচন্দ্রের গৃহে প্রবেশদ্বারে গাড়ী হইতে প্রথম শিশিরকুমার অবতরণ করিলেন। গৃহে মৃত্যুর স্তব্ধতা। দ্বারবান তাঁহাকে দেখিয়া বলিল, "সাহেব" তখনও আদালত হইতে ফিরেন নাই। ততক্ষণে জয়ন্তী ও সৌদামিনী নামিয়াছেন। সৌদামিনী ঝঙ্কার দিয়া বলিলেন, "কে তোর 'সাহেবের' খোঁজ নিচ্ছে?—'সাহেব'!"

শিশিরকুমার "মেমসাহেব—" পর্য্যন্ত বলিতেই সৌদামিনী তাঁহাকে বলিলেন, "কিসের 'মেমসাহেব'? তুমি গাড়ীর ভাড়া মিটিয়ে দাও; আমরা ভিতরে যাচ্ছি।"

তিনি দ্বারবানকে বলিলেন, "আমরা তোমাদের মার দিদি।"

তিনি অগ্রে অগ্রে বলিলেন, জয়ন্তী তাঁহার অনুসরণ করিলেন।

সাবিত্রী শয্যায় থাকিয়া কত কথাই ভাবিতেছিলেন। উভয়কে প্রবেশ করিতে দেখিয়া তিনি কাঁদিয়া উঠিলেন—"দিদি!"

এই প্রথম সাবিত্রী মুখ ফুটিয়া কাঁদিতে পারিলেন। কন্যা চিকিৎসাগারে—জীবন উপহার দিতে যাইয়া—জীবন হারাইয়াছিল; সেই অপরিচিত জনবহুল স্থানে ক্রন্দন নিষিদ্ধ। তাহার পরে কয় দিন—তাঁহার শোক ব্যক্ত করিবার সুযোগ ঘটে নাই। কোন কোন "বান্ধবী" আসিয়াছেন; সাবিত্রীর সাজসজ্জা করিয়া তাঁহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে প্রবৃত্তি হয় নাই; তাঁহারাও সাক্ষাৎ করিবার জন্য আইসেন নাই—সামাজিকতা রক্ষার জন্য আসিয়াছিলেন ও আগমন-সংবাদ জানাইয়া চলিয়া গিয়াছেন। সেক্সপীয়র বলিয়াছেন—যে শোক প্রকাশ পায় না, তাহা বেদনাতুর হৃদয় ভাঙ্গিয়া দেয়। কিন্তু শৈত্য না পাইলে যেমন মেঘের সঞ্চিত বাষ্প বৃষ্টিতে বর্ষিত হয় না, তেমনই সহানুভূতি না পাইলে শোক প্রকাশপথ পায় না। আজ দিদি দুই জনকে পাইয়া সাবিত্রীর শোক ব্যক্ত হইল। তাঁহারা উভয়ে সেই শোকাতুরার অবস্থা দেখিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।

জয়ন্তী ও সৌদামিনী যাইয়া সাবিত্রীর কাছে বসিলেন। জয়ন্তী ভগিনীকে বক্ষে টানিয়া লইলেন। তিন জনই কাঁদিতে লাগিলেন। কেহ কোন কথা কহিলেন না। যে স্থানে হৃদয়ে প্রকৃত সহানুভূতি অনুভূত হয়, সে স্থানে কথার কোন প্রয়োজন থাকে না। কথার সান্ত্বনায় কৃত্রিমতা থাকে; অনুভূতিতেই প্রকৃত সান্ত্বনা।

প্রায় এক ঘণ্টা কাটিয়া গেল। যোগেশচন্দ্র যথাসম্ভব শীঘ্র আদালত হইতে ফিরিলেন—ফিরিয়া দুই জন মহিলা "মেম সাহেবের" নিকট আসিয়াছেন শুনিয়া শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন। সাবিত্রী তখনও জয়ন্তীর বক্ষে মুখ গুঁজিয়া কাঁদিতেছেন; আর জয়ন্তীর অশ্রুধারা ভগিনীর বিস্রস্ত কেশের উপর পড়িয়া কেশদাম সিক্ত করিতেছে; সৌদামিনী অঞ্চলে সেই কেশ মুছাইতেছেন। সৌদামিনীই ঘরে কেহ প্রবেশ করিয়াছেন বুঝিয়া মুখ তুলিয়া চাহিলেন—যোগেশচন্দ্রকে দেখিয়া দৃষ্টি ফিরাইয়া আবার সাবিত্রীর সিক্ত কেশ মুছাইয়া দিতে লাগিলেন।

যোগেশচন্দ্র অল্পক্ষণ নির্ব্বাক অবস্থায় দাঁড়াইয়া রহিলেন—কি বলিবেন, ভাবিতে লাগিলেন। কিন্তু সে অবস্থা অশোভন বুঝিয়া একটু চেষ্টা করিয়াই বলিলেন, "এই বিপদের সময়ে যে আপনারা এসেছেন, এ আপনাদের—"

কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই সৌদামিনী ঘুরিয়া বসিলেন। যখন কটাহে তপ্ত তৈল "ফুটিতে" থাকে, তখন তাহাতে জল পড়িলে যেমন হয়, তেমনই হইবে। তিনি দেবরকে বলিলেন, "সম্পদে যেমন বিপদেও তেমনই যাদের তুমি অবজ্ঞাই কর, জেন, তুমি তাদের যেমন ঘৃণা কর, তারাও তেমনই তোমার বাড়ীতে আসতে ঘৃণা বোধ করে। কিন্তু দুঃখ এই যে, মন বুঝে না—তোমার বিপদ তারা আপনাদের বিপদ ছাড়া আর কিছু মনে করতে পারে না। তুমি সংবাদ দেও নি; কিন্তু সংবাদ পেয়ে জয়ন্তী ছুটে এসেছে; আর আমি আসব না স্থির করেছিলাম বটে, কিন্তু না এসে থাকতে পারলাম না। তা'র কারণ, যে গেছে সে আমারও মেয়ে। আসতে হয় এই অভাগী সাবিত্রীর জন্য; এর ব্যবহারে ত কোন দিন কোন ত্রুটি পাই নি। আর আসতে হয়, আশায়—আমার শ্বশুরকুলের শিবরাত্রির শলিকা—আমার শ্রাদ্ধের অধিকারী আশু যদি তা'র বন্ধ্যা জ্যেঠাইমার শ্রাদ্ধ করে—মনে ক'রে। তুমি টাকা কর; আশীর্ব্বাদ করি, আরও টাকা কর; কিন্তু টাকার জন্য মনুষ্যত্ব বিসর্জ্জন করতে নাই।"

সাবিত্রী মুখ তুলিলেন—যাকে নিরস্ত হইবার অনুরোধ জানাইবার জন্য কাতর দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিলেন। তিনি জানিতেন, জীবনে এমন তিরস্কার যোগেশচন্দ্র কখন ভোগ করেন নাই। কিন্তু সৌদামিনী তাঁহার দিকে চাহিলেন না; দেবরকে বলিলেন, "তুমি ভুলতে পার—মথুরায় রাজা হয়ে ব্রজের রাখালীর কথা ভুলতে পার। কিন্তু আমি কেমন ক'রে ভুলব—তোমার দাদা তোমার ছেলেমেয়েকে কত ভালবাসতেন—ওরা মামার বাড়ীতে থাকলে প্রতিদিন গিয়ে ওদের দেখে আসতেন; আর যে শয্যা তাঁ'র শেষ শয্যা হয়েছিল তা'তে পড়েও প্রতিদিন ওদের আনতে পাঠাতেন, ওদের আসতে বিলম্ব হ'লে বারবার দ্বারের দিকে চাহিতেন—ওদের কণ্ঠস্বর পেলে তাঁ'র মুখে আনন্দ যেন ফুটে উঠত।"

সাবিত্রী সশঙ্ক দৃষ্টিতে ভগিনীর দিকে চাহিলেন—যদি যোগেশচন্দ্র কোন অপ্রীতিকর কথা বলিয়া ফেলেন। জয়ন্তী সৌদামিনীকে বলিলেন, "ও সব কথায় আজ আর কায নাই। এখন কি আর আমাদের অভিমান সাজে?"

সৌদামিনী বলিলেন, "অভিমান! যেখানে আশা থাকে না, সেখানে কোন অভিমান থাকে না। যে আপনার মাকে সহ্য করতে পারে না, তা'র কাছে তা'র বিধবা তা'দের কি কোন আশা থাকতে পারে? আর তোমার পিসীমা—তিনি যদি বিধবার সম্বল—"

সৌদামিনীর মনে হইল, পিসীমার সাহায্যের কথা পিসীমা কখন কাহাকেও উল্লেখ করিতে দেন নাই; আজ সে কথার উল্লেখ বড় রূঢ় হইবে। তিনি সে কথা বলিতে যাইয়া মধ্যপথে বিরত হইবার চেষ্টা করিলেন। আশু যখন পূর্ণবেগে ধাবিত হয়, তখন যদি তাহাকে, কোন কারণে, সহসা নিশ্চল হইতে হয়, তবে সে যেমন গতি-বেগ প্রহত করিতে যাইয়া ভূমিতে পতিত হয়, তেমনই উক্তপ্রায় কথা অনুক্ত রাখিবার চেষ্টায় সৌদামিনী সেই উত্তেজনার সময়ে যেন বাহ্যসংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িলেন।

জয়ন্তী ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া শয্যাপার্শ্বে রক্ষিত পাত্র হইতে জল লইয়া তাঁহার কপালে ও চক্ষুতে দিলেন। সাবিত্রীও তাঁহাকে সাহায্য করিতে উঠিলেন।

প্রকৃতিস্থ হইয়া সৌদামিনী কাতরভাবে কাঁদিয়া বলিলেন, "যখন আমার কপাল পুড়ে তখন সাবিত্রীর পিসীমাই মা'র মত যত্নে আমাকে তুলেছিলেন। সেই দিন হ'তে তিনি বার বার আমাকে বুঝিয়েছেন, হিন্দুর ঘরে বিধবার ভগবানে আত্মসমর্পণই ধর্ম্ম, আর সকলের সেবায় সেই ধর্ম্মের সাধনা—বহির্ব্বিকাশ। আমার মেয়ে হাসপাতালে ভাড়াটে সেবা নিয়ে চলে গেল, আর আমি তা'কে সেবা করবার সুযোগও পেলাম না—আমার এ দুঃখ কে বুঝবে?"

সৌদামিনী কাঁদিতে লাগিলেন।

যোগেশচন্দ্র এতক্ষণ একটি কথাও বলেন নাই, অপরাধীর মত দাঁড়াইয়াছিলেন। তিনি মনে বুঝিতে-ছিলেন, সৌদামিনীর কথা কত সত্য। এখন তিনি বলিলেন, "বৌদিদি, ভগবান আমাকে যে শাস্তি দিয়েছেন, তার তুলনায় আপনার তিরস্কার কিছুই নয়।"

তাঁহার চক্ষুতে এতক্ষণে অশ্রু দেখা দিল।

তাহার পরে যোগেশচন্দ্র জয়ন্তীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কা'র সঙ্গে এলেন?"

সৌদামিনী বলিলেন, "জয়ন্তী এসেছে সকলের ছাই ফেলতে ভাঙ্গা কুলা শিশিরবাবুর সঙ্গে। ওদের পিসীমা বল্‌তেন, 'ও সদাশিব। বিপদে আপদে লোক না ডাকতেই শিশির উপস্থিত হয়'। জয়ন্তী এসে আমার কাছে গিয়েছিল। আমি ত আসব না বলেই স্থির করে-ছিলাম; কিন্তু ও যখন গেল, তখন আর না এসে থাকতে পারলাম না।"

যোগেশচন্দ্র জয়ন্তীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তিনি সংবাদ পেয়েছিলেন?"

জয়ন্তী বলিলেন, "সকালেই সংবাদপত্রে সংবাদ পেয়ে মেজ মেয়েকে জানিয়ে বলেছিলেন, তিনি ন'টার গাড়ীতেই কলিকাতায় যা'বেন। শুনে আমি তাড়াতাড়ি খাবারের ব্যবস্থা করতে গিয়াছিলাম। গাড়ী যখন ষ্টেশনে যা'বে তখন আমাকে বললেন, 'তুমিও চল—সাবিত্রীকে দেখে আসবে।' কেন আসতে হ'বে, তা তখন আমায় বলেন নি; ট্রেন থেকে নেমে ভাড়া মোটর গাড়ীতে উঠবার পরে বললেন, 'মন শক্ত কর—বড় দুঃসংবাদ।' তিনি আমাকে সংবাদপত্র দিলেন। আমি স্তম্ভিত হয়ে কিছুক্ষণ পরে বললাম, 'সৌদামিনীকে নিয়ে যাব।' তাই করেছি।"

সাবিত্রী জিজ্ঞাসা করিলেন, "দিদি, তোমার কি খাওয়াও হয় নি?"

জয়ন্তী বলিলেন, "সে জন্য তুমি ব্যস্ত হ'য়ো না। উনি ব'লে গেছেন, বেলা পাঁচটার আগেই ফিরবেন; কোথায় যাব, স্থির ক'রে আসবেন। সৌদামিনী বলেছেন, ওঁর বাড়ীতেই যেতে হবে। যা হয় হবে—সেজন্য ভেবো না।"

যোগেশচন্দ্র কুণ্ঠিতভাবে বলিলেন, "এখানে কি ব্যবস্থা করা যায় না?"

সৌদামিনী বলিলেন, "জানই ত তা' করা যায় না। আমাদের সবই কুসংস্কার—তাই মাকেও পালিয়ে নিষ্কৃতি পেতে হয়েছে। তবে আর ও কথা কেন? আমরা সাবিত্রীকে ফেলে পালাব না। আমাদের আদালত নাই। যখনই প্রয়োজন বুঝব, তখনই আসব।"

সেই সময় ভৃত্য যোগেশচন্দ্রকে একখানি টেলিগ্রাম আনিয়া দিল।

ছয়

জয়ন্তী ও সৌদামিনী অনেক বুঝাইয়া সাবিত্রীকে উঠিয়া স্নান ও কিছু আহার করিতে সম্মত করাইলেন। কিন্তু শয্যাত্যাগের চেষ্টা করিয়া সাবিত্রী তাহাতে অক্ষম হইলেন। উভয়ে ধরিয়া তাঁহাকে স্নানাগারে লইলেন এবং "আয়াকে" শয্যার আবরণ পরিবর্ত্তন করিয়া দিতে বলিলেন। সাবিত্রীকে স্নান করাইয়া দিতে হইল; ধরিয়া কোনরূপে শয্যায় আনিতে হইল। আহারে তাঁহার প্রবৃত্তি ছিল না—উভয়ের নির্ব্বন্ধাতিশয়ে তিনি সামান্য একটু ঈষদুষ্ণ দুগ্ধ পান করিলেন; তাহার পরে দেহে অস্বস্তি ও যন্ত্রণা অনুভব করিতে লাগিলেন।

অপরাহ্নে শিশিরকুমার ফিরিয়া আসিলেন—তিনি তাঁহার এক আত্মীয়ের গৃহে জয়ন্তীকে লইয়া যাইতে চাহিলেন। সৌদামিনীর অসম্মতিতে তাহা হইল না; সৌদামিনী ও জয়ন্তী একের পর এক জন সন্ধ্যা হইলে সৌদামিনীর ভ্রাতৃগৃহে যাইয়া আবার যোগেশচন্দ্রের গৃহে ফিরিয়া আসিলেন—শিশিরকুমার তথায় রহিলেন।

রাত্রিতে সাবিত্রীর অসুস্থতা বাড়িয়া চলিল—জ্বরও দেখা দিল। ডাক্তার ডাকা হইল। তিনি রোগিনীকে পরীক্ষা করিয়া ও সব শুনিয়া চিন্তিত হইলেন—ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া বলিলেন, ঔষধ রোগের জন্য নহে—ধাতু স্নিগ্ধ করিবার জন্য।

পরদিন প্রাতেও জয়ন্তী ও সৌদামিনী এক বার করিয়া সৌদামিনীর ভ্রাতৃগৃহে যাইয়া যথাসম্ভব শীঘ্র ফিরিয়া আসিলেন।

যোগেশচন্দ্র গৃহের দ্বিতলের একটি অংশ হইতে গৃহসজ্জা সরাইয়া দিবার আয়োজন করিলে সৌদামিনী বলিলেন, "বৃথা কেন ও ব্যবস্থা করছ? ওতে তোমার জিনিষপত্র নাড়ানাড়ি হবে—ক্ষতি হবে, অথচ কোন লাভ হবে না। তোমার এই সব খানসামা আয়ার জল ত আমরা স্পর্শ করতে পারব না। আমাদের জন্য ব্যস্ত হ'তে হ'বে না—কিসে রোগী বাঁচে সেই ব্যবস্থা কর। আমরা ত ভাল কিছুই দেখছি না। ভরসা কেবল এই যে, স্ত্রীলোকের প্রাণ সহজে যায় না।"

তাহার পরে একটু ভাবিয়া তিনি যোগেশচন্দ্রকে বলিলেন, "বরং দক্ষিণদিকের বন্ধ বারান্দাটা খালি করিয়ে দাও—আমরা ধুয়ে-মুছে নেব—বসবার দাঁড়াবার স্থান হবে। একঘড়া গঙ্গাজল আনতে হবে।'

যোগেশচন্দ্র বলিলেন, "আনিয়ে দেব কি?"

"কিসে আনাবে? তোমাদের পাত্রত সবই নোংরা—সব ছোঁয়াছুঁই। তোমার ড্রাইভারটা অজাত নয় ত?"

"হু' জনই শিখ।"

"কায নাই এতে। আমাকে বাড়ীতে দিয়ে আসুক—আমার ভাইপো ডাক্তার, নিজেই গাড়ী চালায়; তা'র গাড়ীতে গঙ্গায় যাব—সেই আমাকে এখানে নামিয়ে দিয়ে যাবে।"

তাহার পরে তিনি বলিলেন, "সেও ত ছাই ঐ সিঁড়ি দিয়ে গঙ্গাজল আনতে হবে। কি আর করব—গঙ্গাজল কখন অপবিত্র হয় না। উপায় ত নাই। সেরে উঠুক সাবিত্রী, তার পরে গঙ্গাস্নান ক'রে আসব। মা-গঙ্গা অপরাধ নেবেন না।"

যোগেশচন্দ্র মোটরগাড়ী প্রস্তুত রাখিতে বলিয়া আসিলেন।

সাবিত্রী জয়ন্তীকে বলিলেন, "দিদি, যে অবস্থায় চ'লে এসেছ, তাতে বাড়ীর কোন ব্যবস্থা নিশ্চয়ই ক'রে আসতে পার নি। কি হবে?"

জয়ন্তী বলিলেন, "কি আবার হবে? মেজ মেয়ে রয়েছে; আর আমি কি অবস্থায় এসেছি, তা' শুনলে তা'র জ্যেঠাইমা বা কাকীমা কেউ তখনই এসে যাবেন। সেজন্য কোন ভাবনা নাই। উনি বরং আজ ফিরে যা'ন।"

যেরূপভাবে জয়ন্তী তাঁহার যাদের উপর নির্ভর করিতে পারেন, তাহা যোগেশচন্দ্র শুনিলেন। তাঁহার মনে হইল,

সাবিত্রীরও মা' আছেন, মা আছেন, শাশুড়ী আছেন, দিদি আছেন। তিনি যে তাঁহাদিগের সাহায্যে বঞ্চিত, সেজন্য কে দায়ী?

সাবিত্রী জয়ন্তীকে বলিলেন, "আমার কেবলই ভয় হচ্ছে, এ সংবাদ পেয়ে কাশীতে সকলের কি অবস্থা হবে! সংবাদ যখন প্রকাশিত হয়েছে, তখন কি আর গোপন থাকবে?"

সে ভয় ও সে ভাবনা জয়ন্তীরও অল্প ছিল না। কিন্তু তিনি ভগিনীকে আশ্বাস দিবার জন্য বলিলেন—"তাঁ'রা গঙ্গা-স্নান, ঠাকুর দেখা—এইসব নিয়েই থাকেন; হয়ত সংবাদ পাবেন না। আর যদি পান, আমার মেজ ছেলে ত কাশীতে রয়েছে। সেজন্য ভেব না।"

"আমার মনে হচ্ছে, তুমি কি দিদি কেহ কাশীতে গেলে হ'ত।"

সৌদামিনী বলিলেন, "তুমি একটু সামলে ওঠ, তা'র পরে ব্যবস্থা স্থির করা যাবে।"

সৌদামিনী গৃহে গমন করিলেন। তিনি যখন গঙ্গাস্নান করিয়া গঙ্গাজল লইয়া ফিরিলেন, তখন ডাক্তাররা আসিয়াছেন। যে ডাক্তার পূর্ব্বদিন সাবিত্রীকে দেখিয়া গিয়াছিলেন, তিনিই পরামর্শের জন্য আর এক জনকে আনিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ডাক্তাররা আসিয়াছেন শুনিয়া সৌদামিনী ভ্রাতুষ্পুত্রকে বলিলেন,—"অমিয়, তুই চল। তুই ডাক্তার—সকলের কি মনে হয়, জেনে আমাদের বলতে পারবি।" অমিয় কিন্তু সঙ্কোচ বোধ করিল—না ডাকিলে যাওয়া ডাক্তারদিগের রীতিবিরুদ্ধ। সে সেকথা বলিলে সৌদামিনী বলিলেন, "কিসের রীতি রে? বাড়ীর ছেলে যদি ডাক্তার হয়, তবে কি সে অন্য ডাক্তার মা মাসীকে দেখতে এলে গঙ্গাপারে চলে যাবে? আমি তোর পিসী—আমার মা' তোর পিসী নয়?"

অমিয় জানিত, পিসীমার আদেশের আপীল নাই; সে গাড়ী রাখিয়া পিসীমা'র অনুসরণ করিল।

যে দুই জন ডাক্তার আসিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের একজন ছাত্র অমিয়কে চিনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি!" সে বলিল, "আমার পিসীমা।" "ওঃ" বলিয়া তিনি তাহাকেও পরামর্শের মধ্যে লইলেন। পরামর্শের পরে অমিয়কুমারের অধ্যাপক ডাক্তার ব্যবস্থাপত্র লিখিয়া তাহাকে বলিলেন, "তুমি ত বুঝলে, চিকিৎসায় ঔষধের প্রয়োজন অল্প—পথ্য আর শুশ্রূষায় যদি ফল হয়। তুমি আছ ভালই হয়েছে। তোমার আর দুই পিসীই ত সেবা-শুশ্রূষা করছেন। তাঁদের পথ্য আর শুশ্রূষার বিষয় বুঝিয়ে দেবে। তাঁদের কাছ থেকে রোগীর অবস্থা সব জেনে কাল সকাল ৮টার মধ্যে আমাকে সংবাদ দেবে।"

ডাক্তাররা বিদায় লইলেন।

যে স্থানে সৌদামিনী ও জয়ন্তী অমিয়কুমারের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন, ভৃত্য তাহাকে তথায় লইয়া গেল। উভয়ে একই সঙ্গে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ডাক্তাররা কি বললেন?"

সে বলিল, "কয়দিন উৎকণ্ঠায় ও অনিদ্রায় কন্যার সেবা করার পরে দুর্ব্বল ও শোকের আঘাতে কাতর অবস্থায় সাবিত্রী কয়দিন শয্যা ত্যাগ করেন নাই—আহারও করেন নাই। দেহের ক্রিয়া যেন স্তম্ভিত ছিল; যে বিষ মানুষের দেহে নিয়ত সঞ্জাত হয় তাহা বাহির হয় নাই— সঞ্চিত হইয়া সমস্ত দেহ বিষাক্ত করিয়াছে। পেটের মধ্যে যে জ্বালা অনুভূত হইতেছে, তাহা, বোধ হয় সেই বিষের ক্রিয়ায় উৎপন্ন ক্ষতের জন্য।"

সৌদামিনী বলিলেন, "কি সর্ব্বনাশ! এখন উপায়?"

অমিয় বলিল, "ঔষধ দিতে হবে। কিন্তু পথ্যে—বিশেষ জলীয় পথ্যে ও শুশ্রূষায় যদি রোগীকে বাঁচান যায়।"

জয়ন্তী কাতরভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "যদি বাঁচান যায়?"

অমিয় বলিল, "বোধ হয়, ক্রমে সুস্থ হবেন। কিন্তু আর যে স্বাভাবিক স্বাস্থ্য ফিরে পাবেন, সে আশা—দুরাশা। এখন আপনারা প্রাণপণে শুশ্রূষা করুন। পথ্য দিতেই হ'বে।"

অমিয় সৌদামিনীকে বলিল, "পিসীমা, ডাক্তার আমাকে কাল সকালে এসে রোগীর অবস্থা বেলা ৮টার মধ্যে তাঁ'কে জানাতে বললেন। কি করা হবে?"

সৌদামিনী বলিলেন, "কি আবার করা হবে—তিনি যা' বলেছেন, তুই তাই করবি। ভালই হ'ল; আমরা সব বিষয় জানতে পারব। কাল সকালে তুই এলে তবে আমি যাব।"

অমিয় চলিয়া গেল।

সৌদামিনী জয়ন্তীকে বলিলেন, "রাগ—পাপ—দোষ আমারই। যদি দুঃসংবাদ পেয়েই ছুটে আসতাম, তবে আর এমন হ'ত না। ছিঃ! ছিঃ! কি অন্যায় কাযই করেছি!"

সেই সময় অমিয় আবার আসিয়া বলিল, "পিসীমা, আমাকে টাকা দেওয়া হচ্ছে কেন? আমাকে ত ডাক্তার ব'লে ডাকা হয় নি।"

"আর বলিস না, বাবা,—ও সব মাথা-খারাপের লক্ষণ" —বলিয়া সৌদামিনী টাকা লইয়া ভ্রাতুষ্পুত্রকে সঙ্গে লইয়া যোগেশচন্দ্রের বসিবার ঘরে উপস্থিত হইলেন। যোগেশচন্দ্র বসিয়া ছিলেন—তাঁহাকে দেখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। সৌদামিনী বলিলেন, "আমি জানি, টাকাই তোমার সাধনা। কিন্তু আমাদের টাকা দেখান কেন? তোমার হয়েছে কি? তুমি আমার ভাইপোকে টাকা দিয়েছ! ওকে আমি এনেছি; যদি টাকা দিতে হয়, আমি দেব; ও যদি পারে ওর পিসীর কাছে টাকা নেবে। আশীর্ব্বাদ করি, টাকা উপার্জ্জন করুক; কিন্তু এমন বুদ্ধি যেন ওর কখন না হয়।"

তিনি টাকাগুলা টেবলের উপর ফেলিয়া দিয়া চলিয়া যাইলেন—যাইতে যাইতে অমিয়কে বলিলেন, "তোকে সন্ধ্যার আগেও এক বার আসতে হবে।"

ডাক্তারদিগের মত শুনিয়া যোগেশচন্দ্র বিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার মনে হইল, যদিও সাবিত্রী আশুতোষকে সংবাদ দিতে নিষেধ করিয়াছিলেন, তথাপি সে লীলার স্বামীর নিকট হইতে সংবাদ পাইয়া মা'র কাছে আসিবার জন্য অনুমতি চাহিয়া যে তার করিয়াছিল, তিনি গতকল্য তাঁহার উত্তরে তাহাকে বিমানে আসিতে তার করিয়া ভালই করিয়াছেন। কি জানি—কি হয়!

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য

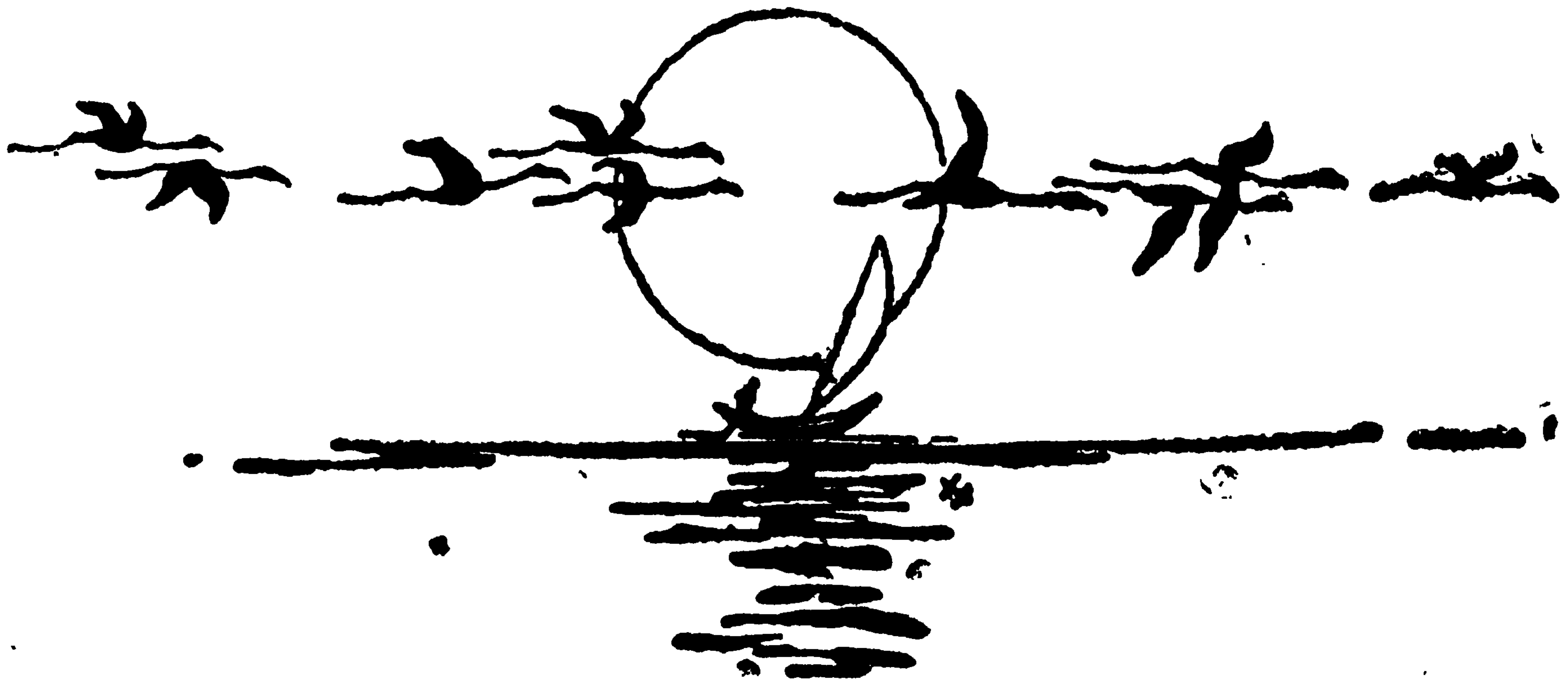

পাগল হ'ল বসুন্ধরা

শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত

জানি না তোমায় আমায়
কখন্ কোথায়
লাগ্‌লো ফাঁসি,—
রূপের রাশি।
চাহিনা আর কিছু তাই
চাই শুধু চাই
ঐ নয়নের
নীরব হাসি।
যখন ঐ গোলাপী লাল
কোমল মৃণাল
বাহুর ডোরে
বাঁধলে মোরে
ওলো সই—!
কাটলো আমার
ভয় ভাবনার
নৈশ আঁধার
নীলাম্বরে।
মেলে চোখ চাইতে জেগে
হর্ষাবেগে
প'ড়লো চোখে
প'ড়লো মুখে,—
যেন কোন্ মন্দাকিনীর
নির্ঝরিণী
এই সাহারায়
ঝ'রলো বুকে।
সে দিনের সেই ক্ষণিকের
সেই ক্ষণিকের
নেশায় মেতে
আস্‌তে যেতে,—
আঁখি মোর নিষ্পলকী
ডুবলো সখি!
তোমার আঁখির
মাঝখানেতে।
ডুবে আর পায়না দিশা
পায় যত তা'র যায় না তৃষা
যায় না মোটে
দগ্ধ ঠোঁটে
অধরের দ্রাক্ষা সরস
তপ্ত সে রস
অধর যত পায় সে লোটে।
চাতকের ফটিক জলের
একটু খানির
অনেক সাজা,—
মুখে মোর নিষিদ্ধ ফল
স্বাদু শীতল
সদ্য তাজা।
চকোরের চাঁদের সুধার
কে ধারে ধার
কে শুধাবে তা'র বারতা,
তোমার ঐ স্মিত হাসির,
জ্যোৎস্না রাশির
যে-জন জানে মর্ম্মকথা।
চোখে যেই রঙ্গ ঝরে
সরমের হিঙ্গুল রাগ

কপোলের আর্শি পরে
রচে সেই ফাল্গুনী ফাগ,—
উরসের শুভ্র সুডোল
নিখুঁৎ নিটোল,
রেশ্‌মি নিচোল
রঙ্‌ ফিরোজা—
যেন তার যুগ্ম চূড়ায়
মকর-কেতন উড়ায় ধ্বজা।
কাঁচা ঐ রূপের খনি
সেই লাবণি-
বন্যা যেন ভাসায় ধরা—
যেন তার ঘূর্ণি জলের
ঊর্ম্মি বলে
মন্মথেরো ডুবায় ভরা।
হিমানীর তুহিন গ'লে
তপ্ত জলে বইলো নদী,—
বুকে তা'র অগ্নি-গিরির
উষ্মা লেগে
অন্ধ বেগে
ছুটলো যদি,—
মাঝি তা'র ভাসায় তরী
বাসনার পাল ফুলিয়ে,
হুঁসিয়ার বৈঠা ধরি
কেটে যায় ঢেউ তুলিয়ে,
তুমি তায় ভয় না ক'রে
ভরসা ক'রেই
বসবে উঠে,—
গোধূলির তরল সোনায়
তোমার সোনার
কান্তি ফুটে।
কি জানি ঐ পসরা
রূপের ভরা
বইতে নারে;
নিখিলের তৃষ্ণা-কাতর
আঁখির যে-শর
তোমার আঁখি
সইতে নারে।
যদি তা'য় সরম লাগে
কপোল রাঙ্গে,
ধৈর্য্য টুটে—
আমার এই বুকের আড়ে
ভয় কাহারে
পাখীর মত আসবে ছুটে।
আমার এই শঙ্কাহরণ বক্ষপুটে,
নিখিল আঁখির আঘাত-কাতর
দুর্গপুরীর কক্ষপুটে।
শোনাবো নর্ম্ম-বাণী
মর্ম্ম-রাণী সেই নিভৃতে,
বলি তা'ই তা'রই খানিক
গান গেয়ে ঠিক
স্বর্গসুখের খবর দিতে।
হৃদয়ের কমল-হীরে
উঠলো জ্বলে
উঠলো রাণি!
ঘিরে ঐ রক্ত-কমল
কুসুম-কোমল
আল্‌তা-রাঙা
পা দু'খানি।
রূপে তা'র পাষাণ গ'লে
অথৈ জলে
ভাসলো ধরা,—
হরষের তুফান লেগে
সেই আবেগে
পাগল হ'ল বসুন্ধরা।

রোমক স্থাপত্য-শিল্প

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত

যখন কলিকাতার ডাক-ঘরের বা দিল্লীর জুমা মস্‌জিদের চূড়া দেখি, তখন 'নূতনের মাঝে তুমি পুরাতন এ কথা যে ভুলে যাই।' কারণ মাইকেল এঞ্জেলো চেয়েছিলেন প্রাচীন প্যানথিয়নকে সেণ্টপিটারের শিরের উপর তুলে প্রাচীনের রূপে নবীনকে সুশ্রী করতে। এবং তারপর বহু সভ্যদেশের অগণ্য অট্টালিকার চূড়া তারই রদবদল করা রূপ। আবার যখন ভারতবর্ষের বৌদ্ধ স্তূপের রচনার ভঙ্গী দেখি, তখন মনে প্রশ্ন ওঠে—এরা কি খৃঃ পূর্ব্ব ২৭ সনের নির্ম্মিত প্যানথিয়নের আদর্শ নয়? কারণ গ্রীক পর্য্যটকেরা রোমের ঐ সৌধ নির্ম্মিত হবার বহু পূর্ব্ব হতে বৌদ্ধ-মত-প্রভাবান্বিত ভারতে যাতায়াত করত। রোমের রূপশ্রীর আদর্শ গ্রীক শিল্প। এসব প্রত্নতত্ত্বের কুটতর্কের গোলকধাঁধায় প্রবেশ করলে সৌন্দর্য্যের উপলব্ধি ক্ষুণ্ণ হয়। সুতরাং শিল্পীর কৃতিত্বে মুগ্ধ হয়ে রসোপভোগই প্রজ্ঞা।

মূসা—মাইকেল এঞ্জেলো

প্যানথিয়ন মন্দিরের সন্নিকটে এক গীর্জ্জা আছে যার নাম সান্তা মেরিয়া সোপরা মিনার্ভা। এর অর্থ সান্তা-মেরি মিনার্ভার উপরে। কারণ এখানে একটি প্রাচীন মন্দির ছিল মিনার্ভা দেবীর। সেই পুরাতনের সঙ্গে সংযোগ রাখবার প্রচেষ্টা এবং নাম মাহাত্ম্যে আস্থা এই নামকরণের মূল অভিসন্ধি। হয়তো বা সোপরা মাতা শব্দে মেরির মাহাত্ম বোঝায় দেবী মিনার্ভার অধিক। গির্জ্জাটির মাঝে কয়েকটি আর্টের বস্তু আছে—রোমানোর এনানসিয়েসনের চিত্র, ফিলিপো লিপ্পি অঙ্কিত অনেক-গুলি মনোরম প্রাচীর চিত্র এবং মাইকেল এঞ্জেলোর জগদ্বিখ্যাত প্রস্তর মূর্ত্তি—ক্রুশবাহী যীশু। এ মূর্ত্তির চিত্র বহুস্থলে বিদ্যমান।

বারাণসীর মত রোম সহরের অলিতে গলিতে গীর্জ্জা। আমরা ভবঘুরের মত পথে পথে ঘুরতাম ও দেশের লোক ভ্রাম্যমান হিন্দুকে নিজের দেশের প্রাচীন শিল্প ও স্থাপত্য-সম্পদ দেখাবার জন্য সদাই ঔৎসুক্য প্রকাশ করত। যে-দিন আমাদের সঙ্গে আমার দু'বছরের পৌত্রী লালী থাকত—আমাদের যত্ন হ'ত অত্যধিক। ইতালীর মহিলারা খুব শিশুভক্ত। ছোটো ছোটো ছেলেমেয়ে তাকে নিয়ে খেলতে ভাল বাস্‌ত—ভাষার বিভিন্নতা মিতালীর প্রতি-বন্ধক হ'ত না। বারাণসী, বৃন্দাবন, নবদ্বীপ প্রভৃতি তীর্থ-স্থলের কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু রোমের মত এত ধর্ম্মভবন কোনো রাজধানীতে নাই। লণ্ডন, প্যারিস, কলিকাতা, দিল্লী প্রভৃতি সহরে ধর্ম্মভবনের অভাব নাই। কিন্তু আমার মনে হয়, এ বিষয়ে প্রতিযোগিতায় রোমের কাছে এদের পরাজয় নিঃসন্দেহ। আমি ৮০টি গীর্জ্জা গুণেছিলাম রোমে। তার মধ্যে জননী মেরীর নামে বারোটি—অবশ্য ভিন্ন ভিন্ন বিশেষণে। যথা—সান্তা মারিয়া অস্তিকা, সান্তা মারিয়া মগগিয়োরে, সান্তা মারিয়া অঞ্জলিকা ইত্যাদি। ক্যাথলিক গীর্জ্জা ব্যতীত এখানে কয়েকটি ইংরাজী ও আমেরিকান

গীর্জ্জা বর্ত্তমান। গীর্জ্জার উপরের ক্রশ, শিব মন্দিরের মাথার ত্রিশূলের মত।

প্রাচীন রোমের আর একটি প্রকাণ্ড সুগঠিত গোল দুর্গ-প্রাসাদ—সেণ্ট এঞ্জেলো কাশল্। অবশ্য নামটা প্রাচীন রোমের নয়—খৃষ্টীয় ৫৯০ খৃঃ অব্দের। কিন্তু অট্টালিকা দ্বিতীয় শতকের। এ প্রাসাদ বাবা তীবরের কুলে। এক প্রকাণ্ড রোমক পুল তীবরের উভয় কুলকে সংযুক্ত ক'রেছে। সম্রাট হাড্রিয়ান আপনার এবং নিজ পরিবারের সমাধি সৌধ হিসাবে এ বৃহৎ সৌধ নির্ম্মাণ ক'রেছিলেন। আজও আমাদের দেশে ধনীর উইলে শ্রাদ্ধের ব্যয়ের বিধান থাকে।

৫৯০ খৃঃ অব্দে রোমে দেখা দিল এক মহামারী। তখন প্রাচীন রোমক ধর্ম্মকে লুপ্ত ক'রেছে খৃষ্টধর্ম্ম। সে-দিন ক্যাটাকুম ছেড়ে ইতালীর খৃষ্টীয় ধর্ম্ম-যাজক বাহিরে প্রকাশ্যে বাইবেল বর্ণিত কৃপার আধার জগদীশ্বরের যশোগানে শাশ্বত সহর রোমকে মুখরিত ক'রেছে। অবশ্য অদৃশ্য স্বর্গতঃ গুরু হিসাবে, দেব-দেবী উপাসকের বংশধর সাধুসন্তের বেদীতে আশীর্ব্বাদ মাগে। সেদিন যশে, মানে পোপ গ্রেগরীর নাম দিগন্ত-প্রসারিত। তাঁর আমলে খাস রোমে মহামারী! যাজক-সম্রাট পোপ গ্রেগরী সহরে প্রার্থনার শোভাযাত্রা বাহির করলেন। তিনি নিজে চল্লেন বিরাট নগর-সঙ্কীর্ত্তনের সর্ব্বাগ্রে। যখন হাড্রিয়ান সমাধি সৌধের নিকটে এলো কীর্ত্তনীয়ার শোভাযাত্রা, পোপ দেখলেন প্রাসাদের শিরে দাঁড়িয়ে স্বয়ং সন্ত মাইকেল হাতের অসি কোষে ভরছেন। এ শুভ দর্শন সূচনা করলে মঙ্গলের। সত্যই দেশে শান্তি এলো, প্লেগের হ'ল দমন। এই দিব্য দর্শনের কাহিনীকে অমর ক'রবার প্রত্যাশায়, পোপের নির্দ্দেশে ঐ দুর্গ-শিরে সন্তের এক মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হ'ল। সন্ত এঞ্জেলোর কল্যাণমূর্ত্তিটি ব্রোঞ্জ ধাতুর।

প্রাচীন রোমের কীর্ত্তি-সৌধের মধ্যে প্রথমেই দৃষ্টি পড়ে কলিসিয়মে। সৌধের উপরতলা ভেঙ্গে গেছে, মাঠের ক্রীড়া-ভূমিও গৌরবহীন ম্লান ভগ্নস্তূপ মাত্র। দেব-দেবীর মন্দির প্রতিষ্ঠা যেমন প্রাচীন রোমক জীবন-স্রোতের এক ধারা, তেমনি অন্য প্রবলধারা ছিল ক্রীড়া-কৌতুক, দেহচর্চ্চা। কারণ ভারতবর্ষ যেমন ব্রাহ্মণ্যকে সামাজিক আদর্শে শীর্ষস্থান দিলে, রোম দিলে ক্ষাত্রধর্ম্মকে। বিশ্ব-বিজয় ছিল রোমের লক্ষ্য, অন্তর-বিজয় ভারতের আদর্শ। য়ুরোপের সাম্রাজ্যবাদ সেই রোমক ভাবধারার পরিণাম।

কলিসিয়ম ক্রীড়াভূমি। সৌধটী থরে থরে ওঠা দর্শকের আসন ব্যবস্থায় পূর্ণ। এখনকার দিনের ষ্টেডিয়ম তারই অনুকরণ। কিন্তু জগতের কোনো ষ্টেডিয়ম প্রাচীন কলিসিয়মের গৌরব বা বিশালতা আয়ত্ত করতে পারে নি। আমি বলছি স্থাপত্যের কথা। কারণ ৮০ খৃঃ অব্দ হ'তে খৃষ্টীয় রোমে ষষ্ঠ শতাব্দী অবধি এই ক্রীড়া-ভূমিতে যে নৃশংসতা আনন্দ দান করত, পরবর্ত্তী জগত তাকে সামাজিক জীবন হ'তে বিদায় দিয়ে মনুষ্যত্বকে সম্ভ্রান্ত ক'রেছে। স্পেন অনেক দিন চালিয়েছিল এমন কৌতুক-ক্রীড়া। কিন্তু নবীন জগত মানুষ মারার অস্ত্র শস্ত্র আবিষ্কার ক'রেছে।

অ্যাম্পিথিয়েটারে দর্শকের আসন-শ্রেণী অর্দ্ধচন্দ্রাকৃত। এর ব্যাস ৫৭৩ গজ। নীচের কুটুরিগুলি এখন চাপা প'ড়েছে—

ক্যাপিটল—সংগ্রহশালা

আবর্জনা স্তূপে, জীর্ণ অট্টালিকাচ্যুত ধুলা ও পাথরে। তার মাঝে থাকত নানা বন্য পশু এবং হতভাগ্য জীব, মল্লযোদ্ধা, প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত অপরাধী, গ্ল্যাডিয়েটর, পালোয়ান ইত্যাদি ইত্যাদি যাদের জীবন হ'ত ক্রীড়া ও আনন্দ এবং দৃষ্টিসুখের সামগ্রী। এখানে মানুষে মানুষে আপ্রাণ যুদ্ধ হ'ত। এখানে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত অপরাধীকে বাঁচবার অবকাশ দেওয়া হ'ত সিংহ, মহিষ প্রভৃতির সঙ্গে সংগ্রামে। বিজয়ীর প্রাণদণ্ড মকুফ্ হ'ত। আরও কৌতুকের কথা, বাস্তমন্দিরের চিরকুমারীরা জয়-পরাজয় বিচার করত।

আমাদের গাইড্স্ গর্ব্বে বল্লে—নিশ্চয়ই ইতিহাসে প'ড়েছেন যে ৮০ খৃঃ অব্দে যেদিন এর দ্বারোন্মোচন হয়, ফ্লেভিয় সম্রাট টিটাস সগর্ব্বে সপরিবারে সম্রাটের আসন অলঙ্কৃত ক'রেছিলেন। সকল শ্রেণীর হাজার হাজার দর্শকে ক্রীড়াস্থল পূর্ণ ছিল। সেদিন এখানে যুদ্ধ ক'রেছিল সিংহ, বাঘ, বন্য মহিষ, গণ্ডার প্রভৃতি। এরা ভীষণ বিক্রমে পরস্পরের সঙ্গে যুঝেছিল। পাঁচ হাজার পশু নিহত হ'য়েছিল—উৎসব চ'লেছিল শতদিন।

সানন্দে সোৎসাহে এই বিবৃতি দিচ্ছিল সুন্দর ইংরাজিতে ইতালীয় গাইড। কিন্তু তার বর্ণনা এই অবধি শুনে আমার পৌত্রী শমিতা বল্লে—ছিঃ, ছিঃ, দাদু চলুন। শিশু মন অতটা বীরত্বের কাহিনী সহ্য করতে পারলে না।

প্রাচীন রোম পঞ্চম শতাব্দীর শেষেই লোপ পেয়েছিল। বর্ব্বর রাজা ও কলিসিয়ম চালিয়েছিল। আজ বর্ব্বর শব্দের অবনতি হয়ে বর্ব্বর মানে হয়েছে অসভ্য। কিন্তু সেদিন য়ুরোপের উত্তরের জাতির নাম ছিল বর্ব্বর। তারাই য়ুরোপে গথিক স্থাপত্য ধারা প্রবর্ত্তন করেছিল। বর্ব্বর ভূপতি খৃষ্টান থিওডোরিক ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে কলিসিয়মে আধুনিক অর্থের বর্ব্বর খেলা বন্ধ করেছিলেন। অবশ্য সত্যের খাতিরে বলতে হয় যে, ৪০৫ খৃঃ অব্দে সম্রাট হনোরিয় সিংহাসনারূঢ় হয়ে ঐ সব ক্রীড়া-কৌতুক নিষেধ করেছিলেন। অবশ্য আবার হিংসা বৃত্তি নিজের লুপ্ত অধিকার উদ্ধার করেছিল কিছুদিন পরে।

মল্লযুদ্ধ ক্রীড়া ভারতে এবং গ্রীসে ছিল। প্রাচীন রোমের ধ্বংসাবশেষের সন্নিকটে খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতকে প্রতিষ্ঠিত ক্যাপিটোলিয়ান থিয়েটরিয়ম। তার মধ্যে খৃষ্ট-পূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীর একটি প্রস্তর মূর্ত্তি আছে। ইংরাজিতে এর নাম ডাইং গল। কিন্তু এর ল্যাটিন নাম শালা ডেল গ্ল্যাডিয়েটোর। এ অপূর্ব্ব মূর্ত্তি গ্রীক দেশ হ'তে আনা। এর উদ্দেশ্য নিশ্চয় মুমূর্ষুর মৃত্যু যন্ত্রণা ব্যক্ত করা এবং সেই যন্ত্রণার সঙ্গে সত্রাস সংগ্রামের চিত্র আঁকা।

এই সংগ্রহ-শালাতেই প্রাচীন গ্রীসের ক্যাপিটোলীন ভিনাস, কাঁটা উদ্ধার করা যুবক প্রভৃতি প্রস্তর-মূর্ত্তির নকল

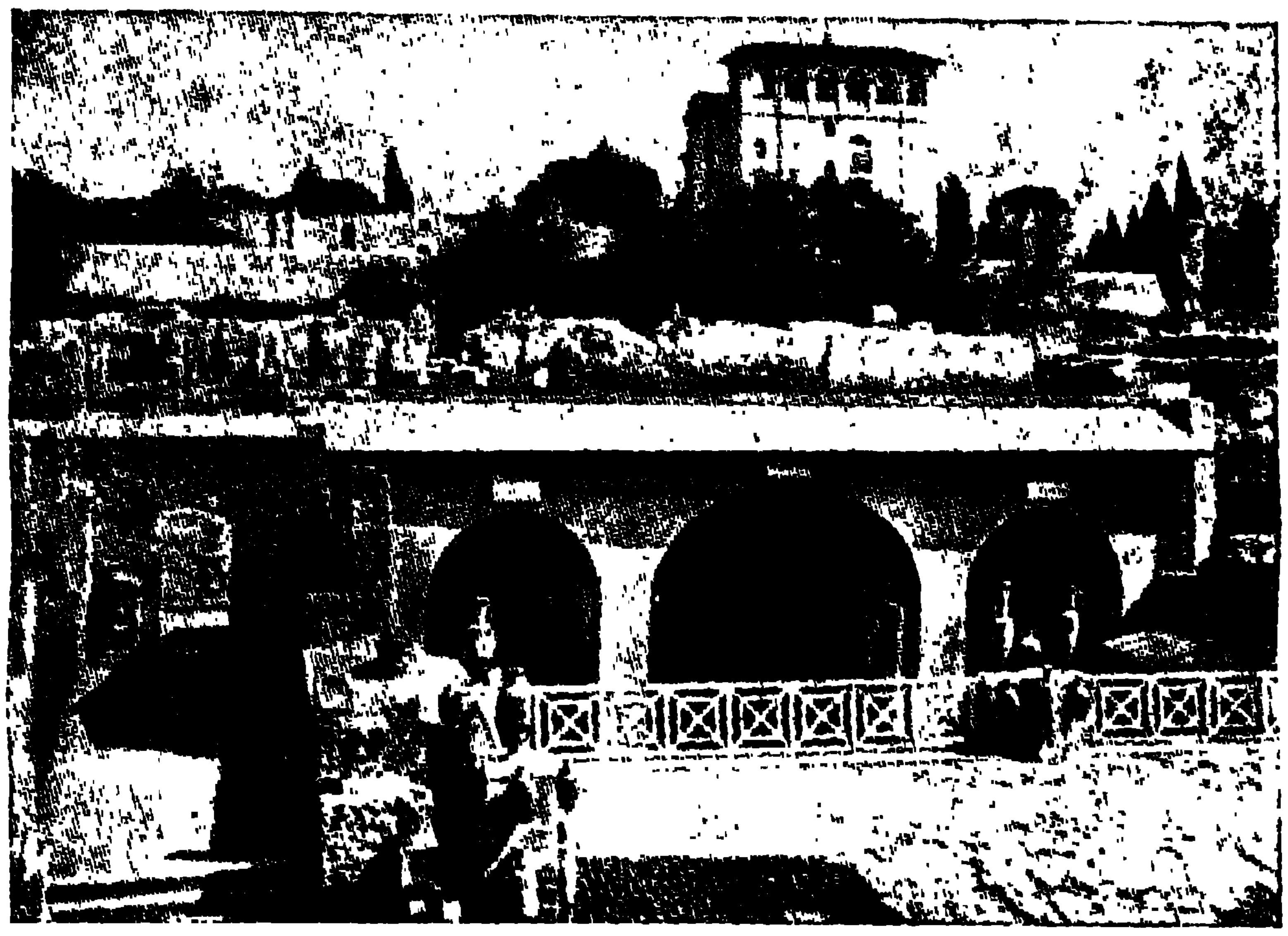

রমুলাসের গৃহের স্থান

আছে। সেগুলিও বহু দিনের।

আধুনিক নির্দ্দোষ দেহ-চর্চ্চা সম্পর্কীয় ক্রীড়ার জন্য ভ্রান্ত মুসোলিনী রোমের প্রান্তে তীবর নদের পরপারে এক প্রকাণ্ড অ্যাম্পিথিয়েটার গড়েছিলেন। বিশাল ক্রীড়া-ক্ষেত্র প্রায় লালদিঘির মত—নাবাল জমি—তার চারিদিকে স্তরে স্তরে সিঁড়ি উঠে এসেছে। সেইগুলি বসবার আসন। ক্রীড়াক্ষেত্রে নামবার সিঁড়ির দুপাশে সুন্দর পাথরের মূর্ত্তি। আজ মুসোলিনীর নাম কেহ উচ্চারণ করে না। তাঁর নির্ম্মিত প্রকাণ্ড অসম্পূর্ণ অট্টালিকা শিক্ষার স্থান হিসাবে নির্দ্দিষ্ট হয়েছিল। আজ সে সৌধ মার্কিনীদের হাতে। এ সব দেখে শুনে মনে পড়ে—বিধিরহো বলবান ইতি মে মতিঃ।

কলিসিয়মের সন্নিকটে কন্‌স্থানটিনের বিজয় তোরণ এখনও সগৌরবে দাঁড়িয়ে আছে। এটি খৃষ্ট-ধর্ম্মের বিজয় নিদর্শন হিসাবে ৩১২ খৃঃ অব্দে নির্ম্মিত হয়েছিল। এরকম বিজয়-তোরণ আরও আছে রোমে। এর গোল খিলান রোমক স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্য। ফ্রান্সের বিজয়-খিলান—আর্ক ডি এয়ম্ফ—এরই অনুকরণে নির্ম্মিত, সে বিষয়ে সন্দেহ আসতে পারে না।

প্রাচীন রোমের ভগ্ন-স্তূপের মধ্যে শনি মন্দিরের তিনটি থাম, বাস্তদেবীর গোল মন্দিরের অবশেষ, ফোরামের জীর্ণ কটি পাথর ইত্যাদি দেখা যায়।

প্রাচীন রোমের ধ্বংসাবশেষ

স্থানটিকে ঘিরে আপাতত সযত্নে রাখা হয়েছে। পূর্ব্বে নিশ্চয়ই লোকে আবশ্যকমত এস্থল হতে ইট কাট পাথরের টুকরা এবং নানা ধাতুর মূর্ত্তি প্রভৃতি স্ব-কাজে লাগিয়েছে!

আধুনিক স্থাপত্য সুদৃশ্য, সুগঠিত ভিক্টর ইমানুয়েল স্মৃতি-সৌধ প্রাচীন ক্যাপিটোলিন পাহাড়ের শিরে প্রতিষ্ঠিত। আমাদের ভিক্টোরিয়া স্মৃতিসৌধ যেমন সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে, এ সৌধও তেমনি চোখে পড়ে। ১৭৭৮ সালে ইতালীর নরপতি ভিক্টর দ্বিতীয় ইম্মানুয়েল দেহরক্ষা করেন। তাঁর রাজত্বকালে বহু প্রদেশে বিভক্ত ইতালী একত্র হয়ে এক রাজ্যে যুক্ত হয়। সেই মঙ্গল-স্মৃতিকে সজীব রাখবার উদ্দেশে এই অট্টালিকার ভিত্ত গাড়া হয় ১৮৮৫ খৃঃ অব্দে। ১৯১১ সালে এ স্মৃতি সৌধ গড়া শেষ হয়। শ্বেত মর্ম্মরের সুউচ্চ সৌধ স্তরে স্তরে উঠে গেছে। এর উপর থেকে দেখা যায় প্রাচীন রোমের ভগ্নাবশেষ।

রোম সুদৃশ্য সৌধ, বিলাস-প্রাসাদ, মূর্ত্তি এবং শিল্প-সম্পদে পূর্ণ। বহু ফোয়ারা চারিদিকে। সকলগুলির পরিচয় দেবার স্থান নাই। তবে একটির পরিচয়ে মধ্য যুগের রোমশিল্পী বার্ণিনীর ভারত-প্রীতির নিদর্শন পাওয়া যায়। নবনা স্কোয়ারে এক বৃহৎ প্রাসাদ বিদ্যমান। তার সম্মুখের আঙিনায় তিনটি ফোয়ারা। তার মাঝেরটির মধ্যে মিশরী এক লম্বা পাথর ফলক। চারদিকে চারটি সুদৃশ্য । তাদের পায়ের তলা দিয়ে জল পড়ছে। এই চারিটি মূর্ত্তি, চারিটি মহাদেশের প্রধান নদী দেবতার চেহারা। রোমান তীবরকে বলত পিতা। সুতরাং গঙ্গা যে মাতা সে সংবাদ সম্ভবতঃ মধ্যযুগের শিল্পী বিদিত ছিলেন না। তাই তিনি চার দেশের চারটি নদের মূর্ত্তি গড়েছেন—দানুব, নীল, লাপ্লাটা এবং বাবা গঙ্গা! বাবা গঙ্গার পিছনে নারিকেল গাছ, সুন্দর চেহারা। হয়তো শিবের মূর্ত্তির সঙ্গে ভুল করেছেন বারনিনি—১৬৪৭—৫২ খৃঃ অব্দে। কিন্তু পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গার প্রতি এ শ্রদ্ধায়—পতিতোদ্ধাররূপে অবশ্য—আমরা কৃতার্থ ও কৃতজ্ঞ।

রোমের বিচারালয় প্রকাণ্ড সুদৃশ্য অট্টালিকা বহু ভগ্ন আশা, মিথ্যা লোভ সত্যের অপমান এবং কূট তর্কের বিলাসিতা তার বাহিরের রূপ ম্লান করতে পারেনি—অন্তরাত্মার কথা অন্তর্য্যামী জানেন।

সাহিত্যসেবীর তীর্থ একটি ছোট বাড়ী যেথায় বায়রণ বাস করতেন আর একটি ছোট কবর যেথায় কীটস অন্তিম শয্যায় শায়িত।

ইতালীর সর্ব্বত্রই শিল্পের' নিদর্শন। জাতি শিল্প ভালবাসে। মহিলারা হাস্যমুখ এবং শিশু দেখলে পরিচয়ের অপেক্ষা করে না। আমাদের ছ'বছরের লালীর এবং ন'বছরের সমিতার পথে-ঘাটে সবিশেষ সম্মান ছিল। ছুটি মেয়েকে লোকে কত মিষ্টান্ন দিত। প্রকৃতপক্ষে গঙ্গার মূর্ত্তি দেখিয়েছিল এক কুমারী—যে প্রথমে আমার পৌত্রীদের সঙ্গে তাদের ইংরাজিতে আলাপ জমিয়েছিল।

কাঁটা

শ্রীশ্যামাপদ ঠাকুর

নাঃ, এ পোড়া মুখ মাধুরী কিছুতেই দেখাবে না! বিয়ে বাড়ীর ভীড়ে সবাই এসে তার দুর্ভাগ্যের সুযোগ নিয়ে যে ন্যাকামো ক'রবে, তা' সে সইতে পারবে না। ছোট্ট একখানা চিঠি লিখে দিল—"মা, মাধবী সুখী হোক। বিয়েতে আমার যাওয়া হবে না, তোমরা দুঃখু কোরো না"—

মা আর-একদফা কেঁদে বুক ভাসালেন। মাধবী কিন্তু বেজায় চটে গ্যালো মনে মনে—দিদি ওকে হিংসে করে! কিন্তু ক্যানো? ওরও তো ভালো ঘরে ভালো বরেই বিয়ে হ'য়েছিল! বরাতে সইলো না, সে-দোষ কার? ছোট বোনকে হিংসে করলেই কি সে দোষ খণ্ডাবে, ফিরে আসবে সুখ? দিদিকে একবার কাছে পেলে হয়, আচ্ছা ক'রে শুনিয়ে দিতে ছাড়বে না!

হঠাৎ বিয়ের ঠিক তিন দিন আগে বাবা নিজে এসে হাজির—চোখের জলের দুটো রেখা গালের উঁচু হাড় বেয়ে নেমে এসেছে—"মা"—বৃদ্ধের রুদ্ধ কণ্ঠ ভেদ ক'রে আর কোনো কথাই বেরুলো না। বাবার চোখের জল মোছাতে নিজেরও বুকের কাপড় ভিজিয়ে ফেললে মাধুরী—সব সঙ্কল্পের বাঁধ গ্যালো ভেঙে···

আজ বাদে কাল বিয়ে—কিন্তু এটা যেন শ্রাদ্ধ বাড়ী! সর্বক্ষণ মা আড়ালে লুকিয়ে চোখের জল মুছছে—বাড়ীটায় নেমে এসেছে মৃত্যুর নিস্তব্ধতা! মাধুরী পা ফেলতেই হাওয়া যেন উল্টো বইতে সুরু করেছে—ক্যামন থমথমে অস্বস্তি! এই জন্যই ও আসতে চায়নি! মাধবীটাও ক্যামন চোখে চাইছে—দূর থেকেই—দিদির কাছে আসতেও ওর ভয়!

মাধুরী আগেকার দিনের মতো স্বচ্ছ-সহজ হ'বার চেষ্টায় ছোট বোনটীকে ওপরে একলা ঘরে বুকে টেনে নিলো—"কথা কইছিস না যে? বড্ডো দেমাক হ'য়েছে, না? মাধবীশাখে ফুল ফুটতে না ফুটতেই এই—ভ্রমর এসে মধুপান সুরু ক'রলে না জানি কি হবে!"

মাধবীর মনে মনে মহড়া দেওয়া কড়া কথাগুলো ক্যামন গুলিয়ে গ্যাছে—দিদির দিকে চোখ তুলে চাইতেই পারছে না।

"কি লো, বোবা হ'য়ে গেলি না কি? জোর ক'রে থুঁতনিটা তুলে ধরতেই চোখ ফেটে বেরিয়ে এলো তপ্ত অভিমান···দিদির বুকের আগুন নিভিয়ে দিলো মাধবী বাঁধভাঙা অশ্রুর বন্যায়—মাধুরীর অশ্রু-আশীর্বাদে ওর সমস্ত ম্লানিমা গ্যালো ধুয়ে মুছে···

বাড়ীটা আবার প্রাণচঞ্চল হ'য়ে উঠেছে···

কিন্তু ভোরের সানাইএর সুর যেন মাধুরীর পিঠে চাবুক বসিয়ে দিলে! কোনো মঙ্গল কাজই ও ধরতে ছুঁতে পারে না। তা' হ'লে এ অপমানের মধ্যে ওকে ক্যানো আনা হ'য়েছে? একজন লোকের সঙ্গে ওরও সত্তা কি গ্যাছে লোপ পেয়ে? একজনের সঙ্গে আরেক জনের হবে জীয়ন্ত সমাধি?···তার সঙ্গ তো মাধুরী পেয়েছিল বড় জোর ছ'মাস—ছ'মাসই বা কোথায়—ছ'মাস তো সে ছিল বিছানাতেই পড়ে! এত্তো বড়ো জীবনের মধ্যে সামান্য ক'টা দিন তার জীবনের ধ্রুবতারা হ'য়ে থাকবে—আর সমস্তই হ'য়ে যাবে মিথ্যে?··· ক্যানো, কী এমন অপরাধ করেছে ও? ও তো ঠিক সেই মাধুরীই আছে—ও হ'য়ে যাবে মিথ্যে আর দুঃস্বপ্নের স্মৃতির ছায়াটাই হ'য়ে থাকবে বড়ো?···ও তো কোথাও বদলায়নি! তা হ'লে?···ওর ছোঁয়াচেও কি অপরের সাধ আহ্লাদ উবে যাবে? ওর চেহারাটায় কি ছিন্নমস্তার ছায়া?

দুমদাম করে পা ফেলে ওপরে উঠে গ্যালো মাধুরী—দড়াম ক'রে দরজাটা দিল বন্ধ ক'রে। জানালার ধারটা বেশ···এক ফালি সাদা চাঁদ আলো হারিয়ে এখনও নীল আকাশের গায়ে ভেসে বেড়াচ্ছে—ওরও জীবনের আলো কি গ্যাছে নিভে?···

পেছন ফিরে চাইতেই বড় আলমারিটার আর্শিখানার

ভেতরে নিজের সঙ্গে দেখা হলো—যেন নতুন কাউকে দেখছে মাধুরী···এগিয়ে গ্যালোর এক পা দু'পা করে··· এতো ভোরেও চোখে ওর আলো ঝিকিমিকি—ফুটন্ত পদ্মের পাঁপড়ির ওপরে কে যেন বিন্দু বিন্দু মুক্তো ছড়িয়ে দিয়েছে···আঁচল দিয়ে বেশ ক'রে মুখখানা মুছে ফেললো—এতো সুন্দর ও!—ঠিক আগেকার মতোই তো দু'গালে টোল খায়—ঠোঁটের কোণে সেই বাঁকা হাসি।—কতো দিন পরে মাধুরী আবার যেন নতুন ক'রে দেখছে নিজেকে—সবই ঠিক তেমনিই তো আছে! সমস্ত পিঠ জুড়ে কিলবিল ক'রছে রুক্ষ চুলের কাঁড়ি—সিঁদুর পরলে সিঁথিটা কি এখনও শুকতারার মতো জ্বলবে না?—নিঃশ্বাস গাঢ় হ'য়ে এলো—আলগোছে চারদিকে একবার চোখদুটো বুলিয়ে নিল মাধুরী—নাঃ, কেউ নেই কাছে পিঠে। চোখে ওর কিশোরীর মায়াকাজল—নতুন আবিষ্কারের উন্মাদনা···বিকচ কোরক দু'টি কী চমৎকার আধ ঘুমে ফুটে আছে! ওদের জাগাবে কে?···রক্তস্রোত উজান বইছে শিরায় শিরায়···এ সবই বিফলে যাবে শুধু ছ'মাস দেখা একটা লোকের অভাবের জন্যে?···ক্যানো—ক্যানো—নাগিনীর জ্বালা বেরিয়ে এলো বুক থেকে···

না খেলে মা কান্নাকাটি করবে—বিয়ে বাড়ীর অমঙ্গল হ'বে—তাই বাধ্য হ'য়ে দাঁতে মুখে এক করলো মাধুরী দুপুরবেলা—কিন্তু কোনো কাজেই একগাছি কুটোও নাড়লো না। ওপরের ঘরটা বেশ—একেবারে গুটিয়ে ফেললে নিজেকে ওই ঘরটায়—ভেজানো দরজা দিয়ে কোনো হৈ-হুল্লোড়ই এসে হানা দিল না।

বিকেলের দিকে দিদির কাছে এসে কেঁদে ফেললো মাধবী—"তুমি তা হ'লে এলে ক্যানো? আমরা তো তোমায় কিছু বলিনি!"

"দূর পাগলী, বলাবলির কী আছে?" সস্নেহে ওর চোখের জল মুছে দিয়ে বললো মাধুরী—"তুই তো সব কিছু বুঝিস বোন—মরা হাতে যে কিছু ছুঁতে নেই!"

"তা ক্যানো হ'বে? এই তো তোমার কী চমৎকার তুলতুলে হাত দু'খানা! আরো দু'গাছা চুড়ি পরিয়ে দি, ক্যামন সুন্দর তাখায় ছাখো"—মাধবী সত্যিই নিজের হাত থেকে চুড়ি খুলতে গ্যালো

"আবার পাগলামো করে"—মিষ্টি হেসে মাধবীর ডান হাতখানা অঞ্জলির মধ্যে টেনে নিলো মাধুরী।

"লক্ষ্মী দিদি"—মাধবীর গলায় আবদার মাখানো—"তুমি নীচে চলো, নইলে কিছু ভালো লাগছে না—"

মাধুরীর তীক্ষ্ণ হাসির ফলাটা ছিটকে গ্যালো—"আর হা-পিত্যেশের দরকার নেই—আজ রাত থেকে ভালো লাগবার লোকের অভাব হ'বে না—"

"যাঃ, ও, তুমি ভারী ইয়ে"—দিদির হাত থেকে টোল খাওয়া গাল দু'টো ছাড়িয়ে নিয়ে মাধবী পালালো···

বর এলো বুঝি—নইলে অতগুলো শাঁখ একসঙ্গে বেজে উঠবে ক্যানো···ধড়মড়িয়ে উঠে বসে দু'হাতে চুলের কাঁড়িটা সামলে নিতে নিতেই দরজার দিকে পা' বাড়ালো মাধুরী···না, যাবে না নীচে—কী দরকার অপরের আনন্দে বাদ সাধবার—এই বেশ—

ভাই-ঝি যমুনা কী কাজে হাঁপাতে হাঁপাতে এসে হাজির—"ছাখো বড়ো পিসী, কী চমৎকার রুমালে পদ্য ছেপে এনেছে বরেরা—কী সুন্দর গন্ধ ছাঁখো"—পিসীর নাকে একবার চেপে ধরলো পদ্যখানা। গন্ধটা সত্যিই ভালো—"তোমার বিয়েতেও ঠিক এমনি হ'য়েছিল, না বড়োপিসী?"

হ্যাঁ, মাধুরীর জীবনেও এসেছিল ঠিক এম্‌নি এক জমাট বাঁধা আনন্দের জীবন্ত সন্ধ্যা—এইতো মোটে সেদিন—সেদিনও এম্‌নি সানাই বেজেছিল—কী মাহেন্দ্র-ক্ষণেই শুভদৃষ্টি হ'য়েছিল মহেন্দ্রের সঙ্গে, ছ'টা মাসও কাটলো না—বুকটা খালি ক'রে অজান্তেই বেরিয়ে এলো একটা গাঢ় দীর্ঘশ্বাস···আবার যদি ফিরে পেতো আগেকার সে সব দিন—সেই কোলকাতার হোষ্টেল—সেই ফার্ষ্ট-এড-এর ক্লাশ—আর—আর···মনে ভেসে ওঠা ছবিটা ছিঁড়ে গ্যালো শাঁখগুলো আবার ঐক্যতানে বেজে উঠতে—

যমুনাটা পালিয়েছে নিজের কাজ সেরে—মাধুরীর কোলের ওপর পড়ে আছে উপহারখানা—বিয়ের পদ্য—না পড়াই ভালো—যতো রাজ্যের ভাইবিনের ময়লা ঘেঁটে জড়ো করা—গা গুলিয়ে ওঠে···কিন্তু ভারী মিষ্টি গন্ধটা ছড়াচ্ছে—দেখাই যাক্ না পড়ে···

"প্রিয়-মাধবী মিলনে"—বুকের ভেতরটায় মোচড় দিয়ে উঠলো…ক্ষিপ্রহাতে আলোটা বাড়িয়ে দিয়ে ছেলে-মানুষের মতো বানান ক'রে ক'রে পড়লো মাধুরী—হ্যাঁ, তাইতো…কে যেন হাতুড়ি পিটছে বুকের ভেতর…প্রিয়ব্রত!…কে এ—এ কোন্ প্রিয়—কার প্রিয়?…আলুথালু বেশে মাতালের মতো টলতে টলতে নীচে নেমে গ্যালো মাধুরী।

কী ভীড়! বরের বসবার ঘরটার জানালায় যেন প্রজাপতির মেলা বসেছে! ঠেলেঠুলে কার একটা শাড়ীর আঁচল ধরে উঁচু জানালাটার পা'-দানিতে উঠে দাঁড়ালো মাধুরী—ওই বর—পাশ ফিরে কার কাণে কাণে কথা কইছে…ভূত…ভূত…চারদিক কালোয় কালো ক'রে একটা প্রকাণ্ড ভূত এসে জাপটে ধরেছে মাধুরীকে…

—কীসের একটা তীব্র ঝাঁঝে স্নায়ুগুলোতে ফিরে আসছে চেতনার স্পর্শ—কী হ'য়েছে ওর—মা, বাবা, বৌদিরা—আরও অনেকে ওকে ঘিরে দাঁড়িয়ে!—কনে-চন্দন-পরা মাধবীরও চোখ টল টল করছে! চুলগুলো জবজবে—ভিজে চোখেমুখে হাতপাখার হাওয়াটা বেশ আরাম দিচ্ছে—মার গাল বেয়ে গড়াচ্ছে দুটো স্বচ্ছ জলের ধারা—ক্যানো? কাণে এলো কারা বলছে—"অমন চোখ জুড়োনো লক্ষ্মী প্রতিমার মতো রূপ—আর কোন্ গুণটাই বা না আছে—কিন্তু ভগবানের কী বিচার—কপালখানা দিয়েছেন একেবারে পুড়িয়ে—ঐ সব ভেবে ভেবেই না—মাধুরীর আধঘুম ছিঁড়ে গ্যালো কতগুলো শাঁখের শব্দে—রাত বোধ হয় এখন অনেক—বিয়ের লগ্ন এলো বুঝি। —সমস্ত শরীর কীসের ব্যথায় ঘুমিয়ে আছে……

দুড়দাড় করে সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসছে কতগুলো পায়ের শব্দ—মিহি কণ্ঠের তীক্ষ্ণ-লঘুতা—সর্ব্বনাশ। মাধুরী মাথা অবধি মুড়ি দিয়ে পাশ ফিরলো—কাল সকালে বর না চলে যাওয়া অবধি ওকে যে ঘুমিয়ে থাকতেই হবে—

"এই চুপ—আস্তে ভাই"—মাধবীর নতুন গলা—নতুন শাড়ীর খস্‌খসানি—"মেজো বৌদি, দিদি যে এখনো ঘুমুচ্ছে।" কী মিষ্টি মাধবীর আধো আধো কথাগুলো—এই একটা রাত্রি কী মধু যে বয়ে আনে মেয়েদের জীবনে! —নিজের অজান্তেই উস্‌খুস্ করে উঠলো মাধুরী।

"ওই তো দিদি নড়ছে—এখন ডাকলে কিছু হবে না—ডাকি, কী বলো? —বিয়ের সময় দিদি কাছে থাকবে না?"—মাধুরীর গলায় কান্না উপচে পড়তে চায়—

"না ভাই থাক্—ডাক্তার যখন ঘুম ভাঙাতে বারণ করেছে—ডেকে তুললে আবার যদি কিছু হয়—চলো সব নীচে—ওদিকে সময় হয়ে এলো"—

পায়ের শব্দগুলো নীচে নেমে যাচ্ছে—যাক্, ভগবান বাঁচিয়ে দিয়েছেন—ভাগ্যিস্ ফিটটা হ'য়েছিল, নইলে কী কেলেঙ্কারী হ'তো কে জানে!…মাথার ভেতরে কতো কী যে তালগোল পাকিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে…বুকটা লাগছে বড্ডো ফাঁকা…ক্যান যেন চোখ দুটো জলে ভরে এলো মাধুরীর!…কিন্তু এরা কি ওকে কাঁদতেও দেবে না নিশ্চিন্তে! শাঁখগুলো হুল ফুটিয়ে দিচ্ছে কাণের ভেতর—সঙ্গে আবার উলু!…সবগুলো শাঁখ গুঁড়িয়ে চুরমার ক'রে দিতে পারলে তবে ঠিক হয়! ক্যানো, ক্যানো ওকে যেচে এনে এমন পুড়িয়ে মারা—নিজের জ্বালায় জ্বলছিল—বেশ ছিল—এনে এমন ক'রে কাঁটা ঘায়ে নুনের ছিটে না দিলেই কী ছিল না? ছোট বোনের বিয়েতে আদর ক'রে নিয়ে এসে তো ভারী উপকারটাই করা হ'য়েছে। …ক্যানো ওকে আগেভাগে জানানো হয়নি—কার সঙ্গে বিয়ে হ'চ্ছে মাধবীর?…দু' ফোঁটা চোখের জল ফেলে এনে ওর বুকে কাঁটা বিঁধে না দিলেই যেন কারুর ভাত হজম হচ্ছিল না!…কার ওপর অভিমানে কে জানে—বালিশটাতে পরম আশ্রয়ে মুখ গুঁজে কান্নায় ভেঙে পড়লো মাধুরী…

নিচে থেকে ভেসে আসছে ব্যস্ততার রেশ—একটা বিশেষ ক্ষণের জন্যে সবাই উদগ্রীব হ'য়ে উঠেছে…মাধুরীও যাবে না কি?…গেলে ক্ষতি কি?…নিজেকে আড়াল করে রাখলেই হ'বে…প্রিয়ব্রত এই ভীড়ে ওকে নিশ্চয়ই দেখতে পাবে না—দেখলেও চিনতে পারবে কি?—চিনতেই পারবে না মাধুরীকে!—এরই মধ্যে প্রিয় যাবে মাধুরীকে ভুলে?—কখনো না—প্রিয় ওকে ভুলতে পারে

না—প্রিয় ওর—পুরোপুরি ওর—দেখা দেবে মাধুরী—ধরা দেবে এই শুভলগ্নে—যাক্ মুখোস খুলে—বেরিয়ে পড়ুক সত্য—ছ মাস আগেকার বিয়ে—সে তো ভুয়ো—আজকের এই শুভলগ্নে মাধুরীর হ'বে সত্যিকারের বিয়ে ওরই প্রিয়র সঙ্গে···

উত্তেজনায় উঠে বসেছে মাধুরী···গাঢ় নিঃশ্বাসে নাক হুটো ফুলে ফুলে উঠছে—হু' হাতে চুলের কাঁড়িটা সংযত ক'রে নিতে গ্যালো—নাঃ,এখনও ভিজে রয়েছে—প্রিয়কে দেখা দেবে এই বেশে !···একটু মিষ্টি ক'রে সেজে গুজে গেলে ক্ষতি কি ? কে কি মনে ক'রবে—ক'রলে তো ব'য়েই গ্যালো···ও যাচ্ছে ওর প্রিয়র কাছে—এতে কার কি বলবার আছে ?···বিয়েতে লোকে সাজবে না ?···ও কি সাজবার অধিকারও হারিয়েছে ?···আর যে যাই মনে করুক—প্রিয় তো খুশী হ'বে !

দুর ছাই—কাপড় চোপড় যে রয়েছে নীচে মা'র ঘরে নাঃ,...থাক্, কাজ নেই গিয়ে···হাজার হোক, ছোট বোন তো ! ও বেচারীর অপরাধ কি !—ওর বুকে আগুন জ্বালালে নিজেও তো তার ছোঁয়াচ থেকে বাঁচবে না !—আবার বিছানায় গা' এলিয়ে দিল মাধুরী···

কপালে কার একখানা ঠাণ্ডা হাতের কোমল স্পর্শ—ওঃ, মা'র—মাও অঝোরে কাঁদছে···"আর পুড়িয়ে মারিস নে মা"—মা'র বিকৃত কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে এলো কথা ক'টা—"একবার নীচে চল্"···মাধুরী হঠাৎ ক্যানো যেন ক্ষেপে গ্যালো—"দোহাই মা, তোমার পায়ে পড়ি—আমায় মাপ করো···আমাকে একটু একলা থাকতে দাও, আর দয়া ক'রে কাউকে খবরদারী করতে ওপরে পাঠিয়ে বিরক্ত ক'রোনা আমায়"···এক নিঃশ্বাসে কথা ক'টা ব'লে ফেলে ওপাশ ফিরে শুয়ে ফুঁসতে লাগলো মাধুরী···আরও খানিকটা চোখের জল ফেলে মা যেমন নিঃশব্দে এসেছিল, তেমনি নেমে গ্যালো।...

···একি অন্যায় কথা ! বাসর ঘরের আর জায়গা হোলো না ! ওর চোখের ওপর ঠিক মধ্যিখানের ঘরটাতেই না হ'লে নয় ! ওকে কই-মাছ ভাজতে সবার খুব আমোদ লাগছে, না !···সব কিছুতে ও আজ অবাঞ্ছিত ওর সুখ দুঃখে কারুর কিছু এসে যায় না !···আবার চোখ ঠেলে জল ভরে এলো।

একে অনেক রাতে বিয়ে হ'য়েছে—পাড়া গাঁ—তায় ছ'মাস আগেকার এমনি একটী দিনের ছবি ভেসে ওঠায় বাড়ীর সবাইকারই মন পাষাণ-চাপা—বর্ষণোন্মুখ শ্রাবণের আকাশের মতো থমথমে···বাসর তাই তেমন জমলো না···একটী হু'টী ক'রে সবাইকে বার ক'রে দিয়ে বৌদি দরজা ভেজিয়ে দিলেন—"খিল বন্ধ ক'রে দে, মাধবী।"

সব কিছুই ওপরের জানলায় দাঁড়িয়ে দেখলো মাধুরী···চারদিক থেকে উঠছে একটানা ঝিঁঝিঁ শব্দ···পেছন-দিককার বাগানের ডোবাটাতেই বোধ হয় একটা ব্যাঙ্ কটকট ক'রছে···আকাশ থেকে একটা কাজলের ঢেউ নেমে এসে যেন পৃথিবীর গায়ে ছড়িয়ে পড়েছে - সব ঘরের দরজাই হয়ে গ্যাছে বন্ধ···এতোক্ষণে সবাই ঘুমিয়েও পড়েছে নিশ্চয়···নিঃশ্বাস বন্ধ ক'রে পা' টিপে টিপে বেরিয়ে এলো মাধুরী···রাত ক'টা !...নাঃ, কেউ নেই···নীচেটা চুপচাপ···চমকে উঠলো মাধুরী ক'টা খেঁকি কুকুরের ঝগড়ায়···বাইরে ব'সেছে ওদের ভোজসভা···এতো জোরে টিপটিপ ক'রছে বুকের ভেতরটায়—কেউ শুনতে পাচ্ছে না তো ! বাসর ফাঁকা—অন্ধকার···ফিসফাস চাপা কথার আওয়াজ আসছে ভেসে···ক্ষতি কি—কেউ তো দেখতে আসছে না...আড়ি পেতে শোনাই যাক্ না ওরা হু'টীতে কী বলাবলি ক'রছে···কেউ দেখলেই বা কি—বাসর ঘরে অমন আড়ি পেতেই থাকে সবাই...প্রিয় কি ঠিক আগেকার মতোই আছে—তেমনি আদর ক'রতে পারে ! তাও কি সম্ভব ! মাধুরী ছাড়া তেমন আদর ক'রবে কা'কে ?···ভেজানো জানলাটার ফাঁকে কাণ রেখে ছায়ার সঙ্গে মিশে দাঁড়ালো মাধুরী···এতো কাছে অথচ কতো দূরে ! ···মাধুরীর গলা না !···হ্যাঁ' মাধবীইতো বলছে বরকে—

"না, আমার ছোট বোন নেই।"

"তোমার দিদি কোনটী ?"—কান হুটো ঝাঁ ঝাঁ ক'রে উঠলো মাধুরীর—দিদিকে তুমি ভাখোনি···মাধুরী ওর নাম।"

"মাধুরী !"···বহুদূর থেকে কার পুরোনো গলা নতুন

হ'য়ে ভেসে এলো…"তোমার দিদি দেখতে তোমারই মতো ?"

"ঠিক আমারই মতো…দিদি খুব ভালো মেয়ে… বিধবা হ'বার পরে ক্যামন যেন—"

"মাধুরী বিধবা !"—মাঝখানেই প্রিয় বাধা দিল।

"কি হ'লো ?"…ভয়ে মাধবী একটু জোরেই চেঁচিয়ে

"না, ও কিছু নয়…বলো"…

"বিয়েতে এসেও দিদি সমস্ত দিন কেঁদেছে…কোনো কিছু ধরে ছোঁয় নি…একলা রয়েছে ছাদের ছোটো ঘরটায়…আগেকার দিন হ'লে আজ কি আমোদই না হোতো—দিদি একাই বাসর জাগিয়ে রাখতো—খই ফুটতো ওর কথায়—এখন হ'য়ে গ্যাছে একেবারে বোবা··

প্রিয়ব্রত পাথর হয়ে গ্যালো না কি—হ্যাঁ—না—কিছুই ব'লছে না !…"সবদিক দিয়েই দিদির বরাত যেন ক্যামন…কোলকাতায় পড়তে পড়তে আমার পিঠের ভাইটী হঠাৎ মারা যায়"—ধরা-ধরা গলায় ব'লছে—"সেই যে হোষ্টেল ছেড়ে চ'লে এলো দেশে—আর কিছুতেই যেতে দিলেন না বাবা…পরীক্ষাটাও আর দেওয়া হ'লো না·· বিয়ে হ'লো বেশ ভালো ঘরে—ছ'মাস যেতে না যেতে সিঁথির সিঁদুর গ্যালো মুছে…" মাধবীর একটা গাঢ় দীর্ঘশ্বাস ভেসে এলো বাতাসে…কাঠ হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছে মাধুরী…মৃত্যুর শীতলতা বুঝি নেমে এসেছে ওর দেহে…

·মাধুরী !…কোলকাতার হোষ্টেল !…স্মৃতির সমুদ্রে তলিয়ে গ্যালো প্রিয়ব্রত…মাধবীরই মত দেখতে !… শুভদৃষ্টির সময় বছর চারেক আগে দেখা একখানা মুখের ছবি মনের আয়নায় ভেসে উঠে তাই আনমনা ক'রে ফেলে'ছিল প্রিয়কে—কে একটা ঠোঁটকাটা মেয়ে অমনি ব'লে উঠেছিল—"কী গো নতুনবর, অমন প্যাঁচামুখো হ'য়ে রইলে ক্যানো ? চাঁদ ছাখো, ভূত নয় !"…

…চাঁদই দেখছিল প্রিয়—মনের গোপন আকাশে ফুটে উঠেছিল সবার অলক্ষ্যে। পূর্ণিমার ভরা চাঁদ—কতোদিন আগে দেখা—তবু অম্লান !…মাধুরীলতা… বড়ো লাজুক…লতার ফুলেরা রাত্তিরেই কথা কয়· ফোটাতে হ'বে ফুল…চুপিসারে…চোরের মতো…

…দু'টো একটা নিঃশ্বাসের শব্দ ছাড়া আর কোনো কিছুই শোনা যাচ্ছে না…বাসর তো নয়—স্মৃতির শ্মশান !…যেমন এসেছিল তেমনই রুদ্ধশ্বাসে পা টিপে টিপে পালিয়ে এসে হাঁপাতে লাগলো মাধুরী…থাক্ দরজাটা আধ-ভেজানো, যদি কেউ এসে ফিরে যায় !—ভাবতেই ফুলে উঠলো বুকখানা হাঁপরের মতো।

শ্রাবণ মাস হ'লে কী হয়—অসহ্য গুমোট গরম পড়েছে আজ !…

…কী কুক্ষণেই এ'যাত্রা বাপের বাড়ী এসেছে মাধুরী…একটা দাবানল যেন ওর শিরায় শিরায় আগুন ধরিয়ে দিয়েছে…কীসের জ্বালায় চোখের পাতা এক হ'তে পারছে না…পাগল হ'য়ে যাবে না কি ও

এক ঝলক সশব্দ হাসি বেরিয়ে এলো—নিজেরই কানে সেটা শোনালো কান্নারই মতো ; …বাসর ঘরে ওরা দুটীতে এতক্ষণ আর জেগে নেই নিশ্চয়ই !…বাইরে খানিকটা ঘুরে বেড়ালে মাথাটা হয়তো ঠাণ্ডা হবে… আলগোছে চোরের মতো বেরিয়ে এলো মাধুরী সামনেকার ন্যাড়া ছাদে…পা দু'টো হ'য়ে উঠেছে বড্ডো ভারী…পা'টা ছমছম ক'রে উঠলো বাগানের কোন্ গাছটায় একটা প্যাঁচা ডেকে উঠতে…বুকের ভেতরে রক্তের নদীতে জোয়ার এসেছে সমুদ্রের সঙ্গে মিলনের আগ্রহে…

নিশুতি রাত—আকাশ জুড়ে মেঘের ফাঁকে ফাঁকে চলেছে তারার লুকোচুরি…মানুষ না কি মরে গেলে তারা হ'য়ে যায়—তাই আকাশে অতো তারা—ওরা পৃথিবীর দিকে চেয়ে থেকে সব কিছু ছাখে…মহেন্দ্রও তা' হ'লে নিশ্চয়ই দেখছে মাধুরীকে !…কোন্ তারাটায় ফুটে আছে সে ?…ছ'মাসের ছাখা হ'লেও মাধুরীকে খুঁজে নিতে তার ভুল হ'বে না এতো মানুষের ভিড়ের মধ্যেও…

ঘুরে ফিরে কখন এদিকটায়ই এসে দাঁড়িয়েছে মাধুরী…কী ভেবে ভারী হ'য়ে আসা পা' দুটো মুড়ে নীচু আলসেটার ওপর বসে পড়লো ও…কে যেন একটা

মোচড় দিয়ে গ্যালো বুকের ভেতরটায় বাসর ঘরের দিকে নজর পড়তে! এতো জোরে ঢিপ ঢিপ ক'রছে··· খসে পড়বে না তো পাঁজর ক'খানা?···এই সময়টায় যদি ও-ঘরখানা খুলে যায়—যদি কেউ বেরিয়ে এসে দেখতে পায় ওকে?···আর কিছু ভাবতে পারে না মাধুরী···ছাদটা নড়ে উঠলো একবার—একটা কিছু আঁকড়ে ধরবার জন্যে ডান হাতখানা বাড়ালো মাধুরী—কালো একটা পর্দ্দা কোত্থেকে নেমে এসে চোখ দুটোকে ঢেকে ফেললে!···

ঢং ঢং ক'রে নীচেকার ঘড়িটা বেজে উঠলো—বাব্বাঃ—চারটে বেজে গ্যালো এরই মধ্যে!···বাসরঘরে একটা আলোর উঁকিঝুঁকি!···চোরটোর ঢোকেনি তো!...একটা বিদ্যুৎ চির খেয়ে গ্যালো মাথার ভেতরে···চোর!—হ্যাঁ—চোরই তো!···মাধবী—ওর ছোট বোন মাধবী—চুরি ক'রেছে ওর প্রিয়কে—ওই ঘরে—ওই বিছানায়—কোনো অধিকার নেই মাধবীর—না—না—না!···প্রিয়ব্রত ওর একার—মাধবীর ওতে কোনো ভাগ নেই!···কোথায় ছিল মাধবী চার বছর আগে যখন প্রিয়কে অদেয় ওর কিছুই ছিল না!···

অসম্ভব ঝুঁকে পড়েছে মাধুরী···দু'চোখ দিয়ে গিলছে আলোর লুকোচুরি···মানুষের হাতে গড়া নিয়ম, তাই হ'বে বড়ো—প্রাণের ঐশ্বর্য্যের এতোটুকুও দাম নেই?···

কে যেন আগুন ধরিয়ে দিয়েছে মাধুরীর মাথায়···পাথরের মতো কঠিন চোখে চেয়ে আছে ও···সব কিছু হ'য়ে গ্যাছে ধোঁয়াটে সাদা···আলোর খেলা কখন্ গ্যাছে মিলিয়ে···

অন্নপূর্ণায়, একটি বিকেল

বটকৃষ্ণ দে

[এক]

বিকেল গড়িয়ে এলো পউষের পড়ন্ত রন্দুরে,
কিশোরী মেয়ের মতো নৃত্যালীর নরম নূপুরে
আকাশ উতল হোলো; মেঘেদের মুখের সোহাগ
মেখে নিয়ে উষ্ণ হ'ল রাঙা-কৃষ্ণচূড়ার পরাগ।

[দুই]

হৃদয় রঙীন হ'লো। কার গানে হ'লো যে মুখর
নিজেই জানি না! তবু, কী যে এক অনুভব নিয়ে
সব ক্লাশ শেষ হ'লো, দুপুরের পাহারা পেরিয়ে।
এখন কোথায়, বলো? চলো, চলো, চৌরঙ্গী-চত্বর!

[তিন]

তাকে নিয়ে তারপর 'অন্নপূর্ণা' কাফে টেরিয়ায়'
নির্জ্জন গুঞ্জন: আর, গোধূলির বিষণ্ণ ছায়ায়
প্রার্থনার সব পাখী ক্লান্ত হ'য়ে এলো নীড়ে ফিরে—
তারা সব ভ'রে দিলো আমার নিঃসঙ্গ সন্ধ্যাটিরে।

[চার]

তারপর সন্ধ্যা নামে: কার্জ্জন পার্কের আলো জ্বলে;
পান্নার কান্নার মতো হৃদয়ের সমুদ্রের তলে
প্রতিটি কথা যে তার মুক্তো হ'ল; বললো সে: 'যদি
সব আলো নিভে যায়, সব তারা, যদি নিরবধি
অন্ধকার ঝরে শুধু, তা হ'লে কী করো?' বললাম,
'তোমার চোখের আলো, তোমার উজ্জ্বলতরো নাম,
এই নিয়ে পৃথিবীর প্রহরের পুরানো প্রসার
পেরিয়ে, আলোর দ্বীপে তীর্থ রচি শুধু দুজনার!'

[পাঁচ]

তার সে চোখের হাসি তীক্ষ্ণ হ'লো; তারপর চুপ;
তার সে হৃদয় নিয়ে শীত সন্ধ্যা খেলে অপরূপ!
বিরল বিকেল শেষ; অন্নপূর্ণা, ছুটি দাও আজ:
তোমাকে দিয়েছি গান, গল্পের গোলাপ, গন্ধরাজ!

[ছয়]

ছাখো, তাকে বললাম, 'চৌরঙ্গীর শীতের সম্ভার—
মনে রেখো, প্রতিশ্রুতি 'অন্নপূর্ণা কাফে টেরিয়ার'॥

দ্বিজেন্দ্র-স্মৃতি

শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার

কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়কে আমি "উপেক্ষিত কবি" বলি। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ লক্ষ্মণ-পত্নী উর্ম্মিলার নামকরণ করেছিলেন, "কাব্যে উপেক্ষিতা।" সত্যি, উর্ম্মিলার ত্যাগ, সহিষ্ণুতা, প্রেম, মাধুর্য্য, কমনীয়তা কাব্যেও কমই পাওয়া যায়; কিন্তু রামায়ণকার মহিয়সী সীতাকে নিয়েই ব্যস্ত, উর্ম্মিলাকে তুলে ধরবার তাঁর সময়ই হোল না; পাঠক-পাঠিকার প্রীতি অনুরাগ দুঃখিনী সীতার জন্যেই উজাড় হয়ে গেল, উর্ম্মিলার কথা ভাববার ফুরসৎই তাঁরা পেলেন না। তাই বিশ্বকবি সেই স্বল্পভাষিণী উর্ম্মিলা-লতাটির দুঃখে ব্যথিত হয়ে বললেন, কাব্যে উপেক্ষিতা। আমি, ১৩২০ সালের ৩রা জ্যৈষ্ঠের নিদাঘ সন্তপ্ত ধূসর সন্ধ্যায় কবি দ্বিজেন্দ্রলালের তিরোধান দিন থেকে গভীর দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করে এসেছি, আমরা এই বরণীয় স্মরণীয় দেশঅনুপ্রাণ: জাতীয় কবিকে উপেক্ষাই ক'রে এসেছি। সভ্য ও সংস্কৃতিসম্পন্ন জাতি মাত্রেই তার পূর্ব্ব-সূরীদের স্মরণ করে; পূজ্যের পূজা ক'রে নিজেরা ধন্য হয়। দ্বিজেন্দ্রলালের বেলা এ সকল সংস্কার, সব নিয়ম, সমস্ত রীতিনীতিই আমরা উপেক্ষা করেছি। উপেক্ষা করেছি, সেই ত এক মহা অপরাধ, আর সে ত কৃতঘ্নতারই সমান। তার ওপরেও কিছু আছে। উপেক্ষার সঙ্গে অকৃতজ্ঞতাও আছে। দু'য়ে মিশে আমাদের পাপের ভরা পূর্ণ করেছে। শুনি, আজ অনেক বিজ্ঞ, প্রতিষ্ঠাভাজন ব্যক্তি দ্বিজেন্দ্র-সাহিত্যে পদার্থের অভাব, গুণের চেয়ে দোষ ত্রুটীর প্রাদুর্ভাব প্রচার ক'রে আত্মপ্রসাদ উপভোগ ক'রে থাকেন। ক্ষীর ছাড়ি নীর নিয়ে যাঁরা অপযশ: কীর্ত্তন করেন, তাঁরা যত বড় ও দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত হৌন, আমি দূর থেকেই তাঁদের নমস্কার করি।

সাহিত্য যদি হিতসাধক বিবেচিত হয়—সাহিত্যের সেই সংজ্ঞাই আমি বুঝি—তাহ'লে অকুণ্ঠ কণ্ঠে এই কথাই বলবো যে, বঙ্কিমচন্দ্রের পরে দ্বিজেন্দ্র-সাহিত্য দেশের যে অপার হিত সাধিত করেছে, তার যেমন তুলনা নেই, তাকে অস্বীকার অথবা নস্যাৎ করতে যাওয়ার মত ধৃষ্টতাও আর হয় না।

দ্বিজেন্দ্র-সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনা করবার সময়ে একটি কথা মনে রাখলে অনেক বিড়ম্বনা থেকে রক্ষা পাওয়া যেতে পারে। দ্বিজেন্দ্রলাল কেন যে এবং কি উদ্দেশ্য নিয়ে সাহিত্য সেবা ব্রত গ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁর উদ্দেশ্য কতখানি সফল হয়েছিল, ঐ একই সঙ্গে সে সকলও সুব্যক্ত, সুস্পষ্ট হয়ে যাবে। আর দ্বিজেন্দ্র-সাহিত্যের সঠিক মূল্যও জানতে পারবেন।

স্মরণ করতে হবে, সেই কালের কথা। লর্ড কার্জ্জনের কুবুদ্ধির অথবা দুষ্টবুদ্ধির ফলে বঙ্গভঙ্গ আর সেই বঙ্গভঙ্গ বিরোধকল্পে সেই স্বদেশী আন্দোলন। আসমুদ্র হিমাচল বঙ্গদেশ বিকম্পিত, আলোড়িত, উদ্বেলিত। পৃথিবী টলমল-টলমল ক'রে উঠেছিল। ইংরাজের ব্যবসা-বাণিজ্য যায়—যেতে বসেছে, ইংরাজের রাজ্যের ভিত নড়ে গেছে, কোহিনূরোজ্জ্বল রত্ন সিংহাসন টলমল করছে। অর্দ্ধ পৃথিবীর অধীশ্বর ইংরাজ জানে, একদিন বণিকের বেশে, ছলে বলে কৌশলে, জাল-জুয়াচুরীর অনুগ্রহে বাঙ্গলা দেশ হস্তগত করতে পেরেছিল ব'লেই উত্তরকালে ইংরাজ রাজাধিরাজ, ভারত সাম্রাজ্যের রাজচক্রবর্ত্তী সম্রাট হ'তে পেরেছিল। ইংরাজ এটাও জানতো, সেই বাঙ্গলা যদি হস্তচ্যুত হয়, তবে বৃটিশ সাম্রাজ্যের মরকতমণি ভারতবর্ষ থেকে রাজ্যপাট গুটোতেও তার দেরী হবে না। বাঙ্গলার স্বদেশী আন্দোলন দমন করবার জন্যে শক্তিশালী, প্রবল পরাক্রান্ত ইংরাজ এই বাঙ্গলার ওপর দিয়ে অত্যাচারের রক্তাক্ত শকট চালিয়ে দিয়েছিল। ইংরাজের তূণীরে যত বাণ ছিল, অস্ত্রাগারে যত অস্ত্র ছিল, ব্যারাকে যত পুলিশ ছিল, ছাউনীতে ছাউনীতে যত সৈন্য-সামন্ত ছিল, রক্ত-

লোলুপ জহ্লাদের মতো ইংরাজ সে সকলই বাঙলা ও বাঙ্গালীর ওপর লেলিয়ে দিয়েছিল। শক্তিমদমত্ত ঐরাবতকুল বাঙলা দেশটাকে তছ-নছ করেছিল; প্রবলের বিপুলকায় ভীমসম ষ্টিম রোলার বাঙলাকে সমতল ভূমি করে ফেলেছিল। ভেবে দেখুন সে দিনের কথা। "বন্দে মাতরম্" শব্দ উচ্চারণ করা নিষিদ্ধ। স্বদেশী কাপড় কিনলে বা কোমরে ধারণ করলে হয় বেত, না হয় জেল। কলকাতার কথা না হয় ছেড়েই দিই; মফঃস্বলের জেলায় জেলায় মহকুমায় মহকুমায় শ্বেতাঙ্গ সাহেবেরা পকেটে রিভলবার ও হাতে হাণ্টার না নিয়ে বাঙলোর বাহিরে পা দিতেন না। শুধু যে সরকারী কর্ম্মচারী বা রাজ-পুরুষরাই ধৃতাস্ত্র হয়ে বেরুতেন, তা নয়; ইংরাজ ও তাদের উচ্ছিষ্টভোজী ইউরেসিয়ান মাত্রই আমাদের অন্নদাতা, শাস্তিদাতা, ভয়ত্রাতা, আর—তরুণ বাঙ্গালী যুবক চোখে পড়েছে কিম্বা পড়ে নি, পকেটের রিভলবার বুঝি-বা মন্ত্রবলেই প্রাণবন্ত হয়ে লাফিয়ে উঠতো; হাতের হাণ্টার খানিকটা মাংস, খানিকটা রক্ত পান না ক'রে নিরস্ত হোত না। কিন্তু সত্যি কথা বলতে হলে বলবো যে, হাণ্টার ত সোনার চাঁদ। দ্বীপান্তর—আন্দামান, যাবজ্জীবন কারাবাস, ফাঁসি, গুলি ক'রে হত্যা হয়েছিল মুড়ি মুড়কী। কত চাঁদপানা ছেলে, কত পিতার জীবন সম্বল ছেলে, কত মায়ের বুকের ধন, চোখের নিধি অকারণে, অকালে মা-মা বলতে বলতে জননী জন্মভূমির মূর্ত্তি ধ্যান করতে করতে মৃত্যুবরণ করেছে, তার কি ইয়ত্তা আছে, না গুণে তাঁর সংখ্যা নির্ণয় করা যায়? পুত্রের অপরাধে পিতার দণ্ড, বৃদ্ধের পেন্সন বন্ধ হোত। বাঙ্গালী যুবকের মাতা ভগ্নী স্ত্রীলোক হ'লেও শাস্তি থেকে অব্যাহতি পে'ত না। আসামের অরণ্য থেকে সভ্যধরা হাতীকে বিলিতী মদ খাইয়ে মাতাল করে সেই হাতী লাগিয়ে বাঙ্গালীর ঘর উপড়ে ফেলা হয়েছে। দ্বিপ্রহর রাত্রে ঘর, পল্লী, গ্রামকে গ্রাম সুষুপ্তিমগ্ন জনপদ—বুঝি বা ভৌতিক কারণেই—ভস্মীভূত হয়েছে, তাও দেখা গেছে। আর দেখেছি, নারীর যে লজ্জা মরণেরও অধিক, বর্ব্বর বেল্লুচি দিয়ে বঙ্গনারীকে অহরহ সেই লজ্জার পীড়ন। মনে মনে সেই দিনের সেই ভয়ঙ্কর চিত্র স্মরণ করুন।

কংগ্রেস নামে একটি বস্তু—তা সে যেমন বস্তুই হউক, শক্তিমান হোক অথবা অশক্ত হোক, তার কার্য্যকারণ আকার প্রকার যেমনই হোক, ছোট হোক্ বড় হোক্, কেজো বা অকেজো হোক্, কংগ্রেস নামে দেশে একটি বস্তু ছিল, সুরাটে সেও গয়া-গঙ্গা-হরির পাদপদ্মে লীন হয়েছে; আবার কোনদিন যে পুনর্জ্জন্ম তার হবে, সে চিন্তাও তখন সুদূরপরাহত। দেশের নেতৃত্ব তাতে ভীত, বিস্মিত, স্তম্ভিত, হয়ত বা জীবন্তে মৃত। ইংরাজের অত্যাচারের রথচক্রের গতিরোধ করা ত দূরে থাক, মৌখিক প্রতিবাদ করবার সাহসও কারও নেই। গান্ধীজী তখনও বহু দূরে, হয়ত বা দক্ষিণ আফ্রিকার জঙ্গলে। নেতাজী বাল্য অতিক্রম ক'রে মাত্র কৈশোরে পা দিয়েছেন, কর্ম্মক্ষেত্র, কুরুক্ষেত্রে আসতে তখনও বহু বিলম্ব। সে এমন একটা দিন যে, বাঙ্গালীর দশটা ছেলে মিলে ড্রিল বা ব্যায়াম করছে শুনলে গড় থেকে ঘড় ঘড় শব্দে কামান বার হোত। খবরের কাগজ, সকালে আছে—বিকেলে অদৃশ্য, অজ্ঞাত লোকে বিলুপ্ত; সম্পাদক ভদ্রলোক এই আছেন, এই নেই। শোনা গেল অন্তরীণে আছে। কেউ কোনস্থানে বক্তৃতা করেছে শুনলে সে তল্লাট ডিনামাইটে উড়ে যেত। আনন্দমঠের একখানা ছেঁড়া পাতা কারও হাতে দেখলে, ষাঁড়ের ডালনায় হৃষ্টপুষ্ট অতিরুষ্ট, ক্রোধাবিষ্ট জন্ বুল কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান বিবর্জ্জিত হয়ে ক্ষেপা শেয়ালের মত ছুটতো—গোটা কতক বাঙ্গালীকে কামড়ে খানিকটা রক্ত বের করে, খানিকটা মাংস থাবলে ছিঁড়ে নিয়ে বীরদর্পে খোঁয়াড়ে ফিরে, গলার ভিতরে নির্জ্জলা এক বোতল রাম্ পুরে দিয়ে, লক্‌লকে জিহ্বা বার ক'রে বিশ্রাম, বা বীরত্বের জাবর কাটতো। তখন বাঙলার আকাশভরা নিশ্ছিদ্র অন্ধকার; বৃটিশের দাপে বায়ুমণ্ডলও স্তব্ধ, স্তম্ভিত; আকাশের পিছনে যদি দেবতারা থাকেন, ভয়ে তাঁদেরও বুক শুকনো; হাত পা পেটের মধ্যে ঢুকে গেছে। নদীমাতৃক বঙ্গদেশের নদীও নিস্তরঙ্গ—বুঝি বা বৃটিশের রোষে; আর বাঙ্গালী? নিঃশ্বাসের শব্দটিও বুকের মধ্যে গোপন ক'রে অস্তিত্বটুকু রক্ষা করতে পারলেও বাঁচতো।

এই ভুবনভরা অন্ধকারের মধ্যেও বাঙ্গলার নাট্যশালা একটি প্রদীপ অম্লান শিখায় জ্বালিয়ে রেখেছিলো। বিশ্বজোড়া হতাশা ও নিরাশার মাঝেও বাঙ্গলা ও বাঙ্গালীর স্বাধীনতার কামনার ও বাসনার সূক্ষ্ম আশা-লতিকাটিকে বাঁচিয়ে রেখেছিলো বাঙ্গলার তিনজন নাট্যকার। সেই তিনের অন্যতম ও শ্রেষ্ঠ দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। বাঙ্গলার নাট্যশালার জনক, নাট্য সম্রাট গিরিশ-চন্দ্র ঘোষ-রচিত তিনখানি অগ্নি উদ্গীরণকারী নাটকই রাজরোষে ভস্মীভূত হ'তে দেখে গিরিশচন্দ্র বোধ হয় কতকটা নিরুৎসাহ হয়ে ঐতিহাসিক নাটক রচনা প্রায় ছেড়েই দিয়েছিলেন। এমনও হতে পারে, সমাজের গ্লানি, সমাজের আবর্জ্জনা তাঁর দৃষ্টি, তাঁর ব্যথিত মনকে সমাজের দিকেই সমধিক আকৃষ্ট করেছিল। ক্ষীরোদ-প্রসাদ "যশোর নগর ধাম, প্রতাপ-আদিত্য নাম," বঙ্গবীর বাঙ্গালী মহারাজ প্রতাপাদিত্য নাটকখানি উপহার দিয়ে বৃটিশ শৃঙ্খলছেদনপ্রয়াসী স্বাধীনতাকামী বাঙ্গালীকে আশার সপ্তম সর্গে উন্নীত করেছিলেন বটে; কিন্তু যে কারণেই হোক, অধ্যবসায় দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। একমাত্র দ্বিজেন্দ্র রায়কেই দেখলুম, অটল অচল গৌরীশৃঙ্গসম অবিচল। একখানির পর একখানি নাটক নিষিদ্ধ হয়েছে, একটির পর একটি সঙ্গীত বাজেয়াপ্ত হয়েছে, তবুও বঙ্গজননীর ভক্ত সন্তান, ভারতীর প্রিয়তম পুত্র, স্বদেশ ও স্বাধীনতার একনিষ্ঠ সাধক দ্বিজেন্দ্রলাল অচঞ্চল। ইংরাজ রাজের রোষরক্তিম ভ্রুকুটি কুটিল চক্ষুও দ্বিজেন্দ্র-লালকে নমিত দমিত করতে পারেনি। দ্বিজেন্দ্রলাল চাকরী ম্যাজিষ্ট্রেসীতে পদাঘাত ক'রেছিলেন, চাকরী ছেড়েছিলেন কিন্তু মাতৃসেবা ছাড়েন নি।

জননী জন্মভূমির ভক্ত সন্তানের অন্তিম নিঃশ্বাস ত্যাগের মুহূর্ত্তটির কথা আজ বারম্বার মনে পড়ছে; কবি তাঁর শেষ নাটক "সিংহল বিজয়ে" সিংহলবিজয়ী বিজয় সিংহের বাহিনীর মুখে মাতৃ-বন্দনা গীতি রচনা করেছিলেন। "যেদিন সুনীল জলধি হইতে উঠিলে জননী ভারতবর্ষ" এই মাতৃস্তোত্রটিও উচ্চারিত হোল, কবিও সেই "সিংহল বিজয়" খাতার ওপরেই সংজ্ঞাহীন দেহে লুটিয়া পড়লেন। সে জ্ঞান আর ফিরলো না, মাতৃচরণে লুটিত শির আর উঠলো না, পিঞ্জরমুক্ত আত্মা জননীর রাতুল চরণে চিরাশ্রয় লাভ করলো। মরবার সময় লোকে হরি নাম করে, কৃষ্ণ নাম করে, ইষ্টদেবকে স্মরণ করে। দ্বিজেন্দ্র-লালের অধরে জননী ভারতবর্ষ স্পন্দিত হতে হতেই জীবনাবসান হোল। দ্বিজেন্দ্রলালই লিখেছিলেন, 'সাধনা আমার স্বর্গ আমার আমার দেশ।' মৃত্যুতেও সার্থক হোল তার সাধনা।

যাঁরা সেদিন ধরাতলে উপস্থিত ছিলেন না, তাঁরা সেদিনের সাম্রাজ্যশঙ্কায় সদা সশঙ্কিত সন্ত্রস্ত বৃটিশের সে ধূম্রলোচন ধূমাবতী মূর্ত্তি কল্পনা করতেও পারবেন না। দেশে তখন কোনও আন্দোলন নেই – সমস্তই দমিত; দেশ শান্ত, শ্মশানের প্রশান্ত শান্তি সর্ব্বত্র বিরাজিত; ইংরাজের প্রতিদ্বন্দ্বী বলতে কেউ নেই, যারা ছিল, তারা সবংশে নির্ব্বংশ; ইংরাজের কথায় প্রতিবাদ করতে পারে, এমন সাহসী মানুষ বাঙ্গলায় নেই (আবার বলি, নেতাজীকুসুমের তখনও মুকুলাবস্থা), তবু ইংরাজ ঝোপে ঝোপে বাঘ দেখে, দেশময় দশমহাবিদ্যার বিকটদর্শন মূর্ত্তি ধারণ ক'রে বিভীষিকা বিস্তার করে বেড়ায়। এই তমসাচ্ছন্ন অন্ধ-নিশীথে প্রজ্জ্বলিত দীপ হস্তে এই দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ই স্বাধীনতার অজানা অচেনা পথটি আলোকিত ক'রে রেখেছিলেন। কবে সে স্বাধীনতার বীর সৈনিকবৃন্দ আসবে, অন্ধকারে তারা পথ না ভোলে, ঘনঘোর তমিস্রা তাদের দৃষ্টি না আচ্ছন্ন করে, সেই বীর, নির্ভীক, বিনিদ্র সাধক বৃটিশের ভ্রুকুটিতে ভ্রুক্ষেপ না ক'রে অভিনব নাটকের দীপ্তি, অপূর্ব্ব ভাষার দ্যুতি, সঙ্গীতের ক্রমমধুর মূর্চ্ছনা দিয়ে জাতিকে জাগিয়ে রেখেছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলাল ছিলেন ভবিষ্যদ্দ্রষ্টা—দিব্যদৃষ্টিতেই দেখেছিলেন—সেদিন আসবে, এ অন্ধকার ঘুচবে, দেশ আলোকের বন্যায় ভাসবে, পরাধীনতার শৃঙ্খল ছিন্ন হবে, স্বাধীনতা আসবে। দেরী থাকতে পারে, বিলম্ব হতে পারে; কিন্তু আসবেই। এবং যতদিন না আসে, ততদিন জাতিকে জাগিয়ে রাখতেই হবে। আশ্বিনের শস্য ভরা ক্ষেতের ওপর দিয়ে দামোদরের প্রবল বন্যা ব'য়ে গেলে উন্নতশির শ্যামল ধান গাছগুলোকে যেমন শুইয়ে দিয়ে যায়, সাম্রাজ্যলিপ্সু বৃটিশের অত্যাচারের প্লাবনে বাঙ্গালীও তখন ধরাশায়ী,

ধূল্যবলুণ্ঠিত, অবসাদগ্রস্ত, জীর্ণ অবসন্ন। ঘুমিয়ে পড়া তার বিচিত্র একটুও নয়। এই সর্ব্বনেশে নিদ্রা এসে জাতিকে ঘুম পাড়িয়ে সর্ব্বনাশ সাধন না করতে পারে, দ্বিজেন্দ্রলালকে সেই ভার গ্রহণ করতে হয়েছিল। কে দিলে সে ভার? বঙ্গজননী দিয়ে থাকতে পারেন; আবার এমনও হ'তে পারে, যুগের প্রয়োজনে যুগ-মানব রূপে দ্বিজেন্দ্র স্বয়ং সে ভার গ্রহণ করেছিলেন। কিছুই আশ্চর্য্য নয়। যুগের প্রয়োজনমুহূর্ত্তে যুগমানবের আবির্ভাব এ দেশে ত কল্পে কল্পে যুগে যুগেই ঘটেছে। "সম্ভবামি যুগে যুগে" এ ত আমার দেশেরই শাশ্বতবাণী। রাজা রামমোহন সেই যুগমানব; নরদেহে নারায়ণ শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেই যুগমানব; ঋষি বঙ্কিম, আনন্দমঠ, বন্দে-মাতরম স্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্র সেই যুগমানব; অরবিন্দ রবীন্দ্র চিত্তরঞ্জন যুগমানব; মহাত্মা গান্ধী সেই যুগমানব এবং বাংলার আদি অন্তকালের অমলিন অত্যুজ্জ্বল দীপশিখা নেতাজী সুভাষও সেই যুগমানব।

ক্ষেত্র প্রস্তুত—জমি তৈরী করা ব'লে একটি কথা আছে। সার্থক কৃষক সে, যে বীজ বপনের আগে ক্ষেত্র প্রস্তুত, ক্ষেতের পাট ক'রে জমি তৈরী ক'রে রাখে। জমিতে আগাছা না জন্মায়, মাটি ঢেলা না হয়, মৃত্তিকা শুকিয়ে রসশূন্য না হয়ে পড়ে, এ সব যদি না করে কৃষক, ফসলের আশা তার দুরাশা। আমি আগেই বলেছি দিব্যদৃষ্টি বলে দ্বিজেন্দ্রলাল দেখেছিলেন, সার্থক কৃষক আসছে, দক্ষিণ আফ্রিকা বিজয়ী মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী আসছেন, বৃটিশের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী নেতাজীর উদ্ভব হয়েছে। তাঁরা আসছেন, ক্ষেত্র যদি প্রস্তুত না থাকে, তাঁদের আগমন যে ব্যর্থ হবে। দ্বিজেন্দ্র-সাহিত্য স্বাধীনতার সেই ক্ষেত্র প্রস্তুত ক'রে রেখেছিল। অত্যাচারে অবসন্ন শ্রান্ত ক্লান্ত জাতিকে সুপ্তির কোলে ঢ'লে পড়তে দেয়নি; নির্য্যাতনে নিপীড়নে নিগৃহীত জাতির অন্তরের স্বাধীনতার কামনাটিকে হতাশার বাষ্পে বিলীন হ'তে দেয় নি। দ্বিজেন্দ্র-সাহিত্যের ছিদ্রান্বেষীদের উদ্দেশেই আমি বিশেষ ক'রে বলবো যে, অন্য কোন কাজ যদি না'ও করে থাকে, এই একটি মহৎ মহনীয় কার্য্যের দ্বারাই দ্বিজেন্দ্র-সাহিত্য জাতির মর্ম্মে অবিনশ্বর হয়ে থাকবে; দ্বিজেন্দ্রলাল স্বাধীনতার জমি প্রস্তুত ক'রেছিলেন।

দ্বিজেন্দ্র-সাহিত্যের ঐ একটিমাত্র উদ্দেশ্য, ঐ একটি মাত্র লক্ষ্য: স্বদেশের স্বাধীনতা। স্বাধীনতা অর্জ্জন ভীরু কাপুরুষের কার্য্য নয়। স্বাধীনতার যোগ্য হ'তে হলে শৌর্য্য বীর্য্য অর্জ্জন করতে হয়। তাই, দ্বিজেন্দ্রলাল ভারতের ইতিহাস-মহাসমুদ্রে ডুব দিয়ে বীর্য্যবান শৌর্য্য-সম্পন্ন চরিত্র আহরণ করলেন; বীরত্বপূর্ণ ঘটনাবলী স্থাপন করলেন। নাটকের জন্য এমন একটি সবল, সতেজ বীরত্বব্যঞ্জক ভাষার সৃজন করলেন, যে ভাষা কেবল জীবিতে নয়, মৃতেও উদ্দীপনা সঞ্চার করতে সমর্থ। দ্বিজেন্দ্রলালের সুমধুর প্রাণোন্মাদকর সঙ্গীতের ভাষাও এমন হোল যে সুরের ঝঙ্কারের সঙ্গে বীর্য্যবত্তার স্ফুলিঙ্গ বিচ্ছুরিত হয়। কি যায় আসে, ইতিহাসের উনিশ যদি বিশই হয়ে থাকে? কি যায় আসে, কোথাও যদি অতি-রঞ্জনের ত্রুটী স্পর্শই করে থাকে? স্বাধীনতার বন্ধুর-দুর্গম দীর্ঘ পথ মন্থন করা, সূচীভেদ্য অন্ধকারে আলোক প্রদর্শনই যে ছিল তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য। স্বদেশের স্বাধীনতায় স্থির বিশ্বাসী কবি, আজীবন—আমরণ সেই সাধনাতেই মগ্ন ছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলাল জানতেন এ জাতির স্বাধীনতার পথ রোধ করবার শক্তি স্বয়ং শক্তিরও নেই, এ জাতি স্বচেষ্টায় স্বাধীন হবেই। এই দৃঢ় বিশ্বাসই দ্বিজেন্দ্র-সাহিত্যের মেরুদণ্ড; এই অবিচল প্রত্যয়ই দ্বিজেন্দ্রলালের জীবনের মূলমন্ত্র। কারণ, তিনি নিজেই ব'লে রেখেছেন—'ঘুচাব আমরা কালিমা তোমার, মানুষ আমরা—নহি ত মেষ!'*

---

* কলিকাতা দ্বিজেন্দ্র-জন্মবার্ষিকী উৎসবে উদ্বোধনী ভাষণ।

রায়বাঘিনী

শ্রীচুণিলাল মুখোপাধ্যায়

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

ভবানীপুর প্রাসাদের একটি কক্ষ।

(রাণী ভবশঙ্করী রাজকার্য্য পরিচালনা করিতেছেন—তিনি, হরিদেব ও মন্ত্রী যথাস্থানে উপবিষ্ট)।

শঙ্করী—গুরুদেব! আমি রাজকার্য্য পরিচালনা কোর্ব্ব। মন্ত্রি ম'শাই! রাজ্যের সকল কার্য্যই আমি নিজে দেখ্‌ব। আর ভুরসুটের সমগ্রবাহিনীর কর্ত্তৃত্ব ও চালনা আমি নিলাম।

মন্ত্রী—এ অতি উত্তম কথা। আমরা সকলে মা তোমার আদেশ যথাশক্তি প্রতিপালন কোর্ব্ব।

হরিদেব—তোমার এ সিদ্ধান্ত মা আমি সর্ব্বতোভাবে যুক্তিযুক্ত ব'লেই মনে করি—তবে সেনাপতি সম্বন্ধে—

শঙ্করী—আমি পরে ভেবে উত্তর দেব। তবে তাঁর সম্বন্ধে আমি কোনও আদেশ না দেওয়া পর্য্যন্ত তাঁর সকল কার্য্য লক্ষ্য করা আবশ্যক। আমি প্রত্যহ দরবার কোর্ব্ব। মন্ত্রি ম'শাই! অনুপস্থিত কালের রাজ্যের সকল বিষয় আমায় বুঝিয়ে দেবেন। সীমান্ত প্রদেশের দুর্গগুলোকে আরও সুরক্ষিত কর্ত্তে এবং সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি করার জন্য কত ব্যয় হ'তে পারে, তার হিসাব আমায় দেবেন। হ্যাঁ, ছাওনাপুর দুর্গাধিপতি সূর্য্যদেব এসেছেন কি?

মন্ত্রী—হ্যাঁ, তিনিও এসেছেন—প্রতিহারি! (প্রবেশ) সূর্য্যদেব।

(প্রতিহারীর প্রস্থান ও সূর্য্যদেবের প্রবেশ ও অভিবাদন)।

শঙ্করী—আসন গ্রহণ করুন দুর্গাধিপতি! আপনার দুর্গ সুরক্ষিত কর্ত্তে আরও কি ব্যবস্থা আবশ্যক আমাদের জানাবেন। গুরুদেব! আমি রাজ্যের সমস্ত দেবালয়গুলো একবার পরিদর্শন কোর্ব্ব। ছাওনাপুর দুর্গের নিকট বাশুড়ী গ্রামে ভবাণী মন্দির আছে-না? সেখান থেকে খানাকুলের জঙ্গল কতদূর?

সূর্য্যদেব—বাশুড়ী গ্রামের ভবাণী মন্দির হ'তে খানাকুলের জঙ্গল বেশী দূর নয়। দু'খানা বড় মাঠ পারে। ছাওনাপুর দুর্গ এক ক্রোশের মধ্যে অবস্থিত।

শঙ্করী—মন্ত্রী ম'শাই! সেনাপতি মহাশয় নিজ বাড়ীতে আছেন ত?

মন্ত্রী—আজ্ঞে হ্যাঁ।

শঙ্করী—দেবী সুমিত্রার কোন সংবাদ পেলেন?

মন্ত্রী—না দেবী—

হরিদেব—অনেক জিনিষ মা আশ্চর্য্য ব'লেই মনে হচ্ছে তবে সুমিত্রা মায়ের আচরণ—

(সুমিত্রা দেবীর ধীরে ধীরে প্রবেশ—তাহার বেশ মলিন—মুখে অসাধারণ গাম্ভীর্য্য ও দৃঢ়তা—সকলে তাকে দেখে আশ্চর্য্য)।

সুমিত্রা—রাণি! আমায় শাস্তি দাও। গুরুদেব! বলতে পারেন, রাণি শাস্তি দেয় না কেন?

শঙ্করী—বোন্! নারীর শাসন নারীই রক্ষা কোর্ব্বে। বলতে পার আমার চিরজীবনের সহচরী—আমার শিক্ষা-দীক্ষা-জ্ঞান—কর্ম্মের চিরসঙ্গিনী—আজ আমার পাশে না দাঁড়িয়ে ওখানে কেন?

সুমিত্রা—মহাপাপ স্পর্শ ক'রেছে—শাস্তি না দিলে আমি স্থির হ'তে পারছি না—জানেন গুরুদেব! আমি গ্রামে গ্রামে ঘুরেছি, কুটীরে কুটীরে বেড়িয়েছি—আহা কত দুঃখ তাদের? আর তাদেরই ওপর আঘাত! মায়ের দেহের অক্ষত রোধ করতে পারবেন না দেব। জান বোন্! এই দেহটা—সবার বড় নারীর ধর্ম্ম—সব ছোট হয়ে যায় মার পবিত্র অঙ্কের কাছে। মার যে কোল এই গরীবগুলোকে আগলে রেখেছে—তাকে রক্ষা কর্ত্তে হবে

তাঁর সন্তানদের—এত শক্তি তাদের—তারা পারবে না? নিশ্চয়ই পারবে।

(দীননাথের প্রবেশ—সুমিত্রার কথা শুনিল—হরিদেবের মুখ উজ্জ্বল)।

দীননাথ—মা! জাগিয়ে দে। এমনি ক'রে ভুরস্টের শক্তি গ্রামে গ্রামে, ঘরে ঘরে ছড়িয়ে দে। ঠিকই ত মাকে আমার অক্ষত রাখতে সবই পণ করতে হয়।

শঙ্করী—(স্থির দৃষ্টিতে সকলের দিকে চাহিল—পরে তাহার দৃঢ় দৃষ্টিতে ভবিষ্যৎ কল্পনা করিয়া) সুমিত্রা! আমি পেয়েছি—সত্যের সন্ধান—তুমি বোন্ আমার এত বড় দ্বন্দ্বের মীমাংসা ক'রে দিলে। বাবা! গুরুদেব! আপনাদের সব কথা আমার শোনা হয়েছে—অত্যাচারী দস্যু আবার আসবে। আমরাও প্রস্তুত থাকবো—সমস্ত ভারত দেখবে অত্যাচারীর ধ্বংস-লীলার বাধা কেমন ক'রে দিতে হয়। এসো বোন্! আমার অন্তর আজ সাড়া পেয়েছে।

(কালু সর্দ্দার ও বিশ্বনাথের প্রবেশ—সকলে প্রণাম)।

কালু—মা! বুড়োটাকে একটু কাজ দে মা—এমন কথাগুলো এ বুড়োটা অনেক দিন শুনে নি (দীননাথকে দেখিয়া) এই যে আমার দাদাটিও আছে—আরে তু আয়—আরে দাদা! আমরা দাঁড়ালে—ক'হাজার পাঠান—সব কু-কথায় যাবে ভেসে। মা! এই বুড়ো বিশ্বনাথ—কি বলতে চায়। ভাল—আমার এ বুড়োটি বড় ভাল—বল না কর্ত্তা—চুপ কেন?

(বিশ্বনাথ সব দেখে আত্মহারা হইয়া)।

বিশ্বনাথ—মা! আমি বুড়ো হয়েছি—আমি—আমি কি কোরবো? কালু বলে লড়াই আমি জানি না। তবে আমার কিছু আছে। মাগো! তাই দেবো আমি আমার রাণীর পায়ে। আমার সব নাও মা—ওরা বলে যখের ধন। বড় কষ্ট মা তাদের—সেই হতভাগ্যগুলোকে রক্ষা কর মা—সর্ব্বনেশে—নির্ম্মম—ডাকাতগুলো সব তাদের দিয়েছে জালিয়ে পুড়িয়ে।

হরিদেব—তুমিই না খানাকুলের সেই ধনী ব্যবসায়ী—তোমার ত প্রচুর অর্থ।

বিশ্বনাথ—ও কিছু না। মার কাছে ও কিছু না। ঠাকুর! আপনি দেবেন আশীর্ব্বাদ—এরা দেবে প্রাণ—আর এই বুড়ো যদি দেয় তার ক্ষুদ্র পিতৃপিতামহের সঞ্চিত ধন, সেইটাই হলো বড়! ঠাকুর! বুড়ো হয়েছি—দেখে যাই জগদ্ধাত্রী মায়ের খেলা! দেখছেন না আপনারা—মা আমার দাঁড়িয়ে! কালুভাই বুদ্ধি ক'রে আনলে তাই ত দেখতে পেলুম। মন্ত্রি ম'শাই! মোহরের আনিয়ে নিন—আর দেরী নয়।

রাণী শঙ্করী—বিশ্বনাথ! তুমি রাজ্যের মঙ্গলকামী—আমার রাজ-কার্য্যের শ্রেষ্ঠ সহায়ক! বোন্ আমার! আর দেরী নয় চল—সকল কার্য্যের ব্যবস্থা করি।

(সিংহাসন হইতে উঠিয়া সুমিত্রার হাত ধরিয়া প্রস্থান)।

দ্বিতীয় দৃশ্য

রাজপথ—প্রত্যুষ

[কয়েকজন রমণী রোণ নদে জল আনিতে যাইতেছে তাহাদের সকলের কক্ষে এক একটি কলসী—তাহারা গান গাইতে গাইতে যাইতেছে—ধীরে ধীরে দিনের আলো প্রকাশ হইতেছে]

গান

পূবের আকাশ রাঙিয়ে দিয়ে
কে আসে ঐ দেখনা চেয়ে
ভোরের বাতাস কাঁপন দিয়ে
রোণের স্রোতে আবীর খেলায়।
এলো উষা আঁধার বধূর
কালো শাড়ী সরিয়ে দিয়ে,
বিশ্বজগৎ জেগে উঠে গাইল ধাতার জাগরণী,
বাংলার মন বেজে উঠে সেই গানেরই চেতনসুরে।

১ম রমণী—হ্যাঁ ভাই, আমাদের নাকি লড়াই শিখতে হবে?

২য় রমণী—তাইত শুনতে পাচ্ছি। আচ্ছা একি নিয়ম ভাই? মেয়ে মানুষ আবার লড়াই করবে কি? এ সব সৃষ্টিছাড়া কথা। কর্ত্তারা তবে কি কোর্ব্বে?

৩য় রমণী—সব কাজই কর্ত্তে হয়—স্ত্রী আর পুরুষকে ভাগ ত আমরা করে নিয়েছি নিজের সুবিধা আর ইচ্ছা-মত। লড়াই ত করছে কত স্ত্রীলোক! সেদিন ত কাট শাকড়া শিবনিবাসে বারজন পাঠানকে শুধু মেয়েরাই শিক্ষা দিয়ে দিলে।

১ম রমণী - না ভাই, এ যেন কি রকম! রাঁধলুম, বাড়লুম—খাওয়ালুম-খেলুম—অসুখ হলো পড়ে রইলুম—তা নয় কুচ-কাওয়াজ করো—অস্ত্র নাও—ঘোড়ায় চড় আবার মানুষ মার। তারপর রাঁধে কে? পুকুরঘাটে গিয়ে কাজ করে কে? এ বাপু ভাল নয়। যখন ইচ্ছে যাচ্ছি, যখন ইচ্ছে গল্প করছি—যা ইচ্ছে করছি। যুদ্ধ করতে হয় সৈন্য রাখুক (ধীরে ধীরে শ্যামার প্রবেশ) মাইনে দিক্, তার ব্যবস্থা রাণী করুক—আমরা অত ধার ধারি কিসের? আমি যুদ্ধ শিখবো আবার উনিও শিখবেন। ব্যস যুদ্ধ খেয়েই দিন কাটুক?

শ্যামা - (আস্তে আস্তে অগ্রসর হইয়া) কি বলছ গা তুমি? তোমার কথা ত বেশ মিষ্টি মিষ্টি।

১ম রমণী—দেখ দিখিনি ভাই রাণীর অন্যায়। সেদিন অমন রাজা গেলেন—বেশ ত মন্দিরে পূজা পার্ব্বন নিয়ে ছিলেন—আবার এলেন সিংহাসনে—তা আসুন—রাণী তা আসবেন বৈকি, রাজকুমার ছেলেমানুষ। বলি যুদ্ধ কি? মেয়েরা মেয়েরা যুদ্ধ কোর্ব্বে কি?

শ্যামা—তবে মেয়েরা কোর্ব্বে কি?

২য় রমণী—কেন, স্বামীর ঘর—গুরুজনের সেবা—সন্তান লালন পালন—

শ্যামা—তোমার ঘরে দস্যু এলো—সন্তানকে নিলে কেড়ে—কোল থেকে বাছা তখন আকুল ক্ষুধায় তোমার বুকের অমৃত ধারা করছিল পান—কে কোর্ব্বে পালন তাকে? তুমি যদি দুর্ব্বৃত্তের সেই হাতখানি কেটে দাও—এটা কি তোমার কাজ নয়? তোমার স্বামীর, তোমার ভায়ের, তোমার বাপের পাশে দাঁড়িয়ে একটা শত্রুকেও যদি মারতে পার, তাতে তোমার সংসারের কিছু নষ্ট হবে না। ভাই। আমি অত জানি না, তবে দাদুর কাছে শুনেছি—সিংহীর কাছ থেকে তার বাচ্ছা কেড়ে নিতে দুটো সিংহও ঘায়েল হয়—

১ম রমণী—কে তোমার দাদু গা?

শ্যামা—(আত্মহারা হ'য়ে) ভাই সেই বুড়োটাই ত কাল কর্ল্লে—হাতা বেড়ী ধরতে শেখালে না—শেখালেন (গাত্রাবরণ ফেলিয়া ভীষণ ছুরি বাহির করিয়া) এইটে ধরতে। সাতখানা গাঁয়ে জানে রামজীবন সর্দ্দারকে—অমন গোঁয়ার কি আর কেউ আছে ভুরসুটে—দীননাথ সর্দ্দার (উদ্দেশে প্রণাম) আর দাদু, বাবা! পাল্লা দিয়ে তলোয়ার ধরে এখনও।

সকলে—(আশ্চর্য্য ও ভীত হইয়া) তাত বটেই, অমন লোক আর কি হয়। তুমি কি আমাদের সেই শ্যামা?

(তৃতীয় রমণী আগাইয়া শ্যামাকে দেখিতে লাগিল)

শ্যামা—দেখ, আমি সব শুনলুম—এ রাজ্যের রাণী-মা জগদ্ধাত্রী, তাঁর কাজ তিনি কোর্ব্বেন। রাস্তায় অমন করে কথা বোলো না—সব তিনি জানতে পারেন—শুনতে পান—তাঁর আদেশ মানতেই হবে, তিনি আমাদের মঙ্গলের জন্য—শুধু ভুরসুটকেই রক্ষা করবার জন্য এই ব্রত নিয়েছেন।

৩য় রমণী—ভাই! আমায় একবার দেখাবে সেই দেবীকে—পূজা দেবো। আচ্ছা, যখন পাঠান আসে তখন কেবল চেঁচিয়ে মরি আর চোখের সামনে সকলের সব সর্ব্বনাশই হয়, কিছুই কর্ত্তে পারি না—এখন যদি উপায় হয় বল, যা বলবে আমি কোর্ব্ব।

(কুনালের প্রবেশ)

কুনাল—সকাল বেলায় অমন করে কথা বলে সময় নষ্ট করলে শ্যামা দিদি! আচ্ছা বলতে পার নিশানা ঠিক থাকে না কেন? যেমন দিদি ধনুক তুলে নিশানা ঠিক করে ছুঁড়তে গেলাম—সামনে দেখি বাঁশীটি নিয়ে সেই দুষ্টু ঠাকুরটি সাসছে—সব নিশানা আমার ভুল হয়ে যায়। এ আমার কি হলো শ্যামাদিদি?

শ্যামা—কুনাল! ভাইটি আমার! তোমায় যে খুঁজছিলেন।

কুনাল—দিদি আমায় হরিবোল বলিয়ে সব গোল করে দিলে। শ্যামা দিদি। আমি যাই ঐ পাহাড়ে ওরা ডাকছে—(প্রস্থান)

শ্যামা—(এক দৃষ্টে চাহিয়া) পাগল ছেলে—

১ম রমণী—এ কে ভাই? এমন ছেলে ত দেখিনি কখনও।

শ্যামা—তোমাদের রাণীকে রক্ষা করেছে এই কতবার! এর অব্যর্থ সন্ধান কখনও ভুল হয় না। তাই বলছিলাম তোমাদের সকলেরই কিছু কিছু শেখা ভাল। রাণীর উদ্দেশ্য আমরা সকলে সফল না করলে আর কে করবে? তাঁর নারী বাহিনী দেশের অপূর্ব্ব সৃষ্টি। যাও তোমরা সকলে ঘরে ঘরে এ কথাই বলে দাও। রাণীর ইচ্ছা আর্ত্ত রক্ষায় পুরুষের পাশে আমাদের দাঁড়াতে হবে। দুর্ব্বৃত্ত অতর্কিতে নারীর হাতের অস্ত্রে আঘাত পেলে কেমনটি হয় বল ত?

২য় রমণী—এ ত ভাই বেশ বলেছে—চল ভাই তাড়াতাড়ি যাই—তাই কোর্ব্ব। আমাদেরও ত দেশ ঘর বাড়ী ধর্ম্ম সব আছে!

(রমণীগণের প্রস্থান—শ্যামার হাসিতে হাসিতে অপর দিকে প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

[চতুর্ভুজ একাকী ধীরে ধীরে ঘরের মধ্যে পদচারণা করিতেছেন, একবার বসিতেছেন—একবার উঠিয়া কাহার জন্য যেন উদ্‌গ্রীব হইয়া অপেক্ষা করিতেছেন—ঘরটিতে একটি প্রদীপ জ্বলিতেছে]

চতুর্ভুজ—(ধীরে ধীরে দরজার নিকট গিয়া কি শুনিয়া) এখনও এলো না—বসন্ (বসন্তের প্রবেশ) এখনও আসছে না কেন? দেরী হচ্ছে না?

বসন্ত—এগিয়ে দেখবো? কি জানি এত দেরী করে কেন?

চতুর্ভুজ—হাঁরে তুই ঠিক বলতে পারিস—(দূরে চাহিয়া) যাঃ তোর কথা মেলেনা—এই তুই বড় বোকা।

বসন্ত—দেখুন—আপনি একটু নিশ্চিন্ত হয়ে বসুন, সব ঠিক হয়ে যাবে।

চতুর্ভুজ—আর সব ঠিক হয়েছে—দেখ দেখ বাইরে বোধ হয় কে এলো!

বসন্ত—ও হাওয়া—কই? কে কোথায়?

চতুর্ভুজ—যা না—দেখতে বলছি—তবুও (বসন্তের প্রস্থান) না—এ আমার ঠিক হচ্ছে না—এ আমি কি করছি—আমার সুমিত্রা মা—না না—

(বসন্তের প্রবেশ)

বসন্ত—হুজুর! এসেছে—

চতুর্ভুজ—কে? আমার মা—অনেকদিন দেখিনি—ডেকে নিয়ে আয়।

বসন্ত—(ইতস্ততঃ করিয়া) ওসমান খাঁর চর—

চতুর্ভুজ—কি বল্লি? ওসমান খাঁ? কেন? কি চায়?

বসন্ত—(আশ্চর্য্য হইয়া) বল্লে কি সব উপহার এনেছে—আর একটা কি কথা আছে।

চতুর্ভুজ—(উদাসভাবে) উপহার! জহরৎ—আমার কি হবে! বলে দে দেখা হবে না—যা দাঁড়িয়ে রইলি কেন? যা (অপরদিকে গমন; বসন্তের প্রস্থান—কিছুদূরে কি যেন দেখিয়া সেই দিকে চাহিয়া) একি! মা! আমার সুমিত্রা—এস মা আমার! অনেকদিন দেখিনি। (সুমিত্রার প্রবেশ ও প্রণাম—হাত ধরিয়া তুলিয়া) কোথায় ছিলি মা এতদিন?

সুমিত্রা—মামা, আমি ব্রত গ্রহণ করেছি।

চতুর্ভুজ—বেশ ত মা। বল তার কি কি যোগাড় কর্ত্তে হবে? কত অর্থ চাই—সব ব্যবস্থা করি। এখানেই সব হোক। পুরোহিতকে বসন্ত—

সুমিত্রা—(ধীরভাবে) মামা! আমার ব্রত—এই ভুরসুটকে মরণজয়ী করা।

চতুর্ভুজ—(উল্লাস) তাতে আমার কি—তোমরা করো।

সুমিত্রা—অভিমান নয়—একাজে অভিমান কেন? অভিমান কার ওপর? সকলেই আমরা মায়ের সন্তান—মায়ের সেবক—মামা! আমি আসছি—

(প্রস্থান)

(মন্ত্রীর প্রবেশ)

দুর্লভ—ভাই চতুর্ভুজ! এমনিই চলে এসেছি—বসন্ বল্লে তুমি একলা আছ।

চতুর্ভুজ—কে? দুর্লভ! এ যে অভাবনীয়। ভুরসুটের মন্ত্রী আজ আমার বাড়ীতে—আমার পরম সৌভাগ্য—

দুর্লভ—কেন ভাই অমন কথা বলছ—আমি মন্ত্রী—তুমি সেনাপতি।

চতুর্ভুজ—সে ত ঠিক। তবে তোমার মন্ত্রণা রাজ্যের সকল কার্য্যেই গ্রাহ্য হয়, আর এ রাজ্যের সেনাপতির আদেশে এখন আর একজন সৈনিকও অস্ত্র ধরে না। থাক গে সে সব কথা। এখন বল ত ভাই কি করতে হবে?

দুর্লভ—এ তুমি কি বলছ?

চতুর্ভুজ—(শান্তভাবে) সব ঠিক। তুমি বুদ্ধিমান, সবই জান। এ রাজ্য শাসন করবে কারা? কার নীতি—কার:চালনায় এ রাজ্যের কর্ত্তব্য নির্দ্দিষ্ট হবে?

দুর্লভ—তুমিই বলো—

চতুর্ভুজ—যার শক্তি আছে—যে যুদ্ধে রক্ত দিয়ে শত্রুকে বাধা দেয়। যার প্রাণশক্তিতে রাজ্যের প্রাণ প্রতিষ্ঠিত হয়—তার অনুশাসন ফেলে দেবার বস্তু নয়।

দুর্লভ—রাজ্য, প্রজা, তাদের উন্নতি—শান্তিময় জীবন, সভ্যতার বিকাশ—সবই নিয়ে আসে মানুষ। বীরের কাজই ত দেশের সেবা করা, কিন্তু শুধু কি রক্ত দিয়ে আর রক্ত নিয়ে! ভাই! শান্তি, সাম্য, মানুষকে যে ঐশ্বর্য্য দান করে যুগযুগান্তর ধরে—সমরের ধ্বংস বহ্নিতে তা নিশ্চিহ্ন হতে কতটুকু সময় লাগে? বীরের কর্ত্তব্য বীর্য্যশক্তি দিয়ে অত্যাচারীকে প্রশমিত করা।

চতুর্ভুজ—বেশ ত, তাই করো না। আমাদের কাছে পাঠানও যা মোগলও তাই। তবে পাঠানকে ছেড়ে মোগলকে গ্রহণ করি কেন?

দুর্লভ—মায়ের কাজ তিনিই বুঝবেন। ভারতে অখণ্ড জাতীয়তা গড়ে তুলতে হবে আর এরই শাসনে তার সমস্ত শক্তি নিয়োজিত। মোগল সম্রাট বা পাঠান সর্দ্দারের বা হিন্দু রাজার আদেশ নয়, এই মহাদেশের নব অভ্যুত্থান আমার কাম্য। এইটেই দেশের সেবা—তারই নির্দ্দেশ আসবে যার মুখ থেকে, সেই চালিত করবে আমাদের—

চতুর্ভুজ—তবে যে এত বিধি ব্যবস্থা, এ সবের অর্থ কি?

দুর্লভ—প্রজারা যতদিন তার অন্তর দিয়ে সে গচ্ছিত ধনকে রক্ষা করে, ততদিন এই সব দরকার হয় না—যখনই তার অভাব হয়, তখনই সেই সবের হয় সৃষ্টি।

চতুর্ভুজ—ভাই দুর্লভ! এখনও মন ঠিক করতে পারিনি—তবে আমি অপমানিত—

দুর্লভ—না তা নয়। রাণী সমস্ত দিক চেয়ে সব ব্যবস্থা করেছেন। তিনি সকল বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখেন—এটা আমি যেমন বুঝেছি তুমিও একদিন বুঝবে।

চতুর্ভুজ—আমাকে ভাই নিজেকে চিন্তা কর্ত্তে দাও।

দুর্লভ—বেশ ত আমি আবার আসবো—(যাইতে উদ্যত)

চতুর্ভুজ—হ্যাঁ, আর একটা কথা, আমার সম্বন্ধে রাণীর আদেশ কি?

দুর্লভ—কেন, তুমি যেমন ছিলে তেমনি থাকবে—তবে সমস্ত সামরিক ব্যবস্থা এবং সৈন্য চালনা তাঁরই আদেশক্রমে হবে।

চতুর্ভুজ—আমি তাঁর সহকারী—

দুর্লভ—আমরা ত সকলেই ভাই—ভাই—

চতুর্ভুজ—দেখ দুর্লভ, আমি কথাটা ঠিক বুঝতে পারছি না—

দুর্লভ—দেখ ভাই—আমরা সকলে বুঝিয়ে আর বিশেষতঃ দেবী সুমিত্রা (ইতস্ততঃ করিয়া) হ্যাঁ, সকল দিক বিবেচনা করেই রাণী এই আদেশ দিয়েছেন।

চতুর্ভুজ—কি বল্লে? সুমিত্রা! রাণীর এই আদেশ—ঠিক বলেছ দুর্লভ—সুমিত্রার জন্য রাণী আমার প্রতি বিশেষ দয়া করেছেন—(বিদ্রূপ)

দুর্লভ—তিনি দয়া করেন নি—তিনি রাজ্যের হিতকর কার্য্য করেছেন—আমি চল্লাম—(প্রস্থান)

চতুর্ভুজ—(একদৃষ্টে সেই দিকে চাহিয়া থাকিয়া মৃদু হাসিলেন ও পরে কি ভাবিয়া) বসন্—বসন্—(ডাকিতে ডাকিতে বাহিরে গেলেন এবং বসন্তকে লইয়া ফিরিয়া) এই, তুই কোথায় থাকিস্?

বসন্ত—আজ্ঞে—ওসমান সর্দ্দার—

চতুর্ভুজ—(বিরক্ত হইয়া) আবার সেই অকর্ম্মণ্য সর্দ্দারের নাম? তুই কি করছিলি বল?

বসন্ত—আজ্ঞে—অত দূর থেকে অমন লোকটা এলো—তার একটু খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা—

চতুর্ভুজ—কার খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা?—এখনও যায়নি সে? ডেকে আন তাকে

(বসন্তের প্রস্থানে অপর দিক দিয়া সুমিত্রার প্রবেশ)

সুমিত্রা—মামা! একবার ভেতরে এস, পরামর্শ আছে—মামা! আমার সময় নেই—আমায় আবার বাগুড়ী যেতে হবে।

চতুর্ভুজ—কই, আমি ত জানি না।

সুমিত্রা—কেন তোমায় বলেনি! কেন? আমি ত জানি না—তুমি কিছু জান না? রাণী গেছেন বাগুড়ী গ্রামে—ভবানী মন্দিরে শক্তি সাধনা হবে। এখনও তার বিলম্ব আছে। নিশ্চয়ই মামা তোমাকে খবর দেবেন—একি সম্ভব?

চতুর্ভুজ—মা! আমার ভাগ্যে সবই সম্ভব। আমার যুক্তি অগ্রাহ্য হয়। সুমিত্রা মায়ের স্থান হয় না সিংহাসনের পাশে—আমি সেনা গঠন করে আজ সেনাপতিত্ব হারিয়ে অবহেলায় বাস করছি রাজ্যে—মা! আমিও দেখবো আমার ভুল কি তোমাদের ভুল! হ্যাঁ, কি বলছিলে?

সুমিত্রা—মামা! কোনও দিন কোনও বিষয়ে কোনও কথা বলিনি। সন্তানের আদর নিয়ে মাতৃহারা আমি তোমার কাছে বড় হয়েছি।

চতুর্ভুজ—তাই ত ভুলতে পারছি না—

সুমিত্রা—তবুও বলছি মামা—মানুষের ছোট বড় স্বার্থের মুখ চেয়ে রাজ্য শাসন হয় না। আজ আমার কর্ত্তব্যের জন্য একথা বলতে হলো।

চতুর্ভুজ—মা! তোমার কর্ত্তব্য আমি বুঝি না। তবে এও বলি সুমিত্রা, তুমি কর্ত্তব্যের বর্ম্ম পরে আমায় যে আঘাত করলে, আমি তা ভুলবো না। মা! তোমার জন্যই সব আর তুমিই আজ—হয়ত আমারই সব ভুল, তবুও আমি থামবো না। আমায় আর উত্যক্ত ক'রো না। তোমাদের রাণীর উদ্দেশ্য সিদ্ধ কর।

সুমিত্রা—মামা! তোমার—

চতুর্ভুজ—আঃ—সুমিত্রা! আমি আমার গৃহে একলা—একটু একলা থাকতে চাই— (প্রস্থান)

সুমিত্রা—আমারই ভাগ্য! এত বড় শক্তি আজ বিক্ষিপ্ত—আমি কি করি? যাই গুরুদেবের কাছে।

(প্রস্থান)

(বসন্ত ও বাউল বেশে হুসেনের প্রবেশ)

বসন্ত—একি! কোথায় গেলেন—এই ত ছিলেন!

হুসেন—কেন আমায় বারবার অপ্রস্তুত কোরছ—এমনি করে সং সেজে আর কতক্ষণ থাকবো?

(ধীরে ধীরে চতুর্ভুজের প্রবেশ)

চতুর্ভুজ—কে? বসন্ত—কি চাই—এ কে?

বসন্ত—এই ত ডাকতে বললেন—এই ওসমান সর্দ্দারের—

চতুর্ভুজ—আবার ওসমান সর্দ্দার—আমার সামনে—

হুসেন—ওসমান সর্দ্দার আমার প্রভু—আমাকে তিনি পাঠিয়েছেন—

চতুর্ভুজ—ওঃ তুমি? হ্যাঁ-হ্যাঁ। (চিন্তা ও পরে) আমি আর কি কোর্ব্ব! আচ্ছা—বসন্ত তুই একবার বাইরেটা দেখ ত (বসন্তের প্রস্থান), এখন বলকি কথা? শিগ্‌গীর—

হুসেন—(চারিদিক দেখিয়া একখানি পত্র বাহির করিয়া চতুর্ভুজের হাতে দিয়া) এতেই সব লেখা আছে। তিনি উত্তর চেয়েছেন।

চতুর্ভুজ—(অন্যমনস্কভাবে তাহা হাতে লইতে গিয়া) না—তোমার প্রভুকে ব'লবে—আমি ভুরসুট ছেড়ে চলে যাচ্ছি—

হুসেন—একবার পড়ে দেখবেন যদি দয়া হয়।

চতুর্ভুজ—পত্র দেওয়ার আবশ্যক কি? কি বলো—আচ্ছা দাও (পত্র লইয়া প্রস্থানোদ্যত, পরে ফিরিয়া) আচ্ছা—উত্তর দেবো—পরে। আমি এখন বড় ক্লান্ত। বসন্—(বসন্তের প্রবেশ) এই এঁর সব ব্যবস্থা করিস্ (প্রস্থান)

[বসন্ত ও হুসেনের বিস্মিত ভাব]

[আগামীবারে সমাপ্য

আলোচনী

গ্রীক-বৈদিক উপকথা

শ্রীগিরিধারী রায়চৌধুরী

লক্ষ্য করলে দেখতে পাওয়া যায় যে ঋগ্বেদে অনেকগুলি পুরাকালে প্রচলিত গল্পের উল্লেখ আছে। সে উল্লেখ কিন্তু সামান্য আর বোঝাও দুষ্কর। প্রায় পনেরটি সূক্তের মধ্যে কথোপকথনচ্ছলে ছড়ান আছে ঐ গল্পগুলির বীজ আর ঐ কথোপকথনগুলিকে গণ্য করা হয় কোন অভিনীত কাহিনীর অংশ ব'লেই। তবুও আসলে ওগুলি যে গল্প ছিল, তার একটা প্রমাণ আমরা খুঁজে পেয়েছি। গ্রীক পুরাণের কতকগুলি গল্প ওই বৈদিক অভিনীত কাহিনীর অংশগুলির প্রতিরূপ। এখন প্রতিরূপ কি না সে বিষয়ে পণ্ডিতদের মতভেদ বা সন্দেহ জন্মাতে পারে। আমি এখানে সেই স্বাভাবিক সন্দেহ খণ্ডনার্থে একটির সঙ্গে অন্যটিকে নিরুপিত করবার চেষ্টা করব। আবার নিরুপিত করার পরে চেষ্টা করব ওই—ওই গল্পের আদিরূপ কি ছিল—তাই নির্ণয় করতে।

আমি অন্যত্র প্রমাণ করেছি যে—(G K.) Prometheus and Epimetheus=(I-E) প্রমেধা-অভিমেধা= =(I-A) নাসতক্রতু-সতক্রতু=নচিকেতা, শ্বেতকেতুর গল্প; (Gk.) Io-Argus—Jupiter=(I.E.) গো-অর্কস—দ্যৌঃ পিতর্=(I.A.) ইন্দ্র-ইন্দ্রানী—বৃষাকপি-সরমা ও গাভী=দণ্ডী পর্ব্ব; (Gk.) Orpheus—Eurydice= (I. E.) ঋভু-অরুদকী=(I.A.) ঋভু রোদসী=পুরুরবা—উর্ব্বশী; (Gk.) Jupiter—Saturn-Phoebus=(I.E.) দ্যৌঃ পিতর্—বৃত্র-শক্র=(I·I) ইন্দর্—বেরেথ্ন=(Scand) Balder's Dead=(I. A.) ইন্দ্র-বৃত্র; (Gk.)Niobe—Cupid=(I.E.) স্ববী-কুপিত=(I.A.) জাহ্নবী-কপিল—সগর বংশ; (Gk.) Pluto-Persephone or Proserpine =(I.E.) যম-যামী=(I.A.) যম-যামী=কচদেবযানী।

Gk.=Greek; I-E=Indo-European; I-A.=Indo-Aryan; I-I = Indo-Iranian; Scand=Scandinavian.

এইবার একটু বুঝিয়ে বলা দরকার। বৈদিক যম[১]-যামী=(পৌরাণিক)—কচ-দেবযানী=Pluto-Persephone or Proserpine। Pluto সংস্কৃত প্রেত-এর সমান এবং Persephone সংস্কৃত প্রসভ্না্র সমান। প্রসভ্না শব্দের অর্থ হয়—ধর্ষিতা। এখন যম-যামীর গল্পের সঙ্গে কচ-দেবযানীর গল্পের যেমন কোন মিল আপাতচক্ষে ধরা পড়ে না, তেমনি Pluto-Persephone-র গল্পের সঙ্গে আগের দুটির বা দুটির মধ্যে কোনটির মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। এই মিল খুঁজে না পাওয়ার কারণ হচ্ছে বিভিন্ন সময়ের গল্প কথকের কারসাজি। এই কারসাজির ব্যাপার কতদূর সত্য, তাই এখানে দেখাচ্ছি। বৈদিক যুগে যম ছিল সূর্য্যবাচক শব্দ—যেহেতু সূর্য্য হচ্ছেন পৃথিবীর নিয়ামক বা নিয়ন্ত্রণকারী। সুতরাং তাঁর স্ত্রীই হোক আর ভগ্নীই হোক [বেদে এরা যমজ ভাই-বোন বলে দেখান আছে] যামী শব্দ রাত্রিবাচক। বর্ত্তমানে সংস্কৃতে যামিনী শব্দ রাত্রিবাচক (=যাম+ইন্+ঈ)—এই হিসাবে, যাম কিনা, নৈশ প্রহর আছে যার। এখন যাম যদি নৈশপ্রহর হয়, তাহলে যামী (=যাম+ঈ) শব্দও রাত্রি বোধক হয়। ফলে, যামী ও যামিনী সমার্থক শব্দই। এখন যম যদি সূর্য্য হয়, আর যামী যদি রাত্রি হয়, তাহলে এই বোঝা যায় যে, একেবারে গোড়ার দিকে যাঁরা গল্পটি বানিয়েছিলেন, তাঁরা এই রূপকটিকে রূপায়িত করতে চেয়েছিলেন যে—দিনকে তার ভগ্নী রাত্রি সম্ভোগের প্রস্তাব দেয় এবং দিন, রাত্রি তার ভগ্নী বলেই, সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। এই গল্পটি বৈদিক সাহিত্যে প্রায় ঠিক থাকলেও পরের যুগের ভারতীয় সাহিত্যে অদ্ভুতভাবে রূপান্তরিত হয়েছিল।

১ ঋগ্বেদ—১০ম মণ্ডল—১০ম সূঃ।

সূর্য্যের পুত্র মৃত্যুর অধিপতি (জীবজগতের নিয়ন্তা) বলেই ক্রমশঃ যম শব্দ সূর্য্যকে ছেড়ে মৃত্যুর অধিপতির ঘাড়ে গিয়ে চাপল। তার ফলে আলঙ্কারিক নিয়মানুযায়ী মৃত্যুর কৃষ্ণবর্ণ গিয়ে মৃত্যুর অধিপতির উপর আরোপিত হোল। মৃত্যু বলতে "কৃষ্ণ" এই শব্দও ব্যবহৃত হ'তে লাগল। কৃষ্ণ থেকে কালক্রমে বেরুল "কচ"। গল্পের পুরাণ নায়ক যমকে হটিয়ে কচ হয়ে দাঁড়াল কর্ত্তা। আর যামীর পাখা গজাল, তার ফলে সে হয়ে দাঁড়াল দেবযানী। এই কচ ও দেবযানীর মধ্যে এসে দাঁড়ালেন শুক্রাচার্য্য ও বৃহস্পতি, শুধু তাই নয়, আরও যোগ হোল সঞ্জীবনীবিদ্যা, দেবাসুরের যুদ্ধ—এমনি কত কি! যম-যামীর গল্পের পরিণতির সঙ্গে কচ দেবযানীর গল্পের পরিণতির সাদৃশ্যটা একটা তারিফ করবার জিনিষ। আর একটা ব্যাপার প্রাচীন গল্পের যমজ ভাই-ভগিনীর বদলে গুরু-ভাই-ভগিনী সম্পর্কটা অর্থাৎ একটু পরিবর্ত্তিত রূপই পৌরাণিক গল্পের মধ্যে দেখান হয়েছে। পরিণতির কথাটা বলি—বৈদিক গল্পে দেখা যায় যম যামীর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে, ঠিক তেমনি—পৌরাণিক গল্পে দেখা যায়, কচ দেবযানীর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। ওদিকে গ্রীক পুরাণে দেখা যাচ্ছে যম কিনা সূর্য্য হয়ে দাঁড়িয়েছেন প্রেত বা মৃত্যুর অধিপতি Pluto আর প্রসভ্না বা Persephone হচ্ছেন Ceres বা বিশ্বশ্রীর কন্যা। এই Ceres-কে প্রকৃতি বা বসুমতীরূপে দেখান হয়েছে। সুতরাং মৃত্যুর অধিপতির সঙ্গে প্রসভ্নার ভগ্নী সম্পর্ক বদলিয়ে গিয়ে ভাগিনেয়ীতে দাঁড়িয়েছে। তার ওপর, আর একটু রকম-ফের হয়েছে—গ্রীক-গল্প কথকদের হাতে পড়ে এক ধরণের রূপক অন্য ধরণের রূপক হয়ে দাঁড়িয়েছে—দিবস ও রাত্রির মিলন ও বিচ্ছেদের রূপক ঋতু-পরিবর্ত্তনের রূপকে পরিণত হয়েছে। ওসব দেশের ঋতু পরিবর্ত্তনের নিয়মানুযায়ী ছ'মাস পৃথিবী (বা Ceres) Persephone-এর বিরহে ম্লান ও অফলা হ'য়ে থাকবে আর বাকী ছ'মাস Persephone-র উপস্থিতির দরুণ সুশ্রী; শস্যশালিনী হয়ে উঠবে।

এই রকম আরেকটা গল্প হচ্ছে গ্রীক পুরাণের Philemon-Baucis-এর গল্প। এর বৈদিক প্রতিরূপ হচ্ছে ২ ইন্দ্র ও বসুক্র। প্রাচীনতর আখ্যায় হয়ত পুলোমা ও বসুক্র ছিল এবং ঋগ্বেদে পুলোমা কক্ষচ্যুত হয়েছিল, আর সে জায়গায় ইন্দ্র এসে জাঁকিয়ে বসেছিল। তার একমাত্র কারণ ইন্দ্র প্রভাবের পূর্ব্ব যুগে অসুর প্রভাবের সময়ে বৃত্রের ছিল অব্যাহত প্রভুত্ব ৩। একা বৃত্র কেন, উশনা বা শুক্র, বরুণ—এরাও প্রায় সমান সম্মানার্হ ছিলেন। অজ্ঞাত এক মতভেদের ফলে দেবতারা বড় হয়ে যাওয়ায় এবং অসুরেরা ছোট বা হীন হয়ে যাওয়ায় ভারতীয় আর্য্য সাহিত্যে ইতোপূর্ব্বে প্রতিপন্ন অসুরদের যতকিছু প্রভাব ও প্রতিষ্ঠা দেবতারূপ রাহুগ্রস্ত হোল। তারই ফলস্বরূপ এই গল্পটির নায়ক পুলোমাকে উৎপাটিত ক'রে এলেন ইন্দ্র। ওদিকে গ্রীক পুরাণে বসুক্র হয়ে দাঁড়াল Baucis, আবার এই Baucis হোল Philemon-এর স্ত্রী Philemon ও Baucis—স্বামীর-স্ত্রী হোল Jupiter ও Hermes-এর আশ্রয়দাতা বা আতিথ্য-সৎকারক। ঋগ্বেদে বসুক্রের স্ত্রীর সুন্দর কথোপকথন পাওয়া যায়। সুতরাং ঋগ্বেদে কাহিনীর উল্লেখ অত্যল্প থাকলেও একমাত্র পুলোমার বদলে ইন্দ্র ছাড়া অন্য কোন পরিবর্ত্তন ঘটেনি ব'লে মনে হয়। গ্রীক পুরাণে কিন্তু সমস্ত গল্পটি যায় চরিত্রগুলি অবধি পরিবর্ত্তিত হয়েছে।

এই কাহিনীর পূর্ব্বরূপ যা অনুমিত হয়, তা' হচ্ছে এই, দেবশ্রেষ্ঠ একদিন বলেন মর্ত্তে মনুষ্যশ্রেষ্ঠ বা আদর্শ মানুষ দম্পতীর সততা-যাচাই করতে। রাত্রি তখন অনেক হয়ে গিয়েছে, অনেকেরই খাওয়া-দাওয়া হয়ে গিয়েছে। শুধু খেতে বাকী আছে আদর্শ মানুষের স্ত্রীর। আতিথ্য ধর্ম্মের প্রতি অবহেলা যাতে না হয় সেই জন্য সেই স্বামী-স্ত্রী অতিথিকে (কি, অতিথিদ্বয়কে) আদর-আপ্যায়িত করে বসিয়ে, বাকী আহারটুকু ধ'রে দিয়ে এবং রাত্রিকালীন আশ্রয় দিয়ে সন্তুষ্ট করল। দেবতা বা দেবতারা যাবার সময় এদের বর দান করে গেলেন। ফলকথা, দেবশ্রেষ্ঠের পরীক্ষায় মনুষ্যশ্রেষ্ঠ সসম্মানে উত্তীর্ণ হোল।

---

২ ঋগ্বেদ—১০ম মণ্ডল—২৮ সূঃ।

৩ ঋগ্বেদের সূক্ত বিশেষে দেখতে পাওয়া যায় যে, দেব ও অসুর সমার্থক শব্দই। পরে কালক্রমে শব্দ দুটীর অর্থের পরিবর্ত্তন ঘটেছিল, তাও সূক্ত বিশেষে দেখতে পাওয়া যায়।

এই ধরণের আরেকটি সুন্দর গল্পের উল্লেখ করে প্রবন্ধ শেষ করব। ঋগ্বেদে[৪] পুরূরবা—উর্ব্বশীর যে গল্প পাওয়া যায়, গ্রীক পুরাণে তার প্রতিরূপ পাওয়া যায় Orpheus-Eurydiceতে। ধ্বনিতত্ত্বের নিয়ম অনুযায়ী দেখতে পাওয়া যায় (GK.) Orpheus=(I.A.) ঋভু (স্); ঋভু শব্দের অর্থ গায়ক আর (GK.) Eurydice=(I.A.) রোদসী; রোদসী আকাশ বাচক শব্দ। রোদসীর প্রাক্তন রূপ ছিল* অরুদক্যা (I.E.)। এখন প্রশ্ন হতে পারে এই যে, ঋগ্বেদে ঋভু-রোদসী (কি-অরুদক্যা)-র জায়গায় পুরূরবা-উর্ব্বশী এল কি ক'রে! হিসাব করলে দেখা যায় ঋভু শব্দের অর্থ যা, পুরূরবা শব্দের অর্থও তাই। পুরু বা পরু=Poly=বহু+রবা। অর্থাৎ—বহু স্বর বান যে, সেই পুরূরবা। তার মানেই গায়ক। অরুদক্যি থেকে ধ্বনি পরিবর্ত্তনের নিয়ম অনুযায়ী, ওরুদচী>উরুঅংসী> উর্ব্বশী হয়ে থাকতে পারে। ভারতে যে সময়ে গল্পটির পর্য্যালোচনার ফলস্বরূপ লোকপ্রিয়ত্ব জন্মাচ্ছিল, সেই সময়েই খুব সম্ভবতঃ চরিত্রগুলির নাম পরিবর্ত্তন হয়ে থাকতে পারে। আরেকটি কথা আকাশ বাচক রোদসী শব্দ ঐ একই* অরুদক্যি থেকে উদ্ভূত হয়েছিল, কিন্তু উর্ব্বশীর উদ্ভবের কিছু আগেই সেটা ঘটেছিল ব'লে মনে হয়।

এখন গ্রীক পৌরাণিক ও বৈদিক উপকথার মধ্যে যা কিছু পরিবর্ত্তন ঘটেছে, তা হচ্ছে এই যে, পুরূরবা একজন রাজা অথচ—Orpheus একজন ভিক্ষাজীবি চারণ মাত্র। Eurydice সর্পদষ্ট হয়ে মারা যান অথচ উর্ব্বশী লতায় রূপান্তরিত হ'ন। আর Eurydiceকে মৃত্যুর পর Orpheus ফিরিয়ে আনবার উদ্দেশ্যে যমপুরীতে হাজির হ'ন এবং ফিরিয়ে আনতে আনতে আবার হারান। এদিকে উর্ব্বশীকে পুরূরবা অনেক খুঁজে বেড়াচ্ছেন এবং না পেয়ে আত্মহত্যা করতে উদ্যত হ'ন।

সুতরাং গল্পটির প্রাক্তন রূপ এই হ'তে পারে যে, কোন গায়ক যার প্রেরণা জোগাত তার স্ত্রী, সে তার স্ত্রী সর্পদষ্ট হয়ে মৃত্যু বরণ করায়, স্বর্গে যায় গান শুনিয়ে মৃত্যুর অধিপতিকে সঙ্গীতে মুগ্ধ ক'রে স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনতে। সে চেষ্টায় সে অর্দ্ধেক সফল হয় এবং পরিণামে নিজে মৃত্যু বরণ ক'রে স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হয়।

৪ ঋগ্বেদ—১০ম মঃ—৯৫ সূঃ ও শত পথ ব্রাহ্মণ ১১।৬ ১।

●

ঋক্‌বেদ-প্রচার

শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

শ্রীধাম নবদ্বীপ নিবাসী পণ্ডিতপ্রবর শ্রীগোপেন্দুভূষণ সাংখ্যতীর্থের নাম বাংলা দেশে সর্ব্বজন পরিচিত। তাঁহার ভাষণ যিনি শুনিয়াছেন, তিনিই তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাবান হইয়াছেন। বর্ত্তমান কালে তাঁহার মত পণ্ডিত যেমন বিরল, তাঁহার মত বক্তাও তেমনই নাই বলিলেই চলে। যে কোন বিষয়ে তিনি বক্তৃতা করিয়া শ্রোতৃবৃন্দকে বিমোহিত করিতে পারেন। তিনি বৈষ্ণব—তাঁহার স্বর্গত পিতৃদেব শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় "শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত" গ্রন্থ সম্পাদন ও প্রকাশ করিয়া বৈষ্ণবজগতের মহোপকার সাধন করিয়াছেন। সম্প্রতি সাংখ্যতীর্থ মহাশয় তাহার তৃতীয় সংস্করণ সম্পাদন করিয়া প্রকাশ করিতেছেন। গোপেন্দুবাবু আর এক বিরাট কার্য্য করিয়া সকলের ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। তিনি সমগ্র শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থখানি সংস্কৃত পদ্যে অনুবাদ করিয়াছেন। তাঁহার সেই অনুবাদ পাঠ শুনিয়া স্বধামগত নবদ্বীপবাসী ললিতাদিদি বলিয়াছেন—"আপনার লেখা শুনিয়া মনে হইতেছে যেন মূল গ্রন্থই শুনিতেছি। কবিরাজের কলম অব্যাহত রাখিয়া আপনি যেরূপ প্রাঞ্জল সংস্কৃত ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন, তাহাতে মনে হয়, আপনি কবিরাজ মহাশয়ের পূর্ণ কৃপালাভ করিয়াছেন।" স্বর্গত প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় ঐ অনুবাদ শুনিয়া বলিয়াছিলেন—"তুমি জগতের

এক পরম মঙ্গলকর কার্য্য করিলে। অর্দ্ধ সহস্র বৎসরের মধ্যে এরূপ প্রয়োজনীয় বিষয়টির প্রতি কাহারও দৃষ্টি পড়ে নাই।" ঐ সংস্কৃত গ্রন্থ এখনও প্রকাশিত হয় নাই। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থানুকূল্যে শীঘ্রই ইহা প্রকাশের ব্যবস্থা হইতেছে। পণ্ডিতপ্রবর সম্প্রতি আর এক বিরাট কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। তিনি 'ঋক্‌বেদ' গ্রন্থ মূলখণ্ড, সায়নাচার্য্যের ভাষ্যানুমোদিত বঙ্গানুবাদসহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশ করিতেছেন। প্রথম খণ্ডে ঋক্‌বেদের প্রথম মণ্ডলে প্রথম অধ্যায়ে উনবিংশ সূক্ত প্রকাশিত হইয়াছে। তাহার মূল্য মাত্র দেড় টাকা। ইহা কলিকাতা ২৩৪ বৌবাজার ষ্ট্রীটস্থ শ্রীলেখা প্রেসে পাওয়া যায়। প্রথম অধ্যায়ের প্রথম সূক্ত সকলের সুপরিচিত। তাহা এই—

ওঁ অগ্নিমীলে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজম্।
হোতারম্ রত্নধাতমম্।১।

ইহার অর্থ—

অগ্নিদেবের স্তুতি করি। এই অগ্নিই দেবতাগণের অগ্রণী, যজ্ঞকর্ম্মের প্রধান সম্পাদক এবং দানাদি গুণযুক্ত ও দীপ্তিমান। ইনিই রমণীয় রত্নদাতৃগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ—যজ্ঞফল স্বরূপ রত্নরাজি ধারণ ও পোষণ করেন।১।

প্রথম সূক্তটিকে আগ্নেয় সূক্ত বলে। ইহাতে নয়টি ঋকমন্ত্রে অগ্নিদেবতার স্তব আছে।

তৃতীয় সূক্তের শেষ তিনটি ঋকে (নং ১০।১১।১২) সরস্বতীর বন্দনা আছে। সেগুলির বঙ্গানুবাদ কিছু প্রদত্ত হইল—

পবিত্রকারিণী দেবী সরস্বতী, যিনি অনুবর্তী ও কর্ম্মফল বিধায়িণী—তিনি আমাদের এই যজ্ঞকে কামনা করুন—অর্থাৎ যজমানগণকে অন্নরাশি বিতরণ করিবার জন্য এই যজ্ঞটিকে সুসম্পন্ন করুন। ১০।

প্রিয় অথচ সত্য এমন বাক্যের প্রেরয়িত্রী ও সুবুদ্ধি সম্পন্ন যজ্ঞানুষ্ঠাতৃবৃন্দের চেতনাদায়িনী দেবী সরস্বতী আমাদিগের এই যজ্ঞকে ধারণ করিয়া আছেন, অর্থাৎ তাঁহারই কৃপায় ঋত্বিকগণ সুষ্ঠুভাবে যজ্ঞ সম্পাদনে সমর্থ। ১১।

সরস্বতী নদী যেমন প্রবাহ দ্বারা তাহার জলের প্রাচুর্য্য প্রকৃষ্টভাবে জানাইয়া দেন, তেমনই বাগ্‌দেবী সরস্বতীও প্রজ্ঞা বিধানকরতঃ স্বীয় বিশ্বব্যাপিনী ধী-শক্তিতে বিরাজিতা রহিয়াছেন, অর্থাৎ যজমানের অনুষ্ঠান বিষয়ক বুদ্ধিবৃত্তিগুলির উন্মেষ করিয়া দিতেছেন। ১২।

বেদে কি আছে তাহা জানাইবার জন্য কয়েকটি মাত্র ঋকের অনুবাদ প্রদত্ত হইল।

বেদ প্রচারের এই চেষ্টা দেখিয়া মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীরমেশচন্দ্র তর্কতীর্থ মহাশয় লিখিয়াছেন—"বেদে কি আছে তাহা জানিবার জন্য শিক্ষিত মাত্রেরই উৎকট ইচ্ছা চিরকাল জাগ্রত। কিন্তু বৈদিক ভাষা-বিজ্ঞানের অভাবে সে আকাঙ্খা জলবুদ্‌বুদের ন্যায় 'উত্থায় হৃদি লীয়ন্তে' হইতেছে। এটি বড় দুঃখের কথা, বিড়ম্বনার কথা, বিদেশীয় সভ্য শিক্ষিত সমাজে অতিশয় লজ্জা ও ঘৃণার কারণ; এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। নবদ্বীপ বঙ্গদেশের মধ্যে সমুন্নত ভারত প্রসিদ্ধ সংস্কৃত প্রতিষ্ঠান। সেই নবদ্বীপবাসী অধ্যাপক শ্রীগোপেন্দুভূষণ সাংখ্যতীর্থ মহাশয় সায়ণ ভাষ্যাদি অনুসারে বেদের বঙ্গানুবাদ প্রকাশে অগ্রণী হইয়াছেন দেখিয়া যে কত আনন্দিত ও আশ্বস্ত হইয়াছি, তাহা স্বল্পাক্ষরে প্রকাশ করিতে পারিতেছি না। তিনি সুপণ্ডিত, সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে অসাধারণ ব্যুৎপন্ন। এযাবৎ কোন বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের এরূপ দুরূহ দুঃসাধ্য কার্য্যে অধ্যবসায় জন্মে নাই। এইটি যে তাঁহার হৃদয়ে উন্মেষ হইয়াছে, ইহাই তাঁহার অসাধারণ বুদ্ধি, প্রতিভা ও তেজস্বিতার নিদর্শন।"

বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ সভার সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীচণ্ডীদাস ন্যায়তর্কতীর্থ মহাশয় এ বিষয়ে লিখিয়াছেন—"সুদীর্ঘ পরাধীনতার ফলে বঙ্গদেশে বেদের চর্চা খুবই শিথিল হইয়া পড়িয়াছে। অন্যে পরে কা কথা—যে বেদ ব্রাহ্মণ মাত্রেরই প্রাণসর্বস্ব, আজ তাঁহাদের মধ্যে কয়জন বেদানুশীলনে অনুরাগী? বেদ-পড়া তো দূরের কথা, বেদ গ্রন্থখানির সহিত অনেকের হয় ত চক্ষুসংযোগই হয় নাই। বিধিবোধিত পদ্ধতিতে বেদজ্ঞান লাভ হয় ত অনেকের ভাগ্যেই ঘটে না, কিন্তু 'স্বল্পমপ্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতোভয়াৎ' এই ভগবদ্বাক্যানুসারে বেদমন্ত্রের আবৃত্তি ও অনুধাবন দ্বারা চিত্তশুদ্ধি ও গ্রহ পবিত্র করিবার সৌভাগ্য লাভে বঞ্চিত হওয়া উচিত নহে। এ কারণে সুপণ্ডিত শ্রীগোপেন্দুভূষণ সাংখ্যতীর্থের বেদ প্রচারের এই উদ্যম খুবই প্রশংসনীয়। পণ্ডিত গোপেন্দুভূষণকে দীর্ঘকাল হইতে সায়ণাচার্য্যের ভাষ্যানুমোদিত বঙ্গানুবাদ সহ মূল সংহিতার মন্ত্রগুলি প্রচারে উৎসাহিত দেখিয়া আসিতেছি। তিনি যে এই কার্য্যে সম্পূর্ণ যোগ্য, ইহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই।"

ইহার পর এ বিষয়ে অধিক বলার কোন প্রয়োজন নাই।

রি-অ্যাক্‌সন

অতুলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

ছোট্ট একখানা চিঠি,—"ভাই অসিত, আসছে সোমবার আমার বিয়ে, বার-এট্‌-ল জয়ন্ত মুখার্জ্জির সঙ্গে। বিকেল বেলায় সামান্য আয়োজন হবে গ্রেট-ইষ্টার্ণে। অবিশ্যি আশা চাই কিন্তু তোমার। নইলে দুঃখিত হবো। ইতি রীতা।"

এমবস্‌-করা গোলাপী-বর্ডার দেওয়া কার্ডের উপর ঐ সামান্য ক'টি কথা রাবীন্দ্রিক ছাঁচে লেখা। লেখিকার নিজেরই হস্ত-লিপি। কারখানা থেকে ফিরে, অবসন্ন দেহে ও বুভুক্ষু জঠরে সে যখন একটু বিশ্রাম এবং আহারের কথা চিন্তা করছিল, ঠিক এমনি সময়ে পড়ল তার চিঠিখানি হাতে, সঙ্গে সঙ্গে ওর মনে হলো যেন জ্বলন্ত এক ঝলক রক্ত হঠাৎ ছুটে এলো ওর মস্তিষ্কের ব্রহ্মতালুতে দেহের সমস্ত শিরাউপশিরার কন্দর বেয়ে।

রীতার চিঠি! একি স্বপ্ন! পরিহাস! না বিদ্রূপ! চিঠিখানা অসিত আবার পড়লো, বারে বারে পড়লো। চিঠিখানা যে রীতার নিজেরই হাতের লেখা এবং তা বহন করে এনেছে তার আসন্ন বিবাহের সংবাদ, তাতে আর কোন সংশয় নেই। অথচ এই নিষ্ঠুর বিদ্রূপের কি কোন প্রয়োজন ছিল।

তা হলে রীতা শুধু নিজেকে এতোদিন প্রহেলিকার আড়ালে রেখে ভান করে এসেছে অসিতকে ভালবাসবার। অথচ কপট অভিনয়ের এই মিথ্যা মোহকে মনে মনে কাঁপিয়ে তুলে, অসিত কল্পনায় গড়ে তুলেছে স্বপ্নসৌধ। রীতার ছোট্ট একটু চিঠি আজ ধূলিসাৎ ক'রে দিয়েছে সেই স্বপ্নসৌধ। এতে হয়তো একটা ক্ষোভ আছে, কিন্তু আত্মগ্লানি আরও বেশী। ছিঃ ছিঃ, নিজে সে এতোই নির্ব্বোধ! এতোদিন একটা মেয়ের কপট ছলনার কাছে নির্ব্বিচারে সে প্রতারিত হ'য়ে এসেছে! অথচ সবচেয়ে হাস্যকর হচ্ছে এই যে, প্রতারণাকেই নিজের আন্তরিক প্রেমের চরম পুরস্কার ভেবে আত্মপ্রসাদ লাভ করেছে, এর চেয়ে আত্মমর্য্যাদার চরম পরাভব আর কিইবা হ'তে পারে!

ক্ষুধা, তৃষ্ণা এবং ক্লান্তির কথা এক নিমেষে ভুলে গেল অসিত। ওর দেহের শিরায় শিরায় যেন বৈদ্যুতিক প্রবাহের ঢেউ লেগেছে। বিপুল উত্তেজনায় ও অশান্ত এবং চঞ্চল। কাণের ভিতরে কেমন ঝাঁ ঝাঁ শব্দ করছে, চোখ দু'টো জ্বালা করছে, নিশ্বাসের তীব্রতা বেড়েছে, গলার ভেতরে একটা উষ্ণ শুষ্কতা এসে স্বাভাবিক অনুভূতির আস্বাদকে নষ্ট ক'রে দিয়েছে।

বিশ্রাম করা অথবা বেশ পরিবর্ত্তন করা হ'লো না অসিতের। আলনা থেকে বহুপুরাতন ধূসর রংএর চেষ্টারফীল্ডটা টেনে নিয়ে গায়ে চড়ালো। কারখানার ময়লা লেগে বহুদিন থেকেই সেটা বিবর্ণ হয়েছিল। তবু শীত ঠেকাবার পক্ষে তা ছিল মজবুদ। ওপেন ব্রেষ্ট কলার দু'টো তুলে দিল খাড়া ক'রে। মাথার ওপরে বনাতের টুপির কাণা দু'টো কাণের ওপর দিয়ে ভেঙ্গে নামিয়ে দিল, তারপর ধরালো মোটা একটা বর্ম্মা চুরুট। কড়া ধোঁয়ায় শরীরটা বেশ গরম থাকে। হন্‌ হন্‌ ক'রে সে বেরিয়ে পড়লো রাস্তার অন্ধকারের মধ্যে।

শীত পড়েছে চেপে। কুয়াশা পড়ছে জমাট হয়ে, রাস্তার আলোগুলো ঘোলাটে, পথ চেনা যায় না ভাল। কেমন যেন মরিয়ার মত হেঁটে চলেছে অসিত; জগতের কোন কিছুর ওপরেই যেন ভ্রূক্ষেপ নেই।

অথচ ভেবে দেখলে রীতার ব্যবহারকে হয় তো খুব অস্বাভাবিকও বলা যায় না। কারণ জগতে এ রকম ঘটনা অহোরহই তো ঘটে থাকে। ঐশ্বর্য্যের সমকক্ষতাই তো সাধারণ ক্ষেত্রে প্রেমের মানদণ্ড। ভালবাসার জন্যে ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগ ক'রে প্রিয়ের অনুগামী হয়েছে জগতে এমন দৃষ্টান্ত বিরল, হয়তো তা সুখেরও নয় এবং স্বাভাবিকও নয়। এক সময়ে অসিতের সাথে রীতার

প্রণয়টা ছিল শোভন ও স্বাভাবিক—যখন ঐশ্বর্য্য ও সমৃদ্ধির মানে অসিত এবং রীতা ছিল এক সামাজিক পংক্তিতে। তখনকার অনেক গোপন স্মৃতি আজও হয়তো ভেসে বেড়ায় লেকের কালো জলে সন্ধ্যাকাশের নিচে, ভিক্টোরিয়া স্মৃতিসৌধের আশে পাশে জনবিরল অবকাশে এবং আরও অনেক জায়গায়। খুঁজে দেখলে কি মনের মধ্যেও তার এক আধ টুকরো অবশেষ পাওয়া যাবে না!

তারপর হঠাৎ কী করে মারা গেলেন অসিতের বাপ, কী করে জমিদারি তাঁর উঠলো লাটে, সে সব অনেক কথা। কিন্তু তার ফল হলো সংক্ষিপ্ত। বি-এ পড়তে পড়তে পড়া ছাড়তে হলো অসিতের পয়সার অভাবে। লোকোমোটিভের কারখানায় ঢুকলো সামান্য মজুর হয়ে। প্রথমে লুব্রিকেটিং অয়েলের ব্যারেল ঠেলতো, তার পর ইঞ্জিন পরিষ্কার করতো। তার পর করেছে ফিটারের কাজ, এখন সে ড্রাইভার। বহুকাল মালগাড়ির ইঞ্জিন চালাতো, হালে প্রমোশন পেয়েছে প্যাসেঞ্জার গাড়ির ইঞ্জিন-ড্রাইভারের পদে। চেষ্টায় আছে মেইল ট্রেনের ড্রাইভার হবার আশায়, গল্পের এ অংশটা আর টেনে না বাড়ালেও চলে—কারণ তা ভবিষ্যৎ সম্ভবনার গর্ভে।

সাংসারিক বিপর্য্যয়ে অনেক কিছুই ওলটপালট হয়ে গেছে অসিতের জীবনে, শুধু একটি মাত্র বিশ্বাস ছিল স্থির। সে ভেবেছিল রীতা তাকে ভালবাসে আর সে ভালবাসা টলতে পারে না সহস্র বাধা এবং বিপর্য্যয়ের সংঘাতেও। এ দুরাশা তার লালিত হয়েছে রীতারই কপট ছলনার প্রশ্রয় পেয়ে। এই এক মাস আগেই সে সহরে গিয়েছিল. রীতার সাথে তখন দেখা হয়েছে, কিন্তু তার আলাপ আচরণে এমন কোন আভাসের একবিন্দুও ফুটে ওঠেনি, যাতে বোঝা যায় একটা কঠিন বিচ্ছেদ প্রত্যাসন্ন। অসিত ভাবে,—প্রেমের অভিনয়ে মেয়েরা নিখুঁৎ! নিজের মনকে ওরা শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত গোপন করে রাখতে পারে মধুর ছলনা এবং মিঠে হাসির কড়া মদ খাইয়ে। সমস্ত নারীজাতির ওপর একটা দুর্দ্দমনীয় ঘৃণা এবং হিংস্রতা নিয়ে অন্ধকার পথ বেয়ে অসিত হন্ হন্ ক'রে এগিয়ে চলতে লাগলো একটা বন্য একরোখা জানোয়ারের মত, উত্তেজনায় ঘন ঘন টানতে লাগলো কড়া বর্ম্মা চুরুট।

কারখানায় আসবার পর আর একটি মেয়ের সাথে পরিচয় হয়েছিল অসিতের। তাকে ও এতোকাল পাশ কাটিয়ে এসেছে অনুকম্পার চোখে। রূপের আসরে মেয়েটি অপাংক্তেয়। ধনীর দুলালী রীতার সাথে দাঁড়াতে পারে না কোন তুলনাতেই। লেখাপড়া শেখবার সুযোগ পায়নি জীবনে। আচরণের মধ্যে ঝলসে ওঠে না উগ্র নাগরিক সভ্যতার ঝলকানি। অশিক্ষা, অবহেলা এবং অভাবের বিপুল বোঝার চাপে ও মানুষ। নাম ওর রেখা, কারখানার বড় মিস্ত্রির মেয়ে। শৈশব থেকেই মাতৃহীনা।

প্রথম দৃষ্টিতে আকৃষ্ট হবার মত সম্পদ ওর চেহারায় অলক্ষ্য। কপাল ওর চওড়া, নাসিকা নয় রীতার মত সুঠাম এবং তীক্ষ্ণ, গায়ের রং নিকৃষ্ট। মুখের মিষ্টি হাসি ঝরেনা অহোরহ ফোয়ারার মত অজস্র বর্ষণে। এলো-খোপার ছন্দে ছন্দে গ্রীবাভঙ্গির লীলায়িত লালিত্য দুলে ওঠে না ঠমকে ঠমকে। অতি সাধারণ গোছের মেয়ে রেখা। মানুষ বেড়ে ওঠে বয়সের ধর্ম্মে। স্বাভাবিক নিয়মেই তারুণ্যের ঢেউ এসে লেগেছে ওর জীবনে, পুষ্পিত হ'য়ে উঠেছে হৃদয়ের রঙ্গীন আশা। রূপের অভাব এবং দারিদ্র্যের কঠিন সীমা বাধা দিতে পারেনি ওর মনের অগ্রগতিকে। অসিতকে সে ভাল-বেসেছিল। কিন্তু অসিত ধরা দেয়নি নিজেকে রেখার কাছে, কারণ সে তখন বিভোর হ'য়ে ছিল রীতার প্রেমের ধ্যান ও স্বপ্নে। রীতা ধনীর মেয়ে, রীতা রূপসী, রীতা বিদুষী।

দেবার মত কোন সম্পদই কি নেই রেখার? আছে, তার আছে আড়ম্বরহীন অকৃত্রিম প্রেম এবং স্পর্শকাতর প্রাণ। প্রাণের একটা রূপ এবং পরশ আছে। অনুভব যাদের গভীর নয়, প্রাণের সৌন্দর্য্য ধরা পড়ে না সহজে তাদের চোখে। রেখার স্বভাবের যেদিকটা ছিল মনোরম সেদিকে নজর পড়েনি অসিতের, কারণ রীতার রূপ ও ঐশ্বর্য্যের তীব্র উজ্জ্বলতায় ওর চোখের দৃষ্টি গিয়েছিল ধেঁধেঁ।

রেখার বাবা কারখানার বড় মিস্ত্রি। এই চাকুরিতে চুল পেকেছে তার, ষ্টাফিং বক্সের প্যাকিং বাঁধতে অদ্বিতীয়; পিষ্টনের রিং কোট ঘসে বসাতে পারে নিখুঁৎ ভাবে, হাতের অনুমান পাকা। কারখানার চীফ্ ইঞ্জিনিয়ার প্রায় সব রকম কঠিন কাজই বুড়ো মিস্ত্রির হাতে ছেড়ে দিয়ে মনে মনে ভরসা পান। সে যাই হোক, এই সব পরিচয় নিয়ে কি গর্ব্ব করা চলে অভিজাত সমাজে! বরং লজ্জাই বাড়াবে বেশী। বুড়ো মিস্ত্রির কালো মেয়ের ভালবাসা কি এতোই মূল্যবান! আর রীতা! না; আর ভাবতে পারা যায় না! এক সময়ে এই সমস্ত কথা ভাবতে ভাবতে অব্যক্ত পুলকে অসিতের দেহের প্রতি অণু পরমাণু বারংবার রোমাঞ্চিত হতো।

রেখা কলেজের শিক্ষা পায়নি সেকথা সত্যি, কিন্তু রুচি তার ভোঁতা নয়। এক সময়ে ওরা ছিল মধ্যবিত্তের স্তরেই, এখন নেমে এসেছে শ্রমিকের ধাপে, তবু বংশানুক্রমিক মার্জ্জিত রুচির ছাপ একেবারে মুছে যায়নি ওদের পারিবারিক সংস্কৃতি থেকে। ও যখন বুঝতে পেরেছে তার ভালবাসার প্রতিদান যথোচিত সাড়া জাগায়নি অসিতের আচরণে, তখন থেকে নিজেকে একটু দূরেই সরিয়ে রেখেছে। আগ্রহের বাড়াবাড়ি দেখিয়ে নিজেকে সে আর খেলো করতে চায়নি অসিতের সামনে।

এক সময়ে বুড়ো মিস্ত্রির বাসায় খুবই যাতায়াত ছিল অসিতের। নিজে হাতে জলখাবার তৈরি ক'রে কতদিন রেখা খাইয়েছে ওকে, মনে মনে তার জেগেছে গোপন পুলকের চঞ্চলতা। ঝাঁঝাঁতে ইঞ্জিন ডিরেইল হ'য়ে আহত হয়েছিল অসিত। রেলের হাসপাতাল থেকে যখন ছাড়া পেলো, প্রথমেই সে এসে উঠেছিল বুড়ো মিস্ত্রির বাড়িতে। শরীর তার তখনও খুব দুর্ব্বল। রেখারই অক্লান্ত এবং সাগ্রহ সেবায় ধীরে ধীরে আবার সে সুস্থ হ'য়ে উঠেছে। এই সেবা যত্ন এবং আগ্রহের আড়ালে, রেখার যে একটা মনের দাবি প্রচ্ছন্ন ছিল সে কথা হয়তো প্রথমে বুঝতে পারেনি অসিত। কিন্তু মনের পরিচ্ছন্ন উত্তরের কাছে স্পষ্ট হবার পর থেকেই অসিত বুড়ো মিস্ত্রির বাড়ির ত্রিসীমানা এড়িয়ে চলবার চেষ্টা করেছে পারতপক্ষে। রেখাও বুঝেছে ভাগ্য তার প্রসন্ন নয়।

এমনি ক'রে আরও কতদিন কাটতো কে জানে। হঠাৎ অবস্থাটা এসে দাঁড়িয়েছে ক্রাইসিসের মুখে। তার মূলে রীতার লেখা ঐ ছোট্ট চিঠিখানি।

আগুনধরা হাওয়াই যেমন ছুটে চলে শাঁই শাঁই করে, তেমনি উদ্‌ভ্রান্ত বেগে হেটে চলেছে অসিত। চলতে চলতে এসে পড়লো শ্রমিক মহল্লার অপর প্রান্তে। কুয়াশার সাথে কয়লার ধোঁয়া মিশে দুর্ভেদ্য হয়েছে অন্ধকার। টিম্ টিম্ করে জ্বলছে দু'টো একটা কেরোসিনের আলো। এখানে সেখানে জটলা ক'রে আগুন পোহাচ্ছে দু'চারজন শ্রমিক। আরও খানিকটা এগিয়ে গেল সে, অন্ধকারে ঠাহর ক'রে এসে দাঁড়ালো টালির ছাদ-দেওয়া একটা ছোট একতলা বাড়ির সামনে। চৌকাঠের ওপর বাড়ির নম্বর দেখে নিশ্চিত হলো, যে, এটা বুড়ো মিস্ত্রিরই বাড়ি। কড়ার নাড়া দিয়ে অসিত ডাকলো—মিস্ত্রিমশাই!

নারী কণ্ঠে জবাব এলো—বাড়ি নেই।—মিস্ত্রি যে নেই সেকথা অসিত জানতো। কোন দিনই মিস্ত্রি এমন সময়ে বাড়ি থাকে না। অসিত আবার ডেকে বল্ল,—দয়া ক'রে এদিকে একবার শুনে যাবেন তো!

কবাট খুলে বেরিয়ে এলো রেখা। খুব সম্ভব রান্না করছিল সে। কোমরে তার আঁচল জড়ানো শক্ত করে। আগুনের তাতে কিঞ্চিৎ রাঙা হয়ে উঠেছে ললাট এবং কপোল। কবাট খুলে এমন অসময়ে অসিতকে দেখে হঠাৎ যেন কেমন থমকে গেল, কিন্তু কিছু বলবার অবকাশ পেলো না। অসিত বোধ হয় এক পলক চেয়ে ছিল নির্ব্বাক হ'য়ে, তার পর অকস্মাৎ পাগলের মত রেখাকে জড়িয়ে ধরলো বুকে। বল্‌লো,—তোমায় আমি ভালবাসি রেখা।

আকাশের গ্রহ-নক্ষত্রে কোথায় কী গোপন চক্রান্ত ঘটে গেছে তা জানে না রেখা। অতলস্পর্শ বিস্ময়ে ওর চোখের দৃষ্টি নিশ্চল। অসিতের মুখের দিকে সে শুধু ফ্যাল ফ্যাল ক'রে চেয়ে রইল, নিবিড় আলিঙ্গন বন্ধনে।

সাম্প্রতিক বাংলা কবিতার আশাবাদী রূপ

অরুণ চৌধুরী

বাংলা কবিতার 'মৃত্যুসংবাদ' অনেকেই দিয়ে থাকেন, অনেকেই অভিমত দেন, রবীন্দ্রনাথের পর আর বাংলা কাব্যের ক্ষেত্রে অগ্রগতি হয়নি, যা হয়েছে তা' রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ প্রভাবপুষ্ট কয়েকজন কবিদের দ্বারা, এর পরে যা' হয়েছে, সে সমস্ত লেখা 'কাব্য' আখ্যা পাবার আদৌ উপযুক্ত নয়, অদূরভবিষ্যতে যে বাংলা কাব্যের পুনরভ্যুত্থান হবে, সে আশাও তাঁরা করেন না। সুতরাং তাঁরা যে সিদ্ধান্তে উপনীত হন, তা' হ'লো বাংলা কাব্যের 'মৃত্যু' অবধারিত এবং ইতিমধ্যেই সে 'মৃত্যু' ঘটতে সুরু হয়ে গেছে।

'দিঙ্‌নাগ সমালোচকদের' এ আলোচনায় কর্ণপাত না করে বলা যায়, বাংলা কবিতার 'মৃত্যু' হয়নি বটে এবং অদূরভবিষ্যতে 'মৃত্যু'র কোনো সম্ভাবনাও নেই, তবে তার 'কায়াবদল' বা 'দেহান্তর প্রাপ্তি' যে ঘটেছে এ কথা অত্যন্ত সত্য। বাংলা কবিতায় আজ 'রূপান্তর' অতিশয় প্রকট। পুরাণো কাব্যবস্তু, রূপকর্ম্মের পুরাণো ঢং, কাব্যের অন্তরের পুরাণো সুর—সমস্তই আজ একে একে বদলে যাচ্ছে এবং তার স্থান অধিকার করছে নতুন কাব্যবস্তু, রূপকর্ম্মের নতুন পদ্ধতি বা ঢং আর নতুন সুর। কিন্তু এ 'দেহান্তর প্রাপ্তি' প্রসঙ্গে একটি কথা বিশেষভাবে স্মরণীয়। 'পুনর্জ্জন্মবাদ' মানবজীবনে না মানলেও কাব্য বা সমগ্রভাবে সর্ব্বপ্রকারের রূপক্রিয়ার ক্ষেত্রে এর সত্যতা স্বীকার করা চলে। কারণ সমস্ত দেশের রূপক্রিয়ার যে রূপান্তর, তার পিছনে ঐতিহ্যের বিরাট অস্তিত্ব এবং প্রভাবকেও স্বীকার করতেই হয়, ঐতিহ্যের অস্তিত্বকে তার প্রাপ্য সম্মান না দিয়ে পরবর্ত্তী স্তরে কোনো প্রকারের উন্নতধরণের রূপসৃষ্টি সম্পূর্ণভাবেই অসম্ভব। সুতরাং বাংলা রূপবিদ্যার এক শাখা, কাব্যের যে 'দেহান্তর প্রাপ্তি'র কথা বলছি—তাতে অতীতের 'সংস্কার' প্রভৃতির প্রভাবকে উড়িয়ে দেওয়ার কোনো মনোভাব নেই কিন্তু। আজকের 'নতুন দেহে'ও 'পুরানো দেহের' অস্তিত্বের কথা বারংবার স্মরণে জাগতেও পারে। পুরানো দেহ থেকে অনেক কিছু লাভ করেই এ 'নতুনদেহে' উত্তরণ।

এ প্রসঙ্গে আরেকটি কথা, এ 'রূপান্তর' কোনো প্রকারের আকস্মিক ঘটনা নয়, এর পিছনে রয়েছে বহুদিনের বহু রকমের প্রচেষ্টা এবং পরীক্ষা নিরীক্ষা—মোটামুটি ভাবে তার সূচনাকাল নির্দ্দেশ করতে হ'লে বলতে হয় প্রথম মহাযুদ্ধের (১৯১৪-১৮) কথা, বাংলা কাব্যসাহিত্যের ক্ষেত্রে যাঁর অসাধারণ প্রতিভার প্রভাব সব সময়েই স্মরণীয়, সেই রবীন্দ্রনাথের সুদক্ষ হাতেই এর শুভ উদ্বোধন।

সেদিন থেকে আরম্ভ করে নজরুল ইসলাম হ'তে সুভাষ মুখোপাধ্যায় তথা সুকান্ত ভট্টাচার্য্য অবধি সে রূপান্তরের বীণা নানা জনের হাতে নানা ভাবে নানা সুরে বেজেছে। এখন প্রশ্ন, শুধুকি নানা হাতে নানা সুরে নানা ঢং-এ তার নিছক কসরতই চলেছে, না শেষাবধি কোনো যথার্থ পথের ও পদ্ধতির আবিষ্কারও সম্ভব হয়েছে? এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া খুব সহজ ব্যাপার নয়। তার কারণ কাব্যবিচারে ও কাব্যের রসাস্বাদনের ব্যাপারে 'নানা মুনির নানা মতে'র ইঙ্গিত পূর্ব্বেই দিয়েছি। একক কোনো কাব্যবিচার পদ্ধতি, কাব্যের রসাস্বাদনের একক কোনো কায়দা কোনোদিন ছিল কি না সন্দেহ; (হয়ত নয়), এবং একক কোনো পদ্ধতি আবিষ্কৃত হবে কি না বা হ'তে পারে কি না তাও ভবিষ্যতের হাতে সমর্পণ করাই ভালো। অবিশ্যি তর্কের খাতিরে ও নিয়ে নানাধরণের তার্কিক প্যাঁচ খেলে, নানা তার্কিক কসরত দেখিয়ে, এক পক্ষ অপর পক্ষকে ঘায়েল করে 'তর্কবীর' উপাধি পেতে পারেন, কিন্তু পরিসমাপ্তিতে যদি সে তর্কের ফল যোগ করা হয়, তবে দেখা যাবে 'যথাপূর্ব্বং

তথাপরং'; অর্থাৎ সেই পুরানো প্রশ্ন: পাত্রাধার তৈল কিংবা তৈলাধার পাত্র।

বাংলা কবিতার যে অগ্রগতি পরিলক্ষিত হচ্ছে, তা' প্রধানত: তার কথাবস্তু বা content-এর কথাবস্তুর রূপান্তরে আঙ্গিকের রূপান্তরও হ'তে বাধ্য এবং হচ্ছেও। বাংলা কাব্যের কথাবস্তু বা content পূর্ব্বের চেয়ে অনেক বেশি ব্যাপ্ত। পূর্ব্বেকার সংকীর্ণ গণ্ডী থেকে মুক্ত হয়ে সে আজ অধিকতর গণমুখীন। সামাজিক সুযোগপ্রাপ্ত স্বল্পসংখ্যক ব্যক্তির প্রেম ভালোবাসা, সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনার পরিবর্ত্তে আজ বাংলা কাব্যে মূর্ত্ত হয়ে উঠেছে সমাজের অবহেলিত সংখ্যাগরিষ্ঠদের জীবনকথা, তাদের আনন্দ-বেদনা, সুখদুঃখ এবং প্রেম-ভালোবাসা; তাদের জীবনের বিভিন্ন নিগ্রহের দিকের কথা, তাদের দাবীর কথা, প্রয়োজনের কথা। এ ব্যাপ্তির ফলে কবিতার পরমায়ু অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে, তা' সন্দেহাতীত ঘটনা। কারণ, কোনো কিছুই অধিকদিন পরগাছা হয়ে বাঁচতে পারে না; যে বাঁচতে চায় তাকে মাটিতে শিকড় গেড়ে আত্মশক্তির 'পরে ভর দিয়ে দাঁড়াতে হবে, নতুবা ভবিষ্যতে একদিন না একদিন তার জীবন-রস ফুরিয়ে যাবেই। বাংলা কবিতার অধিকাংশ স্রষ্টাই এ বিষয়ে অধুনা সজাগ হয়েছেন। এ অত্যন্ত আশার কথা। তবে সংগে সংগে তাঁদের কথাও স্মরণীয়, যাঁরা আজও 'মনের রোগে' ভুগছেন, আর 'মনের মৃত্যু' রচনা করতে নিয়োজিত করেছেন নিজেদের কবি-শক্তিকে।

অবিশ্যি যে রূপান্তরের কথা উল্লেখিত হ'ল, তা'তে এদের কোনো কোনো কবির স্থান বিশেষভাবে উল্লেখ্য। তাঁদের দু'একজনের প্রভাবও সবিশেষ। এবং এ রূপান্তরের ক্ষেত্রে তাঁদের দানও অনস্বীকার্য্য। যথা: জীবনানন্দ দাস (১৮৯৯) এবং অজিত দত্ত প্রভৃতি। কিন্তু তা' সত্ত্বেও তাঁদের অতিশয় আত্মকেন্দ্রিক রোমান্টিক কবিমনের জন্যে তাঁরা কোনো সুস্থ গণমুখীন আশাবাদী জীবন-বিশ্বাসের চেয়ে আত্মঘাতী হতাশাবাদই ছড়িয়েছেন অধিক। নিয়ত এক 'পলায়নী মনোবৃত্তির' চর্চ্চাতেই তাঁদের সৃষ্টির ভাণ্ডার পূর্ণ। অতিশয় ব্যক্তি-প্রবণতার জন্যে তাঁরা প্রায়ই সমাজ-বিমুখীন। আর এই সমাজবিমুখতার জন্যেই পুরাণো কাব্যধারার বিরুদ্ধে তাঁদের যে 'বিদ্রোহ' ঘোষণা, তা' নিছক 'বিদ্রোহ' হিসেবেই ব্যর্থ হয়েছে। কোনো সার্থক পরিবর্ত্তন আনতে তাঁরা সক্ষম হননি। এ ভাবেই তাঁদের শক্তিমান্ লেখনীর শক্তি বিনা সাফল্যেই নিঃশেষিত হয়ে গেছে।

আশার কথা, এর পাশাপাশি গণমুখীন আশাপ্রোজ্জ্বল জীবনবিশ্বাসযুক্ত কবিতাও আজ বাংলা কাব্যজগতে নিতান্ত স্বল্পসংখ্যক নয়। অনেক কবির সমাজ-সচেতন লেখনীর মুখেই শুনতে পাই জীবনের অমোঘ জয়-বার্ত্তা। আর সে জয়বার্ত্তা সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের ভাব-প্রকাশের বাহন কাব্যেরও।

আসল কথা, আজকে কবি সাহিত্যিক তথা সর্ব্বশ্রেণীর সংস্কৃতিসেবীর পক্ষেই 'গজদন্তমিনারে' বসে নিছক উদ্দেশ্য-হীন 'নভোবিলাস' শোভা পায় না। বর্ত্তমান জীবনের দাবী অবিরত সংগ্রাম। কিসের বিরুদ্ধে? সর্ব্বরকম অন্যায়, অসত্য ও অসাম্যের বিরুদ্ধে। সংস্কৃতির সঙ্গে জীবনের নিগূঢ় সম্পর্ক যখন অনস্বীকার্য্য, তখন সর্ব্বরকমের সংস্কৃতি-কর্ম্মীকেই আজকে নতুন জীবন লাভের জন্যে যে সংগ্রাম সে সংগ্রামের অংশীদার হ'তে হ'বে। কবি ও অন্যান্য সর্ব্বশ্রেণীর সংস্কৃতি-কর্ম্মীরাই জীবনের রূপকার এবং জীবন-সংগ্রামের অংশীদার। সমাজে অবস্থানকারী অন্যায়, অসত্য ও অমানবিকতার নিষ্পেষণে নিষ্পেষিত মানবতাকে মুক্ত করা তথা জীবনের কল্যাণময় মঙ্গলপ্রদ রূপের দিকটি দেখিয়ে দেওয়াই হ'চ্ছে কবির কাজ চিরদিনের। কবি সৌন্দর্য্যের উপাসক, সৌন্দর্য্যের পূজারী পুরোহিত। কোন্ সৌন্দর্য্যের? সে সৌন্দর্য্যের প্রকৃত স্বরূপ কি?

যে সৌন্দর্য্য সমগ্র মানবজীবন এবং পারিপার্শ্বিক বিশ্বকে বিভূষিত করে, কল্যাণরূপিণী করে। সুতরাং সে সৌন্দর্য্যের নির্লিপ্তরূপায়ন করলেই কবির কাজ সমাপ্ত হয় না। জীবনের সৌন্দর্য্যকে লাভ করবার সংগ্রামের অংশী হয়েই দাঁড়াতে হ'বে কবিকে। এক কথায়, সে আজ মানবতার মুক্তি-সংগ্রামেরই ঘনিষ্ঠ সহযোগী। সে সংগ্রামে যারা লিপ্ত, তাদেরই 'একজন'। তাঁর প্রকৃত উক্তি আজ:

তাদের দলের পিছনে আমিও আছি,
তাদের মধ্যে আমিও যে মরি-বাঁচি।
(অনুভব—সুকান্ত ভট্টাচার্য্য)

পরিষ্কার ভাবে জীবনের সৌন্দর্য্য লাভের 'ধর্ম্ম যুদ্ধে' সম্মতি জানাতে এ কবির একবিন্দু দ্বিধা নেই। এঁদের উক্তি ঋজু এবং নির্দ্বৈধ :

কৃষক, মজুর, তোমরা শরণ—
জানি, আজ নেই অন্য গতি ;
যে পথে আসবে লাল প্রত্যুষ
সেই পথে নাও আমাকে টেনে।
(কানামাছির গান—সুভাষ মুখোপাধ্যায়)

অবিশ্যি উধৃত কাব্যাংশ দু'টির রচয়িতা দু'জনেই এক বলিষ্ঠ জীবনবিশ্বাসে বিশ্বাসী হয়েই এ কথা বলার শক্তি পেয়েছেন। তাঁদের অনুসৃত জীবনবাদের বলিষ্ঠভাবই তাঁদের দ্বিধাহীন করেছে। সন্দেহের কোনো উপলখণ্ডে তাঁদের কাব্যস্রোত ব্যাহত হয়ে যায়নি। আত্মকেন্দ্রিকতার সংকীর্ণ কুঠরীর গণ্ডীমুক্ত হ'য়ে তাঁরা বস্তুতাবিক হ'তে পেরেছেন। এঁদের বক্তব্যের মধ্যে যেমনি অন্যায়, অসত্য ও অমানবিকতার বিরুদ্ধে 'ধর্ম্মযুদ্ধ' ঘোষণার মনোভাবও প্রবল, তেমনি এঁদের গণমুখীনতাও বিশেষ লক্ষ্যণীয়। গণমুখীনতা ও সমাজ-সচেতনতা এবং আশা-প্রোজ্জ্বল জীবনবাদে সুগভীর প্রত্যয়, এ সবক'টি গুণই এঁদের কাব্যের সার্থকতা এনে দিয়েছে।

আরেকটি বিষয়ও এঁদের কাব্যালোচনার ক্ষেত্রে লক্ষ্যণীয়। সে হ'ল, এঁদের সুনিবিড় আন্তরিকতা। আন্তরিকতা জীবনধর্ম্মী কাব্যসৃষ্টির ক্ষেত্রে বিশেষভাবে স্মরণীয়। আর সেই আন্তরিকতার বলে অনেক সময় অনেক কবি জীবন-বিশ্বাসের ক্ষেত্রে মতান্তর থাকলেও এঁদেরই মতো জীবনধর্ম্মী আশাবাদী কবিতা রচনা করতে সমর্থ হন। হয়ত শেষোক্ত কবিদের জীবন-বিশ্বাস ও প্রথমোক্তদের জীবনবিশ্বাস, এ দুয়ের মধ্যে কোন্‌টি অধিক খাঁটি—এ নিয়ে চুলচেরা দার্শনিক বিচার করা যেতে পারে, কিন্তু তা' বাদ দিলেও শেষোক্ত কবিদেরও আশাবাদী প্রগতিপন্থী কবি বলতে বাধে না। কারণ, এঁরা জীবনকেই আশ্রয় করেছেন, জীবন-সংগ্রামেরই শরণ নিতে প্রস্তুত হয়েছেন, জীবনের প্রতি সুগভীর আশাবাদ এবং অবহেলিত নিষ্পেষিত জীবনে সৌন্দর্য্য প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষাই এঁদের কবিধর্ম্ম; আর সে ক্ষেত্রে এঁদের আন্তরিকতাও প্রশংসনীয়।

প্রসংগত, কবি দক্ষিণারঞ্জন বসুর নাম উল্লেখ করা যেতে পারে।

দক্ষিণারঞ্জন তারুণ্যের কবি। তারুণ্যের রক্তিমাভ মায়া-অঞ্জন চোখে দিয়ে তিনি দেখেছেন এই বসুধাকে। ভালো বেসেছেন তার প্রতি ধূলিকণাকে; তার প্রকৃতিকে, মানুষকে, পশুপাখীকে। কিন্তু সেই সৌন্দর্য্যময় বসুধার বুকে চেপে-বসা নির্ম্মম অসত্য, অন্যায় এবং অমানবিকতার জগদ্দল পাথরের গুরুভার দেখে তাঁর মনপ্রাণ ব্যথিত হয়ে উঠেছে। তাঁর কবি-হৃদয়ে জেগেছে তীব্র বেদনার তরঙ্গ, কিন্তু সে বেদনায় অস্থিরতায় তিনি পথের হদিশ হারাননি, দিশেহারা হয়ে আত্মঘাতী হতাশাবাদী নীতি অনুসরণ করেননি কবি। দৃঢ় প্রত্যয় রেখেছেন তাঁর মনে এবং সেই আত্মপ্রত্যয়ের অটলতায় আহ্বান করেছেন :

এ বসুধা বারাঙ্গনা,
দস্যুদের অঙ্কবিলাসিনী
এ লজ্জা ঘুচাও। (মরামাটি)

এর পরবর্ত্তী স্তবকে কবির প্রতীতি সর্ব্বজনিক :

বসুন্ধরা সবাকার,
সকলের লাগি তার
অকলঙ্ক হোক আত্মদান
(ঐ)

কিংবা—

শাবল শানাও—
উর্ব্বর স্বপ্নের হাসি
তুমি শোন সবারে শোনাও।
(ঐ)

'বসুন্ধরা সবাকার' এ প্রতীতি আধুনা অত্যন্ত প্রবল। অসাম্যের জ্বরে জর্জ্জরিত পৃথিবীতে আধুনা দেশবিদেশের বহু কবিই এ বাণী শুনিয়েছেন, অনেক কবি-কণ্ঠেই এই ধ্বনি ধ্বনিত। বিশেষত, প্রথম সমরোত্তর যুগে (১৯১৪-১৮) আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতার হিমালয়সদৃশ দোষত্রুটি ধরা পড়ে, য়ুরোপের সমর-বিধ্বস্ত দেশের বিদীর্ণ বুকে এবং অন্যত্র বিভিন্নদেশের বুদ্ধিজীবী ও সংস্কৃতি

কর্ম্মীরা এ নিয়ে চিন্তা করতে থাকেন। ওরই সঙ্গে সঙ্গে রুশ বিপ্লবের (১৯১৭) আশ্চর্য্য সফলতা এবং লেলিনের নেতৃত্বে রাশিয়ার সুবিস্তৃত ভূভাগ ব্যাপী নতুন সভ্যতা ও সংস্কৃতির অভ্যুত্থান পৃথিবীর কবি এবং বিভিন্ন শ্রেণীর শিল্পী ও সাহিত্যিককে বিস্মিত করে। অসাম্যের অসুর নাশে সেখানকার সমাজে সাম্যের অভিনব ফুল ফোটার আশ্চর্য্য দৃশ্য দেখে তাঁরা স্তম্ভিত হন। অনেকে প্রভাবিতও হন ও যায়। ওর প্রভাবে তৎকালিক চিন্তাজগতে কী জাতীয় আলোড়ন এনেছিল, তার সাক্ষ্য দেয় রবীন্দ্রনাথ রচিত ভ্রমণ-কাহিনী 'রাশিয়ার চিঠি'র ভূমিকায় (১৯৩০) তাঁর একটি উক্তি…'আপাতত রাশিয়ায় এসেছি—না এলে এ জন্মের তীর্থদর্শন অত্যন্ত অসমাপ্ত থাকতো রুশ-বিপ্লবের পর থেকেই 'বসুন্ধরা সবাকার' এ ধারণাটি এবং এর সভ্যতা ও সফলতা সম্পর্কে মানব সমাজের বৃহদাংশের ধারণা দৃঢ়তর হয়। কালের পথ বেয়ে দ্বিতীয় মহাসমরোত্তর (১৯৩৯-৪৫) যুগে এ প্রতীতি আরও দৃঢ়তর হয়েছে। কবি, শিল্পী, সাহিত্যিক তথা সর্ব্বশ্রেণীর সংস্কৃতি-কর্ম্মীকেই অল্পবিস্তর নাড়া দিয়েছে। বাংলাকাব্যে এর প্রভাব সর্ব্ব-প্রথম পরে নজরুল ইসলামের (১৮৯৯) কাব্যে ; প্রেমেন্দ্র মিত্র, সমর সেন, দিনেশ দাস, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, বিমল চন্দ্র ঘোষ এবং সুকান্ত ভট্টাচার্য্যের কবিতায় এর প্রভাব সমধিক ভাবে প্রকট। তবে কেউবা সেখানে মন্থর হৃদয়াবেগদ্বারা চালিত হয়েছেন (যথা—প্রেমেন্দ্র মিত্র), আবার কারুর প্রতীতি অতিশয় প্রখর এবং বস্তুতান্ত্রিক ও ঋজু (যথাঃ সুভাষ মুখোপাধ্যায়, বিমলচন্দ্র ঘোষ, সুকান্ত ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি)

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির সংগে সংগে এ সময়কার জাতীয় অবস্থাও উল্লেখযোগ্য। অসহযোগ আন্দোলন (১৯২১) থেকে আরম্ভ করে দ্বিতীয় বিশ্ব সমরোত্তর যুগ (অর্থাৎ ১৯৪৭) পর্য্যন্ত বাংলা তথা ভারতের জাতীয় আর্থিক ও রাষ্ট্রনৈতিক পরিস্থিতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ক্রমবর্দ্ধমান জাতীয়তার চেতনা একদিকে, আরেক দিকে আর্থিক অবস্থার নিম্নগামিতা, দুর্ভিক্ষ ও নানাধরণের অভাব-অনটনের দ্বন্দ্ব জাতিকে সংক্ষুব্ধ করে তোলে। সমাজ-সচেতন কবির কর্ত্তব্য হ'ল এ পরিস্থিতিতে সুগভীর আত্মবিশ্বাস ও আশাবাদ নিয়ে চলা। এ পরিস্থিতিতে কবির উক্তি :

অন্ধকারের ফণায় মৃত্যু ঢাকা,
হে শিকারী হুঁশিয়ার!
আসন্ন দিনের তূণে তীর প্রস্তুত,
অব্যর্থ শরের ঘায়ে বিদ্ধ কর
চূড়ান্ত সন্ধান,
নিশ্চিহ্ন হবার আগে
শেষ চেষ্টা কর একবার।
স্থির লক্ষ্য জয়ী হোক
মানুষের হাড়ের ধনুকে!

(বিসর্গ—দক্ষিণারঞ্জন বসু)

এ উক্তি কবির অনপহৃত আশাবাদী মনেরই সাক্ষ্য দেয়। এই ভাবেই সমাজ-সচেতন কবি ভাবীযুগের অবশ্য-সংঘটনীয়তার দিকে মানুষের তথা সমগ্র সমাজের দৃষ্টি আকৃষ্ট করেন।

কবির লক্ষ্য এক নবীনতম পৃথিবী :

আমি গাহি নিদ্রাহীন অনাগত সেদিনের গান—
যেদিন মানুষ পাবে মানুষের যথার্থ সম্মান।

(আসিবে সেদিন আসিবে—দক্ষিণারঞ্জন বসু)

মানবসভ্যতার প্রার্থিত সে সুপ্রভাত অদূরবর্ত্তী। সংগ্রামী চেতনা, আশাবাদী মন ও সুগভীর আত্মপ্রত্যয় নিয়ে কবি যেন স্পষ্ট দেখতে পারছেন অদূর সম্মুখে এক নবীন প্রভাত :

কুয়াসা কাটছে, কাটবে আজ কি কাল,
ধুয়ে ধুয়ে যাবে কুৎসার জঞ্জাল,
ততোদিন প্রাণ দেবো শত্রুর হাতে,
মুক্তির ফুল ফুটবে সে সংঘাতে।

(বিক্ষোভ—সুকান্ত ভট্টাচার্য্য)

এ কিন্তু নিছক 'কবি-কল্পনা' নয়, সুদৃঢ় আত্মপ্রত্যয় রয়েছে এর পিছনে

আবার সুদিন আসে—আসে নেমে
কুমারী প্রভাত ;
অংকুরে ভরিয়া ভরে মরামাটি
যেন অকস্মাৎ।
কংকালের পরশ লাগে নীল দুপুরের ,
শ্মশানের শূণ্যতায় স্বপ্ন হাসে নবজীবনের

(নবযুগ—দক্ষিণারঞ্জন বসু)

রূপান্তরিত বাংলা কাব্যের ক্ষেত্রে এই সমাজ সচেতনতা, গণমুখীনতা এবং আশাপ্রোজ্জ্বল জীবন-বিশ্বাস, একটি প্রধান বিশেষত্বরূপে গণ্য হবার যোগ্য।

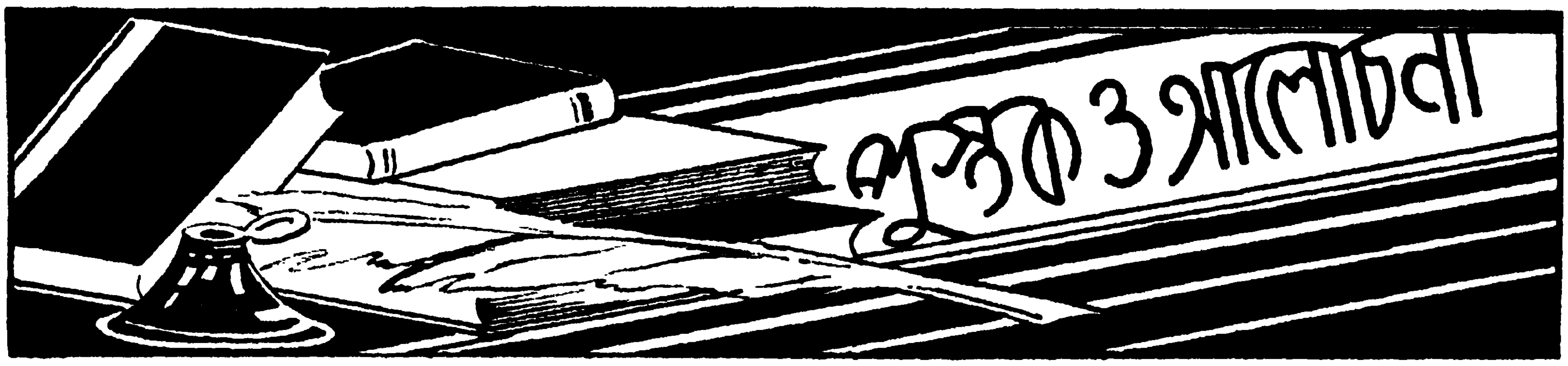

নিম্নলিখিত গ্রন্থসমূহ সমালোচনার জন্ত আমাদের হাতে আসিয়াছে

১। রাবণ-বধ (নাটক)—কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার। কবি কৃষ্ণচন্দ্রের অপ্রকাশিত নাটকের পাণ্ডুলিপি উদ্ধার করিয়া সম্পাদক শ্রীকৃষ্ণ মিত্র বিদগ্ধ সমাজের ধন্তবাদভাজন হইয়াছেন।

২। পদাতিক (উপন্তাস)—শক্তিপদ রাজগুরু। রসঘন কথাচিত্র। জীবনে আঘাত আছে, কিন্তু সেই আঘাতকে জয় করিবার একটা মহৎ চেষ্টা কাহিনীর স্বাভাবিক গতিতে সার্থক হইয়া উঠিয়াছে।

৩। জীবনায়ন (কাব্য)—শ্রীশান্তশীল দাস

৪। ব্রহ্ম ও আত্মাশক্তি (১ম ও ২য়, নিবন্ধ)

—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ঘোষ

৫। ভাঙছে শুধু ভাঙছে (উপন্তাস)—অমরেন্দ্র ঘোষ। শক্তিমান কথাশিল্পীর শক্তির স্বাক্ষর। দাঙ্গা ও তাহার অনিবার্য্য ফলস্বরূপ বঙ্গ-বিভাগের ইতিহাসকে কথাচিত্রের মধ্য দিয়া সার্থক রূপ দেওয়া হইয়াছে।

৬। একটি রঙকরা মুখ (গল্প)

—শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

আধুনিক ছোট গল্পের জগতে লেখকের সার্থক পদপাত। গ্রন্থে 'বিজ্ঞাপন' শীর্ষক গল্পটি সমধিক উল্লেখযোগ্য। গল্পটি ইতিপূর্ব্বে বঙ্গশ্রীতে প্রকাশিত হয়।

৭। অতিথি (কৌতুক নাটিকা)—সুবোধ বসু

৮। আমাদের কবি (ছোটদের রবীন্দ্র-জীবনী)

—শ্রীমনোরম গুহঠাকুরতা

৯। পূর্ব্বরঙ্গ (কাব্য)—অমিয়রতন মুখোপাধ্যায়

১০। অগ্রগামী (উপন্তাস)—শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। নতুন জগতের আলো লইয়া খ্যাতিমান লেখকের কাহিনী রচনা। চিত্রনাট্য উপযোগি।

১১। মাটির মাধুরী (কাব্য)—শ্রীসুধীর গুপ্ত

মাটির মতই স্নিগ্ধ ও সুধাময়ী কবিতাগুলি।

১২। বিধুর বিভব কাব্য (কাব্য)—শ্রীপঞ্চানন কবিরত্ন

১৩। রবীন্দ্র সঙ্গীত প্রসঙ্গ (নিবন্ধ)—শ্রীশেফালিকা শেঠ

১৪। (ক) মধুমিতা (খ) তিমির তৃষা } (কাব্য)—দিলীপ দাশগুপ্ত

১৫। অন্তরাগ (কাব্য)—শ্রীরাইহরণ চক্রবর্ত্তী

১৬। পরমহংস শ্রীশ্রীজ্ঞানানন্দ সরস্বতী (জীবন-দর্শন)

—স্বামী ভাস্করানন্দ সরস্বতী

১৭। তরণী বিহার (কাব্য)

—স্বামী ভাস্করানন্দ সরস্বতী

১৮। জনতা (কাব্য)—নবজীবন ঘোষ

১৯। বিরহি-মাধব (কাব্য)—শ্রীবিষ্ণু সরস্বতী

২০। যুগের ডাক (নিবন্ধ)—আবদুর রউফ

২১। যক্ষ্মা চিকিৎসা (১ম ও ২য় খণ্ড)

—শ্রীপ্রভাকর চট্টোপাধ্যায়

২২। আলোপাত (কাব্য)—শ্রীনরেন্দ্রচন্দ্র রায়

২৩। লাল টিপের কাব্য (কাব্য)

—শক্তি মুখোপাধ্যায়

২৪। আহ্বান (কাব্য)—শ্রীসন্তোশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য

২৫। কয়েকটি কবিতা (কাব্য)—চিত্রভানু

২৬। পাকিস্তানের চিঠি (কাব্য)—শ্রীঅমলেন্দু রায়

২৭। অভিশাপ (কাব্য)—নীলাম্বর

২৮। যমের বিপদ (নাটিকা)—শ্রীবীরেশ্বর ভট্টাচার্য্য

২৯। ঋগ্বেদ (১ম খণ্ড)—শ্রীগোপেন্দুভূষণ সাংখ্যতীর্থ

সাম্প্রাদকীয়

বিশ্বশান্তি ও ট্রুম্যান-চার্চ্চিল যৌথ-ঘোষণা

মার্কিন প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান ও বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী মিঃ চার্চ্চিলের দুইদিন ব্যাপী ঐতিহাসিক বৈঠকের পর তাঁহাদের আলোচনার মুখ্য বিষয়গুলি এক যৌথ ঘোষণার আকারে জনসাধারণের উদ্দেশ্যে প্রচারিত হইয়াছে। ঐতিহাসিক বৈঠক এই কারণে যে, এখানে বনিকের মানদণ্ড ও সাম্রাজ্যবাদীর রাজদণ্ড যুক্তাকারে যাদুদণ্ডের রূপ লইয়া বিশ্বশান্তি সম্পর্কে মানুষকে আশ্বস্ত করিতে যত্নবান হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু বিবৃতি দিতে যাইয়া যে স্বতস্ফূর্ত্ত সংশয় এবং সেই সাথে বিশেষ একটা আত্মবোধ ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা জনসমাজে যাদুবিদ্যা প্রদর্শনের মতো কোনোরূপ সম্মোহনের কাজই করে নাই। আসলে মানুষ মাত্রেই যে নির্ব্বোধ বা অজ্ঞ নয়, এ কথা বুদ্ধিজীবী রাষ্ট্র-ধুরন্ধরেরা উপলব্ধি করিতে পারিলে তাঁহাদের ক্রিয়াকলাপ ও বিবৃতিসমূহও স্বাভাবিক ও সহজতর হইত। কিন্তু আলোচ্য ট্রুম্যান-চার্চ্চিল যুক্ত-বৈঠকেও দেখা গেল—সেই সহজ ও স্বাভাবিকতার পথ এখনও সুদূরপ্রসারী।

ইঙ্গ-ফরাসী আলোচনা, গণতান্ত্রিক জার্ম্মাণী ও ইউরোপ, মিশর ও ইরাণ সমস্যা, দূরপ্রাচ্যে ইঙ্গ-মার্কিন স্বার্থ, দেশরক্ষার প্রস্তুতি ও অর্থনৈতিক স্থায়িত্ব প্রভৃতি সমস্যাবলী সম্পর্কে মোটামুটি একটা স্থির সিদ্ধান্তে আসিয়া বিশ্বশান্তি সম্পর্কে বলা হইয়াছে : 'আমরা এই আশা ও বিশ্বাস পোষণ করি যে, বর্ত্তমানে যে সকল আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র নির্ম্মিত হইয়াছে, সেগুলি মানবজাতির উপর প্রযুক্ত হইবে না। বিশ্বশান্তি বিপন্ন হইবার মতো কোনো পরিস্থিতি দেখা দিলে আমরা পরস্পরের সহিত সে সম্পর্কে আলোচনা করিব। আমরা মনে করি না যে, যুদ্ধ অনিবার্য্য—আমাদের এই বিশ্বাসের ভিত্তিতেই আমাদের কার্য্যনীতি পরিকল্পিত হইবে। বর্ত্তমানে যে সকল সমস্যা বিশ্বশান্তি বিঘ্নিত করিতেছে, সেগুলির সমাধানকল্পে সর্ব্বপ্রকার ন্যায়সঙ্গত পন্থা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে আমরা সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকিব।'

ঘোষণার মূল বাণী সম্বন্ধে একেবারেই নীরব থাকা কোনো বুদ্ধিজীবীরই কর্ত্তব্য নয়। ঘোষণায় সংগ্রাম-সন্ত্রস্ত বিশ্বকে স্পষ্টতঃ এই কথাই শুনানো হইয়াছে যে, তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ অনিবার্য্য নয়। দুঃখের বিষয়, বর্ত্তমান পৃথিবী আলোচ্য বৈঠকের মাধ্যমে এইরূপ নেতিবাচক বাণী শুনিতে চায় নাই, যাহা কিছু-মাত্রও শুনিবার আগ্রহ ছিল, তাহা হইতেছে স্পষ্ট ও দীপ্তকণ্ঠের ঘোষণা যে, যুদ্ধ অসম্ভব। শুধু তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধই নয়, আগামী পৃথিবীতে যুদ্ধ বলিয়াই কিছু থাকিবে না। কিন্তু হতাশার কথা এই যে, এ কথা উচ্চারণ করিবার মতো বল ও বিশ্বাস দুই জনের কেহই সঞ্চয় করিয়া উঠিতে পারেন নাই। যুদ্ধোন্মাদনার পিছনে যে তাঁহাদের আত্মবোধই বিশেষভাবে জাগ্রত, এ কথা নিরুদ্ধ মনের অন্তরালে কোথাও তাঁহাদের চাপা থাকিতে পারে নাই, বরং উচ্ছ্বাসের অতি-প্রাবল্যে উদ্গত অভিব্যক্তিতেই তাহা রূপ পাইয়াছে। আসলে বাক্যে এবং কার্য্যে মিলাইয়া বিষয়টি যে কত হাস্যাস্পদ, তাহা আলোচ্য বৈঠকের অব্যবহিত কয়েকদিন পূর্ব্বের মিঃ ট্রুম্যানের এক ঘোষণা হইতেই প্রতিপন্ন হইবে। উক্ত ঘোষণায় ছিল—

যুক্তরাষ্ট্রের রণসম্ভার উৎপাদনের পরিমাণ দ্বিগুণ বর্দ্ধিত করা হইবে। এদিকে মিঃ চার্চ্চিলের নবরচিত প্রতিরক্ষা পরিকল্পনার প্রস্তাবিত ব্যয়বরাদ্দের গুরুভারে বৃটেনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা আজ বিপর্য্যস্তপ্রায়। এই দুইটি পরিকল্পনাকে খাড়া ঢেঁকীর মতো সামনে রাখিয়া বিশ্বযুদ্ধের অসম্ভাব্যতা সম্পর্কে আজ কি ভাবে নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি দেওয়া যাইতে পারে ?

আরও একটি বিষয় এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। সম্মিলিত ব্যবস্থা অবলম্বন কমিটি বাতিল করিয়া দিবার জন্য এবং পৃথিবীতে রেষারেষি হ্রাস ও কোরিয়ার সংগ্রামের অবসান ঘটাইবার জন্য নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠক আহ্বানের যে প্রস্তাব ইতিপূর্ব্বে রাশিয়া কর্ত্তৃক উত্থাপিত হইয়াছিল, রাষ্ট্রপুঞ্জ রাজনৈতিক কমিটি উহা অগ্রাহ্য করেন। রাষ্ট্রপুঞ্জ বাহিনীর জন্য প্রেরিত সৈন্যগণকে শিক্ষাদান ও অস্ত্রসজ্জিত করিবার জন্য সমরবিশারদগণের একটি প্যানেল গঠন করা হইবে বলিয়াও সঙ্গে সঙ্গে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। 'নিরাপত্তা বাহিনী' গঠনের জন্য বৃটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স ও অপর ৮টি রাষ্ট্র কর্ত্তৃক উত্থাপিত একটি প্রস্তাবের জন্য স্বতন্ত্রভাবে ভোট গ্রহণ করা হয়। ইহার বিরুদ্ধে কোনোরূপ মন্তব্যই এ পর্য্যন্ত ট্রুম্যান-চার্চ্চিলের যুক্ত কণ্ঠ হইতে নিঃসৃত হইয়াছে বলিয়া আমরা জানি না। অতএব এ কথা স্বতঃসিদ্ধ যে, যুদ্ধের জন্য যুদ্ধকে জীয়াইয়া রাখিবার জন্যই 'নিরাপত্তা বাহিনী' গঠনে এই দুইজন রাষ্ট্রনায়কের পূর্ণ সমর্থন রহিয়াছে। শান্তি সম্পর্কিত সোভিয়েট-প্রস্তাব লইয়াও এ পর্য্যন্ত তাঁহারা আশানুরূপ মতৈক্যে আসিতে পারেন নাই। সোভিয়েট-প্রস্তাবের মূল বিষয়গুলি হইতেছে : (১) রাষ্ট্রপুঞ্জ সদস্যগণের পক্ষে অতলান্তিক ব্লকে যোগদান ও বিদেশে 'সামরিক ঘাঁটি' রাখা নিষিদ্ধ করিতে হইবে। (২) অবিলম্বে কোরিয়া যুদ্ধের অবসান ঘটাইতে হইবে, দশ দিনের মধ্যে ৩৮ ডিগ্রী অক্ষরেখা হইতে সরিয়া আসিতে হইবে এবং তিন মাসের মধ্যে সকল বিদেশী সৈন্য অপসরণ করিতে হইবে। (৩) আনবিক অস্ত্র ব্যবহার নিষিদ্ধ করিতে হইবে। এই নিষেধাজ্ঞা সর্ত্তসাপেক্ষ হইবে না—নিষেধাজ্ঞা যাহাতে মানিয়া চলা হয়, তজ্জন্য কঠোর আন্তর্জ্জাতিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিতে হইবে ; আনবিক অস্ত্র নিষিদ্ধকরণ এবং আন্তর্জ্জাতিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন, এই দুই কাজই যুগপৎ আরম্ভ হইবে। (৪) নিয়ন্ত্রীকরণ কমিশন আগামী ১লা জুনের পূর্ব্বে আনবিক অস্ত্র নিষিদ্ধকরণ, মজুদ আনবিক অস্ত্রের বিনাশ সাধন ও আন্তর্জ্জাতিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন সম্পর্কে একটি চুক্তিপত্রের খসড়া প্রণয়ন করিবেন। (৫) বৃহৎ পঞ্চশক্তি এক বৎসরের মধ্যে তাহাদের অস্ত্রশস্ত্রের পরিমাণ এক তৃতীয়াংশ হ্রাস করিবেন। (৬) আনবিক অস্ত্র নিষিদ্ধ হইবার ও বৃহৎ শক্তিসমূহের অস্ত্রশস্ত্র এক তৃতীয়াংশ হ্রাস পাইবার এক মাস পরে সকল রাষ্ট্রই তাহাদের অস্ত্রশস্ত্রের হিসাব পেশ করিবে। (৭) আনবিক অস্ত্রের নিষিদ্ধকরণ, অস্ত্রসজ্জা হ্রাস, অস্ত্রশস্ত্রের হিসাব রাখা প্রভৃতি ব্যাপারে তদারক করার জন্য একটি আন্তর্জ্জাতিক প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে হইবে। এই আন্তর্জ্জাতিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠান পর্য্যবেক্ষণ কার্য্য চালাইতে পারিবেন ; কিন্তু কোনো রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীন ব্যাপারে হস্তক্ষেপের অধিকার উহাকে দেওয়া হইবে না।

ইহার উপর মন্তব্য করিতে গিয়া বৃটিশ রাষ্ট্রমন্ত্রী মিঃ লয়েড বলিয়াছেন যে, তিনি এ প্রস্তাবে নতুন কিছুই খুঁজিয়া পাইতেছেন না, এতদ্ভিন্ন দেশরক্ষা প্রস্তুতির জন্য বৃটেনের বিপুল ব্যয় হইলেও (এই প্রস্তাব অনুসরণ করিয়া।) তাঁহারা একে একে নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইতে চাহেন না। একথা বৃটিশেরই মর্ম্মের কথা।

যে সূত্রে চার্চ্চিল-গভর্ণমেন্ট শাসনতন্ত্রের ছিন্ন কন্থাখানি নতুন করিয়া গাঁথিয়া তুলিয়াছেন, ইহা সেই সূত্রেরই বিভিন্ন জটের প্রকাশ। অতএব মিঃ লয়েডের কথা যে মিঃ চার্চ্চিলের কথারই রেকর্ড মাত্র, তাহাতে সংশয় কি! বিবৃতিপ্রসঙ্গে মিঃ লয়েড কেবল সাউণ্ড-বক্সের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছেন মাত্র।

এতৎসত্ত্বেও আমরা বলিব যে, উল্লেখিত সোভিয়েট-প্রস্তাবও যুদ্ধের মূল কারণ উৎপাটন সম্পর্কে পর্য্যাপ্ত নয়। তবু উহা শান্তি সৃষ্টির একটা বড় পথ বটে। আসলে যতদিন না মানুষ চিত্তশুদ্ধির দ্বারা পবিত্র হইতেছে এবং হৃদয়ের পরম স্বাচ্ছন্দ্য দ্বারা একে অপরের প্রতি সৌহার্দ্দ্যবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া বিশ্ব-সংস্কৃতির এক অমৃতলোকে মিলিবার প্রয়াস না পাইতেছে, ততদিন পারস্পরিক বিদ্বেষ এবং বিদ্বেষজনিত পারস্পরিক দেশগুলির মধ্যে যুদ্ধপ্রস্তুতি বা যুদ্ধাকাঙ্ক্ষা নিবৃত্ত হইতে পারে না। সেই নিবৃত্তি তথা নির্ব্বানের পথ একদা মহা ভারত সমগ্র বিশ্বকে দেখাইয়াছে, দেখাইয়া বলিয়াছে—'সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সংবো মানাংসি জানতাম' : একত্র বিহার করো, একত্রে বাক্য উচ্চারণ করো এবং নিজের মধ্যে সকলকে লইয়া সুখী হও।—বলিয়াছে :

'যস্তু সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানু পশ্যতি,
সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং ন তত বিজুগুপ্সতে।'

অর্থাৎ যিনি সর্ব্বভূতকে নিজের মধ্যে এবং নিজেকে সর্ব্বভূতের মধ্যে দেখেন, তাহার কখনও বিনাশ নাই। যাহাতে বিশ্ব এই বিনষ্টি হইতে মহৎ পরিত্রাণের পথে উত্তীর্ণ হইতে পারে, সেই পথ প্রাচীন মহা ভারতীয় আদর্শে আজ আবার বিশ্বকে গ্রহণ করিতে হইবে। একথা আমরা প্রতি বারই বলিয়া আসিয়াছি। চুক্তির দ্বারা, পার্লামেন্টারী শাসনের ডকুমেন্ট্ চোখের সাম্নে মেলিয়া ধরিয়া সেই ডকুমেন্টারী প্রশেজে যে শান্তি আসিতে পারে না, এ কথা এ পর্য্যন্ত পৃথিবীর বড় বড় চুক্তি বা 'ডকুমেন্টারী এ্যাক্ট'গুলি প্রমাণ করিয়াছে। আর একটি অনুরূপ ডকুমেন্টের প্রমাণ স্পষ্ট হইয়া দেখা দিতে চলিয়াছে আলোচ্য ট্রুম্যান-চার্চ্চিল যৌথ-ঘোষণা সম্বলিত ঐতিহাসিক বৈঠকে।

হোয়াইট্ হাউসের প্রেস-সেক্রেটারী মিঃ জোসেফ শর্ট্ এই বৈঠকের গুরুত্ব ও তাৎপর্য্য সম্পর্কে ভাবগদগদ কণ্ঠে মন্তব্য করিয়াছেন : 'It is considerably more than a social event,' অর্থাৎ সাধারণ সামাজিক ঘটনাবলী হইতে এই বৈঠক বহুগুণ অধিক গুরুত্বপূর্ণ। ইঙ্গ-মার্কিন সূত্রে বৈঠকটি গুরুত্বপূর্ণ ভিন্ন কি! পররাষ্ট্রনীতির দিক হইতে যদিও বৃটিশ ও মার্কিনের মূলগত কোনও পার্থক্য নাই, তথাপি আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে যে সর্ব্বদাই তাহারা সর্ব্বত্র পারস্পরিক সহযোগিতা রক্ষা করিয়া চলিতে পারিয়াছে, তাহা বলিলে ভুল বলা হইবে। যে সমস্ত সমস্যা সম্পর্কে এই উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে স্বার্থসংঘাত ও মতদ্বৈতা অন্তঃসলীলা ফল্গুর মতো তলে তলে প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে, তাহার মূলগত বিষয়গুলি হইতেছে 'পশ্চিম জার্ম্মানীর সৈন্যদলসহ জেনারেল আইসেন হাওয়ারের নেতৃত্বে পশ্চিম ইউরোপীয় বাহিনী গঠন, পারস্যে ইঙ্গ-ইরাণ তৈল বিরোধ, মিশরের রাজা ফারুককে সুদানের রাজারূপে স্বীকার করার প্রশ্ন, কম্যুনিষ্ট চীনের সহিত বৃটেনের সম্পর্ক ও ব্যবসা-বাণিজ্যগত স্বার্থ এবং কোরিয়া যুদ্ধবিরতি প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইলে কম্যুনিষ্ট চীনের বিরুদ্ধে যে সামগ্রিক সংগ্রাম সুরু করিবার প্রস্তাব মার্কিন কর্ত্তৃক উত্থাপিত

হইয়াছে, তদ্বিষয়ে বৃটেনের অভিমত ও অংশগ্রহণ, সর্ব্বশেষে কম্যুনিষ্ট চীনের সহিত ব্যবসা-বাণিজ্যগত সম্পর্ক রক্ষা ব্যাপারে জাপানের মনোভাব ও অধিকার।'

সোভিয়েট-প্রভাবমুক্ত বিশ্বের রক্ষা সম্পর্কে বৃটেন ও মার্কিনের পক্ষে আত্মস্বার্থের খাতিরে গুরু-দায়িত্বের বোঝা কম নয়, কিন্তু তাহার পূর্ণ সার্থকতার অন্তরায় হইতেছে উপরোক্ত বিষয়গুলি। ঐগুলির পূর্ণ সমাধানের উপরেই নির্ভর করিতেছে ইঙ্গ-মার্কিন যুক্ত ফ্রন্টের বিজয়-দুন্দুভি-নিনাদ। কিন্তু আন্তর্জ্জাতিক ব্যাপারে তাহারইবা সুষ্ঠু প্রকাশ কোথায়? মার্কিন অবশ্য তাহার ডলারের জাল যদৃচ্ছা বিস্তার করিয়া আত্মকর্ত্তৃত্বকে খাড়া ঢেঁকীর মতো সর্ব্বত্র উঁচাইয়া ধরিবার প্রচেষ্টায় কম যত্নশীল নয়, কিন্তু বৃটিশ তাহার দেশরক্ষার ব্যাপারে আজ এক চরম সঙ্কট-মুহূর্ত্তে আসিয়া উপস্থিত হইলেও বিনা সর্ত্তে যে মার্কিনের হাতে নিজেকে ছাড়িয়া দিবে, একথা ভুল। গত মহাযুদ্ধের সময় মিঃ চার্চ্চিল দীপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছিলেন, 'আমি বৃটিশ-সাম্রাজ্যতরী ডুবাইয়া দিবার জন্য ইহার হাল ধরি নাই।' বস্তুতঃ তিনি তাঁহার বাক্যের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছিলেন। এবারও নিশ্চয়ই আত্মমর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ করিবার জন্য তিনি প্রধানমন্ত্রীত্ব গ্রহণ করেন নাই। অতএব বৃটিশ-ঐতিহ্য ও মার্কিনী ডলার-সংস্কৃতির আশু যে একটা 'টাগ-অব-ওয়ার'-এর স্বতস্ফূর্ত্ত বিকাশ ঘটিতে চলিয়াছে, ইহাকে আজ আর ধামা চাপা দিয়া রাখিবার উপায় নাই। বস্তুতঃ তাঁহাদের এই যুক্ত ঘোষণা হইতে এই সিদ্ধান্তেই আসা যাইতে পারে যে, ট্রুম্যান-চার্চ্চিল-বৈঠকে তাঁহাদের পূর্ব্বপ্রতিষ্ঠিত মতৈক্যেরই পুনঃপ্রতিষ্ঠাকল্পে অমীমাংসিত জটিল সমস্যাগুলিকে সাধ্যমত সরাইয়া রাখিবার একটা দূরপনেয় প্রচেষ্টাই বিশেষ ভাবে জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে। নিরবচ্ছিন্ন বিশ্বশান্তির স্বার্থে তাঁহাদের উচ্চকিত বক্তৃতা নিতান্তই বক্তৃতাসুলভ শ্লোগান মাত্র, তাহা বিশ্বমানব-কল্যাণের আশাবাদে কিছুমাত্র কাজে আসে নাই, বরং তাহার উল্টা ফলই প্রসব করিয়াছে।

ডেভার্স্ পরিকল্পনা

গত ২২শে জানুয়ারী প্যারিসে জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের অসামরিকীকরণের জন্য প্রথম 'ডেভার্স পরিকল্পনা' প্রকাশিত হয়। তৎপূর্ব্বেই ডাঃ ফ্রাঙ্ক্ গ্রাহামের দ্বিতীয় পরিকল্পনা তাহার বিস্তৃত অনুশীলন সহ প্রকাশিত হইয়াছে। ডেভার্স্ পরিকল্পনার প্রকাশ ঘটিয়াছে ডাঃ ফ্রাঙ্ক্ গ্রাহামেরই উক্ত দ্বিতীয় পরিকল্পনা সম্বলিত রিপোর্টের ষষ্ঠ পরিশিষ্ট হিসাবে। মজার ব্যাপার এই যে, ২৯শে নভেম্বর ডাঃ ফ্রাঙ্ক্ গ্রাহাম যে পরিকল্পনাটি ইঁহাদের হাতে দিয়াছিলেন, তাহা প্রকাশিত হওয়া সত্বেও উহার সহিত সাম্প্রতিক ডেভার্স্ পরিকল্পনার কোনোরূপ মিল নাই। এবং আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ভারত সরকার কিম্বা ভারতের প্রতিনিধি শ্রী বি. এন্. রাও ও তাঁহার সামরিক উপদেষ্টাদিগকে প্যারিসে আলোচনাকালে এ সম্বন্ধে একেবারেই কিছু জানানো হয় নাই। যুদ্ধ বিরতি রেখার উভয় পার্শ্বে শুধু সৈন্য অবস্থানের বিষয় নহে, অন্যান্য বিষয়েও ডেভার্স্ পরিকল্পনার গুরুতর পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করা যাইতেছে। গিলগিট স্কাউট্ সংক্রান্ত বিধান প্রভৃতি কয়েকটি নূতন বিষয়ও এই পরিকল্পনায় সংযোজিত হইয়াছে। এখানে পরিকল্পনাটির অংশবিশেষের বিবরণ উদ্ধৃত করা গেল:

(১) ভারত ও পাকিস্থানের প্রতিনিধিদের মধ্যে প্রধান প্রধান বিষয়ে চুক্তির পর ত্রিশ দিন চরম সীমা বলিয়া পরিগণিত হইবে।

(২) (ক) যুদ্ধবিরতি চুক্তির সর্ত্ত যাহাতে লঙ্ঘিত না হয়, তাহা দেখিবার জন্য শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষাকল্পে স্থানীয় সরকারসমূহকে সাহায্যের জন্য এবং সৈন্যবাহিনী সমাবেশের জন্য রাষ্ট্রপুঞ্জের পর্য্যবেক্ষকবাহিনীর সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি করিতে হইবে এবং জীপ, হেলিকোপ্টার ও যোগাযোগ ব্যবস্থার অন্যান্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম দিতে হইবে।

(খ) পশ্চিম দিক হইতে বিনা অনুমতিতে যাহাতে কেহ প্রবেশ না করিতে পারে, তজ্জন্য পাকিস্থানকে আজাদ-কাশ্মীর এলাকার পশ্চিম সীমান্ত দিয়া প্রবেশ বন্ধ রাখিতে হইবে। বাছাই করা নিয়মিত বাহিনীর দ্বারা এই কাজ করিতে হইবে।

(গ) তিন ব্যাটেলিয়ান ছাড়া সমস্ত নিয়মিত পাকিস্থানী সৈন্য অপসরণ করিতে হইবে।

(ঘ) আজাদ-কাশ্মীর সশস্ত্র বাহিনীকে কমাইয়া চার ব্যাটেলিয়ান করিতে হইবে এবং ভারতের নিয়মিত সৈন্যদলের সংখ্যা হ্রাস করিয়া এক ডিভিসন করিতে হইবে।

(ঙ) নিম্নলিখিতভাবে আজাদ এলাকায় ৪ হাজার অসামরিক ব্যক্তিকে লইয়া একটি পুলিশ-বাহিনী গঠন করিতে হইবে:

(ক) ভাঙ্গিয়া দেওয়া আজাদবাহিনীর পূর্ব্বতন লোকজনের মধ্য হইতে ১২০০ জনকে সশস্ত্র সৈন্য হিসাবে বিশেষভাবে বাছাই করিতে হইবে। (খ) কখনও আজাদবাহিনীতে কাজ করে নাই, এমন ১২০০ ব্যক্তিকে সশস্ত্র সৈন্য হিসাবে বিশেষভাবে বাছাই করিতে হইবে। কোনো পাকিস্থানী বা পাক্-সশস্ত্র বাহিনীর ভূতপূর্ব্ব সৈন্যকে ইহাতে গ্রহণ করা হইবে না। (গ) ভাঙ্গিয়া দেওয়া আজাদ বাহিনীর ভূতপূর্ব্ব লোকজনের মধ্য হইতে ৮০০ নিরস্ত্র অসামরিক ব্যক্তিকে বিশেষভাবে বাছাই করিতে হইবে। (ঘ) কখনই আজাদ বাহিনীতে যোগদান করে নাই, এরূপ ৮ শত নিরস্ত্র অসামরিক ব্যক্তিকে বিশেষভাবে বাছাই করিতে হইবে। কোনো পাকিস্থানীকে অথবা পাক্-সশস্ত্র বাহিনীর ভূতপূর্ব্ব সৈন্যকে উহাতে গ্রহণ করা হইবে না।

এ সম্পর্কে একদিকে যেমন ভারত সরকারের প্রেসনোটে বিস্ময় প্রকাশ করা হইয়াছে, অন্যদিকে তেম্‌নি পাক্-পররাষ্ট্র মন্ত্রী মিঃ জাফরুল্লা খাঁও কম উষ্মার সঙ্গে তারস্বরে ইহার নিকুচি করেন নাই। জম্মু ও কাশ্মীরের প্রধান মন্ত্রী শেখ আব্দুল্লা স্পষ্টই বলিয়াছেন: 'আমরা ইহা তো স্বীকার করিয়া লইতে পারিই না, বিশেষতঃ আমরা ডেভাস্‌´ পরিকল্পনা স্পর্শও করিব না।' অতএব কাহাদের জন্য এই পরিকল্পনা, তাহা বিবেচ্য বিষয়।

বিষয়টি এখন যে অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে দেখা যায়—'মায় পোড়ে না, পোড়ে মাসীর, কেঁদে মরে পাড়াপড়শী।' কাশ্মীর-গণপরিষদ গঠিত হইবার পর এখনও এইরূপ তৃতীয় পক্ষীয় টালবাহনা বরদাস্ত করা যথার্থই ধৈর্য্যের অপেক্ষা রাখে। দ্বিতীয়তঃ অস্ত্র হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে অস্ত্র-সংযোজনার ইঙ্গিতও পরিকল্পনাগুলিতে নিতান্তই নেপথ্যচারণা করিতেছে না। বিশ্বশান্তি পরিকল্পনার

জন্য রাষ্ট্রপুঞ্জের যে সমবেত চেষ্টা চলিয়াছে, তাহাতে কাশ্মীর সংক্রান্ত এই পরিকল্পনাগুলি কতখানি সুখকর ও রুচিকর, তাহা চিন্তা করিবার বিষয়। অবস্থা পারম্পর্য্যে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, পরিকল্পনাটি যত আলোড়নেরই সৃষ্টি করুক না কেন, শেষ পর্য্যন্ত ইহা কোনই কাজে আসিবে না। শেখ আব্দুল্লার উক্তির মধ্যেই তাহার প্রত্যক্ষ ইঙ্গিত রহিয়াছে।

নেপাল-বিদ্রোহ

ক্ষমতা হস্তগতের প্রয়াস লইয়া সম্প্রতি আবার নেপালে যুদ্ধাগ্নি দেখা গেল। ১৯৫০ সালের বিদ্রোহের সময়ে যে 'রক্ষী-দল' গঠন করা হইয়াছিল, এবারও তাহারা সমভাবেই সক্রিয়। এই বিদ্রোহী অভ্যুত্থান যে নিতান্তই আকস্মিক ঘটনা, তাহা নয়। নেপালী কংগ্রেস যখন দেশের শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করিবার জন্য মিলিত মন্ত্রিসভা গঠন করিল, তাহারই একটি অসন্তুষ্ট অংশ কিন্তু স্বাভাবিক চিত্তে এই ব্যবস্থাকে স্বীকার করিয়া লইতে পারিল না। তাহাদেরই যে অন্তর্নিহিত বিক্ষোভ এতদিন তিল তিল করিয়া জ্বলিতেছিল, এবারে সুযোগ পাইয়া তাহা পুনরায় বিদ্রোহী অভ্যুত্থানের আকারে বিসুভিয়াসের মতো ফাটিয়া পড়িল। কিন্তু বার বার কেন এই বিদ্রোহের প্রয়াস—ইহা জানিতে হইলে নেপাল সম্পর্কে কিছুটা ইতিহাস জানা প্রয়োজন।

আসলে নেপাল দেশটা রাজারও নয়, প্রজাদেরও নয়, মাত্র ৮০টি পরিবারের। নেপালের যত ভূমি, তার শতকরা ৯০ ভাগের মালিক এই ৮০টি পরিবার। নেপালের যত প্রাকৃত সম্পদ, যত রাজকীয় পদ, যত ব্যবসা ইত্যাদি—তাহার একচেটিয়া কর্ত্তৃত্ব শুধু এই আশীটি পরিবারের। নেপালের যে অট্টালিকা আর রাজপথসমূহ—তাহার সবকিছুতেই এই ৮০টি পরিবারভুক্ত মানুষ ছাড়া আর কাহারও পা দেওয়ার অধিকার নাই। যে কয়টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে, সেখানে প্রবেশাধিকার পায় শুধু এই ৮০টি পরিবারের লোকেরা। অথচ প্রজাদের কেহ যদি নিজেদের জন্য কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়িতে চায়, তবে সেই অপরাধের শাস্তি স্বরূপ তাহাকে কারারুদ্ধ করা হয়। এই ৮০টি পরিবারের বিরুদ্ধে কেহ যদি 'টু'-শব্দটি উচ্চারণ করে, তবে সেই হতভাগ্যের ফাঁসি যাইতেও আটকায় না। এমন কি এইরূপ হঠকারিতা যদি সেখানে রাজাধিরাজও স্বয়ং করিয়া বসেন, তাহা হইলেও সম্ভবতঃ তাঁহাকে লইয়া টানা-হেঁচড়া করিতে বাধে না। নেপালের আভ্যন্তরীণ স্বরূপ হইতেছে প্রায় এইরূপ।

আধুনিক পৃথিবীতে এই রাষ্ট্রিয় স্বরূপকে নিঃসন্দেহেই অনন্যসাধারণ বলিতে হইবে। কিন্তু ঘরের পাশে থাকিয়াও আমরা ভারতবাসীরা নেপাল রাজ্যের এই অসাধারণ সত্তার কথা কোনোদিন জানিতে পারি নাই, জানিতে পারি নাই যে—গত প্রায় কুড়ি বৎসর কাল হইতে নেপালী জনতার একটা অনুবেক্ষণীয় অংশ ভারতীয় কংগ্রেসেরই আদর্শে স্বদেশের এই অসাধারণ নারকীয়তা অপনীত করার জন্য শুধু সংগ্রাম করিয়াছে আর প্রাণ দিয়াছে। বিষয়টির সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটিল একটা অসাধারণ ঘটনারই সূত্রে। নেপালের অধিপতি স্বয়ং সেদিন এই ৮০টি পরিবারের নাগপাশ হইতে পলায়ন করিয়া আমাদের ভারত সরকারের কাছে আশ্রয় গ্রহণ করেন। মাত্র বৎসরাধিককালের ঘটনা এটা।

কিন্তু আধুনিক পৃথিবীর ইতিহাসে নেপাল-রাষ্ট্রের এই যে অনন্যসাধারণ বৈষম্য-স্বরূপ, এই স্বরূপ শেষ পর্য্যন্ত অটুটই থাকিয়া গেল। গত বৎসর ঠিক এই সময়ের স্বল্পকাল পূর্ব্বে সীমাহীন অন্ধকার স্তূপের মধ্যে এককোঁটা আলোকরশ্মির মতো একটা মহনীয় গণচেষ্টা মাথা তুলিবার চেষ্টা করিয়াছিল; নেপালের এই অসাধারণ রাষ্ট্রিয় বৈষম্যকে দূর করিবার জন্য কিন্তু অগণ্য প্রতিকূলতার মধ্যে এই প্রচেষ্টা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইয়া গিয়াছিল। নেপালের রাণাচক্রকে ভূমিসাৎ করার জন্য আজও যাহারা সর্ব্বস্ব বিপন্ন করিয়া নেপালের রাজকীয় বাহিনীর সহিত সংগ্রামপর, রাণাচক্রের ক্ষমতার তুলনায় তাহাদের শক্তি নিতান্তই সামান্য, সন্দেহ নাই। কিন্তু সামান্য হইলেও মনোবলে তাহারা দৃঢ়। এই সামান্য শক্তিই হয়ত অসামান্য হইয়া উঠিবে একদিন।

সাম্প্রতিক ঘটনার সঙ্গে দুইজন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তির নাম বিশেষ ভাবে জড়িত। একজন নেপালের প্রাক্তন মন্ত্রী মিঃ বি, পি, কৈরালা, অন্যজন ডাক্তার কে, আই, সিং। মতবৈষম্যের জন্যই মিঃ বি, পি, কৈরালা বর্ত্তমান মন্ত্রিসভায় আসন গ্রহণ না করিয়া বাহির হইয়া আসেন এবং উপদলীয় চক্রান্ত তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়াই রচিত হইতে থাকে। যে রক্ষীদল বিদ্রোহ করিয়াছিল, তাহারাই অবরুদ্ধ ডাক্তার সিংকে মুক্ত করিয়া আনে। জনৈক সাংবাদিকের সঙ্গে সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে ডাক্তার সিং বিদ্রোহীদলের দাবীর যে ফিরিস্তি প্রকাশ করেন, তাহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। মোটামুটি বিদ্রোহীদলের দাবী হইতেছে—বর্ত্তমান গভর্ণমেণ্ট ভাঙ্গিয়া দিয়া তাহার স্থলে এক সর্ব্বদলীয় গভর্ণমেণ্ট গঠন করিতে হইবে; সর্ব্বদলীয় সরকার অর্থে মন্ত্রীসভার মধ্যে কম্যুনিষ্ট পার্টিকে গ্রহণ করা যেমন অবশ্য কর্ত্তব্য, প্রতিক্রিয়াশীল গোর্খা দলকে বাদ দেওয়া তেম্নি বাধ্যতামুলক। ডাঃ সিং বলেন, বিদ্রোহীরা শোণিতস্নান কামনা করে না সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া নেপালাধীশের পক্ষে দাবী এড়াইয়া চলিবার যদি কোনোরূপ চেষ্টা হয়, তাহা হইলে নেপালকে দ্বিতীয় কোরিয়ায় পরিণত করিতে তাঁহারা দ্বিধাবোধ করিবেন না।

ডাঃ সিংহের এই উক্তি সর্ব্বৈব সমর্থনযোগ্য নয়। স্বদেশের প্রতি মমতা থাকিলে নিশ্চয়ই তিনি প্রয়োজনের খাতিরে নেপালকে কোরিয়ার অনুরূপ যুদ্ধঘাঁটিতে পরিণত করার বাসনা ব্যক্ত করিতে পারিতেন না। কম্যুনিষ্ট প্রবেশের কথা শুধু আজ নয়, যেদিন হইতে তিব্বত সমস্যা কঠিন আকারে দেখা দিয়াছে, সেদিন হইতে নেপাল সম্পর্কেও অনুরূপ একটি আভাস স্বাভাবিক ভাবেই জাগিয়া উঠিয়াছে।

পরবর্ত্তী ঘোষণায় অবশ্য বলা হইয়াছে—নেপালাধীশ ত্রিভুবন নেপালে আপৎকালীন অবস্থা ঘোষণা করিয়া শাসনকার্য্য পরিচালনের ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমাতৃকা প্রসাদ কৈরালার হস্তে সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্ব অর্পন করিয়াছেন। সম্প্রতি একটি স্থিতাবস্থার মধ্যে নেপালের আবহাওয়া সীমাবদ্ধ থাকিলেও এ কথা জোর করিয়া বলা যায় না যে, আবার যে-কোনো অতর্কিত মুহূর্ত্তেই সুপ্ত বিদ্রোহ পুনরায় মাথা চাড়া দিয়া উঠিবে না! যাহাতে সেই বিদ্রোহাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়া নেপাল ধ্বংসের পথে অগ্রসর না হয়, তাহার দায়িত্ব আজ প্রধানতঃ রাণাচক্রের। পৃথিবীর স্বাভাবিক ঘটনাবলীর দিকে লক্ষ্য রাখিয়া আজ যদি তাঁহারা প্রজাসাধারণের ন্যায্য প্রয়োজনীয়তার প্রতি সচেতন হইয়া দেশকে নতুন আলোকে উজ্জীবিত করিয়া না

তোলেন, তবে যে নিজেদের রাজকীয় দম্ভের কাছে একদিন নিজেরাই পরাভূত হইবেন, ঐতিহাসিক বস্তুবাদের দিক হইতে তাহা একরকম অবশ্যম্ভাবিরূপে সত্য।

ভারত ও ফোর্ড ফাউণ্ডেশন চুক্তি

সম্প্রতি ভারত সরকার ও ফোর্ড ফাউণ্ডেশনের মধ্যে এক চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে। এই চুক্তি অনুসারে ফোর্ড ফাউণ্ডেশন ভারতকে তাহার পল্লী উন্নয়ন পরিকল্পনায় আর্থিক সাহায্য করিবে। ভারত সরকারের পক্ষ হইতে অর্থমন্ত্রী শ্রী সি. ডি. দেশমুখ এবং ফোর্ড ফাউণ্ডেশনের ডিরেক্টর মিঃ পল. জি. হফ্‌ম্যান চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেন। বিষয়টির যোগাযোগের মূলে রহিয়াছেন—ভারতস্থিত মার্কিন রাষ্ট্রদূত মিঃ চেষ্টার বোল্‌স্‌।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় পল্লী উন্নয়নের যে ব্যাপক কর্ম্মসূচী করা হইয়াছে, তাহারই একটি অংশ সম্পর্কে এই চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে। ফোর্ড ফাউণ্ডেশনের প্রতিনিধি ডাঃ ডগ্‌লাস এনস্‌মিঙ্গার শীঘ্রই এ সম্পর্কে পাকাপাকি আলোচনার জন্য ভারতে আসিবেন বলিয়া আশা করা যাইতেছে। যে সমস্ত রাজ্যে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পরিকল্পনার কেন্দ্রসমূহ প্রতিষ্ঠিত হইবে, তাহা হইতেছে—পাতিয়ালা ও পূর্ব্ব-পাঞ্জাব রাজ্য ইউনিয়ান, পাঞ্জাব, বিহার, উড়িষ্যা, আসাম, মধ্যপ্রদেশ, হায়দরাবাদ, হিমাচল প্রদেশ, বিন্ধ্য প্রদেশ ও ভূপাল। ভারত সরকার ফোর্ড ফাউণ্ডেশনের আর্থিক সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া পাঁচটি স্থানে মূলকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করিবেন। এই কেন্দ্রগুলিতে লোকেরা শিক্ষালাভ করিয়া বিভিন্ন রাজ্যের কৃষি উন্নয়ন পদ্ধতি প্রয়োগ ও তত্ত্বাবধান করিবেন। কথা চলিতেছে বোম্বাইয়ের 'আনন্দ' নামক স্থানে প্রথম শিক্ষাকেন্দ্র খোলা হইবে। অন্যান্য কেন্দ্রগুলি উত্তর প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ ও মহীশূরে প্রতিষ্ঠিত হইবার কথা চলিতেছে। এইসব কেন্দ্রে কৃষি উন্নয়ন, উন্নত ধরণের কৃষি-পদ্ধতি, পশু পালন, জনস্বাস্থ্য, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও প্রাপ্তবয়স্কদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইবে।

অর্থানুকূল্যে ব্যবস্থার দিক হইতে হয়ত শেষ পর্য্যন্ত কিছুই বাকী থাকিবে না, কিন্তু যে পরিমাণে ও যে পদ্ধতিতে মার্কিন সাহায্য ক্রমেই ভারতকে গ্রাস করিয়া বসিতেছে, তাহাতে এ আশঙ্কা করা হয়ত মিথ্যা নয় যে, ভারত অবশেষে মার্কিনী তাবেদারের অধীনে তাঁহাদের হাতের খেলার পুতুলে পরিণত হইয়া অকুল সমুদ্রে হাহাকার করিবে। এ সাবধান আমরা দীর্ঘকাল হইতেই ভারত সরকারকে করিয়া আসিতেছি। তাঁহারা ১৯৫২ সাল হইতে খাদ্যশস্য সম্পর্কে দেশকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করিবেন বলিয়া ইতিপূর্ব্বে ঘোষণা করিয়াছিলেন। কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা করিতে পারেন নাই। বরং মার্কিন প্রভৃতি দেশের কাছে পুনরায় ভারত সরকারকে হাত পাতিতে হইয়াছে। এই ভাবেই স্বাধীনতার এবং স্বায়ত্ত্ব শাসিত রাষ্ট্রের প্রথম পাঁচ বৎসর অতিক্রান্ত হইতে চলিয়াছে। এখনও অর্থনৈতিক দিক হইতে ভারত ভিক্ষার ঝুলি বহিয়া চলিয়াছে। মার্কিনী ডলারের জালে আবদ্ধ হওয়া মানে নিজের ব্যক্তিসত্তাকে খর্ব্ব করা। উপরন্তু আবার এই ফোর্ড ফাউণ্ডেশন। আমেরিকা চাহিতেছে ডলারের সাহায্যে বিভিন্ন দেশকে নিজের ক্ষমতার অধীনে টানিয়া রুশ-বিরুদ্ধ শক্তিকে দৃঢ় করিয়া তুলিতে ও ক্রমান্বয়ে পৃথিবীর সর্ব্বময় কর্তৃত্ব নিজের হাতে গ্রহণ করিতে। উত্তর এ্যাট্‌লাণ্টিক চুক্তি হইতে সুরু করিয়া নানা চুক্তির মধ্যেই তাহার পরিচয়

বিশ্বের চোখে স্পষ্টভাবে ধরা দিয়াছে। ইতিহাসের ধারা যখন এইভাবে গড়াইয়া চলিয়াছে, তখন ফোর্ড ফাউণ্ডেশনের সঙ্গে অনুরূপ সাহায্যবাচকচুক্তি ভবিষ্যতে ভারতের পক্ষে কতখানি শুভ হইবে, এ সম্বন্ধে ভারত সরকারকে আমরা চিন্তা করিয়া দেখিতে অনুরোধ করি।

ভারতের দ্বিতীয় বার্ষিক প্রজাতন্ত্র উৎসব

দেখিতে দেখিতে স্বাধীন প্রজাতন্ত্রী ভারতের আর একটি বৎসর অতিক্রান্ত হইতে চলিল। ২৬শে জানুয়ারী ভারতের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দিন। ১৯৫০ সালের এই পুণ্য ও পবিত্র দিনেই ভারতে স্বাধীন প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বায়ত্ত-শাসনের দিক হইতে ১৫ই আগষ্ট যেমন ভাস্বর রশ্মিতে দেদীপ্যমান হইয়া আছে, প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দিক হইতেও তেম্‌নি ২৬শে জানুয়ারী উজ্জ্বল ভানুর মতো শাশ্বত হইয়া রহিল। ১৯৩০ সালের ২৬শে জানুয়ারী পাঞ্জাবে যে প্রস্তাব অঙ্কুরিত হইয়াছিল, নানা বিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া শাসন ক্ষমতা অধিকারের সঙ্গে ১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারী তাহা পূর্ণতা লাভ করে এবং ১৫ই আগষ্টের ন্যায় এই দিনটিও জাতীয় উৎসবের দিন হিসাবে ধার্য্য হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, দেশের আপামর সর্ব্বসাধারণ সুস্থ হৃদয়ের স্বাভাবিক আনন্দের সঙ্গে অদ্যাবধি এই উৎসবে সমবেত ভাবে আসিয়া যোগ দিতে পারে নাই। ইহার পিছনে যে কারণ না রহিয়াছে তাহা নয়। প্রথমতঃ, বহু দুঃখ, বহু লাঞ্ছনা, কারাবরণ ও রক্তপাতের মধ্য দিয়া বহু তপস্যার পুরস্কার স্বরূপ যে স্বাধীনতা দেশে আসিল, তাহা নামে স্বাধীনতা হইলেও স্বাধীনতার পূর্ণ রূপ লইয়া আসিয়া দেশবাসীর কাছে ধরা দিল না; দ্বিতীয়তঃ, স্বাধীনতার অনিবার্য্য ফলস্বরূপ দেশ বিভাগের জন্য লক্ষ লক্ষ মানুষ উদ্বাস্তু হইয়া কেহ বা উদ্বন্ধনে প্রাণ বিসর্জ্জন দিল, কেহ বা ভীতত্রস্ত পলাতক আসামীর মতো স্বাধীন সার্ব্বভৌম ভারতের নানা প্রদেশে ছিট্‌কাইয়া পড়িয়া কোনোভাবে দিনগত পাপক্ষয় করিতে বাধ্য হইল; তৃতীয়তঃ, যাঁহারা স্বেচ্ছায় সুযোগ লাভ করিয়া দেশের শাসনভার নিজেদের হাতে গ্রহণ করিলেন, দেশের মানুষের সুখ-দুঃখের প্রয়োজনে তাঁহাদের অনেকেই কার্য্যতঃ বড়বেশী কাজে আসিতে পারিলেন না। ফলে একদিকে যেমন দেশের হাহাকার উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিল, অন্যদিকে তেম্‌নি শাসনকার্য্যের অপটুতায় দেশের অর্থ দেশের মানুষের নিত্যপ্রয়োজনে বড় বেশী আসিয়া যুক্ত হইতে পারিল না। দেশ যেখানে অন্ন-বস্ত্রের কাঙাল, সেখানে স্বাধীনতা বা প্রজাতন্ত্র উৎসবের আনন্দ দেশের মানুষের চিত্তে আসিয়া সাড়া জাগাইবে কেমন করিয়া?

অবশ্য খুশী হইবার মতো আরও একটি দিক আছে। প্রাচীন ইতিহাসে অশোকের সময়ে, সমুদ্র গুপ্তের সময়ে, ঔরঙ্গজেবের সময়ে, সেন-পাল ও বর্ম্ম রাজাদের সময়ে অবিভক্ত ভারতের চিত্র আমরা দেখিয়াছি। কিন্তু অবিভক্ত হিসাবে কোথাও ভারত পূর্ণাঙ্গ ছিল না। ইংরেজ আমলে খণ্ড-ছিন্ন-বিক্ষিপ্ত আকারে ভারত আরও নানা ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িল। তৎপূর্ব্বেই মারাঠা অভ্যুত্থানকালে শিবাজীর প্রচেষ্টা ছিল সমগ্র ভারতকে একসূত্রে গাঁথিয়া তুলিবার, কিন্তু দুঃখের বিষয়, সারা জীবনের চেষ্টার দ্বারাও তিনি তাহা সম্ভব করিয়া যাইতে পারেন নাই। ইংরাজ আসিল দুরপনের 'ডিভাইড্ এ্যাণ্ড্ রুল' প্রথার ভিত্তিতে ভারতকে আরও নানাভাগে বিচ্ছিন্ন করিয়া। সেখানে দেখিতে পাই স্বতন্ত্র দেশীয় রাজ্যই ন্যূনাধিক

৫৯৩টি ও একটি বৃটিশ রাজ্য। ভারতের স্বোপার্জ্জিত স্বাধীনতার ফলে সেই ৫৯৩টি দেশীয় রাজ্যের অবসান হইয়া ভারতবর্ষ এক অখণ্ড বিশাল মহাদেশে পরিণত হইয়াছে। ইহা কম সৌভাগ্যের কথা নয়।

মুষ্টিমেয় যে কয়টি উদ্যোগী প্রতিষ্ঠান বা সর্ব্বসাধারণের যাঁহারা ২৬শে জানুয়ারীর উৎসব পালন করেন, সেই উৎসবের মূলধারা দেখা যায় তিনটি, যথা—(ক) সঙ্কল্প গ্রহণ, (খ) নিজ গৃহে বা প্রতিষ্ঠানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন এবং (গ) সূত্রযজ্ঞে যোগদান। তৎসহ বড়জোর আলোকসজ্জায় লরিসহ ঢোল ও করতাল বাজাইয়া নগর প্রদক্ষিণ। কিন্তু ইহাই কি প্রজাতন্ত্র উৎসব দিবসের মূল স্বার্থক অভিব্যক্তি? আসলে সমাজে যাহারা বাস করে, পরস্পরের সুখ-দুঃখ, কল্যাণ-অকল্যাণ, মঙ্গল-অমঙ্গলের দায়িত্ব সেখানে তাহাদের প্রত্যেকের। স্বায়ত্ব-শাসিত ভারতের সাধারণতন্ত্রের নাগরিক হিসাবে সাধারণতন্ত্রের প্রতি আনুগত্যের সঙ্কল্প গ্রহণই এই দিনে যথেষ্ঠ নয়। কাজের দ্বারা পরিচয় দিতে হইবে প্রজাতন্ত্রী ভারতকে ভালোবাসিবার, ভারতের মাটি ও ভারতের প্রত্যেকটি মানুষকে ভালোবাসিবার, দেশের মানুষের প্রয়োজন মিটাইয়া ভারতের মাটিকে শস্যশ্যামল করার ও ভারতের মানুষকে মর্য্যাদার উচ্চশিখরে প্রতিষ্ঠিত করার কার্য্যকরী পরিচয় ও দায়িত্ব স্খালনের মধ্যেই রহিয়াছে সত্যকারের উৎসব উদ্‌যাপনের সার্থকতা।—গান্ধীজী বার বার এই দিকেই মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। কিন্তু হা হতোস্মি। দেশের চৈতন্য তবুও অন্ধকার নিশিগর্ভেই নিমজ্জিত রহিল। উপরন্তু সেই অন্ধকারের গর্ত্ত হইতে এমন কতকগুলি দানব বাহির হইয়া আসিল, যাহারা মানুষের ক্ষুধার খাদ্য লইয়া কালোবাজারে ছিনিমিনি খেলিল. দেশ-বিভাগের সুযোগ লইয়া শরণার্থীদের জীবনে বিভীষিকার সৃষ্টি করিয়া তুলিল এবং গোটা সমাজটাকে পাপসিক্ত করিয়া তুলিতে পর্য্যন্ত দ্বিধা বা সঙ্কোচ বোধ করিল না। গভর্ণমেণ্ট পারিলেন না ইহাদিগকে শক্তহাতে দমন করিতে বা সেই কালোবাজারকে পুরাদস্তুর পর্য্যুদস্ত করিতে। তেমনি ধীরে ধীরে মানুষের চিত্তে এমন ভাবে আজ পাপ প্রবৃত্তি আসিয়া আশ্রয় করিয়াছে, যাহা চিন্তার অতীত। চুরি, রাহাজানি হইতে সুরু করিয়া নারীধর্ষণ ও শিশু-হত্যা পর্য্যন্ত এমন দিক নাই—যাহা লইয়া সমাজ আজ ভারগ্রস্ত হইয়া না পড়িয়াছে। ইহা লইয়া আদলত সমূহে কয়টি মোকদ্দমাই বা সোপর্দ্দ হয়? অথচ পৃথিবী অগ্রগতিশীল। দেশ আজ যে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে উন্নীত হইয়াছে, তাহা দেশের মানুষের দ্বারাই উন্নীত হইয়াছে। দেশের সেই চরিত্রকে জাগাইতে হইবে, মনোবলকে দৃঢ়তার সঙ্গে বিকাশের পথ দিতে হইবে, উন্নততর শিক্ষা ব্যবস্থার দ্বারা ভারতীয় সংস্কৃতিকে পুনর্জ্জীবিত করিয়া তুলিতে হইবে। ইহার পিছনে একদিকে যেমন গভর্ণমেণ্টের দায়িত্ব, অন্যদিকে জনসাধারণেরও দায়িত্ব সমান অংশেই রহিয়াছে। ২৬শে জানুয়ারী পালন করিতে হইলে চাই এই দায়িত্ব পালনের শক্তি। দুঃখের বিষয়, এ বৎসরও আমরা সেই শক্তির অবক্ষয় দেখিয়াছি।

আরও একটি প্রয়োজনীয়তা আছে এই দিনে। তাহা হইতেছে—যাঁহাদের ত্যাগ, নির্য্যাতন ও রক্তদানে স্বাধীনতা সম্ভব হইয়াছে, এই দিনে ভক্তিপ্রণত চিত্তে তাঁহাদিগকে স্মরণ করিয়া এই ব্রতই গ্রহণ করা: 'আমরা প্রত্যেকেই প্রত্যেকের জন্য কাজ করিব এবং সকলে একত্র হইয়া সমবেতভাবে দেশের কাজে আত্মদান করিব। সেখানে পারস্পরিক দলাদলি থাকিবে না, পাপ মাথা তুলিয়া কখনও ন্যায়বুদ্ধিকে বিভ্রান্ত করিবে না, উচ্চ-নীচ চণ্ডাল-ব্রাহ্মণ সেখানে সম অধিকারে ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের পূর্ণাঙ্গ নাগরিক।'

আমরা আশা করিব, বিগত মুষ্টিপ্রমাণ বৎসরের ক্ষতিগুলিকে আগামী বৎসরের সার্থক উৎসবের

মধ্য দিয়া পরম লাভবান ও মর্য্যাদাসম্পন্ন করিয়া তুলিতে দেশবাসী তথা জাতীয় সরকার অবশ্যই যত্নবান হইবেন।

'দিল্লী রণতরী' দর্শনে দুর্ঘটনা

বিগত ২৬শে জানুয়ারী যখন কলিকাতায় ও হাওড়ায় দ্বিতীয় বার্ষিক প্রজাতন্ত্র উৎসবের অম্বুদ্বেল ঢেউ বহিয়া চলিয়াছে, ঠিক সেই একই দিনে উৎসবের অঙ্গস্বরূপ গঙ্গাবক্ষে নোঙরবদ্ধ 'দিল্লী রণতরী' দেখিতে যাইয়া উন্মুখ জনতার চাপে কয়েকটি প্রাণ নিঃশেষিত হয়। জনতার চাপ সহ্য করিতে না পারিয়া প্রিন্সেপ্ ঘাটের নিকটবর্ত্তী ম্যান-অব-ওয়ার জেটির রেলিং ভাঙিয়া পড়ে, ফলে পিছন হইতে চাপের বেগ সংবরণ করিতে না পারিয়া অসংখ্য স্ত্রী-পুরুষ গঙ্গাবক্ষে পতিত হয় এবং কয়েকজন মৃত্যুবরণ করে। পুলিশ-প্রহরার ব্যবস্থা ছিল সত্য, কিন্তু তাহা অনুল্লেখযোগ্য। এ সম্পর্কে পোর্ট কমিশনার-কর্ত্তৃপক্ষের যতখানি দায়িত্ব পালন করা কর্ত্তব্য ছিল, তাহার বিন্দুমাত্রও পালিত হইয়াছে বলিয়া আমাদের জানা নাই। উৎসবের দিন 'দিল্লী রণতরী'র মতো নোঙরবদ্ধ জাহাজ দেখিতে যে কাতারে কাতারে ভিড় হইবেই, একথা সর্ব্বজন-বিদিত। অতএব এই সাধারণ কথাটি জানিয়া শুনিয়া জেটিকে পূর্ব্ব হইতে সুরক্ষিত করাই কি তাঁহাদের কর্ত্তব্য ছিল না? অন্যথায় নিজেদের অযোগ্যতার কথা পুলিশ কর্ত্তৃপক্ষকেও তাঁহারা পূর্ব্বাহ্ণেই জানাইয়া রাখিতে পারিতেন। কিন্তু ব্যবস্থার দিক হইতে কোনো পথই তাঁহারা গ্রহণ করেন নাই, ফলে এই প্রাণনাশ। এই হৃত প্রাণগুলির জন্য তাঁহাদিগকে দায়ী করিলে কি ভুল করা হইবে? তেম্নি জনসাধারণের উদ্দেশ্যেও আমাদের কিছু বক্তব্য আছে। একটা জিনিষ আমরা আগাগোড়াই লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি, দেশ স্বাধীন হইলেও অদ্যাবধি দেশের লোকের মধ্যে 'সিভিক্ সেন্স' কিম্বা 'পৌর সভ্যতা' বোধ বলিয়া কিছু জাগে নাই। কাতারে কাতারে উন্মত্তের মতো ভিড়ের সৃষ্টি না করিয়া যদি তাঁহারা স্ত্রী-পুরুষ উভয়তঃ ছোট ছোট দলে বিভক্ত হইয়া গঙ্গার তট প্রদক্ষিণ করিয়া আসিতেন, তবে রণতরী দর্শনে এইভাবে প্রাণনাশ নিশ্চয়ই ঘটিত না। অনুরূপ একাধিক ঘটনা হইতে তাঁহাদের অন্ততঃ সাবধান হওয়া উচিৎ ছিল।

সাধারণ নির্ব্বাচন ও কংগ্রেসের দায়িত্ব

সারা ভারতব্যাপী বিশাল সাধারণ নির্ব্বাচন আজ প্রায় সমাপ্তির পথে। নির্ব্বাচন যেরূপ সুনিয়ন্ত্রিত ও শান্তিপূর্ণভাবে সমাপ্ত হইয়াছে, আধুনিক বিশ্বে তাহা একটি রেকর্ডস্বরূপ। ইহার জন্য নির্ব্বাচনের ভারপ্রাপ্ত কর্ত্তৃপক্ষের এবং স্থানীয় সরকারী কর্ম্মচারীদের কৃতিত্বই সূচিত হইতেছে। তাঁহাদের এই সুব্যবস্থার জন্য মুখ্য নির্ব্বাচন কমিশনার অজস্র ধন্যবাদ জানাইয়াছেন। আমাদেরও তাঁহারা ধন্যবাদভাজন।

নির্ব্বাচনে কংগ্রেস সর্ব্বশীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে, ইহাতে বিস্ময়ের কিছু নাই। ভারতের প্রাচীনতম শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান কংগ্রেস। তাহার যে নির্দ্বন্দ্ব ও নিরঙ্কুশ জয় হইল না, ইহাই বিস্ময়ের বিষয়। কিন্তু কেন এই দ্বন্দ্ব, কেন তাহার বিরুদ্ধ-দলসমূহের শক্তিশালী সংগঠন? তাহার কারণ ইহা নয় যে, প্রতিষ্ঠান হিসাবে কংগ্রেস ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে, বরং ইহাই বলিতে হইবে, শাসন-ক্ষমতা কংগ্রেসের হাতে আসার পর হইতে এত দুর্নীতি তাহাকে আশ্রয় করিয়া বসে—যাহার ফলে বহু স্বার্থত্যাগী শক্তিশালী ব্যক্তি কংগ্রেস হইতে বাহির হইয়া আসেন এবং ধীরে ধীরে বামপন্থী দলগুলি সক্রিয় ও শক্তিশালী হইয়া

উঠিবার সুযোগ পায়। জনসাধারণের মোটামোটি স্বার্থ খাওয়া-পরার স্বার্থ। কিন্তু দুঃখের বিষয়, কংগ্রেস-নেতৃবৃন্দ শাসনক্ষমতা হাতে লওয়া অবধি গত চারি বৎসরের মধ্যেও জনসাধারণের সেই ন্যূনতম স্বার্থের ক্ষীণতম দাবী মিটাইতে পারেন নাই ; বরং দেশের দুঃখ-কষ্ট-লাঞ্ছনা উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিয়াছে। যদিও কংগ্রেসের বিকল্প প্রতিষ্ঠান হিসাবে দেশে এ-পর্য্যন্ত অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিতে পারে নাই, তথাপি সুস্থ ও স্বাভাবিকভাবে জীবন ধারণ করিতে পারার অদম্য আশা বুকে লইয়াই জনসাধারণের কোনো কোনো অংশ কংগ্রেস-বিরোধী বামপন্থী প্রতিষ্ঠানগুলির সপক্ষে ভোট দিয়াছে। আশা—তাহাদের মাধ্যমে তবু যদি নতুন সূর্য্যের মুখ দেখা যায়! এদিক হইতে এই নির্ব্বাচন কংগ্রেসের নিকট একটি বড় পরীক্ষাও বটে। তাহাদের গত চারি বৎসরের যে ক্রিয়াকলাপের ফলে সুদীর্ঘ প্রায় সত্তর বৎসরের শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানে ভাঙন ধরে এবং দেশের কয়েকটি অংশই একরকম কংগ্রেস-বিরোধী মতবাদে বিশ্বাসী হইয়া ওঠে, এবং এমন কি সাম্প্রতিক নির্ব্বাচনে মন্ত্রিদের অনেকেও যে-কারণে অকৃতকার্য্য হইতে বাধ্য হন, তাহার প্রতিকার করিতে হইলে কংগ্রেসের মূল নীতির সঙ্গে মিলাইয়া একদিকে যেমন নেতৃবৃন্দের নিজেদের ত্রুটিগুলি সংশোধন করা প্রয়োজন এবং ত্যাগ ও নিষ্ঠার সঙ্গে সংগঠনের দ্বারা দেশের আত্মশক্তিকে দৃঢ় করিয়া তোলা আবশ্যক, অন্যদিকে তেম্‌নি আসন্ন মন্ত্রিত্ব গঠনে এমন সব কৃতি ব্যক্তিকেই মন্ত্রিত্বে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য—দেশের হৃদয়ের সঙ্গে যাঁহাদের নাড়ীর সম্পূর্ণ যোগ রহিয়াছে। ইহা শুধু পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্কেই নয়, কেন্দ্রিয় এবং ভারতের সমগ্র রাজ্যগুলি সম্পর্কেই এই একই কথা। কংগ্রেসের এই সাংস্কৃতিক নব-যাত্রার উপরেই নির্ভর করিবে তাহাদের আগামী পাঁচ বৎসরের সুনাম-দুর্নাম, খ্যাতি-অখ্যাতি, স্থায়িত্ব ও নিশ্চিন্ততা।

পাঠকবৃন্দের সুবিধার্থে আমরা সারা ভারতের নির্ব্বাচনের একটি তালিকা নিম্নে প্রস্তুত করিয়া দিলাম —

১৪. ২. ৫২ তারিখ পর্য্যন্ত বিভিন্ন দলের নির্ব্বাচিত সদস্য সংখ্যা

	আসন সংখ্যা	কংগ্রেস	সোশ্যালিষ্ট	কৃ-প্র-ম	জনসঙ্ঘ	কম্যুনিষ্ট ও বামপন্থী	তপশীল জাতি ফেডারেশন	স্বতন্ত্র	অন্যান্য দল	মোট
লোকসভা	৪৯৬	২৮৮	১০	১০	৩	২৭	২	৩২	৩২	৪০৪
বিধান সভা										
আসাম	১০৮	৭৯	৫	২	০	১	০	১২	৬	১০৫
বিহার	৩৩০	২৪১	২৩	১	০	১	০	১২	৫২	৩৩০
বোম্বাই	৩১৫	২৭০	৮	০	০	১	১	১৭	১৮	৩১৫
মধ্যপ্রদেশ	২৩২	১৯৩	১	৮	০	০	০	২৩	৫	২৩০
মাদ্রাজ	৩৭৫	১৫২	১৩	৩৫	০	৬১	২	৬৩	৪৯	৩৭৫
উড়িষ্যা	১৪০	৭০	১০	০	০	৭	০	১৭	৩৬	১৪০
পাঞ্জাব	১২৬	৯৮	০	০	০	৬	০	৬	১৬	১২৬
উত্তর প্রদেশ	৪৩০	২৬৫	১২	১	১	২	০	৭	২	২৯০
পশ্চিমবঙ্গ	২৩৮	১৫১	০	১৫	১০	৪২	০	১০	১০	২৩৮
হায়দরাবাদ	১৭৫	৯৩	১১	০	০	৪২	৫	১৪	১০	১৭৫

	আসন সংখ্যা	কংগ্রেস	সোস্যালিষ্ট	কৃ-প্র-ম	জনসঙ্ঘ	কম্যুনিষ্ট ও বামপন্থী	তপশীল জাতি ফেডারেশন	স্বতন্ত্র	অন্যান্য দল	মোট
মধ্যভারত	৯৯	৭৫	৪	০	৪	০	০	৩	১৩	৯৯
মহীশূর	৯৯	৭২	৩	৮	০	১	২	১১	০	৯৭
পেপসু	৬০	২৫	০	১	২	৩	১	৯	১৯	৬০
রাজস্থান	১৬০	৮১	১	১	৮	০	০	৩৫	৩৩	১৫৯
সৌরাষ্ট্র	৬০	৫৫	২	০	০	০	০	২	১	৬০
ত্রিবাঙ্কুর কোচিন	১০৮	৪৪	১২	০	০	৩২	০	১১	৯	১০৮
আজমীর	৩০	২০	০	০	৩	০	০	৪	৩	৩০
ভুপাল	৩০	২৫	০	০	২	০	০	২	১	৩০
কুর্গ	২৪	১৫	০	০	০	০	০	৯	০	২৪
দিল্লী	৪৮	৩৯	২	০	৪	০	০	২	১	৪৮
হিমাচল প্রদেশ	৩৬	২৪	০	৩	১	০	১	৭	০	৩৬
বিন্ধ্য প্রদেশ	৬০	৩৮	১১	৩	২	০	০	৩	৩	৬০
নির্ব্বাচক সমিতি										
কচ্ছ	৩০	২৮	০	০	০	০	০	১	১	৩০
মণিপুর	৩০	১০	১	০	০	২	০	১	১৬	৩০
ত্রিপুরা	৩০	৭	০	০	০	১০	০	৫	২	২৪

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য প্রকাশের জন্য আন্তর্জ্জাতিক পরিষদ

প্রাচীন ভারতীয় ও তৎসংশ্লিষ্ট সাহিত্য প্রকাশের জন্য বিশ্বের পঞ্চাশটি রাষ্ট্র ভারতীয় সংস্কৃতির আন্তর্জ্জাতিক পরিষদ গঠনে সাহায্য করিবেন বলিয়া জানা গিয়াছে। এতদুদ্দেশ্যে পরিষদকে পরিকল্পনা রচনায় সাহায্যের জন্য বৌদ্ধ মহাযান শাস্ত্রে সুপণ্ডিত পশ্চিম জার্ম্মাণীর মারবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাঃ জে নোবেল ভারতে আসিয়াছেন। পরিষদের সদস্যগণের অভিমত এই যে, পরিকল্পনা সম্পূর্ণ হইলে বিশ্বের সুপ্রাচীন গ্রন্থ সঙ্কলন ও প্রকাশের জন্য বিভিন্ন রাষ্ট্রের পণ্ডিত ব্যক্তিগণের সাহায্য পাওয়া যাইবে। ইউরোপের অসংখ্য পণ্ডিতের অক্লান্ত পরিশ্রমে গ্রীক ও লাতিন সাহিত্য প্রচারিত হইয়াছে। পরিষদের সদস্যগণ মনে করেন, ভারতের প্রাচীন সাহিত্যের অসংখ্য অসংখ্য পাণ্ডুলিপির মধ্যে কয়েকটি মাত্র প্রকাশিত হইয়াছে। এই সব পাণ্ডুলিপির সংখ্যা পাঁচ লক্ষেরও অধিক হইবে। জাপান, ইন্দোচীন, ইন্দোনেশিয়া, ব্রহ্ম, সিংহল, জার্ম্মাণী, ইতালী, ফ্রান্স, হল্যাণ্ড, ইংলণ্ড, আমেরিকা ও ভারতের পণ্ডিতগণ এই পরিষদে সহযোগিতা করিতে সম্মত হইয়াছেন।

ভারতে ভেষজ গবেষণা

সুইজারল্যাণ্ডবাসী অধ্যাপক ডাঃ অটোল সম্প্রতি এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, ভারত ভেষজ প্রস্তুত গবেষণার খুবই উপযোগি। ভারত সরকারের আমন্ত্রণে ভারতে বিজ্ঞানীদের সহিত আলোচনার জন্য বর্ত্তমানে তিনি ভারতে আসিয়াছেন। গাছ-গাছড়া হইতে ঔষধ প্রস্তুতের সুযোগ এখানে অনেক বেশী; সুতরাং ভারত বৈদেশিক বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করিয়া এ বিষয়ে অগ্রণী হইতে পারে। ভেষজশিল্প প্রসারের জন্য প্রয়োজন অপরিসীম ধৈর্য্য; কারণ কোনো ঔষধ বাজারে ছাড়িবার পূর্ব্বে তাহা দীর্ঘকাল ধরিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখা দরকার। মূলধন ও বৈদেশিক সাহায্য লইয়া এই শিল্পের উন্নতি করা যাইতে পারে।

প্রাচ্য আদর্শ

ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অব ওয়ার্ল্ড এ্যাফেয়ার্সের মাদ্রাজ শাখায় বক্তৃতা 'প্রসঙ্গে' মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভার্জিনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক ডাঃ কুর্ট্ এফ্ লিডেকার বলেন, কি পবিত্র নীতিকে আশ্রয় করিয়া প্রাচ্যের সনাতন দৃষ্টিভঙ্গী গড়িয়া উঠিয়াছে, পাশ্চাত্য দেশ তৎসম্পর্কে বিশেষভাবে গবেষণা করিতে চায় না। বাঁচিয়া থাকিতে গেলে নীতির দিক দিয়া প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলনের প্রয়োজন। সাময়িকপত্র, পুস্তক প্রভৃতির দ্বারা দুই দেশের মধ্যে কিছুটা মিলন সাধন করা যাইতে পারে! সম্পূর্ণ মিলন সাধনের জন্য আরও কিছুর প্রয়োজন। তাহা হইতেছে রাজনীতি, অর্থনীতি ও চিন্তার ক্ষেত্রে পারস্পরিক সাহায্য। অধ্যাপক লিডেকার এ বিষয়ে রাষ্ট্রপুঞ্জের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সমাজ প্রতিষ্ঠানের দানের সবিশেষ উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, প্রাচ্যের অধিবাসীরা পাশ্চাত্য দেশ সম্পর্কে অনেক কিছু জানে শোনে। পাশ্চাত্য দেশগুলিকেও প্রাচ্য সম্বন্ধে সহানুভূতিশীল হইতে হইবে।

প্রাচ্য বাণী মন্দিরের বার্ষিক উৎসব

গত ২০শে ও ২১শে জানুয়ারী কলিকাতা রাজ্যপাল ভবনে প্রাচ্য বাণী মন্দিরের অষ্টম বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম দিন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন রাজ্যপাল মাননীয় হরেন্দ্র কুমার মুখোপাধ্যায় এবং প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন ডক্টর যদুনাথ সরকার। ডক্টর নলিনীরঞ্জন সেনগুপ্ত সভার উদ্বোধন করেন। দ্বিতীয় দিনের অধিবেশন উপলক্ষ্যে প্রাচ্যবাণী ছাত্র দিবস উদ্‌যাপিত হয়। সভায় পৌরোহিত্য করেন শ্রীযুক্ত অতুল চন্দ্র গুপ্ত এবং প্রধান আতিথ্য গ্রহণ করেন রাজ্যপাল-পত্নী শ্রীযুক্তা বঙ্গবালা দেবী। প্রেসিডেন্সী বিভাগের কমিশনার শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ তালুকদার সভার উদ্বোধন করেন। প্রাচ্যবাণী মন্দির কর্ত্তৃক সংস্কৃত ও বাংলা সাহিত্যের নানাবিধ অমূল্য গ্রন্থ প্রকাশ, সংস্কৃত সাহিত্যের প্রচার এবং সর্ব্বভারতীয় ভিত্তিতে বিশ্ববিদ্যালয় সংগঠনের প্রয়াশের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া বিভিন্ন বক্তা, সভাপতি ও প্রধান অতিথিবৃন্দ বক্তৃতা করেন। উভয় দিবসেই প্রাচ্যবাণী মন্দিরের সদস্যগণ মহাকবি ভাস্ রচিত 'প্রতিমা' নাটকখানি মূল সংস্কৃতে অভিনয় করেন।

বদ্রীনাথ

হিমালয়ের বদ্রীনাথ শুধু পাহাড়ই নয়, হিন্দুর নিকট ইহা বিষ্ণু-তীর্থ স্বরূপ। বৌদ্ধ শ্রমণদিগের নিকটও ইহা তেম্নি একটি বৃহত্তম সাধনক্ষেত্র ছিল। সাম্প্রতিক এক সংবাদে প্রকাশ, চীন বদ্রীনাথের দাবী করিয়াছে। এ দাবী অবশ্য বৌদ্ধসূত্রেই। লণ্ডনের 'টাইম্‌স্‌' পত্রিকা ইহার উপর মন্তব্য করিয়া এক টিকা প্রকাশ করিয়াছে। অতঃপর কবে না জানি চীন গয়ার বোধিদ্রুমেরও দাবী করিয়া বসিবে, কারণ উহা বুদ্ধের সাধনপীঠ। বৌদ্ধবাদী চীনের এ দাবী কতখানি যুক্তিপূর্ণ, তাহা চিন্তাসাপেক্ষ। বৌদ্ধবাদ ভারতের মাটি হইতে উত্থিত হইয়া সমগ্র এশিয়াকে একদিন আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল। সেই সূত্র ধরিয়া চীন যদি আজ ভারতের বিভিন্ন বৌদ্ধতীর্থগুলি দাবী করিয়া বসে, তবে চীন-ভারত সাংস্কৃতিক যোগ কতখানি নিবিড় হইবে, তাহা ভাবিবার বিষয়। সুখের বিষয় যে, 'টাইম্‌স্‌' এ সম্বন্ধে যেমন কোনো সিদ্ধান্তের ইঙ্গিত দেন নাই, বিষয়টাও তেমনি অদ্যাবধি বেশী দূর অগ্রসর হয় নাই। তবে আশঙ্কার কারণ রহিয়াছে, নিঃসন্দেহ।

শোক সংবাদ

পরলোকে ইংলণ্ডের রাজা ষষ্ঠ জর্জ্জ

গত ৫ই ফেব্রুয়ারী শেষ রাত্রে ইংলণ্ডের রাজা ষষ্ঠ জর্জ্জ নিদ্রিত অবস্থায় শান্তিতে পরলোক গমন করেন। অনিশ্চিত মৃত্যু হইলেও শান্তিপূর্ণ মৃত্যু নিঃসন্দেহ। কোনোরূপ রোগক্লান্তি নাই, উদ্বেগ বা অধীরতা নাই, নিদ্রিতাবস্থায় শায়িত থাকিয়া নিঃশব্দে প্রয়াণ। পূর্ব্ব-ইংলণ্ডের স্যাণ্ড্রিংহামে প্রভাতসূর্য্য উদয়ের পূর্ব্বে এত বড় দুঃসংবাদ কাহারও জানিবার পর্য্যন্ত সুযোগ ছিল না। তাঁহার মাতা মেরী আজ ৮৪ বৎসরের বৃদ্ধা। তাঁহার এই শোকের কাছে আজ সারা ইংলণ্ডের ক্ষতি সামান্যই বলিতে হইবে।

জর্জ্জের পুরা নাম এলবার্ট ফ্রেডারিক আর্থার জর্জ্জ। রাজা পঞ্চম জর্জ্জ ও রাণী মেরীর তিনি দ্বিতীয় পুত্র। ১৮৯৫ সালের ১৪ই ডিসেম্বর স্যাণ্ড্রিংহামের ইয়র্ক্‌ কটেজে তাঁহার জন্ম হয়। রাজকুমার জর্জ্জ ১৯১৩ সালে ওস্‌বর্ণ ও ডর্টমাথের রয়াল নেভাল কলেজ হইতে মিড্‌শিপ্‌ম্যান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় ১৯১৬ সালে জুটল্যাণ্ডের সমরক্ষেত্রে তিনি সাব-লেপ্টেন্যাণ্টের পদে কাজ

করেন। ১৯১৭ সালের শেষভাগে তিনি নৌ-বিভাগে যোগদান করেন এবং ১৯২০ সালে উইং-কম্যাণ্ডার পদে উন্নীত হন। যুদ্ধের পর ১৯১৯ সালের অক্টোবর মাসে তিনি ট্রিনিটি কলেজে ভর্ত্তি হন এবং ইতিহাস, অর্থনীতি এবং রাজনীতি অধ্যয়ন করেন। ১৯২০ সালের জুন মাসে তাঁহাকে ডিউক্ অব ইয়র্ক করা হয় এবং ১৯২৩ সালের ২৬শে এপ্রিল আর্ল অব ষ্ট্রাথ্মোরের কন্যা লেডী এলিজাবেথ বোজলিয়নের সহিত তিনি পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। ১৯২২ ও ১৯২৩ সালে তিনি রুমানিয়া, সার্ভিয়া এবং চেকোশ্লোভাকিয়ার রাজকীয় উৎসবে রাজা পঞ্চম জর্জ্জের প্রতিনিধিত্ব করেন। ১৯২৫ সালে ওয়েমলীতে যে বৃটিশ সাম্রাজ্য প্রদর্শনী হয়, উহাতে ডিউক্ অব ইয়র্ক্ সভাপতিত্ব করেন। ১৯২৬ সালের ২১শে এপ্রিল রাজা ষষ্ঠ জর্জ্জের প্রথমা কন্যা রাজকুমারী এলিজাবেথ জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৩০ সালে তাঁহার দ্বিতীয়া কন্যা রাজকুমারী মার্গারেট রোজের জন্ম হয়। ১৯৪৬ সালের ২০শে জানুয়ারী রাজা পঞ্চম জর্জ্জের মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রিন্স্ অব ওয়েল্স্ অষ্টম এড্ওয়ার্ড্ নাম গ্রহণ করিয়া ইংলণ্ডের রাজা হন। কিন্তু তিনি মিসেস্ ওয়ালিশ ওয়ারফিল্ড্ বা মিসেস্ আর্ণেষ্ট সিম্পসনের সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইবার সঙ্কল্প প্রকাশ করিলে মিসেস্ ওয়ারফিল্ড্ অভিজাত বংশসম্ভূত নহেন বলিয়া প্রবল প্রতিবাদধ্বনি উত্থিত হয় ও এক শাসনতান্ত্রিক সঙ্কট উপস্থিত হয়। ফলে অষ্টম এড্ওয়ার্ডকে রাজসিংহাসন অথবা তাঁহার মনোমত পাত্রী — অন্যতরভয়ের একটি বাছিয়া লইতে হয়। তিনি সিংহাসন ত্যাগের সিদ্ধান্ত করিলে ১৯৩৬ সালের ১০ই ডিসেম্বর পার্লামেণ্টে ঘোষণা করা হয় যে, রাজা অষ্টম এড্ওয়ার্ড সিংহাসন ত্যাগ করিয়াছেন। অতঃপর ১২ই ডিসেম্বর ডিউক্ অব্ ইয়র্ককে ইংলণ্ডের রাজা বলিয়া ঘোষণা করা হয়। ১৯৩৭ সালের ১২ই মে তারিখে রাজা ষষ্ঠ জর্জ্জের রাজ্যাভিষেক উৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন হয়। ১৯৩৯ সালের মে মাসে তিনি সস্ত্রীক কানাডা পরিভ্রমণ করেন। ১৯৪৭ সালের ২০শে নভেম্বর রাজকুমারী এলিজাবেথের সঙ্গে লেঃ ফিলিপ মাউণ্টব্যাটেনের শুভ পরিণয় হয়। বিবাহের পূর্ব্বদিন লেঃ ফিলিপ এডিনবরার ডিউক্ উপাধি প্রাপ্ত হয়।

ভারতে রাজার মৃত্যুসংবাদ পৌঁছিবামাত্র দিল্লী সংসদের উপরস্থিত ভারতীয় রাষ্ট্রিয় পতাকা অর্দ্ধ অবনমিত করা হয় এবং ভারতের সর্ব্বত্র শোক প্রকাশ করা হয়।

পিতার মৃত্যুর পর রাজকুমারী এলিজাবেথ ইংলণ্ডের রাণীর পদে অধিষ্ঠিতা হইলেন। 'এলিজাবেথ দি সেকেণ্ড্' নামে তিনি রাজকার্য্য পরিচালনা করিবেন।

শ্রীকে. ভি. আপ্পারাও কর্ত্তৃক মেট্রোপলিটান প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস্ লিমিটেড
২০, লোয়ার সারকুলার রোড, কলিকাতা ১৪ হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বাউল

ফোটো—শিবপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

RAMAKRISHNA MISSION INSTITUTE OF CULTURE
LIBRARY

উনবিংশ বর্ষ চৈত্র—১৩৫৮ ২য় খণ্ড-৪র্থ সংখ্যা

RAMAKRISHNA ... LIBRARY

শ্রীকৃষ্ণ-বিজয় ও কালান্তরের পূর্ব্বাভাষ

ডক্টর অরবিন্দ পোদ্দার

খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ, চতুর্দ্দশ এবং পঞ্চদশ শতকের প্রথমাংশ গভীর রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক নৈরাজ্য ও অস্থিরতার ভেতর দিয়ে কেটেছে। এই অস্থিরতা শুধু মাত্র রাষ্ট্রের উত্থান বা পতন, বিশেষ কোন নৃপতির জীবনাবসান অথবা রাজ্যাভিষেকের কাহিনীতেই সীমাবদ্ধ নয়; এই অস্থিরতা সামাজিক ভাবাদর্শের রূপান্তর, ধর্ম্মীয় আদর্শের পরিবর্ত্তন, নীতিবোধের ব্যতিক্রমের মধ্যেও প্রকাশ পেয়েছে। কেন না মুসলমান অভিযানকারীরা শুধু তাদের সংঘবদ্ধ সামরিক শক্তি ও উন্নতধরণের সমর-নৈপুণ্য নিয়েই এদেশে আসে নি। তারা নতুন সমাজআদর্শ ও ধর্ম্মের বাণীতেই (এই আদর্শ তাদের হাতে ও আমলে এর মৌলিক রূপ থেকে বহুলাংশে বিচ্যুত হয়ে থাকলেও) বহন করে এনেছে। তাই এই যুগে সংঘাতটা শুধু সামাজিক শক্তির নয়, ভাবাদর্শেরও। এই সংঘাতে বাঙ্গালীর সনাতন চিন্তাধারা ও আদর্শ, তার মন ও মানস নানা ভাবে আহত হয়েছে, তার আদর্শ ও অবলম্বন অভিযানকারীর হাতে নির্ম্মমভাবে লাঞ্ছিত হয়েছে; কিন্তু অভিযানকারীরা তার জন্যে কোন সৃষ্টিশীল আদর্শ সুদূর প্রান্ত থেকে নিয়ে এসেছে তা অনুসন্ধান করা তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। কিন্তু সত্যই মুসলমান অভিযানকারীর স্খলসিত তরবারির পশ্চাতে অর্থবহ মানবিক সত্য ও আদর্শ লুক্কায়িত ছিল, এবং তা সঙ্গোপনে বাঙ্গালীর মন, মানস ও চরিত্রকে এক স্বভাব থেকে স্বভাবান্তরের পথে প্রবাহিত করে দিচ্ছিল। ভাবাদর্শের সংঘাত থেকে রূপান্তরিত নতুন বাঙ্গালী চরিত্র ও ভাবাদর্শ পঞ্চদশ শতকের শেষের দিকে ও ষোড়শ শতকের গোড়ার দিকে আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু এই সমন্বয় সাধনের পূর্ব্বে বিপরিতধর্ম্মী আদর্শের ঘাত-প্রতিঘাতে

বাঙালী জীবন যে ভীষণভাবে বিক্ষুব্ধ হয়েছিল, তা' সহজেই অনুমান করা চলে।

হিন্দুশাসনের অবসানের মুখেই বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন ধ্বংসের প্রান্তসীমায় পৌঁচেছিল। এই পতনশীল আদর্শকে স্পর্দ্ধা করে দাঁড়াল যে নতুন ইসলামিক আদর্শ, ভারতে আগমনের পূর্ব্বেই তাও তার আদি গতিশীলতা ও সুস্থ সমাজবোধ হারিয়ে ফেলেছিল। সুতরাং সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় প্রাধান্য লাভের জন্য এই দুই আদর্শের সংগ্রামটা নিতান্তই ধ্বংসপ্রবণ হলো, আর রাষ্ট্রীয় সংগ্রাম সাধারণ মানুষের জীবনের মূল্য ও মর্য্যাদা কোন কালেই দেয় না, ধ্বংসের তরঙ্গে তার সব কিছুকে বিসর্জ্জন দেওয়ার আহ্বানই জানায়। এই পরিবেশে জীবনের অনিশ্চিয়তা পূর্ব্বকালের চেয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে, জাগতিক ঘটনাকে মনে হয়েছে পূর্ব্ব থেকেও ভয়াবহ, আর সংসারকে মনে হয়েছে অন্তহীন দুঃখের লীলাভূমি। এই দুঃখের স্পর্শ থেকে পরিত্রাণ লাভের প্রেরণাও তার সমভাবে দেখা দিয়েছে, মেঘের আড়ালে লুকানো সূর্য্যকে সে প্রতীক্ষা করছে প্রতিক্ষণ। এই নৈরাশ্য ও আশার দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়ে সে একটা স্থিতিশীল যুগোপযোগী সমন্বয়ে উপনীত হয়েছিল।

এই সমন্বয় সাধিত হওয়ার ঠিক অব্যবহিত পূর্ব্বকালীন সামাজিক ও ভাবপরিমণ্ডলে মালাধর বসু তাঁর 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়" রচনা করেন। শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্য-প্রচার এই গ্রন্থ রচনার মূল অনুপ্রেরণা হয়ে থাকলেও, কবির ভাবাকাশ আশ্চর্য্যভাবে তাঁর সমকালীন সামাজিক ভাবাকাশের লক্ষণাক্রান্ত। সুতরাং তাঁর গ্রন্থকে যুগসংক্রান্তির স্মারক রূপেই গ্রহণ করা যেতে পারে। কলি যুগে সামাজিক অবস্থা কিরূপ হবে, কবি তার বর্ণনায় বলেছেন—

"কলিকাল পূর্ত্ত্যাসন্ন প্রেবেস করএ।
বল বুদ্ধি তেজ সত্ব সভাকার ক্ষএ॥
অল্পসত্ব হব লোক অল্পবুদ্ধি বল।
একপুয়া হব ধর্ম্ম অধর্ম্ম প্রবল॥
সত্য জজ্ঞ তপোদান চারিপোয়া ধর্ম্ম।
সকল ছাড়িয়া লোক করিব কুকর্ম্ম॥
ব্রাহ্মণ ছাড়িব বেদ অধর্ম্ম আচার।
অমর্য্যাদা হব লোক করিব অবেভার॥
বাপে না মানিব পুত্র নিন্দিব জ্যেষ্ট ভাই।
ব্রহ্ম না জপিব বিপ্র করিব বড়াঞি॥
ভার্য্যা না মানিব স্বামি করিব দুরাচার।
পরপুরুস লইয়া করিব ঘরদ্বার॥
পৃথুবি সঙ্কোচ হব অধর্ম্ম আপার।
নিচ জনের ঘরে হব লক্ষির অবতার।
সাধুজনের দুঃখ হব নিচ পাবে সুখ।
দুঃখ ভাবি হব লোক ধর্ম্মেতে বৈমুখ॥" ইত্যাদি

(পৃঃ ৬৫৮-৫৯ ; খগেন্দ্রনাথ মিত্র সম্পাদিত গ্রন্থ)

ঠিক এমনি একটা অবস্থা যে তাঁর সমকালীন সমাজে আত্মপ্রকাশ করেছে, তার স্বল্প স্বীকৃতিও গ্রন্থে রয়েছে। যথা,—

"দুই দিগে বন বাড়ি পথ আৎসাদিল।
বেদ না জানিঞা জেন দিজ নষ্ট হৈল॥
মেঘের সঙ্গে বিজুলি আকাসেত জাএ।
নিদ্ধন পুরুসে জেন কামিনি না ভাএ॥"

(ঐ ; পৃঃ ১১৪)

এইরূপ এক সমাজে যেখানে সুস্থ, সৃষ্টিশীল, কল্যাণ-ধর্ম্মী সমাজ-আদর্শ বিলুপ্ত হয়েছে, যেখানে নীতিবোধ অনুপস্থিত, সত্য ধর্ম্ম যেখানে লাঞ্ছিত, অনাচার ব্যভিচার যেখানে সুপ্রতিষ্ঠিত এবং ন্যায়বিচারের আদর্শ যেখানে অর্থহীন, এইরূপ সমাজে সৃষ্টিশীল আদর্শের স্বীকৃতি অসম্ভব ও অবিশ্বাস্য; সরল অনাড়ম্বর মধুর জীবন যাপনের আশাও এখানে বৃথা। সুতরাং সহজভাবেই জীবনকে সংসারকে অস্বীকার করার প্রেরণা দেখা দেয়। কবি বল্‌ছেন,—

বিসম সমএ হৈল পাপ ব্যবহার।
সভে চল স্বর্গপুরি ছাড়িয়া সংসার॥ (পৃঃ ৬৬৩)

কবির সংসার-অভিজ্ঞতা অত্যন্ত গভীর ও ব্যাপক। জীবনের আকাঙ্ক্ষা ও আশা প্রতিদিন মানুষকে তার প্রসারিত সংসারের দিকে টেনে আনছে; কিন্তু সাংসারিক নিয়ম ও সামাজিক বিধিব্যবস্থার নিকট পরাভূত হয়ে

তার আশা যে প্রতিনিয়ত তার মর্ম্মবেদনায় আঘাত করছে, কবি তা অনুভব করেছেন। এবং এই চেতনাও তাঁর আছে যে, মানুষের শক্তির চেয়ে মানুষেরই সংঘবদ্ধ কেন্দ্রীভূত শক্তি—সমাজ শক্তি—অত্যন্ত বেশী প্রবল, এবং তুলনায় অমোঘ। এই শক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ব্যক্তি-গত মানুষের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। তাই পরাজয়কে নিশ্চিত জেনে সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়ার চেয়ে যার জন্যে দুঃখ, যার জন্যে ব্যর্থতা, তার মূলোৎপাটনই সহজসাধ্য। তা হ'লেই ব্যর্থতার দৈন্যে মুহ্যমান হ'তে হবে না। কবি লিখছেন—

সম্পদ ক্ষেনেক সবে বিপদ বিস্তর।
ধন উপার্জ্জন হেতু দুঃখ নিরন্তর॥
ধনবানজন চিত্ত কভু স্থির নহে।
অগ্নি পানি চোর দৈন্য গুনে রাজ ভএ॥
জথা তথা থাকে সেই ধনকে চিন্তএ।
ধন সোকে দুঃখ পায়্যা পরান হারাএ॥
ধন তেজি জেই থাকে সেই বড় থির।
নাহি চিন্তা নাহি ভয় নির্ভয় সরির॥
... ...
জত জত মোহ করি তত সোক বাড়ে।
পুত্র সোকে ধন সোকে লোক প্রাণ ছাড়ে॥
মোহ হৈতে আপনার বুদ্ধি বল ক্ষয়।
আপনাকে থিক কহো কার মিত্র নয়॥
গৃহ পুত্র কলত্র বিসয় মোহ জাল।
ইহাতে মজিলে সোক বাড়এ বিসাল॥
মনে গুনি জাগহ তেজহ মায়া বন্ধ।
পাইবে পরম ব্রহ্ম অতুল আনন্দ॥ (ঐ; ৬২৬)

কিন্তু এই যে অস্বীকারের প্রেরণা তা প্রকৃত অস্বীকার নয়। কারণ, এই অস্বীকারের মাধ্যমে তিনি এর থেকে বড়, এর থেকে কল্যাণধর্ম্মী একটা কিছুকে স্বীকার করতে চাইছেন; একটা মহৎ আদর্শকে অবলম্বন করতে চাইছেন। এই যে বিসর্জ্জন, তার ভিতর দিয়েও তিনি একটা মহত্তর আদর্শের প্রতিষ্ঠাকে আবাহন জানাচ্ছেন।

'শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়ে' মালাধর বসু শ্রীকৃষ্ণের বীরত্ব এবং ঐশ্বর্য্য বর্ণনা করেছেন। সমস্ত রকমের সম্ভাব্য অসম্ভাব্য বিপদকে তিনি অনায়াসে জয় করছেন, অক্লেশে অপরিমেয় শক্তিধর প্রতিপক্ষকে পরাভূত করছেন। অবশ্য ভাগবতকে অবলম্বন করেই মালাধর তাঁর গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। ভাগবতে বর্ণিত এই সব চিত্তাকর্ষক কাহিনীর উপর ভাগবত-যুগের সমাজ-পরিবেশের প্রতিফলন সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। শ্রীকৃষ্ণ যেসব শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছেন এবং সংগ্রামে জয়ী হয়েছেন, তা থেকে জানা যায় যে, মানুষ কতকগুলো প্রাকৃতিক ঘটনা যথা দাবানল, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি ইত্যাদির রক্তচক্ষুর বিরুদ্ধে নিরাপত্তা বোধ করছিল না, কতকগুলো হিংস্র বন্য জন্তু জানোয়ার তার অস্তিত্বকে বিঘ্নসঙ্কুল করে তুলছিল; তার উপর ছিল গোষ্ঠীপতির অত্যাচার উৎপীড়ন। এই সম্মিলিত অভিযানের সম্মুখে তাকে অসমর্থিতভাবে নিঃসঙ্গ সংগ্রাম করতে হচ্ছে। এই সংগ্রামে পরাভূত না হওয়ার সঙ্কল্প থেকেই সে কামনা করেছে অপরিমেয় শক্তি-সামর্থ্য, কামনা করেছে সীমাহীন বল-বীর্য্য-বুদ্ধি ও উদ্ভাবনী প্রতিভা যার সাহায্যে সে অনায়াসে অতিক্রম করবে সমস্ত অনাত্মীয় প্রতিরোধ, জয় করবে নৈসর্গিক শক্তির খেলাকে, আর প্রতিষ্ঠিত করবে নিজের স্বরূপকে। অর্থাৎ মানুষ তার ক্ষুদ্র শক্তিকে সহস্রগুণ স্ফীত ক'রে সেই অসম্ভব শক্তির অধিকারী হতে চেয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্রের মাধ্যমে তার এই কামনাই ব্যঞ্জনা লাভ করেছে। সেই সীমাহীন শক্তির অধিকারী শ্রীকৃষ্ণ দাবানল গ্রাস করছেন, গিরি গোবর্দ্ধন ধারণ করে কুপিত ইন্দ্রের আক্রমণ—অবিশ্রান্ত বর্ষণ—থেকে গোকুল রক্ষা করছেন; দুগ্ধ-শিশু হয়েও বৎসাসুর, বকাসুর, অঘাসুর ইত্যাদি অগণিত হিংস্র জানোয়ারকে হত্যা করছেন, কালীয় দমন করছেন; আর সর্ব্বোপরি, গোষ্ঠীপতিকে হত্যা করে গোষ্ঠীপতির অত্যাচার থেকে সমস্ত জনসমষ্টিকে রক্ষা করছেন। নানাভাবে উৎপীড়িত ও অসহায় মানুষ তার নিজের উপর দেবত্ব আরোপ করে সমস্ত প্রতিকূল পরিবেশের উপর আত্মকর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার কল্পনা করেছে। এবং পরিবেশের উপর আত্মকর্তৃত্ব স্থাপনের হৃদয়-রস-রঞ্জিত চিত্র এঁকে মানুষ বাস্তব পৃথিবীতে সেই শক্তির অথবা সেই শক্তির আধার পুরুষের আবির্ভাব সহজ সুগম

করেছে। তার জীবনযুদ্ধে এবং জীবনকে সৃষ্টি করার কার্য্যে এই কল্পনার ও চিত্রের অবদান যৎসামান্য নয়।

যে কোন সমাজ ও সংস্কৃতি-সঙ্কটের যুগে অস্বীকৃত বঞ্চিত মানুষের মনে এই ভাগবত কাহিনীর নিঃসন্দেহ প্রভাব অনুভূত হবে। মালাধর বসুর সমকালীন ভাব-মণ্ডলেও তার আঘাত অনুভূত হয়েছে। ব্রাহ্মণ্য সমাজ সংস্থায় সাধারণ মানুষের জীবনের পর্য্যাপ্ত স্বীকৃতি ছিল না; তাকে উচ্ছেদ করে যে মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলো তাতেও সাধারণ মানুষের রাজনৈতিক অধিকার স্বীকৃত হয় নি। বরং রাষ্ট্রীয় দ্বন্দ্ব কোলাহলের ভিতর দিয়ে সাধারণ মানুষের জীবন ক্রমাগত বঞ্চনা, উৎপীড়ন ও অবজ্ঞার সম্মুখীন হয়েছে। এই বিশৃঙ্খল প্রতিকূল পরিবেশকে জয় করতে হলে শক্তির কামনা ও সাধনা অপরিহার্য্য। ভাগবত যুগের সঙ্গে মালাধর যুগের মানস পরিমণ্ডলের ঐক্য এই দিক থেকেই। শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়ের কাহিনী এবং শ্রীকৃষ্ণের বীরত্ব ও ঐশ্বর্য্য সমকালীন মানুষের শক্তির কামনাকেই চরিতার্থ করেছে, ভাবের ক্ষেত্রে তাকে প্রতিষ্ঠিত করে বাস্তব সমাজে ক্রিয়াশীল মানুষকে শক্তি ও সান্ত্বনা দিয়েছে। কংসের স্থলে যদি মালাধর বসুর সমসাময়িক কোন রাজাকে বসান যায়, এবং শ্রীকৃষ্ণকে হত্যা করার জন্য প্রেরিত বিভিন্ন অসুরকে প্রজার অত্যাচারের অংশীদার বিভিন্ন রাজকর্ম্মচারী বলে গণ্য করি, তা হলে এই পৌরাণিক কাহিনীও রীতিমত বাস্তব ও সজীব হয়ে ওঠে। শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়ের কাহিনী অনুরূপ কোন ভাব-সংশ্লেষের সাহায্যেই মালাধর বসুর যুগমানস অধিকার করে থাকবে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, সজ্ঞান ক্রিয়াই হোক অথবা অবচেতন প্রক্রিয়াই হোক, শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়ের মাধ্যমে মালাধর জীবনের উপলব্ধি কামনা করেছেন; জীবনের যে দিকটা অস্বীকৃতি ও বঞ্চনার গহ্বরে ডুবে আছে, তাকেই প্রত্যক্ষ বাস্তব সম্পর্কের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। অন্তত তাঁর কামনা তাই। সে-জন্যই বলা যায়, তাঁর অস্বীকৃতি স্বীকৃতির অপর দিক; ত্যাগের প্রেরণাও ভোগের প্রেরণাসঞ্জাত। শ্রীকৃষ্ণ, যিনি বিষয় পথ ছেড়ে ধর্ম্ম আচরণের উপদেশ দিচ্ছেন, তাঁকেই দেখছি পরম ভোগীরূপে; যিনি ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করে ব্রহ্ম চেতনায় নিমগ্ন হওয়ার উপদেশ দিয়ে বলছেন—

শ্রবনেতে না শুনে নয়ানে না দেখে।
নাসিকা নালএ গন্ধ জিভ্‌া নাহি ভখে॥
পরস না লএ চর্ম্ম সর্ব্ব সমান।
সরূপে লভিল স্বরূপ পাইল ব্রহ্মজ্ঞান॥

(ঐ; পৃঃ ৬৩২)

তিনি ইন্দ্রিয় সুখকর কার্য্যে আত্মনিয়োগ করতে কুণ্ঠিত নন। মালাধর শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকা জীবনের যে চিত্র এঁকেছেন, তাও অনুরূপ ইন্দ্রিয়সুখকর। যথা,—

নানা সুখে বাড়ে গোসাঞের বংস তোথা।
সর্গে হৈতে পারিজাত আরোপিল জোথা॥
দেব দানবের রাজ্যে জত রত্ন ছিল।
সকল আনিঞা গোসাঞি দ্বারকা পুরিল॥
অকালে মরন নাহি চিন্তা ভয় সোক।
গোবিন্দ চরন সেবি আছে সব লোক॥
দ্বারিকার মহিমা কহিব কোন জন।
অবতার কৈল তথা দেব নারায়ন॥
গোসাঞের পুত্র পৌত্র জতেক কুমারে।
কোন জন আছে তারে গনিবারে পারে॥
কুমার পড়াইতে আইলা যতেক ব্রাহ্মণ।
তিন কোটি আসি লক্ষ তাহার গনন॥ ইত্যাদি

(ঐ; পৃঃ ৬৩১)

শুধু তাই নয়, মালাধর কৃষ্ণচরিতের 'আলাপে' যে মোক্ষ লাভের কল্পনা করেন, তাও চাওয়ার আকৃতিতে, ভোগের আনন্দে রঙীন। তিনি বলছেন—

ধন-ধান্যে পুত্রে পৌত্রে বাড়িবেক লোক।
ইহা জেই সুনে নাহি পাএ কোন সোক॥
নিতি নিতি সুনিলে বাড়ে জাএ সর্গস্থল।
সকল সম্পদে তার জাএ সর্ব্বকাল॥
শ্রীকৃষ্ণ-বিজয় পুথি থাকে যার ঘরে।
অকালে মরন তার নহে কোন কালে॥

(ঐ পৃঃ ৬৬৬-৬৭)

এই কামনা ও চিত্রের সংগে কবির—

গৃহপুত্র কলত্রাদি দেহ বিসর্জ্জন।
জলের বিম্বক হেন কেহ স্থির নহে॥
পথিকে পথিকে জেন পথে পরিচয়॥

(ঐ পৃঃ ৬২০)

এই উক্তি নিতান্তই বেমানান। কবির একান্ত পার্থিব মন এই পৃথিবীর বুকেই সুখ-স্বচ্ছন্দে আনন্দে বিচরণের প্রয়াসী, কিন্তু এই সামান্য ব্যবস্থায় তার কোন আশা চরিতার্থ হয় না বলেই তার দুঃখ, আর এই দুঃখ থেকেই তাঁর পরিহার প্রবৃত্তির উদ্ভব। কিন্তু এই পরিহার চেতনা থেকে তাঁর জীবনের চেতনা, বাঁচার সহজ আনন্দ ও ভোগের আকাঙ্ক্ষা বহুগুণে প্রবল ও সজীব। তাই গ্রন্থের পাতায় পাতায় সে নিজেকে প্রকাশ করে চলেছে। কবি জীবনকে অস্বীকার করতে চাইলেও জীবন কবিকে অস্বীকার করেনি। তাই কবির ভাবাকাশ নিতান্তই বস্তুধর্ম্মী। বলা বাহুল্য, এই বস্তুধর্ম্মীতা ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি-মানসের অঙ্গীভূত নয়।

মূল ভাগবতে তৎকালীন ব্রাহ্মণ্য সংস্কার সংস্কৃতির বিরুদ্ধে একটা মূলগত প্রতিবাদের সুর অনায়স লক্ষ্য। তাই ভাগবতকার ঈশ্বরের আরাধনায় কিরাত, পুলিন্দ পুক্কস, যবন প্রভৃতি ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির মতে ম্লেচ্ছ জাতিরও অধিকার ঘোষণা করেছেন। সামাজিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে তিনি প্রচার করলেন তার সমদর্শন। শ্রীকৃষ্ণ-বিজয় একান্তভাবে ভাগবত অবলম্বনে রচিত বলে, এই সমদৃষ্টি মালাধর বসুর মধ্যেও সবিশেষ লক্ষ্যণীয়। শ্রীকৃষ্ণের মুখনিসৃত উক্তি, যথা—

সভাকার এক আত্মা ভিন্ন না মানিহ।
পর আত্মাএ নিজ আত্মাএ বেথা নাহি দিহ।

(পৃঃ ৬২৭)

এবং

সর্ব্বভূতে হের আমি দেখাল্য তোমারে।
ভূতে দয়া জেই করে সেই ত আমারে॥
ভূত হিংসা জেই করে সেই আমার বৈরি।
অহিংসা পরম ধর্ম্ম থাকহ আচরি॥ (পৃঃ ৬২১)

ইত্যাদির ভিতর দিয়েই যে এই সমদৃষ্টির অভিব্যক্তি লাভ করেছে, তা নয়, গ্রন্থের ইতস্তত বিক্ষিপ্ত বহু কাহিনীকে অবলম্বন করে এই ভাব প্রকাশ পেয়েছে। "যেমন পৃথুবির ভার হর মারিয়া অসুরে", "ধর্ম্ম হিংসা জেই করে অকালে সেই মরে" ইত্যাদি। এই সব উক্তি থেকে নিশ্চিতরূপে অনুমান করা যায়, বিভিন্ন ধর্ম্মমতের সংঘাতে এবং সমাজ আদর্শের ঘাত-প্রতিঘাতের তরঙ্গে সমাজ-মানস কোন দিকে প্রবাহিত হতে আরম্ভ করেছে; বোঝা যায়, মালাধর বসু এবং তাঁর সমকালের সামাজিক মানুষ কোন সৃষ্টিধর্ম্মী আদর্শের জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়েছেন, এই আদর্শ বিশেষ কোন ব্যক্তিগোষ্ঠী বা সম্প্রদায়কে কেন্দ্র করে গড়ে উঠবে না, সকলকেই সমানভাবেই আলিঙ্গন করবে। কাউকে অবহেলা করে না, সকলকে সমর্য্যাদায় স্বীকার করে নিয়েই সে প্রতিষ্ঠিত হবে। এই ভাবে ব্যক্তিক বা গোষ্ঠী সীমানা অতিক্রম করে সর্ব্বত্র প্রসারিত হওয়ার চেতনা মালাধরের মধ্যেও লক্ষ্য করা যায়। সেই উদ্দেশ্যেই তার শ্রীকৃষ্ণ-বিজয় রচনা। তিনি বলছেন—

ভাগবত অর্থ জত পয়ারে বাঁধিয়া।
লোক নিস্তারিতে করি পাঁচালি রচিয়া॥

ভাগবত শুনি আমি পণ্ডিতের মুখে।
লৌকীক কহিল লোক সুন মহাসুখে॥ (পৃঃ ৩)

তাঁর উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট; সেটা হলো লোকশিক্ষা। তিনি পণ্ডিতের মুখে ভাগবত শ্রবণ করে সর্ব্বসাধারণের জন্য লৌকিকভাবে পয়ারে রচনা করেছেন। তাঁর উদ্দেশ্যই তাঁকে সংকীর্ণ সীমা লঙ্ঘন করে বহুর সান্নিধ্যে সমগ্রের মধ্যে টেনে নিয়ে গিয়েছে। অগ্রচারী যুগ ভাবধারার বৈশিষ্ট্যই তাই।

আরও একটি দিক থেকে মালাধর ভবিষ্যতের হয়ে ভূমি প্রস্তুত করেছেন। কান্তাভাবে ঈশ্বরোপাসনা ভক্তিবাদের একটি প্রধান সূত্র। এই কান্তাভাবে উপাসনার চেতনা মালাধরে বর্ত্তমান ছিল। তিনি বলছেন—

এক ভাবে বন্দো হরি জোর করি হাত।
বসুদেব সুত কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ॥ (পৃঃ ১)

শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্ব্বে এই চেতনার লক্ষণ সত্যই বিস্ময়কর। তা ছাড়া ভারতে ইসলামের আবির্ভাবের ফলে ধর্ম্মীয় চিন্তায় যে একেশ্বরবাদ পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়, তার পূর্ব্বাভাসও মালাধর বসুর গ্রন্থে রয়েছে। কৃষ্ণের স্তবে তিনি বলছেন—

তুমি দেব নিরঞ্জন দেব প্রজাপতি।
তুমি দেব মহেশ্বর তুমি উমাপতি॥
তুমি চন্দ্র তুমি সূর্য্য তুমি তারাগণ।
তুমি দিবা তুমি রাত্র দণ্ড প্রহর ক্ষণ॥
তুমি জপ তুমি তপ তুমি যজ্ঞদান।
তুমি যোগ তুমি ভোগ পরম গিয়ান॥
শ্রীষ্টি স্থিতি প্রলয় তুমি নারায়ণ।
তোমার নিদ্রা সে নিদ্রা জাগিতে জাগরণ॥
ইত্যাদি (পৃঃ ৩৩-৪)

মালাধর বসু কালান্তরের মুখে বসে তাঁর গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। তাই কালান্তরে প্রবেশের জন্য ব্যাকুল বিভিন্ন ভাবধারা অলক্ষ্যে তাঁর কল্পনা ও লেখনীকে অবলম্বন করে ব্যঞ্জনা লাভ করে। তাঁর মধ্যে যে চিন্তা ও ভাবের সূচনা তাই পরবর্ত্তীকালে শ্রীচৈতন্য ও বৈষ্ণব-গীতি কবিদের মধ্যে পূর্ণতা অর্জ্জন করে। শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের গুরুত্ব এইখানে যে, ইহা ধর্ম্ম সমন্বয়ের আগমনকে সহজ করেছে।

বসন্তে

শ্রীবিভূতিভূষণ বিদ্যাবিনোদ

অন্তর কেন চঞ্চল হ'ল
আজি বসন্ত-বায়ে,
পুলকের মধু-পরশ কাহার
লাগিল সারা এ গায়ে!

প্রভাত-কিরণে নব কিশলয়
হাতছানি দিয়ে ডাকে,
বিকশিত শত কুসুম কাহার
হাসিমুখখানি আঁকে।

চুত-মুকুল মদির গন্ধ
মন-ভ্রমরায় করিল অন্ধ,
পাপিয়া পাগল পুকারি পুকারি
বন অঞ্চল ছায়ে,
পুলকের মধু-পরশ কাহার
লাগিল সারা এ গায়ে!

এ কী অধীরতা আকাশে বাতাসে,
কে তাহার লিপি পাঠালো আভাসে,
চচিতে মুখর দিশি দিশি কা'র
বন্দনা তরে ধায়ে—
পুলকের মধু-পরশ কাহার
লাগিল এ মোর গায়ে!

একটি ভ্রমণ কাহিনী

প্রভাত দেবসরকার

এখনো শোভার আড়ষ্ট ভাবটা কাটলো না। কি জানি কেন, আজো স্বামীর সঙ্গে মুখ তুলে কথা কইলে না সে। কি যে সংকোচ ওর! লজ্জাও হ'তে পারে—

প্রিয়তোষ পেড়াপিড়ি কম করেনি, কিন্তু নব বধূকে মনের মত করে' কিছুতে সে কাছে পায়নি। কোথায় যেন একটা বাধা রয়ে গেছে। খুব সাধ্যসাধনায় যে-সাড়া পায় তাতে মন ভরে না। শোভা এমন ভাবে টেঁকি-গেলা হ'য়ে কাছে আসে, বলবার নয়। প্রিয়তোষ জিগ্যেস করে, অমন করে আছ কেন, আমি কি বাঘ না ভল্লুক? দাঁড়িয়ে আছ কেন, বল না!

বিরস মুখে শোভা জবাব দেয়, কেন, কেমন করে আছি! বেশ তো, বলনা কি বলবে!

হয়তো প্রিয়তোষের কিছু বলবার ছিল, হয়তো কিছু ছিলনা—কিন্তু শোভার প্রশ্নে আর কিছু বলবার থাকে না। অপ্রস্তুতের একশেষ। এরপর শোভা সপ্রতিভ হ'য়ে স্বামীর মুখের উপর চেয়ে নিঃশব্দে হাসে, কিন্তু সে-হাসির আলোকে প্রিয়তোষকে উজ্জ্বল দেখায় না। পছন্দমত বৌ মনের মত হয়না কেন, প্রিয়তোষ ভেবে পায় না। শোভা আজো তার কাছে রহস্য। রঙ-চঙ-এ খেলনার মত নিজে থেকে নাড়াচাড়া করলে তবে বাজে, নইলে একধারে প'ড়ে থাকে—নির্জীব, নিষ্প্রাণ!

অথচ দেখে শুনে পছন্দ ক'রে প্রিয়তোষ এমনটা প্রত্যাশা করে নি। পাত্রী নির্ব্বাচনে নিজের বুদ্ধি বিবেচনার ওপরই সে বিশেষ নির্ভর ক'রেছিল—অনেক বাছ-বিচার অনেক দিন ধ'রে চালিয়েছিল। নিজের চোখ আর মনকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে একমত করতে অনেক চোখকে সরস আর অনেক মনকে বিরস করতে হ'য়েছে। কিন্তু শোভা প্রিয়তোষকে হতাশ ক'রেছে। ঠিক দুঃখ নয়, কেমন একরকম খোঁচার মত শোভার সান্নিধ্য প্রিয়তোষের মনে হয়, কে জানে কৃতকর্ম্মের ফল কিনা? দু'জনেই দু'জনের কাছে যেন অপরাধী হ'য়ে আছে অজান্তে। অকারণেও হয়তো।

অনেক দিন পরে আজ হঠাৎ দক্ষিণা বাতাস বইতে সুরু ক'রেছে। শহরের ধুলোয় মাদকতা। ঝরা পাতায় প্রাণের সাড়া।

শোভা জানালায় দাঁড়িয়ে ছিল। সামনে চৌরাস্তার মোড়টা দমকা বাতাসে ঘুলিয়ে উঠে অন্ধকার হ'য়ে যায় কিছুক্ষণের জন্যে, ধুলো উড়ে জীর্ণ পাতা ছুটে একাকার। বাতাস থামলে আবার যে-কে-সেই। মোড়ের মাথায় অদৃশ্য কারা যেন ম্যাজিক করছে মন্ত্রপূত ধুলো ছিটিয়ে। আনমনা লক্ষ্য ক'রে শোভার মনটাও লঘু হ'য়ে ওঠে। তার বিয়ের পর এই বোধ হয় প্রথম বসন্ত। একটু কেমন শিরশিরে ভাবও আছে ঐ লুটো-পুটি বাতাসে। জানালার বাইরে হাত বাড়িয়ে ওদের ডাকা যায় না? ওরা আসে না ডাকলে? তার জানালার সামনে খেলা করে না?

শোভার মাথার ঘোমটা খ'সে গিয়েছিল, বক্ষ-বাস শিথিল হ'য়েছিল। দৃষ্টি উন্মনা হ'য়েছিল। কি ভেবে হাসলে সে আপন মনে। দু'-এক লাইন গানের কথাও মনে হ'লো। আশ্চর্য্য, কতকাল গান গাওয়া হয় নি! বিয়ে হ'য়ে যেন বন্দী হ'য়ে আছে সে।

শোভা আপন মনে গুণ-গুণ করতে থাকে। হঠাৎ খুসীতে নিজেকে ভুলে যায় সে—বধূ নয়, গৃহিণী লক্ষ্মী নয়, কুমারী প্রিয়া সে। কোন সম্বন্ধে কারো ঘরণী সে নয়। কে বলে বন্দী সে—কার সাধ্য তাকে বন্দী ক'রে রাখে! ঐ দুরন্ত বাতাসের মত বন্ধনহারা সে।

প্রিয়তোষ কখন এসে দাঁড়িয়েছিল পাশে, শোভা টের পায় নি। প্রিয়তোষও কোন সাড়া করে নি, নববধূকে যেন সে এই ভাবেই দেখে বুঝতে চায়—দুঃখটা কি, ব্যথাটা কিসের? অত আড়-আড় ভাব কেন?

না, কিছুই বোঝা যায় না। এখন ভাল লাগে শোভাকে, ছেলেমানুষের মত ওর মুখচোখ আপন প্রাণরসে উদ্ভাসিত। প্রিয়তোষ মনে মনে কৌতুক বোধ করে।

প্রিয়তোষ ডাকবে কি ডাকবে না ভাবতে ভাবতেই শোভা ঘুরে দাঁড়াল বিস্রস্ত বাস ঠিক করতে। স্বামীর সঙ্গে চোখাচোখি হ'তে নিঃশব্দে হাসলে, হাসি দিয়ে হাসি বুঝতে প্রিয়তোষও হাসলে। চুরি ক'রে দেখার অপরাধ স্বীকার করলে।

প্রিয়তোষ জিজ্ঞেস করলে, কি ব্যাপার! জানালায় দাঁড়িয়ে যে?

হাসিতে উচ্ছল শোভা জবাব দিলে, পথ চেয়ে, কেন?

কি ভাগ্যি, আজ কার মুখ দেখে উঠেচি! প্রিয়তোষ সরে আসে কাছে।

শিথিল কবরী মণিবন্ধে ঘুরিয়ে ঠিক করতে করতে শোভা স্মিত মুখে বলে, কার আবার! আমার।

হাতের নাগালে আর কিছু না পেয়ে আঁচল ধরে প্রিয়তোষ টান দেয়, তাই নাকি! রোজ কি এমন প্রভাত হবে?

কেন, হয় না নাকি! শোভা দমকা হাওয়ার মত ঘর থেকে বেরিয়ে যায় ছুটে।

প্রিয়তোষ হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে থাকে। জানালার বাইরে আকাশটা আবির-গোলা, কি আশ্চর্য্য শোভা কথা বলে, কেলি রহস্যে মাতে! রহস্যালাপ করে!

ঘুরে এসে শোভা বলে, চলনা কোথাও বেড়িয়ে আসি। আজ বেশ বেড়াবার দিন কিন্তু!

অবাক লাগে প্রিয়তোষের স্ত্রীর প্রস্তাবে। স্ত্রী-চরিত্রের রহস্য বোঝাই ভার। হঠাৎ একি কাণ্ড আজ—

প্রিয়তোষকে চুপ করে থাকতে দেখে শোভা অভিমান করে, ও—সময় নেই বুঝি? থাক তবে।

ঠিক কি জবাব দেবে প্রিয়তোষ ভেবে পায় না, কি বলবে সে, বর্ত্তে গেছে না ব্যস্ত হয়েছে। সত্যিই সময় নেই তার স্ত্রীকে পাশে নিয়ে বেড়াতে। নিছক স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধে বিলাস-ভ্রমণের অবসর কোথায়! শোভা কোন দিন যায় নি, আজ হঠাৎ এ খেয়াল কেন!

প্রিয়তোষ অবিশ্বাসের সুরে বলে, সত্যি যাবে?

শোভা আরো যেন রহস্যময়ী হয়ে ওঠে: না কি মিথ্যে! চল না, অনেক দিন বেরুন হয়নি। না বললে তো তুমি নিয়ে যাবে না!

প্রিয়তোষ নির্ব্বিবাদে দোষ স্বীকার করে নেয়। দোষ তারই। শোভার কোন দোষ ছিল না। প্রিয়তোষ জিজ্ঞেস করলে, কোথায় যাবে? হেসে শোভা বললে, যেখানে খুসী। ট্রামে করে এদিক ওদিক।

পা বাড়িয়ে প্রিয়তোষ বললে, চল, দেরী কেন তবে!

শোভা কপট কোপ প্রকাশ করে, বারে, এই বেশে! একটু দাঁড়াও—

মেয়ে দেখার দিনটি প্রিয়তোষের স্মরণ হয়। এই রকম অপরূপ সাজে কন্যা সভায় উপস্থিত হয়েছিল। সেদিনের আরক্ত লজ্জাটুকু বাদ দিলে যেন আজকের শোভাকে খুঁজে পাওয়া যায়। এতটুকু বদল হয় নি—সেই কবরী-বন্ধ, সেই অলঙ্করণ, সেই মার্জ্জিত মুখশ্রী, সেই আনম্র দৃষ্টি।

অনেক দেখায় এমন দেখাটি প্রিয়তোষের আর কোন-দিন চোখে পড়েনি। প্রিয়তোষের পছন্দ হ'য়ে গিয়েছিল। নিজেকে ভাগ্যবান বলে' মনে করেছিল সে বিনা দ্বিধায়।

সেজে গুজে এসে শোভা বললে, এস।

ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে চেয়ে প্রিয়তোষ না-বোঝার মত বললে, চল।

শোভা তাড়া দেয়: অমন করে দেখছো কি হাঁ করে!

অকপটে প্রিয়তোষ উত্তর দেয়: তোমাকে। চমৎকার মানিয়েছে কিন্তু!

হেসে কুটিকুটি হয় শোভা: তাই নাকি! সত্যি!

নতুন করে' পাওয়ার আনন্দে প্রিয়তোষ গদগদ হয়ে বলে, সত্যি! ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে তোমাকে আজ।

শোভা কৃত্রিম কোপে বলে, থাক, হ'য়েছে!...এখন এস।

বলবার অনেক কথা প্রিয়তোষ গুলিয়ে ফেলে। কাঁচপোকার আরশোলা ধরার-মত আবিষ্ট হ'য়ে পড়ে। এতদিন সত্যিই সে শোভাকে চিনতে পারেনি, বুঝতে পারেনি—মিথ্যে মনস্তাপ করেছে। শোভা শোভাই।

স্বামী-স্ত্রীতে পাশাপাশি বসে যাবার সৌভাগ্য হ'লো না ট্রামে। না হোক, খানিকটা গিয়ে এখুনি তারা নেমে

পড়বে। মাঠের ওপর পাশাপাশি হেঁটে বেড়াবে। অস্তাচলের রক্তিমাভা মনে ধরবে। ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে মাঠটা বৈকালিক আলোছায়ায়। গোচারণ মাঠে নিঃশব্দ আলোর সঞ্চারণ রঙ-বেরঙ, আবির ছুট্।

ছ'ষ্টপেজ পরে শোভার পাশের মেয়েটি উঠে গেল। সিট খালি হলো। অদূরে দাঁড়িয়ে প্রিয়তোষ তাক করতে লাগলো, স্ত্রীর পাশে গিয়ে বসবে কি না ভাবতে যেন অনেকটা দেরী হয়। এখন শোভার পাশে গিয়ে বসাটা তার পক্ষে অনুচিত না হ'লেও যেন অশোভন দৃষ্টিকটু হ'বে—ভিড়ের মধ্যে স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধটা যেন সে হারিয়ে ফেলেছে, প্রিয়তোষ পাশে বস্তে গেলেই নিঃশব্দ আপত্তি উঠবে, বহু দৃষ্টিতে সন্দেহ ফুটবে অহেতুক। লজ্জার একশেষ!

প্রিয়তোষ স্বভাবতই সঙ্কোচ বোধ করে। শোভাও ডাকতে পারে না। তারও ইচ্ছে নয়, কেউ জানুক তারা স্বামী-স্ত্রী বেড়াতে বেরিয়েছে, নরোচা সে, কারো সমভিব্যাহারিনা সে।

খালি সিটটা খালি-খালি লাগে—একটা অস্বস্তিকর লাজুকতা শূণ্য আসনটা জুড়ে পরপুরুষের গাত্র স্পর্শের মত শোভাকে সঙ্কুচিত করে রাখে। এত চোখের লুব্ধ দৃষ্টিতে জানালার বাইরে থেকে চোখ ফেরান যায় না। এখন কোন রকমে নেমে যেতে পারলে যেন বাঁচা যায়।

ধারে কাছে প্রিয়তোষ নেই যে, শোভা ডেকে কথাটা বলবে। কাজ নেই বাপু আর বেড়িয়ে, বাড়ী ফিরে চল! মাগো কি ভিড়!

স্বামীকে কাছে পাবার জন্মে শোভা মুখ ফেরালে। মানুষের ভিড়ে চোখ ছুটো আটকে যায়, ভানুমতীর খেলা দেখার দর্শকের মত তাকে ঘিরে ভিড়টা আশেপাশে জড় হ'য়েছে। চেনা মানুষটার পাত্তা নেই।

চোখ তুলতে শোভা চেনা মুখ একটা দেখতে পায়। প্রিয়তোষ নয়, আর একজন। বিস্মিত চাপা কণ্ঠে শোভা বলে, বিশুদা!...

কোটপ্যাণ্ট পরা দোহারা লোকটি কম অবাক হয় না। একটু যেন শব্দ করেই জবাব দেয়: শোভা! তারপর খবর ভাল?

শোভা ব্যস্ত হ'য়ে ইশারায় কাছে ডাকে। অস্ফুটে আলাপ করে, কতকাল দেখা নেই...পাড়া ছেড়েছি বলে আমরা একেবারে পর হ'য়ে গেছি—কোন খবর নেই!

পাশে বসে বিশুদা আপত্তি করে, না, না, তা কেন... নানা ঝঞ্ঝাট, সময়ই পাই না!

শোভাকে আশ্চর্য্য রকমে সপ্রতিভ দেখায়: বাজে কথা ছেড়ে দাও না, বল আর যাবার দরকার ছিল না... সম্বন্ধ তো কিছু নেই!

বিশুদা ঘাড় নাড়ে: কি মুশকিল! ওকথা কেন! সত্যি যাবার সময় পাইনি। সংসার নিয়ে জড়িয়ে পড়েছি এমন—

রহস্য করতে গিয়ে শোভার গলাটা হঠাৎ কেঁপে ওঠে: কেন, বিয়ে করেছো নাকি!

বিশুদা হাসে: বিয়ে না ক'রলে বুঝি সংসারের আর ঝক্কি নেই?...মা বাবা ভাই-বোন এরা!

শোভা ছেলেমানুষের মত জেদ ধরে: তুমি বিয়ে করেছো কিনা তাই বল! মা-বাবার কথা পরে বলো।

বিশুদা চুপ করে হাসে। কি শুনলে শোভা খুশী হ'বে, এখনো তেমনি সরল আছে শোভা। বিশুদার বিয়ের খবরটা না জানলে বোধ হয় তার রাত্রে ঘুম হবে না আজ।

বিশুদা যদি আর একটু সজাগ হ'তো, তা হ'লে হয়তো স্পষ্ট দেখতে পেতো—খবরটা জানবার জন্যে শোভার সপ্রশ্ন দৃষ্টিটা কি পরিমাণ উৎসুক হ'য়ে আছে। ছেলেমানুষীটা কিসের তাড়ায় গুরুগম্ভীর হ'য়ে উঠেছে। কিন্তু লাভ কি আর সে খবরে?

হঠাৎ বিশুদা জিগ্যেস করে বসে: তোমার?

লজ্জায়, সঙ্কোচে, জড়তায় শোভার মাথাটা হেঁট হ'য়ে যায়। বিশুদার কাছে মুখ না-দেখাবার মত যেন অপরাধ করেছে সে।

সিঁথির উজ্জ্বল সিঁদুর-রেখায় বিশুদা চমকে ওঠে, কি বোকার মত প্রশ্ন করেছে সে, ছি-ছি, অন্ধের মত এ কি প্রশ্ন করলো সে!

শোভা মুখ তুলতে বিশুদার সঙ্গে চোখাচোখি হয়। ছ'জনের মুখেই ম্লান হাসি ফুটে ওঠে। উভয়ের কেউ কিন্তু

স্পষ্ট করে বোঝে না, এ নিঃশব্দ হাসির অর্থ কি! ব্যক্তিগত সংবাদে হাসির গুরুত্ব কিছু নেই।

বিশুদা যেন অবাক হয় : তা একলা বেরিয়েচ ?

শোভা হাসি মুখে বলে : না, সঙ্গে আছেন।

সাগ্রহে বিশুদা বলে, আলাপ করিয়ে দাও।

হবে'খন, কই তোমার কথা বললে না ? শোভা বিশুদাকে অন্য কথা বলতে দেবে না।

বলবো'খন। হঠাৎ বিশুদা বড় গম্ভীর হ'য়ে যায়।

শোভা ঠিক বুঝতে পারে না—প্রশ্নটা তার অন্যায় হয়েচে কিনা। অপ্রস্তুতের মত শাড়ির আঁচল পাকিয়ে অন্যমনস্ক হ'তে চেষ্টা করে, গত চার বছরে বিশুদার অনেক পরিবর্ত্তন হ'য়ে গেছে—মুখচোখে কিসের ছায়া পড়েছে, রঙ অনেকটা কালো হয়েছে, মাথার চুল পাতলা হ'য়ে গেছে।

হঠাৎ বিশুদা রহস্য করলে, বিয়ের নেমন্তন্নটাও ফাঁকি দিলে! একপাত খাবার যোগ্যতাও কি ছিল না ?

শোভা চুপ। ওকথা তুলে আর লাভ কি। চার বছরের মধ্যে একদিনও যদি আর দেখা হ'তো। সেই যে ওঁরা উঠে গেলেন আর খবরও দিলেন না—পথে ঘাটেও আর দেখা হ'লো না। বুঝলেও অভিমান করতে শোভা ছাড়েনি। তার বাড়ীর সঙ্গে যাই হোক না কেন, বিশুদা তাকে শুদ্ধ ছেঁটে-কেটে বাদ দিলে কেন! সে কি দোষ করেছিল ?

বিশুদা তেমনি রহস্য করছে : খেতে না ডাকতে, পরিবেশন করতে ডাকতে পারতে—অলাভ হ'তো না তোমাদের। কোমরে তোয়ালে জড়িয়ে দেখতে একবার ছোটাছুটির বহরখানা! বিশু আর যাই হোক কুঁড়ে নয়।

শোভা নীরব পাথর, পাশে বসে কে যেন কি বলছে—হয়তো অশ্রুপাতের সূচনা।

মুখ ফিরিয়ে বিশুদা স্তব্ধ হ'য়ে যায়। ছি, ছি, বড় অন্যায় করে ফেলেছে সে। অপরাধীর মত অন্যায় স্বীকার করে' বিশুদা বলে, রাগ করলে ?

ধরা গলায় শোভা বললে, না, সত্যি কথা তো, রাগের কি আছে! হঠাৎ বিশুদা ব্যস্ত হয়ে ওঠে : এইবার আমাকে নামতে হ'বে। ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হ'লো না একদিন নিয়ে এসো না আমাদের ওখানে!

শোভা চুপ করে থাকে। বিশুদারই বোধ হয় খেয়াল হয়—কি বুদ্ধি দেখ, ঠিকানা না বললে কোথায় আসবে! —এখন আমরা টালীগঞ্জে আছি, দুই-এর তিন-এর এফ, রসা রোড—মনে থাকবে ?

শোভা ঘাড় নাড়লে। বিশুদা ঠিকানা স্পষ্ট করলে, ব্রীজটা পেরিয়ে দুটো ষ্টপেজ পরে বাঁহাতি।

যেন কালই শোভা যাবে স্বামীকে সঙ্গে নিয়ে ভুলে যাওয়া ঠিকানা পুনরুদ্ধারের চেষ্টায়।

বিশুদা উঠে ঘুরে দাঁড়াতেই প্রিয়তোষের সাম্‌নাসামনি পড়ে, দু'জনেই অবাক হ'য়ে যায়, প্রিয়তোষ প্রশ্ন করবার আগেই বিশুদা সশব্দে বলে, হ্যালো প্রিয়তোষ, খবর কি ? একেবারে ডুব !

প্রিয়তোষ কেন জানি না জড়সড় হ'য়ে যায়। বিশুদা তখনো পুরোণ বন্ধুকে হঠাৎ-পাওয়ার আনন্দ-আতিশয্যে বিভোর : তারপর করচো কি! বিয়ে থা ? সীতু বেচারা প্রায়ই তোমার খোঁজ করতো।

ষ্টপেজ পেরিয়ে যায়, তবু বিশুদা নামে না। বিশুদা বলে, বেচারা সত্যি তোমাকে খুব লাইক করতো।

প্রিয়তোষ বিষয়ান্তরে যায় : তোমার খবর কি—আমাদের পাড়া তো ছেড়েচো।

না ছেড়ে উপায়! তোমরা কি আর রাখলে দয়া করে—এত হাতেপায়ে ধরা, বিশুদা খোঁচা দেয়।

প্রিয়তোষ আমতা আমতা করে : বিশ্বাস কর, আমার কোন হাত ছিল না—বাড়ীর লোকের মত হয় নি।

বিশুদা গম্ভীর কণ্ঠে কৈফিয়ৎ চায় : কেন ? টাকা তো! তা হ'লে তোমাকে লাইক করার মানে কি!

প্রিয়তোষ ব্যস্ত হ'য়ে বলে, থাক ও কথা। খবর ভাল তো ?

বিশুদা চড়া গলায় বলে, না, ভাল হ'তে তোমরা দিলে কোথায়!

ব্যস্ত হ'য়ে প্রিয়তোষ বল্‌লে, বাদ দাও ওসব কথা। একদিন বুঝিয়ে বলবো ভাল করে।

বিশুদা নাছোড়বান্দা: কি আর বুঝিয়ে বলবে! এত বোকা ভাবো। ইচ্ছে করলে তুমিই সব করতে পারতে!

প্রিয়তোষ মিনতি করলে, দয়া করে চুপ কর বিশুদা, যা হবার হ'য়ে গেচে।

বিশুদা চুপ করে এগিয়ে আসে। হঠাৎ মেজাজ বদলে বলে, তারপর তুমি বিয়ে করেচ তো?

প্রিয়তোষ আসামীর মত জড়িত কণ্ঠে জবাব দেয়: হ্যাঁ।

বিশুদা পরম আত্মীয়ের মত বলে, একদিন বৌ নিয়ে আমাদের ওখানে এস। আমরা তোমার বৌ দেখবো—কেমন হ'য়েছে! তোমার বাড়ীর তো আবার অনেক বায়নাক্কা ছিল।

প্রিয়তোষ চোখ বাড়িয়ে বিশুদাকে বৌ দেখায়—ঐ যে!

সামনে অনিন্দনীয় কিছু একটা দেখলে লোকে বোধ হয় এতটা বিমূঢ় হয় না, শোভাকে প্রিয়তোষের বৌ হিসেবে দেখে বিশুদা যতটা বিমূঢ় হ'লো। খানিক্ষণ স্তব্ধ হ'য়ে থেকে মুখে বল্‌লে, ভাল।

প্রিয়তোষের পরিতৃপ্তির হাসিটা তার লক্ষ্য হ'লো না। তাড়াতাড়ি বিশুদা ঠেলেঠুলে সামনে এগুতে লাগল। এখন ভিড়ের মধ্যে মিলিয়ে যাওয়াই বাঞ্ছনীয়। পিছন থেকে প্রিয়তোষ প্রশ্ন করলে, সীতা কেমন আছে?

ঘুরে দাঁড়িয়ে ভিড়ের মধ্যে থেকে ঘাড় বাড়িয়ে সরস গলায় বিশুদা বল্‌লে, সি ইজ ডেড্!

অস্ফুটে প্রিয়তোষ আক্ষেপ করলে। শোভা কি বলতে গিয়ে চুপ করে গেল—সীতার কথা তার আগেই জিজ্ঞেস করা উচিত ছিল।

ট্রামটা থামতে গন্তব্যে নেমে বিশুদা প্রিয়তোষদের জানালার কাছে এসে নব-দম্পতিকে অভিনন্দন করলে, চিয়ারিও! বাই-বাই—একদিন এসো দু'জনে।

ট্রামটা ছাড়তে হঠাৎ যেন মনে পড়ে যাওয়ায় বিশুদা চেঁচিয়ে উঠলো: ভাল কথা, তুমি তো কবি, রাইট এ লভ পোয়েম্...সীতা লাইকড্ ইউ সো ম্যাচ্...চিয়ারিও।

স্বামীস্ত্রী দু'জনেই অবাক, কারো মুখে কোন কথা নেই। অমন একটা লোক রাস্তায় নেমে যেন পাগল হ'য়ে গেছে। কিছু বলবার না থাক, এখন উভয়কে উভয়ের যেন বোঝাবার দরকার আছে। নিঃশব্দ প্রশ্নের হুঙ্কারটা ট্রামের চাকায় গর্জ্জন করছে।

প্রিয়তোষ প্রশ্ন করলে, তোমার সঙ্গে বুঝি আলাপ ছিল?

শোভা অবিচলিত উত্তর করলে, হ্যাঁ।

প্রিয়তোষ নিজের মনে বল্‌লে, আমার সঙ্গেও। তোমার কেউ হ'ন নাকি?

তেমনি ভাবে শোভা উত্তর দিলে, না।

প্রিয়তোষ বল্‌লে, আমারও কেউ হন না। বছর দু'য়েক আমাদের পাশের বাড়ী ওরা ছিলেন, দক্ষিণ দিকে একটু বাগান মত করা যে বাড়ীটা!

শোভা হ্যা-না কিছু বল্‌লে না।

প্রিয়তোষ শুনিয়ে শুনিয়ে বলতে লাগল: লোক ওরা মন্দ নয়—তবে বড় গায়ে পড়া।

খানিকটা চুপ করে থেকে আবার বল্‌লে, আর একটু হ'লে বোনটাকে ঘাড়ে তুলে দিয়েছিল আর কি! বড্ড বেঁচে গেচি।

নীরবে শোভা চোখ তুলে স্বামীর দিকে চাইলে—সে দৃষ্টিতে যেন ভৎর্সনা ফুটে উঠেছে। মৃতের প্রতি অসম্মানের প্রতিবাদ বুঝি বা।

প্রিয়তোষ লক্ষ্য ক'রলে না। নিজে নিজে বলতে লাগল: ওরা ভাবতো মেয়ে দেখিয়ে কার্য্যোদ্ধার করবে—

হঠাৎ শোভা প্রশ্ন করে বসে: তোমাদের তো ভালবাসা ছিল।

ধরা পড়ার মত থতমত খেয়ে প্রিয়তোষ বললে, কে বল্‌লে!—বাজে কথা...ওরা যদি তাই ভেবে থাকে! একদম মিছে কথা!

শোভা আর প্রশ্ন করে না। সত্যি তার স্বামীর পূর্ব্বরাগ প্রমাণ করবার কোন সাক্ষীই এখন নেই। সীতা মারা গেছে আর বিশুদা তো পাগল—ওর কথায় বিশ্বাস কি! তা না হ'লে বোনের মৃত্যু নিয়ে কবিতা লিখতে বলে!

সহাস্যে প্রিয়তোষ নিজের সাফাই গায়: ভাগ্যি বিয়ে হয়নি…তোমাকে পেতুম তা হ'লে কি করে… দোজবরে তো আর তোমরা রাজী হ'তে না।

শোভার গাটা রি রি করে ওঠে। এমন একটা নির্লজ্জ লোকের সংস্পর্শে সে আর কখনো আসেনি। বেহায়ার মত নিজের সাফাই গাইছে।

নির্লিপ্তের মত শোভা জবাব দেয়: না হ'য়ে উপায় কি! সুপাত্রকেই লোকে চায়!

প্রিয়তোষ সশব্দে হাসে। বিশুদার বোন সীতার ব্যাপারটা শোভা কিছু বিশ্বাস করলে নাকি কে জানে! এমন করে মুখ করে আছে—কিছু বোঝবারও উপায় নেই।

যেন বিষয়টার মধ্যে কোন গুরুত্বই নেই—এমনি ভাবে প্রিয়তোষ আলাপ করে: ওদের মধ্যে ঐ একটি লোকই ভাল…সংসারটাকে মাথায় করে রেখেছে…বোনকে চেষ্টাচরিত্র করে লেখাপড়াও শেখাচ্ছিল…ইস্, বেচারাদের বড্ড ক্ষতি হ'য়ে গেল…ফর নাথিং…

নীচু গলায় সংযত কণ্ঠে শোভা বললে, ক্ষতি না হ'তেও পারতো!

কি করে? প্রিয়তোষ থতমত খেয়ে জিজ্ঞেস করে।

হেসে শোভা উত্তর দিলে, বিয়ে হ'লে ফাঁড়া কেটে যেত, কে বলতে পারে—

স্ত্রীর কথার তাৎপর্য্য কিছু না ধরতে পেরে প্রিয়তোষ সকৌতুকে বললে, তা যা বলেচো, কিন্তু—

হঠাৎ শোভা উঠে দাঁড়াল। প্রিয়তোষ বাধা দিলে, এখানে, নয় আর একটু পরে।

শোভা বললে, না। বাড়ী ফিরবো।

সে কি! মাঠে নামবে না? প্রিয়তোষ অবাক।

না। অবিচলিত শোভা ততক্ষণে স্বামীকে টপকে এগিয়ে এসেছে। অগত্যা প্রিয়তোষকেও উঠতে হয় বিরক্ত হ'রে। মেয়েছেলের মেজাজ বোঝাই ভার। কেন'র প্রশ্ন এখন অবান্তর।

তবু প্রিয়তোষ জিজ্ঞেস করে, কি হ'লো? এরি মধ্যে বাড়ী ফিরবে?

হ্যাঁ। আর কিছু গলা দিয়ে শোভার বেরুল না।

স্ত্রীর অনুগমন করতে করতে প্রিয়তোষ চেয়ে দেখলে, চোখ ওঠার মত রক্তাক্ত আকাশটা গোচারণ ভূমিকে শুদ্ধ করে দিয়েছে। স্মৃতিসৌধে ছায়া মসিকৃষ্ণ।

ভয়ে ভয়ে প্রিয়তোষ জিজ্ঞেস করে: এরি মধ্যে ফিরবে? চল না মার্কেটটা ঘুরে যাই; এলুম যখন!

আজ নয়, আর একদিন। উল্টোমুখে ট্রামের জন্যে অপেক্ষা করতে করতে শোভা বললে।

কিন্তু—প্রিয়তোষ কি বলে স্ত্রীকে রাজী করাবে ভেবে পায় না। আর কেন যে এত সঙ্কোচ বোধ করে, বুঝতে পারে না। মনে মনে অপরাধ বোধ থেকে যায় সঙ্গোপনে। কিন্তু সত্যি কিসের অপরাধ? সত্যি সীতাকে সে ভালবাসতো কি না এই তো! ভালবেসে বিয়ে না করাটা কি অপরাধ বর্ত্তমান স্ত্রীর কাছে?

তা হ'লে প্রিয়তোষও তো শোভাকে প্রশ্ন করতে পারে—বিশুদার সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক ছিল নাকি হৃদয়ের! না, অতো নোংরা সে নয়—স্ত্রীর পূর্ব্ব অবস্থা নিয়ে বোঝাপড়া করবে! ছি!

প্রিয়তোষ অনুরোধ করলে, আজ চল না! আবার কবে আসা হবে তার ঠিক কি!

অবিচলিত শোভা উল্টোমুখে তেমনি জবাব দেয়, না।

প্রিয়তোষ আর অনুরোধ করে না। মুখ বুজে পশ্চিম আকাশের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। ওদিকে আলো ফুরিয়ে বোধ হয় অন্ধকার হ'য়ে এলো। এই একটু আগে পরস্পরকে বোঝবার যে সুবিধাটা হ'য়েছিল, তা কখন্ অপহৃত হ'লো। সীতার মৃত্যুর জন্যেই কি এই স্তব্ধতা? আশ্চর্য্য নয় হয়তো!

শোভা হাত বাড়িয়ে ট্রামে উঠলো। প্রিয়তোষ পিছনে উঠে একধারে সরে দাঁড়ালো। শোভার পাশে জায়গা ছিল, তবু গিয়ে বসল না। তার মনে হ'লো, অধিকার থাকলেও পাশে বসবার বিশেষ অনুমতিটা সে পাবে না। দরকার কি শোভাকে বিরক্ত করে! ও যদি না চায়—

জানালা দিয়ে বাইরে চেয়ে দেখে প্রিয়তোষ—

মাঠে যেটুকু আলো অবশিষ্ট ছিল তাও নিভে গেছে। ভৌতিক আবিষ্টতায় গাছগুলো খাড়া হ'য়ে আছে—বসন্তের প্রথম সমীরণ মরে ঝরে গেছে।

ফিরতি ট্রামে ভিড় নেই, কারো মুখে কোন কথা নেই; —পরস্পর মুখ চাওয়াচায়ি করে বোবা হ'য়ে বসে আছে মানুষগুলো, কে জানে সীতার মৃত্যু-সংবাদ এর জন্যে দায়ী কি না!

প্রিয়তোষের ইচ্ছে করে একবার চিৎকার করে শোভাকে জিগেস করে, কি ভেবে সে অমন গম্ভীর হ'য়ে আছে, আর কিসের জন্যেই বা আজকের এমন দিনটাকে সে মাটি করে দিলে? কি অর্থ এর? কন্‌ডাকটার ভাড়া চাইতে কেবল নিজের ভাড়াটা দিলে প্রিয়তোষ। সঙ্গে যে আর একজন আছে ভুলে গেল। হয়তে আশা করলে পরমুখাপেক্ষীর যাত্রা, অত যদি নিজেই ভাড়া দিক।

না, ওদিকে কোন উচ্যবাচ্য শোনা গেল না। কন্‌ডাকটারটা সাহস করে এগুলো না। শোভা তেমনি স্তব্ধ হ'য়ে বসে আছে।

স্বামীস্ত্রীর সম্বন্ধের ফাঁকটা ধরতে পারলেও বিশুদার সঙ্গে শোভার সম্বন্ধটা বিকৃত করে' দেখতে প্রিয়তোষ সঙ্কোচ বোধ করে। শোভার গাম্ভীর্য্যের অর্থ আর যাই হোক, বিশুদা যেন না হয়। এ ভাবে ঠকতে প্রিয়তোষ রাজী নয়।

ট্রাম থেকে নেমে প্রিয়তোষ স্ত্রীকে প্রশ্ন করলে, সীতার জন্যে তোমার মন খারাপ হ'য়ে গেল নাকি!

গম্ভীর মুখে শোভা বললে, না।

তবে? প্রিয়তোষ জিগ্যেস করলে।

নিজের জন্যে! বলে' শোভা ম্লান হেসে স্বামীর মুখের উপর চেয়ে রইল।

এতক্ষণে প্রিয়তোষ সব বুঝতে পারে। শুধু যে ঠকেছে তা নয়, লজ্জা অপমানে মুখ ঢাকবার তার জায়গা নেই কোথাও। সহধর্ম্মিণীর কাছে এভাবে ধরা পড়বে প্রিয়তোষ, ভাবেনি।

নিজেকে ভুলে পাগলের মত প্রিয়তোষ চীৎকার করে উঠলো: তার মানে? কি ভাব তুমি?

ধীর কণ্ঠে শোভা বললে, কিছু না। ভাববার আর সময় পেলুম কবে!

রাস্তায় গ্যাসের আলো ততক্ষণে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছে।···

কর্ম্মবাদী

অরুণবরণ চক্রবর্ত্তী

দিবসের পিছে ধায় অনুক্ষণ যেমন শর্ব্বরী,
কৃষ্ণপক্ষ ধেয়ে চলে স্বপ্ন-ঝরা শুক্লের পশ্চাতে,
নিদাঘের অগ্নিদূত বসন্তের বিদায় ঘোষিছে;
ঊষার অঞ্চলখানি সবিতা যেমন আছে ধরি,
গভীর স্তব্ধতা নামে গগন-বিদারী বজ্রপাতে,
প্রেমের নেপথ্যগানে কামনার ইঙ্গিত বাজিছে,
তরঙ্গের পিঠে ধায় মহানন্দে তরঙ্গ যেমন,
মহাপ্রলয়ের পর আসে শান্তি সুন্দর সংযত,
জীবনের পিছে ধায় মরণ যেমন ছায়া সম,
কর্ম্মের পিছনে বন্ধু, কর্ম্মফল ছুটিছে তেমন।-
ভাগ্য মিথ্যা—জন্মক্ষণে কোন কথা নিজ ইচ্ছা মত
লিখে নাহি দেয় ভালে বিধাতার হস্ত অনুপম।

হেসে উঠি তাই বন্ধু, দেখি যবে জীবন-সংগ্রামে
ব্যর্থ পরাজিত হ'য়ে ব্যস্ত সবে ভাগ্যের দুর্ণামে।

ভারতীয় সংস্কৃতিতে ইস্‌লামের রূপ

আজহার উদ্দিন খাঁন

কথারম্ভ

বর্ত্তমানের প্রবন্ধে সংস্কৃতির মধ্যযুগের ধারা টিকে ইতিহাসের পটভূমিকায় প্রতিফলিত করে দেখাবার চেষ্টা করেছি। ভারতীয় সংস্কৃতির মর্ম্মবাণীটি জানা না থাকলে এ প্রবন্ধের বক্তব্য বিষয়টি পরিস্ফুট হয়ে উঠবে না অনেকের কাছে। তাই এখানে এসম্বন্ধে অল্প আলোচনা করা হল।

ভারতীয় সংস্কৃতির মর্ম্মবাণী সম্পর্কে সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ্ বলেছেন, "ভারতীয় সংস্কৃতি ধর্ম্মান্ধ বা সঙ্কীর্ণ মনোভাব অবলম্বনের কথা বলে নি, পরন্তু এতে বৈচিত্র্যের মধ্যে অন্তর্নিহিত পরম ঐক্যের কথাই বলেছে এবং মানবের কর্ত্তব্য সম্পর্কে এই কথাই বলেছে যে, তারা যেন বিভিন্ন মতবাদের মধ্যে অন্তর্নিহিত এই ঐক্যের সহিত তাদের অন্তরের ঐক্যসাধন করে।...এই সংস্কৃতিতে অন্ধবিশ্বাসের স্থান নেই। এতে কেবল সর্ব্বধর্ম্মের মূলনীতিই আত্মপ্রকাশ করেছে।" এই জন্যে দেখি নানাজাতির নানা ধর্ম্মের নানারূপ আচার বিচার, নানারূপ দান আমরা গ্রহণ করেছি। এরূপ গ্রসিষ্ণু শক্তি অন্য কারুর নেই বলে তাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতি পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর জগৎ থেকে বিদায় নিয়ে ইতিহাসের বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়েছে। প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে মুসলমান পূর্ব্বযুগ পর্য্যন্ত যেসব জাতির এদেশে আগমন হয়েছিল, তাদেরকে আপন করে নিয়ে মহামানবের সাগরতীর্থ রচনা করেছে, কিন্তু যখন ইসলাম এল তখন প্রথমে সে তাকে সম্পূর্ণরূপে আত্মসাৎ করতে পারল না তার উগ্র ধর্ম্মমতের জন্যে। আর ইসলামেরও সে শক্তি ছিল না হিন্দুধর্ম্মকে গ্রাস করবার, কেননা হিন্দু সাহিত্য ধর্ম্ম ও দর্শন অতি উচ্চাঙ্গের; যত বিরোধী মতবাদ ভারতের মাটিতে মথা তুলে দাঁড়িয়েছিল, কালক্রমে সে সমস্তই হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে তাদের সত্তা হারিয়ে ফেলেছে। তাই অধ্যাপক রাইস ডেভিস বলেছেন, "পৃথিবীর যাবতীয় ধর্ম্মের মধ্যে হিন্দুধর্ম্মই স্বাধীন মত ও চিন্তা প্রকাশের প্রশস্ততম অধিকার প্রদান করে।" (Budhist India)। পরে যখন ইসলাম ভারতীয় ভাবাপন্ন হল, তখন সে তাকে আপন করে নিল। তুর্ক আফগান যুগ থেকে এর সূচনা আরম্ভ হোল আর মোগল যুগের মাঝামাঝিতে এর যবনিকা পড়ল। আকবরের সমকালে পৌঁছে মুসলমানেরা ভারতীয় হয়ে পড়লেন। আকবর, দারাশিকোহ, মুসলিম সুফীসাধক কবীর দাদূ চৈতন্য নানক রজ্জব, আউল-বাউলের দল ভারতীয় সংস্কৃতির চলমান মর্ম্মবাণীকে সার্থক করে তুললেন। ধর্ম্মান্ধ ঔরঙ্গজেব ভারতীয় মর্ম্মবাণীর মূলে কুঠারাঘাত করে নিজ সাম্রাজ্যের পতনকে অত্যাসন্ন করে তুললেন।

এরপর এলো 'লৌহবাঁধা পথে অনল-নিঃশ্বাসী রথে' প্রবল ইংরেজ, এঁদেরই পো ধ'রে এলো মিশনারীরা। এদের মধ্যে কেউই ভারতীয় হলো না—ভারতকে গ'ড়ে তুললো অর্থশোষণের ক্ষেত্ররূপে। বঙ্গভঙ্গ যুগের দেশ-প্রেমিক সখারাম গণেশ দেউস্কর ব'লেছিলেন, "ইংরাজের আমলে আমাদের অন্য উন্নতি যতই হোক, ভারতবর্ষের ওপর আমাদের যে জন্মস্বত্ব ছিল, তা আমরা ক্রমেই হারাচ্ছি। এখন দেশের ধনধান্য পরে ভোগ করছে। শিল্পী আর শিল্পকৌশল প্রকাশের অবসর পাচ্ছে না, প্রতিভাশালী ব্যক্তিগণ প্রতিভা বিকাশের উপযুক্ত ক্ষেত্র পাচ্ছেন না, বলবানের বল প্রকাশের সুযোগ লোপ পেয়েছে। কৃষকের বহু যত্নে উৎপাদিত শস্য বিদেশীর উদরজ্বালা নিবারণ করছে, দেশ দিন দিন নিরন্ন ও নির্ধন হয়ে উঠছে; এক কথায়, আমরা 'নিজ বাসভূমে পরবাসী' হয়েছি।...মুসলমান আমলে ভারতবাসী পরতন্ত্র হলেও এরূপ পরাধীন ছিল না। ইংরাজের আমল হ'তেই ভারতে প্রকৃত পরাধীনতা ও পরতন্ত্রতার হয়েছে

সূত্রপাত।" তাই ইংরেজ রাজত্বের সঙ্গে সঙ্গে বিক্ষোভের দানা বেঁধে উঠেছিল সারা ভারতের বুকে।

ইতিহাসের পটভূমিকা

মুসলমানদের ভারতে আসবার আগে থেকে ভারতীয়দের সঙ্গে তাদের মানসিক যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছিল। ভারতীয় পণ্ডিতেরা বাগদাদে গিয়ে গণিত ও জ্যোতিষ শাস্ত্রাদি প্রচার করেন। 'হিতোপদেশ' 'পঞ্চতন্ত্র' প্রভৃতি গল্প থেকে অনেক গল্প আরবীয় জগতে আরবীয় ভাষায় অনুবাদিত হয়। চাণক্য, শুশ্রুত, চরক প্রভৃতিদের ন্যায়শাস্ত্র, সামরিক বিজ্ঞান প্রভৃতি অনূদিত হয়! তখন ঐস্লামিক সংস্কৃতি উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করে। ("বঙ্গশ্রী"তে আমার "ঐস্লামিক সংস্কৃতি ও বর্ত্তমান বিশ্ব-প্রগতি" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)।

সপ্তম শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধেই আরবীয়রা পশ্চিম ভারতে উপদ্রব আরম্ভ করে, কিন্তু রাজ্য বিস্তারের দিকে তাদের মন ছিল না। অষ্টম শতাব্দীর প্রথম ভাগে সিন্ধু ও মুলতান মহম্মদ বিন কাসিম কর্ত্তৃক অধিকৃত হয়। আরবীয় সভ্যতা সে-যুগে বিশেষ উন্নতিলাভ করা সত্ত্বেও তারা ভারতের উপর সংস্কৃতির প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি, তাই লেনপুল আরবদের সিন্ধু বিজয়কে ফলহীন বিজয় ব'লে উল্লেখ ক'রেছেন। একাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে এলেন গজনীর অধিপতি সুলতান মামুদ, তিনি চালালেন লুণ্ঠনাভিযান, অসংখ্য দেবমন্দির ধ্বংস করলেন তিনি, শুধু পাঞ্জাব জয় ক'রেই ক্ষান্ত হলেন। তাঁর মৃত্যুর পর প্রায় দেড়শ বছর ধ'রে তাঁর বংশধরেরা পাঞ্জাবে এসে বসবাস করতে আরম্ভ করল, ধর্ম্মপ্রচারকরাও এলো এদেরই সাথে। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ দশক ও ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে সমগ্র উত্তর ভারত মুসলমানের অধীন হয়। দিল্লী মুসলমানদের রাজধানী হল; ক্রমে দাক্ষিণাত্যেও তাদের আধিপত্য বিস্তৃত হল। প্রায় সাড়ে পাঁচশ বছর পরে সমগ্র ভারতবর্ষের অধীশ্বর তারা হয়ে উঠল।

প্রথম প্রথম মুসলমান আক্রমণ এত নৃশংসজনক ছিল যা বর্ণনাতীত। এ সম্বন্ধে ইতিহাস পাঠক মাত্রেরই অল্প-বিস্তর পরিচয় আছে।

ভারতীয়দের মধ্যে এত অধিক সংখ্যায় মুসলমান কেন এ প্রশ্ন স্বভাবতঃই অনেকের মনে জাগতে পারে। এর কারণ অনুসন্ধান করলে জানা যাবে যে, কালক্রমে একটা সঙ্কীর্ণ অনুদার ভাব ধীরে ধীরে হিন্দু সমাজে প্রবেশ করেছিল। একেলে জাতিভেদের বন্ধন কঠোর হতে কঠোরতর হয়ে উঠলো। অনুদার মতাবলম্বী গোঁড়া ব্রাহ্মণেরা আপনাদের প্রভুত্ব ও আধিপত্য বিস্তারের মোহে নিম্নজাতিদের উপর অকথ্য অত্যাচার আরম্ভ করলেন। এই বর্ণাশ্রমিকদের অমানুষিক অত্যাচারের হাত থেকে আত্মরক্ষার তাগিদেই একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে এইসব লোকেরাই ইসলামধর্ম্ম গ্রহণ করেছে। এরা তখন অবাক হয়ে দেখলো যে আগন্তুকদের ধর্ম্মে জাতিভেদ নেই, চণ্ডালও যদি মুসলমান হয়ে যায় ত সে বড় চাকুরী পেতে পারে আর তখন এমন কি ব্রাহ্মণরাও তাকে রাজপুরুষ হিসেবে খাতির করবে। তাই রাজশক্তির আশ্রয় পাবার আশায় তারা মুসলমান হয়ে গেল। তাই স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, "ভারতের দারিদ্র্যের মধ্যে এত অধিক সংখ্যায় মুসলমান কেন? তরবারী বলে তাঁহারা ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে, একথা বলা মূর্খতা। জমিদার ও পুরোহিতের দাসত্ব হইতে মুক্তির জন্যই তাহারা ইসলামধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে।" পণ্ডিতপ্রবর হ্যাভেল 'Aryan Rule in India' গ্রন্থে এ সম্বন্ধে আলোকপাত করেছেন।

সংস্কৃতি সমন্বয়

মুসলমান বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় সংস্কৃতির দ্বিতীয় পর্ব্ব আরম্ভ হল। প্রথম প্রথম তাদের ধর্ম্ম স্বাতন্ত্র্য থাকায় আতিথ্য দান সম্ভব হয়ে উঠল না। তখনকার মুসলমানদের যোগসূত্র আরব, পারস্য প্রভৃতি মুসলমান সভ্যতার সঙ্গে ছিন্ন হয়নি, তারা সর্ব্বদাই মনে রেখেছে ভারত তাদের স্বদেশ নয়—আরব, পারস্যই তাদের জন্মভূমি, তাদের প্রাণভূমি। ক্রমে যখন তারা বুঝতে পারল যে হিন্দুদের আনুকূল্য ও সাহায্য ব্যতীত রাজ্য শাসন অসম্ভব আর জাতিভেদে প্রপীড়িত হিন্দুসমাজের এক বিরাট অংশ যখন মুসলমান হয়ে গেল, তখন তারাও

অজ্ঞাতসারে ভারতীয় হতে বাধ্য হল। যতই তারা দিল্লী, জৌনপুর ছেড়ে অগ্রসর হতে লাগল, ততই সেখানকার লৌকিক আচার বিচারের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পেল। এইভাবে তুর্ক-আফগান যুগ হচ্ছে হিন্দু মুসলমান সমন্বয় ও পুনর্গঠনের যুগ। ধর্ম, ভাষা, শিল্প, সাহিত্য, সামাজিক রীতি-নীতিতে, জীবনের সর্বক্ষেত্রে এই সমন্বয়সাধন প্রচেষ্টার সুস্পষ্ট ছাপ রয়েছে। কালক্রমে আকবরের সমকালে পৌঁছে মুসলমানরা সত্যি সত্যিই ভারতীয় ভাবাপন্ন হয়ে পড়ল। কোন দেশে ইসলাম রাষ্ট্রক্ষেত্রে বিজয়ী হয়ে সমাজক্ষেত্রে এমনভাবে পরাজিত হয়নি। তাই স্যার জন মার্শাল বলেছেন—"...seldom in the history of mankind has the spectacle been witnessed of two civilisations, so vast and so strongly developed, yet so radically dissimilar as the Muhammadan and Hindu, meeting and mingling together. The very contrasts which existed between them, the wide divergences in their culture and their religions make the history of their impact peculiarly instructive..." এই মিশে যাবার ফলে মুসলমান সম্প্রদায় কয়েকটী নতুন জিনিষ দিলেন। শুধু দিলেন না, নিলেনও প্রচুর। এই দেয়া-নেয়ার ইতিহাস পরবর্তী অধ্যায়ে সংক্ষেপে বিবৃত করব।

দেয়া-নেয়ার হিসাব নিকাশ

ভাষা:—মুসলমানদের ভারত বিজয়ের পর বহুদিন পর্যান্ত হিন্দুরা তাঁদের ব্যবহৃত তুর্কী, পারসী, আরবী ভাষা প্রভৃতি বুঝতেন না। মুসলমানরাও হিন্দুদের ভাষা বুঝতেন না। ভাষা এবং ভাবের ঐক্য না হলে শাসন পরিচালনা করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। কাজেই ফারসী ও দেশীয় ভাষার মিশ্রণে দেশী ভাষা উর্দুর উদ্ভব হল। মিঃ এস এম জাফর বলেছেন, "...হিন্দু মুসলমানের মিলিত সংস্কৃতি পুরোণো খাত পরিত্যাগ করে উর্দু ভাষায় নতুন প্রণালী পথে প্রবাহিত হতে আরম্ভ করে। এ ভাবে যে সংস্কৃতির উদ্ভব হল তা বিশিষ্টভাবে হিন্দুও নয়, একান্তভাবে মুসলমানও নয়, হিন্দু ও মুসলমানের মধুময় মিলন প্রসূত।" (Some Cultural Aspects of Muslim Rule in India)।

সাহিত্য:—ভাষার উন্নতিতে সাহিত্যের উন্নতি হোল। দেশীয় ভাষার প্রতি শাসকদের নজর পড়ল, শাসিতরাও বিদেশী ভাষার প্রতি আকৃষ্ট হল। চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে হিন্দু মুসলমানের সমন্বয় ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছিল, তার পরিচয় আমরা কবি আমীর খসরুর রচনাবলী থেকে জানতে পারি। তুর্ক—আফগান যুগের মিনহাজউদ্দিন, জিয়াউদ্দিন, আফিফ প্রভৃতিদের ফারসী ভাষায় ইতিহাস উল্লেখযোগ্য। মোগল যুগে ফারসী ভাষায় আবুল ফজল—ফৈজীর গ্রন্থাবলী, বাবর জাহাঙ্গীরের আত্মজীবনী, গুলবদন—জাহানারা—জেবুন্নিসার রচনা ও কবিতাবলী, নিজামুদ্দিন—বদায়ুনী—ফিরিস্তা—আব্দুল হামিদ লাহোরী—কাফী খাঁ প্রভৃতিদের ঐতিহাসিক গ্রন্থ সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। সাহাজাহানের পুত্র সাধক দারা শিকোহ্ ছিলেন মহাপণ্ডিত। আরবী, ফারসী ও সংস্কৃত ভাষায় তাঁর বুৎপত্তি ছিল অসাধারণ। তিনি ফারসী ভাষায় উপনিষদ, ভাগবত গীতা, যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ অনুবাদ করেন। এ ছাড়া মুসলিম সাধকদের জীবনী ও সুফী দর্শন সম্বন্ধে নানা বই প্রনয়ণ করেন। তাঁর 'মির-উল-আকবর', 'মুকালম্-ই-বালোদাস' হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। তাই দারার সমাধি দেখে স্যার উইলিয়াম শ্লীম্যান মন্তব্য করেছিলেন, "যদি তিনি সম্রাট হতেন, তাহলে শিক্ষার ধরণ ধারণ পরিবর্ত্তিত হত ও ভারতবর্ষের ইতিহাস অন্যভাবে রচিত হত।" বহু হিন্দু সেকালে ফারসী ভাষা শিক্ষা করতেন এবং এই ভাষায় গ্রন্থাদি রচনা করতেন, ভীমসেন, সুজন রায় ক্ষত্রী, ঈশ্বরদাস প্রভৃতি তার উদাহরণ। হিন্দীতে পাই পঞ্চদশ শতকের বিখ্যাতমরমী কবীরের দোহাবলী, ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে মালিক মহম্মদ জৈসীর পদ্মাবৎ, তুলসী দাসের রামচরিত মানস, সুরদাস, কেশবদাস, ভূষণ প্রভৃতিদের রচনা। পণ্ডিত রামনরেশ ত্রিপাঠী কর্ত্তৃক সংগৃহীত "কবিতাকৌমুদী" নামক কাব্য সঙ্কলন খুললে হিন্দী সাহিত্যে মুসলমানদের যা দান তা বুঝতে পারা যাবে। ডাঃ তারাচাঁদ বলেছেন, "হিন্দী

ভাষার উপর মুসলিম প্রভাব এত গভীর যে, তার শব্দ-বিন্যাসে ও ব্যাকরণে, ছন্দ ও উপমায় এক কথায় সমগ্র প্রকাশ-ভঙ্গীতে তার অস্তিত্ব সুস্পষ্ট। হিন্দীর পক্ষে যা সত্য, মারাঠী, বাংলা, পাঞ্জাবী ও সিন্ধীর ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি।" (Influence of Islam on Indian Culture)। একনাথ, রামদাস, মহীপতি, ময়ূরপণ্ডিত প্রভৃতি মারাঠী ভাষার এবং নানক প্রভৃতি শিখ গুরুরা পাঞ্জাবী ভাষার সাহিত্যিক মূল্য বৃদ্ধি করেন। সংস্কৃতের চর্চ্চাও মুসলমান যুগে হয়েছে। মুসলমান সম্রাট, ওমরাহ, জায়গীরদার প্রভৃতিরা আনন্দের সঙ্গে সংস্কৃত শিখতেন ও সংস্কৃত যারা চর্চ্চা করতেন তাঁদেরকে পুরস্কার দেবার ব্যবস্থাও করেছিলেন। এইভাবে রামায়ণ, মহাভারত, অথর্ব্ববেদ ফারসী ভাষায় অনূদিত হয়। এই অনুবাদের ফলে পারসিক সংস্কৃতির ওপর হিন্দু সংস্কৃতির প্রভাব বহু পরিমাণে লক্ষিত হয়। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে মুসলমানদের প্রাণস্পন্দন বিশেষ ভাবে মুদ্রিত। কাব্য, ধর্ম্ম-তত্ত্ব, সঙ্গীত, ইতিহাস, উপাখ্যান, পীরপূজা প্রভৃতি বিষয়ে তাঁরা বহু গ্রন্থ রচনা করে বাংলা সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি করেছেন। সাধারণ ভাবে বলতে গেলে মধ্য-যুগের বাংলা সাহিত্য প্রধানতঃ রাজসভাশ্রিত ছিল। (দ্রঃ—ডঃ সুকুমার সেনের বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস) মহাভারতের প্রথম বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত হয় নাজির শাহের আমলে (১২৮২—১৩৮৫), বৈষ্ণব কবি বিদ্যাপতি প্রাদেশিক ভাষার এই পরম উৎসাহ দাতা নৃপতির উদ্দেশে তাঁর একটি সঙ্গীত উৎসর্গ করে তাঁকে অমরতা দান করেছেন। (দ্রষ্টব্য: N. N. Law. Promotion of Learning in India during Muhammadan Rule)। সুলতান রুকনুদ্দীন বারবাক শাহের (১৪৫৯—১৪৭৪) কর্ম্মচারী মালাধর বসুর (গুণরাজ খাঁন) 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' নামে ভাগবতের অনুবাদ, সুলতানের অপর এক কর্ম্মচারী গোবর্দ্ধন পাঠকের (শুভরাজ খাঁন) "পুরাণ সর্ব্বস্ব" রচনা উল্লেখযোগ্য। পঞ্চদশ শতকের শেষ দশকে হোসেন শাহের (১৪৯৩—১৫১৯) রাজসভাতে বাংলা কাব্যের জন্ম বিশেষ স্মরণীয় ঘটনা। হোসেন শাহের সেনাপতি লস্কর পরাগল খাঁন ও তৎপুত্র ছুটি খাঁনের পৃষ্ঠপোষকতায় চট্টগ্রামে বিরচিত পরমেশ্বর ও শ্রীকরণ নন্দীর অশ্বমেধ পর্ব্ব অবলম্বনে "পরাগলী মহাভারত", হোসেন শাহের পৌত্র আলাউদ্দিন ফিরুজ শাহের সহায়তায় শ্রীধরব্রাহ্মণের "বিদ্যাসুন্দর" রচনা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এরপর আসে চৈতন্যযুগ ও বৈষ্ণবযুগ। প্রেমগাথায় মুখরিত বৈষ্ণব সাহিত্যে মুসলমান কবিদেরকে যতটা আকৃষ্ট করেছে, আর কিছুই তেমন করেনি। করিমালি, আলিরাজা, সৈয়দ মর্ত্তুজা, দৌলতকাজী ও সর্ব্বশেষে আলাওলের নাম প্রসিদ্ধ। সপ্তদশ শতাব্দীতে আরাকানের রোসাঙ্গ রাজসভায় দেশী বিদেশী কাহিনী কাব্যরূপ পায়, আরব্য উপন্যাস, পারস্য উপন্যাসের জিন, পরি হুরীর নানা বুজর্গের কেরামতির ছাপ মুসলমানী কাব্য ও পুঁথিসাহিত্যে ফুটে ওঠে। অষ্টাদশ শতাব্দীতেও সপ্তদশ শতকের জের চললো পুরোমাত্রায়—শেখ ফয়জুল্লার 'গোরক্ষবিজয়', কবি আব্দুল সুকুর মামুদের "গোপীচাঁদের সন্ন্যাস", কবি জৈনুদ্দিন ও শেখ চান্দের 'রসুল বিজয়' কাব্য রচনা তার উদাহরণ।

দর্শন ও বিজ্ঞান

বেদান্ত দর্শনের মত সুফী দর্শনও সমগ্র জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মতবাদরূপে সম্মানার্হ হয়েছে। ভারতবর্ষে সুফী প্রভাব সম্বন্ধে শ্রদ্ধেয় সুনীতিবাবু বলেছেন, "সুফীদের প্রত্যক্ষ প্রভাব ভারতবর্ষের মধ্যযুগে খৃষ্টীয় পনের শতক হইতে আসিতে আরম্ভ করে। কবীর প্রভৃতি সন্তগণের অনুভূতিতে ও শিক্ষায় ও নানা বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের উপরে—আমাদের গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের উপরেও পড়িয়াছিল বলিয়া অনুমিত হয়।" বিজ্ঞান আদানপ্রদান সম্পর্কে প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ডঃ কালীকিঙ্কর দত্ত বলেছেন, "Muslim courts and Muslim preachers and saints were attracted to the study of Hindu philosophy like Yoga and Vedanta and the sciences of medicine and astrology. The Hindu astronomers similarly borrowed from the Muslim technical terms, the Muslim calculations of latitudes and longitudes, some items of the calendar (Zich) and

a branch of horoscopy called Tājik, and in medicine the knowledge of metalic acids and some processes in iatro-chemistry." (An Advanced History of India.)

(দ্রঃ "ঐস্লামিক সংস্কৃতি ও বর্ত্তমান বিশ্ব প্রগতি" প্রবন্ধ)

সঙ্গীত ও নৃত্য

বাদশাহী দরবারের পৃষ্ঠপোষকতায় মুসলমান গুণীদের সঙ্গীতকলা ভারতীয় সঙ্গীতের ঐতিহ্যকে যেরূপভাবে সমৃদ্ধ ক'রেছে, তার আলোচনা এত হ'য়েছে যে, তা' আবার সবিস্তারে বলার অবকাশ রাখে না।

ভারতীয় সঙ্গীতের প্রধানতম নিদর্শন 'ধ্রুপদে' বিশেষ দমের আবশ্যক, তাই সংযম ও মনের শক্তির বিশেষ প্রয়োজন। এখানে স্রষ্টার নিজস্ব রুচি, কল্পনা বা বৈচিত্র্যের সমাবেশ ঘটাবার স্বাধীনতা ছিল না। এরূপ কঠিন সঙ্গীতকে লোকানুরঞ্জনে অংশ গ্রহণ করতে সাহায্য ক'রেছে মুসলিম ভারতের সৃষ্টি 'খেয়াল'। এই রাগের জন্ম সম্রাট আলাউদ্দীন খিলজীর রাজত্বকালে। এই রাগের লঘুতর সন্ততি 'ঠুংরী'র প্রচলন হ'ল লক্ষ্ণৌএ, এরপর পাঞ্জাব হ'তে 'শোরী'র করুণ কণ্ঠে শোক ও বিষাদপূর্ণ 'টপ্পা' গানের উদ্ভব হ'ল। এ ছাড়া কয়েকটী মিশ্ররাগ ও কয়েকটি ছোট ছোট তালের সৃষ্টি হ'ল। রাগের সঙ্গে তালের সামঞ্জস্য বিধানের উদ্দেশ্যে মৃদঙ্গকে ভেঙ্গে তবলা ও বাঁয়ার সৃষ্টি আর সঙ্গীতে যন্ত্রসুরকে প্রাধান্য দেয়ার উদ্দেশ্যে সেতার সৃষ্টি বিশেষ স্মরণীয় ঘটনা। ভারতীয় সঙ্গীতেরই প্রচলিত কয়েকটি রাগরাগিণীর নতুন ধরণ-ধারণের সূত্রপাত হয়েছে এই যুগে, যেমন,—পুরোনো কানাড়া মোগল দরবারে ক্রমে দরবারী কানাড়া, মল্লার মিঞা তানসেনের বিন্যাস প্রভাবে হয়েছে মিঞা মল্লার। রাজদরবারকে আশ্রয় ক'রে সঙ্গীত চর্চ্চা করা ছাড়াও এক একজন গুণীর অধীনে এক একটি রাগরাগিণীর অনুসরণে এক একটি কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। এইসব কেন্দ্রে সঙ্গীতানুশীলন চলেছে পুরোমাত্রায়। এই ধরণের বৈশিষ্ট্যগুলি আজও আমাদের গুণী সমাজে বেঁচে আছে।

এখানে একটা কথা না ব'লে পারা যায় না, সেটি হচ্ছে যে, সঙ্গীতজ্ঞ সমাজ দেশের গণজীবন থেকে অনেক দূরে সরে গিয়েছিলেন—সাঙ্গীতিক বর্ণাশ্রম এ যুগে গ'ড়ে উঠেছিল। কীর্ত্তন, রামপ্রসাদী, ভাটিয়ালী, সারি, জারী, কজরী, গর্চ্চা প্রভৃতি লোক-সঙ্গীতকে তাঁরা বরাবরই উপেক্ষা ক'রেছেন, কিন্তু এইসব লোক সঙ্গীতের মধ্যেই সাধারণ হিন্দু-মুসলমান পরস্পরকে চিনেছে। এর ফলেই আমরা আজকে দেখি যে, রাগরাগিণী তালমানের সঙ্গীত সবই বনেদী ধারায় প্রবাহিত, শিক্ষিত মহলেই ওর প্রভাব সীমাবদ্ধ, কিন্তু চাষাভুষা প্রভৃতিদের কাছে ঐসব লোক-সঙ্গীত কবির ভাষায় স্বর্গের সুধাস্রোত।

নৃত্যকে ভারতীয়রা পরমাত্মার সান্নিধ্যানুভূতিতে পরমানন্দ লাভ ব'লে বর্ণনা ক'রেছেন, কিন্তু মুসলমান আমলে এ ধারা বজায় রইল না। তাঁরা বললেন, সাধারণ জীবনের সঙ্গে ভগবানের কোন সম্পর্ক নেই। নাচ, গান মানুষের পার্থিব কর্ম্ম। এই হোল ভারতীয় নৃত্যে মুসলমান চিন্তাধারার মোটামুটি আদর্শ। তাঁদের এই আদর্শ থাকায় তাঁরা সুন্দরী নারী দেখলেই হরণ করতেন, নৃত্যগীতপটিয়সীকে বলপূর্ব্বক ধরে এনে আপন সভামাঝে নৃত্যগীত করতে বাধ্য করাতেন। এর ফলে পুরনারীরা নৃত্যগীত চর্চ্চা ছেড়ে দিলেন; উত্তরাঞ্চল থেকে নৃত্য চর্চ্চা উঠে গেল: দক্ষিণাঞ্চলের মন্দিরাদির দেবদাসীরা সমাজচ্যুত হলেন। বাধ্য হয়ে জীবিকা নির্ব্বাহের জন্যে রাজসভায় বা রাজপথে এসে আশ্রয় নিলেন। এই ভাবে নৃত্যের অবনতি মধ্যযুগে হয়েছে।

শিল্প ও ভাস্কর্য্য

ভারতীয় শিল্প ও স্থাপত্য মুসলমান যুগে নতুন ভাবধারা ও নতুন গঠনরীতিতে সমৃদ্ধ হয়ে উঠলেও ভারতীয় চিত্র তার প্রশান্ত অনাড়ম্বর সূক্ষ্ম আবেদন ও আধ্যাত্মিক ভাবব্যঞ্জনা ধীরে ধীরে হারিয়ে ফেলে। এর পরিবর্ত্তে এল লালসার লালায়িত রূপায়ণ।

তুর্ক-আফগান যুগে ভারতীয় শিল্পে পারসিক ভাবধারা ও গঠনরীতির আমদানী হয়। দাসবংশের আমলে নির্ম্মিত মসজিদ ও কুতুবমিনার, খিলজী বংশের আলাউদ্দিন খিলজীর 'সিরী', তোঘলক বংশের গিয়াসুদ্দীনের 'তুঘলকাবাদ', মহম্মদ বিন তোঘলকের 'জাহান পন্না'

ফিরোজ তোঘলকের 'ফিরুজাবাদ' প্রভৃতি নগর ও হর্ম্ম্য নির্ম্মাণ এ যুগের প্রধান শিল্পকীর্ত্তি। তোঘলক শাসন-কালে দিল্লী সাম্রাজ্য ভেঙ্গে পড়ল; স্বাধীন রাজ্যের উৎপত্তি হ'ল। দিল্লীর শিল্পে খাঁটি মুসলমানী আদর্শ বিশেষ-ভাবে লক্ষ্য করা গেলেও প্রাদেশিক রাজ্যসমূহের শিল্প-রীতি হিন্দুভাবাপন্ন ছিল।

এরপর এলো মোগল যুগ। এ যুগের চিত্রকলার সমৃদ্ধি বহু জ্ঞাত ও বহু আলোচিত। তাই সংক্ষেপে মোগল যুগের চিত্রকলার বৈশিষ্ট্য নির্দ্দেশ করতে বাধা নেই। বাবরের সময় ভারতীয় শিল্পে মধ্য এশিয়ার শিল্প প্রভাব এসেছিল, আকবরের সময় ভারতীয়রীতির সঙ্গে সংমিশ্রণ ঘটলো, জাহাঙ্গীরের সময় ভারতীয় শিল্প অনুকরণরীতি পরিত্যাগ ক'রে আত্মপ্রতিষ্ঠিত হ'ল, আর শাহাজাহানের সময় সেই শিল্প চরম উন্নতি লাভ করল। সম্রাট ঔরঙ্গ-জেবের সময় আকস্মিকভাবে মোগল শিল্পের পতন ঘটে।

এই শিল্পকে কেন্দ্র ক'রে বহু শাখা-প্রশাখার উদ্ভব হয়েছে। ডঃ তারাচাঁদ এই সম্পর্কে ব'লেছেন, 'হিন্দু-মুসলমানের এই মিলিত শিল্পকলা, একদিকে যেমন অজন্তার প্রাচীর চিত্রের সহিত সম্পর্কিত, অপর দিকে তেমনি সমরখন্দ ও হীরাটের ক্ষুদ্রায়ব চিত্রাঙ্কনের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত; এতদুভয়ের মধ্যে বহু শাখা-প্রশাখা বিদ্যমান এবং তাদের ভঙ্গীগত বৈচিত্র্য বা বৈশিষ্ট্য নির্ভর করে এক বা অপরের অভিমুখীনতার উপর। জয়পুর ও কাংড়ার রাজপুত যাহাদী-প্রথা ও হিমালয় সন্নিহিত হিন্দু-রাজ্যসমূহের অঙ্কণভঙ্গী প্রাচীন ঐতিহ্যেরই রসঘন রূপায়ণ; পক্ষান্তরে দাক্ষিণাত্যে, লক্ষ্ণৌ, কাশ্মীর, পাটনা প্রভৃতি স্থানের 'কালাম' মুসলিম পদ্ধতিরই অধিক অভিমুখী; শিখ কালাম এতদুভয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থানে অবস্থিত। এদের প্রত্যেকেই দিল্লী বা আগ্রার বাদশাহী দরবারের মূলকাণ্ড হ'তে নিঃসৃত এক একটি শাখা পদ্ধতি।' (Influence of Islam on Indian culture)।

হিন্দুদের মধ্যে দেব-বিগ্রহ ও মূর্ত্তিপূজার প্রচলন থাকায় ভাস্কর্য্যবিদ্যা ভারতবর্ষে বিশেষ উন্নতিলাভ ক'রে-ছিল। পক্ষান্তরে মূর্ত্তিপূজা ইসলাম ধর্ম্মে নিষিদ্ধ হওয়ার ফলে ভাস্কর্য্যশিল্পের অনুশীলন উত্তর ভারতে ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে যায়। তবে পারস্য দেশীয় রাজন্যবর্গের দৃষ্টান্ত অনুসরণ ক'রে মোগল সম্রাটেরা তাঁদের প্রাসাদ, বাসভবন ও প্রমোদাগারসমূহের শোভা ও সৌন্দর্য সম্পাদনের জন্যে ভাস্কর্য শিল্পের সহায়তা গ্রহণ করতেন। দাক্ষিণাত্যে বিজয়নগর রাজবংশের আমলে এই শিল্পের ধারা অব্যাহত থাকলেও কিছুকাল পরেই নষ্ট হয়ে যায়। বাঙলায় নিতান্ত ক্ষীণভাবে এই শিল্পধারা ছিল বেঁচে; কৃষ্ণনগরের ভাস্কর্যই তার প্রধান নিদর্শন হিসেবে উল্লিখিত হ'তে পারে।

অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক

মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রবল স্বজাতি অভিমান ও ধর্ম্মান্ধতা থাকায় তাঁরা সকল সম্প্রদায়ের প্রতি সমদর্শী হ'তে পারেন নি; রাষ্ট্রে, সমাজে মোল্লা উলেমাদের স্থান ছিল সর্ব্বোচ্চে—বলপূর্ব্বক ধর্ম্মান্তর করানো, 'জিম্মি' নামে অমুসলমান সম্প্রদায়ের উপর অতিরিক্ত কর চাপানো, উলেমা সমর্থিত শাসনতন্ত্রের কাঠামো রচনা ইত্যাদির নজির মধ্যযুগের সমন্বয়সাধন প্রচেষ্টার মধ্যে বহু পরিমাণে রয়েছে। তবে অনেক মুসলমান শাসক ভারতীয় কৃষ্টির অনুরাগী ছিলেন এবং কৃষ্টি নষ্ট করবার প্রয়াস না ক'রে তার প্রচার ও প্রসারের নিমিত্ত যত্নপরায়ণ হ'য়েছিলেন। মুসলিম নৃপতিদের মধ্যে বাবরই প্রথম ঐতিহাসিক সত্য হৃদয়ঙ্গম ক'রেছিলেন যে, হিন্দু-মুসলিমের মিলিত প্রচেষ্টার উপর তাঁর সাম্রাজ্য টিকৃতে পারে। হুমায়ুনকে তাই তিনি উপদেশ দিয়েছিলেন, 'ভারত সাম্রাজ্য নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত। সুতরাং তোমার উচিত—সকল প্রকার ধর্ম্মীয় অন্ধতা ও গোঁড়ামী পরিত্যাগ ক'রে প্রত্যেক ধর্ম্মের বিশ্বাস অনুযায়ী বিচার করা—বিশেষতঃ গো-হত্যা করবে না। হিন্দুস্থানের জনসাধারণের হৃদয় জয় করবার এইটেই শ্রেষ্ঠ উপায়।' বাবর হ'তে আরম্ভ ক'রে অনেক মুসলমান নরপতি হিন্দু মনোভাবের প্রতি সহানুভূতি পরবশ হয়ে গো-হত্যা আইনতঃ নিষিদ্ধ না করলেও, তা' হ'তে যথাসম্ভব বিরত থাকবার জন্যে বার বার বলেছেন। আকবর ও জাহাঙ্গীর এত দূর অগ্রসর হয়েছিলেন যে তাঁরা হিন্দুদের মনোরঞ্জনের জন্যে স্থানে স্থানে সপ্তাহের

কোন একটা নির্দ্দিষ্ট দিনে গো-হত্যা বন্ধ করবার আদেশ দিয়েছিলেন। ডঃ ঈশ্বরীপ্রসাদ বলেছেন, 'দেখা যায়, ঈদ উপলক্ষে গো-কোরবাণী দেয়া হত, কারণ এরূপ বিহিত ছিল যে, ঈদ উপলক্ষে আপন আপন সামর্থ্য অনুযায়ী প্রত্যেকে নিজের নিজের বাড়ীতে একটি করে ছাগ-কোরবাণী দিবে।' (A Short History of Muslim Rule in India) পাঠানকুলতিলক শেরশাহ, আকবর, জাহাঙ্গীর প্রভৃতি সম্রাটরা জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে রাজকার্য্যে বহাল করতেন। বাদশাহ, আমীর ওমরাহরা বহু হিন্দু রমণীর পানিগ্রহণ করে একে অপরের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। এসব ধারা প্রাদেশিক রাজ্যসমূহেও চলেছিল। তাই অতুলানন্দ চক্রবর্ত্তী বলেছেন, 'কৃষ্টিগত পারস্পরিক সহযোগিতা না থাকাই যদি নিয়মরূপে স্বীকৃত হত, তাহলে হিন্দু ও মুসলমান রাজারা অন্য সম্প্রদায়ের ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য সনদ দান করতেন কেন? দক্ষিণ ভারতের ইতিহাস যাঁরা অধ্যয়ন করেছেন, আদিলশাহী, কুতুবশাহী ও আসফশাহী বংশের রাজগণ কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণদেরকে এরূপ দানের অসংখ্য দৃষ্টান্তের সহিত তাঁরা নিশ্চয়ই পরিচিত। মারাঠা রাজগণও তেমনি দিল্লী বাদশাহের সহিত বিরোধ ও সংগ্রাম সত্ত্বেও, মুসলিম ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য মুক্ত হস্তেসাহায্য বিতরণ করতেন।' (Call It Politics)।

কাগজ, গোলাপফুল, চিনির কল ও বারুদ মুসলমানরা প্রথম এদেশে আনেন; কাগজ আনার ফলে গ্রন্থের কদর বাড়ল। দীপদাম, আয়না, বিবিধ প্রকার ব্যঞ্জন রাঁধবার প্রণালী লৌকিক জীবনে এঁরা আনলেন। শ্রীযুত গোপাল হালদার ভূমিব্যবস্থায় ও রাষ্ট্রশাসন ব্যবস্থায় মুসলমান আগমনে কি পরিবর্ত্তন এলো, তার একটা মোটামুটি হিসেব দিয়েছেন: 'কৃষি সমাজের পরিবর্ত্তন হইল না বটে, কিন্তু তাহার সামন্ততন্ত্র জায়গীর-দারীরূপে এসে পরিস্ফুট হইল। প্রথম দিকে জমিজমার বন্দোবস্ত, খাজনার হিসাবপত্র সবই অনেকটা পুরাতন ধারায় চলল, কিন্তু চলল মুসলমানী কায়দায় ও ফারসী ভাষায়। বলা বাহুল্য—ভারতীয় মুসলিম সংস্কৃতির রূপ এই কৃষি ব্যবস্থাতেই স্পষ্ট হয়, উহাতে তাহা কোন মৌলিক পরিবর্ত্তন সাধন করে নাই।...এই কৃষি সমাজে মুসলমানদের দান ছিল প্রধানত কারুশিল্পে ও সওদাগরী কাজের উন্নতিতে।...মুসলমান রাজ্যের উজীর, কাজী, মুন্সি প্রভৃতি আমাদের ধারা হইয়া উঠে—হিন্দু রাজ্যেও তাহা গৃহীত হয়। ঠিক এরূপে রাজপুরুষদের ও অভিজাতদের আদবকায়দা, খেতাব-খেলাৎ, উর্দি-কুর্ত্তা প্রভৃতিও মুসলমানদের নিকট হ'তে ভারতবাসী সকলই লাভ করল—উহা আজও ভারতের হিন্দুমুসলমান সকলকার দরবারী পোষাক এবং কায়দাকানুন।' (সংস্কৃতির রূপান্তর)।

মুসলমান আগমনে মধ্যযুগের ভারতীয় সংস্কৃতি নাগরিক প্রধান হলেও পল্লীসভ্যতাকে তাঁরা বিনষ্ট করেননি। তাঁরা পল্লীবাসীদের হাতেই বিচার শান্তিরক্ষা ইত্যাদির ভার ছেড়ে দিলেন। তাই পল্লীবাসীরা কখনও মুসলমান শাসনের পৃথক অস্তিত্ব অনুভব করতে পারেননি। (মাসিক বসুমতীর ১৩৫৭এর কার্ত্তিক সংখ্যায় আমার প্রকাশিত 'ভারতীয় সংস্কৃতি আধুনিক যুগের কেন্দ্র' রচনা দ্রষ্টব্য)।

নারীসমাজ

মধ্যযুগে জীবনের বৃহত্তর পরিধি থেকে নারীকে অপসারিত করে গৃহের দাক্ষিণ্যহীন অনুকূলে আবদ্ধ করে প্রজননের অসহায় যন্ত্ররূপে দেখে সমাজ তাকে যে মূল্য দিয়েছে, প্রতিদিনের অবহেলা অপমান ও অত্যাচারের মৌন বেদনায় তার চিত্ত যে ভাবে জর্জ্জরিত হয়েছে, তার বিস্তৃত কাহিনী ইতিহাসে লিপিবদ্ধ। নারী সমাজের উপর মুসলমানী আক্রমণ কম অত্যাচার করেনি। মুসলমান আমলে পর্দ্দা প্রথা প্রবর্ত্তনে নারীকে সম্পূর্ণ পর্দ্দানশীন হতে হয়। নারী-জাতির সমস্ত শক্তি ও অধিকার এই যুগে এসে সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়। বিয়ের নামে ব্যভিচার মুসলমানযুগে যথেষ্ট ছিল। মুসলমানদের হাত হতে ধর্ম্ম ও ইজ্জৎ রক্ষার্থে জহরব্রত-প্রথা বিশেষ সচেতন হয়ে ওঠে।

স্বামীর মৃত্যুর পর পুনর্বিবাহের প্রথা তুলে দিয়ে সতীদাহ বা সহমরণ প্রথার প্রচলন হয়; মুসলমান সম্রাট স্বয়ং আকবর এরূপ বীভৎস প্রথাকে তুলে দেবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু ধর্ম্মের উপর হস্তক্ষেপ করা হবে বলে

সফলকাম হতে পারেননি; পরে রামমোহনের চেষ্টায় সহমরণ প্রথা উঠে যায় ও বিদ্যাসাগরের চেষ্টায় বিধবা বিবাহের প্রথা প্রবর্তিত হয়। জাতিভেদের কঠোরতার সঙ্গে সঙ্গে অসবর্ণ বিয়ে বন্ধ হয়ে পণপ্রথার কড়াকড়ি চলে। কুলীন ব্রাহ্মণ ও হিন্দু জমিদাররা একসঙ্গে অনেক গুলি বিয়ে করতেন—মুসলমান আমীর ওমরাহরাও অনেকগুলি বিয়ে করতেন। নারী হয়ে ওঠে কামানলের সুখ ইন্ধনস্বরূপ, তাই আত্মসর্বস্ব ভোগমুখী বিকৃতরুচির যুগের আরম্ভ এই মধ্যযুগ থেকে।

শিক্ষা

দীর্ঘ প্রায় ছ'শ বছর ধরে ভারতে মুসলমানদের আধিপত্য ছিল। এই সময়ের মধ্যে জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চা সাধারণের মধ্যে তেমন হয়নি। কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বলতে কয়েকটা টোল আর মাদ্রাসাই ছিল সম্বল, যেখানে শিক্ষার চেয়ে শাসনই ছিল অমোঘ। টোলে যেমন হিন্দু শাস্ত্রাদি পড়ান হত, তেমনি মুসলমান ভারতের সৃষ্টি মক্তবে আরবী ফারসী ও কোরাণ শিক্ষা দানের ব্যবস্থা প্রচলিত হয়। এই সব মক্তব মাদ্রাসায় অলঙ্কারশাস্ত্র, ন্যায়শাস্ত্র, আইনবিদ্যা এবং মুসলমান ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় ক্রিয়াকাণ্ড ও ধর্ম্মতত্ত্ব সম্বন্ধে পড়ান হত। অনেক হিন্দু বালক এই সকল মক্তবে আরবী ও ফারসী শিক্ষা করত, (অনেক ক্ষেত্রে হিন্দু ছাত্রদের অধ্যয়নের জন্যে সংস্কৃতগ্রন্থ পাঠ্যতালিকাভুক্ত করা হত)। যেমন অনেক মুসলমান বালক ব্রাহ্মণদের টোলে গিয়ে সংস্কৃত শিক্ষা করত। মক্তব ও টোলগুলিকে সরকার থেকে সাহায্য দেবার বন্দোবস্ত ছিল—অনেক ক্ষেত্রে টাকা দিয়ে অথবা জমি দিয়ে সাহায্য করা হত। স্ত্রীলোকদের মধ্যে শিক্ষার প্রচলন ছিল না বলা চলে না, তবে খুব ব্যাপক ছিল না, তার কারণ সহজেই অনুমেয়; যেখানে সনাতন হিন্দু পরিবার গঙ্গাস্নানার্থে মেয়েদের পাল্কীতে করে নিয়ে গিয়ে পাল্কী শুদ্ধ চুবিয়ে আনতেন, আর যেখানে মুসলমান বোন তার ভাইয়ের সামনে এসে কথাবার্ত্তা বলার অধিকার পেত না সেখানে এর চেয়ে বেশী আশা করা বাতুলতা মাত্র।

ইসলামের ভারতীয় রূপ

ইসলাম সেমেটিক গোষ্ঠির ধর্ম্ম, অন্যান্য প্রতিবেশীদের সঙ্গে সে খাপ খাইয়ে নিয়েছিল, কিন্তু ভারতীয় দৃষ্টি-ভঙ্গীর ও তার পরিবেশের মধ্যে নিজেকে মিশিয়ে দিতে পারল না—তার কঠোর একেশ্বরবাদ ও প্রতিমা পূজার প্রতি আপোষহীন তীব্র মনোভাব থাকায়। জাতিভেদে প্রপীড়িত এক বিরাট অংশ রাজানুগ্রহ পাবার আশায় মুসলমান হয়ে গেল। তখন মোল্লা মৌলবী উলেমারা অধিকতর উৎসাহে ধর্ম্ম প্রচারে লেগে গেলেন, আর হিন্দু সমাজের পণ্ডিত পুরোহিতেরা ধর্ম্ম ও শাস্ত্রের সীমানা সামলাতে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। এ ভাবে দেশে চলল প্রবল দুটি মতবাদের সংঘর্ষ। মিলনের পথ আবিষ্কার হোল না। এ কাজের ভার নিলেন হিন্দু মুসলিম সাধকেরা; তাঁদের মধ্যে অনেকেই নিরক্ষর দীনদরিদ্র নীচকুলজাত। এঁরাই ধর্ম্মের প্রকৃত তত্ত্ব প্রচার ক'রে ভারতবাসীদেরকে পুনরায় স্বধর্ম্মে সুপ্রতিষ্ঠিত করলেন। রামানন্দ, কবীর, সৈয়দ আলী হুজবেরী, খাজা মৈমুদ্দিন চিশতী, নিজামুদ্দিন আউলিয়া, শ্রীচৈতন্যদেব, নানক, দাদু, রজ্জব প্রভৃতিদের নাম উল্লেখযোগ্য (আকবরের 'দীন ইলাহী' ধর্ম্ম এ প্রসঙ্গে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়)। ভারতীয় সাধকদের প্রধান দুটী লক্ষণ উল্লেখযোগ্য: 'একদিকে প্রবল আধ্যাত্মবাদ, তেমনি প্রবল মানব-সাম্যের ধারণা।' একদিকে এইসব সাধকেরা ও সুফীসম্প্রদায়েরা, অপর দিকে আউল-বাউলের দল ফকীর দরবেশ সম্প্রদায় প্রভৃতি সমাজের দিক দিয়ে ঐক্যের বন্ধন সুদৃঢ় করবার জন্যে চেষ্টা করতে লাগলেন। এঁদেরই প্রভাবে ও অপরদিকে যাঁরা রাজানুগ্রহ পাবার আশায় মুসলমান হয়েছিলেন তাঁদের প্রভাবে ইসলাম ভারতীয়রূপে পরিণত হতে বাধ্য হল। খাঁটি শরীয়তী হতে অনেক দূরে সরে চলে এলো।

সাধারণদের মধ্যে যাঁরা মুসলমান হলেন, ভারতের লৌকিক জীবনের মায়া কাটিয়ে তাঁরা দূরে সরে যেতে পারলেন না—হিন্দুদের সঙ্গে একত্রে বসবাস করতে আরম্ভ করলেন। কিছুকাল সৌহার্দ্দ্যের সহিত একত্রে

বাসের ফলে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে ধর্ম্ম সম্পর্কে উদার ভাবের উদয় হল। এইরূপে 'ব্রহ্ম হৈল মহম্মদ, বিষ্ণু হৈল পেগম্বর, মহেশ হৈল বাবা আদম, গণেশ হইল কাজী, কার্ত্তিক হইল গাজী, ফকীর হইল মুনিগণ', বৌদ্ধ দেবতারা হলেন পীর আর স্তূপ হল দরগা। পুরোনো দেবলীলার কাহিনী নতুন পীরের কেচ্ছাকাহিনীতে পরিণত হল। প্রাচীন পাঠান সেনাপতিরা যুদ্ধে মারা পড়লে গাজী-পীররূপে পূজা পেতেন, আর মুসলমান সাধুরা তো পেতেনই। ক্রমশঃ এই পীর স্থানের মাহাত্ম্য সর্ব্বসাধারণের মধ্যে স্বীকৃত হল। পশ্চিমবঙ্গের প্রাচীন পীরের ও পীরস্থানের উল্লেখ পাই 'ধর্ম্মমঙ্গল', 'চণ্ডীমঙ্গল', 'মনসামঙ্গল' প্রভৃতি কাব্যের দিগবন্দনায়। (ডঃ সুকুমার সেনের 'মধ্যযুগের বাঙ্গালা ও বাঙ্গালী')। অনেকেই বলেন, সত্যপীর নামক মুসলমান ফকীরই সত্যনারায়ণ।

তাই সমাজ জীবনে দেখছি হিন্দুর আচার বিচারের সঙ্গে মুসলমানের আচার বিচার একেবারে মিলে গেছে; ধর্ম্ম পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাদের সামাজিক পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিক পরিবর্ত্তিত হয়নি. পূর্ব্বে যেমন ছিল তেমনি রয়ে গেল। এ জন্যে তাঁরা পারিপার্শ্বিকতার প্রভাব হতে নিজেকে মুক্ত রাখতে পারেননি। যেমন (১) এখনো অশিক্ষিত নিম্ন শ্রেণীর হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে মহরম-পর্ব্বে 'তাজিয়া' মানস করবার প্রচলন দেখা যায়। অভীষ্ট লাভের আশায় বর্ত্তমানকালেও বহু হিন্দু পীরের শিন্নি দিয়ে থাকেন। পীরের দরগায় মাটির ঘোড়া প্রদানের মানসিক করতেও দেখা যায়। অনেক পল্লীগ্রামের মুসলমানেরা শীতলাদেবীর পূজোয় হিন্দুদের সহিত যোগাযোগ করে থাকেন। হিন্দুরা যেমন শীতলার মানসে বের হন, তেমনি মুসলমানরাও কুলোয় ফুল সিঁদুরাদিসহ ঘট বসিয়ে বাদ্যবাজনা সঙ্গে করে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরেন। হিন্দুরা যেমন বৃষ্টির জন্যে পূজা স্তব ইত্যাদি করেন, তেমনি মুসলমানরা পাড়ায় পাড়ায় 'ওলা বিবিকা বেড পিয়াসা' ছড়া কেটে কেটে ঘোরেন। এমনি করেই মুসলমান এসে দেয় গাছতলায় তেল-সিঁদুর, কালী পূজোয় দেয় মানতকরা পাঁঠাবলি, আর হিন্দু এসে নেয় মসজিদের পানীপড়া। (২) 'মহরম' উৎসবও প্রায় এক প্রকার পৌত্তলিক গন্ধ পর্ব্ব—কেননা ত 'তজিয়া' নির্ম্মাণ করে তাকে হোসেনের সমাধি বলে বর্ণনা করা এবং তাকে ভক্তি করা আমার মতে পৌত্তলিকতার নামান্তর মাত্র। আবার 'মহরম' পর্ব্ব সিয়া সম্প্রদায় যেরূপভাবে পালন করেন, সুন্নী সম্প্রদায় সেরূপ ভাবে করেন না। প্রায়ই এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে কলহ বিবাদের সংবাদ পাওয়া যায়। (৩) মুসলমানরা জাতিভেদের প্রভাব হতে মুক্ত হতে পারেন নি। আজও তাঁদের মধ্যে সৈয়দ, শেখ, পাঠান, হাজাম. ধোবী, শিয়া, সুন্নী, খোজা পরিবার ইত্যাদি জাতিগত স্তর ভেদ দেখা যায়। ধর্ম্মের অনুশাসনে দেখি মুসলমান মাত্রেই মুসলমানের ভাই, বৃত্তিগত, জন্ম বা বংশগত ভেদাভেদ নেই। তাই পারস্পরিক বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন ধর্ম্মের দিক দিয়ে নিষিদ্ধ নয়। তথাপি আমরা দেখছি এক সূক্ষ্ম স্বাতন্ত্র্য চেতনাবোধ ধীরে ধীরে মুসলমান সমাজের মধ্যে গড়ে উঠেছে। আজ আর কোন সৈয়দ বংশীয় মুসলমান ধোবী বা হাজামের মেয়ের সঙ্গে পুত্রের বিয়ে দিতে নারাজ। সৈয়দ পাত্র আজ খুঁজছে সৈয়দ বংশের পাত্রী। (৪) আজও অনেক মুসলমানের পদবী সাহা, মল্লিক, দাস, গায়েন ইত্যাদি। (৫) হিন্দুসমাজে বিধবা বিবাহের প্রশ্ন ওঠে না, ইস্‌লাম ধর্ম্মে বিধবা বিবাহ নিষেধ নয়, স্বয়ং হজরত মোহম্মদ বিধবা বিবাহ করেছিলেন। তথাপি হিন্দু প্রথা ও পরিবেশ মুসলমান সমাজের ওপর এরূপ প্রভাব বিস্তার করেছে যে সম্ভ্রান্ত বংশীয়রা বিধবা বিবাহকে বিশেষ শ্রদ্ধার চোখে দেখেন না। পরন্তু হিন্দুপ্রথাসম্মত বিধবাদের আহার্য্য ও পরিচ্ছদ বিষয়ে বিধিনিষেধ শিক্ষিত মুসলমান সমাজে প্রচলিত। (৬) শাঁখা-সিঁদুর হিন্দু প্রথা সম্মত এয়োর চিহ্ন মুসলমান নারীরা ধারণ করছেন, এও আমি দেখেছি।

উল্লিখিত দৃষ্টান্তসমূহ এই সত্যকেই সুস্পষ্টরূপে প্রমাণ করে যে, যাঁরা মুসলমান হলেন, তাঁদের জীবনের বার আনা জুড়েই ছিল দৈনন্দিন লোক-জীবনের আচার-নিয়ম—অনুষ্ঠানের চিরাচরিত ধারা। এইভাবে ইসলাম ভারতবর্ষে এসে দারা শিকোহর ভাষায় 'মজমু'অ অল-বহ্‌রৈন' অর্থাৎ দুটি সাগরের সম্মিলন হয়ে দাঁড়াল।

কথা শেষ

মধ্যযুগের সুদীর্ঘ ইতিহাসের সুখে দুঃখে বিচিত্র টানা পোড়েনের সাহায্যে হিন্দু-মুসলিমের যে একত্ব বোধ গড়ে উঠেছিল, সেই একত্ববোধকে বিকৃত করে অজ্ঞ মুসলিম জনগণকে বোকা বানিয়ে তাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের লোভ দেখিয়ে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করলেন যাঁরা, তাঁরাই নিজেদের সৃষ্ট আগুণে পুড়ে মরবেন। জনগণের অজ্ঞতা একদিন না একদিন ঘুচবেই, কেন না, "You can fool all people for some time. You can fool some people for all time. But you cannot fool all people for all time." তাই সেদিনকার সুপ্রভাতের আশায় আজ ভারত ভাগ্যবিধাতা যেন উদ্দীপ্ত হয়ে বলছেন, "আলো জ্বালাও, আলো জ্বালাও, দিকে দিকে আলো জ্বালিয়ে তোল। Light, Light and Light.*

* বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের মেদিনীপুর শাখার সাহিত্য-সভায় পঠিত।

হে বন-কপোতী

শ্রীকরুণাময় বসু

হে বন-কপোতী সময় হল কি তব,
আকাশ শিয়রে নীড় খুঁজিবারে
চঞ্চল বেগে যাও বারে বারে,
অঞ্চল-পাখা লুটায়ে চলেছ ফাল্গুন ফুল অঙ্গনে,
নিশা চলে যায় বিধুর বিবশা কার দুটি ভুজ-বন্ধনে,
শুধু দেখেছ কি গুণ্ঠন ছায়া তলে,
সুদূর আকাশে মণিদীপগুলি জ্বলে,—
বলেছ সেখানে আশ্রয় খুঁজি লবো,
হে ভীরু কপোতী, সময় হ'ল কি তব ?

ছায়ায় আলোকে দিনগুলি র'বে ঘিরে,
মনের বীণায় গানগুলি লভি
কখনো ভূপালি, কভু ভৈরবী
গেয়ে চলে যেও আকাশে আকাশে যাত্রা যেথায় শেষ হ'বে,
সেদিনে ঘনাক আজিকার এই মধু মৌচাক সৌরভে।
বেদনা-ভ্রমর কখনো বেড়াবে ঘুরে,
স্বপ্ন ঘনাবে তব অশ্রু-মুকুরে ;
আবার কখনো আশা-আশাবরী মীড়ে
হৃদয় বাজিবে পাতাঝরা দিন ঘিরে।

যদি যায় বেলা ফুরাইলে খেলা তব,
কতো চেনামুখ ছিল উৎসুক,
আকাশের গানে ভরেছিল বুক ;
মনে পড়িবে কি চাঁদের শিশিরে
গলে গলেযাওয়া কতো রাত—
বক্ষে তোমার একটি নিমেষ দুলেছিল কভু দৈবাৎ।
সেই ক্ষণটুকু বিদায় বেলার কালে
ভুল ক'রে যেন একটি প্রদীপ জ্বালে,
গোধূলি কালের শেষ চাওয়াটুকু ল'বো,
যদি যায় বেলা ফুরাইলে খেলা তব।

গঙ্গাচরণ

রমেন মৈত্র

সওদাগরি অফিসের আরমেচার বাইণ্ডার! ডাক নাম মাণিক। ভাল নাম গঙ্গাচরণ প্রামাণিক। তিন বছর আগে ত্রিশ টাকায় ঢুকেছিল চাকরীতে। এখন মাইনে হয়েছে প্রায় ছোট কেরাণীর মাইনের সমান।

এক নিঃশ্বেষে নিজের জীবনের প্রাথমিক কর্ম্ম-পর্ব্ব শেষ করলে গঙ্গাচরণ। হাতের টর্চটাকে ভালো করে বাগিয়ে ধরে সঙ্গের দম্পতিকে সাবধান করলে।—অন্ধকার রাস্তা। সাবধানে আমার পেছনে পেছনে আসুন।

পাঁড়াগাঁয়ের অন্ধকার সর্পিল পথ। কোথাও উঁচু কোথাও নীচু। কখনও পুকুরের ধার ঘেঁষে, বসত বাড়ীর উঠোনের ওপর দিয়ে—কখনও বা এঁদো পুকুরের পাড় দিয়ে চলে গেছে সরু রাস্তা। রেলওয়ে ষ্টেশন থেকে নেমে পাকা আধ ক্রোশ হাঁটলে তবে গঙ্গাচরণের বাড়ী।

পেছনে টর্চের আলো ফেলে গঙ্গাচরণ বললে: 'এখানে চলা অভ্যেস না থাকলে এক পা এগোয় কার বাপের সাধ্যি। আমার ছেলেবেলা থেকে অভ্যেস বলেই বেঁচে আছি এখনও। নইলে কবে হয় সাপে কামড়াত না হয় দক্ষিণপাড়ার নিমগাছের ভুত ঘাড়ে ভড় করত। বাপ ঠাকুরদা দেখে শুনে বাড়ী করেছিল বটে। না আছে আলো. না আছে ভালো একটা রাস্তা! আছে ভুত পেত্নী, সাপ আর শেয়াল। মারো ঝাড়ু শালার গাঁয়ের মাথায়। সাবধান, এখানে গর্ত্ত আছে—একটু দেখে শুনে পা ফেলবেন।'

প্রায় লেফ্-টরাইট্ করে শব্দ করতে করতে চললো গঙ্গাচরণ। পরনে হাফ প্যাণ্ট, গায়ে হাফ সার্ট। কোন কোন জায়গায় তার তেল আর কালির দাগ। প্যাণ্টের দু'পকেট বোঝাই হয়ে ফুলে উঠেছে। চলবার তালে তালে তার ভেতর থেকে আওয়াজ বেরোচ্ছে—টুং টাং।

টর্চের আলোতে হাতঘড়ি দেখে নিয়ে গঙ্গাচরণ বললে: "এখনও কিন্তু পনের মিনিট হাঁটতে হবে সত্য বাবু।"

'হাঁটা অভ্যেস আছে আমাদের। আমার নাম কিন্তু হরিহর।'

'তা নয়। সঙ্গে মেয়েছেলে আছে কিনা। বাড়ী থেকে যদি একটু সকাল সকাল বেরোতেন, তাহলে আর এত কষ্ট হোত না।'

'কষ্ট আর কি! জায়গা তো অচেনা নয়। তবে রাত্তির বলে—এই যা।"

ষ্টেশন থেকে সাইকেল রিক্সা সব দিকেই যায়। শুধু এই দিকেই আসে না। বলে যে এখানে এলে সাইকেল নিয়ে আর ফিরে যেতে হবে না।' বলে একটু ঘনিষ্ঠ হয়ে চাপা গলায় বললে—'ঠাকুরদার আমলে এ রাস্তায় ডাকাতের ভয়ে সন্ধ্যের পর আর কেউ বেরোত না।'

সঙ্গের দম্পতি বোধ হয় ভয় পেল।

গঙ্গাচরণ বললে: কিছু ভয় নেই। আমি যতক্ষণ আছি, ততক্ষণ কোন ভয় নেই।

সঙ্গের যাত্রীটি ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলে:

"বাজার পর্য্যন্ত যাবেন তো?"

গঙ্গাচরণ বললে: "বাঃ, যাবো না মানে? বাজারেই তো আমার বাড়ী। এই দেখুন ভয় পেয়ে গেছেন।

'ভয় নয়, ভয় নয়। তবে সঙ্গে সোনার গয়না পত্তর রয়েছে কিনা।'

'সে আমি গাড়ীতেই দেখে নিয়েচি। তাই তো সাবধান হয়ে চলতে বলছি। তবে আর ভয় নেই। এখন এ অঞ্চলে হাজার লোকের বাস। চুরি করে চোর পালাবে কোথা দিয়ে! ধরতে পারলে কেঁড়ে ফেলে দোব না! দেখবেন তবে?"

ভেতরকার জামার পকেট থেকে লম্বা এক ছোরা বের করলে গঙ্গাচরণ।

"এই সব রাখতে হয় আমাকে। এক এক দিন ফিরতে রাত্তির বারোটা একটা হয়ে যায় কিনা।"

"বলেন কি মশাই? রাত্তির বারোটার সময়ে আপনি এই রাস্তা দিয়ে যান?"

"পাঁচ বছর ধরে যাচ্ছি। যাত্রা করছি আজ প্রায় পাঁচ বছর।"

"যাত্রা থিয়েটারেও সখ আছে?"

"থিয়েটারে নেই। যাত্রাটাই ভালবাসি।"

"যাত্রায় আর কত কল্ পান। থিয়েটার করলেই পারেন।"

"আমি কল পাবো না তো পাবে কে? ফিমেল পার্টের দরকার হলেই ডাক মাণিককে। এই পাঁচ ছ' মাসের মধ্যে কতগুলো যাত্রা করেছি জানেন? রামের নির্ব্বাসন, সুভদ্রা-হরণ, একলব্য—নদের নিমাই, কৃষ্ণার্জ্জুন, কমলে কামিনী—এখনও দুটোর রিহার্সাল চলছে—একটা লক্ষ্মণের শক্তিশেল—ঠন্‌ঠনে কালীতলায়, আর একটা নৌকাবিলাস রামরাজাতলায়।"

"বেশ আছেন আপনি।"

"না মশাই। বাইরে থেকেই ওমনি দেখতে। লোকে বলে বটে—চাকরী করি, যাত্রা-গান নিয়ে পড়ে আছি—বেশ আছি। হ্যাঁ, অনেক বাসনাই প্রাণে ছিল, কিন্তু সব ভেঙে গেল। দেখলেন তো গাড়ীতে আসতে আসতে একটা দল ধরেছিল, একটা পার্ট করে দেবার জন্যে। আমি বললুম—না, যাত্রা গান আর করবো না। সব ছেড়ে দিচ্ছি।" টর্চ্চের মৃদু আলোর ছায়াতে গঙ্গাচরণের বাবরি-চুলের গোল মাথাটা ঘন ঘন দুলতে লাগলো।

"কিছু নেই, কিছু নেই মশাই। খালি বদনাম এ-লাইনে।" নিঃশ্বাস ফেললে গঙ্গাচরণ। লক্ষ্মণের শক্তিশেল আর নৌকাবিলাস দুটো হয়ে গেলে বেঁচে যাই। সখের পার্ট করি, এক পয়সা পাইনা, অথচ লোকে বদনাম দেয়, এ সহ্য হয় না। মদ খাই না, বদখেয়ালি নেই, অথচ ব্যাপার দেখুন।"

"এসব করলে একটু আধটু বদনাম লোকে তো দেবেই।"

'দেবে বললেই দেবে?' গঙ্গাচরণ প্রায় চেঁচিয়ে উঠলো। 'এই যাত্রা-করার জন্যেই মশাই বিয়েটা হ'তে হ'তেও হোল না। অথচ আমার সঙ্গে বিয়ে দেবার জন্যে ঝুলোঝুলি।

"কি রকম?" সহযাত্রীটি গঙ্গাচরণের গায়ের ওপর পড়ে জিজ্ঞেস করলে। গলাটা নামিয়ে একটু হেসে গঙ্গাচরণ বললে, "সকলেই রাজি হ'ল, মেয়ে কিন্তু রাজি হোল না। বললে, মানুষের চরিত্তির খারাপ।"

"দজ্জাল মেয়ে তো দেখছি।"

"এইটুকু শুনেই আপনি দজ্জাল বলে ফেললেন। সবটা শুনলে মেয়েকে বাপ তুলে গালাগাল দিতেন।"

তারপর ঘন গাছপালার দিকে টর্চ্চ ঘোরাতে ঘোরাতে গঙ্গাচরণ বললো: এখানটার নাম রায়পাড়ার জঙ্গল। ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বছর আগে এখানে বাঘ লুকিয়ে থাকতো। বর্ষায় কুমীর মারতেও আমরা দেখেছি। আর ঐ যে নিম গাছ দেখছেন, ঐখানে দিনের বেলায় যেতে সাহস করতো না।

"কেন?"

"কেন আবার! ভূতের জন্যে। নিম গাছটা ছিল এক বুড়ীর। সে নাকি ঐ গাছের ডালে কাপড় বেঁধে গলায় ফাঁস লাগিয়ে মরেছিল।"

ঘোমটা দেওয়া মেয়েটি বোধ হয় ভয়ে তার স্বামীর হাতের কাছে কাছে চলতে লাগল।

"আসুন এইবার বাঁদিকে বেঁকতে হ'বে। তারপর সোজা মিনিট সাত আট গেলেই বাজার। রাস্তাটা চিনে রাখুন।" বলে গঙ্গাচরণ লেফ্‌ট-রাইট করতে করতে চললো। তারপর বললে: আজ আপনাদের কপালে অনেক কষ্ট। বাড়ী গিয়ে পায়ে তেল মালিশ করতে হবে আপনাদের দুজনকেই।

"আপনি কি করবেন?

"আমার বাড়ী গিয়ে অনেক কাজ। ক্লাবে যেতে হবে। গান করতে হ'বে। বইএর পার্ট মুখস্ত করতে হ'বে। অনেক কাজ আমার।"

"আপনার ধৈর্য্য আছে দেখছি।"

এ তো কি! কতদিন চারটে করে বই বিছানায় নিয়ে শুয়েছি। চারটে পার্ট মুখস্থ করেছি...রাত কেটে গেছে; তার পরের দিন অফিস করেছি। এখন আর মুখস্ত করতে হয় না। দু' একবার পড়লেই হয়ে যায়। এমন দিন গেছে, সকালে যাত্রার খবর পেয়েছি—আর সন্ধ্যের সময় পার্ট করে দিয়ে এসেছি। অনেক কিছু করেছি মশাই। মাঝ থেকে বদনাম দিয়ে মেয়েটা প্রাণে বড় আঘাত দিয়ে গেল। অথচ একটু তলিয়ে দেখলে না—সত্যি না মিথ্যে।"

"সত্যিই তো আপনার কোন দোষ নেই, তবে ও নিয়ে এত ভাবছেন কেন?"

"ভাবছি না ছাই? আমার ঘরে আমি ছবি টাঙিয়ে রাখব, তাতে কার বাবার কি? বদনাম না দিয়ে বললেই হোত—ছেলে আমার পছন্দ হয়নি।"

"ব্যাপারটা খুলে বলুন দিকি।"

"বড় লজ্জার ব্যাপার মশাই···শুনলে কাণে আঙ্গুল দেবেন। স্কুলটা দেখেছেন তো? তার পাশে গোবরা ঘোষের বাড়ী। জাত গোয়ালা। পেটে বিদ্যে নেই এক ফোঁটা। দুধে জল মিশিয়ে বিক্রী ক'রে টাকা আর জমি-জমা কিছু করেছে। তার মেয়ের দেমাকে মাটীতে পা পড়ে না। বাড়ীতে আইবুড়ো ছেলে মেয়ে থাকলেই বিয়ের সম্বন্ধ হয়ে, থাকে এ তো জানা কথা। কোথা থেকে সে শুনেছে, তার সঙ্গে বিয়ের কথাবার্ত্তা চলছে; এসে হাজির আমাদের বাড়ীতে ছোট ভাইকে নিয়ে। মা আর বোনেদের সঙ্গে চেনা-শোনা আছে, তাই নির্ব্বিঘ্নে ঢুকে পড়েছে ঘরে। আমার ঘরে আমি তখন বই পড়'ছি, দেখি বোনের সঙ্গে ঢুকলো একেবারে আমার ঘরে। বলুন দিকিনি কি বেহায়া মেয়ে?"

"তারপর?"

"আমি পড়তে লাগলুম। আমি দেখতে যাবো কেন? তারপর মেয়েটা বোনকে কি বললে জানেন? বললে, "তোর দাদা কি কাজ করে?" বোন বল্লে—'ইলেকটিকের'। তাতে ঠোঁট উল্টে 'ও' ব'লে বেরিয়ে গেল। দেমাকটা একবার দেখুন শুধু। চেহারা তো আখের মত, আর গলার আওয়াজ দাঁড়কাকের গলার আওয়াজের মত; তার আবার অত ফুটুনি কিসের হ্যা? প্রথমটা আমি বুঝতে পারিনি, পরে বোনের কাছে সব শুনলুম কেলেঙ্কারীর কথা।'

"হুঁ—তারপর কি হোল?"

"তারপরে আর হবে কি? মা যত্ন আত্মীয়তা ক'রে খাবারদাবার খাওয়ালো। ঘণ্টাখানেক ধ'রে বড় মানুষের নবাবী গল্প শুনিয়ে তো কেটে পড়লো। বোনকে জিজ্ঞেস করলুম—'কে হ্যা?' বোন বললে—'ওরই সঙ্গে তো তোমার বে'র কথা হচ্ছে। কেমন দেখলে?' ভদ্রতাই ক'রে বললুম—মন্দ নয়। বোন বললে, পরে খবর দেবে বললে। দেখি কি খবর দেয় ব'লে ব'সে আছি—ও মা, দিন তিনেক আগে শুনলুম সপ্তাহখানেক আগে তার বে' হয়ে গেছে। অত্যন্ত অসৎ লোক ওরা, ভাগ্যিস ও বাড়ীতে আমার বিয়ে হয় নি, তা হ'লে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খেত। টাকার গরম ম'শাই আমাদেরও আছে, তবে দেখাই না। ঠাকুদ্দার তিন বিঘে জমি ছিল···গইলে দশটা গরু, বাড়ীর আশে-পাশে পাঁচটা পুকুর। মাছ ধরবার হুকুম ছিল না কারও। হঠাৎ-বড়লোক আমরা নই।"

"কিন্তু আপনাকে পছন্দ না হবার কারণ কি?"

"খারাপ দেখতে নাকি আমি! আমাকে নাকি বাসের ড্রাইভারের মত দেখতে। মনে মনে বললুম—কি রকম রাজপুত্তুরকে তোর বাপ জামাই করে, তাও দেখবো 'খন। ঠিক তাই হয়েছে। শুনছি নাকি কোথাকার কে একটা হাড়হাভাতের হাতে প'ড়েছে মেয়েটা। দেখুন, চেহারার বদনামে আমার খুব বেশী লাগে নি। কিন্তু যখন শুনলুম সে বলেছে আমার চরিত্তির খারাপ, তখনই মেজাজ গেল বিগড়ে। বোনদের বললুম—'ছেড়ে দে···গোবরা ঘোষের বাড়ী গিয়ে তার মেয়ের কাণে পাক দিয়ে তিন থাপ্পড় লাগিয়ে আসি। পাঁচজনে আমাকে ধ'রে ফেললে তাই, নইলে সেদিন একটা এস্‌পার ওস্‌পার হয়ে যেত। বোনদের বললুম, ফের যদি কোনদিন সে আমার চরিত্তির নিয়ে কথা ওঠায়, তা হ'লে তাকে যমের দক্ষিণ দোর দেখিয়ে দোব। বোনরা বলে—ঘর থেকে ঐসব ছবি খুলে ফ্যাল।···আমি বলি—মাইরি আর কি,···পয়সা খরচ ক'রে ছবি তুলেছি বাক্সোতে রাখবার জন্যে?"

"ছবিগুলো বুঝি খুব খারাপ ?"

"আরে না মশাই, খারাপ হ'তে যাবে কেন ?" গঙ্গাচরণ আর একবার চেঁচিয়ে উঠলো সরু গলায়—"খারাপ কেন ? ফিমেল পার্ট করি বলে গোটাকতক বাছা বাছা ছবি তুলে রেখেছি ফিমেল সেজে। কোনটা রামের নির্ব্বাসন থেকে, কোনটা নৌকাবিলাস থেকে। নানারকম ড্রেস-পোষাকে নানারকম ছবি তুলিয়েছি। বলা যায় না, হঠাৎ যদি মরে যাই···ছবিগুলো থাকবে তো ? লোকে তবুও মাঝে মাঝে দেখবে। পরে যারা ফিমেল পার্ট করবে, তারা ঐসব ছবি দেখে মেক-আপ নিতে পারবে,—বুঝলেন না ?"

"কিন্তু সেগুলো তো আপনার নিজেরই ছবি। তাতে মেয়েটির কোন কথাই বলবার নেই।"

"ও-ই তো বদ্‌মাইসি। মানে—খেলিয়ে দেখে নিলে। আরে বাবা এ কি যে সে লোক—এ হচ্ছে গঙ্গা পরমাণিক। তারপরে অন্য মেয়েমানুষের ছবি টাঙানো, এ তুই বিশ্বাস করলেও আর পাঁচজনে করবে কেন ? বাড়ীর লোকে সব ছ্যা ছ্যা করতে লাগলো ছুঁড়িকে। আমি বললুম—বেঁচে থাকলে তোর চেয়ে সুন্দরী মেয়ে অনেক মিলবে। তোর কথায় আমার ফিমেল-ড্রেসে তোলা ছবি ফেলে দোব, এত বড় বোকা লোক আমি নই।"

"ফিমেল সাজলে আপনাকে তাহলে চেনা মুস্কিল বলুন ?"

"বাজি মেরে একবার ফিমেল সেজে মেয়েদের মধ্যে বসে বায়স্কোপ দেখে এসেছিলুন। কেউ ধরতেও পারলে না। অনেক কাহিনী আমার আছে। কাল আসবেন। বাজারে এসে যাকে জিজ্ঞেস করবেন, সেই আমার বাড়ী দেখিয়ে দেবে। সব বোলবো'খন, শুনবেন।"

"আপনার কিন্তু কষ্ট হোল অনেক বেশী। আমাদের চেয়েও।"

"রামোচন্দ্র : বলুন না, আপনার বাড়ী পর্য্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসছি। ও-ই তো স্কুল। বাজার তো পেরিয়ে এলাম। এবার কোন দিকে যাবেন ? আপনার স্ত্রী যে এগিয়ে চললেন অন্ধকারেই। আরে মশাই, সাপখোপ আছে, যাবেন না এগিয়ে !"

সঙ্গের মেয়েটি এতক্ষণে এগিয়ে গিয়েছে একটা বাড়ীর সামনে। সেখান থেকেই সে স্বামীকে উদ্দেশ করেই ডাকলে : চলে এসো না। আর আলোর দরকার নেই। তারপর বোধ হয় গঙ্গাচরণকে উদ্দেশ করেই বললে : আপনি শুতে ঠাঁই পায় না শঙ্করাকে ডাকে।—ছোটলোক কোথাকার।"

গঙ্গাচরণ এদিক ওদিক চেয়ে বললে : "ওটাই গোবরা ঘোষের বাড়ী। কোথায় যাবেন আপনারা ?"

"গোবরা ঘোষের বাড়ীতেই যাবো। উনি আমার শ্বশুর হ'ন। আপনি ঠিকই বলেছেন, সপ্তাখানেক আগে ওর মেয়ের সঙ্গে আমারই বিয়ে হয়েছে।" খানিকটা বোকার মত চেয়ে থেকে বোকার মতই গঙ্গাচরণ হাসলে। বললে : বেশ হয়েছে, বেশ হয়েছে। আপনার সঙ্গে চেনা শোনা হোল, খুব খুশী হলুম। কাল যাবেন আমার বাড়ী। চারদিক দেখিয়ে শুনিয়ে দোব'খন।' নমস্কার করার ভঙ্গীতে টর্চ্চ-সমেত হাতটা কপালে ঠেকিয়ে গঙ্গাচরণ ফিরল।

কীর্ত্তন-সঙ্গীত

শ্রীকালিদাস রায়

ইদানীং পদাবলী সাহিত্য মুদ্রিত আকারে পাওয়া যায় বলিয়া অনুদ্‌গীত হইলেও পদাবলী সাহিত্য স্বতন্ত্র ভাবে পঠিত, পাঠিত ও আলোচিত হয়, কিন্তু পূর্ব্বে পদাবলী সাহিত্যের সহিত বাঙ্গালীর পরিচয় ঘটিত কীর্ত্তন-সঙ্গীতের মধ্য দিয়া। পদাবলী গানের নাম লীলাকীর্ত্তন বা রস-কীর্ত্তন। লোকে এই লীলাকীর্ত্তন শ্রবণ করাকে ধর্ম্মানুষ্ঠানের অঙ্গীভূত বলিয়া মনে করিত। আজিও বৈষ্ণবগণ তাহাই মনে করেন। গৌড়ে শ্রীচৈতন্য দেবই ইহাকে ধর্ম্মের ও সাধনার অঙ্গীভূত করিয়া তুলিয়াছিলেন। লোকে ধর্ম্মতৃষ্ণানিবৃত্তির জন্য লীলাকীর্ত্তন শ্রবণ করিত—তাহাতে তাহাদের সাহিত্যরস-পিপাসারও নিবৃত্তি হইত। তাহারা পদকর্ত্তাদের রচনার মাধুর্য্য ধর্ম্মের রসপুটে উপভোগ করিত। তাহারা পাইত ধর্ম্ম, সাহিত্য ও গীতির একটি অপূর্ব্ব সম্মেলন।

আজকাল নগরের ইংরাজিশিক্ষিত ধর্ম্মবিদ্বেষী লোকেরাও কীর্ত্তন সঙ্গীতের আদর করে, ধর্ম্মের জন্য নয়, সাহিত্যের জন্য নয়, গীতিরস উপভোগের জন্য। তাই এই ধর্ম্মহীন যুগেও কীর্ত্তনের সমাদর আছে। এযুগের ঐ শ্রেণীর লোকে ইহার জন্য একটা পবিত্র আবেষ্টনীর প্রয়োজন আছে—তাহা মনে করে না। বড় বড় লোকের বাড়ীতে শ্রাদ্ধবাসরে যে কীর্ত্তন হয়, সেই কীর্ত্তনের আসরে অভ্যাগতেরা সঙ্গীতের মাধুর্য্য ত উপভোগ করে না—নিমন্ত্রণরক্ষার আসরই মনে করে। সে আসর সিগারেট ও চুরুটের ধোঁয়ায় কুহেলিকাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। আমি এ আসরের কথা বলিতেছি না। রেডিও গ্রামোফোনের মারফতে কীর্ত্তন গান উপভোগ অনেককে করিতে দেখিতে পাই। তাহার সঙ্গেও ধর্ম্মের সম্পর্ক নাই। থাক অবান্তর কথা।

কীর্ত্তনের অর্থ কীর্ত্তিগান, কীর্ত্তিগান চিরদিনই আছে—সে কীর্ত্তি মহীপালেরও হইতে পারে, রামপালেরও হইতে পারে, দনুজমর্দ্দনদেবেরও হইতে পারে, আবার দেব দেবীরও হইতে পারে।

এই কীর্ত্তিগান দেশে চিরদিনই ছিল; কি ঢঙে, কি সুরে, কি ভাবে তাহা গীত হইত তাহা আমরা জানিনা। জয়দেব, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতির পদগুলি গাইবার জন্যই রচিত। নিশ্চয়ই সেগুলি দেশে গীত হইত, তাহাকে কীর্ত্তন বলিত কিনা জানা যায় না। কি কি সুরে সেগুলি গাওয়া হইত—তাহা পুঁথির সাহায্যে আমরা জানিতে পারি। কিন্তু সেগুলি সুরে কী বিশিষ্ট রূপ গ্রহণ করিত, তাহা আমরা জানি না। শ্রীচৈতন্যের প্রেরণাতে ঐ পদাবলী-গীতি লীলাকীর্ত্তনের আখ্যা লাভ করে। খুব সম্ভব শ্রীচৈতন্যের সময়ে উহা বিশিষ্ট রূপ ও রীতি লাভ করিয়াছিল। শ্রীচৈতন্যের পূর্ব্বে পদাবলী গীতি রাগানুগা ভক্তি সাধনার অঙ্গ ছিল বলিয়া মনে হয় না। শ্রীচৈতন্যই যখন বঙ্গদেশে রাগানুগা ভক্তিবাদের প্রচারক—তখন তদনুযায়িনী রীতি ও ভঙ্গী তদনুবর্ত্তী রূপ তিনিই পদাবলী কীর্ত্তনে সঞ্চারিত করিয়াছেন—ইহাই মনে করা স্বাভাবিক। আমরা এখন কীর্ত্তনীয়াদের মুখে যে লীলা-কীর্ত্তন শ্রবণ করি, তাহাতে শ্রীচৈতন্য প্রবর্ত্তিত রীতিভঙ্গী ও রূপই চলিতেছে বলিয়া মনে করি।

কীর্ত্তন বলিতে আমরা এখন শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলা কীর্ত্তনকেই বুঝিয়া থাকি—অন্য কোন কীর্ত্তিগানকে বুঝি না। বাংলার বাহিরে ঠিক এইরূপ কীর্ত্তন গান নাই—ইহা বাংলার সম্পূর্ণ নিজস্ব। উড়িষ্যায় অবশ্য আছে,—সেখানে ত থাকিবেই। উড়িষ্যাই শ্রীচৈতন্যদেবের প্রধান লীলাভূমি। আজিও বাংলার পদাবলী সুদূর চিল্কা তীরেও গীত হয়। উড়িয়া ভাষাতেও কীর্ত্তনের বহু পদ রচিত হইয়াছে। অন্যান্য দেশে ভাগবত সঙ্গীতকে 'ভজন' বলা হয়—তাহার সুর, রীতি, ভঙ্গী ইত্যাদি স্বতন্ত্র।

লীলাকীর্ত্তনের অপর নাম রসকীর্ত্তন। শ্রীকৃষ্ণের যে সকল লীলায় কোন-না-কোন রসের (দাস্য, বাৎসল্য, সখ্য, মধুর) গভীর সংযোগ আছে—সেই সকল লীলার কথাই কীর্ত্তন গানের বিষয়ীভূত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের যে সকল লীলায় শ্রীকৃষ্ণের ভাগবতী শক্তি বা ঐশ্বর্য্য বর্ণিত হইয়াছে—সে সকল লীলা অবলম্বনেও পদ রচিত হইয়াছে, কিন্তু সে সকল পদ লীলাকীর্ত্তনের উপজীব্য হয় নাই। গোবর্দ্ধন ধারণ বা কালীয়দমন কীর্ত্তনের বিষয়ীভূত নয়। কীর্ত্তনসঙ্গীতের সর্ব্বপ্রধান উপজীব্য রাধাকৃষ্ণের প্রণয়। কীর্ত্তনসঙ্গীতে যে সকল লীলা বাদ গিয়াছে, যাত্রা ও পাঁচালীতে স্থান পাইয়াছে

রাধাকৃষ্ণের সকল লীলাই রাধাকৃষ্ণের সম্মিলিত রূপ শ্রীচৈতন্যের জীবনের রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইয়াছে। ভক্ত-কবিগণ শ্রীচৈতন্যের জীবনের সেই লীলাভিনয় অবলম্বনে পদ রচনা করিয়াছেন। এই পদগুলির নাম গৌরচন্দ্রিকা। রাধাকৃষ্ণের সর্ব্ববিধ লীলারসেরই গৌরচন্দ্রিকাপদ আছে। যে লীলার কীর্ত্তন গাওয়া হয়, সেই লীলার সম্পূর্ণ অনুগত গৌরচন্দ্রিকা প্রথমে গাহিয়া কীর্ত্তনের আরম্ভ হয়। এ বিষয়ে ধরাবাঁধা একটা পদ্ধতি বহুকাল হইতে কীর্ত্তনিয়াদের জানা আছে। কীর্ত্তনসঙ্গীতের বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ বলেন—'খেতুরির উৎসবেই সর্ব্বপ্রথম কীর্ত্তনের সঙ্গে গৌরচন্দ্রিকা গানের সূত্রপাত হয়।'

কীর্ত্তনীয়ারা যখন পদাবলী কীর্ত্তন করেন, তখন তাঁহারা পদাবলীর রসের ব্যাখ্যাও করেন। এই ব্যাখ্যা সুরযুক্ত গদ্য বাক্যেও হইতে পারে, সুরযুক্ত বাক্য বা বাক্যাংশের দ্বারাও হইতে পারে। ইহাকে বলে আঁকর বা অলঙ্কার। এই অলঙ্কার প্রয়োগে ঘনীভূত রস অনেক সময় তরলায়িত হইয়া শ্রোতার আস্বাদ্যমান হয়। কোন কোন কীর্ত্তনীয়া নিজের রচিত অলঙ্কার প্রয়োগ না করিয়া চিরপ্রচলিত অলঙ্কারেরই প্রয়োগ করেন। ইহাই নিরাপদ। কীর্ত্তনিয়া নিজে রীতিমত লীলারসের রসিক না হইলে অলঙ্কার প্রয়োগে দোষ হয়। এই দোষকে বলা হয় রসাভাস, রসাভাস ঘটানো একটা বড় অপরাধ। রসজ্ঞ শ্রোতা ইহাতে বড়ই বেদনা অনুভব করেন। ভাবানুগত সুপ্রযুক্ত অলঙ্কারে কীর্ত্তনগানের মাধুর্য্য ও সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পায়।

পদাবলী গীতিকবিতা হিসাবে রচিত হয় নাই—কীর্ত্তনে উদ্‌গীত হইবার জন্যই রচিত। কীর্ত্তনই পদাবলীর বাহন। বাহ্য ও বাহন উভয়ে মিলিয়াই আমাদের যেমন দেব-প্রতিমা। কীর্ত্তনের সুর ও পদাবলী মিলিয়া তেমনি সম্পূর্ণাঙ্গ সৃষ্টি। পদকর্ত্তারা মনে মনেই হউক অথবা অনুচ্চস্বরেই হউক গাহিতে গাহিতে পদাবলী রচনা করিয়াছেন। কীর্ত্তনে গীত হইলেই সেজন্য পদাবলী সম্পূর্ণ সার্থকতা লাভ করে। সে জন্য আমি পদাবলীকে অর্দ্ধ-সৃষ্টি বলি। যিনি মহাজনদের কোন পদ পড়িয়া রস উপভোগ করিতে না পারেন, তিনি সেই পদ কীর্ত্তনে উদ্‌গীত হইতে শুনুন—তাহা হইলে পরিপূর্ণ রস পাইবেন। আর যদি কোন পদ পড়িয়াই রস পাইয়া থাকেন—কীর্ত্তনে শুনুন, দ্বিগুণ কি চতুর্গুণ রস পাইবেন।

কীর্ত্তনীয়া যে পদটি গান করেন, সেই পদটিতে যতটুকু রসমাধুর্য্য—তাহা নিঃশেষে পরিবেষণ করেন, যে বাক্যে আলঙ্কারিক বৈশিষ্ট্য—সেই বাক্যটির পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যাখ্যা করেন, যে পদে কবিত্ব রস ঘনীভূত আছে—সেই বাক্যটিকে বারবার পুনরাবৃত্ত করিয়া শ্রোতার মর্ম্মস্থলে প্রেরণ করেন, এমনকি শব্দালঙ্কারগুলিতে খুব Emphasis দিয়া তাহার মাধুর্য্য শ্রোতাদের অধিগম্য করিয়া তোলেন। আবেগের আবেদন সুরের মূর্চ্ছনায় ও কণ্ঠের কাকুতে কিরূপ মর্ম্মস্পর্শী হয়, তাহা কাহারও অবিদিত নাই।

লীলাকীর্ত্তন ছাড়াও কীর্ত্তন আছে। তাহার নাম নাম-কীর্ত্তন। এই নামকীর্ত্তনের কথা ভাগবতে আছে। এই নামকীর্ত্তন সর্ব্বসাধারণের জন্য—ইহাতে অধিকারী অনধিকারী ভেদ নাই। লীলাকীর্ত্তন লীলারস উপভোগের অধিকারীদের জন্য। যে কেহ ভগবান মানে—সেই ভগবানের নাম জপ, নাম স্মরণ বা নামকীর্ত্তনকেই ধর্ম্মসাধনার অঙ্গ মনে করিতে পারে। অতএব ইহাতে যে-কেহ যোগ দিতে পারে। ভাগবতের অনুসরণে শ্রীচৈতন্য যখন প্রচার করিলেন—কলিযুগে নামকীর্ত্তনই একমাত্র ধর্ম্ম—তখন তিনি আপামর সাধারণ সকলের কথাই ভাবিয়াছিলেন—শুধু অন্তরঙ্গদের কথাই ভাবেন নাই। শ্রীবাসের অঙ্গনে তিনি যে সারারাত্রি ধরিয়া কীর্ত্তন করিতেন—তাহা এই নামকীর্ত্তন। এই নামকীর্ত্তন করিতে করিতে তিনি নগর পথে বাহির হইলে আপামর সাধারণ সকলেই সেই কীর্ত্তনে যোগ দিতে পারিত। এই ভাবে তিনি নাম ও নামের মধ্য দিয়া প্রেম বিলাইয়া গিয়াছেন।

নামকীর্ত্তনে সাহিত্য-রসপিপাসু বা সঙ্গীত-রস-পিপাসুদের জন্য নয়—ইহা শুধু ভক্তদের জন্য। যাহারা

অভক্ত, তাহারাও যদি ইহাতে যোগ দেয়—তাহা হইলে নাম গৌরবের আবেষ্টনীর মধ্যে আসিয়া ক্ষণকালের জন্যও ভক্ত হয়। নামসংকীর্ত্তনের একটি উদ্দেশ্য উচ্চৈঃস্বরে নামগান করিয়া দূরবর্ত্তী উদাসীন ব্যক্তিকেও ভগবানের নাম শুনানো এবং সকলকে নামগানে যোগ দিতে আহ্বান।

ভগবানের একই নাম বারবার মুক্তকণ্ঠে উচ্চারণের মধ্যে সাহিত্য নাই, একেবারে সঙ্গীত নাই বলা যায় না। নামই নানা সুরে গাওয়া যাইতে পারে। ইহার প্রধান উপজীব্য ভক্তি। নাম কীর্ত্তনে খোল-করতালের বাদ্যে ও উদ্দণ্ড নৃত্যে মানুষকে মাতাইয়া তাতাইয়া তোলা হয়। তাহাতে ক্ষণকালের জন্যও মানুষ বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয় এবং তাহার চিত্ত ভগবদভিমুখী হয়। কাজেই মুহুর্মুহুঃ নাম-কীর্ত্তন করিলে চিত্তশুদ্ধি হয় এবং শ্রীভগবানে রতি জন্মে। এজন্য শ্রীচৈতন্যদেব নাম-কীর্ত্তনের এত মহিমা প্রচার করিয়াছেন এবং নিজে অনবরত নামকীর্ত্তন করিয়া আপনি আচরি ধর্ম্ম পরকে শিখাইয়া গিয়াছেন। ইহাতে অভক্তের চিত্তেও ভক্তির উদ্রেক হয়। আর যিনি সত্যই ভক্ত—তাঁহার ভাবাবেশ হয়। ভাবাবেশ হইলে আমরা ভণ্ডামি মনে করি, কিন্তু প্রকৃত ভক্তের সত্যসত্যই ভাবাবেশ হয়। আমরা ভক্ত নই বলিয়া বুঝিতে পারি না।

নগরসংকীর্ত্তনে পথে পথে নাম বিলানো হয়, তাহাতে সমগ্র নগর বা গ্রামে ভক্তি রসোপেত পবিত্রতার সঞ্চার হয়। অনেক নগর সংকীর্ত্তনে ভগবানের নাম গান না করিয়া কোন একটি পদের একটি কলিই বার বার গাওয়া হয়। যেমন—

নিতাই এনেছে নাম নিতে হবে।
রসের পাগল গোরা নেচে নেচে যায়রে।
শান্তিপুর ডুবু ডুবু নদে ভেসে যায়রে।

ইহাতে ভগবানের নাম নাই। এরূপ সংকীর্ত্তনেও একটা পবিত্রতার আবেষ্টনীর সৃষ্টি হয়। আমাদের দেশে অষ্ট-প্রহর, চব্বিশ-প্রহর ইত্যাদি নামকীর্ত্তন উৎসব সম্পাদিত হয়। ইহাতে সমগ্র গ্রামে ভক্তিভাবের সঞ্চার হয়। এই সকল উৎসবে একই হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ উচ্চারিত হয় না। নানারূপ সুরে ও তালে ঐ নাম গীত হয়। নামগানকে তাহাতে সঙ্গীতেরই মর্য্যাদা দেওয়া হয়।

মনে হয় শ্রীচৈতন্যদেব আদ্যলীলায় নামকীর্ত্তনের দ্বারা মানুষের চিত্তক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া পরে লীলাকীর্ত্তনের দ্বারা রাগানুগা ভক্তির বীজ বপন করিয়াছিলেন। নবদ্বীপ ধামে তিনি দাস্যভাবের প্রেম প্রচার করিয়াছিলেন—তাই নামকীর্ত্তনই তাঁহার প্রধান অনুষ্ঠান হইয়াছিল—পরে তিনি মধুর রসের প্রেমের প্রচারক হইলে লীলাকীর্ত্তনের রস উপভোগ করিতেন এবং বিশেষ করিয়া তাহারই অভিনব প্রবর্ত্তন করেন।

নামকীর্ত্তন লীলাকীর্ত্তনের মত সমান সমাদরই পাইয়াছিল। তাহার কারণ, মধুররসের মধ্যেও যে দাস্যরস রহিয়াছে। তাহা ছাড়া, জীবের উদ্ধারের জন্য—সর্ব্ব-সাধারণের জন্য নামকীর্ত্তনেরও যে প্রয়োজন ছিল! এই নামসংকীর্ত্তন ভগবানের নাম উচ্চৈঃস্বরে গান। ইহা নিশ্চয়ই পূর্ব্বে ছিল। কেবল বঙ্গদেশে কেন—সব দেশেই ছিল। না থাকিবার কোন কারণ নাই। ভাগবতে একশ্রেণীর সাধকের কথা বলা হইয়াছে, তাহারা নাম সংকীর্ত্তনকেই প্রধান ধর্ম্ম মনে করিত। পূর্ণিমা রজনীতে মহাপ্রভু জন্মগ্রহণ করেন—সেদিন চন্দ্রগ্রহণ হইয়াছিল—সেজন্য—

গঙ্গাস্নানে চলিলেন সকল ভক্তগণ।
নিরবধি চতুর্দ্দিকে হরিসংকীর্ত্তন॥—চৈতন্যভাগবত।

অতএব নামকীর্ত্তন নিশ্চয়ই ছিল, সম্ভবতঃ ইহা নৈমিত্তিক উপলক্ষেই হইত। চৈতন্যদেব এই নামকীর্ত্তনকে কলিযুগে একমাত্র ধর্ম্ম বলিয়া প্রচার করেন এবং নৈমিত্তিককে নিত্য অনুষ্ঠেয় করিয়া তুলিয়াছিলেন।

আর পুরীধামে যে সংকীর্ত্তন শুনিয়া প্রতাপরুদ্রদেব বিস্মিত ও বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন—তাহা নিশ্চয়ই লীলা-কীর্ত্তন।

পুরীধামে স্বরূপ দামোদরই লীলাকীর্ত্তনের প্রধান গায়ক ছিলেন। শ্রীবাসের অঙ্গনে যে কীর্ত্তন, তাহার প্রধান অঙ্গ ছিল নৃত্য। এই নৃত্যসনাথ কীর্ত্তন যে নাম-কীর্ত্তন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

এই নামকীর্ত্তনের বহুল প্রচারের একাধিক কারণ আছে। একটি কারণ, যে অনুষ্ঠানের সঙ্গে নৃত্য ও গীতের আনন্দ বিজড়িত, তাহা অন্য নীরস অনুষ্ঠানের তুলনায় ঢের বেশি হৃদ্য ও চিত্তাকর্ষক। দ্বিতীয় কারণ, হিন্দুর প্রত্যেক অনুষ্ঠান ব্যয়সাপেক্ষ ও পুরোহিত সাপেক্ষ, এরূপ অনুষ্ঠানে কোন ব্যয় নাই, কাহারো কৃপা অথবা সহায়তার অপেক্ষা করিতে হয় না। আর একটি কারণ, একমাত্র এই অনুষ্ঠানে জাতিভেদ, বংশভেদ, অধিকারভেদ নাই, স্পৃশ্যাস্পৃশ্য ভেদ নাই। কুলীন ব্রাহ্মণের সঙ্গে চণ্ডালও ভগবানের নাম করিয়া নৃত্য করিতে পারে। কেবল তাহাই নয়, সৌকণ্ঠ্য ও সবল স্বাস্থ্য থাকিলে একজন নীচ শূদ্রও ব্রাহ্মণোত্তম অপেক্ষা এক্ষেত্রে অধিকতর মান্য।

রাহু

শ্রীকৃতান্তনাথ বাগচী

জীবনে কত সামান্য ঘটনার পিছনে যে কি অসামান্য ব্যাপার লুকিয়ে থাকে, বাস্তব অভিজ্ঞতার আগে বুঝতে পারি নি। হাওড়া ষ্টেশনের জনতার মাঝে একটী ভদ্রলোকের বাহুমূলে অকস্মাৎ পিঁপড়ে কামড়াল যেন। পরে দেখা গেল—সেই সামান্য যন্ত্রণাটুকুর অন্তরালে কি জটিল ষড়যন্ত্র আত্মসংগোপন করেছিল। এ সংবাদ বাংলাদেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় মাত্রই জানেন। প্রত্ন-তাত্ত্বিক ও পুরাতত্ত্ববিদরাও এ সত্য মানেন। তাই প্রাচীনকালের কোন প্রাণীর এক টুকরো হাড় অথবা কোন পাত্রের ভগ্নাংশকে তাঁরা অবহেলা করেন না। পথপার্শ্বের অনাদৃত ধূলিধূসর প্রস্তর খণ্ড যে কথা শোনায় তাই লিপিবদ্ধ করে পণ্ডিতরা বিরাট গ্রন্থ রচনা করেন। এই মুখবন্ধের প্রয়োজন ছিল অসিতবাবুর বিচিত্র-ব্যবহারের ভাষ্যের জন্য। তাঁর সুপরিণত পৌঢ়ত্ব। কাণের কাছের কালোচুলে সাদা রঙের বাহুল্য বৃদ্ধি পাচ্ছে। ওঁর কপালে গভীর চিন্তার বলীরেখা—দুটী চোখে যেন নিরাশার ছায়া। সংসারের প্রতি তাঁর আকর্ষণ যে প্রবল ছিল—এ কথা কেউ বলবে না। তিনি ছিলেন চিরকুমার। এই দুশ্চর ব্রতপালনের অন্তরালে কোন্ শক্তির প্রভাব ছিল—কেউ তা জানতেন না। সুপুরুষ অসিতবাবুর স্বাস্থ্য যে এককালে ভাল ছিল তার সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় অধুনাশিথিল মাংস-পেশীতে। শোনা যায় যে তাঁর পিতা যে ধনসম্পদ রেখে গেছলেন—তাতে অন্ততঃ তিনপুরুষ বসে খেতে পারত। সুতরাং অর্থনৈতিক বা সামাজিক কারণে যে তিনি বিয়ে করেন নি, এ মতবাদ টিকেনা। মনের মতন মেয়ে পাওয়াও তাঁর মতন যোগ্য ব্যক্তির পক্ষে একেবারে অসম্ভব ছিল না। আর বাংলা দেশে মশা ও মেয়ে, ম্যালেরিয়া আর বিয়ে সমপর্য্যায়ের নয় কি? মেয়েদের মূল্যও এখানে মশারই মতন। বিয়েটাও হয়ে দাঁড়িয়েছে ব্যাধি।

অনেকে বলাবলি করিতেন যে, অসিতবাবু একজন চরম আদর্শবাদী ব্যক্তি। সে যে কি আদর্শ—এক তিনি ছাড়া আর কেউ জানতেন না। আর সেই আদর্শের সাথে অবিবাহিত থাকার সম্বন্ধটীও সুস্পষ্ট ছিল না। কেউ তাঁকে শ্রদ্ধা করত···কেউ বা সন্দেহ। ঐ নিতান্ত নিরীহ ভাল মানুষটির ভিতরের অন্ধকারে যে কি রহস্য ছিল, সময়ে সময়ে অলস অবসরে এ নিয়ে জল্পনাকল্পনা করার মতন সুবুদ্ধির অভাব হয় নি। কিন্তু এতে সময়ই কেটে গেছে ···অসিতবাবুর চারিদিকের কুয়াশা কাটে নি। বরঞ্চ সে ঘোর আরও ঘনিয়ে উঠেছে। উর্ব্বর মস্তিষ্কের কল্প-লোক হতে উদ্ভব ছায়ামূর্ত্তি বেরিয়ে এসে দলে দলে সেই অস্পষ্টধূসর সন্ধ্যায় অদ্ভুতভাবে সঞ্চারণ করেছে।

আমিও তাঁর সম্বন্ধে কাণাঘুষা শুনেছিলুম। শুনেছিলুম যে তিনি একজন কবি। তাঁর কবিতা কোন দৈনিক, সাপ্তাহিক কি মাসিকে কখনও প্রকাশিত হয় নি।

অরণ্য যেমন আপন সুখে পাতা মেলে ফুল ফুটিয়ে আবার তাদের অনায়াস আনন্দে ঝরিয়ে দিয়ে তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলে, অসিতবাবুও নাকি তেমনি করেই অজস্র কবিতা রচনা করতেন। তারপর সেই সদ্যোজাত শিশুদের নিতান্ত হেলাভরে বাজে কাগজ ঝুড়ির ডাষ্টবিনে নিক্ষেপ করতেন। মানুষটী খেয়ালী। আর তাঁর খেয়াল তিনি মিটিয়েছেন প্রচুর অর্থব্যয়ে, জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলে। তিনি ইউরোপ আমেরিকা ঘুরে এসেছেন। সে সাগরপাড়ির উদ্দেশ্যের সম্বন্ধেও কেউ সঠিক সংবাদ দিতে পারে না। কেউ বলে স্বাস্থ্য অন্বেষণে। কারও মত--অভিজাত সমাজে উচ্চ আসন পাবার জন্য। কারও ধারণা—হয়তো কোন মেমের প্রেম এর মূলে আছে। এক কথায় তিনি হয়ে উঠেছিলেন মূর্ত্তিমান হেঁয়ালী। এই জীবন্ত হেঁয়ালীর পাল্লায় পড়ে আমাদেরও কম হয়রানি হতে হয়নি। আমাদের বন্ধু সরিতের বিয়ে। "রজনী-

পন্থা!" ক্লাবের আমরা সবাই সভ্য। অসিতবাবুর আর যে দোষই থাকুক না কেন, তিনি প্রতি সন্ধ্যায় নিয়মিত-ভাবে ক্লাবে আসতেন। আবার রাত সাড়ে দশটা হতে এগারোটার মধ্যে বাড়ী ফিরে যেতেন। তিনি একজন একনিষ্ঠ বিশিষ্ট পুরাতন সভ্য। আমাদের সাথে তিনিও চললেন সরিতের বিয়ের বরযাত্রী হয়ে। বিয়ের বাসর বাগবাজার। যাতায়াতের কোন অসুবিধা নেই। আদর অভ্যর্থনারও কোন ত্রুটী হল না। কন্যাপক্ষ প্রস্তাব করলেন যে, বিয়ের আগেই যেন আমরা খাওয়া-দাওয়ার পালা শেষ করে ফেলি। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ বিশেষ করে অসিতদা এতে আপত্তি তুললেন। বিয়ের লগ্ন তো সাড়ে নয়টায়। বিয়ে-শেষে ভোজন-পর্ব্ব সুরু করলেই হবে। অসিত ছদ্মমহানুভবতা ও ঔদরিক ব্যাপারে উদার ঔদাসীন্য দেখিয়ে শান্তিনিকেতনী ভঙ্গীতে কইল, "আমরা তো দুর্ভিক্ষের দেশ থেকে আসিনি। আপনারা অনর্থক ব্যস্ত হবেন না।"

যাই হোক, অসিতদার সিদ্ধান্তই আমরা মেনে নিলুম।

জয়ঢাক, ঢোল, কাঁসর, সানাই বাজল, হুলুধ্বনি উঠল, শুভ শঙ্খরব হল। সালঙ্কারা বেনারসী সাড়ীপরা কন্যাকে আল্পনা-আঁকা পিঁড়ির উপর বসিয়ে চারজন যুবক ধরাধরি করে নিয়ে এসে বরের সাথে সাতপাক ঘোরাতে লাগল। মেয়েটী অত্যন্ত জড়োসড়ো হয়ে বসে ছিল। তার অপরিসীম লজ্জাকে সজ্জার সমারোহে লুকিয়ে রাখা দায় হয়ে উঠেছিল। এ কালের বিশেষ করে কলকাতার মেয়ের পক্ষে এই সঙ্কোচ অস্বাভাবিক বৈ কি! আর যাঁরা তাকে সাজিয়েছিলেন, তাদেরই বা কি রুচি! এমন ভাবে তাকে বেনারসী শাড়ী আর রেশমী জ্যোৎস্না-ওড়নায় জড়ানো হয়েছে যেন মোড়কে মোড়া কোন গয়না সে। তার দুটী বাহুও ভিতরে প্রচ্ছন্ন। পরে এর কারণ বোঝা গেল। শুভ দৃষ্টির লগ্ন। বরণমালা পরাণোর সময় দুটী হাত তার বাইরে বেরুল। তীব্র বৈদ্যুতিক আলোকে, শত কৌতূহলী চোখের সুমুখে ঘোমটা সরানো মুখটী যখন দেখা দিল, তখন আমরা সরিতের জন্য সকরুণ দীর্ঘশ্বাস ফেললুম।

কালো মেয়ে। সরিতের সাথে তাকে মানাবে চাঁদের কলঙ্কেরই মতন। শুধু সে কালোই নয়, কুশ্রীও। সেই কুশ্রীতার তীব্রতা হ্রাসের জন্য অজস্র স্বর্ণালঙ্কার। সে যেন কোন সম্ভ্রান্ত ধনী মণিকারের দোকানের কালো মখমল পেটিকা⋯প্রদর্শনীতে। ফিস ফিস করে সমীর কইল, "পাত্রী তো নয়, দীপান্বিতা রাত্রি।"

বিক্ষুব্ধ অমল চুপি চুপি জানাল যে, এর জন্য দায়ী সরিতের বাবা যিনি ছেলের মুখ না চেয়ে আপন সুখটাই বড় করে দেখলেন। ছিঃ, টাকার লোভে শেষকালে তিনি এই অপকর্ম্ম করলেন! হায় সরিত, তোমার কপালে এই ছিল!

পুরুত মন্ত্র পড়লেন, আশীর্ব্বাদ করলেন গুরুজন। বিয়ের প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যের উপর যবনিকা পাত হল। বর ও বধূ আজ এই একটী রাত্রির জন্য রাজা ও রাণী। রাজা ও রাণীর মতনই উড়ুনী আর ওড়নায় গ্রন্থি বন্ধন করে ধীরগম্ভীর পদবিক্ষেপে নারীকণ্ঠের হুলুরোলের মাঝে সরিৎ তার নবপরিণীতা বধূকে নিয়ে বাসর ঘরে প্রবেশ করল। এবার এল বরযাত্রী ভোজনের পালা। সবাই আমরা পাতের কাছে গিয়ে বসলুম। হঠাৎ চোখে পড়ল অসিত বাবু নেই। চারিদিকে চেয়ে দেখি, নাঃ, তাঁকে পাওয়া গেল না। এমন অসামাজিকতা ও অভদ্রতায় আমরা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হলুম। এর প্রতিবিধান করতেই হবে।

পরদিন সন্ধ্যায় আমরা ক্লাবে এ সম্বন্ধে আলোচনা করলুম। স্থির হল যে, অসিতবাবুর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। তিনি আজ অনুপস্থিত ছিলেন। ছয়মাসের জন্য তিনি আমাদের ক্লাবে আসতে পারবেন না। আমাদের এই সিদ্ধান্ত সোমেশ তাঁকে বাড়ীতে গিয়ে কাল জানিয়ে আসবে।

সোমেশ তাঁর বাড়ীতে গেছল, কিন্তু দেখা পায়নি। দীপ-নেভা শূণ্য বাড়ী। একটী মাত্র চাকর ছিল। তার কাছ হতে যে খবরটুকু পাওয়া গেল, তাতে ব্যাপারটী আরও রহস্যময় হয়ে উঠল। অসিতবাবু গতপরশু অর্থাৎ সরি-তের বিয়ের তারিখে রাত্রি শেষে তাঁর মোটরখানা নিয়ে কোথায় যেন চলে গেছেন। যাবার আগে একখানি

লিখেছেন। খামের উপর লেখা: "আমার রজনীগন্ধা ক্লাবের বন্ধুগণ।" চাকরকে নির্দেশ দিয়ে গেছেন যে এই ক্লাব থেকে কেউ তাঁর খোঁজে গেলে খামখানি তাঁকে দেবার জন্য। আশ্চর্য্য! অসিতবাবু যেন বিলাতী ডিটেকটিভ উপন্যাসের নায়ক হয়ে উঠেছেন। যাই হোক, খেলা, হাসিতামাসা, গানবাজনা সব স্থগিত রেখে আমরা খামের চিঠির পাঠোদ্ধারে মন দিলুম। অমিত পড়তে লাগল···

ভাই!

তোমরা হয়তো আমাকে মনে মনে গালাগালি দেবে, ভাববে যে এমন বেরসিক লোকও সংসারে থাকে। বিয়েবাড়ী, বরযাত্রী, ক'লকাতা সহর আর সেই আনন্দমুখর সভা হ'তে যে মানুষটী সহসা না জানিয়ে উধাও হয়ে গেল, তিনি আর যাই হোন, স্বাভাবিক নন। বন্ধু সমাজে এই ব্যবহার বিশ্বাসঘাতকতারই সামিল, এ-কথা আমি বিনীতভাবে স্বীকার করি। কিন্তু যে যন্ত্রণায় ও আতঙ্কে ভ্রমরের হুলবিদ্ধ হতভাগ্য অন্ধের মতন দিশাহারা হয়ে ছুটে পালায়, তার স্বরূপ জানে না ব'লেই একজন তার উদ্‌ভ্রান্ত ব্যস্ততায় অবাক হয়ে যায়। তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অদ্ভুত সঞ্চালনে ব্যঙ্গ করতে পারে, হাসে বিদ্রূপের হাসি। আপাতদৃষ্টিতে আমার আচরণও তোমাদের চোখে এমনি বিসদৃশ বোধ হবে। তার জন্য তোমরা দায়ী নও। দোষ আমার অদৃষ্টের।

কৈশোর হ'তেই আমার দুর্নাম রটে গেছল যে, আমি ভাবুক প্রকৃতির। বাড়ীতে মাঝে মাঝে মা ব'লতেন, "এমন উদাস ছেলে হ'ল! ও যে কবে কি অঘটন ঘটিয়ে ফেলবে তার ঠিক নেই।"

বাবা মন্তব্য করতেন, "না, গো, না। তুমি দেখে নিয়ো, অসিত হবে একজন মস্ত বড়লোক। হয়, ও হবে মহাকবি, না হয় বিরাট দার্শনিক।"

মা আতঙ্কে বলতেন, "না, না, ওসব ছন্নছাড়া মানুষদের একজন হয়ে দরকার নেই। আর তোমাদের ত পাগলের বংশ। আমার কপালগুণে অসিত আবার তাই না হয়ে যায়।"

বাবা গম্ভীর হয়ে যেতেন। তারপর তিনি আমায় পয়সা দিয়ে ফুটবল খেলার মাঠে পাঠিয়ে দিতেন। তখন আমার তারুণ্য সবে অঙ্কুরিত হচ্ছে। আমি করতুম কি জান? গঙ্গার তীরে কোন নিরিবিলি জায়গায় বসে সূর্য্যাস্তের সৌন্দর্য্য দেখতুম। না হয় গড়ের মাঠ পেরিয়ে শ্বেত সম্রাজ্ঞীর মর্ম্মর-স্মৃতিসৌধকে প্রদক্ষিণ করতুম।

তখন শরৎকাল। বর্ষা শেষের নির্ম্মল নীল আকাশ ···বৃষ্টি ধোওয়া সবুজ মাঠ গাছপালা। স্তব্ধ পাষাণ মন্দিরের আশেপাশের কালো দিঘীগুলি কানায় কানায় ভরা। কত রঙের, কত গন্ধের অজস্র ফুলের মৌন হুলুধ্বনি উঠছে—তরুবীথিকায়, তৃণাঙ্গণের সযত্নরচিত শয্যায়, অযত্নবর্দ্ধিত লতাবিতানে, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কামানো ফিটফাট ঝোপে ঝাড়ে।

বেলা শেষের ডাক দিয়েছে এই মৌন মর্ম্মর সুন্দরী। সারি সারি মোটর রিকসা ফিটনে পায়ে হেঁটে মধুলোভী মানুষের মিছিল তাকে লক্ষ্য ক'রে আসতে সুরু হয়েছে। এ তো নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। সুতরাং বিস্মিত হবার বা গল্প করবার মতন কিছুই এতে নেই। ঐশ্বর্য্য ও বিলাসের সমারোহে, অফুরন্ত রূপ ও যৌবনমত্ততার মাঝে একটী সোনার দিনান্তে সেখানে আমার চোখে যা পড়ল, মনে হ'ল যেন তার স্বাতন্ত্র্য অত্যন্ত উদ্ধতভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

একটী ঝকঝকে নতুন রোল্‌সরয়েস এসে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার কালো মূর্ত্তির সুমুখের পথে থামল। শিখ-সারথি তাড়াতাড়ি নেমে গাড়ীর দরজা খুলে দিল। সেই সুন্দর তরুণের মাথার সবুজ পাগরী, গায়ের পাৎলা শুভ্র পাঞ্জাবী, পরণের গাঢ় নীল পায়জামার কথা এখনও আমার মনে আছে।

মোটরের কোটর হতে বেরিয়ে এল একটী বিদেশিনী তরুণী। মনে পড়ে সেই সুবেশা শ্বেতাঙ্গিনীও অনন্যা সুন্দরী ছিল। তারপর বেরুল একটী দেশী মেয়ে। মাদ্রাজী হাঁসের কালো ডিমের মতন তাকে দেখতে। সে তখন শৈশব হতে কৈশোরে পৌঁছেচে। কি কুশ্রী সে কৈশোর!

তার পায়ে দামী জুতা ও মোজা, অতিসুন্দর ফ্রক পরণে…বিলিতী ছাঁদে চুল ছাঁটা। নিশ্চয়ই কোন ধনী-কন্যা। শিখ-সারথি তাকে সেলাম করে সসম্ভ্রমে সরে গেল।

মেয়েটী সাগ্রহে হাতবাড়িয়ে তার শীর্ণ হাতিশুঁড়ো-হাত ধরল। তারপর তারা দু'জনে ধীরে ধীরে স্মৃতিসৌধের এলাকায় প্রবেশ করল। আমার চোখে, আমার মনে, আমার চেতনায় এই ব্যাপারটী যেন একটী ছাপ দিল… কেন কে জানে! মেয়েটীকে ঘিরে যে ঐশ্বর্য্য ও সৌন্দর্য্যের প্লাবন ব'য়ে চলেছে, আমি লক্ষ্য করলুম যে কুরূপার কলঙ্ক যেন এতে সহস্রগুণ বেড়ে গেছে। আমি কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করতে লাগলুম। ধীরে ধীরে সেখান থেকে চলে এলুম।

এ সামান্য ঘটনা মনে রাখবার মতন নয়…হয়তো বিজ্ঞজনে বলবেন। কিন্তু মনে রাখা আর না রাখার উপর আমাদের কতটুকু কর্ত্তৃত্বই বা আছে! ঘটনাটী প্রায় ভুলেই গেছলুম। কিন্তু বছর ছয়েক পর একটী আকস্মিক ব্যাপারে আবার তার স্মৃতি উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

আমার ফুলের নেশা ছিল। সুবিধাসুযোগ পেলেই আমি ফুলের দোকান হতে ফুল কিনতুম। সাধারণতঃ আমি বৌবাজার, হ্যারিসন রোড, চিৎপুর রোড, নিউ-মার্কেট থেকে ফুল সংগ্রহ করতুম। সেদিন কি খেয়াল হল চল্লুম বালিগঞ্জে। শুনেছিলুম ও-অঞ্চলে সবার সেরা ফুলের খোঁজ পাওয়া যায়। কথাটা মিথ্যা নয়। একটী অভিজাত ফুলের দোকানে প্রবেশ কল্লুম। কি সুন্দর ভাবে কত রকমের ফুলের কি বিচিত্র সজ্জাই না কাঁচের আলমারীতে, টেবিলে, চেয়ারে। আর সেই ফুলের মেলায় জীবন্ত ফুলেরা এদিক ওদিক ঘুরে বেড়চ্ছে, দেখা-শুনা করছে। মোগলবাদশাহের নওরোজের মেলার কথা প্রথমে আমার মনে পড়ল। আমার আশেপাশে রঙীন প্রজাপতির মতন তরুণীর দল চপল আনন্দে বিহার করে বেড়াতে লাগল…ফুল কেনা উপলক্ষ্য হয়তো। পরে দেখলুম তরুণরাও আছেন।

একগুচ্ছ বসোরা গোলাপ পছন্দ করলুম। গাঢ়লাল যেন কোন প্রেম-পূজারীর বুকের তাজা রক্তে রাঙ্গা। তার উদ্‌ভ্রান্ত সৌরভে মন হঠাৎ ডানা মেলে ওমর খৈয়মের স্বপ্নলোকে উড়ে চলে যায়। আমার মনও গোলাপী হয়ে উঠেছিল। আমি ধীরে ধীরে গোলাপ-গুচ্ছটী নিয়ে যেখানে বিলের টাকা দেওয়া হচ্ছিল সেদিকে চল্লুম। সেখানে সুন্দরীদের ভীড়। এরই মধ্যে কেউ কবরীতে ফুল গুঁজেছেন, কেউ বুকে দুলিয়েছেন মালা… কারও হাতে তোড়া।

দাম দেবার সময় মণিব্যাগ থেকে টাকা বের করতে গিয়ে চমকে উঠলাম। একি! এ কে! এই অফুরন্ত সৌন্দর্য্যের মাঝে এই পুঞ্জিত কুশ্রীতা। মেয়েটির বয়স ষোল কি সতের হবে। কিন্তু যেমন সে কালো তেমনি কুৎসিত। যেন আলকাৎরার একটি পিপে। অথচ সর্ব্বাঙ্গে তার ফুলের সাজ, পরণে বহুমূল্য রেশমী শাড়ী। জ্যোৎস্নারাতের স্বল্পনীল আকাশে হঠাৎ কালো মেঘের মতই তাকে দেখাচ্ছে। আশে পাশের সুন্দরীরা তার কুরূপকে আরো মুখর করে তুলছে। হা হতোস্মি।

ফুল কিনে বাইরে বেরিয়ে এসে গেটের কাছের দরোয়ানকে ঘুষ দিয়ে জানলুম যে উনি এই দোকানের মালিকের মেয়ে। আশ্চর্য্য হবার হয়তো কিছু ছিল না। তবুও আমি আশ্চর্য্য হলুম। মোহন রূপের মাঝে ঐ বিভৎসতার অর্থই বা কি, সার্থকতাই বা কোথায়?

পাশের একটি রেস্তোরাঁয় চা পান করতে ঢুকলুম। চায়ের পেয়ালা তখনও শেষ হয়নি, একটি মোটর এল। সেই মোটরটিকে মর্ম্মর সমাধির পাশে দেখেছিলুম কয়েক বছর আগে। সেই শিখ সারথি। তবে এবার তরুণী শ্বেতাঙ্গিনী নেই।

ফুলের দোকানের মধ্য হতে বৈকালী বেশে সেই মেয়েটি বেরিয়ে এল। তার ব্রোচের সাথে শুধু একগুচ্ছ ছোট নীল ফুল বিদ্ধ। হাওয়া খেতে চলে গেলেন তিনি।

বসন্ত-নিশীথের দুঃস্বপ্ন।

প্রায় দুটি বছর পরে। এক বন্ধুর বিয়ের বরযাত্রী হয়ে যেতে হল লক্ষ্ণৌ। খুব-আমোদ আহ্লাদ করা গেল। বিয়ে শেষে বাসর ঘরে মেয়েদের গানের-আসর বসল। আমরা কয়জন বরের বন্ধুও সেই সঙ্গীত সভায়

যোগদানের অনুমতি চাইলুম। বলাবাহুল্য, মেয়েদের পক্ষ হতে সাদর সম্বর্দ্ধনা পেলুম।

এ যেন এক ঝাঁক নানা রঙের পাখীর দেশে আমরা একদল পথ ভোলা পথিক এসে পড়েছি। তাদের ঝলমলে পালকে স্বপ্নসৌরভ। একটি ছোট নীলপাখী গান গাইছিল···গোলাপকুঁড়ি ফুটে ওঠার বেদনার গান।

প্রথম সম্রম ও বিস্ময়ের ঘোর কেটে গেলে চারিদিকে চেয়ে দেখলুম। আমার বন্ধুর বাঁপাশে নববধূ আর ডান পাশে—!

তার প্রসাধন ও সজ্জার সমারোহের অন্ত নেই। কিন্তু রং করা সঙের মতন তাকে দেখাচ্ছে। তার মুখের হাসি দেখে ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছা হয়। কি কুৎসিৎ কটাক্ষ তার চোখে। এ যে সেই কলকাতার কালো মেয়েটি। কি করে সে এখানে এল! আর সে তো জানে না যে সুন্দর পটভূমিকায় ও মোহন পরিবেশে তার কুরূপের কি পরম প্রকাশই না হয়। চন্দন বনের সাপিনী।

পরে শুনতে পেলাম যে আমাদের বন্ধুর বৌ তার বান্ধবী! আমরা যেমন বরযাত্রী, সেও তেমনি কন্যাযাত্রী!

এই ঘটনার পর হ'তে কোন ভাল জায়গার উৎসব সমারোহের মাঝে যাবার আগে আমার দশা হ'ত ঠিক অন্ধকারে চলা ভূতভয়গ্রস্তের মতন। আঁধারের সাথে যেমন ভূতের ভয় জড়িয়ে থাকে, আলো উৎসব হাসি গানের সভার সাথে তেমনি তার স্মৃতি আমার মনের মধ্যে তীক্ষ্ণ কাঁটার মত খচ খচ করত। আর সত্য কথা বলতে কি, নাট্যশালায় কি চিত্রপ্রদর্শনীতে আমি তাকে নির্ভুলভাবে দেখেছি···এক দোয়াত কালির মতন। আমার মনে হত—আমি যেন এক রাহুর পাল্লায় পড়েছি। অথচ সে নির্দ্দোষ। আমার কোন ক্ষতি সে করেনি।

আমার বিয়ের সম্বন্ধ আসতে লাগল। পাত্রীরা কেউ অপছন্দের নয়। তবে অবয়বহীন এক আতঙ্ক আমার সারা চৈতন্যে কালোছায়া ফেলেছিল। আমি গভীরভাবে চিন্তা করতুম যে আমার স্ত্রী সুন্দরী হতে পারেন। কিন্তু কে জানে তিনি কোন সন্তানের জননী হবেন? যদি তাঁর গর্ভের রাত্রিতে একটী কৃষ্ণ কন্যার জন্ম হয়, যার কুরূপে জগৎ চমকে উঠবে···তখন?

এই আশঙ্কা ক্রমশঃ গভীর বিশ্বাসে পরিণত হল ঐ কালো মেয়েটীর সাথে আমার সকল ভাল জায়গায় সাক্ষাৎ হওয়ায়। আমার মনে হ'ত এই যেন আমার নিয়তি। যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই রাত হয়। আর এওতো দেখেছি যে, জীবনে যা দূরে সরাতে চেয়েছি, তাই বোঝা হয়ে সিন্দবাদ নাবিকের গল্পের দ্বীপের বুড়োর মতন ঘাড়ে চেপেছে।

তাই মনে হ'ত কালো কুৎসিৎ মেয়েটীর প্রতি যে তীব্রবিতৃষ্ণা আমি পোষণ করি, তার ফল স্বরূপ আমাকে কালো কেউটে কণ্ঠে জড়িয়েই পৃথিবীর পথে চলতে হবে।

বাবা হতাশ হয়ে বিয়ের চেষ্টা ছেড়ে দিলেন। মাও মারা গেছলেন। মাতৃহীন। বৌ নিয়ে ঘর করবার সাধ মেটানোর জন্য আর কেউ পীড়াপিড়ী করবার ছিল না। সুতরাং কুমার জীবন যাপনের আর বিশেষ বাধা রইল না। নিঃসঙ্গ জীবনের ভার লঘু করার জন্য আমি সাগর পাড়ি দিলুম। আমি যাব শ্বেত কন্যার রাজ্যে।

অন্ততঃ যে কয়বৎসর বাইরে ছিলুম, এই কৃষ্ণবিভীষিকার প্রত্যক্ষদর্শনের দণ্ড হতে অব্যাহতি পেয়েছিলুম।

দেশে ফিরতে হল। সেবার গেলুম পুরীর সমুদ্রতীরে। যে সম্ভ্রান্ত ও আধুনিক হোটেলে ঘরভাড়া নিলুম, বহু বিদেশী ও ভারতীয় সেখানে থাকেন। ইউরোপ, আমেরিকা, এশিয়ার বিভিন্ন দেশ থেকে আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা এসে সেখানে বাসা বাঁধতেন। সারা বেলা নীল সমুদ্র দর্শন···।

কি গম্ভীর তরঙ্গ কল্লোল, কি সুস্নিগ্ধ পবন। নতুন প্রাণ যেন পেলুম। কখনও উপন্যাস পড়ে, কখনও আকাশবাণী শুনে, ঘুমিয়ে, আনন্দে, নব নব স্বপ্ন বুনে আমার কাল পাল তুলে ছুটে চলেছিল। সহসা এক ডুবো চরে ধাক্কা লেগে গেল।

আগেই বলেছি হোটেলটীতে নানা দেশের মানুষ এসে আশ্রয় নিয়েছিল।

বিরাট হোটেল। বিলাতী আদব কায়দা বিধিবিধান।

সকাল বেলায় চায়ের পেয়ালায় প্রথম চুমুক দিয়ে খবরের কাগজের পাতায় চোখ বুলাচ্ছি···বেয়ারা একটী ছোট কার্ড নিয়ে এলো।

নিমন্ত্রণ। আজ রাত্রি আটটায় সময় হোটেলের বিরাট খোলা ছাদে মুক্ত আকাশতলে ভোজনের সাদর আমন্ত্রণ। যিনি, নিমন্ত্রণ করেছিলেন তিনি তাঁর নাম দেননি। শুধু ইংরাজীতে লিখেছিলেন "Friend," এর উদ্দেশ্য আর কিছুই নয়···প্রীতি সম্মেলন ও শারদোৎসব। আজ সুদিন বৈ কি! বিদেশে বন্ধু লাভ! সারাদিন আমার মনটী খুসীতে ভরে রইল।

সুন্দর সেই সন্ধ্যা! পূর্ণিমার রাত্রি। শরৎ কালের স্বচ্ছনীল আকাশ। এখানে ওখানে দু একটি ছন্নছাড়া শাদা মেঘ অলসভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে। জ্যোৎস্না ঝলসিত সীমাহীন নীল সমুদ্র।

রাত্রি আটটা। আমি ধীরে ধীরে নৈশ ভোজনের পোষাক পরে ছাদে গিয়ে উঠলুম। অপূর্ব্ব সে সম্মেলন। একটী আন্তর্জ্জাতিক বিশিষ্ট জনতা। এই বিপুল ভোজ সভার আয়োজনের পিছনে যার কল্পনা ও সঙ্গতি সক্রিয় ছিল তাঁর উদারতা ও মহানুভবতার কথা ভেবে আশ্চর্য্য হলুম। রুচি ও জাতীয়তা অনুসারে বিবিধ খাদ্য ও পানীয়ের সুবন্দোবস্ত ছিল।

হাসি ঠাট্টা পানভোজন পুরাদমে চলেছে। এমন সময় সেই পূর্ণিমার আকাশতলে সমুদ্রতীরের আনন্দিত প্রমোদসভায় আকস্মিক বজ্রপাত হল, অন্ততঃ আমার মনে তাই হয়েছিল।

দেখলুম একটি শীর্ণ শুকনো চেহারার কালো বাঙ্গালিনী প্রত্যেকের কাছে গিয়ে হেসে আপ্যায়ন করছে। কানাকানি সুরু হয়ে গেল। ইনিই আজ আমাদের ভোজদাত্রী···বিশ্ববান্ধবী। আমি অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করতে লাগলুম। শুনলুম যে ইনি চিরকুমারী। ধনকুবের-কন্যা। ইনি বিশিষ্টা মানবপ্রেমিকা ও সমাজকল্যাণ-ব্রতচারিণী।

নিমন্ত্রিত অতিথিদের প্রতি সৌজন্যের পালা সেরে তিনি ধীরে ধীরে ক্রমশঃ আমার দিকে এগিয়ে আসতে লাগলেন। আমি নিষ্পলক চোখে তার পানে চেয়ে রইলুম। হায়রে দুরন্ত অভিশাপ···এখানেও তুমি··· এই আনন্দে, উৎসবে, অফুরন্ত সৌন্দর্য্যলীলার মাঝে!

আমি স্পষ্ট দেখতে পেলুম—কি ক্ষুধিত তার হৃদয়! সমুদ্রের কল্লোল ছাপিয়ে তার অন্তরের চিরন্তন কান্না আমার কানে এল। রূপহীনা নারীর উপেক্ষিত জীবনের প্রবঞ্চনা, সংসারে সমাজে, মানুষের মনের মাঝে একটুকু ঠাঁই পাবার ব্যাকুল বাসনার ছবি আমাকে অকস্মাৎ উদ্‌ভ্রান্ত করে দিল। মনে হল সেই যখন তাকে প্রথম দেখেছিলুম পাষাণ স্মৃতির প্রাঙ্গনে, তারপর হতে কত পরিবেশে কত বিচিত্র ভঙ্গীতে ঐ রূপহীনার সাথে আমার দেখা সাক্ষাৎ হয়েছে। সহসা আজ আমার মনে এই সত্য সুস্পষ্ট হয়ে উঠল যে, সে সর্ব্বনাশী, সে আমার নিষ্ঠুরা নিয়তি। তার প্রভাব আমার জীবনে যে কি বিরাট পরিবর্ত্তন এনেছে, সে আমি ছাড়া এ বিশ্বসংসারে আর তো কেউ জানে না, হয়তো জানবেও না।

সে কাছে এল। তার স্বাভাবিক সৌজন্যে শুধাল—আমার কোন অসুবিধা হয়েছে কি না।

জীবনে এই প্রথম তার সাথে কথা বলবার সুযোগ পেলুম, বল্লুম, "আপনার এই ভোজনপর্ব্বের উদ্দেশ্য কি?"

তিনি আকাশের দিকে চেয়ে উদাস স্বরে কইলেন, "আমি চলে যাচ্ছি কিনা···তাই।"

আমি মনে মনে খুশী হলুম। একলা ঘরে বিছানায় শুয়ে আমার চোখে ঘুম নেই। রাত গভীর হতে গভীরতর হল। শুধু একটীর পর একটী চিন্তা ঢেউয়ের পর ঢেউয়ের মতন আসতে সুরু করেছে। আমি এতকাল পরে আত্ম-বিশ্লেষণের সুযোগ পেয়েছি। অনেক ভেবে শেষকালে আমি বুঝতে পারলুম যে সংসারে ঐ মেয়েটীর কৌমার্য্যের পিছনে যেমন রয়েছে অনন্যসাধারণ কুরূপ-আমারও এই চিরকুমারব্রত পালনের অন্তরালে প্রচ্ছন্ন অফুরন্ত প্রেমহীনতা। আমরা দুজনেই এই ভরা ভুবনের হাটে দেউলিয়া। আমি যদি কালোকে ভালবাসতে পারতুম, তবে হয়তো আমার জীবনের ইতিহাস আজ অন্য পথে চলত। ভিতরে ভিতরে অত্যন্ত অনুতপ্ত হলুম। ঠিক কল্লুম কাল সকালে প্রাতরাশের পর আমি তার সাথে দেখা করে ক্ষমা ভিক্ষা করব। শেষরাতের দিকে

ঘুমিয়ে পড়েছিলুম বলে পরদিন উঠতে বেলা হল। ম্যানেজারের কাছে খোঁজ নিয়ে জানলুম যে খুব ভোরে সে প্রভাতবায়ুসেবনে বেরিয়ে যায়। আজও গেছে। এখনও ফিরে আসে নি।

বৈকালের প্রতীক্ষায় রইলুম। নাঃ, তখনও সে ফেরেনি।

রাত্রি আটটার সময় আবার প্রশ্ন করে জানলুম যে, পুলিশে সংবাদ দেওয়া হয়েছে।

সে নিরুদ্দেশ।

সারা রাত্রি আমার এমনি উদ্বেগে কাটল। আমি স্বপ্নেও ভাবিনি যে, সে আমার অতল মনের পাতালপুরে এমনি ভাবে জুড়ে বসেছিল। আমি তাকে ভয় করেছি, এড়াতে চেয়েছি, হয়তো ঘৃণাও করেছি; কিন্তু নিজের অজ্ঞাতসারে যে ভালবেসেও ফেলেছি, একথা আজ শুনলে কেইবা বিশ্বাস করবে! আজ যেন আমি আমার নতুন পরিচয় পেলুম। তার প্রতি তীব্র মোহই না আমাকে অন্য কোন নারীকে জীবন-সঙ্গিনীরূপে বরণের ইচ্ছাকেও অঙ্কুরে বিনষ্ট করেছে।

ঐ কালীর পদতলে আমার দুর্ব্বল পৌরুষ শিবের মতন অচৈতন্য

আত্মদর্শনের সেই ভীষণ রাত্রি প্রভাত হল। আমি উন্মাদের মতন ম্যানেজারের ঘরের দিকে ছুটলুম। তিনি তখন ছিলেন না। শুনলুম সমুদ্রতীরে কি একটা জরুরী কাজে পুলিশের লোক তাঁকে ডেকে নিয়ে গেছে।

আমিও হোটেলের বাইরে ছুটে বেরিয়ে এলুম।

হোটেল থেকে কিছুদূরে সাগরসৈকতে একটী কৌতূহলী জনতা জমেছে। পোষাকপরা পুলিশের লোকও আছে। আমি তাড়াতাড়ি সেদিকে চল্লুম। তখন সূর্য্য উঠছে। আকাশে বাতাসে সমুদ্রে সৈকতে প্রথম আলোর সিঁদুর ছড়ানো। দু'হাতে ভীড় ঠেলে সরিয়ে আমি তাকে শেষবারের মতন দেখলুম···মাটীর মেয়ে মাটীর কোলের উপর ঘুমিয়ে। সে ঘুম আর ভাঙ্‌বেনা।

ঢেউয়ের ফেণায় ফেণায় মনে হচ্ছে সে যেন ফুলের সজ্জা পরেছে। আজ এই প্রভাতের নতুন আলোয় নতুন চোখে তার নতুন রূপ দর্শন কল্লুম। মনে হল মৃত্যু তাকে দিয়েছে যে মহিমা ও সৌন্দর্য্য, তার আর তুলনা নেই।

পরে বুঝেচি—আমার মনের মাধুরী মিশিয়ে তাকে রচনা করেছিলুম বলেই সে কন্যা আমার শুভদৃষ্টির সুমুখে এমন মোহিনীরূপে শেষবারের মতন দেখা দিয়েছিল।

বন্ধুগণ! তোমাদের সব অকপটে নিবেদন কল্লুম। সুরিতের শুভদৃষ্টির লগ্নে যখন তার বধূর মুখাবরণ সরিয়ে ফেলল, তখন আমার মনে হঠাৎ যেন বিদ্যুৎ চমকে উঠল। কি অদ্ভুত সাদৃশ্য রয়েছে তার মুখ ও চোখের, তার চামড়ার রঙের সাথে সেই আমার ভয়করা, ঘৃণাধরা, ভালবাসা চেয়ে কেঁদে মরা মেয়েটীর চেহারার সাথে।

আচ্ছা, এখন তোমরাই বল···আমি কি আর সেই সভায় একদণ্ডও তিষ্ঠাতে পারি?"

মনের মানুষ মিলিবে কোথায়!

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

মানুষের সাথে মিতালী করিয়া নয়ন-অশ্রু নীরবে মুছে
মিথ্যা আশায় বেঁধেছি বুক।
আমার জীবন-যাত্রা চলেছে নিরাশার তীরে মাণিক খুঁজে
পাবো কি কোথাও ক্ষণিক সুখ?
সার্থচোরার মধুর ভাষণে আকাশকুসুম ফুটেছে মনে,
ভাবিনি তাহার পশ্চাতে রয় বিষের যাতনা ছলনা সনে,
মনের মানুষ মিলিবে কোথায় পাইনি তাহার আভাস কিছু,
খেয়ালের বনে ক্ষেপা বাতাসের আলোড়নে মাথা
হোলো যে নীচু
ব্যথার সাগরে ডুবেছে মুখ।

কালিয়া দমন হোলোনা আমার হৃদিযমুনার কালিয়াদহে
হোলো নাকো বলা প্রাণের কথা।
তীব্র গরলে স্রোতোধারা নীল, বিষবাষ্প যে নিয়ত বহে
তাই কাঁদে মোর জীবনলতা।
কত বাণী এলো কতো হোলো লয়,
কলকণ্ঠেতে দিয়েছে সাড়া,
এলোনা অশোকা, দুঃখে শোকেতে আমিযে রহিনু
পন্থাহারা।
সাধু সেজে কত শঠ শয়তান নিজেরে দেখায় কলুষহীন,
ভাবিনি কখন তারাই আমার আঁধার করিবে প্রতিটি দিন
অগোচরে রচি বিপক্ষতা।

কোথায় শান্তি! ভ্রান্তিকুহকে উন্মাদসম রহিনু একা,
বিফলতা শুধু নিয়েছি বরি।
স্বপনের চিতা ধিকি ধিকি জ্বলে ভাগ্যগগনে কাজলরেখা
আয়ুর পাতা যে পরিছে ঝরি।
প্রতারণা করে তারাই আমারে যাদের করেছি
নিত্য সেবা,
আমার দুখের নিশীথ দুয়ারে সুখের প্রদীপ জ্বালিবে কেবা!
ধরার উপরে বাঁধিনু যে ঘর, তারি বাতায়ন গিয়াছে খসি,
তবুও এখনো আশা করি কেন আকাশে আমার উদিবে শশী
তারার কেশর কীর্ণ করি!

একটি দিনের ভুলের বোঝাটি সারাজীবনের
হোলো যে বোঝা
মহা মিথ্যার হেরিনু মেলা।
শতেক জনের স্তুতিবাদ করে উক্তি কাহারো পাইনি সোজা,
সবাই দেখায় চাতুরী খেলা।
মৃত রজনীর অস্থিতে ঢাকা মর্ত্ত্য-শ্মশান-মথিত পথ,
সেথা কি ভাঙিয়া পড়েছে আজিকে মহাসারথীর পুষ্পরথ?
আশ্রয় যেথা আশ্রিতজনে পরিহাস করে জনান্তিকে
বুঝিতে নারিনু পড়ে আছি কেন শুধু দাসখত সেথায় লিখে
বিনিময়ে নিয়ে মাটির ঢেলা।

নয়নেরজলে ভিজায়ে দিলাম মরুর বুকেতে তুলিয়া ফুল
ক্লান্তি আমার ঘনায়ে আসে,
দীর্ঘ বরষ গেল যে কেবল স্মৃতির ঘরেতে ভরিয়া ভুল
লীলাকমলের সমাধি পাশে।
তৃণের দম্ভ হেরিয়া আমার হাসি পায় হেথা শূন্য তীরে
ফুলের ফসল হোলো নাকো আর, ভুলের ফসল রয়েছে ঘিরে।
এজীবনে মোর শত অবিচার সাথে অনাচার আসিছে ধেয়ে,
এর প্রতিকার হবে নাকো জানি
দুখের কাহিনী কি হবে গেয়ে
মোর পরাণের সর্ব্বনাশে!

মুখের কথার মূল্য কোথায়? কৃতজ্ঞতার পাইনি দান
যুগযাত্রীর শতেক শ্লেষে।
বুদ্ধিহারা এ রুদ্ধকণ্ঠ ঘুমপাড়ানিয়া শুনিছে গান
কেন অসহায় ধরায় এসে।
মিথ্যা মোহের মায়া মরীচিকা ভ্রমিছে আমার সমুখে সদা
উৎসবউষা সমারোহ যত রচিছে অজানা কল্পকথা।
আলোর দীপালি হোলোনা আমার
বেঁচে থাকা আজ বিড়ম্বনা,
গতিহীন যার পথচলা হোলো, সেজন উদাসী অন্যমনা
দুর্গতি ভোগ হবে কি শেষে?

সুয়েজ

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত

জাহাজের প্রচার পত্রে দেখলাম—

'সুয়েজ—সকাল ৬টা—পোর্ট তিউফিক্।'

৮ই জুন ১৯৫১।

সান্ধ্য ভোজ শেষ হয়েছে। জাহাজের বড় হলঘরে নৃত্য হচ্ছে। যারা মাত্র নৃত্য উৎসবের দর্শক তাদের মধ্যে উত্তেজনা দেখা দিল—জাহাজ ভোরে সুয়েজের মুখে পোর্ট তিউফিকে পৌছবে। প্রচারপত্র হাতে হাতে ঘুরলো।

আমার মনটা চার হাজার বছর বেড়িয়ে নিলে। চিত্তপটে ভেসে উঠলো চলচ্চিত্রের ছবির মতো খলিফ ফারাওহ্, টলেমি, খেদিভ, নেপোলিয়ন ফার্ডিনাণ্ড ডি লেসসেপ। সুয়েজ খাল দুটা মহাদেশকে দ্বিখণ্ড করেছে—দুটা সাগরকে যোগ করে তিনটে মহাদেশের মধ্যে যাতায়াতের জলপথ নির্ম্মাণ করেছে।

আমি যখনই মানুষের এ কৃতিত্ব ভাবি, মনে হয় আমাদের পুণ্যভূমির চিরদিনের সমৃদ্ধির সুফল আর ভারতের প্রতি সারা দুনিয়ার লোভ-লোলুপ দৃষ্টি। আজ তার ছেলে মেয়ে অনশনক্লিষ্ট, যথেষ্ট বলহীন। আর চার হাজার বছর তার সাথে বাণিজ্য করে লাভবান হবার জন্ত তোড়জোড়, বিধি ব্যবস্থা পরিকল্পনায় সভ্যসমাজ আত্মনিয়োগ করেছে শতাব্দীর পর শতাব্দী।

মিশরের নীল, ভারতের সিন্ধু গঙ্গা এবং মধ্য এসিয়ার ইউফ্রেটিস টাইগ্রিসের সঙ্গে মানব সভ্যতার ইতিহাস ওতপ্রোতভাবে জড়ানো। মিশরের নীলনদ পদ্মের আকার ধারণ করে ভূমধ্য সাগরে সলিল বিসর্জ্জন দিচ্ছে বহুশাখায় বিভক্ত হ'য়ে। কিন্তু নীলে ভেসে কোন তরী য়ুরোপ বা আফ্রিকা হতে এসিয়া ভূখণ্ডে পাড়ি দিতে পারে নি। কারণ নীল নদের কোন মুখ লোহিত সাগরে মেশেনি। উটের পিঠে আরোহণে বা পায়ে হেঁটে

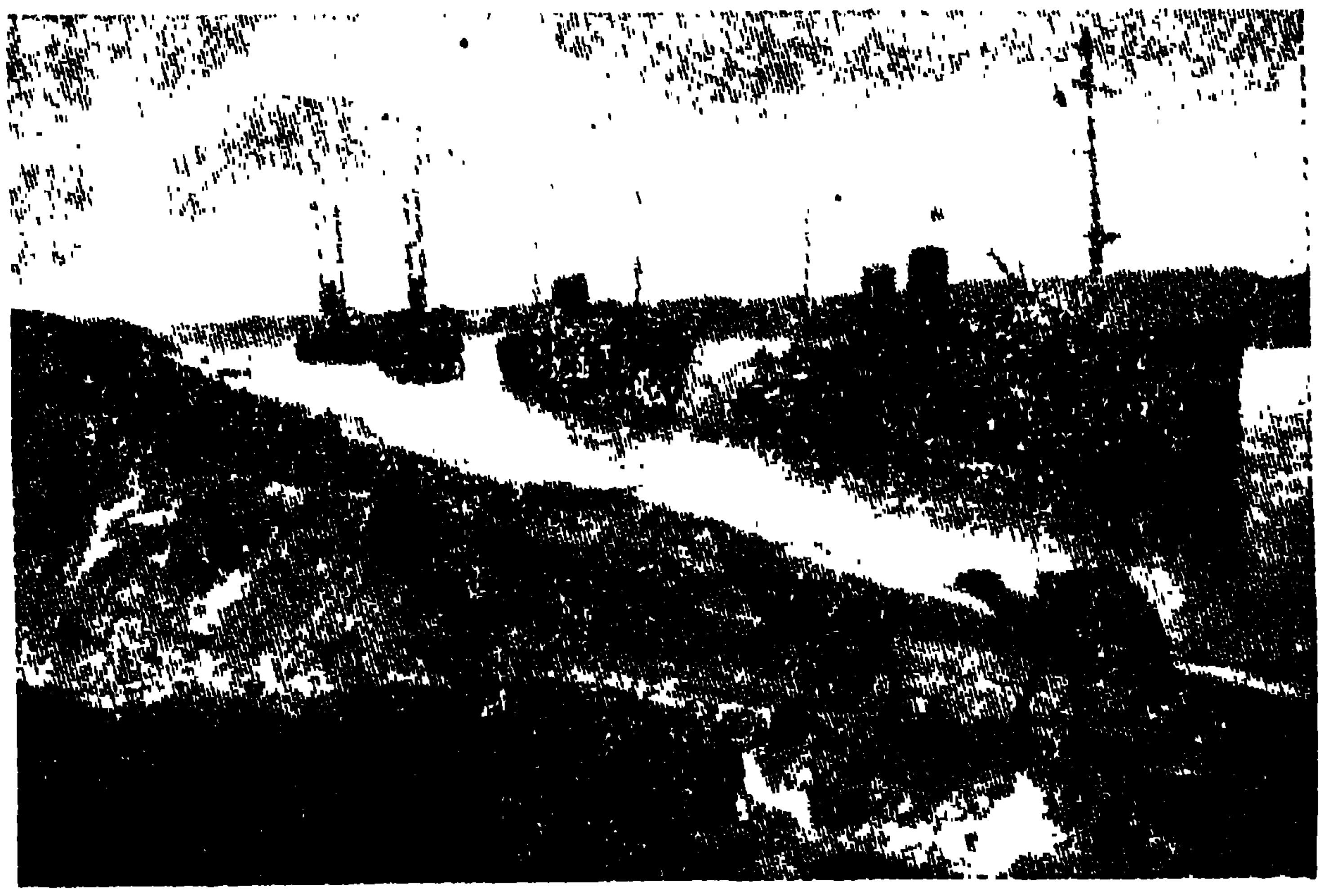

সুয়েজ খাল

সুয়েজযোজক না পার হলে এসিয়ায় পৌছান যায় না। স্থলপথে লোহিত সাগরে পৌছবার ব্যবস্থা চিরদিন কষ্টসাধ্য।

বিধাতা নির্ব্বাণ বাতির অন্ধকারে মানুষের ভাগ্যলিপি লেখেন। যার ভাগ্যনিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করেন, সে কিছু জানতে পারে না। মিশর হতে জলপথে এসিয়ায় পৌছবার আয়োজনে চিরদিন যে ভারতবর্ষের ললাটলিপির একটা স্থান ছিল, এ-কথা সহজে মনে হয় না। কিন্তু এখন জানা গিয়েছে যে, প্রাচীন মিশরের পণ্য বীথিকায় ভারতীয় মালের চাহিদা কিছু কম ছিল না। ঐতিহ্য বলে ফারাওহ্ সেসেস্ত্রী খৃঃ পূর্ব্ব দু'হাজার শতকে নীল নদীর দক্ষিণ পূর্ব্ব শাখা হতে লোহিত সাগরে পৌছবার জন্ত একটি খাল কেটেছিলেন। তার ফলে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যে বাণিজ্য ও কৃষ্টির সংযোগ স্থাপন হয়েছিল। হাজার বছর এ প্রণালী—ফারাওহ্দের নামের মোহর নিয়ে বর্ত্তমান ছিল।

কিন্তু রাস্তা যেমন রাষ্ট্রের প্রসারে সহায়তা করে তেমনি শত্রুকে ঘরে আনবার অবকাশ দেয়। খাল কেটে কুমীর আনা প্রবচনের অন্তরালে যে প্রজ্ঞার নির্দ্দেশ তা সকল সমাজে সকল যুগেই বিদিত। বোধ হয় আত্ম-রক্ষার চেষ্টাতেই সে-খাল বন্ধ হয়েছিল। আবার ফারাওহ্ নেকো খৃঃ পূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে প্রণালীটি হতে বালি ও পাঁক

তুলে তাকে সজীব করেছিলেন। তার কারণও ছিল। তিনি যুডার রাজা যশিয়াকে জয় করে এক লক্ষ বিশ হাজার বন্দী এনেছিলেন। এতগুলা য়িহুদীকে না খাটিয়ে বসিয়ে রাখা শক্তির অপচয়। প্রাচ্যের পণ্যও প্রবল স্রোতে মিশরে ঐশ্বর্য্য আনতে পারেনা খাল না কাটলে। তাই তিনি ফারাওহ্ প্রণালীকে পুনর্জীবন দান করেছিলেন।

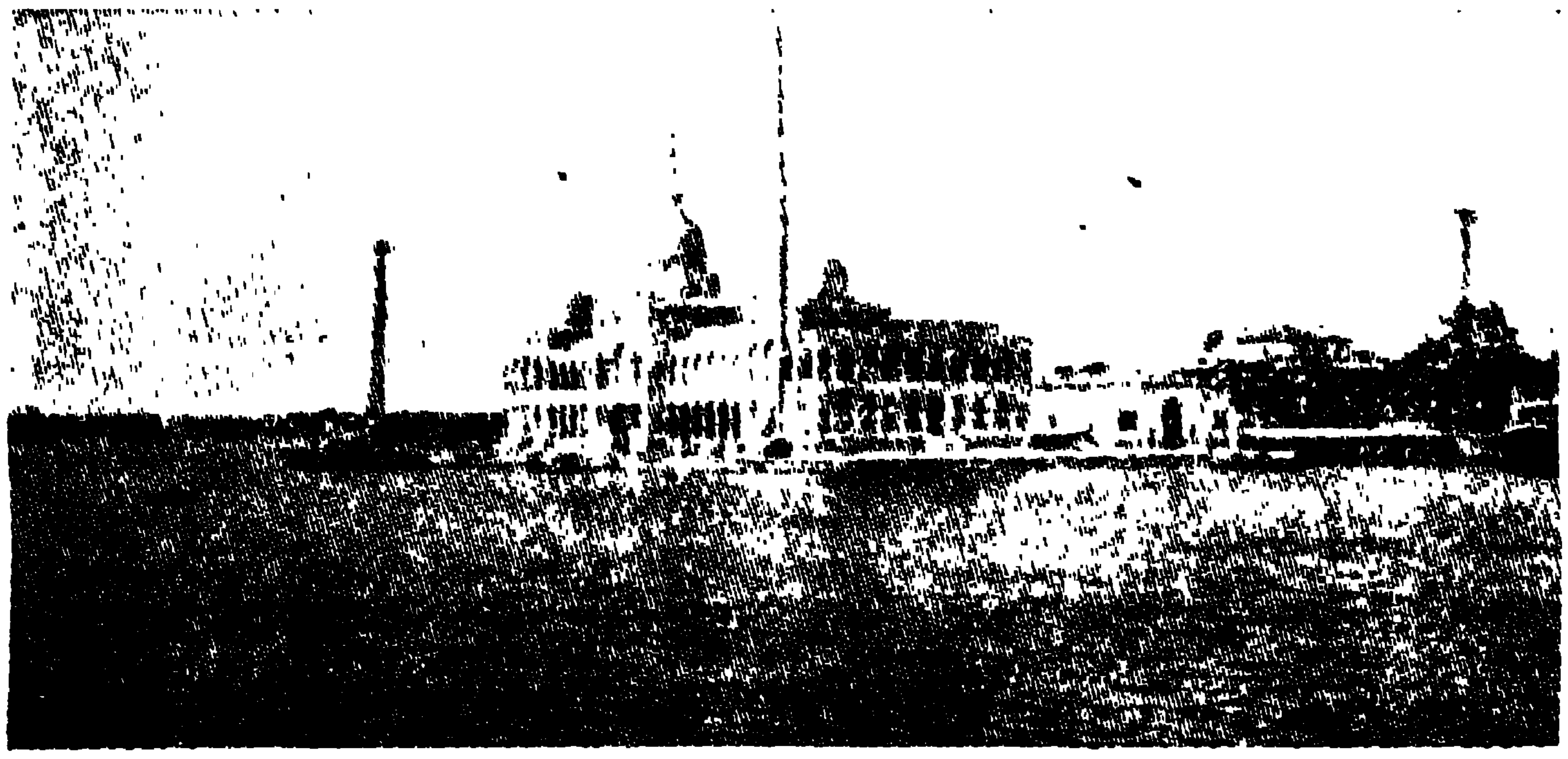

পোর্ট সৈয়দে সুয়েজ খাল অফিস

কু-সংস্কার ও দৈব-স্বপ্ন সেদিনের ইতিহাসে বহু অধ্যায় গড়েছে। খাল কাটার পর স্বপ্ন দেখলেন মিশরাধিপতি। এ পথে পণ্য আসবে, অর্থ আসবে। কিন্তু বিদেশী বর্ব্বর সৈন্যের অভিযান অনিবার্য্য। আবার প্রণালীতে বালি পড়ল, পাঁক জন্মালো। সত্যই কুমীর এলো। পারস্যের প্রবল ভূপতি কম্বায়সীজ মিশর জয় করলেন। ভূপতি দরীয়সের আজ্ঞায় আবার খাল কাটানো হয়েছিল খৃঃ পূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীতে। হেরোডোটস্ এ প্রণালীর উল্লেখ করেছেন—নীলনদী হতে লোহিত সাগরের খাল।

যখন মিশর গ্রীক টলেমীদের আয়ত্তে গেল—তখনও এ-খাল বিদ্যমান। সেকন্দর সাহ স্থল পথে পঞ্চনদীর কুলে এসেছিলেন। টলেমী ফিলাডেলফস্ প্রথমে যোজক কেটে ভূমধ্য সাগরের সঙ্গে লোহিত সাগরকে যুক্ত করবার চেষ্টা করেন। কিন্তু কৃতকার্য্য হন্ নি। আলেকজান্দারের নামে আলেকজান্দ্রিয়া (ইস্কানদেরিয়া) সে যুগের কৃষ্টির কেন্দ্র ছিল। সেখানে সকল দেশের প্রসিদ্ধ পুস্তক সংগ্রহ করা হয়েছিল এবং বহু গ্রন্থ গ্রীক ভাষায় অনুদিত হ'য়েছিল। এইখানেই প্রথমে নিউ টেষ্টামেন্ট এবং জেন্দ অবেস্তার গ্রীক ভাষায় অনুবাদ করা হয়। আর রহস্যের কথা গ্রীকদের আনা হিন্দুস্থানের হাতী দেখে টলেমীরা আফ্রিকার বন্যহস্তীকে যুদ্ধ শেখাতে আরম্ভ করে। উইন উড্ রীড বলেন - যুদ্ধে ভারতের হস্তীর পারদর্শিতা ছিল অধিক।

ভারতের ভাগ্যের অনুরূপ ভাগ্য মিশরের। মিশরী গ্রীক টলেমীদের অধঃপতনের পর তার শাসনভার পড়লো রোমকদের হাতে। এন্টনী ও ক্লিওপেট্রার প্রেমের গল্প যুগ-যুগান্ত প্রসিদ্ধ। রোমকদের আমলেও নীল হ'তে এক নূতন প্রণালী মিশরকে লোহিত সাগরের পথে প্রাচ্যের সঙ্গে যোগ করেছিল। গ্রীক-মিশরী টলেমীদের কালে ইস্কনদরিয়ায় (আলেকজান্দ্রিয়া) বেশ সমৃদ্ধ ছিল। সেযুগে ভারতের দক্ষিণ পশ্চিম কুলের বাজারের মারফত তখনকার দিনের পাশ্চাত্যের সভ্যজগতের বাণিজ্যের ফলে উভয় ভূখণ্ডের পরিচয় ছিল। বলা বাহুল্য, চালানী মালের সঙ্গে কৃষ্টিরও চলাচল হ'য়েছিল। তার ফলে পাশ্চাত্যে ভারতীয় দর্শনের মতবাদ এবং প্রাচ্যে পাশ্চাত্যের শিল্পের প্রসার। জ্যোতিষ শাস্ত্র কে কাকে দিল আমি আজিও নির্দ্ধারিত ভাবে বুঝিনা। তবে সুমেরিয় সভ্যতা, মিশরের কৃষ্টি, গ্রীসের জ্ঞান ও সৌন্দর্য্য বোধ এবং ভারতের সংস্কৃতি পণ্যের সঙ্গে আমদানি রপ্তানী হ'ত তখনকার সভ্য জগতে, সে বিষয়ে ইতিহাসের মত স্পষ্ট। রোম ক্ষাত্র-ধর্ম্মের পোষণ কর্ত্তা—কিন্তু সর্ব্বাঙ্গীন সৌন্দর্য্যের অভিলাসে এদের সকলের কৃষ্টিতে আপনাকে সমৃদ্ধ করেছিল।

রোম ভেঙ্গে গেল। মিশর আরবের হাতে পড়ল। খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে মিশরের বাজার ও সভ্যতা নতুন রূপ নিলে। প্রভূত উৎসাহ, বীরত্ব ও কর্ম্মদক্ষতা মোস্লেম সারাসেনের প্রথম যুগের। ভূমধ্য সাগরের পূর্ব্ব ও দক্ষিণ কুলে ক্রুশের স্থলে অর্দ্ধচন্দ্র দেখা দিল। কিন্তু আলেকজান্দ্রিয়ার পুস্তকালয় ভস্মীভূত হ'ল, ভারতের সঙ্গে

ব্যবসা চললো স্থল পথে। উত্তর ইতালীতে জল ঘেরা ভেনিস হল খৃষ্টানের রক্ষা-ভূমি। ব্যবসা জগতে সে নীরবে আত্ম-প্রসার করলে। পৃথিবীতে যে যবে বড় হয় তার চোখ পড়ে ভারতের 'পরে। ভারত কেবল ঘুমায়ে রয়। মিশরের মোস্লেম হাটে কায়রো ও ইস্কন্দ্রিয়ার ভিতর দিয়ে—কতক জল পথে, কতক স্থল-পথে ভেনিস ভারতে পৌছল। কাঁচের বদলে কাঞ্চন গেল ভিনিসে। আর গেল মশলা। গীর্জ্জার জন্য মোমবাতি। বাঙলার কাপড় গেল, আরও কত কি? কিন্তু মিশর হ'ল হাট।

পর্ত্তুগাল উঠলো। ২০শে মে ১৪৯৮ সালে সেখান হতে গুড্‌হোপ অন্তরীপ ঘুরে ভাস্কো ডি গামা মালাবারে পৌছল। তথাকার জামোরিন (আরবী সামেরি) তাকে অভ্যর্থনা করলে। তার হাতে পর্ত্তুগালের রাজাকে জামোরিন লিখে পাঠালে—আমার রাজ্যে প্রচুর দারুচিনি লবঙ্গ, আদা, মরীচ এবং মনিমুক্তা আছে। তার বিনিময়ে আপনার দেশ হতে চাই সোনা, রূপা, প্রবাল ও শকলাত (লাল কাপড়)।"

"মলিবার মুমলেকেতে আস্ত
আজ মমলিকে হিন্দুস্থান
কে বজানেবে দকন ওয়াকেয়াত।"
হিন্দুস্থানের দক্ষিণের প্রদেশ আছে মালাবার—
বলেছিলেন পারস্য কবি, এতো ছিল তার সুযশ।

এই দিন হ'তে ঐ পথ হল বাণিজ্য-পথ। মিশরের পথ ক্রমশঃ বন্ধ হ'ল। ভেনিসের সাথে ভারতের ব্যবসা ম্লান হল। তখন তারা সুয়েজে খাল কাটবার আবেদন নিয়ে মিশরের সুলতানের সম্মুখীন হল। কিন্তু কুমীরের ভয় সুলতানকে নিরস্ত করলে। এক দিকে খৃষ্টান, অন্যদিকে হিন্দু। উভয় দিক হ'তে কাফেরের চাপ কি জানি খেলাফতকে কোন দ্বন্দ্বের মাঝে নিয়ে যায়।

পতন-অভ্যুদয় বন্ধুর পন্থা। আবার আঠারো শ' উনিশ শতকের যুগের লাভের পথে, লোভের পথে ধাবিত যাত্রীর রূপ বদলে গেল। একদিন যেমন হনুমানে কুম্ভকর্ণে হুড়াহুড়ি লেগেছিল লঙ্কায়, তেমনি মিশরে ইংরাজে ও ফরাসীতে হুড়াহুড়ি লাগলো। লড়ায়ের পরোক্ষ লক্ষ্য ভারত-সীতা। যে মিশর হাত করতে পারবে সে

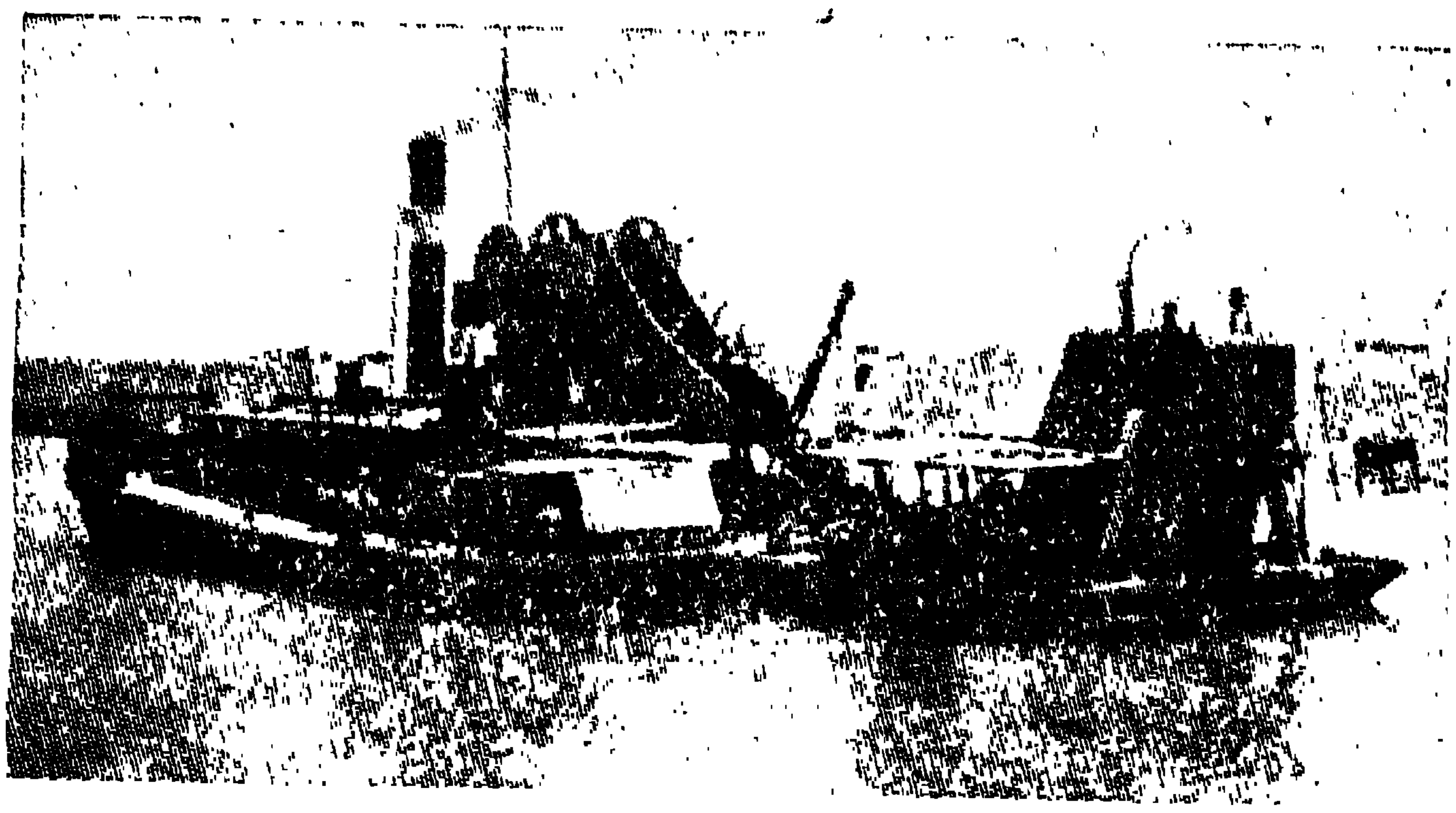

সুয়েজে মাটিকাটা জাহাজ

পারে ভারতে অধিকার। উভয় দেশেরই রাজ-শক্তি জরাজীর্ণ মোস্লেম সম্রাটের হাতে। দিল্লীর বাদসাহ আর পারে না। হিন্দু, মুসলমান ভারতবাসী যে যেখানে পারছে রাজ্য থেকে টুকরো কেটে নিয়ে স্বাধীন হচ্ছে। তুর্কীর সুলতানেরও শক্তি নাই মিশরের খেদিভকে আটকাবার। খেদিভের পক্ষেও ভুলিয়ে নবীন উদ্যমশীল জাতির দুজনের একজনের পক্ষে হাত করা সম্ভবপর। যার হাতে মিশর, য়ুরোপের সেই শক্তির হাতে যাবে ভারত। ভারত এ-সব কথা বোঝে না, বোঝবার চেষ্টা করে না। ছোটো স্বার্থের তুচ্ছ ঝগড়া নিয়ে ভারতবাসী পরস্পরের সঙ্গে বিবাদে মসগুল হ'য়ে থাকে। য়ুরোপ জাগে—ভারত কেবল ঘুমায়ে রয়। সে বিধিলিপির দোহাই দেয়। জানে ও মানে 'লাখ্ তদ্‌বির করে তো কেয়া হোতা হায়, ও হি হোতা হায় যো কে মনজুরে খোদা হোতা হয়।'

পৃথিবীর ঘোরার তালে কত জাতি প্রভাব ও প্রতাপ হারালো, কত জাতি জেগে উঠলো—সমৃদ্ধির পথে জোরে পা ফেললে। ভেনিসের শোকে ফরাসীর শিক্ষা হ'ল। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারতবর্ষে বেশ ব্যবসা জমিয়েছে।

কিন্তু তাদের মালপত্র যাতায়াত করে আফ্রিকা ঘুরে। আফ্রিকার কাঁধ পেরিয়ে লাল সাগরে পড়তে পারলে ভারতীয় পণ্য সস্তায় সরবরাহ করা যায় য়ুরোপে। ফরাসী ভাবলে ইজিপ্ত দখল করতে পারলে নীল-নদের একটা শাখা থেকে খাল কেটে লোহিত সাগরের সঙ্গে মিশিয়ে দেবে। তা'হলে ভারতবর্ষ ফরাসীর জমিদারী হয়ে যাবে। ভারতবর্ষ এসব অভিসন্ধির তোয়াক্কা রাখলে না —কে কোন্ নবাবকে হাত করবে, কোন জমিদার কোন্ প্রজার রক্ত শুষে খাবে, কোন্ ব্রাহ্মণ কাকে অচ্ছুৎ প্রতিপন্ন করবে এবং কোন্ কুলীন কতগুলো বিবাহ করবে, এই সব ব্যাপার নিয়ে রইল।

ফরাসী বুদ্ধিমান। কিন্তু সেদিনের ইংরাজ প্যাঁচালো ছিলেন। সে সদ্‌গুণ বোঝাবার জন্য তারা শব্দ ব্যবহার করে—ডিপ্লোমেসি। ১৭৮৫ সালে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্ণেল কপার এক পুস্তক লিখে স্বজাতিকে বোঝালে যে মিশর হাত না হ'লে ভারতের বাণিজ্য গোল্লায় যাবে।

ফরাসীদের প্রজাতন্ত্র হ'ল। রাজা গেল, রাণী গেল, বাড়ি গেল, ঘর গেল, কিন্তু ভারতবর্ষের লোভ সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার অমোঘ ব্যবস্থার মধ্যে স্থান পেলে। ইংরাজ বুঝলে বাঁধন-ছেঁড়া ফরাসীকে দমন করতে না পারলে গতিক সাঙ্ঘাতিক। বার্ক সাহেব খুব চীৎকার করলে। পিট মিস্ত্রী বুঝলে ফরাসীকে গণ্ডীর মধ্যে না পুরলে সর্ব্বনাশ। তার কুটনীতি প্রাসিয়া প্রভৃতিকে দলে নিলে। যুদ্ধ ঘোষিত হ'ল।

কিন্তু মরেও মরে না রাম এ ভীষণ বৈরী—একদিন বলেছিল সোনার লঙ্কার রাক্ষস। এত হট্টগোল বিপ্লব ও গিলোটিনের মাঝে ফরাসীর বিক্রম অম্লান। ধুমকেতুর মত গগনে দেখা দিল ক্ষুদ্র কর্শিকা দেশের এক যোদ্ধা, নাম নেপোলিয়ন। ১৭৯৭ সালে নেপোলিয়ান বললে—দোকানদারের জাতিকে মারতে গেলে ইজিপ্ট নিতে হয়।

ট্যালিরাণ্ড লিখলে তার শাসক শক্তিকে: "ফরাসীকে ইজিপ্টে প্রতিষ্ঠিত করতে পারলে য়ুরোপের ব্যবসা জগতে এক বিপ্লব হবে। সেটা বিশেষভাবে আঘাত করবে ইংলণ্ডকে। এতে তার ভারতের শক্তি ধ্বংস হবে—কারণ তার য়ুরোপের জাঁকজমকের একমাত্র ঐ শক্তিটাই প্রধান।"

সুতরাং মিশর অভিযান ইংরাজ জাঁকজমক নষ্ট করবার একমাত্র উপায়। ১৭৯৮ সালে ফরাসী সেনা ইস্‌কান্দ্রিয়া দখল করলো।

ইজিপ্টে দুই পক্ষের প্রতিদ্বন্দ্বিতা, য়ুরোপে ওদের যুদ্ধ এ সব সুয়েজ প্রণালী প্রসঙ্গে অবান্তর। সকল পক্ষই চেষ্টা করলে একটা খাল কেটে কুমীর হ'য়ে বোকা ভারতবাসীর মাংসে পুষ্ট হতে।

না আর আলোচনা করব না। হুড়াহুড়ি দুপাদুপি। কড় কড় শব্দে শিকল পড়লো। ষ্টুয়ার্ড শয্যা-চা এনে দিলে, তার সঙ্গে একজোড়া সেব আর দুটা কদলী।

—কিসের গোলমাল?

—স্যার, জাহাজ পৌঁছেছে তুইফিক্ পোর্টে।

জাহাজ প্রায় সারাদিন সুয়েজে রইল। সুয়েজ ছোট সহর। অনেক জাহাজ প্রতীক্ষা করছে প্রণালীতে প্রবেশ করবার জন্য। জেটি এসেছে সর্পিল ভঙ্গীতে। আরব, আরমানী, য়িহুদী মাল বেচতে এলো জাহাজে। মানুষ চায় মানুষের সঙ্গ—বিশেষ নব-পরিচিতের, যদি তার আকার প্রকার রং ও ঢং বিভিন্ন হয়। তুলনা করে মন—প্রায়ই নবাগতকে ক্ষুদ্র প্রতিপন্ন করবার সপক্ষে যুক্তি খোঁজে। তবে বহু ভারতবাসী আজও ইংরাজ বা আমেরিকানের মাঝে অমায়িক ভাবের লক্ষণ দেখলে বলে—আহা! এদের মত হ'তে আমাদের এখন অনেক দেরী। বাঙ্গালী সবাই তা' বলে না। অনেকে বলে—এ অমায়িকতাও একটা চাল। কলসীর মুখের ক্ষীর। যাক্, পরের কথা।

আবার মিশরের আলোচনা করি। স্মরণ হল মোহম্মদ আলির কথা। তার খেদিভ-পদ গ্রহণের কাল হ'তেই আধুনিক মিশরের ইতিহাস আরম্ভ। মিশর ছিল তুর্কীর একটা প্রদেশ। ঔরঙ্গজেবের শাসনের পরিণামে দিল্লী-সাম্রাজ্যের যে দুর্দ্দশা হ'য়েছিল, তুর্কীর সে দুরবস্থা হ'ল অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ হ'তে। য়ুরোপের বিভিন্ন জাতির অভ্যুত্থান হল বিলাসী তুর্কীর অধঃপতনের কাল ও কারণ। সম্রাজ্য যখন জীর্ণ হয়, দূরের অঙ্গগুলি

খসে পড়ে। মিশরের উপর য়ুরোপীয় ভূতের নৃত্য বিভীষিকার সৃষ্টি করলে কুস্তনতুনিয়ায়। মহম্মদ আলি আলবানীয়ার নব-গঠিত সেনার অধিপতি ছিলেন। তিনি মিশরে গিয়ে আপনাকে তুর্কী-সুলতানের প্রতিনিধি ব'লে ঘোষণা করলেন—এবং প্রকৃত পক্ষে তথায় রাজা হ'য়ে বসলেন। নামে মিশর রইল তুর্কীর প্রদেশ।

চতুর মোহাম্মদ আলি স্পষ্ট বুঝলে যে মিশরকে ঘাঁটি করতে চায় য়ুরোপীয়। একদলকে অন্যদলের বিপক্ষে খাড়া না করলে তাঁর নিজেরই নিরপত্তা অব্যাহত থাকে না। কায়রোতে ইংরাজ ও ফরাসীতে প্রতিযোগিতা চল্‌লো। তখন ভারতবর্ষে ঐ রকম পাল্লা দেওয়ার ফলে কার্ণাটিকে ফরাসী ডুপ্লে ইংরাজ ক্লাইভের কাছে মার খেয়ে গেছে। ভারতের ললাটে লেখা বিধিলিপি তখন ফুটে উঠেছে—তথায় স্পষ্ট পড়া যাচ্ছে—ইংরাজের প্রাধান্যের কথা। ভারত রাখতে গেলে এবং লুটতে গেলে ইংরাজ চায়না সুয়েজ খাল—নীল নদী হ'তে লাল-সাগরের যোগও নয়—ভূমধ্য সাগরের সঙ্গে লাল-সাগরের সংযোগ তো অসহ্য। ফরাসীর বুদ্ধি বেশী—সে ঠিক ঐটাই চায়, তা' হ'লে এসিয়ার প্রবেশ পথে ইংরাজকে রুখতে পারবে। কুমারিকা অন্তরীপের পথে সে যথা-ইচ্ছা যাক। ইংরাজি জাহাজ সে পথে ভারতে পৌছ-বার পূর্ব্বে ফরাসী মালে হিন্দু-স্থানের হাট-বাজার পূর্ণ হবে।

মোহাম্মদ আলি আরও ধূর্ত্ত। সে ফরাসীকে অন্তরে ভালবাসে, ইংরাজকে ভয় করে। মোট কথা তার জীবদ্দশায় কসরত চল্‌লো—কোপ পড়লো না। আশী বছর বয়সে বৃদ্ধ নিজ পুত্র মোহাম্মদ সৈয়দের হাতে রাজ্য-ভার অর্পণ ক'রে দেহত্যাগ করলে।

এতদিনে ইংরাজ বুঝলে শীঘ্র-গমনের পথ চাই ভারতে। ১৮২৯ সালে ওয়াগহরণ বহু গবেষণা করলে। তখন থেকে সুয়েজ প্রণালী কাট্‌বার ব্যবস্থা হ'তে লাগলো। কিন্তু ব্যাপারটা সাঙ্ঘাতিক। ভূমধ্য-সমুদ্র বা লোহিত সমুদ্রের একটি সাগর যদি উচ্চ হয়—প্রবল বন্যায় বহু দেশ ভেসে যাবে খাল কাট্‌লে। তখন নোয়ার ডিঙ্গি না হ'লে পুর্ত্ত কর্ম্মীর প্রাণ বাঁচানো দায় হবে। অনেক গবেষণা পরীক্ষা অঙ্কশাস্ত্রের সাহায্যে চল্‌লো।

কিন্তু নতুন খেদিভ পিতৃ-পন্থায় চল্‌লো।

ফরাসীদেশে সেণ্ট সাইমনের নামে এক সাধু লোক-হিতার্থে এক দল গড়লেন। জাতীয়তার গণ্ডী ভগবানের সন্তানদের মাঝে ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই নীতিকে প্রসার করে—সবাই যে তাঁর ছেলে একথা ভুলিয়ে দেয়। সুতরাং তার দলবলকে ফরাসী ক্ষেপার দল ভাবলে। তারা মিশরে এসে 'সুয়েজ খাল কাট্‌বার চেষ্টা করলে। কিন্তু তাদের চেষ্টা ব্যর্থ হল।

শেষে তাদেরই মতে অনুপ্রাণিত হলেন ফার্ডিনাণ্ড ডি লেস্‌সেপ। তিনি ফরাসীর রাজদূত ছিলেন। তিনি নানা দেশে ঘুরেছিলেন, কিন্তু মিশর ছিল তাঁর প্রিয়। একদিন তিনি এক রামধনু দেখলেন উভয় দেশের উপর—তার এক প্রান্ত আফ্রিকায়, অন্য প্রান্ত এসিয়ায়। উত্তরে

মধ্যপথের ষ্টেশন

য়ুরোপ। এটা জগদীশ্বরের সঙ্কেত। পৃথিবীর তিনটি মহাদেশকে একত্র করা যায় প্রণালীর দ্বারা।

লেস্‌সেপ এক বিশ্বকোম্পানী পরিকল্পনা করলেন অর্থ-সংগ্রহের জন্য। তার নাম হল—Compagnie Universelle du Canal Maritime de Suez. এর পূর্ব্বে সন্ত-সাইমনের দল চেষ্টা করেছিলেন যে কোম্পানীর মারফত তার নাম ছিল—Societe Eludes du Canal de Suez.

কিন্তু যার বিবাহ তার তো হুঁস নাই—পাড়া পরসীর নিদ্রা নাই। ভারত কেবল ঘুমায়ে রয়। বিধিরহো বলবান ইতি মে মতিঃ।

ইন্দ্রধনুর সঙ্গে আর একটা কাণ্ড ঘট্‌লো। ইতিমধ্যে খেদিভ আব্বাসের ইংরাজ-প্রীতির ফলে তারা আলেকজান্দ্রিয়া হ'তে কায়রো অবধি এক রেলপথ নির্ম্মাণ ক'রে ফেলছে। ১৮৫৪ সালে আব্বাসের দেহান্ত হ'ল।

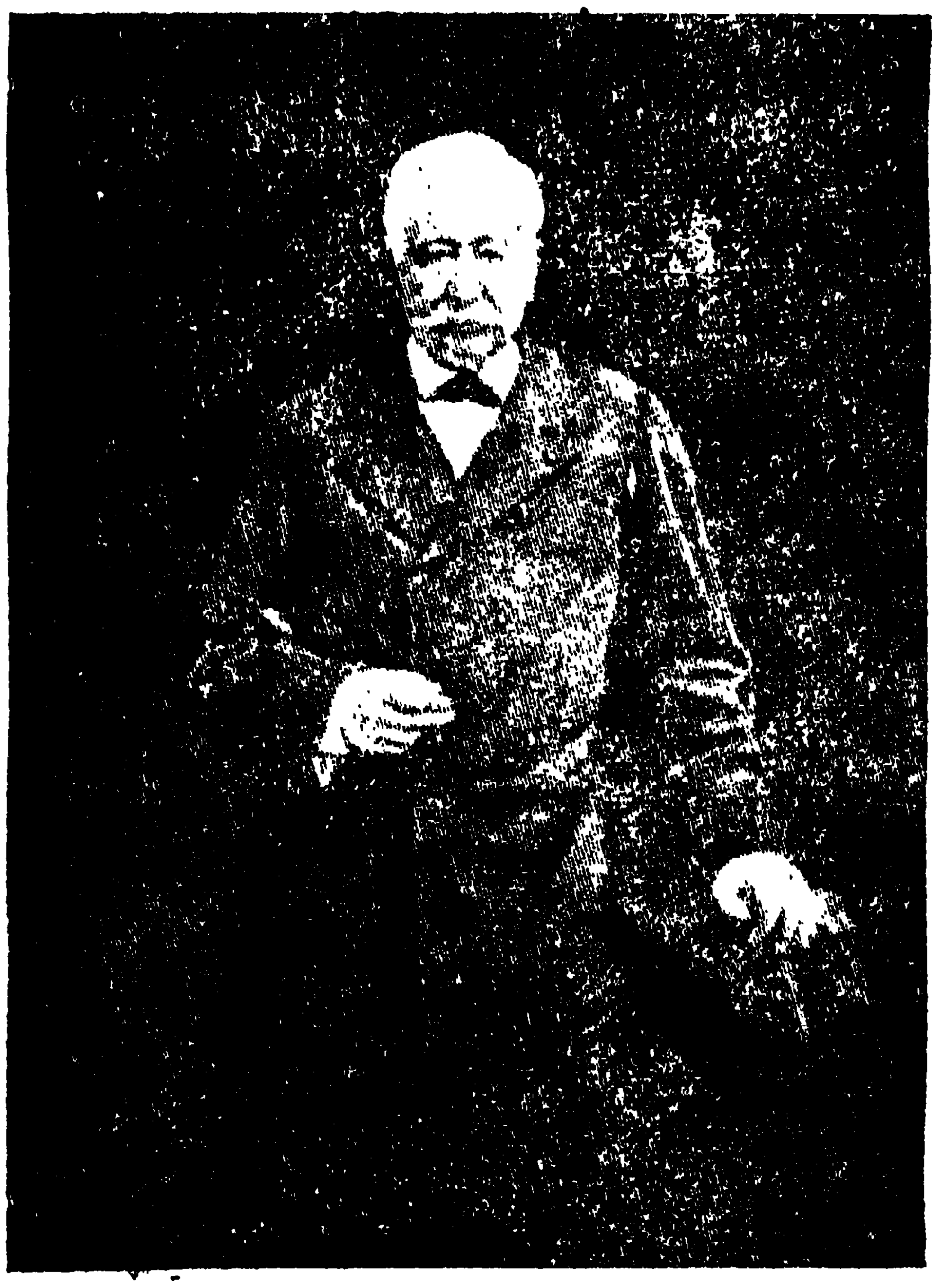

ফার্ডিনাণ্ড ডি লাস্‌সেল

পরবর্ত্তী খেদিভ সৈয়দপাশা বাল্যকালে লেস্‌সেপের সঙ্গসুখের মাধুরী উপলব্ধি ক'রেছিলেন। তিনি কায়রোর ভ্রমণ করতে যাবার সময় লেস্‌সেপকে সঙ্গে নিলেন। তাঁকে একটি আরবী ঘোড়া উপহার দিলেন। মরিয়া নামক স্থলে মরুভূমির শিবিরে লেস্‌সেপ রামধনু দেখলেন। তাঁর মন উদ্‌ভ্রান্ত হ'ল। শিবির ঘিরে পাথর জড় ক'রে খেদিভ শিবিরের নিরাপত্তার জন্য রাজকর্ম্মচারীরা এক চক্রাকার প্রাচীর গ'ড়েছিল। লেস্‌সেপের কথায় বলি—

"খেদিভের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নিজের তাঁবুতে প্রাতরাশের জন্য যাবার সময় তাঁকে দেখাতে চাইলাম আমার ঘোড়া কেমন লাফাতে পারে। আমি তাকে প্রাচীরের ওপর তুলে কদমে কদমে চ'লে গেলাম। ...আবার পাঁচটার সময় সেই ঘোড়ায় চ'ড়ে প্রাচীরের ওপর দিয়ে খেদিভের কাছে এলাম।...খেদিভ বল্লেন—আমি মন স্থির ক'রেছি। আপনার পরিকল্পনা গ্রহণ করলাম।"

লেস্‌সেপ অনুমতি পেলে খাল কাট্‌বার। ইংরাজ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হ'ল। মিশরকে ভয় দেখালে ইংরাজ। কিন্তু শেষ ফল—লেস্‌সেপের জয়।

পোর্ট সৈয়দে তাঁর প্রস্তর-মূর্ত্তি প্রাণে শ্রদ্ধা জাগালো। আর মনে পড়ল তার শেষ দিনের অবমান। সাফল্যের ফলে, তাঁর ওপর ভার পড়লো পানামা জাল কাটবার। সে ব্যাপার বিফল হ'ল। এমনকি হিসাবের গণ্ডগোলের অভিযোগে তাঁর কারাদণ্ড হ'য়েছিল। অবশ্য লেস্‌সেপকে কারাগৃহে যেতে হয় নি। কিন্তু আইনের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য তাঁকে গৃহে বন্দী থাকৃতে হ'য়েছিল। তাঁর দেহান্ত হয় ১৮৯৪ সালে।

ইংরাজ অভিমান ক'রে, চোরের ওপর রাগ ক'রে ভুমে ভাত খেলে না। পরে কূটনীতির অমোঘ আশীর্ব্বাদে খেদিভের বা ইজিপ্টের বহু অংশ কিনে নিয়ে সুয়েজ কোম্পানীর প্রধান অংশীদার হ'ল।

সুয়েজ ১৮৬৯ সালে ইসমাইল পাসার হাতে খোলা হ'ল। ৯৯ বছরের মেয়াদী পাট্টা। সুতরাং ১৯৬৯খৃঃ অবধি এখন সুয়েজ প্রণালী কোম্পানীর সম্পত্তি। সেয়ারের সুদ হিসাবে ইংরাজের বাৎসরিক আয় প্রায় দেড় কোটি

টাকা। আজ যে ইস্‌মাইলার গণ্ডগোলের কথা শুনি, সে সহর ইসমাইল পাশার স্মৃতিতে প্রতিষ্ঠিত। আজ সেথায় জ্বলে উঠেছে যুদ্ধের রক্তশিখা।

সুয়েজ খাল দুদিকে বাঁধানো। আগাগোড়া বিজলী বাতি। মাঝে মাঝে এক একটা হ্রদ আছে। জাহাজ যখন উত্তরে যায়, তখন উত্তর হতে আর জাহাজ আসে না। মোট লম্বা ১০২ মাইল—এর ২১ মাইল লোনা জলের হ্রদ। সাধারণতঃ দেড় শত ফুট প্রশস্ত।

সারারাত চলে ভোরে জাহাজ এলো পোর্ট সৈয়দে। মেডিটারেনিয়েনের মুখ—পারে চমৎকার অট্টালিকা—কোম্পানীর বাড়ি। ফতোয়া এলো—যারা বোম্বাই বন্দরে জাহাজে চড়েছে, তারা পোর্ট সৈয়দে নামতে পারবে না।

অষ্ট্রেলিয়ার লোক বেড়াতে গেল তীরে। লঙ্কার লোক গেল, আমরা আটক পড়লাম অবশ্য বহু ইংরাজের সঙ্গে। অভিমান হল। ঘড়ি বেচবার জন্য এক মিশরী এসেছিল। সে বললে—এ বিধান ভারত হতে যে সব ইংরাজ যাচ্ছে তাদের জন্য। আপনাদের জন্য নয়। আপনারা ভাই। কিন্তু জাত হিসাবে তো বলা যায় না—তাই বন্দর হিসাবে অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

হাসলাম। একজন যাদুকর এলো। ঘোল মানে ভুত আরবীতে। সে ঘলি ম্যান—অর্থাৎ ভুতের খেলা দেখায়। আল গোল তারা আড়াই দিন অন্তর ম্লান হয়, তাই তার নাম অল্‌ঘোল—ঐ ভুত। ঘলি ঘলি ম্যান গা থেকে মোরগ বার করলে, টাকা পয়সা তো উড়িয়ে দিলেই। শিশুদের মহা আনন্দ।

সুয়েজের নিজের একটা যাদুশক্তি ছিল এতদিন। তাকে ঘলি ঘলি কানাল বলা যেতে পারে। সুয়েজ প্রণালী পার হয়েই ইংরাজ হয়ে যেত বড় সাহেব, তার জাতীয় ভদ্রতার উপর একটা ভুতুড়ে অভদ্রতার খোলস চাপাতো। আবার ফেরবার সময় সে কোট খুলে ফেলত। তার দেশের লেখক অলডুস হাক্‌স্‌লি প্রভৃতি ভারতের সাহেবদের এই আচরণ যাকে আমি ঘলি ম্যানের আচরণ বলছি—সে সম্বন্ধে অনেক বিদ্রূপ করছে।

জাহাজের ধারে অনেক নৌকা এলো—আরব, আরমাণী, য়িহুদী। দড়ি ছুঁড়ে দিলে জাহাজে জিনিসের দর হবে। একদিকে বাঁধনে তার পণ্য—আরোহী জিনিস নিয়ে দাম বেঁধে দিলে দড়িতে। দরদস্তুর ভীষণ, এক পাউণ্ড বলে, পাঁচ শিলিঙে বেচে যায় জাহাজ ছাড়বার মুখে। যতই দর হোক—দুধে হাত পড়ে না—জলের ভাগ এতো বেশী।

যাক্‌—সেই দিন বুঝলাম ইংরাজের মুস্লিম মিতালী ঘা খেয়েছে মিশরে। সে জুন মাসের কথা।

সেপ্টেম্বরে ফেরবার সময় বাসরায় উড়োজাহাজ দাঁড়াবার কথা—নামলো বহরীনে। কারণ টিহারণের তেলের ঝগড়া, কায়রোতে অল্পক্ষণ ছিলাম—কিছু বুঝলাম না।

বড়র পীড়িতি বালীর বাঁধ। কভু হাতে দড়ি, ক্ষণেক চাঁদ। আশা করি মোস্লেম পীরিতির ঐ ধারা বুঝেছে ইংরাজ। একে একে সবাই গেল, বাকী শুধু পাকিস্তান।

শ্রীঅরবিন্দের জীবনী সমস্যা

শ্রীঅজয়কুমার মিত্র

শ্রীঅরবিন্দের রাজনীতি-পরবর্ত্তী জীবনের অর্থাৎ তাঁর পণ্ডিচেরী জীবনের কাহিনীটিই আজ বিশেষ করে সকলের কৌতূহল উদ্রেক করে। কারণ স্বদেশীযুগের কাহিনী এতদিনে আমরা নানা কাগজ পত্রাদি পড়ে অনেকখানি জেনে ফেলেছি। কিন্তু তাঁর অজ্ঞাত বাসের কথা "আর্য" পত্রিকা ও অধ্যাত্ম জীবন, তাঁর যোগতত্ত্ব ও শিক্ষাপদ্ধতি প্রভৃতির বিষয়গুলি এখনও সম্পূর্ণ রহস্যমুক্ত হয় নি। অথচ যে ক'খানি বই আমাদের দেখবার সুযোগ হয়েছে, সে সবের মধ্যে আবার যেগুলির লেখকেরা কোন বিশেষ-উদ্দেশ্য নিয়ে না লিখে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক কাহিনী বর্ণনা করতে চেষ্টা করেছেন, তাঁরাও অনেক ক্ষেত্রে তথ্য-সংগ্রহ বা তত্ত্বব্যাখ্যার দিক দিয়ে অভ্রান্ত হতে পারেন নি। কিন্তু তাঁদের উদ্দেশ্য যখন সাধু, তখন তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে সেই সব কাহিনীর সম্ভবমত পুনরালোচনা করলে হয়ত তাঁরা গ্রহন বর্জনের দ্বারা পরে ভুলগুলি সংশোধন করে নিতে পারবেন। সেই সঙ্গে সাধারণ পাঠকও এগুলি পড়ে কিছুটা কৌতূহল মেটাতে পারেন। যে যে কারণে সংবাদগুলি ত্রুটীহীন হয়নি, মোটামুটি তা হচ্ছে: (১) তারিখের ভুল—তাতে ক্ষেত্র বিশেষে ঘটনার পারম্পর্য নষ্ট হয়েছে, (২) জনশ্রুতিকে যাচাই না করে সত্য ঘটনা বলে চলিয়ে দেওয়া: তাতে উদ্দেশ্য বদলে গেছে, (৩) শ্রীঅরবিন্দের ইংরেজী কথাগুলির অনুবাদ কোন কোন জায়গায় ঠিক না হওয়ায় অর্থের গুরুত্ব হ্রাস হয়েছে, (৪) অল্পপরিসর জায়গায় সংক্ষেপে কোন কোন বিষয়ের ইঙ্গিত দিতে গিয়ে ঘটনার পিছনের আসল তত্ত্ব লোপ পেয়েছে, (৫) শ্রীঅরবিন্দের অধ্যাত্ম-তত্ত্বের তুলনামূলক ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে সহজকে জটিল এবং দুর্ব্বোধ্য করে তোলা হয়েছে এবং স্থান বিশেষে সত্যকে ক্ষুণ্ণ করা হয়েছে। অথচ এই সবের বেশীর ভাগই লেখকদের ইচ্ছাকৃত নয় বলেই মনে হয়। এবার আসল কথা পাড়া যাক।

(১) ১৯১০ সালের ৪ ঠা এপ্রিল শ্রীঅরবিন্দ গোপনে পণ্ডিচেরীতে আসেন। আর তার ঠিক চারদিন আগে, অর্থাৎ ৩১ শে মার্চ্চ, আসেন শ্রীসুরেশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী (ওরফে মণি) শ্রীঅরবিন্দের অজ্ঞাতবাসের ব্যবস্থা করবার জন্যে। সুরেশ চন্দ্রের লেখা থেকে (প্রবাসী জ্যৈষ্ঠ ১৩৫২), আমরা যে বিশদ সংবাদটি পেয়েছি তা এই: "১৯১০ সালের ৪ঠা এপ্রিল, কলিকাতা থেকে কলম্বোগামী ফরাসী যাত্রীবাহী মেল ষ্টীমার ডুপ্লেক্স (Duplcix) যখন পণ্ডিচেরী বন্দরে এসে বিকেল আন্দাজ ৪ টার সময় নোঙ্গর ফেল্‌ল তখন সেই ষ্টীমার থেকে যতীন্দ্রনাথ মিত্র ও বঙ্কিমচন্দ্র বসাক নামে দুই বাঙ্গালী যাত্রী পণ্ডিচেরীতে অবতরণ করলেন। এই বঙ্কিমচন্দ্র বসাকের আসল নাম হচ্ছে বিজয়কুমার নাগ, আর এই যতীন্দ্রনাথ মিত্র হচ্ছেন শ্রীঅরবিন্দ"।

এর ঠিক আগের ঘটনাবলীকে আশ্রয় করে একটি সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ইতিহাস গড়ে উঠেছে এবং বছর কয়েক আগে (১৯৪৫) তা সাময়িক পত্রিকাদিতে প্রকাশিত হয়। ঘটনাস্থলে যে গুটিকয়েক অনুচর শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে গোড়া থেকে শেষ পর্য্যন্ত ছিলেন, তাঁদের মধ্যে দু'জন শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ও শ্রীনলিনী কান্ত গুপ্ত পণ্ডিচেরী আশ্রম থেকে, শ্রীঅরবিন্দের অনুমোদিত কয়েকটি প্রবন্ধে (প্রবাসী ১৩৫২, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, ফাল্গুন) যথার্থ সত্যঘটনা বিবৃত করেন। কিন্তু ১৩৫৬ সালে প্রকাশিত শ্রীঅরবিন্দের জীবনীতেও নির্ভুল তথ্যগুলি স্থান পায়নি। শ্রীঅরবিন্দের কথা অনুসারে যে বাংলা বিবৃতি নলিনীবাবু প্রকাশ করেছিলেন (বর্ত্তিকা—১৯৪৬, এপ্রিল), তা থেকে ওই অংশটুকু এখানে উদ্ধৃত করা হল:

"...শামসুল আলমের (তৎকালীন বোমার মামলার সরকারী C.I.D. পুলিসের ডেপুটি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট) হত্যা সম্পর্কে গবর্ণমেণ্ট শ্রীঅরবিন্দের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনার মতলব করছে—এধরণের কথা নিয়ে নিবেদিতার

সঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের কোন আলাপ কখন হয়নি, হবার সম্ভাবনাও ছিল না; কারণ এরকম সংবাদ শ্রীঅরবিন্দকে কেউ কখন দেয়নি। আর নিবেদিতা শ্রীঅরবিন্দকে লুকিয়ে পড়তে (go (nto hiding i কোন দিন পরামর্শ দেননি। আসলে যা ঘটেছিল তার সঙ্গে চন্দননগরে যাত্রার কোন সম্বন্ধই নাই। ঘটনাটি এই। এসব ব্যাপারের অনেক পূর্ব্বে শ্রীঅরবিন্দকে নিবেদিতা জানান যে, গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য তাঁকে দেশান্তরে আটক রাখা (deport), আর পরামর্শ দেন বৃটিশ-রাজ্য ছেড়ে বিদেশে চলে যেতে এবং সেখান থেকে কাজ করতে—লুকিয়ে পড়তে নয়। শ্রীঅরবিন্দ সে পরামর্শ গ্রহণ করলেন না—বললেন, একটা খোলা চিঠি তিনি লিখবেন এবং আশা করেন, তাতে গবর্ণমেণ্টের মনোভাব পরিবর্ত্তিত হবে। নিবেদিতা পরে শ্রীঅরবিন্দকে জানান, বাস্তবিকই চিঠিখানিতে কাজ হয়েছিল, অতঃপর নির্ব্বাসনের আর কোন কথা ওঠেনি।

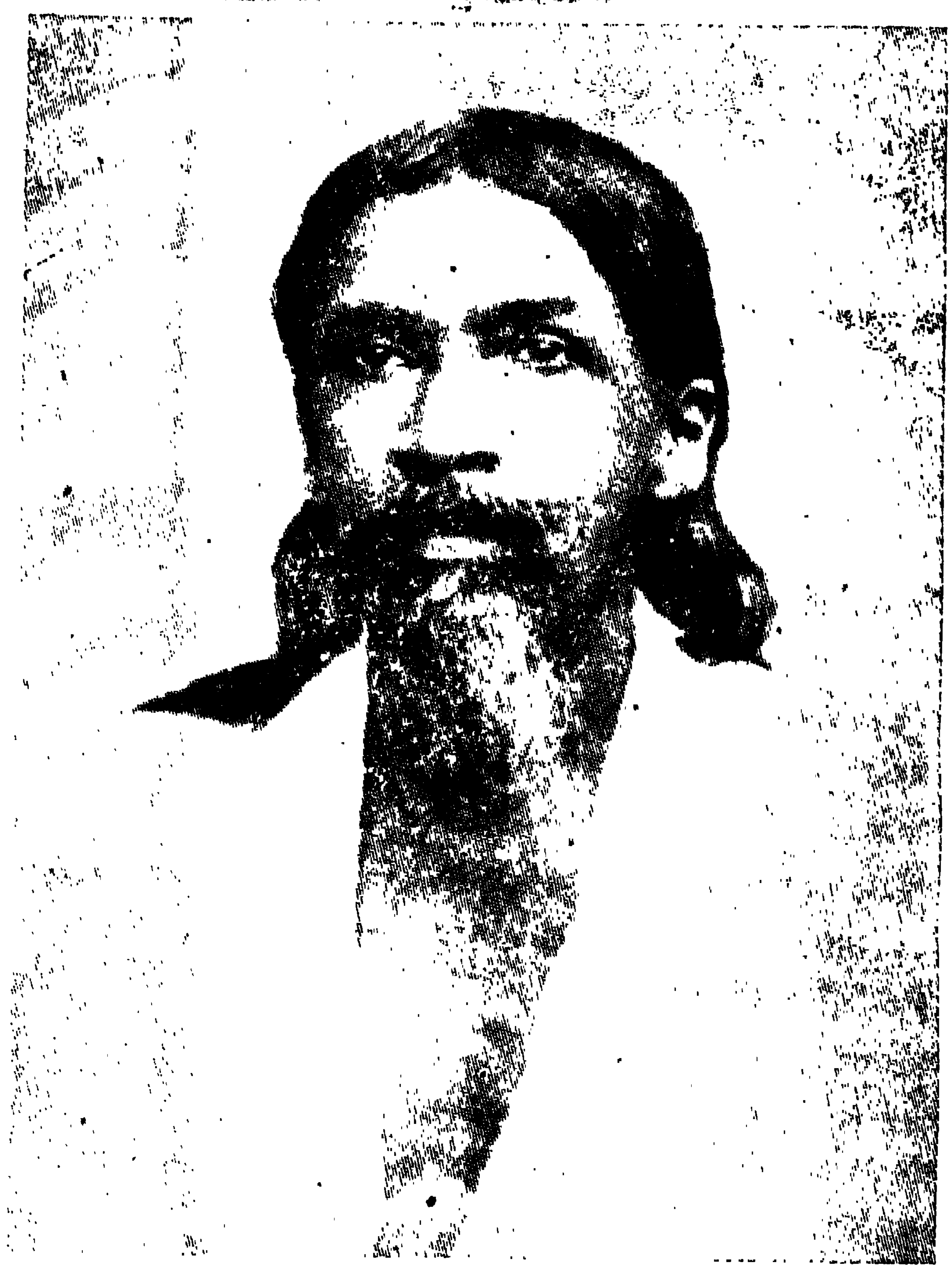

শ্রীঅরবিন্দ

চন্দননগরে যাওয়ার পথে শ্রীঅরবিন্দ বোসপাড়ায় যাননি, নিবেদিতার সঙ্গে দেখা করেননি।...আসলে নিবেদিতা শ্রীঅরবিন্দের এই চন্দননগরে যাত্রার বিষয়ে কিছুই জানতেন না। এক আধদিন পরে শ্রীঅরবিন্দ তাঁকে খবর পাঠান 'কর্ম্মযোগিন' সম্পাদনার ভার গ্রহণ করতে, তখনই তিনি ব্যাপারটি জানতে পেরেছিলেন। কারণ সমস্ত ব্যাপারটি ঘটে একান্ত আকস্মিক ভাবে। ঠিক কি হয়েছিল—শ্রীঅরবিন্দ নিজেই বলেছেন,—তাঁর কথা এই: একদিন কর্ম্মযোগিন অফিসে তিনি শুনলেন যে অফিস শীঘ্র খানাতল্লাসী হবে, তাঁকেও গ্রেপ্তার করা হতে পারে; তখনই তিনি হঠাৎ "আদেশ" পেলেন চন্দননগরে চলে যেতে, এবং সেই মুহূর্ত্তেই তিনি কাজও করলেন সেই অনুসারে। সঙ্গী সাথী সহকর্ম্মী কাকেও কিছু বললেন না, একান্ত গোপনে সকলের অজ্ঞাতে (তখন উপস্থিত আমরা যে কয়েকজন ছিলাম তাদের অবশ্য ছাড়া) মিনিট পনেরর মধ্যে ব্যাপারটি ঠিকঠাক হয়ে গেল। শ্রীঅরবিন্দ ঘাট পর্য্যন্ত রামবাবুর (মজুমদার) অনুসরণ করলেন, সুরেশচন্দ্র আর বীরেন ঘোষ (বীরেন নয়) চলল আর একটু পিছনে। একখানা নৌকা ডাকা হল, তিনটি প্রাণী তাতে উঠে রওনা হয়ে গেল।...চন্দননগরে অবস্থানও গোপন ছিল, অল্প কয়েকজন মাত্র জানত—চন্দননগর

ছেড়ে পণ্ডিচেরী যাত্রাও ঐ রকম গোপন ও অল্প কয়েকজনের মাত্র জ্ঞানগোচর ছিল।...শ্রীযুক্ত মতিলাল রায় প্রথমে তাঁর বাড়ীতে শ্রীঅরবিন্দকে নিয়ে রাখেন—তিনিও কথাটি কয়েকজন অন্তরঙ্গ ছাড়া আর কাউকে জানতে দেননি। শ্রীঅরবিন্দের নিজের কথানুসারে এই হল সত্য ঘটনা।”

(২) দেশের অধিকাংশ লোকই শ্রীঅরবিন্দের এই অজ্ঞাতবাসের খবর প্রমাণসহ জানতে পারেন ১৯১৪ সালে তাঁর বিখ্যাত “আর্য” পত্রিকা প্রকাশিত হলে। কিন্তু তাই বলে, “ইংরেজের গোয়েন্দা পুলিশ এই চারি বৎসর অক্লান্ত চেষ্টা করিয়াও শ্রীঅরবিন্দের কোন সন্ধান পাইল না”,—এ অনুমানের কোনই কারণ নেই। বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষ অতি অল্পদিনের মধ্যেই এ খবরটি জানতে পারে এবং তখন থেকেই তাঁকে ধরবার জন্যে নানা রকম চেষ্টা করে। প্রকাশ্যভাবে তাদের সে চেষ্টার প্রথম নিদর্শন পাই তাদের এক মোক্ষম চালে। কর্ম্মযোগিন-এ প্রকাশিত তাঁর শেষ এবং বিখ্যাত প্রবন্ধটিকে (“দেশবাসীদের প্রতি আমার খোলাচিঠি”) রাজদ্রোহমূলক বলে, এবং তিনি পলাতক এই ঘোষণা করে তাঁর বিরুদ্ধে এক গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারি করে। দেশের লোকের মনে মিথ্যা ধারণা যাতে স্থান না পায়, সে জন্যে শ্রীঅরবিন্দ পণ্ডিচেরী থেকে তখন এক বিবৃতি দেন। সেটি মাদ্রাজের এক সংবাদপত্রে (মাদ্রাজ-টাইম্‌স্‌এ) প্রকাশিত হয়। তাঁর আইনসঙ্গত যুক্তিপূর্ণ সে বিবৃতিটির ফলে বৃটিশ কূটনীতিকরা চালমাৎ হয়ে যায়। তাঁর যুক্তি ছিল যে, তিনি বাংলা দেশ ত্যাগ করার পরে বৃটিশরাজ তাঁর বিরুদ্ধে মতলব ক'রে এক অভিযোগ এনেছেন। কারণ তাঁর লেখাটি মোটেই রাজদ্রোহমূলক নয়। সুতরাং তিনি আইনত যেতে বাধ্য নন। তা ছাড়া তিনি রাজনীতি পরিত্যাগ করে যোগসাধনায় মনোনিবেশ করেছেন। তাই আত্মপক্ষ সমর্থন করবার জন্যে পণ্ডিচেরী থেকে যাবার তিনি কোন প্রয়োজন দেখেন না। যথার্থত তাঁর লেখাটি পরে কলকাতা হাইকোর্টের দুজন বিখ্যাত বিচারপতির দ্বারা (উড্রোফ্ এবং ফ্লেচার) নির্দ্দোষ বলে বিবেচিত হয় এবং তাঁদের রায়ের ফলে কর্ম্মযোগিন্-মুদ্রাকরও ছোট আদালতের বিচার অনুযায়ী ছ'মাস কারাদণ্ড ভোগের হাত থেকে অব্যাহতি পান। এইত গেল প্রথম প্রমাণ। দ্বিতীয় আর একটি প্রমাণ থেকে পাঠক আরও প্রত্যক্ষ বুঝতে পারবেন, কত শীঘ্রই বৃটিশ-গোয়েন্দারা পণ্ডিচেরীতে এসে তাঁর চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি রাখতে আরম্ভ করেছিল।

প্রথম তিন মাস একেবারে অসূর্য্যম্পশ্য অবস্থায় থাকার পর শ্রীঅরবিন্দ তাঁর অনুচর দুটিকে (বিজয় ও সুরেশ) বাইরে বেরুতে অনুমতি দিলেন। তখন এঁরা দু'জনে বিকেল পাঁচটা নাগাদ বেরিয়ে সমুদ্রের ধারে গিয়ে পিয়ারে ঘণ্টাখানেক করে কাটিয়ে আসতে আরম্ভ করলেন। দিন কয়েক যেতে না যেতেই তাঁরা দেখলেন, দুজন বাঙালী পিয়ারে ওই একই সময় এসে তাঁদের কাছাকাছিই পায়চারি শুরু করে। এঁরা ভ্রূক্ষেপও করেন না। কয়েকদিন এইভাবে কাটার পর তাদের একজন এগিয়ে এসে এঁদের সঙ্গে আলাপ করল। বলল, তার নাম অনুকূল সরকার। মাদ্রাজে বাহাদুর কোম্পানীর হারমোনিয়ামের এজেণ্ট। আলাপ জমতে লাগল লোকটির উৎসাহে। সাহিত্য বিষয় নিয়ে সে আলাপ করত, রাজনীতি বা সঙ্গীত নিয়ে নয়। এমন কি আলেকজাণ্ডার ডুমার বিখ্যাত উপন্যাস কাউণ্ট অফ মণ্টেক্রষ্টো বইখানি সে এঁদের পড়তে দেয়। একদিন মেঘ করে বৃষ্টি হব-হব হতে, লোকটি এঁদের বহু অনুরোধ করল, তার কাছাকাছি বাড়ী পর্য্যন্ত গিয়ে একটি ছাতা নিয়ে যেতে। তাঁরা সে অনুরোধ না রাখাতে বেচারা খুব খুন্ন হল। বিখ্যাত তামিল কবি ৺সুব্রহ্মণীয়া ভারতী তখন যুবক; তিনি ও শ্রীনিবাস আচারি প্রভৃতি বৃটিশ-ভারতের দাগী দেশভক্তেরা পণ্ডিচেরীতে পালিয়ে এসে বাস করছিলেন। তাঁরাই শ্রীঅরবিন্দের দেখাশুনা পরিচর্য্যা করতেন। ভারতী শুনেই ব্যাপারটা বুঝতে পেরে কায়দা করে উক্ত দুই বঙ্গসন্তানকে সরে পড়তে বাধ্য করেন। অনেকদিন পরে সুরেশবাবুরা জানতে পারেন যে, সেই বাহাদুর কোম্পানীর বাদ্যযন্ত্র বিক্রেতা আসলে বৃটিশ সরকার বাহাদুরেরই পালিত শাবক। তাঁর আসল নাম সতীশচন্দ্র মজুমদার (অনুকূল সরকার নয়) এবং তিনি খুলনায় পুলিসের ডেপুটি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট। আর খুলনা হচ্ছে বিজয় নাগের

আদি বাসভূমি। এ গল্পটি সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর ঝুলি থেকে সংগ্রহ করা।

(৩) ১৯১৪ সালের ২৯শে মার্চ্চ, পলরিশার এবং শ্রীমা পণ্ডিচেরীতে আসেন এবং অরবিন্দকে দর্শন করেন। তারিখ হিসেবে সেটা প্রথম মহাযুদ্ধের চার মাস আগের কথা ("অব্যবহিত কাল পরে" নয়)। শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে এই হ'ল শ্রীমায়ের প্রথম চাক্ষুষ দর্শন ও পরিচয়। চাক্ষুষ বলার কারণ এই যে, অতীন্দ্রিয় জগতের সূক্ষ্ম-অনুভূতিতে তিনি শ্রীঅরবিন্দকে বহু আগেই দেখেছিলেন এবং চিনতেন। আর ম'সিয় পলরিশারের এই হ'ল শ্রীঅরবিন্দকে দ্বিতীয় দর্শন। কারণ ১৯১০ সালের এপ্রিল মাসেই, অর্থাৎ শ্রীঅরবিন্দের পণ্ডিচেরী পৌঁছনর কয়েক দিন পরেই রিশার অভাবনীয় ভাবে শ্রীঅরবিন্দকে দেখবার ও তাঁর সঙ্গে আলাপ করবার সুযোগ পেয়েছিলেন।

(৪) তারপর ১৯১৯ সালে, জাপানে প্রবাসকালে ম'সিয় রিশার টোকিওর ওয়াসেদা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গনে ("যুদ্ধের পর ইউরোপে ফিরিয়া" নয়) ৩রা যে তারিখে শ্রীঅরবিন্দ সম্বন্ধে যে বক্তৃতা করেন তাতে তিনি বলেন যে, "পৃথিবীর সর্ব্বত্র আমি সাধু-সন্ন্যাসীর অন্বেষণে ঘুরিয়াছি, কিন্তু পণ্ডিচেরীতে গিয়া আমি প্রকৃত সাধু দর্শন করিলাম। এই সাধুর নাম শ্রীঅরবিন্দ।..." এখানে এইটুকুও বলে রাখা ভাল যে, পলরিশার কোন দিনই "শ্রীঅরবিন্দের শিষ্যত্ব গ্রহণ" করেন নি। রিশারের ছিল তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, পাণ্ডিত্য ও মনীষা এবং অতীন্দ্রিয় অনুভূতির কল্পনা-সামর্থ্য। এবং এই সবের সাহায্যেই তিনি শ্রীঅরবিন্দের অলৌকিক শক্তিকে উপলব্ধি করতে এবং শ্রদ্ধা করতে পেরেছিলেন। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দের অধ্যাত্ম-তত্ত্ব, তাঁর পূর্ণযোগের পদ্ধতি, তিনি ধরতে পারেন নি এবং গ্রহণও করেন নি। শ্রদ্ধাকে অতিক্রম ক'রে যখন সমর্পণের অবস্থা এল, তখনই রিশার শ্রীঅরবিন্দকে ছেড়ে চলে গেলেন। সেটা ১৯২১ সালের কথা।

(৫) শ্রীমা যে-বছর প্রথম পণ্ডিচেরীতে আসেন, অর্থাৎ ১৯১৪ সালের মার্চ্চ, সেই আগষ্টেই য়ুরোপে প্রথম মহাযুদ্ধ বেঁধে গেল। ফরাসী গভর্ণমেণ্টের সামরিক আইন অনুসারে তাই সে-বার তাঁরা বেশী দিন থাকতে পারলেন না। ১৯১৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ফ্রান্সে ফিরে যেতে বাধ্য হলেন। সেখান থেকে শীঘ্রই তাঁরা জাপানে যান, এবং যুদ্ধের পর জাপান ফেরতা আবার পণ্ডিচেরীতে আসেন। সেটা ১৯২০ সালের ২৪শে এপ্রিল, ১৯২১ সালে নয়। এবং এই হল শ্রীমায়ের দ্বিতীয় ও শেষবার পণ্ডিচেরী আসা। উত্তরকালে শ্রীঅরবিন্দ ওই দিনেও দর্শন দিতেন।

(৬) ফ্রান্সে থাকাকালীন তিনি শ্রীঅরবিন্দের আলোকচিত্র দর্শন করে বলেছিলে যে এই মূর্ত্তি দশ বৎসর বয়সে তিনি স্বপ্নে দেখেছিলেন। এ সংবাদটি মোটেই সত্য নয়। শ্রীমায়ের একটি উক্তি থেকে আমরা জানতে পারি যে, তাঁর এগার থেকে তের বছর বয়সের মধ্যে ক্রমান্বয়ে বহু সূক্ষ্ম এবং আধ্যাত্মিক উপলব্ধি হয়। তার ফলে তিনি যে জ্ঞান লাভ করেন তাতে ভগবান যে কেবল আছেন তাই নয়, মানুষের পক্ষে যে তাঁর সাক্ষাৎকার লাভ সম্ভব, কর্ম্মে এবং চেতনায় যে তাঁকে সর্ব্বাঙ্গীন ভাবে অভিব্যক্ত করা যায় এবং এই পৃথিবীতে এক দিব্য-জীবনের পরিবেশে যে তাঁকে মূর্ত্ত করে তুলতে পারা যায়, সে বিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহ হন। রাত্রে নিদ্রিত অবস্থায় তাঁর দেহ যখন ঘুমন্ত সেই সময় সূক্ষ্ম চেতনায় কয়েকজন আধ্যাত্মিক শিক্ষাগুরু এই উপলব্ধিটি এবং একে বাস্তবে রূপ দেবার কৌশল তাঁকে শিখিয়ে দিতেন। বহির্জ্জগতে পরে তাঁদের কারুর কারুর সঙ্গে শ্রীমায়ের দেখা হয়েছে। তারপর যত তাঁর অন্তরের এবং বাইরের জীবনের বিকাশ হতে থাকে, এই সব সূক্ষ্ম সত্তাদের একজনের সঙ্গে তাঁর আধ্যাত্মিক এবং বাহ্যিক সম্পর্কও ততই সুস্পষ্ট এবং নিগূঢ় হতে থাকে। সে সময়ে তিনি ভারতীয় ধর্ম্ম ও দর্শন সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানতেন না, কিন্তু তবু এই সূক্ষ্ম সত্তাকে তিনি শ্রীকৃষ্ণ বলে জানবার ইঙ্গিত অন্তর থেকেই পান। আর তখন থেকেই তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস হয় যে, এই পৃথিবীতে একদিন সেই মহাপুরুষের সঙ্গে তাঁর দেখা হবেই এবং তাঁরই সঙ্গে সেই দিব্যকর্ম্ম তাঁকে করতে হবে, যে সম্বন্ধে অতি শিশুকাল থেকেই তিনি টের পেয়েছিলেন। এবং বয়েস

বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে যত তাঁর মনের ও বুদ্ধির বিকাশ হতে থাকে, তত এই কর্ত্তব্য সম্পাদনের চেতনাটিও নিখুঁত এবং পূর্ণাঙ্গভাবে ফুটে উঠতে থাকে। তারপর ১৯১৪ সালে পণ্ডিচেরীতে এসে শ্রীঅরবিন্দকে দেখবামাত্রই তিনি চিনতে পারলেন যে, ইনিই হচ্ছেন তাঁর সূক্ষ্ম জগতের সেই অতি পরিচিত সত্তা, যাঁকে তিনি শ্রীকৃষ্ণ বলে জানেন। এবং তখনই শ্রীমা তাঁর স্থান ও কাজ যে ভারতবর্ষে এবং এঁরই পাশে, সে বিষয়ে একেবারেই নিঃসন্দেহ হন। তাই আমরা দেখি যে, প্রথম শ্রীঅরবিন্দ দর্শনের ঠিক পরের দিনই তিনি তাঁর আধ্যাত্মিক উপলব্ধির ডায়রীতে লিখে রেখেছিলেন (মূল লেখাটি অবশ্য ফরাসীতে), "...গতকাল যাঁর দর্শন পেলাম, তিনি পৃথিবীতে এসেছেন। মর্ত্তের বুকে তাঁর আবির্ভাব একথা প্রমাণ করার পক্ষে যথেষ্ট যে, একদিন আসবেই যখন পৃথিবীর ঘন অন্ধকার ভাস্বর জ্যোতিতে রূপান্তরিত হবে এবং হে প্রভু, এই পৃথিবীতে তোমার দেবরাজ্য পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হবে।" লেখাটির তারিখ হল, ৩০শে মার্চ্চ ১৯১৪। "শ্রীমায়ের প্রার্থনা ও ধ্যান" নামে প্রকাশিত ফরাসী ও ইংরেজী পুস্তকে লিপিবদ্ধ আছে।

(৭) দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস স্বয়ং পণ্ডিচেরীতে এসে শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে দেখা করেন, মাত্র একবারই—দুই বা তিন বার নয়। সেটা হল ১৯২৩ সালের ৫ ই জুন। তাঁর সঙ্গে এসেছিলেন আসামের তৎকালের প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার ফুকান্। পরে হয়ত আরও জানতে পারা যাবে অন্যান্য বড় বড় লোকেরা কে কবে এসেছিলেন! যে কটি নাম এখনই হাতের কাছে, পেলাম সে কটি এই :

১৯২০ সালে আসেন সরলা দেবী চৌধুরাণী। ওই ১৯২০-তেই আসেন ডাঃ মুঞ্জে। ১৯২৩ সালে আসেন দেশবন্ধু ও ফুকান্। ১৯২৫ সালে আসেন পাঞ্জাব-কেশরী লালা লাজপত রায় এবং শ্রীযুক্ত ট্যানডন। ১৯২৮ সালে প্রথমে আসেন ফরাসী মনীষী সিলভাঁ লেভি, তারপর জুন মাসে আসেন রবীন্দ্রনাথ।

১৯২৬ সালের নবেম্বর মাসে শ্রীঅরবিন্দ তাঁর নিভৃত কক্ষে আবার প্রবেশ করেন এবং বছরে তিনদিন মাত্র দর্শন দেন ১৯৩৮ সাল পর্য্যন্ত। তারপর থেকে আরও একটি দিন বেশী (২৪ শে এপ্রিল) অর্থাৎ চারদিন দর্শন দিতেন। এই নিয়মের প্রথম ব্যতিক্রম হয় ১৯২৮ সালে দুবার। তিনি অধ্যাপক সিলভাঁ্যা লেভী এবং রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করেন। শেষের কয়েক বছর অর্থাৎ ১৯৪৬ থেকে ১৯৫০ পর্যন্ত, প্রধান কয়েকজন রাজনীতিক নেতা এবং বিশিষ্ট পদস্থ ব্যক্তি তাঁর সঙ্গে দেখা করবার অনুমতি পেয়েছিলেন।

(৮) ১৯৪০ সালের ১৫ ই আগষ্ট শ্রীঅরবিন্দ তাঁর শিষ্যদের উদ্দেশ্যে আশ্রমে কোন বাণী দেন নি। এবং "The fifteenth august is a day of awaking, of the birth of the spirit into the truth of manifestation..." ইত্যাদি প্রায় ৩০।৩৫ লাইন রচনাটী শ্রীঅরবিন্দের নয়। ওটি শ্রীঅরবিন্দের এক শিষ্য অনেকদিন আগে লিখে কোন এক পত্রিকাতে দেন। ভাব ও ভাষা দুই-ই আধ্যাত্মিক প্রেরণালব্ধ সন্দেহ নেই, তবে ভুলক্রমে ওটি শ্রীঅরবিন্দের লেখা বলেই আরও দু'একবার অন্যান্য কাগজে পুনর্মুদ্রিত হয়েছে।

(৯) ১৯৪২ সালের মার্চ্চ মাসে স্যার ষ্টাফোর্ড ক্রীপস্, বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের পক্ষ থেকে ভারতবর্ষকে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা দেবার জন্যে যে প্রস্তাবটি রেডিও যোগে ঘোষণা করেন, শ্রীঅরবিন্দ সেটি শুনে দেশবাসীদের তা গ্রহণ করতে বলেন। কিন্তু তাঁর সমর্থনের কারণ-স্বরূপ একথা কখনও বলেন নি যে, জাপান ও জার্ম্মাণি শীঘ্রই পরাজিত হবে, তাই প্রস্তাবটি গ্রহণ করা উচিত। এ ধরণের ভুল উপেক্ষনীয় হওয়া উচিত নয়। শ্রীঅরবিন্দ ক্রিপস্‌কে যে টেলিগ্রাম করেছিলেন, তা সে সময় কাগজে বেরিয়েছিল। তাতে ছিল—

"...I welcome it (the proposal) as an opportunity given to India to determine for herself, and organise in all liberty of choice, her freedom and unity, and take an effective place among the world's free nations. I hope that it will be accepted, and right use made of it, putting aside all discords and divisions. I hope too that friendly relation between Britain and India replacing the past struggle will be a step towards a greater world union in which,

as a free nation, her spiritual force will contribute to build for mankind a better and happier life. In this light, I offer public adhesion in case it can be of any help in your (i.e. Sir Stafford's) work.

31-3-1942 Sri Aurobindo."

অর্থাৎ, "প্রস্তাবটিকে আমি অভিনন্দিত করছি। কারণ আমার মতে এ-হল ভারতবর্ষকে একটা সুযোগ দেওয়া, যাতে সে স্বেচ্ছায়, সম্পূর্ণ নিজের পছন্দ মত স্বাধীনতা এবং একতা গড়ে তুলতে পারে এবং জগতের মত স্বাধীন জাতিদের মধ্যে নিজের উপযুক্ত স্থান করে নিতে পারে। আশা করি সকল অনৈক্য, সব ভেদ-স্পৃহাকে একপাশে সরিয়ে রেখে দেশ এ প্রস্তাব গ্রহণ করবে এবং এর উপযুক্ত সদ্ব্যবহার করবে। আমি আরও আশা করি যে, অতীত সংঘর্ষের পরিবর্তে এখন ভারত ও বৃটেনের মধ্যে মৈত্রীভাব গড়ে উঠবে। তাতে বৃহত্তর এক বিশ্বসঙ্ঘ গড়ে তুলবার পথ পরিষ্কার হবে, এবং সেই সঙ্ঘের মাঝে থেকে, সমগ্র মনুষ্যজাতির জন্যে বর্তমানের তুলনায় শ্রেষ্ঠতর এবং আনন্দময় জীবন গড়ে তোলার কাজে স্বাধীন জাতি হিসেবে ভারতবর্ষ তার আধ্যাত্মিক শক্তি প্রয়োগ করতে পারবে। সেই উদ্দেশ্যে আমার এই সমর্থন সকলকে জানাবেন, যদি তার দ্বারা আপনার কাজের কোন সহায়তা হয়।

৩১শে মার্চ, ১৯৪২, শ্রীঅরবিন্দ।"

(১০) ১৯৪৬ সালের ১৬ই মে, মন্ত্রী-মিশনের পরিকল্পনার কথা ঘোষিত হলে শ্রীঅরবিন্দ আর একবার দেশবাসীকে তা গ্রহণ করতে বলেন বলে যে সংবাদটি তাঁর কোন জীবনীপুস্তকে সন্নিবিষ্ট হয়েছে, তা অভ্রান্ত সত্য নয়। তারিখ এবং সংবাদ দুটিই ভুল। কেবল ক্রিপ্‌সের প্রস্তাবের বেলাতেই তিনি উপযাচক হয়ে প্রকাশ্যে তাঁর সমর্থন জানিয়েছিলেন। কিন্তু দেশ অর্থাৎ দেশের নেতারা যখন শ্রীঅরবিন্দের কথা বুঝলেন না এবং গ্রহণ করলেন না, তখন শ্রীঅরবিন্দ আবার নিজেকে সরিয়ে নিলেন, এবং ভিতর থেকে আগের মতই নীরবে জগতের ঘটনা প্রবাহের ওপর তাঁর তপঃশক্তি প্রয়োগ করতে লাগলেন। অমৃতবাজার পত্রিকার তরফ থেকে শ্রীঅরবিন্দকে অনুরোধ করাতে তাঁর অনুমতি অনুসারে আশ্রম-সেক্রেটারী যে উত্তর দেন, সেটি ২৬শে মার্চ (মে, মাসে নয়) ১৯৪৬—উক্ত পত্রিকাতে ছাপা হয়েছিল। সে উত্তরটি এই :

"Sri Aurobindo thinks it unnecessary to volunteer a personal pronouncement, though he would give his views if officially approached for them. His position is known. He has always stood for India's complete independence which he was the first to advocate publicly and without compromise and as the only ideal worthy of a self-respecting nation. In 1910 he authorised the publication of his prediction that after a long period of wars world wide upheavals and revolution beginning after four years, India would achieve her freedom. Lately he has said that freedom was coming soon and nothing could prevent it. He has always foreseen that Britain would approach India for an amicable agreement conceding her freedom. What he had foreseen is now coming to pass and the British Cabinet Mission is the sign. It remains for the nation's leaders to make a right and full use of the opportunity. In any case, whatever is the immediate outcame, the Power that has been working out this event, will not be denied the final result. India's liberation is sure."

অর্থাৎ, "দেশের নেতারা নিজে থেকে শ্রীঅরবিন্দের কাছে তাঁর মত জানতে চাইলে তিনি তা বলবেন, নইলে তিনি নিজে আবার কিছু বলার প্রয়োজন দেখেন না। তাঁর মত কী, তা সকলেই এখন জানেন। তিনি চিরকালই ভারতবর্ষের পূর্ণস্বাধীনতা চেয়েছেন। প্রকাশ্য ভাবে তিনিই সর্বপ্রথম পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি পেশ করেন, এবং তার মাঝে কোন রফার তিনি পক্ষপাতী ছিলেন না। কারণ তাঁর মতে, আত্মমর্যাদা সম্পন্ন একটা জাতির পক্ষে এ ছাড়া আর কোন রাজনৈতিক আদর্শ হতেই পারে না। ১৯১০ সালে তাঁর যে ভবিষ্যৎবাণী তাঁর সম্মতিক্রমে প্রকাশিত হয়েছিল, তাতে তিনি বলেছিলেন যে, বহুদিন ধরে যুদ্ধের পর জগৎব্যাপী এক তুমুল অশান্তি

এবং বিদ্রোহের সৃষ্টি হবে। যুদ্ধের ঠিক চার বছর বাদেই সেটা শুরু হবে এবং তার পর ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করবে। কিছু কাল আগেই তিনি আবার বলেছিলেন যে, ভারতের স্বাধীনতা প্রায় আসন্ন এবং কোন শক্তিই তা রদ করতে পারবে না। তিনি বহুকাল আগে থেকেই জানতেন যে, বৃটেন নিজে উপযাচক হয়ে এসে ভারতবর্ষের সঙ্গে মিটমাটের চেষ্টা করবে এবং তার স্বাধীনতার দাবি মেনে নেবে। তাঁর সেই দেখার ফল এখন ফলতে শুরু করেছে। বৃটিশ-ক্যাবিনেট-মিশন হল তারই নির্দ্দেশক। এখন এই সুযোগের যথাযথ এবং ষোল আনা সংব্যবহার করার ভার দেশের নেতাদের হাতে। সে যাই হোক, বর্ত্তমানে এর ফল যাই হোক না কেন, যে ভগবৎশক্তি এটা ঘটাচ্ছেন, শেষ রক্ষা তিনি করবেনই। ভারতের স্বাধীনতা অব্যর্থ।"

(১১) ৩রা জুন (১৯৪৬) মাউণ্টব্যাটেন-এর প্রস্তাব শুনে "অখণ্ড ভারতের স্বাধীনতার উপাসক শ্রীঅরবিন্দ এই ঘোষণা শ্রবণ করিয়া বলিয়া উঠিলেন—Not a solution but an ordeal." এ সংবাদটিও সত্য নয়। আর যেটা কানে লাগে তা হচ্ছে, "শ্রবণ করিয়া বলিয়া উঠিলেন।" শ্রীঅরবিন্দের স্বভাবেই এ ধরণের নাটকীয় ব্যাপার ছিল না। বিশেষ আপত্তিকর কিছু ঘটলেও তিনি, না জিজ্ঞাসা করলে কিছু বলতেন না, এবং কখন ভাবাবেগ প্রকাশ করতেন না। ওই বাক্যটি শ্রীমায়ের একটি বাণী থেকে সংকলন করা। ওভাবে একটি বাক্য সমগ্র বাণীটি থেকে চয়ন করে উল্লেখ করলে বিষয়টির গুরুত্ব কমে যায় বলেই আমাদের ধারণা, বিশেষ করে এ ক্ষেত্রে। স্থানাভাবে বা অন্য কারণে যদি সমগ্র বাণীটি উল্লেখ করা জীবনী লেখকের পক্ষে সম্ভব না হয়, এবং অংশ বিশেষের সংকলনে যদি সত্যের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়, তাহলে বিষয়টি একেবারে বাদ দিয়ে যাওয়াই হয়ত ভাল। শ্রীমায়ের বাণীটি, যা তৎকালে কাগজে প্রকাশিত হয়েছিল, তা এই:

"(This is the word that came to the Mother when she heard on the Radio the declaration of June 2, 1947, issued by the Viceroy to the leaders of Indian parties; it has been approved by Sri Aurobindo:)

"A proposal has been made for the solution of our difficulties in organising Indian independence and it is being accepted with whatever bitterness of regret and searchings of the heart by Indian leaders.

But do you know why this proposal has been made to us? It is to prove to us the absurdity of our quarrels.

And do you know why we have to accept these proposals? It is to prove to ourselves the absurdity of our quarrels.

Clearly this is aot a solution; it is a test, an ordeal which, if we live it out in all sincerity, will prove to us that it is not by cutting a country into small bits that we shall bring about its unity and its greatness; it is not by opposing interests against each other that we can win for it prosperity; it is not by setting one dogma against another that we can serve the spirit of Truth. Inspite of all, India has a single soul, and while we have to wait till we can speak of an India one and indivisible our cry must be:

Let the soul of India live for ever!

3-6-1947. The Mother"

অর্থাৎ, (২রা জুন ১৯৪৭, ভারতের বিভিন্ন রাজনীতিক দলের নেতাদের কাছে বড়লাট রেডিও যোগে যে ঘোষণা করেন, তা শুনে শ্রীমা অন্তর থেকে এই বাণীটি পান। শ্রীঅরবিন্দ এটি সমর্থন করেছেন)

"ভারতবর্ষের স্বাধীনতা গড়ে তুলবার পথে আমাদের বাধাগুলির সমাধানের জন্যে এক প্রস্তাব করা হয়েছে, এবং দেশের নেতারা তা মেনে নিচ্ছেন, তিক্ত-বিরক্ত অন্তরে এবং গাত্রদাহের সঙ্গে।

কিন্তু কেন এ প্রস্তাব আমাদের কাছে করা হল, তা জান কি? আমাদের ঝগড়াঝাঁটিগুলো যে কতখানি মূঢ়তার পরিচায়ক সেটা আমাদের কাছে প্রমাণ করাই হল এর উদ্দেশ্য।

আর কেন এ প্রস্তাব আমাদের মেনে নিতে হবে তা বুঝেছ কি? আমাদের কলহ বিবাদ যে কতখানি বোকামী, সেটা আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখান হল এর উদ্দেশ্য।

একে যে সমাধান বলে না তা অতি প্রত্যক্ষ। এ হল আমাদের পরীক্ষা, কঠোর অগ্নি-পরীক্ষা। যদি যথার্থই আমাদের বাস্তব জীবনকে এই নির্দ্দেশমত পরিচালিত করি, তাহলে তার দ্বারা এইটাই প্রমাণিত হবে যে, একটা দেশকে ছোট ছোট করে কেটে ভাগ করে তার ঐক্য, তার মহত্ব গড়ে তোলা যায় না। এক মতবাদের বিরুদ্ধে আর এক মতবাদ খাড়া করে আমরা যথার্থ সত্যের উপাসক হতে পারি না। তবু এ সব সত্ত্বেও ভারতের আত্মা এক এবং অখণ্ড। তাই যতদিন পর্য্যন্ত না আবার আমরা ব'লতে পারি যে, ভারত এক এবং অবিভাজ্য, ততদিন আমাদের মুক্তকণ্ঠে এই প্রার্থনা করতে হবে :

ভারতের আত্মা চিরজীবী হোক!

৩-৬-১৯৪৭ শ্রীমা।"

(১২) ১৯৪৮ সালে দেশের দারুণ দুরবস্থায় উৎপীড়িত হয়ে বাংলার বিশিষ্ট কয়েকজন ব্যক্তি দিলীপকুমার রায়ের মারফৎ শ্রীঅরবিন্দকে জানান। শ্রীঅরবিন্দ তদুত্তরে ১৮ই জুলাই যে বাণীটি দেন, সেটি ১৯৪৮ সালের ১৫ই আগষ্টের উৎসব উপলক্ষে শ্রীমা আশ্রমের সকলকেও বিতরণ করেন। বাণীটি এই :

"I am afraid I can hold out but cold comfort for the present at best to those of your correspondents who are lamenting the present state of things. Things are bad, are growing worse and may at any time grow worst or worse than worst if that is possible—and anything however paradoxical seems possible in the present perturbed world. The best thing for them is to realise that all this was necessary because certain possibilities had to emerge and be got rid of if a new and better world was at all to came into being: it would not have done to postpone them for a later time. It is as in yoga where things active or latent in the being have to be put into action in the light so that they may be grappled with and thrown out or to emerge from latency in the depths for the same purificatory purpose. Also they can remember the adage that night is darkest before dawn and that the coming of dawn is inevitable. But they must remember too that the new world whose coming we envisage is not to be made of the same texture as the old and different only in pattern and that it must come by other means, from within and not from without—so the best way is not to be too much preoccupied with the lamentable things that are happening outside, but themselves to grow within so that they may be ready for the new world whatever form it may take.

July 18, 1948. Sri Aurobindo."

অর্থাৎ, "দুঃখের বিষয় তোমার যে সব বন্ধু বর্ত্তমান অবস্থার জন্যে হা-হুতাশ করে তোমাকে লিখেছে তাদের সান্ত্বনা দেবার মত বিশেষ কিছুত দেখছি না, অন্তত এখনকার মত ত নয়। অবস্থা খুবই খারাপ, ক্রমশই তা আরও খারাপের দিকে যাচ্ছে, এবং যে কোন সময় তা সবচেয়ে বেশী খারাপে গিয়ে দাঁড়াতে পারে, বা তারও বাড়া যদি কিছু হওয়া সম্ভব হয় ত হতে পারে। জগতের বর্ত্তমান বিক্ষুব্ধ অবস্থায় একেবারে অসম্ভব কিছু ঘটাও বিচিত্র নয়। এ সবই ঘটার দরকার ছিল তাই ঘটছে, এটা যদি তারা বুঝতে চেষ্টা করে তাহলেই সব চেয়ে ভাল হয়। কারণ যদি এক নতুন এবং শ্রেয়স্কর জগত সত্যিই গড়ে তুলতে হয়, তাহলে কতকগুলো সম্ভাব্য আবর্জ্জনার প্রথমে ফুটে বেরুনো দরকার, তারপর সেগুলোকে বর্জ্জন করা চাই। ভবিষ্যতের জন্যে এসবকে ঠেলে সরিয়ে রাখলে আর চলত না। এ হল যেমনটা যোগের অবস্থায় হয়ে থাকে, মানুষের মধ্যে যে সব বস্তু খুব প্রবল বা সুপ্ত ছিল, সে সবকে আর ঢেকে না রেখে উন্মুক্ত করে ফেলা চাই, যাতে সেগুলোর ঘাড় ধরে সম্পূর্ণ বর্জ্জন করা যায়, অথবা সত্তার গভীরতম প্রদেশের সুপ্ত অবস্থা থেকে টেনে বের করে সেগুলোকে বিশুদ্ধ করে তোলা চাই। আর তাদের সেই প্রবচনটিও স্মরণ করিয়ে দিতে পার যে, ভোরের আগেই রাতের অবস্থা

হয় প্রগাঢ় অন্ধকার, আর তার মানেই উষার উদয় অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু এ কথাও যেন তারা ভুলে না যায় যে, যে নতুন জগতের আবির্ভাব আমরা চাইছি, তা কেবল পুরোনোর ধরণটা বদলে ভিতরকার জিনিস যেমন ছিল তেমনি রেখে হবে না। সে নতুন জগতের বিকাশ হবে অন্যভাবে, অন্য উপায়ে। মানুষের অন্তর্জ্জগতের পরিবর্ত্তনের দ্বারা, বাইরের পরিবর্ত্তনের দ্বারা নয়। তাই বাইরের শোচনীয় অবস্থার বিষয় ভেবে ভেবে সময় নষ্ট না করে, যদি তারা নিজেদের অন্তরের চেতনার বিকাশের চেষ্টা করে তাহলেই সবচেয়ে ভাল কাজ করা হয়। কারণ তাহলে আমাদের ঈপ্সিত নতুন জগত যে রূপ নিয়েই গড়ে উঠুক, তারা সে জন্যে প্রস্তুত হয়ে উঠতে থাকবে।

১৮ই জুলাই ১৯৪৮ শ্রীঅরবিন্দ।

এই বাণীটি থেকে চার পাঁচটি ছত্র ("Night is the darket before dawn and the coming of dawn is inevitable..." ইত্যাদি) শ্রীমা স্বহস্তে লিখে দেন, বিশেষ এক ভক্তকে, যিনি প্রতি বৎসর তাঁর ব্যবসায়ের তরফ থেকে wall calendar ছাপাবার জন্যে একটি motto চান।

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট, ভারতের প্রথম স্বাধীনতা দিবসে শ্রীঅরবিন্দ যে সুদীর্ঘ দিব্য-বাণীটি দেন, তা থেকেও শ্রীমা ওই একই উদ্দেশ্যে কয়েকটি ছত্র লিখে দেন। "(India is free but she has not achieved unity..." ইত্যাদি)। উক্ত দুটি বাণীরই হস্তলিপি হল শ্রীমায়ের, ভাষা শ্রীঅরবিন্দের।

(১৩) ১৯৪৩ সালে শ্রীদিলীপ কুমার রায় শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে এক ঘণ্টা আলাপ করবার সুযোগ পান। শিষ্যদের মধ্যে একমাত্র তিনি ছাড়া আর কেউ এ সুযোগ পাননি। শ্রীমায়ের মারফৎ অন্যান্য শিষ্যদের ডাকিয়ে "প্রয়োজন হইলে"ও শ্রীঅরবিন্দ মৌখিক উপদেশ দেননি। তাঁর সকল উপদেশই গেছে শ্রীমায়ের মারফৎ, তবে তা পত্রের আকারে। এখন সেগুলি খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হচ্ছে। দিলীপকুমারের ও-দিনের একটি প্রশ্নের উত্তরে (আপনি কি বাইরে এসে লোকেদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলবেন না?) শ্রীঅরবিন্দ বলেছিলেন—

"...I don't know...I donot decide from the mind, I stand no longer on the mental plane... things are not predetermined with me...suffice it to say for the present that I can't do what I have to do if I go on seeing people..."

অর্থাৎ, (শ্রীঅরবিন্দ বলেন) "...বলতে পারিনা।... আমি এখন আর মনের স্তরে বাস করিনা, মন দিয়ে কিছু স্থির করিনা।...কি করব তা আমার আগে থেকে ঠিক করা থাকে না। এখনকার মত এইটুকু বললেই চলবে যে, আমি যদি লোকজনের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করে চলি তাহলে আমার যে সব কাজ করবার রয়েছে তা যে করা হবে না।" এই সঙ্গে আরও একটু শ্রীঅরবিন্দের কথা (যা দিলীপ কুমার তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ Among the Great-এ, বা তীর্থংকর-এ লিপিবদ্ধ করেছেন) উদ্ধৃত করে দিলে পাঠকরা নিশ্চই খুশি হবেন।

"Now in these times of world-crisis when I have to be on guard and concentrated all the time...and when, besides, the major movement of the inner spiritual work needs an equal concentration and persistence, it is not possible for me to abandon the rule,...Certainly my force is not limited to the Ashram and its conditions. As you know it is being largely used for helping the right development of the war and of the change in the human world. It is also used for individual purpose outside the scope of the Ashram and the practice of yoga; but that of course is silently done and mainly by spiritual action. The Ashram however remains at the centre of the work and without the practice of yoga the work would not exist and could not have meaning or fruition..."

অর্থাৎ, "জগতের এই ঘোর সংকটলগ্নে, যখন আমার সমস্তক্ষণ সজাগ ও সংহত হয়ে না থাকলেই নয়, আর এ ছাড়া যখন আমার সাধনার প্রধান সিদ্ধির জন্য চাই একান্ত অভিনিবেশ ও অধ্যবসায়, তখন আমার পক্ষে সম্ভব নয়

এই নিয়মকে লঙ্ঘন করা।" (এই অংশটুকুর বাংলা অনুবাদ দিলীপকুমারের)।

শ্রীঅরবিন্দের কথা, "...অবশ্যই আমার যোগ শক্তির প্রভাব শুধু আশ্রম এবং তৎসংক্রান্ত ব্যাপারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। তুমি ত জান যে, আমার শক্তির অনেকখানিই এখন যুদ্ধের গতিকে ঠিক পথে চালাতে এবং জগতের মানুষদের পরিবর্ত্তনের কাজে ব্যয়িত হচ্ছে। তাছাড়া যোগ বা আশ্রমের উদ্দেশ্য বাদেও অন্যান্য বিশেষ ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হচ্ছে; যদিচ তা নীরবে এবং আধ্যাত্মিক উপায়েই হচ্ছে। অবশ্য আশ্রম আমার সকল কাজেরই কেন্দ্রস্থল এবং যোগ অভ্যাস ছাড়া কাজের অস্তিত্বই থাকে না এবং কাজ করার কোন অর্থ, কোন সার্থকতাই থাকে না।"

(১৪) তাঁর এই অতিমানসকে পৃথিবীতে নামানোর প্রচেষ্টাকে লোকে পাগলামীর পর্য্যায়ে ফেলতে পারে, এই ধরণের উক্তির উত্তরে এক পত্রে তিনি দিলীপ কুমারকে লিখেছিলেন—

"...I believe the descent of this truth opening the way to a development of divine consciousness here to be the final sense of the earth evolution. If greater men than myself have not had this vision and this ideal before them, that is no reason why I should not follow my truth-sense and truth-vision. If human reason regards me as a fool for trying to do what Krishna did not try, I do not in the least care...It is a question between the divine and myself—whether it is the divine will or not, whether I am sent to bring that down or open the way for its descent or atleast make it more possible or not. Let all men jeer at me if they will or all Hell fall upon me if it will for my presumption,—I go on till I conquer or perish. This is the spirit in which I seek the supermind, no hunting for greatness for myself or others."

অর্থাৎ..."আমার দৃঢ় বিশ্বাস, পৃথিবীতে এই অতিমানস সত্যের অবতরণ হলেই এখানে দিব্যচেতনার বিকাশের পথ পরিষ্কার হয়ে যাবে। পার্থিব ক্রমবিকাশতত্ত্বের সেইটিই হল চরম নিগূঢ় অর্থ। আমার চেয়ে মহত্তর লোকদের এই দৃষ্টি এবং এই আদর্শ যদি থেকে না থাকে, তার জন্যে আমি কেন আমার সত্যবোধ এবং সত্যদৃষ্টিকে অনুসরণ করতে পারব না? স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণও যে কাজ করতে চেষ্টা করেন নি (যে কাজ করতে বিরত ছিলেন বললে একই অর্থ বোঝায় কি?) আমি তা করতে চেষ্টা করছি বলে মানুষের যুক্তি বিচারে যদি আমাকে পাগল বলা হয়, তাতে কিছুই আসে যায় না। কথা হচ্ছে এটা ভগবৎ ইচ্ছা কি না, অতিমানসকে পৃথিবীতে নামিয়ে আনতে অথবা তার নামবার পথ পরিষ্কার করে দিতে, অন্তত তার নামবার সম্ভাবনাকে আরও দ্রুত করে দিতেই আমি এসেছি কি না, সেইটাই হল ভগবান আর আমার মধ্যে বোঝাপড়া। জগতের সবাই যদি আমাকে উপহাস করে ত করুক, এমন কি আমার এই দুঃসাহসের জন্যে যদি সমগ্র নরকও আমার মাথার ওপর ভেঙে পড়ে ত পড়ুক—আমি আমার কাজ করে যাব, শেষ পর্য্যন্ত হয় সিদ্ধি নয় মৃত্যুলাভ করব। অতিমানসের সাধনায় এই হল আমার পণ, এই হল আমার উদ্দেশ্য। আমার নিজের বা অন্যদের মহিমান্বিত করা এর উদ্দেশ্য নয়।"

(১৫) শ্রীঅরবিন্দ-জীবনীর এই হল মূল কথা। পণ্ডিচেরী জীবনে এই রহস্যই তাঁর মধ্যে মূর্ত্ত হয়ে উঠেছে। এ রহস্য কোন পূর্ব্ববর্ত্তী মহাপুরুষের বা অবতারের সাধনারই "পরিপূরক" নয়। এই কথাটি মনে রাখলেই শ্রীঅরবিন্দতত্ত্ব কখনও জটিল বা দুর্গম হবে না। গত ২৪শে জুলাই, ১৯৫১ শ্রীমা আশ্রমের শিশুদের উপলক্ষ করে যে বাণীটি দেন তার কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করা যাক (মূল বাণীটি ফরাসী ও ইংরেজীতে)—

"প্রকৃতির স্বধর্ম্মে রয়েছে এক ঊর্দ্ধগামী ক্রমবিকাশের ধারা। তা পাথর থেকে গাছপালাতে, গাছপালা থেকে পশুতে, পশু থেকে মানুষে ধাপে ধাপে এগিয়ে চলেছে। এখনকার মত মানুষই হল এই ঊর্দ্ধমুখী ক্রমপরিণতির শিখরচুম্বি শেষ পাদপীঠ। তাই তার ধারণা যে সে-ই হল এই অধিরোহণ পর্ব্বের শেষ পূর্ণচ্ছেদ। আর

তার বিশ্বাস যে, পৃথিবীতে তার চেয়ে বড় অন্য আর কিছুই হতে পারে না। এ ধারণাটি তার কিন্তু ভুল। কারণ তার বহিঃস্বভাবের প্রায় ষোল আনাতেই সে এখনও পশুই রয়েছে। এ পশু ভাবতে আর কথা কইতে পারে বটে, কিন্তু পার্থিব সকল বৃত্তি ও প্রবৃত্তির দিক থেকে আসলে সে পশুই। আর প্রকৃতিও যে এমন একটা অসম্পূর্ণ পরিণতিতে নিজেকে কৃতার্থ মনে করবে তা কখনই হতে পারে না। সেও নিশ্চয়ই এরপর এমন জীবকে গড়ে তুলতে অভিনিবিষ্ট—যে হবে মানুষের তুলনায় তাই, মানুষ পশুর তুলনায় যা। বাইরের আকৃতিতে সে মানুষই থাকবে, কিন্তু তার চেতনা হবে মনের চেয়ে অনেক উঁচু এবং অজ্ঞানের দাসানুদাস হওয়ার সম্ভাবনার বহু উর্দ্ধে প্রতিষ্ঠিত হবে সে।

"শ্রীঅরবিন্দ পৃথিবীতে এসেছিলেন জগৎবাসীদের এই সত্য বুঝিয়ে দিতে। তিনি প্রচার করলেন যে মানুষ হল ক্রমবিকাশমান এক জীবমাত্র। মনের চেতনায় তার বাস, যদিচ নতুন এক চেতনা, সত্য-চেতনাকে লাভ করার শক্তি তারই মধ্যে নিহিত। এবং এক নতুন জীবন গ্রহণ করার সামর্থ্যও রয়েছে তারই মধ্যে। সে জীবন হল সুসঙ্গতির লীলাক্ষেত্র মনোরম এবং পবিত্র। আর হল তা আনন্দময় এবং চেতনায় সমুজ্জ্বল। আজীবন শ্রীঅরবিন্দ এই চেতনাকে আপনার মাঝে মূর্ত্ত করে তুলতে এবং যারা তাঁর কাছে এসে সমবেত হয়েছিল তাদেরও এই চেতনা লাভ করবার জন্যে সাহায্য করে কাটিয়ে গেলেন। তাঁর ভাষায় এই চেতনার নাম হল অতিমানস।..."

শ্রীঅরবিন্দের নিজের লেখা বিবরণ থেকে আমরা জানতে পারি যে, ১৯০৪ সালে তিনি যোগ-সাধনা আরম্ভ করেন। প্রথমে খুব প্রাণায়াম ইত্যাদি করতেন। তার আগে এবং পরেও তাঁর নানা যৌগিক দর্শন ও উপলব্ধি হয়েছিল। ১৯০৮ সালের জানুয়ারী মাসেই প্রথম তিনি বরোদায় মহারাষ্ট্রি যোগী বিষ্ণুভাস্কর লেলের কাছ থেকে সাধনপথে বিশেষ সাহায্য পান, এবং ক্রমশঃ নিজের সাধনার ভিত্তি নিজে আবিষ্কার করেন। আনুষ্ঠানিক ভাবে যাকে দীক্ষা নেওয়া বলে, তা তিনি কারুর কাছেই নেন নি। লেলে মহারাজের কাছে তিনদিন ক্রমান্বয়ে বসে তাঁর নির্দ্দেশমত মনকে চিন্তাশূন্য করে শ্রীঅরবিন্দ স্থির নিশ্চল অবস্থার মধ্যে ডুবে যান। লেলে মহারাজের যা শ্রেষ্ঠ দান শ্রীঅরবিন্দকে, তা হ'ল, মনকে কেবল শান্ত, চিন্তাশূন্য ক'রে রাখা, যাতে তিনি মনের উর্দ্ধে থেকে তাঁর অন্তরের নির্দ্দেশ-বাণী পান, কোন চিন্তা যেন সে বাণীকে ঢেকে ফেলতে না পারে, আর সম্পূর্ণরূপে ভগবানের ওপর নির্ভর ক'রে তাঁর নির্দ্দেশ অনুসারে সকল কাজ করা। এই অপূর্ব্ব নতুন চেতনা লাভ করে চিন্তা-শূন্য মনে শ্রীঅরবিন্দ তার কয়েক দিন পরেই বোম্বাই শহরের এক প্রকাণ্ড জনসভায় বক্তৃতা করেন। বোধ হয় সেটি, ১৯শে জানুয়ারী, ১৯০৮, মহাজন ওয়াদিতে দেওয়া তাঁর "বর্ত্তমান অবস্থা" নামে বক্তৃতাটি। এই নীরব চিন্তা-শূন্য মন নিয়ে তিনি তারপর চারমাস "বন্দেমাতরম্" কাগজ প্রকাশ করেছেন, পণ্ডিচেরী জীবনে ছ' বছর ধ'রে একাদিক্রমে, একলাই একরকম, "আর্য" পত্রিকা লিখেছেন, এবং উত্তর কালের পর্ব্বত প্রমাণ পত্রাবলী এবং যাবতীয় বাণী ও আশ্রম পরিচালনার কাজ ক'রেছেন। তাঁর সাধন পদ্ধতির এইটিই হ'ল প্রথম ক্রম।

আলিপুর জেলে থাকতে তিনি গীতা ও উপনিষদ পড়তেন এবং তখন গীতার যোগই অনুসরণ করতেন। এই জেল কুঠুরীতেই ধ্যানাবস্থায় তিনি পনের দিন ধরে অবিরাম স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব অনুভব করতেন এবং তাঁর কণ্ঠস্বর শুনতেন। বিবেকানন্দ ওই পনের দিনে তাঁকে আধ্যাত্মিক উপলব্ধির একটি বিশেষ অঙ্গের গুরুত্ব-পূর্ণ ক্ষেত্র সম্বন্ধে যা কিছু বলবার ছিল, তা ব'লে দিয়ে যান। শ্রীমায়ের একটি লেখায় আছে—

"Sri Aurobindo said, Vivekananda came to him not in a visible form but as a presence which was with him for a fortnight, during which he spoke certain things about the processes of the higher truth consciousness."

এই সময়েই শ্রীঅরবিন্দের বিশ্বচেতনা উপলব্ধি হয় এবং সর্ব্বভূতে নারায়ণ দর্শন করতে থাকেন। জেলে, বোমার মামলার বিচার সভায় এবং সর্ব্বত্র তাঁর বাসুদেব দর্শনের কথা আমরা জেনেছি বই পড়ে।

শ্রীঅরবিন্দের যোগপন্থা—যাকে তিনি "পূর্ণযোগ" বলেছেন, এবং তাঁর অধ্যাত্ম দর্শন যে চারটি প্রধান উপলব্ধির ওপর প্রতিষ্ঠিত, তার প্রথমটি হল অদ্বৈত অবস্থার উপলব্ধি,—ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা, দর্শন। দ্বিতীয়টি হল—ব্রহ্ম সত্য, জগৎব্রহ্ম, দর্শন, সর্ব্বভূতে নারায়ণ দর্শন। তৃতীয়টি হল—সর্ব্বোত্তম ব্রহ্মের অখণ্ড রূপের উপলব্ধি, সগুণ ও নির্গুণ, ব্রহ্মের সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় অবস্থা যে এক ও অভিন্ন, সেই উপলব্ধি। তারপর চতুর্থটি হল—চেতনার উর্দ্ধতর স্তর-বিন্যাসের উপলব্ধি, যা অতিমানসলোকে গিয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে।

পণ্ডিচেরী যাবার আগেই প্রথম দুটি অবস্থার পূর্ণ উপলব্ধি তিনি সম্পন্ন করেন এবং আলিপুর জেলেই শেষ দুটির উপলব্ধি শুরু হয় এবং সে পথে তিনি অনেকখানি এগিয়েছিলেন।

পুরনো যোগের সঙ্গে তাঁর যোগতত্ত্বের তফাৎ, তাঁর ভাষাতে, হচ্ছে এই, "পুরনো যোগ মনবুদ্ধিকে জানতো আর আত্মাকে জানতো। মনের মধ্যেই আত্মার অনুভূতি পেয়ে সন্তুষ্ট থাকত। কিন্তু মন খণ্ডকেই আয়ত্ত করতে পারে, অনন্ত অখণ্ডকে সম্পূর্ণ ধরতে পারে না; ধরতে হলে সমাধি, মোক্ষ, নির্ব্বাণ ইত্যাদি মনের উপায়, আর উপায় নেই।" অথচ মানুষের মনের অতীতে, তদূর্দ্ধে অবস্থিত যে অতিমানস, অনন্ত সত্যের মূর্ত্ত চেতনা (eternal truth consciousness) তা হ'ল ভগবৎ জ্ঞানেরই স্বয়ং-সচেতন (self-aware), স্বয়ং-সিদ্ধ (self-determining) জ্যোতি এবং শক্তি। মানুষ এতাবৎকাল ধরে যা কিছু শ্রেষ্ঠ ও বিশিষ্টকে লাভ ক'রেছে, তার স্থায়িত্ব এবং পূর্ণতা সে লাভ করতে পারে নি। একমাত্র ওই অতিমানসের চেতনায় উঠে, তাকে এই পৃথিবীতে নামিয়ে এনে, মানুষের জীবনে তাকে সক্রিয় করে তুলতে পারলেই মানুষ যা চাইছে কিন্তু পাচ্ছে না, তা তার পক্ষে পাওয়া সম্ভব হবে।

বর্ত্তমানে এই ক'খানি বই প'ড়ে প্রবন্ধটি লেখার প্রয়োজন হয়:

(১) Sri Aurobindo—G. H. Langley
(২) Sri Aurobindo—K. R. S. Iyenger
(৩) Sri Aurobindo (short life sketch)—Sisir Ghose)
(৪) Life work of Sri Aurobindo—Jyotish Ghose
(৫) শ্রীঅরবিন্দ (জীবন ও যোগ)—প্রমোদ সেন
(৬) শ্রীঅরবিন্দ—ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
(৭) ভারতপুরুষ-শ্রীঅরবিন্দ—উপেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

—বিশেষ ক'রে শেষের বইখানিতে বহু ভুল তথ্য সংশোধন করা দরকার।—লেখক

প্রতিধ্বনি

শ্রীআশুতোষ সান্যাল

আমি কবি—মনে ছিল এই অহঙ্কার।
কথার কুসুমপুঞ্জ করিয়া চয়ন
কবিতার যে-মালাটি গাঁথি সযতনে,—
ভাবিতাম কালজয়ী গন্ধশোভা তার!
আজি নৈশ অম্বরের চন্দ্রাতপতলে
ক্লান্ত দেহ ল'য়ে বসি' নবদূর্ব্বাদলে
কান পেতে শুনি যত পাপিয়া-ঝঙ্কার,—
মনে হয় ব্যর্থ মোর বচন-রচন।
একখানি সুললিত গীতিকাব্যসম
বিরাজে সম্মুখে মোর গগনভুবন
ছন্দোময়। অন্তরালে কোন্ মহাকবি
রচিতেছে নিরন্তর সৃষ্টির কবিতা
অনন্ত ব্যঞ্জনাময়, স্নিগ্ধ ভাবোজ্জ্বল?
আমার কবিতা তারি ক্ষীণ প্রতিধ্বনি!

বড়মা

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

সাত

পিসীমা'র আদেশে অমিয় সন্ধ্যার সময় আবার যোগেশচন্দ্রের গৃহে আসিল। সাবিত্রীর অবস্থা দেখিয়া সে ভয় পাইল—শরীর যেন শক্তিশূন্য—কেবল বেদনার চেতনা আছে। সে সৌদামিনীকে জিজ্ঞাসা করিল, এই কয়দিনেই কি সেই অবস্থা হইয়াছে? তাহাই হইয়াছে জানিয়া সে আরও চিন্তিত হইল।

দিনের পর দিন কাটিতে লাগিল। চতুর্থ দিন জয়ন্তী অমিয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন—কোন পরিবর্তন কি লক্ষিত হইতেছে? তাঁহারা ত কিছুই বুঝিতে পারিতেছেন না। অমিয় বলিল, সকলেরই মত, কোনরূপ উন্নতি দেখিতে বিলম্ব অনিবার্য্য; তবে যত দিন যায়—ততই ভাল; বিশেষ অবস্থার যে কোন অবনতি ঘটে নাই, তাহাতেই আশা।

সেই দিন শিশির এক বার কলিকাতায় আসিলেন—মধ্যম পুত্রের পত্র লইয়া আসিলেন। সে লিখিয়াছে, কাশীতে সংবাদ পাইয়া সকলেই শোকে বিহ্বল হইয়াছেন—কে কাহাকে সান্ত্বনা দিবে? তাহার মধ্যে যাহা করা সম্ভব, সে তাহা করিতেছে। জয়ন্তী ও সৌদামিনী শিশিরকুমারের সহিত পরামর্শ করিলেন। সাবিত্রীর যে অবস্থা তাহাতে তাঁহারা তাঁহাকে ফেলিয়া যাইতে পারেন না। শিশিরকুমার বলিলেন, তিনিই এক বার কাশী ঘুরিয়া আসিবেন; তাহা মনে করিয়াই তিনি সাত দিন ছুটী লইয়া আসিয়াছেন। জয়ন্তী যাহা বলিয়াছিলেন তাহাই হইয়াছে—শিশিরের এক ভ্রাতৃজায়া আসিয়া তাঁহার সংসারের ভার লইয়াছেন; সে জন্য চিন্তার কোন কারণ নাই।

শিশিরকুমার সেই রাত্রিতেই কাশী যাত্রা করিলেন। সে কথা সাবিত্রীকে জানান হইল না।

আরও দুই দিন গেল। অমিয় বলিল, ডাক্তাররা মনে করিতেছেন, আর দুই তিন দিনেই উন্নতি উপলব্ধ হইবে।

জয়ন্তী বলিলেন, "ভগবান্ তা'-ই করুন।"

সেই দিন অপরাহ্নে সৌদামিনী ও জয়ন্তী যখন অমিয়কুমারের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, তখন সহসা সাবিত্রী যেন কি শুনিয়া উৎকর্ণ হইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। তাঁহার মনে হইল, একি স্বপ্ন—না বিকারে তিনি ভুল শুনিতেছেন? এযে আশুর কণ্ঠস্বর! সে জিজ্ঞাসা করিতেছে—মা কেমন আছেন?

দেখিতে দেখিতে আশুতোষ আসিয়া কক্ষে প্রবেশ করিল—যে বেশে ছিল, সেই বেশেই মা'র কাছে গেল। রোগযন্ত্রণাও যেন ভুলিয়া সাবিত্রী পুত্রকে বক্ষে টানিয়া লইলেন; সে-ও কাঁদিতে লাগিল, তিনিও কাঁদিতে লাগিলেন।

অমিয় ঘরে আসিয়া তাহাদের সে অবস্থা দেখিয়া সৌদামিনীকে বলিল, "পিসীমা, দু'জনকেই শান্ত করা দরকার।"

সৌদামিনী আশুকে বলিলেন, "বাবা, ক' দিনের পথ এসেছ—ওঠ, স্নান ক'রে কিছু খাও। মা'কে ঔষধ পথ্য দিতে হবে।"

আশুতোষ উঠিল—উঠিয়া জ্যেঠাইমাকে ও মাসীমাকে প্রণাম করিল, তাহার পরে স্নান করিতে গেল।

সাবিত্রীকে পরীক্ষা করিয়া অমিয় দেখিল, এত বড় অপ্রত্যাশিত ঘটনা—বিশেষ মাতাপুত্রে এই সাক্ষাৎ তিনি যে ভাবে সহ্য করিয়াছেন, তাহা বিশেষ আশাপ্রদ। সে ইহাও জানিত যে, বড় দুঃখের সময়েও যে আনন্দ আসে তাহা ঔষধ অপেক্ষা কার্য্যকরী হয়। সে সৌদামিনীর নির্দ্দেশে সাবিত্রীকে পিসীমা বলিতে আরম্ভ করিয়াছিল;

তাঁহাকে বলিল, "পিসীমা, এইবার আপনি শীঘ্র শীঘ্র সেরে উঠবেন।"

আশু পিতার নিকট অমিয়ের পরিচয় পাইয়াছিল—স্নান করিয়া আসিয়া তাহাকে বলিল, "দাদা, যাবার সময় আমাকে এক বার ডাকবেন।"

সে অমিয়কুমারের নিকট সকল ঘটনা ও অবস্থা জানিয়া লইল। আহারের পরে সে আবার আসিয়া সাবিত্রীর কাছে বসিল; মা'কে ঔষধ ও পথ্য প্রদানে জ্যেঠাইমা'কে ও মাসীমা'কে সাহায্য করিতে লাগিল। তাঁহারা উভয়ে পুনঃ পুনঃ তাহাকে যাইয়া একটু বিশ্রাম করিতে বলিলেন; কিন্তু সে গেল না।

পরদিন প্রাতে সাবিত্রী পুত্রকে বলিলেন, "বিলাতে ত খাবারের বড় অভাব; খুব কষ্ট হয়েছে?"

আশু বলিল, "এক রকম সয়ে গিয়েছিল।"

"কি খেতে ইচ্ছা হয়, বলিস।"

আশু জয়ন্তীর দিকে চাহিয়া বলিল, "মাসীমা, বিলাতে যাবার আগে যখন আপনার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম, তখন আপনি যে রান্না খাইয়েছিলেন, সে আমি ভুলতে পারি নি। আপনার সেই রান্না খাব।"

জয়ন্তী বলিলেন, "মা সেরে উঠুন—তার পরে আমি তোমাকে নিয়ে যাব; তখন সেই রান্না খা'বে—এখানে হবে না।"

"কেন, মাসীমা; স্থানমাহাত্ম্য আছে না কি?"

"এখানে কোথায় রাঁধব?"

সাবিত্রী বলিলেন, "দিদিরা ত এ বাড়ীতে খান না।"

আশু জিজ্ঞাসা করিল, "সে কি?"

সাবিত্রী বলিলেন, "এ বাড়ীর ব্যবস্থা অন্যরূপ। তাই ত প্রতি দিন দু'বার ক'রে তোর বড়মা'র বাড়ীতে যেতে হয়।"

"আমি আজই সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। প্রতিদিন এই করতে হয়েছে! তাই বুঝি কাল সন্ধ্যার পরে একবার কিছুক্ষণ ওঁদের দেখতে পাই নি?"

সে সৌদামিনীকে বলিল, "বড়মা, তিন তলার একটা পাশ খালি ক'রে দেব, না—সবটাই খালি করব?"

সৌদামিনী ব্যস্ত হইয়া বলিল, "না, বাবা, অত হাঙ্গামা করতে হ'বে না। তোমার মা সেরে উঠুন তা'র পরে ত আর প্রয়োজন হবে না—এত দিন গেছে, আর ক'টা দিনও কেটে যাবে।"

"সে হবে না, বড়মা। মা মাসীমা কষ্ট সহ্য করবেন; আর ছেলে সুবিধা ছাড়বে না।"

"তোমার মা সেরে উঠলে আবার ত রোগা শরীরে সব সাজান গুছান করতে হ'বে। তোমাদের থাকার অভ্যাস এক রকম।"

"কেন, বড়মা, আপনি কি মা ন'ন? ঠাকুরমা আর দিদিমা আর দিদি আমাকে ছেলেবেলা থেকেই ব'লে এসেছেন, 'বড়মা'র ছেলে নাই—তুই-ই তাঁ'র ছেলে। তিনি যেন কখন ছেলের অভাব মনে না করেন।' আর বড়মা, আমি ছাড়া আপনার কি ছেলে আছে?"

"না, বাবা। ভগবানের কাছে এই প্রার্থনাই ত করি যে, শেষে তোমার হাতের জল যেন পাই।" তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে বুকে টানিয়া লইয়া সস্নেহে তাহার মুখচুম্বন করিলেন।

সেই সময় যোগেশচন্দ্র সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন; কয় দিন হইতে যে কথা বলিব বলিব করিতেছিলেন, তাহা বলিলেন, "বৌদিদি, আপনারা ত এত দিন দিনরাত্রি রোগীর সেবা করলেন—এ বাড়ীতে জলস্পর্শও করলেন না, এখন কি রাত্রির জন্য শুশ্রূষাকারিণীর ব্যবস্থা করা যাবে?"

সৌদামিনী কঠিন হইয়া উঠিলেন; বলিলেন, "তোমাদের কি ভাড়াটে সেবা নইলে মন ওঠে না? ঐ দিয়াই ত বাছাকে আমার মেরেছ। আবার সেই কথা বলবে? আমরা সেবা করি প্রাণের টানে—তারা করবে পয়সার জন্য। তোমার মাথা খারাপ হয়েছে—সে দিন অমিয়কে টাকা দিতে গেলে, আজ আবার এই কথা বলছ। আমি বাড়ীর বড় বৌ—যে কয় দিন আমি এ বাড়ীতে আছি, সে কয় দিন তুমি কর্ত্তাত্বি ক'র না। আমি চ'লে গেলে যা' হয় ক'র। তোমার হাই কোর্ট কি উঠে গেছে?"

আশু বলিল, "বড় মা, এই ত বললেন, আপনি বাড়ীর বড় বৌ, আপনার মতেই কায হবে। আমি বাড়ীর এক ছেলে—যা' করতে হবে আমাকে বলুন—আমি সব ব্যবস্থা করব। আমার বাড়ীতে আপনারা থাকবেন না, তাতে কি আমার মনে কষ্ট হয় না?"

"আচ্ছা, সে যা' হয়—পরে হবে।"

"পরে নয়, বড় মা, আমি এখনই সব ব্যবস্থা ক'রে ফেল্‌ছি।"

সে যাইতে উদ্যত হইল। সৌদামিনী বলিলেন, "আমি ত বাড়ীর বড় বৌ; কিন্তু আমরা যাঁ'র বৌ—তিনিও যে আছেন।"

"আপনি ভাববেন না, আপনার ছেলে ঠাকুরমা'র দিদিমা'র আর দিদির কথা ভুলে গেছে। মা একটু সারলেই তাঁ'দের কাছে যাব। মেসমশাই ফিরলে তাঁদের সব সংবাদ পাব। কিন্তু, বড় মা, রাগ করবেন না—আপনার পরিবর্ত্তন দেখে ভয় হচ্ছে, তাঁদেরও কি এমনই পরিবর্ত্তন হয়েছে?"

জয়ন্তী বলিলেন, "সে কি, আশু?"

আশু বলিল, "আমি লক্ষ্য করছি, বড় মা আর আমাকে তাঁর সেই আশু ভাবতে পারছেন না—'তুই' ছেড়ে এখন 'তুমি' বলা ধরেছেন। আমি কিন্তু আপনাদের সেই আশু।"

সৌদামিনীর মনে আনন্দ ও বেদনা এক সঙ্গে প্রকাশ পাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। তিনি কিছু বলিবার পূর্ব্বেই আশু ঘর হইতে আসবাব সরাইতে গেল। সৌদামিনী তাহার অনুসন্ধানে যাইয়া তাহাকে বলিলেন, "আশু, তোকে ত আবার অল্প দিন পরেই বিলাতে যেতে হবে—কেন এ সব করছিস?"

আশু বলিল, "হয়ত যাব—কিন্তু কেবল পরীক্ষা দিতে। বড়মা, আমরা যে সমাজ গড়ে তুলেছি, তাতে থাকতে ঘৃণা হয়। লীলার সংবাদ আমি পেলাম বিলাতে—তা'র স্বামীর কাছে। দু'জনে মাটির নীচের রেলগাড়ীতে দেখা। দু'জনই একটা সম্মিলনের যাত্রী। আমাকে দেখে সে বলল, 'বাড়ীর কোন সংবাদ আজকাল পেয়েছ?' আমি উত্তর দিলাম, 'না'। তখন সে বলল, 'বড় দুঃসংবাদ'—ব'লে পকেট থেকে তার' বাবার পাঠান টেলিগ্রাম বার ক'রে আমাকে দিল—তা'তে লীলার মৃত্যু-সংবাদ। তখন সে তা'র চুরুটের বাক্স থেকে একটা সিগারেট বা'র ক'রে সেটা বাক্সটার বার দুই ঠুকছে। আমি দেখলাম, সে যেন নির্ব্বিকার—অথচ তার স্ত্রীর মৃত্যু হয়েছে, আর সে সংবাদ সে দিচ্ছে—সেই স্ত্রীর ভাইকে! তা'র পরে সে খুব কায়দা দেখিয়ে বলল, 'আহা বেচারা!' যেন সে উপন্যাসের কোন চরিত্রের সমালোচনা করছে! আমি পরের ষ্টেশনেই নেমে—বাসায় ফিরবার পথে দেশে ফিরবার জন্য বাবার অনুমতি চেয়ে টেলিগ্রাম পাঠিয়ে বাসায় গেলাম; ভাবতে লাগলাম—এ-ও মানুষ! তা'র ব্যবহারে ঘৃণার জন্যই, বোধ হয়, আমি শোকে অভিভূত হয়ে পড়লাম না। তা'র পরে আমি আর তা'র সঙ্গে দেখাও করি নি।"

সৌদামিনী বলিলেন, "বেশ করেছিস। অমন লোকের মুখ দর্শন করাও পাপ।"

"কৃত্রিমতার চর্চ্চা করতে করতে আমরা যেন আন্তরিকতা হারিয়ে ফেল্‌ছি।"

"এই দেখ না, আমাদেরই কি হ'ল। জানি, অদৃষ্টে যা' ছিল, তাই হ'তই; কিন্তু তবুও যে মনকে প্রবোধ দিতে পারা যায় না। বাছাকে আমার হাসপাতালে পাঠাল। আমি রাগী মানুষ; আর আমার কথা বড় তিক্ত—তাই মনে হয়, আঁতুড় ঘরে আমার মুখে মধু দিতে ভুল হ'য়েছিল। আমি, সেইজন্য, কোন কথাই বলি না। কিন্তু তোর মাসী, সব ব্যবস্থার কথা জেনে লিখেছিল, মেয়েটাকে কেবলই ভয় দেখান হচ্ছে—ছেলে হবে, সে ত স্বাভাবিক ব্যাপার। তোর মা'কে লিখেছিল, মেয়েকে কাছে আনুক। আহা—শুনেছি, হাসপাতালে মা আমার সেই কথাই ব'লেছিল—'মা, তুমি কেন আমাকে তোমার কাছে নিয়ে গেলে না?'—"

রোদনোচ্ছ্বাসে সৌদামিনীর কণ্ঠস্বর আর বাহির হইল না।

তাহার পরে তিনি বলিলেন, "সে দুঃখ ত আর মন হ'তে কখন দূর হবে না। এখন ভাবি, আজ যেমন

এসেছি, তখন কেন তেমনই এসে ঝাঁপিয়ে পড়ি নি। তা হ'লে হয়ত তাকে হারাতাম না।"

আশুও কাঁদিতে লাগিল।

তাহার পরে আশু বলিল, "বড় মা, কিন্তু আমাদের গতি কি হবে?"

সৌদামিনী বলিলেন, "তোর জেঠা ঐ কথাই ভাবতেন। তুই জানিস না, স্বদেশী আন্দোলনের প্রথম সময়ে, তিনি যখন যুবক তখন তাতে মেতে উঠেছিলেন; পূর্ব্ববঙ্গে যখন এক দল মুসলমানের অত্যাচার তখন যারা বোমা আর বন্দুক নিয়ে অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল, তিনি তাদের মধ্যে ছিলেন। পূর্ব্ববঙ্গের সেই কাযে গিয়েই তাঁ'র শরীর প্রথম ভেঙ্গে গিয়েছিল। তিনি বলতেন—'বঙ্কিমবাবু আমাদের বর্ণনায় বলেছিলেন, আমরা বিলাতী পণ্ডিত থেকে বিলাতী কুকুর পর্য্যন্ত বিলাতীর ভক্ত; তা'তে। আমাদের চৈতন্যোদয় হয় নি। তা'র পর উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব বলেছিলেন, আমরা ফিরিঙ্গীর ফেনচাটা; তা'তেও আমাদের ভুল ভাঙ্গে নি। আমি কেবল ভাবি, আমাদের ভুল ভেঙ্গেছে, না বেড়েছে? যে আপনার মা'কে ভক্তি করে না, সে কি দেশমা'কে ভক্তি করতে পারে? যে আপনার সমাজকে ভাল না বাসে, সে কি কখন স্বাধীনতা পেতে পারে? যে আপনার ধর্ম্মকে ঘৃণা করে, সে ঘৃণারই উপযুক্ত।' এ সব কথা আমি আমার স্বামী, আমার শিক্ষক, আমার গুরু, আমার দেবতা তোর জ্যেঠার কাছে শিখেছি; তাই এখন আমার জপমালা হয়ে আছে—এ মত আমি ইষ্টমন্ত্র মনে করি।"

আট

শিশিরকুমার কাশী হইতে ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, কলিকাতার সংবাদে তথায় সকলেই কাতর হইয়াছেন, কিন্তু কি আশ্চর্য্য দৃঢ়তা পিসিমার! তিনি আপনি শোকে অধীর না হইয়া সাবিত্রীর মাতাকে ও শাশুড়ীকে সান্ত্বনা দিতেছেন—শাস্ত্রের কথা বলিয়া বুঝাইতেছেন।

শিশিরকুমার বলিলেন, পিসীমা আর সাবিত্রীর শাশুড়ী উভয়েই সৌদামিনীকে আশীর্ব্বাদ জানাইয়াছেন—তিনি যে ব্যবহার পাইয়াছেন, তাহাতে তিনি যদি শোকের সময় সাবিত্রীর সেবাশুশ্রূষা না করিতেন, তাহা হইলে কেহ তাঁহাকে নিন্দা করিত না—এ কায তাঁহার উদারতারই পরিচায়ক। তাঁহার শাশুরী বলিয়াছেন, তাঁহার বড় ছেলে যেমন বড় বধূও তেমনই, সাবিত্রীর পুত্র কন্যাকে আপনাদিগের সন্তানের মতই ভালবাসিয়াছেন, যোগেশচন্দ্রই সে স্নেহের মর্য্যাদা বুঝিতে পারেন নাই, মর্য্যাদা রাখেন নাই।

শুনিয়া সৌদামিনী বলিলেন, "আমাকে আবার আশীর্ব্বাদ করা কেন?"

শিশিরকুমার বলিলেন, "পিসীমা বলেছেন, এ জন্মে ত নারী জন্মের সাধ পূর্ণ হ'ল না, আশীর্ব্বাদ করি, পরজন্মে যেন পতিপুত্রকন্যা নিয়ে সুখী হয়।

সৌদামিনী বলিলেন, "যা'র নিজের বুকে ব্যথা, সে-ই পরের ব্যথা বুঝতে পারে।"

ইহার দুইদিন পরে আশু সাবিত্রীকে বলিল, "মা, আমি এক বার কাশী যাব।" সাবিত্রী তাহাকে যোগেশচন্দ্রকে সে কথা বলিতে বলিলেন। শুনিয়া সৌদামিনী তাঁহাকে তিরস্কার করিলেন—"কোন বিষয়ে প্রতিবাদ না ক'রে, আর সব সহ্য ক'রে সংসারের এই অবস্থা করেছ; আবার ছেলেকেও সেই লোকের কথা শুনতে বলছ? ও যাবে এর ঠাকুরমা'কে, দিদিমা'কে আর যাঁর জন্য আজ তোমাদের সব সেই দিদিকে প্রণাম করতে, তাতে আবার মতামতের বিচার-বিবেচনার কি আছে? ভালমন্দ বুঝবার বয়স ওর হয়েছে।"

আশু পিসীমা'র তাহার পিতার বিদেশে শিক্ষালাভের ব্যয় নির্ব্বাহের বিষয় জানিত না; জিজ্ঞাসা করিল, "বড়মা, দিদির কথা কি বলছেন?"

সৌদামিনী সাবিত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ছেলেকে সে কথা বল নি?

সাবিত্রী বলিলেন, "না, দিদি।"

"কেন? পরিবারের কে শত্রু কে মিত্র, কে উপকারী কে অপকারী, কে শ্রদ্ধেয় কে অশ্রদ্ধেয়, কে আত্মীয় কে অনাত্মীয়—তা' না জানলে ছেলেমেয়েরা যে অন্ধকারেই পথ খুঁজবে?"

"দিদি, আমার পিসীমার কথা—তাই আমি বলি নি।"

"তবে আমিই বলি"—বলিয়া সৌদামিনী যোগেশ-চন্দ্রের জন্য পিসীমার বিধবা'র সঞ্চয় হইতে ব্যয়ের বিবরণ বিবৃত করিলেন।

শুনিয়া আশু বলিল, "দিদি আমাদের জন্য এত ত্যাগ স্বীকার করেছেন!"

সৌদামিনী বলিলেন, "ঐখানটায় তোদের শিক্ষার ভুল। আমরা হিন্দু মেয়ে ঐরূপ করা ত্যাগ ব'লে মনে করি না—স্নেহ ভালবাসার ধর্ম্ম মনে করি; তা'র পরিবর্ত্তে কিছু লাভের কথা মনেও করি না। পিসীমা কি তাঁ'র সেই টাকার ফল কি হয়েছে, তা' চোখে দেখেছেন? এই যে তোর মা আপনার স্বাতন্ত্র্য পর্য্যন্ত ত্যাগ করেছে—একি কম ত্যাগ, বাবা? কিন্তু ও কষ্ট ছাড়া আর কিছু মনে করলে তা' করতে পারত না।"

আশু বলিল, "বড়মা, আমরা যেন একেবারে স্বজনশূন্য অবস্থায় 'মানুষ' হয়েছি। আপনি আমাকে আমার কর্ত্তব্য জানিয়ে দেবেন—কি করতে হয় বুঝিয়ে দেবেন।"

সৌদামিনীর কথা শুনিয়া আশুর কাশী যাইবার আগ্রহ যেন বাড়িয়া উঠিল। সে তাহার কাশী যাইবার প্রস্তাব তাহার পিতার নিকট কহিল। যোগেশচন্দ্র কোন আপত্তি করিলেন না, কেবল সঙ্গে ভৃত্য ও নানা জিনিষ লইতে বলিলেন।

আশু বলিল, "ও সব আমি নেব না। যাচ্ছি শোকাতুরা ঠাকুরমা, দিদিমা, দিদিকে দেখতে; নিমন্ত্রণ রক্ষা করতেও নয়—বিলাত যাত্রা করতেও নয়।"

যোগেশচন্দ্র আর কিছু বলিলেন না।

জয়ন্তী বলিলেন, "আশু একা গিয়ে পড়বে?"

সৌদামিনী জয়ন্তীকে বলিলেন, "সাবিত্রীর শরীর ত একটু একটু ক'রে ভালই হচ্ছে। তুমি অনেকদিন মা'কে আর পিসীমা'কে দেখ নাই; আবার শীঘ্রই ত নিজের ঘরে ফিরতে হবে—তখন বার হওয়া দুষ্কর হবে। তুমি ওর সঙ্গে যাও—তাঁ'দের দেখাও হবে, বিশ্বনাথ অন্নপূর্ণাও দেখা হ'বে। আমার ঝাড়া হাত পা, বিশ্বনাথের কৃপা হ'লে যখন ইচ্ছা যেতে পারব। তুমি তেরাত্রি কাশীবাস ক'রেই চ'লে এস। এ ক'দিন আমি সাবিত্রীকে দেখব।"

কাশী যাত্রার পূর্ব্বে আশু মা'কে বলিল, "মা, ঠাকুরমা, দিদিমা আর দিদিকে কি এক বার আসতে বলব? এখন ত কোন অসুবিধা হবে না।"

সাবিত্রী একটু ভাবিয়া বলিলেন, "আশু, সেটা ভাল হবে কি না, তা' আমি ভেবে ঠিক করতে পারছি না। তোমার ঠাকুরমা যখন এসেছিলেন, তখন যে তাঁর জন্য কোন ব্যবস্থাই করা হয় নি, তা' মনে ক'রে আমি লজ্জা অনুভব করি। এ বিষয়ে তুমি তোমার মাসীমা'র মত নিয়ে কায কর। তিনি অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করবেন।"

জয়ন্তীকে সঙ্গে লইয়া আশু কাশীযাত্রা করিল।

নয়

কাশী হইতে ফিরিয়া জয়ন্তী ভগিনীকে বলিলেন, "আশুর ইচ্ছা ছিল, সকলকে এক বার তোমার কাছে আনে। কিন্তু সে বিষয় মা'কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম; তিনি বললেন, পিসীমা বাবার মৃত্যুর পর আর কাশী ছেড়ে কোথাও যান নি—এখন সে প্রস্তাব করলে কেবল কাঁদবেন। আমি সেই জন্য কেবল ব'লে এসেছি, আশু বলছে, সে আবার এসে সকলকে এক বার যাবার কথা বলবে, সে আমাদের জন্য বাড়ীর ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন করেছে।"

তাহার পরে তিনি বলিলেন, "পিসীমা বারবার বললেন, 'আশুর বিয়ে দাও। নইলে কি নিয়ে সাবিত্রী মনকে প্রবোধ দেবে? আশুর ছেলে মেয়ে হ'লে আবার নূতন সংসার হবে।"

সাবিত্রী কিছু বলিলেন না। সৌদামিনী বলিলেন, "এই ত তাঁ'র উপযুক্ত কথা—পাকা গৃহিণীর কথা। আমিই ঠাকুরপোকে বলব।"

সৌদামিনী যখন যোগেশচন্দ্রকে বলিলেন; তিনি এ বার তাঁহার পুত্রের বিবাহ দিবেন, তখন যোগেশচন্দ্র বলিলেন, "বৌদিদি, আপনারা যা' ভাল বোঝেন, তা'ই করুন।" তাহার পরে তিনি বলিলেন, "আশু কি পরীক্ষা দিতে বিলাতে যাবে না?"

সৌদামিনী সে কথা আশুকে জিজ্ঞাসা করিলে আশু বলিল, তাহাকে হয় আর এক সপ্তাহ পরে যাইয়া পরীক্ষা দিয়া ফিরিতে হয়—আর তাহা না হইলে ছয় মাস পরে আবার পরীক্ষা।

শুনিয়া সৌদামিনী বলিলেন, "পুরুষ মানুষের বসে থাকা আমি ভালবাসি না। যখন এত দিন বিদেশে থেকে, এত কষ্ট সহ্য ক'রে পড়েছিস্, তখন পরীক্ষা দিয়ে আয়। এ বার ত বিপদ-আপদ গেল। পরীক্ষা দিতে পারবি ত?"

আশু বলিল, "আপনাদের আশীর্ব্বাদে তা' পারব বলেই মনে করি। তবে যদি মন স্থির রেখে দেড় মাস পড়তে আর পরীক্ষা দিতে পারি—তবেই তা' হয়।"

"সে তুই বুঝে দেখ। নইলে ত আবার ছ' মাস দেরী করতে হ'বে। শুভস্য শীঘ্রং।"

"সে আপনার ওপর নির্ভর করবে।"

"কেন, বাবা?"

"মাসীমা অনেক দিন তাঁর সংসার ছেড়ে এসে রয়েছেন, তাঁকে আর থাকতে বলতে পারি না; কিন্তু আপনাকে বলতে পারি ব'লেই বলছি, আপনি যদি এ ছ' মাস মার ভার নেন, তবেই আমি নিশ্চিন্ত হয়ে যেতে পারি; আর ব'লে যেতে পারি, তা' হ'লে আপনার ছেলে পরীক্ষায় নিশ্চয়ই উত্তীর্ণ হবে।"

সৌদামিনী ভাবিতে লাগিলেন--তাহার পরে বলিলেন, "তোর মা'র শরীর ত এখন সারছে—না হয় শুশ্রূষাকারিণীর ব্যবস্থা ক'রে যাব।"

আশু কাতরভাবে সৌদামিনীর দিকে চাহিয়া বলিল, "সে হবে না, বড়মা—আপনি যদি মা'র ভার না নেন, তবে আমি যাব না। আপনাদের কথায় 'নার্সে' আমার আতঙ্ক হয়েছে।" তাহার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া আসিল।

সৌদামিনী ব্যস্ত হইয়া অঞ্চলে তাহার চক্ষুর জল মুছাইয়া দিয়া বলিলেন, "তুই চোখের জল ফেলিস না। তোর কথাই থাকবে—ছ' মাস আমি তোর মা'র ভার নিলাম।"

আশু বলিল, "বড় মা, ঠাকুরমা বলতেন 'কুপুত্র যদিও হয়,—কুমাতা কখন নয়।' আমার যদি কোন অপরাধ হয়—তবুও আপনি রাগ করবেন না—আমাকে শাসন করবেন, কিন্তু আমার ওপর রাগ করবেন না।"

সৌদামিনীর মনে রুদ্ধ মাতৃস্নেহ যেন উথলিয়া উঠিতে লাগিল। তিনি আশুর মুখ বুকে টানিয়া লইয়া বলিলেন, "আমার ছেলে—আমার শ্বশুর কুলের সম্বল কি কখন কুপুত্র হ'তে পারে? সংসার বড় তিক্ত অভিজ্ঞতা দিয়াছে—তাই রাগটা বেড়েছে, কিন্তু রাগ পাপ।"

আশু সেই দিন মাতাকে জিজ্ঞাসা করিল, "মা, ঠাকুরমা যদি এ বাড়ীতে থাকতেন, তবে কি বড়মা থাকতেন?"

সাবিত্রী বলিলেন, "বোধ হয়, থাকতেন—তোমাদের মায়াতেই জড়িয়ে থাকতেন। ওঁরা স্বামিস্ত্রী তোমাদের কি ভালই বেসেছেন!"

যাত্রার পূর্ব্বে আশু পিতাকে বলিয়া গেল—বাড়ীর সঙ্গে আর একটি ছোট বাড়ী করা হয়, ইহাই তাহার ইচ্ছা; সেটি এ বাড়ীর সংলগ্ন থাকিবে—কিন্তু তাহার সব ব্যবস্থা স্বতন্ত্র হইবে; ঠাকুরমা, দিদিমা, দিদি, বড়মা, মাসীমা কেহ যদি দয়া করিয়া আসেন, তাঁহাদিগের যেন কোন অসুবিধা না হয়

যোগেশচন্দ্র বলিলেন, তাহাই হইবে।

আশু বলিল, "আমি ফিরে আসবার আগেই যেন বাড়ী হয়।"

আশু ইংলণ্ডে চলিয়া গেল।

দশ

সৌদামিনী জয়ন্তীকে বলিলেন, "অনেক দিন ত সংসার ফেলে থাকতে হ'ল; বলছিলে, বড় মেয়ে শ্বশুর-বাড়ী যাবে—এই বার ত তোমাকে যেতে হবে। ছেলের বিয়ের কি করা যাবে, স্থির ক'রে যাও।"

জয়ন্তী বলিলেন, "তোমার ঠাকুরপোকে এক বার জিজ্ঞাসা করবে না?"

যোগেশচন্দ্রকে ডাকিয়া পাঠান হইল। তিনি আসিলে সৌদামিনী তাঁহাকে বলিলেন, "ছ' মাস পরেই ত আশু ফিরবে: এই বার আমি ছেলের বিয়ে দেব।"

যোগেশচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "ছেলেকে জিজ্ঞাসা করেছেন?"

"ছেলেকে আবার কি জিজ্ঞাসা করব? তোমাদের সঙ্গে ঐ জন্য কোন বিষয়ে কোন কথা বল্‌তে প্রবৃত্তি হয় না—সবই যেন সৃষ্টিছাড়া ব্যবস্থা! ছেলের অনুমতি নিতে হবে—ছেলের বাপের অনুমতি নিতে হবে—ও সব আমার ধাতে সয় না।"

যোগেশচন্দ্র হাসিয়া বলিলেন, "তবে আমাকে ত কিছু করতে হবে না?"

সৌদামিনী বলিলেন, "না।"

"খরচের টাকাও দিতে হবে না?"

"ঐ টাকাই চিনেছ, আর বুঝেছ। তোমাদের ইহকালও নাই, পরকালও নাই; আছে কেবল টাকা! তা' তুমি মনেও ক'র না, ছেলের বিয়েতে তোমার কাছে পয়সার জন্য হাত পাততে হবে। ছেলের বিয়ে দিতে পারি, সে ক্ষমতা আমার আছে।"

যোগেশচন্দ্র হাসিতে লাগিলেন, বলিলেন, "আপনার খা'র 'বৌপরিচয়ের' বালাও দিতে হবে না ত?"

সৌদামিনী বলিলেন, "না। বালা নিয়েই ত আমাদের পিসী ভাইঝীতে বিবাদ। আমি স্থির করেছিলাম, আমিই বালা দিব। কিন্তু জানলাম, আশু বিলাত যাবার সময়েই পিসীমা তাঁ'র বালা পাঠিয়ে দিয়েচেন—আশু যদি অজাত বিয়ে করে না আসে, তবে বৌকে দিতে হবে। পিসীমা আমাদের সকলের পূজ্য, তাই আমি—সুবোধ ও সুশীল বলে—তাঁ'কেই সে অধিকার দিলাম; স্থির করলাম, আমার যে মুক্তার ন'-নর আছে তাই দেব। জিনিষ দু'টাই সেকেলে—তোমরা পরে এখনকার পসন্দমত করিয়ে নিও।"

"এ সময় আবার আমাকে কেন?"

"তোমাকে নয় গো—তোমাকে নয়—সাবিত্রীকে বল্‌ছি।"

"এ বিষয়ে আমার একটা কথা আছে; পরে বলব।"

"তবেই হয়েছে! জয়ন্তী যে চলে যাবে।"

যোগেশচন্দ্র তাঁহার বক্তব্য সাবিত্রীর উপস্থিতিতে বলিতে ইতস্ততঃ করিতেছিলেন—পাছে স্মৃতি তাঁহাকে বেদনা দেয়। কিন্তু সৌদামিনীর কথার পরে তাঁহাকে তাহা বলিতেই হইল। তিনি বলিলেন, সাবিত্রী যে দিন বলিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের সুষমা দিদি লীলার সহিত পুত্রের বিবাহ দিতে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন, সে বিবাহ হইলে হয়ত ঘটনার স্রোতঃ অন্য পথে প্রবাহিত হইত, সেই দিন হইতে তাঁহার মনে হইতেছে, প্রায় তিন বৎসর পূর্ব্বে তিনি যখন একটি মোকর্দ্দমার জন্য দিল্লীতে গিয়াছিলেন, তখন তথায় তাঁহার সতীর্থ বৃন্দাবনচন্দ্রের সহিত বহু দিন পরে তাঁহার সাক্ষাৎ হইলে তাঁহার বিশেষ আগ্রহে যোগেশচন্দ্র তাঁহার গৃহে গিয়াছিলেন এবং তাঁহার একটি কন্যাকে দেখিয়া তাহার প্রশংসা করিলে বৃন্দাবনচন্দ্র বলিয়াছিলেন—"তোমাকে বলতে সাহস হয় না—যদি আপত্তি না থাকে বৌ কর না কেন?" তিনি বলিলেন, "কলেজে বৃন্দাবন আমাদের মধ্যে সেরা ছেলে ছিল—আমাকে অনেক সময় পড়ায় সাহায্য করত। এখন ভারত সরকারের হিসাব বিভাগে চাকরী করে; বাড়ীতেও অনেক পোষ্য—নিজেরও অনেকগুলি ছেলেমেয়ে; কাযেই টাকা রাখতে পারে নি।"

জয়ন্তী বলিলেন, "প্রায় তিন বৎসরের কথা—কন্যাদায়গ্রস্ত মানুষ, তিনি কি এতদিন চুপ ক'রে ব'সে আছেন?"

"বার দুই আমাকে পত্র লিখেছিলেন—আমি 'ছেলে বিলাতে যাবে' আর 'বিলাতে গেছে' ব'লে আর সে কথা উত্থাপন করতে দিই নি।"

"যদি মেয়েটি ভাল হয়, তবে সংবাদ নিলে হয়।"

"তা' হ'লে আমাকেই একবার দিল্লী যেতে হয়।"

সৌদামিনী বলিলেন, "তা'ই না হয় কর—কখনও ত কুটাটি ভেঙ্গে সাংসারের কোন উপকার কর না!"

যোগেশচন্দ্র বলিলেন, "আমি গিয়ে যদি দেখি, সে মেয়ের বিয়ে হয় নি, তবে ত আপনারা এক বার দেখবেন।"

"নিশ্চয়। তোমার ওপর যে নির্ভর করতে পারি না—সে কথা আমি স্পষ্ট ক'রেই বলব।"

"তবে কি আমি যদি দিল্লী হ'তে তার করি, তা' হ'লে আপনারা যেতে পারবেন?"

"সে কি ক'রে হবে? জয়ন্তী চলে যাচ্ছে। আমার স্পষ্ট কথা—দিল্লী যদি যাই, তবে মথুরা বৃন্দাবন না হয়ে,

আর ফিরবার পথে মা'কে প্রণাম না ক'রে আর কাশীতে গঙ্গাস্নান না ক'রে—বিশ্বনাথ অন্নপূর্ণা দর্শন না ক'রে আসতে পারব না। এ দিকে আবার আমি ছেলের কাছে সত্যবদ্ধ, তা'র মা'র ভার—সে না ফেরা অবধি—আমার; তা'কে একা ফেলে আমার যাওয়া হয় না।"

"তা' হ'লে কি করা যাবে?"

"একেই বলে—'গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল।' তুমি যাও—দেখ, সে মেয়ের বিয়ে হ'য়ে গেছে কি না; তাঁ'রাই বা কি বলেন। তা'র পরে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা। এখনও ত আশুর ফিরতে দু'মাস বিলম্ব আছে।"

জয়ন্তী পূর্ব্বেই স্বামীকে পত্র লিখিয়াছিলেন। তিনি আসিয়া স্ত্রীকে লইয়া যাইলেন।

যোগেশচন্দ্র দিল্লী যাত্রার আয়োজন করিলেন।

এগার

যোগেশচন্দ্র বিষণ্ণভাবেই দিল্লী হইতে ফিরিয়া আসিলেন।

সৌদামিনী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হ'ল?

যোগেশচন্দ্র বলিলেন, "বৃন্দাবন আমার কাছে কোন আশা না পেয়ে—"

তিনি কথা শেষ করিবার পূর্ব্বেই সৌদামিনী সাবিত্রীকে বলিলেন, "আমরা ত আগেই বলাবলি করেছি, তারা কি নিশ্চিন্ত থাকতে পারে?"

যোগেশচন্দ্র বলিলেন, "তা'র এক শালা কাশী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক। তিনি একটি সম্বন্ধ করেছেন, ছেলেটি সেখানেই পড়ে। কথা অনেকটা এগিয়ে গেছে পরের সপ্তাহে বৃন্দাবন মেয়েকে মামার বাড়ী নিয়ে যাবে।"

সৌদামিনী সোল্লাসে বলিলেন, "চমৎকার! বিয়ে, বোধ হয়, ঐ মেয়ের সঙ্গেই হবে।"

যোগেশচন্দ্র ও সাবিত্রী কেহই সৌদামিনীর কথার মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিলেন না।

সৌদামিনী যোগেশচন্দ্রকে বলিলেন, "ছুরী যত ধারালই কেন হ'ক না, শাণ দিতে দিতে তা'র ইস্পাত ক্ষয়ে যেমন লোহা বা'র হয়, তোমার বুদ্ধিও তেমনই শাণ দিতে দিতে ভোঁতা হয়েছে।"

যোগেশচন্দ্র বলিলেন, "আমার অপরাধ?"

সৌদামিনী বলিলেন, "কাশীতে মা আছেন, সাবিত্রীর মা আছেন—পিসীমা আছেন। তাঁ'দের অনুমতি ছাড়া ত বিয়ে হবেই না।"

"আপনারা দেখবেন না?"

"নিশ্চয় দেখব।"

"এই যে আপনি সে দিন বললেন, ছেলের কাছে সত্যবদ্ধ আছেন, যেতে পারবেন না?"

"আমি ত বলেছি, সাবিত্রীকে ছেড়ে যাব না। তাকে সঙ্গে নিয়ে যাব না, এমন কথা কি বলেছি? সাত দিনে সাবিত্রী যেটুকু সবল হবে, তখন ওকে আমি কাশী নিয়ে যেতে পারব। সেখানেও সব এর জন্য কত ব্যস্ত হয়ে আছেন।"

"এ যে একেবারে আইনের ফাঁকি!"

সৌদামিনী হাসিয়া বলিলেন, "আমি কত বড় ব্যারিষ্টারের বৌদিদি; আমার দেবর ত আইনের ফাঁকিই জপমালা করেছে; আর সেই জন্য ফাঁকি পড়ছে। তুমি কি ব'লে এলে?"

"আমি ত কোন শেষ কথা বলতে পারি নি।"

"আজই টেলিগ্রাফ ক'র দাও, আমরা সব কাশীতে মেয়ে দেখব। সেখানে তোমার মা, শাশুড়ী, পিসশাশুড়ী সব আছেন; আর বাড়ীর বড় বৌ স্বয়ং সশরীরে তার মা'কে সঙ্গে নিয়ে যাবেন।"

তাহার পরে তিনি বলিলেন, "জয়ন্তীকে ছেড়ে যাওয়া চলবে না; তাকে আসতে লিখে দেব। আর আমার ভাজ অনেক দিন আমাকে বলেছে—কাশী যা'বে; তা'কেও সঙ্গে নেব।"

তিনি যোগেশচন্দ্রকে বলিলেন, "জানিয়ে দাও, মেয়ে পসন্দ হ'লে আমাদের আর কোন কথা নাই।

যোগেশচন্দ্র বলিলেন, "ছেলেকে জিজ্ঞাসা করেছেন কি?"

"ছেলেকে আবার কি জিজ্ঞাসা করব? মা বিয়ে দেবে—আমার ছেলে তেমন নয় যে, তা'তে আপত্তি করবে।"

সৌদামিনীর ছেলের সম্বন্ধে মতে যোগেশচন্দ্র বিশেষ আনন্দানুভবই করিলেন; কিন্তু যেন তাঁহাকে রাগাইবার জন্যই বলিলেন, "তাদেরও ত ছেলে পসন্দ হওয়া চাই।"

সৌদামিনী বলিলেন, "কি? আমার ছেলেকে কার অপসন্দ হ'তে পারে? তোমার বৃন্দাবনবাবুর মেয়ে যদি অনেক তপস্যা ক'রে থাকে, তবেই অমন বর পাবে। লোক বলে, বর আর ঘর। ঘরের জন্য ত ভাবনা নাই—ঐ যে নূতন বাড়ী হচ্ছে তোমাকে ওখানে তাড়িয়ে দিয়ে আমরা ছেলেকে এই বাড়ী দেব। কথায় বলে, কন্যা রূপ, মা অর্থ, পিতা বিদ্যা, বান্ধবগণ কুল চাহে—আমার ছেলের সে সকলের কোনটিরই অভাব নাই; আর ইতর লোক মিষ্টান্ন চায়—মিষ্টান্ন তোমাকে দেওয়া যাবে।"

"আর ছেলের জ্যেঠাইমা'র মিষ্ট কথা?"

"তা'র যে ধার তাতে, যদি প্রয়োজন হয়, বেহাইয়ের কান কাটা যাবে।"

বার

বড় দুঃখে কাশীতে সকলের সহিত সাবিত্রীর সাক্ষাৎ হইল। যোগেশচন্দ্রের মাতা পিসীমা'র সহিত এক বাড়ীতেই থাকিতেন। সৌদামিনীর বুদ্ধিতেই সকলকে শোক সংযত করিতে হইল। তিনি সকলকে বলিলেন, সাবিত্রীকে অনেক চেষ্টায় বাঁচাইতে হইয়াছে, তাঁহার 'নূতন শরীর'—তিনি এখনও সম্পূর্ণ সুস্থ ও সবল হইতে পারেন নাই—তবুও যে তিনি তাঁহাকে কাশীতে আনিয়াছেন, সে কেবল সকলের সহিত সাক্ষাৎ হইবে বলিয়া, আর পিসীমা জয়ন্তীকে যাহা বলিয়াছেন, তাহা স্মরণ করিয়া—আশুর বিবাহ না দিলে সাবিত্রী কি লইয়া তাঁহার দারুণ শোকে সান্ত্বনা লাভ করিতে পারিবেন? তিনি যেন সকলের শোকে কাতর হইয়া না পড়েন। তাহাতে স্বাস্থ্যভঙ্গ হইবে।

যোগেশচন্দ্র আপনার ব্যবহার স্মরণ করিয়া কুণ্ঠিত হইয়া থাকিলেন। কিন্তু তিনি তাঁহার মাতার, শাশুড়ীর ও পিসীমা'র ব্যবহারে কোনরূপ অভিমান লক্ষ্য করিতে পারিলেন না। স্নেহ স্বভাবতঃই নিম্নগামী এবং সে স্নেহাস্পদের সকল ত্রুটির কালিমা আপনি ধৌত করিয়া তাহাকে মালিণ্যমুক্ত করে—আবার স্নেহ যখন শোকের সহিত সংযুক্ত হয়, তখন তাহার পাবনীগুণ আরও বর্দ্ধিত হয়। তিনি সৌদামিনীর পরামর্শে বৃন্দাবনচন্দ্রের কন্যাটিকে সকলকে দেখাইবার ব্যবস্থা করিলেন। দশাশ্বমেধের ঘাটে তাহাকে দেখা হইল; সকলেই তাহাকে গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হইলেন।

গৃহে ফিরিয়া সৌদামিনী বলিলেন, তাঁহাদিগের শাশুড়ীর নাম যখন হেমপ্রভা, তখন আশুর পত্নীর নাম হৈমবতী থাকিলে চলিবে না। নাম কি হইবে?

পিসীমা বলিলেন, "বাছা তোমরা ত এখন সবই মান—যে নাম বদলাবে?"

সৌদামিনী বলিলেন, "না মেনে কি ভাল হচ্ছে?"

তিনি পিসীমাকে বলিলেন, "দুর্গার নাম—
উমা কাত্যায়নী গৌরী কালী হৈমবতীশ্বরী
শিবা ভবানী রুদ্রাণী সর্ব্বাণী সর্ব্বমঙ্গলা
অপর্ণা পার্ব্বতী দুর্গা মৃড়ানী চণ্ডিকাম্বিকা—
এখন আপনি যেটি হয় বেছে নি'ন।"

পিসীমা যখন ভাবিতেছিলেন, তখন সৌদামিনী বলিলেন, "বৌ এসে আমাদের সর্ব্ব বিষয়ে মঙ্গল করুক—ওর নাম থাক—সর্ব্বমঙ্গলা।"

যে দিন 'মেয়ে দেখা' হইল, সেই দিনই সৌদামিনী সংবাদ পাঠাইলেন, মেয়ে তাহাদিগের পসন্দ।

বৃন্দাবনচন্দ্রের শ্যালকের এই সম্বন্ধে বিশেষ আগ্রহ ছিল না। তিনি বৃন্দাবনচন্দ্রকে ঈশপের উপকথার ধাতুপাত্র ও মৃৎপাত্রের গল্প স্মরণ করাইয়া বলিয়াছিলেন—যোগেশচন্দ্র একে অত্যন্ত ধনী, তাহাতে আবার য়ুরোপীয় রীতির ভক্ত, তাঁহার পুত্রের সহিত হৈমবতীর বিবাহ দিলে অসম কায হইবে—মধ্যবিত্তের পক্ষে মধ্যবিত্তের ঘরে কায করাই ভাল। তাহাতে কন্যাকে দেখিতে যাইলে পিতাকে দ্বারবানে ঘরে অপেক্ষা করিতে হয় না।

অপরাহ্নে বৃন্দাবনচন্দ্র শ্যালককে সঙ্গে লইয়া যোগেশচন্দ্রের নিকটে আসিলেন। তখন বৃন্দাবনচন্দ্রের শ্যালক বলিলেন, "আমার ভয় হয়। আমরা গরিব গৃহস্থ আপনাদের সঙ্গে কায করতে সাহসে কুলায় না।"

সৌদামিনী প্রভৃতি পার্শ্বস্থ কক্ষেই ছিলেন। তিনি যোগেশচন্দ্রকে তথায় ডাকাইয়া বলিলেন, "ঠাকুরপো, ব'লে দাও—ছেলের বাপই বড় মানুষ; তা'র মা গরিব গৃহস্থের মেয়ে, আর আমি তা'র বড় মা গরিবের মেয়ে—গরিবের স্ত্রী—গরিবের বৌ। যারা খেটে খায়, তারা আবার বড় মানুষ কে? বল, আমি অভয় দিচ্ছি, বড় মানুষী আমার ঘরে চলবে না।"

কথা সৌদামিনী দেবরকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন বটে, কিন্তু যে স্বরে বলিলেন, তাহাতে তাহা পার্শ্বের ঘরে খুবই স্পষ্ট শুনা গেল।

তখন বৃন্দাবনচন্দ্রের শ্যালক জিজ্ঞাসা করিলেন, "ছেলে ত এখন বিলাতে। তা'র মত না জেনে কি আপনারা পাকা কথা দেবেন?"

সৌদামিনী বলিলেন, "আমি ত জানতাম, বড় ব্যারিষ্টাররা সংসারের কাযে বোকা হয়—এখন দেখছি, অধ্যাপক পণ্ডিতদেরও তা'-ই! আমি এমন ছেলের মা নাই যে, ছেলে আমার মতের ওপর কোন মত প্রকাশ করবে। কথা দিচ্ছি আমি, এ বাড়ীর বড় বৌ। এ ব্যারিষ্টারের কথা নয় যে, নড়চড় হবে। আমার কথার ওপর কথা বলবার কেবল এক জন এ পরিবারে আছেন—আমার শাশুড়ী। তিনি আমার কথায় কখন অমত করেন নি—করবেনও না। পাকা কথা! আমি কাশীতে—আমার শাশুড়ীর সামনে যে কথা দিতে পারি—সে কথা পাকা দেখার বেশী হবে।"

যোগেশচন্দ্রের মাতা জয়ন্তীকে বলিলেন, "শুনছ, বড় বৌমা'র কথা?"

জয়ন্তী বলিলেন, "বাড়ীর বড় বৌ কি না। সৌদামিনী আশুকে আর লীলাকে যে কত ভালবেসেছে, তা' আমরাও বুঝতে পারি নি। সে স্নেহ প্রকাশ হ'তে না পেরে গভীরও হয়েছে। এখন সব স্নেহই আশুর ওপর পড়েছে।"

সৌদামিনী বলিলেন, "ঠাকুরপো ওঁর বন্ধু ব'লে কতকটা কথা দিয়েছিলেন—সেই জন্যই আমার এত আগ্রহ। তবে তাঁদের যদি মত না থাকে, সে স্বতন্ত্র কথা।"

বৃন্দাবনচন্দ্র বলিলেন, "সে কি কথা? আমাদের অমত!"

কথা হইল,আশু ফিরিলেই বিবাহের দিন স্থির হইবে।

তের

তাহার পরদিন সৌদামিনী জয়ন্তীকে বলিলেন, "এ বার ঠাকুরপো খুব জব্দ হয়েছেন। এতদিন হাইকোর্ট ছাড়া! এই বার সব যাবার উদ্যোগ করা যাক।"

জয়ন্তী বলিলেন, "বিয়ের পরে তুমি ছেলে-বৌ নিয়ে কাশীতে এসে সকলকে দেখিয়ে যেয়ো।"

সৌদামিনী বলিলেন, "তার মানে?"

"আমি তখন আর আসব না।"

"সে কি? বিয়ে কাশীতেই হবে যে।"

জয়ন্তী বিস্মিতভাবে তাঁহার দিকে চাহিলে সৌদামিনী বলিলেন, "জান ত, নারায়ণ সাক্ষী না ক'রে আমাদের বিয়ে হয় না। যাঁরা আমাদের জীবন্ত দেবতা তাঁদের সাক্ষী না ক'রে আমি ছেলের বিয়ে দেব না। কলিকাতায় বিয়ে হ'লেই ঠাকুরপোর যত বন্ধুবান্ধব সকলকে ব'লতে হবে। সে আমোদ করবার মত মনের অবস্থা আমাদের নাই—সাবিত্রীরও নাই। আর সেই দলের যারা মেয়ে নিয়ে মনে ক'রেছে—আমার ঘরে পাঠাবে, তারা যে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলবে, সে-ও আমি চাই না।"

ফিরিবার পূর্ব্বদিন—গঙ্গাস্নানান্তে বিশ্বনাথ ও অন্নপূর্ণা দর্শন করিয়া আসিয়া সৌদামিনী সাবিত্রীকে বলিলেন, "এ ক'দিন ত হৈ-হৈ ক'রে কেটে গেল; এখন চল, মা'র সঙ্গে ঘর-সংসারের কথা ব'লে যাই।"

সৌদামিনী সাবিত্রীকে ও জয়ন্তীকে লইয়া তাঁহার শাশুড়ীর ঘরে যাইয়া বলিলেন, "মা, কে কি দেওয়া যাবে, বলুন।"

শাশুড়ী বলিলেন, "তুমি কি বল?"

"আপনি আপনার হার দিন। আমি ভেবেছিলাম, যে বালা সেকেলে অমৃতি পাকের ব'লে আপনি ভেঙ্গে করিয়ে দিয়েছিলেন, তাই দেব। কিন্তু পিসীমা আগেই বালা পাঠিয়ে দিয়েছেন। তাই মনে করছি, মুক্তার মালাই দেব। আপনি কি বলেন?"

"তা'ই হ'ক।"

"ও বালাও ত পরে বৌ পাবে। সবই ত ওর।"

শাশুড়ী জিজ্ঞাসা করিলেন,"যোগেশ কি কি দেবে?"

সৌদামিনী বলিলেন, "কিচ্ছু না। আমি বলেছি, ছেলের বিয়ের আমি ঠাকুরপোর কাছে এক কাণাকড়িও নেব না।"

শাশুড়ী বলিলেন, "কেন?"

"যা'রা জীবনে কেবল টাকাই বোঝে—তাদের টাকা আমি শুভকাযে নেব না। ছেলের বিয়ে আমিই দেব। আমি 'অসৈরণ' সহ্য করতে পারি না। আমার ঠাকুরমা আমার নাম রেখেছিলেন—সৌদামিনী; সকলকে জ্বালিয়েই গেলাম, নিজেও জ্বললাম।"

"সে-কি মা? আমার ঘর ত তুমি আলোই ক'রে-ছিলে। আমার কপাল পোড়া—তা' সহ্য হ'ল না—" তিনি অশ্রুপাত করিলেন।

চৌদ্দ

যথাসময়ে আশু ফিরিয়া আসিল। সৌদামিনী পত্র লিখিয়া জয়ন্তীকে আনাইয়া রাখিয়াছিলেন। আশুর আগমনের পরদিন তিনি তাহাকে বলিলেন, "আশু, তোর কাছে সত্যবদ্ধ ছিলাম, তুই না ফেরা পর্য্যন্ত তোর মা'র ভার আমার। এই বার তোর ভার তুই নে।"

আশু বলিল, "বড়মা, রসিদ দিতে হবে কি? কিন্তু আমার কি কেবল এক মা? আপনার ভার?"

"আমার ভার আমিই বইতে পারি।"

"হয় ত পারেন; কিন্তু আপনাকে—আমি বর্ত্তমানে—সে ভার কে বইতে দিচ্ছে?"

"না, বাবা। তোর বিয়েটা হয়ে গেলেই আমার একেবারে ছুটী। এখন বিয়ের দিনটা স্থির ক'রে ফেলতে হবে।"

জয়ন্তী বলিলেন, "আশু, তোমার বড় মা আমাদের সব কাশীতে নিয়ে গিয়ে সেখানে মাদেরও মেয়ে দেখিয়ে তোমার বিবাহ স্থির ক'রে এসেছেন।"

আশু সৌদামিনীকে বলিল, "কেন, বড় মা?"

সৌদামিনী বলিলেন, "কেন কি? আমার কি কোন ইচ্ছাই হ'তে পারে না? আমি ছেলের বিয়ে দিব—সেইজন্ত।"

আশু বলিল, "কিন্তু, বড় মা—"

বাধা দিয়া সৌদামিনী বলিলেন, "কিন্তু কি? তোকে জিজ্ঞাসা ক'রে কি আমাকে কায করতে হবে?"

"কিন্তু, বড় মা, এ বিষয়ে আমার একটা কথা আছে—একটা সর্ত্ত আছে যে।"

"আছে বুঝি? তবে থাক"—বলিয়া সৌদামিনী, যেন কি কাযে, সে ঘর হইতে চলিয়া যাইলেন।

তাঁহার প্রত্যাবর্ত্তনে বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া যোগেশ-চন্দ্র জয়ন্তীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৌদিদি কোথায় গেলেন?"

সেই সময় ব্যস্ত হইয়া সাবিত্রী আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হয়েছে?"

যোগেশচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন?"

"দারোয়ান এসে বলল, দিদি ট্যাক্সী ডাকিয়ে চলে গেলেন!"

"কি সর্ব্বনাশ!"—বলিয়া যোগেশচন্দ্র যাহা ঘটিয়া-ছিল, তাহা বলিলেন।

সাবিত্রীর মুখ যেন রক্তশূন্য আর তাঁহার চক্ষু অশ্রু-সজল হইল। তিনি আশুকে বলিলেন, "কেন ও কথা বললে, আশু?"

আশু আপনার অপরাধ কি—ত্রুটি কোথায় তাহা বুঝিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেন, মা?"

"দিদি স্বভাবতঃই প্রতিবাদে অসহিষ্ণু। তিনি তোমাদের ভাইবোনকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন—এখন তুমি তাঁ'র সব স্নেহ পেয়েছ। তাই তিনি মনে করেন, তুমি এখনও তাঁর ছোট্ট ছেলেটি আছ—তিনি যা' বলবেন, তোমাকে তাই করতে হ'বে। তাঁর কথা ছাড়া তোমার যে কোন কথা থাকতে পারে, তা' তিনি মনে করতে পারেন না।"

যোগেশচন্দ্র বলিলেন, "তুমি যখন ছোট ছিলে তখন দাদা বলতেন, 'বড় বৌর আদরে ছেলেটা দেখছি আছুরে হ'য়ে উঠছে'।"

আশু বলিল, "আমি তাঁকে এখনই নিয়ে আসছি।

সে গাড়ী বাহির করিতে বলিল এবং গাড়ী বাহিরেই আছে শুনিয়া জয়ন্তীকে বলিল, "মাসীমা আমার সঙ্গে চলুন।"

উত্তরে সৌদামিনীর ভ্রাতার গৃহে উপনীত হইলে তাঁহার ভ্রাতৃজায়া বলিলেন, "ব্যাপার কি? ঠাকুরঝি হঠাৎ এলেন, মুখ কালবৈশাখীর আকাশের মত—বললেন আজই কাশী চ'লে যাবেন, ক'লকাতায় আর থাকবেন না।"

জয়ন্তী বলিলেন, "স্নেহের অভিমান—মায়ে ছেলেতে ঝগড়া। চলুন—তাঁর কাছে।"

সৌদামিনীর কাছে যাইয়া আশু জিজ্ঞাসা করিল, "বড় মা, কি হ'ল?"

সৌদামিনী গম্ভীরভাবে বলিলেন, "কিছুই না।"

"আপনি হঠাৎ চলে এলেন কেন?"

"তোমার ভার তোমাকে বুঝিয়ে দিয়েছি—এ বার আমি কাশী যাব। সেখানেই আমার স্থান।"

"আমার অপরাধ কি হয়েছে, বড় মা।"

"কিছুই না।"

"তবে আপনি রাগ করে চলে এলেন কেন?"

"এখানেই ত এতদিন ছিলাম। রাগ করব কার ওপর—রাগ করবার অধিকার কোথায়?"

"মা কাঁদছেন। আমি এসেছি। মা ছেলের ওপর রাগ করলে কি ছেলের মঙ্গল হয়? বড়মা, ঠাকুর মা যে বাড়ী থেকে চলে গেছেন, তাতে কি আমাদের ভাল হয়েছে?"

আশুর কথা সৌদামিনীর মনের যে স্থানে আঘাত দিল, সে স্থানটা স্বভাবতঃ কোমল ও দুর্ব্বল। তিনি বলিলেন, "আমি আশীর্ব্বাদ করছি, তোমার ভাল হ'ক। ভগবান তোমাদের ভালই করবেন। আমিই ভুল করেছি—ভগবান যাকে বন্ধনমুক্ত করেছেন, তার বন্ধনে বদ্ধ হবার চেষ্টা অন্যায়।"

আশু বলিল, "বড়মা, আমি আপনার ছেলে—আপনি বলেন, 'স্পষ্ট কথায় কষ্ট নাই'—তাই আজ বলছি, আপনি বন্ধনমুক্ত হ'তে পারেন নি; পারেন নি ব'লেই দিনরাত শুশ্রূষা ক'রে যাকে বাঁচিয়ে তুলেছেন—পারেন নি ব'লেই আপনার ছেলের বিয়ে দিয়ে মেয়ের শোক ভুলবার চেষ্টা করছেন। তবে ভুল আপনি করেছেন। বাবার ভুলে অভিমান ক'রে ঠাকুরমা আর আপনি যদি অধিকার ত্যাগ ক'রে না যেতেন তবে—আপনাদের কাছে থাকলে, বোধ হয়, লীলার জন্য আজ কাঁদতে হ'ত না। মার ভুলের প্রায়শ্চিত্ত আজ ছেলেকে করতে—"

আশুর গলাটা 'ধরিয়া' আসিল। সৌদামিনীর মনে হইল, তিনিই ভুল করিয়াছেন—এই ছেলে, ইহার উপর কি তিনি রাগ করিতে পারেন? তাঁহার ইচ্ছা হইতে লাগিল, আশুকে বক্ষে লইয়া তাহার অভিমান দূর করিয়া দেন। মনে যে স্থানটা বেদনায় টন্ টন্ করিতেছিল, তাহা হইতে যেন রক্ত বাহির হইয়া গেল।

সৌদামিনীর ভ্রাতৃজায়া বলিলেন, "ঠাকুরঝি, ছেলেকে কি কাঁদাতে আছে?"

আশু তাঁহাকে বলিল, "মামীমা, আপনি আমাদের সঙ্গে চলুন। মাসীমা বলেছেন, এ মায়ে ছেলেতে ঝগড়া। আপনি এর বিচার করবেন।"

আশু যখন বলিল, "চলুন, বড়মা"—তখন সৌদামিনী আর "না" বলিতে পারিলেন না। আশু তাঁহার ভ্রাতৃজায়াকে বলিল, "চলুন, মামীমা।"

বাড়ীতে যাইয়া আশু সাবিত্রীকে বলিল, "মা তুমি আর কেঁদ না—বড়মাকে ধ'রে এনেছি। তাঁকে আমার কথা শুনতেই হবে।"

সে সৌদামিনীকে বলিল, "বড়মা, আপনার কথা—আমি ছেলে আমার শিরোধার্য্য। কিন্তু আমার যা' ইচ্ছা—আমার যা বিবাহের সর্ত্ত—আমার যা দাবী—আবদার তা আপনাকে মানতেই হবে।"

সে কি বলে জানিবার জন্য সকলে উৎকর্ণ হইয়া রহিলেন—সাবিত্রী শঙ্কিতা হইলেন।

আশু বলিল, "বড়মা, আমার সর্ত্ত—আপনি আপনার বাড়ীতে থেকে—বাড়ীর বড়বৌ'র অধিকারে আপনার বৌকে শিক্ষা দেবেন। আপনি সম্মত হ'লে আমি বিয়ে করব; নইলে জীবনে কখন বিয়ে করব না।"

সকলেই যেন স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন।

সেই স্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া সৌদামিনী বলিলেন, "আর মায়ার জড়াসনে, বাবা।"

কালবৈশাখীর মেঘ তখন স্নিগ্ধ বর্ষণে আপনাকে নিঃশেষ করিয়াছে।

আশু বলিল, "সে হবে না, বড়মা। আমি আগে কিছুই জানতাম না; জেনে বাবাকে ঐ নতুন বাড়ী করতে ব'লে গিয়েছিলাম। যাতে আপনাদের কোন অসুবিধা না হয়, সে ব্যবস্থা আপনি ক'রে নেবেন। ঠাকুরমা চলে গিয়াছিলেন। আমাদের সে অপরাধ তিনি যে ক্ষমা করেছেন, তা তিনি না এলে আমি মনে করতে পারব না। দিদি যা দিয়েছেন, তার ফল তিনি দেখেন নি—আমি তাঁকে কাশী ছেড়ে এসে থাকতে বলব না, কিন্তু এক বার তাঁ'কে পায়ের ধূলা দিয়ে এ বাড়ী পবিত্র করতেই হবে। দিদিমাকে আমি দিদিকে ছেড়ে থাকতে বলব না; কিন্তু তিনি মধ্যে মধ্যে কেন আসবেন না? এ সব ব্যবস্থা আপনাকেই করতে হ'বে। এ সব ব্যবস্থা আপনি করবেন—স্বীকার হবেন, তবে আমি বিয়ে করব—এ আমার ধনুর্ভঙ্গ পণ।"

সৌদামিনী হাসিয়া যোগেশচন্দ্রকে বলিলেন, "শুনছ, ছেলের কথা। বাড়ীতে এক সঙ্গে পিঁজরাপোল আর চিড়িয়াখানা করবে।"

যোগেশচন্দ্র বলিলেন, "চিড়িয়াখানায় কি বাঘের ঘর থাকবে?"

"আমার জন্ত তাই ত চাই।"

"সে আপনি আপনার ছেলের সঙ্গে বুঝুন; এখন ওরই কথায় কায হবে।"

"আর আমি ওকে পরামর্শ দেব?"

"তাই ত দেখছি।"

সৌদামিনী সাবিত্রীকে বলিলেন, "আজ আমার কেবল তোমার ভাশুরের কথা মনে পড়ছে—এই ছেলে দেখে যেতে পেলেন না! নিজে এদের কত ভালবাসতেন, তা জান; কিন্তু ছেলেকে একটু বেশী আদর দিলেই আমাকে সাবধান করতেন—বেয়াড়া হ'য়ে না যায়।"

সেই কথা শুনিয়া যোগেশচন্দ্র বলিলেন, "দাদা বেঁচে থাকলে বোধ হয় এই যে এতদিন দুঃস্বপ্নের মত গেল এর দুর্ভোগ ভুগতে হ'ত না।"

তাহার পরে তিনি সাবিত্রীকে বলিলেন, "বৌদিদি ত দিন স্থির ক'রে ফেললেন। এখন গহনা প্রভৃতির কি ব্যবস্থা ক'রতে হবে?"

সাবিত্রী বলিলেন,"দিদি যখন বলেছেন, তিনি তোমার কাছ থেকে এক পয়সাও বিয়ের জন্ত নেবেন না, তখন আমি ও'কে আর সে বিষয়ে কোন কথা বলতে সাহস করি না। উনি বলেন ও'র সিদ্ধান্তের 'না দলিল, না উকীল, না আপীল।' তোমার সাহস থাকে তুমি বল।"

যোগেশচন্দ্র হাসিয়া বলিলেন, "আমরা তবে নিমন্ত্রণ খাব?"

* * *

কাশীতে আশুর বিবাহ হইয়া গেল।

আশুর আবদারে আর সৌদামিনীর পরামর্শে সকলকেই এক বার কলিকাতায় আসিতে হইল। সৌদামিনী তাঁহাদিগের আগমনের পূর্ব্বদিন আসিয়া সব ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছিলেন। তিনি জয়ন্তীকে সঙ্গে আনিয়াছিলেন এবং শিশিরকে পত্র লিখাইয়া পূর্ব্বেই তাঁহার পুত্রকন্যাজামাতা সকলকেই আনাইয়া রাখিয়াছিলেন। তিনি পৌঁছিবার পূর্ব্বে তাঁহার ভ্রাতৃজায়ার উপর সকলের জন্ত ব্যবস্থার ভার ছিল। তিনি জয়ন্তীর পুত্রকন্যা প্রভৃতিকে—সেই "চাঁদের হাট" দেখিয়া—বলিয়াছিলেন, "এ নইলে সংসার?"

কাশী হইতে সকলে আসিলে সৌদামিনীই তাঁহাদিগকে যান হইতে নামাইয়া লইলেন—তাহার পরে বধূকে বলিলেন—"মা, তোমার ভাগ্যে সব কল্যাণ হ'ক—আমার দেওয়া সর্ব্বমঙ্গলা নাম সার্থক হ'ক। এই যে তোমার দিদিদের দেখছ এঁদের করবে ভক্তি; মামীমা, মাসীমা, মেসোমশায় সকলকে করবে আদর যত্ন; আত্মীয় কুটুম্বকে স্বজন ভাববে, তোমার শাশুড়ীর মেয়ের শূন্যস্থান পূর্ণ করবে; আর"—তিনি যোগেশচন্দ্রকে দেখাইয়া বলিলেন, "শ্বশুরটিকে, অজ্ঞান লোক যেমন টাকশালকে প্রণাম করে তেমনি প্রণাম করবে।"

যোগেশচন্দ্র বলিলেন, "আর আপনাকে?"

সৌদামিনী বলিলেন, "আর এই যে আমাকে দেখছ, আমি বাড়ীর বড় বৌ—আশুর বড় মা—আমাকে করবে ভয়।"

আশু বলিল, "কিন্তু বড় মা, আমি ত আপনাকে ভয় করি না।"

সৌদামিনী আশুর মুখচুম্বন করিয়া বলিলেন, "তুই কেন ভয় করবি? আমিই যে তোকে ভয় করি—পাছে বলিস জল দিবি না।"

যোগেশচন্দ্র বলিলেন, "ভয় করবার একচেটে ভার আমিই নিলাম।"

সৌদামিনী তখন বধূর মুখচুম্বন করিয়া বলিলেন, "ভালই হ'ল, মা। তোমাকে আর ভয় করতে হবে না। তবে একটা কথা বলে রাখি, আমার শরীরে রাগটা বড় বেশী, আবার জানইত 'বুড়া বয়সের ধর্ম্ম অল্পে হয় রোষ'। বিশ্বনাথ অন্নপূর্ণার কাছে প্রার্থনা জানিয়ে এসেছি, তাঁরা যেন আমাকে তা থেকে মুক্ত করেন। তবুও যদি কখনও রাগ করি, তুমি তাতে দুঃখ ক'র না—মা যেমন মেয়ের দোষ ভুলে যায় তেমনই ভুলে যেও; ভেব, তুমি মা, আমি তোমার মেয়ে।"

শপথ

সনৎকুমার মিত্র

তুলিয়াছি বজ্রমুষ্টি হানিতে আঘাত,
তোমাদের টলমল স্বর্ণ সিংহাসনে;
তুলিয়াছি বজ্রমুষ্টি ভাঙিতে পৃথিবী,
গড়িতে নূতনরূপে স্বেদবিন্দু দানে।

দাঁড়ায়েছি ব্রত ল'য়ে সারিবদ্ধ হয়ে,
সবাকার সমমূল্য মানব সমাজে;
শ্রমের রজত মুদ্রা শক্রপুরী হতে,
আনি দিব জনতার কল্যাণের কাজে।

ব্রত আছে কণ্ঠ মাঝে বক্ষ মাঝে বল,
পেশীল বাহুতে তার দেব পরিচয়;
মুখ বুঁজে বহুকাল সহিয়াছি বহু,
আর কিছু নাহি দিব—কণা মাত্র নয়।

জেনে রাখ শুধুমাত্র ভাঙনের আশে,
আসি নাই—আসিয়াছি গড়িবার লাগি;
প্রাচীনের ধ্বংসপরে নূতনের ছবি,
করে যাব সৃষ্টি শুধু আমরণ জাগি।

কালচক্র তালে তালে করে অতিক্রম,
প্রাচীনের যুগ ছাড়ি নূতনের পানে;
চাহি মোরা ভরে দিতে শূন্য বক্ষগুলি,
আশার আলোকে আর নূতনের গানে।

ঈরাণের শিল্প ও সংস্কৃতি

শ্রীগুরুদাস সরকার

জোরোয়াস্ত্রীয় ধর্ম্মে বৈদিক দেবতা

জোরোয়াস্ত্রীয়দিগের দৃষ্টিতে বৈদিক দেবতাগণ পাপাশয় অভিমানে ভ্রষ্টাচারী সন্তান বলিয়া পরিগণিত, অপ্রধান হইলেও সক্রিয় ও অনিষ্ট কর্ম্মা। প্রতীতি হয় যে, প্রাচীন আর্য্যগণ, ভারতীয় ও ঈরাণীয় এই দুই ভাগে বিভক্ত ও বিচ্ছিন্ন হইবার পূর্ব্বে উপাস্যদিগকে অসুর ও দেব এই উভয় নামেই সমভাবে অভিহিত করিতেন। দেবাসুরের যুদ্ধ তখনও তাঁহাদিগের কল্পনার মধ্যে আসে নাই। বৈদিক দেবতা "নরাশংস" (অগ্নি), বায়ু, রুদ্র (শৌর্ব), বৈবান্‌হো (বৈবস্বত), ভগ প্রভৃতির উল্লেখ আবেস্তায় দৃষ্ট হয়। ইন্দ্র এবং নাসত্য ("নাওঙ-হৈথ্যা") নামে পরিচিত অশ্বিনীকুমারদ্বয় পারসীকদিগের দানবধর্ম্মী দেবতা (দিব্) গণেরই অন্তর্গত। ইন্দ্র এদিক দিয়া দানবেশ্বর বলিয়া পরিচিত হইলেও তাঁহার অপর একটি স্বরূপ "ভেরেথ্রঘ্ন" (বৃত্রঘ্ন) জোরোয়াস্ত্রীয় দেবগণের মধ্যেই স্থান পাইয়াছেন। ঋগ্বেদে অসুর শব্দ শুধু ইন্দ্র কেন সবিতা, বরুণ, ত্বষ্টা প্রভৃতি দেবগণের প্রতিও প্রযুক্ত হইয়াছেন, (২৫)। ইহাতে ঋগ্বেদীয় যুগের কতকাংশে 'দেব' ও "অসুর" এই দুই নামে যে পার্থক্য করা হইত না এই অনুমানই সমর্থিত হয়।

জরথুস্ত্রবাদে বৈদিক দেবতা 'মিত্র' ও বরুণ

প্রাচীন বৈদিক দেবতাদিগের মধ্যে "মিথ্র" (মিত্র) ঈরাণীয়দিগের উপাস্যরূপে অসঙ্কোচে গৃহীত হইয়াছিলেন। "মিথ্র"যে পূর্ব্বকালে প্রাচীন পারসীক-দিগের ধর্ম্মশাস্ত্রে, উচ্চতম দেবতা-গণের মধ্যে গণ্য হইতেন, তাহা "মিহির যাস্ত" নামক সুদীর্ঘ "যাস্ত" হইতেই অনুমিত হয়। পরবর্ত্তীকালে পারসীক ধর্ম্মে "মিথ্র" দেবতা অহুরমাজ্‌দা'র সহিত সমভাবেই সম্মানার্হ ও পূজার্হ বলিয়া বিবেচিত হইতেন (২৬)। আবার অহুরমাজ্‌দা স্বয়ংও আলোকের দেবতারূপে পরিগণিত হইতেন (২৭)।

জেন্দাবেস্তা গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, মিত্র সত্যবাদী এবং তিনি বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রের অধিপতি। তাঁহার সহস্র কর্ণ, দশ সহস্র চক্ষু, তিনি বলবান, অনিদ্র, চিরজাগরূক এবং পূর্ণজ্ঞান সমন্বিত (২৮)। মিত্র এক্ষণে খুর্‌সেদ্‌ নামে পরিচিত। "হ্বরে ক্ষএত" এই যুক্ত শব্দ হইতেই খুর্‌সেদ্‌ নামের উৎপত্তি হইয়াছে। ভবিষ্য পুরাণ মতে সূর্য্যের অন্যতম অনুচর "শ্রোষ"। এই নামের সহিত অবিচ্ছিন্ন যে শ্রোষ দেবতার পারসীকদিগের শাস্ত্রে উল্লেখ আছে, তিনি তাঁহাদিগের পবিত্র উপাসনা প্রণালীর মূর্ত্তিমান রূপ, সামান্য দেবদূত, স্বর্গদূত, বা কোনও উচ্চতর দেবতার অনুচরমাত্র নহেন (২৯)। মৃত্যুর পর বিচারের ভার যে, ইঁহার ও "রশ্নু" নামক দেবতার উপর ন্যস্ত আছে। জরথুস্ত্রবাদী ঈরাণীয়েরা এ-কথা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করিতেন।

আচার্য্য রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী মাজ্‌দা ও বৈদিক বরুণ অভিন্ন বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছেন (৩০)। অনেক স্থলেই তাঁহার চিরসহচর মিত্র দেবতার সহিত বরুণের

(২৫) রমেশচন্দ্র দত্ত, ঋগ্বেদ সংহিতা, পাদটীকা, পৃঃ ৫৩, ১৩৩।

(২৬) Bouquet, Comparative Religion (Pelican), p. 80.

(২৭) "The great God Ahuramazda was a God of Light" —A. U. Pope, Masterpieces of Persian Art, p. 3.

(২৮) মিহির যাস্ত।

(২৯) Hang's Essays on the Parsees, pp. 189, 190 200 (footnote.)

(৩০) যজ্ঞ কথা, পৃঃ ১০৭।

উল্লেখ দেখা যায়(৩১)। বৈদিক ধর্ম্ম অপেক্ষা ঈরাণীয় ধর্ম্মে এই দুই দেবতার স্থান অনেক উচ্চে। ঈরাণবাসী জরথুস্ত্রবাদীরা অসুর উপাসক ছিলেন বলিয়া মাজ্‌দা'ও অসুর ("অহুর") নামে পরিচিত। জরথুস্ত্রপন্থীরা মনে করিতেন দেবগণ ("দেও") গবাদি পশুর শত্রু এবং তাহারাই এই সকল পশুর প্রজননে বিঘ্ন ঘটাইয়া থাকে। জোরোয়াস্ত্রীয় ধর্ম্মে গোধন পবিত্র বলিয়া বিবেচিত এবং তদ্ধর্ম্মাবলম্বিগণ গো-রক্ষার ভার সাগ্রহে গ্রহণ করিয়াছিলেন। বিশেষ করিয়া গবাদি পশু হনন তাঁহাদিগের নিকট ঘৃণ্য অনাচার বলিয়া পরিগণিত হইত, যদিও অতি প্রাচীন কালে ঈরাণীয়েরাও যে গোমাংশ ভক্ষণ করিতেন এরূপ বিশ্বাস করার কারণ আছে। সে যাহা হউক, ভারতীয় আর্য্যদিগের মধ্যে গোহত্যা যে কিরূপ ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল, তাহা মেঘদূতে রন্তিদেবের কীর্ত্তি বলিয়া বর্ণিত চর্ম্মণ্বতী-নদীর উৎপত্তি বিষয়ক প্রবাদ হইতেই বুঝা যায় (৩২)। কতকটা বোধ হয় এই কারণেই ভারতীয় আর্য্যগণের উপাস্য "দেও" দিগের উল্লেখ, স্বধর্ম্ম-বিশ্বাসী জোরোয়াস্ত্রীয়ের মনে প্রবল ঘৃণার উদ্রেক করিত।

আচার্য্য রামেন্দ্র সুন্দরের অভিমত।

এই প্রসঙ্গে আরও দুইটি বৈদিক দেবতার কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। ঋগ্বেদের যম ও যমী এবং ঈরাণীয় ধর্ম্মগ্রন্থের "যিমে" ও "যিমী" অভিন্ন। ভ্রাতা ও স্বসা হইলেও, ইরাণীয়েরাও ইঁহাদের উভয়ের মধ্যে দাম্পত্য সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়ার কথা অস্বীকার করেন নাই। ঋগ্বেদে "যমী", "গর্ভবাসাদারভ্য সখীভূতম্" বলিয়া পত্নীরূপে তো স্বীকৃত হন-ই-নাই বরং সুস্পষ্ট ভাবেই যমকর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়াছেন (৩৩)। যম ও যমী, অগ্নি ও পৃথিবী, কিম্বা দিবা ও রাত্রি (৩৪)। যাহাই হউক না কেন, বিবাহ প্রথার বিবর্ত্তনের (evolution-এর) দিক্ দিয়া এই আখ্যায়িকায়, আর্য্যদিগের এই দুই শাখার মধ্যে যে পার্থক্য সূচিত হইয়াছে, তাহা বাস্তবিকই বিশেষ যত্ন সহকারে অনুধাবন যোগ্য।

যম ও যমী

প্রাচীন ঈরাণীয় সমাজে নিতান্ত নিকট আত্মীয়ের মধ্যেও বিবাহ প্রচলিত ছিল এবং উহা বৈধ বলিয়া পরিগণিত হইত। এমন কি সহোদরাকেও পত্নীরূপে গ্রহণ করিতে বাধিত না। এই প্রথা "খএত্ব দথ" (Khetvadatha) নামে পরিচিত ছিল। আধুনিক জোরোয়াস্ত্রীয়গণ ইহা (marriage of first cousins) মামাতো, খুড়তুতো, মাসতুতো ও পিস্‌তুতো ভাই ভগ্নীদের মধ্যে বিবাহ অর্থেই গ্রহণ করিয়া থাকেন (৩৫)। প্রাচীন গ্রীক ও রোমকেরা ঈরাণীয়দিগের মধ্যে ভ্রাতা ও ভগ্নী, এমন কি মাতা ও সন্তানের সহিত বিবাহ প্রথা প্রচলিত থাকার উল্লেখ করিয়াছেন। ভ্রাতার সহিত ভগ্নীর বিবাহ প্রাচীন মিশরে অজ্ঞাত ছিল না। মিশরীয় রাজবংশের অনুকরণে ঈরাণের অভিজাত সমাজে এ প্রথা প্রবর্ত্তিত হওয়া অসম্ভব নয়। প্লুটার্কের গ্রন্থে ঈরাণীয় রাজপরিবারে ভ্রাতা ও ভগ্নীর উদ্বাহ বন্ধনে বদ্ধ হওয়ার উল্লেখ রহিয়াছে। মাতা ও পুত্রের দাম্পত্য সম্বন্ধ সে যুগে কোন ও বিশেষ ক্ষেত্রে হয়তো ঘটিয়া থাকিতে পারে, কিন্তু ইহা যে সাধারণ্যে প্রচলিত ছিল বৈদেশিক ইতিবৃত্তে নিবদ্ধ এ প্রকার প্রবাদোক্তি বিশ্বাস

(৩১) তৈত্তিরীয় উপনিষদের শিক্ষাবল্লীর একাদশ অনুবাকের শেষ অংশে, মিত্র ও বরুণের একত্রে উল্লেখ রহিয়াছে। "শন্নো মিত্র সং বরুণঃ")। অনুবাদে "মিত্র" দিনের দেবতা ও "বরুণ" রাত্রির দেবতা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন (শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের তৈত্তিরীয় উপনিষদ, পৃঃ ১৫২)

(৩২) "স্রোতোমূর্ত্ত্যা ভুবিপরিণতাং রন্তিদেবস্য কীর্ত্তিং (পূর্ব্বমেঘ, ৪৬) রন্তিদেবের রন্ধনশালায় প্রত্যহ দুই সহস্র করিয়া গোবধ করা হইত বলিয়া প্রবাদ আছে"। সুমতি বিজয় লিখিয়াছেন "রন্তিদেবেন রাজ্ঞা গোমেধযজ্ঞেষু সততশো ধেনবঃ অহতা তদ্রক্তা নদীপ্রবাহেণ চর্ম্মণ্বতি জাতেতি প্রসিদ্ধিঃ"।

(৩৩) ঋগ্বেদ, ১০।১০।

(৩৪) Maxmuller, Science of Language, Vol II, p. 630.

(৩৫) মহাজনের জাতকে রাজার ভাগিনেয়ের বা ভ্রাতুষ্পুত্রের সহিত রাজকন্যার বিবাহের কথা লিখিত আছে। বুদ্ধপত্নী যশোধারা বুদ্ধের পিস্‌তুতো কিম্বা মামাতোভগ্নী ছিলেন। জাতক ঈশান শেষ, ২ য় খণ্ড, পৃ, ১।৶০

যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। প্রাকৃতিক নিয়মের যাহা ব্যভিচার তাঁহা কোন দেশেই কোন কালেই স্থান পাইতে পারে না। ঈরাণীয়দিগের নিজস্ব

ঈরাণীয়দিগের নিজস্ব দেবতার অন্তর্ভুক্তি

দেবতার মধ্যে জলের অধিষ্ঠাত্রী দেবী "অনাহিত" (অনৈত) এবং সিরিউস্ অর্থাৎ লুব্ধক নক্ষত্র জ্ঞাপক (তিশ্রিয়) বা "তিশ্রিয়ে"র উল্লেখ পাওয়া যায়। তাক্-ই-বুস্তানে, গিরিগাত্রে, খিলান আকারে ক্ষোদিত খস্রু পারভেজের যে অপূর্ব্ব কীর্ত্তি বিদ্যমান, তাহাতে রাজার সান্নিধ্যেই অনাহিত দেবীর মূর্ত্তি উৎকীর্ণ রহিয়াছে। আধুনিক পারসীকদিগের মধ্যে শুকতারা (planet venus) জ্ঞাপক "অনাহিদ্" বা "নাহিদ্" শব্দটি অনাহিতেরই নামান্তর। আরবীয় ভাষায় জোহ্রা নামটিও এই অর্থেই ব্যবহৃত হয়। গ্রীক দেবী "অনৈতিস" ও "অনাহিত" অভিন্ন বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে।

কথা উঠিতে পারে যে, ঈরাণীয় আর্য্যদিগের আদিম ধর্ম্ম কি ছিল? মনে হয় এখনকারকালে যাহাকে লোক-

লোকধর্ম্ম ও জরথুস্ত্রবাদ

ধর্ম্ম (folk religion) বলা হয়, সে ধর্ম্ম ছিল অনেকাংশে তাহারই অনুরূপ। বৈদিক যুগের ধর্ম্ম বিশ্বাসের সহিত এ ধর্ম্ম তুলনীয়। হয়তো ইহাকে কৌমী ধর্ম্ম (tribal religion)-ও বলা চলে। জরথুস্ত্র ধর্ম্ম সম্বন্ধে একবারে নূতন কিছু না গড়িয়া তুলুন, পূর্ব্ব প্রচলিত লোকধর্ম্ম হইতে শিষ্টাচার বিরুদ্ধ এবং ইন্দ্রিয়সুখৈকসর্ব্বস্ব সকল কিছু বর্জ্জন করিয়া এবং পরস্পর সঙ্গতিবিহীন অনুষ্ঠানাদির সংস্কার ও সঙ্গতি সাধন করিয়া তৎকালীন ধর্ম্মমতের বিশুদ্ধি ও পবিত্রতা সম্পাদনে সমর্থ হইয়াছিলেন। পুরাতনের এই ভিত্তির উপরেই তাঁহার এই নবপ্রচারিত ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। 'অহুরমাজ্দা'র উপাসকদিগকে "সাধুচিন্তা" "সাধুবাক্য" ও "সাধুকর্ম্ম" অনুষ্ঠান করিতে হইত। এই তিনটি অনুজ্ঞা সর্ব্বদা পালন করিতে হইবে, ইহাই ছিল তাঁহাদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রের নির্দ্দেশ। প্রাচীন ধর্ম্মগ্রন্থের ভাষায় ইহা "হুমত" (সুমত), "হূখ্ত" (সূক্ত) ও "হর্ষৎ" (সুবৃক্ত) নামে উক্ত হইয়াছে। [ক্রমশঃ

আগামী বৈশাখের বিশেষ আকর্ষণ

রবীন্দ্র-স্মরণী : চির নূতনেরে দিল ডাক
পঁচিশে বৈশাখ

শিক্ষা ও সংস্কৃতি : ডক্টর কালিদাস নাগ
শ্রীউষা বিশ্বাস, এম্. এ, বি. টি

কিশোর কিশোরী : সচিত্র কিশোর আলেখ্য

● ● ●

ধারাবাহিক জীবনসমস্যামূলক নূতন উপন্যাস
এবং
প্রখ্যাত সাহিত্যিক পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের নবতম নাটক
'বিদুষী'

এতদ্ব্যতীত নিয়মিত প্রকাশানুরূপ চিন্তাশীল প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা প্রভৃতির মনোজ্ঞ সমাবেশ।

আলোচনী

বেতারের কয়েকটি দিক

পঞ্চভূত

কিছুদিন আগে পর্য্যন্তও ভারতীয় বেতার ছিল এক অসম্ভব অবাস্তব রূপকথার আবহাওয়ায় আবদ্ধ। সেদিন বৃটিশ শাসন ছিল ভারতবর্ষের বুকের উপর জগদ্দল পাথর। তার চাপে ভারতের দেহ পিষ্ট, মন পঙ্গু। পরশাসনের যাবতীয় ব্যবস্থার চরম লক্ষ্য ছিল বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের পুষ্টি। ভারতবাসীর ভাল-মন্দ বাঁচা-মরা আনুসঙ্গিক উপলক্ষ্য মাত্র। ভারতবর্ষকে ঠিক ততখানিই বাঁচাইয়া রাখিতে হইবে যাহাতে সেই পুষ্টির ব্যাঘাত না ঘটে। অধিক বাঁচাও ব্যাঘাত, একেবারে কম বাঁচাও ব্যাঘাত। এই উদ্দেশ্য অনুযায়ী তদানীন্তন ভারতীয় বেতার অনুষ্ঠান-গুলি রচিত, প্রযোজিত এবং প্রচারিত হইত।

* * *

যে অদ্ভুত সমাজের অদ্ভুততর চিত্র ও চরিত্রকে কেন্দ্র করিয়া বেতারের কাহিনী, প্রবন্ধ ও ঘটনাপ্রবাহ সৃষ্টি করা হইত, সেই সমাজের অস্তিত্ব আমাদের জাতীয় জীবনে সন্ধান মেলে না। এগুলি পরিকল্পনানুযায়ীই করা হইত। এই অনুষ্ঠানগুলির পরিবেশ ছিল তৎকালীন বৃটিশ প্রভু-ভক্ত অনুষ্ঠান। প্রযোজনার ভারপ্রাপ্ত বেতার কর্ম্মচারি-গণের প্রভুভক্তি পরিচায়ক জাতীয়তা বিরোধী ভেদশাসন নীতিমূলক সাম্প্রদায়িক কাহিনীর বিমূঢ় ধর্ম্মাবলম্বী আবেদন, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থার গুণ ব্যাখ্যান, সম্পূর্ণ মনগড়া কাল্পনিক রসাভাসে ভরা প্রেম-বৈদগ্ধ্য নিবেদন ইত্যাদি। পরশাসনের ইহাই তো স্বাভাবিক পরিণতি।

* * *

বৃটিশ শাসিত ভারতের অপপ্রচার ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। ভারতবাসীর মনকে বৃটিশ জয় করিতে সমর্থ হয় নাই। সংগ্রামী ভারতীয় জনগণকে বিভ্রান্ত করিতে পারে নাই। ভারতের জাতীয় সংগ্রাম জয়যুক্ত হইয়াছে। ভারতীয় বেতার আজ পরশাসনমুক্ত—স্বাধীন। কিন্তু তবুও স্বাধীন ভারতীয় বেতার মারফৎ অগণিত ভারতবাসী আকাঙ্ক্ষিত অনুষ্ঠান শুনিতে পাইতেছে না কেন? ইহার কারণ কোথায় লুক্কায়িত রহিয়াছে? এবং এ সম্পর্কে শ্রোতৃজনের কর্ত্তব্য কী? শ্রোতার রুচি ও দাবীর ভিত্তিতে গঠনমূলক সমালোচনা দ্বারা ভারতীয় বেতার অনুষ্ঠান-গুলিকে আকর্ষণীয়, শিক্ষনীয় ও জাতিগঠনের সহায়ক করিয়া তোলাই এই বিভাগের অন্যতম উদ্দেশ্য। তাই প্রয়োজন শ্রোতার আন্তরিক সহযোগিতা।

* * *

বেতারের শক্তি অপরিসীম। বেতার জাতীয় জীবনকে ঢালিয়া সাজিতে পারে। দেশ বিদেশের সহিত সাংস্কৃতিক আদান প্রদান ও যোগাযোগ বেতার মারফৎ আজ কত সহজ ও সরল হইয়াছে। আমোদ প্রমোদের পরিবেশনকে বেতারের সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কাজ বলা যাইতে পারে। রাষ্ট্র ও ব্যক্তির মধ্যে সহযোগিতামূলক সম্পর্ক স্থাপনের কাজে বেতার নিতান্ত প্রয়োজনীয়। বেতারের দায়িত্ব বহুমুখীন। এবং রাষ্ট্রের নেতৃত্বে রাষ্ট্রীয় বেতার জাতিগঠন ও জনকল্যাণের কাজে দ্রুত অগ্রসর হইবে, ইহাই তো স্বাভাবিক।

* * *

বড়ই আশ্চর্য্য যে, আদর্শ সমাজ এবং খাঁটি মানুষ তৈরী করিবার জন্য বলিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতিফলন আজও ভারতীয় বেতার অনুষ্ঠানগুলিতে পরিলক্ষিত হইতেছে না। কিন্তু কেন? কারণ পরিষ্কার। আজও বৃটিশ শাসনকালীন আমলাতন্ত্রীগণই বেতার বিভাগের কর্ম্মকর্তা। জন-সাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে এঁদের এতটুকুও পরিচয় নাই। ভারতীয় সংস্কৃতির সম্বন্ধে এঁদের শিক্ষা ও জ্ঞানের অভাব। ভারতীয় ইতিহাস এঁরা জানেন না। স্বাধীনতার স্বরূপ সম্বন্ধে এঁদের ধারণা নাই। সে-যুগে জাতীয় সংগ্রামকে এঁরা বিদ্রূপ করিয়াছেন। স্বাধীন ভারতে

এঁরাই পদোন্নীত হইলেন। অজুহাত—এঁদের অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা। অদ্ভুৎ যুক্তি!

* * *

নতুনকে গ্রহণ করিবার ক্ষমতায়, সমীকরণের অপরূপ পদ্ধতিতে বাঙ্গালী আজো ভাস্বর। বাঙ্গালীর মতো আর কোন জাতি সমগ্র ভারতীয় জীবনকে উপলব্ধি করিয়া এত গভীর ও ব্যাপক ভাবে সেই ভারতীয় জীবনকেই প্রভাবান্বিত করিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। খণ্ডছিন্ন বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িলেও চেতনায় ও সাধনায় বাঙ্গালী আজো বিশ্বভারতের অগ্রগণ্য। তাহার বর্ত্তমান বিপর্য্যয় এক অপরিমেয় দিগন্তের পূর্ব্বাভাস। খণ্ডছিন্ন বিক্ষিপ্ত বাঙ্গালী আজ সারা ভারতের সমস্যা। ১৯০৫ আজ হইয়াছে ১৯৫২। ঐতিহাসিক দায়িত্বভার আজ বাঙ্গালীর উপর ন্যস্ত রহিয়াছে। সংকটের প্রহরে তাহাকে হইতে হইবে নতুন সভ্যতার অগ্রদূত। বাংলা তথা ভারতের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি বিশ্বমানবের অনুশীলনের বস্তু। আ-ভারতীয় পটভূমিতে ইহার বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যান ভারতীয় বেতারের অন্যতম কেন্দ্র কলিকাতার অনুষ্ঠান-গুলিতে পাওয়া যায় না।

* * *

বাংলা ও বাঙ্গালীর ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে জ্ঞান কলিকাতা বেতার-কর্ত্তৃপক্ষের আছে, এমন পরিচয় কমই পাওয়া গিয়াছে। সস্তা খেলো আবেগ ও উত্তেজনাপূর্ণ আধুনিক গান, জোলো ভাবালুতায় ভরা গল্পের দুর্ব্বলতা ও ঘটনার অসম্ভাব্যতাকে গোটাকয়েক স্বদেশানুরাগী গরম বক্তৃতা মিশাইয়া নাটকে, প্রবন্ধে, সমালোচনায়, সরকারী নির্দ্দেশানুযায়ী কথিকা দিনের পর দিন প্রচারের নামই বর্ত্তমানে হইয়া দাঁড়াইয়াছে সংস্কৃতি ও শিক্ষামূলক বেতার অনুষ্ঠান। কলিকাতা বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠান শুনিবার জন্য ভারতের অগণিত শ্রোতৃবৃন্দ উৎসুক। কলিকাতা কেন্দ্রের কৃত্রিমতাভরা অনুষ্ঠানগুলি তাহাদের মানসিক ক্ষুধা মিটাইতে পারিতেছে না। কিন্তু চেষ্টাও যে নাই। তবুও কর্ম্মকর্ত্তাগণের পদোন্নতীতে বাধা নাই। তবে কি ইহাই ঠিক যে, ভারতীয় সংস্কৃতিকে জবাই করিবার দক্ষতাই পদোন্নীত হইবার প্রকৃষ্ট পন্থা?

আমি আশাবাদী। কর্ম্মের দ্বারা সত্যের সহিত যোগ সাধন করিবার কাজে আমি আস্থাবান। হতাশা সেজন্য আমাকে অভিভূত করিতে পারে নাই। পারিবেও না। গঠনমূলক সমালোচনা আমাদের কাজ। এইরূপে সমাজ-জীবনের ও সংস্কৃতির ছবিটাকে ভারত তথা বিশ্বভারতের পটভূমিকায় তুলিয়া ধরিয়া বেতার অনুষ্ঠানগুলির চালনা ও প্রযোজনা করিলে তাহা অবশ্যই প্রাণবন্ত ও আকর্ষনীয় হইবে। কর্ম্মযোগকে কর্ম্মক্ষেত্রে প্রয়োগ করিবার কৌশলটী কলিকাতা কেন্দ্রাধ্যক্ষের জানা নাই। জানিবার জন্য আগ্রহও নাই। কেননা সমাজ বা সমষ্টির প্রতি তাঁহার দরদের অভাব। ব্যক্তিগত স্বার্থের উর্দ্ধে উঠিয়া দেশ ও দশের সেবার শিক্ষা তিনি কোন দিন পান নাই। ইহাই তাঁহাকে পদোন্নীত করে বলিয়া উপযুক্ত জ্ঞান এবং শিক্ষার প্রয়োজনীয়তাও তিনি উপলব্ধি করেন না। এঁদের ব্রহ্মাস্ত্র মোসাহেবি। প্রশ্ন হইতে পারে, সরকারের দৃষ্টি ইহার প্রতি নাই কেন? সরকারের দৃষ্টি আছে। সরকারী নির্দ্দেশের তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিবার মত শক্তি বা সামর্থ্য এঁদের নাই। এ জন্য উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী এবং অনুষ্ঠান-সহকারিগণের কাজগুলি বিকৃত রুচিতেই পর্য্যবসিত হইতেছে। অতএব এই সকল দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভার জ্ঞানী ও গুণীর হস্তে সমর্পণ করা ছাড়া গত্যন্তর নাই। সরকারের দৃষ্টি ইহার প্রতি আকর্ষণ করিতেছি।

সম্প্রতি কলিকাতা মহানগরীতে আন্তর্জ্জাতিক ছায়া-চিত্র মহোৎসব হইয়া গেল। দেশ-বিদেশ হইতে বহু শিল্পীর সমাগম হইয়াছিল। অনুষ্ঠানেরও ত্রুটী ছিল না। সংবাদপত্রগুলি ছায়াচিত্র বিষয়ে বহুবিধ তথ্যপূর্ণ সংবাদ পরিবেশন করিয়া ছায়াশিল্প সম্বন্ধে সাধারণ জনের জ্ঞান অর্জ্জন করিবার সহায়তা করিয়াছেন। কলিকাতা বেতারকেন্দ্র এ-সম্পর্কে আকর্ষণীয় অনুষ্ঠান সূচীবদ্ধ করিবেন আশা ছিল। আশা ভাঙ্গিয়া গেল। সেদিন খেলার মাঠে নারী ও পুরুষ শিল্পীদের ক্রিকেট খেলাটী বেতার মারফৎ প্রচারিত হইতে শোনা গেল।

কিন্তু ইহাই কি আন্তর্জাতিক ছায়াচিত্রের প্রাণটুকু বা সবটুকু?

* * *

জাতির জীবনে ছায়াছবির অপরিসীম প্রভাব আজ নিশ্চয়ই নতুন করিয়া খুলিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। তবুও এ সম্বন্ধে বিশেষ অনুষ্ঠান প্রচার করিবার সুযোগটী এই উৎসবের সময় কেন যে লওয়া হইল না, তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই। কলিকাতা কেন্দ্র কেন্দ্রাধ্যক্ষহীন বলিয়াই কী? তাঁহার রাজত্বেও ত সময় এবং সুযোগ থাকা সত্বেও উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটে নাই! এখন অনুষ্ঠান সম্বন্ধে ভারপ্রাপ্ত সহকারী কেন্দ্রাধ্যক্ষ যিনি শিলং গৌহাটি কেন্দ্র হইতে কলিকাতা কেন্দ্রে পুনরায় বদলী হইয়া আসিয়াছেন তাঁহার যোগ্যতার পরিচয় শ্রোতৃবর্গ পান নাই। বরং তাঁহার এখানে থাকাকালীন শ্রোতাদের মধ্যে অসন্তোষ ছিল প্রচুর। সুতরাং এঁর নেতৃত্বে কলিকাতা কেন্দ্রের অনুষ্ঠান সরস হইবার কোন কারণ নাই। সরকার উপযুক্ত কেন্দ্রাধ্যক্ষ আনুন, ইহাই শ্রোতার দাবী।

* * *

বেতারে অনুষ্ঠানের ত্রুটি নাই। শিশু মহল, কিশোর মহল (গল্পদাদুর আসর), পালোয়ান আখড়া (শরীর চর্চ্চা), হিন্দি শিক্ষা, মহিলা মহল, মজদুর মণ্ডলী প্রভৃতি অনুষ্ঠান প্রচারিত হইয়া থাকে। কিন্তু প্রত্যেকটি অনুষ্ঠান নির্জীব। কারণ অনুষ্ঠান রচনায় শিল্পীর স্বাধীনতা নাই। অনুষ্ঠান সহকারী বা অনুষ্ঠান নির্ব্বাহকের জ্ঞান ও দৃষ্টিভঙ্গীর মাপকাঠিতে অনুষ্ঠান বলা-কওয়া সীমাবদ্ধ। অনুষ্ঠানকে প্রাণবন্ত করার পথে উহা এক ভয়ানক অন্তরায়। সরকারী নীতিকে যে কর্ম্মচারী যে ভাবে অর্থ বা কদর্থ করিবেন, তদনুযায়ীই প্রচারলিপিটি সংশোধিত বা পরিবর্দ্ধিত হইবে। ইহা সর্ব্বনাশা নীতি।

* * *

জাতির ভবিষ্যৎ শিশু। শিশুমহল এবং গল্পদাদুর অনুষ্ঠান শিশু এবং কিশোরদের উদ্দেশ্যে প্রচারিত হইয়া থাকে। অগণিত অভিযোগ এই অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে হস্তগত হইতেছে। অনুষ্ঠানগুলি প্রাণহীন। বিভাগীয় অনুষ্ঠান সহকারী এবং অনুষ্ঠান নির্ব্বাহকদ্বয় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় সরবরাহ বিভাগে সামান্য কেরাণীর কাজ করিতেন। শিশু বা কিশোরের মন, শিশুবিজ্ঞান বা মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে ইঁহাদের কোন জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা না থাকিবারই কথা। তবুও এই দায়িত্বপূর্ণ কাজে এঁরা নিযুক্ত আছেন। এঁরা দুইজনেই নারী। মাতৃজাতি বলিয়া হয়তো মনে করা হইয়াছে যে ইঁহারাই এই দায়িত্ব পালনে সমর্থ হইবেন। কিন্তু হইতেছে না দেখিয়াও কেন্দ্রাধ্যক্ষের ভ্রূক্ষেপ নাই। ইতিমধ্যে কিন্তু কেন্দ্রাধ্যক্ষ পদোন্নীত হইয়া দিল্লী বদলী হইয়া গেলেন। ইঁহাদের চালচলনে পোষাক-পরিচ্ছদে, আদব-কায়দায়, ভাবভঙ্গীতে কথায় বার্ত্তায় ভারতীয় ছাপ মেলে না। সবটুকুই একটা ফিরিঙ্গিয়ানায় ভর্ত্তি। ইহাই দুর্নীতি। ইহাই পোষ্য পোষণ! ইহাই অনুগ্রহ বিতরণ। ইহার অবসান না ঘটাইতে পারিলে প্রাণবন্ত অনুষ্ঠান শুনিতে পাইবার আশা সুদূরপরাহত।

রায়বাঘিনী

শ্রীচুণিলাল মুখোপাধ্যায়

চতুর্থ অঙ্ক

চতুর্থ দৃশ্য

[বাগুড়ী গ্রামে ভবানীমন্দির—মন্দির সম্মুখে চত্বর। অমানিশার ঘোর অন্ধকার। মন্দির মধ্যে দেবীর স্থানে ঘৃতপ্রদীপ জ্বলিতেছে। প্রদীপটি স্বর্ণশৃঙ্খলে ঝুলিতেছে। তাহার দীপ্তি বাহিরের কিয়দংশ আলোকিত করিয়াছে। বাহিরে মুক্ত কৃপাণ হস্তে শ্যামা ও অন্যান্য দেহ-রক্ষিণীগণ নিজ নিজ কার্য্যে নিযুক্ত। মন্দির মধ্যে রাণী ভবশঙ্করী ব্যাঘ্র চর্ম্মে আসীনা--ধ্যানস্থা। শঙ্খ-ঘণ্টা বাজিয়া থামিয়া গেল। রাণীর মূর্ত্তি ধূমাচ্ছন্ন প্রদীপালোকে উদ্ভাসিত। মন্দির মধ্যে মুক্তদ্বার পথে ধূনা ধূপের ধুম নির্গত হইতেছে। হরিদেব ভট্টাচার্য্য দেবীর স্তব পাঠ করিতেছেন। কিছুকাল পরে স্তবপাঠ শেষ হইলে হরিদেব এবং সুমিত্রাদেবী বাহিরে আসিলেন—শঙ্করী তখনও ধ্যানমগ্না।]

হরিদেব—সুমিত্রা! আজকের পূজার অনুষ্ঠান সমস্তই অপূর্ব্ব সাফল্য মণ্ডিত হ'য়েছে। মার ধ্যানমগ্না মূর্ত্তির দিকে চেয়ে দেখ—দেবী ভবানীর জ্যোতিঃ মার অঙ্গ থেকে বিকীর্ণ হচ্ছে! এ অলৌকিক সুমিত্রা! এ অলৌকিক! মা আমার ঘোর অমাবস্যা তিথিতে শক্তি সাধনায় সিদ্ধি-লাভ করলেন। অনেক দিন মা অনেক মন্ত্র দিয়ে ভবানীর সাধনা করেছি, কিন্তু এত বড় ভক্তির ধ্যান দেখিনি। সুমিত্রা! মা! অপূর্ব্ব তোমাদের শিক্ষা।

সুমিত্রা—গুরুদেব সবই ত আপনার দয়া—

হরিদেব—(স্মিত হাস্যে) মহাশক্তির অংশরূপিনী ভুরসুটের গৌরবময়ী কন্যা! আমার দয়া! চেয়ে দেখ সুমিত্রা—ভবানীমায়ের অসামান্যা সেবিকা আজ কি তেজঃপুঞ্জের অধিকারিনী হয়ে মার পূজায় আত্মস্থা। বেটী আজ নিজেকে নিঃস্ব ক'রে সমস্ত শক্তি দিয়ে পরিপূরিত করেছেন তোদের রাণীকে। আজ যদি ইন্দ্র—চন্দ্র—বায়ু—বরুণ একে একে দেবীশক্তির অধিকারিণী এই নারীর সম্মুখীন হন, তাঁদের শক্তিও বুঝি প্রতিহত হবে! মা! সার্থক তোমাদের চেষ্টা। ভুরসুট আজ ধন্য!

সুমিত্রা—গুরুদেব! এই অমানিশার অন্ধকারে অপূর্ব্ব জ্যোতি স্ফুরিত হ'লো আমার নয়নে—গুরুদেব! কি দেখছি!

হরিদেব—সুমিত্রা! আলো! দেখ্‌ছিস্ না মা আমার আলোর রাণী!

সুমিত্রা—শ্যামা! শ্যামা!! (দুই হাত বাড়াইয়া আহ্বান-তাকে দেখাইতে) (শ্যামা আগাইয়া আসিয়া দেখিয়া মোহিত—অপর দিক হইতে কুনালের প্রবেশ—সেও সমস্ত দেখিয়া বিস্মিত হইল। মন্দির অভ্যন্তর হইতে জগদ্ধাত্রীরূপিনী শঙ্করী দেবীর প্রবেশ—তখনও তার মুখমণ্ডল অলৌকিক ভাবে পরিপূরিত।)

শঙ্করী—আমার মা কৈ? আমার শ্যামা মা! (বিহ্বল দৃষ্টি)।

সুমিত্রা—(শঙ্কিত হইয়া রুদ্ধস্বরে) গুরুদেব। (হরিদেব মন্দির হইতে শান্তিবারি আনিয়া রাণী ভবশঙ্করীর মস্তকে ছিটাইলেন)।

কুনাল—(রাণীর গলার স্বর শুনিয়া) দিদি! আমার দিদি কই—(কাছে এসে তীর ধনুক পদতলে রাখিল)।

শঙ্করী—(সম্বিত ফিরিয়া পাইয়া) এস কুনাল (হাত ধরিল)।

কুনাল—দিদি! আমি পেয়েছি—

শঙ্করী—(স্নেহের উচ্ছ্বাস) কি?

কুনাল—আমার নিশানা—

শঙ্করী—(তাহার মাথায় হাত রাখিলেন) সুমিত্রা! অন্ধকারে ওকি! কিসের শব্দ? (সকলে শুনিল, শ্যামা কিছু অগ্রসর হইয়া)।

শ্যামা—কোনও অশ্বারোহী এলেন—

(শ্যামার কথা শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে একজন অশ্বারোহী যুবক সহ একজন নারী সৈনিকের প্রবেশ—শ্যামাকে কি বলিয়া প্রস্থান)।

শঙ্করী—কি সংবাদ যুবক?

যুবক—আমি ভবানীপুর থেকে আসছি। মন্ত্রীর এই পত্র এনেছি। (পত্র দিল) (রাণী লিপিখানি সত্বরে খুলিয়া পাঠ—তাঁহার মুখভাব পরিবর্ত্তিত হইল এবং ক্রমে ক্রমে ভীষণ হইয়া উঠিল। হরিদেব সুমিত্রা উহা দেখিয়া ভীত হইলেন)

হরিদেব—মা! কি সংবাদ?

শঙ্করী—ওসমান সর্দ্দার আবার আসছে। এবার আয়োজন গুরুতর—মূলে ষড়যন্ত্র আছে মন্ত্রী জানিয়েছেন। বেশ ত, আমি প্রস্তুত। যুবক! তুমি এখুনি ছাওনাপুরে—আচ্ছা দাঁড়াও (মন্দির মধ্যে প্রবেশ ও পরে ফিরিয়া) এই নাও আমার অনুজ্ঞাপত্র। বীর সূর্য্যদেবকে বলো—সৈন্য-সহ প্রস্তুত হয়ে অবিলম্বে আসতে। তাঁদের রাণী বিপন্ন—শীঘ্র যাও (দূতের প্রস্থান) শ্যামা! আমার শঙ্খ। গুরুদেব এখুনি মন্দিরে দেবী প্রণাম কোর্ব্বে। (শ্যামা শঙ্খ দিল, রাণী ভবশঙ্করী তাহা বাজাইলেন—সঙ্গে সঙ্গে বাহিরে দামামা বাজিল। নারী সৈন্যগণ আসিয়া দাঁড়াইল—সকলেই আগ্রহ ব্যাকুল—শ্যামা পুরোভাগে দাঁড়াইল) আমার সঙ্গিনীগণ! এই মাত্র খবর পেলাম পাঠান সর্দ্দার বহু সৈন্য নিয়ে এই ভবানী মন্দিরে আমায় আক্রমণ করতে আসছে! থানাকুল জঙ্গলে তারা ছাউনী করেছে। কালুসর্দ্দার এ খবর দিয়েছে। সব সতর্ক থাকবে। আজ আমার মান—ভুরসুটের ভবিষ্যত তোমা-দের হাতে। তোমরা প্রস্তুত হও। আমি নিজে আজ সৈন্য চালনা কোর্ব্ব—তোমরা থাকবে আমাকে ঘিরে—সুমিত্রা আর কুনাল থাকবে আমার কাছে হস্তি পৃষ্ঠে।

সুমিত্রা—ভুরসুটের রাণী! আমায় ছেড়ে দাও—আমি যাই।

শঙ্করী—ভুরসুটের বীর বালা। এ রাণীর হুকুম—(সুমিত্রা এবং কুনালের হাত ধরিয়া প্রস্থান এবং শ্যামাসহ নারী সৈন্যগণের প্রস্থান)।

হরিদেব—(স্থির গম্ভীরভাবে সমস্ত দেখিলেন—গভীর চিন্তামগ্ন থাকিয়া ধীরে ধীরে মন্দিরস্থ দেবী মূর্ত্তির দিকে ফিরিলেন) মা! তোমার লীলা তুমিই জান—মানুষ তোমার খেলার পুতুল। তোমার ইচ্ছাই মাগো পূর্ণ হবে। দেখিস্ মা! আমার সোণার ভুরসুটকে তোর ভাঙন দোলায় তুলে দিস্‌নি! বাংলার শান্ত ছেলে-গুলোকে তোর স্নেহের কোল ছাড়া করিস্ নি মা! তারা বড় অভিমানী—মা! মা আমার!! (কণ্ঠরুদ্ধ—ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল; পশ্চাতে পাগলা বাউলের গাহিতে গাহিতে প্রবেশ)

গান

চালিয়ে দে মা চালিয়ে দে
তোর রুদ্র দানব প্রলয় নেশা
ছুটিয়ে দে মা ছুটিয়ে দে
মরণ বাঁচন মেলা মেশা
সকল নেশা ছুটিয়ে দে
(তোর) রক্ত নিশান ভক্ত নিলে
বিজয় কেতন আনবে বলে
তাইত মা তুই অট্ট হেসে
তার হাতেতেই দিলি তুলে
(তার) মরণ হানা খড়্গ খানা
(তার) মত্ত মাতাল শঙ্খ ভীষণ
বাজিয়ে দে মা বাজিয়ে দে।

(হরিদেব মুগ্ধ হইয়া সে গান শুনিল—বাউল ভক্তিভরে মাকে প্রণাম করিল)

বাউল—মা! মা!! (জোড় হাতে সম্মুখে দাঁড়াইল)

হরিদেব—হ্যাঁরে পাগলা! তুই এত রাত্রে গান গাইছিস্—ঘুমোবিনা?

বাউল—আজ যে অমাবস্যা—আজ কি ঘুমুতে আছে ঠাকুর? আমি এই অন্ধকারে বসে মার মরণ খেলা দেখবো—আমি যাই ঠাকুর।

হরিদেব—মাকি মারে রে পাগলা—মায়ে পালন করে।

বাউল—সব জান ঠাকুর—আমায় পরীক্ষে—ঐ শোন—(হাসিয়া প্রস্থান)।

(বাহিরে দূরে জয়ধ্বনি—দুই দিক দিয়া সূর্য্যদেব এবং কালু সর্দ্দারের প্রবেশ। উভয়ের ভবানী দেবীকে প্রণাম—পরে হরিদেবকে প্রণাম—হরিদেবের আশীর্ব্বাদ)

সূর্য্যদেব—গুরুদেব! আমরা এসেছি।

কালুসর্দ্দার—আমাদের রাণীমাটি কোথারে ঠাকুর মশাই?

(হরিদেব মন্দিরের দিকে ফিরিয়া কি বলিতে গেলেন—সম্মুখে দেবীমূর্ত্তি রাণী ভবশঙ্করীকে যুদ্ধবেশে দেখিলেন—সঙ্গে কুনাল। সকলে মোহিত হইলেন। রাণীর হাতে দেবী দত্ত খড়্গ প্রদীপালোকে ঝলসিয়া উঠিল)।

হরিদেব—ঐ দেখ তোমাদের মা!

(সূর্য্যদেব ও কালু সর্দ্দারের উভয়ের প্রণাম)

শঙ্করী—সর্দ্দার তুমি কখন এলে?

কালু—মা! দোষ নিবেন না—সব ব্যবস্থা করে এসেছি—সহর আর গাঁ গুলোতে সব ঠিক আছে। মা! ঠিক থাকতে পারি নাই—ক'জন বুনো ছেলিয়ারে সাথে লিয়ে চলিয়ে আসৃছি। মা! আমি তোর ছেলিয়া—(প্রণাম)।

শঙ্করী—(স্মিতহাস্যে আশীর্ব্বাদ করিল) সূর্য্যদেব!

সূর্য্যদেব—মা! আমি কালুর কাছে সব শুনেছি। মা! আজ আমি প্রস্তুত। আমার সমস্ত সৈন্য নিয়ে আজ মা ভুরসুটের রাণীর জন্য আমরা প্রাণ দিতে প্রস্তুত। বল মা! আমরা ভবাণীপুরে গিয়ে সমস্ত বিশ্বাসঘাতকগুলোকে শাস্তি দিয়ে আসি।

(সুমিত্রার প্রবেশ—মুখে অলৌকিক ভাব—দৃঢ়হস্তধৃত কৃপাণ)।

সুমিত্রা—তাই করো, মায়ের বীর সন্তান। ভুরসুটকে রক্ষা কর—আমার জীবনের কল্পনাকে বাঁচাও। চলো আমিও যাব—(যাইতে উদ্যত)।

(রাণী তাহার দিকে ব্যাকুল ভাবে চাহিয়া—কুনাল তাহার হাত ধরিল)

হরিদেব—সুমিত্রা! মা আমার! তোমার অপূর্ব্ব শক্তির লীলা আজ ভুরসুট চায়। তোমার আদরের শঙ্করী যে আজ বিপন্ন। মা! এই ব্রাহ্মণের জীবনে মূর্ত্ত হয়ে উঠুক তোদের মাতৃপূজা।

শঙ্করী—সুমিত্রা! (বলিয়া দুই পদ অগ্রসর হইতেই)

সুমিত্রা—আমার রাণী! ভুরসুটের আদর্শ নারী! বল—বল ভাই কি কর্ত্তে হবে?

শঙ্করী—বাজাও তোমার শঙ্খ ভাই—(উভয়ে শঙ্খ বাজাইলেন—বাহিরে তুর্য্যধ্বনি "পাঠান আসছে" দূরাগত বাণী)।

হরিদেব—(জলদ গম্ভীর স্বরে) ডেকে আন মা—বাংলার বীর সন্তানদের! শুনেছ সূর্য্যদেব। গ্রাম্য কুলবধূর সন্ধ্যা-শঙ্খ আজ প্রলয় সুরে বেজেছে! ঐ দেখ মা তোর ছেলেরা জেগেছে।

(দলে দলে সৈন্যরা আসিল—সম্মুখে শ্যামা, অপর দিক দিয়া পাগলা বাউলের গাহিতে গাহিতে প্রবেশ)

"(তোর) মত্ত মাতাল শঙ্খ ভীষণ
বাজিয়ে দে মা বাজিয়ে দে,"

শঙ্করী—শ্যামা! জ্বালিয়ে দে সমস্ত মশাল! সূর্য্যদেব! কর শীঘ্র ব্যূহ রচনা—চল সুমিত্রা—(হরিদেব ও পাগলা বাউল ব্যতীত সকলের প্রস্থান)।

(হরিদেব দেবীর সম্মুখে ধ্যানমগ্ন—পাগলা বাউল মন্দির সোপানে বসিয়া গাহিল—সৈনিকের প্রবেশ)

বাউলের গীত—"চালিয়ে দে মা চালিয়ে দে" ইত্যাদি

বাউল—তুমি এখানে কেন?

সৈনিক—আমরা মন্দির পাহারা দিচ্ছি।

বাউল—কোথায় লড়াই হচ্ছে?

সৈনিক—ওই মাঠে যুদ্ধ হচ্ছে—তুমি লড়াই দেখবে তো গাছে ওঠ গিয়ে—

বাউল—আরে আমি মাকে অগুলে বসে আছি। ঐত ঠাকুরমশাই বসেছেন ধ্যানে। (বাহিরে যুদ্ধের শব্দ—সৈনিকের জয়ধ্বনি—হরিদেবের বাহিরে আগমন—সৈনিকের প্রবেশ)

হরিদেব—কি সংবাদ সৈনিক?

২য় সৈনিক—অপূর্ব্ব যুদ্ধ—রাণীমা শত্রু সৈন্য ধ্বংস করেছেন—ঐ শুনুন শত্রু সৈন্যের আর্ত্তনাদ—আমি যাই।

(২য় সৈনিকের প্রস্থান)

হরিদেব—মা! মা!! মুখ রাখিস্ মা!

বাউল—সব ঠিক চলছে ঠাকুর—ভয় কি?

হরিদেব—মাকে ডাক—

বাউল—মা! মা!! (প্রণাম)

(শ্যামার প্রবেশ, হাতে রক্তসিক্ত তরবারি)

শ্যামা—গুরুদেব আমাদের জয় হয়েছে—পাঠান পরাজিত—পালাচ্ছে—বহু পাঠান হত—

হরিদেব—আমার মা—তোমাদের রাণী।

শ্যামা—নিরাপদ—দেবী আজ অপূর্ব্ব রণকৌশলে পাঠানদের বিধ্বস্ত করলেন। গুরুদেব! বাংলার বীর নর-নারীর এ বীরত্ব ভোলবার নয়; কিন্তু গুরুদেব সুমিত্রা দেবীকে পাওয়া যাচ্ছে না—(প্রস্থান)…(বাহিরে জয়ধ্বনি)।

হরিদেব—মা! মা!! তোর সন্তানদের মুখ রেখেছিস্—আমার দুঃখিনী সুমিত্রাকে বাঁচিয়ে রাখিস্—

বাউল—হয়েছে—হয়েছে ঠাকুর, এবার আমি যাই। (প্রস্থান)

[হরিদেবের আশ্রম—হরিদেব এবং মন্ত্রী বসিয়া]

হরিদেব—এখন ত রাজ্যে বেশ শান্তি বিরাজ করছে। এবার আমি কিছুদিনের জন্য তীর্থ ভ্রমণে যাব মনে করেছি।

মন্ত্রী—আমি বুঝেছি ঠাকুর দেবী সুমিত্রার জন্য আপনার মন ব্যাকুল হয়েছে।

হরিদেব—ঠিক বলেছ বিচক্ষণ মন্ত্রী। মা আমার কোথায় গেল—আর চতুর্ভুজ তারও কোন সন্ধান পাওয়া গেল না—আমি একবার দেখবো।

মন্ত্রী—পাঠান শক্তি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হলো—আপনারই আশীর্ব্বাদ।

হরিদেব—সবই মায়ের খেলা দুর্লভ। মানুষ কি করে? দিল্লীর খবর কিছু পেয়েছ?

মন্ত্রী—না—বিশেষ কিছু পাইনি। তবে শুনেছি মোগল সম্রাট অতীব আনন্দিত হয়েছেন। সম্রাটের দরবারে রাণী ভবশঙ্করী খুবই প্রশংসিত হয়েছেন।

(শ্যামার প্রবেশ ও প্রণাম)

হরিদেব—কি সংবাদ শ্যামা মা?

শ্যামা—সবই শুভ। মন্দিরে আরতি দেখতে যাবার পথে রাণী একবার আশ্রমে আসছেন। (মন্ত্রীকে) আপনি যখন এখানেই আছেন, আমার আর কষ্ট করতে হ'লো না।

হরিদেব—কেন শ্যামা? আমাকে সংবাদ দিলেই ত আমি আশীর্ব্বাদ করে আসতুম।

শ্যামা—তাত জানি না। বোধহয় কোন গোপনীয় পরামর্শ আছে। (প্রস্থান)

হরিদেব—কিছু অনুমান করতে পার মন্ত্রী?

মন্ত্রী—ঠাকুরের খেলা ঠাকুরই জানেন।

হরিদেব—এই আশ্রমেই তারা ফুলের মত ফুটে উঠেছিল—তাদের জীবন প্রভাতে, তারা হেসে খেলে কৈশোরের অনাবিল আনন্দে সকলকে মাতিয়ে দিয়ে যৌবনের কর্ম্মময় জীবনে প্রবেশ করলে। সবই দেখলুম। তাঁদেরই কল্পনা ও কর্ম্মে সকলকে করলে মোহিত। সবই হোল কিন্তু মা আমার কোথায়? (দীর্ঘ নিশ্বাস)

মন্ত্রী—আপনি কি রাণীকে কিছু বলেন নি?

হরিদেব—দুর্লভ তা ত আমি পারি না। (চিন্তামগ্ন)

(পরিচারিকার প্রবেশ)

পরিচারিকা—(প্রণামান্তে) গুরুদেব! রাণীমা আসছেন।

হরিদেব—চল মন্ত্রী—(উভয়ে উঠিলেন) (অপর দিক হইতে রাণীর শ্যামা ও পরিচারিকা সহ প্রবেশ) এস মা! কেন এত কষ্ট করে এখানে এলে বলত? আমায় খবর দিলে আমি ত অনায়াসেই যেতাম।

শঙ্করী—গুরুদেব! এ পবিত্র যায়গায় আসতে আমার কষ্ট! এর বৃক্ষলতা, এর আলো অন্ধকার, এর পাখীর ডাক, ফুলের হাওয়া সবই মধুর স্পর্শে ভরা। ঐ শিলাতলে বসে কতদিন আমি আর—(উদ্বেলিত আবেগে কণ্ঠরুদ্ধ হইল, নয়নে অশ্রু ভরিয়া আসিল—রাণী ধীরে ধীরে সেই শিলার দিকে অগ্রসর হইলেন—সকলের চক্ষে জল—বাহিরে কুনাল গাহিয়া চলিয়াছে—শুনিয়া) কুনাল! কুনাল!!

হরিদেব—শঙ্করী!

শঙ্করী—গুরুদেব! থামলেন কেন? সুমিত্রাকে ডাকলেন না? ডাকুন—ডাকুন!

হরিদেব—মা! ব্রাহ্মণকে কাঁদাস নে আর—

শ্যামা—(কোনও রকমে নিজেকে সংযত করিয়া) মা! কুনালকে ডাকি—সে যে চলে যায়—

শঙ্করী—(আত্মস্থ হইয়া) হ্যাঁ—ডাক (শ্যামার প্রস্থান ও কুনালসহ প্রবেশ) কুনাল! গান গাও।

গান

এমন মধুর নাম আমি ভুলি কেমনে
আকাশ বাতাশ আলো ছায়া
জীবের জীবন পারের মায়া
সবাই কেন ঘুরে মরে আমি জানি নে
এমন নামের বাঁধন ছিঁড়ে রইলি কেমনে?

হরি নামের মধুর ডাকে
ঘর ছাড়া এই বনের পাখী
আমি কারুর মানা মানিনে
এমন মধুর নাম আমি ভুলিনে।

শঙ্করী—এ কি গান গাইলে কুনাল?

কুনাল—আর সব ভুলে গেছি।

শঙ্করী—কুনাল! তোমায় দেখতে পাইনি কেন এত দিন?

কুনাল—সব ছেড়ে দিয়েছি। কেবল গান গাই আর ঘুরে বেড়াই। দেখ না দিদি হাতে কিছু নেই। ঠাকুর আর কেন বসে আছ—এস বেরিয়ে পড়ি।

শঙ্করী—শ্যামা! পরিচারিকাকে যেতে বলে দাও—

(শ্যামার তথা করণ—পরিচারিকার প্রস্থান—সকলে বসিলেন)।

শঙ্করী—গুরুদেব! আমি আপনাদের স্নেহের প্রতাপকে রাজ-সিংহাসনে অভিসিক্ত কর্ত্তে ইচ্ছা করি। আপনাদের মতামত জানতে চাই।

হরিদেব—সবই ত যুক্তিযুক্ত কিন্তু (মন্ত্রী জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাহিলেন)।

শঙ্করী—গুরুদেব! আমি রাজমাতা—তারই প্রতিভূ হয়ে রাজকার্য্য চালাব। অভিষেকের কার্য্যে বিলম্ব করা আর যুক্তিযুক্ত মনে হয় না। আমরা ত রইলাম। এই অভিষেক বার্ত্তা আমি রাজ্যে প্রচার কোর্ব্ব—গুরুদেব! বিচক্ষণ মন্ত্রী!

হরিদেব—বুঝেছি মা তোমার গূঢ় উদ্দেশ্য।

মন্ত্রী—রাণী! আপনার দূরদর্শিতার পরিচয় পেয়ে মোহিত হলাম।

হরিদেব—মা! আমার তীর্থ গমন তা হলে স্থগিত থাকবে। আগামী বৈশাখী পূর্ণিমার শুভলগ্নে কুমার প্রতাপের অভিষেক হবে। রাজ্যে ঘোষিত হোক। কিন্তু দিল্লীতে—

শঙ্করী—তার ব্যবস্থাও করেছি। কাল প্রত্যুষে সূর্য্যদেব দিল্লী যাত্রা কর্ব্বেন। সব প্রস্তুত কেবল আপনাদের সম্মতি সাপেক্ষ।

মন্ত্রী—এ অতি উত্তম কথা। আমার উপর আদেশ মাত্রই যোগ্য ব্যবস্থা কোরব।

শঙ্করী—আর একটা কথা—খুব বেশী আড়ম্বরের আবশ্যকতা দেখিনা, তবে আপনারা যা কোর্ব্বেন তাতে আমার আপত্তি নেই। সকলে সম্মত? গুরুদেব! (প্রণাম করিলেন—হরিদেবের আশীর্ব্বাদ) কুনাল একটা গান গাও ত ভাই—

কুনাল—কি গান গাইব? কীর্ত্তন?

শঙ্করী—কীর্ত্তন?

কুনাল—এখন আমি সেই গানই গাই—

(কুনালের গীত)

ষষ্ঠ দৃশ্য

(ভুরসুটের রাজসভা)

[দূরাগত মঙ্গলবাদ্য—ভুরসুটের শ্রেষ্ঠ বীরগণ সমাসীন—নারী-সৈন্যগণ, দীননাথ, সূর্য্যদেব, কানু সর্দ্দার, বিশ্বনাথ, সামন্তগণ বসিয়া আছেন। চন্দ্রাতপতলে ভুরসুটের রাজ-সিংহাসন—রাণী শ্যামাসহ এবং মন্ত্রী আসিয়া বসিলেন—সকলের সম্মান জ্ঞাপন]

শঙ্করী—(হাত তুলিয়া সকলকে বসিতে বলিলে সকলে বসিল)

সূর্য্যদেব—(উঠিয়া) শাহন শাহ দিল্লী সম্রাটের সেনাপতি অম্বরপতি মহারাজা মানসিংহ—

(মহারাজ মানসিংহের প্রবেশ—সঙ্গে রামসিংহ তার হস্তে সম্রাট প্রদত্ত দ্রব্যাদি—রাণী ও সভাস্থ সকলে উঠিলেন)

শঙ্করী—মহামান্য অম্বরপতি! ভুরসুটের পক্ষ থেকে আমি আপনাকে সসম্মানে অভ্যর্থনা করছি।

(মন্ত্রী আসিয়া তাড়াতাড়ি অম্বরপতিকে সিংহাসন পার্শ্বে বসাইলেন)

মানসিংহ—মহিয়সী রাণী আমি সানন্দচিত্তে ভুরসুটের আসন গ্রহণ করলাম। (মাথা নত করিলেন। রাণীও তাহাই করিলেন)

(হরিদেব প্রতাপনারায়ণসহ প্রবেশ—সকলের জয়ধ্বনি)

হরিদেব—(প্রতাপকে রাণীর হস্তে দিয়া) এই নাও মা! ভুরসুট সিংহাসনের অধিকারী—

(প্রতাপনারায়ণের অভিষেকযোগ্য বেশ—তেজোদৃপ্ত মুখমণ্ডল দেখিয়া সকলে মোহিত হইল—রাণী তাহার হাত ধরিয়া লইলেন—প্রতাপ সম্মান প্রদর্শন করিয়া মাতার নিকট বসিল ও সকলে বসিল)

শঙ্করী—গুরুদেব! মহারাজা মানসিংহ!

(উভয়েই স্মিতহাস্যে অনুমতি দিলেন) মন্ত্রী! অভিষেক বিষয়ে উপযুক্ত ঘোষণা করা হয়েছে—রাজ্যের সকল প্রজার কাছে?

মন্ত্রী—(উঠিয়া) দিকে দিকে সকল স্থানে, নগরে, গ্রামে, পাহাড়ে, জঙ্গলে, প্রান্তরে এ বার্ত্তা ঘোষিত হয়েছে—

শঙ্করী—সভাস্থ সকলের অনুমতি নিয়ে অভিষেক কার্য্যে মঙ্গলাচরণ করার জন্য আমি ভূরসুটের পরম হিতৈষী দেশহিতব্রতী সর্ব্বত্যাগী বাংলার ব্রাহ্মণ—পূজনীয় হরিদেব ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে আহ্বান করছি—(মঙ্গলশঙ্খ বাজিল) (হরিদেব স্বস্তিবচন উচ্চারণ করতঃ কুমারের মস্তকে অভিষেক বারি সিঞ্চন করিলেন—অন্যান্য আনুসঙ্গিক কার্য্যাদি সম্পন্ন হইলে পর মহারাজা মানসিংহ সম্রাটের ফারমান পাঠ করিলেন—পরে রাণী ভবশঙ্করী এবং হরিদেব ভট্টাচার্য্য কুমার প্রতাপনারায়ণকে সিংহাসনে বসাইলেন—সকলে জয়ধ্বনি করিলেন—মহারাজা মানসিংহ প্রতাপের মাথায় রাজমুকুট পরাইলেন)

শঙ্করী—গুরুদেব! মহারাজা মানসিংহ! আমার সন্তানগণ! পরলোকগত মহারাজা যে দায়িত্ব রেখে গেছেন—তা তোমাদের বহন কর্ত্তে হবে। জনসাধারণের সহজ সুন্দর স্বাধীনতাকে অত্যাচারের কঠোর শাসনে শৃঙ্খলিত করে শান্তির রাজ্য স্থাপন করা আমার কাম্য নয়। সমস্ত জাতির শক্তি যাতে মায়ের পূজায় নিয়োজিত হয়, ভূরসুটের সন্তানগণ যাতে দেহমন আর ধীশক্তি দিয়ে জাতীয়তার পুষ্টি সাধন করে মানবতার শ্রেষ্ঠ আদর্শ স্পর্শ করতে পারে—ঈশ্বরের সৃষ্টি মাহাত্ম্য সার্থক ক'রে তুলতে পারে—এইটাই হবে ভূরসুটের আদর্শ! রাজা প্রজা সকলেই মায়ের সেবক—আমরা সকলে চলেছি স্রষ্টার মন্দিরে পূজার অর্ঘ্য নিয়ে। এই আদর্শ ভূরসুট গ্রহণ কর্লে—আমার পুত্রের অভিষেক হবে সার্থক—এইটাই যেন আজকের দিনটাকে স্মরণীয় করে রাখে। (বসিলেন)

(জয়ধ্বনি) (প্রজাগণ নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী উপহার দিলেন)

মানসিংহ—ভূরসুটরাজ! রাণী ভবশঙ্করী! গুরুদেব? ভূরসুটের প্রজাগণ! আজ সত্যই অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানাবার উপযুক্ত শক্তি আমার নেই। মহান সম্রাট আপনাদের রাণীর ও আপনাদের শক্তি পূজায় অতীব প্রীত। তাই আমাকে তিনি পাঠিয়েছেন। আজ আমি যা প্রত্যক্ষ করলাম সবই অতীব সুন্দর। যে মহীয়সী নারী এই রাজ্য পরিচালনা কর্চ্ছেন তিনি ভূরসুটের কেন সমগ্র ভারতের গৌরব। রাজার অভিষেকে দিল্লী সম্রাটের শুভেচ্ছা আমার আন্তরিক অভিনন্দন আমি জানাচ্ছি। ভূরসুটের সন্তানগণ! তোমরা তোমাদের ব্রহ্মচারিণী রাণীর পরিচালনায় পাঠানকে বিদূরিত ক'রে বাংলার গৃহস্থকে শান্তি দান করেছ। বাংলার বীর্য্যসাধনা বিদ্যাবুদ্ধি শুধু ভারতের নয় বিশ্বের সভায় আদৃত। গ্রীক বীর্য্য খর্ব্বকারী বাংলার সন্তান! সিংহল বিজয়ী বীরের বংশধর! ভারত কখনও ভুলবে না তোমাদের দান! এই সর্ব্বৈশ্বর্য্যশালিনী মায়ের কোল থেকে যে তোমাদের রাণী—মায়ের মূর্ত্তি নিয়ে সন্তান পালন কর্ত্তে আসবেন এর আর বিচিত্র কি! মা! সব আমরা জানি সম্রাটের আকুল দৃষ্টি মা, ভূরসুটের দিকে পড়ে আছে। আদর্শ হিন্দু নারী! পাতিব্রত্যের অপূর্ব্ব শক্তি তোমাতে—তুমি মা তোমার ব্রহ্মচারিণী অন্তরখানাকে প্রশমিত ক'রে রাজ্য রক্ষায়—বাংলার রক্ষায়—যে ত্যাগের কীর্ত্তি রেখে গেলে—শক্তির যে পরিচয় মা তুমি দিয়ে গেলে তা যেন কখনও বাংলার সন্তান না ভুলে যায়। কে জানে বাংলার—ইতিহাস কি হোত মা, তোমার ত্যাগের সাহায্য না পেলে। আর প্রখর বুদ্ধিশালী বাংলার সর্ব্বত্যাগী ব্রাহ্মণ সার্থক তোমার শিক্ষা। গুণগ্রাহী দিল্লীর বাদশা শাহন শাহ আকবর আপনাদের রাণীর বীর্য্য ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হয়েছেন। পাঠানের দানবীয় শক্তিকে যে ভাবে রাণী পরাজিত করেছেন তার চিহ্ন স্বরূপ সম্রাট তোমাদের রাণীকে "রায় বাঘিনী" খেতাবে ভূষিত করেছেন।

(সকলের জয়ধ্বনির মধ্যে সম্রাটদত্ত উপহার মানসিংহ রাণীকে দিলেন)

রাণী—আমি ভূরসুট রাজ্যের সকল প্রজার পক্ষ থেকে এ সম্মান গ্রহণ করলাম। মহান্ সম্রাট প্রদত্ত এ সম্মান আমার সমস্ত ভূরসুটের—(মাথা নত করিলেন)

[ইতিমধ্যে সভার প্রবেশ পথে গোলযোগ হইল। সকলে উদ্গ্রীব। দূরে দেখা গেল একজন বৃদ্ধ (চতুর্ভুজের প্রবেশ) তাঁহার মুখ মণ্ডল দীর্ঘ গোঁফ দাড়িতে ঢাকা—বেশ ছিন্ন মলিন। পাদুকাহীন পদযুগল ক্ষতবিক্ষত। তাহার আকৃতি বীরত্ব ব্যঞ্জক। সকলে বাধা দিলে সে জোর পূর্ব্বক প্রবেশ করিল। তিনি

বাকশক্তিহীন, কেবল অব্যক্ত শব্দ বাহির হইতেছে। দৌবারিকের বা অন্ত বাধাদানকারীর প্রতি দৃকপাত মাত্র না করিয়া করুণভাবে সব দিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল এবং তাহার মুখ হইতে এক প্রকার অব্যক্ত শব্দ বাহির হইল। সভাস্থ সকলে নির্ব্বাক। কেহ যখন তাহার জবাব দিল না, তখন সে বস্ত্রাবরণ হইতে এক ছোরা বাহির করিতেই একজন প্রহরী তাহাকে আক্রমণ করিতে গেলে—সুমিত্রার প্রবেশ]

সুমিত্রা—মামা! (কণ্ঠ রুদ্ধ)

(ভবশঙ্করী চাহিয়াছিলেন নির্ব্বাক বিস্ময়ে—সুমিত্রার কণ্ঠস্বরে চমক ভাঙ্গিল—হরিদেব চমকিত—সকলে চকিত)

শঙ্করী—(আত্মবিস্মৃত হইয়া চিৎকার করিয়া) সুমিত্রা! (সংযত স্বরে) গুরুদেব! এসেছে সে এসেছে (সুমিত্রা চতুর্ভুজ ও সৈনিকের মধ্যস্থলে চতুর্ভুজকে আগুলিয়া ঊর্দ্ধে উত্থিত সৈনিকের তরবারি) সৈনিক! সূর্য্যদেব! (সৈনিক ভয়ে ত্রস্তে তরবারি নামাইল)

হরিদেব—মা! আমার জননী! ভূরসুটের অভাগিনী কন্যা!

(রাণী শঙ্করী আত্মহারা হইয়া দুই পদ অগ্রসর হইলেন—সকলে সন্ত্রস্ত—চতুর্ভুজ কি যেন খুঁজিতেছে—হাতে ছোরা, কি যেন বিস্মরণ হইতেছে)

সুমিত্রা—এত ক'রে বোঝালুম তবু এলে, মানা শুন্‌লে না। জল খেতে চাইলে জল আন্‌তে গেছি আর চলে এলে। (তার গায়ে স্নেহে হাত বুলাইয়া ইঙ্গিত করিল)

চতুর্ভুজ—(সব মনে পড়িল। বস্ত্রাবরণের একাংশ ছিন্ন করিয়া একটী বড় পুলিন্দা বাহির করিল এবং আনন্দে সুমিত্রার হাত ধরিয়া তাহার দিকে একবার-সিংহাসনের দিকে, রাজারদিকে সকলের দিকে চাহিল এবং অব্যক্ত শব্দের দ্বারা সকলের দিকে কি প্রার্থনা জানাইল)

শঙ্করী—ভুরসুটের সেনাপতি!

হরিদেব—মহাবীর চতুর্ভুজ—সুমিত্রা!

(চতুর্ভুজ তখন ধীরে অগ্রসর হইতেছে সিংহাসনের দিকে। চোখে আনন্দাশ্রু। হরিদেবের দিকে এবং শঙ্করীর দিকে মিনতিপূর্ণ দৃষ্টিতে অনুমতি প্রার্থনা—সুমিত্রা সঙ্গে)

শঙ্করী—গুরুদেব! মন্ত্রি! ভুরসুটের সেনাপতি কি চান? সুমিত্রা আমার বোন—(হাত ধরিল)

সুমিত্রা—হতভাগ্য মামা! (অশ্রুকণ্ঠ রোধ করিল)

(চতুর্ভুজ সেই পুলিন্দাটী ছিন্ন করিয়া বহুমূল্য মণিহার রাজার গলায় পরাইলেন এবং বহুরত্নাবলী সিংহাসনতলে রাখিলেন। পরে পার্শ্বদেশে গোপনস্থানে রক্ষিত নিজ তরবারি রাজার সিংহাসনতলে রাখিলেন—কেহ বাধা দিলেন না। সকলে অবাক হইয়া দেখিলেন। তারপর আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া জয়ধ্বনি দিবার অব্যক্ত শব্দ উচ্চারণ। সকলের জয়ধ্বনি—চতুর্ভুজের মহাআনন্দ। মন্ত্রী তাহাকে পার্শ্বে বসাইতে গেলে সে সুমিত্রার হাত ধরিল।)

হরিদেব—সুমিত্রা, মা! আমায় ত মা তুমি তোমার পিতার ন্যায় ভালবেসেছিলে। মা! আমার একি করলি?

সুমিত্রা—আমায় আর অপরাধী কর্ব্বেন না। নিয়তি—সব তাঁরই খেলা, সেই ঘোর রজনীতে যখন দেখলাম আমার ভুরসুটের মানরক্ষা হয়েছে—আর আমার করার কিছু নেই, তখনই মনে হলো আমার সমস্ত জীবনের অবলম্বন মামাকে। (রাণীকে) অপরাধ নিও না, ভাই! আমি দুর্ব্বলা—পেলাম না দেখতে—বাড়ীতে ছুটলাম—গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে। বহুদিনের অনুসন্ধানের পর খানাকুলের জঙ্গলে মামাকে পেলাম, কিন্তু তখন সব শেষ (কণ্ঠরুদ্ধ) মামা আমার নিজের হাতে জীবনটা কেটেছে। তখনও মুখ দিয়ে রক্ত পড়ছে। অনেক শুশ্রূষার পর—সারিয়েছি। বোধশক্তি সব নেই, কিন্তু যখনই রাজার অভিষেকের বার্ত্তা গেল, আর তাকে ধরে রাখতে পারলাম না। ভবানীপুরে ছুটে এল। গুরুদেব! আমিও জানতাম তাঁর এই অভিসন্ধি—

(সকলের চক্ষে জল)

মানসিংহ—ভুরসুটের রাণী! তোমার জয়ের শক্তি!

সুমিত্রা—(রাণীকে) আমি সব জানি ভাই, আমার আশা সফল হয়েছে।

হরিদেব—সুমিত্রা! চতুর্ভুজকে বুঝিয়ে দাও তোমার বোন শঙ্করী মহান্ সম্রাট কর্ত্তৃক সম্মানিত হয়েছেন।

(সুমিত্রা তাহা করিল)

[চতুর্ভুজ রাণীর দিকে কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে চাহিল—তাহার চক্ষে জল। সে আনন্দে নৃত্য করিল—সকলের জয়ধ্বনি—রাণী অবনত মস্তকে দাঁড়াইয়া সম্মান দেখাইলেন]

যবনিকা

সম্পাদকীয়

কংগ্রেসের দায়িত্ব

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের দায়িত্বের কথা ভাবিতে হইলে আগেই ভারতবর্ষের কথা ভাবিতে হয়, ভারতবর্ষের বিশেষত্বের কথা ভাবিতে হয়; যুগ যুগ ধরিয়া ভারতবর্ষ অপর দেশের সঙ্গে এবং অপর দেশগুলি ভারতবর্ষের সঙ্গে কি সম্পর্কের যোগসূত্রে বাধা ছিল, তাহার কথা ভাবিতে হয়।

ভারতবর্ষ জনবহুল স্থান—সমগ্র পৃথিবীর এক-পঞ্চমাংশ লোকের বাস এই দেশে। ভারতের কথা পৃথিবীর পাঁচ ভাগের এক ভাগের কথা। শুধু জনবহুল নহে, ভারতবর্ষ জমি-বহুলও বটে। আয়তনের দিক দিয়া দেখিতে গেলে ভারতবর্ষ হইতে দেশ হিসাবে রাশিয়া বা চীন বৃহত্তর বটে, কিন্তু ভারতবর্ষের মত আয়তন অনুপাতে জমির বৃহত্ত্বতা এই সমস্ত দেশে নাই। আরও স্পষ্ট করিয়া বলিতে হইলে বলিতে হয় যে, যে সমস্ত ভূমিতে শস্য জন্মান বিশেষ ভাবে বিজ্ঞান সম্মত উপায় অবলম্বন না করিয়া সহজ ভাবে এবং স্বাভাবিক উপায়েই হইতে পারে, তাহাকে আমরা যদি 'জমি' আখ্যা দিই, তবে ভারতের মত জমি-বহুল দেশ পৃথিবীর অন্যত্র কোথাও নাই।

ভারতবর্ষ শুধু জন-বহুল ও জমি-বহুলই নয়, ভারতবর্ষ নদী-বহুলও বটে। এই নদী-বহুল দেশের এমন স্থান খুবই বিরল যেখানে একশত মাইল দূরত্বের মধ্যে দুইটী বৃহতী স্রোতস্বতী এই দেশকে জলসিক্ত করিয়া না গিয়াছেন। আজ এই নদীগুলির অধিকাংশই শুষ্ক ও বালুকা পরিপূর্ণ বা শীর্ণ ধারায় পর্য্যবসিত বটে, কিন্তু এমন একদিন ছিল যখন ইহাদের প্রত্যেকটিই কুলে কুলে জলপূর্ণ থাকিয়া দেশ-মাতৃকাকে স্নিগ্ধ ও উর্ব্বর করিয়া রাখিত। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সঙ্গে তুলনা করিলে দেখা যাইবে যে, ভারতবর্ষের মত এত সংখ্যক স্রোতস্বিনী আর কোথাও দেখা যায়না।

এই নদীর স্রোতে বহমান শস্য-খাদ্য ভাণ্ডার মাটীর অন্তর্দ্দেশ হইতে রস-কণা মিশ্রিত অবস্থায় আমাদের মা-টীকে সরস, সতেজ ও শস্য-শালিনী করিয়া তুলিত। ফলে স্বভাবতঃই খাদ্য-শস্য এত প্রচুর পরিমাণে জন্মাইত যে, এত জন-বহুল দেশেও খাদ্যের অভাবের প্রশ্ন ত দূরের কথা, খাওয়া পরার অভাব কাহাকে বলে, আমাদের দেশের সাধারণ জন-শ্রেণীর তাহা জানাই ছিল না। কথা ছিল এই দেশে: জীব দিয়াছেন যিনি, আহার দিয়াছেন তিনি; সুতরাং অভাবের কথা অবান্তর।

শুধু অভাব ছিল না তাহাই নহে—যথেষ্ট উদ্বৃত্ত ছিল। এই উদ্বৃত্ত খাদ্যে ভাগ বসাইবার জন্য বাহিরের লোক সব সময়ই থাকিত ভারতের দিকে একান্তভাবে চাহিয়া। ভারতে আসিতে পারিলেই অভাবের অবসান ঘটিবে—সব দেশেই, বিশেষতঃ ইউরোপে এইরূপ মনোভাব বিদ্যমান ছিল। ভারতের জমিতে সোনা ফলে—এইরূপ কথা লোক-পরম্পরায় জানা যাইত।

সাধারণ বণিক হিসাবে ইংরাজ জাতি ভারতে প্রবেশ করেন এবং বণিক হইতে তাঁহারা এদেশের রাজা হন। ভারতের রাজা হইয়া তাঁহারা পৃথিবীর প্রথম জাতির সোপানে আরোহন করেন। ইংরাজের

শিল্প-যুগের প্রবর্ত্তন (Industrial Revolution) সম্ভব হইয়াছিল ভারত তাহাদের অধিকারে ছিল বলিয়া। ইংরাজের ব্যাঙ্কিং ও মুদ্রামানের স্থিতিত্ব সম্ভব হইয়াছিল ভারতের বিশিষ্ট দানের জন্য।

ভারতের ইতিহাস যখন আমরা পড়ি, তখন স্বতঃই মনে হয় যে, ভারত ছিল একটা দেশ যেখানে লোকেরা ঘরোয়া বিবাদ-বিসংবাদ লইয়া কলা-কৌশলের সৌন্দর্য্যে মাতিয়া প্রাচুর্য্যের আরামে ডুবিয়া দিন কাটাইয়া দিত। কোথা হইতে এত অবসর সময়ের সুবিধা ভারতীয়দের আসিত তাহা চিন্তা করাও যেন তাহাদের কোন প্রয়োজনীয়তা ছিল না। ভারতীয় রাজগণ কখনও একত্রিত হইতে পারেন নাই—নিজেদের মধ্যে মারামারি করিয়াছেন, বিলাস-ব্যসনে জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন এবং তাঁহাদের বড়ত্ব স্থাপনের জন্য অদ্ভুত স্থাপত্য, কলা ও চারুশিল্পের নিদর্শন চতুর্দ্দিকে রাখিয়া গিয়াছেন—যাহা সম্ভব ছিল অখণ্ড অবসর ও অগনিত অর্থব্যয়ের সুবিধার জন্য। তারপর মুসলমান আসিল লুণ্ঠনের উদ্দেশ্যে। প্রচুর লাভ করিলেন তাঁহারাও। তাই স্থিতি করিলেন দিল্লীর মসনদে বাদ্‌শাহ হইয়া। দিল্লীর বাদ্‌শাহ দুনিয়ার ইতিহাসে সম্রাটত্বের চুরান্ত নিদর্শন। তাঁহারা খরচ করিয়া গিয়াছেন দুই হাতে, কিন্তু তথাপি আয়কে ব্যাকুল করিতে পারেন নাই। এমন দেশে আসিল ইউরোপীয়, আসিল ইংরাজ এবং তাহাদের নিজেদের দেশ ভারতের ছেঁাওয়া পাইয়া ফলে, ফুলে, আনন্দে, বিজ্ঞানে, উৎকর্ষতায় ভরপুর হইয়া উঠিল।

এ হেন ভারতে আজ বিদেশী শাসনের অবসান ঘটিয়াছে—আজ ভারতীয় ভারতের শাসনকর্ত্তা, ভারতের ভাগ্যবিধাতার পদে আসীন। কিন্তু সে সোনার ভারত আজ আর নাই। আজ ভারতের ভূমি ত্রিধা বিভক্ত; আজ ভারতের জমি শুষ্ক, বিফলপ্রসূ; আজ ভারতের নদী শীর্ণা, ক্ষীণা, রসহীনা; আজ ভারতের জন জীর্ণ, বুভুক্ষু, রোগগ্রস্ত ও মৃত্যুন্মুখ। কেন এবং কি কারণে সোনার ভারত মরণোন্মুখ ভারতে পরিণত হইল, তাহা লইয়া আলোচনা করা আমাদের এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। আমরা শুধু আলোচনা করিতে বসিয়াছি যে, আজ এই অবস্থায় আমাদের দায়িত্ব কি? কংগ্রেস রাজত্বভার গ্রহণ করিয়াছেন—আমাদের দায়িত্ব বলিতে তাই কংগ্রেসের দায়িত্ব সম্বন্ধেই আলোচনা করিতে হইবে।

দায়িত্বের কথা ভাবিতে বসিলে প্রথমেই ভাবিতে হয় জনসাধারণ যাহাতে প্রকৃত ভাবে শিক্ষিত হইয়া উপার্জ্জনক্ষম হ'ন, তাহার ব্যবস্থার কথা। সেই উদ্দেশ্য সাধন করিতে ছয়টি ব্যবস্থা দেশের মধ্যে প্রবর্ত্তন করিতে পারিলে উপার্জ্জনক্ষম লোকের পক্ষে নিজ নিজ জীবিকার্জ্জন করিতে কোন ক্লেশ ভোগ করিতে হয় না। যে ছয়টি ব্যবস্থা দেশের মধ্যে প্রবর্ত্তিত করিতে পারিলে উপার্জ্জনক্ষম লোকের স্ব স্ব জীবিকার্জ্জনে কোন ক্লেশ ভোগ করিতে হয় না, তাহা সাধারণতঃ নিম্নলিখিত ভাবে ভাগ করা যাইতে পারে—

(১) দেশের মধ্যে যাহাতে মোট লোকসংখ্যার শতকরা ত্রিশ জনের বেশী শিল্প, বাণিজ্য, ওকালতী, ডাক্তারী প্রভৃতি ব্যবসায়, শিক্ষকতা ও সরকারী চাকুরীর উপর নির্ভরশীল না হয় এবং যাহাতে কৃষি লাভবান হয়, তাহার ব্যবস্থা;

(২) জমির স্বাভাবিক উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি পাইয়া যাহাতে সাধারণ সারের ব্যবহারেই প্রতি বিঘায় অন্ততঃ ১২ মণ ধান অথবা গম অথবা সেই মূল্যের অন্যান্য শস্যাদি উৎপাদিত হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা;

(৩) যে-সমস্ত জমির উৎপাদিকা শক্তি উপরোক্ত অবস্থা হইতে যথেষ্ট হীনতর, সে সমস্ত জমিতে যাহাতে কৃষকদের চাষ না করিতে হয় এবং যাহাতে সেই সমস্ত জমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি করিবার জন্য সরকার চেষ্টা করিতে আরম্ভ করেন, তাহার ব্যবস্থা ;

(৪) নদীগুলি যাহাতে এত গভীর হয় যে, বর্ষাকালে বৃষ্টির পরিমান যতই বেশী হউক না কেন, তাহার দুই তীর প্লাবিত হইবার কোন সম্ভাবনা না থাকে, তাহার ব্যবস্থা এবং দেশস্থ বনভাগ যাহাতে বৃক্ষ-হীন হইবার আশঙ্কা না থাকে, তাহার ব্যবস্থা ;

(৫) বিভিন্ন খাদ্য-শস্য, খাদ্য-দ্রব্য, শিল্পজাত ব্যবহার্য্য জিনিষ এবং গৃহনির্ম্মাণের উপকরণের বিভিন্ন জিনিষের মূল্যের মধ্যে যাহাতে সাদৃশ্য (Parity) থাকে, তাহার ব্যবস্থা ; এবং

(৬) সাংসারিক জীবিকানির্ব্বাহের খরচ ও পারিশ্রমিকের মধ্যে যাহাতে সাদৃশ্য (Parity) থাকে, তাহার ব্যবস্থা।

মূলতঃ উপরোক্ত ব্যবস্থাগুলি প্রবর্ত্তন ও চালু করিতে না পারিলে উপার্জ্জনক্ষম লোকেরা নিজ নিজ জীবিকার্জ্জন করিতে বাধাপ্রাপ্ত হন এবং অবশেষে তাহাদের জীবিকার্জ্জনের চেষ্টা প্রতিহত হইয়া তাহারা নানাভাবে বিপদগ্রস্ত হইতে থাকেন। সুতরাং কংগ্রেসের প্রধান দায়িত্ব এই ব্যবস্থাগুলি যাহাতে দেশে চালু থাকিতে পারে, তাহার জন্য কার্য্য করা। কিন্তু এই ব্যবস্থাগুলি চালু করিতে হইলে আমাদের কি করা উচিত ? কোন্ দিকে আমাদের মৌলিক চেষ্টা চালাইতে হইবে ?

প্রসঙ্গক্রমে এখানে বলিয়া রাখা প্রয়োজন যে, আমাদের কংগ্রেস গভর্ণমেণ্ট ইহা উপলব্ধি করেন যে পূর্ব্ব চিন্তিত পরিকল্পনা অনুযায়ী না চলিলে সমষ্টিগত উন্নতির কার্য্য হইতে পারে না। তাই তাঁহারা পরিকল্পনা সমিতির (Planning Commission) নিয়োগ করিয়াছেন এবং এই পরিকল্পনা সমিতির অনুসন্ধান ও মতানুযায়ী দেশকে নিয়ন্ত্রিত করিবেন—এইরূপ স্থির করিয়াছেন। পরিকল্পনা সমিতি একটী পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (Five years' plan) দিয়াছেন। গভর্ণমেণ্ট এই পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্য্য করিতে অগ্রসর হইবেন, এইরূপ প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন এবং বহিরাগত বহু মনীষীও এই পরিকল্পনার যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছেন। এই পরিকল্পনায় সমস্যা হিসাবে প্রথমতঃ নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলির অবতারণা করা হইয়াছে, যথা—

(১) যুদ্ধ এবং ভারত বিভাগের জন্য দেশের মধ্যে যে অর্থনৈতিক অসামঞ্জস্য আসিয়া পড়িয়াছে, তাহার সঙ্গতি বিধানের ব্যবস্থা,

(২) কতকগুলি দেশীয় মৌলিক অবস্থার আশু উন্নতি বিধানের পরিকল্পনা ও চেষ্টা—যাহাতে ভবিষ্যতে অর্থনৈতিক উন্নতি বর্দ্ধিত হারে হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা,

(৩) বাস্তুহীনদের সমস্যা সমাধানের ব্যবস্থা, এবং

(৪) আমাদের শাসনতন্ত্রানুযায়ী যাহাতে সমতা ও উত্তরোত্তর প্রগতিশীল অর্থনৈতিক সৌন্দর্য্যের পরিপুষ্টি সাধিত হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা।

আমরা মনে করি যে, উপরিলিখিত প্রসঙ্গের সমাধান করিবার জন্য যে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা হইয়াছে, তাহা দ্বারা দেশের ও দশের সমূহ কিছু উপকার দেখা গেলেও অবশেষে বিশেষ কোন

উন্নতির সম্ভাবনা দেখা দিবে বলিয়া বলা চলে না। পরিকল্পনা সাময়িক অবস্থা লইয়া করিলে সুফল লাভ করা কঠিন, কিন্তু পরিকল্পনার কার্য্য এমন হইবে যে, সাময়িক অসুবিধাগুলিও দূর করিবার জন্য যত্নবান হইতে হইবে।

যাহা হউক, দেশীয় উন্নতির পরিকল্পনা লইয়া ভাবিতে বসিলে প্রথমেই ভাবা একান্ত দরকার যে, কি করিলে দেশের সকল লোক প্রথমতঃ খাইতে পাইবে ও দ্বিতীয়তঃ পরিতে পারিবে। এই খাওয়া-পরাই আজ সমস্ত দেশে জাতীয় জীবনের বিষম বিভ্রাট। সবাইকে খাওয়াইবার বন্দোবস্ত করিতে হইলে দেশে যথেষ্ট খাদ্য উৎপাদিত হওয়া দরকার। বিদেশ হইতে খাদ্য আমদানী করিয়া সবাইকে খাওয়ান যায় না। সবাইকে ঠিক মত পরিবার জন্য কাপড়-চোপড় দিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে চাই যথেষ্ট তুলার উৎপাদন। তুলার উৎপাদনের সঙ্গে চাই বস্ত্রশিল্প প্রবর্ত্তন। এই খাওয়ার জিনিষ ও পরার জিনিষ উৎপাদনের পিছনে রহিয়াছে দেশের কৃষিকার্য্য। আগেই বলিয়াছি, ভারতবর্ষ জমিবহুল ও জনবহুল স্থান। এইরকম দেশে জন যাহাতে জমি লইয়া সন্তুষ্ট চিত্তে জীবন যাপন করিতে পারেন, সেই সম্ভাবনার অবস্থা থাকিলে সঙ্গে সঙ্গে খাওয়া ও পরার চিন্তারও অবসান ঘটে এবং বেশীরভাগ লোকের পক্ষে অভাব বা অকর্ম্মণ্যতার প্রশ্নও থাকে না। ভারতবর্ষে কৃষিকার্য্যকে প্রধান এবং লাভজনক কার্য্যে পরিণত করিতে পারিলে একাদিক্রমে অনেক প্রশ্নেরই সমাধান হওয়া সম্ভব।

একটু হিসাব করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, শতকরা অন্ততঃ ৭০জন লোক যদি লাভজনক কৃষিকার্য্য লইয়া জমিতে ব্যস্ত থাকেন, তাহা হইলে দেশের সমস্ত লোকের পক্ষে যথেষ্ট খাওয়া-পরার জিনিষও প্রস্তুত হইবে এবং অধিকাংশ লোকের পক্ষেই গ্রামে থাকিয়া কর্ম্মব্যস্ত সুখী-জীবন যাপন করা সম্ভব হইবে। সুতরাং লাভজনক কৃষিকার্য্য কি করিয়া হইতে পারে, তাহার প্রচেষ্টায় একান্তভাবে আত্মনিয়োগ করাই আমাদের কংগ্রেস সরকারের প্রথম কার্য্য। লাভজনক কৃষিকার্য্য সম্ভব কেন হইতেছে না—এ বিষয় লইয়া চিন্তা করিলে দেখা যাইবে যে, ভারতের জমিতে প্রতি একরে খাদ্যদ্রব্য জন্মাইবার হার ক্রমশই কমিয়া আসিতেছে। এ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত সংখ্যাগুলি আমাদের কথার সাক্ষ্য জোগাইবে। দেখা যাইবে যে, ভারতবর্ষে যে জমিগুলিতে গমের চাষ হয়, তাহা হইতে প্রতি একরে নিম্নোক্ত হারে ফসল জন্মাইয়াছে—

১৯২৯-৩০ সালে	৮১২ পাউণ্ড
১৯৩২-৩৩ „	৬৮৪ „
১৯৩৪-৩৫ „	৬২৯ „
...	...
১৯৪৬-৪৭ „	৪৩৭ „

যে সমস্ত জমিতে ধান চাষ করা হয়, তাহাতে গড়ে প্রতি একরে নীম্নোক্ত হারে চাউল ফলিয়াছে—

১৯২৯-৩০ সালে	৮৭০ পাউণ্ড
১৯৩২-৩৩ „	৮৫০ „
১৯৩৪-৩৫ „	৮৩২ „
...	...
১৯৪৬-৪৭ „	৭২৮ „

সুতরাং জমির উর্ব্বরাশক্তি যে কমিয়া আসিতেছে, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। উর্ব্বরাশক্তির হ্রস্বতাকে যুঝিবার জন্য কর্ষিত জমির পরিমাণ বাড়াইতে হইতেছে এবং তাহার ফলে কৃষককে ক্রমাগত এমন সমস্ত জমি চাষ করিতে হইতেছে যাহা হইতে উদ্বৃত্ত হওয়া ত দূরের কথা, তাহাদের নিজের এবং নিজ পরিবারভুক্ত লোকের দুই বেলা উদরপূর্ত্তি করিয়া খাইবার মতও যথেষ্ট শস্য উৎপাদিত হইতেছে না। কিছুদিন কৃষক তাহার জমিতে অনেক কষ্টেও পড়িয়া থাকেন, কিন্তু অবশেষে জমি ছাড়িয়া মজুর-গোষ্ঠীতে চাকুরী যোগাড় করিতে পারেন কিনা, তাহার জন্য বুভুক্ষু অবস্থায় তাহাকে ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়। ফলে তাহার উৎপাদিত শস্য শুধু কমিয়া যায় না, মজুরের মজুরী কমিবার জন্য তাহার অস্তিত্ব যথেষ্ট সহায়তা করে। তাই, এই কৃষককে তাহার জমিতে সুখে, স্বাচ্ছন্দ্যে এবং লাভজনক উপায়ে রাখিতেই হইবে।

কৃষককে তাহার জমিতে এইভাবে রাখিতে হইলে জমির উর্ব্বরাশক্তি বাড়াইবার চেষ্টা করিতে হইবে। জমির উর্ব্বরাশক্তি বাড়াইতে হইলে ভারতে নদীগুলি যাহাতে অবাধে তাহাদের উৎপত্তি স্থান হইতে পতন স্থল পর্য্যন্ত সাবলীল গতিতে আপন পথে প্রবাহিত হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা অটুট রাখিতে হইবে। তবেই জমিগুলি থাকিবে সরস ও শস্য-খাদ্যে ভরপূর। তবেই গ্রামগুলি হইয়া উঠিবে আবার শস্য-শ্যামলা মাতৃরূপা। ভারতের নদীগুলি নিজ নিজ পথে সাবলীলগতিতে প্রবাহিত হইতে বাধাপ্রাপ্ত হওয়াতেই শুষ্ক হইয়া জীর্ণা, শীর্ণা ও বালুকাপূর্ণা হইয়া যাইতেছে। নদীর স্বাভাবিক পথের বাধাগুলি যাহাতে দূরীভূত হইতে পারে, শুধু তাহার চেষ্টা করিলেই এই ভারতবর্ষে খাদ্যাভাব ও বস্ত্রাভাব দূর হইতে বেশী দিন লাগিবার কথা নয়।

একজন কৃষকের পরিবার গড়ে সাধারণত ৪টি প্রাণীতে হইয়া থাকে। এই ৪টি প্রাণীকে খাইয়া থাকিবার জন্য বৎসরে ৪০ মণ, পরিবার ও অন্যান্য সামগ্রী ক্রয় করিবার জন্য ৪০ মণ ও খাজনা প্রভৃতি দিতে আরও ৪০ মণ—মোট ১২০ মণ ফসল বৎসরে পাইলে প্রতিটি কৃষক পরিবারের শান্তিতে জীবন কাটিতে পারে। ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, একটি কৃষক পরিবার ১০বিঘা জমির বেশী নিজেরা চাষ করিতে পারেন না; সুতরাং বিঘা প্রতি ১২ মণ ফসল হওয়া তাহার পক্ষে একান্ত দরকার। বিঘা প্রতি ১২ মণ ফসল অর্থে একর প্রতি ২৯৫০ পাউণ্ড ফসল। যেখানে একর প্রতি ২৯৫০ পাউণ্ড চাউল হওয়া প্রয়োজন, সেখানে আজ ৭২৫ পাউণ্ডের বেশী হয় না। ফলে চাষীর জীবনে চাষ লইয়া চলা আর সম্ভব নহে। কোনক্রমে প্রয়োজনের এক-চতুর্থাংশ মাত্র জমি হইতে চাষী আজ পাইতে পারেন। এই অবস্থার দূরীকরণ অবিলম্বে করা প্রয়োজন।

এই অবস্থার দূরীকরণের জন্য প্রথমেই চেষ্টা করিতে হইবে যাহাতে জমির স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি অন্ততঃ এতখানি হইতে পারে যাহাতে ন্যূনপক্ষে ১২ মণ চাউল বা তন্মূল্যের অন্যান্য শস্য বিঘাপ্রতি জন্মাইতে পারে এবং যে সমস্ত জমির স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি ইহা হইতে হীনতর, তাহাদের স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি বৃদ্ধি করিবার প্রয়াস এখন হইতেই করিতে হইবে। যদি প্রয়োজনের জন্য এই সমস্ত হীনতর জমি চাষীদের চাষ করিতে হয়, তাহা হইলে যে পর্য্যন্ত না এই সমস্ত জমির স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি উপরিলিখিত ভাবে উন্নীত হয়, সে পর্য্যন্ত কৃষকদিগকে সরকার হইতে সমতুল ভাবে সাহায্য দিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তিকে বাড়াইতে হইলে নদীগুলি যাহাতে গভীরভাবে কূলদেশ প্লাবিত না করিয়া আপনার স্বাভাবিক পথে অবাধে চলিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। নদীর গভীরত্ব এই জন্য

এতখানি হওয়া দরকার যে, ভূ-মধ্য বালুকাস্তরের অন্তর্দ্দেশ পর্য্যন্ত এই নদীর জলরাশির পৌছান আবশ্যক— যাহাতে বালুকাস্তর জলসিক্ত হইয়া আপনা হইতেই ছুই নদীর মধ্যবর্ত্তী স্থানকে রস-সিঞ্চিত করিয়া রাখিতে পারে এবং সঙ্গে সঙ্গে পর্ব্বতদেশ হইতে আনীত শস্যখাদ্যের ভাণ্ডার এই জলকণার সঙ্গে সঙ্গে জমির অন্তঃস্থলে স্বাভাবিক ভাবেই জমা হইতে পারে।

এই ভাবে খাদ্য-শস্য ও পরিধেয় সামগ্রীসমূহ উৎপাদনের যথেষ্ট ব্যবস্থা হইলে সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার প্রবর্ত্তন করিতে হইবে। শিক্ষা এমন হওয়া চাই যাহাতে প্রত্যেক লোক অন্ততঃ নিজ নিজ জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য একটী না একটী কার্য্য শিক্ষা করিতে পারেন এবং তৎসঙ্গে ভাষা শিক্ষা ও কলাবিদ্যা আয়ত্ত করিতে পারেন। লাভজনক কৃষি ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইলে দেখা যাইবে যে, পাঁচ মাস শ্রমের ফলে বার মাসের আহার্য্য ও ব্যবহার্য্য প্রস্তুত হইয়াছে। বাকী সাতমাস যদি ইহারাই শিল্প, কলা, কৌশল ইত্যাদি শিক্ষা করিয়া ঘরে বসিয়া বস্ত্র বয়ন হইতে আরম্ভ করিয়া মৃত্তিকা-পাত্র পর্য্যন্ত প্রস্তুত করেন, তবে এই সমস্ত শিল্প ও কলাজাত সামগ্রী সামান্য মাত্র মূল্যে বিক্রয় করিলে যথেষ্ট লাভ থাকিয়া যায়। কুটীরশিল্পে দেশ তখন ভরিয়া উঠিবে এবং প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্ভারে ঘর পূর্ণ হইয়া যাইবে। এমতাবস্থায় সরকারকে মূল্যের সমতা লইয়া আসিতে হইবে ছুই-ভাবে, একভাবে প্রস্তুত জিনিষপত্রের বিক্রয়মূল্য হইতে যাহাতে পরিবারের ভরণপোষণ করা সম্ভব হয়, সেইভাবে শ্রমের মূল্য নির্দ্ধারণ এবং অন্যভাবে যাহাতে কৃষিজাত, শিল্পজাত, মস্তিষ্ক-প্রসূত বিভিন্ন পদার্থের মধ্যে মূল্যের এমন সমতা থাকে যেন কৃষকের শিল্পী হইবার প্রচেষ্টা বা শিল্পীর উকীল হইবার প্রচেষ্টা বা উকিলের খাদ্য-দ্রব্য উৎপাদনের প্রচেষ্টা করিবার ঔৎসুক্য জন্মাইতে না পারে।

চিন্তা করিয়া দেখিলে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, আমরা যে পন্থার কথা কহিলাম, সেই পন্থায় সত্যিকারের উন্নতি লাভ হইতে পারে এবং উন্নতি করিতে হইলে উহাই একমাত্র পন্থা। ভারতে যেদিন 'সোনা' ফলিত, আমাদের মতে সেদিন ভারতে এই ব্যবস্থাই বিদ্যমান ছিল। কিন্তু সে স্থলে যদি আমরা আমাদের পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনার লাইন ধরিয়া শুধু সাময়িক অসুবিধা অপনোদনের চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করি, তাহা হইলে আমরা খানিকটা বিলাতী-ভাবাপন্ন হইতে পারিব সন্দেহ নাই, কিন্তু সেই বিলাতের আজ যে অবস্থা হইয়াছে, অচিরে আমরাও সেই অবস্থায় আসিয়া পড়িব। আমরাও দেখিব যে, যুদ্ধ করিয়া না বেড়াইলে আমাদের ব্যবসা চলে না; আমরাও দেখিব—শান্তির প্রচেষ্টা কথার কথা মাত্র; আমরাও দেখিব যে, শ্রেণীতে শ্রেণীতে, কর্ম্মীতে কর্ম্মীতে মারামারি ও গোলযোগ হওয়াই স্বভাবের ধর্ম্ম। এবং এমনি ভাবে আজিকার ছুনিয়ার অনেক কিছুই আমাদের ঘাড়ে চাপিয়া বসিবে। ভারতের যে নিজস্ব দান—শান্তি, শৃঙ্খলা ও সুখ—তাহা আমরা চিরতরে ভুলিয়া যাইব।

আজ কংগ্রেসের নেতাদের এ বিষয়ে ভাবিবার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে। দেশের লোক যখন কংগ্রেসকেই দেশ শাসন ও সংরক্ষণের জন্য নির্ব্বাচিত করিয়াছে, তখন কংগ্রেসের দায়িত্ব সমধিক বর্দ্ধিত হইয়াছে সন্দেহ নাই। আমরা আশা করি যে, কংগ্রেস এই গুরু দায়িত্বভার সম্মানের সহিত বহন করিতে পারিবেন এবং আমাদের শোক, ছঃখ, জরাজীর্ণ ভারত এবং দুর্ব্বল ও ক্ষীয়মান ভারতীয়দের আবার সেই সুখ শান্তিতে ভরপুর ভারতে এবং সক্ষম ও সবল ভারতীয়তে পরিণত করিতে পারিবেন।

খাদ্যমন্ত্রী সম্মেলন

গত ২০শে ফেব্রুয়ারী নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠিত রাজ্য-খাদ্যমন্ত্রী-সম্মেলনের দুই দিবস ব্যাপী অধিবেশন শেষ হয়। দেশের অন্নভোজি অঞ্চলসমূহ, বিশেষ করিয়া দক্ষিণ ভারতের রাজ্যসমূহ যাহাতে প্রচুর পরিমাণে চাউল পাইতে পারে, তজ্জন্য যে-সমস্ত উপায় অবলম্বন করা যায়, তৎসম্পর্কে সুপারিশের ফলেই এই অধিবেশন আহূত হয়। সম্মেলনে স্থির হয় যে, যে সমস্ত অঞ্চলে চাউল প্রধান খাদ্য নয়, সেই সমস্ত অঞ্চলে চাউল মজুত করিবার জন্য কঠোরতম ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে। যে সমস্ত রাজ্যে চাউল প্রধান খাদ্য নয়, সেই সমস্ত রাজ্যে প্রধানতঃ তিনটি ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য সুপারিশ করা হয়, যথা: (১) অন্ন-ভোজিদের রেশনে চাউলের পরিমাণ দৈনিক ৬ আউন্সের বেশী হইবে না; (২) যাহারা মিশ্র খাদ্য গ্রহণে অভ্যস্ত, তাহাদিগকে রেশনে ১ আউন্সের বেশী চাউল দেওয়া হইবে না, এবং (৩) আবাসিক হোটেল ব্যতীত রেষ্টুরেন্ট্ প্রভৃতি কোনো প্রতিষ্ঠানে চাউল সরবরাহ করা হইবে না, এবং হোটেলগুলিতে উপরোক্ত পরিমাণ চাউলের বেশী দেওয়া হইবে না।

সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী শ্রীযুক্ত কে, এম, মুন্সী এবং উদ্বোধন করেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহেরু। মধ্যপ্রদেশ ও সৌরাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রীদ্বয় সহ চৌদ্দটি রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রিগণ আলোচ্য সম্মেলনে যোগদান করেন। ভারতের প্রয়োজনীয় খাদ্য লইয়া যে বিরাট ও জটিল সমস্যা আজ দেখা দিয়াছে, তাহার প্রায় সব কয়টি দিক লইয়াই মুন্সীজি ও পণ্ডিতজি স্বতঃস্ফূর্ত্ত আলোচনা করিয়াছেন। কার্য্যকরী ব্যবস্থার দিক হইতে শেষ পর্য্যন্ত সম্মেলনে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়, মোটামুটি তাহা হইতেছে—'চাউল সংগ্রহের জন্য সমগ্র ভারতব্যাপী সরকারী প্রয়াস; গমভোজি অঞ্চলে রেশনে চাউলের বরাদ্দ হ্রাস এবং চাউলভোজি অঞ্চলে চাউলের ঘাটতি পূরণের যথাসাধ্য চেষ্টা। চাউলের সহিত গমজাত দ্রব্য ভোজনে যাহারা অভ্যস্ত, তাহাদিগকে রেশনে দৈনিক এক আউন্সের বেশী চাউল দেওয়া হইবে না।'—প্রধানত দক্ষিণ ভারতের চাউলের ঘাটতি পূরণ করিবার জন্যই রুদ্ধদ্বার-কক্ষে সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাব গৃহীত হয়।

ইহার পিছনে কিছু রাজনীতির প্রভাব থাকা অস্বাভাবিক নয়। সে আলোচনা হইতে আমরা অবশ্য বিরত থাকিব। সম্মেলনের গৃহীত সিদ্ধান্তের ফলে ইতিমধ্যেই দক্ষিণ ভারতের সমস্যার কিছু সুরাহা হইয়াছে কি না, আমরা জানি না। তবে সিদ্ধান্তের দিকে চাহিয়া হতাশ্বাসে একথা স্পষ্টই উচ্চারণ করা যায়: এই দুর্গত অবস্থা আর কতকাল চলিবে? স্বয়ং মুন্সীজিও কিন্তু এ প্রশ্নের আশানুরূপ জবাব দিতে পারেন নাই, বরং প্রচলিত বৎসরের দিকে ইঙ্গিত করিয়া তিনি বলিয়াছেন—'এবার গতবারের অপেক্ষা অধিক পরিমাণ বিদেশী চাউল পাওয়া তো দূরের কথা, গতবার যাহা পাওয়া গিয়াছিল, ততটা পাওয়ারও আশা নাই।' প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, গত বৎসর নানা দিক হইতে ভারত সরকার আমদানী করিয়াছিলেন ৭ লক্ষ ৫৮ হাজার টন চাউল।—এইরূপ যখন সাম্প্রতিক অবস্থা, তখন মাদ্রাজের খাদ্যমন্ত্রী দিল্লী সম্মেলনে পৌঁছিবার পূর্ব্বে যে উক্তি করেন, তাহা এস্থলে সবিশেষ চিন্তা ও আলোচনার বিষয়। তিনি এই বলিয়া দাবী জানান যে, '১৯৫২ সালে ৬ লক্ষ টন চাউল ও ৩ লক্ষ টন গম, একুনে ৯ লক্ষ টন কেন্দ্রীয়

খাদ্য সাহায্যের দ্বারা মাদ্রাজের চলিবে না, মাদ্রাজকে আরও অধিক পরিমাণে কেন্দ্রীয় সাহায্য দেওয়ার আবশ্যক হইবে।' বোম্বাইয়ের খাদ্যমন্ত্রীও প্রায় অনুরূপ দাবীই করিয়াছেন।

এ ক্ষেত্রে সমস্যা যে কতখানি জটিল, তাহা যে কোনো ব্যক্তিই উপলব্ধি করিবেন। সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্তের দ্বারাও যে এ সমস্যার আশু প্রতিকার সম্ভব হইবে, তাহা মনে হয় না। খাদ্যের অত্যধিক সরবরাহ ও বিশেষভাবে উৎপাদন বৃদ্ধিই এখন একমাত্র ভরসা। কিন্তু এ প্রসঙ্গে খাদ্যমন্ত্রী কোনোরূপ আশার কথাই বলিতে পারেন নাই। তিনি কেবল স-দ্বিধায় উচ্চারণ করিয়াছেন যে, বর্ত্তমান বৎসরের খাদ্য উৎপাদন গত বৎসর হইতে কম হইবে না। ইহার মধ্যে যে আশু সমস্যার কিছুমাত্র সমাধান নাই, তাহা স্পষ্টই লক্ষণীয়। ইংরেজিয়ানার সুরকে বহাল রাখিয়া গত ১০ বৎসরে ভারত সরকার 'অধিক খাদ্য ফলাও' আন্দোলনে প্রায় সহস্রাধিক কোটি টাকা ব্যয় করিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির পক্ষে তাহা বিশেষ কিছু সহায়ক হয় নাই। সমস্যার অধিকাংশ নিজের হাতে তুলিয়া লইয়াও 'পরিকল্পনা কমিশন' কার্য্যতঃ এ পর্য্যন্ত কিছু সুরাহা করিতে পারেন নাই। ভারতের ক্রমবর্দ্ধিত লোকসংখ্যার তুলনায় দেশের খাদ্যব্যবস্থা যে ক্রমশঃই হ্রাসপ্রাপ্ত হইতেছে, ইহা লক্ষ্য করিয়াও যথাসময়ে যে ইহার প্রতিকারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় নাই, সে অপরাধ কাহার? এ প্রশ্নের উত্তরে মুন্সীজি অবশ্যই নীরব থাকিবেন। ভারতের খাদ্যসম্পর্কিত আত্মনির্ভরতার সূত্রে তিনি কেবল বলিবেন: 'বর্ত্তমান ঘাটতি মিটাইবার জন্য অতিরিক্ত খাদ্য উৎপাদন এবং সরকারের রেশনব্যবস্থা চালাইবার জন্য যথেষ্ট পরিমাণ খাদ্য সংগ্রহ—ইহা যখন সম্ভব হইবে, তখনই ভারতকে খাদ্য বিষয়ে আত্মনির্ভরশীল বলা যাইতে পারে।' এ উক্তি তাঁহার ন্যায় বয়োবৃদ্ধ পণ্ডিত কেন, সাধারণ একটি মাইনর-ছাত্রও স্পষ্ট উচ্চারণ করিতে পারে। মুন্সীজির কথাদৃষ্টে 'পরিকল্পনা কমিশন' অবশ্য এজন্য ১৯৫১-৫২ সাল হইতে ১৯৫৫-৫৬ সাল পর্য্যন্ত অতিরিক্ত উৎপাদনের একটা পরিমাণ নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। ইহাতে মুন্সীজির চারিটি নির্দ্দেশই স-রবে উচ্চারিত হইয়াছে, যথা: (ক) জমি সংস্কার, (খ) সেচ অঞ্চলে প্রকৃষ্টভাবে চাষ, (গ) উৎকৃষ্টতর বীজ ও সার সরবরাহ, এবং (ঘ) জলহীন অঞ্চলে সেচের বন্দোবস্ত।

ইহার প্রত্যেকটি বিষয়ই যে কৃষি-জীবনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, এ কথা পরিকল্পনা কমিশন বা মুন্সীজি স্বয়ং নিশ্চয়ই জানেন। কিন্তু তাঁহারা কি ইহাও জানেন না যে, দেশের অগণিত কৃষক সম্প্রদায়ের জন্য তাঁহারা কি পরিমাণ সরকারী সাহায্য করিয়াছেন। ইংরেজ-আমলেও তাহাদের যে চরম দুর্দ্দশার মধ্য দিয়া কাটিত, এখনও ঠিক অনুরূপভাবেই কাটে। তাহাদের অধিকারকে ক্রমশঃ নাকচ করাই হইয়াছে, সুস্থ সবলদেহে বাঁচিয়া থাকিয়া যাহাতে বৃহত্তর জাতীয় জীবনে তাহারা মহাশক্তির উৎসারিত বন্যার মতো কাজে আসিতে পারে, সেদিকে জাতীয় সরকার দৃষ্টি দিয়াছেন বলিলে ভুল বলা হইবে। বলদ দিয়া, লাঙল দিয়া, বীজের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া সেচ্ ব্যবস্থাকে পাকাপাকি করিবার জন্য কৃষক সম্প্রদায় হইতে পুনঃ পুনঃ আবেদন বা দাবী উচ্চারিত হইলেও ভারত সরকার বা রাজ্যসরকার সমূহ কৃষকবৃন্দকে উপযুক্ত সাহায্য করিতে পারেন নাই। এই না-পারার ফলেই যেমন 'গ্রো মোর ফুড' বা 'অধিক খাদ্য ফলাও' আন্দোলন সমূলে মাঠে মারা গিয়াছে, বলা যায় না—আলোচ্য চারিদফা নির্দ্দেশের পরিণামও সেইরূপই দাঁড়াইবে কি না।

দ্বিতীয় প্রশ্ন হইতেছে এই যে, সমস্যা যখন মৃত্যুদূতের ন্যায় দুয়ারে দণ্ডায়মান, তখন পরিকল্পনার পায়তারা কষিয়া সারা দেশের জীবন রক্ষা কি আদৌ সম্ভব ? খাদ্যোৎপাদন না বাড়াইয়া ভারতের গতি নাই, এ কথা নিশ্চিত, এবং তাহা যত সত্বর সম্ভব হয়, ততই মঙ্গল ; কিন্তু তাই বলিয়া আশু সমস্যাকে ব্যঙ্গাত্মকভাবে উপহসিত করিলেও কর্ত্তব্যের কিছু সমাধান হইবে না। ব্যঙ্গ কথাটি স্বতস্ফূর্ত্ত ভাবেই আসিয়া পড়িল ; আলোচনা করিলে তাহার কারণও উপলব্ধি হইবে। যে চাউল লইয়া মুন্সীজি এবং পণ্ডিতজী আজ হিমসিম খাইয়া উঠিয়াছেন, ভারতে যথার্থই কি তাহার অধিক অভাব রহিয়াছে? যদি থাকিবে, তবে প্রাক্‌মৃত্যু জীবনে মহাত্মাজী রেশনপ্রথা বাতিল করিয়া দিতে পরামর্শ দিতেন না। আসলে চোরাকারবারে, কালো বাজারে যে কত কাঙালের ধন হীরা-জহরতের মূল্যে বিকাইয়া যাইতেছে, তাহার কথা সরকারী দপ্তরে পৌঁছাইলেও তাহার হিসাব তাঁহারা রাখেন না। যদি রাখেন, তবে তাহার উপযুক্ত প্রতিকার হয় না কেন ? দুই একটি ঘটনা ধরা পড়িল বা দুই এক ব্যক্তির জরিমানা বা ততোধিক কঠোর সাজা হইল, ইহাই যথেষ্ট নয়। এন্‌ফোর্স্‌মেণ্ট বিভাগ যদি আরও কিছু সক্রিয় হইতেন, তবে 'গুপ্তধন' উদ্ধারের মতো অনেক গুপ্ত রহস্যই ফাঁসিয়া যাইত, এবং অধিক পরিমাণে চাউল স্বল্পমূল্যে আপামর দেশবাসীর ভোগে আসিতে পারিত। সাম্প্রতিক চাউল সমস্যা সমাধানের ইহাকেও আমরা একটি বড় দিক বলিয়া বিবেচনা করি। দেশে চাউল থাকিতেও চাউলের পরিবর্ত্তে আটা এবং আটার পরিবর্ত্তে কেহ যদি বজ্‌রা খাইবার নির্দ্দেশ দেন, তবে সেই নির্দ্দেশ ব্যঙ্গাত্মক উপহাস ভিন্ন কি ?

খাদ্যমন্ত্রী সম্মেলনের রুদ্ধদ্বারকক্ষে যে সিদ্ধান্ত প্রথম গ্রহণ করা হইয়াছে, অর্থাৎ—'চাউল সংগ্রহের জন্য সমগ্র ভারতব্যাপী সরকারী প্রয়াস', সে-প্রয়াস আমরা আশা করি, ঐ গুপ্তধন উদ্ধারের সর্ব্বাত্মক প্রয়াসেই সার্থক হইয়া উঠিবে। উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যবস্থা ইহার সঙ্গে সঙ্গেই চলিতে থাকিবে।

বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবীতে পূর্ব্বপাকিস্থানে সঙ্ঘাত

পূর্ব্ব-পাকিস্থানে মাতৃভাষা 'বাংলা'র রাষ্ট্রিয়করণের দাবী লইয়া আবার একটা জীবনান্ত ঘটনা সংঘটিত হইয়া গেল। ঘটনাটা আকস্মিক হইলেও অভূতপূর্ব্ব নয়। পূর্ব্বপাকিস্থানের সীমা নির্দ্ধারিত হইবার পর স্বতন্ত্র রাষ্ট্রশাসনের ক্ষমতা বিধিবদ্ধ হইবার সময় হইতেই পূর্ব্বপাকিস্থানের জনসাধারণের জীবনে নানা সমস্যার ন্যায় ভাষা-সমস্যাটিও গুরুত্তররূপে দেখা দেয়। বাংলাদেশ বিভক্ত হইয়া পূর্ব্বপাকিস্থানের সৃষ্টি হইলেও—যে সাড়ে চারি কোটি অধিবাসীকে লইয়া সেই রাজ্য-ব্যবস্থা, তাঁহারা কিন্তু রাতারাতিই তাঁহাদের আজন্ম সাধনলব্ধ মাতৃভাষা বাংলাকে নিঃশেষে ভুলিয়া পুরাদস্তুর আরবি, ফার্সি বা উর্দ্দু-সংস্কৃতজ্ঞ হইয়া উঠিতে পারিলেন না। পৃথিবীর কোনো দেশের কোনো রাষ্ট্রের ইতিহাসেই এমন নজির নাই। সেই সাধনলব্ধ বাংলাভাষার মাধ্যমেই যাহাতে স্কুল, মক্তব, মাদ্রাসা, কলেজ, আদালত প্রভৃতির শিক্ষাদীক্ষা ও কার্য্য পরিচালিত হয়, তজ্জন্য একটি সক্রিয় ও সঙ্ঘবদ্ধ প্রচেষ্টা গত ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্টের পর হইতেই পূর্ব্বপাকিস্থানের নানা অঞ্চলে গড়িয়া ওঠে। কিন্তু করাচীর উর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষের কঠোর ব্যবস্থা ও সেই ব্যবস্থার পরিপূরক হিসাবে পূর্ব্বপাকিস্থান-সরকারের হুকুমনামায় উর্দ্দুকেই একমাত্র ভাষা হিসাবে গ্রহণ

করিতে হইবে। ইহা পূর্ব্বপাকিস্থানের জনসাধারণের উপর একরকম জোর করিয়া চাপাইয়া দেওয়া রাষ্ট্রাধিকার ভিন্ন আর কিছুই নয়। এই সরকারী জুলুমকে যদি স্বীকার করিয়া লইতে হয়, তবে সেখানকার জনসাধারণের মতানুসারে শুধু আঞ্চলিক সংস্কৃতিই বিপন্ন হইবে না, সেই বিপন্ন সংস্কৃতির কবরের উপর দাঁড়াইয়া আপামর অধিবাসীবৃন্দকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিপর্য্যয়কে বরণ করিয়া লইয়া নিঃশেষে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে হইবে। আর যদি সেই সরকারী আদেশকে অস্বীকার করিতে হয়, তবে সত্য ও ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার ভিত্তিতে সরকারী আইনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া বেয়নেটের গুলি, টিয়ার গ্যাস আর লাঠির নির্ম্মম আঘাতকেই বরণ করিয়া লইতে হইবে—যাহার সমুদ্যত শক্তি সম্পর্কে কিছুমাত্র সংশয় নাই।

সুখের বিষয় যে, ঘটনা নির্ম্মম হইলেও অধিকার প্রতিষ্ঠার সেই ক্ষুরধার পথকেই পূর্ব্বপাকিস্থানের যুবক ছাত্রসমাজ বাছিয়া লইয়াছেন। বাছিয়া লইবার ন্যায়সঙ্গত কারণ আছে বলিয়াই তাঁহাদের উদ্দীপ্ত জয়ধ্বনিতে উত্তর ও পূর্ব্ববঙ্গের মাটি আজ এমন জীবন-তরঙ্গে কাঁপিয়া উঠিয়াছে। পাকিস্থানে মোট জনসমষ্টির দুই-তৃতীয়াংশের মাতৃভাষা হইতেছে বাংলা। সেই 'বাংলা'র রাষ্ট্রিয়করণের দাবীতে গত ২১ ও ২২শে ফেব্রুয়ারী ঢাকায় ৮ টি ছাত্র-জীবন সরকারী বেয়নেটের গুলিতে নিঃশেষিত হয়। সঙ্গে একজন পথচারীকেও প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে হয়। নিহত ছাত্রগণের মধ্যে একটি আট বৎসরের বালকও ছিল। এই শোচনীয় হত্যাকাণ্ড আকস্মিক হইলেও ইহার বীজ দীর্ঘকাল পূর্ব্বেই উপ্ত হইয়াছিল। হত্যাকাণ্ডের পর পূর্ব্বপাকিস্থান-ব্যবস্থা-পরিষদে প্রধান মন্ত্রী জনাব নুরুল আমিন অবশ্য এইরূপ মর্ম্মে এক প্রস্তাব উত্থাপন করেন যে, বাংলাভাষাকে পাকিস্থানে অন্যতম রাষ্ট্রভাষারূপে গ্রহণ করিবার জন্য পূর্ব্ববঙ্গের ব্যবস্থা পরিষদ দাবী জানাইতেছে; কিন্তু বিরাট বিক্ষোভের উপর ইহাকেও একটা সাম্প্রতিক প্রলেপ ভিন্ন আর কিছু ভাবা চলে না। অবস্থা পারম্পর্য্যে নুরুল আমিন সাহেব হয়ত অনেকটা নিজের ভুল উপলব্ধি করিতে পারিয়াই পরিষদের তরফ হইতে এই দাবী তুলিয়া থাকিবেন, কিন্তু তাঁহার যে ভুল ও অবিমৃষ্যকারিতার ফলে নয়-নয়টি তাজা প্রাণ এইভাবে রক্তক্ষরিত বুকে নিঃশেষিত হইয়া গেল, তাহার জন্য সম্পূর্ণ দায়ী কি একমাত্র তিনিই ন'ন? বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব তিনি যদি ২২শে ফেব্রুয়ারী না করিয়া ২১ শে ফেব্রুয়ারী করিতেন, তবে অন্ততঃ তাঁহার দেশেরই এই সবুজ প্রাণগুলি রক্ষা পাইতে পারিত এবং ভবিষ্যতে তাঁহাদের দ্বারা হয়ত বৃহত্তর সমাজ-কল্যাণও সাধিত হইতে পারিত। তাঁহার এই বিলম্বিত ভ্রম-সংশোধনের জন্য তিনি জাতির চোখে কৃপার পাত্র হইতে পারেন, সন্দেহ নাই, কিন্তু ক্ষমার পাত্র মোটেই ন'ন্। দ্বিতীয়তঃ, 'প্রলেপ' শব্দটি ব্যবহার করিয়াছি এই কারণে যে, নুরুল আমিন সাহেব ব্যবস্থা পরিষদের অনুরূপ দাবী তুলিলেও করাচীর কর্ত্তৃপক্ষ তাহা গ্রাহ্য এবং স্বীকার করিবেন কিনা, তাহাতে সন্দেহ আছে। উত্তর ও পূর্ব্ববঙ্গের বাঙ্গালী মুসলমানদের উপর তাঁহারা যে গোড়া হইতেই সহৃদয় সম্পন্ন নহেন, তাহার পরিচয় ইতিপূর্ব্বেই স্পষ্টভাবে ধরা পড়িয়াছে। পূর্ব্বপাকিস্থানের নানা সরকারীপদে ও সমাজের বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ইতিপূর্ব্বে বিহারী ও অন্যান্য আঞ্চলিক মুসলমানকে বহাল করিয়া করাচীর উর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষ বাঙালী মুসলমান সম্প্রদায়কে যে শিক্ষা দিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, সে ইতিহাস এত সত্বরই মুছিয়া যাইবার নয়। তখন পাক-প্রধানমন্ত্রী ছিলেন লিয়াকৎ আলী খাঁ। তাঁহার মৃত্যুর পর খাজা নাজিমুদ্দিন সাহেব

সেই প্রাধান্য সহস্তে গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি পূর্ব্ববঙ্গের অধিবাসী হইয়াও উর্দ্দুভাষী। উর্দ্দুর প্রতি স্বাভাবিক মমতা তাই তাঁহার পক্ষে বিসর্জ্জন দেওয়া যেমন কষ্টসাধ্য, তেমনি করাচীর একান্ত অনুগত ও আজ্ঞাবাহী মন্ত্রী হইয়া নুরুল আমিন সাহেবের পক্ষে উর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষের বিরুদ্ধ-কার্য্যে কতদূর অগ্রসর হওয়া সম্ভব, তাহাও বিবেচ্য বিষয়। খাঁজা সাহেব উর্দ্দুভাষী হইলেও পূর্ব্ব পাকিস্থানের সাড়ে চারি কোটি নরনারী যে বাংলা ভাষায়ই কথা বলেন, ভাষা বলিতে একমাত্র বাংলা ভাষাই বোঝেন, উর্দ্দু আদৌ জানেন না, জনসাধারণের সঙ্গে উর্দ্দুর কোনোকালেই যোগাযোগ নাই, এই অতিবড় সত্যটি নিশ্চয়ই তাঁহার অজ্ঞাত নয়। কিন্তু তৎসত্ত্বেও করাচীর পরিবেশের প্রভাব তিনি কাটাইয়া উঠিতে পারেন নাই, এবং সেই কারণেই ঢাকা-সফরে আসিয়াও একমাত্র উর্দ্দুর পক্ষেই তাঁহাকে নূতন অভিমত ব্যক্ত করিতে হইয়াছে। সেই অভিমতের বিরুদ্ধে শিক্ষিত জনসাধারণ ও ছাত্রসমাজ সুস্পষ্ট প্রতিবাদ জানাইলেও নুরুল আমিন সাহেব তথা পূর্ব্বপাকিস্থান-সরকার তাঁহাদের নিজেদের অভিমত ব্যক্ত করিয়া কর্ত্তব্য পালন করিতে পারেন নাই, বরং ভাষা লইয়া একটা সাধারণ ও স্বাভাবিক আন্দোলনের কণ্ঠ রোধ করিবার জন্য ১৪৪ ধারা জারী করেন। সব চাইতে মজার এবং আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে; পূর্ব্ব-পাকিস্থান-ব্যবস্থা-পরিষদ বাংলার সপক্ষে রাষ্ট্রিয়করণের দাবী জানাইবার পরেও বহু ছাত্র, অধ্যাপক এবং জননেতাকে বলপূর্ব্বক গ্রেপ্তার করিয়া হাজতে আবদ্ধ করা হয়। নুরুল আমিন সাহেব যদি আন্দোলনের সপক্ষেই আন্তরিক ভোট দিয়া থাকিবেন, তবে তাঁহার সেই ভোট-ধ্বনির পরেও এইরূপ ফ্যাসিষ্ট্ জাতীয় সরকারী অভিনয় কেন?

বিশ্ব-ইতিহাসের প্রতি লক্ষ্য করিলে একথা তাঁহারা স্পষ্টই উপলব্ধি করিতে পারিবেন যে, রাষ্ট্রের দুই-তৃতীয়াংশ লোকের দাবী যেখানে ন্যায় ও সত্যের উপর ভিত্তিশীল, সেখানে যথেষ্ঠ নির্য্যাতনের দ্বারা জোর করিয়া তাহাদের উপর কিছু চাপাইয়া দিলেই দীর্ঘকাল তাহা স্থায়ী বা অটুট থাকে না; প্রলয় ভূমিকম্পের মতো একদিন তাহা ধ্বসিয়া পড়ে। করাচীর কর্ত্তৃপক্ষকে আজ না হউক্ কাল জনগণের এই ন্যায়সঙ্গত দাবী স্বীকার করিয়া লইতেই হইবে। সেই স্বীকৃতি সহজ ও বন্ধুত্বপূর্ণ পথে আসিলেই সরকারের প্রতি জনসাধারণের মমতা অধিক জাগ্রত থাকিত। আমরা আশা করি, পূর্ব্ব পাকিস্থান সরকার তথা করাচীর উর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষ শুভবুদ্ধিপ্রণোদিত হইয়া রাষ্ট্রনিরাপত্তার দিক হইতেই বাংলা ভাষাকে পূর্ব্ব পাকিস্থানের রাষ্ট্রভাষারূপে সরকারী ঘোষণার মাধ্যমে স্বীকার করিয়া লইয়া জনসাধারণের প্রীতি ও শ্রদ্ধাভাজন হইবেন।

১৯৫২-৫৩ সালের রেলওয়ে বাজেট

গত ২২শে ফেব্রুয়ারী নয়াদিল্লী সংসদে পরিবহন ও রেলওয়ে মন্ত্রী শ্রীএন, গোপালস্বামী আয়েঙ্গার একটি 'শ্বেতপত্র' আকারে ১৯৫২-৫৩ সালের রেলওয়ে পরিচালনার আয়ব্যয়ের আনুসঙ্গিক হিসাব পেশ করিয়াছেন। অন্যান্য বৎসর যে স্থলে বাজেট পেশ করা হয়, এ বৎসর সেখানে বাজেটের স্থান গ্রহণ করিয়াছে—'হোয়াইট্ পেপার'—ইহাই এবারের বিশেষত্ব। হিসাবানুসারে বিবেচিত হয় যে, ১৯৫২-৫৩ সালে রেলওয়ে পরিচালনার দরুণ উদ্বৃত্ত থাকিবে ২৫ কোটি টাকা। ১৯৫১-৫২ সালের উদ্বৃত্ত হার ২২

কোটি টাকা। আর্থিক কমিশনারের একটি মুখবন্ধ দ্বারা শ্বেতপত্রের সুরু হইয়াছে। উহাতে রেলওয়ে উন্নয়নের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এবং রেলওয়েকে যে সকল ভিন্নমুখী সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে, তাহার বিবরণ আছে। নব ভারতের আর্থিক সংগঠনে রেলওয়ে যাহাতে উপযুক্ত অংশ গ্রহণ করিতে পারে, তজ্জন্য কি কি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে, শ্বেতপত্রে তাহারও একটি আলোচনা রহিয়াছে।

কয়লা সংক্রান্ত একটি বিশেষ প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে, কয়লা চালানের মাশুল বর্ত্তমান হার অপেক্ষা শতকরা প্রায় ৩০৲ টাকা বৃদ্ধি করা হইবে। ইহাতে যে অতিরিক্ত প্রায় ৬ কোটি টাকা আয় হইবে, তন্মধ্যে রেলবিভাগ কর্ত্তৃকই তাহাদের কয়লা ব্যবহারের দরুণ প্রদত্ত হইবে ২ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা। ফলতঃ কয়লা ব্যবহারকারী অন্যান্য শিল্প প্রতিষ্ঠানকে নীট ৩ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা দিতে হইবে। পাঠকবৃন্দের সুবিধার্থে আমরা বাজেটটিকে শ্রেণীবদ্ধ ভাবে নিম্নে সাজাইয়া দিলাম। টাকার অঙ্ক কোটি টাকার হিসাবে ধরিতে হইবে।—

	১৯৫০-৫১ সালের সঠিক হিসাব	১৯৫১-৫২ সালের বাজেট	১৯৫১-৫২ সালের সংশোধিত বাজেট	১৯৫২-৫৩ সালের বাজেট
যাত্রী ও মাল বহনের দরুণ মোট আয়—	২৬৩	২৭৯	২৮৮	২৯৯
পরিচালনার মোট ব্যয়—	১৮০	১৮৭	১৯৬	২০৩
বিবিধ ব্যয়—	৫	৭	৭	৭
ক্ষয়ক্ষতির তহবিলে সংরক্ষিত—	৩০	৩০	৩০	৩০
মোট ব্যয়—	২১৫	২২৪	২৩৩	২৪০
মোট রেলওয়ে রাজস্ব—	৪৮	৫৫	৫৫	৫৯
সাধারণ রাজস্বে দেয় অংশ—	৩৩	৩৩	৩৩	৩৪
নীট উদ্বৃত্ত—	১৫	২২	২২	২৫

মূলধনী ব্যয়, রেলওয়ে সমস্যা, পুনর্গঠনের কাজ, সাজসরঞ্জাম উৎপাদনের চেষ্টা, রেলওয়ের পুনর্ব্বিন্যাস, ভাড়ার সামঞ্জস্য বিধান, ব্যয় সঙ্কোচ, শ্রমিক সম্পর্ক, লক্ষণীয় উন্নতি প্রভৃতি নানা বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করিয়া শ্রীযুক্ত আয়েঙ্গার ১৯৫০-৫১ ও ১৯৫১-৫২ সালের আয়-ব্যয় সম্পর্কে বিস্তৃত ভাবে বক্তৃতা প্রদান করেন। উপরোক্ত শ্রেণীবদ্ধ হিসাবের উদ্বৃত্তাংশের প্রতি লক্ষ্য করিলে স্পষ্টই দেখা যায়—১৯৫০-৫১ সাল হইতে ক্রমেই কি ভাবে এই উদ্বৃত্তের হার বৃদ্ধি পাইয়া আজ প্রায় দ্বিগুণ মুনাফায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

রেলওয়ে কোম্পানীর এই উদ্বৃত্তের মূলে রহিয়াছে প্রধানতঃ তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী। ইহাদেরই দেয় অর্থ ক্রমাগত রেলওয়ে কোম্পানীর উদ্বৃত্তের হার বাড়াইয়া তুলিয়াছে। অথচ তাহাদিগকে যথেষ্ট পরিমাণে সুযোগ সুবিধা করিয়া দিবার আশা দিয়াও অদ্যাবধি মাইলপ্রতি একমাত্র ভাড়াবৃদ্ধি করা ভিন্ন আর কিছুই করা হয় নাই। ভাড়া বৃদ্ধি একমাত্র তৃতীয় শ্রেণীর উপরেই প্রযোজ্য হয় নাই, আপামর সমস্ত শ্রেণীর যাত্রীর উপরেই হইয়াছে। কিন্তু যাত্রীর সুখ-সুবিধা এমন কি হইয়াছে, তাহা আমরা জানি না। চলতি বৎসরে উচ্চতর শ্রেণীর ভাড়া আদায় হইয়াছে ১৩ কোটি ৮৯ লক্ষ টাকা, আর তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়া আদায়

হইয়াছে ৯৯ কোটি ৩৩ লক্ষ টাকা। আগামী বৎসরেও উচ্চতর শ্রেণীর ভাড়া ১৩ কোটি ৬৪ লক্ষ টাকা এবং তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়া ৯৮ কোটি ৫৫ লক্ষ টাকা আদায় হইবে বলিয়া ধার্য্য হইয়াছে। যাহাদের নিকট হইতে প্রতি বৎসর এই ভাবে প্রায় একশত কোটি টাকা আদায় হয়, সেই তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী পূর্ব্বেও যেরূপ কষ্ট ভোগ করিত, আজও সেইরূপই কষ্ট ভোগ করিয়া চলিয়াছে। বাজেটে তাহাদের জন্য অবশ্য ৩ কোটি টাকার একটা বরাদ্দ রাখা হইয়াছে, কিন্তু ইহা সর্ব্বশ্রেণীর যাত্রীসাধারণকে মিলাইয়াই বরাদ্দ, বিশেষ ভাবে তৃতীয় শ্রেণীর জন্য নয়। এই তিন কোটি টাকা হিসাবের বরাদ্দে দেখান হইয়াছে—

পায়খানা সংস্কার বাবদ—		৩৫৲	হাজার	টাকা
ষ্টেশনে জল	,,	১২,০৭	,,	,,
বিশ্রামাগার	,,	৩২,৫৭	,,	,,
খাবারের দোকান	,,	১২,৪৯	,,	,,
প্লাটফর্ম্ম উন্নতি	,,	৬৫,৩৭	,,	,,
পুল সংস্কার	,,	১০,৭১	,,	,,
প্লাটফর্ম্ম ও ওয়েটিং হলে আলো ও পাখা		১৭,৯৩	,,	,,
ষ্টেশনে স্নানাগার	,,	১,২২	,,	
ষ্টেশনের রাস্তা সংস্কার	,,	৭,১৫	,,	,,
গাড়ীতে আলো, পাখা প্রভৃতি বসানো	,,	৪৭,৪৯	,,	,,
টিকিট কেনা প্রভৃতির সুবিধার জন্য কাজ	,,	৮৭,৬০	,,	,,

যাত্রীজনসাধারণ এই তালিকাটি হইতেই নিজেদের সুখ-সুবিধার অঙ্ক কষিয়া লইতে পারিবেন। প্রশ্ন হইতেছে—যে গাড়ীর মাধ্যমে যাত্রীদের নিকট হইতে অর্থ গ্রহণ করা হয়, সেই গাড়ীর উন্নতির জন্য স্বতন্ত্রভাবে যাত্রীসাধারণের সুখ-সুবিধা হেতু বরাদ্দ তহবিলের টাকা লওয়া হইবে কেন? আর প্যাসেঞ্জার এ্যামিনিটিজ ফাণ্ডের টাকায়ই বা পুল, ওয়েটিং হল, প্লাটফর্ম্ম প্রভৃতির জন্য বরাদ্দ ধার্য্য হইবে কেন?

সম্প্রতি যাত্রীর ভাড়া আর নতুন করিয়া বাড়ে নাই বটে, তবে কয়লার ভাড়া বাড়ানো হইয়াছে। ইহার প্রতিক্রিয়া কয়লার বাজারে কিরূপ পড়িবে, তাহা সহজেই প্রতীয়মান হইতেছে। যেখানে মুনাফা আজ পঁচিশ কোটি টাকায় উঠিয়াছে, সেখানে হঠাৎ এমন কয়লার ভাড়া বাড়াইতেই বা রেলকর্ত্তৃপক্ষ উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন কেন? ইহার দুর্ভোগ ভুগিতে হইবে তো শেষ পর্য্যন্ত জনসাধারণকেই! বিষয়গুলি সম্পর্কে আমরা রেলকর্ত্তৃপক্ষ তথা ভারত সরকারকে বিবেচনা করিয়া দেখিতে বলি।

কলিকাতায় আন্তর্জ্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব

সাম্প্রতিক কলিকাতা ইডেন গার্ডেনে অনুষ্ঠিত আন্তর্জ্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবানুষ্ঠান বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য ঘটনা। সমগ্র এশিয়া মহাদেশে এই অনুষ্ঠান এই প্রথম। গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল ডাঃ হরেন্দ্র কুমার মুখার্জ্জি ইহার উদ্বোধন করেন। ২৩টি বিভিন্ন রাষ্ট্রের চলচ্চিত্র-কৃতিত্ব ২৬টি বিভিন্ন ভাষায় দশটি সিনেমার পর্দ্দায় উদ্ভাসিত হইয়া ওঠে। ভারতবাসীর জীবনে ইহা এক পরম বিস্ময় ও স্বপ্নের সৃষ্টি করে। উৎসবের জন্য একটি কেন্দ্রীয় ও তিনটি আঞ্চলিক উদ্যোক্তা কমিটি নির্ব্বাচিত হয়। কেন্দ্রীয় কমিটির সভ্য ছিলেন চেয়ারম্যান ক্লিফোর্ড মনোমোহন আগরওয়ালা, সম্পদক—মোহন ভাবনানী, এবং সহ-সম্পাদক—জে. এন্. গঞ্জু ও এইচ. এ. কোলহটকর। যে ২৩টি রাষ্ট্র অনুষ্ঠানে যোগদান করে, তাহারা হইতেছে—যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ইতালী, ফ্রান্স, চীন, জাপান, রাশিয়া, পশ্চিম জার্ম্মানী, চেকোশ্লো-ভাকিয়া, আর্জ্জেন্টিনা, সুইটজারল্যাণ্ড, কানাডা, মিশর, যুগোশ্লাভিয়া, পাকিস্থান, পূর্ব্ব আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া, নরওয়ে, নেদারল্যাণ্ড, রুমানিয়া, হাঙ্গেরী ও ভারত। ইতিপূর্ব্বে উৎসব যথাক্রমে বোম্বাই, মাদ্রাজ ও দিল্লীতে অনুষ্ঠিত হয়। সাধারণতঃ যে সমস্ত বড় চিত্র উৎসবে স্থান পায় ও প্রদর্শিত হয়, সেগুলি হইতেছে: দি লাষ্ট স্কোয়াড (আর্জ্জেন্টিনা); হোয়াইট হেয়াড্ গার্ল ও দি গ্রেট ইউনিটি অব অল্ নেশন্স (চীন); দি ট্র্যাপ ও. ভিক্টোরিয়াস উইঙ্গস্ (চেকোশ্লোভাকিয়া); নাইল বয়, লায়লেট ঘারম (মিশর); লাইফ বিগিন্স, ডেজার্ট ওয়েটিং, ফিয়ারলেস জার্ণি, টুমরো, রিভস্ ছ আমুর, টরেন্ট বিয়ণ্ড দি গেট্স্, চিল্‌ড্রেন অব প্যারাডাইস্, জুর ছ ফেত, ব্লাইণ্ড ব্লু রিয়ার্ড, দি গ্রেট ম্যান, মার্সিলেস্, ম'সিয়ে ভিন্‌সেন্ট, ডিজায়ার, ভিজিট টু প্যারিস (ফ্রান্স); মিসেস্ ডেরী, কলোনী আণ্ডার গ্রাউণ্ড (হাঙ্গেরী); আওয়ারা, অমর ভূপালী, পাতাল ভৈরবী, বাবলা (ভারত); বাইসিকল থিপ, ফর্‌বিডন ক্রাইষ্ট, মিরাক্‌ল অব মিলান, পাথ অব হোপ; দেয়ার ইজ নো পিস্ এ্যামঙ্গ অলিভ ট্রিজ, ওপন্ সিটি, মিলিওনিয়ার অব নেপল্‌স (ইতালী); যুকিওয়ারিশু ও লাইফ অব গৌতম বুদ্ধ (জাপান); ভিক্টরী অব লাইফ্ (রুমানিয়া); ফোর ইন্ এ জীপ্ (সুইট্‌জারল্যাণ্ড); ম্যান ইন্ দি হোয়াইট সুট, ম্যাজিক বক্স, লাইফ ইন হার হ্যাণ্ডস, গার্ল অব দি মার্স, মার্ডার ইন্ দি ক্যাথেড্রাল, ক্রাই মাই বিলাভেড কানট্রি (যুক্তরাজ্য); এলিস ইন্ ওয়াণ্ডার ল্যাণ্ড, আমেরিকান ইন প্যারিস, ম্যাগনিফিসেন্ট ইয়াঙ্কি, ব্রাইট ভিক্টরী, নো হাইওয়ে অন দি স্কাই (যুক্তরাষ্ট্র); ফল্ অব বার্লিন, ডনবাস মাইনর্স, ক্যাভেলিয়ার অব দি গোল্ডেন ষ্টার, লিবারেটেড চায়না, মুসোরোগস্কী, অন্ দি সার্কাস এরিনা, গ্র্যাণ্ড কনসার্ট, টাইম্স অব পিস, বাউন্টিফুল সামার (রাশিয়া); ফ্র বার্ণ (যুগোশ্লাভিয়া)।

ইহাকে কেবল চিত্রপ্রদর্শনী বা উৎসবানুষ্ঠান বলিলে ভুল হইবে। সমগ্র পৃথিবীর এই যে সহ-যোগিতাদ্বারা চিত্র-মিলন, ইহা একটি বড় সংস্কৃতির লক্ষণ। এক দেশ অপর দেশকে জানিবার, চিনিবার ও বুঝিবার এত বড় মিলন-ক্ষেত্র বড় বেশী রচিত হয় না। বিশেষ করিয়া বিপুল একটা রসানুভূতি ও চিত্ত-স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্য দিয়া এই যোগটি সম্পূর্ণ হওয়ায় উৎসবটি বিশ্বশান্তির পক্ষেও অনেকখানি কাজে আসিল।

আমরা হাঙ্গেরিয়ান প্রতিনিধি ডি. রেভের আমন্ত্রণে তাঁহার আহূত এক প্রেস্-কনফারেন্সে মিলিত হইয়া হাঙ্গেরির চিত্রজগৎ ও তৎপ্রসঙ্গে অন্যান্য দেশের চিত্রপ্রতিষ্ঠান সম্পর্কেও বিস্তৃত আলোচনা করিয়া প্রীতিলাভ করি। ডি. রেভে এই বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করেন যে, হাঙ্গেরিতে ভারতীয় চিত্রের প্রদর্শনী দেবার ব্যবস্থা করা সত্বেও ভারতে কোনো হাঙ্গেরিয়ান চিত্র এ পর্য্যন্ত দেখানো হয় নাই, ইহা যে উদ্দেশ্যমূলক ভাবে দেখানো হয় নাই, তাহা নয়।

আসলে সংস্কৃতির প্রচার ও প্রসার নির্ভর করে পারস্পরিক দেশগুলির ভাবের আদান প্রদানের উপর। আজ আর পৃথিবী বিচ্ছিন্ন বা দূরত্বসঙ্কুল নয়। যুদ্ধের বীভৎসতা ও ভয়াবহতার উপর আজ সারা পৃথিবীতে যে শান্তি আন্দোলন গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহাকে দৃঢ় ও ক্রিয়াশীল করিয়া তুলিবার প্রধান অবলম্বন হইতেছে চলচ্চিত্র। শিল্পের এই বিশেষ অবলম্বনকে কেন্দ্র করিয়াই এক-পৃথিবী গড়ার কাজ সার্থক হইয়া ওঠা সম্ভব, এবং সেই পৃথিবী হইবে নির্ভয় নির্লোভ শান্ত পৃথিবী। বিশ্বের চলচিত্র যে আজ কতখানি উন্নতির উচ্চ শিখরে উঠিয়াছে, তাহা এমন একটা উৎসবানুষ্ঠানের আয়োজন না হইলে উপলব্ধিতেই আসিত না। এই দিক হইতে ভারত-সরকার যেমন প্রসংশার্হ, তেমনি অভিনন্দনীয় উৎসবের প্রাণ-পুরুষেরা। এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন দেশের যে সকল প্রতিনিধি এখানে আসিয়া ভারতীয়দের সঙ্গে বন্ধুভাবে মিশিয়া নিজেদের দেশ সম্পর্কে ভারতকে নানা তথ্যের দ্বারা ওয়াকিবহাল করিতে এবং ভারত সম্পর্কে নিজেদের দেশকে ওয়াকিবহাল হইতে যত্নবান হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে আমরা সাদর অভিনন্দন জ্ঞাপন করি।

ভারতসরকারের ১৯৫২-৫৩ সালের বাজেট

গত ২৯শে ফেব্রুয়ারী অর্থমন্ত্রী শ্রীসি, ডি, দেশমুখ নয়াদিল্লী সংসদে এক হোয়াইট্ পেপার আকারে ভারত সরকারের ১৯৫২-৫৩ সালের সাধারণ বাজেট পেশ করেন। শ্রীযুক্ত দেশমুখ বলেন: ইহা অন্তর্ব্বর্ত্তীকালের জন্য মাত্র। নূতন সরকার গঠিত হইলে তাঁহাদের বিবেচনানুযায়ী পরিবর্ত্তিত আকারে উহা নূতন সংসদে পুনরায় উত্থাপিত হইবে। আলোচ্য বাজেটের মোট আয়-ব্যয়ের হিসাবটি সংক্ষেপে এইরূপ, যথা:

(ক) ১৯৫২-৫৩ সালে রাজস্বের পরিমাণ হইবে ৪২৪ কোটি ৯৮ লক্ষ টাকা। ব্যয় হইবে আনুমানিক ৪০৬ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা। সুতরাং উদ্বৃত্ত থাকিবে ১৮ কোটি ৭৩ লক্ষ টাকা।

(খ) ১৯৫১-৫২ সালে সংশোধিত হিসাব অনুযায়ী রাজস্বের পরিমাণ দাঁড়াইবে ৪৯৭ কোটি ৬৭ লক্ষ টাকা। ব্যয় হইবে আনুমানিক ৪০৫ কোটি ৬ লক্ষ টাকা। সুতরাং উদ্বৃত্ত থাকিবে ৯২ কোটি ৬১ লক্ষ টাকা।

(গ) বর্ত্তমান করের হার অপরিবর্ত্তিত থাকিবে।

(ঘ) প্রতি রক্ষাখাতে এই বৎসর ১৮১ কোটি ২৪ লক্ষ টাকা এবং আগামী বৎসরে ১৯৭ কোটি ৯৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে।

(ঙ) খাদ্য সাহায্যবাবদ চলতি বৎসরে ৩৮ কোটি ৬৬ লক্ষ টাকা এবং আগামী বৎসরে ২৫ কোটি টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

(চ) মূলধনী বাজেট বাবদ যত ব্যয় হইবে বলিয়া ধরা হইয়াছে, তাহার মধ্যে চল্‌তি বৎসরে ৭৮ কোটি ৭৮ লক্ষ টাকা এবং আগামী বৎসরে ৮২ কোটি ৪৮ লক্ষ টাকা রাজ্য সরকারসমূহকে ঋণবাবদ দেওয়া হইবে।

(ছ) আমেরিকা হইতে ধারে যে গম পাওয়া গিয়াছে, তাহার এবং কলম্বো পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রাপ্ত সাহায্য বাবদ দ্রব্যাদির বিক্রয় মূল্য হইতে একটি বিশেষ উন্নয়ন ভাণ্ডার স্থাপন করা হইয়াছে।

প্রবর্ত্তিত বিধান ও সংবিধান মতে কুর্গ, দিল্লী, আজমীর, বিন্ধ্য, ভূপাল ও হিমাচল যে মর্য্যাদা লাভ করিয়াছে, তাহার পর উক্ত রাজ্যগুলির বাজেট আর কেন্দ্রীয় বাজেটের অন্তর্ভুক্ত হয় নাই। এই দিক হইতে বাজেটকে চারিমাসের অন্তর্ব্বর্ত্তীকালীন বাজেট হিসাবে হোয়াইট পেপারে রূপ দেওয়া হইয়াছে। অন্যান্য বৎসরের তুলনায় নূতনত্বের দিক হইতে ইহাতে বিশেষ কিছুই উল্লেখ করা হয় নাই; তবে অর্থমন্ত্রী প্রস্তাব করিয়াছেন—

আমেরিকার প্রদত্ত গম এদেশে বিক্রয় করিয়া যে টাকা মুনাফা হইবে, তাহা হইতে ৭১ কোটি টাকা লইয়া একটি 'বিশেষ উন্নয়ন ভাণ্ডার' গঠন করা হইবে।—নূতনত্বের মধ্যে এই প্রস্তাবটিই যাহা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। অন্যথায় করভার-প্রপীড়িত ভারতবর্ষ খাদ্য প্রভৃতি সমস্যা সম্পর্কে যে গুরুতর অবস্থার সম্মুখীন হইয়াছে, তাহার অংশত আমরা খাদ্যমন্ত্রীসম্মেলন সম্পর্কিত স্বতন্ত্র অনুচ্ছেদে আলোচনা করিয়াছি।

অধিক আলোচনার অবকাশ এখানে কম। মাত্র কিছুকাল পরেই নূতন সংসদে বাজেটটি যখন পূর্ণাঙ্গ ভাবে পেশ করা হইবে, তখন ইহার নানা দিক সম্পর্কে আমরা আলোচনা করিব।

শোক-সংবাদ

পরলোকে ন্যুট্ হামসুন্

নরওয়ের বিখ্যাত কথাশিল্পী চিন্তানায়ক ন্যুট্ হামসুন গত ১৮ই ফেব্রুয়ারী ৯২ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। বয়সের দিক হইতে দীর্ঘতর জীবন তিনি লাভ করিয়াছিলেন, তেমনি সার্থক জীবনের স্বাক্ষর রাখিয়া গেলেন পৃথিবীতে। ১৯২০ সালে তাঁহার 'গ্রোথ্ অব দি সয়েল' গ্রন্থের জন্য নোবল্ কমিটি ন্যুট্ হামসুনকে নোবল্ পুরস্কার দিয়া সম্মানিত করেন। কি সমাজতত্ব, কি রাজনীতি, কি শিক্ষা ও সংস্কৃতি —সর্ব্বদিকেই তাঁহার দৃষ্টি ছিল যেমন সজাগ, তেম্‌নি ব্যুৎপত্তিও ছিল অসাধারণ। শেষ জীবনে গত ১৯৪৫ সালে তিনি রাজদ্রোহের অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত হন; কেবল বার্দ্ধক্যের বিবেচনায় তাঁহাকে কারারুদ্ধ করা হয় নাই, শুধু ২১ হাজার পাউণ্ড জরিমানা করিয়া তাঁহাকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। তাহা হইলেও একজন কথাশিল্পী ও চিন্তানায়কের উপর এইরূপ গুরু অর্থভার না চাপাইলেই রাজন্যকর্ত্তৃপক্ষ সুবুদ্ধি ও মহত্ত্বের পরিচয় দিতেন।

১৮৫৯ সালের ৪ঠা আগষ্ট ন্যুট্ হামসুন জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম পিডার পিডারসন। বাল্যজীবনে ছেলেমেয়েরা যেভাবে শিক্ষারম্ভের সুযোগ পায়, ন্যুট্ হামসুনের জীবনে তাহা ঘটে নাই।

প্রথম জীবনে তিনি মালগুদাম ও পরে এক ডাকঘরে কেরাণীর কাজ করেন। কোনো সময় তাঁহাকে বাসের কণ্ডাক্টারী করিয়াও জীবিকার্জ্জন করিতে হয়। দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে অবিশ্রান্ত সংগ্রামের মধ্য দিয়াই তাঁহার প্রতিভার উন্মেষ ও বিকাশ ঘটে। তাঁহার রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে 'গ্র্যালো সয়েল', 'গ্রোথ অব দি সয়েল', 'হাঙ্গার', 'প্যান', 'মিষ্টিরিয়াস', 'দি উওমেন এ্যাট দি পাম্প', 'ভ্যাগাবণ্ডস্', 'দি রোড লীডস্ অন' প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। নিজে দরিদ্র হইয়া দুর্গত পৃথিবীর চিত্রই তিনি আঁকিয়া গিয়াছেন তাঁহার সারা জীবনের সাহিত্যে এবং তাহার মধ্য দিয়াই তিনি সারা পৃথিবীর অভিনন্দন লাভ করিয়াছেন। এমন গৌরব সচরাচর সব সাহিত্যিকের ভাগ্যেই ঘটে না। এইখানেই তাঁহার জীবনের পূর্ণতা সূচিত হয়।

শেষ বয়সে তিনি নরওয়ের গ্রীমষ্ট্যাড অঞ্চলে বাস করিতেছিলেন। তাঁহার দুই পুত্র ও তিন কন্যা বর্ত্তমান। তাঁহার মৃত্যুতে বিশ্বের সংস্কৃতি-আকাশের একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র আজ নির্ব্বাপিত হইল। ঈশ্বর তাঁহার পরলোকগত আত্মার চিরশান্তি বিধান করুন।

পরলোকে কাশিমবাজারের মহারাজা শ্রীশচন্দ্র নন্দী

গত ২২শে ফেব্রুয়ারী মধ্যরাত্রির শেষ যামে কাসিমবাজারের মহারাজা ও কলিকাতার শেরিফ শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র নন্দী তাঁহার কলিকাতার সার্কুলার রোডস্থ বাসভবনে মাত্র ৫৫ বৎসর বয়সে পরলোক-গমন করেন। রাজন্যোচিত গাম্ভীর্য্যের দ্বারা তিনি কখনও নিজেকে দেশের মানুষের নিকট হইতে স্বতন্ত্র করিয়া রাখেন নাই, বরং দানশীলতার দ্বারা, শিক্ষা ও সংস্কৃতিগত যোগাযোগের দ্বারা তিনি জনসাধারণের চিত্ত অধিকার করিয়াই ছিলেন।

১৮৯৭ সালে কলিকাতার রাজবাটীতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। বহরমপুরে স্কুল ও কলেজের পাঠ সমাপ্ত করিয়া কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে আসিয়া তিনি ভর্ত্তি হন এবং ১৯২০ সালে ইতিহাসে উচ্চস্থান অধিকার করিয়া এম্-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তৎসহ তিনি আইনও অধ্যয়ন করিয়াছিলেন; কিন্তু পরীক্ষা দেন নাই। স্নাতকোত্তর জীবন হইতেই ফরাসী ও জার্ম্মান ভাষায় তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি জন্মে।

পিতা মহারাজা মনীন্দ্রচন্দ্র ছিলেন আদর্শবাদী জনসেবক। শ্রীশচন্দ্র পিতার সেই আদর্শেই আদর্শবান হইয়া জনকল্যাণব্রত গ্রহণ করেন। যথাক্রমে ১৯২১-২২-২৩ সালে তিনি বহরমপুর পৌরসভার সভাপতি নির্ব্বাচিত হন, এবং অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে তিনি সে কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। এ সময়ে তিনি কয়েক বৎসর-কাল বহরমপুরে প্রথম শ্রেণীর অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদেও অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং মুর্শিদাবাদ জেলাবোর্ডের সদস্য ছিলেন।

ইহার ঠিক পরবর্ত্তী বৎসরই (১৯২৪) মহারাজা শ্রীশচন্দ্র প্রথম বঙ্গীয় আইন পরিষদের সদস্য নির্ব্বাচিত হন। তদবধি মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত নিয়মিত তিনি উক্ত পরিষদের সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়া আসিতেছিলেন। ১৯৩৫ সালে ভারত শাসন আইন প্রবর্ত্তনের পর মিঃ এ, কে, ফজলুল হক্ প্রথম যে কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা গঠন করেন, ন্যাশনালিষ্ট পার্টি হইতে মহারাজা অন্যতম মন্ত্রী হিসাবে তাহাতে যোগদান করিয়া সেচ, বর্ত্ম ও পূর্ত্ত বিভাগের ভার গ্রহণ করেন। এই সময়ে তিনি বৈজ্ঞানিক উপায়ে নদী নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা আরম্ভ করেন; তাহারই প্রাথমিক অঙ্গস্বরূপ বাংলার নদী অঞ্চলের জমির ঢালের জরীপ করা হয়। মহারাজা সঙ্গে সঙ্গে একটি

আন্তঃপ্রাদেশিক নদী-কমিশন স্থাপনের চেষ্টাও করেন। ১৯৪১ সালের ডিসেম্বর মাসে তিনি মন্ত্রিত্বপদ ত্যাগ করেন।

সাহিত্য, সঙ্গীত, চারুকলা প্রভৃতির তিনি বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। দেশের নানা সমস্যার ভিত্তিতে তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করেন। মনপ্যাথি, দস্যুদুহিতা; শান্তি কোন্ পথে, বন্যা ও তাহার প্রতিকার, Bengal's River-Problems, Bengal Rivers and our Economic welfare প্রভৃতি গ্রন্থ তাঁহার সেই সাহিত্য সেবা ও মননশীলতারই পরিচায়ক। তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলিকাতা ইউনিভারসিটি ইন্‌ষ্টিটিউট, নিখিল ভারতীয় সঙ্গীত-সভা, বেঙ্গল লন টেনিস এ্যাসোসিয়েশন, বেঙ্গল টেবল্ টেনিশ এ্যাসোসিয়েশন, সেকেণ্ড ক্যাল্‌কাটা বয়স্কাউট্‌ এ্যাসোসিয়েশন, সেণ্ট্রাল ক্যালকাটা রাইফেল ক্লাব, রামকৃষ্ণ মিশন শিশুমঙ্গল প্রতিষ্ঠান, হিন্দুস্থান চেম্বার অব কমার্স ইত্যাদি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সভাপতি, ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ামের ট্রাষ্টী, বিশ্বভারতী, ইণ্ডিয়ান সায়েন্স নিউজ এ্যাসোসিয়েশন ইত্যাদির আজীবন সদস্য, বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন, বঙ্গীয় মহাজনসভা প্রভৃতির প্রাক্তন সভাপতি, বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্সের সদস্য, ক্যাল্‌কাটা সাউথ ক্লাবের সহকারী সভাপতি, মহারাজা মনীন্দ্রচন্দ্র কলেজ, বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজ প্রভৃতি বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালক সমিতির সভাপতি ছিলেন।

প্রসঙ্গতঃ মহারাজার বাগ্মীতা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ছাত্রাবস্থা হইতেই তাঁহার মনোজ্ঞ বক্তৃতার শক্তি গড়িয়া ওঠে। শিক্ষার অহঙ্কার ও আভিজাত্যের গর্ব্ব হইতে তিনি একেবারেই মুক্ত ছিলেন। তাঁহার এই চরিত্রমাধুর্য্যেই তিনি সর্ব্বজনপ্রিয় হইয়াছিলেন। তাঁহার এই আকস্মিক অকাল বিয়োগে বাংলার শিক্ষা, সংস্কৃতি তথা রাষ্ট্রক্ষেত্রে যে ক্ষতি হইল, তাহা পূর্ণ হইবার নয়। মৃত্যুকালে তিনি পত্নী, এক পুত্র ও এক কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন। আমরা মহারাজার অমর আত্মার চির শান্তি কামনা করি এবং তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করি।

পরলোকে বিখ্যাত কাগজ-ব্যবসায়ী শ্রীরঘুনাথ দত্ত

কলিকাতার বিখ্যাত কাগজ ব্যবসায়ী, মেসার্স রঘুনাথ দত্ত এ্যাণ্ড সন্স লিমিটেডের প্রতিষ্ঠাতা, শ্রীযুক্ত রঘুনাথ দত্ত গত ৪ঠা মার্চ্চ মঙ্গলবার তাঁহার কলিকাতা বিডনষ্ট্রীটস্থ বাটিতে ৬৭ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করেন। প্রসিদ্ধ কাগজ ব্যবসায়ী স্বর্গত ভোলানাথ দত্তের তিনি সুযোগ্য পুত্র ছিলেন। কলিকাতার বেনিয়াটোলার খ্যাতিমান দত্তবংশ তাঁহারা। কিশোর জীবন হইতেই রঘুনাথ তাঁহার পিতার ব্যবসায়ে সংশ্লিষ্ট হইয়া পড়েন এবং অল্পকালের মধ্যেই ব্যবসায়ে প্রচুর অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন। ভবিষ্যতে তিনি শ্রীদুর্গা কটন স্পাইনিং এ্যাণ্ড উইভিং মিলস্ লিমিটেড ও রঘুনাথ দত্ত এ্যাণ্ড সন্স্ লিমিলেড প্রতিষ্ঠা করেন। ব্যবসায়িক কৃতিত্বের ফলে কলিকাতার নাগরিক হিসাবে তাঁহার বিশেষ খ্যাতি ছিল। কলিকাতা কাগজ-ব্যবসায়ী সমিতি এবং বঙ্গীয় মিল-মালিক সমিতিরও তিনি সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করিবার গৌরব লাভ করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত বহু সাহিত্য সমিতি ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের তিনি আজীবন সভ্য ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। সদা হাস্যমুখ ও স্বল্পভাষিতা ছিল তাঁহার চরিত্রের প্রধান গুণ। বঙ্গশ্রীর কাগজ সরবরাহকারী হিসাবে তাঁহার সঙ্গে আমাদের অন্তরের যোগ ছিল দীর্ঘকালের। তাঁহার মৃত্যুতে আমরা একজন পরম সুহৃদকেই হারাইলাম। তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি আমরা সমবেদনা জ্ঞাপন করি।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য কর্তৃক মেট্রোপলিটান প্রিণ্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস্ লিমিটেড
৯০, লোয়ার সারকুলার রোড, কলিকাতা ১৪ হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

অষ্টাদশ বর্ষ বৈশাখ—১৩৫৮ ২য় খণ্ড—৫ম সংখ্যা

THE RAMAKRISHNA MISSION INSTITUTE OF CULTURE LIBRARY CALCUTTA

প্রতিধ্বনি

[গ্রীক পুরাণের 'ইকো'র কাহিনী অনুসরণে]

শ্রীশিবদাস চক্রবর্ত্তী

নহ তুমি ভাষাহীন, অর্থহীন ওগো প্রতিধ্বনি,
তব কণ্ঠস্বরমাঝে অহরহ ওঠে অনুরণি'
ধ্বনির ব্যাকুল সুর ; আছে আছে আছে ভাষা।
নিত্য তব হিয়াতলে সৃজনের দুরন্ত পিপাসা
আভাসে ইঙ্গিতে ঠারে দিকে দিকে রচি' তোলে গান
প্রেমের শাশ্বতছন্দে লীলানন্দে চির কম্পমান।

হে অনঙ্গ মায়াবিনী, ছিলে নাকো তুমি চিরদিন
এমনি অরূপ মায়া বাণীহীন, তনুমনহীন।
একদিন রূপে রসে ছিলে তুমি মর্ত্ত্যের মানবী,
শ্যামশ্রী-মূর্চ্ছিত-তনু শরতের পূর্ণ প্রতিচ্ছবি,
উষার শিশির ভারে নীল আঁখি করুণ কোমল,
নির্ম্মল কপোলখানি মিঠা লাজে রক্তিম উজল,
যৌবনের তরুশিরে স্ফুটমান নবীন বল্লরী,
লাবণ্য-সরসী নীরে ভাসমান সরোজসুন্দরী।
বনপরীদের সাথে মিলে মিশে বন পথে পথে
হেসে খেলে বেড়াইতে অতুলন আনন্দের রথে।
কণ্ঠস্বরে ছিলো ঢালা প্রেম-ভরা মাতোয়ারা সুর,
মুখের ভাষণভঙ্গী কতো মনোহর সুমধুর।
প্রিয়জন-বিরহিণী দেবরাজ-পত্নী জুনো রাণী
মর্ত্ত্যের প্রবাসকাল কাটাইত শুনি' তব বাণী।
শুনিতে শুনিতে তব কণ্ঠ-ঝরা মধুময় গীতি
অলক্ষ্যে অন্তরে তার ঘনাইত স্বর্গের বিস্মৃতি ;
সহসা হেরিত যবে—কোথা বা সে, কোথা দেবরাজ,
অমনি মনের কোণে ছাখা দিতো ক্রোধ-ভরা লাজ।

ভাবিত সে—ছল করি' চতুরিকা তরুণী ললনা
তাদের মিলন ঘেরি' করিয়াছে বিরহ রচনা।
তব বাণীসঙ্গীতেরে ভুলে তাই ভাবি' প্রগল্‌ভতা
অভিশাপ হানি' তব কণ্ঠ হ'তে হ'রে নিলো কথা।
হৃদয়েরে বাণীচ্ছন্দে প্রকাশের বিচিত্র ভঙ্গিমা
মুহূর্ত্তে মিলায়ে গেলো—হ'লে মূক মাটির প্রতিমা।
লোকালয় পরিহরি' বনমাঝে তরুশিরে তাই
অসহ প্রাণের গ্লানি লুকাইতে খুঁজে নিলে ঠাঁই।

একদা সে ছায়াঘন বনপথে ল'য়ে সঙ্গীদল
সুদর্শন যুবা এক যেতেছিলো চাহনি-চঞ্চল,
চেয়ে দেখিবার মতো রূপ তার, নাম—নারসিসাস্
অঙ্গ ভরি' যৌবনের লাবণ্যের ললিত উচ্ছ্বাস,
আঁখিকোণে ভাষা খোঁজে অন্তরের উল্লসিত আশা,
এমনি সে মুখ, যেন হেরিলেই জাগে ভালোবাসা।
তাহারে হেরিয়া তব অলক্ষ্যিতে মনে হোলো সাধ
দু'টি কথা ক'য়ে তারে মিটাইবে প্রাণের বিষাদ।
কিন্তু মূক মনোবীণা,—আছে সুর, নাহি আর বাণী,
মুহূর্ত্তে ভুলিয়া গিয়া এ কথাটি, শুধু পেলে গ্লানি।
তবু তারে ছেড়ে-থাকা সহিলো না হৃদয়ে তোমার
আড়ালে আড়ালে রহি' চুপি চুপি পিছু নিলে তার
এই মতো যেতে যেতে নার্‌সিসাস্ সহসা কখন
হেরিয়া বিজনবনে পিছে তার নাহি সঙ্গীগণ,
'কে আছো, কে আছো' বলি' তারস্বরে যতোই শুধা
অলক্ষ্যে দাঁড়ায়ে তুমি 'আছো' বলি দাও তারে সায়।

একান্তে সে বনোমাঝে নাহি কেউ দৃষ্টির ভিতর
তবুও ব্যঙ্গের মতো তার-ই স্বরে কে দেয় উত্তর,
এই কথা ভাবি' মনে যতো জাগে পরম বিস্ময়,
'কাছে এসো, কে কোথায়' ফিরে ফিরে এই ততো কয়।
তুমি শুধু 'এসো' কহি ধীরে চলো, থমকি' দাঁড়াও,
শুনিয়া তাহার কথা চারিদিকে ফিরে ফিরে চাও;
রুধিতে বাসনা-ব্যথা না পারিয়া তুমি অবশেষে
পরিহরি' লাজভয় কাছে তার দাঁড়াইলে এসে।
আপন প্রেমের রূপে এ বিশ্বেরে হেরি' প্রেমময়
ভাবিলে না—যেথা রূপ, সেথা প্রেম সর্ব্বদা না রয়,
বুঝিলে না—যেথা আলো, সেথা সদা নাহি রহে আশা,
যেখানে হৃদয় আছে নাহি সেথা রহে সদা ভাষা।
সোহাগে প্রসারি' তব দু'টি কর তুহিন-ধবল
মাগিলে প্রেমের দান ক্ষণিকের উচ্ছ্বাসে চঞ্চল।
দেখেনি যে কোনোদিন মুগ্ধ চোখে প্রভাতের আলো
কাহারেও কোনোদিন জীবনে যে বাসে নাই ভালো,
তার কাছে প্রেম নয় সুদুর্ল্লভ সাধনার ধন,
সে যে তার কাছে শুধু অর্থহীন প্রলাপ বচন।
তাই সে তোমার দেওয়া মানবের মহীয়ান দান
বিরাগে ফিরায়ে দিলো অট্টহাস্যে করি' প্রত্যাখ্যান।

সেই প্রত্যাখ্যান-গ্লানি, ওগো গরবিণী; বুকে ল'য়ে
সখিদের কাছে আর ফিরিলেনা লাঞ্ছিত হৃদয়ে।
বনের একান্ত কোণে অনাহারে যাপি' রাত্রিদিন
ধীরে ধীরে তনু হোলো অতি শুষ্ক, ক্ষীণ হ'তে ক্ষীণ;

প্রাণের নিশ্বাস-বায়ু দুর্ব্বল দেহের কারা হ'তে
বাহিরিয়া মুক্ত হ'য়ে মিশে গেলো অনন্তের স্রোতে।
অনঙ্গ অস্তিত্ব ল'য়ে সেই হ'তে বনে বনান্তরে,
সাগর, নদীর তীরে, পর্ব্বতের কন্দরে কন্দরে
ছায়ার অতীতরূপে বাণীহীন সুরের মূর্ত্তিতে
বিচরিছ নিশিদিন আপনার খেয়াল-খুশীতে।

বঙ্কিমচন্দ্রের 'লরেন্স ফষ্টর' চরিত্র কাল্পনিক নয়—বাস্তব

কাঁথি হইতে বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৬০ সালের নভেম্বর মাসে খুলনা মহকুমার ভার গ্রহণ করেন। এবং ১৮৬৪ ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত সেখানে ছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার প্রথম উপন্যাস "দুর্গেশনন্দিনী" খুলনায় লিখিতে আরম্ভ করেন। এইখানে মাত্র দুইটি অধ্যায় শেষ করেন। আর অগ্রসর হন না। পূর্ব্বাধ্যায়ে বলিয়াছি—কাঁথির অন্তর্গত জলেশ্বর, মোগলমারি প্রভৃতি স্থানে মোগল পাঠানের মধ্যে বহুবার যুদ্ধ হয়। রাজা মানসিংহ অনেক সময়ে ওসমান খাঁর নেতৃত্বে পরিচালিত আফগান বিদ্রোহ দমন করেন। জগৎসিংহ ছিল মানসিংহের পুত্র। পাঠান কতলু খাঁও একজন বিদ্রোহী ছিল, আকবরের সময়ে দায়ুদ খাঁর সে পার্শ্বচর ছিল। উপন্যাসে বর্ণিত ঘটনা কাল ১৫৯০ খৃষ্টাব্দ (৯৯৭ বঙ্গাব্দ); সমস্ত অবস্থা দেখিলে দুর্গেশনন্দিনীকে ঐতিহাসিক উপন্যাসই বলা চলে এবং স্যার যদুনাথ সরকারের মতে বঙ্গ সাহিত্যে ইহা প্রথম যথার্থ ঐতিহাসিক* উপন্যাস। তবে ঐতিহাসিক উপন্যাস হিসাবে স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র ইহার নাম করেন নাই।

গড় মান্দারণের কিম্বদন্তীও বঙ্কিমচন্দ্রকে কম উৎসাহিত করে নাই। তাঁহার এক খুল্ল পিতামহ ছিল। তাঁহার মাঝে মাঝে বিষ্ণুপুরও যাতায়াত ছিল। তিনি বলিতেন—

"মান্দারণ গ্রাম জাহানাবাদ ও বিষ্ণুপুরের মধ্যস্থিত, এই অঞ্চলে মান্দারণের ঘটনাটি উপন্যাসের ন্যায় লোকমুখে কিম্বদন্তীরূপে চলিয়া আসিয়াছিল। মান্দারণে জমিদারের গড় ও বৃহৎ পুরী ভগ্নাবস্থায় দেখিয়াছি। আমি শুনিয়াছি উড়িষ্যা হইতে পাঠানেরা মান্দারণ গ্রামের জমিদারের পুরী লুঠপাট করিয়া তাহাকে ও তাহার স্ত্রী-কন্যাকে বন্দী করিয়া লইয়া যায়। রাজপুতকুল-গৌরব জগৎসিংহ তাহাদের সাহায্যার্থ প্রেরিত হইয়া বন্দী হন।" †

বঙ্কিম-কনিষ্ঠ পূর্ণচন্দ্র বলেন, "বঙ্কিমচন্দ্র উনিশ বৎসর বয়সে এই গল্পটি শুনিয়াছিলেন। তাহার বৎসর তিনেক পরে দুর্গেশনন্দিনীর সূচনা হয়।"

বস্তুতঃ দেখিয়াছি কাঁথির ওসমান খাঁ, কতলু খাঁ এবং মান্দারণের কাহিনী অবলম্বনেই "দুর্গেশনন্দিনী" রচিত হয়।

খুলনার সুপারী এবং নারিকেল বৃক্ষরাজি বঙ্কিমের মনে এমন রেখাপাত করিয়াছিল যে, তিনি সীতারামে উড়িষ্যার তালবৃক্ষের রূপান্তরালে সেই দৃশ্য বর্ণনা করেন—

"চারিদিকে—যোজনের পর যোজন ব্যাপিয়া—হরিদ্বর্ণ ধান্যক্ষেত্র—মাতা বসুমতীর অঙ্গে বহু যোজন বিস্তৃতা পিতাম্বরী শাটী! তাহার উপর মাতার অলঙ্কারস্বরূপ তালবৃক্ষশ্রেণী—সহস্র সহস্র, তারপর সহস্র সহস্র তালবৃক্ষ; সরল সুপত্র শোভাময়!"

—সীতারাম, ১ম খণ্ড
১৭ পরিচ্ছেদ।

খুলনার স্বর্গীয় ঈশানচন্দ্র দত্ত, (রমেশচন্দ্র দত্ত, সি, আই, ই, মহাশয়ের পিতা) মহাশয়ও ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্য করিতেন। ঈশানবাবু নদীয়া জিলার কুষ্টিয়ার

বঙ্কিমচন্দ্র

* যদুনাথ রচিত দুর্গেশনন্দিনীর ভূমিকা।

† পূর্ণচন্দ্র প্রণীত বঙ্কিমচন্দ্রের বাল্যকথা।

নিকট দিয়া জলপথে আসিতে নৌকা ডুবিয়া মারা যান। বঙ্কিমচন্দ্র তখন ডুবুরি পাঠাইয়া দেহ উদ্ধার করিতে বিশেষ চেষ্টা করেন। এবং মৃত্যুর পরে রমেশবাবুকে একখানি সহানুভূতিসূচক পত্রও লেখেন। পত্রের কথাগুলি রমেশবাবুর কথায়ই ব্যক্ত করিতেছি—

"যখন আমার ১০।১২ বৎসর বয়স মাত্র ছিল, তখন আমার পিতা এবং বঙ্কিমবাবু একত্র খুলনায় কাজ করিতেন; উভয়েই ডেপুটী কালেক্টর ছিলেন, উভয়ের মধ্যে অতিশয় স্নেহ ছিল। আমার পিতার রাজকার্য্য হইতে অবসর লইবার সময় হইয়া আসিয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্র রাজকার্য্যে তখন প্রবেশ করিয়াছেন মাত্র, সুতরাং বঙ্কিমবাবু আমার পিতাকে যৎপরোনাস্তি সম্মান করিতেন এবং তাঁহার ঋষিতুল্য আদর্শ চরিত্র লক্ষ্য করিয়া বড় ভালবাসিতেন। তখন একবার বঙ্কিমবাবু কলিকাতায় আইসেন। আমাদের বাটীতে আমার পিতার সহিত একত্র আহার করেন—সেই আমি বঙ্কিমবাবুকে প্রথম দেখিলাম। আমি তখন ১০।১২ বৎসরের বালক, বঙ্কিমবাবু আমাকে অতিশয় স্নেহ করিলেন, সে স্নেহ তিনি আজীবন ভুলিলেন না।

"১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে রাজকার্য্য উপলক্ষে খুলনা জেলায় আমার পিতার কাল হয়, বঙ্কিম তখন খুলনায়, তিনি যেরূপ বিলাপ করিয়া একখানি পত্র লেখেন, অদ্যাবধি সে কথা আমার হৃদয়ে জাগরিত রহিয়াছে।"

বৈশাখ ১৩০১, নব্য ভারত।

এই সময় বাঙ্গলার শাসনকর্ত্তা ছিলেন স্যার জন পিটার গ্রাণ্ট। নীলকরের উপদ্রব দূর করিবার নিমিত্ত তিনি বাছিয়া বাছিয়া সুদক্ষ ও যোগ্যতম ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটগণকে সঙ্কটাপন্ন মহকুমাগুলির ভার প্রদান করেন। যশোহর জিলার অন্তর্গত খুলনা মহকুমা তখন মোরেলগঞ্জ প্রভৃতি স্থানের নীলকরগণের অত্যাচার ও অনাচারে জর্জ্জরিত হইতেছিল। দুর্দ্ধর্ষ নীলকর মোরেল সম্প্রতি আবার সুন্দরবন আবাদ করিবার অধিকার লাভ করিয়াছেন। তাহার অত্যাচারে সে অঞ্চল বড়ই বিব্রত, অন্যান্য নীলকরগণও সমানই অত্যাচারী। তাই বঙ্কিমচন্দ্রকে এত শীঘ্র কাঁথি হইতে স্থানান্তরিত করিয়া খুলনার ভার প্রদান করা হয়।

মোরেল পরিবার আবার অসাধ্য সাধন করিয়া গভর্ণমেণ্টের প্রীতিভাজন হইয়াছেন। তিনি মোরেল পুত্রগণের সহায়তায় দশ বৎসর মধ্যে—এ পর্য্যন্ত যাহা কেহ পারে নাই—৬৫০০০ বিঘা অনাবাদ জমি চাষোপযোগী করিয়া ফেলিয়াছেন। ইহারা নদীতীরে বাজার বসাইয়া "মোরেলগঞ্জ" নাম দিয়াছেন এবং অল্পদিন মধ্যে বিপুল বিত্তশালী হইয়া পড়িয়াছেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রবার্ট মোরেল জমিদারী সংক্রান্ত কাজকর্ম্ম দেখিত এবং কনিষ্ঠ হেনরী মোরেল তাহার সহায়তা করিত। আবাদে দুর্বৃত্ত প্রজা শাসন করিতে কতকগুলি বেতনভোগী লাঠিয়ালের প্রয়োজন হইয়াছিল। ইহারা আবশ্যক হইলেই লাঠি ধরিত, লুঠ করিত, বল পূর্ব্বক জমি দখল করিত। ইহাদের দলপতি ছিল একবিংশতি বয়স্ক ডেনিস হিলি নামক আইরিশ যুবক। পূর্ব্বে সে সৈন্য বিভাগে কাজ করিত, কিন্তু কি অপরাধে কর্ম্মচ্যুত হইয়া যায়। পরে আসিয়া মোরেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট পদে বহাল হয়। হিলি লাঠিয়ালের সর্দ্দার হয় বটে, কিন্তু সে আর লাঠি ধরিত না, কথায় কথায় বন্দুক চালাইত। নিষ্ঠুরতায় হিলির তুলনা ছিল না।

বঙ্কিমচন্দ্র যখন খুলনায়, মোরেলগঞ্জের সুকুলিয়া গ্রামে একটা ভয়ানক দাঙ্গা হয়। সে দাঙ্গা নীল সংক্রান্ত ব্যাপার লইয়া নহে—জমির সীমানা উপলক্ষ্যে এই দাঙ্গা-হাঙ্গামার তদন্ত ব্যাপারেই বঙ্কিম রাজকার্য্যে অপর্য্যাপ্ত যশার্জ্জন করেন।

বরাখালি গ্রামে রহিমুল্লা নামক একজন সাহসী প্রজা ছিল। ইতিপূর্ব্বে মোরেলের লাঠিয়ালগণের সহিত তাহার দুই-একবার দাঙ্গাও হয় এবং তাহাতে মোরেলের পক্ষীয় ব্যক্তিগণের মেয়াদ হয়। মোরেল ও হিলি এই অপমানের প্রতিশোধ লইতে বদ্ধপরিকর হইয়া উঠেন।

ইতিমধ্যে রহিমুল্লা আপনার গাতি জমা প্রভৃতি টাকীর মুন্সী জমিদারবাবুদিগকে বিক্রয় করিয়া ভাগচাষে কৃষিকার্য্য করিতে থাকে। ঘটনাচক্রে সুকুলিয়ার গুলমামুদ তালুকদারের ও রহিমের বাড়ীর সীমানা লইয়া ভয়ানক বিবাদ বাধে, আর সেই গোলমালে মোরেলের দক্ষিণ হস্ত হিলি গুলমামুদের পক্ষ সমর্থন করে।

২৫শে নভেম্বর (১৮৬১) তারিখে উভয় পক্ষে দাঙ্গা হয়, এবং লাঠি চলিতে থাকে। ইহাতে সাহেবের পক্ষীয় রামধন মালো নামক একব্যক্তি খুন হয় ও হিলি রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করে। কিন্তু প্রতিহিংসা চরিতার্থ না করিয়া ক্ষান্ত হইবার পাত্র হিলি নয়। 'Now or never' মনে মনে ভাবিয়া সেই দিনই শেষ রাত্রে (২৬শে নভেম্বর) হিলি] আবার বহু লাঠিয়াল লইয়া রহিমের বাড়ী ঘেরাও করে। রহিমও ঢাল ও রামদাঁও হস্তে যখন শত্রুর দিকে অগ্রসর হইতে থাকে, তখনই হিলির গুলীতে পায়ে ভয়ানক আহত হইয়া পড়ে। তাড়াতাড়ি রহিম বাড়ীতে চলিয়া গিয়া যখন ক্ষতস্থান ধুইতে থাকে, অকস্মাৎ পশ্চাৎভাগে বৃক্ষের অন্তরালে হিলির কালান্তক মূর্ত্তি দেখিয়া তখনই চীৎকার করিয়া নিম্নলিখিত ভাবে তাহাকে সম্বোধন করে—

"আমাকে যথায় ইচ্ছা লইয়া চল, কিন্তু আমাকে প্রাণে মারিও না। আমার অনেক পোষ্য পরিবার আছে। যদি আমাকে নষ্ট করাই তোমার একান্ত ইচ্ছা হইয়া থাকে তবে দোহাই ঈশ্বরের, আমার পরিবারের ও স্ত্রীলোকদের কোন প্রকার অপমান করিও না।"

কিন্তু হিলির কঠোর প্রাণ সে কথায় কর্ণপাতও করিল না। তাহার নিক্ষিপ্ত গুলি আসিয়া রহিমের বক্ষঃস্থলে লাগিয়া তাহাকে শমনসদনে প্রেরণ করিল। রহিমের একটী পুত্র এবং বাড়ীর কয়েকটী স্ত্রীলোকও আহত হইল। অতঃপরে রহিমকে মৃত দেখিয়া তাহার দলস্থ সকলে পলায়ন করে, এবং হিলিও কয়েকটী স্ত্রীলোক এবং রহিমের মৃতদেহ নৌকায় করিয়া লইয়া বরাখালি পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করে। পরবর্ত্তী ঘটনা আমরা স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন সিংহ সম্পাদিত "পরিদর্শক" হইতে উদ্ধৃত করিতেছি—

"হিলি একুশজন প্রজাকে সপরিবারে লইয়া গিয়া কুঠিতে আবদ্ধ করে। যখন শুনিতে পাইল হাকিম তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিতেছেন, হিলি তাহাদিগকে সুন্দরবনে লইয়া যায়। গুলি করিয়া একটী গর্ভবতী রমণীর প্রাণ সংহার করে। তারপরে ঐসব প্রজাদের কতককে অন্যদিকে পাঠাইয়া কতক লইয়া সে মাতলায় (পোর্ট ক্যানিংতে) রওনা হয়। প্রজাদের ভয়ানক উৎপীড়ন করে, দুইটী স্ত্রীলোকের প্রতি বলাৎকার করে, একটীর কোলে একটী শিশুকন্যা ছিল, টানাটানির সময় শিশুটীর মৃত্যু হয়। অতঃপরে হিলি মোরেলের সঙ্গে পরামর্শ করিতে আসে এবং পরে বঙ্গোপসাগর দিয়া পূর্ব্ব দিকে রওনা হইয়া বাহির সুন্দরবনের একটী দ্বীপে সেই নিঃসহায় দলকে ছাড়িয়া দেয়। হিংস্রজন্তুর ভয়ে তাহারা জেলেদের বাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ করে। অন্যদিগের প্রজাও দৈববলে আসিয়া তাহাদের সহিত মিলিত হয়। অতঃপরে বাখরগঞ্জের কয়েকজন বরকন্দাজ তাহাদিগকে উদ্ধার করে। অতঃপরে খুলনার মাজিষ্ট্রেটের ভয়ে হিলি পলাতক হয়।"

এই খুলনার মাজিষ্ট্রেটই আমাদের এই গ্রন্থের নায়ক বঙ্কিমচন্দ্র। উপরে যে সকল কথা বলিলাম আজকাল হয়তো তাহা অতিরঞ্জিত বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু তৎকালীন মোকদ্দমা সংক্রান্ত বিবরণাদি হইতে সার সংগ্রহ করিয়া যাহা বর্ণনা করিলাম, সেসমস্ত কথার মধ্যে কোন অত্যুক্তি থাকিবার সম্ভাবনা নাই। আর এই অত্যাচারের ফলেই মোরেল পরিবারের সর্ব্বনাশ হয়—তাহারা ঋণগ্রস্ত হয় এবং পরে দুর্গাচরণ লাহার নিকট সমগ্র জমিদারী বিক্রী করিয়া ঐ স্থান পরিত্যাগ করিয়া বিলাত চলিয়া যায়।

বঙ্কিম ১৮৬১ সালের পূজার ছুটির সঙ্গে পনের দিন অতিরিক্ত ছুটি লইয়া অক্টোবর মাসের শেষে বাড়ী হইতে আসিয়াছেন। এবং যেদিন এই ভীষণ দাঙ্গা অনুষ্ঠিত হয়, বঙ্কিমচন্দ্র তখন ফকিরহাটা থানায় ছিলেন। ঘটনার দুইদিন পরে ২৮শে নভেম্বর (১৮৬১) তাঁহার কাছে এজাহার হয়। বঙ্কিম কালবিলম্ব না করিয়া যশোহর হইতে পঞ্চাশজন সিপাহী সৈন্য প্রেরণের জন্য ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে প্রার্থনা করিয়া স্বয়ং নৌকাযোগে মোরেলগঞ্জ রওনা হন। অত্যাচার কাহিনী শুনিয়া এবং ঘটনাস্থল দেখিয়া তিনি স্তম্ভিত হন, আর সকলে তাঁহার সেই সময়কার গুরুগম্ভীর মূর্ত্তি দেখিয়া বিস্মিত হইয়া যায়। কালবিলম্ব না করিয়া তিনি সবিশেষ পরিশ্রম, ক্ষিপ্রকারিতা ও প্রত্যুৎপন্নমতির

সহকারে তদন্তে প্রবৃত্ত হইলেন। বেনব্রিজ সাহেব তখন (Mr. Antony John Richard Bainbridge) যশোহরের জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট, যে মাসে ১৮৬১ সেখানে আসিয়াছেন। তিনি বঙ্কিমকে সম্পূর্ণ সহায়তা প্রদান করিতে একটুও ত্রুটি করেন নাই।

তদন্তের সময় বঙ্কিম যখন জনৈক সাহেবকে হিলি অনুমান করিয়া নাম জিজ্ঞাসা করেন, সেই সাহেব উত্তর করে—

"আমি নাম বলিব না, আর যে মোরেলগঞ্জের উপর পদার্পণ করিবে আমি তাহাকে গুলি করিব।"

হিলি সাহেব তখনও ধৃত হয় নাই, তারপরে কোথায় পলাইয়া যায়। অতঃপর সে কলিকাতার চীৎপুরে যায় এবং গুজব উঠিল যে সে আমেরিকায় চলিয়া গিয়াছে।

জ্যেষ্ঠ মোরেল সাহেব (রবার্ট মোরেল) পূর্ব্বোক্ত দাঙ্গার রাত্রে বরিশাল ছিল, বোধহয় alibi (অনুপস্থিতি) প্রমাণ করিবার জন্য। হেনরী মোরেল এবং লাইটফুট নামক আর একজন সাহেব বিলাত পলাইয়া যায়, তাহাদের প্রত্যেককে ধরিয়া আনিতে পারিলে ২০০০৲টাকা পুরস্কার পাইবার ঘোষণা হইল। হিলিও সত্যই বিলাত যায় নাই। ছদ্মবেশে সে আসামের জঙ্গলে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। তাহার সঙ্গে আড়াইশত টাকার আফিম ছিল, ইচ্ছা ছিল আসাম হইতে বার্ম্মা হইয়া চীনদেশে চলিয়া যায়, কিন্তু দুর্দ্ধর্ষ বঙ্কিমের ওয়ারেণ্ট ও বুদ্ধিশক্তি তাহাকে তৎপূর্ব্বেই আসাম হইতে ধরিয়া আনে।

হিলি যখন পলাতক, মোরেল সাহেব (রবার্ট) একটি ফন্দী করিয়া তাহার নামে একটি তহবিল তছরুপের মোকদ্দমা আনয়ন করে, উদ্দেশ্য—হিলির কার্য্য তাহার অনুমোদিত নয়—তাহাই প্রমান করিবার জন্য।

সমস্ত ঘটনার জন্য বেনব্রিজ সাহেব মোরেলের নিকট হইতে একটী কৈফিয়ত তলব করেন। ইতিমধ্যে মোরেলও ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্য অনুমতি চাহিল। কিন্তু বেনব্রিজ সাহেব তাহাকে লিখিয়া পাঠাইলেন—

"মোকদ্দমার নিষ্পত্তির পূর্ব্বে তোমার সঙ্গে আমি দেখা করিব না। তুমি আমার আবাসে আসিও না।"

এদিকে মোরেল সাহেবের লোক বঙ্কিমচন্দ্রকে প্রলোভিত করিতেও কম চেষ্টা করেন নাই। একজন সাহেব (মোরেল কি লাইট্ ফুট ঠিক বলা সম্ভব নয়) বঙ্কিমচন্দ্রের বাংলোতে উপস্থিত হয়, এক লক্ষ টাকার নোট ও স্বর্ণমুদ্রা উপস্থিত করিয়া বলে, 'হয় তুমি ইহা গ্রহণ কর, নচেৎ আমার এইগুলিই তোমার শেষ অস্ত্র হউক?' বঙ্কিমচন্দ্র স্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করিবার অজুহাতে বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিলেন, আর আসিলেন না। উক্ত শ্বেতাঙ্গ সাহেবও ভগ্নমনোরথ হইয়া শাসাইয়া চলিয়া যায়*।

বঙ্কিম-সহোদর পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ও লিখিয়াছেন—

"বঙ্কিমচন্দ্র সাহেবের পিস্তল গ্রাহ্য করেন নাই।" শচীশ বাবুও ঘটনাটি আংশিকভাবে উল্লেখ করিয়াছেন, তবে তিনি বলেন, "হিলি ছদ্মবেশে নামান্তর গ্রহণ করিয়া বোম্বাই হইতে পলাইতেছিল।" প্রকৃতপক্ষে হিলিকে আসামের জঙ্গল হইতে ধৃত করিয়া আনা হয়।

বস্তুতঃ বরাখালির এই বিখ্যাত ব্যাপার না জানিলে বঙ্কিমচন্দ্রকে ভাল করিয়া বুঝা যায় না। সাহেবদের কথা পরে বলিব। ইতিমধ্যে দুর্গাচরণ সাহা নামক মোরেলের প্রধান কার্য্যকারক ওয়ারেণ্টের ভয়ে বৃন্দাবনে পলাইয়া গিয়া রাধামাধব দাস নাম গ্রহণ করে। কিন্তু বঙ্কিমের ওয়ারেণ্ট তাহাকেও সেখান হইতেই লইয়া আসে। যশোহরের দায়রার বিচারে হিলির পক্ষের দৌলত চৌকীদারের ফাঁসির হুকুম হয়,৩৪জন আসামীর যাবজ্জীবন

* স্বর্গীয় কৈলাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাঁহার "Sayings of Bankim" পুস্তকে লিখিয়াছেন—

He conversed with Bankim Babu to the effect that his master was willing to pay him a lac of rupees which he had brought with him in gold on condition of his hushing up the celebrated Morelgunge case. If he was not willing to accept the offer, his alternative instruction was to shoot him on the spot ..After he had escaped out of the clutches of the dreadful man, he screamed aloud for his servants....

দ্বীপান্তর হয় এবং দুর্গাচরণ সাহার সাত বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড হয়। মোকদ্দমার পরে বেনব্রিজ সাহেব বঙ্কিমের বহু প্রশংসাবাদ করিয়া ফার্লো লইয়া বিলাত চলিয়া যান।

আর হিলি? আসামের জঙ্গলে ঘুরিতে ঘুরিতে অবশেষে মিচেল সাহেব (Henry Louis Mitchel) কর্তৃক আশ্চর্য্যভাবে ধৃত হইয়া পড়ে। ধরা পড়িয়া হিলি প্রথমে ক্রন্দন করিয়া উঠিয়াছিল ও নাম ভাড়াইয়া অবশেষে আপনাকে হিলি বলিয়া পরিচয় দিতে বাধ্য হয়।

হিলি ধৃত হয় জুলাই মাসে ১৮৬২, এবং সাত মাস হাজতে পচিবার পর ২৬শে জানুয়ারী ১৮৬৩এ হিলির বিচার হইল হাইকোর্টে এবং কসাইটোলার জুরীর সহায়তায়। প্রথম কথা হইয়াছিল হাইকোর্টের বিচারপতি মর্গ্যান সাহেব যশোহরে অথবা খুলনায় গিয়া স্থানীয় জুরীর সহায়তায় বিচার করিবেন, কিন্তু কেন যে তাহা হইল না তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। বিচার হইল স্যার চার্লস্ জ্যাক্‌সনের আদালতে এবং সরকার পক্ষ সমর্থন করিলেন কাউইস্ সাহেব (Advocate General) ও মিঃ গ্রাহাম Standing Counsel আর আসামী পক্ষ সমর্থন করিলেন Messers, Doyne ও Paul সাহেব।

কাউইস সাহেব প্রথমেই জজ ও জুরীদিগকে সম্বোধন করিয়া বলেন, "আপনাদের এই মোকদ্দমায় বিচারের বিষয় একটীমাত্র ব্যাপার সম্বন্ধে যে হিলির গুলিতেই রহিমের প্রাণবিয়োগ হইয়াছে কি না। দাঙ্গা অথবা ঘর জ্বালানি প্রভৃতি বিষয়ে কোন প্রমাণ নির্ণয় করিবার আপনাদের অধিকার নাই।" নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ এবং স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র সাক্ষ্য প্রদান করেন।—

হিলির ভগ্নীপতি Francis Bear—

"হিলি এই দেশে জন্মিয়াছে, তাহার পিতামাতা উভয়ে আয়র্লণ্ডের লোক। হিলির বয়স পূর্ণ ২১ বৎসর।

সমিরুদ্দিন প্রভৃতি ১২।১২ জন সাক্ষী বলিয়াছিল যে, হিলির গুলিতেই রহিমের প্রাণ বিয়োগ হয়।

ভগীবিবি বলে—"রহিমের বাড়ী থাকিতাম। সাহেবকে স্বহস্তে প্রাণনাশ করিতে দেখিয়াছি। অতঃপর মৃতদেহ ও আমাকে নৌকায় করিয়া লইয়া যায়। হিলি প্রথমে সেই নৌকায় ছিল। হিলি যাবতীয় দস্যুকে লুঠ ও হত্যা করিতে উৎসাহ দেয়।"

বড়ুবিবি—ঐ—

রহিমের স্ত্রী ফল্‌গা বিবি—রহিম যে মহারাণীর দোহাই দিয়া স্ত্রীলোকের প্রতি অপমান করিতে নিষেধ করেন, তাহা বলেন। তবী বিবি, ফল্‌গা বিবিকে কিরূপে নৌকায় করিয়া হিলি লইয়া যায় তাহা বিবৃত করেন।

বঙ্কিমচন্দ্র সাক্ষী দিতে দাঁড়াইয়া বলেন—

"আমি গত বৎসরের অগ্রহায়ণ মাসে বরাখালীর দাঙ্গার কথা শ্রবণ করিয়া তথায় গিয়াছিলাম। তিনজন সাক্ষীর জবানবন্দী লই, তাহার মধ্যে একজন সমিরুদ্দিন (সরফতুল্লা) মৃতপ্রায় ছিল। ২রা ডিসেম্বর হুরুলিয়ায় আমার সহিত হিলির সাক্ষাৎ হয়। মোরেলের কয়েকজন প্রজার উপর সন্দেহ হওয়ায় আমি হিলিকে তাহাদিগকে ধরিয়া দিতে বলি। হিলি বলিলেন, তাহারা নির্দ্দোষ। হিলির নাম জিজ্ঞাসা করিলে হিলি তাহা বলেন না। মোরেলের বাটীর ভিতর হইতে দুই ব্যক্তিকে বাহির করা হয়। ৬ই ডিসেম্বর হিলিকে গ্রেপ্তার করিবার পরোয়ানা নাজিরকে দিয়াছিলাম। হিলি ধৃত হইয়া আনীত হইলে তাহার একজন বন্ধু গত জুলাই মাসে (১৮৬২) বলেন, যাহাকে হিলি বলিয়া ধৃত করা হইয়াছে, সে বস্তুতঃ হিলি নহে। আর হিলিকে সে হিলি কিনা জিজ্ঞাসা করিলে বলে, I do not say that :I am and I do say that I am not, হিলিই যে হত্যাকারী এ কথা অনেক ব্যক্তি তাহার নিকট বলিয়াছে। আমি যখন হিলিকে চিনিতে পারিয়া গ্রেপ্তার করিতে চেষ্টা পাই, তখন সে বলিয়াছিল যে, মোরেলগঞ্জের উপর পদার্পণ করিবে, আমি তাহাকে গুলী করিব। কিন্তু সেই ব্যক্তিই যে তিনি তাহা নিঃসন্দেহ না জানিয়া গ্রেপ্তার করি নাই।"

পুলিসের জমাদার দীনবন্ধু সিংহ "হিলিকে আমি নিজচক্ষে ঘটনাস্থলে দেখিয়াছি" বলিয়া সনাক্ত করে। হিলিকে সনাক্ত করিবার জন্যই সে গিয়াছিল।

সমস্ত সাক্ষীর জবানবন্দী হইয়া গেলে ২৮শে জানুয়ারী প্রধান জুরী (foreman) বলিয়া উঠিলেন—we wont

hear defence—prosecution failed to prove the case. We are unanimous. "আমরা আসামীর বক্তব্য শুনিতে চাই না। সরকার পক্ষ প্রমাণ করিতে অসমর্থ হইয়াছে।" জুরীরা সকলেই ছিল শ্বেতাঙ্গ সাহেব।

জজ সাহেব বাহাদুরও জুরীদের সহিত একমত হইয়া আসামীকে মুক্তিপ্রদান করেন। এই বিচার সম্বন্ধে 'সোমপ্রকাশ' নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশ করে—

"জুরীরা যেরূপ মত প্রকাশ করুন না কেন, আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যে, হিলি হইতে বরাখালির হত্যাকাণ্ড সাধিত হইয়াছে। সাক্ষীদিগের বাক্যে আমাদিগের অণুমাত্র সংশয় জন্মিতেছেনা। এপ্রকার অত্যাচার, এরূপ নৃশংস মানবস্বভাব এরূপ অনুষ্ঠিত ব্যবহার অন্যকোন দেশে কখনও দৃষ্ট হয় নাই। ফরাসী-বিদ্রোহে সহস্র সহস্র লোক এক এক স্থানে হত হইয়াছে. যথার্থ বটে, কিন্তু প্রগাঢ় শান্তির সময়ে কোন সভ্যদেশেও সভ্যতম গভর্ণমেণ্টের অধীনে দুর্ব্বল ব্যক্তির উপর এরূপ অত্যাচার হইয়াছে ইহা কখনও শ্রবণ করা যায় নাই। অত্যন্ত অসভ্য জনের বিচারও ইহার নিকটে লজ্জিত হইয়াছে। মনুষ্য ক্রোধ, লোভ, স্বার্থপরতা ও বৈরনির্য্যাতন নিষ্ঠুরতাদি দ্বারা প্রেরিত হইয়া যে সমস্ত কুক্রিয়া করিয়া থাকে সে সমস্ত এক হিলির দ্বারা একপদে সম্পাদিত হইয়াছে। হিলি গৃহদাহ, গৃহ বিলুণ্ঠন, হত্যা, বলাৎকার, ভ্রূণহত্যাদি কোন পাপক্রিয়াই অনুষ্ঠান করিতে বাকী রাখে নাই। ভয়ানক যুদ্ধের পরও জয়শীল সেনাগণ শত্রুদলের মৃতব্যক্তিদিগের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া করিতে দেয়, নিতান্ত দুরাত্মা হিলি রহিমুল্লাকে এ সম্মানও প্রদান করে নাই।"

যে জন্য হিলির সনাক্ত সম্বন্ধে জুরীর মনে সন্দেহ জন্মে তাহা বড়ই বিস্ময়কর। অনেকেই হিলিকে সনাক্ত করিয়াছে তবে আবার কেহ কেহ বলিয়াছে একজন সাহেব ছিল, কেহ বলিলেন—মোরেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ছিল। তবে অন্ধকারে তাহার শ্বেতবস্ত্র ছিল কি লালবস্ত্র ছিল, তাহার হাতে বন্দুক ছিল কি পিস্তল ছিল, তাহা সঠিক বলিতে পারে নাই। তবে ১২।১৪ জন সাক্ষীর মধ্যে কোন কথার কোন বৈলক্ষণ্য হয় নাই। তাহাদের প্রদত্ত প্রমাণই হিলির অপরাধ সাব্যস্ত করিতে যথেষ্ট ছিল। তবে জুরীদের বিচার সম্বন্ধে নন্দকুমারের সময়ের ন্যায় একালেও সকলের আস্থা বড় কম ছিল। কসাইটোলার জুরীদের গুণ সম্বন্ধে বাঙ্গলার ছোটলাট ইডেন সাহেবও (Sir Ashley Eden) দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন, "অপরাধ করিয়া যদি নির্দ্দোষ প্রমাণিত হইবার ইচ্ছা থাকে, তবে Supreme Court-এর বিচারই মনোনীত করিও।"

হিন্দু পেট্রিয়ট খুব নির্ভীকভাবে লিখিয়াছিল—Dennis Hely the rioter, the arraigned murderer, the fugitive the prisoner is now again a gentleman.

যাহাহউক হিলি মুক্ত হইয়া বেঙ্গলী, হিন্দু পেট্রিয়ট, সোমপ্রকাশ প্রভৃতি সংবাদপত্রের নামে মানহানির মোকদ্দমা করিবে বলিয়া ভয় দেখাইয়াছিল। 'বেঙ্গলী' সম্পাদক গিরিশচন্দ্র ঘোষ তখন বিদেশে ছিলেন। এই সম্বাদ শুনিয়া তাঁহার পুত্র অতুল ঘোষ মহাশয়কে পত্রে লেখেন, "যদি মোকদ্দমা হয় তো খুব ভালই হইবে—"I would consider it good fortune for the "Bengalee" to be the means of confirming the guilt of a man who had providentially escaped Scot-free. Providence will not save him a second time.

যাহা হউক, Advocate General বাহাদুর দাঙ্গা ও ঘর জ্বালানির (Rioting and arson) এর চার্জ্জ-গঠন না করাইয়া খুবই অন্যায় করিয়াছিলেন, কারণ হিলি যে সর্দ্দার ছিল, ঘর জ্বালাইয়া দিয়াছিল এবং স্ত্রীলোকদের নিয়া নৌকায় চলিয়া যায়, এই সম্বন্ধে সব সাক্ষীই প্রায় একরূপ বলিয়াছিল। জজসাহেবও বলিয়াছিলেন, "That there was a serious affray there can be no doubt."

হিলি মুক্তই হোক বা পালাইয়াই যাক্, বঙ্কিমচন্দ্র দোষী ব্যক্তিগণকে ধৃত করিয়া যেরূপ বিচার বুদ্ধি, কৌশল ও নির্ভীকতার পরিচয় দিয়াছেন, এ রোমাঞ্চকর অধ্যায়ের অবতারণা সেই উদ্দেশ্যেই হইয়াছে। আর এই মোকদ্দমার ঘটনা হইতেই (দাঙ্গা, গুলি নিক্ষেপ,

মশাল, নৌকায় পলায়ন) যে চন্দ্রশেখরের বাড়ীর ডাকাতির সূত্র আর হিলিই যে দুর্বৃত্ত লরেন্স ফষ্টর, তাহা বুঝাইবার জন্যই এই বিবৃত ঘটনায় পাঠককে পীড়িত করিতে সাহসী হইয়াছি।

হিলি যেমন ২৫শে নভেম্বর বিফল মনোরথ হইলেও "Now or Never" বলিয়া সেই রাত্রেই বহুসংখ্যক লাঠিয়াল লইয়া রহিমের বাড়ী সশস্ত্র হইয়া আক্রমণ করে, লরেন্স ফষ্টরও "Now or Never" সঙ্কল্প করিয়া পূর্ব্ব রাত্রেই সন্ধ্যার পরে শিবিকাবাহক, কুঠীর কয়জন বরকন্দাজ লইয়া বেদগ্রাম অভিমুখে যাত্রা করে।

চন্দ্রশেখরে ফষ্টরের আক্রমণের যে বিবরণ প্রকৃত পক্ষে হিলিরই তাহা পরিচয়—"গ্রামবাসীর চীৎকার, কোলাহল, বন্দুকের শব্দ এবং রোদনের ধ্বনি, মশালের আলো"—সবই হিলির আক্রমণেও ছিল।

চন্দ্রশেখরে যে বর্ণিত আছে—"ফষ্টর স্বয়ং শিবিকা সমভিব্যাহারে লইয়া দূরবর্ত্তিনী ভাগীরথী তীর পর্য্যন্ত আসিলেন। সেখানে নৌকা সুসজ্জিত ছিল। শৈবলিনীকে নৌকায় তুলিলেন" ইত্যাদি ঘটনা "পরিদর্শকে" বিবৃত ঘটনারই অনুরূপ।

হিলির নিষ্ঠুরতার সহিত বলাৎকারেরও সংস্রব ছিল, কিন্তু ফষ্টর শৈবলিনীর কামরায় আসিতে অগ্রসর হইলে শৈবলিনী বলে, "যদি আমার ঘরে প্রবেশ কর, এ ছুরিতে হয় তুমি মরিবে, নয় আমি মরিব।" আর ছুরির ভয়ে দুরন্ত ইংরাজ বশ হইয়াছিল।

"চন্দ্রশেখর" উপন্যাসে ফষ্টর সম্বন্ধে বঙ্কিমের বর্ণনা হিলিকে উপলক্ষ করিয়াই লিখিত—

"এ সময় যে সকল ইংরাজ বাঙ্গলায় ছিলেন, তাহারা দুইটি কার্য্যে মাত্র অক্ষম ছিলেন। তাহারা লোভ সম্বরণ করিতে অক্ষম আর পরাভব স্বীকার করিতে অক্ষম। তাহারা কখনও স্বীকার করিতেন না, একার্য্য পারিলাম না, নিরস্ত হওয়াই ভাল এবং তাহারা কখনও স্বীকার করিতেন না যে, এ কার্য্যে অধর্ম্ম আছে অতএব অকর্ত্তব্য। যাহারা ভারতবর্ষে প্রথম ব্রিটেনিয়া রাজ্য সংস্থাপন করেন, তাহাদিগের ন্যায় ক্ষমতাশালী এবং স্বেচ্ছাচারী মনুষ্য-সম্প্রদায় ভূমণ্ডলে কখনও দেখা যায় নাই। লরেন্স ফষ্টর সেই প্রকৃতির লোক।"

যাহা হউক, হিলি যেমন নাম বদ্লাইয়া আসামের জঙ্গলে ঘুরিতেছিল, ফষ্টরও জন ষ্টালকার্ট নাম দিয়া "প্রাণ ভয়ে ভীত হইয়া প্রাণ ভয়ে পলাইতেছিল"।

চন্দ্রশেখরে আছে—আমীর হোসেন তাহাকে জিজ্ঞাসা করে, "লরেন্স ফষ্টর নামে একজন ইংরাজকে আপনি চিনেন?"

ফষ্টর উত্তর করে—"লরেন্স ফষ্টর? কৈ, না?"

আমীর হোসেন—কখনও তাহার নাম শুনিয়াছেন?

ফষ্টর কিছু বিলম্ব করিয়া উত্তর করিল—"নাম—লরেন্স ফষ্টর—হাঁ, কই? না।

হিলিও প্রথমে আপনার নাম ভাড়াইয়াছিল, পরে আপনাকে হিলি বলিয়া পরিচয় দেয়। হিলিকে যেমন ওয়ারেণ্টে ধরা হয়, আমীর হোসেনও কুলসমের নিকটে লরেন্স ফষ্টরের পরিচয় পাইয়া সমরুকে বলে, "সাহেব! ইহার গ্রেপ্তারের জন্য নবাব নাজিমের অনুমতি আছে। আপনি আমার সঙ্গে সিপাহী দিন, ইহাকে লইয়া চলুক।"

ফষ্টরকে প্রহরীর সহায়তায় আমীর হোসেন বাঁধিয়া লইয়া গেলেন। হিলিও প্রহরীর সহায়তায় আসাম হইতে খুলনা প্রেরিত হয়।

গ্রেপ্তার হইলে হিলি যখন বঙ্কিমের নিকট উপস্থিত হয়, সে বলে, "আমি নিজেকে হিলি বলিব না এবং নাও বলিব না।" এতদ্ভিন্ন আরও কি কথাবার্ত্তা হইয়াছিল সঠিক বলা কঠিন। কিন্তু ফষ্টরের শেষ কথায় কতক পরিচয় পাওয়া যায়।

লরেন্স ফষ্টর আনীত হইয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল। নবাব জিজ্ঞাসা করিলেন—তুমি কে?

লরেন্স ফষ্টর বুঝিয়াছিল যে, এবার নিস্তার নাই। এতকালের পর ভাবিল, "এতকাল ইংরেজ নামে কালি দিয়াছি, এক্ষণে ইংরেজের মত মরিব"—

"আমার নাম লরেন্স ফষ্টর।"

নবাব--তুমি শত্রু হইয়া কেন আমার শিবিরে আসিয়াছিলে?

ফষ্টর—আসিয়াছিলাম সেজন্য আপনার যাহা অভিরুচি হয় করুন—আমি আপনার হাতে পড়িয়াছি। কেন আসিয়াছিলাম, তাহা জিজ্ঞাসার প্রয়োজন নাই—জিজ্ঞাসা করিলেও উত্তর পাইবেন না।

নবাব—জানিলাম তুমি ভয়শূন্য—সত্য কথা বলিতে পারিবে?

ফ—ইংরেজ কখনও মিথ্যা বলে না।

ন—বটে? তবে দেখা যাউক।...

শৈবলিনী আনীতা হইল। ফষ্টর প্রথমে শৈবলনীকে চিনিতে পারিলেন না—শৈবলিনী রুগ্না, শীর্ণা মলিনা জীর্ণ সঙ্কীর্ণ বাস পরিহিতা। রহিমের পরিবারস্থ রূপ যৌবন সম্পন্না ফলুগা বিবি এবং ভগী বিবিরও কম দুর্দশা হয় নাই।

নবাব জিজ্ঞাসা করিলেন—ইহাকে চেন?

ফ—চিনি।

ন—এ কে?

ফ—শৈবলিনী, চন্দ্রশেখরের পত্নী।

ন - তুমি চিনিলে কি প্রকারে?

ফ—আপনার অভিপ্রায়ে যে দণ্ড থাকে, অনুমতি করুন, আমি উত্তর দিব না।

ন—আমার অভিপ্রায় কুকুর দংশনে তোমার মৃত্যু হইবে।

ফষ্টরের মুখ বিশুষ্ক হইল, হস্ত পদ কাঁপিতে লাগিল, ভগবানকে এই প্রথম সে ডাকিল।

হিলিও এইরূপ কাঁদিয়া উঠিয়াছিল।

পরে রামানন্দ স্বামী আশ্বাস প্রদান করিলে ফষ্টর বলিতে লাগিল—

"আমি শৈবলিনীর রূপে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে গৃহ হইতে হরণ করিয়াছিলাম। আমার নৌকায় রাখিয়াছিলাম, মনে করিয়াছিলাম সে আমার প্রতি আসক্ত। কিন্তু দেখিলাম যে, তাহা নহে, সে আমার শত্রু। নৌকায় প্রথম সাক্ষাতেই সে ছুরিকা নির্গত করিয়া আমাকে বলিল, 'তুমি যদি আমার কামরায় আসিবে, তবে এই ছুরিতেই দুজনে মরিব। আমি তোমার মাতৃতুল্য। আমি তাহার নিকট যাইতে পারি নাই, কখনও তাহাকে স্পর্শও করি নাই।"

শৈবলিনী ফষ্টরের হাত হইতে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিল, কিন্তু রহিম-পত্নী নিরুপায়া ফলুগা বিবিকে নিঃসহায় অবস্থায়ই ধরিয়া লইয়া হিলি তাহার প্রতি অমানুষিক অত্যাচার করিতে দ্বিধা করে না। বঙ্কিম শাসিত হিলির নিষ্ঠুরতা কল্পনা করা যায় না, উহা বিবৃত করিবার ভাষাও অভিধানে নাই, তবে ফষ্টর হিলির ছায়াবলম্বনে চিত্রিত হইলেও বঙ্কিম-লেখনী তাহাকে খুব ভদ্রভাবে অঙ্কিত করিয়াছে।

যাহা হউক, বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতাপে মোরেল সাহেবদের বিস্তর ক্ষতি হইল। অত্যাচারী নীলকর মোরেলগণ মামলা মোকদ্দমা ও অপযশ দুর্নামে একরূপ সর্ব্বস্বান্ত হইয়া গেল। ঘোর পাপে মোরেলদের পতন অনিবার্য্য হইয়া পড়িল। তাঁহারা জমিদার দুর্গাচরণ লাহার নিকট সমস্ত সম্পত্তি বিক্রয় করিতে বাধ্য হয়।

এই মোকদ্দমার ব্যাপারেই যে কেবল বঙ্কিমচন্দ্রের যশ বৃদ্ধি হয় তা নয়, তিনি সুন্দরবন এবং সমুদ্রের নিকটবর্ত্তী নদীসমূহেও জলদস্যুদের নিবারণ করিয়া অত্রাঞ্চলে বিশেষ শান্তিবিধান করেন। সুন্দরবন ও খুলনা অঞ্চল বরিশালের ন্যায় দস্যুপ্রধান স্থান ছিল এবং বঙ্কিম ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে দৃঢ় পাহারা রাখিয়া কঠোর বিচারনীতি অবলম্বনে সমস্ত উপদ্রব দূর করিয়া সকলের আশীর্ব্বাদ সঞ্চয় করেন। গভর্ণমেণ্টও এই বিষয়ে তাঁহার কার্য্যের প্রশংসা করেন এবং এমন যে সিভিলিয়ান সাহেব সি, ই, বাকলাণ্ড. তিনিও তাঁহার "Bengal under Lieutanant Governors" নামক পুস্তিকায় বঙ্কিমের প্রশংসা করিয়া লিখিয়াছেন—

While in charge of Khulna he helped very largely in suppressing river docoities and establishing peace and order in the eastern canals.

[Bengal under Lieutanant Governors.

– C. E. Buckland.

আরেকটি অত্যাচারী সাহেবের কথাও উল্লেখ করিব। খুলনার অপর দিকে ভৈরবনদের তীরে রেনি (Rainy) সাহেবের কুঠি বলিয়া এখনও একটী কুঠি আছে। ঐ স্থান হইতে অর্দ্ধ মাইল দূরে সাহেবের পুরাতন কুঠী অবস্থিত ছিল, কিন্তু তাহা এখন নদীগর্ভে। ঐ কুঠিতে Rainy সাহেবের নীলের কারবার ছিল আর সাহেব ভারী অত্যাচারী ছিল। ইহাকে দমন করাও বঙ্কিমের প্রধান কাজ হইয়াছিল।

এই সব প্রশংসনীয় কার্য্যের জন্য ১৮৬০ সালের ১৩ই জানুয়ারী তারিখে বঙ্কিম চতুর্থ শ্রেণীর ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে উন্নীত হন এবং তাঁহার একশত টাকা বেতন বৃদ্ধি পায়।

ইহার পরেও এক বৎসরকাল বঙ্কিম খুলনায় ছিলেন। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের ৫ই মার্চ্চ তারিখে বারুইপুর মহকুমার সবডিভিসন্তাল ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে তিনি বদলী হইয়া যান।

সাহিত্যিক

শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়

সাহিত্যিক।

নামকরা সাহিত্যিক। প্রায় সব পত্রিকাতেই তার লেখা গল্প সমাদরে প্রকাশিত হয়। বাংলার পাঠক-পাঠিকারা তার গল্পের জন্য ব্যগ্রতার সঙ্গে প্রতীক্ষা করিয়া থাকে। তার লেখার আদর—খুবই। কিন্তু, লেখার জন্য তার খ্যাতি যত বড়, তার সাংসারিক অস্বচ্ছলতাও ঠিক ততই বড়। একটা ছোট সদাগরী আফিসে ৬০৲ টাকা মাহিনায় কেরাণীগিরি চাকরী করে। লেখার খুব আদর ও চাহিদা থাকিলেও, তাহা হইতে তাহার মাসে ৩০।৪০৲ টাকার বেশী কখনই হয় না। সুতরাং সংসারে টানাটানি হওয়া ত স্বাভাবিক। কিন্তু রমেশ সাহিত্য রচনাতেই বিভোর, সংসারের অভাব-অনটন তাহাকে চঞ্চল বা চিন্তিত করিতে পারে না।

সংসারে পরিজন সংখ্যা মাত্র দুইজন; সে এবং তার স্ত্রী সবিতা। সুতরাং দুইটি প্রাণীর আহারের ব্যয় তেমন কিছু বেশী পড়ে না। ঘরের ভাড়া, জামা-কাপড়, চা-সিগারেট, ডাক্তার, ওষুধ, ট্রাম-বাসের ভাড়া, ধোবা-নাপিত, এখানে-সেখানে বেড়ানো, কিছু কিছু অনাবশ্যক সখের জিনিস কেনা প্রভৃতিতেই রমেশের স্বল্পার্জ্জিত অর্থ নিঃশেষে ব্যয় হইয়া গিয়া, প্রতিমাসেই কিছু কিছু দেনা হইয়া থাকে। মাহিনা পাইলেই, পূর্ব্বমাসের দেনা শোধ হইয়া যায়, কিন্তু আবার নূতন দেনা হিসাবের খাতায় নিয়মিত স্থানটা অধিকার করিয়া বসে। কিন্তু রমেশের এজন্য কোন অস্থিরতা বা দুর্ভাবনা নাই। সে সাহিত্য-সাধনাতেই ডুবিয়া থাকে; সৃষ্টির আনন্দেই সে বিভোর। চিন্তা ও চাঞ্চল্য শুধু সবিতার। এই অবস্থায় একটি নূতন আগন্তুক, তাহার আগমন বার্ত্তা পাঠাইয়া তাহাকে অধিকতর চিন্তান্বিত করিয়া তুলিয়াছে। এই সূত্রে তাহার অন্তরে আনন্দ ও নিরানন্দের দ্বন্দ্ব লাগে। শেষে নিরানন্দ ও দুশ্চিন্তাকেই সমস্ত স্থানটা ছাড়িয়া দিয়া, পরাজিত আনন্দ অদৃশ্য হইয়া পড়ে। এই ভাবে দিন যায়।

সেদিন সকালে চা খাইয়া রমেশ লিখিতে বসিয়াছিল। স্নানাহারের সময় উত্তীর্ণ হইলেও রমেশ উঠিল না, এক মনে সে লিখিয়া যাইতেছিল, সবিতা কয়েকবার তাহাকে ডাকিতে আসিয়া বৃথাই ফিরিয়া গেল। অবশেষে, বেলা যখন প্রায় বারটা, তখন রমেশ তার গল্পটা শেষ করিয়া মহাতৃপ্তি এবং আনন্দের সঙ্গে সবিতার সামনে আসিয়া কহিল—"কালকের গল্পটা আজ শেষ কোরে ফেল্লুম। Grand, grand Sublime, grand গল্পটা যে কী সুন্দর হোল তা আর কি বোলবো তোমাকে। আমার সমস্ত শক্তি দিয়ে ওর finishing paraটা লিখলুম। কি Sublime, কী চমৎ...!"

কিন্তু যাহাকে বলা হইতেছিল, সে তখন ভাবিতেছিল—"কী দুর্ভাগ্যের ঘন মেঘ! কী অন্ধকার ভবিষ্যৎ!"

অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে রমেশ কহিল—"গল্পটা শুনবে একবার? পড়বো?"

"আজ তা হোলে তোমার আফিস···

"রেখে দাও তোমার আফিস। কী চমৎকার উৎরে গেল যে গল্পটা! দুপুর বেলা তোমায় পোড়ে শোনাব, সবু!"

"কিন্তু ঘন-ঘন এই রকম আফিস-কামাই"···কথাটা রমেশের কানেই গেল না। লেখা খাতাখানা হাতে করিয়া সে শোবার ঘরের দিকে চলিয়া যাইতে যাইতে আবার ফিরিয়া আসিয়া কহিল—"এইবার নাইতে হবে, খেতে হবে, কি বল? বেলা কত হল!" বলিয়া আনন্দ-পদবিক্ষেপে পুনরায় ঘরের দিকে অগ্রসর হইল।

সবিতা আর কোন কথা বলিল না। শুধু একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া, যেমন বসিয়াছিল, তেমনি বসিয়া রহিল।

পরের দিন আফিসে গেলে, বড় বাবু তাহাকে ডাকিয়া কহিলেন—"দেখুন রমেশবাবু. এত কামাই করলে চলবে না। আমি সাহেবের কাছে কি বলি বলুন ত ?"

রমেশ আমৃতা-আমৃতা করিয়া কহিল—"কাল একটা গল্প শেষ করতে বেলা হোয়ে গেল। শেষটা যদি একটানা শেষ না করতুম, তা হোলে লেখাটা যেরকম সুন্দর উৎরে গেছে, ঠিক ও রকমটি হোত না। সেই জন্যে…

"কিন্তু, যে জন্যেই হোক, ওরা সাহেব-সুবো লোক, ওরা আপনার লেখা বুঝবেওনা, তার ধারও ধারে না। তা একটা কাজ করলেই ত পারেন। লেখায় যদি আপনার ভালো রকম আয় থাকে, ত চাকরি না-হয় না-ই করলেন। তাতে আপনি লেখার জন্যে প্রচুর সময় পেতে পারবেন।"

"কিন্তু জানেন ত, আমাদের দেশে লেখাতে কি রকম টাকা পাওয়া যায়। লেখাটা ঠিক টাকা পাবার জন্যে নয়। অর্থ উপার্জ্জনের সঙ্গে সাহিত্য রচনার কোন সংস্রবই নেই।"

"তাই যদি হয়, তা হোলে লেখা-টেখা ছেড়ে দিন ; পেটটা চালাতে হবে ত ?"

"পেটের জন্যে লেখা ছাড়ব !"

"না খেয়ে ত লেখা চলবে না। লিখতে হোলে বাঁচতে হবে ; বাঁচতে হোলে দুটি খেতেও হবে। খেতে হোলে পয়সা উপার্জ্জন চাই।"

রমেশ আর কোন কথা না বলিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। বড়বাবু কহিতে লাগিলেন—"যাই হোক, আপনার ঘন-ঘন কামাইয়ের জন্যে সাহেব আপনার ওপর খুবই বিরক্ত। আপনার ওপর সাহেবের অসন্তোষের মাত্রা যতদূর বাড়বার বেড়েচে। আপনার ভালোর জন্যেই বলচি, রমেশবাবু ; খুব সতর্ক হোয়ে আপনি কাজ করবেন।"

গত কালের লেখা গল্পটা খুব ভালো হওয়াতে, যে পরিমাণ আনন্দে তাহার মন ভরা ছিল, আজ বড়বাবুর এই সব কথায়, সেই আনন্দের পনর আনা তিন পাই, তাহার অন্তর হইতে উধাও হইয়া নিরানন্দের বায়ুমণ্ডলে মিলাইয়া গেল। সে বিমর্ষচিত্তে তাহার চেয়ার খানাতে আসিয়া বসিয়া পড়িল।

দুই

বেলা নয়টা বাজিয়া যায় ; কয়েক মিনিট মাত্র বাকী। রমেশের স্নান করিবার সময় হইয়াছে, কিন্তু উঠিতে পারিতেছে না। একটা কবিতা সে এইমাত্র শেষ করিয়াছে। তাহারই ভাব-মাধুর্য্যের মধ্যে সে নিমগ্ন। দুই চারিটা—'মিল' ঠিক তাহার মনোমত হয় নাই ; সেই মিলের কথাই তাহাকে পাইয়া বসিয়াছিল। অপেক্ষাকৃত ভাল মিলের জন্য সে একান্ত মনে চিন্তা করিতেছিল, তাই উঠি-উঠি করিয়াও উঠিতে পারিতেছিল না। যদিও সবিতা দুইবার তাহাকে স্নানের জন্য তাগাদা দিয়া গিয়াছে।

অবশেষে ফাঁদ, চাঁদ,' 'অবসাদ,' 'প্রতিবাদ,' 'একাকী,' 'ফাঁকি' প্রভৃতি কথাগুলো তাহার ক্লান্ত মস্তিষ্কের মধ্যে যখন দ্বন্দ্ব বাঁধাইল, তখন রাত্রের জন্য ঐ মিল গুলিকে মুলতুবি রাখিয়া খাতাখানা বন্ধ করিতেই বাহির হইতে একটি ষোল-সতের বছরের কিশোরী ঘরে ঢুকিয়া কহিল—"আপনাকে একটু জ্বালাতন করতে এলুম ; আমি বালীগঞ্জ প্রেস থেকে আসচি।"

"বলুন। কি দরকার আপনার ?"

মেয়েটির হাতে সুন্দর চাকচিক্যময় একখানা বাঁধানো খাতা ছিল, কহিল, "আমার autographয়ে বড্ড সখ। তাই আপনার কাছে এসেছি…

"অটোগ্রাফ নেবার জন্যে ?"

"আজ্ঞে, হ্যাঁ। দয়া কোরে একটু 'বাণী' আর তার সঙ্গে আপনার নাম সইটা…" বলিয়া মেয়েটি তাহার অটোগ্রাফের খাতার পাতা উল্টাইতে লাগিল।

মেয়েটি কহিল—"এ মাসের 'বাঁশরী'তে আপনার গল্পটা পড়লুম। কি চমৎকার যে আমার লাগলো, তা আর বলবার নয়।" আনন্দ-বিস্ফারিত চোখে মেয়েটির দিকে চাহিয়া থাকিয়া রমেশ কহিল—"খুব ভাল লেগেছে আপনার ?"

"আপনার সব গল্পই আমার যে কি ভালো লাগে ! আমার দাদা আপনার গল্প পড়বার জন্যে পাগল !"

এই সময়ে সবিতা আর একবার উঁকি দিয়া দেখিয়া গেল ; রমেশ তাহা দেখিতে পাইল না। মেয়েটির সঙ্গে

বহুক্ষণ ধরিয়া বহু কথা কহিল। তারপর মেয়েটি যাইবার জন্ত যখন উঠিয়া দাঁড়াইল, তখন রমেশ তাহার হাত ঘড়িটার উপর চোখ দিতেই চোখ দুইটা তাহার কপালে উঠিয়া গেল। বেলা তখন সওয়া দশটা। স্নান না করিয়া, নাকে-মুখে দুটি ভাত গুঁজিয়া ছুটিলেও, আফিসে পৌঁছিতে তাহার সাড়ে এগারটা হইবে। অত বেলায় আফিসে যাওয়া-না যাওয়া সমান; সুতরাং……

সুতরাং তাহার আফিস যাওয়া হইল না…

পরের দিন আফিসে গেলে, কেহই তাহাকে কিছু বলিল না, শুধু বড় সাহেব তাহাকে ডাকাইয়া এইটুকু মাত্র বলিলেন—This is the 2nd warning and be careful for the 3rd !"

কিন্তু তখনো রমেশের মাথার মধ্যে—'একাকী', 'ফাঁকি', 'অবসাদ' 'প্রতিবাদ' প্রভৃতি মিলগুলা তাল-গোল পাকাইতেছিল এবং কবিতার কাগজখানা তাহার পকেটের মধ্যে থাকিয়া হাঁফাইয়া উঠিতেছিল।

সেই সপ্তাহের একখানা কাগজেই রমেশের লেখা কোন-একটা গল্পের ভূয়সী প্রশংসা বাহির হইয়াছিল। তাহাতে লেখা হইয়াছে—'এ রকম সুন্দর গল্প, একমাত্র রমেশবাবুর দ্বারাই সম্ভব। শুধু বাংলা সাহিত্যে নয়, জগতের সাহিত্যে রমেশবাবুর দান অতুলনীয়।... * *।' ইহা পাঠ করিয়া গর্ব্বে ও আনন্দে রমেশের মন ফুলিয়া ফুলিয়া দুলিয়া উঠিতেছিল। তাহার এই দেশ-জোড়া যশ, এই সর্ব্বজন প্রসারিত খ্যাতির কাছে, তাহার চাকরী, আফিস, অর্থোপার্জ্জন, বাড়ী, ঘর, সংসার সব-কিছুই তুচ্ছ বলিয়া মনে হইল। সেদিন আফিসের কাজে-কর্ম্মে তাহার অযথা বিলম্ব এবং ভুল হইতে লাগিল। কোন রকমে পাঁচটা পর্য্যন্ত কাটাইয়া সে উৎসাহিত মনে বাসায় ফিরিয়া আসিল ও সবিতাকে চায়ের জন্ত বলিয়া কবিতার কাগজখানা খুলিয়া বসিল।

সন্ধ্যার পর, চা খাইতে খাইতে, রমেশ যে-ভদ্র-লোকটির কথা মনে মনে ভাবিতেছিল, এবং যাহার আগমন-প্রতীক্ষায় মাঝে মাঝে ঘড়িটার দিকে চাহিয়া দেখিতেছিল, কিছু পরে তিনি খুব জোরে জুতার শব্দ করিয়া এবং ততোধিক জোর শব্দে দরজাটা খুলিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং রমেশকে চা খাইতে দেখিয়া কহিলেন—"দাদা, বউদিকে আর এক কাপের জন্যে বলে আসুন, সারাদিন ঘুরে ঘুরে বড্ড ক্লান্ত হোয়ে পড়েছি।"

এই যুবকটি রমেশকে যথেষ্ট ভালবাসে এবং কিসে রমেশের আর্থিক অসচ্ছলতা দূর হয়, সর্ব্বদাই সেজন্ত চিন্তা এবং চেষ্টা করিয়া থাকে। তাহার টানাটানির সংসারের প্রকৃত খবর, বাহিরের কেহ একটা বড় জানিত না, শুধু জানিত এই হরনাথ। হরনাথের উপর রমেশেরও খুব প্রীতি; সে জানিত যে, একমাত্র হরনাথই তাহার প্রকৃত বন্ধু ও মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। সে তাহাকে আপন কনিষ্ঠ সহোদর বলিয়া মনে করিত এবং সেইরূপ ভালবাসিত। তাহার দুইখানি গল্পের বই হরনাথই ছাপাইয়াছে। সে দুইখানা বই বাজারে প্রায় সবই বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। আর একখানা নতুন বই হরনাথ ছাপাইতে চায়। আজ সেই বিষয়ে কথা কহিতেই হরনাথ আসিয়াছে। সবিতা কিন্তু হরনাথের উপর মোটেই সন্তুষ্ট নয়; কারণ—আগেকার বই দুইখানার জন্ত হরনাথ একটি পয়সাও রমেশকে দেয় নাই। অন্য কোন প্রকাশককে দিলে নিশ্চয়ই কিছু পাওয়া যাইত, এবং তাহাদের টানাটানির সংসারে তদ্দারা অনেক উপকার হইত। কিন্তু রমেশ সবিতাকে বুঝাইত যে, জগতে পয়সা অপেক্ষা প্রীতির মূল্যই বেশী। তাহার প্রতি হরনাথের প্রগাঢ় ভালবাসাটা সে ভালভাবেই বুঝিত। সে জানিত, অসময়ে হরনাথ নিশ্চয় তাহাকে দেখিবে। তাহার অদিনে হরনাথ তাহাকে না দেখিয়া পারিবে না। হয়ত সবিতা হরনাথকে ঠিক বুঝিতে পারে নাই। রমেশকে কিন্তু হরনাথ প্রায়ই বলিয়া থাকে—"দাদা, আপনার জন্যে আমি আছি এবং থাকবো। ভগবান না করুন, যদি কখনো আপনার খুব বেশী অসময় পড়ে, তখন আপনার পাশে থাকবো—শুধু আমি। এটা নিশ্চয় জানবেন যে, বউদির পর, আমিই আপনাকে ভাল-বাসি।" এত বড় কথা রমেশকে কেহ কখনো বলে নাই। কিন্তু সে এ কথাটাও বুঝিতে পারিল না যে, এর চেয়ে অসময় তাহার আর কি হইবে। যাহা হউক, এই নতুন গল্পের বইখানা অন্ত কোথাও দিলে হয়ত দুই-চারি 'শ টাকা এই দুর্দ্দিনে রমেশ পাইতে পারিত, কিন্তু

তাহা না দিয়া, সে তাহার এই প্রীতিভাজন, পরমাত্মীয়বৎ বন্ধুটিকেই দেওয়া স্থির করিল।

প্রায় এক ঘণ্টাকাল নানা কথা ও আলোচনায় কাটাইয়া, হরনাথ যাইবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইতেই, বাহির হইতে তিনজন আগন্তুক ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল ও নমস্কার জানাইয়া কহিল—"রমেশবাবুর সঙ্গে আমরা দেখা করতে চাই। অনেক খুঁজে তবে বাসার সন্ধান কোরে এসেছি।"

হরনাথ রমেশকে দেখাইয়া দিয়া কহিল—"ইনিই রমেশবাবু, বাংলার শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক এবং কবি। আপনারা আসছেন কোথা থেকে?"

"আমরা বর্দ্ধমান থেকে আসছি।"

অপর একজন কহিল—"আমরা একটা ভিক্ষাপ্রার্থী হোয়ে আপনার শরণাগত।"

রমেশ কহিল—"কি বলুন?"

"আসচে রবিবার আমাদের ওখানে একটা সাহিত্য সভা হবে। সেই সভায় আপনাকে আমরা সভাপতি নির্ব্বাচিত করেছি।···আপনি সম্মতি দিয়ে আমাদের··· আপনি বাংলা সাহিত্যের একজন দিকপাল। আপনার মত লোকের কাছে আসতে আমাদের সাহসে কুলোয় না, দুঃসাহসের সঙ্গেই আজ আমরা আপনার দ্বারস্থ হোয়েচি।"

হরনাথ মনে মনে ভাবিল, এঁরাও ত দেখচি, সাহিত্যের এক-একজন কম দিকপাল নয়! সে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল, আবার বসিল। রমেশকে কানে কানে কি বলিয়া ঘরের বাহির হইয়া গেল এবং মিনিট দশ-বারোর মধ্যে, শালপাতার ঠোঙ্গা করিয়া কি আনিয়া, গোপনে রমেশের হাতে দিল; রমেশ তাহা লইয়া ভিতরে চলিয়া গেল।

অতঃপর প্রায় আধঘণ্টা ধরিয়া সকলের মধ্যে অনেক কথা ও আলোচনা হইয়া ইহাই স্থির হইল যে, আগামী রবিবার বেলা একটার মধ্যে বর্দ্ধমান হইতে কেহ আসিয়া রমেশকে লইয়া যাইবে। তাঁহার বিদায় লইবার আগে, রমেশ তাঁহাদের চা ও মিষ্টিমুখ করাইয়া আপ্যায়িত করিল। বলা বাহুল্য যে, হরনাথও তাহার কিছু অংশীদার হইল, এবং ইহাও বলা অ-বাহুল্য নয় যে, আপ্যায়নের পয়সাটা তাকেই পকেট হইতে বাহির করিতে হইয়াছিল।

বর্দ্ধমানের মত একটা বড় জায়গায় এবং বড় সভায় সভাপতিত্ব করিবার গর্ব্বে ও আনন্দে রমেশের বুকখানা নাচিয়া উঠিল। অত্যন্ত উৎসাহিত মনে গণিয়া দেখিল, রবিবারের আর মাত্র তিনটা দিন বাকী আছে। সে আনন্দ কল্পনায় মগ্ন হইয়া পড়িল—'বর্দ্ধমান সহরের মধ্যস্থলে প্রকাণ্ড সভা-মণ্ডপ; অসংখ্য জন-সমাবেশ; সমস্ত সভাস্থল দেবদারুপাতায় ও নানাবিধ পুষ্প-পতাকায় পরিপাটিরূপে সজ্জিত; মনোমুগ্ধকর তোরণ। সুসজ্জিত মঞ্চোপরি সভাপতির গৌরবাসনে সে উপবিষ্ট। সকলের আকাঙ্ক্ষিত প্রসন্ন দৃষ্টি তাহার উপর নিপতিত। তাহার সরল, সুন্দর, জ্ঞানগর্ভ দীর্ঘ বক্তৃতা; চারিদিক হইতে প্রশংসাসূচক করতালি। বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক ও কবিকে দেখিবার জন্য সকলের ভীড় ঠেলাঠেলি··

"রাত দশটা বেজে গেল যে! খাবে কখন?"

রমেশের রঙীন স্বপ্ন সবিতার ডাকে ভাঙ্গিয়া গেল সে ভিতরে যাইবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইল।

তিন

"আমার ক্ষমতার বাইরে, রমেশবাবু। আপনি সাহেবের কাছে গিয়ে একবার বরং চেষ্টা কোরে দেখুন, যদি তাকে নরম করতে পারেন।"

"মনে করুন, যদি আমার কোন অসুখই করতো, তা হোলে ত আর আসতে পারতুম না।"

"সাহেবকে গিয়ে তাই বলুন। ···তবে, যা বুঝচি, সাহেব আপনাকে আর কিছুতেই রাখবে না।"

আফিসের বড়বাবু আর রমেশের মধ্যে কথা হইতেছিল। আজ মঙ্গলবার। রবিবার বর্দ্ধমানের সভা ভাঙ্গিতে রাত দশটা হয়। তাহার পর খাওয়া-দাওয়া সারিয়া শুইতে রাত প্রায় একটা হইয়া যায়। রমেশ ভাবিয়াছিল, সোমবার ফার্ষ্ট ট্রেণে আসিয়া সরাসরি আফিস করিবে। কিন্তু তাহা হয় নাই। সকালের দিকের ট্রেণে সে আসিতে পারে নাই। তিনটার গাড়ীতে উঠিয়া রমেশ

সন্ধ্যার সময় কলিকাতায় আসে। আফিসের সাহেব পূর্ব্ব হইতেই তাহার উপর খাপ্পা হইয়াছিল; সে অবস্থায় এত শীঘ্র আবার তাহার কামাই হওয়াতে, সাহেব তাহাকে বরখাস্ত করিয়া দিয়াছে এবং "ডিস্‌মিস্-অর্ডার" লিখিয়া বড়বাবুকে উহা পাঠাইয়া দিয়াছে।

বড়বাবু 'অর্ডার'খানার দিকে দেখাইয়া কহিলেন—"ওখানা তুলে নিন; একবার সাহেবের কাছে গিয়ে একটু···

"না—যাবো না। চাকরী আর না করাই ভাল।" বলিয়া রমেশ একটা টানা নিঃশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে কাগজখানা টেবিলের ওপর হইতে তুলিয়া লইল এবং মুঠার মধ্যে পাকাইতে পাকাইতে ধীর পদক্ষেপে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

আজ তাহার মনের একদিকটায়, গাঢ় জমাট-বাঁধা অন্ধকার স্তরের পর স্তর চাপিয়া বসিতে লাগিল. অপর দিকটায় তাহার চিরকালের মনের অস্বস্তি ও অসন্তোষ যেন হু হু করিয়া হাল্কা হইতে সুরু করিল। এই দুইয়ের মাঝখানে, হাজার রকমের চিন্তা তাহার মনের দুয়ারে আসিয়া ঘা দিতে লাগিল। সেই সব ভাবনা ভাবিতে ভাবিতে, সন্ধ্যার পর সে যখন বাসায় ফিরিয়া আসিল, তখন দেখিল—সবিতা ভাতের হাড়ী নামাইয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিয়াছে। উনানের আঁচ শুধু শুধুই নষ্ট হইয়া যাইতেছে। সামনে তরকারীর থালি চ্যাঙারিটা দেখিয় তাহার মনে পড়িয়া গেল যে, অফিসের ফেরত তাহার বাজার করিয়া আনিবার কথা ছিল। কিন্তু সে কথা তাহার একেবারেই মনে ছিল না; সাহেবের ডিস্‌মিস্ অর্ডারের এক টুকরা কাগজ তাহাকে সব কথাই ভুলাইয়া দিয়াছিল।

বাজারের থলিটা হাতে লইয়া সে তখনই আবার বাহির হইয়া গেল

চার

রমেশের চাকুরী যাইবার পর, পৃথিবী সূর্য্যকে পুরা এক পাক ঘুরিয়া আসিয়াছে। সে তখন ভাবিয়াছিল, চাকুরী গিয়া তাহার পক্ষে ভালই হইয়াছে। এখন হইতে সে প্রচুর সময় পাইবে এবং পূর্ব্বের চেয়ে বেশী লিখিতে পারিবে। কিন্তু ফলে হইয়াছিল বিপরীত। সারা সকালটা এখানে-ওখানে গিয়া গল্পগুজব করিতেই কাটিয়া যায়; তারপর দুপুরে ভাত খাওয়ার পর বেশ একটু আলস্য আসে, সুতরাং শুইয়া পড়ে। বেশ একটা ঘুম দিয়া বৈকালে যখন সে ওঠে, তখন শরীরটা ম্যাজ-ম্যাজ করে, কোন-কিছু লিখবার মত মন তখন তাহার থাকে না। তারপর সন্ধ্যা হইলে আবশ্যক বা অনাবশ্যক কাজে একবার তাহাকে বাহির হইতে হয়। যেদিন ঘরে থাকে, সেদিন কাগজ কলম লইয়া বসে এবং সেগুলি সামনে রাখিয়া নিবিষ্টচিত্তে চিন্তা করিতে থাকে। কিন্তু এ চিন্তা গল্পের প্লটের জন্য চিন্তা নয় বা চরিত্র চিত্রাঙ্কনের চিন্তা নয়, কিংবা কবিতার ছন্দ বা মিলের জন্যও চিন্তা নয়; এ চিন্তা—টাকার, ভাতের, কাপড়ের, স্ত্রীর অসুখের ডাক্তার ঔষধ পথ্যের, নবজাত শিশুটির দুগ্ধের এবং ইত্যাদি অনেক কিছুর চিন্তা।

মাস ছয় হইল রমেশের একটি পুত্রসন্তান হইয়াছে। প্রসবের পর হইতে সবিতা অসুস্থ। যেরূপ পথ্য ও পরিচর্য্যা প্রসবের পর সাধারণতঃ আবশ্যক হয়, অর্থাভাবে তাহার কিছুই হয় নাই। সে জন্য রোগ রুগীকে বেশ ভাল ভাবেই পাইয়া বসিয়াছে। সবিতা দিন-দিনই নীরবে একটির পর একটি করিয়া পৃথিবীর বন্ধন কাটিয়া চলিয়াছে। রমেশও ইহা বুঝিতে পারে, কিন্তু বুঝিয়া কোন ফল নাই। প্রতিকার করিবার সামর্থ্য তাহার নাই। সে কখনো ভগবানকে ডাকে নাই; আজকাল সে তাহার কাতর নিবেদন ঐকান্তিক মনে ভগবানকে জানায়। এ ছাড়া তাহার আর উপায় নাই।

একদিন সে হরনাথকে একখানা চিঠি লিখিয়া ডাকে দিল। সে মনে জানে, এই অসময়ে হরনাথই তাহার একমাত্র বন্ধু; হরনাথ তাহার এই দুরবস্থার কথা জানিতে পারিলে সে নিশ্চয়ই তাহার সাহায্যের হাত বাড়াইয়া ছুটিয়া আসিবে। একদিন সে তাহাকে যে কথা বলিয়াছিল, তাহার চেয়ে বড় কথা আজ পর্য্যন্ত কেহ তাহাকে বলে নাই। সে যে বলিয়াছিল—'দাদা, বউদির পরে আমিই আপনাকে ভালবাসি ও শ্রদ্ধা করি'—এরকম কথা

রমেশ আর কাহারো মুখ হইতে শুনে নাই। সবিতা প্রায়ই বলে—'তুমি হরনাথকে সব অবস্থা খুলে জানাও, চুপ করে থাকলে ত কেউ কিছু বুঝতে পারবে না।' এই সমস্ত কথা ভাবিয়া রমেশ হরনাথকে তাহার দুরবস্থার কথা জানাইয়া লিখিল—'আমি অর্থাভাবে চরম দুর্দ্দশায় পতিত, এমন কি কোন কোন দিন দুবেলা আহার জোটে না। তোমার বৌদি প্রসবের পর থেকেই অসুস্থ এবং শয্যাগত। বিনা চিকিৎসায় সে মরিতে বসিয়াছে। এ সব কথা ত বাইরে অন্য কাকেও বলা চলে না। তুমি অতি সত্বর আমায় কিছু সাহায্য করিবে। অন্ততঃপক্ষে এ সময় তুমি তোমার সাধ্যমত কিছু আমায় ঋণস্বরূপ দিলেও হয়ত তোমার বৌদিকে সারাইয়া তুলিতে পারিব। পরে ভগবান দয়া করিলে তোমার ঋণ আমি পরিশোধ করিব।'

রমেশ প্রত্যহই হরনাথের আশায় থাকে; কিন্তু হরনাথ আসিল না। দিন আষ্টেক পরে হরনাথের বদলে হরনাথের একখানা চিঠি আসিল। চিঠিতে লিখিয়াছে—'আপনার অবস্থার কথা জানিয়া মর্ম্মাহত হইলাম। আমি দু একদিনের মধ্যেই আপনার সহিত দেখা করিব।'

কিন্তু পনের দিন কাটিয়া গেল, তবুও হরনাথ আসিল না। রমেশ পুনরায় তাহাকে চিঠি দিল। এবার চিঠির আর জবাবই আসিল না। রমেশ দুঃখের সহিত বিস্মিত হইল। হরনাথের উপর তাহার কথার উপর রমেশের খুবই আশা ও নির্ভরতা ছিল; কিন্তু…কিন্তু… রমেশ আকাশ পাতাল অনেক কিছুই ভাবিতে লাগিল। কিন্তু কোন নিষ্পত্তিতে সে আসিতে পারিল না। তাহার মাথার ভিতরটায় কেমন যেন সব গোলমাল হইয়া গেল। তাহার চিরকালের সুন্দর পৃথিবীটা যেন কুৎসিৎ এবং কঠিন আকারে তাহার চোখের সামনে আসিয়া তাহাকে মুখ ভ্যাংচাইয়া ব্যঙ্গ করিতে লাগিল।

পাঁচ

"আজ তুমি কেমন আছ, সোবু?"

"ভাল আছি; আমার জন্যে ভাববার কোন দরকার নেই।"

"পেটের ব্যথাটা?"

ম্লান হাসিয়া সবিতা কহিল—"ওর সঙ্গে আমার ভালবাসার বাঁধনটা ত দিন দিন শক্ত হচ্ছে। ওকে নিয়েই ত আমি যাব।"

রমেশের মুখ হইতে আর কোন কথা বাহির হইল না। সবিতা কহিল—"তুমি আজ একবার সত্যবাবুর কাছে যাও। হরনাথের আশা আর কোরো না। চিরকাল সত্যবাবুর কাগজে তুমি লিখে আসচ; তাঁকে আমাদের দুরবস্থার কথা জানালে, আমার বিশ্বাস—তিনি যা-হোক একটা ব্যবস্থা করবেনই। দু'একশো টাকা ধার, আমার মনে হয় তিনি ঠিকই দেবেন।"

"তাই যাবো আজ।" রমেশের বিমর্ষ চিত্ত চিন্তা-সাগরে ভাসিতে ভাসিতে যেন কূল খুঁজিতে লাগিল।

সবিতা কহিল—"আমার জন্যে তুমি কিছু ভেবো না; আমি শীগ্‌গীরই সেরে উঠবো। আজ তুমি সব কাজ ফেলে একবার সত্যবাবুর কাছে যাও।"

রমেশের বলিবার আর কিছুই ছিল না; একটা বিড়ি ধরাইয়া সে টানিতে লাগিল। এই সময়ে বাহিরের দরজার কড়া নড়িয়া উঠিল। রমেশ আসিয়া দরজা খুলিতেই একটি অপরিচিত লোক ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া কহিল—"হরনাথবাবু আমায় পাঠিয়ে দিলেন। তাঁর স্ত্রীর বড্ড অসুখ, সেই জন্যে তিনি আসতে পাচ্ছেন না; একটু সারলেই আপনার সঙ্গে এসে দেখা করবেন।"

রমেশের কিছু বলিবার নাই বুঝিতে পারিয়া, লোকটি চলিয়া গেল। রমেশ সারাদিন ধরিয়া হাজার রকমের চিন্তা করিবার পর, অপরাহ্নের দিকে সত্যবাবুর কাছে যাইবার জন্য বাহির হইয়া পড়িল। সত্যবাবুর কাছে কি করিয়া, কোন্ সূত্রে সে তাহার প্রসঙ্গটা উত্থাপন করিবে, বাস্'য়ে বসিয়া সারা পথটা সে সেই চিন্তাই করিতে লাগিল:—'সংসারের হীনাবস্থার কথা সত্য-বাবুকে কখনো বলিনি; এখন না বোলে আর উপায় নেই। আমার লেখার শতকরা নিরানব্বই ভাগ অংশ ওর কাগজেই লিখেছি। ওঁর যদি মানুষের প্রাণ থাকে, এ সময় আমাকে দেখা ওঁর একটা প্রধান কর্ত্তব্য কিন্তু …বড়ই ব্যবসাদার লোক। আমার যদি কোন উপায়

থাকতো, তাহোলে ওঁর কাছে আমার সংসারের গোপনীয় অবস্থার কথা গোপনেই রাখতুম। ভগবান লেখার শক্তি দিলেন—যত বড়, ঠিক তত বড়ই দিলেন—দারিদ্র্য। এ রহস্য কিছুই বোঝা যায় না।...মুখ ফুটে হীনতা প্রকাশ করতে কিরকমটা যেন হয় সোবুর অসুখটাতেই আমাকে—

'বাস'য়ের কন্‌ডক্টর কিড়িং করিয়া ঘণ্টা দিয়াই হাঁকিয়া উঠিল—"জেনানা হ্যায়, একদম ঠাহ্রিয়ে।"

"মশাই, বিঁড়ির আগুনটা একটু সাবধান।"

—সোবুর অসুখটাতেই আমাকে ভাবিয়ে তুলেছে অন্ততঃ শ'খানেক টাকা যদি সত্যবাবুর কাছ থেকে পাই, তাহোলে ভালো কোরে একবার চিকিৎসাটা—নাঃ, লজ্জা করলে চলবে না, যেমন কোরেই হোক মুখ ফুটে আজ টাকার কথাটা বলতেই হবে, নইলে—।' এই সময়ে তাহার বিধাতাপুরুষ তাহাকে লক্ষ্য করিয়া একটু হাসিলেন।

মিনিট পাঁচেক পরে, বাস্‌খানা চৌরাস্তার মোড়ে আসিয়া থামিলেই রমেশ নামিয়া পড়িল ও 'বাণী' পত্রিকার অফিসের দিকে অগ্রসর হইল।

সত্যবাবুকে রমেশ যাহা বলিবে এবং যে-পথে বলিবে, কোন্ কথাটা আগে ও কোন্ কথাটা পরে—সমস্তই মনের মধ্যে রমেশ সাজাইয়া গুছাইয়া রাখিয়াছিল। একদিকে শ্রেষ্ঠ লেখক হিসাবে তাহার মান-মর্য্যাদা, অপরদিকে তাহার নিদারুণ দৈন্য, এ দুইয়ের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া কি ভাবে তাহাকে কথা কহিতে হইবে, সে সম্বন্ধে রমেশ খুব সচেতন হইয়াই রহিয়াছিল।

সত্যবাবু তাঁহার সুসজ্জিত কক্ষে একাকী বসিয়াছিলেন। রমেশ ঘরে ঢুকিতেই, অত্যন্ত আনন্দ ও উৎসাহের সঙ্গে সত্যবাবু তাহার দিকে চাহিয়া কহিলেন —"আপনি ভাগ্যবান লেখক রমেশবাবু।"

রমেশ তাহার বক্তব্য আর একবার মনে মনে 'রিহার্সাল' দিয়া লইয়া, মৃদু-মধুর হাসির সহিত কহিল—"আপনাদেরই দয়া সেটা।"

"সত্যিই আপনি ভাগ্যবান। আপনাকে এক বিরাট অভিনন্দন দেবার প্রস্তাব হোচ্ছে-কোলকাতার অধিবাসীদের তরফ থেকে। আমি আজই জানতে পারলুম, ভেতরকার একজন বড় মাতব্বরের কাছ থেকে। অবশ্য, শীগ্‌গীরই তাঁরা আপনার কাছে যাবেন। সুখবর সর্ব্বপ্রথম দোবার লোভটা আমি সামলাতে পারলুম না।"

রমেশের সব ওলোট-পালোট হইয়া গেল। গর্ব্ব, আনন্দ, উৎসাহ, হতাশা, আতঙ্ক, দুশ্চিন্তা, সব এক সঙ্গে তাহার মাথার মধ্যে জট পাকাইয়া উঠিল। বিভ্রান্তের মত সে কোনও মতে সামনের চেয়ারখানা টানিয়া থপ্ করিয়া বসিয়া পড়িল। যাহা সে বলিবার জন্য গিয়াছিল, সে কথা আর তাহার বলা হইল না। সারা কলিকাতার অধিবাসীরা মিলিয়া তাহাকে অভিনন্দিত করিবে! সত্যই ত সে ভাগ্যবান! তাহার হৃদয় নাচিয়া উঠিল; তাহার সমস্ত দুঃখ, দৈন্য, দুশ্চিন্তা সেই আনন্দ-নৃত্যের তালে ডুবিয়া গেল। সত্যবাবুর সমাদরে প্রদত্ত জলখাবার, চা, পান, সিগারেট ইত্যাদি উপভোগ করিয়া রমেশ উৎফুল্ল অন্তরে বাসায় ফিরিয়া আসিল।

বিধাতাপুরুষ তাঁহার আগেকার হাসির সূত্র ধরিয়া এই সময় আর একবার হাসিলেন।

ছয়

"কেন তুমি অত ভাবচো, আমি সেরে উঠব।"

"ভগবানের কাছে আমি কত বড় অপরাধে অপরাধী হোয়ে থাকলুম, আমি তোমার উচিত মত চিকিৎসা করাতে পারলুম না, সোবু!

"আমি মরবো না গো, মরবো না! দেখো, আমি যা বলচি ঠিক তাই হবে; আমার খোকন-সোনাকে ফেলে রেখে আমি কি মরতে পারি কখন! না খোকন মণি?" —সবিতা একটু কাত্ হইয়া খোকার তুল-তুলে গালের উপর তাহার নিরক্ত ঠোঁট রাখিয়া চুমা খাইল। রমেশ কহিল—"রাত্রে তোমার শরীরটা হঠাৎ ও রকম হোল কেন? আমার বড্ড ভয় হচ্চে সোবু, তুমি কি আমায় ফেলে রেখে পালিয়ে যাবে?"

"ওগো, না—না! সমস্ত কোলকাতার লোক মিলে ক'দিন পরে তোমায় অভিনন্দন দেবে, হাজার টাকার তোড়া তোমায় তাঁরা উপহার দেবে। আমার চিরকালের

দুঃখ্ এইবার ঘুচবে ; এ সময় কি আমি মরতে পারি— ?”

একটানা এতগুলা কথা বলিয়াই সবিতা খুব ক্লান্ত হইয়া পড়িল। ইহা দেখিয়া পাছে রমেশ ভাবিত হয়, সেজন্ত খুব ধীরে ধীরে কহিল—“বড্ড ঘুম পাচ্ছে।”—বলিয়া তাহার নিষ্প্রভ চক্ষু দুটি মুদ্রিত করিয়া, এই ক্লান্তিটুকু দূর করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

কাল রাত্রে সবিতার অবস্থা হঠাৎ খুব খারাপ হইয়া পড়ে। আজ সারা সকালটা রমেশ তাহার কাছ-ছাড়া হইতে পারে নাই। গতমাসে রমেশ তাহার বিয়ের আংটিটা বিক্রী করিয়া সবিতার ওষুধের দাম দিবার সঙ্গে, খুব আশা করিয়া খোকার নামে একখানা ‘রেস্নাসে’র টিকিট’ কিনিয়াছিল। আজ কালই ড্রয়িংয়ের ফলাফল বাহির হইবার কথা। রমেশ কয়দিনই দুইবেলা গিয়া খবর জানিয়া আসে; আজ আর যাইতে পারে নাই। কাশীর মা তোলা-ঝিয়ের কাজ করে। সে আসিলে, তাহাকে সবিতার কাছে রাখিয়া সে একবার খবর জানিয়া আসিবে। যদি একটা প্রাইজ সে পায়, তবে তাহার জীবনের ধারা নতুন পথে প্রবাহিত হয়। তার উপর, অভিনন্দনের সঙ্গে হাজার টাকার তোড়া পাওয়া যাইবে! এতদিনের পর ভগবান মুখ তুলিয়া যদি বা চাইলেন, কিন্তু···কিন্তু···। রমেশ আর ভাবিতে পারে না। ভাবনার চাপে তাহার সমস্ত আশা উৎসাহ ছিন্নভিন্ন হইয়া তাহার চারিপাশের অন্ধকারকে গাঢ় হইতে গাঢ়তর করিয়া তুলিতে লাগিল। সকাল হইতে সে চা খাহিতে পায় নাই। এখন একবার উঠিয়া চা খাইবার যোগাড় করিতে গেল। অনেক কষ্টে কাগজ জ্বালাইয়া জল গরম করিল। তারপর কোন রকমে এক কাপ চা তৈরী করিয়া খাইয়া, আবার সবিতার শয্যার পার্শ্বে আসিয়া বসিল। সবিতা এতক্ষণে অনেকটা সুস্থ হইয়াছিল; কহিল—“চা তৈরী কোরে খেলে? বড্ড তোমার কষ্ট হচ্চে! আমি হতভাগী এমন পড়লুম যে আর ······হ্যাঁ গা, লটারীর কি হোল, আজ আর জানতে গেলে না ?’

“কাশীর মা এলেই, তাকে তোমার কাছে বসিয়ে আমি যাব।”

“যাও—যাও; দেখো—এবার ঠিক উঠবে। হ্যাঁ গা তোমার অভিনন্দন কবে হবে?”

“আসচে রোববার। মাঝে আর চারটে দিন। কথা কইতে তুমি হাঁপিয়ে যাচ্চ,—সোবু; বেশী কথা তুমি কয়ো না। একটু ঘুমোবার চেষ্টা কর।”

এই সময় কাশীর মা আসিয়া পড়ায়, রমেশ তাহাকে সবিতার কাছে বসিতে বলিয়া, রেস্নাসে’র খবর জানিতে বাহির হইয়া গেল।

সাত

রবিবার।

রমেশের অভিনন্দনের দিন আজ।

বাংলার সমস্ত দৈনিক পত্রে আজ বড় বড় অক্ষরযুক্ত ‘হেডিং’য়ে বাহির হইয়াছে—‘বাংলার লোকপ্রিয় সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত রমেশ রায়কে কলিকাতাবাসীর সাদর ও সশ্রদ্ধ অভিনন্দন।’

‘সুভাষ ইনষ্টিটিউটে’র বিস্তৃত হল নানাবিধ পত্র-পুষ্প-পতাকায় সুন্দরভাবে সজ্জিত করা হইয়াছে। কর্ম্মকর্ত্তাগণের কর্ম্ম-চঞ্চল চলা-ফেরা ও পরিদর্শন কোলাহলে সমস্ত স্থানটা মুখরিত। সকাল হইতেই পল্লীতে পল্লীতে এই বিষয়েই আজ আলোচনা চলিতেছে। সাহিত্যিক অ-সাহিত্যিক, সাহিত্য রসিক, সাহিত্যিক নামে পরিচিত সাহিত্য-ব্যবসায়ী, কবি, নাট্যকার, প্রকাশক প্রভৃতি সকলেরই মুখে আজিকার এই অভিনন্দন-উৎসবের কথা আলোচিত হইতেছে।

পূর্ব্ব হইতেই স্থির হইয়া আছে যে ঠিক বেলা পাঁচটায় সভার কার্য্য আরম্ভ হইবে এবং ঠিক বেলা তিনটায় রমেশকে লইয়া যাইবার জন্ত ট্যাক্সি লইয়া কর্ম্মকর্ত্তাদের দুই একজন তাহার বাসায় আসিয়া তাহাকে লইয়া যাইবেন।

রমেশের ছোট ক্লক-ঘড়িটায় ঠং করিয়া আড়াইটার ঘণ্টা বাজিতে, কাশীর মা ঝি সদর দরজা খুলিয়া বাহিরের দিকে একবার দেখিয়া গেল। ইহারই মিনিট বিশ-পঁচিশ পরে, হর্ণ দিতে দিতে একখানা ট্যাক্সি রমেশের বাসার সামনে আসিয়া দাঁড়াইল ও সঙ্গে সঙ্গে দরজার কড়া নাড়ার শব্দ হইতে লাগিল।

খিল খুলিয়া কাশীর মা আসিয়া দাড়াইতেই, একজন যুবক ব্যস্ততার সহিত জিজ্ঞাসা করিল—"রমেশবাবু?"

"তিনি নেই।"

"বাসায় নেই? কোথায়?"

"শ্মশানে।"

আগন্তুকদ্বয় হতভম্বের মত হইয়া গেলেন। কাশীর মা কহিল—"ভোরবেলায় তেনার 'ইস্তিরী' মারা গেছে; তাই...

"তাঁর স্ত্রী মারা গেছেন! ভোর বেলায়?"

আর কোন কথা কাহারো মুখ হইতে বাহির হইল না; নিস্পন্দের মত সকলে দাঁড়াইয়া রহিল।

যাহাকে লইতে আসিয়াছিল, তাহাকে না লইয়াই তাহাদের ফিরিতে হইল। শূন্য ট্যাক্সি শূন্যতা লইয়াই চলিয়া গেল। বসন্তে বর্ষা দেখা দিল। মালার সুতা ছিঁড়িয়া গেল। পূর্ণিমাকে অমাবস্যা আসিয়া গ্রাস করিল। যে জনস্রোত 'সুভাষ ইনস্টিটিউটে' আসিতেছিল, মোড় ঘুরিয়া সেই স্রোত কেওড়াতলা'র দিকে প্রবাহিত হইল।

কেওড়াতলার শ্মশানে কাতারে কাতারে লোক আসিয়া জমিতে লাগিল। 'বাংলার জনপ্রিয় সাহিত্যিকের অভিনন্দন' আজ হইল ঠিকই, তবে অভিনন্দন-স্থানের কিছু বদল ঘটিল। সুভাষ ইনষ্টিটিউটের বদলে তাহা হইল—কেওড়াতলার শ্মশানঘাটে।

সকলে দেখিল, অদূরের একটি বৃক্ষতলে রমেশ নিস্পন্দ দেহে, স্থির দৃষ্টিতে চিতার দিকে চাহিয়া বসিয়া আছে; তাহার সেই প্রশান্ত স্থির দৃষ্টি, চিতার শেষ অগ্নিধূমের সহিত মিলিয়া উর্দ্ধে স্বর্গের পথে গমন করিতেছে।

●

আমি নিশ্চয় জানি, স্বাধীনতার জন্মগত অধিকার যদি কারও থাকে তো সে মনুষ্যত্বের, মানুষের নয়। অন্ধকারের মাঝে আলোকের জন্মগত অধিকার আছে দীপশিখার, দীপের না, নিবানো প্রদীপের এই দাবী তুলে হাঙ্গামা করতে যাওয়া শুধু অনর্থক নয়, অপরাধ।

—শরৎচন্দ্র

আঁদ্রে জিদ্

শ্রীপ্রভাতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

বার্ণার্ড শ', সিনক্লেয়ার লুইস ও বাঙলা দেশের বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় অতি অল্প দিনের ব্যবধানে লোকান্তরিত হওয়ায় সাহিত্য জগতের বেশ কিছু ক্ষতি হয়ে গেল এবং সাহিত্যরস-পিপাসু জনগণ ব্যথাহত অন্তরে এ সংবাদ গ্রহণ করলো। এ আঘাতের ক্ষত আরাম হ'তে না হ'তেই ২১শে ফেব্রুয়ারীর সংবাদপত্রে খ্যাতনামা ফরাসী সাহিত্যিক আঁদ্রে জিদের মৃত্যু-সংবাদ তাদের বিহ্বল ক'রে দিল।

১৮৭০ থেকে ১৯৪০ সাল পর্য্যন্ত, অর্থাৎ আঁদ্রে জিদের প্রায় সমগ্র জীবনকাল, ফরাসী সাহিত্যের স্বর্ণযুগ বলা চলে। এ সময়কার ফরাসী সাহিত্য বিশ্ব সাহিত্যের ওপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার ক'রেছিল। ভিক্টর হুগো, বালজাকের মত প্রতিভা জন্মগ্রহণ করে নি বটে, কিন্তু এ সময় ফরাসী জাতির সমগ্র সত্তা যেন শিল্প ও সাহিত্য-চিন্তার মধ্যে ডুবে ছিল এবং এরকম বিচিত্র ও বিপুল সৃষ্টিও আর কোন সময় সম্ভব হয় নি। এমিল জোলা, আনাতোল ফ্রাঁস, রোমাঁ রোলাঁ, জুলে রোমাঁ, আঁদ্রে জিদ্, প্রুস্ত্, পল ভ্যালেরী এ যুগের ফরাসী সাহিত্যাকাশের এক একটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক।

আঁদ্রে জিদ্ গত ২০শে ফেব্রুয়ারী ৮২ বছর বয়সে প্যারিসে তাঁর বাসভবনে পরলোকগমন করেন। জিদ্ ফরাসী গদ্য সাহিত্যের একজন দিকপাল। ১৯৪৭ সালে তিনি নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন, এইটাই বড় কথা নয়, বস্তুতঃ তাঁকে পুরস্কার দিয়ে সুইডিস একাডেমী একজন যোগ্য ব্যক্তিকেই সম্মানিত ক'রেছেন। তাঁর স্বচ্ছ ও সুদৃঢ় প্রকাশভঙ্গী, ঋজু ও বলিষ্ঠ চিন্তাধারা, সূক্ষ্ম ও যুক্তিপূর্ণ বিশ্লেষণ পদ্ধতি এবং প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। সামাজিক ও নৈতিক অনুশাসনের বিরুদ্ধে তিনি বিদ্রোহ ক'রেছিলেন—যেমন ক'রেছিলেন বার্ণার্ড শ' আর আমাদের শরৎচন্দ্র। তাই শ' আর শরৎচন্দ্রের মত তাঁকে নিয়েও সাহিত্য জগতে সোরগোল কম হয় নি।

১৮৬৯ সালের ২২শে নভেম্বর জিদ্ প্যারিসে জন্মগ্রহণ করেন। যে পরিবারে তাঁর জন্ম, দু'টি বিপরীত ধর্ম্মমতের মিলনক্ষেত্র সেটি। তাঁর পিতার পূর্ব্বপুরুষেরা দক্ষিণ-ফ্রান্সের প্রোটেষ্ট্যাণ্ট, কিন্তু মাতার পূর্ব্বপুরুষেরা ক্যাথলিক। তবে জিদের মাতা ও মাতামহী উভয়েই প্রোটেষ্ট্যাণ্ট ছিলেন। গোঁড়া প্রোটেষ্ট্যাণ্ট ধর্মমতের মধ্যে মানুষ হয়েও জিদ্ তাই ক্যাথলিক প্রভাবকেও অনেক সময় অস্বীকার করতে পারেন নি।

জিদের বয়স যখন মাত্র ১১, তাঁর পিতা পৃথিবী থেকে চিরবিদায় নিলেন। কাজেই পিতার ব্যক্তিগত চরিত্রের প্রভাব জিদের ওপর খুব বেশী পড়া সম্ভব হয় নি। তবে তিনি আইনের অধ্যাপকের উপযুক্ত একটি গ্রন্থাগার রেখে গিয়েছিলেন পুত্রের জন্য। পিতার কাছ থেকে সরাসরি শিক্ষা লাভের সৌভাগ্য জিদের হয়নি, কিন্তু তাঁর রেখে যাওয়া গ্রন্থাগার উত্তরকালে জিদের পিতার অভাব মিটিয়েছিল। শিক্ষাক্ষেত্রে আর একজন তাঁর পিতার অভাব পূরণ করেছিলেন; ইনি তাঁর কাকা খ্যাতনামা অর্থনীতিবিদ চার্লস জিদ্। কাকীমা ক্লেয়ারও বড় কম যেতেন না। সারা শৈশবটাই জিদকে মা আর কাকীমার চোখে চোখে থাকতে হয়েছে।

শৈশবকালে জিদের উপর মায়ের ছিল কড়া শাসন। পুত্রের লেখাপড়া, চলাফেরা, কথাবার্ত্তা, পোষাক-পরিচ্ছদ সব কিছুর ওপরই তাঁর বিশেষ নজর ছিল—পুত্রকে ধার্মিক ক'রে তোলার দিকে তাঁর লক্ষ্য ছিল। কোন স্বাধীনতাই ছিল না জিদের, নিজের ইচ্ছা ব'লে কোন বস্তুই ছিল না তাঁর, মায়ের ইচ্ছায় দাসত্বই তাঁকে ক'রতে হয়েছে। সকল কাজে মায়ের এই গণ্ডিবাঁধা শাসন জিদ কিন্তু পছন্দ করতেন না, তিনি হাঁপিয়ে উঠতেন। জিদ নিজেই বলেছেন, 'মায়ের ভালবাসার পদ্ধতিটা আমার মনে তাঁর প্রতি একটা বিরূপতা জাগিয়ে তুলতো।' মায়ের এই শাসন কিন্তু জিদের জীবনে অন্যদিক দিয়ে ফলপ্রসূ হ'ল। মায়ের মৃত্যুর পর মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো তাঁর

স্বাভাবিক প্রবৃত্তি, মায়ের শাসনে যা সুপ্ত ছিল এতদিন। কিন্তু শাসনের ফলে জাগ্রত ধর্মবুদ্ধিকেও তিনি একেবারে অস্বীকার করতে পারেন নি। একদিকে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি, অন্যদিকে ধর্মবুদ্ধি, এ দু'য়ের দ্বন্দ্ব সমানে চলেছে জিদের জীবনে এবং এর সূত্রপাত হয়েছে এই শৈশবেই।

প্রথম যৌবনে তিনি এক চিত্রকর বন্ধু Paul Laurens-এর সঙ্গে বেরিয়ে পড়েছিলেন আলজিরিয়া ভ্রমণে। এখানেই তিনি মুক্তির আনন্দ সর্বপ্রথম অনুভব করলেন, পৃথিবী তাঁর কাছে নতুন রূপে দেখা দিল, পৃথিবীর রূপ-রস-শব্দ-গন্ধে তিনি বিমুগ্ধ হ'লেন।

এ সময়ে আর একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। যক্ষ্মায় আক্রান্ত হওয়ার মত লক্ষণ দেখা দেয় জিদের। তিনি রীতিমত শঙ্কিত হয়ে ওঠেন। কিন্তু যখন জানতে পারলেন তাঁর যক্ষ্মা হয় নি, তিনি আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠলেন, লিখলেন, 'আমি অনুভব করলাম আজ আমি প্রথম জীবন পেলাম। মৃত্যুর ছায়াঘন অন্ধকারের মধ্যে জন্ম নিয়ে আমি আজ প্রকৃত জীবনের দিকে এগিয়ে চলেছি—আজ আমি নূতন অস্তিত্ব অনুভব করছি।'

নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ হ'ল। নতুন যাত্রা সুরু হ'ল, জিদ্ মনোহারিণী বিশ্বের অন্তরতম লোকে প্রবেশ করলেন। কিন্তু আমরা আগেই বলেছি যে, তিনি কোনদিন ধর্মভাব কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। তাই ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যেতে গিয়েও বার বার পিছন পানে তাকিয়েছেন। মায়ের মৃত্যুর পর যৌবনে ধর্মের বন্ধন কাটিয়ে জীবনটাকেই সম্ভোগ ক'রতে বেরিয়েছিলেন, কিন্তু ধর্মবুদ্ধি আবার তাঁকে পিছন দিকে টেনে নিয়ে গিয়েছে। এই দুই বিরোধী শক্তির দ্বন্দ্বই অবিরাম চলেছে জিদের জীবনে, জিদের সাহিত্যে।

শ'য়ের মত প্রখর ব্যক্তিত্বের অধিকারী না হ'লেও কয়েকটি বিষয়ে মনীষী বার্ণার্ড শ'র সঙ্গে জিদের সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। সমসাময়িক কালে জন্ম গ্রহণ ক'রে উভয়েই প্রায় শতাব্দীকাল ব্যাপী সৃষ্টির মধ্য দিয়ে সাহিত্যকে সম্পদশালী ক'রে গেছেন। এ গেল বাইরের দিক। চরিত্রের দিক থেকেও উভয়ের মধ্যে মিল ছিল। শ'য়ের মত জিদের কাছেও স্থূল জীবন ছিল অসহনীয়। শ' যেমন সঙ্গীতে পারদর্শী ছিলেন, জিদও তেমনি পিয়ানো বাজনায় ব্যুৎপত্তি লাভ ক'রেছিলেন। বস্তুতঃ সাহিত্যের মত সঙ্গীতও ছিল তাঁর প্রাণ। তিনি বলেছেন, প্রথম জীবনে যদি তাঁকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হত, তা'হলে তিনি পিয়ানো শিক্ষকের কাজ নিতেন। নিজের সঙ্গীত শিক্ষকের প্রতি ছিল তাঁর অসীম শ্রদ্ধা।

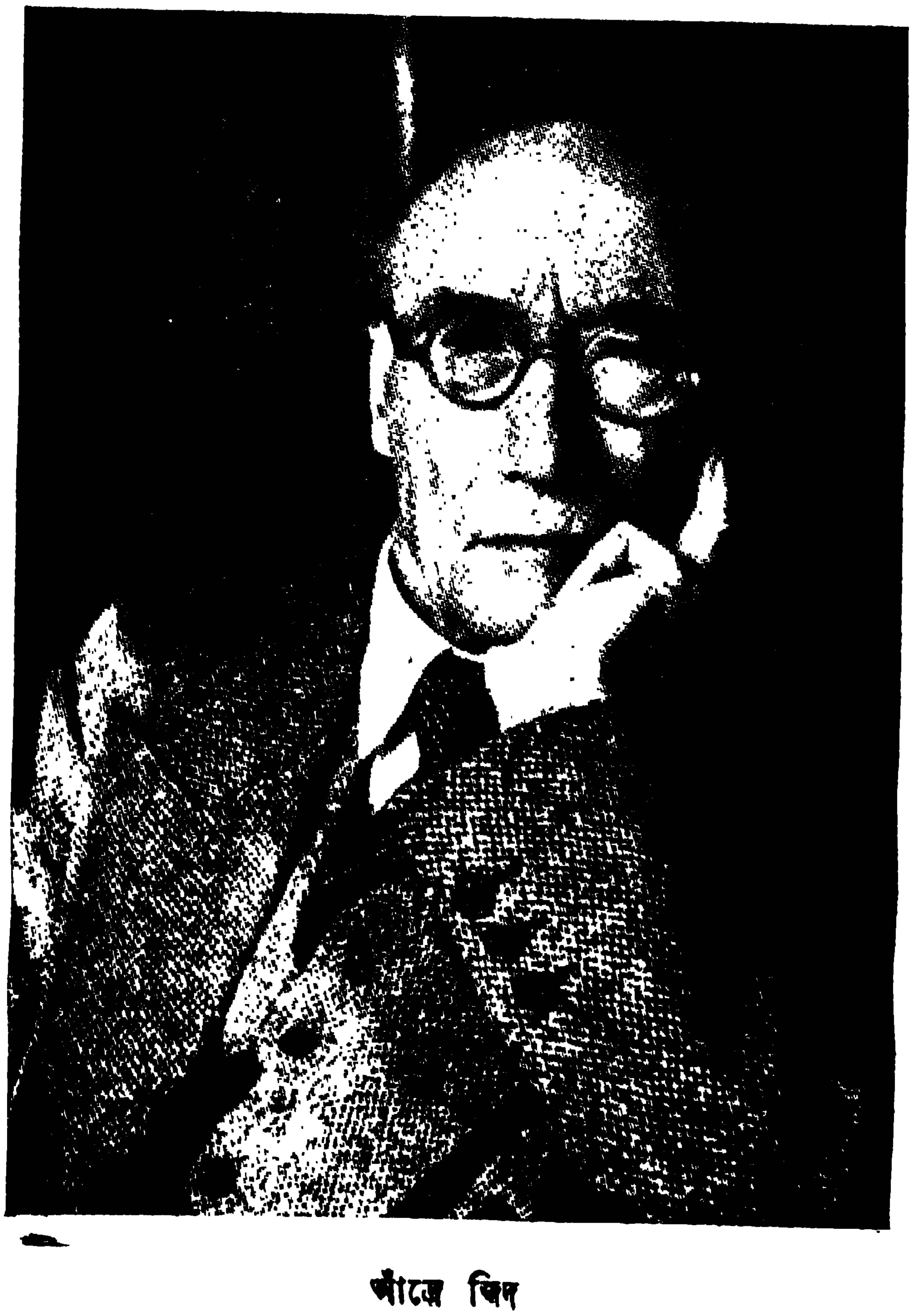

আঁদ্রে জিদ

জীবনে দু'টি নারীর সংস্পর্শে এসেছিলেন জিদ—এ্যানা ভাক্লুটন আর এমানুয়েল। ফটল্যাণ্ডের এ্যানা ভাক্লুটন জিদের মায়ের সঙ্গে বহুদিন কাটিয়েছে। জিদের পরিবারের সঙ্গে তার সম্পর্ক হয়ে দাঁড়িয়েছিল ঘনিষ্ঠ। এ্যানা একদিকে যেমন অন্যান্য ভাষা থেকে ফরাসীতে অনুবাদ করতো আর ছবি আঁকতো. অন্যদিকে তেমনি আবার উদ্ভিদবিদ্যার চর্চা করতো। শিল্পকলা ও বিজ্ঞানের সমন্বয় হয়েছিল তার মধ্যে।

এমানুয়েলের প্রকৃতি সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের। ঈশ্বরের দিকে তার মতি ছিল। একজন জিদকে নিয়ে যেতে চেয়েছে শিল্পকলা ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে, অপরজন তাঁকে আকর্ষণ করেছে ঈশ্বরের দিকে। একজন ধর্ম্ম ও অতীতের প্রতি আসক্তির প্রতীক, অন্যজন বিজ্ঞান ও ভবিষ্যতের আশার প্রতীক। ১৮৯৫ সালে জিদ এমানুয়েলের সঙ্গে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হ'ন। জিদের মায়ের ইচ্ছাও ছিল তাই। কারণ তাঁর সঙ্গে এমানুয়েলের প্রকৃতিগত মিল ছিল। মায়ের ইচ্ছা জয়ী হ'ল বটে, কিন্তু জিদের সাহিত্যে এ্যানার মৃত্যু হয়নি কোন দিন।

১৯০১ সালের ২৫শে অক্টোবর 'The Immoralist' লেখা শেষ হয় এবং ১৯০২ সালে প্রকাশিত হয়।

The Immoralist উপন্যাসটিতে জিদ দেখিয়েছেন সামাজিক ও নৈতিক অনুশাসনের লৌহ বেড়াজাল মানুষের জীবনের বিকাশের পথে কি পরিমাণ বাধা সৃষ্টি ক'রে, মানুষের জীবনকে কি ভাবে পঙ্গু ও জড় ক'রে রাখে এবং এই বেড়াজালের মধ্য থেকে বেরিয়ে এসে মুক্ত জীবনের স্বাদ পেয়ে মানুষ কি ভাবে তার মহত্ব আবিষ্কার করে সার্থকতার পথে এগিয়ে যায়। এ যেন তাঁর নিজের জীবনেরই প্রতিচ্ছবি। Art সম্পর্কে জিদের ধারনাও এই আবিষ্কারের ভিত্তিতেই গ'ড়ে উঠেছিল।

'Immoralist' প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেশ-বিদেশে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি হ'ল। সমালোচকেরা ক্ষুব্ধ হয়ে সমাজের পরম হিতৈষী হ'য়ে উঠে নীতিবাগীশের মত বললেন আইনের সাহায্যে উপন্যাসের প্রচার বন্ধ করতে হ'বে। কিন্তু জিদের পক্ষ সমর্থনে এগিয়ে এলেন বার্নার্ড শ'। তিনি প্রতিবাদ ক'রে বললেন, "There is much unpalatable in Gide. But who is there to deny his extraordinary greatness, his intellectual height?"

জিদ বলেন, প্রাচীন রীতি-নীতির অনুবর্ত্তন ও শৃঙ্খলা-বোধই বিশুদ্ধ শিল্প নয়। বিদ্রোহের পথই শিল্পীর পথ। বদ্ধ জীবনে চিন্তার পঙ্গুতা থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে মুক্ত জীবনের আস্বাদ লাভ করে মানুষ কিভাবে তার অন্তর্নিহিত শক্তিকে আবিষ্কার করে, তারই বাণী বহন ক'রে এনেছেন জিদ্।

জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হ'লে আর্ট নিরর্থক। জীবনের মধ্যেই আর্টের জন্ম। জীবনের প্রতি সমবেদনা, জীবন সম্পর্কে সচেতনতা থেকেই মহৎ আর্টের উদ্ভব হয়। জিদ বলেন স্রষ্টাকে খুঁজে পাওয়া চাই তার সৃষ্টির মধ্যে, অর্থাৎ স্রষ্টা যেখানে তাঁর সৃষ্টির মধ্যে ওতপ্রোতভাবে জড়িত সেখানেই তাঁর সৃষ্টি সার্থক, সেখানেই তা আর্ট হয়ে উঠল—"a character doesn't interest me unless created complete from the flesh of the author." ডষ্টয়েভস্কীর বৈশিষ্ট্য এখানেই। তাঁর চরিত্রগুলি "are projection of personal and private anguish." তাই জিদ ফ্লবেয়ার অপেক্ষা ডষ্টয়েভস্কীকে পছন্দ করেন বেশী।

ফ্লবেয়ারের সঙ্গে জিদের এক জায়গায় বিরোধ ছিল। ফ্লবেয়ার আর্টের জন্যই বেঁচে ছিলেন, কিন্তু জিদ জীবনকে বেশী ভালবেসেছিলেন। জীবনের প্রতি ফ্লবেয়ারের অবজ্ঞা জিদকে ব্যথিত করেছিল। জিদের মতে জীবনকে বাদ দিয়ে আর্ট অসম্পূর্ণ।

অচেনাকে অজানাকে ভালবেসে, বিপদ অগ্রাহ্য ক'রে সেই অজানাকে আবিষ্কারের নেশায় অনিশ্চিত ভবিষ্যতের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়াই যৌবনের ধর্ম্ম। জিদ এই যৌবনের জয়গান গেয়েছেন Immoralist উপন্যাসে।

যৌবনের এই ধর্ম্ম আবার পরিবারের বন্ধন মেনে নিতে পারে না। জিদের জীবনে এটা সত্য হয়ে দেখা দিয়েছিল। এক জায়গায় তিনি লিখেছেন, 'জানালা দিয়ে তাকিয়ে আছি, সামনের একটা বাড়ীর দিকে চোখ পড়লো। দেখলাম একটি ছোট ছেলে পড়াশুনা করছে।

তার বাবা পাশেই ব'সে আছেন, আর মা একপাশে ব'সে সেলাই করছেন। ইচ্ছে হ'ল ছেলেটিকে ঘর থেকে টেনে বা'র ক'রে আনি পথের মধ্যে।' অথচ আবার পারিবারিক স্নেহ-বন্ধনকেও জিদ অস্বীকার ক'রতে পারেন নি। এরই একটা রূপ প্রকাশ পেয়েছে তাঁর বন্ধুবাৎসল্যের মধ্যে। এখানেও সেই শাশ্বত বিরোধী শক্তির দ্বন্দ্ব।

জিদের বন্ধুবাৎসল্য অতুলনীয়। দিনের পর দিন, সপ্তা'র পর সপ্তা' বন্ধুরা তাঁর বাড়ীতে আস্তানা বাঁধতো। জিদ আর তাঁর পত্নী বন্ধুদের আদর-আপ্যায়নের মধ্যে ডুবিয়ে রাখতেন। শিশু-যুবক-বৃদ্ধ নির্বিশেষে সকলেই তাঁর বন্ধু, ভ্রমণে বা মৎস্য শিকারে তাঁর মত সঙ্গী পেলে লোকে ধন্য হত, গল্প বা আলোচনা আসরে তাঁর উপস্থিতি অপরিহার্য্য। এমনিভাবে জিদকে ঘিরে গ'ড়ে উঠেছিল একটি গোষ্ঠী।

১৯০৯ সালে জিদের 'Strait is the Gate' উপন্যাস প্রকাশিত হয়। ঐ বৎসরই বন্ধুদের সহায়তায় তিনি একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। ১৯১১ সালে N. R. F. নামে একটি প্রকাশক প্রতিষ্ঠানও স্থাপন করেন।

জিদ প্রগতিবাদে বিশ্বাসী। এগিয়ে চলাই তাঁর জীবনাদর্শ। এগিয়ে চলার এই আদর্শ থেকে ক্রমে তাঁর সাম্যবাদের প্রতি প্রীতি দেখা দিতে লাগলো। পৃথিবীর সমস্ত কিছু ভালবেসে, সকলের সঙ্গে প্রাণখুলে মেলামেশার ফলে জিদের নতুন চেতনা হ'ল। তিনি বললেন,—

"If with all we have, we are not able to be happy, it is because we have fashioned a false idea of happiness. When we shall have understood that the secret of happiness is not in possessing, but in giving, in making people happy around us, we shall be happier ourselves." সোভিয়েট রুশিয়া সম্পর্কে আগ্রহ ও অনুরাগ তাঁর ক্রমেই বাড়তে লাগলো। তিনি দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করলেন, "I wish I could shout very loudly my sympathy for Russia. And it is important that my cry should be heard." তিনি বললেন, "What I admire in the U. S. S. R. is the abolition of that abominable formula : 'you shall earn MY bread in the sweat of YOUR brow'."

তিনি আহ্বান জানালেন, "ব্যক্তিগত সম্পত্তি যেখানে তার চারপাশে দুরতিক্রম্য প্রাচীরের ব্যবধান সৃষ্টি ক'রে সকলকে দূরে থাকতে বলছে, ভেঙে ফেলো সে প্রাচীর সমস্ত শক্তি দিয়ে, ঘুচিয়ে ফেলো ব্যবধান, তোমার শ্রমের প্রতিদান পুরোপুরিভাবে আদায় ক'রে নেওয়ার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়।"

এইভাবে কম্যুনিজমে বিশ্বাসী হয়ে পাঁচ বৎসরকাল সোভিয়েট ইউনিয়নের অনুরাগী থাকার পর জিদ ১৯৩৬ সালে রুশিয়া গমন করলেন এবং 'Retour de l' U. R. S. S.' (Return from the U. S. S. R.) প্রকাশ করলেন। বইটিতে রুশ জনসাধারণ সম্পর্কে জিদ উচ্চ ধারণা প্রকাশ করেছেন। পর বৎসর তিনি 'After thoughts on the U. S. S. R.' নামে আর একখানি পুস্তক লেখেন। কিন্তু এই দুইখানি পুস্তকে কম্যুনিজম সম্পর্কে জিদের পরস্পর বিরোধী মত প্রকাশ পেয়েছে। প্রথমে যার প্রশংসা করেছেন, পরে বলেছেন সে নীতি কৃত্রিম।

প্রগতির পথে এগিয়ে চলার জন্য ক্রমে তিনি মানুষের শক্তিতে বিশ্বাসী হ'য়ে উঠেছেন, বলেছেন,—

"Don't believe anything, don't accept anything without proof...Thirst for knowledge is born of doubt. Stop believing and begin to learn."

অদৃষ্টবাদ থেকে তিনি দূরে স'রে এসেছেন, সংস্কারের ঊর্দ্ধে উঠে বলেছেন, "Do not accept life as men offer it to you. Do not stop believing that life might be more beautiful...The day when you begin to understand that men are responsible, and not Gods for almost all the evils of life, you will no longer be resigned to these evils."

পৃথিবীকে তিনি উন্নততর ক'রে তুলতে চেয়েছিলেন। বর্ত্তমান পৃথিবীর রূপে তিনি সন্তুষ্ট থাকতে পারেন নি। পৃথিবী যে আরও সুন্দর হয়ে উঠতে পারে, সেই আশাই তিনি প্রকাশ করেছেন বার বার। তাই তিনি বলেছিলেন, "Woe to him who is satisfied with this imperfect world which couud be so beautiful."

মানসিক গঠনের এই অবস্থায় জিদ ঝুঁকেছেন বিজ্ঞানের দিকে। অতীতের গ্লানির দিকে পিছন ফিরে না দেখে তিনি ভবিষ্যতের আশার আলোক লক্ষ্য ক'রে এগিয়ে গিয়েছিন। তাঁর মত আর কোন সাহিত্যিক বোধ হয় এভাবে বিজ্ঞানকে স্বীকৃতি দেন নি। তাঁর বিশ্বাস বিজ্ঞান মানুষকে সমস্ত কিছু সমস্যা সমাধানে সহায়তা করবে। বিজ্ঞানের মধ্য দিয়ে জীবন ও শিল্প অতি উচ্চ স্তরে উপনীত হ'বে। এ্যানা স্তাকলুটন আর এমানুয়েলের দ্বন্দ্বে এ্যানা জয়লাভ করলো।

জিদের সুবৃহৎ গ্রন্থ 'Journals' ফরাসী সাহিত্যের এক অপূর্ব্ব সম্পদ। এই আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থটিতে তিনি বিশ্বসাহিত্য ও শিল্পের যে আলোচনা করেছেন তা অমূল্য।

ফরাসী সাহিত্যে জিদের একটি অতুলনীয় দান তাঁর অনুবাদ কার্য্য। অনুবাদের মধ্য দিয়ে জিদ ফরাসী সাহিত্যকে সমৃদ্ধ ক'রে গিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি ও ডাকঘরের অনুবাদ, সেক্সপীয়রের হ্যামলেটের অনুবাদ এবং পুশকিন, ওয়াল্ট হুইটম্যান, জোসেফ কনরাড, উইলিয়ম ব্লেক প্রভৃতির লেখা অনুবাদ তাঁর অক্ষয় কীর্ত্তি।

যৌবনের সেনা

শ্রীকৃতান্তনাথ বাগচী

১

কিসের তরে অন্ধকারে তুলছে জয়ধ্বনি
জাগছে কারা ভাবনাহারা অমাপ্রহর গণি ?
তাদের যেন রুদ্ধ ঘরের সুখ শয়ন নয়,
ভীরুর দেশে পণ করেছে জিনতে বিষম ভয়।
ঘুমের ঘোরে চমক লাগায় আধমরাদের দলে
যৌবনের সেনা তারা পাহাড় পথে চলে।

২

সে কি গহন রাত্রি কালো আকাশে নাই তারা,
মাঝে মাঝে শাসনবাণী বজ্রেতে দেয় সাড়া।
মৃত্যুহাণে অগ্নিবাণে—চরণে নাগপাশ,
ভাষাহারা নিবিড় ব্যথায় শিউরে উঠে ঘাস।
ছিন্ন হিয়ার শোণিত ঝরে, বিষের ফাঁসী গলে,
যৌবনের সেনা তবু দৃপ্ত পদে চলে।

৩

পথের দুঃখ ঢেউয়ের মতন সারির পরে সারি,
স্বপ্ন আঁকা কেতন যেন অশ্রু ভেজা ভারী।
হয়তো হঠাৎ লুটালো কেউ ঝরা ফুলের প্রায়,
এগিয়ে এসে ধরল বুকে যাত্রী সাথী ভাই,
আশার বাণী বাজল তখন যে মুমূর্ষু গলে
তারই আলোয় অজেয় বীর দুঃসাহসী চলে।

৪

দেখরে চেয়ে আকাশ ছেয়ে কিসের পড়ে তাড়া,
উর্দ্ধশ্বাসে পালায় ত্রাসে মেঘেরা ছন্নছাড়া।
ভোরের আলোর পরশ লাগে গিরির শুভ্র ভালে
ফুল ফোটানোর দোলন সাড়া হাওয়ায় ডালে ডালে।
দুয়ার খুলে মুক্তমানব এল কৌতূহলে,
শহীদ শবের পুষ্প লোটায় জীবন-বেদী তলে।

৫

নাই বা তাদের চিনলরে কেউ—জানল নারে নাম
তবু পুণ্যশ্লোক পাবে যে প্রভাতের প্রণাম।
সকল বর্ষা কাঁদবে তাদের বিচ্ছেদেরে স্মরি
গৌরবেতে উঠবে শরৎ সোনার আলোয় ভরি।
তাদের ব্যথায় হিম হবে শীত ; বসন্ত ফুল দলে
অমর স্বপন ভাষা পাবে নীল আকাশের তলে।

পথের সন্ধান

শ্রীঊষা বিশ্বাস

দীপক বসু ষোল বছর পরে কাল জেল থেকে ছাড়া পাবে। ষোল বছর আগে রাজদ্রোহ-অপরাধে তার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হ'য়েছিল। কাল তার এতদিনকার বন্দীজীবনের অবসান হবে। ষোল বছর আগে ফেলে-আসা অতীত জীবনের অনেক কথাই আজ তার মনে প'ড়ছে। সে ছিল তার বিধবা মায়ের একমাত্র সন্তান। গ্রামের স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ ক'রবার পরে তার মা তাকে নিয়ে তাঁর ভাই-এর বাড়ীতে ক'লকাতায় চ'লে এলেন। দীপকের মামা রায় বাহাদুর অধরচন্দ্র ঘোষ ছিলেন বাংলা সরকারী দপ্তরের একজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী। বোন ও ভাগ্নের তাঁর বাড়ীতে এসে থাকাটা রায় বাহাদুর মোটেই পছন্দ ক'রলেন না। সে-কথা তিনি স্পষ্ট ক'রে না ব'ল্লেও প্রকারান্তরে তা'দের বুঝিয়ে দিলেন—ব'ল্লেন—"শিবানী, তোর ছেলে তো ম্যাট্রিক পাশ ক'রলো! এবার ওকে একটা চাকুরীতে ঢুকিয়ে দেবার চেষ্টা করি, কি বলিস্? ছেলেদের বি-এ, এম-এ, পাশ ক'রে আজকাল কি বা হ'চ্ছে? মিছিমিছি সময় ও পয়সা নষ্ট! ও সব, বাপু, বড়লোকদের ছেলেদেরই সাজে।" শিবানী ব'ল্লেন—"দাদা, দীপু তো আমার জলপানি পেয়েছে। পড়াশুনার দিকে ওর ছোটবেলা থেকেই বড্ডো ঝোঁক। ওর বাপেরও খুব ইচ্ছে ছিল ওকে এম-এ পাশ করানো—আমি তোমাদের সংসারে বোঝা হ'য়ে থাক্তে চাই নে যতদূর পারি শরীর দিয়ে খেটে দেবো। তুমি আমার ছেলেটাকে মানুষ ক'রে দাও।" শিবানীর ভ্রাতৃ-জায়া—রায় বাহাদুরের স্ত্রী—শোভনা নিতান্ত চক্ষু লজ্জার খাতিরেই মুখ ফুটে কোনও আপত্তি জানাতে পারলেন না। কিন্তু বিধবা ননদের ছেলে নিয়ে তাঁর সংসারে এসে থাকাটা প্রথমে তাঁর একটুও মনঃপূত হয় নি। পরে বোধহয় তিনি ভেবে দেখ্লেন বাড়ীতে একটি বিধবা ননদ থাকলে সময়ে অসময়ে তার দ্বারা সংসারের অনেক কাজও হ'তে পারে। তিনি নিজে মানুষটি ছিলেন অলস-প্রকৃতির ও স্বার্থপর। সংসারে সব কিছুর লাভ ক্ষতি খতিয়ে দেখাই ছিল তাঁর অভ্যেস। তাই শিবানী আস্বার পরে ব্যয় সংক্ষেপ ক'র্বার জন্যেই বোধহয় রাঁধুনী উঠিয়ে দিলেন। ননদকে শুনিয়ে শুনিয়ে মাঝে মাঝে ব'ল্তেন—"ঠাকুরঝিকে তো তা'র নিজের নিরামিষ ঘরের রান্নাটা ক'র্তেই হয়। মিছিমিছি একটুখানি আমিষ রান্নার জন্যে আর একটি ঠাকুর রেখে দরকার কি? যা খরচের ধাক্কায় পড়া গেছে! খরচ একটু না কমালে ঐ ক'টা টাকায় কুলোনোই দায়।" দীপকের আজ মনে প'ড়লো কত আশা ক'রে তার মা তা'কে ক'লকাতায় নিয়ে এসে কলেজে পড়াতে চেয়েছিলেন। তাঁর বড় আশা ছিল দীপক পাশ ক'রে একটা বড় চাকরী পেলে তাঁর দুঃখ ঘুচ্বে। তখন তিনি তাঁর মনের মতো একটি বউ নিয়ে এসে ছেলে, ছেলের বউ নিয়ে একটি সুখের নীড় গ'ড়ে তুলবেন। গ্রামে তাঁর সই সুনন্দার একটি ছোট্ট ফুট্‌ফুটে মেয়ে ছিল। তা'র নাম ছিল সুভদ্রা। দীপকের সঙ্গে সুভদ্রার বিয়ে দেবেন শিবানী মনে মনে একরকম ঠিকই ক'রে রেখেছিলেন। দুই সইতে এ সম্বন্ধে কথাবার্ত্তাও হ'য়ে গিয়েছিল। মায়ের কথা মনে হ'তেই দীপকের আজ একটি গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস প'ড়্লো। তা'র মা'ই ছিলেন তা'র সংসারে একমাত্র বন্ধন—আজ তিনিও নেই। দীপক বিপ্লবী দলে যোগ দিয়েছে এ-কথা যখন জানাজানি হ'য়ে গেল তখন তা'র মা কত চোখের জলই না ফেলেছেন—সাশ্রু নয়নে কত কাতর কাকুতি মিনতি ক'রে তাকে সেই পথ থেকে ফেরাতে চেয়েছেন। কিন্তু তা'র মায়ের অশ্রুজলও সেদিন তাকে সংকল্প-চ্যুত ক'র্তে পারে নি।' তা'র মনে হ'য়েছিল, সে কোনও অবস্থায় প'ড়েই তা'র দলের বিশ্বাসভঙ্গ ক'র্তে পারে না—তা' হ'লে তাকে সংঘের কাছে বিশ্বাসঘাতক হ'তে হবে। তার জন্যে শিবানীকে কত নিগ্রহ না ভোগ ক'র্তে হ'য়েছে তাঁর ভাই ও ভাজের কাছ থেকে। সেদিন স্বদেশ-জননীর পরাধীনতার গ্লানি—তা'র দুঃখটাই—দীপকের অন্তরে বড়ো বেশী ক'রে বেজেছিল। সে তাই তার নিজের জীবন পণ ক'রেও দেশ-মাতৃকার শৃঙ্খল মোচন ক'র্তে চেয়েছিলেন। দেশসেবার পবিত্র ব্রত গ্রহণ ক'রে সে যে কঠিন বিপদসঙ্কুল, কণ্টকাকীর্ণ পথ বেছে নিয়েছিল সেটাই সেদিন তার কাছে একমাত্র পথ ব'লে মনে হ'য়েছিল। সেদিন তা'র মনে হ'য়েছিল তার দেশ-জননী যেন তাকে ব'ল্ছেন—

"ঘরের মঙ্গলশঙ্খ নহে তোর ও রে,
নহে রে সন্ধ্যায় দীপালোক,
নহে প্রেয়সীর অশ্রুচোখ।"

জেলে যেদিন সে তা'র মায়ের মৃত্যু-সংবাদ পেয়েছিল সেদিন এক নিদারুণ ব্যথায় তার বুকটা টন্ টন্ ক'রে উঠেছিল—তার চোখ দিয়ে অঝোরে বেদনাশ্রু ঝ'রেছিল। সেদিন তা'র মনে হ'য়েছিল সে এমনি হতভাগ্য যে সে তা'র দুঃখিনী মায়ের দিকে একবার ফিরেও তাকায় নি—তাঁর কোনও সাধ, কোন আশাই পূর্ণ ক'র্‌তে চেষ্টা করে নি। দাঁত থাকতে কেউ দাঁতের মর্ম বোঝে না। মাকে হারিয়েই সেদিন দীপক বুঝ্‌তে পার্‌লো তা'র মা তা'র কতখানি ছিলেন। তার মনে হ'লো জননীর অতল গভীর স্নেহের মধ্যে নিরন্তর ডুবে থেকে তা'র মূল্য সে বুঝ্‌তেই পারে নি'—সেটাকে সে যেন তার অবশ্য প্রাপ্য ব'লেই ধ'রে নিয়েছিল। শিশুকাল থেকে মায়ের কাছ থেকে সে কেবল নিয়েই এসেছে তাঁকে দেবার কথা তার কখনও মনেই হয় নি'—তা'র মনেই হয় নি' তার মায়েরও তার উপর কোনও দাবী থাকতে পারে। আজ জেল থেকে আসন্ন বিদায়ের ক্ষণে তা'র এ সমস্ত কথাই মনে প'ড়ছে—তা'র মায়ের বিষন্ন করুণ মুখখানি যেন বার বার তার চোখের সাম্‌নে ভেসে উঠ্‌ছে। আজ তা'র মনে কোথায় সেই মুক্তির আনন্দ? কিসের জন্যে এই মুক্তি? জেলের বন্দী জীবনেই সে বেশ অভ্যস্ত হ'য়ে গিয়েছিল। সে তো এই মুক্তি চায় নি।' আজ তা'র মনে হচ্ছে তার মা যখন বেঁচে নেই সারা জীবন তার জেলে কাট্‌লেই বা কি ক্ষতি ছিল? এই বিশাল বিশ্বে তার মতো হতভাগ্যের স্থান কোথায়? কাল সে জেল থেকে বেরিয়ে কোথায় যাবে? তার মা বেঁচে থাক্‌লে কাল সে এখান থেকে মুক্তি পেয়ে তাঁর কাছেই ছুটে যেতো। তাঁর কাছে গিয়েই বোধহয় সে তা'র সব দুঃখ-জ্বালা ভুল্‌তে পার্‌তো। জেল থেকে বেরিয়ে সে কি ক'রবে—সেও একটা মস্তো বড় সমস্যা। ষোল বছর আগে যখন সে প্রথম জেলে ঢুকেছিল, সে ছিল একজন তরুণ যুবক। তখন তার অন্তর ছিল আশা, আকাঙ্ক্ষা; উদ্দীপনায় ভরা। জীবনকে আবার নতুন ক'রে গ'ড়ে তোলা আর কি তার পক্ষে সম্ভব? আজ কোথায় তা'র সেই উদ্যম, উৎসাহ? দীপকের মনে হ'লো তার জীবনের এতগুলি বছর জেলে কাটিয়ে সে দেশকে স্বাধীনতার পথে কতটুকু এগিয়ে দিতে পেরেছে—সে নিজের জীবনকেই বা কতখানি সার্থক ক'রে তুল্‌তে পেরেছে? কে তার এই আত্মত্যাগের মূল্য দিয়েছে বা বুঝেছে? তা'র মত অমন কত হাজার হাজার যুবক-যুবতী স্বাধীনতা সংগ্রামে আত্মাহুতি দিয়েছে, কে তাদের খবর রাখে? দীপকের আজ আর একজনের কথা মনে প'ড়্‌ল। সে তার পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট ক্লাসের সহপাঠিনী উজ্জ্বলা মিত্র। একদিন সে উজ্জ্বলাকে তার জীবনসঙ্গিনী ক'র্‌বার স্বপ্নও দেখেছিল। তাকে পেলে হয় ত বা তা'র জীবন অন্য রকম হ'তেও পার্‌ত। চপলা বিদ্যুৎশিখার মতই এই মেয়েটি একদিন তা'র জীবন-পথে ক্ষণিকের জন্যে "চকিত-চমকে" দেখা দিয়েই স'রে গিয়েছিল। চটুলা, লীলাচঞ্চলা, হাস্যমুখরা, বসনে, ভূষণে, প্রসাধনে অতি আধুনিকা এই মেয়েটি যেন প্রদীপ্ত আলোকশিখার মতই সেদিন তার চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছিল। দীপক ছিল অত্যন্ত লাজুক ও মুখচোরা—নিজের চেহারা এবং বেশভূষার প্রতি একান্ত উদাসীন। এর আগে সে কখনও এ রকম ধরণের মেয়ে দেখেই নি কিংবা কোনও অনাত্মীয়া মেয়ের সঙ্গ লাভেরও বিশেষ সুযোগ পায় নি। তাই তার উজ্জ্বলাকে বড় ভাল লেগেছিল। বিপরীতধর্ম্মী গুণ পরস্পরকে আকর্ষণ করে—এটাই বোধ হয় স্বভাবের নিয়ম। প্রথম প্রথম দীপক উজ্জ্বলাকে এড়িয়ে চ'ল্‌তেই চেষ্টা ক'র্‌ত। তার প্রতি এই আত্মভোলা সৌম্য দর্শন যুবকটির ঔদাসীন্য যেন উজ্জ্বলার একেবারে অসহ্য ব'লে মনে হ'ল। সে নানা উপায়ে তার দৃষ্টি আকর্ষণ কর্‌বার চেষ্টা কর্‌তে লাগ্‌ল। সে প্রায়ই উপযাচিকা হ'য়ে দীপককে পড়াশুনা সম্বন্ধে এটা ওটা জিজ্ঞেস্ ক'র্‌তে আস্‌ত। একদিন দীপক ছুটীর পরে রাস্তায় ট্রামের জন্য অপেক্ষা ক'র্‌ছিল, এমন সময় প্রকাণ্ড একখানা বুইক গাড়ী তার সাম্‌নে এসে থেমে গেল। সে চেয়ে দেখ্‌ল উজ্জ্বলা ব'সে আছে গাড়ীখানাতে। সে তাকে দেখে মিষ্টি হাসি হেসে ব'ল্‌ল—"চলুন, আপনাকে পৌঁছে দিয়ে যাই আপনি যেখানে যাবেন।" দীপক লজ্জিত হ'য়ে ব'ল্‌ল—"না, না, আমায় পৌঁছাবার কোনও দরকার নেই। আমি ট্রামেই যাব রোজ যেমন যাই।"

"উঠুন্, উঠুন্, কোনও কথা শুনব না আমি। আর সীন করবেন না। রাস্তায় সবাই আমাদের দিকে তাকাচ্ছে। সে-দিকে খেয়াল আছে?"

দীপক আর বাক্য ব্যয় না ক'রে গাড়ীতে উঠে বস্‌ল। এম্‌নি ক'রে সে ক্রমে উজ্জ্বলার দিকে আকৃষ্ট হ'তে লাগল। তারপর একদিন তার ভুল ভাঙতেও দেরী হ'ল না। এক শনিবারে সে ম্যাটিনী শো'তে সিনেমায় গিয়েছিল। সেদিন খুব ভালো একখানা বই ছিল। বিরামের সময় দীপক উঠে যখন বাইরে যাচ্ছিল সে দেখ্‌ল তাদের ক্লাসের সমরেশ চৌধুরী ও উজ্জ্বলা দু'জনে পাশাপাশি বসে খুব হেসে হেসে গল্প ক'র্‌ছে ও সিগারেট টান্‌ছে। এ দৃশ্য দেখে দীপকের মনে বেশ একটু ঈর্ষার উদ্রেক হ'য়েছিল। এসম্বন্ধে একদিন সে উজ্জ্বলাকে

বলেছিলও। উজ্জ্বলা তা'তে বিরক্ত হয়ে বলেছিল—"আমি যা'র সঙ্গেই মিশিনা কেন আপনার তাতে কি আসে যায়? আপনি কি আমার গার্ডিয়ান?" তারপর থেকে সে লক্ষ্য ক'র্‌ল উজ্জ্বলা যেন তাকে এড়িয়ে চল্‌তে চাইত। কলেজের বারান্দায় বা সিঁড়ি দিয়ে উঠ্‌তে নাম্‌তে কখনও দেখা হ'লে না দেখ্‌বার ভান ক'র্‌তেই চেষ্টা করত—নিতান্ত সাম্‌না সাম্‌নি প'ড়ে গেলে একটু হেসে চ'লে যেত—কোনও কথা ব'ল্‌ত না। ক্লাসের ছুটীর পরে সে প্রায়ই দেখতো উজ্জ্বলা ও সমরেশ একসঙ্গে গাড়ীতে চলেছে। একদিন দীপক একখানা ট্যাক্সি ভাড়া ক'রে তাদের গাড়ীর পেছন পেছন গিয়েছিল—দেখ্‌ল তারা দু'জনে নেমে একটা সোডা ফাউন্টেনে ঢুক্‌ল। ক্রমে দীপক বুঝল উজ্জ্বলাকে জীবনসঙ্গিনী ক'র্‌বার সে যে স্বপ্ন দেখেছিল তা বামনের চাঁদ ধরতে চাওয়ার মতই অসম্ভব। উজ্জ্বলা তাকে চায় না—সে চায় সমরেশকে, যেহেতু সে ধনীপুত্র। দীপক ভেবেছিল সে কোনও প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দিয়ে একটা ভাল চাক্‌রী পেলে উজ্জ্বলার কাছে বিয়ের প্রস্তাব ক'রবে।

কিন্তু সে এখন বুঝল, তার উজ্জ্বলাকে পাবার আশা দুরাশা মাত্র। প্রথমে উজ্জ্বলাকে না পাবার দুঃখটা তার বুকে বড়ই বেজেছিল। কতদিন সন্ধ্যা বেলায় সে কোনও পার্কে গিয়ে একটা বেঞ্চে চুপ্‌ ক'রে ব'সে থাক্‌ত—কী যে সে ভাবত তা' সে নিজেই জানে না—পার্কে লোকজনের আনাগোনা, তাদের হাসি গল্প—কোন কিছুর দিকেই তার খেয়াল নেই। প্রায়দিনই অনেক রাতে বাড়ী ফিরে সে কিছু না খেয়েই চুপচাপ শুয়ে প'ড়ত। তার শরীর খারাপ হয়ে যাচ্ছে দেখে তার মা বিশেষ চিন্তিত হ'য়ে প'ড়লেন—বারবার জিজ্ঞেস করতেন—তার কোনও অসুখ করেছে কিনা। দীপক চিরদিনই পড়াশুনা ভালবাসত—সে পড়াশুনার মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দিয়ে উজ্জ্বলাকে ভুল্‌তে চাইল—নিজের দুঃখকেও ভুল্‌তে চাইল। দেখল তাও অসম্ভব। সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বই খুলে ব'সে থাক্‌ত—বই এর লেখা গুলো যেন তার কাছে অর্থহীন ব'লে মনে হ'ত। অনেক দিন থেকেই তার এক সহপাঠী বন্ধু শ্যামল রায় তাকে তাদের দলে টান্‌তে চাচ্ছিল। সে দীপককে পীড়াপীড়ি ক'র্‌ছিল তাদের একটা গুপ্ত সমিতির সভ্য হবার জন্য। সংঘের আদর্শ ও কার্য্য-কলাপ সম্বন্ধে কিছু কিছু পুস্তিকাও শ্যামল গোপনে তাকে প'ড়তে দিয়েছিল। দীপক ঠিক ক'র্‌ল সে শ্যামলদের দলেই ভিড়ে পড়বে—তার একটা কাজ চাই। কাজের মধ্যেই সে নিজেকে ডুবিয়ে রাখবে যা'তে সে উজ্জ্বলার কথা ভাববার অবসর না পায়। একদিন শ্যামল তাকে নিয়ে গেল তাদের সংঘের সভাপতির কাছে—যথারীতি শপথ গ্রহণ ক'রে দীপক এই সংঘের সভ্য হ'ল। অনতিবিলম্বে সে সংঘের একজন অত্যন্ত উৎসাহী সভ্য হ'য়ে উঠ্‌লো এবং অনেক কঠিন কঠিন কাজের ভার নিল। কাজের নেশায় সে মেতে উঠ্‌ল।—আজ এতকাল পরে দীপকের মনে পড়ল উজ্জ্বলার কথা। সে-ই ত তার জীবনের মোড় ফিরিয়ে দিয়েছিল। ভাবল সেদিন যদি উজ্জ্বলা তাকে গ্রহণ ক'রত তাহ'লে তার জীবন হয়ত এরকম হত না। একথা মনে হ'তেই তার নিজের অজ্ঞাতে ছোট্ট একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস প'ড়ল—ভাবল লজ্জ্বলা হয়ত এতদিনে সমরেশকে বিয়ে ক'রে সুখে স্বচ্ছন্দে ঘরকন্না ক'র্‌ছে—হয়ত বা তাদের দু'একটি ছেলে মেয়েও হ'য়েছে। দীপকের আজ সুভদ্রার কথাও মনে হ'ল—মনে হ'ল তার মায়ের কত ইচ্ছা ছিল তাকে বৌ ক'র্‌বার। দীপক বিপ্লবীদলে যোগ দিয়েছে ব'লে যখন তা'র মা কানাঘুষা শুন্‌ছিলেন তখন তিনি চেয়েছিলেন তার সঙ্গে সুভদ্রার বিয়ে দিয়ে তাকে সংসারের মায়াপাশে বাঁধতে। তার মা তাকে একদিন বলেছিলেন—"দীপু, এবার তোর সইমাকে বলি, আস্‌ছে মাসেই একটা ভাল দিন দেখে ভদ্রার সঙ্গে তোর বিয়েটা দিয়ে ফেল্‌তে। ভারী লক্ষ্মী মেয়েটি কিন্তু। গ্রামে থাক্‌তে হয়। কতদিন আর সই মেয়েকে আইবুড়ো ক'রে রাখবে? গ্রামের লোকের কথার জ্বালায় সে অস্থির হ'য়ে উঠেছে শুন্‌ছি।" শুনে দীপক হেসে বলেছিল—"এখন বিয়ে করবার কথা ত মা আমি ভাবতেই পাচ্ছি নে। চাক্‌রী বাক্‌রী একটা না পেলে পরের মেয়েকে এনে খাওয়াবোই বা কি? আমরা নিজেরাই ত এখন পরের উপর খাচ্ছি।—তুমি আমার বিয়ের জন্যে অত ভাবছ কেন? লোকের কন্যাদায় হয়, তোমার দেখছি পুত্রদায় হ'ল।" তার মা বলেছিলেন—"তোর চাক্‌রী ক'র্‌বার এমনই বা দরকার কি? তুই তো বি-এ পাশ করেছিস, চেষ্টা ক'র্‌লে গ্রামের স্কুলেও ত একটা মাষ্টারি পেতে পারিস। তা না হ'লেও যা খুদকুঁড়ো আমাদের আছে গ্রামে গিয়ে থাক্‌লে তাতেই আমাদের বেশ চলে যাবে—গরীবানা চালে চ'ল্‌লে। কি জানি কবে ম'রে যাই! ম'র্‌বার আগে তোকে সংসারি দেখে যেতে চাই।" উত্তরে দীপক বলেছিল—"বিয়ের কথা এখন ভাবতেই পারিনে মা।—আর ভদ্রা কতটুকু মেয়ে! পাড়াগেঁয়ে মেয়ে লেখাপড়া জানে না। আমাকে চাকরী নিয়ে হয় ত ক'লকাতাতেই থাক্‌তে হবে। ভদ্রা এখানকার সমাজে পাঁচজনের সঙ্গে মিশতে পারবে কেন? তুমি সইমাকে বলে দাও আমার ভরসায় না থেকে অন্য ভাল

পাত্রের সন্ধান ক'রতে। ভদ্রা ত দেখতে ভালই—ঘরকন্নার কাজও সে বেশ ভাল জানে। ওর পাত্রের অভাব হবে না।" দীপকের কথা শুনে শিবাণীর সেদিন বড়ো দুঃখ হ'য়েছিল—যদিও তিনি মুখে কিছু বলেন নি'। ছেলের উপর বোধহয় একটু অভিমানও হ'য়েছিল। কতদিন থেকে তিনি মনে মনে ঠিক ক'রে রেখেছিলেন সুভদ্রাকেই তিনি পুত্রবধূ ক'রবেন। ছেলের কথায় বুঝতে পারলেন তার এবিয়েতে মত নেই। তার অমতে ওখানে তার বিয়ে হতেই পারে না একথাও বুঝলেন। শিবাণী তাঁর ছেলেকে চিন্‌তেন—সে একবার 'না' ব'ল্‌লে তাকে "হ্যা" বলানো বড়োই কঠিন। তাছাড়া তিনি নিতান্ত জেদ ক'র্‌লে দীপক যদি ভদ্রাকে বিয়ে করেও, তাহলে সে মোটেই সুখী হবে না। এ কথাও তিনি বুঝলেন। তাঁর একমাত্র সন্তান অসুখী হবে তাঁর মায়ের প্রাণে তাও ত সইবে না। অথচ তিনি যে তাঁর সইকে একরকম কথাই দিয়েছিলেন সুভদ্রাকে বৌ করবেন ব'লে। দীপক আজ তার অতীত জীবনের এই সব ঘটনা গুলিরই রোমন্থন করছিল। সে চুপ ক'রে বসে যখন এই কথা ভাবছিল তখন তার এক সঙ্গী সুনীল কর এসে ব'ল্‌ল—"কি এত ব'সে ব'সে ভাবছেন বলুন্ ত আপনি? কাল ত ছাড়া পাচ্ছেন। আমাদের যে আরও কতকাল এখানে পচতে হবে কে জানে?" দীপক চম্‌কে উঠ্‌লো—ব'ল্‌লো—"হাঁ্যা, ভাব্‌ছিলাম কাল জেল থেকে বেরিয়ে কোথায় যাবো? এত বড়ো দুনিয়ায় আমার মতো হতভাগ্যের স্থান ত দেখি নে'। সংসারে আমার আপনার ব'ল্‌তে ছিলেন একমাত্র মা। চার বছর হলো তিনিও ত আমার মায়া কাটিয়ে চলে গিয়েছেন। তাঁর কত আশা ছিল আমি এম-এ পাশ ক'রে চাক্‌রী বাক্‌রী পেলে তাঁর দুঃখ ঘুচ্‌বে। তাঁর সে আশাও পূর্ণ হ'ল না। অল্প বয়সে বিধবা হ'য়ে কত কষ্ট করেই তিনি আমায় মানুষ করেছিলেন। জেল থেকে বেরিয়ে তাঁকে যে আর দেখতে পাবো না এইটেই আমার সব চেয়ে বড় দুঃখ। আজ আমার মনে হচ্ছে মা'র মৃত্যুটা আমিই এগিয়ে দিয়েছি। কতই বা তাঁর বয়স হ'য়েছিল! যাক্, সে সব কথা ভেবে আর এখন লাভ কি? আমি জেল থেকে বেরিয়ে কি করব সেও এক মস্ত ভাবনা। গত ষোল বছর ধ'রে আমার ত বাইরের জগতের সঙ্গে কোনও সম্পর্কই নেই। বাইরে গিয়ে হয় তো দেখবো দেশের চেহারা কত ব'দ্‌লে গিয়েছে—আমাদের তখনকার কালের সঙ্গে এখনকার কালের হয় তো কোনও মিলই নেই। হয় ত একালের সঙ্গে এত বছর পরে আমার খাপ খাইয়ে চলাই কঠিন হবে। তারপরে সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে—জীবিকা সমস্যা। ষোল বছর আগে যখন প্রথম জেলে ঢুকেছিলাম তখন আমি একুশ বছরের তরুণ যুবক আর আজ আমি সাঁইত্রিশ বছরের প্রৌঢ়! এখন কি আর আমার পক্ষে এক নতুন জীবন গড়ে তোলা সম্ভব? যৌবনের সেই উৎসাহ, সেই মনের বল আজ কোথায়? কোথায় সেই তরুণ বয়সের আশাবাদ, আদর্শবাদ? সেদিন দেশের স্বাধীনতার যে স্বপ্ন দেখেছিলাম তা আজ একেবারে অসার বলে মনে হচ্ছে—মনে হচ্ছে সেদিন যেন মরীচিকার পেছনেই ছুটেছিলাম—সার্থকতার প্রকৃত পথটির সন্ধান পাইনি। সেদিন স্বদেশের সেবাকেই জীবনের ব্রত ব'লে গ্রহণ ক'রেছিলাম। আমার উদ্দেশ্য ছিল খাঁটি। কিন্তু আজ মনে হচ্ছে সত্যিই কি আমি আমার দেশের সেবা করতে পেরেছি? কয়েকজন ইংরেজ কর্ম্মচারী মেরে বিপ্লবাত্মক কাজের দ্বারা দেশের স্বাধীনতা কতখানি এগিয়ে দিতে পেরেছি? বুঝতে পারছি না সেদিন যে পথ বেছে নিয়েছিলাম সেটাই সত্যি না মহাত্মাজীর অহিংসা পথই সত্যি। আজ এই সব প্রশ্নই এত বছর পরে মনে জাগ্‌ছে।"

সুশীল বল্‌লো—"আপনি এখান থেকে বেরিয়ে কোথায় যাবেন ঠিক ক'রেছেন?"

"এখান থেকে কোথায় যাব, কি কর্‌ব—তা' আমি এখনও কিছু ঠিক কর্‌তে পারি নি। মামার বাড়ীর দরজা ত চিরদিনের জন্যেই বন্ধ হয়ে গিয়েছে। যেখানে আমার মা'রও শেষে স্থান হয় নি সেখানে কি আর আমার স্থান হবে? মাকে দিয়েই তো মামার সঙ্গে সম্পর্ক। মামার বাড়ীতে একজনের কাছ থেকেই একটু স্নেহ মমতা পেয়েছিলাম—সে আমার মামাতো বোন মমতা। সে এখন কোথায় আছে কে জানে? মামার বাড়ীর কোনও খবরই তো আমি জানি না। মামা বেঁচে আছেন কিনা তাই বা কে জানে? তাই ভাবছি এখান থেকে বেরিয়ে একে-বারে সোজা আমাদের গ্রামের বাড়ীতে গিয়েই উঠব। সেখানে আমার বিষয় সম্পত্তিও কিছু ছিল। জানি না কা'রা এখন সে সব ভোগ দখল কর্‌ছে।"

পরদিন সকালে জেলের সঙ্গীদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে দীপক রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল। শেষ পর্য্যন্ত সে গ্রামের বাড়ীতে গিয়ে ওঠাই স্থির কর্‌লো। ২৪ পরগণা জেলায় তাদের গ্রামটি। এককালে সেখানে বেশ কয়েক ঘর বর্দ্ধিষ্ণু ব্রাহ্মণ কায়স্থের বাস ছিল। ষ্টেশানে নেমেই দীপক হাঁটতে শুরু করল। ষ্টেশান থেকে তাঁদের গ্রাম মাইল দুই রাস্তা হবে। পথেই তার বাল্যবন্ধু সুবলের সঙ্গে দেখা হ'লো। সুবল প্রথমে তাকে

চিন্‌তে পারে নি। দীপকই প্রথম কথা বল্‌ল—"কে? সুবল না?"

"হ্যাঁ, আপনাকে ত চিন্‌তে পারলাম না।"

"আমায় চিন্‌তে পারছো না? আমি দীপক—দীপক বসু।"

"ওঃ! তুমি দীপক? কোথায় উঠেছ? তোমাদের বাড়ীতে ত তোমার প্রভাত দাদা সপরিবারে রয়েছেন। কাকীমা মারা যাবার পরে বাড়ীটা অনেকদিন খালিই পড়ে ছিল। তুমি আমার বাড়ীতেই চলো তা হ'লে, কেমন? আমি অবিশ্যি গরীব ইস্কুল মাষ্টার। যা পাই তাতে কোনও রকমে মোটা ভাত কাপড় জুটে যায়। জমিজমাও কিছু আছে তো। তোমায় পেলে সুধা—আমার স্ত্রী—খুব খুশী হবে। বেচারার সারাদিন একলা একলাই তো কাটে।"

"কেন? তোমাদের ছেলেপুলে নেই?"

"না।"

তার পরদিন রবিবার ছিল। দীপক সকালে সুবলের সঙ্গে বেড়িয়ে গ্রামটা ঘুরে দেখে এল—কয়েকটা বাড়ীতে গিয়ে দেখা সাক্ষাৎটাও সেরে নিল। গ্রামের বিশেষ কিছু উন্নতি বা পরিবর্ত্তন তার চোখে পড়ল না—তার অবস্থা 'যথাপূর্ব্বং তথা পরম্'। কিন্তু গ্রামের মানুষগুলি কেমন যেন বদ্‌লিয়ে গিয়েছে ব'লে মনে হ'লো। আগেকার সেই জমাট ভাবটি যেন আর নেই—সকলেই যেন নিজের নিজের স্বার্থ নিয়েই ব্যস্ত। বাড়ী ফিরে এসে দীপকরা দেখল, সুধার রান্না শেষ হ'তে তখনও দেরী আছে। কাল রাতে কোনও জোগাড় ছিল না ব'লে সুধা দীপককে ভাল ক'রে খাওয়াতে পারে নি—ঘরে যা ছিল তাই দিতে হ'য়েছিল। আজ রবিবার—কোনও তাড়া নেই। আজ তাই সে রান্নার একটু বিশেষ আয়োজন ক'রেছে। দীপক কতদিন পরে এসেছে—জেলে ত এত বছর ভালো মন্দ জিনিষ খেতে পায় নি। দুই বন্ধু স্নান হেসে নিয়ে ব'সে ব'সে গল্প ক'রছিল। দীপক জিজ্ঞেস করল—"সইমা এখানে নেই? ভদ্রার খবর কি?"

"ভদ্রার মা গত বছর মারা গেছেন। তিনি মেয়ের কাছেই শেষে থাকতেন—এখানে থাকতেন না। ভদ্রার কথা তুমি শোন নি? তুমি কি করেই বা শুনবে? সে ত এখন সিনেমা করে। সে এখন বড়লোক—বেশ দু'পয়সা রোজগার করছে।"

"ভদ্রা শেষে সিনেমায় নাম্‌লো, বল কি? সে ত অত্যন্ত ঘরোয়া মেয়ে ছিল। তার সাত চড়ে মুখে রা বেরুতো না। সে এখানে মাঝে মাঝে আসে নাকি?"

"না, গ্রামে আসবার কি আর তার মুখ আছে? গ্রামের লোকদের তুমি জানই তো!—আহা! ভদ্রা মেয়েটি কিন্তু বড় ভাল। বেচারার এ ছাড়া আর উপায় ছিল না। অত বড় আই বুড়ো মেয়ে নিয়ে ওর মায়ের পক্ষে গ্রামে বাস করাই দায় হয়ে উঠেছিল। এ ধারে ওর কাকাও ওর বিয়ের জন্যে বড্ডো ব্যস্ত হ'য়ে উঠলেন। ভদ্রার মা'র আর পাত্রই পছন্দ হয় না। পাত্র যদি বা পছন্দ হয় তো তা'র খাঁই মিটানো অসম্ভব হয়ে পড়ে। মেয়ের রূপ কেউ চায় না—সবাই চায় টাকা। ভদ্রার মা নিঃসম্বল বিধবা। টাকা দেবেন কোথা থেকে? শেষে ভদ্রার কাকা এক রকম জোর ক'রেই ৪০৲ টাকা মাইনের এক কেরাণীর সঙ্গে তার বিয়ে দিলেন। পাত্রটি বয়সেও ভদ্রার চেয়ে অনেক বড়। তাঁর দুই ভাই টি, বি-তে মারা গিয়েছিল বলে ভদ্রলোক অনেক বয়স পর্য্যন্ত বিয়েই করেন নি। যা হ'ক্, যার কপালে যা লেখা থাকে কেউ তা খণ্ডন করতে পারে না!

বিয়ের বছর চারেক পরেই ভদ্রার স্বামী রমেশবাবুর পক্ষাঘাত হ'ল। বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত পরিবারে লোকের কতই বা সঞ্চয় থাকে—বিশেষ করে একটি কেরাণীর পক্ষে কতই বা সঞ্চয় করা সম্ভব? ক্রমে তাদের যা কিছু পুঁজিপাটা ছিল সব নিঃশেষ হ'য়ে গেল। ভদ্রার যে দু' একখানা গয়না ছিল তাও গেল। সংসার একেবারে অচল। বাড়ীতে অসুস্থ স্বামী ও একটি শিশু পুত্র। ভদ্রা এমন কিছু লেখাপড়া শেখে নি যে সে চাকরী ক'রে সংসার চালাতে পারে। জানই ত সে খুব বুদ্ধিমতী ছিল। আর কোনও উপায় না দেখে সে তার এক মামাতো ভাই-এর সাহায্যে কোনও রকমে একটা সিনেমায় ঢুকল। প্রথমটা ওর স্বামী ও অন্যান্য আত্মীয় স্বজন খুবই আপত্তি ক'রেছিলেন। কিন্তু শেষে আর কোনও উপায় নেই দেখে রমেশবাবু মত দিয়েছিলেন। তা না হ'লে সমস্ত পরিবারকেই অনাহারে মরতে হত। তার বছর দুই পরে রমেশবাবু মারা গেলেন। শুনেছি ভদ্রা যেমন রোজগার ক'রে সংসার চালিয়েছে তেম্‌নি স্বামীরও সেবা করেছে। ওকে যখন সুটিং-এ বেরুতে হ'ত তখন ওর মা রমেশ বাবুকে ও ছেলেটিকে দেখাশুনা করতেন। ভদ্রার মা'ও গত বছর মারা গিয়েছেন। একটি ছেলে ছাড়া ওর আর সংসারে কেউ নেই এখন। ভদ্রা কাকীমারও সর্ব্বদা খুব খবরাখবর করত—তাঁকে ক'লকাতায় তার বাড়ীতে নিয়ে রাখতেও চেয়েছিল নাকি। কিন্তু তিনি কিছুতেই যেতে রাজী হন্‌নি। শেষে তাঁকে দেখাশুনা করবার জন্যে একটি মাইনে করা মেয়ে মানুষও রেখে দিয়েছিল। কাকীমার বড়ো সাধ ছিল তোমার সঙ্গে ভদ্রার বিয়ে দেন।"

দীপক শুনে কিছু বলল না। নিজের অজ্ঞাতেই শুধু তার একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস পড়ল। ক'দিন গ্রামে থেকে দীপক বল্ল—"সুবল, কাঁহাতক আর এখানে ব'সে ব'সে তোমার অন্ন ধ্বংস করা যায়? এ রকমভাবে ব'সে থাক্‌লে ত চল্‌বে না। একটা চাক্‌রী বাক্‌রীর চেষ্টাও ত করতে হবে। আমার জমিজায়গা যা ছিল তাও তো বে-দখল হতে বসেছে। তাই ভাবছি ক'লকাতায় গিয়ে যা হক্ একটা চাক্‌রী জোগার করবার চেষ্টা করা যাক্। জানই ত—আমি দাগী আসামী। আমার পক্ষে কোনও কাজ জোটানও সহজ নয়। দেখলে ত! তোমাদের স্কুলে একটা কাজ খালি থাকা সত্বেও আমায় নিতে সাহস পেলেন না, পাছে সরকারী সাহায্য পাওয়া নিয়ে কিছু গোলমাল হয়। টাকা থাকলে আমি নিজেই গ্রামে একটা স্কুল খুলতাম কিংবা একটা কিছু ব্যবসা করবার চেষ্টা করতাম। আমার অবিশ্যি ব্যবসাবুদ্ধি আছে কিনা ঘোর সন্দেহ। যাক্, আজ আমার বন্ধু ও সহপাঠী তপন মুখোপাধ্যায়ের চিঠি পেলাম। সে অনেক ক'রে লিখেছে ক'লকাতায় তার বাড়ীতে উঠতে এবং যতদিন ইচ্ছে থাকতে।" তারপর একটু চুপ করে থেকে দীপক আবার বল্ল—"তপন আমাদের সঙ্গে পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট ক্লাসে পড়ত। সে ছিল বড় লোক—জমিদারের ছেলে। যদিও স্বদেশীর দিকে তার খুবই ঝোঁক ছিল—আমাদের কাজের প্রতি তার যথেষ্ট সহানুভূতিও ছিল—তবু সে প্রকাশ্যে আমাদের সঙ্গে যোগ দেয় নি। মাঝে মাঝে দরকার হ'লে আমাদের টাকা-কড়ি দিয়ে সে সাহায্য করত।"

দিন দুই পরে দীপক কলকাতায় গেল। অনেকদিন পরে তপন তাকে পেয়ে খুবই খুশী হ'লো। বছর দুই হ'লো তার পত্নীবিয়োগ হ'য়েছে। তার শুধু বছর দশেকের একটি ছেলে আছে। তার বিধবা মা ই তার সংসার দেখাশুনা করেন। তপনের মা দীপককে ছেলের মতই আদর যত্ন করতে লাগলেন। তাঁকে দেখে দীপকের নিজের মায়ের কথাই মনে হ'ত—মনে হ'ত তার মাও ছিলেন এম্‌নি স্নেহময়ী। একদিন কথায় কথায় তপন বল্ল—"সমরেশ চৌধুরীকে তোমার মনে আছে? সেদিন তার সঙ্গে হঠাৎ সিনেমায় দেখা হ'ল। তার এই স্ত্রীকে আমার বেশ ভাল লাগল কিন্তু। ভদ্রমহিলা নাকি বিয়ের আগে কোনও স্কুলের মিষ্ট্রেস্ ছিলেন। সমরেশ তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিতে তিনি আমায় অনেক করে বল্লেন একদিন তাঁদের বাড়ীতে যেতে। আমার অবিশ্যি এখনও যাওয়া হ'য়ে ওঠেনি।"

দীপক চুপ করে শুনে গেল—কোনও কথা জিজ্ঞেস করল না। তপন বল্ল—"জানই ত সমরেশের সঙ্গে আমাদের ক্লাশের সেই উজ্জ্বলা মিত্রের ভাব ছিল। পরে ওদের বিয়েও হয়েছিল। সমরেশের বাবার এবিয়েতে খুবই আপত্তি ছিল। অসবর্ণ বিয়ে। তার জন্যে যত না হক্ উজ্জ্বলাকেই তাঁর পছন্দ ছিল না। বিয়ের পর সমরেশ ও উজ্জ্বলা দু'জনে একসঙ্গে বিলেত গিয়েছিল। তারপর বছর পাঁচেক আগে একদিন কাগজে পড়লাম ওদের বিবাহবিচ্ছেদের মামলার কথা। উজ্জ্বলাই তার স্বামীর বিরুদ্ধে কয়েকটি অভিযোগ এনে মামলা করেছিল। সমরেশ নিজেকে ডিফেণ্ড ক'রল না। বিবাহ-বিচ্ছেদ হ'য়ে গেল। ওদের একটি ছেলেও আছে। কিছুদিন পরে শুন্‌লাম উজ্জ্বলা সমরেশের এক বাল্যবন্ধু এক মস্ত বড় কলিয়ারীর মালিক—সুধীর দত্তকে বিয়ে করেছে। তুমি ত উজ্জ্বলাকে জান্‌তে। সে যেন রবীন্দ্রনাথ কল্পিত উর্ব্বশী—"নহ মাতা, নহ কন্যা, নহ বধূ"। একেবারে ultra-modern যাকে বলে। সেদিন দেখলাম থ্রি হাণ্ড্রেড ক্লাবে একজন মিলিটারী অফিসারের সঙ্গে বসে খুব ড্রিংক করছে।"

দীপক চুপ করে শুনে গেল—ভালমন্দ কোন কথাই বল্‌ল না। শুধু তার মনে হল একদিন সে এই উজ্জ্বলাকে নিয়ে একটি সুখের সংসার পাতবে বলে আকাশকুসুম রচনা করেছিল—তাকে তার জীবনসঙ্গিনী করবার স্বপ্ন দেখেছিল। তার সেই স্বপ্ন যখন ভেঙে গেল] তখনও সে সুভদ্রাকে বিয়ে করতে চায়নি। উজ্জ্বলার পাশে সুভদ্রাকে সেদিন তার বড়ই ম্লান বলে মনে হয়েছিল। উজ্জ্বলাই সেদিন তার কাছে নারী-চরিত্রের আদর্শ ছিল যেহেতু সে সুন্দরী, শিক্ষিতা ও আধুনিকা। আজ তার মনে হ'লো—"All that glitters is not gold"। তবে কি মানুষ তার আদর্শকেও তার নিজের মন দিয়েই গড়ে নেয়?

কয়েকদিন কলকাতায় থেকে দীপক কাজের জন্যে বড়ো ব্যস্ত হয়ে উঠল। কতদিন আর এরকম ভাবে কাটান যায়? সে শুনেছিল তপনদের জমিদারীর অবস্থাও এখন তেমন ভাল নয়। সে কারুর গলগ্রহ হয়ে থাকতে চায় না। সে স্থির করল যেমন তেমন একটি চাক্‌রী পেলেই সে একটা মেসে উঠে যাবে। একদিন খবরের কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দেখল, সুমিত্রাদেবী বলে কে একজন তাঁর একটি দশ বছরের ছেলের জন্যে একজন উপযুক্ত গৃহশিক্ষক খুঁজছেন। দীপক ঐ কাজের জন্যে তাড়াতাড়ি একখানা দরখাস্ত ছেড়ে দিল এবং সুমিত্রাদেবীর

সঙ্গে সাক্ষাৎ প্রার্থনাও করল। যথাসময়ে তার দরখাস্তখানির উত্তরও এল। সুমিত্রাদেবী তাঁর বাড়ীতে তাঁর সঙ্গে তাকে দেখা করতে লিখেছেন একটি নির্দ্দিষ্ট দিনে সন্ধ্যেবেলায়। একদিন সন্ধ্যেবেলা কলকাতার একটি রাস্তায় দীপক স্বল্পালোকে একটি বাড়ীর নম্বর খুঁজছিল। রাস্তা দিয়ে একটি যুবককে যেতে দেখে জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা বলতে পারেন ৬৭-বি নম্বরের বাড়ীটা কোথায়?"

"এই গলির মধ্যে ডানহাতি তৃতীয় বাড়ীটা।"

"ধন্যবাদ" বলেই দীপক এগিয়ে গেল। নির্দ্দিষ্ট বাড়ীটির দরজার কড়া নাড়তেই একটি পশ্চিমা দরোয়ান গোছের লোক এসে দরজা খুলে দিল। লোকটি দীপকের আপাদমস্তক দেখতে লাগল। দীপক জিজ্ঞেস করল—"এটা কি সুমিত্রাদেবীর বাড়ী?"

"হাঁ। আপনি কাকে মাঙসেন?"

"সুমিত্রাদেবী বাড়ীতে আছেন?"

"হাঁ। আপনার কি নাম আছে? হামি কাগজ পেন্সিল লিয়ে আস্‌ছি। আপনি আপনার নামটা একটু লিখিয়ে দিবেন।" দীপক কাগজে তার নাম লিখে দিল। খানিক পরে লোকটি ফিরে এসে বলল—"আসুন। মাইজী উপরে বসতে বলিয়েছেন।" বলে তাকে দ্বিতলের একটি কক্ষে নিয়ে গিয়ে বাতি জ্বালিয়ে বসতে বলে চলে গেল। একটু পরেই একটি স্ত্রীলোক এসে বলল, "মা সন্ধ্যে নিয়ে আসছেন। আপনাকে একটু বসতে বললেন।"

দীপক বসে বসে ঘরটির চারদিক দেখতে লাগল। বেশ সুসজ্জিত ঘরটি—আধুনিক রুচিতে সাজান। দেখলেই গৃহকর্ত্রীর সুরুচির পরিচয় পাওয়া যায়। খানিকক্ষণ পরে একটি মহিলা এসে নমস্কার ক'রে বললেন—"আপনাকে একটু বসিয়ে রাখতে হল। কিছু মনে করবেন না।"

দীপক অনুমানে বুঝল ইনিই গৃহকর্ত্রী সুমিত্রা দেবী। ভদ্রমহিলা বিধবা—পরণে একখানি সাদা থান ও একটি সাদা ব্লাউজ। বয়স ত্রিশের কিছু কমই হবে ব'লে মনে হয়। বেশ সুশ্রী চেহারা—মুখের মধ্যে এমন একটি ভাব আছে যে, দেখলেই ভালো লাগে। দীপক প্রতিনমস্কারে কোনও ভূমিকা না ক'রেই ব'লল—"আমার নাম দীপক বসু। আপনি আমাকে আপনার সঙ্গে দেখা ক'র্‌তে লিখেছিলেন। আপনি কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন, আপনি আপনার ছেলের জন্যে একটি গৃহ-শিক্ষক চান ব'লে, আমি ঐ কাজের একজন প্রার্থী। আমাকে যদি এই কাজের যোগ্য ব'লে মনে করেন ত আমি এই কাজ ক'র্‌তে পারি। সম্প্রতি আমার একটি কাজের বিশেষ দরকার হ'য়ে প'ড়েছে। আমার আগেকার ইতিহাসটাও আপনাকে জানান উচিত। সব জেনেই যদি আমায় রাখা সমীচীন মনে করেন, তবেই রাখ্‌বেন। ১৬ বছর আগে রাজদ্রোহ অপরাধে আমার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হ'য়েছিল আমরা একদল একটা বোমা তৈরীর মামলায় ধরা প'ড়েছিলাম। সম্প্রতি জেল থেকে ছাড়া পেয়েছি।" দীপক আপন মনেই ব'লে চ'লছিল—সুমিত্রা দেবীর মুখের দিকে চাইবার তার অবসর ছিল না। চাইলেই দেখতে পেত, তিনি যেন কথাটা শুনে চমকে উঠলেন। দীপককে তার কথা শেষ ক'র্‌তে না দিয়েই তিনি ব'ল্‌লেন—"আচ্ছা একটা কথা জিজ্ঞেস ক'র্‌ছি। আপনি কিছু মনে ক'র্‌বেন না। আপনি কি ২৪ পরগণার বিলাসপুর গ্রামের ৺অলক বসুর ছেলে? রায় বাহাদুর অধরচন্দ্র ঘোষের ভাগ্নে?"

"হাঁ। আপনি কি ক'রে জান্‌লেন? আপনি আমার বাবাকে চিন্‌তেন নাকি?"

মহিলাটি তখন হেসে ব'ল্‌লেন—"আমায় তুমি চিন্‌তে পারছ না, দীপু দা? আমি ভদ্রা—তোমার সইমার মেয়ে।" বলেই সে ভূমিষ্ঠ হ'য়ে দীপককে প্রণাম ক'র্‌তে গেল।

"আরে, আরে কর কি? তুমি ভদ্রা? তোমার চেহারা কত বদ্‌লে গিয়েছে! চিন্‌বারই জো নেই।"

"চেহারা বদ্‌লাবে না? বুড়ো হ'তে চ'ল্‌লাম! তোমার সঙ্গে কত কাল পরে দেখা বল তো? এর মধ্যে কত ঝড়ঝাপ্‌টা মাথার উপর দিয়ে গেল" ব'লে সুভদ্রা একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেল্‌ল।

খানিকক্ষণ কথাবার্ত্তা ব'লবার পরে সুভদ্রা ব'লল—"দীপুদা, তুমি একটু বস। আমি একটু আস্‌ছি। আজ কিন্তু তোমায় না খাইয়ে ছাড়ছি নে। কতদিন পরে দেখা। আজ সইমা বেঁচে থাক্‌লে তাঁর কত আনন্দ হ'ত, এতদিন পরে তোমায় পেয়ে। তোমায় দেখে অবধি আমার খালি সেই কথাই মনে হচ্ছে।" ব'লে সুভদ্রা চলে গেল। একটু পরেই সে বছর দশেকের একটি প্রিয়দর্শন বালককে নিয়ে ঘরে ঢুক্‌ল—ছেলেকে ব'ল্‌লো—"আশীষ, এঁকে প্রণাম কর। ইনি তোমার মামা হন্‌।"

ছেলেটি তার মা'র কথামত প্রণাম ক'র্‌তেই দীপক তার মাথায় হাত দিয়ে আশীর্ব্বাদ ক'রে ব'ল্‌ল—"এইটিই বুঝি তোমার ছেলে, ভদ্রা?"

"বাঃ! খাসা ছেলেটি ত!—খোকা তোমার নাম কি? কি পড়?"

"আশীষকুমার বসু। আমি এখনও কোনও স্কুলে ভর্ত্তি হই নি—বাড়ীতেই মাষ্টারের কাছে পড়ি।"

সুভদ্রা ছেলেকে ব'ল্‌ল—"আশীষ তুমি এবার প'ড়তে যাও।" আশীষ চ'লে যাবার পরে ব'ল্‌ল—"তারপর, দীপুদা, তোমার সব খবর এখন বল।—আমার কি ভাগ্যি! এতকাল পরে এইরকম ভাবে দেখা পেলাম।"

দীপক ব'ল্‌ল—"আমার আর কি খবর থাকতে পারে বল? এতকাল ত আমার জেলেই কাট্‌ল। জেলের সেই বন্দী জীবনে একরকম অভ্যস্ত হ'য়ে গিয়েছিলাম।—জেলে বসেই শুনলাম মা'র মৃত্যু-সংবাদ। আমি তাঁর একমাত্র সন্তান। তুমি ত জান আমায় ছোটটি নিয়েই তিনি বিধবা হ'য়েছিলেন। কত কষ্ট ক'রে ভাইয়ের বাড়ীতে থেকে আমায় কলেজে পড়াতে চেয়েছিলেন। তাঁর বড় আশা ছিল—আমি পাশ ক'রে চাক্‌রী বাক্‌রী ক'র্‌লে তাঁর দুঃখ ঘুচবে। কিন্তু তাঁর দুঃখ ঘোচান ত দূরে থাক্ আমি তাঁকে আরও দুঃখ দিলাম। আমার গর্ভধারিণী মা—যিনি তাঁর বুকের রক্ত দিয়ে আমায় বড় ক'রেছিলেন—তাঁর চেয়েও সেদিন বড়ো ব'লে মনে হ'য়েছিল দেশকে। তাই মা'র অশ্রুজল, তাঁর কাতর মিনতি—আমায় টলাতে পারে নি আমার কঠিন সঙ্কল্প থেকে। মা'র ব্যথা আমি যে বুঝি নি তা নয়—কিন্তু তা'র চেয়েও ঢের বেশী বড় ব'লে মনে হ'য়েছিল দেশের দুঃখটাই।—মামা ছিলেন রায় বাহাদুর খেতাব-ধারী সরকারী বড় চাকুরে। পাছে তাঁর বিপ্লবী রাজদ্রোহী ভাগ্নের জন্যে গভর্ণমেণ্টের কুনজরে পড়েন, এজন্যে তাঁর ভাবনার অন্ত ছিল না। শেষে তিনি স্পষ্টই মাকে ব'লে দিলেন ছেলের সঙ্গে সম্পর্ক রাখলে তাঁর বাড়ীতে তাঁর স্থান হবে না। শুনেছি আমি জেলে যাবার পর মা আমাদের দেশের বাড়ীতে গিয়েই ছিলেন। কত কষ্ট পেয়েই হয় ত তিনি মারা গিয়েছেন!"

"হ্যাঁ, তুমি জেলে যাবার পরে কাকীমা গ্রামের বাড়ীতে গিয়েই উঠেছিলেন।"

"শুনেছি, তুমি নাকি সর্ব্বদাই তাঁর খবরাখবর নিতে। তোমার ঋণ আমি কোনদিন শুধ্‌তে পারব না, ভদ্রা।"

"ছি! ও কথা ব'লে আর আমায় লজ্জা দিও না, দীপুদা। আমি আর কাকীমাকে কি এমন দেখাশুনা ক'র্‌তে পেরেছি? আমার নিজের মাথার উপর দিয়েও অনেক ঝড় ব'য়ে গিয়েছে।" ব'লে সুভদ্রা একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেল্‌ল। তারপর আবার ব'ল্‌তে লাগ্‌ল—"জানই ত আমার মায়ের অবস্থাও কতকটা সইমার মতই ছিল। মাকে তার দেওরের বাড়ীতে একটি আই-বুড় মেয়ে নিয়ে থাক্‌তে হ'ত। এ ধারে কাকা তাঁর গলা কাঁটা নামাতে পার্‌লেই বাঁচেন! তিনি একরকম জোর ক'রেই আমার বিয়ে দিলেন একজনের সঙ্গে। আমার স্বামী মানুষটি যে নেহাৎ মন্দ ছিলেন তা নয়—যদিও তাঁর একটু সন্দেহবাই ছিল। তাঁর বড় দুই ভাই টি-বিতে মারা যান ব'লে অনেক দিন পর্য্যন্ত তিনি বিয়েই করেন নি। বিয়ের পরে বছর চারেক আমাদের এক-রকম কেটেছিল—সুখেদুঃখে। একটি মেয়ে ও একটি ছেলেও হল। মেয়েটি বছর খানেকের হ'য়ে মারা গেল। তারপর ছেলেটি যখন মাস ছয়েকের তখন আমার স্বামীর পক্ষাঘাত হ'ল। আমার মাথার উপর যেন আকাশ ভেঙে প'ড়্‌ল। ঘরে অসুস্থ স্বামী ও একটি শিশু। রোজগার ক'রবার কেউ নেই। যা কিছু পুঁজিপাটা ছিল তা দু'দিনেই নিঃশেষ হ'য়ে গেল। কেরাণীর আর কতই সঞ্চয় থাক্‌তে পারে বল? লেখাপড়াও এমন শিখি নে যে চাক্‌রী ক'রে সংসার চালাতে পারি। দাসীবৃত্তি করা ছাড়া আর উপায় দেখ্‌লাম না। কিন্তু তাতেও ত সংসার চলে না। অসুস্থ স্বামীর চিকিৎসাই বা করাই কি ক'রে? টাকার ভাবনায় আমি যেন পাগল হ'য়ে গেলাম। শেষে অন্ধকারে হঠাৎ যেন একটা পথ দেখ্‌তে পেলাম। তুমি ত জান গান বাজনার দিকে আমার ছোটবেলা থেকেই একটু ঝোঁক ছিল। যদিও কেউ কোনদিন শেখায়নি তবু একটু আধটু আবৃত্তি ও অভিনয়ও করতে পারতাম। শুনেছিলাম আমার এক মামাতো ভাই, সৌরীনদা সিনেমায় নেমে বেশ কিছু পয়সা করেছেন। নিরুপায় হয়ে তাঁরই শরণাপন্ন হলাম। দু'একজন ফিল্ম ডিরেক্টারের সঙ্গে সৌরীনদার বিশেষ পরিচয় ছিল। একটা কোম্পানীর সঙ্গে চুক্তিপত্রও সই করলাম, অবশ্য কাউকে না জানিয়েই। প্রথমে আমার স্বামী ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজনেরা ঘোরতর আপত্তি করেছিলেন। আমি কারুর কথা শুনলাম না। স্বামী ও ছেলে না খেয়ে মরে যাবে এত আর চোখে দেখা যায় না। আমার মতে মেয়েমানুষ তার নিজের মান রাখতে জানলে জগতে কোনও পুরুষেরই সাধ্য নেই তাকে অসম্মান করতে পারে। দেশের বাড়ী থেকে মাকে আনিয়ে নিলাম। আমি বাইরে বেরুলে বাড়ীতে অসুস্থ স্বামী ও ছেলেটিকে দেখে কে? বছর দুই পরে আমার স্বামী মারা গেলেন। আমি সেই থেকে এই কাজই করছি। ভগবানের কৃপায় আজ আমার অর্থের কোনও অভাব নেই। যাক্! এতক্ষণ নিজের কথাই ব'লে গেলাম। তোমার কথা ত কিছু শোনা হ'ল না। তুমি কবে ছাড়া পেলে? এখন কি করছ?"

"কিছুই করছি নে। সম্প্রতি একেবারেই বেকার। দেখছ

ত চাকৃরী খুজে বেড়াচ্ছি। তোমার কাছে কাজের প্রার্থী হয়েই আজ এসেছিলাম। জেল থেকে বেড়িয়ে দেশের বাড়ীতে ওঠাই ঠিক করলাম। সেখানে গিয়ে দেখলাম আমার সামান্ত যা কিছু বিষয় সম্পত্তি ছিল তাও বেদখল হ'তে বসেছে। আমাদের বাড়ীতে আমার জ্ঞাতি ভাই প্রভাত দাদা সপরিবারে বাস করছেন। আমি গ্রামে আমার বাল্যবন্ধু সুবল চাটুয্যের বাড়ীতেই ক'দিন থাকলাম। তারা অবিশ্যি আমার খুবই আদর যত্ন করেছিল। তারপর ক'লকাতায় আমার একজন বন্ধু ও সহপাঠীকে আমায় একটি কাজ খুঁজে দেবার জন্তে লিখলাম। তিনি আমায় ক'লকাতায় চলে আস্তে লিখলেন। আমি সম্প্রতি তাঁর বাড়ীতেই আছি। ইচ্ছে—আমি একটা চাকৃরী বাকৃরী পেলে একটা মেস্-টেস্ ঠিক ক'রে নিয়ে সেখানে উঠে যাব। কতদিন আর পরের বোঝা হয়ে থাকা যায়?

ভদ্রা চুপ করে সব শুন্‌ল—পরে বল্‌ল—"সত্যি, দীপুদা, তুমি আমার ছেলের ভার নেবে? তা' হলে ত আমি বাঁচি। তোমার মত মাষ্টার আমি কোথায় পাব? কতদিন তোমার কথা ভেবেছি। ভেবেছি তুমি ফিরে এলে একদিন আমার আশীষকে তোমার হাতেই সপে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত ও ভারমুক্ত হ'ব। আমি শুধু ওকে লেখাপড়া শেখাতে চাই নে—সত্যিকারের মানুষ ক'রতে চাই। তুমিই তাকে সত্যিকারের মানুষ ক'রে গড়ে তুল্‌তে পারবে। অনেক দিন ত টাকা রোজগার করলাম। ভোগে আমার স্পৃহা নেই। সংসারে আমার একটিমাত্র বন্ধন—আমার ছেলে। তাকে ও আমার সমস্ত বিষয় সম্পত্তি তোমার হাতে দিয়ে আমি কোনও আশ্রমে গিয়ে থাকব। আমি জানি, তুমি আমার আশীষকে আমার চেয়েও ভাল ক'রে তুল্‌তে পারবে। তোমার সঙ্গে আমার আবার যে এইরকম ক'রে দেখা হ'ল এর মধ্যেও ভগবানের কোনও শুভ ইচ্ছা আছে—আজ আমি যেন স্পষ্ট বুঝতে পারছি।—তুমি কি করবে কিছু ঠিক ক'রেছ কি?"

"না, কিছুই ত ঠিক করিনি এখনও। যা করতে যাবো তাতেই ত টাকার দরকার। জেল থেকে ত কপর্দ্দকশূণ্য হ'য়ে বেরিয়েছি। ষোল বছর আগে যখন জেলে ঢুকেছিলাম তখন আমি ২১ বছরের তরুণ যুবক, আর আজ আমি ৩৭ বছরের প্রৌঢ়। তখনকার সেই আশা, উৎসাহ ও উদ্যমের এখন আর কিছুই অবশিষ্ট আছে বলে ত মনে হয় না। এখন নতুন করে জীবনকে গ'ড়ে তোলাও কঠিন। যা হক্, কিছু টাকা থাকলে আমি গ্রামে গিয়েই থাকতাম। এখন আমার মনে হয় গ্রামে আমাদের অনেক কাজ করবার আছে। আমরা যারা নিজেদের শিক্ষিত বলে মনে করি তারা সকলেই যদি গ্রাম ছেড়ে শহরবাসী হই তা হলে আমাদের দেশের গ্রামগুলির অবস্থা কোনদিনই ভাল হবে না। তাই ভাবছি হাতে কিছু টাকা পেলে আমি আমাদের গ্রামে গিয়ে একটা স্কুল খুলব। দেশে সত্যিকারের মানুষ গড়ে তোলা নিতান্তই দরকার হ'য়ে প'ড়েছে। জেলে থাকতে এ বিষয়ে আমি যথেষ্ট ভেবেছিও। এখন মনে হচ্ছে বিপ্লবী দীপকের সত্যিই মৃত্যু হয়েছে। আমার মনে হয় সেদিন আমি যদি বিপ্লবের পথ বেছে না নিয়ে দেশের ছেলেদের মানুষ ক'রবার ভার নিতাম তাহলে হয় ত প্রকৃত দেশের কাজই ক'র্তাম; দেশের স্বাধীনতার পথটিও তা'তে ক'রে উন্মুক্ত হত। আমার মাও ত শেষে তাই চেয়েছিলেন। এখন বুঝতে পারছি মহাত্মাজী কেন ব'লেছেন—চরকাই আমাদের স্বরাজ আনবে।"

ব'লে দীপক একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফে'ল্‌ল। সেদিন খাওয়া দাওয়ার পর দীপক যখন যাবার উদ্যোগ ক'র্‌ছে, সুভদ্রা ব'ল্‌ল—"টাকার জন্তে তুমি একটুও ভেবো না, দীপুদা। তোমার পথ তুমি বেছে নাও। তোমার যা টাকার দরকার আমি দেব। তুমি আমার টাকা নিতে কিছুমাত্র সংকোচ ক'রো না। একজন হিন্দু বিধবার টাকার এমনই বা কি দরকার? আমার মনে হয় যে টাকা দেশের ও দশের কাজে লাগল না তার কোনও সার্থকতা নেই। ছোট বেলা থেকে আমি ত তোমার কাছ থেকে এই শিক্ষাই পেয়েছি। আমি তো তোমারই হাতে গড়া, দীপুদা। তুমি গ্রহণ ক'র্‌লেই আমার টাকা সার্থক হবে। লোকে পাঁচ কথা বলবে জানি। কিন্তু সংসারে সব সময় লোকের কথা শুনলে চলে না।"

সে রাত্রে খাওয়া দাওয়ার পরে দীপক যখন বাড়ী ফিরছিল তখন তার কেবলই মনে হতে লাগল এতদিনে সে যেন তার জীবনের সত্যিকারের সার্থকতার পথটি খুঁজে পেয়েছে—এতদিনে জীবনের লক্ষ্য সে স্থির ক'র্‌তে পেরেছে। জীবনের এতগুলি বছর সে যেন শুধু অন্ধকারেই পথ হাতড়ে বেড়িয়েছে—কায়া ছেড়ে শুধু ছায়ার পেছনেই ছুটে এতদিন সে যা কিছু আদর্শ বলে আঁকড়ে ধরতে চেয়েছিল সবই আজ মিথ্যে ব'লে মনে হচ্ছে। একদিন যাকে সে অশিক্ষিতা গ্রামের মেয়ে ব'লে উপেক্ষা করেছিল সেই সুভদ্রাই আজ তাকে ধ্রুব তারার মত জীবনের ঠিক পথটি দেখিয়ে দিল। সংযম ও নিষ্ঠার প্রতিমূর্ত্তি এই মেয়েটি আজ হয় ত সমাজের দশজনের চক্ষে হেয়। তবু সে সত্য স্থির দৃষ্টিতে তার জীবনের প্রকৃত পথটি বেছে নিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেনি। সত্যের এই সহজ রূপটি দেখেছে বলেই আজ সুভদ্রার কাছে মানুষের চেয়ে সমাজ বড় হ'য়ে ওঠে নি। অথচ তার দৈনন্দিন জীবনে সামাজিক নিয়মগুলি সে কী অচঞ্চল নিষ্ঠার সঙ্গেই মেনে চ'ল্‌ছে।

অনলাভিসার

শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত

দীর্ঘ দিবস ধরে
গভীর মমতা ভরে হায়
বুকে করে যা' রেখেছি, যাক্,
যা কভু চেয়েছি নাকো
পেয়েও রেখেছি নাকো তায়
পরিশেষে পেয়েছি তো থাক্।
হেলায় শ্রদ্ধার ধন
করিয়াছি অযতন কত
আজ তাই তাহারেই চাই,
যাহারে চেয়েছি আগে
সুগভীর অনুরাগে যত
আজ তত সমাদর নাই।
শেষ যবনিকাখানি
মৃত্যু যবে দিবে টানি তায়
নয়নের শেষ দৃষ্টি মুছি,—
নীরব নিথর বক্ষে
নিমীলিত চক্ষে আপনায়
নিবেদিয়া করি লব শুচি।
আকাশের গ্রহ তারা
সাক্ষী সবে রবে তারা মোর
তারা মোর জন্ম-মৃত্যু সাথী—
অতন্দ্র জাগিয়া থাকি
মোর সাথে ঢালি আঁখি লোর
সাজাইবে শিশিরের পাঁতি।
সমুদ্র তুলিয়া ঢেউ
তাহাদেরো কেউ কেউ মোরে
পিছু ডাকি দিবে হাতছানি
এ মাটির দেহ গেহ
বাঁধিয়া দুশ্ছেদ্য স্নেহ ডোরে
কাটিতে ছিঁড়িবে মর্ম্ম জানি।
তবু সে মৃত্যুর মাঝে
তোমার আহ্বান রাজে গুণী
কানে যেন বাঁশীখানি বাজে,
আমি করি অভিসার
সর্ব্বনাশা ধ্বনি তার শুনি
পতঙ্গের মত বহ্নি মাঝে।

প্রদীপ

শ্রীমমতা ঘোষ

বিদ্যুতেরে মুঠোর ভেতর পায়নি কেহ যবে
ঘরে ঘরে সন্ধ্যাবেলায় দীপ জ্বালাত সবে।
স্নিগ্ধ নরম আলোখানি
শান্তি দিত চক্ষে আনি,—
সাথী ছিল নিরালাতে মিলন মহোৎসবে।
কল টিপিলে অমনি আজ বিজলিবাতি পাই,
দিনের আলোর মত উজল হয় যে সকল ঠাঁই।
কে গো এসে এমন কালে
আস্তে প্রদীপখানি জ্বালে?
মানায় নাকো হেথায় ওরে বুঝিস্ না কি ভাই।
সহরে ও সঙ্কুচিত—নেহাত বেমানান্,
ভীরু ও-যে, নয়কো প্রখর, নয় রে দীপ্যমান।
লাজুক বড়—তাইতো জোরে
ফোটে না ও তেমন ক'রে;
জোরালো এই আলোর মাঝে তাই মেলে না স্থান।
মনে পড়ে সেদিনগুলি—সেই যে আঁধার হ'লে
খাওয়া সেরে শুতাম যখন ঠাকুরমায়ের কোলে,—
একটি প্রদীপ ঘরের কোণে
কিরণ দিত আপন মনে,
আধেক আলো অন্ধকারে যেতেম কোথায় চ'লে।
চ'লে যেতাম কল্পলোকে রূপকথারি দেশে
পক্ষীরাজের পিঠে চ'ড়ে তেপান্তরের শেষে।
দিনের বেলায় এমন ক'রে
যায় না দেখা নয়ন ভ'রে—
প্রদীপখানির স্নিগ্ধ আলোয় দাঁড়াত সব এসে।
আলো আঁধার এক হয়েছে—তফাত আজি কই?
রাতের বেলায় দীপ্তি দেখে অবাক চেয়ে রই।
তাইতো বলি প্রদীপ ওরে
এখান থেকে চলুরে স'রে—
নিলাজ সহর দিন কাটাবে শান্ত প্রদীপ বই।

নাট্যাচার্য্য অমৃতলাল বসু

শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

নাট্যাচার্য্য অমৃতলাল বসু

অমৃতলালের কথা থিয়েটারের প্রসঙ্গ হইলেই শুনিতাম। এ প্রসঙ্গ ভালও লাগিত, আর আমাদের ছাত্রাবস্থায় প্রায় বর্দ্ধিষ্ণু গ্রামের ছেলেরাই সখের থিয়েটারে সংশ্লিষ্ট থাকিয়া এ বিষয়ে আলাপও করিতেন। আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি তখন ষ্টার থিয়েটারে 'চন্দ্রশেখর' খুব সাফল্য গৌরবে অভিনীত হইতেছিল। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে অমৃতলাল তখন ষ্টারের ম্যানেজার ও অন্যতম সত্বাধিকারী। ষ্টার সে সময়ে হাতীবাগানে ৯১।১।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে।* আজও অবশ্য ষ্টার সেই স্থানেই রহিয়াছে। অমৃতলালের সে সময়ে চল্লিশ বৎসর বয়স হইয়াছে।

১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাস, আমি তখন জুবিলি স্কুলে দ্বিতীয় শ্রেণীতে (Calss IX)এ পড়িতাম। গ্রীষ্মের ছুটির তখনও বিলম্ব ছিল। এমন সময় ঢাকায় ষ্টার থিয়েটার সম্পর্কে নানারূপ আলাপ আলোচনা চলিতে লাগিল। নবাব বাহাদুর স্যার আবদুল গণি সাহেবের বাড়ীর কোন একটি ছেলের অন্নপ্রাসন কি অন্য কি ব্যাপার উপলক্ষ্যে ষ্টার থিয়েটার নবাব বাড়ীতে ছয় রাত্রি অভিনয় করিতে আসিয়াছিল। এই অভিনয় দেখিতে আমার বড়ই ইচ্ছা হয়। আমাদের জনৈক প্রতিবেশী আত্মীয় প্রসন্ন সেন নবাব বাড়ীতে কাজ করিতেন। ২।৩ দিন পরে তাহার মারফত একখানি টিকিট যোগাড় করিয়া সন্ধ্যার সময় নবাব বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম। কি নূতন জিনিষ দেখিলাম তাহার বর্ণনা এখানে আর করিব না, তবে 'একাকার' প্রহসনটির অভিনয় শেষ হওয়ার পরেই অমৃতবাবু মঞ্চের উপরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। স্পষ্ট এবং গম্ভীর স্বরে নবাব সাহেবকে ধন্যবাদ দিয়া প্রায় দশ পনেরো মিনিট বক্তৃতা করেন। তিনি তখন কোট প্যাণ্ট পরিহিত ছিলেন, আর অভিভাষণ দেন ইংরাজীতে। তাঁহার কণ্ঠে ইংরাজী বক্তৃতা শুনিতে শুনিতে এই প্রথম অমৃতলালকে দেখিলাম। 'একাকারের' পরে সে রাত্রে 'রামাশ্বমেধ'ও হইয়াছিল।

নবাব বাড়ীতে ছয় রাত্রি অভিনয়ের পরে ষ্টার কোম্পানী টিকেট বিক্রয় করিয়া আবার স্থানীয় ক্রাউন থিয়েটারে ছয় রাত্রি অভিনয়ের বন্দোবস্ত করে, সেখানেও বাসার কয়েকজনের সঙ্গে 'নরমেধ যজ্ঞ' ও 'কালাপাণি' দেখিলাম। উভয় স্থানেই 'চন্দ্রশেখর' অভিনীত হইয়াছিল, আর উহার প্রশংসায় ঢাকা সহর সর্ব্বত্র মুখরিত হয়।

ক্রাউন থিয়েটারে অভিনয়ের সময়ে কৌতূহলবশতঃ আমি একদিন বৈকালে থিয়েটারের বহিঃপ্রাঙ্গনে গিয়াছিলাম। ক্রাউন থিয়েটার তখন ঢাকা কলেজের পশ্চিমদিকে ব্রাহ্মসমাজের উত্তরে অবস্থিত ছিল। সেখানে দেখিলাম বাহিরে তিনি আলাপ করিতেছেন, আর সকলে হর্ষোৎফুল্ল হইয়া তাহা শুনিতেছে।

---

* ১৮৮৩—১৮৮৭ পর্য্যন্ত ষ্টার ছিল বিডন ১৮৮৮ হইতে বর্ত্তমান বাড়ীতে আছে।

একজন ভদ্রলোকের রংটা বড় কালো ছিল। অমৃত বাবু কুশলাদি জিজ্ঞাসার পর বেশ রসিকতার সহিতই বলেন, "মশায়ের নামটি কি?"

—"আজ্ঞে দুর্গাচরণ মজুমদার।"

"সে কি, দুর্গাচরণ? দুর্গাচরণ না হ'য়ে কালীচরণ হ'লেই বোধ হয় মানাত।" কথাটায় যেন একটু অশিষ্টাচার ভাব দৃষ্ট হয়, কিন্তু বলিবার ভঙ্গিমাতে সকলেই সেই রসামোদ উপভোগ করিয়াছিল।

ইহার পরে ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেসের সময় একদিন ষ্টার থিয়াটারে দ্বিজেন্দ্রলালের "বিরহ" দেখিতে গিয়াছিলাম। আমি সেদিন উপরেই বসি, দেখিলাম অমৃতলাল আসিয়া কয়েকজন দর্শকের সঙ্গে আলাপ করেন। আমি বলিলাম, "চন্দ্রশেখর শীঘ্র দেখান না কেন?"

চন্দ্রশেখর সম্বন্ধে আমার একটি বন্ধু কলিকাতায় দেখিয়া আমাকে এতদ্ সম্বন্ধে লিখিয়াছিল। গঙ্গাবক্ষে চন্দ্ররশ্মি ও শৈবলিনী এবং প্রতাপের সাঁতার নাকি অপূর্ব্ব হইয়াছিল। চন্দ্রশেখর দেখিতে আমার বরাবর আগ্রহ ছিল। অমৃত বসু উত্তর করেন, "আমাদের নিজেদের মধ্যে পরামর্শ হবে। তারপরে ঠিক করব।" সামান্য আলাপেও অহঙ্কার দেখিলাম না, তবে গাম্ভীর্য্য ছিল।

এক সপ্তাহের মধ্যেই "চন্দ্রশেখর" নাটকের অভিনয় হইয়াছিল। ইহার পর ছয়বৎসর পরে ১৯১২ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা আসিয়া আইন ব্যবসায় আরম্ভ করিবার পরে অমৃত বসুর সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হই। অতঃপরে যখন আমি গিরিশচন্দ্রের জীবন চরিত লিখিতে উদ্যত হইলাম, তখন ঘনঘন যাইতাম। প্রতি বৈকালেই তিনি শ্যামবাজার এ, ভি স্কুলে আসিয়া বসিতেন। সেখানে নানা রকমের লোক আসিতেন। রঙ্গমঞ্চ সম্বন্ধে যাহা জানিবার তাহা আমি জানিয়া নিতাম। তাহার সরল অথচ পাণ্ডিত্যপূর্ণ কথা এত ভাল লাগিত যে কাছারীর পর ৩।৪ ঘণ্টা কিরূপে অতিবাহিত হইত টেরই পাইতাম না। অনেকদিনই ট্রাম পাই নাই, সেয়ারে ঘোড়ার গাড়ীতে বাসায় ফিরিতে হইয়াছে। এরূপ কথোপকথনের অনন্যসাধারণ শক্তি আমি জীবনে আর একজনের মাত্র দেখিয়াছি, তিনি আমাদের শিক্ষক পরেশনাথ ঘোষ—ভনগীড় কিন্তু তিনিও বেশীক্ষণ চালাইতে পারিতেন না। অল্পক্ষণ পরেই ক্লান্তিবোধ করিতেন। আর অমৃলালের ঘণ্টার পর ঘণ্টা এইরূপ কথা-বার্ত্তা চলিত বিনা আয়াসে—অবিরামে।

অমৃতলালের অসংখ্য বক্তৃতাও শুনিয়াছি। তিনি কথা কহিতেন, আর সমস্ত দর্শকমণ্ডলী হাসিতে হাসিতে লুটোপুটি খাইত। একদিনের কথা বলিতেছি। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে মনোমোহন থিয়েটারে গিরিশচন্দ্রের স্মৃতি-সভা হইতেছিল। বক্তা ছিলেন স্বামী অভেদানন্দ, অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্তা হেমপ্রভা মজুমদার প্রভৃতি অনেকে। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন সভাপতিত্ব করিতেছিলেন। অমৃতলাল প্রায় পোনর মিনিট বলিয়াছিলেন, এবং এই সময় মধ্যে অন্য লোকের কথা দূরে থাকুক আমি দেশবন্ধুর এত সরস ও হৃদয় ভরা উচ্চ হাসি কখনও দেখি নাই। তিনি তখন নির্ব্বাচন সংগ্রামে অবিশ্রান্ত ভাবে ব্যাপৃত থাকিতেন, সেদিন হাসিটি তাহার স্বাস্থ্যের পক্ষে কত অনুকূল ও হিতকর হইয়াছিল তাহা পার্শ্বে থাকিয়া আমিই জানিতাম।

কথাবার্ত্তায়ও তাঁহার সরসতার একটু পরিচয় দিই। একবার একটি ভদ্রলোক অনেক খুঁজিয়া খুঁজিয়া তাহার সঙ্গে দেখা করিতে উপস্থিত হন্। অমৃতবাবু তখন শ্যামবাজারে ৯।২ রামচন্দ্র মৈত্র লেনে থাকিতেন। কিন্তু ভদ্রলোকটি অনবরত ৯ মৈত্রের লেনই খুঁজিতে ছিলেন। দেখা হইবামাত্র ভদ্রলোকটি বলিলেন—"মশায় অনেক খুঁজেছি—কিন্তু ভুল ঠিকানা ব'লে বড় ঘুরতে হয়েছে।"

অমৃতবাবু—"কে আপনাকে ঐরূপ ভুল ঠিকানা দিলে?"

"আজ্ঞে আপনাদের একজন অভিনেতা।"

ওঃ অভিনেতা কিনা, তাই ঘুরেছেন! ওরা অর্দ্ধেক মুখস্থ করে, অর্দ্ধেক প্রম্‌টে বলে—তাই প্রম্‌টের টুকু আর আপনাকে বল্‌তে পারে নাই। সেই সহাস্য সরসোক্তিতে ভদ্র লোকের ভ্রম অপনোদিত হইল।

অমৃতলালের স্বাস্থ্য খুব ভাল ছিল। বেশ খাইতে পারিতেন। বৃদ্ধ বয়সে গল্প করিতে করিতে অনেকগুলি

মাছ খাইয়া ফেলিয়াছিলেন, তাই পেটের পীড়া জন্মে, সম্ভবতঃ কিছু অনিয়ম হইয়া থাকিবে, তাই বোধ হয় ঐ অসুখই কাল-অসুখে পরিণত হয়।

অমৃতলালের অভিনয় নিজে আমি অনেকবার দেখিয়াছি। তন্মধ্যে তরুবালার বেহারী খুড়ো, কালাপানির তিনকড়ি মামা, বিবাহ বিভ্রাটে মিঃ সিং, আর খাসদখলে নিতাই খুবই ভাল হইত। দ্বিজেন্দ্রলালের রাণা প্রতাপ নাটকে শক্তসিংহ এবং নৃত্য গোপাল কবিরাজের হরিশ্চন্দ্র নাটকে বিশ্বামিত্রও বেশ ভাল হইত। কিন্তু গিরিশচন্দ্রের 'বেল্লিকবাজারে' ছকড়ি সেন ও 'প্রফুল্ল নাটকে' রমেশ চরিত্রাভিনয় সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট হইয়াছিল। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে কোহিনুর থিয়েটারে যে অন্যান্য থিয়েটারের অভিনেতা অভিনেত্রীগণের সঙ্গে মিলিয়া 'বলিদান' নাটকের অভিনয় হইয়াছিল, তাহার মধ্যে করুণাময়ও নিন্দনীয় হয় নাই। সিরিয়াস্ অপেক্ষা সিরিও কমিক্ নেভ্ জাতীয় (রমেশ, রূপচাঁদ) ভূমিকায় বেশী ভাল হইত। মিনার্ভার "সধবার একাদশী"র নিমচাঁদও বেশ সরস মনে হইয়াছিল। তাহার ব্যঙ্গ ও হাস্যরস পূর্ণ অভিনয়ের গিরিশ্চন্দ্র খুব প্রশংসা করিতেন। তিনি বলিতেন—

"হাস্যরসাভিনয়ে অর্দ্ধেন্দু বাবু, বেলবাবু এবং ভুনিবাবু তিনজনই ছিলেন অদ্বিতীয়।"

তিনজনই সমসাময়িক ছিলেন এবং একসঙ্গে অভিনয় করিতেন। বস্তুতঃ শ্লেষ প্রধান চরিত্রের অভিনয়ে অমৃতলালের তুলনা ছিলনা।

গিরিশচন্দ্রকে তিনি গভীর শ্রদ্ধা করিতেন—গুরুর ন্যায় ভক্তি করিতেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে কোহিনুর থিয়েটারে তাহার রচিত যে কবিতাটি পঠিত হয়, তাহার মর্ম্ম ছিল—

"হে সাথী, গুরু, মিত্র, তুমি ত চলিয়া গিয়াছ, তোমার এই প্রিয় শিষ্যের একটু স্থান তোমার চরণে রাখিও—

"প্রিয় শিষ্য তরে স্থান রাখিও চরণে।"

উক্ত প্রশস্তিতে গিরিশ্চন্দ্রের চৈতন্যলীলা এবং রঙ্গালয়ে তাঁহার অবদান সম্বন্ধে যে কয়টি কথা বলিয়াছেন তাহা বঙ্গসাহিত্যে এবং নাট্যশালার ইতিহাসে অমর হইয়া থাকিবে—

"লিখিলা চৈতন্যলীলা, হীরক হইল শিলা
নাট্যশালা হ'ল তীর্থ ভক্তমেলা থিয়েটার
বাজে সিঙ্গা বাজে খোল, রঙ্গমঞ্চে হরিবোল
বিলাসীর নতশির আঁখিজলে ভেসে যায়
ছুটিল নামের বন্যা ধরণী হলেন ধন্যা
গণিকা গুণীর গণ্যা কেঁদে লুটে কৃষ্ণপায়।

গিরিশের এ সাধনা হীনাসনে আরাধনা
দেখেন বেদনাহারী হরি রামকৃষ্ণ চক্ষে
শ্রীগুরু দেখান ইষ্টে গুরুরূপে ধরাপৃষ্ঠে
সেই ইষ্টে দৃষ্টি-করে কবি ব্যাকুলিত চক্ষে।

অভিনয় সম্বন্ধেও অমৃতলাল গিরিশচন্দ্রের খুব প্রশংসা করিতেন। একদিন আমি জিজ্ঞাসা করি—"গিরিশ চন্দ্র আর অমৃত বাবুতে (মিত্র) অভিনয়ের কি তফাৎ ছিল?"

তিনি বলেন, "ওঃ খুব তফাৎ, গুরুশিষ্যে যে তফাৎ সেই তফাৎ

এই অভিনেতা অমৃত মিত্রও খুবই শ্রেষ্ঠ ছিলেন। জলদগম্ভীর মধুকণ্ঠে তাহার আবৃত্তি হইত অনন্য সাধারণ।

আমায় একদিন বলেন, "হেমবাবু, গিরিশবাবু কেবল আমার নাট্যকলার গুরু নন, মনুষ্যত্বেরও গুরু ছিলেন। ধর্ম্ম-সম্বন্ধেও যে আমি তার কাছে কত ঋণী তা আমি তোমাকে কি বল্‌বো? পরমহংসদেব আমাদের থিয়েটারে আস্‌বার পর থেকে ১৮৮৪-৮৫ তিনি অনবরত 'মা' 'মা' করতেন, আমরাও সবাই 'মা' 'মা' করতাম। একদিন আমি বলি 'মশায় ডাকিতো, কিন্তু শান্তি পাই না, এর চেয়ে না ডাকাই বরং ছিল ভাল। খানিকক্ষণ তিনি চুপ ক'রে রইলেন, তার কিছুক্ষণ পরে ষ্টেজের মাঝখানে একখানি সিন জোড়া ছিল, সেখানকার জায়গাটা ছিল অন্ধকার, সেইখানে আমায় ডাকলেন এবং তিনি আসনপিঁড়ি হয়ে বস্‌লেন। আমাকেও সেইরূপ সম্মুখে বসতে বললেন, পরে আমার উরুতে তাঁর দুইখানি হাত রেখে শ্যামা নামের স্তোত্র ঘন ঘন পাঠ (আবৃত্তি) করতে লাগলেন, তাঁর উদাত্ত কণ্ঠে কি মধুর-ও গম্ভীর শোনাচ্ছিল। তার

উপদেশমত আমিও তাঁর দুই উরুতে দুই হাত দিয়ে তাঁর সঙ্গে স্তব পাঠ কর্ত্তে লাগলাম, একটু পরে দেখলাম আমার গায়ে যেন কাঁটা দিয়ে উঠেছে, শরীরের মধ্য দিয়ে যেন বিদ্যুৎ খেলতে লাগল, একটা আনন্দের স্রোত বয়ে গেল, আনন্দে আমি তাঁর পা জাঁকড়িয়ে ধরে বললাম—"গুরো, আজ আমার মাকে ডাকিয়েছ, খুব ভক্তিভরে মাকে ডেকেছি, এরূপ আনন্দ, শান্তি ও উল্লাস ইতিপূর্ব্বে কখনও অনুভব করিনি। আপনিই আমার খাঁটি গুরু।"

আর একটি ঘটনা বলি—১৯০৫, দ্বিজেন্দ্রলালের "রাণাপ্রতাপ" ষ্টারে অভিনীত হয়, অমৃত মিত্র হন রাণা প্রতাপ, অমৃত বসু শক্ত সিংহ, নরীসুন্দরী মেহের, বসন্তকুমারী দৌলত। অভিনয় খুব চমৎকার হয়। অমৃতলাল গিরিশ ঘোষের রচিত 'হলদিঘাটের যুদ্ধ' কবিতাটি চারিজন ভূতের মুখ দিয়া বলাইয়া দেন। ইহাতে দ্বিজেন্দ্রলাল খুব মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া মিনার্ভা থিয়েটারে পরবর্ত্তী সপ্তাহ হইতে রাণাপ্রতাপ অভিনয়ের বন্দোবস্ত করেন। অমৃত বাবু শুনিয়া নির্ব্বিকারভাবে উত্তর দেন, "গিরিশবাবুর এই কবিতাটি দ্বিজুবাবুর এই নাটকে সংযোজিত করায় তার নাটকের মর্য্যাদা বরং বেড়েছে।"

১৯১৭ খৃষ্টাব্দে সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের বাড়ীতে কাঁটালপাড়ায় একটি বঙ্কিমসাহিত্য-সম্মিলনী হয়। তাহাতে দেশের যাবতীয় প্রধান প্রধান সাহিত্যরথী উপস্থিত ছিলেন। সাহিত্য সম্বন্ধে তখনও আমার কোন প্রবন্ধ বাহির হয় নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের উপর অগাধ শ্রদ্ধা বশতঃ সেখানে উপস্থিত ছিলাম। অমৃতলাল ও বিশিষ্ট আরও কয়েকজন সাহিত্যিক পূর্ব্বাহ্নে ৺হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের বাড়ীতে ভোজনে আপ্যায়িত হইয়াছিলেন। সম্মিলনীতে অমৃতলাল সরস ভাবে সেই কাহিনী বিবৃত করিয়া বঙ্কিমসাহিত্য সম্পর্কে থিয়েটারের যে বরাবর সহযোগিতা ছিল তাহাই প্রমাণ করেন, এবং বলেন "গিরিশবাবুই সর্ব্বপ্রথমে কপালকুণ্ডলা ও মৃণালিনী উপন্যাস নাটকে রূপান্তরিত করেন এবং মৃণালিনীর অভিনয়ে গিরিশবাবু যে অনন্যসাধারণ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন, তাহাতে অন্য দেশ হইলে এক পশুপতির ভূমিকায় অভিনয়ের জন্যই তিনি রাজসম্মানে ভূষিত হইতেন।

গিরিশচন্দ্রের প্রতি এরূপ অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা দেখিয়া অমৃতলালকে আমি আরও শ্রদ্ধা করিতে লাগিলাম। তিনিও আমাকে স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। কয়েকদিন না গেলেই বলিতেন, "হেমবাবু, এতদিন আসো নাই কেন?"

আমাকে প্রায়ই বলিতেন, মহান্ ব্যক্তির স্মৃতি রক্ষা করিতে আমি এ পর্য্যন্ত দুইজনকে দেখিয়াছি—এক নগেন্দ্রনাথ সোমকে, আর তোমাকে।

শ্রদ্ধেয় নগেন্দ্রবাবু "মধু-স্মৃতি" লিখিয়াছিলেন।

অমৃতলালকে দেখিতাম অন্যের আত্মপ্রশংসা সহ্য করিতে পারিতেন না। খুব সরস ভাষায় ব্যঙ্গচ্ছলে উত্তর দিতেন। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে ষ্টার থিয়েটারে 'গিরিশ স্মৃতিসভায়' অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি গিরিশচন্দ্রের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করেন। স্বর্গীয় হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় সভাপতিত্ব করিতেছিলেন, অমৃতলাল প্রমুখ কয়েকজন নাট্যকারও উপস্থিত ছিলেন।

একজন বক্তা বলেন, "গিরিশবাবু নাট্যকার ছিলেন, আমিও নাট্যকার, আমার বেশী বলা শোভা পায় না।"

শেষদিকে অমৃতলাল বক্তৃতার সময় বলেন, "গিরিশবাবুও নাট্যকার, আমিও নাট্যকার—যেমন হাতীরও পাঁচ পা, ব্যাঙেরও পাঁচ পা।" সকলেই ইঙ্গিতটি বুঝিলেন। উপরোক্ত নাট্যকারটিও বোধ হয় কিছু অপ্রতিভ হইলেন।

১৯২৬ ও ১৯২৮ খৃষ্টাব্দেও গিরিশ স্মৃতিসভায় প্রথমটি মিনার্ভা থিয়েটারে, দ্বিতীয়টি শিশিরকুমারের নাট্যমন্দিরে তিনি বক্তৃতা দিয়াছিলেন। ইতিমধ্যে কাঁটালপাড়ায় একটা বঙ্কিম স্মৃতিসভায় তিনি মূল সভাপতি হন, রায় সাহেব অক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত হন সাহিত্য শাখার সভাপতি। কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তি কর্ত্তৃক উত্থাপিত গোলমালে তিনি সভাপতি হিসাবে যে কঠোরভাবে শৃঙ্খলা রক্ষা করিয়াছিলেন তাহা আজিও মনে আছে। এই রকম শৃঙ্খলা রক্ষা করিতেন শ্যামবাজার এ, ভি স্কুলে—এইরূপ করিতেন থিয়েটারে। ষ্টার থিয়েটারে এমনই কড়া শাসন ছিল, রিহার্সেলে ঠিক সময়ে সকলকে আসিতে হইত। বাহিরেও কেহ অভদ্রাচরণ করিতে পারিত না। একবার জনৈক দর্শক একটী অভিনেত্রীর প্রতি লক্ষ্য করিয়া কি একটা কথা অসংলগ্ন ভাষায় ব্যক্ত করিয়া ফেলিয়াছিল। কিছুক্ষণ

পরে বাহিরে দর্শকটিকে ডাকাইয়া পয়সা ফেরত দিয়া বাড়ী যাইতে বলিয়া দেওয়া হয়। এইরূপ নিয়মানুগমতা ষ্টার থিয়েটারের বৈশিষ্ট্য ছিল এবং এইভাবেই গুরুদেবের পদাঙ্কানুসরণ করিয়া অমৃতলাল থিয়েটারকে একটা প্রধান শিক্ষার মন্দিরে পরিণত করেন। বরং এই বিষয়ে তিনি গুরুর অপেক্ষাও অধিকতর কঠোরতা অবলম্বনে শৃঙ্খলা রক্ষা করিতেন।

প্রায় ২২ বৎসর হইল অমৃতলালের তিরোধান হইয়াছে। তাঁহার জীবনী লিখিতে তাঁহার পুত্রগণ আমাকে বিশেষভাবে অনুরোধ করিয়াছিলেন। জ্যেষ্ঠপুত্র ক্ষেত্রবাবু আমাকে সহোদরের ন্যায় জ্ঞান করিতেন, কনিষ্ঠ পুত্র অসিবাবুও জ্যেষ্ঠের সম্মান দিতেন। দ্বিতীয় পুত্র কেতন বাবুকেও আমি পূর্ব্বে অনেকবার দেখিয়াছি। শশীভূষণ বাবুর সহিত আলাপ ছিল না, তবে 'খাসদখলে' তাঁহাকে সারদার ভূমিকায় দেখিয়াছি। আজ ইঁহারা কেহই ইহলোকে নাই। কিন্তু আমি তাহাদের অনুরোধ কখনও ভুলি নাই। ব্যক্তিগত আকর্ষণ ছাড়াও অমৃত বাবুকে শ্রেষ্ঠ লোকশিক্ষক বাঙ্গালী বলিয়া আমি খুবই শ্রদ্ধা করিতাম। কিন্তু দুঃখের বিষয় পূর্ব্বকালে এতই সময়াভাব, আর আমারও বয়স কেবল বাড়িয়াই চলিয়াছে, তাই পূর্ণ জীবনী লিখিবার আর ভরসা পাইতেছি না, বোধ হয় এ জীবনে তাহা সম্ভবও হইবে না। তাই তাঁহাকে যেরূপ দেখিয়াছি, তাঁহার মুখে যে কথা শুনিয়াছি অথবা অন্যের নিকটে শুনিয়া তাহার নিকট হইতে যাচাই করিয়া নিয়াছি, সেইরূপ কয়েকটি স্মৃতি কথায় এই প্রবন্ধে তাঁহার উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিতেছি।

পোনের বৎসর বয়সে (১৮৬৮ খৃঃ)* তিনি এণ্ট্রান্স পাশ করিয়া মেডিকেল কলেজে পড়েন। তাহার পিতা কৈলাশচন্দ্র বসু একজন বিশেষ নামকরা শিক্ষক ছিলেন।

শিক্ষাদান বিষয়ে পিতার দক্ষতা, জ্ঞানস্পৃহা এবং শৃঙ্খলানুরাগ অমৃতলাল পিতার নিকট হইতে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিছুদিন মাত্র পড়িয়া কাশীতে ডাক্তারী করিতেন, তবে মধ্যে মধ্যে কলিকাতা আসিতেন। অমৃতলাল নট জীবনের ইতিহাস সম্বন্ধে বলিতেন, "১৮৬৯-৭০ খৃষ্টাব্দে গিরিশচন্দ্র একটি নাটকের দল গঠন ক'রে "সধবার একাদশী" অভিনয় করেন। পূর্ব্বে আমি এই বইখানা পড়েছিলাম। কয়দিনই অভিনয় হয়। একদিন অর্দ্ধেন্দুর সঙ্গে দেখা হয়, পূর্ব্বে আমি তার সঙ্গে পড়তাম। সে অভিনয়ের কথা তুলে আমাকে জিজ্ঞেস করলে—"হাঁ হে ভুনি, তুমি আমাদের সধবার একাদশী দেখতে গেলে না ?"

আমি বললাম, "কি ক'রে যাই ? সময় কৈ ?" তার পরই জিজ্ঞেস করলাম—"হাঁ হে, তোমাদের নিমে দত্ত সাজে কে ?"

অর্দ্ধেন্দু—কেন, গিরিশ ঘোষ।

আমি—কোন্ গিরিশ ঘোষ ?

"বোসপাড়ার নীলকমল ঘোষের ছেলে।"

আমি—ও সে তো বুক-কিপার হে, শুনেছি বক্‌নো বক্‌নো পান ওজার করে, সে আবার সেক্সপিয়র কি আবৃত্তি করবে ? আরে ছ্যাঃ, আমি ছাড়া নিমে দত্ত কেউ পার্ব্বেই না।

অর্দ্ধেন্দু হেসে বল্‌লে—না হে, সে নিমে দত্তের পার্ট খুব ভাল করে।

আমি দেখতে গেলাম না—বোধ হয় ঈর্ষা বশেই হবে, কিন্তু পরে অনুতাপ হয়েছিল যে একদিন যার কাছে অবনত মস্তকে পুরোপুরি শ্রদ্ধা নিয়ে শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছি, তার সুখ্যাতি শুনে মনে এত রীষ হ'ল কেন ?

যাক্, অর্দ্ধেন্দু শেখরের সঙ্গে খাতির থাকায় তার সঙ্গে একটু একটু ফার্স-এর ন্নত নক্‌সা করতুম। ক্রমে ইচ্ছে হ'ল একটা ফার্স লিখে নিলে হয় না! গিরিশ ঘোষ নাকি এরূপ লিখে দিতেন। একদিন রবিবার একেবারে তার বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হলুম।

গিরিশ বাবু জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি কে গা, তোমার নাম কি ?

আমি—আমার নাম অমৃতলাল বসু-কৈলাশ বসুর ছেলে।

ওঃ, বুঝেছি বোম্বো, তুমি কি করছ ?

* ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে অমৃতবাবুর জন্ম হয়।

আমি এন্‌ট্রেন্স পাশ করেছি, তবে আমরা একটা ফার্স করব, আপনি লিখে দিন।

'তোমাদের কি রকম ফার্স দরকার, তাতো জানি না, ফার্স যদি তোমরা ক'রে থাক, একদিন সেইখানা নিয়ে আসবে।'

কিছুদিন পরে একখানা বই নিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করলাম—তিনি পড়ে বল্‌লেন, বইখানা কে লিখেছে?

আমি বল্‌লাম—আজ্ঞে আমি।

তিনি খুসী হইয়া বলিলেন—"তুমি তো মন্দ লেখনি, আচ্ছা তুমিই লেখ, আমি দেখে দেব।"

এইদিন থেকেই আমার উৎসাহ খুব বেড়ে গেল, তাঁর কাছে যেতে লাগলুম—তার মুখে সেক্সপিয়র মিলটন আবৃত্তি শুনতুম। কি চমৎকার আবৃত্তি করতেন, আর কণ্ঠস্বরও ছিল কিরূপ গম্ভীর অথচ শ্রুতিমধুর। সব দিক দিয়েই আমার অহঙ্কার চূর্ণ হ'ল—তাঁর কাছে মাথা নত ক'রে শিষ্যত্ব গ্রহণ করলাম।

অমৃতলাল বলেন, "সধবার একাদশীই বাঙ্গলার পাব্‌লিক থিয়েটারের মূল। এ থেকেই সাধারণ থিয়েটারের সূত্রপাত হয়।"

সধবার একাদশীর অভিনয় করিয়া গিরিশবাবু দীনবন্ধুর লীলাবতীর অভিনয় করেন। শ্যামবাজার রাজেন্দ্র পালের বাড়ী বাঁধা ষ্টেজে অভিনয় হয়। যে কয়দিন কলিকাতায় ছিলেন, সিন আঁকা প্রভৃতি বিষয়ে যাহাতে পীঠশিল্পী ধর্ম্মদাস সুর সম্পূর্ণ মন দিতে পারে, তজ্জন্য তাঁহার ক্লাশ ইনি নিতেন। ধর্ম্মদাস বাবু তখন শিক্ষকতা করিতেন। অনারেবল ভূপেন্দ্রনাথ বসু, ডাক্তার চুনীলাল বসু প্রভৃতি সেইখানেই উহাদের কাছে পড়েন। যাহা হউক, লীলাবতীর অভিনয়ের সময়ে অমৃতবাবু কলিকাতা ছিলেন না, কাশী চলিয়া গিয়াছিলেন। লীলাবতীর সময়েই থিয়েটারের নাম দেওয়া হয় "ন্যাশনাল থিয়েটার।"

ইহার পর নীলদর্পণের রিহার্সেল আরম্ভ হয়। গিরিশবাবুই সব ভূমিকা স্থির করিয়া দেন। নিজে তিনি উড্ সাহেবের রিহার্সেল দেন। কিন্তু একটু অগ্রসর হইলেই দলের মধ্যে মতদ্বৈধ হইল। অর্দ্ধেন্দুবাবু ছিলেন টিকেট বেচিয়া থিয়েটার করিবার পক্ষপাতী।

কিন্তু গিরিশ বাবু বলেন—"অর্দ্ধেন্দু, তোমরা ন্যাশনাল থিয়েটার নাম রেখে ঐ নামে টিকেট বেচে থিয়েটার করতে যেও না।"

অর্দ্ধেন্দু—কেন?

গিরিশ—"আমাদের উপযুক্ত সাজসরঞ্জাম নাই, এই সিন ড্রেসে লোককে এমনি দেখাতে পারি আমাদের ইচ্ছে, কিন্তু টিকেট বেচে থিয়েটার কর্‌লে ভয়ঙ্কর সমালোচনার মধ্যে পড়ব। একেই তো ভিন্ন জাতি বাঙ্গালীর নাম শুনলেই মুখ বাঁকায়। তার উপরে আমাদের দৈন্য অবস্থা দেখলে কি না বল্‌বে। টিট্‌কিরি দিয়ে বল্‌বে এই এদের জাতীয় থিয়েটার! কয়জন গৃহস্থ যুবা একত্র ক্ষুদ্র সরঞ্জামে ন্যাশনাল থিয়েটার কচ্ছে তাতো বুঝবে না।"

কিন্তু অর্দ্ধেন্দু প্রভৃতি আপত্তি শুনিল না। অমৃতবাবু এই সময় কাশী হইতে আসিয়া অর্দ্ধেন্দুর সঙ্গে যোগ দেন ও সৈরিন্ধ্রির ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। অভিনয়ের তারিখ ১৮৭২, ৭ই ডিসেম্বর। অভিনয় ভাল হয়—আর অমৃতবাবুর পার্টেরও প্রশংসা হইয়াছিল। তবে দীনবন্ধু গিরিশের অভাব খুব বুঝিতে পারেন। বলেন—"একজন গম্ভীর অংশের অভিনেতা না থাকায় অঙ্গহানি হয়েছে।"

অভিনয় হয় জোড়াসাঁকো—মধুসূদন সান্যালের ঘড়িওয়ালার বাড়ীতে। বসিবার স্থান ছিল চেয়ার বেঞ্চ ও বারান্দায় রক। ষ্টেজে ও দর্শকের উপরে চটের সামিয়ানা থাকিত। সুতরাং প্রথম পাবলিক থিয়েটার প্রতিষ্ঠায় গিরিশবাবু ছিলেন না। অমৃতবাবু, অর্দ্ধেন্দুবাবু ছিলেন। তবে মতভেদ বেশী দিন ছিল না। দুই মাস মধ্যেই কৃষ্ণকুমারীতে ভীম সিংহ করাইতে সকলে আসিয়া গিরিশবাবুকে লইয়া যান। 'নয় শো রুপেয়া'তে অমৃতলালের রঞ্জনের ভূমিকাও উল্লেখযোগ্য।

এ সময় হইতেই অর্দ্ধেন্দু বাবু এবং গিরিশচন্দ্রের শিক্ষাদান প্রণালী সম্বন্ধে নানারূপ আলোচনা হইত। এবিষয়ে 'অর্দ্ধেন্দু জীবনীতে' গিরিশ বাবুও কিছু কিছু আলোচনা করিয়াছেন। সে অনেক দিনের কথা। তবে আমি একদিন অমৃতবাবুকে জিজ্ঞাসা করিতে তিনি বলেন—

"দেখুন নাট্যকলা শিক্ষাদান করে অর্দ্ধেন্দু ছিলেন স্কুলের শিক্ষক—গিরিশবাবু ছিলেন কলেজের অধ্যাপক। অর্দ্ধেন্দু খুঁটিনাটি বিষয়ে শিক্ষা দিতে ছিলেন সিদ্ধ হস্ত আর গিরিশচন্দ্র fine psychological touches দিতে ছিলেন একেবারে বিশেষজ্ঞ। "নীলদর্পণে" আমাকে অর্দ্ধেন্দু সৈরিন্ধ্রীর ভূমিকায় কান্না শিখিয়েছিলেন, তাঁর কাছেই আমার প্রথম শিক্ষা।"

যাহা হউক, ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে ৩১শে ডিসেম্বর ভুবনমোহন নিয়োগীর স্বত্বাধিকারিত্বে বিডন ষ্ট্রীটে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার স্থাপিত হয়। এটি স্থায়ী থিয়েটার। স্থানটি বর্ত্তমানে যেখানে মিনার্ভা থিয়েটার, সেইখানে। ইহার ছয়মাস পূর্ব্বে ১৮৭৩, ১৬ই আগষ্ট বেঙ্গল থিয়েটার খোলা হয়। বেঙ্গল থিয়েটারের বাড়ী ছিল খোলার চাল সংযুক্ত আর গ্রেটন্যাশনাল একেবারে পাকাবাড়ী।

'কাম্যকানন' লইয়া গ্রেট ন্যাশনাল আরম্ভ হয় এবং অমৃতলালই হিরো সাজেন। কিন্তু প্রথম অভিনয় রজনীতে থিয়েটারের সম্মুখভাগে হঠাৎ সামান্য আগুন ধরে, তাহাতে অভিনয় বন্ধ হইয়া যায়। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে ১৯শে সেপ্টেম্বর হইতে বেঙ্গল থিয়েটারের ন্যায় গ্রেট ন্যাশনালও স্ত্রী ভূমিকায় অভিনয় করিবার জন্য অভিনেত্রী নিয়োগ করে। বেঙ্গল থিয়েটার প্রথম অভিনয় রাত্রি হইতেই স্ত্রীলোক অভিনেত্রী লইয়াছিল।

গ্রেট ন্যাশনালে অমৃতলাল প্রথমে হীরক চূর্ণ নাটক রচনা করেন। বরদার গায়কোয়ার সেখানকার পলিটি-কাল এজেন্ট কর্ণেল ফায়ারকে হীরক চূর্ণ দিয়া তাহার প্রাণ বিনাশের ষড়যন্ত্র করিবার অভিযোগে গদিচ্যুত হন। তাহার বিচারের জন্য একটি কমিশন বসে, তাহাতে দেশীয় মেম্বররা তাহাকে নির্দ্দোষ মনে করে, কিন্তু ব্রিটিশ সভ্যরা দোষী বলে। সমস্ত দেশে একটি আন্দোলন হয়। কারণ তাহারা অভিযোগ কাল্পনিক বলিয়া মনে করে। অমৃত-বাজার প্রভৃতি সমস্ত দেশীয় কাগজ গভর্ণর জেনারেল লর্ড নর্থব্রুকের সিদ্ধান্তে ক্ষুব্ধ হইয়া মন্তব্য করে। এমন কি বিলাতের টাইমস পেলমেল বজেট, বোম্বাইর হিন্দুপ্রকাশ, টাইমস অব ইণ্ডিয়া প্রভৃতি কাগজও মহারাজের পক্ষ সমর্থন করে। কিন্তু হিন্দু পেট্রিয়ট সম্পাদক স্বর্গীয় কৃষ্ণদাস পাল মহাশয় অন্য সুর ধরেন; তিনি বলেন—

"বরং বহু গায়কোয়ারকে আমরা ছাড়িতে পারি, কিন্তু একজন লর্ড নর্থব্রুককে ছাড়িতে পারি না।" এইরূপ উক্তির জন্য হীরক চূর্ণ নাটকে তাহাকে বিদ্রূপ করা হয়। অভিনয় বেশ ভাল হয়—গায়কোয়ার হন অর্দ্ধেন্দুবাবু, আর অমৃতবাবু হন এডভোকেট জেনারেল মিঃ স্কবোল। কিন্তু নাটকখানির প্রশংসা হইলেও ইহার মধ্যে কৃষ্ণদাস পালের উদ্দেশ্যে রচিত অশিষ্টোক্তিতে তাহাকে ব্যঙ্গ করা হয়। অমৃতবাজার পত্রিকা বলেন—

"এক কলস দুগ্ধে একটু গোমূত্র পড়িলে যেমন সমস্ত দুধটাই নষ্ট হইয়া যায়, এক্ষেত্রেও সেইরূপ হইয়াছে।"

নাটকের চতুর্থ অঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে মদন বলিতেছে—

"তাইতো, হিন্দু পেট্রিয়ট এমন হলেন কেন কিছু বুঝতে পাচ্ছিনা। সম্পাদক জাত্যাংশে তেলি, ইনি অনারেবল হয়েছেন।"

আয়ান—ওঃ, তাই বলি তেলি, হাত পিচলে গেলি, অনারেবল হলি—তবে বাবুর যেমন আকৃতি তেমন প্রকৃতি মহাশয়, দাঁড়কাকের বাসায় কি কখনো শুকপক্ষী বাস করে?

যাহাহউক, পরে শুনিয়াছিলাম কৃষ্ণদাস বাবুর সঙ্গে অমৃতবাবুর সম্প্রীতি হইয়াছিল।

"হীরকচূর্ণ নাটক" প্রথম বয়সে রচিত হইলেও অমৃত বাবু নিজে আমাকে বলিয়াছেন—অনেক কাগজপত্র ঘাঁটিয়া এই নাটকখানি খাঁড়া করেন। আমি নিজেও সেইরূপ দেখিয়াছি। কমিশনে সাক্ষীদের বর্ণনা ও জেরা সম্বন্ধে তিনি যে প্রশ্ন ও উত্তর তৈরী করেন, তাহাতে বেশ গবেষণা ও ধীশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। আবার স্থানে স্থানে বেশ রসেরও সঞ্চার হইয়াছে। দুই একটি পরিচয় দিতেছি।

ডাক্তার সিউয়ার্ড সাক্ষ্যে বলে, "কর্ণেল ফেয়ারের সরবতের গ্লাস পরীক্ষা করিয়া আর্সেনিক আর ডায়মণ্ড ডাষ্ট পাইয়াছিল।" সার্জ্জেণ্ট ব্যালেণ্টাইন গাইকোয়ারের পক্ষে তাহাকে জেরা করে—

আপনি কি কি দ্রব্য দিয়ে সম্বৎ পরীক্ষা করেছিলেন ?

সিউ—জল আর কয়লা।

ব্যালে—যে জল আর কয়লা ব্যবহার করেছিলেন সেই জল আর কয়লা প্রথমে পরীক্ষা করেছিলেন ?

সিউ—না।

ব্যালে—এই সব দ্রব্য বিষসংযুক্ত থাকতে পারে।

সিউ—মিথ্যা নয়, আমি অতোটা ভাবিনি।

ব্যালে—আচ্ছা বলুনতো আরসেনিকের স্পেসিফিক গ্রাভিটি কত ?

সিউ—ভুলে গেয়েছি।

ব্যালে—৩ গুণ, কেমন ঠিক কি না।

সিউ—আমার মনে হচ্ছে না—ডাক্তার গ্রে এখনি বলতে পারেন।

ব্যালে—আচ্ছা আর্সেনিক জলে ডোবে না ভাসে ?

সিউ—মহাশয়, আমায় আর পেড়াপীড়ি কেন, ডাক্তার গ্রেকে জিজ্ঞাসা করুন।

ব্যালে—বিলক্ষণ! সকলই দাদার উপরে বরাত ? তবে কি আপনি বিদায় হবেন ?

সিউ—আজ্ঞে তা হ'লে বড় বাধিত হই, আমায় আর কেন ?

পরে মাষ্টার ফিলিপ যখন জিজ্ঞাসা করে—

সাক্ষ্য দেওয়ার সময় আপনি সকল কথাতে ডাক্তার গ্রেকে রেফার কল্লেন কেন ?

সি—এতো আর সাক্ষ্য দেওয়া নয় যেন ডব্‌লিন ইউনিভার্সিটির ডাইভা ভোস্‌ একজামিনেশন, আর আমি কি অতো জানি—সার্জেন্ট ব্যালেণ্টাইন 'ল' ছেড়ে মেডিসিন আরম্ভ করেছে!

সিউ—তা বটে, আমার ক্ষমতা থাক্‌লে তোমায় আমি প্রমোসন দিতাম।

সিউ—আমি হকারের কাছ থেকে একখানি রেস্বার্স কেমিষ্ট্রী কিনেছি—এবার আর আমায় কেউ ঠকাতে পার্ব্বে না।

ইহার কিছুদিন পরে অমৃতবাবু বেঙ্গল থিয়েটারে যান এবং শীঘ্রই ফিরিয়া আসিয়া গ্রেট ন্যাশনালের ম্যানেজার হন, উপেন্দ্রনাথ দাস হন ডিরেকটার। থিয়েটারে স্ত্রীলোক অভিনয় করে, ইহাতে রুচিবাদীদের দল বড় রুষ্ট হয়। বিশেষতঃ গোলাপ সুন্দরী, সুকুমারী দত্ত নামে যখন তিন আইনে গোষ্ঠবিহারী দত্ত নামীয় একজন অভিনেতার সহিত পরিণয়াবদ্ধা হয়, (১৮৭৫) তখন সেই রোষ আক্রোশে পরিণত হয়। থিয়েটারে এসময় মদকেও প্রশ্রয় দেওয়া হইত। আর নানা কাগজে বিশেষতঃ ব্রাহ্মদের পরিচালিত কাগজে থিয়েটার সম্বন্ধে নানারূপ কুৎসা বাহির হইতে লাগিল।

আর একটি বিষয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৮৭৫ ডিসেম্বর মাসে ইংলণ্ডের যুবরাজ চার্ল্‌স্‌ (পরে সম্রাট সপ্তম চার্লস) কলিকাতায় পদার্পণ করেন। উকীল জগদানন্দ মুখার্জ্জি তাহার বকুল বাগানের বাড়ীতে মেয়েদের দিয়া উলুধ্বনি ও বরণ প্রভৃতির সহায়তায় তাহাকে অভ্যর্থনার আয়োজন করেন। এই লইয়া সমাজে বড় নিন্দা হয়, আর থিয়েটার হইতে 'গজদানন্দ' প্রহসনে তাহাকে বিদ্রূপ করা হয়। গভর্ণমেণ্টের কাছে জানাইতেই উহা অর্ডিনান্স দিয়া প্রহসনটি বন্ধ করিয়া দেয়। কিন্তু থিয়েটার কোম্পানী পশ্চাদ্‌পদ হইল না। নাম বদলাইয়া সেই বিষয়টিই "হনুমান চরিত্র" নামে অভিনয় করিল। গভর্ণমেণ্ট এটিও বন্ধ করিয়া দেয়। থিয়েটার কোম্পানী নাছোড়বান্দা—সেই জিনিষই 'পুলিস অব পীগ্‌ এবং সিপ' নামে অভিনয় করে। Police of pig and sheep অর্থাৎ এ সময়ে পুলিস কমিশনার ছিল স্যার ষ্টুয়ার্ট হগ্‌ আর আসিষ্টাণ্ট ছিল Mr. Lamb, এটিও বন্ধ করা হয়। অমৃতবাবু বলেন, এসবই অভিনয় গিরিশবাবুর পরামর্শে হয়। তিনি তখন আসিতেন, যাইতেন এবং সকলেই তাঁহাকে মুরুব্বি বলিয়া মানিতেন। প্রহসন ও গানগুলি তিনিই রচনা করিয়া দেন।

গানগুলির একটু নমুনা দিতেছি—

'ওরে জজ হ'তে চাও গজ গিরিধন'

'ওগো বুঝতে পারি না একটু ধীরে চল।'—সবই তাঁর রচনা।

তিনি বলেন, অমৃতলাল আপনাকে আরও বলি—এই অভিনয়ের অনেক পরে কবি হেমচন্দ্র "বাজীমাৎ" পদ্যটি রচনা করেন।

এবার গভর্ণমেণ্ট অন্যভাবে শাস্তি দিতে অগ্রসর হয়। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে ১লা মার্চ্চ "সুরেন্দ্র বিনোদিনী' নাটকের অভিনয় হয়। পূর্ব্ব বিজ্ঞপ্তি সত্বেও এদিন আর প্রহসন অভিনীত হয় না। উক্ত নাটকে অমৃতবাবু হন অত্যাচারী ম্যাজিষ্ট্রেট Mc Crimbe—কতকটা 'নীল দর্পণের' রোগ সাহেবের মত। নাটকখানি উপেন্দ্রনাথ দাসের রচিত।

বিরাজ মোহিনীর ভূমিকায় নামেন সুকুমারী দত্ত। ম্যাজিষ্ট্রেট যখন বলে—

"তুমি আমার কাছে এস, আমি তোমায় কিছু বলিব না—ভয় কি আছে, I am not a tiger or a bear," আমি তো বাঘ বা ভল্লুক নই।

দ্বিতীয়বার আবৃত্তি করিতে অমৃতবাবু বলিয়া ফেলিলেন, "I am not a tiger or a bear or a pig or a sheep."

কথা বলিয়া সাহেব আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলে বিরাজমোহিনী বারান্দা হইতে নীচে লাফাইয়া পড়ে। ম্যাজিষ্ট্রেটরূপী অমৃতবাবু By Joe Ah the sweet lady! actually jumped from the balcony. এই বলিয়া নীচে চলিয়া গিয়া বিরাজ মোহিনীরূপী সুকুমারীকে হাতের পাঁজার উপরে করিয়া লইয়া আসে। বিরাজের পরিহিত কাপড়ের সম্মুখের অংশ রক্তাক্ত দেখিয়া দর্শক চঞ্চল হইয়া উঠে। এই অভিনয়ের রিপোর্ট পুলিসের লামবার্ট ও রবার্টসন দেয় যে, ইংরাজ ম্যাজিষ্ট্রেটের অত্যাচার দেখান হইয়াছে। ৪ঠা মার্চ্চ তারিখে উপেন্দ্রবাবু ও অমৃত বাবু উভয়ে গ্রেপ্তার হন। ৮ জনের বিচার হয়, আর সবকে ছাড়িয়া দিয়া উপেন্দ্রবাবু ও অমৃতবাবুকে একমাস করিয়া বিনাশ্রমে সাজা দেওয়া হয়। পরদিনই স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় Mr. (W. C. Bonerjee) উকীল গণেশচন্দ্র মহাশয় সহ জামিন মঞ্জুর করিয়া আনেন।

আপিলের শুনানী হয় বিচারপতি ফিয়ার ও মার্কবীর আদালতে। সওয়াল জবাব করেন ব্রান্‌সন, টি, পালিত এবং মনোমোহন ঘোষ মহাশয়। বিচারে "সুরেন্দ্র বিনোদিনী" অশ্লীলতা-দোষ মুক্ত হয়। শুনানির তারিখ ১৮৭৬, ২০মার্চ্চ।

উপেন্দ্রবাবু এবং অমৃতবাবু উভয়েই খালাস পান। গভর্ণমেণ্ট কিন্তু ইহাতে ভারী চটিয়া যায়। বিচারপতি ফিয়ারের অবসর গ্রহণের কোন কথাই ছিল না, কিন্তু রাতারাতি তাহাকে পদত্যাগ করিয়া এই দেশ ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে হয়। সকলের বিশ্বাস হইল, এইরূপ নিরপেক্ষ বিচারের জন্যই তাহার এরূপভাবে চলিয়া যাইতে হয়।

কিন্তু দেশীয় লোক বিচারপতি ফিয়ারের ন্যায় নিষ্ঠার জন্য প্রশংসা মুখর হইয়া উঠেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের জ্যেষ্ঠতাত দুর্গামোহন দাস সে সময়ে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাহার বাড়ীতে লেডী ফিয়ারকে একটা অভিনন্দন দেওয়া হয়। এবং দুর্গামোহনবাবুর জ্যেষ্ঠা কন্যা স্বর্গীয়া সরলা রায়ই অনুষ্ঠানের প্রধান উৎসাহী ছিলেন। এই সরলা রায়ই পরে গোখেল মেমোরিয়াল স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন।

ইহার পরেই অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন পাশ হয়।

এই বিচার এবং জেল সম্বন্ধে অমৃতলালের সঙ্গে আমার অনেক দিন কথা হয়। তিনি বলেন—

"এক রাত্রি প্রেসিডেন্সি জেলে ছিলাম, কোট পেণ্টলুন পরা ছিলাম, সেখানে গিয়ে তা ছাড়তে হয়েছিল, জেলের জমাদার আমাদের জন্য একেবারে কেঁদে ফেলেছিল—অন্যান্য লোকও খারাপ ব্যবহার করে নি।"

আমি—এরূপ ফৌজদারী অপরাধে আপনারাই বোধ হয় বাঙ্গলা দেশে প্রথম জেলে গিয়েছেন।

তিনি—মহারাজা নন্দকুমারের কথা ছেড়ে দিলে লং সাহেবের পরেই আমাদের প্রথম জেল দর্শন। তবে লং সাহেবের নামে মোকদ্দমা করে ইংলিসম্যানের সম্পাদক। আমাদের বিরুদ্ধে করে গভর্ণমেণ্ট। ধর পাকড়, পুলিসের থিয়েটার বেষ্টন, পুলিস কোর্টের বিচার চারিদিকে সশস্ত্র প্রহরী জিনিসটি বড়ই ভয়াবহ করিয়া তুলিয়াছিল। লং সাহেবের বিচারে এসব অনুষ্ঠানের বালাই ছিল না।

আমি—আপনাদের বিরুদ্ধে কি অভিযোগ ছিল?

তিনি—অশ্লীলতা প্রচার—দণ্ডবিধি আইনের ২৯২, ২৯৪, ধারানুযায়ী অভিযোগ—

গভর্ণমেণ্ট শুদ্ধ কেঁপে উঠেছিল। অর্ডিনান্স, গ্রেপ্তার, জেল, নূতন আইন—আমরা যেন কতই রাজদ্রোহী! হাইকোর্টের বিচারের পূর্ব্বে সরোজিনী অভিনয় হয়, তাতে আমরা সাধারণের সহানুভূতি চাহিয়া আপিল বার করি। সে রাত্রে রঙ্গমঞ্চে তিলধারণের স্থান ছিলনা। বেশ টাকাও উঠেছিল।

কিন্তু ইহার পরেই অন্ধকার আসিয়া গ্রাস করিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন পাশ হয় এবং থিয়েটার এক রকম উঠিয়া যায়।

অমৃতলাল কোন একটা চাকুরী লইয়া আন্দামানে চলিয়া যান। সেখানে তিনি প্রায় দুই বৎসর থাকেন।

[ক্রমশঃ

* স্বদেশী নেতা শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র চন্দ্র ও বিচারপতি কমলচন্দ্রের পিতামহ।

কন্যা কুমারী

শ্রীমতী জ্যোতির্ম্ময়ী ঘোষ

কুমারী পূজা আমাদের দেশে বহুদিন হতে প্রচলিত। কুমারীর পবিত্রতা আমাদের দেশে কত উচ্চে স্থান পেয়েছে, তারই নিদর্শন দেখে এলাম কুমারিকা অন্তরীপে—ভারতবর্ষের শেষ প্রান্তে কন্যাকুমারীর মন্দিরে যেখানে মাতা পার্ব্বতীর কুমারী মূর্ত্তি মালা হাতে দাঁড়িয়ে আছেন। তিন দিকে সাগর ঘেরা কুমারিকা অন্তরীপ; বঙ্গোপসাগর, ভারত মহাসাগর ও আরব সাগর এই তিনটী সাগর চির মুখর কলতান বন্দনা গানে দেবীর চরণমূল ধৌত করছে। যুগ যুগ ধরে তারা দেবীর স্তুতি গান গাইছে। তাদের বিরামহীন, ক্লান্তিহীন ডাকে তারা জাগিয়ে রেখেছে তাদের দেবীকে।

অনেক দিনের আশা ছিল দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের। প্রত্যেক বৎসরই যাবো যাবো করে আর সময় হয়ে ওঠে না। এবার ঠিক করলাম কোন বাধাই মানবো না; জোড় করে বেড়িয়ে পড়বো। জানুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে আমরা বেড়িয়ে পড়লাম। আমি, আমার স্বামী পুত্র ও আমার শাশুড়ীদ্বয়। প্রথমে আমরা মাদ্রাজে সাতদিন থাকলাম, সেখান থেকে মোটরে পক্ষীতীর্থ। মহাবলীপুরম্ ও কাঞ্জিভরম্ দেখলাম। তার পর মাদ্রাজ হতে রামেশ্বরধাম ও ধনুষ্কোটী গেলাম। রামেশ্বর ও ধনুষ্কোটী এই দুই স্থান দর্শন করে আমরা মাদুরা দেখে ত্রিভেন্দ্রম্ গেলাম। ত্রিভেন্দ্রম্ থেকে কন্যাকুমারী ৫৩ মাইল। আমরা একটী taxi ঠিক করে সকাল ৮টার সময় রওনা হলুম কন্যা কুমারীর উদ্দেশ্যে। বহুদিনের আশার স্বপ্ন ভারতবর্ষের শেষ প্রান্ত কুমারিকা অন্তরীপ। আমরা সকলেই উদ্‌গ্রীব হয়ে রইলাম পৌঁছবার জন্যে। মোটর ছুটে চললো। আমরা কখনো ছোট ছোট গ্রামের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি, আবার কখনও বনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি। সব গ্রামেই একটী গীর্জ্জার উচ্চ চূড়া আমাদের চোখে পড়লো। আমি মনে মনে ভাবলাম এখানকার অনেক অধিবাসীই নিশ্চয়ই ক্রিশ্চান এবং পরে জানতে পারলাম যে আমার অনুমান মিথ্যা নয়। কন্যাকুমারীতে একটী আশ্রম আছে, সেখানে যে সব ক্রীশ্চান হিন্দু হতে চায়, তাদের শুদ্ধি করে হিন্দু করা হয়। আমাদের কাছ থেকে সেই আশ্রমের একটী কর্ম্মী চাঁদা নিলেন। হিন্দুধর্ম্মের বাহ্যিক আড়ম্বর ত্যাগ করে হিন্দুরা যদি বহু আগে থেকে এ কাজ করতো তবে বোধ হয় অভাগিনী ভারতমাতাকে আজ রক্তাপ্লুতা বিখণ্ডিতা ভাবে দেখতে হতোনা। গাড়ী কিছুক্ষণ চলবার পর একধারে উচ্চ পাহাড় শ্রেণী দেখা

বরমাল্যহস্তে কন্যা কুমারী

যেতে লাগ্‌লো, মাঝে মাঝে বনের গাছপালা পাহাড়কে ঢেকে দিতে লাগলো—নারিকেল গাছের মধ্যে মধ্যে অনেক তালগাছের সারি; একটা মিষ্টি গন্ধ মাঝে মাঝে ভেসে আসতে লাগলো। ক্রমশঃ আমরা যত এগোতে লাগলাম, বন সরে গিয়ে কেবল দূরে পাহাড় শ্রেণী দেখতে লাগলাম। ক্রমশঃ বড় পাহাড়গুলি একটার পর একটা ছোট হতে হতে শেষে যেন একেবারে প্রান্তে মিলিয়ে

কেপ্‌টাউন হোটেল। স্বামীপুত্রসহ লেখিকা

গেল। তার পর দেখা দিল লাল মাটি—খুব লাল। বাতাসের খুব জোর অনুভব করলাম, বুঝতে পারলাম সমুদ্রের খুব সামনে এসে গেছি। সমুদ্রের এত কাছে এরকম লাল মাটি দেখে অবাক হলাম। একটু পরেই সমুদ্রের নীল জল দেখতে পেয়ে আমরা সকলেই সমস্বরে 'এইযে সমুদ্র' বলে চেঁচিয়ে উঠলাম। যত এগিয়ে যেতে লাগলাম ততো সমুদ্র নিকটে এগোতে লাগলো। পরে আমাদের গাড়ী Hotel-এর দিকে বাঁক ঘুরতেই দেখি আমরা উপরে এবং আমাদের ঠিক একটু দূরে নীচেই সমুদ্র। আমাদের সামনে দিগন্তব্যাপী নীল সমুদ্রের জলরাশির সৌন্দর্য্য দেখে আমি মুগ্ধ হয়ে গেলাম। মন একটা অপূর্ব্ব বিরাট আনন্দে পূর্ণ হয়ে গেল। মুখের ভাষা স্তব্ধ হয়ে গেল। কেবল চোখ দিয়ে সৌন্দর্য্য সুধা পান করতে লাগলাম। সঙ্গে সঙ্গে মন ছুটে চললো সেই চির সুন্দরের পায়ে—যিনি এই সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করেছেন। কেবলই মনে হতে লাগলো—যিনি এই সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করেছেন, তিনি না জানি আরো কত বেশী সুন্দর!

আমরা Hotel-এ আগেই ফোন করে দু' খানা ঘর ঠিক করে রেখেছিলাম। হোটেলটী ঠিক সমুদ্রের উপর। ঘর থেকে সমুদ্র দেখা যায়। সমুদ্রের মাতাল হাওয়াতে ঘরের জিনিস পত্র মাতামাতি করে কেবল পড়ে যেতে লাগলো। আমরা যখন পৌঁছলাম তখন বেলা ৫টা।

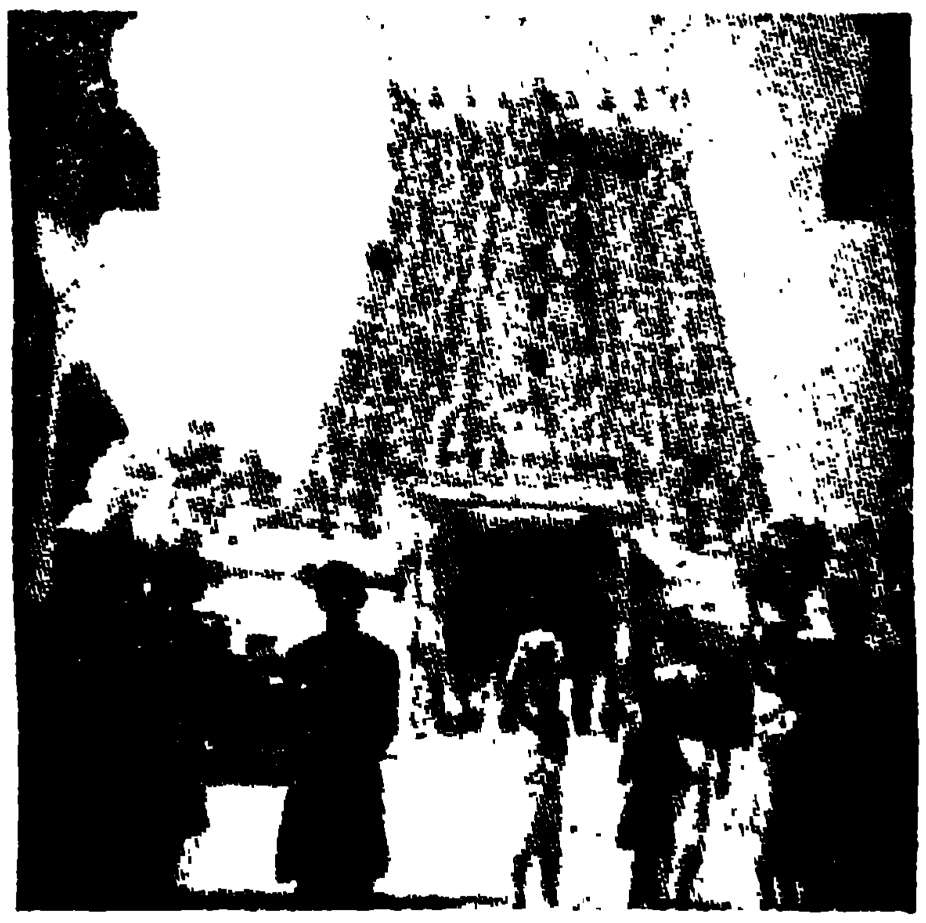

শচীন্দ্রম মন্দির

ওখানে জলের খুব কষ্ট। হোটেলের Bath-room এ একটা টবের কোণে সামান্য একটু জল দেওয়া ছিল, তাতে চান তো দূরের কথা, মুখ ধোয়াও ভাল ভাবে হয় না। হোটেলের নিজস্ব Swimming pool আছে সমুদ্রের ধারে; সেখানে কাপড় ছাড়বার ঘর আছে এবং ঘরের চাবি আছে। হোটেলের ম্যানেজার আমাদের চাবি দিয়ে পথ দেখিয়ে দিলেন। আমরা কাপড় জামা নিয়ে নেমে গেলাম সেখানে স্নানের জন্য। অনেক খানি পথ নেমে যেতে হলো, কিন্তু স্নান খুব ভাল হলো। চারদিকে প্রাচীর ঘেরা বেশ বড় জলাশয়। একদিকে খানিকটা উন্মুক্ত স্থান দিয়ে সমুদ্রের জল আসছে; জল খুব গভীর নয়, গলা পর্য্যন্ত আমরা খুব মনের আনন্দে অনেকক্ষণ স্নান করলাম। স্নান সেরে হোটেলে এসে খেলাম। খুব ভাল খাবার দিয়েছিল, আমার স্বামী ও ছেলে Camera নিয়ে তক্ষুণি বেড়িয়ে পড়লেন; এদের ভীষণ ফোটো তোলার সখ। আমিও শুয়ে পড়লুম বিশ্রাম করতে।

বিকালে চা খেয়ে আমরা বেড়িয়ে পড়লাম মন্দির দর্শন করবার জন্য। রাস্তা দিয়ে হেটে চলেছি, নীচে সমুদ্র; এই সমুদ্র ভারত মহাসাগর; উঁচু ঢেউ নেই; সামান্য কেঁপে কেঁপে সমুদ্র দোল খাচ্ছে। এক এক জায়গাতে এক এক রকম রং; কোথাও ফিকে নীল, মেঘের ছায়া পরে কোথায়ও গাঢ় নীল, কোথাও ফিকে সবুজ এবং কোথাও গাঢ় সবুজ। এখানকার রং মিলিয়ে ওখানে যাচ্ছে—ওখানকার রং এখানে আসছে; যেন রংএর লুকোচুরি খেলা চলেছে সমুদ্রের বুকে। তার মধ্যে দেখা যাচ্ছে ছোট ছোট সাদা পাল তোলা নৌকো। সমুদ্রের এই অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখলে স্তব্ধ হয়ে কেবল সেই দৃশ্যই দেখতে ইচ্ছে করে। খানিকটা এগিয়ে যাবার পর রাস্তা নেমে গেল সমুদ্রের দিকে। সূর্য্যাস্ত দেখবো বলে আমরা তাড়াতাড়ি নেমে যেতে লাগলাম। রাস্তা নেমে গেছে সমুদ্রের গায়ে ঘাটের দিকে। ঘাটে নামতে হয় কয়েক ধাপ সিঁড়ি দিয়ে। যেখানে ধাপ আরম্ভ হয়েছে ঠিক তার উপরে খানিকটা প্রশস্ত জায়গা, তার মাঝ খানে একটা পাথরের ঘর, মাথায় পাথরের ছাদ। ঠিক ঘর নয়, চারটা pillar-এর উপর পাথরের আচ্ছাদন। এই ঘাট থেকে সূর্য্যাস্ত দেখলাম। শুনলাম এই একই ঘাট থেকে আবার সূর্য্যো-

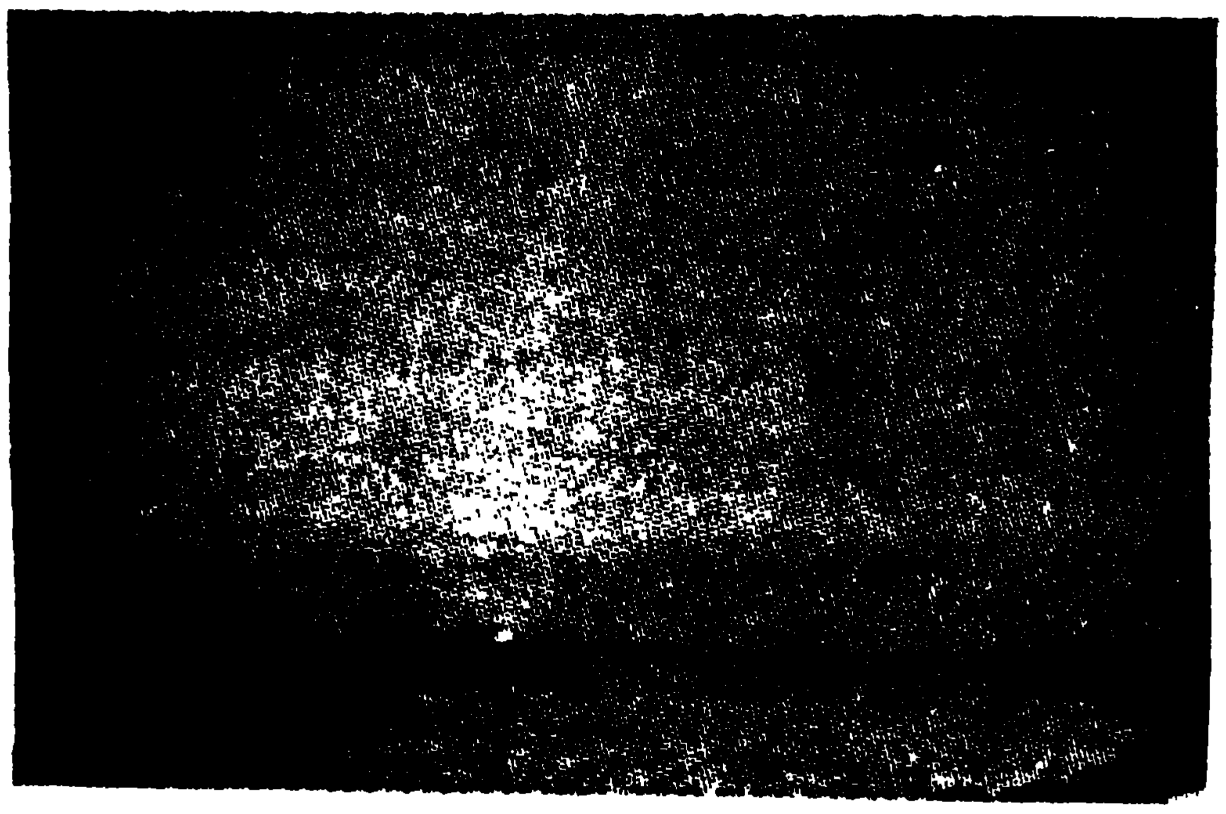

আরবসাগরে সূর্য্যাস্ত

দয়ও দেখা যায়। একজন পাণ্ডা সেখানে দাঁড়িয়েছিলেন, আমাদের দেখে বল্লেন—কাল সকালে ভোর ৫ টার সময় এই ঘাটে আসবেন, এখান থেকে সূর্য্যোদয় দেখতে পাবেন। প্রকৃতির এমনি খেলা। একই স্থানে দাঁড়িয়ে আমরা দেখতে পাই—প্রভাত-সূর্য্যোদয়ের অত্যাশ্চর্য্য রূপ, আবার দেখতে পাই দিবাবসানের ক্লান্ত রবির এক অপরূপ ছবি: যখন সূর্য্যদেব তার সমস্ত ক্লান্তি দূর করে নেমে পড়েন সমুদ্র বক্ষে। আমরা ধাপে ধাপে ঘাটে নেমে গিয়ে সমুদ্র স্পর্শ করলাম। এখানে ঘাট চারদিকে প্রায় বাধানো। সমুদ্রে নেমে গেছে ছোট ছোট প্রস্তর খণ্ড। ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজ বাঁধিয়ে দিয়েছেন এ ঘাট জনসাধারণের জন্য। এখানে সমুদ্রের জল আটকানো হয়েছে। এ ঘাটে মিশেছে তিনটী সাগরের জল। বঙ্গোপসাগর, ভারত মহাসাগর ও আরব সাগর—ইহা তিনটী সাগরের মিলন স্থলের পূণ্য তীর্থ। এ ঘাটের থেকেই একটু উপরে দেখা যাচ্ছে কন্যা কুমারীর মন্দিরের চূড়া। এখানকার দৃশ্য অপরূপ। ভারত সাগরের জল শান্ত একটু কাঁপানো যেন ঈষৎ দোল দিয়ে যাচ্ছে ধরিত্রীকে। আর তারই পাশে বঙ্গোপসাগরের ফেনিল উচ্ছসিত অসংখ্য তরঙ্গ সগর্জ্জনে আছড়ে পড়ছে তটভূমিতে। ঠিক মনে হচ্ছে অসংখ্য ক্রুদ্ধ সর্পিনী রুষ্ট হয়ে আক্রোসে ফণা বিস্তার করে ছুটে এসে পৃথিবীকে দংশন করছে। পাশাপাশি এই রুদ্র ও শান্ত রূপ দেখলে বিস্মিত হতে হয়। ইহাই কি সৃষ্টির রূপ—একদিকে ভাঙ্গন, একদিকে গড়ন? ভারত সাগরের তটভূমিতে লাল রংএর বালিকণা শোভা পাচ্ছে। খানিকটা লাল রংএর বালির পরে সাদা বালি, আবার বঙ্গোপসাগরের দেখা যাচ্ছে কালো বালুকারাশি। আমার ছেলে নেমে গিয়ে দুদিক থেকে দু'রকমের বালি তুলে আনলো বাড়ী নিয়ে যাবে বলে।

আমরা সূর্য্যাস্ত দেখে উঠে এলাম মন্দির দেখতে। সমুদ্রের প্রায় গা থেকে উঠেছে মন্দিরের ভিত্তি। অনেকটা উঁচুতে চতুষ্কোণ চত্বর; তার মধ্যে মস্ত উঁচু প্রাচীর ঘেরা মন্দির। এখানে দেখলাম দাক্ষিণাত্যের সব মন্দিরের মত প্রায় একই গড়নের মস্ত বড় গগনস্পর্শী গধুরম্ নেই। আমরা তোরণের সামনে জুতো রেখে সামনেই দোকান থেকে পূজার উপকরণ কিনে নিলাম। ফুলের মালা, নারিকেল, কলা ও ফুল। দাক্ষিণাত্যের সব জায়গাতেই দেখলাম নারিকেল, কলা ও ফুল এই

দিয়েই পূজা হয়। এখানে মন্দিরে ঢুকতে গেলে পুরুষরা বিজাতীয় পরিচ্ছদে ঢুকতে পারে না। নগ্ন গাত্রে প্রবেশ করতে হয়। পাণ্ডাজী আমাদের মন্দিরের ভিতর নিয়ে গেলেন। মন্দিরের ছাদটী বেশ নিচু, ভিতরে খুব অন্ধকার। প্রদীপের আলোতে পথ দেখে আমরা দেবী মূর্ত্তির নিকটে গেলাম। কন্যাকুমারীর সুন্দর মূর্ত্তি—মাথায় মুকুট, হাতে মালা, কুমারী স্নিগ্ধ নয়নে দাঁড়িয়ে আছেন। তখন আরতি আরম্ভ হবে,দেখলাম—দেবীর সর্ব্বাঙ্গ চন্দনে ঢাকা, গলায় ফুলের মালা। দ্বার প্রান্ত এবং চতুর্দ্দিক প্রদীপের আলোকে আলোকিত। দাক্ষিণাত্যের সব জায়গাতেই পূজারী ছাড়া কারুর ভিতরে প্রবেশের অধিকার নেই। কন্যাকুমারী দেবীর মূর্ত্তি দরজার বেশ নিকটেই আমরা খুব ভালভাবে দেখতে পেলাম।

পরদিন আমরা সমুদ্রের ঘাটে গিয়ে সঙ্কল্প করে সমুদ্র স্নান করলাম। স্নান করতে এত ভাল লাগছিল যে উঠতে ইচ্ছে করছিলো না। ঘাটের অনতিদূরে সমুদ্র বক্ষে বঙ্গোপসাগরে দুটী খণ্ডগিরি আছে, জানলাম ইহার একটীর নাম বিবেকানন্দ রক্। স্বামী বিবেকানন্দ এই

স্বামী বিবেকানন্দ রক্

প্রস্তরখণ্ডের উপর বসে অনেকদিন ভগবানের সাধনা করে-ছিলেন এবং এখান থেকেই তিনি আমেরিকা যাবার প্রেরণা পেয়েছিলেন; স্বামী বিবেকানন্দের কথা স্মরণ হতেই শ্রদ্ধায় আমাদের মাথা আপনি নত হয়ে এলো স্বামী বিবেকানন্দ হিমালয় পর্ব্বত হতে কুমারিকা অন্তরীপ পর্য্যন্ত ভারতের সব তীর্থ পায়ে হেটে দর্শন করেছিলেন। তিনি আমাদের দেশ ও হিন্দু ধর্ম্মকে জগতের সামনে বহু উচ্চে তুলে ধরেছিলেন। পরাধীন ভারতবাসী জগতের কাছে তাঁর জন্য মাথা তুলে দাঁড়াতে পেরেছিল। এখানেও দেখলাম সকলেই শ্রদ্ধাভরে আজও স্বামী বিবেকানন্দের নাম করেন এবং বাঙ্গালীদের খুব সম্মান ও শ্রদ্ধার চক্ষে দেখেন। আমরা সমুদ্র স্নান করে পাণ্ডাঠাকুরের সঙ্গে মন্দিরে গেলাম পূজা দিতে। দেখলাম দেবী এখন আর চন্দনচর্চ্চিত নেই। পাথরে খোদিত বেশ সুন্দর মূর্ত্তি। এ মন্দির বহু প্রাচীন। কথিত আছে পৌরাণিক যুগে ভব ও মুখ নামে দু'জন অসুর দেবতাদের খুব উপদ্রব করেছিল। দেবতারা অনেকের কাছে সাহায্য চাইলেন অসুরদের দমন করতে; কিন্তু কেহই তাঁহাদের কথায় কর্ণপাত করলেন না। তখন দেবতারা কাশীর বিশ্বনাথের কাছে সাহায্য চাইলেন। বিশ্বনাথ তখন শক্তিদেবীকে আহ্বান করে তাঁকে কুমারীরূপে পাঠিয়ে দিলেন কুমারিকা অন্তরীপে। এই কুমারী শক্তি অসুরদের দমন করলেন এবং সেখানেই থাকলেন ও পূজিত হলেন।

শান্ত ভারত মহাসাগর

কুমারিকা অন্তরীপের ১০ মাইল পূর্ব্বে সুচিন্দ্রম্ মন্দির নামে একটী মন্দির আছে। এখানে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের ত্রিমূর্ত্তি। আমরা কুমারিকা অন্তরীপে আসবার পথে এই মন্দিরটী দেখে এসেছিলাম। খুব সুন্দর মন্দির। এ মন্দির সম্বন্ধে অনেক প্রবাদ আছে, তার

মধ্যে একটী হলো এইরূপ : দেবরাজ ইন্দ্র এই মন্দিরে নিজেকে ব্রহ্মার সম্মুখে যজ্ঞে আহুতি দিয়ে গৌতমের অভিশাপ হতে মুক্তি পেয়ে শুচি হয়ে এখানে শিবের আরাধনা করেছিলেন ; তাই এখানকার শিবের নাম

অশান্ত বঙ্গোপসাগর ও মন্দিরপ্রাঙ্গণে পর্য্যবেক্ষণ গৃহ

সুচিন্দ্রেশ্বর মহাদেব। এই সুচিন্দ্রেশ্বর মহাদেব কন্যা কুমারীর রূপে গুণে মুগ্ধ হয়ে কন্যা কুমারীকে বিবাহ করবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। দেবতারা মহা বিপদে পড়লেন। দেবতারা দেখলেন যদি মহাদেব ও কন্যা কুমারীর মিলন হয়, তবে কুমারীর পবিত্রতা নষ্ট হয়ে যাবে। একমাত্র এই পবিত্রতার শক্তিতেই তিনি অসুরদের দমন করে রাখতে সমর্থন হয়েছিলেন। কুমারীর এই পবিত্রতা রক্ষা করতে না পারলে তিনি অসুর দমন করবার শক্তি হারাবেন। তাহলে আবার দেবতাদের অসুরের কবলে পড়তে হবে। মহাদেবকে নিষেধ করবার সাহস তাদের নেই ; সুতরাং তারা চিন্তিত হয়ে পড়লেন। অবশেষে তারা নারদমুনির নিকট এ বিষয়ে সাহায্য প্রার্থনা করলেন। নারদদেব তাদের উদ্ধার করবার প্রতিশ্রুতি দিলেন।

এদিকে বিবাহের দিন ও লগ্ন সব ঠিক হয়ে গেল। মহাদেব নির্দ্দিষ্ট সময় রওনা হলেন ঠিক লগ্নে বিবাহ সভায় পৌঁছবার জন্য। এমন সময় পথের মধ্যে নারদ মুনি কাকের বেশ ধারণ করে উচ্চস্বরে কা কা রবে ডেকে উঠলেন। মহাদেব কাকের ডাকে ভোর হয়েছে ভেবে কুচ করলেন। ভোর হয়ে আসছে, তবে তো বিয়ের লগ্ন পেরিয়ে গেছে, এই ভেবে তিনি বিবাহ-বাসরে না গিয়ে পথ হতে বাড়ী ফিরে এলেন। এদিকে কুমারীদেবী বিবাহ সাজে সজ্জিত হয়ে মালা হাতে দাঁড়িয়ে রইলেন শিবের প্রতীক্ষায়। যত সময় চলে যেতে লাগলো, তিনি

কন্যা কুমারিকার সাগর স্নানের ঘাট

তত উদগ্রীব হয়ে উঠলেন। ভোরের আলো দেখা দিলো, তবুও তার আরাধ্য দেবতা যখন এলেন না তখন নিরাশ হলেন। দেবীর আজ্ঞায় বিবাহের ভোজের খাদ্য-দ্রব্য সব পবিত্র ঘাটে ছড়িয়ে ফেলে দেওয়া হলো। সেগুলি সমুদ্রের বালি ও শুক্তি প্রভৃতিতে পরিবর্ত্তিত হলো।

কুমারিকা অন্তরীপের সাদা বালিগুলি দেখতে অনেকটা ঠিক ছোট ছোট, মোটা মোটা গোটা আতপ চালের মতন। সেই যে কন্যাকুমারী বরমাল্য হাতে তাঁর চির আরাধ্য দেবতার প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে ছিলেন, দেবীর সেই কুমারী মূর্ত্তি মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যুগ যুগ ধরে পূজিত হচ্ছে। শরণার্থীদের রক্ষার জন্য দেবী নিজ সুখ হতে বঞ্চিত হয়ে আজও তাঁর ভক্তদের অভয় দান করছেন। তাই আজও মহাসিন্ধুর কলতানে আমাদের কাণে ভেসে আসে তাঁরই বন্দনাগীতি। মন আপনি নত হয়ে পড়ে ভক্তিভরে কন্যাকুমারীর পবিত্র পদতলে।

এখানে তীরে বসে দিগন্তব্যাপী সমুদ্রের অপরূপ লীলা-প্রকৃতির এই বিরাট প্রকাশ দেখলে এই হিংসা দ্বেষ পূর্ণ ক্ষুদ্র পৃথিবীর কথা ভুলে মন চলে যায় অনেক অনেক দূরের এক মনোহর চির সুন্দর ও চির শান্তির রাজ্যে— যেখানে এই বারিরাশির কলতান গানের ছন্দে ভেসে বেড়ায় এক শান্তির ও মধুর সঙ্গীতের সুরে।

নবগঙ্গা

রণজিৎ কুমার সেন

এগার

সামনেই একটা ছুটির দিন পেয়ে বিজন এবারে একাই রওনা হ'য়ে প'ড়লো রাসবিহারী এভিন্যুতে। ক'ল্‌কাতার বড় রাস্তাগুলো চিনে উঠ্‌তে বিশেষ বেগ পেতে হয়নি তাকে। একদিকে মহেন্দ্র, অন্যদিকে অরুণ—মহানগরীর সঙ্গে বিস্ময়কর পরিচয়ের ব্যাপারে দু'জনের সাহচর্য্য এসে যুক্ত হ'য়েছে দু'দিক থেকে। রাস্তাগুলো তাই অল্প দিনের মধ্যেই সহজ হ'য়ে উঠ্‌লো তার কাছে।

রাসবিহারী এভিন্যুতে এসে বাড়ীটা খুঁজে পেতে বিলম্ব হ'লো না তার। পঁয়ষট্টির চারের তিনের এক। ক'লাপ্‌সিব্‌ল্ গেট্ওয়ালা দ্বিতল বাড়ী। সাম্‌নে লনের মতো খানিকটা ফাঁকা যায়গা। গেট্ পেরিয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়াতেই মুখোমুখি দেখা হ'য়ে গেল মিঃ মল্লিকের সঙ্গে। বিজন ভুমিষ্ট হ'য়ে তাঁকে প্রণাম ক'রতে যেতেই বাধা দিয়ে সোৎসাহে মিঃ মল্লিক ব'ল্‌লেন, 'হ'য়েছে, হ'য়েছে, পায়ে হাত ছোঁয়ালেই কি বেশী কিছু ভক্তি শ্রদ্ধা দেখানো হয় নাকি! তারপর—ক'ল্‌কাতায় এলে কবে?'

—'এই কিছুদিন।' সোজা হ'য়ে দাঁড়িয়ে বিজন ব'ল্‌লো, 'দৌলতপুর থেকে আই, এ পাশ ক'রে এখানেই এখন বি, এ প'ড়ছি।'

—'বাঃ, চমৎকার, ইট্ ইজ্ এ ভেরি গুড্ নিউজ।' খুশীর হাসি হেসে মিঃ মল্লিক ব'ল্‌লেন, 'চলো, ভিতরে চলো, তোমার মাসীমার সঙ্গে দেখা ক'রবে; কত খুসী হবেন তিনি!' এবং ভিতর মহলে প্রবেশ ক'রতে ক'রতেই স্ত্রীর উদ্দেশে গলা তুল্‌লেন তিনি: 'ওগো শুন্‌ছো, দেখ কে এসেছে! সেদিনের বিজু আজ বি. এ. প'ড়ছে, হাউ সুপ্রেন্‌ডিড্!'

মিঃ মল্লিকের অনুগমন ক'রে বিজন ব'ল্‌লো, 'কেন, চিরকালই ছোট থাক্‌বো, তাই কি ব'ল্‌তে চান মেসো-মশাই? তা ছাড়া আই, এ, প'ড়তে তো দেখেই এসে-ছিলেন আমাকে। আই, এ'র পরে বি,এ ছাড়া স্বাভাবিকতার দিক দিয়ে আর কিই বা হ'তে পারতো!'

—'না, না, বেশ ক'রেছ, ভালো ক'রেছ তুমি। আফ্‌টার অল্ ইউ আর এ্যান্ আইডিয়াল।'

সাম্‌নে এসে মিসেস্ মল্লিক ব'ল্‌লেন, 'উঃ, কতদিন পরে তোমাকে দেখলাম বিজু! তুমি যে ক'ল্‌কাতায় আস্‌বে, ভাবতেই পারি নি।'

—'নিজে উদ্যোগ না ক'রলে অবিশ্যি আসা হ'তো না, মার মত ছিল না।' ব'লে মিসেস্ মল্লিককে প্রণাম ক'রে উঠে দাঁড়ালো বিজন।

—'ষাট; দীর্ঘজীবী হও।' বিজনের মাথার উপর দিয়ে হাত স্পর্শ ক'রে নিয়ে মিসেস্ মল্লিক জিজ্ঞেস্ ক'রলেন, 'দিদির শরীর ভালো আছে তো?'

—'খুব ভালো বলা চলে না, আছেন কোনোরকম।'

—'বড় দেখতে ইচ্ছে হয় দিদিকে, কতদিন দেখি না।' থেমে মিসেস্ মল্লিক ব'ল্‌লেন, 'তোমাকে ছেড়ে দিদির খুব কষ্ট হবে।'

বিজন ব'ল্‌লো, 'জানি। এবারে তাই বাড়ীতে একজন প্রতিভূ রেখে তবে ঘর থেকে বেরিয়েছি।'

—'তবু ভালো।'

দ্বিতলের সিঁড়ি ভেঙে রেবাকে নেমে আস্‌তে দেখা গেল এই সময়ে। কাছে এসে কিছু ব'ল্‌বার আগেই বিজন ব'ল্‌লো, 'খবর কি, ভালো আছো?' সঙ্গে সঙ্গে রেবার বেশ-বাসের পরিবর্ত্তনটাও লক্ষ্যে প'ড়লো বিজনের। নাগরিক আভিজাত্যের ছাপ ফুটে উঠেছে তার সর্ব্বাঙ্গে। মনে হ'চ্চে—লম্বায় চওড়ায় আরও অনেকখানি বেড়েছে সে ইতিমধ্যে। আজ আর মাণ্ডয়ার সেই রেবা নেই, তার উজ্জ্বল মুখখানিতে ক'ল্‌কাতার রাজকীয় ছাপ ঝ'ল্‌সে যাচ্ছে। আগের চাইতে আরও যেন সুন্দর হ'য়েছে রেবা!

কাছে এসে মিষ্টি হেসে রেবা ব'ল্‌লো, 'আমাদের খবর তো ভালোই, তা—তুমি হঠাৎ ক'ল্‌কাতায় উড়ে এলে কেমন ক'রে?'

—'যদি বলি এরোপ্লেনে, সেটা বিশ্বাস্য হবে না, অতএব ট্রেনে। এবারে নিশ্চিন্ত হ'তে পারো।'

—'আছো তো কিছুদিন, না হঠাৎই আবার চ'লে যাবে?' জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চোখ দু'টো তুলে ধ'রলো রেবা।

এবারে বিজনের কথাটা মিঃ মল্লিকই ব'লে দিলেন: 'চ'লে যাবে কি রে, বিজু যে এখানে বি, এ প'ড়ছে!' তারপর থেমে জিজ্ঞেস্‌ ক'রলেন, 'তোমার নতুন কবিতা কবে শোনাচ্ছ বিজু, বলো? বহুকাল তোমার কবিতা শুনি না।'

জবাব দিতে গিয়ে এবারে প্রথমটা থাম্‌তে হ'লো বিজনকে। পরে ব'ল্‌লো, 'কবিতা লেখা প্রায় ভুলেই গেছি মেসোমশাই। অনেকদিন আর ওকাজে কলম ধরিনি।'

মিঃ মল্লিক ব'ল্‌লেন, 'সে কি, ফ্যাকাল্টি থেকে বিরত থাকা, সে তো সহজ কথা নয়! একদিন আমি যে যশোহরে নতুন মাইকেলের সম্ভাবনা বোধ ক'রেছিলাম! সে কি আমার তবে সেদিনের একটা দুরাশা মাত্র ছিল?'

—'হয়ত ছিল না!' বিজন ব'ল্‌লো, 'কিন্তু ভেবে দেখলাম মেসোমশাই, বাংলা সাহিত্যে বীরবলের কথাটাই দুরন্ত খাঁটি সত্য: দেশ যতো বৈজ্ঞানিক চিন্তার পথে অগ্রসর হবে, দেশের কাব্যপ্রতিভা ততই নিশ্চিহ্ন হ'য়ে আসবে।'

—'রেখে দাও তোমার বীরবল।' মিঃ মল্লিকের কণ্ঠে এবারে কিছুটা চাঞ্চল্য প্রকাশ পেল: 'এই যে রেবা এত চমৎকার চমৎকার সব গান শিখচে, এর কি তবে কোনই মানে হয় না? পৃথিবীর কোনো অসম্ভব বিষয়কেই আমি কখনও বিশ্বাস করি না। ইচ্ছে ক'রে তুমি তোমার কবি-প্রাণকে হত্যা ক'রবে, এ অসহ্য।'

জবাব দিতে গিয়ে এবারে থাম্‌লো বিজন। আসলে জবাব খুঁজে পেলো না সে। মিঃ মল্লিকের কথাটা তার ভালো লাগলো। প্রথম জীবনের সার্থক প্রশংসা একদিন তাঁর মুখ থেকেই পেয়েছিল বিজন। দেখলো—ক'ল্‌কাতার চিম্‌নির কালিতে আজও তাঁর মন ঢাকা প'ড়ে যায়নি।

রেবা ব'ল্‌লো, 'মিথ্যে কথা দিয়ে বাবাকে শুধু ভোলাতে চেষ্টা ক'রছো বিজুদা। এরপর যেদিন আস্‌বে, কবিতার খাতা সঙ্গে নিয়ে আস্‌বে, ভুল্‌লে চ'ল্‌বে না।'

—'তা না হয় হ'লো, কিন্তু এই মাত্র মেসোমশাই'র মুখে যে কথা শুন্‌লাম, তার পরিচয় পাচ্ছি কবে?'

মিসেস্‌ মল্লিক ব'ল্‌লেন, 'রেবার গান তুমি যেদিন আস্‌বে, সেদিনই শুন্‌তে পাবে বাবা। দক্ষিণ ক'ল্‌কাতা সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় এরই মধ্যে দু'টা মেডেল পেয়েছে রেবা।' থেমে মেয়েকে লক্ষ্য ক'রে ব'ল্‌লেন, 'যা না, মেডেলগুলো এনে একবার তোর বিজুদাকে দেখা না, মা?'

—'ও আবার দেখাবার মতো কিছু নাকি?' ব'লে অপাঙ্গে একবার বিজনের দিকে তাকালো রেবা। তারপর হেসে জিজ্ঞেস করলো, 'আজকাল হকি খেল না বিজুদা?'

—'কেন, সেদিনের কথা বুঝি ভুলতে পারো নি?' ব'লে মুখ টিপে একবার হাস্‌লো বিজন।

স্মিতহাস্যে রেবা ব'ল্‌লো, 'তোমার মেডেল জেতার সেই ইতিহাস কখনও ভুল্‌তে পারি?'

বিজন ব'ল্‌লো, 'আজ তোমার মেডেল পাওয়ায় যে কৃতিত্ব, তার কাছে আমার সেদিনের মেডেল পাওয়া

কবেই ম্লান হ'য়ে গেছে। মিথ্যে আর সেদিনের কথা ব'লে লজ্জা দিচ্ছ কেন?'

—'লজ্জা দিচ্ছি না, আনন্দ পাচ্ছি।' থেমে রেবা ব'ল্‌লো, 'পুরনো কথা ভাবতে কী যে ভালো লাগে, ব'লে বুঝোতে পারবো না।

বিজন এবারে কিছু-একটা বলার আগে মিসেস্ মল্লিক ব'ল্‌লেন, 'নিশি কোথায় গেল দেখ্‌তো মা, বিজুকে চা ক'রে দিতে বল।'

কথা না বাড়িয়ে রেবা এবারে নিশির খোঁজেই উঠে প'ড়লো। নিশি অর্থাৎ নিশিকান্ত: মিঃ মল্লিকের সংসারে বেয়ারা, বাবুর্চি, ঠাকুর, চাকর ব'ল্‌তে একাধারে সব।

নিশিকান্ত ভিতরেই ছিল। অল্প সময়ের মধ্যেই সে চায়ের সঙ্গে কিছু ক্রিম-ক্রেকার এনে বিজনের সাম্‌নে টিপয়ে সাজিয়ে দিল।

মিসেস্ মল্লিক ব'ল্‌লেন, 'চা খাও বিজু।'

—'চা কি শেষ পর্য্যন্ত শুধু আমার জন্যেই হ'লো?' জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে একবার চোখ দুটো তুলে ধ'রলো বিজন। সঙ্গে সঙ্গে সে খাবারের তারতম্যটাও লক্ষ্য করলো। মফঃস্বল-জীবন আর সহর-জীবনের মধ্যে কত পার্থক্য! রেবার পুতুল-বিয়েতে খাবারের অনুষ্ঠানে চায়ের যোগ ছিল না, সে খাবারের মধ্যে ছিল একটা পরিপূর্ণ পরিতৃপ্তি; আজকের চায়ের আয়োজনটা নিতান্তই ভদ্রতা-সূচক, খানিকটা যেন বাহ্যিক আন্তরিকতায় সমৃদ্ধ। তাতে মন ভরে, কিন্তু হৃদয় স্পর্শ করে না! কত পার্থক্য ক'ল্‌কাতায় আর মফঃস্বলে!

চায়ের ব্যবস্থা ক'রে রেবা আবার যথাস্থানে এসে ব'সে ছিল। এবারে বিজনের কথার জবাবে ব'ল্‌লো, 'ভেবেছ আমরা এতক্ষণ চা না খেয়ে ব'সে আছি? কখন্‌ও পাট শেষ হ'য়ে গেছে আমাদের। নাও, ঠাণ্ডা হ'য়ে যাচ্ছে, খেয়ে নাও।'

আর দ্বিরুক্তি না ক'রে এবারে সলজ্জে চায়ের কাপ তুলে নিয়ে চুমুক দিল বিজন।

মিঃ মল্লিক জিজ্ঞেস্ ক'র্‌লেন, 'কি কম্বিনেশন নিলে বি, এ'তে?'

—'হিষ্ট্রি আর ইকোনমিক্স্। ইকোনমিক্সে অনার্স।'

—'দ্যাট্‌স্ গুড্। ইট্ ইজ্ এ্যান্ ইজি এ্যাণ্ড নাইস্ কম্বিনেশন। আমিও একদিন নিয়েছিলাম। ভেরি ইন্‌টারেষ্টিং সাব্‌জেক্ট।'—স্বভাবসুলভ কণ্ঠেই কথাগুলো উচ্চারণ ক'রলেন মিঃ মল্লিক। ক'লকাতায় এসে তাঁর ইংরেজি কথালাপ খানিকটা বেড়েছে। প্রায় প্রতি-কথাতেই তার পরিচয় পাওয়া যায়।

তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে মিসেস্ মল্লিক ব'ল্‌লেন, 'সাম্‌নের শুক্রবার তো রেবার জন্মদিন! ঐ দিন সন্ধ্যায় বিজুকে খাবার নেমন্তন্ন ক'রে রাখি, কি বলো?'

—'এর মধ্যে আর ব'ল্‌বার কি আছে? নেমন্তন্ন না ক'রলেই বা কি? রেবার জন্মদিনে বিজু এসে খাবে-দাবে আনন্দ-ফুর্ত্তি ক'রবে, এইটেই তো স্বাভাবিক।' থেমে এবারে নিজের মুখেই নিমন্ত্রণের পাঠটা সেরে রাখলেন মিঃ মল্লিক।

বিজন ব'ললো, 'বাঃ, এ তো আনন্দের বিষয়! এসে আজ যা-হোক্ কিছু মিষ্টি খাবার যোগ ঘটানো গেল। সেদিন তুমি নিশ্চয়ই গান শোনাচ্ছ, না কি বলো রেবা?'

হেসে রেবা ব'ল্‌লো, 'জন্মদিনে কেউ বুঝি আবার নিজে গায়, সে তো শুধু শোনে! তুমিই বরং সেদিন তোমার কবিতা শোনাবে।'

সোৎসাহে মিঃ মল্লিক ব'ল্‌লেন, 'ভেরি নাইস্ প্রোপোজাল।' তারপর স্ত্রীর মুখের দিকে চোখ দু'টো একবার তুলে ধ'রলেন: 'রেবা হ্যাজ্ এ শার্প্ ব্রেইন্, যাই বলো।'

কথায় কথায় চায়ের কাপ অনেকক্ষণই শেষ হ'য়ে গিয়েছিল, সেই সঙ্গে ক্রিম-ক্রেকারও। দেয়ালের দিকে তাকিয়ে এবারে সম্ভবতঃ একবার ঘড়ির সন্ধান ক'রলো বিজন। কারণ, সে যখন প্রথম এসে ঘরে ঢুকেছিল, ক্লকের আওয়াজ শুন্‌তে পেয়েছিল সে। আসলে ক্লকটা এ ঘরে নয়, পাশের ঘরে। সময় একেবারে কম অতি-বাহিত হয় নি অনুমান ক'রে এবারে বিজন ব'ল্‌লো, 'আজ উঠি মাসীমা, গিয়ে আবার পড়াশুনো আছে।'

—'এস বাবা। তা—শুকুরবার কিন্তু সন্ধ্যায় এখানেই খাবে। রেবার জন্মদিন, আমাদের সকলের পক্ষেই আনন্দের বিষয়।'

—'আস্‌বো বৈ কি, নিশ্চয়ই আস্‌বো। একদিন রেবার পুতুল বিয়ের খাওয়াই শুধু খেয়েছি, এবারে জন্মদিনের খেয়ে তার সুদ তুল্‌বো বৈ কি!'

স্মিতহাস্যে উঠে দাঁড়িয়ে চৌকাঠের বাইরে পা বাড়ালো বিজন। সাম্‌নের গেট পর্য্যন্ত এসে তাকে পৌঁছে দিল রেবা। ফুটপাথে পা বাড়াবার আগে একবার ফিরে তাকালো বিজন রেবার দিকে। কিছু ব'ল্‌বার জন্য নয়, যাবার আগে তার কমনীয় অনিন্দ্যকান্তি মুখখানিই শুধু আর-একবার দেখ্‌বার জন্য।

উজ্জ্বল মুখের হাসি দিয়ে তাকে বিদায় দিল রেবা।

চার

এতদিনে যেন একটা শান্ত তৃপ্তিকর সরোবরে অবগাহন ক'রে উঠ্‌লো বিজন। সামান্য একটা খণ্ডকালের স্মৃতি, তার মূল্যই বা কম কি! রেবার সান্নিধ্য থেকে বেরিয়ে এসে অন্ততঃ সেই স্মৃতিসুখেই খানিকক্ষণ ম'জে রইল বিজন। আগামী শুক্রবারের কথাটা মনে এসে সমস্ত চেতনা যেন তার সহসা একবার অনুরণিত হ'য়ে উঠলো। রেবার জন্মদিন। মাগুরায় থাক্‌তে কখনও রেবার জন্মদিনের উৎসব হ'য়েছে ব'লে মনে পড়ে না। এটা ক'লকাতার জীবনের আকস্মিক ঘটনা। তা' হোক্‌। তবু একটা বিশেষ দিনকে স্মরণ ক'রে আত্মস্থ হওয়া চলে, দশের শুভেচ্ছা মাথায় নিয়ে এগিয়ে চলার উন্মাদনা জাগে সাম্‌নের পথে। কিন্তু শূন্যহাতে এ'দিনে কি রেবাকে শুভেচ্ছা জানাতে যাওয়া চলে? কি আছে তার, কি দিতে পারে সে, কি দেওয়া উচিৎ তার পক্ষে? ভাবতে গিয়ে একবার বাগেরহাটের কলেজ-জীবনের কথা মনে পড়লো বিজনের। পুজোর প্রীতিউপহার দিতে ছন্দা আর রেবার জন্য ব'য়ে এনেছিল দু'খণ্ড কলেজ-ম্যাগাজিন—যার প্রধান আকর্ষণ ছিল তার কবিতা। জন্মদিনেও অবিশ্যি রেবা তাকে গিয়ে কবিতা শোনাতেই অনুরোধ ক'রেছে। কিন্তু কবিতা শোনানোই কি প্রীতিউপহারের সব কিছু?

সমস্তটা পথ, সমস্তটা রাত্রি এই চিন্তাই তাকে বিশেষ ভাবে উতলা ক'রে তুল্‌লো। ট্যুইশনি ক'রে যে অর্থ তার হাতে আসে, তাতে সারা মাসের খরচ বাঁচিয়ে অন্ততঃ উপহার যে দেওয়া চলে না, এ কথা নিশ্চিত। প্রতিমুহূর্ত্তেই নিজের দারিদ্র্য তার বিভৎস রূপ নিয়ে এসে সাম্‌নে দাঁড়ায়, গুঁড়িয়ে দেয় তার সমস্ত চেতনাকে।...

সকালের ডাকে অকস্মাৎ মাগুরার চিঠি এসে উপস্থিত। বিজনের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে উতলা হ'য়ে নির্ম্মলা লিখেছেন:

'...কাল রাত্রে একটা দুঃস্বপ্ন দেখিয়া হঠাৎ জাগিয়া উঠি। তুমি সুস্থ আছ কি না, আমাকে পত্রপাঠ লিখিয়া নিশ্চিন্ত করিবে। একটা মুহূর্ত্তও আমি স্থির থাকিতে পারিতেছি না।

এদিকে আজ সকালেই আবার খবর পাইলাম, রাজসাহীতে ছন্দার বরের বড় অসুখ, কাঁদিয়া কাটিয়া ছন্দা তাহার কাকাকে চিঠি লিখিয়াছে। শুনিয়া অবধি এতটুকুও শান্তি পাইতেছি না। তোমার কুশল জানাইয়া নিশ্চিন্ত করিতে এতটুকুও যেন বিলম্ব করিও না বাবা।...'

স্বতন্ত্র একটুকরো কাগজে অনুযোগ তুলে অতসী লিখেছে:

'...এই বুঝি মনে রাখিবার নমুনা, বিজু ভাই? মা'র স্নেহ যে আমি পুরাপুরি কাড়িয়া লইতে পারি নাই, মা'র চিঠিতেই তাহার পরিচয় পাইবে। অভাগিনী দিদিটাকে যে ইতিমধ্যেই মন হইতে মুছিয়া ফেলিয়াছ, তাহা বুঝিয়াছি। তবু অনুরোধ, ভাই, ভুলিবার আগে একবারটি শেষ চিঠি দিও।...'

অতসীর চিঠিটা প'ড়তে গিয়ে একবার হাসি পেলো বিজনের। কিন্তু সহজ ভাবে মন খুলে হাস্‌তে পারলো না; মা'র চিঠির অক্ষরগুলো খচ্‌ ক'রে এসে বুকে

বিঁধ্‌লো। মা অবিশ্যি তার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে মিথ্যাই উতলা হ'য়েছেন; মায়ের প্রাণ তো! কিন্তু ছন্দার স্বামী শ্যামলকান্তির অসুখের কথা জানিয়ে মা যে তাকেও বড় কম চিন্তায় ফেল্‌লেন না! দুঃখের জীবন থেকে বেরিয়ে গিয়ে সুখের নীড় রচনা ক'রে সংসার-জীবনে কেবল প্রথম পা বাড়িয়েছে ছন্দা, তার মধ্যে এ আবার কী দুঃখের অভিঘাত! শ্যামলকান্তির অসুখ কিছু-একটা বাড়াবাড়ির দিকে না গেলে ছন্দাই বা অমন কেঁদেকেটে চিঠি দেবে কেন রসিকলালকে! ইচ্ছে হ'লো—এক্ষুনি সে একটা টেলিগ্রাম করে ছন্দাকে। কিন্তু সম্ভব হ'লো না, সঙ্কোচ এলো, ঠিকানা সম্পর্কে সন্দেহ হ'লো। বাধ্য হ'য়ে মাকেই সে নিজের কুশল জানিয়ে অবিলম্বে ছন্দার কাছে চিঠি দিয়ে খবর জান্‌তে লিখ্‌লো। সেই সঙ্গে অতসীর চিঠির জবাবেও দু'কলম লিখে দিল বিজন:

'অতসীদি, মিথ্যা অনুযোগ তুলিয়া তুমি নিজের মনে আঘাত পাইয়াছ। কলিকাতার মত কর্ম্মব্যস্ত সহরে ছাত্র পড়াইয়া আমাকে লেখাপড়া করিতে হয়। এখানে না থাকিলে কেউ বুঝিতে পারে না—মানুষের সময় কত অল্প! তাই বলিয়া তোমাকে ভুলিয়া গিয়াছি, একথা তুমি কেমন করিয়া মনে করিলে? মা'র স্নেহ তুমি সমস্তটুকুই কাড়িয়া নাও, তাহাতে আমি সুখীই হইব। তুমি ভিন্ন মাকে দেখিবার আর কে আছে বলো?...'

লেখা শেষ ক'রে নিজের হাতে গিয়ে চিঠিটা ডাকে দিয়ে এলো বিজন। এসে খানিকটা আত্মস্থ হ'য়ে ব'স্‌তে চেষ্টা ক'রলো সে। চিন্তাসূত্র নানা গ্রন্থীতে গাঁথা, উর্ণনাভের মতো সে আপনার জাল আপনি বিস্তার ক'রে চলে; সময় বা কালের প্রতীক্ষা সে রাখে না। সেই গ্রন্থীবদ্ধ জালের গিঠে গিঠে মানুষ হামা দিয়ে চলে রাত্রি-দিন। বিজনও তা-ই চ'লেছে। রেবার জন্মদিনের উপহারের কথাটা নিয়ে সারাদিনের মধ্যে একবারও কিছু-একটা ভাব্‌তে পারেনি সে। মাঝখানে একটা দিন শুধু বাকী, অথচ কিছুই স্থির ক'রে উঠ্‌তে পারেনি বিজন। মিঃ মল্লিকের সম্ভ্রান্ততার দরজা দিয়ে প্রবেশ ক'রতে গিয়ে নিজের ত্রুটিতে পাছে রেবার ঐতিহ্যে কোথাও আঘাত লাগে, এ সম্বন্ধে খানিকটা সচেতনতা আবশ্যক বৈ কি! নিমন্ত্রিতের মধ্যে সে-ই কিছু একজন অদ্বিতীয় হবে না নিশ্চয়ই; মিঃ মল্লিকের আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধবের অভাব নেই ক'ল্‌কাতায়, তারাও কিছু বাদ প'ড়বার মানুষ নয়। তাদের থেকে স্বতন্ত্র হ'য়ে সত্যিই কি সুন্দর কিছু উপহার দেওয়া যায় না রেবাকে?

ইতিমধ্যে কোথা থেকে হঠাৎ মহেন্দ্র এসে ঘরে দাঁড়াল। ঘরে ব'সে থাক্‌বার লোক নয় সে, ব'সে থাক্‌লেই জড়তায় সে আচ্ছন্ন হ'য়ে পড়ে, ততক্ষণে সেয়ার মার্কেটের দরজায় গিয়ে দাঁড়ালে তার পেশীতে আসে রক্তের জোয়ার, মনে আসে দুর্ব্বার গতি। ঘোড়ার মতো ঘুরে ঘুরে অদ্ভুত পরিশ্রম ক'রতে পারে মহেন্দ্র, তাতে তার ক্লান্তি নেই, বিরক্তি নেই। এসে ঘরে ঢুকেই গা থেকে জামা খুলে ব্রাকেটে টাঙিয়ে রাখ্‌তে রাখ্‌তে ব'ল্‌লো, 'ব্রাদারকে যেন কিছুটা নৈর্ব্যক্তিক চেতনার মানুষ ব'লে মনে হ'চ্ছে? ব্যাপার কি, কোনো মেয়ের বাপের কাছ থেকে কিছু অফার পেলে না কি হঠাৎ?'

অফারই বটে! সঙ্কোচের কণ্ঠে বিজন ব'ল্‌লো, 'মুখের ত ট্যাক্স্‌ নেই, বলুন—শুনে যাই। মাঝে মাঝে বড়-বেশী রসিকতা ক'রে বসেন আপনি মহিন্‌দা।'

—'রসিকতা? ভালো কথা ব'ল্‌লেও যদি রসিকতা মনে করো, তবে আর কি ব'ল্‌তে পারি, বলো?' মহেন্দ্র ব'ল্‌লো, 'বয়সের ঔদাস্য দেখ্‌লেই বোঝা যায়।'

—'হ'য়েছে, থামুন।'

—'বেশ, থাম্‌লাম।'

টান্‌ টান্‌ হ'য়ে নিজের বিছানায় শুয়ে প'ড়লো মহেন্দ্র।

অরুণ আজ ঘরে নেই। দু'দিনের জন্য কী কাজে গেছে চন্দননগরে নইলে এতক্ষণে সেও কিছু-একটা কথায় যোগ দিত।

থেমে মহেন্দ্র ব'ল্‌লো, 'সেয়ারের বাজারে আজ যা ভীড় গেল, গত ছ'মাসে এমন ভীড় চোখে পড়ে নি। নতুন এক অসমীয়া পার্টি আজ দু'লাখ টাকা হেরে সে-কি হাউ হাউ ক'রে কান্না! তার পাঁতিপুকুরের প্যালেসখানি এবারে হাত-ছাড়া হ'লো।'

—'মানে?' খানিকটা উৎসুক হ'য়ে উঠ্‌লো বিজন।

—'মানে আর কি! সেয়ার বাজারের হাল্‌ফিল্‌ই এই। দু'লাখ টাকা হেরে গিয়ে লোকটির বাড়ী বাধা প'ড়লো, তা আর উদ্ধার হবার কোনো সম্ভাবনাই নেই।' মুখ টিপে একবার হাস্‌লো মহেন্দ্র।

বিজন ব'ল্‌লো, 'এম্‌নি ক'রেই আপনাদের ফট্‌কার বাজার তবে মানুষকে সর্ব্বস্বান্ত করে? লোভের বশবর্ত্তী হ'য়ে মানুষ তবে যায় ওখানে নিজেকে বলি ক'রতে? নমস্কার আপনাদের সেয়ার মার্কেটকে মহিন্‌দা।'

—'একেবারেই ছেলেমানুষ তুমি।' ব'লে হাস্‌লো মহেন্দ্র, তারপর স্বল্পক্ষণ থেমে ব'ল্‌লো, 'তোমার অত্যুগ্র ইচ্ছে সত্ত্বেও এই জন্যেই বাধা দিয়েছিলাম সেদিন বিজন। সংসারে সব পথ সব মানুষের জন্যে নয়, জানো তো?'

—'জানি।' ব'লে প্রসঙ্গটা চাপা দিতে চেষ্টা ক'রলো বিজন।

মহেন্দ্রও আর কিছু-একটা দ্বিরুক্তি ক'রলো না। উঠে নিজের জামার পকেট থেকে সেয়ার সংক্রান্ত কি একখানি কাগজ বার ক'রে একাগ্র চোখে সেখানি প'ড়ে যেতে লাগ্‌লো।

আকস্মিক নিস্তব্ধতায় ঘরখানি মনে হ'লো গুমোট হ'য়ে উঠেছে। কেমন বিশ্রী লাগতে লাগলো বিজনের। কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ ক'রে আর-একবার গলা তুল্‌লো সে: 'বলি মহিন্‌দাও কি শেষ পর্য্যন্ত পড়াশুনোয় মন বসালেন নাকি?'

—'কি আর করি বলো, ফিল্ড-ওয়ার্কে নামতে গিয়ে আগে থাকতে কিছু প্রিপারেশন দরকার বৈ কি!' মহেন্দ্র ব'ল্‌লো, 'গোটা জীবনটাই একটা প্রিপারেশনের বস্তু।'

অত্যন্ত স্বাভাবিক কণ্ঠেই বিজন ব'ল্‌লো, 'আপনি কেন ফিলজফার হ'লেন না মহিনদা?'

—'এবারেই হাসালে তুমি। একদিন তুলি ছেড়ে ছবি আঁকা বন্ধ ক'রলাম; ফিলজফার হবার সুযোগ ছিল কোথায় জীবনে?' ব'লে চোখের এক অদ্ভুত ভঙ্গী ক'রলো মহেন্দ্র।

কথাটাকে অধিকদূর না বাড়িয়ে স্বল্পক্ষণ থেমে বিজন ব'ল্‌লো, 'আমি যে একটা মুস্কিলে প'ড়ে গেছি মহিন্‌দা, কি করি বলুন তো? জন্মদিনের একটা উপহার মনে মনে কিছুতেই সাব্যস্ত ক'রে উঠতে পারছি না।'

—'কার? ছেলের, না মেয়ের?' বিজ্ঞের মতই প্রশ্ন ক'রলো মহেন্দ্র।

—'আবার তো বাজে ব'কতে সুরু ক'রলেন!' ব'লে মুখ টিপে হাস্‌লো বিজন।

—'এতেও বাজে বকা হ'লো? উপহারের ব্যাপারে স্ত্রী-পুরুষের তারতম্য আছে বৈকি!'

থেমে বিজন ব'ল্‌লো, 'ধরুন, মেয়েদের উপযোগিই কোনো উপহার।'

না হেসে পারলো না এবারে মহেন্দ্র, ব'ল্‌লো, 'এই নিয়েই সমস্যায় প'ড়েছ? বলি, পথে কি চোখ বুজে হাঁটো, না চোখ দু'টো খোলা রাখো! সারা বাজারটাই তো মেয়েদের জন্যে, ডিজাইন আর রঙের ছড়াছড়ি পথে।'

—'তা দেখেছি, ওসবে চ'লবে না।' বিজন ব'ল্‌লো, 'দামে সস্তা অথচ খুব লাভ্‌লি হয়, এরকম কিছু চাই।'

—'একটু বাজে বকি তবে এবারে।' থেমে মহেন্দ্র ব'ল্‌লো, 'প্রণয়ের ব্যাপারে কিন্তু ওটা নিরাপদ নয়। সামান্য জিনিষকেও মহার্ঘ্য ব'লে না চালাতে পারলে প্রণয়ের স্থায়িত্ব সম্পর্কে সন্দেহ উপস্থিত হয়। জানি না, কোন্ সম্পর্কের জগতে তোমার উপহার গিয়ে পৌঁছাবে!'

এবারে নিজের মধ্যে কিছুটা সঙ্কুচিত হ'য়ে প'ড়লো বিজন। ব'ল্‌লো, 'নিন্, হ'য়েছে, কাজ নেই আমার উপহার দিয়ে, এবারে দয়া ক'রে থামুন দিকিনি মহিনদা।'

—'মহেন্দ্র থাম্‌লেই কি আর মন থামে! যাকেই হোক্, যেখানেই হোক্, উপহার হয়ত শেষ পর্য্যন্ত তুমি দেবেই।' খানিকটা সহানুভূতির কণ্ঠে এবারে মহেন্দ্র ব'ল্‌লো, 'ঝামেলা না বাড়িয়ে দু'পাঁচ টাকার একটা ফুলের তোড়াই না হয় দাও না—যার স্থায়িত্ব কম, অথচ পূর্ণতার দিক দিয়ে যার তুলনা নেই!'

কথাটা মন্দ নয়। ফুলের সত্যিই তুলনা নেই। কিশোর-জীবনে একদিন মাষ্টারের গলায় মালা দেবার জন্য রেবাকে বকুল ফুল কুড়িয়ে মালা গেঁথে দিতে

বলেছিল বিজন। রেবা সেদিন সে-অনুরোধ রাখেনি, রেখেছিল ছন্দা। রেবার জন্মদিনে তাকে এবারে ফুলের উপহার দিয়ে জব্দ করা যাবে। মনে মনে উপহার নির্ব্বাচন ঠিক হ'য়ে গেল বিজনের। ব'ললো, 'দি আইডিয়া, ভালো সাজেস্‌সান দিয়েছেন এতক্ষণে মহিনদা।'

মহেন্দ্র আর দ্বিরুক্তি না ক'রে বিজনের চোখের উপর দিয়ে একবার নরম দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে আবার নিজের কাজে মন-সংযোগ ক'রলো।...

শুক্রবার যথাসময়ে মিঃ মল্লিকের বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হ'লো বিজন। যাবার আগে নিউ মার্কেট থেকে ভালো দেখে বিলেতি ফুলের একটা তোড়া নিয়ে গেল অয়েল-পেপারে মুড়ে, তার সাথে স্বরচিত আট লাইনের একটা কবিতা: জন্মদিনের শুভেচ্ছা আর ভালোবাসা দিয়ে গাঁথা তার অক্ষরগুলো

পুষ্পময়ী হোক্ আজ তোমার জন্মদিন
হও প্রেমময়ী;
জীবনে লঙ্ঘিতে হবে দুস্তর বন্ধুর পথ,
হ'তে হবে জয়ী।
তোমার কল্যাণী-মূর্ত্তি ঢেলে দিক্ সর্ব্বলোকে
পারিজাত সুধা,
শুভক্ষণে আমি আজ সাজালাম পুষ্পরাগে
তোমার বসুধা।

উপহার পেয়ে রেবা খুসীতে উপ্‌চে প'ড়লো। নানা ডিজাইনের শাড়ী, কাস্কেট আর সোনার জিনিষ সে কম পায়নি। তাদের স্থায়িত্ব শুধু একটি দিনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; ভবিষ্যতের অনেকগুলো স্মৃতিমুখর দিনের নানা প্রহরে প্রহরে তারা ব'য়ে নিয়ে আসবে অপরূপ আনন্দের ধারা। তবু এই ক্ষণস্থায়ী একগুচ্ছ ফুলের মধ্যে যেন নবজীবনের একটা সন্ধান পেলো রেবা। অন্য কারুর উপহারের সঙ্গেই এমন একটি উদ্দীপনাময়ী কাব্য কিছু নেই। কতবার যে মনে মনে আবৃত্তির সুরে কবিতাটি প'ড়লো রেবা, তা সে নিজেই বুঝতে পারলো না।

মিঃ মল্লিক ব'ল্‌লেন, 'কবিতার এই ছোটখাটো স্পর্শই কি আজকের দিনে যথেষ্ট বিজু? কথা ছিল, আজ তুমি নিজের খাতা থেকে কবিতা আবৃত্তি ক'রে শোনাবে।'

লজ্জিতকণ্ঠে বিজন ব'ল্‌লো, 'নতুন কিছু যে আর লিখিনি, তা তো সেদিনই ব'লেছি মেসোমশাই। পুরনো লেখাগুলো আজ নিজের কাছেই ভালো লাগে না। দেখলাম—সেগুলো লোকসমাজে বার ক'রবার মতো নয়।'

মিঃ মল্লিকের পাশে থেকে একটি যুবক প্রশ্ন ক'রলো, 'উনি তবে সত্যিকারের জাত-কবি?'

—'এ বাডিং পোয়েট অব বেঙ্গল একদিন মাইকেল আর রবীন্দ্রনাথও ওর মতই ছিলেন সবে সুরু; অতুল সম্ভাবনা র'য়েছে বিজুর জীবনে। কে ব'ল্‌তে পারে, এই বেড়ালই বনে গেলে বন-বেড়াল হবে কিনা।' ব'লে যুবকটির মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাস্‌লেন মিঃ মল্লিক।

বিজন ব'ল্‌লো, 'জীবন-তপস্যায় শেষ পর্য্যন্ত যে বিড়ালত্ব প্রাপ্তি, সে সম্বন্ধে সত্যিই ভুল নেই মেসোমশাই।'

আসলে মিঃ মল্লিক উপমা টানতে গিয়ে কিছু বাক্য-বিভ্রাট ক'রে ব'সেছিলেন; তিনি বোঝাতে চেয়ে-ছিলেন—এই কবিই যে একদিন বিলেত গেলে পোয়েট-লরিয়েট হবে না, কে ব'ল্‌তে পারে!

সেদিকে ইঙ্গিত ক'রে এবারে যুবকটি ব'ল্‌লো, 'নট্ টু বি ক্যাট্, বাট্ টু বি লরিয়েট, সম্ভবতঃ এ কথাই উনি ব'ল্‌তে চেয়েছেন।' ব'লে মিঃ মল্লিকের মুখের দিকে তাকাতেই তিনি ব'ল্‌লেন, 'এক্‌জাক্‌ট্‌লি সো। বেড়াল মানে কি, বিজু হবে একদিন বিপুল বিশ্বের বিরাট বাণী-সাধক। তোমার সঙ্গে তো আলাপ নেই দিলীপ, এস আলাপ করিয়ে দিই।'

ততক্ষণে বিজন এবং দিলীপ দু'জনেই নমস্কার ও প্রতি নমস্কারের ভঙ্গীতে যুক্ত হাত সামনে প্রসারিত ক'রে ধ'রেছে।

মিঃ মল্লিক ব'ল্‌লেন, 'আমরা এতকাল মাগুরায় এক পাড়াতেই বাস ক'রেছি। বিজনের বাবা কুঞ্জবিহারী বাবু ছিলেন আমাদের শুভানুধ্যায়ী বন্ধু। বিজু তার বাবার গুণ পেয়েই বড় হ'য়েছে। বিজুর মাও বড় নিষ্ঠাবতী

মহিলা। রেবার মার মুখে তাঁর কথা শুন্‌তে পাবে। বিজু আমাদের ঘরের ছেলের মতো।'

স্মিতহাস্যে দিলীপ ব'ল্‌লো, 'বড্ড খুসী হ'লাম পরিচয় জেনে। এখানেই কোথাও সার্ভিসে আছেন নিশ্চয়ই ?'

—'এই বয়সেই সার্ভিস্‌, বলো কি তুমি ?' মিঃ মল্লিক ব'ল্‌লেন, 'বিজু এখনও কলেজ-ষ্টুডেণ্ট্‌, ক'লকাতায় বি-এ প'ড়ছে।'

বিজন ব'ল্‌লো, 'পরিচয়টা শেষ পর্য্যন্ত এক-তরফাই থেকে গেল না কি মেসোমশাই ?'

—'গুড্‌ গড্‌। তাও তো বটে। দিলীপের পরিচয়টা যে দেওয়াই হয় নি তোমাকে!' থেমে মিঃ মল্লিক ব'ল্‌লেন, 'সম্প্রতি বিলেত থেকে নতুন ব্যারিষ্টার হ'য়ে এসেছে দিলীপ। এ পাড়ায় দত্ত বাড়ী ব'ল্‌তে ওদের বাড়ীকেই বোঝায়। বাড়ীটা পাশেই, লক্ষ্য ক'রলে এখান থেকেই দেখ্‌তে পাবে।' পাশের খোলা জানালার ভিতর দিয়ে সাম্‌নেই একটা বাড়ীর দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ ক'রলেন মিঃ মল্লিক।

পাশাপাশি হু'খানি বাড়ীর পরে তৃতীয় বাড়ী। তিন তলার উপরেও ছোট একটি চিলে কোঠা। এখান থেকে বাড়ীটা সম্পূর্ণ চোখে না প'ড়লেও ত্রিতল থেকে চিলে কোঠা অবধি স্পষ্টই চোখে ভেসে ওঠে। নতুন হাল-ফ্যাসানের কার্নিসে বাড়ীটা বিলেতি রুচিরই পরিচয় দেয়। সেদিকে একবার লক্ষ্য ক'রে বিজন ব'ল্‌লো, 'আপনারা তবে একেবারেই নেক্‌স্ট্‌-ডোর-নেইবার ?'

মিঃ মল্লিক ব'ল্‌লেন, 'যেমন তোমরা আর আমরা ছিলাম মাগুরায়। এখানে এসে প্রথম কথা ব'ল্‌বার লোক পাই দিলীপদের। ওর বাবা দাশরথী বাবু যেমন মিশুক্‌ লোক, তেম্‌নি একেবারে মাটির মানুষ।'

উত্তরে বিজন কি একটা ব'ল্‌তে যাচ্ছিল, ইতিমধ্যে নিশিকান্ত এসে খবর দিল—'খাবার প্রস্তুত।'

পাশের ঘরে ডাইং টেব্‌লে খাবার ব্যবস্থা। জীবনে চেয়ার-টেব্‌লে ব'সে খাওয়া বিজনের এই প্রথম। পিঁড়িতে ব'সে গ্রাসের পর গ্রাস তুলে খাবার অভ্যাস চিরকাল, আজকের এই ব্যবস্থায় তাই কিছুটা অসুবিধেই বোধ ক'রলো সে।

পাশে ব'সে মিসেস মল্লিক ব'ল্‌লেন, 'লজ্জা ক'রে খেয়ো না যেন বিজু!'

লজ্জা যে না ক'রছিল, তা নয়। তবু স্বাভাবিক কণ্ঠেই বিজন ব'ললো, 'রেবার জন্মদিনের খাওয়া, এখানে লজ্জার অবকাশ কোথায়!'

খাবার পরিবেশন ক'রছিল রেবা নিজের হাতে, ব'ললো, 'কবি মানুষদের কথাই সব, পাকস্থলী ঠন্‌ঠনে। লজ্জাই যদি না ক'রবে তো পাতের খাবার মুখে উঠ্‌ছে না কেন ?'

—'কেন, না-ই বা উঠ্‌চে কি!' মুখ তুলে বিজন ব'ললো, 'বলি, হঠাৎ এমন আতিথেয়তা দেখাবার আর কি লোক পেলে না ? পাশে তো আরও কেউ র'য়েছেন!'

দিলীপ ব'ললো, 'আমাকে যে কোনো জিনিষ সাধ্‌তে হয় না, তা ওঁরা জানেন; আর জানেন ব'লেই এতক্ষণে সমস্ত আতিথেয়তাটা গিয়ে চেপেছে আপনার ঘাড়ে। আপনি বরং হাত-চালনাকে কিছু দ্রুত ক'রতে চেষ্টা করুন বিজনবাবু।'

বিজন ব'ললো, 'খাদ্যবস্তুর সঙ্গে তবে যে বক্সিং ল'ড়তে হয়!'

কথা শুনে এবারে না হেসে পারলো না কেউ।

মিঃ মল্লিক ব'ললেন, 'না, না, তোমাকে তাড়াতাড়ি ক'রতে হবে না বিজু, ধীরে সুস্থেই তুমি পেট পুরে খাও।'

পেট পুরেই খেয়ে উঠলো বিজন। তার সকল লজ্জার মধ্যেও খাদ্যসূচী'র দীর্ঘতা পীড়া দিতে পারে নি তার পাকস্থলীকে, বরং কিছুটা পীড়নই ক'রছে এখন। অনেক-দিন এমন সুললিত খাদ্যে এত অত্যধিক আহার ঘ'টে ওঠে নি তার। ওয়েলিংটনের মেসে উড়ে ঠাকুরের রান্না খেতে খেতে খাবারের পরিমাণ তার ইদানীং একে-বারেই ক'মে এসেছিল। অকস্মাৎ খাদ্যের পরিমাণ কিছু বেশী হ'লে পাকস্থলীকে এখন পীড়নই করে।

দিলীপ বেশীক্ষণ আর অপেক্ষা ক'রলো না। এক-সময় বিদায় নিয়ে সে উঠে গেল। হাঁটা-চলার মধ্যে তার বিশেষ একটা সাহেবি ভঙ্গী জড়িত। সেটুকু লক্ষ্য এড়ালো না বিজনের। বিলেত গেলে মানুষের রুচি যে কী অদ্ভুত ভাবে বদ্‌লায়, শুধু সেই কথাটাই ভাবতে লাগলো সে।

শুধু বিলেত কেন, ক'লকাতাই কি কম! দি সেকেণ্ড সিটি অব দি বৃটিশ এম্পায়ার।...

নিমন্ত্রিতের সংখ্যাটা শুধু দিলীপ আর বিজনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। নিকটতম ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিরাও বাদ যান নি অনেকেই, যথাসময়ে এসেই তাঁরা নিমন্ত্রণ রক্ষা ক'রে গিয়েছিলেন। ব্যাচের শেষে প'ড়েছিল দিলীপ আর বিজন।

মিসেস্ মল্লিক ব'ল্লেন, 'তাড়াতাড়ি যাবার তাগিদ নেই তো কিছু বাবা, দু'দণ্ড ব'সে বরং রেবার সঙ্গে গল্প ক'রে যাও। সেই ভোর থেকে এ অবধি একটু ক্ষণের জন্তও ব'স্তে পারেনি মেয়েটা। এতক্ষণে তবু যা-হোক্ কাজ চুক্লো।'

উঠবার সত্যিই তাগিদ ছিল না বিজনের। আবার গিয়ে তো সেই একঘেয়ে মেসের জীবনযাত্রা, তার চাইতে এখানে বরং পারিবারিক স্বাচ্ছন্দ্যকে ঘিরে মনটা কিছুক্ষণের জন্তও স্বপ্ন-সায়রে অবগাহন ক'রে উঠতে পারছে।

একটু বাদেই রেবা এসে পাশে ব'স্লো। এতক্ষণে দু'টো ভালো ক'রে কথা বলার অবকাশ হ'লো তার।

বিজন লক্ষ্য ক'রে দেখলো—কপাল থেকে এখনও তার চন্দন-সজ্জা মুছে যায়নি। কাজল-পরা চোখের দু'পাশ দিয়ে এসে মিশেছে সেই চন্দন-সজ্জা। উপহার এনে হাতে তুলে দেবার সময় এমন সযত্ন দৃষ্টি দিয়ে লক্ষ্য ক'রতে পারে নি বিজন। লোকজনের সাম্নে সে-দৃষ্টি হারিয়ে গিয়েছিল। পাশে মিসেস্ মল্লিকের চেয়ারের দিকে তাকাতে গিয়ে দেখলো—কখন্ তিনি নিঃশব্দে উঠে চ'লে গেছেন। খেয়ে উঠে অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্ত বিশ্রাম না নিয়ে পারেন না মিঃ মল্লিক। মিসেস্ মল্লিক উঠে একসময় স্বামীর পাশে গিয়েই ব'সেছেন।

রেবা ব'ল্লো, 'এমন সুন্দর ফুলের তোড়া তুমি কোথায় পেলে বিজুদা?'

বিজন ব'ল্লো, 'ক'ল্কাতার বাজারে শুনি সমস্ত পৃথিবীটাকেই খুঁজে পাওয়া যায়, ফুল তো সামান্ত জিনিষ। এমন আর কি সুন্দর!'

—'বাঃ, সুন্দর নয়? আমার সমস্ত উপহারকে আলো ক'রে দিয়েছে তোমার ফুলের তোড়া আর কবিতা।'

—'আয়নায় হয়ত তা হ'লে আজ নিজেকে একটি বারও ভালো ক'রে দেখবার অবকাশ পাওনি তুমি!' বিজন ব'ল্লো, 'ফুল সুন্দর হ'য়েও যে কত কুৎসিৎ হ'তে পারে, তোমার মুখের দিকে না তাকালে তা বিশ্বাস করা কঠিন। কোনো উপহারই তোমার সৌন্দর্য্যের সীমা ছাড়িয়ে উঠতে পারে না।'

অকস্মাৎ এতখানি আত্মপ্রশংসা রেবা কল্পনা ক'রতে পারে নি। কিছুক্ষণের জন্ত এবারে থাম্তে হ'লো তাকে। পরে ব'ল্লো, 'এমন ক'রেও তুমি বাড়িয়ে ব'ল্তে পারো বিজুদা! তোমার এমন সুন্দর উপহারের সঙ্গে তুমি তুলনা ক'রছো আমাকে! তোমার কবিতা প'ড়ে মা আর বাবা যে কতখানি মুগ্ধ হ'য়েছেন, তা তুমি জানো না। ওটাকে ফ্রেমে বাঁধিয়ে আমি আমার ছবির পাশে রেখে দেবো।'

—'রেখে দিলে তুমি ভুল ক'রবে, মানাবে না। এত তুচ্ছ জিনিষও নাকি আবার বাঁধিয়ে রাখে মানুষ!'

—'তুচ্ছ?' থেমে রেবা ব'ল্লো, 'আমার জন্মদিনটাও তবে মিথ্যে বলো?'

উত্তরে কি একটা ব'ল্তে গিয়ে এবারে কথা হারিয়ে ফেল্লো বিজন পরে ব'ল্লো, 'আজ সমস্ত আনন্দের মধ্যেও একটা অভাব থেকে গেল, রেবা।'

—'কিসের অভাব?'

—'তোমার গান।'

ম্লান হেসে রেবা ব'ল্লো, 'তোমার কাছে সত্যিই আমি অপরাধী বিজুদা। ভোর থেকে সব কিছু নিজের হাতে ক'রে-ক'র্ম্মে শেষ পর্য্যন্ত আর গান গাইবার মতো সুযোগ পেয়ে উঠ্লাম না। অনেকেই ব'লেছিল, কাউকেই সুখী ক'রতে পারিনি। এরপর যেদিন আসবে, কোনো ওজর তুল্বো না। কিন্তু কথা দিয়ে যাও—অন্ততঃ পাঁচটা নতুন কবিতা লিখে এনে শোনাবে?'

এবারে ইচ্ছে ক'রেও বিজন না ব'ল্তে পারলো না, বরং স্বাভাবিক কণ্ঠেই ব'ল্লো —'শোনাবো।'

ইতিমধ্যে পাশের দরজা দিয়ে এসে সামনে দাঁড়ালো নিশিকান্ত।

রেবা জিজ্ঞেস্ ক'রলো, 'কি খবর নিশি ?'

নিশিকান্ত ব'ল্‌লো, 'আমি কিছুক্ষণের জন্য একবার বাইরে যাবো দিদিমণি। আপনাকে একবার ভাড়ার ঘরে আসার দরকার।'

—'যাচ্ছি, যাও।'

বিজন ব'ল্‌লো, 'আমি আজ তবে উঠি রেবা। তোমার এখন রেষ্ট্ নেওয়া দরকার।'

রেবা জিজ্ঞেস্ ক'রলো, 'আবার কবে আস্‌চো এদিকে ? মাসিমার চিঠি পত্র পাও তো ?'

—'পাই। ভালোই আছেন। আস্‌বো কবে ঠিক ব'ল্‌তে পারি না। শনি রবিবার ছাড়া সময়ও পাই না বড়-একটা। ট্যুইশনি ক'রতে হয়, তাতেই সময় চ'লে যায়। এর মধ্যে যদি এসে পড়ি, তবে জানবে—তা তোমার গানের আকর্ষনেই।' ব'লে আর অপেক্ষা ক'রলো না বিজন। পথে এসে সাম্‌নেই বাস পেয়ে সে উঠে প'ড়লো।

রেবা ততক্ষণে তাদের ভাড়ার ঘরে ঢুকে নিশিকান্তের সঙ্গে কথালো হ'য়ে উঠেছে। একটা একটা ক'রে তাকে হিসেব বুঝিয়ে দিচ্ছে নিশিকান্ত।

[ক্রমশঃ

চিহ্ন

শ্রীবিভূতিভূষণ ভট্টাচার্য্য

মুখর সে মুখ ভাষাহারা আজি নাহিক গানের মায়া,
আসমানে গড়া স্বপ্ন সৌধে কালের কুয়াসা ছায়া,
বিদ্যুৎ জ্বালা লয়ে,
দুঃখবেদনা লুকানো বক্ষে জাগি সাথীহারা হয়ে।

কানে বেজে ওঠে শুধু হাহাকার সমীরণে ভেসে আসা,
যাযাবরী মন চলে গেছে দূরে ভাঙিয়া ক্ষণিক বাসা,
ধূলিমাঝে আছে জানি,
চরণচিহ্নে ফেলে রেখে যাওয়া স্মরণচিহ্নখানি।

কাজল তোমার ভুরুতে দেখেছি রাত্রির ঘন কালো,
রহস্যভরা আঁখিতারা মাঝে বিস্ময় ঘেরা আলো,
মহা জিজ্ঞাসা তুমি,
নীল সাগরের অতলে কোথায় তোমার চলার ভূমি।

বেদনা জড়ানো নিঝুম রজনী তাকাতে পারি না দূরে,
অসীম শূন্য বারে বারে যেন বুকখানি থাকে জুড়ে,
হেথায় তারার দল,
কম্পিত আলো পাঠাইয়া করে ধরণীরে ঝলমল।

পৃথিবীর মাটী আকাশ বাতাস গাছপালা ছায়া আলো
দিক্‌হারা মরুপথিকের মত আর ত লাগে না ভালো,
সব পুরাতন মানি,
নীড়ভাঙা মনে জেগে ওঠে শুধু অতীতের হাতছানি।

কি শিখিলাম

শ্রীহরিহর শেঠ

(আমার কর্ম্ম জীবনের শিক্ষা)

বিনয়ের দ্বারা লুকাইবার কোন প্রয়োজন দেখি না, আমাকে অনেকে অনেক প্রকার বিশেষণে বিশেষিত করিয়া থাকেন, কিন্তু যিনি যে আখ্যায়ই আখ্যায়িত করুন, আমার প্রকৃত পরিচয় এক কথায় ব্যবসাদার। আমার পিতা পিতামহ প্রভৃতি সকলেই ব্যবসায়ী ছিলেন, আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ অংশও ব্যবসায় কার্য্যেই অতিবাহিত হইয়াছে। আমার কর্ম্ম-জীবন বলিতে ইহাকেই প্রধান বলিতে হয়। জীবনের প্রায় এক তৃতীয়াংশ ব্যবসায় কার্য্যে কাটাইতে হইয়াছে বলিয়াই শুধু নহে, এই কার্য্যকে উপলক্ষ করিয়া ভগবান প্রদত্ত কিছু অর্থ সামর্থ্য হইতেই কর্ম্মের অন্য পথে অগ্রসরের সুযোগ হইয়াছে। তাহা আমার তথাকথিত দেশ সেবার অন্যতম।

আমার ব্যবসায় জীবনের শিক্ষার কথায় বলিবার মত কিছু আছে মনে করি বলিয়াই একটি স্বতন্ত্র অধ্যায়ে তাহা বিষদ ভাবে লিখিয়াছি। ব্যবসায় ক্ষেত্রে থাকিয়া তখন না বুঝিলেও এখন বুঝিতেছি, সে জীবনটা আমার কাছে সুখেরই ছিল। তখন আমার সাহিত্য-সাধনা বা সাহিত্যিক সাজার সখ মিটান বন্ধ করিতে হওয়ায় যথেষ্ট ক্ষোভের কারণ হইলেও, অর্থোপার্জ্জনের জন্য যে ক্ষেত্রে অনেককে স্খলিত হইতে দেখা যায়, অর্থাৎ বিপথে আকর্ষণ করে, ভগবানের কৃপায় আমার সে অবস্থা একবারও হয় নাই। অথচ আমাদের পৈত্রিক যৌথ কারবারের কথা ছাড়িয়া দিলেও, আমার নিজস্ব কারবারে আমার আকাঙ্খার মাত্রা বা কোন সীমা, এমন কি ঠিক কিছু আকাঙ্খা না থাকিলেও তিনি আমার পক্ষে অনেক দিয়াছিলেন। আর হয়ত অব্যবসায়ীদের মধ্যে কেহ কেহ শুনিলে আশ্চর্য্য হইবেন, সে জন্য আমার কোন পরিশ্রম বা মূলধনের বা বিন্দুমাত্র অন্যায় অর্থাৎ দুর্নীতির আশ্রয় লইতে হয় নাই। অবশ্য সে সময়টা স্বাভাবিক অবস্থা নহে, প্রথম ইউরোপীয় যুদ্ধের শেষ সময়। তখন চোরা বাজার বলিয়াও কিছু ছিল না।

লেখক

ব্যবসায় ক্ষেত্রে উৎসাহ বলিয়া কোন কিছু আমি আমার পিতৃদেবের নিকট হইতে কোন দিনই পাই নাই, তিনি এ বিষয় আমার যোগ্যতায় সন্দিহান ছিলেন। কিন্তু আমার ভিতর হইতে একটা প্রেরণা বা উৎসাহ আমি অনেক সময়ই লাভ করিয়াছিলাম। এবং মনে করি তাহাতেই যথেষ্ট শক্তিবান হইয়া তখনকার দিনগুলি বেশ সোজা ও সচ্ছন্দ ভাবে কাটাইতে পারিয়াছিলাম। তাহা হইতেই আমার শিক্ষা যাহা সৎ তাহা সকল ক্ষেত্রেই সৎ। শঠতা, প্রবঞ্চনা, ঠকাইবার প্রবৃত্তি অন্য সকল ক্ষেত্রে যেমন ভাল নহে, ব্যবসায় ক্ষেত্রেও তাহাই।

আপাততঃ সময় বিশেষে হয়ত ইহার দ্বারা কিছু অর্থাগম হইতে পারে, কিন্তু পরকালের কথা জানি না, ইহকালে পরিণামে ইহাই পতনের মূল হইয়া থাকে।

আমার কর্ম্মজীবনের অপর দিক দেশের কাজ বা দেশ সেবা। কংগ্রেস, ফরওয়ার্ড ব্লক, হিন্দুমহাসভা, সমাজতন্ত্রীদল এমন কি কমিউনিষ্ট পার্টি প্রভৃতি এই সবের মধ্য দিয়া যে কাজ, এখন তাহাই সাধারনতঃ দেশের কাজ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ইহার ভিতর দিয়া বা কোন দল বিশেষের মধ্যমে না হইলে যদি দেশের কাজ না হয়, তাহা হইলে আমার কাজকেও সংজ্ঞা দেওয়া চলে না। আমার দেশ সেবা যাহা তাহা আর কিছু নহে, কেবল দেশের কতকগুলি জনহিতকর সাধারণ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হইয়া তাহার সেবা, আর মাতৃ-অঙ্গের যে যে অঙ্গ আভরণহীন মাত্র, সেই সেই অঙ্গে দুই চারিখানা অলঙ্কার বিন্যাসের উপলক্ষ্য হইবার চেষ্টা মাত্র। এই মা আমার দেশ মা—চন্দননগর। ভারত জানিনা, বংলা জানিনা, আমি যেমন ক্ষুদ্র আমার মাও তেমনই ক্ষুদ্র। এই আমার ভারত, এই আমার বাংলা। জানিনা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, মহামানব মহাত্মাগান্ধী ভারত-মাতার সেবায় আত্মসমর্পণ করিয়া আমার এই ক্ষুদ্র সহরের সেবার আনন্দের অপেক্ষা অধিক আনন্দ পাইয়াছিলেন কি না!

সংসারে মানুষ মাত্রেই কাজ করিয়া যাইতেছে। শুনা আছে গীতার মূল সূত্র নিরন্তর কর্ম্মেরত থাকা এবং আসক্তিহীন কর্ম্মই হইতেছে শ্রেষ্ঠ। ইহাই কর্ম্মযোগের মূল ভিত্তি। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, বিনা অভি-সন্ধিতে সাধারনতঃ বড় একটা কাজ হয় না; ধর্ম্ম, অর্থ, যশ, মানের জন্যই অনেকে অনেক কর্ম্ম করেন। ইহা ভিন্ন স্বার্থশূন্য বা বাধ্য না হইয়া দেশের জন্য দশের জন্য যিনি কাজ করিয়া যান তিনি মহাপুরুষ। আমার কাজের মধ্যে আসক্তি কি ছিল না ছিল ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারি না। অভিসন্ধি ছিল, তাহা দেশের বা জনসাধারণের উপকার ভিন্ন অন্য কিছু না হইলেও, কর্ত্তব্য পালনের জন্য কাজ করিয়াছি। তাহাদের স্বার্থের চিন্তার সঙ্গে যে নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থ-লেশ শূন্য ছিল তাহা নহে, প্রকারান্তরে তাহা নাম যশের আকাঙ্খা। বলা বাহুল্য, তবে সে শুধু ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় যে সব কর্ম্ম তাহার মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল। অপরের পরিশ্রমলব্ধ ফলের জন্য হয়ত কখন কখন আমি প্রশংসা পাইয়াছি, কিন্তু আমি কখন সে প্রত্যাশা করি নাই।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমার দেশ বলিতে আমি খুব বড় করিয়া ভাবিতে কখনও পারি নাই। যদিও বাঙ্গলা ও বাঙ্গালী জাতির জাতীয় চরিত্রের অভাব, আবশ্যকতা ও প্রতিকারের উপায় সম্বন্ধে কখন কিছু চিন্তা আপন হইতে মনে আসিয়াছে, কিন্তু তাহার সমাধানের সক্রিয় উপলক্ষ্য হইবার বিশেষ ভাবে চেষ্টা কখন করি নাই। যদিও জগৎসমীপে ভারত ও ভারতবাসীর সম্পদ ও গৌরব গরিমার কথা শুনিলে প্রাণের মধ্যে প্রভূত আনন্দ হয়, তাহা হইলেও সে বিষয় বিশেষ কোন চেষ্টা কখন করিতে পারি নাই। ইচ্ছা বা আগ্রহের অভাবে নয়, শক্তির অভাবে, সাহসের অভাবে। আমাদের পরিশ্রম বিমুখতা, ব্যবসা বিমুখতা, শিক্ষার ত্রুটি, সর্ব্বোপরি নারীজাতির অজ্ঞতা বা শিক্ষার অভাব ও তাহার পরিণাম প্রভৃতি সম্বন্ধে অনেক সময় অনেক কথা মনে হইয়াছে। সে সম্বন্ধে চিন্তায় ব্যথা পাইয়াছি, কিন্তু এই পর্য্যন্ত। বড় জোর যাহা ভাবিয়াছি নিবন্ধের সাহায্যে মনোভাব ব্যক্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছি মাত্র! ঠিক বলিতে গেলে, যেদিন হইতে দেশের কথা ভাবিতে শিখিয়াছি, শত ত্রুটির আধার আমার এই চন্দননগরের বহু অভাবের কথা ভাবিয়াই সর্ব্বদা মনটা ম্রিয়মান থাকিত। সে জন্য ক্ষুদ্র সামর্থে যেটুকু সম্ভব তাহা মোচনের উপলক্ষ হইবার প্রয়াস পাইয়াছি মাত্র।

সহরে নারীজাতির আবশ্যক শিক্ষার অভাব আংশিক মোচন ও জনসাধারণের প্রাথমিক শিক্ষা বিষয় উন্নতি সম্বন্ধে যদি আমি কিছুমাত্র উপলক্ষ্য হইতে পারি, সেজন্যই প্রথম আমার মনে একটা প্রবল বাসনা জাগিয়াছিল; কিন্তু নিজের কর্ম্মশক্তির দৈন্যতা, উপযুক্ত অর্থের অভাব, তদোপরি পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রতিকূলতা লক্ষ্য করিয়া সেদিকে অগ্রসর হইতে সাহস হয় নাই। তৎপরে ১৩২২ সালে যখন বন্ধুদের আহ্বানে প্রথম চন্দননগর

পুস্তকাগারের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সহিত সংশ্লিষ্ট হই, প্রকৃত প্রস্তাবে তখন হইতেই আমার তথাকথিত দেশ-সেবা বা পাবলিক্ লাইফের আরম্ভ। সেই সময়ই শ্রীভগবানের কৃপায় আমার নিজস্ব ব্যবসায়কে কেন্দ্র করিয়া কিছু আর্থিক সুযোগও আসিয়া পড়ে। আমার পিতৃদেবের কোন কোন সাধারণের হিতকর প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা বিষয় অপূরিত বাসনা ও আমার ভ্রাতৃদ্বয়ের উক্ত অর্থে অনাশক্তিই আমার কর্ম্মজীবনের নূতন পথের দ্বার মুক্তির প্রথম সহায় হয়।

আমি পারিপার্শ্বিক অনুকূলতার অভাবের কথা উল্লেখ করিয়াছি, কিন্তু পুস্তকাগারে প্রবেশের পর কোন কোন সুহৃদের সহায়তা যে পাই নাই তাহা নহে। নিতান্ত দুঃখের কথা, যদিও শেষ পর্য্যন্ত কোন কোন অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে বা হইতেছে, তাহা হইলেও একথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে বাধ্য যে, বন্ধুবর শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র দের সহিত নীতিগত কতকগুলি গুরুতর অমিল বা চরিত্রগত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও অন্ততঃ ত্রিশ বৎসর ধরিয়া তিনি বরাবরই আমার পার্শ্বে ছিলেন। তিনি বয়সে কিছু ছোট হইলেও প্রাথমিক অবস্থায় তাঁহাকে সহায়রূপে না পাইলে হয়ত আমার সামান্য কর্ম্মজীবনটা ভিন্ন পথও গ্রহণ করিতে পারিত। এই যে অমিল বা পার্থক্যের কথা উল্লেখ করিলাম, ইহা যে আমার স্বভাবের ত্রুটি হইতেই উদ্ভূত নহে এমন কথা জোর করিয়া বলিতে পারি না, কারণ সে বিচারের জন্য কখনও কোন প্রাজ্ঞ বিচারকের দ্বারস্থ হই নাই।

পুস্তকাগারের সহিত সম্পর্কিত হইয়াই আমার আকৈশোর পুস্তকাগার প্রতিষ্ঠার যে সখ তাহা চরিতার্থ হইবার সুযোগ আমাকে বিশেষ উৎসাহিত করিল। যখন হইতে আমার এই সখের উৎপত্তি তখন আমার বয়স অতি অল্প। তখন Sett's Family Library নামে অল্প সংখ্যক পুস্তক লইয়া বাটীতে একটি সখের লাইব্রেরি করি। শিক্ষার পূর্ণতা সাধনের জন্য ইহার প্রয়োজনীয়তা অনিবার্য্য এরূপ কোন কথা তখন যে মনে হইত তাহা নহে। পুস্তকাগারের ভার হাতে আসার পর হইতে এ কথা মনে হইতে লাগিল এবং সহরবাসীর নাগরিক জীবনের মান উন্নত করিতে সভাসমিতির জন্য একটি উপযুক্ত হলের আবশ্যকতাও সেই সময়ই অনুভূত হয়। তাহারই ফলে নৃত্যগোপাল স্মৃতিমন্দির ও চন্দননগর পুস্তকাগার ভবনের উদ্ভব। সে ১৩২৭ সালের কথা। এই পুস্তকাগারের প্রভাবই আমার জীবনে নূতন পথের সন্ধান আনিয়া দেয়। আমার দুর্ভাগ্য বশতঃ যদিও বারে বারে নিতান্ত দুঃখের সহিত ইহার আকর্ষণ বিচ্ছিন্ন করিতে হইয়াছে, তথাপি আমাকে স্বীকার করিতেই হইবে, আমার মধ্যে যদি কিছু থাকে ত সে দিয়াছে এই চন্দননগর পুস্তকাগার। ইহা আমার কাছে দেব মন্দির। ছেলে ও মেয়েদের প্রাথমিক শিক্ষার, দরিদ্র ও গৃহস্থ সাধারণের বিনামূল্যে চিকিৎসার, দুর্ম্মূল্যের সময় চাউলের মূল্য হ্রাসের, পানীয় জলের অভাব মোচন প্রভৃতির সুযোগ—সংঘটন করিয়া দিতে যেটুকু উপলক্ষ হইবার সৌভাগ্য ঘটিয়াছে, সেজন্য আমার মত লোকের যে বলিষ্ঠ চিন্তা ও আশা এবং প্রাণবন্ত উৎসাহের আবশ্যক, তাহা যোগাইয়াছিল এই পুস্তকাগার।

এই প্রসঙ্গে আমাদের অবস্থার কথা বুঝাইবার জন্য বলা আবশ্যক, উক্ত সকল কার্য্য পরিণত করিতে অনেক-গুলির জন্য রাষ্ট্র কর্তৃপক্ষদের মুখাপেক্ষার কোন প্রয়োজন না থাকায় বিশেষ কোন বেগ পাইতে হয় নাই। কিন্তু দুঃখের কথা হইলেও তাহা না বলিয়া পারি না, স্ত্রী-জাতির শিক্ষাকল্পে অতি আবশ্যকীয় একটি প্রতিষ্ঠান গড়িতে এবং কলেজের পুনঃ প্রতিষ্ঠার চেষ্টার জন্য আমাকে অশেষ বাধা পাইতে হইয়াছিল। প্রথমটি ১৯১৮ হইতে প্রত্যক্ষ চেষ্টা করিয়া প্রায় সাত বৎসরের পর প্রতিষ্ঠার অনুমতিলাভ ঘটে এবং ১৯২৬ সালের জুন মাসে ইহাই 'কৃষ্ণভাবিনী নারী শিক্ষা মন্দির' নামে প্রতিষ্ঠিত হয়। আর দ্বিতীয়টি অর্থাৎ কলেজ প্রতিষ্ঠা বিষয় বহু চেষ্টার পর ১৯১৮সালে ফেব্রুয়ারী মাসে ফরাসী সরকারী গেজেটে উহার পুনঃপ্রতিষ্ঠার কথা ফরাসী ভারতের গভর্ণর মঁসিয়ে মার্ত্তিনোর আরেতের (আদেশনামা) দ্বারা ঘোষিত হওয়া সত্ত্বেও শেষ পর্য্যন্ত গভর্ণর পরিবর্ত্তনের সহিত মতের পরিবর্ত্তন ঘটায় উহা আর আমাকে উপলক্ষ করিয়া কার্য্যে পরিণত হইতে পারে নাই। শেষোক্ত

গভর্ণর ম'সিয়ে জারবিনিতের সময় স্থানীয় মরগ্যা হাসপাতালের উন্নতিকল্পে আমার অর্থসামর্থের তুলনায় অনেকগুলি টাকা দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া একটি প্রস্তাব দেই। তাহার পরিবর্ত্তে ধন্যবাদ লাভ ছাড়া বহুদিন বিষয়টি ঝুলাইয়া রাখার পর বিফল মনোরথ হইতে হয়। টেকনিক্যাল্ স্কুল প্রতিষ্ঠা বিষয়েও প্রতিশ্রুতি পাওয়া সত্ত্বেও কার্য্যে কিছু হয় নাই।

নারী শিক্ষা মন্দির প্রতিষ্ঠা ও কলেজ পুনঃ প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় স্বর্গতঃ শ্রদ্ধেয় চারুচন্দ্র রায় মহাশয়ের সহায়তা যথেষ্ট ছিল। তাঁহার এবং চন্দননগরের তদানিন্তন কোন কোন নেতার মুখে শুনিতাম, এই সকল আবশ্যকীয় প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিতে না পারার মূল কারণ দলগত পলিটিক্স্। তাহা আর কিছু নহে, পাছে ঐ সকল কার্য্যের উপলক্ষ্য হওয়ায় আমি এখানে কিছু জনপ্রিয় হইয়া নির্ব্বাচন ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করি। একথা মনে হওয়া বিচিত্র নহে, কারণ ফরাসী ভারতে সামান্য রাজকর্ম্মচারী হইতে গভর্ণর পর্য্যন্ত সব কেহই একটি দলের পৃষ্ঠপোষকরূপে থাকেন। প্রতিদ্বন্দ্বিতা দূরে থাকুক, দলগত রাজনীতির আমি বিরোধী এবং উহা ঘৃণা করি, তাহা সত্ত্বেও সফল না হইলেও আমার কর্ম্ম জীবনের এ দিকের যেটুকু সংস্পর্শ এবং শিক্ষা তাহা পরে সংক্ষেপে বলিব।

আমি প্রসঙ্গত আমার কর্ম্ম জীবনের প্রচেষ্টার পরিচয় দিতে আমার দুইজন খুড়িমার দানের কথা যাহা উল্লেখ করা উচিৎ তাহা করি নাই। আমার সেজ খুড়িমা স্বর্গীয়া হরিমতি দাসীর দানেই 'অঘোরচন্দ্র অবৈতনিক প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয়' এবং ছোট খুড়িমা স্বর্গীয়া তারক দাসীর অর্থানুকুল্যে 'তারক দাসী নারী কল্যাণ সদন' ও 'সন্তুচন্দ্র সেবাশ্রম' নামক অতিথি ভবনের প্রতিষ্ঠা আমার দ্বারা সম্ভব হইয়াছিল। তৎপূর্ব্বে 'সন্তুচন্দ্র সেবাশ্রম' নামে যে তিনটি অবৈতনিক চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, শ্রীভগবানের কৃপায় তাহার উপলক্ষ্য হইবার আমার সৌভাগ্য হইলেও, উক্ত মহিয়সী মহিলার দানই এ কার্য্যকে ত্বরান্বিত করিয়াছিল।

পুস্তকাগারের সংশ্রবে আসিয়া আমার এই দেশজননীর শ্রীঅঙ্গে দুই এক খানি অলঙ্কারের উপলক্ষ্য হইবার সৌভাগ্য লাভ হওয়াতেই হউক বা যে কারণেই হউক ক্রমে এখানকার কোন কোন বিশিষ্ট শিক্ষা বিষয়ের প্রতিষ্ঠানের সহিত আমার যোগ সাধিত হয়। আমি জোরের সহিতই বলিতে পারি, স্বেচ্ছায় তথাকার উদ্যোগী কর্ম্মিবৃন্দ তথায় আমায় তাঁহাদের শ্রেষ্ঠ সম্মানের পদ দিলেও এবং তাঁহারা যথেষ্ট সাহায্যের জন্য সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকিলেও, আমি কোন ক্ষেত্রেই ঠিক মত আমার কর্ত্তব্য পালনে সমর্থ হই নাই। ফলে পরে তথা হইতে বিদায় লইয়া চলিয়া আসিয়াছি। যাঁহারা আমার সম্পর্ক ছেদ চান না, তাঁহারা আমার অক্ষমতা জানান সত্ত্বেও আজিও আমার নামটি রাখিয়া দিয়াছেন। আমি অনেক সময় ভাবিয়াছি, কি আর্থিক,কি কায়িক আমি প্রায় কোন সাহায্যই করিতে পারি না, তথাপি আমায় চাহিবার কারণ কি, সেখানে নির্ব্বাচনের পর নির্ব্বাচনে কেন আমাকে মনোনীত করেন! আমি নিজের মধ্যে তন্ন তন্ন করিয়া অন্বেষণ করিয়াও পাই নাই। পাইয়াছি এই, কার্য্যে কিছু করিতে না পারিলেও প্রতিষ্ঠান সমূহের উন্নতি বিধানের আকাঙ্খামুক্ত একদিনের জন্যও ছিলাম না; সর্ব্বদাই তাহাদের উন্নতি ও সাফল্য আন্তরিক ভাবেই কামনা করিতাম এবং এখনও করিয়া থাকি। শুধু এই টুকুতেই এত বিশ্বাসের অধিকারী হইতে পারা যায় তাহা পূর্ব্বে বুঝি নাই। ইহা হইতে আন্তরিকতা যে সুলভ বস্তু নয় ইহাই বুঝা যায়।

এইভাবে চলিতে চলিতে আমার কর্ম্মজীবনের একটা অপ্রত্যাশিত অভিনব পথে আসিয়া পড়িতে হইল। প্রথম মহাযুদ্ধের অন্তে যখন নয় বৎসরের পর ফ্রান্স হইতে নির্ব্বাচনের সংবাদ আসিল, তখন এখানকার রাজনীতি ক্ষেত্রে একটা নবচেতনার ভাব দেখা দিল। দেশের কর্ম্মিযুবকবৃন্দ, প্রবীন জননেতা—যাঁহাদের রাজনীতিই পেশা, সেই সকল রাষ্ট্রধুরন্ধরদের আর চাহিলেন না, তৎপরিবর্ত্তে চাহিলেন আমাকে ও আমারই মত রাজনীতি বিষয়ে নিতান্ত অনভিজ্ঞ আকাঙ্খাশূন্য দ্বিতীয় তালিকাভুক্ত*

* তৎকালে চন্দননগরে নির্ব্বাচকদিগের দুইটি তালিকা ছিল, প্রথমটি শ্বেতাঙ্গ ও পণ্ডিচারীর অধিবাসী রাজকর্ম্মচারীদের এবং দ্বিতীয়টি স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্য হইতে।

ছয়জনকে চন্দননগর মিউনিসিপ্যালেটির সদস্যরূপে। এবং একথা খুব দৃঢ়তার সহিতই বলা যায়, সে বারের এই নির্ব্বাচনের ইতিহাসও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। ভোট সংগ্রহের জন্য তাঁহাদের কোনরূপ প্রোপাগ্যাণ্ডা, উপরোধ অনুরোধ বা অর্থব্যয় ছিল না। মোটকথা এরূপ সম্মানের সহিত নির্ব্বাচিত হওয়ার কথা এখানে ইহার পূর্ব্বে বা পরে এখন পর্য্যন্ত শুনা যায় নাই। আরও আশ্চর্য্যের কথা, এখানকার রাজনীতি ক্ষেত্রে যাঁহাদের নেতৃত্ব একাধিপত্য ছিল, তাঁহারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে দাঁড়াইয়া আমার অক্ষমতার কথা জানিয়াও সেবারের হাওয়া বুঝিয়া যদি আমাদের নাম থাকিলে সাফল্য লাভ হয়, এই আশায় তাহাদের বুলত্যাঁয় * আমার ও স্বনামখ্যাত চিকিৎসক শ্রীযুক্ত যোগেশ্বর ভামানী মহাশয়ের নাম উপরেই দিয়াছিলেন। তাহাতেও তাঁহাদের নেতার ভোট আমাদের এক এক জনের অপেক্ষা এক পঞ্চমাংশেরও কম হইয়াছিল।

রাজনীতি ক্ষেত্রে এই সব পদের মধ্যে যে এত মাদকতা আছে, তাহা লাভের জন্য যে মানুষ কতটা নামিতে পারে তাহা তখনই প্রথম জানিলাম। যাহাকে প্রধানতঃ লোকে দেশের কাজ বলিয়া থাকেন, এইরূপে তাহাতেও প্রবিষ্ট হইলাম। ঘটনাচক্রে ম্যারের কার্য্যভারও আমার উপর ন্যস্ত হইল। রাজনীতি জানি না, ফরাসী ভাষা জানি না, আইন কানুন জানি না, উপযুক্ত সময় দিবারও সুযোগ নাই; সাধারণের প্রদত্ত এই গুরুভার পালনের অক্ষমতার কথা মনে করিয়া বিশেষ বিচলিত হইলাম। চলতি কাজ কোন প্রকারে করিয়া যাইতে লাগিলাম, কিন্তু কর্ত্তব্যের ত্রুটি হইতেছে উপলব্ধি করিয়া অল্পদিনের মধ্যে পর পর দুই বার পদত্যাগ পত্র দিলাম, কিন্তু ফরাসী ভারতের গভর্ণরের অনুরোধ ছাড়িতে পারিলাম না, আরও কিছুদিন রহিলাম। কিন্তু এই বিবেক বিরোধী কাজ করিয়া প্রকারান্তরে নিরীহ দেশবাসীর বিশ্বাসঘাতকতা করা অধিক দিন সম্ভব হইল না, তখন পদত্যাগ করাই সঙ্গত মনে করিয়া তাহাতেই কৃতসঙ্কল্প হইলাম। তখন বেশ বুঝিলাম, আমার এ সঙ্কল্পে আমার দেশবাসীর সমর্থন আদৌ নাই। স্থানীয় সংবাদপত্রের মধ্যমেও তাঁহাদের অভিপ্রায় আমার এ কার্য্যে প্রতিনিবৃত্ত হইবার অনুরোধের আকারে প্রকাশ পাইল। কিন্তু সে অনুরোধ রক্ষা করা আর সম্ভব হইল না। ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি আমি গভর্ণরকে এবার স্পষ্টই লিখিলাম, নববর্ষের প্রথম হইতেই আর আমি মেরীতে* যাইব না। দেশবাসীর দেওয়া একটি মাত্র কার্য্যে অক্ষমতা এবং উচ্চরাজপুরুষদিগের ঐকান্তিক অনুরোধ রক্ষায় অসমর্থতা হেতু মনটা একদিকে যেমন ক্ষুণ্ণ হইল, তেমনিই প্রিয় দেশবাসীর আমার প্রতি এই অহেতুকী স্নেহের প্রথম পরিচয় লাভে মনের মধ্যে যুগপৎ এক অনুপম বিষাদ ও হর্ষে ভরিয়া উঠিল।

আমার পদত্যাগের পর কয়েকদিন না যাইতেই মিউনিসিপ্যাল সভা ভঙ্গ করিয়া মনোনীত সদস্যের দ্বারা গঠিত এক কমিশনের উপর উহার ভার অর্পিত হইল। এদিক দিয়া আমার দেশের কাজ আপাততঃ স্থগিদ রহিল। আমি যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। আমার ব্যবসায় কার্য্য দেখাশুনার সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্ববৎ কোন কোন শিক্ষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রতিষ্ঠানের সহিত সংযুক্ত থাকিয়া কর্ম্মজীবন অব্যাহত রাখিলাম, কিন্তু রাজনীতিক্ষেত্র হইতে সরিয়া আসিয়াও একেবারে অব্যাহতি পাইলাম না। অনিচ্ছা সত্ত্বেও এ সম্পর্কে সময় সময় বন্ধুদের সঙ্গে কথা কহিতে হইত। প্রচলিত আইন অনুসারে কমিশনের পরমায়ু ছয় মাসের অধিক থাকিতে পারে না, সুতরাং পুনরায় নির্ব্বাচনের বাদ্য বাজিয়া উঠিল। পুরাতন নেতারা তাঁহাদের মরিচা ধরা অস্ত্র সস্ত্র বাহির করিয়া শান দিতে লাগিলেন এবং একটি নূতন দল আসরে নামিবার মানসে আমাদের সময়ের নির্ব্বাচনের ব্যর্থ অনুকরণে লোকচক্ষে ধূলি দিয়া স্বকার্য্য সাধনোদ্দেশ্যে অভিনয়ে প্রবৃত্ত হইলেন। সব বুঝিয়াও আমি নির্ব্বাকই ছিলাম, কিন্তু কোন কোন বন্ধুর কথায় আমার কর্ত্তব্যের ত্রুটী হইতেছে ভাবিয়া রাষ্ট্রীয় গগনে অতি কাম্য আবহাওয়া যাহা আমাদের সময়ে সৃষ্ট হইয়াছিল তাহা লোপ পাইতে চলিয়াছে দেখিয়া, দেশের রাষ্ট্রক্ষেত্রে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের নিকট তৎকালে যে সকল

* ফরাসীতে ব্যালট, পেপারকে বুলত্যাঁ বলে।

* মিউনিসিপ্যাল অফিসকে চন্দননগরে মেরী বলে।

ব্যক্তির নির্ব্বাচন বাঞ্ছনীয় মনে করিয়াছিলাম, তাহা ব্যক্ত করিলাম। তাহার মধ্যে আমার অনুরোধ কিছুমাত্র ছিল না, শুধু দলগত রাজনীতির প্রশ্রয়ে যে অনিষ্টের আশঙ্কা তাহাই নিবেদন করিয়াছিলাম। আমার কথা সহরবাসী গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং সেই সকল লোককেই নির্ব্বাচন করিয়াছিলেন। আমার দেশবাসী ইহা ভাল ভাবেই গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু আজও মনে পড়ে, পুরাতন দলের নেতা "Harihar Babu posses to be the dictator of the town" বলিয়া বিদ্রূপ করিয়াছিলেন।

হয়ত একটু আত্মপ্রশংসা হইতেছে, তাহা হইলেও বিনয়ের আবরণে গোপন করার প্রয়োজন দেখি না। সত্যই আমার সে কার্য্যে শুভ অভিপ্রায় ভিন্ন অন্য কিছু না থাকিলেও ডিক্টেটরের মত কাজ করাই হইয়াছিল, রাষ্ট্রনীতিতে অনভিজ্ঞ যে আমি মাত্র কয়েকমাস পূর্ব্বে অক্ষমতা হেতু সাধারণের ইচ্ছায় বিরুদ্ধে ম্যারের কার্য্যভার ত্যাগ করিয়াছিলাম, সহরের বহু শিক্ষিত ভদ্রলোকের প্রকাশ্য সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তাহার কথা সকলের কাছে সমর্থিত হইল কেন, ইহা চিন্তা করিবার বিষয়। আমার মনে হয় সহরের কল্যাণার্থ ভিন্ন ইহার মধ্যে অন্য কোন উদ্দেশ্য আছে বা আন্তরিকতার অভাব আছে, এরূপ সন্দেহ কেহ করেন নাই। আমার অনুমান যদি সত্য হয়, ইহা হইতে এই বুঝা যায়, লোকে আন্তরিকতার মূল্য দিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত এবং ইহার স্থান রাজনীতির উর্দ্ধে। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা করায়ত্ব করিবার লোভে লোকের স্বার্থগত প্রচেষ্টা সাধারণ নির্ব্বাচকদিগের নিজ নিজ বিবেক বিবেচনা মত কার্য্য করিবার সুযোগ ও শক্তিকে নষ্ট করিয়া বিভ্রান্ত করিয়া দেয়।

ইহার পর আরও দুইবার আমাকে মিউনিসিপ্যালিটিতে ঢুকিতে হইয়াছিল। প্রথমবার নির্ব্বাচনে—পূর্ব্বে না বুঝিলেও পরে বুঝিয়াছিলাম বন্ধুত্বের সুযোগ লইয়া কোন বন্ধুবিশেষের নিজস্ব উদ্দেশ্য সাধনার্থ সুযোগ হিসাবে আমার নাম লওয়ার আবশ্যক হইয়াছিল। শেষ বার এ্যাডমিনিষ্ট্রেটর মহোদয়ের বিশেষ অনুরোধে মনোনয়নের দ্বারা। এই দুইবার শেষ পর্য্যন্ত তথায় থাকিতে পারিয়াছিলাম, কারণ বড় দায়িত্ব তখন আর আমার উপর ছিল না। এই সময় হইতে আমার একটি বিষয় নূতন উপলব্ধি হইয়াছিল, তাহা আর কিছু নহে। যে সকল বন্ধু আমার সুখ শান্তি সম্পদ খ্যাতিতে বা রাজনৈতিক অধিকার প্রাপ্তিতে বরাবর আনন্দ অনুভব করিয়াছেন, তন্মধ্যে অল্প কয়েকজনের যাঁহারা রাজনৈতিক প্রভুত্ব পাইবার জন্য লালায়িত, তাঁহাদের এই ক্ষেত্রে আমার খ্যাতি প্রতিপত্তি যেন ক্রমেই অস্বস্তির কারণ হইয়া উঠিতেছিল। এই শূন্যগর্ভ সম্মান যে এত লোভের তাহা তখন হইতেই ভাল করিয়া বুঝিলাম। যাহা হউক, আমার নিবৃত্তির সহিত তাঁহাদের মধ্যে সে ভাব অনেকাংশে প্রশমিত হইলেও, পুনরায় আবার একদল যুবকের মধ্যে বিশেষ তীব্র ভাবে তাহা দেখা দেয়—যখন ভারতের স্বাধীনতা লাভের সহিত অকস্মাৎ দেশ-জননীর অলক্ষ্য আহ্বানে চন্দননগরে নবগঠিত শাসন পরিষদের প্রথম সভাপতির পদ গ্রহণ করিতে হইয়াছিল।

পূর্ব্বেকার দিনের কথা জানি না; এখন রাজনীতি বলিতে যাহা বুঝায়, তাহা আমি বুঝি না। সে বিষয় যে আমার দক্ষতার অভাব এ প্রমাণ আমার দেশবাসী ও সরকারও পূর্ব্বেই পাইয়াছেন, তথাপি সহরে বহু জ্ঞানী গুণী রাষ্ট্রনৈতিক জ্ঞানসম্পন্ন আগ্রহশীল কর্ম্মী থাকিতে তথায় নূতন ক্ষমতাদানের কালে প্রতিনিধি পরিষদের ও মিউনিসিপ্যাল সদস্যদিগের সহিত আমাকে পুরোভাগে রাখিয়া শাসন পরিষদ গঠনের তাৎপর্য্য কি, তাহা আজিও ঠিকমত বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই। গভর্ণর বাহাদুরের অনুরোধ রক্ষায় আমার বারংবার অসম্মতি জ্ঞাপন সত্বেও শেষে বিবেচনা ও বন্ধুদের নিকট হইতে কতটা সাহচার্য্য পাইতে পারি পরামর্শ করিয়া উত্তর দিবার সময় দিয়া তিনি বিনা অপেক্ষায় অনতিপরেই স্বেচ্ছায় আরেতে * করিয়া অন্যথাচরণ করিলেন কেন, ইহার মূলে কোন রহস্য বা ষড়যন্ত্র আছে, মনে হওয়াও বিচিত্র নহে।

আমার এই পদ গ্রহণ করায় আমাদের ভারতভুক্তির পথ অবরুদ্ধ হইল এই অজুহাতে কতিপয় যুবকের প্রভাবে সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যালয়ের কতকগুলি ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে যে

* গভর্ণরের আদেশনামা।

বিক্ষোভের সৃষ্টি ও সত্যাগ্রহ, রেসিডেন্সিতে পিকেটিং প্রভৃতি উদ্ভব হইয়াছিল, যদিও শ্রীভগবানের কৃপায় আমাদের উপলক্ষ্য করিয়া বাঞ্ছিত মুক্তির পথ সুগম ও শেষ পর্য্যন্ত সাফল্য লাভই হইয়াছে, তাহা হইলেও সত্যই যে ফরাসী গভর্ণমেণ্টের আমাদের দিয়া তাঁহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার আশা ছিলই না, তাহা বলা যায় না। কারণ পরে যতদিন যাইতে লাগিল তাঁহাদের কার্য্যাবলী হইতে আমাদের স্বাধীকার দানের পশ্চাতে তাঁহাদের নগ্নমূর্ত্তি প্রকট হইয়া উঠিতে লাগিল। আমার সহকারী বন্ধুদের কথা ছাড়িয়া দি, আমাকে কেন্দ্র করিয়া এত যে কাণ্ড চলিতে লাগিল, এমন কি আমার বাস-গৃহের সম্মুখে মেয়েদের সত্যাগ্রহ হইবার সম্ভাবনাও হইল, তাহা সত্ত্বেও আমি যে পদত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিলাম না, তাহার কারণ আমার বিশ্বাস ছিল, যখন মাত্র সামান্য প্রচেষ্টাতেই এই শাসন সংস্কার পাওয়া গিয়াছে, তখন এই পথ ধরিয়াই কাম্য ফললাভ সহজ হওয়া সম্ভব। তদ্ভিন্ন এইরূপ একটা স্বাধীকার লাভ হইতে পারে কিছুদিন পূর্ব্বে যখন এই আশ্বাস পাওয়া যায়, তাহা গ্রহণ করা সম্বন্ধে স্থানীয় নেতৃবর্গ মহাত্মা গান্ধী, শ্রীঅরবিন্দ, পণ্ডিত জওহরলাল প্রভৃতির অভিমত লইয়া জানিয়াছিলেন যে, উহা গ্রহণ করিয়া কাম্যমুক্তির জন্য বৈধ শান্তিপূর্ণ ও নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে সংগ্রাম করিয়া যাওয়াই উচিত। এই উপদেশ স্মরণ করিয়া এবং মাত্র একটা বৎসর, যদি পারি কোন প্রকারে কাটাইয়া দিব—এই ভাবিয়াও পদত্যাগ করিতে বিরত থাকাই কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল।

এই নূতন পরিষদের উপর পূর্ণ অর্থনৈতিক ও আংশিক রাষ্ট্রিক অধিকার অর্পণের পর তৃতীয় দিবসে পণ্ডিতজীর অভিপ্রায়ে বাঙ্গলার তদানিন্তন প্রদেশপাল রাজাজীর দ্বারা সত্যাগ্রহীদের নিবৃত্তির উদ্দেশ্যে পশ্চিম বাংলার সদ্য নিয়োজিত প্রধান মন্ত্রী ডাঃ শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল ঘোষ মহাশয় প্রভৃতি চন্দননগরে প্রেরিত হন। তাঁহারা হুগলীর কমিশনার সহ প্রথম আমাদের বাটীতে আমাদের ও পরে এ্যাডমিনিষ্ট্রেটর ও ম্যারের সহিত আলোচনা করিয়া মৈত্রীর মাঠে সমবেত জনতাকে লক্ষ্য করিয়া বক্তৃতা করার পর আমি ধন্যবাদ দিতে উঠিলে এক যুবক শেম্ শেম্ বলিয়া উচ্চকণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠেন। রাজনৈতিক জীবনের ইহাই আমার প্রথম পুরস্কার। যদিও আমার রাজনৈতিক জীবনে কেন কোনদিন কোথাও প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য কোন স্থানেই এবম্প্রকার মন্তব্য শুনিতে হয় নাই। দ্বাদশ বৎসর পূর্ব্বে বন্ধুদের দ্বারা অনুষ্ঠিত আমার ষষ্টিতম জন্মোৎসবে ও প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের সভায় দেশবাসীর স্নেহের দান 'শিক্ষাবন্ধু' ও 'দেশশ্রী' উপাধিতেও যেমন ইহার সামঞ্জস্য আমার মধ্যে পাই নাই, প্রকাশ্য মহতী সভায় এই ধিক্কারসূচক বাক্যেরও সার্থকতা চিন্তা করিয়া আমার মধ্যে পাই নাই বা বিচলিতও হই নাই। তবে এ কথা অবশ্যই স্বীকার করিব, বংশগত শেঠ উপাধি ভিন্ন রাজদত্ত বিদেশী বা দেশবাসীর অথবা পণ্ডিত সমাজ প্রদত্ত উপাধি ব্যবহারের অভ্যাস আমার না থাকিলেও, উপাধির দ্বারা লোকচক্ষে একটা অলঙ্কারভূষিতরূপে প্রতীয়মান হওয়া ভিন্ন ইহার অন্য সার্থকতা উপলব্ধি করিতে না পারিলেও, ফ্রান্সের প্রদত্ত উচ্চ সম্মান 'লেজিয় দনার' 'অফিসিয়ে জেলা এ্যাসট্রাকসিও পাবলিক' প্রভৃতি এমন কি বিভিন্ন সভা হইতে 'বিদ্যাবিনোদ' 'সাহিত্যভূষণ' প্রভৃতি প্রাপ্ত উপাধির অপেক্ষাও ইহা আমার কাছে অধিকতর আদরের মনে করি। চন্দননগরকে ভালবাসায় কোন শ্রদ্ধাস্পদ নাগরীক প্রদত্ত আমার 'কূপমণ্ডূক' উপাধির ন্যায় এই 'শেম্'ও আমার কাছে গরীয়ান। আর সত্য বলিতে কি, পরিষদ হইতে বিদায়ের দিনে পরিষদ প্রদত্ত অভিনন্দনের সহিত সভাপতির বিশিষ্ট আসনখানি এবং তথাকার কর্ম্মচারীবৃন্দের প্রদত্ত স্নেহোপহার সুবর্ণ-মণ্ডিত লেখনীও যেন এই বিদ্রূপাত্মক বাক্যোপহারের সহিত সংযুক্ত হইয়া অধিকতর শ্রীসম্পন্ন হইয়াছিল।

এই পরিষদে প্রবেশের তিনমাস পরে চন্দননগর মুক্ত-নগরী বলিয়া ঘোষিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে নবগঠিত এসেমব্লি হইতে পুনর্ব্বার সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়া যখন দুই-একটি বিষয় ভিন্ন প্রায় সর্ব্ব বিষয়ের অধিকার হাতে আইসে, তখন সত্যকার কাজ করিবার অনেক কিছু পাওয়া যাইল। পূর্ণ স্বরাজ বা মুক্তিলাভ না হইলেও, চন্দননগরের যথার্থ কল্যাণসাধনের অনেক সুযোগ সম্মুখে দেখিয়া মনে বহু আশা হইল। সহকর্ম্মী বন্ধুদের বিশেষ

করিয়া প্রথম সহকারী শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ দাসের সহায়তায় শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য, পল্লী-উন্নয়ন প্রভৃতি বহু বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া হইল। আমি নামে মাত্র, সত্যকার যাহা কিছু করিতে লাগিলেন আমার সহকর্ম্মীগণই। নবীন উৎসাহে কতকটা অজ্ঞতা, কতকটা উদাসীনতার জন্য দেক্রের* সর্ত্তাবলীর প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়াই কোন কোন বিধান লঙ্ঘন করিয়াও চন্দননগরের কল্যাণার্থে আমরা অগ্রসর হইতে লাগিলাম। ফ্রান্স শুধু নীরবে নয়, বোধহয় চন্দননগর হস্তচ্যুত হইবে না এই ভরসায় তাহা সানন্দেই সব কিছু সহ্য করিয়া যাইতে লাগিলেন। কিন্তু যতই দিন যাইতে লাগিল, আশা ও আকাঙ্ক্ষার প্রাচুর্য্য ও অন্যদিকে তাহার পূর্ণতাসাধন বিষয় প্রতিবন্ধক দেখিয়া উপযুক্ত শক্তির অভাব ও নিজ দুর্ব্বলতা হেতু দুর্নীতি ও অনাচার সকল রোধের অক্ষমতা ও সেই সঙ্গে আমাদের ভারত-ভুক্তির সাধনা সিদ্ধিলাভের পথ ক্রমশই জটিলতর করিয়া তোলায়, আর আমাদের মধ্যেও ক্রমে কার্য্যের অপেক্ষা আড়ম্বরের আধিক্য দেখিয়া নৈরাশ্যে শিহরিয়া উঠিলাম। পদত্যাগের জন্য ক্রমেই মন ব্যাকুল হইতে লাগিল, কিন্তু তাহাতে কোন সুরাহার সম্ভাবনা মনে হইল না। কারণ আমি পদত্যাগ করিলে প্রথম সহকারীকে সেই পদগ্রহণ করিতে হইবে। তিনি বা অপর প্রায় সকলেই ত হৃষ্টমনে আমাকে সাহায্য করিয়া থাকেন এবং তাঁহাদের উপর ভারার্পিত বিভাগগুলিতে তাঁহাদের পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া আছে। আমি ক্ষত বিক্ষত হৃদয় লইয়া আমার কার্য্যকালের পরিসমাপ্তির জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলাম।

আমার এই দেশ সেবার কার্য্যে প্রবেশ করিয়া এক বৎসরের অভিজ্ঞতায় আমার ধারণা হইয়াছে, অল্পলোক ভিন্ন অবশিষ্ট প্রায় সকলেই দেশ সেবার নামে কোন না কোন প্রকারে আত্মসেবায় রত থাকেন। তাঁহাদের মধ্যে সকলেই যে প্রত্যক্ষ অর্থলোভই করিয়া থাকেন তাহা নহে। প্রকারান্তরে বিবিধ প্রকারে স্বার্থ সাধন হইয়া থাকে। এমন কি সেজন্য প্রার্থী হইবার বা কোনরূপ চেষ্টা করিবারও অনেক সময় আবশ্যক করে না। দেখা যায়, তাঁহাদের সন্তুষ্ট করিয়া স্বকার্য্য সাধনের জন্য স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া অর্থ বা অন্যরূপে উপঢৌকনাদি দিয়া থাকেন। এই যে বড় দিন, নববর্ষে বা সদস্যদিগের বাটিতে বিবাহাদি কার্য্যে ভেট বা উপহারাদি দেওয়া হইয়া থাকে, ইহার পনের আনা স্থলে খুব ভিন্ন আর কিছুই নহে। আমার সৌভাগ্য, এরূপ কেহই আমাকে কিছু দিতে আইসেন নাই। কাজ করিবার কালে বরং তৎপরিবর্ত্তে আমি ও আমার প্রধান সহকর্ম্মী তদানিন্তন এ্যাডমিনিষ্ট্রেটর মঁসিয়ে বঁ্যাজার নিকট হইতে উভয়ের পদোপযোগী ব্যবহারের জন্য সুন্দর রজত নির্ম্মিত নটরাজ ও শ্রীরাম চন্দ্র মূর্ত্তি সম্বলিত শীলমোহর একটি করিয়া উপহার পাইয়াছিলাম। আর কার্য্যকালের শেষে পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমার বিদায়ের কালে সভাপতির ব্যবহারের কাষ্ঠাসন খানি পরিষদ হইতে এবং আমার প্রিয় পরিষদের কর্ম্মচারী বন্ধুদের স্নেহের উপহার একটি স্বর্ণ মণ্ডিত ফাউন্টেন পেন পাইয়াছিলাম। এমনও দেখা যায় শুধু পরবর্ত্তী নির্ব্বাচনে জয়লাভের প্রত্যাশায় ব্যক্তি বিশেষের সন্তোষ সাধন জন্য, কেহ কেহ অবিচার পক্ষপাতিত্ব করিয়া থাকেন। রাষ্ট্র পরিচালনা ব্যাপারে যত কিছু অন্যায়, অবিচার, পক্ষপাতিত্ব প্রভৃতি দুর্নীতি, বেশ করিয়া চিন্তা করিয়া বুঝিয়াছি, তাহার মূল কারণ অন্ততঃ বার আনা স্থলে স্বার্থ প্রণোদিত, আর চারি আনা স্থলে দুর্ব্বলতা। এই দুর্ব্বলতা আমার ছিল। আমার সম্বন্ধে এরূপ একটা মন্তব্য আমার কর্ণগোচর হইয়াছে, যে, আমাকে সম্মুখে রাখিয়া অনেক অন্যায় হইত। ঠিক এ কথা আমি মনে করি না। আমার দুর্ব্বলতা ও আমাদের উপযুক্ত শক্তির অভাব জনিত আমার জ্ঞাতসারেই অন্যায় প্রশ্রয় পাইয়াছে। শুধু দেশের কল্যাণের জন্য যাঁহারা এ কার্য্যে রত হন তাহার সংখ্যা নিতান্তই বিরল। কাজ করার সঙ্গে নাম যশের আকাঙ্খা লইয়াও কতক লোক ইহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া থাকেন। সে সংখ্যা একেবারে বিরল না হইলেও অধিক নহে। আর পূর্ব্বের বর্ণিত শ্রেণীর দেশ-সেবক সুপ্রচুর। আর শিখিলাম, প্রভুত্বের লোভও কম নয়। ইহাতে অনেক মানুষকে অন্ধ করিয়া ফেলে। তাঁহাদের কাজে বা

* ফ্রান্সের মন্ত্রীদের প্রবর্ত্তিত সনদ, আদেশনামা বা উপবিধিকে ফরাসী ভাষায় 'দেক্রে' বলে।

কথায় যে কোন ভুল ত্রুটি হইতে পারে ইহা তাঁহারা ভুলিয়া যান। গদিলাভ করিয়া তাঁহারা নিজেকে সর্ব্ব বিষয়ে বিশারদ মনে করেন। কেহ কেহ ধরাকে সরা জ্ঞান করিয়া থাকেন। এমনও দেখা যায়, শুভ ইচ্ছা লইয়া কাজে প্রবৃত্ত হইয়া শেষে লোভ সংবরণ করিতে না পারিয়া পাপে লিপ্ত হন, এবং পতনশীল পদার্থের ক্রম বর্দ্ধমান গতির ন্যায় যত দিন যায় ততই তাঁহারা নামিতেই থাকেন। এই সবই বিশ্বাসঘাতকতা ও চৌর্য্যের পর্য্যায়ে পড়ে। অনেকেই জানেন বহু ক্ষেত্রেই সরবরাহ কারক বা কণ্ট্রাক্টারের মধ্যমেই সেই কার্য্য হইয়া থাকে।

এ সবের প্রতিকার সহজ নহে। খুব প্রখর বিদ্যা বুদ্ধি সম্পন্ন যদি নাও হয়, নির্লোভ দেশপ্রেমিক লোক ভিন্ন কাহারও উহার মধ্যে যাওয়া উচিৎ নহে। অবশ্য চোরকে চুরি করিতে নিষেধ করা যেমন নিরর্থক, ইহাও তদ্রূপ। গৃহস্থের সাবধানতাই যেমন সমধিক ফলপ্রসূ, তেমনই অজ্ঞ নির্ব্বাচকদিগকে তাঁহাদের স্বার্থ ও অধিকার বিষয় শিক্ষিত করিয়া তোলাই কতকটা উপায়। এই চেষ্টা যাঁহারা করেন, নির্ব্বাচকদিগকে স্বার্থান্বেষীদের প্রভাব হইতে যাঁহারা রক্ষা করিবার চেষ্টা করেন, তাহারাই প্রকৃত রাষ্ট্রের বন্ধু। মোট কথা যে কোন উপায়েই হোক যাঁহারা নির্ব্বাচন ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া আদাজল খাইয়া লাগিয়া যান, তাঁহাদের বিশ্বাস করা কঠিন।

পরিশেষে আমার নিবেদন, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে রাজনীতিক ক্ষমতাভিলাষ সম্পন্ন ব্যক্তিদের সাধারণ ভাবে ত্রুটি ও নিন্দার কথা বলিলাম। আমার রাজনীতিক জীবনের শিক্ষা প্রবন্ধেও যথেষ্ট বলিয়াছি। ইহা হইতে আমি অপরের চরিত্রে যাহা দোষাবহ মনে করি, আমি যে ঐ সকল দোষে দুষ্ট নহি ইহাই আমি বলিতে চাহিয়াছি, এ কথা যদি কেহ মনে করেন, তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার নাই। রাজনীতি ক্ষেত্রে আমার জ্ঞান কতটা ও স্থান কোথায় তাহা আমার অজ্ঞাত নহে। অনেক ক্ষেত্রেই অধুনা যেমন মেকিই চলিতেছে, আমার সম্বন্ধে এ ক্ষেত্রেও তাহাই। আমার যোগ্যতা থাক আর নাই থাক, আমার সাধুতা সম্বন্ধে আমার কোন মন্তব্য করা নিষ্প্রয়োজন। প্রকৃত পক্ষে কর্ম্মক্ষেত্রে থাকা কালীন আমি এই সব অপরাধ হইতে মুক্ত ছিলাম কি না, তাহার বিচারক আমার সহরবাসী এবং তদপেক্ষা আমার সহকর্ম্মীগণ।

আমি তার ধরি হাত

শ্রীলক্ষ্মণকুমার বিশ্বাস

নীরব পল্লীপথে গোধূলির বনছায়
কে এক অচিন মেয়ে ভিন্ গাঁয়ে চলে যায়,
কালো তার কেশদাম চঞ্চল সমীরণ
কুঞ্চিত দোলা লাগে, অঞ্চল উনমন,
কুমকুম আভরণ, আবরণ অহেতুক
বনফুল পরশন মন মোর উৎসুক।
জীবনের সজ্জায় আছে তার প্রয়োজন
মিশে যাক্ এ হিয়ায় ও হিয়ার তনুমন ;
গ্রামিক মেয়ের রূপ, আনুক আমার সুখ
শিহরণ লাগি তার স্বাভাবিক আয়োজন।
বিহগের কাকলীতে মুখরিত বনতল
নদীজল ছলছল—মম মন সমতল ;
বিরহ দিনের ব্যথা দূরে গেছে নাই আর,
আমার পরাণ মন ও মেয়ের চারিধার
দেখিলাম ফিরে চায় ও মেয়ে এ পৃথিবীর,
আমি তার ধরি হাত—নির্জ্জন নদীতীর।

'নবজাতকের' কবি রবীন্দ্রনাথ

শ্রীসচ্চিদানন্দ চক্রবর্ত্তী

রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রকৃতি বা কবিমানসকে আনুপূর্ব্বিক বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, তাঁর সৃষ্টিঅংশ যুগে যুগে বিবর্ত্তিত হয়ে নব নবরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে এবং তাঁর কাব্যনির্ঝরের গতি-প্রকৃতি বিভিন্ন কালে পরিবর্ত্তিত হয়ে বিভিন্ন খাদে প্রবাহিত হয়েছে। জগৎ ও জীবনের নিত্যপরিবর্ত্তনশীল সত্তা তাঁর মননশীল কবিকল্পনাকে শুধু ধরা দেয় নাই, তাহা বাঙ্ময়রূপে মূর্ত্ত হয়ে অমৃতের রসায়নে তাকে অভিসিক্ত করেছে এবং অভিনব ছন্দমাধুর্য্যে আপ্লুত করেছে। 'মানসী' থেকে আরম্ভ করে 'চিত্রা'র সৃষ্টিকাল পার হয়ে 'নৈবেদ্য' থেকে 'গীতাঞ্জলি' পর্য্যন্ত এবং পরে 'বলাকা' থেকে 'বীথিকা' পর্য্যন্ত রবীন্দ্রকাব্যের সুদূর প্রসারিত অখণ্ড প্রবাহ নব নব ধারায় পরিপুষ্ট হয়ে খরস্রোতে এবং তরঙ্গের অশান্ত আলোড়নে রসপ্রাণকে উদ্বুদ্ধ করে জাতির চিত্তভূমিকে প্লাবিত করেছে। অতঃপর রবীন্দ্রকাব্যের নিরঙ্কুশ গতি সাময়িক ভাবে সম্মুখ হতে রুদ্ধ হয়েছে এবং তাঁর কবিকল্পনা সম্পূর্ণ ভিন্নমুখী একটি ধারার অনুসরণ করেছে। অর্থাৎ রবীন্দ্র-কাব্যের যে-নির্ঝর উত্তুঙ্গ পর্ব্বতের অদৃশ্য গুহা থেকে উত্তীর্ণ হয়ে পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে এসে অনেক গহন অরণ্য অতিক্রম করে প্রান্তরের সমতল ভূমিতে উচ্ছ্বসিত স্রোতোধারায় প্রবাহিত হয়ে দুরন্তগতিতে মহাসাগরের দিকে ছুটছিল, তা হঠাৎ এখানে এসে মন্থর হয়ে গেছে। মহাসাগরের দূরত্বের স্বল্পতা যেমন একদিকে একে তটসীমার কঠিন বন্ধন থেকে মুক্তি দিয়েছে, তেমনি অপর দিকে এর শান্ত ও নির্ম্মল রসধারার দর্পণে জাতি আপনার মুখবিম্ব প্রতিবিম্বিত দেখবার সৌভাগ্য লাভ করেছে। বস্তুতঃ 'পুনশ্চ' থেকে রবীন্দ্রনাথের কাব্যরূপের পরিবর্ত্তনের যে সূচনা দেখা দিয়েছিল, তা 'প্রান্তিকে' রূপান্তরিত হয়ে 'নবজাতকে' নতুন রূপে বিকশিত হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি প্রেরণা সম্বন্ধে মোটা-মুটি কিছু না বললে আলোচ্য বিষয়টি সুবোধ্য হবে না। 'নবজাতক' রবীন্দ্রনাথের ঋতু পরিবর্ত্তনের কাব্য। এখানেই তাঁর কবি-প্রতিভার সৃষ্টি বদলের শেষ পালা। গতানুগতিকতা রবীন্দ্রকাব্যের মনন-কল্পনার সম্পূর্ণ বিরোধী। কবি তাঁর সৃষ্টির আদি যুগ থেকে কাব্যের যে-পরীক্ষণরীতি অনুসরন করে চলেছিলেন, 'নবজাতকে' তার ব্যতিক্রম দেখা যায় নি। এযাবৎ কবির আত্ম-কেন্দ্রিক ভাবকল্পনা কেবল মাত্র ব্যক্তি-জীবন এবং বিশ্ব-জীবনের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য খুঁজে বার করতে প্রাণ পণে চেষ্টা করেছে। 'নবজাতকে' সেই জীবন দর্শনের অবসান হয়েছে। কবি স্বভাবসিদ্ধ ব্যক্তি-চেতনা থেকে সমাজ চেতনায় ও রাষ্ট্র চেতনায় মনোযোগী হয়েছেন। এই হিসেবে কাব্যের 'নবজাতক' নামকরণও সার্থক হয়েছে।

'নবজাতকের' কবিতাগুলি মোটামুটি দুই ভাগে ভাগ করা যায়। এক—কবির ঐতিহাসিক চেতনা-সঞ্জাত কবিতা যাহাতে বৃহত্তর পৃথিবী এবং তাহার জন-মানস সম্বন্ধে বাস্তব-বোধের নিদর্শন বর্ত্তমান। দুই—কবির ব্যক্তিগত জীবনের ভাবব্যঞ্জনা পূর্ণ ছন্দোবদ্ধ বাণী। অর্থাৎ কবির সূক্ষ্ম ভাবানুভূতি একদিকে যেমন সভ্য জগতের বাস্তব জীবনকে অস্বীকার করতে পারেনি তেমনি অপরদিকে তার নগ্নতা এবং কুশ্রীতাকেও সমর্থন করতে পারে নি। ফলে তাঁর মননকল্পনার এক দ্বন্দ্ব সংঘাতের আবর্ত্ত রসচেতনাকে মথিত করে বিষের মধ্যে অমৃতের স্বাদ গ্রহণ করেছে। তাই এই কাব্যের কবিতা-গুলিতে হতাশা ও ব্যর্থতার সুর ধ্বনিত হলেও পরাজয়ের স্বীকৃতি নেই। কবি বিশ্বাস করেন যে, মানব ইতিহাসের অভিব্যক্তির চরম ব্যথা তার সাময়িক পতন বা স্খলনে নয়—তার শাশ্বত জয়যাত্রার অভিযানে, যেখানে সে সকল বাধাকে অতিক্রম করেছে—সত্য-শিব ও সুন্দরের আরাধনায় এবং আপনার অন্তরের কল্যাণ বুদ্ধির সাধনায়।

'নবজাতকের' কবিতাগুলির বিষয় বস্তু সম্বন্ধে প্রধান লক্ষ্যনীয় বিষয় এই যে, কবি এখানে অলঙ্কার বর্জ্জিত

শব্দের ও সহজ বোধ্য ভাষা এবং ভাবের আশ্রয়ে তাঁর কাব্যকে অপূর্ব্ব শ্রীমণ্ডিত করেছেন। রবীন্দ্র-কাব্যের অস্পষ্টতা এবং দুর্ব্বোধ্যতা সম্বন্ধে একদল সমালোচক মহলে প্রায়শঃ যে সকল অভিযোগ শোনা যায়, এখানে কবি তা কৃতিত্বের সঙ্গে নিরসন করেছেন। বস্তুতঃ ইতিপূর্ব্বে 'পরিশেষ' কাব্যে যে নিরলঙ্কার বিরল-সৌষ্ঠব স্বল্প ভাষিতার সূচনা দেখা দিয়েছিল, তাহাই সুপরিণত এবং সার্থকভাবে এখানে আত্মপ্রকাশ করেছে। ইংরেজী কাব্যসাহিত্যে কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ একদা কবিতার ভাব ও ভাষাকে প্রচলিত আলঙ্কারিক রীতি থেকে মুক্তি দিতে সচেষ্ট হয়েছিলেন এবং নিজস্ব কাব্যরীতি (diction) প্রবর্ত্তন করে সাহিত্যের ইতিহাসে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। কিন্তু তবুও তিনি কবিতাকে অতি-নিরূপিত ছন্দের বন্ধন থেকে মুক্তি দিতে সাহস করেন নি। পরে একজন মার্কিনদেশীয় কবি (Whitman) এই কার্য্যে সিদ্ধি লাভ করেন এবং আধুনিক যুগের একজন প্রতিভাশালী কবি (টি, এস্‌ এলিয়ট) এ বিষয়ে অধিকদূর অগ্রসর হয়েছেন এবং কাব্যের ভাষা ও বিষয়বস্তুকে অনাড়ম্বর স্বল্পভাষিতায় পরিপূর্ণ করে সমগ্র জন-মানসের উপযোগী সহজবোধ্য রস পরিবেশন করেছেন।

রবীন্দ্রকাব্যের রূপ বিবর্ত্তন অনুধাবন কালেও দেখি যে 'বলাকা'য় তিনি এক ধরনের ছন্দ-স্বাতন্ত্র্যের সৃষ্টি করেছিলেন। গদ্য ও পদ্যের মধ্যে সমন্বয় যুক্ত মুক্তক ছন্দের নিয়মিত বৃত্ত প্রবাহ ও অন্তঃমিলের সেই পরীক্ষণ প্রচেষ্টা পুনরায় 'নবজাতকে' আবির্ভূত হয়েছে। কাব্যের ভাষায় ও প্রকাশরীতিতে চিরাচরিত সসজ্জ সলজ্জ অবগুণ্ঠন মোচন করা বা পদ্যের স্বাধীন ক্ষেত্রে তাকে বিচরণ করতে দেবার দুঃসাহসিক কাজ কাব্যসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের মৌলিক দান। এবার 'নবজাতকের' কবিতাগুলির বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাক।

ইংরেজ কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ একবার বলেছিলেন—"Better a living in the Pantheistic paganism of ancient Greece than adherence to the materialistic formalism of modern humanity." রবীন্দ্রনাথের নবজাতকেও এই ভাব প্রতিধ্বনিত হতে

সত্যদ্রষ্টা কবি রবীন্দ্রনাথ

দেখা যায়। আধুনিক জগৎ, বিশেষ করে জড়বাদে বিশ্বাসী পাশ্চাত্য জগৎ ব্যবহারিক জীবন ক্ষেত্রে যেমন উন্নতির উচ্চ শিখরে উঠেছে তেমনি তার আত্মিক শক্তির উৎসমুখ বন্ধ হওয়ায় তার আধ্যাত্মিক জীবন পঙ্গু ও বিকল হয়ে গিয়েছে। সুদীর্ঘকাল বৈদেশিক শাসনাধীনে থাকার ফলে ভরতবর্ষও ইউরোপের অনুকরনে বিজ্ঞান সভ্যতায় প্রলুব্ধ হয়ে নিজের যুগ যুগান্তরের বৈদিক সভ্যতা এবং তপোবন সাধনার আধ্যাত্মিক ঐতিহ্য হারিয়ে ফেলতে বসেছে। কবির মরমী মন এতে গভীর বেদনায় ভরে উঠেছে এবং এই ঘুনেধরা পাপ-দীনতাপূর্ণ সভ্যতার অনিবার্য্য ধ্বংসের কথা তিনি সাবধান বাণীর মাধ্যমে সমগ্র দেশবাসীকে শুনিয়ে গেছেন 'নবজাতক' কাব্যের একাধিক কবিতায়। নিদারুণ ব্যথায় কবিচিত্ত বলে উঠেছে—

ক্ষুধাতুর আর ভুরি ভোজীদের
নিদারুণ সংঘাতে
ব্যাপ্ত হয়েছে পাপের দুর্দ্দহন,
সভ্য নামিক পাতালে যেথায়
জমেছে লুটের ধন।

* * *

ধরার বক্ষ চিরিয়া চলুক
বিজ্ঞানী হাড়গিলা
রক্তসিক্ত লুব্ধ নখর—
একদিন হবে ঢিলা ॥

(প্রায়শ্চিত্ত)

ধর্ম্মের নামে, সভ্যতার নামে, মানুষের এই পুঞ্জীভূত পাপের প্রায়শ্চিত্ত কেবল শাস্ত্রমন্ত্র পড়লে হবে না—সত্যিকার কল্যাণশক্তি দিয়ে সেই কাজ করতে হবে। তবেই—

"নূতন জীবন, নূতন আলোকে
জাগিবে নূতন দেশে ॥" (প্রায়শ্চিত্ত)

কবি কখনও মনে প্রাণে এ কথা বিশ্বাস করতে পারেন না যে, যে-বিশ্ব সৃষ্টির লীলা আদিকাল থেকে মানুষের জয়যাত্রার কাহিনী ঘোষণা করে এসেছে তা আজ মুষ্টিমেয় একদল মানুষের ভুলের জন্যে বা তাদের পাপ ও বিকৃতির ফলে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যাবে। তা হলে বিধাতার সৃষ্টির অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য অর্থাৎ মানব জীবনের উর্দ্ধলোক-যাত্রার ও তার আত্মার শাশ্বত উন্মার্গগামীতার সুদীর্ঘ সাধনা সব ব্যর্থ হয়ে যাবে—তার সব আশা আকাঙ্ক্ষা ধুলিসাৎ হয়ে যাবে। তাই কবির মনে এই প্রশ্ন জাগে—

* * *

"বহু যুগযুগান্তরের কোন্ এক বাণী ধারা
নক্ষত্রে নক্ষত্রে ঠেকি পথহারা
সংহত হয়েছে অবশেষে
মোর মাঝে এসে।
প্রশ্ন মনে আসে আরবার,
আবার কি ছিন্ন হয়ে যাবে সূত্র তার—
রূপহারা গতিবেগ প্রেতের জগতে
চলে যাবে বহুকোটি বৎসরের শূণ্য যাত্রাপথে ?
উজাড় করিয়া দিবে তার
পান্থের পাথেয় পাত্র আপন স্বল্লায়ু বেদনার—
ভোজ শেষে উচ্ছিষ্টের ভাঙা ভাণ্ড হেন ?" (কেন)

সঙ্গে সঙ্গে এই যান্ত্রিক সভ্যতা যে মনুষ্যত্বের মহিমার পূর্ণ বিকাশের সহায়ক নয়—এ যে তার অপমৃত্যুর কারণ এ কথাও কবি বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন। আধুনিক বিজ্ঞান সভ্যতার প্রসারের ফলে মানুষের অন্যায় আকাঙ্ক্ষা এত দূর বেড়ে গেছে যে সে স্বচ্ছন্দবিহারী পাখীদের মত আকাশে বিচরণ করে শুধু তাদের স্বতঃস্ফূর্ত্ত গানই বন্ধ করেনি, মাটির পৃথিবীর মানুষকে অবহেলা করেছে, তাদের শান্তিপূর্ণ জীবনযাত্রায় ব্যাঘাত ঘটিয়েছে এবং সবচেয়ে স্পর্দ্ধার বিষয় এই যে, বিধাতার মহান শক্তিকে পর্য্যন্ত তারা আঘাত করতে উদ্যত হয়েছে। তাই কবি তাঁর পরুষ কণ্ঠে তীব্র ভাষায় এর প্রতিবাদে বলছেন—

"দেবতা যেথায় পাতিবে আসনখানি
যদি তার ঠাঁই কোনোখানে নাই
তবে, হে বজ্রপাণি,
এ ইতিহাসের শেষ অধ্যায় তলে
রুদ্রের বাণী দিক দাঁড়ি টানি
প্রলয়ের রোষানলে ॥
আর্ত্ত ধরার এই প্রার্থনা শুন
শ্যামবনবীথি পাখিদের গীতি
সার্থক হোক পুন ॥ (পক্ষী মানব)

নব জাতকের কবি বাস্তব জগত সম্বন্ধে গভীরভাবে সচেতন। এই বাস্তবনিষ্ঠার নিদর্শন হিসাবে কবি যে-সকল বিষয়বস্তু বা উপমা কাব্যের উপকরণরূপে গ্রহণ করেছেন তা আধুনিক যুগের সর্ব্বসাধারণের সুপরিচিত সামগ্রী—যেমন, এরোপ্লেন, রেলগাড়ী, রেডিও ইত্যাদি। বিশ্বজগৎ তাঁর কাছে ইষ্টেশনের মত স্থান যেখানে মানুষের প্রাণযাত্রার বাহন রেলগাড়ী। কবি দেখছেন—

"দিনরাত গড়্ গড়্ ঘড়্ ঘড়্
গাড়িভরা মানুষের ছোটে ঝড় ॥
* * *
নিত্য মেলার নিত্য ভোলার ভাষা
কেবল যাওয়া-আসা। (ইস্টেশন)

সকাল সাড়ে নটায় কবি বৈঠকখানার ঘরে বসে রেডিয়োতে বিদেশিনীর কণ্ঠ সঙ্গীত শুনছেন এবং মনে মনে বলেছেন এ যেন—

—"বিশ্বহারা
একখানি নিরাসক্ত সঙ্গীতের ধারা। (সাড়ে নটা)

এ ছাড়া কবির যে দু'টি কবিতা তাঁর ইতিহাস-চেতনাকে নবতনরূপে উদ্ঘাটিত করেছে, তা' হল 'রাজপুতানা' এবং 'হিন্দুস্থান'। রাজপুতানার বীরগণের অতীত শৌর্য্যবীর্য্যের সঙ্গে বর্ত্তমান অবনতির তুলনা করে তার পর প্রসাদভোগী রাজন্যবর্গের দাস-মনোবৃত্তি এবং কৃত্রিম আড়ম্বর দেখে কবির মনে স্থির ধারণা হয়েছে যে এত হীনতা স্বীকার করে বেঁচে থাকার চেয়ে তার ধ্বংসকে বরণ করাই উচিত ছিল। কেননা কোনো এক রকমের জীবনের চাইতে মরণই মঙ্গল। তাই কবি বলেছেন—

"প্রচণ্ড সত্যেরে ভেঙে গল্পে রচে অলস কল্পনা
নিষ্কর্ম্মার গল্প উত্তেজনা
নাট্যমঞ্চে ব্যঙ্গ করি বীর সাজে
তারস্বর আস্ফালনে উন্মত্ততা করে কোন্ লাজে।
তাই ভাবি হে রাজপুতানা,
কেন তুমি মানিলে না যথাকালে প্রলয়ের মানা
লভিলে না বিনষ্টের শেষ স্বর্গলোক,
* * *
শঙ্করের তৃতীয় নয়ন হতে
সম্মান পেলে না কেন যুগান্তের বহ্নির আলোতে।"
(রাজপুতানা)

হিন্দুস্থান কবিতায় কবি শত শতাব্দীর সেই ইতিহাসকে স্মরণ করেছেন যার বিস্মৃত অধ্যায়ে—

"নব নব ধ্বজা হাতে নব নব সৈনিক বাহিনী
এক কাহিনীর সূত্র ছিন্ন করি আরেক কাহিনী
বারংবার গ্রন্থি দিয়ে করেছে যোজন।" (হিন্দুস্থান)

এবং অবশেষে ভগ্নজানু প্রতাপের ছায়ার সেই ইঙ্গিত শুনেছেন যা বিদায়ের আগে—

"বলে যায়—
আরো ছায়া ঘনাইছে অস্ত দিগন্তের
জীর্ণ যুগান্তের।" (ঐ)

কিন্তু এই বাস্তব চেতনা তাঁর কাব্যসৃষ্টির প্রেরণাকে উদ্বুদ্ধ করলেও তাঁর কবি-প্রকৃতিকে স্থায়ীভাবে নাড়া দিয়ে তার অন্তর্মুখী প্রবৃত্তিকে বহির্মুখী করতে পারেনি। ফলে কবির অন্তর ও বাহিরের মননক্ষেত্রে নিরন্তর এক দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করেছে। 'নবজাতকে'র অনেকগুলি কবিতায় এই ভাবজগতের সঙ্গে বস্তুজগতের দ্বন্দ্ব সুস্পষ্ট ভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। 'এপারে ওপারে' কবিতায় কবি যেমন চিত্রময়ী বর্ণনার সাহায্যে সহরবাসী মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার কথা অপূর্ব্বভাবে উদ্ঘাটিত করেছেন তেমনি সেই প্রাণপ্রবাহে একাত্ম অনুভূতি দেখাতে না পেরে অন্তরে খেদ অনুভব করেছেন। কেননা যেখানে—

"—ঘনীভূত জনতার বিচিত্র তুচ্ছতা
এলোমেলো আঘাতে সংঘাতে
নানা শব্দ নানা রূপ জাগিয়ে তুলিছে দিনে রাতে
* * *
তারি ধাক্কা পেয়ে মন
ক্ষণে ক্ষণে
ব্যগ্র হয়ে ওঠে জাগি
সর্ব্বব্যাপী সাফল্যের সচল স্পর্শের লাগি।"
(এপারে-ওপারে)

কিন্তু এ ব্যগ্রতা কবির বস্তু জগতের ব্যগ্রতা, ভাব-জগতের ব্যগ্রতা নয়। তাঁর ভাব-জগৎ অতি উর্দ্ধে অবস্থিত যেখানে মন সংসারের সকল কোলাহল থেকে মুক্ত হয়ে নিস্তব্ধ ও ধীর অবস্থায় আপনার কাজ করে চলেছে। তাই কবি বলছেন, বাস্তবের ধাক্কা যত প্রবলই হোক তাঁর মন অবিচলিত ভাবে বিরাজ করে স্বরচিত এক কল্পলোকে এবং তা কখনও—

"আপনার উচ্চ তট হতে
নামিতে পারে না সে যে সমস্তের ঘোলা স্রোতে।"
(এপারে ওপারে)

নিভৃত লোকবাসী কবি-প্রকৃতির এই আভিজাত্য-বোধকে অনেকে রোমাণ্টিক বলে অভিযোগ করেছেন। কবি তাঁদের সেই অভিযোগের সত্যতা সম্পূর্ণ না হলেও আংশিক মেনে নিয়েছেন, কেননা তিনি রসতীর্থ পথের পথিক। কিন্তু রোমাণ্টিক বলেও একেবারে জগতের দৈন্য, দুঃখ, ব্যথা, কুশ্রীতাকে ভুলে আকাশচারী কল্পনার পক্ষে ভর দিয়ে তিনি বাস্তব জগতের রূঢ়তা থেকে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করেন নি। বরং যেখানে এ সকলের লেশ-মাত্র চিহ্ন দেখেছেন সেখানে নির্ম্মমভাবে তার প্রতিরোধ

করতে বদ্ধপরিকর হয়েছেন এবং নিজেকে জাগ্রত করে—কম্বুকণ্ঠে বলেছেন :

"দৈন্য সেথা, ব্যাধি সেথা, সেথায় কুশ্রীতা,
সেথায় রমণী দস্যুভীতা—
সেথায় উত্তরী ফেলি পরি বর্ম;
সেথায় নির্ম্মম কর্ম্ম;
সেথা ত্যাগ, সেথা দুঃখ, সেথা ভেরি বাজুক মাভৈঃ
সৌখিন বাস্তব যেন সেথা নাহি হই।
সেথায় সুন্দর যেন ভৈরবের সাথে
চলে হাতে হাতে॥ (রোমান্টিক)

তবুও কাব্য সৃষ্টির বাস্তব অপূর্ণতা শেষ জীবনে তাঁকে বিশেষভাবে পীড়িত করেছে। কবির স্বভাব সৌকুমার্য্য কাব্যকে কেবলমাত্র রূপের মধ্যেই প্রত্যক্ষ করেছে। কিন্তু সৌন্দর্য্যের পরিপূর্ণ বিকাশ কেবলমাত্র রূপের ভেতরই হয় না, রূপ-বিরূপের দ্বন্দ্ব সংঘাতে যে-শক্তির স্ফূরণ হয় তারই আলোকে সৌন্দর্য্য আপনার অবিনশ্বর মূর্তিতে প্রকটিত হয়। কবি তাই সখেদে সুকুমার রূপের সঙ্গে রৌদ্র বিরূপকে আহ্বান জানাচ্ছেন :

"তাই আজ বেদমন্ত্রে হে বজ্র, তোমার করি স্তব—
তব মন্দ্ররব
করুক ঐশ্বর্য্য দান,
রৌদ্রী রাগিণীর দিক্ষা নিয়ে যাক মোর শেষ গান,
আকাশের রন্ধ্রে রন্ধ্রে
রূঢ় পৌরুষের ছন্দে
জাগুক হুংকার,
বাণী বিলাসীর কানে ব্যপ্ত হোক ভর্ৎসনা তোমার॥
(রূপ-বিরূপ)

এ ছাড়া নবজাতকের আর সকল কবিতায় রবীন্দ্রনাথের কবি কল্পনা মানবাত্মার সেই জয়যাত্রার গান গেয়েছে যা প্রতিনিয়ত মর্ত্য জগতের স্থূল আবরণ ভেদ করে সূক্ষ্ম অসীম অধ্যাত্মলোকের দিকে অবিরাম ধাবিত হচ্ছে। অর্থাৎ এখানেও কবির সেই-জীবন-দেবতার আহ্বান বাণী প্রতিধ্বনিত হয়েছে যা তাঁকে শৈশব থেকে কৈশোরে এবং যৌবন থেকে বার্দ্ধক্যে চালিত করার পরও বিশ্বসৃষ্টির রহস্য উদ্‌ঘাটনের সমাপ্তির কথা বলেনি বরং আরও দূরে নব নব লোকের সন্ধানে টেনে নিয়ে চলেছে; কবির সকল সত্তা নিবিড় ভাবে এই অনুভব করে যে—

* * *

"এ অজ্ঞের সৃষ্টি আমি অজ্ঞেয় অদৃশ্যে যাবে নাবি।
অসীম রহস্য নিয়ে মুহূর্তের নিরর্থকতায়
লুপ্ত হবে নানারঙা জলবিম্ব প্রায়,
অসমাপ্ত রেখে যাবে তার শেষ কথা
আত্মার বারতা। (প্রশ্ন)

জীবন ও মৃত্যুর পরম শুভ লগ্নে দাঁড়িয়ে 'নবজাতকে'র কবি তাঁর জীবন-দেবতাকে ভক্তিনম্র অশ্রুবিগলিত কণ্ঠে প্রার্থনা জানাচ্ছেন—

"ক্ষণিক মুহূর্ত্ত তরে চরম আলোকে
দেখে নিই স্বপ্ন ভাঙা চোখে
চিনে নিই, এ লীলার শেষ পরিচয়ে
কী তুমি ফেলিয়া গেলে, কী রাখিলে অন্তিম সঞ্চয়।"
(শেষ কথা)

কিন্তু কাছে থেকে মিলনের মাঝে কবি যাকে পরিপূর্ণ ভাবে চিনতে পারেননি, আজ দূর থেকে বিচ্ছেদের মাঝে তিনি তাকে চিনতে পারবেন বলে মনে করলেও এই কথা ভেবে তাঁর সন্দেহ হচ্ছে—

"জানি না, বুঝিব কি না প্রলয়ের সীমায় সীমায়
শুভ্রে আর কালিমায়
কেন এই আসা আর যাওয়া
কেন হারাবার লাগি এতখানি পাওয়া।
জানিনা, এ আজিকার মুছে-ফেলা ছবি
আবার নূতন রঙে আঁকিবে কি তুমি, শিল্পী কবি॥
(শেষ কথা)

কিন্তু পরক্ষণেই আবার সকল সন্দেহ ভঞ্জন করতে নিজের মনকে সকল নৈরাশ্য ত্যাগ করতে আহ্বান জানাচ্ছেন। কারণ চারিদিকের ঘন অন্ধকারের মাঝেও তিনি বিধাতার সান্ত্বনাবাণী শুনেছেন এবং আশার আলোকের ইঙ্গিত পেয়েছেন, যার বলে তাঁর মনের জড়তা-তামস দূরীভূত হয়ে গেছে এবং তিনি নিঃসংশয়ে এই কথাই বলছেন—

"নহি নহি আমি নহি অপূর্ণ সৃষ্টির
সমুদ্রের পঙ্কলোকে অন্ধ তলচর
অর্দ্ধস্ফুট শক্তি যার বিহ্বলতা বিলাসী মাতাল
তরঙ্গে নিমগ্ন অনুক্ষণ।
আমি কর্ত্তা, আমি মুক্ত, দিবসের আলোকে দীক্ষিত
কঠিন মাটির পরে
প্রতি পদক্ষেপ যার
আপনারে জয় ক'রে চলা।" (রাত্রি)

বিশ্বসৃষ্টির এই গূঢ়গভীর রহস্যই রবীন্দ্রনাথের 'নবজাতক' কাব্যে অপূর্ব্ব মহিমায় আত্মপ্রকাশ করে কাব্যপিপাসু পাঠককে স্থায়ী রস পরিবেশন করেছে।

রবীন্দ্রনাথের উপনিষদ-ভাষ্য বা ধর্ম্মজিজ্ঞাসা

'ঈশ্বর যে অহঙ্কার দিয়ে আমাদের বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছেন সেটা তাঁর প্রেমেরই লীলা। অহঙ্কার না হ'লে বিচ্ছেদ হয় না, বিচ্ছেদ না হ'লে মিলন হয় না, মিলন না হ'লে প্রেম হয় না। মানুষ তাই বিচ্ছেদ পারাবারের পারে বসে প্রেমকেই নানা আকারে চাইতে চাইতে নানা রকমের তরী গড়ে তুলছে—এ সমস্তই তার পার হবার তরণী—রাজ্যতন্ত্রই বল, সমাজতন্ত্রই বল, আর ধর্ম্মতন্ত্রই বলো।'

'আমরা প্রেমকেই চাই। কখন সেই প্রেমকে পাই? যখন বিচ্ছেদ-মিলনের সামঞ্জস্য ঘটে; যখন বিচ্ছেদ মিলনকে নাশ করে না এবং মিলনও বিচ্ছেদকে গ্রাস করে না; দুই যখন একসঙ্গে থাকে অথচ তাদের মধ্যে আর বিরোধ থাকে না, তারা পরস্পরের সহায় হয়।'

'আমাদের যথার্থ তাৎপর্য্য আমাদের নিজেদের মধ্যে নেই, তা জগতের সমস্তের মধ্যে ছড়িয়ে রয়েছে। সেই জন্যে আমরা বুদ্ধি দিয়ে, হৃদয় দিয়ে, কর্ম্ম দিয়ে কেবলই সমস্তকে খুঁজছি; কেবলই সমস্তের সঙ্গে যুক্ত হ'তে চাচ্ছি, নইলে যে নিজেকে পাই নে। আত্মাকে সর্ব্বত্র উপলব্ধি করবো, এই ইচ্ছে আত্মার একমাত্র আকাঙ্ক্ষা।'

'ঈশ্বরের ইচ্ছা যেদিকে নিয়মরূপে প্রকাশ পায় সেই দিকে প্রকৃতি, আর ঈশ্বরের ইচ্ছা যেদিকে আনন্দরূপে প্রকাশ পায় সেই দিকে আত্মা। এই প্রকৃতির ধর্ম্ম বন্ধন আর আত্মার ধর্ম্ম মুক্তি। এই সত্য এবং আনন্দ, বন্ধন এবং মুক্তি, তাঁর বাম এবং দক্ষিণ বাহু। এই দুই বাহু দিয়েই তিনি মানুষকে ধ'রে রেখেছেন।'

'ব্রহ্মকে সহজ ক'রে জানবার শক্তিই আমাদের সত্যকার শক্তি; সেই শক্তি আমাদের আছে, জানতে

ধ্যানমগ্ন কবি

পারছি নে ব'লে সে শক্তিকে কখনোই অস্বীকার ক'রবো না। বারবার তাঁকে ডাকতে হবে—বার বার তাঁকে

বলতে হবে, 'এই তুমি, এই তুমি, এই তুমি। এই তুমি আমার সম্মুখেই, এই তুমি আমার অন্তরেই। এই তুমি আমার প্রতিমুহূর্তে, এই তুমি আমার অনন্তকালে।'

'পিতা নোঽসি—পিতা তুমি আছ, তুমি আছ—এই আমার অন্তরের একমাত্র মন্ত্র; তুমি আছ এই দিয়েই আমার জীবনের এবং জগতের সমস্ত কিছু পূর্ণ। 'সত্যং' এই ব'লে ঋষিরা তোমাকে একমনে জপ করেছেন, সে কথাটির মানে হচ্ছে এই যে: পিতা নোঽসি। পিতা তুমি আছ। যা সত্য, তা শুধু মাত্র সত্য নয়, তাই আমার পিতা।' **শান্তিনিকেতন**—১ম, ২য় খণ্ড।

'যে দার্শনিক দর্শনকে সহজ করিয়া দেখাইতে পারেন, তিনিই যথার্থ ক্ষমতাশালী, ধীশক্তিমান; যে সভ্যতা আপনার সমস্ত ব্যবস্থাকে সরলতার দ্বারা সুশৃঙ্খল ও সর্ব্বত্র সুগম করিয়া আনিতে পারে সেই সভ্যতাই যথার্থ উন্নততর। বাহিরে দেখিতে যেমনই হউক, জটিলতাই দুর্ব্বলতা, তাহা অকৃতার্থতা; পূর্ণতাই সরলতা। ধর্ম্ম সেই পরিপূর্ণতার, সুতরাং সরলতার, একমাত্র চরম আদর্শ।'

'যাহা পাই তাহা চাই না, আমাদের যাহা আছে, তাহাকেই পাইব, ইহাই আমাদের প্রার্থনার বিষয়; যাহা দূরে তাহাকে সন্ধান করিব না, যাহা আমাদের ধীশক্তিতেই প্রকাশিত, তাহাকেই আমরা উপলব্ধি করিব, ইহাই আমাদের ধ্যানের লক্ষ্য। আমাদের প্রাচীন ভারতবর্ষের ধর্ম্ম এইরূপ সরল, এইরূপ উদার, এইরূপ অন্তরঙ্গ, তাহাতে স্বরচিত কল্পনাকুহকের স্পর্শ নাই।' **ধর্ম্ম**।

'স্বার্থ আমাদের যে সব প্রয়াসের দিকে ঠেলে নিয়ে যায়, তার মূল প্রেরণা দেখি জীবপ্রকৃতিতে; যা আমাদের ত্যাগের দিকে, তপস্যার দিকে নিয়ে যায়, তাকেই বলি মনুষ্যত্ব, মানুষের ধর্ম।

কোন্ মানুষের ধর্ম। এতে কার পাই পরিচয়। এ তো সাধারণ মানুষের ধর্ম নয়, তা হ'লে এর জন্যে সাধনা করতে হত না।

আমাদের অন্তরে এমন কে আছেন যিনি মানব অথচ যিনি ব্যক্তিগত মানবকে অতিক্রম করে 'সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ'। তিনি সর্ব্বজনীন সর্ব্বকালীন মানব। তাঁরই আকর্ষণে মানুষের চিন্তায় ভাবে কর্ম্মে সর্ব্বজনীনতার আবির্ভাব।'—**মানুষের ধর্ম্ম**।

'ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াম্। এ তত্ত্ব বাহিরে নাই, এ তত্ত্ব অন্তরের মধ্যে সকলের মূলে নিহিত।'

'ধর্ম্ম সেই সঙ্গীতশালা যেখানে পিতা তাঁহার পুত্রকে গান শিখাইতেছেন, পরমাত্মা হইতে আত্মায় সুর সঞ্চারিত হইতেছে। এই সঙ্গীতশালায় যে সর্ব্বত্রই সঙ্গীত পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতেছে তাহা নহে। সুর মিলিতেছে না, তাল কাটিয়া যাইতেছে; এই বেসুর বেতালকে সুরে তালে সংশোধন করিয়া লইবার দুঃখ অত্যন্ত কঠোর; সেই কঠোর দুঃখে কতবার তার ছিঁড়িয়া যায়, আবার তার সারিয়া লইতে হয়। সকলের একরকমের ভুল নহে, সকলের একজাতীয় সাধনা নহে, কাহারও বা সুরে দোষ আছে, কাহারও বা তালে, কেহ বা সুর তাল উভয়েই কাঁচা; এই জন্য সাধনা স্বতন্ত্র। কিন্তু লক্ষ্য একই। সকলকেই সেই এক বিশুদ্ধ সুরে যন্ত্র বাঁধিয়া, এক বিশুদ্ধ রাগিণী আলাপ করিয়া, এক বিশুদ্ধ আনন্দের মধ্যে মুক্তিলাভ করিতে হইবে, যেখানে পিতার সঙ্গে পুত্রের, গুরুর সঙ্গে শিষ্যের যন্ত্রে যন্ত্রে কণ্ঠে কণ্ঠে হৃদয়ে হৃদয়ে মিলিয়া গিয়া যোগের সার্থকতা পরিপূর্ণ হইয়া উঠিবে।—**সঞ্চয়**।

এই যোগসাধনা হইতে বিযুক্তি মানে—মানুষের 'ছোট আমি'র কাছে 'বড় আমি'র পরাভব। বিষয়বুদ্ধির গর্ত্তে পড়িয়া মানুষ সেখানে আত্মার অমরতাকে হারায়। আত্মকল্যাণের পথ সেখানে রুদ্ধ। জীবপ্রকৃতিকে মায়াময় এই পৃথিবীর কোলাহল যখন আবিষ্ট করিয়া তোলে, তখন বুদ্ধিভ্রমে মানুষ আপনার মধ্যেই পাঁকের সৃষ্টি করিয়া আপনাতে আচ্ছন্ন হইয়া থাকে, মরীচিকার মায়াবী ধাঁধায় সত্যকে সে তখন দেখিতে পায় না। কিন্তু সাধনলব্ধ চিত্তে যখন সে এই জড়প্রকৃতির কোলাহলের বাহিরে আসিয়া সত্যের মুখামুখি হইয়া দাঁড়ায়, তখন এই মায়াময় বিশ্বও তাহার নিকট আনন্দস্বরূপ হইয়া দেখা দেয়, তখন প্রেমে প্রাণে গানে গন্ধে আলোকে পুলকে সে তাহার পরম প্রাণপুরুষের সঙ্গে লীলাবিহার করে। সেই পরমপুরুষই তাহার পরমাত্মা, পরম সত্য, পরম জ্ঞান ও পরম লক্ষ্য। তখন সে গায়ত্রী পাঠ করিয়া এই সত্যই উপলব্ধি

করে : 'বিশ্বভুবনের অস্তিত্ব আর আমার অস্তিত্ব একাত্মক।' তখন তাহার হৃদয়ে মহাবিশ্বের মহাসম্মেলনের হাট বসিয়া যায়, আপন আনন্দে তখন সে গাহিয়া ওঠে :

'হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি।
জগৎ আসি সেথা করিছে কোলাকুলি।
ধরায় আছে যত মানুষ শত শত
আসিছে প্রাণে মোর, হাসিছে গলাগলি।'...

ভূমার মধ্যেই সুখ, অল্পে সুখ নাই। সমষ্টির সঙ্গে যুক্তিতেই আত্মার মুক্তি। আত্মাকে সমস্ত বিশ্বলোকে উপলব্ধি করিব, এই আকাঙ্ক্ষাই আত্মার একমাত্র আকাঙ্ক্ষা। 'ঈশ্বরের ইচ্ছা যেদিকে নিয়মরূপে প্রকাশ পায়, সেই দিকে প্রকৃতি, আর ঈশ্বরের ইচ্ছা যেদিকে আনন্দরূপে প্রকাশ পায়, সেইদিকে আত্মা। এই প্রকৃতির ধর্ম বন্ধন, আর আত্মার ধর্ম মুক্তি।' মুক্তির পথে এই আত্মা ঈশ্বরের সঙ্গে প্রেমে যুক্ত হয়। এই প্রেমের মধ্যেই আনন্দ। আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দং প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি : 'সেই সর্ব্বব্যাপী আনন্দ হইতেই এই সমস্ত প্রাণী জন্মিতেছে; সেই সর্ব্বব্যাপী আনন্দের দ্বারাই এই সমস্ত প্রাণী জীবিত আছে; সেই সর্ব্বব্যাপী আনন্দের মধ্যেই ইহারা গমন করে, প্রবেশ করে।' এই আনন্দের রসসাগরে একবার যে যোগ দিতে পারিয়াছে, সে মুক্তিস্নান করিয়া উঠিয়াছে। এই পথই মানুষের মুক্তির পথ। উপনিষদ এই পথের সন্ধানই মানুষকে দিয়াছে।

আধুনিক বিশ্বে উপনিষদের শ্রেষ্ঠ ভাষ্যকার রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'শান্তিনিকেতন', ১ম ও ২য় খণ্ড, 'ধর্ম্ম', 'সঞ্চয়' ও 'মানুষের ধর্ম্ম'—এই পাঁচখানি গ্রন্থে নানাভাবে ধর্ম্মজিজ্ঞাসার মূল সূত্রে সেই উপনিষদকেই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কোথাও তাহা প্রার্থনার মন্ত্ররূপে, কোথাও প্রকৃতির ষড়ঋতুর মাধুর্য্যে, কোথাও বা আত্মবিশ্লেষণের মধ্যে অভিব্যক্তি পাইয়াছে। পরম পুরুষ ব্রহ্মকে কখনও তিনি 'জীবনদেবতা' বলিয়া আরতি করিয়াছেন, কখনও বা 'মনের মানুষ' বলিয়া সেই মনের মানুষকে লইয়া খেলাঘর রচনা করিয়াছেন। উপনিষদের সঙ্গে যাঁহাদের কিছুমাত্র যোগ আছে, তাঁহারাই এই গ্রন্থগুলির মধ্যে আনন্দস্বরূপের সাক্ষাৎ পাইবেন। আনন্দস্বরূপ হইতেছেন 'সেই দেবতা য একঃ, যিনি এক', একমেবাদ্বিতীয়ম্ ব্রহ্ম। সেই ব্রহ্ম-উপলব্ধিই এই পাঁচখানি গ্রন্থের মূল বিষয়বস্তু। ধর্মব্যাখ্যা বলিয়া ধর্মানুশীলনের স্বতন্ত্র পাঠ হিসাবেই ইহা মাত্র বিবেচ্য নয়, কবির লেখনীস্পর্শে ইহা সাহিত্যেরও উন্নত শীর্ষে স্থানলাভ করিয়াছে। আজিকার বিভ্রান্ত যুগের মানুষ ধর্মসাধনা হইতে বিযুক্ত হইয়া বেদ, বেদান্ত ও উপনিষদকে ভুলিয়া গিয়াছে। আত্মস্থ হইয়া আত্মানুশীলনের আজ অভাব। উপনিষদের আলোয় রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন : 'অন্তরাত্মাকে জানো (আত্মানং বিদ্ধি), তা হলেই অমৃতকে জানবে, তা হলেই পরমকে জানবে।' সেই জানাকে সার্থক করিয়া তুলিতেই এই পাঁচখানি গ্রন্থের অবতারণা। যাঁহারা মূল উপনিষদ না পড়িয়াছেন, তাঁহারাও এই গ্রন্থগুলির দ্বারা উপনিষদের মূল রসই উপলব্ধি করিবার অবকাশ পাইবেন। উপরে তাহারই মাত্র কয়েকটি উদ্ধৃতি দেওয়া হইল।

মায়ের প্রাণ

শ্রীগোপালদাস চৌধুরী

দশ

রাতের বেলা ঘুম হো'ক আর নাই হো'ক রোজই ঠাকমা ভরতপাখীর মত ভোর বেলাই উঠে পড়তেন। তাঁর কাছেই ঘুমুতাম বলে আমারও সকাল সকাল ঘুম ভেঙে যেত। ফুলশয্যার পরের দিন কিন্তু ছ'টার আগে ঘুম ভাঙল না আমার। নিমন্ত্রিতদের খাইয়ে, বাড়ীর লোকজনদের হাঙ্গামা মিটিয়ে, ঘুমুতে আসতে ঠাকমার হয়ত রাত বারোটা একটা হয়েছিল। তা' হলে কি হয়, ঘুম ভেঙেছিল হয়ত নিত্যকার সময়ই। আমার ঘুম ভাঙতেই দেখলাম ঠাকমা বিছানায় নেই। ছোট ঠাকমা জানালার কাছটিতে একটা সিল্কের চাদর মুড়ি দিয়ে দিব্যি আরামে ঘুমুচ্ছিলেন তখনও। হাড়-ভাঙা খাটুনির পর ঝি-চাকররাও হয়ত তখন অঘোরে ঘুমুচ্ছিল। নীচে-উপরে কারুরই সাড়া-শব্দ পাওয়া যাচ্ছিল না।

হাত মুখ ধুয়ে এসে দেখি ছোট ঠাকমা জেগেছেন; কিন্তু তখনও বিছানা ছাড়েননি। আমি ঘরে ঢুকতেই জিগ্‌গেস করলেন—দিদি কোথারে খোকন?

নীচে পূজার আয়োজন করছেন। শুনছ না ঐ চন্দন ঘষার শব্দ? আমি বল্‌লাম।

—বাপরে বাপ। এখনও সূর্য্যি ওঠেনি, এরি মধ্যে তোরা উঠে পড়েছিস! নাঃ, তোদের রাত-দিন জ্ঞান নেই—বলে ছোট ঠাকমা গায়ের চাদরটা বিছানার ওপর রেখে উঠে বসলেন।

আমি হেসে বললাম—সূর্য্যি ওঠেনি কি ছোট ঠাকমা! ঐ ছাখো রায় বাবুদের তিনে কোটার দেয়ালটা কেমন ঝিক্‌মিক করছে রোদে।

ও রোদ নয়—অরুণের আলো—ছোট ঠাকমা বল্লেন।

অরুণের আলোয় আর রোদে যে কি তফাৎ সেটা আমার মাথায় ঢোকেনি। আমি বললাম—ঠাকমা হয়ত অরুণের আলো ফুটবার আগেই উঠে পড়েছেন। অন্য দিন আমরা এক সঙ্গেই উঠি। আজই আমার দেরী হ'য়েছে।

দিদির কথা ছেড়ে দে—ছোট ঠাকমা বললেন। বউ বেলা থেকে দেখে আসছি ত। ভোরের পাখীর ডাক শুনলে আর বিছানায় থাকতে পারেন না। আমার কিন্তু বাপু রোদ না উঠলে ঘুম ভাঙে না।

আমি হাসতে হাসতে বললাম—তুমি ত বলছ এখনও রোদ ওঠেনি। তবে যে তোমার ঘুম ভাঙলো?

সে তোদের বাড়ীর গুণে—বলেই ছোট ঠাকমা নীচে নেমে গেলেন। টেবিলের ওপরকার 'টাইমপিস' ঘড়িটায় টং টং করে সাতটা বাজলো।

আমি বই-টই গুছিয়ে পড়তে বসবো, তখন বাবা শোবার ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বারান্দায় দাঁড়ালেন। চোখো-চোখি হ'তেই দেখলাম মুখখানি খুবই ভার ভার। আমাকে জিগ্‌গেস করলেন—তোর ঠাকমারা উঠেছেন, খোকন?

হ্যাঁ বাবা, তাঁরা নীচে গেছেন।

আমি পড়তে বসলাম। বাবা হাত মুখ ধুয়ে এসে বারান্দায় পায়চারি করতে লাগলেন। একটু বাদেই শিবুর মা বাসন মেজে ঠাকমার কথা মত নতুন মার ঘরে কাজ করতে এল। নতুন মা'র তখনও ঘুম ভাঙেনি দেখে সে নীচে নেমে যাচ্ছিল।

বাবা জিগ্‌গেস করলেন—চা হয়েছে, শিবুর মা?

—না বাবা জল ফুটছে—এখুনি হয়ে যাবে যেন।

চা হলেই আগে তোমার মাকে এক কাপ দিয়ে যেয়ো—বাবা বললেন।

পাঁচ-সাত মিনিটের মধ্যেই শিবুর মা চা-জলখাবার নতুন মার ঘরে রেখে এলো। সকলেই জানল দিনের প্রথম বারের চা খাওয়াটা নতুন মা বিছানা ছাড়বার আগেই খাবেন।

একটু পরেই বাবা ও আমার চা-জলখাবার নিয়ে ঠাকমা উপরে আসলেন। বাবা চা খেতে-খেতে জিজ্ঞেস করলেন—কাকীমা কখন যাচ্ছেন মা?

ঠাকমা বললেন—এ-বেলাই ত যেতে চাইছিল। আমি খেয়ে-দেয়ে ও-বেলায় যেতে বলেছি।

বাবা বিরক্তির সহিত বললেন—কি দরকার ছিল থাকবার কথা বলবার? যেতে চাচ্ছিলেন যেতে দিলেই পারতে। অমন ঝগড়াটে লোককে বাড়ীতে ঠাঁই দেয়া ঝকমারি কাজ।

বাবার কথা শুনে ঠাকমা ত অবাক! তিনি আর একটি কথাও না বলে নীচে নেমে গেলেন।

নতুন মা চা খেয়ে বেরুলেন যখন, দেয়াল-ঘড়িটায় ঢং ঢং করে আটটা বাজল। শিবুর মা নিকটেই হাজির ছিল; নতুন মাকে বেরুতে দেখে তাঁর শাড়ী, সায়া, সেমিজ গামছা চানের ঘরে রেখে এল। নতুন মা একটি ছোট হাত-বাক্স হাতে করে স্নানাগারে গিয়ে ঢুকলেন। পরে জেনেছিলাম ঐটিতে দাঁত-মাজন, দাঁতের বুরুশ, চিরুণী আয়না, মাখবার সাবান, পাউডার ইত্যাদি থাকত।

নতুন মা হাত মুখ ধুয়ে চান-টান করে সেরে যখন বেরুলেন তখন দেয়াল ঘড়িটায় ন'টা। এই সময়ের মধ্যে শিবুর মা নতুন মার শোয়ার-ঘর ঝাড়-মোছ করে নীচে নেমে গেছে। তার তাজ কাজে এলেও শিবুর মা'র মনে সোয়াস্তি ছিল না। বাড়ীর পুরনো লোক সে; সে মনে করত অন্য লোক যতই যত্ন করে করুক তার মত গুছিয়ে করতে আর কেউ পারবে না। তাই যখন নতুন মা'র কাজ করে একটু ফাঁক পেত, ছুটে এসে সংসারের কাজে ভিড়ে পড়ত। ঠাকমার নিষেধ কানেও তুলত না।

বেলা পাঁচটা নাগাদ বাবা ও আমি চা খাচ্ছি। নতুন মা'র চা-জলখাবার এ-বেলাও তাঁর ঘরে দিয়ে এসেছে শিবুর মা। আমাদের খাবার ঠাকমাই নিয়ে এলেন। তাঁর পিছু-পিছু ছোট ঠাকমাও এলেন বাড়ী যাওয়ার আগে দেখা করতে। তাঁর মোটর অনেক আগে থেকে এসেই দাঁড়িয়েছিল।

ঠাকমা ও ছোট ঠাকমা দু'জনই আমাদের খাওয়া দেখছিলেন বসে। সে সময় ঠাকমা বাবাকে বললেন—ফুলশয্যায় বেয়ানরা না আসায় মনটা বড়ই খারাপ লাগছে মধু! সতু এসেও না খেয়ে, না বলে-কয়ে চলে গেল। ব্যাপার কিছুই বুঝতে পারলাম না।

বাবা গম্ভীর ভাবে উত্তর দিলেন—বোঝা-বুঝির আর কি আছে। সতু যে এসেছিল সে-ইত আমাদের ভাগ্যি। সেও না এলেই ভাল করত।

ছোট ঠাকমা—এ আবার কি রকম কথারে মধু? এত করে বলে কয়ে এলাম, না আসাটা উচিত হল বেয়ানদের?

ছোট ঠাকমার দিকে চেয়ে বাবা বললেন—কি রকম আবার কি? নিজেই ভেবে ছাখো না কী অভদ্রতা করে এসেছ।

ছোট ঠাকমা ফোঁস করে উঠলেন—ও বাব্বা! এরি মধ্যে একখানাকে সাতখানা করে লাগানো হয়েছে কানে!

তাতে এমন কি দোষের হয়েছে? মিথ্যে ত আর বলেনি?—বাবা বললেন। বাবার জবাবের মধ্যে কিছুটা গুমটের লক্ষণ দেখা গেল।

—নিশ্চই মিথ্যে। সত্যি হলে তোর শালা সতুই বড়-গলায় বলে যেতো; শ্বশুর বাড়ীর পক্ষ টেনে তোকে আর ওকালতি করতে হত না।

ঠাকমা ছোট ঠাকমাকে বললেন—অমু, তোর মোটর সেই কখন থেকে দাঁড়িয়ে আছে।

ঠাকমা একটা আসন্ন ঝড়ের আশঙ্কা করে, ছোট ঠাকমাকে তাড়াতাড়ি বাড়ী পাঠাতে চাচ্ছিলেন। ছোট ঠাকমা তা বুঝতে পেরেও কথাটা কানে তুললেন না।

ছোট ঠাকমা বাবাকে বললেন—শুনেছিসই যদি তবে সবটাই শোন। এক পক্ষের কথা শুনে দোষ-গুণ বিচার করিসনে। কাল কুটুমদের দর্শন করতে গিয়ে প্রথমেই ত সদরে দাঁড়িয়ে পা ঠাণ্ডা করতে হল বেশ কিছুক্ষণ। সদর দুয়ার বন্ধ ছিল, বার বার হর্ণ দিয়ে মোটর হার মানল। কেউ দরজা খুলতে এলো না। পরে ড্রাইভারের ডাকাডাকি আর কেমীর কড়া নাড়ার শব্দে হয়ত অতিষ্ঠ হয়েই দরজা খুলে দিল। সিঁড়িতে তোর বড় শালীর সঙ্গে দেখা। সে নবাবের বেটী নবাব প্রণামটাও

করলে না। তুরুক সওয়ারের কায়দায় একটা নমস্কার ছুঁড়ে দিয়েই ভদ্রতার দায় থেকে খালাস! দোতলায় পা দিতেই বেয়ানের সঙ্গে দেখা; নমস্কার করলাম। ইনি আবার মেয়ের চেয়েও এক কাঠি সরেস! আমার নমস্কারটা মাঠেই মারা গেল। একবার মাথাটাও নোয়ালেন না।

ঠাকমা বা-হাত খানা গালে ঠেকিয়ে বললেন—ও মা, এ আবার কি রকম ভদ্রতা!

ভদ্র তারা মোটেই নয় দিদি—ছোট ঠাকমা বললেন।

বাবা বিরক্তির সঙ্গে বললেন—না! তারা ভদ্র হবেন কেন, যত ভদ্র আমরা!

ছোট ঠাকমা—ও বটে! আমার কথা না হয় নাই ধরলাম; কিন্তু খোকনকেই কোন একটু আদর যত্ন করলে! বসতে-খেতে না হয় নাই বলেছে, একবার কোন জিগ্‌গেস করলে কে সে?

বাবা সপ্রতিভ ভাবেই উত্তর দিলেন—পরিচয়টা ত তোমারই দেওয়া উচিত ছিল।

ছোট ঠাকমাও বেশ ঝাঁঝের সঙ্গে বললেন—আমার কি উচিত ছিল না-ছিল সে আর তোকে শিখুতে হবে না। তুই চুপিচুপি চোরের মত গিয়ে বিয়ে করে এলি—না নিলি বাজনা, না নিলি বরযাত্রী সে জন্য কিনা মায়ে-ঝিয়ে মিলে ঝাল ঝাড়ল আমার ওপর!

—নেইনি যে সে কথা কোন্ আর মিথ্যে! রাগ ত তাঁদের হবারই কথা।

তুই চুপ কর মধু—ঠাকমা বললেন।

ছোট ঠাকমা বললেন—তোর শাশুড়ী নাক-মুখ টানা দিয়ে শোনালেন তার বড় জামাই এসেছিল চৌঘুড়ি চড়ে, গোরার বাদ্যি বাজিয়ে, তুরুক সওয়ার নিয়ে। তুই একা একা হেংলার মত বিয়ে করতে গিয়ে তাদের নাক কাটিয়েছিস, লজ্জা দিয়েছিস।

বাবা বল্লেন—তা তাঁরা একশ' বার এ-কথা বলতে পারে।

ছোট ঠাকমা বাবার কথায় কান দিলেন না। আপন মনেই বলে চললেন—তাদের বে-আক্কেলে কথা শুনে আমারও বড্ড রাগ হলো। আমিও বললাম—বেশ ত, মধুই না হয় চুপিচুপি এসেছিল, তোমরা ত দু'দশ জনকে বলতে পারতে। তোমাদের কন্যা পক্ষের ক'জন এসেছিল শুনি? আমরা যে বরের মা-খুড়ী আমাদেরই কোন জানিয়েছিলে বিয়ের খবর?

ছোট ঠাকমা থামছিলেন না দেখে বাবা অস্বস্তি বোধ করছিলেন। তিনি ব্যস্ততার সঙ্গে বললেন—মিছিমিছি ওঁদের দোষ দিয়ো না খুড়ী। আমিই বারণ করেছিলাম তোমাদের জানাতে।

ছোট ঠাকমা ঠেস দিয়ে বাবাকে শুনালেন—আহা কী আমার মায়ের সুপুত্তুর রে! শ্বশুর বাড়ীর লোক দিয়ে মা খুরীর মান খোয়ালি!

ক্রমেই ব্যাপারটা গুরুতর হয়ে উঠছিল দেখে ঠাকমা বললেন—অমু, তুই থাম বাপু। ও-সব নিয়ে আর ঘাটাঘাটি করিসনে। চ', তোকে মোটরে তুলে দিয়ে আসি।

ছোট ঠাকমা—যাচ্ছি দিদি, এক্ষুনি যাচ্ছি—আমি থাকতে আসিনি। মধু ক্ষেমীর ননদের মেয়েকে বিয়ে করেছে জানলে আমি আসতামই না। ওরা যে কি দরের লোক তা সহর, সহরতলীর সকলেই জানে। যে ঘরেই ওদের মেয়ে গেছে সে ঘরেই আগুন জ্বলিয়েছে। শ্বশুর বেঁচে থাকতেই সুকুমারী শ্বশুর ঘরে লাথি মেরে বাপের ঘর করেছে। আমাদের বউর গুণ-গরিমা ত নিজের চোখেই দেখলাম। বাড়ীতে পা দিয়েই কী লঙ্কাকাণ্ড বাঁধিয়ে বসেছে। সতু খেয়েই যেতো; বউ-মাই জোর-জুলুম করে না খাইয়ে পাঠিয়ে দিলে।

বাবা রেগে বললেন—হ্যাঁ, তোমার কানে কানে বলে গেছে।

—না, কানে কানে বলেনি। নিজের কানেই শুনেছি। ডাকবো সতুকে সাক্ষী?

বাবার সর্ব্বশরীর রাগে থর থর করে কাঁপছিল। তিনি সঙ্কোচ শূন্য হয়ে উত্তেজনার মুখে বলে বসলেন—হাঁ হাঁ ঢের হয়েছে; আর জালিয়ো না। এখন বাড়ী গিয়ে মাথা ঠাণ্ডা করো। তুমি নিজে যেমন অন্যকেও তাই মনে করো। কে না জানে তোমার পরামর্শেই কাকাবাবু বাবার সঙ্গে পৃথকান্ন হয়েছিলেন।

মহা বিস্ময়ে ঠাকমা বললেন—ছিঃ ছিঃ, খুড়ীমাকে ও-সব কি বলছিস মধু?

—কেন বলব না? মিছে কথা ত আর বলছিনে?

—মিছে নয়ত কি? যা জানিসনে তা নিয়ে কথা কোস নে।

ছোট ঠাকমা বললেন—তাঁরা ভিন্ন হয়েছিলেন কারবারে বনিবনাও না হওয়ায়! আমার পরামর্শে নয়। আমাদের দুই জায়ে বরাবরই ভাব-ভালবাসা ছিল, এখনও আছে।

বাবা ছোট ঠাকমার কথায় কান না দিয়ে বললেন—হয়েছে, হয়েছে, আর গলাবাজি করতে হবে না। তোমার কত দরদ আমাদের ওপর, তা আমার খুব জানা আছে। পাছে আমি কোন দিন কাকাবাবুর সম্পত্তি দাবী করি, সে ভয়ে আগে থেকেই আমাকে ঠকাবার মতলবে বাড়ী-ঘর, কোম্পানীর কাগজ তোমার দাদাকে লিখে পড়ে দিয়েছ।

ঠাকমা বিরক্ত হয়ে বললেন—চুপ কর মধু, চুপ কর, আজ এ কি শুনছি তোর মুখে? ঠাকুর-পো অমুকে, তার বিষয় সম্পত্তি লিখে দিয়ে গেছেন। অমুর যাকে ইচ্ছে হয় দিয়েছে বা দেবে তাতে তোর রাগ করবার কি আছে?

বাবা বললেন—আমার দায় পড়েছে রাগ করবার জন্যে। অমু বলতেই তুমি অজ্ঞান হও, তাই উনি কি দরের লোক চিনিয়ে দিলাম তোমায়। এখন থেকে একটু সাবধান হয়ো।

ছোট ঠাকমা ছিলেন অসম্ভব রকম অভিমানী। বাবার শক্ত শক্ত কথাগুলি তাঁর বুকে শেলের মত বিঁধল। তাঁর চোখে অপমানের ঘায়ে জল ও আগুন দুইই এসে হাজির হল। তিনি অভিমানরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন—চিনিয়ে দিয়ে ভালই করলি মধু। তবে আমি জানি, দিদি কোনদিনই আমাকে ভুল বোঝেন নি। আজ যা তোর নতুন রূপ দেখলাম তাতে আমিও তোকে চিনে নিলাম। তোকে যদি কিছু না দিয়ে থাকি বা না দি, অন্যায় করা হবে না। নিজের মা'র সঙ্গে তোর যা ব্যবহার দেখে গেলাম তাতে খুরি হয়ে কি আর বেশী আশা করতে পারি!

ঠাকমা বললেন—ছেলের কথায় কি দোষ ধরতে আছে ভাই অমু? কথায় বলে, রাগ চণ্ডাল। রাগ হলে কি ভাল মন্দ জ্ঞান থাকে লোকের?

ছোট ঠাকমা আঁচলে চোখ মুছে বললেন—এ রাগের কথা নয় দিদি। মধু যদি রাগ করে কি ভুল করে আমায় কিছু বলত, তা আমি হেসে উড়িয়ে দিতে পারতাম। ও আমাকে অপমান করছে শুধু ওর বউকে খুশি করবার জন্যে, শ্বশুর বাড়ীর লোকদের মান বাঁচাবার জন্যে। এই অকারণ অপমান আমি সইব না, ভুলব না। আজ যাই দিদি, যা নমুনা দেখে গেলাম, তুমি যে ক'দিন বাড়ীতে তিষ্ঠুতে পারবে তা জানিনে দিদি।

ঠাকমাকে প্রণাম করে, আমায় আদর জানিয়ে আঁচলে চোখ মুছতে মুছতে ছোট ঠাকমা গিয়ে মোটরে উঠলেন।

ঠাকমা সজল চোখে বললেন—কিছু মনে করিস নে ভাই অমু। মধু আমার পেটের ছেলে, সে যে এ-সব কথা মুখেও আনতে পারে তা কোন দিনই জানতামনা! তুই আর আসিসনে এ বাড়ী, সময় পেলে আমিই গিয়ে দেখা করবো।

একটা মর্মভেদী বেদনায় মধ্যে মোটর ছেড়ে দিল।

[ক্রমশঃ

রায়বাঘিনী

শ্রীচুণিলাল মুখোপাধ্যায়

চরিত্র পরিচয়

আকবর শাহ	ভারত সম্রাট
মহারাজা মানসিংহ ...	জয়পুরাধিপতি
তোডর মল্ল বীর বল	... মন্ত্রী
রাম সিংহ ...	রাজপুত সামন্ত রাজা
রাজা রুদ্রনারায়ণ ...	ভুরসুট রাজ
হরিদেব ভট্টাচার্য্য ...	ঐ গুরুদেব
দীননাথ চৌধুরী	সর্দ্দার ও রুদ্রনারায়ণের শ্বশুর
দুর্লভ দত্ত ...	ঐ মন্ত্রী
চতুর্ভুজ চক্রবর্ত্তী ...	ঐ সেনাপতি
চরণ দাস ...	রাজভৃত্য
সূর্য্য দেব ...	ছাতনাপুর দুর্গাধিপতি
কালু চাঁড়াল ...	বুনো সর্দ্দার
চন্দন ...	কাটুশাকড়া মন্দিরের পূজারী
ওসমান খাঁ ...	পাঠান সর্দ্দার
হুসেন ...	ঐ অনুচর
অনন্ত ...	ওসমান খাঁর চর
রামজীবন ...	দীননাথের প্রতিবেশী
বসন্ত ...	চতুর্ভুজের অনুচর
কুনাল ...	পাহাড়ী ছেলে
বিশ্বনাথ বিশ্বাস ...	ধনী তালুকদার
জগাই মধাই গজপতি	কালু সর্দ্দারের বুনো যোদ্ধা

পাঠান সৈন্য, বুনো যোদ্ধাগণ, হিন্দু সৈন্য, ভুরসুটের নাগরিকগণ, পাগলা বাউল, দূত, চর, আশ্রমের ছাত্র-ছাত্রিগণ, পাহাড়ীয়াগণ, ভট্ট কবি।

ভবশঙ্করী ...	রাণী
সুমিত্রা ...	ঐ অনুচরী ও সেনাপতির ভাগ্নী
তারা	রামজীবনের পৌত্রী এবং রাণীর প্রধানা দেহরক্ষিণী

পরিচারিকা, নারী সৈন্যগণ।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[দ্রোণ নদের তীরবর্ত্তী আচার্য্য হরিদেব ভট্টাচার্য্যের বিদ্যাশ্রম, দূরে দূরে এক একখানি পর্ণকুটীর—হরিতকী, বেল, আমলকী ইত্যাদি বৃক্ষাদি স্থানটীকে আলোছায়ায় ভরিয়া রাখিয়াছে। দ্রোণ নদে নামিবার একটি ঘাট, তাহারই অনতিদূরে ছাত্রছাত্রীগণের পাঠাভ্যাসের জন্য বসিবার ব্যবস্থা, তাহার সম্মুখে আচার্য্যের বসিবার আসন—দ্রোণ নদের পরপারে উষার আলোর পূবের আকাশ উদ্ভাসিত হইয়াছে। আশ্রমের ছাত্রছাত্রীরা বেদের স্তোত্র পাঠ শেষ করিলে আচার্য্য হরিদেবের তন্ময়তা ভঙ্গ হইল]

হরিদেব। ওঁ শান্তি! ওঁ শান্তি!! (স্বস্তি বচন উচ্চারণ করিলেন) (অপর দিকে দূরে ঘন জঙ্গল মধ্যে দেখা গেল ভবশঙ্করী একটি বন্য শূকরকে অনায়াসে অস্ত্রাঘাতে বধ করিলেন। পশুরক্তে তাহার পরিধেয় সিক্ত হইল। আশ্রমের ছাত্র-ছাত্রীরা কোলাহল করিয়া উঠিল।)

ছাত্র। আচার্য্য! চেয়ে দেখুন, দেবী শঙ্করী ঐ বন্য শূকরটাকে কেমন অনায়াসে মেরে ফেল্লে।

(আচার্য্য স্থির দৃষ্টিতে সেইদিকে চাহিলেন)

ছাত্রী। পশুরক্তে ওর পরিচ্ছদ একেবারে রঞ্জিত হোল। ঐ যে শঙ্করী আসছে। (ধীরে ধীরে কোটীদেশে ভীষণ ছোরাখানি রাখিতে রাখিতে ভবশঙ্করীর প্রবেশ—চারিদিকে চাহিয়া আচার্য্যকে প্রণাম—শঙ্করী অষ্টাদশ বর্ষীয়া সৌন্দর্য্যময়ী বীর্য্যবতী ব্রাহ্মণ কুমারী)

হরিদেব। শঙ্করী! মা! আবার! আবার তোমার এই নিষ্ঠুর খেলা! প্রভাতের পবিত্র দেহ জীবরক্তে রাঙিয়ে দিলে। ব্রাহ্মণ কুমারী তুমি—তোমার এই নির্ম্মম বৃত্তি।

শঙ্করী। আচার্য্য! আমি নির্দ্দোষ। আক্রান্ত হয়েই আমি আত্মরক্ষা ক'রেছি।

হরিদেব। মা! তুমি নারী—তোমার কাজ তো হত্যা নয়—পালন। মা! জীবরক্ষায় আত্মত্যাগই যে শিক্ষার শ্রেষ্ঠ আদর্শ। এ নিষ্ঠুর হত্যা তো মা তোমার নয়। শক্তির আকর্ষণে চিত্তবৃত্তির অপব্যয় ক'রো না। মা! মানুষকে রক্ষা ক'রে জীব পালন ক'রে মায়ের কর্তব্য ক'রো। হত্যার লিপ্সা, তোমরা মা, মনের মধ্যে পোষণ ক'রো না। সোনার বাংলাকে ভারতের বুকে উজ্জ্বল ক'রে তোল—তোমাদের স্বভাবসিদ্ধ দয়ায়। এ নিষ্ঠুর বৃত্তি মা—তোমার নয়।

(এক সন্ন্যাসীর প্রবেশ—পরিধানে কৌপীন—দেহ কৃশ—মস্তকে জটা—মুখমণ্ডল উজ্জ্বল—জ্যোতির্ময়—হাতে শঙ্খ ও ত্রিশূল)।

সন্ন্যাসী। না—না—হরিদেব! তা নয়! শান্তির যারা শত্রু তাদের মারতে হবে। তার আক্রমণ থেকে সৃষ্টি রক্ষায় পাপ কই?

(হরিদেব ত্রস্তে উঠিয়া নীচে আসিয়া সন্ন্যাসীর পদতলে প্রণিপাত—ছাত্র-ছাত্রী সকলে প্রণাম করিল—শঙ্করী নিশ্চল)

হরিদেব। একি! দেব! কত বর্ষপরে বাংলার মাটী পবিত্র ক'রে—আমার গৃহে আজ কোন সৌভাগ্য আপনাকে এনে দিলে! আমার বাক্যের চিন্তার সকল ত্রুটি মার্জ্জনা করুন। (পদতলে বসিল)

সন্ন্যাসী। (হাত তুলিয়া সকলকে আশীর্ব্বাদ করিয়া) হরিদেব! ওঠ। (আলিঙ্গন দিল) মা! শঙ্করী! বীর্য্যশালিনী বাংলার মেয়ে। এস মা আশীর্ব্বাদ করি। হরিদেব! এ মেয়ে যে অসাধারণ লক্ষণ সম্পন্না। বাংলার সৌভাগ্য আনবে এই আমার মা। এস, এস মা আমার।

(ভবশঙ্করী সম্বিত ফিরিয়া পাইল—বীর্য্যবতী কৌতুহলপূর্ণ দৃষ্টি নিয়া সন্ন্যাসীর নিকট আসিয়া তাহাকে প্রণাম করিল—সন্ন্যাসী আশীর্ব্বাদ করিয়া) মা! দুর্ব্বলের রক্ষায়, দুষ্টের শাস্তি দিতে তোমার হাতের অস্ত্র সর্ব্বদা উন্মুক্ত থাকুক। এই নে মা! পবিত্র শঙ্খ তোকেই দিলাম। বুঝি তোরই জন্য মা এতকাল নিয়ে বেড়াচ্ছি। বাজিয়ে দে মা পাঞ্চজন্য শঙ্খ, বাজিয়ে দে! পীড়নকারী শান্তিনাশীদের শাস্তি দিয়ে রক্ষা কর মা, সৃষ্টি রক্ষা কর।

হরিদেব। ভারতের শাশ্বতকালের সাধনা ধ্বংস হবে না। তাকে রক্ষা কর। বাংলার সন্তানদের শাস্ত্রা-শাস্ত্রবিদ্যায় দীক্ষিত করে তাদের বলীয়ান করে তোল।

হরিদেব। দেব! আমি বুঝিনি। আপনার আদেশ শিরোধার্য্য।

সন্ন্যাসী। শঙ্করী! মা! আমি আবার আসবো। (সকলকে) তোমাদের আশীর্ব্বাদ করি—বাংলার মুখ উজ্জ্বল করো।

(হরিদেব ও সন্ন্যাসী ব্যতীত সকলের প্রস্থান)

হরিদেব। আদেশ করুন দেব!

সন্ন্যাসী। তোমায় আর কি বলবো—এই মেয়েটির দিকে দৃষ্টি রেখো। এর গতি ভঙ্গিমায় অসাধারণ শক্তির বিকাশ পায়। এর সঙ্কল্প দৃঢ়। হরিদেব! ঐ সমস্ত ভারতে পাঠানের অত্যাচার ছেয়ে গেছে। তাদের লক্ষ্য সমস্ত সাম্যের উচ্ছেদ। আর্য্যের যে মহান সাধনা সমস্ত পৃথিবীর লক্ষ্য বস্তু, তার ধ্বংস হতে পারে না। দুষ্ট লুণ্ঠনকারীর দল এতবড় সভ্যতাকে চূর্ণ করে দিতে যেন বদ্ধপরিকর!

হরিদেব। আপনি মহাজ্ঞানী এর উপায় বলে দিন।

সন্ন্যাসী। রাজশক্তির সহায়তা কর। সম্রাট আকবর দূরদর্শী—ভারতের জাতি গঠনে তার ঐকান্তিক চেষ্টা। বাধা অনেক। তার সহায়তা কর। সবদিক রক্ষা পাবে। আমি যাই হরিদেব, আবার আসবো।

(হরিদেবের প্রণাম) তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ হোক। (প্রস্থান)

(হরিদেব সেই অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন সন্ন্যাসীর দিকে চাহিয়া তন্ময় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল—তাহার মুখমণ্ডল প্রভাত সূর্য্যরশ্মি সম্পাতে উদ্ভাসিত)

(চরণদাসের প্রবেশ)

চরণদাস। (প্রণামান্তে) ঠাকুর! রাজা প্রণাম জানিয়েছেন এবং অবিলম্বে একবার গুপ্তমন্ত্রণাগারে যেতে বলেছেন।

হরিদেব। কেন চরণ? এমন সময়ে গুপ্ত মন্ত্রণা! (চিন্তিত)

চরণ। পাঠান লুণ্ঠনকারীর অত্যাচার—ঠাকুর! এর উপায় হবে না। নিরীহ লোকগুলো কি রাজ্য ছেড়ে পালাবে?

হরিদেব। আচ্ছা চরণ, চল যাচ্ছি—নারায়ণের ইচ্ছা পূর্ণ হোক। চল চরণ—। (উভয়ের প্রস্থান)

[ক্রমশঃ

চিঠি

শ্রীচাঁদ মোহন চক্রবর্তী

গ্রীষ্মকাল। দশটা'র ভিতরে বাড়ীর কর্ত্তা প্রেমানন্দ বাবু অফিসে বেরিয়েছেন—ছেলে মেয়েরা গেছে স্কুল কলেজে। বাড়ী নিস্তব্ধ। বেলা বারোটা বাজল। বাড়ীতে দু'টি প্রাণী—বাড়ীর কর্ত্রী বিনতা দেবী আর চাকর রঘুয়া। উপরে অত্যধিক গরম লাগায় বিনতা দেবী নেমে এলেন নীচে বৈঠকখানায়—পাখা খুলে দিয়ে বেশ আরাম অনুভব করলেন। হৃষ্টমনে আরাম কেদারায় দেহলতা এলিয়ে দিয়ে পড়তে লাগলেন "বঙ্গশ্রী"। বিনতা তন্ময়চিত্তে পড়ছিল একটি গল্প—একটি দীন দরিদ্রের কন্যা পিতৃবন্ধুর সৌজন্যে বধূবেশে আশ্রয় পেল এক ধনীর গৃহে, শ্বশুর শাশুড়ী দু'জনেই তাকে স্নেহ করতে লাগল অত্যধিক, দরিদ্র কন্যার মনে সুখ হল অপার, কিন্তু অদৃষ্টের বিড়ম্বনায় তার সেই সুখ তাসের ঘরের ন্যায় অচিরে গেল ভেঙে! গরীব কন্যার স্বামী দেবতা একজন নর পিশাচ—মায়ের প্ররোচনায় অপেয়া স্ত্রীকে বিতাড়িত করল রুগ্নাবস্থায় তার বংশধর সহ। তারপর! সেই দরিদ্র কন্যা—ধনীর পুত্র বধূর মৃত দেহ দেখা গেল একটা বাড়ীর রোয়াকের উপর। সেই মৃতা তরুণীর বুকের উপর জীবন্ত শিশুপুত্র মায়ের দুগ্ধহীন স্তন পান করতে চেষ্টা করছিল! এই বিয়োগান্ত গল্প পড়ে বিনতা দেবীর মাতৃ হৃদয় হাহাকার করে উঠল। উদ্‌ভ্রান্তভাবে ভাবছিলেন এই গল্পের ইতিকথা। দোল খাচ্ছিল তার হৃদয়ে স্বামী কি এমনি নিষ্ঠুর হতে পারে স্ত্রীর প্রতি!

সেইক্ষণে ঘরের মেঝেতে একখানি চিঠির পতন শব্দে বিহ্বল ভাব কেটে গেল বিনতা দেবীর—তিনি চিঠিখানি কুড়িয়ে নিয়ে পড়লেন। নিমেষে তার মুখচ্ছবি রূপান্তরিত হল ভিন্ন মূর্ত্তিতে—স্নেহশীলা মাতৃমূর্ত্তিতে ফুটে উঠল ঘৃণা—বিতৃষ্ণার লক্ষণ। মুখে শোনা গেল অস্ফুট গুঞ্জন—"পুরুষগুলি কপট—নির্ম্মম!" ঘৃণাভরে চিঠিখানি টেবিলের উপর রেখে বিমর্ষ মুখে বিনতা দেবী ধীর মন্থর গতিতে চলে গেলেন শয়ন ঘরে। বিছানায় শুয়ে শান্তিবোধ হল না—সর্ব্বাঙ্গে যেন হচ্ছিল বৃশ্চিক দংশন! ছেলে-মেয়েরা স্কুল কলেজ থেকে ফিরল বাড়ীতে। অন্য দিন বিনতা দেবী ছেলেমেয়েদের প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকেন বাড়ীর বারান্দায়—তাদের কলরব, আবদার বায়নাক্কা বরণ করেন হাসিমুখে। আজ তাদের কলরব, কোলাহল তার অন্তরে আনল বিরক্তি—নিরানন্দ ছেলেমেয়েরা মায়ের দেখা না পেয়ে বিস্মিত হল—তাদের মুখের হাসি গেল মিলিয়ে মা'কে বিছানায় শায়িত দেখে—সকলে নিঃশব্দে মায়ের ঘরে ঢুকে শংকিত কণ্ঠে ডাকল, মা মণি তোমার কি অসুখ করেছে? বিনতা দেবী পুত্রকন্যাদের স্নেহের দাবী উপেক্ষা করতে পারলেন না। তাদের বিষাদপূর্ণ মুখচ্ছবি। তিনি ছেলেমেয়েদের প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে শয্যা ত্যাগ করলেন—রঘুয়াকে ডেকে তাদের খাবারের বন্দোবস্ত করলেন। মায়ের সদা হাস্যময় মুখ আজ অন্ধকারাচ্ছন্ন দেখে পুন কন্যারা গেল তরকে, ভয়ে আর কোন প্রশ্ন করতে সাহস করল না। বাড়ী আজ নিঃস্তব্ধ—নিরানন্দ! সায়াহ্নে বৃন্দাবন চাপরাশী এসে জানাল—বাবুর ফিরতে একটু দেরী হবে, এক বন্ধুর বাড়ী গেছেন। বৃন্দাবন প্রাতে ও সন্ধ্যায় প্রেমানন্দ বাবুর বাড়ীর পাচক ও মধ্যাহ্নে তার অফিসের চাপরাশী। প্রেমানন্দ বাবু হাওড়ায় সব-জজ। বিনতা দেবী বৃন্দাবনের বার্তায় কোন জবাব দিলেন না—অন্য দিন গন্তব্যস্থানের বিশদ বিবরণ জেনে নেন বৃন্দাবনের কাছ থেকে। বৃন্দাবন লক্ষ্য করল বিনতা দেবীর চোখ-মুখের অস্বাভাবিক মূর্ত্তি—সে নিঃশব্দে চলে গেল নিজের কাজে।

রাত্রি সমাগমে। বিনতা দেবী একবার মাত্র বিছানা ছেড়ে নীচে বৈঠকখানা থেকে চিঠিখানি নিয়ে এলেন! কয়েকবারপড়লেন চিঠিখানি—উত্তেজনার ভাব

স্পষ্ট ভেসে উঠল তার চোখে মুখে।—চোখে দেখা দিল অশ্রু বিন্দু।

সেইক্ষণে গৃহে প্রবেশ করল বান্ধবী শেফালী দেবী। বিনতার মলিন মুখ ও চোখে অশ্রুর রেখা দেখে বিস্মিত কণ্ঠে বলল—কি ব্যাপার বিণী? তোর বাড়ী দেখছি কেন নিস্তব্ধ—বিষাদপুরী?

বিনতা আত্মসংবরণ করে মুখে ফোটাতে চেষ্টা করল হাসির রেখা। শেফালী বুঝল বান্ধবীর হৃদয়ে কোন অব্যক্ত যন্ত্রণা হয়েছে—দাম্পত্য জীবনের মান অভিমান, ঝড়ের পূর্ব্বলক্ষণ প্রতিভাত হচ্ছে বান্ধবীর মুখে চোখে। শেফালীর অন্তর কেঁদে উঠল বান্ধবীর জন্য—সে বিনতাকে বুকে জড়িয়ে ধরে সহানুভূতি সূচক কণ্ঠে বলল: বল ভাই বিনু, তোর দুঃখের কাহিনী, আমার কাছে কিছু লুকাসনি! বিনতা তার বাল্য কৈশোর ও যৌবনের সহচরী ও বান্ধবী শেফালীর আন্তরিক সমবেদনা অনুভব করল শিরায় শিরায় —সে পারল না আত্মসংবরণ করতে। তার চোখে ছুটল অশ্রুবন্যা—বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলল: শেফালী, আমার কপাল ভেঙেছে!—এই চিঠি পড়লে সব বুঝবি।

সাগ্রহে শেফালী চিঠিখানি নিল বিনতার হাত থেকে, রুদ্ধশ্বাসে পড়ল চিঠি। শেফালী সহাস্যে বিদ্রূপভরা কণ্ঠে বলল: এই চিঠি পড়ে তোর এতটা বিহ্বল হওয়া নিছক ছেলেমানুষী ভাই। বিনতা চোখের জল কাপড় দিয়ে মুছে বলল: দেখছিস না, অনেক দিনের আলাপ প্রণয়—। শেফালী ঝঙ্কার দিয়ে বলল: সেখানে প্রণয় বাঁধলে এতদিন ধরা পড়ত। প্রেমানন্দ বাবুকে দেখে বা তার সঙ্গে আলাপ করে আমি বলব তোর অনুমান নিছক কল্পনা। তবে চিঠিখানি একটু রহস্যময়। তুই এই ব্যাপার নিয়ে দাম্পত্য কলহের সৃষ্টি করিস না প্রেমানন্দ বাবুর সঙ্গে। আমি চিঠিখানি নিয়ে যাচ্ছি —ওদের পাঠাব আজ রাত্রে এই ঠিকানায় তোর সতীন মানদাকে ধরতে! আমি এখন আসি। ওদিকে আমার তিনি তোর মত সন্দেহ করতে পারেন আমার অনুপস্থিতি এই অসময়ে! আমাদের জীবনই কল্পনাময়। পুরুষরা ব্যঙ্গ করে বলে নারী রহস্যময়ী।—আর তাঁরা? কপট! রহস্যপ্রিয়া শেফালী প্রিয় বান্ধবীর হৃদয়ের ক্ষতস্থানে শীতল প্রলেপ দিয়ে প্রস্থান করল বিনতার অসুস্থ মন শান্ত ভাব ধারণ করল। রাত ৮টার সময় প্রেমানন্দ বাবু যখন বাড়ী ফিরলেন, বিনতা অভ্যর্থনা করল তাকে স্বাভাবিক ভাবে। আধ ঘণ্টা পূর্ব্বে আসলে হয়তো একটা অশোভনীয় ঘটনা ঘটত।

শেফালী গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করে স্বামী অনুপমকে জানাল বিনতার মনোদুঃখের বার্ত্তা—পাঠাল স্বামীকে 'মানদা'র সন্ধানে। অনুপম সহাস্যে বিদ্রূপ কণ্ঠে বলল: এক নারী স্বামীকে যেখানে পাঠাতে নারাজ আর তুমি কি নারী হয়ে আমাকে পাঠাচ্ছ সেই কুস্থানে? তোমরা সত্যিই রহস্যময়ী!

অনুপম যখন চিঠির লিখিত ঠিকানা ৯৯ নং প্রেমচাঁদ বড়াল ষ্ট্রীটে উপস্থিত হল, তখন ৮টা বেজে গেছে। বাড়ীর সামনে দাঁড়িয়ে দরজার কড়া নাড়লে বেড়িয়ে এলেন একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক। অনুপমের দিকে তীক্ষ্ণভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে একটু বিরক্তিভরা কণ্ঠে ভদ্রলোক প্রশ্ন করলেন: কি চাই আপনার?

স্ত্রীর কথার ধরণে অনুপম আশা করেছিল এক নারীর দর্শন, কিন্তু তার পরিবর্ত্তে অপ্রত্যাশিতভাবে দর্শন মিলল এক ভদ্রবেশী পুরুষের। তার পর ভদ্রলোকের প্রশ্নের জবাব কি দেবে তাই নিয়ে হয়ে পড়ল এক সমস্যা। চিঠিতে আছে এক নারীর নাম। অনুপমের জবাব দিতে বিলম্ব হওয়ায় ভদ্রলোক সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকাল অনুপমের দিকে। তারপর কপাটের পাশে দাঁড়িয়ে ঝাঁঝাল স্বরে বললেন: মশাই নির্ব্বাক কেন? বলুন কি দরকার? নয় ত দরজা বন্ধ করে আমি চললুম।

অনুপম আমতা আমতা করে সঙ্কোচভাবে বলল: আমি একবার মানদা দেবীর সংগে দেখা করতে চাই।

কথাটি শুনে প্রৌঢ় ভদ্রলোকের মুখ চোখের হল অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন—কে যেন সেই সৌম্য মুখে কালী ছড়িয়ে দিল। তিনি কঠোর কণ্ঠে "আচ্ছা দাড়ান" বলে জোড়ে দরজা বন্ধ করে দ্রুত পদক্ষেপে চলে গেলেন উপরে। অনুপম কিছুই অনুধাবন করতে না পেরে বিস্মিত ভাবে তাকিয়ে রইল বন্ধ দরজার দিকে। কিছুক্ষণ পরে অনুপম শুনল নর ও নারীর কণ্ঠের কথার কাটাকাটি

—দাম্পত্য কলহের ভিগীর! এক সময়ে শুনল পুরুষের কণ্ঠস্বরে—"যাও নাগর এসেছে। আমি আজ বাইরে যাব মনে করে বোধ হয় নিমন্ত্রণ পাঠিয়েছিলে?"

বামা কণ্ঠে উত্তর শুনল: ছি! ছি! এত ছোট মন তোমার? শিক্ষিত হাকিম হয়ে এই সব অযথা উক্তি করছ আমাকে? এত সন্দেহবাই তোমার? চলো না সংগে, দেখি কে এসেছে?

দ্রুত পদক্ষেপ শোনা গেল সিঁড়ীতে—সংগে অস্ফুট গুঞ্জন ধ্বনি। দরজা উন্মুক্ত করে এক সুন্দরী যুবতী উপস্থিত হল অনুপমের সামনে—মুখে চোখে অশ্রুরেখা —বিষাদের ছায়া। বিনা ভূমিকায় সংযত কণ্ঠে অনুপমকে প্রশ্ন করল: আমার নিকট আপনার কি দরকার? অনুপম নিঃশব্দে পকেট থেকে একখানি চিঠি বের করে যুবতীর হাতে দিল। মেঘমুক্ত দিবাকরের ন্যায় যুবতীর মুখে ফুটে উঠল হাসির রেখা। ভদ্রলোক দরজার আড়াল থেকে আত্মদর্শন দিলেন যুবতীর পশ্চাতে—ঝুঁকে চিঠিখানি পড়ে তাঁর মুখেও ফুটে উঠল হাসির রেখা। তিনি এবারে যুবতীকে হাত দিয়ে পিছনে সড়িয়ে অনুপমের কাছে এসে হাসিমুখে বললেন: আপনি এই চিঠি কোথায় পেলেন? যুবতী ভদ্রলোককে ভর্ৎসনা সূচক কণ্ঠে বলল: এঁকে অনেকক্ষণ অকারণ রাস্তায় দাঁড় করিয়ে রেখেছ—এখন ভিতরে নিয়ে গিয়ে কথা বল। ভদ্রলোক লজ্জিতভাবে অনুপমকে নিয়ে ভিতরে ঢুকল।

রবিবার। প্রেমানন্দ গভীর মনোনিবেশ সহকারে রায় লিখছিলেন—অনতিদূরে স্ত্রী বিনতা দেবী জামার উপর একটি ফুল তুলছিলেন ছুঁচ দিয়ে। বাইরে কড়া নাড়ার শব্দ পেয়ে সূচীকর্ম্ম ত্যাগ করে অনিচ্ছার সহিত দরজা খুললেন। গৃহে প্রবেশ করল সস্ত্রীক বিমান বাড়ুয্যা। বিনতা সাদরে অভ্যর্থনা করলেন দম্পতী-যুগলকে। বিমান বিদ্রূপকণ্ঠে প্রেমানন্দকে সম্বোধন করে বলল: আচ্ছা লোক দেখছি। আমাদের নিমন্ত্রণ করে দরজা বন্ধ করে বসে আছ ছু'টিতে! প্রেমানন্দ অপ্রস্তুত ভাবে বন্ধুর দিকে তাকিয়ে আনন্দিত কণ্ঠে বলল: কি খবর মানুদা—একেবারে যুগলরূপ দর্শন পেলুম, কি সৌভাগ্য আমার?

বিমান আশ্চর্য্য কণ্ঠে বলল: মানে?—তুমি আজ আমাদের চায়ের নিমন্ত্রণ করে পাঠালে—আর কিনা জিজ্ঞেস করছ, "খবর কি?—আচ্ছা ভদ্রলোক দেখছি! প্রেমানন্দের চোখে মুখে বিস্ময়ের চিহ্ন—সে প্রশ্নসূচক দৃষ্টিতে তাকাল বিনতার দিকে। বিনতার মুখেও ভেসে উঠছিল সেই ছবি। আগন্তুক দম্পতিযুগল লক্ষ্য করল বিনতা ও প্রেমানন্দের দৃষ্টি বিনিময় ও মুখচ্ছবি। প্রেমানন্দ সলজ্জ ভাবে বলল: আচ্ছা, মানু দা—বিমান তাকে বাঁধা দিয়ে বিরক্তপূর্ণ কণ্ঠে বলল: মানু দা — মানু দা—দেখ প্রেমানন্দ, তুমি আর কখ্খনও ডাকবে না আমাকে "মানু দা" বলে। বাবা কি সর্বনেশে সম্বোধন! আমি এই নামের প্রলোভনে পরে এক চিঠি লিখে কুরুক্ষেত্র বাঁধিয়েছি—ঘরে ও বাইরে! প্রেমানন্দ বিস্মিত কণ্ঠে বলল: "মানে?"—সেইক্ষণে গৃহে প্রবেশ করল আর এক দম্পতীযুগল—অনুপম ও শেফালী! শেফালী চটুল হাসি হেসে বলল: মানে—আমি বলছি—এক রহস্যপূর্ণ চিঠি পড়ে আমার বান্ধবী বিনতা আত্মহত্যা করতে যাচ্ছিলেন—আর চিঠির লেখকের বাড়ী থেকে তার স্ত্রী গৃহ হতে বহিষ্কৃতা হয়েছিলেন আর কি?—চিঠি নয়ত—শাঁকের করাত।

বিমান কতুহলাবিষ্টভাবে শেফালীর সুন্দর মুখের দিকে একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করে জিজ্ঞাসুনেত্রে তাকালে অনুপমের দিকে। অনুপম স্মিত মুখে বলল: ইনি আমার স্ত্রী—শেফালী দেবী। নমস্কার বিনিময় হল। শেফালী দুষ্টুমী ভরা হসিমুখে বিমান বাবুর স্ত্রীর কাছে এগিয়ে গিয়া তাকে জড়িয়ে ধরে বলল: আপনিই বুঝি "মানদা" দেবী। মানদা দেবী এক ঝলক হাসি হেসে বলল: আপনার অনুমান সত্য। বড় ভাল লাগছে আপনাকে। বিনতা বলল: শেফালী আমার বাল্য বন্ধু—একবার আলাপ করলে বুঝবেন—হীরার টুকরা। এ-ই সেদিন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের অবসান ঘটিয়েছে।

প্রেমানন্দ প্রশ্নসূচক দৃষ্টিতে তাকাল শেফালীর দিকে। শেফালী সহাস্যে বলল: আপনাকে 'মানে' বলব বলেছি —এই দিন—এই চিঠিখানি পড়ে 'মানে' বুঝতে চেষ্টা

করুন। শেফালীর হাত থেকে সাগ্রহে চিঠিখানি নিয়ে প্রেমানন্দ পড়ল রুদ্ধশ্বাসে—

১১১, প্রেমচাঁদ বড়াল ষ্ট্রীট,
৩০শে মার্চ্চ, ১৯৫১।

হে মোর প্রেমানন্দ,

তুমি কি নিঠুর! তোমার প্রতীক্ষায় ছিলাম এতদিন—নিরাশ হয়ে আজ লিখছি এই চিঠি। একবার দর্শন দাও। এতদিনের প্রেম,—ভালবাসার অবমাননা কোরো না। এই শনিবার, তোমার জন্যই শুধু দ্বার উন্মুক্ত থাকবে। নিরাশ করো না, লক্ষ্মীটি।

তোমারই—মা—ন—দা

পুঃ—দু'দিন হ'ল নূতন বাড়ীতে উঠে এসেছি।

সকলের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল প্রেমানন্দের দিকে—তাদের মুখে চোখে দুষ্টুমীর চাপা হাসি। প্রেমানন্দকে নির্ব্বাক দেখে শেফালী বিদ্রূপভরা কণ্ঠে বলল: হে বিচারপতি,—এবারে বিচার করুন যদি কোন স্ত্রী স্বামীর নামীয় 'এমনি ধরনের চিঠি পড়েন' তবে তার মনের অবস্থা কি হ'তে পারে? মানদা কৃত্রিম ক্রোধের ভাব দেখিয়ে বলল: আসামীকে শাস্তি দিন—তিনি আমাকেও লাঞ্ছিত করেছেন গত রাত্রে—সাক্ষী আছেন অনুপমবাবু।

প্রেমানন্দ নির্ম্মল হাসি হেসে বলল: আমার এই বন্ধুটি চিরকালই ভাব-প্রবণ ও রসিকস্বভাব সম্পন্ন—কলেজের হোষ্টেলে ছেলেরা উত্যক্ত হয়েছে এর দুষ্টুমীতে, আবার সৎ কাজেও ছিল অগ্রণী—তাই আমরা সকলেই ডাকতাম "মান্‌দা" বলে। উত্তর কালে হলেন কবি ও সুলেখক কিন্তু অস্থির চিত্ত। যৌবনে হারালে প্রথমা পত্নী লিখলেন দ্বিতীয় "উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম" খণ্ডকাব্যে, নানা দেশ ঘুরে একদা ফিরে এলেন সংগে ক'রে এই বিদুষী ভার্য্যা মান্‌দা দেবী। তাহার সেই বালকসুলভ চপলতা এখনও আছে অটুট এই প্রৌঢ় বয়সে। বিচার যখন চেয়েছেন দোষীর দণ্ডাবধান আমি করব। মানদা দেবী বিমানের দিকে কটাক্ষ হানল।

বিমান অনুতপ্ত কণ্ঠে বলল: আমি আমার হঠকারিতার জন্য বাস্তবিক দুঃখিত বিনতা দেবী। আজকে এখন উঠি—রাত্রি সমাগত। উদরে জঠরানল প্রজ্বলিত—চায়ের নিমন্ত্রণ দেখছি ভুঁয়ো—দেওয়াল পঞ্জীতে দেখছি ১লা এপ্রিল!

প্রেমানন্দের কাছে গিয়ে অনুপম কি চুপি চুপি বলল। প্রেমানন্দ মৃদুহাস্যে বিমানকে সম্বোধন ক'রে বলল: তুমি আসামী আমার আদেশ না নিয়ে কোথায় যাবে? দোষ স্বীকার ক'রেছ ব'লে দিচ্ছি লঘুদণ্ড। এই দণ্ডে চলো আমাদের সংগে অনুপমের বাড়ী—সেখান হ'তে যাবে নিজ গৃহে একাকী। মানদা দেবী আজ থাকবেন বন্দিনী এই গৃহে।

অনুপমের বাড়ীতে ভুরি ভোজন ক'রে বিমান এলিয়ে দিল তার দেহভার একখানি গদিআঁটা আরাম কেদারায়। প্রেমানন্দ আশ্চর্য্যভরা কণ্ঠে বলল: এ কি হে, মান্‌-দা, তোমার মতলব কি বলো ত? বিমান তার পা দু'খানি ছড়িয়ে দিয়ে সহজ কণ্ঠে বলল: গাঁদা 'বোট' যেমনি ষ্টীমার ছাড়া চলতে পারে না, তোমার মান্‌-দা তেমনি 'মানদা' ছাড়া এক পা অগ্রসর হ'তে পারে না।

পুস্তক ও আলোচনা

হে মোর অতীত: শ্রীবিনয় চৌধুরী। টাওয়গেট বুক্‌স্‌-এর পক্ষ হইতে শ্রীটমাস বিজদাস হালদার কর্তৃক প্রকাশিত। দাম—দেড় টাকা মাত্র।

গল্প ও প্রবন্ধ এই উভয় মাধ্যমেই বিনয়বাবু বাংলা সাহিত্য ক্ষেত্রের একজন সুপরিচিত লেখক। 'অভিনয় বিজ্ঞান' ও 'ছায়াচিত্রকলা'—ইতিপূর্ব্বে প্রকাশিত তাঁহার এই পুস্তক দুইখানি বাংলার অপুষ্ট আলোচনা-সাহিত্যের দুইখানি উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা। ছোট গল্পের ক্ষেত্রেও বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁহার লেখাগুলি রসজ্ঞ পাঠকের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে।

আলোচ্য গ্রন্থখানি একটি ইংরেজি memoirs জাতীয় রচনা।—লেখক কলিকাতাতে আছেন বহুদিন হইতেই, কিন্তু তাহা শুধুই জীবিকার্জ্জনের তাগিদে। নহিলে তিনি 'গ্রাম-হৃদয়া' পূর্ব্ববঙ্গেরই সন্তান। সেই পূর্ব্ববঙ্গের একটি বিশেষ গ্রাম আনন্দপুর, সেই আনন্দপুরের মাটি, তার বাতাস, তার নানান জীবন পর্য্যায়ের মানুষজন, তার সংস্কৃতি—ইহাই হইল লেখকের পারিবারিক জীবনের আপন পৃথিবী, তাঁহার বাপ-পিতামহের ভিটা। উপস্থিত গ্রন্থটি লেখকের সেই আপন পৃথিবীর একটি স্মৃতি আলেখ্য। উদ্বাস্তু হৃদয়ের বেদনা মন্থনে এ আলেখ্য প্রকৃতই মর্ম্মস্পর্শী হইয়া উঠিয়াছে। কতকগুলি মানুষ ও কয়েকটি 'এপিসোড্' তো রীতিমত মনে করিয়া রাখার মতো। ধর্ম্মীয় সংকীর্ণতার গোড়ামির বিরুদ্ধে লেখকের উদারচিত্ত পিতৃদেবের নিঃশব্দ অভিযান, সদানন্দ বাবাজীর আখড়া, ব্রজরাজ মাষ্টারের 'তরুণ অপেরা পার্টি', রূপসী বেদেনী মেহাগ্নির প্রেমে পড়া ঘাঘী চোর ছমিদা, আর সুদাস বাবাজীর কণ্ঠের শাখাগোমতীর নরম পলিমাটির মতো নরম সুরের গান—এই সব কয়টি মানুষেরই মধ্যে এক-একটি প্রথম শ্রেণীর কাহিনীর উপাদান আত্মগোপন করিয়া আছে।

আশাকরি বিনয়বাবুর 'হে মোর অতীত' বাঙালী পাঠকের কাছে সমাদর লাভ করিবে।

শকুন্তলা: সতীন্দ্রনাথ লাহা। ৩৩-বি, মদন মিত্র লেন হইতে সুহৃদ রুদ্র কর্তৃক প্রকাশিত। প্রাপ্তিস্থান—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড্ সন্স্। দাম, আড়াই টাকা মাত্র।

এদেশের না ওদেশের নাম-ধামটা ঠিক স্মরণ হইতেছে না, কিন্তু বেশ মাননীয় গোছেরই কে যেন একজন একদা শিশুসাহিত্য সম্বন্ধে একটি ভারী খাঁটি কথা বলিয়াছিলেন যে, এই জাতের সাহিত্য যদি রচনা করিতেই হয়, তাহা হইলে সর্ব্বাগ্রে মনটিকে ঠিক শিশুর মনের ছাঁচে গড়িয়া তোলা চাই; ভাবনা-ধারণাটি হওয়া চাই ঠিক শিশুমনের মতো রূপকথাময় আর ছন্দস্পর্শাতুর, আর কল্পনাতে থাকা চাই শিশুর স্বপ্ন-বিস্ময়ের বর্ণচ্ছটা। তার মানে, শিশুসাহিত্য লিখিতে হইলে কলম ও কল্পনা—সাহিত্য রচনার এই দুটি সরঞ্জামই রীতিমত পটু ও পাকা গোছের হওয়া চাই। নচেৎ শিশুসাহিত্য রচনা সম্পূর্ণ বিড়ম্বনা মাত্র।

সতীন্দ্রবাবু প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী। সুতরাং তাঁহার রূপকল্পনায় ও তুলির টানে তিনি যে শিশুমনের রূপকথা-ময় ও ছন্দস্পর্শাতুর স্বপ্নবিস্ময়ের বর্ণচ্ছটা প্রতিফলিত করিতে পারিবেন সেক্ষেত্রে শিল্পী হিসাবে সেটা তাঁহার পক্ষে তেমন বিস্ময়ের ব্যাপার হইবে না। কিন্তু তিনি যদি এই ছন্দিত ও স্বপ্নেলা বর্ণ-আবেশ সঞ্চারিত করিতে পারেন তাঁহার লেখনীমুখেও, তাহা হইলে সেটাকে আমরা একটা সাহিত্যিক বিস্ময়ই বলিব। আয়তনে ছোট হইলেও সতীন্দ্রবাবুর বইখানিতে সেই প্রীতিপদ বিস্ময় প্রায় প্রতি ছত্রেই বিদ্যমান। মহাকবির বয়স্ক কল্পনা সুষমাকে তিনি কোনোখানে এতটুকুও ক্ষুন্ন হইতে দেন নাই। অথচ সেই সুষমাকে খাঁটি শিশুরুচির সামগ্রী করিয়া তুলিতে খাঁটি শিশুসাহিত্যের রূপ-সুষমাও তিনি সর্ব্বত্র পুরাপুরি অব্যাহত রাখিয়াছেন। লেখার গুণে এমন পরিচিত কাহিনীটাও মনে হয় যেন একটি মৌলিক রচনার পর্য্যায়ে গিয়া উঠিয়াছে। এক নিঃশ্বাসে পড়িতে গিয়া অনুভূতি উপলব্ধিতে শিশুমনোচিত অর্দ্ধচেতনার মতো কেমন একটা ঘোর লাগিয়া যায়।

মোট কথা সতীন্দ্রবাবুর 'শকুন্তলা' বইখানি অনেকদিক দিয়াই বাংলা সাহিত্যের মান বাড়াইবার মতো একখানি বই,—তা যেমন লিপি-সৌকার্য্য, তেমন চিত্রসম্ভারে, তেমন প্রচ্ছদ ও গঠন পরিসজ্জায়। শেষোক্ত ব্যাপারে প্রকাশক সুহৃদ রুদ্রের সৎসাহসও প্রশংসনীয়।

সম্পাদকীয়

মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ডের নির্ব্বাচন

মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ডের তিনজন প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রমোহন চক্রবর্ত্তী, শৈলেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কামিনীকুমার ঘোষ দস্তিদার, দুইজন শিক্ষক বামনদাস মণ্ডল ও জ্ঞানেন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত, একজন প্রধানা শিক্ষয়িত্রী শ্রীযুক্তা ডক্টর ফুলরেণু গুহ, একজন শিক্ষয়িত্রী শ্রীযুক্তা অনিলা রায় এবং তিনজন কার্য্যনির্ব্বাহক সভাসমূহ হইতে সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন—শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত, ডাক্তার পি, কে, ঘোষ এবং শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র মাল। ইহাদিগকে ব্যক্তিগতভাবে আমরা যোগ্যলোক বলিয়া জানি এবং তাঁহাদের নির্ব্বাচনে আমরা আনন্দিত।

কিন্তু এই নির্ব্বাচনে ম্যানেজিং কমিটির উপরে যে বিশেষ অবিচার হইয়াছে, তাহা আমাদের সাধারণের গোচরীভূত করা কর্ত্তব্য। ম্যানেজিং কমিটির সভ্যদের আপ্রাণ চেষ্টায়ই বিদ্যালয়গুলির প্রতিষ্ঠা এবং উন্নতি। কিন্তু বর্ত্তমান নিয়মানুসারে যখন শিক্ষকগণ নিয়োগবলে কমিটির সভ্য থাকিতে পারেন, ম্যানেজিং কমিটির সভ্য হিসাবে তাঁহাদের নির্ব্বাচনেরই বেশী সম্ভাবনা—বিশেষতঃ যখন নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি এবং কলিকাতা শিক্ষক সমিতির প্রতিনিধিদের দ্বারা মফঃস্বল হইতে শিক্ষক সভ্যদের নিকট হইতে বিস্তর নির্ব্বাচন পত্র যোগাড় করা সম্ভব। এইবারে কেবল একজন প্রধান শিক্ষক-সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। আর দুইজন নির্ব্বাচিত হইলেও আশ্চর্য্য হইবার কোনও কারণ ছিল না। এইরূপ হইলে যাহারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া বহু ত্যাগ স্বীকার করিয়া বিদ্যালয় গঠন করিয়াছেন, শিক্ষাবোর্ডে তাঁহাদের প্রবেশ করিবার কোন সম্ভাবনা থাকিবে না। এমতাবস্থায় তাহারা যদি বুঝিতে পারে, তাহাদের সব চেষ্টা তাহাদের অধীনস্থ শিক্ষকমণ্ডলী দ্বারা পণ্ড হইবার সম্ভাবনা, তবে শিক্ষার মূলেও যে বিশেষ কুঠারাঘাত হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাই আমাদের অভিমত যে, শিক্ষক এবং প্রধান শিক্ষকগণের যখন স্বতন্ত্র নির্ব্বাচনকেন্দ্র বিদ্যমান রহিয়াছে, তখন কার্য্যনির্ব্বাহক সভাকেন্দ্র হইতে কোন শিক্ষক বা প্রধান শিক্ষক দাঁড়াইতে পারিবেন না এইরূপ নিয়ম থাকিলেই ন্যায়সঙ্গত হয়।

দ্বিতীয়তঃ, পদপ্রার্থীদের মধ্যে যদি কেহ বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো বা ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট বা প্রিন্সিপ্যাল থাকেন, তাহারা সাক্ষীস্বরূপ attest করিতে পারিবেন না, এইরূপ নিয়ম না থাকিলে বহু অনাচার সম্ভব। অন্ততঃ অপরের মনে আশঙ্কা থাকিতে পারে যে ঐরূপ ক্ষমতা থাকায় উক্ত ব্যক্তিদের সুবিধা হইয়াছে। অদ্য আমরা বিস্তারিত লিখিলাম না, সংক্ষেপে কর্ত্তৃপক্ষের গোচরে আনিতে চাই যে, সব পদপ্রার্থীদের সমান সুবিধা থাকে—এরূপ অবস্থায় নির্ব্বাচন হইলেই তাহা নিরপেক্ষ হইবে। এবার সেরূপ হয় নাই বলিয়া আমাদের বিশ্বাস নির্ব্বাচন নিরপেক্ষ হয় নাই। সুতরাং ম্যানেজিং কমিটির সভ্যগণের পুনরায় নির্ব্বাচন হওয়া বাঞ্ছনীয়।

উত্তপ্ত পরিষদ

কথা নাই বার্ত্তা নাই, কিছুকাল হইতে ভারতের ব্যবস্থাপরিষদগুলি সহসা যেন বড় বেশী মাত্রায় উত্তপ্ত হইয়া উঠিতে সুরু করিয়াছে। কবিজনোচিত উপমা দিয়া বলিতে পারিলে বলা যায় যে, পেপসু হইতে পশ্চিমবঙ্গ পর্য্যন্ত একটি তপ্ত পরিষদীয় ঝটিকা যেন সারা ভারতময় নাচিয়া-কুঁদিয়া ফিরিতেছে। প্রাকৃতিক ব্যাপারে যেমন ঝড়-ঝটিকার ঝাপটাটা প্রথমে বড়দের গায়েই লাগে, তারপর ব্যাপার তেমন সঙ্গীন হইয়া পড়িলে সেই ঝাপটা হইতে ক্ষুদ্রেরাও বাদ পরে না, এ ক্ষেত্রেও, তেমনই এই পরিষদীয় ঝড় প্রথমে সুরু হইয়াছিল দেখিয়াছিলাম ভারত পার্লামেণ্টে,—বর্ত্তমানে সেই ঝাপটা আসিয়া লাগিতেছে আমাদের পশ্চিম বঙ্গেও।

অবশ্য উত্তপ্ত হওয়াটাই হইল পরিষদীয় কর্ম্মকাণ্ডের দস্তর। পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রের এই এক বড় চিত্তাকর্ষক ব্যাপার। রাজনীতি-অর্থনীতির ভিন্ন-ভিন্ন প্রোগ্রামের ইউনিফর্ম্ম পরিহিত কয়েক জন মানুষ একটি প্রশস্ত কক্ষে প্রবেশাধিকার লাভ করিবার পর বিতর্ক মজলিসের মতন দুইটি পৃথক দলে বিভক্ত হইয়া যাইবেন। দলে ভারি যাঁহারা, অর্থাৎ একই ধরণের ইউনিফর্ম্ম যাহাদের গায়ে গরিষ্ঠ সংখ্যায় থাকিবে, তাঁহারা রাজকর্ত্তা ব্যতীত একটি পুরা রাজ্যেরও অধিকার লাভ করিবেন। অন্ত পক্ষে এই সংখ্যাগরিষ্ঠতা যারা শতচেষ্টা করিয়াও আয়ত্ত করিতে পারিবেন না, তাহাদের কপালে রাজকর্ত্তা বা রাজত্ব কোনটাই জুটিবে না। কিন্তু একটা ব্যাপারে তাহাদের অবাধ অধিকার থাকিবে। রাজত্বভোগী যাঁহারা তাঁহাদের প্রতি এই সংখ্যালঘু রাজ্যবঞ্চিতদের দল যত ইচ্ছা ঈর্ষান্বিত হইতে পারিবেন এবং অন্ধি-সন্ধি ও নজিরপ্রমাণ হস্তগত করিতে পারিলে উপরিউক্ত প্রশস্ত কক্ষে দাঁড়াইয়া রাজত্বভোগীদের বিরুদ্ধে যত খুসি নিন্দাবাদ করিতে পারিবেন। মোটামুটি ইহাই হইল পরিষদীয় উত্তাপ। অবশ্য এমন একটি উত্তাপের ব্যাপার উৎসাহী তরুণদের ডিবেটিং ক্লাবগুলিতেও থাকে, সার্ব্বজনিন দুর্গাপূজা কমিটি-গুলিতেও থাকে। তবু পরিষদীয় উত্তাপটি এতদুভয় হইতে সতন্ত্র এই কারণে যে, পরিষদীয় তর্কবিতর্কের মূলে থাকে একটা বৃহৎ রাজ্যপটের ব্যাপার; সুবৃহৎ এক জন-সংখ্যার ভাগ্য নিয়া লেনদেনের কাজকর্ম্ম—সেই জন্যই ডিবেটিং ক্লাব ও পূজা কমিটিগুলি হইতে উহা অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ, অনেক বেশী নীরস অর্থাৎ বস্তুধর্ম্মী। অন্ততঃ কাগজে কলমে অথবা আপাত দৃষ্টে।

আবার এতখানি বস্তুধর্ম্মী ও গুরুত্বপূর্ণ বলিয়াই, পরিষদীয় তর্কবিতর্কের উত্তাপ লইয়া পরিষদের বাহিরেও উত্তাপের ঝড় বহিতে থাকে। হাটে মাঠে ঘাটে, চায়ের দোকানে, রোয়াকে ও বৈঠকখানায় জন সাধারনের জীবন-ক্ষেত্রের সর্ব্বত্র আর একটি করিয়া অস্থায়ী পরিষদ জন্ম লাভ করিয়া বসে। তর্কবিতর্ক করিতে করিতে স্কুল কলেজ ও আপিস কামাই হইয়া যায়। রেশন আনিতে পর্য্যন্ত খেয়াল থাকে না।

এও আরেক আকর্ষণীয় ব্যাপার পার্লামেন্টারি গণ-তন্ত্রের। সংখ্যাগরিষ্ঠতার প্রসাদে যাহারা রাজ্যচালনার অধিকারী, রাজত্ব তাঁহারা যেমনভাবে খুসী তেমনভাবে চালাইতে পারেন, এমন কি যদি অরাজকভাবে চালাইতে সুবিধার ব্যাপার বলিয়া মনে করেন, তাহা হইলে সেই ভাবেও। কিন্তু সে জন্য তাহাদের কোনোরূপ সন্ত্রস্ত বা উদ্বিগ্ন হইবার প্রয়োজন করে না। সহিবার মধ্যে তাহাদের কিছু সহিতে হয় বিপক্ষদলের উৎক্ষিপ্ত রাশি-খানেক কুৎসা ও অপবাদ, আর দু' দশখানা নিরপেক্ষ সংবাদপত্র থাকিলে তাহাদের প্রচারিত খানিকটা অপযশ। ইহা ছাড়া আর কিছু নয়। সংখ্যায় নিজের দলের ইউনিফর্ম্ম-পরা লোক বেশী থাকিলে বিপক্ষদলের সকল কুৎসা ও অপযশ পুষ্পচন্দনের মতো সমাদৃত হইতে পারে।

পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রের এই শেষোক্ত নিরঙ্কুশ জটা এবারে ভারতীয় পরিষদ-গৃহসমূহের সাম্প্রতিক অধিবেশন গুলিতে যেমন প্রকটভাবে দেখা গেল, তাহা সম্ভবতঃ গণতন্ত্রের সমগ্র ইতিহাসেই অভূতপূর্ব্ব। পর পর কত-গুলি কেলেঙ্কারির গুপ্তকথা ফাঁস হইয়া গেল ভারত পার্লামেণ্টে।—মুদ্রিজীর সার ক্রয়ের কেলেঙ্কারি, রাজ-কুমারী কউরের প্রিফ্যাবগৃহনির্ম্মাণ কারখানার কেলেঙ্কারি, শিল্প ও সরবরাহ বিভাগের পাট ও বস্ত্র নিয়ন্ত্রণের কেলেঙ্কারি, তারপর সবশেষে জানা দেখা দেশরক্ষা মন্ত্রকের বিবিধ সমবেসাকরণ ক্রয়ের কেলেঙ্কারি। এসবের যে কোনো একটি কেলেঙ্কারিকে কেন্দ্র করিয়া অন্ত যে-কোনো দেশ হইলে সেখানে হয়তো একটা শাসনতান্ত্রিক বিপর্য্যয় আসিয়া উপস্থিত হইত, নতুবা জনবিক্ষোভের আশঙ্কায় মন্ত্রীরা নিজেরাই গদি ত্যাগ করিতেন। পশ্চিম বঙ্গের ব্যবস্থা পরিষদেও নবগঠিত বিরোধীদল শাসকপক্ষের বিরুদ্ধে যেসব কেলেঙ্কারির কথা উদ্ঘাটিত করিয়াছেন, টাকা পয়সায় হিসাবে তাহা কেন্দ্রীয় কেলেঙ্কারির মতো ওজনদার না হইলেও, গুরুত্বে সেগুলিও বড় কম নয়।

কিন্তু শেষপর্য্যন্ত ফল কী দাঁড়াইল এই সব রোমহর্ষক উদ্ঘাটনের? পরিষদগৃহে উভয় পক্ষের মধ্যে গাছকোমর বাঁধিয়া বেশ কিছুক্ষণ বাচনিক ধস্তাধস্তি চলিল; উভয়পক্ষ

পরস্পরের প্রতি বেশ কিছুটা কটূক্তি ও টিটকারি বর্ষণ করিলেন; মাঝে মাঝে সততা, জনকল্যাণ এবং নীতি ও আদর্শের ভালো ভালো আপ্তবাক্যও উচ্চারিত হইল, সদস্যরা এক-আধবার গান্ধীজীর মৃত আত্মাকেও পর্য্যন্ত টানিয়া আনিলেন। তারপর পরিষদের বাহিরে সংবাদ-পত্রগুলিতে এই সব সংবাদ প্রকাশিত হইল; সম্পাদকেরা উভয়পক্ষের পক্ষে ও বিপক্ষে নানারূপ তীব্র মন্তব্য লিখিলেন; আমরা জনসাধারণ সেই সব সংবাদ ও মন্তব্য পাঠ করিয়া যুগপৎ উল্লসিত ও উত্তেজিত হইলাম। কিন্তু তারপর? বিরোধীপক্ষরা এই সব কেলেঙ্কারির বিহিতার্থে যে প্রস্তাব উত্থাপিত করিবার চেষ্টা করিলেন, ভোটের জোরে তাহা নাকচ হইয়া গেল, সরকার পক্ষ জয়লাভ করিলেন। জানা গেল যে তুচ্ছ দুই-একটা কেলেঙ্কারি হইলেও তাহা রাষ্ট্রের নিরাপত্তাকে কোনো রকমে বিপন্ন করে নাই। ভারতীয় সংস্কৃতি নির্ব্বিঘ্ন অবস্থাতেই আছে।

হাওড়া নির্ব্বাচন

হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির পরিচালক পরিষদের নির্ব্বাচনে কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থীরা মিলিত বামপন্থী দলের মনোনীত প্রার্থীদের কাছে পরাজিত হইয়াছেন, শোচনীয় রূপেই পরাজিত হইয়াছেন বলা যাইতে পারে। কারণ ইতিপূর্ব্বে যেকোন পরিষদের সদস্য তালিকার ৩০ জন সদস্যের মধ্যে ৩০ জনই ছিল কংগ্রেসের মনোনীত প্রার্থী, সেই জায়গায় এবারে কংগ্রেস ৩০টি আসনের মধ্যে অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছেন মাত্র ১৪টি আসন। তার মানে হাওড়া নির্ব্বাচক মণ্ডলী হইতে শতকরা প্রায় ৫৪ জন মানুষই বেমালুম কংগ্রেসের বিরোধী হইয়া গিয়াছেন। ঘটনাটি যে কত বেশী উদ্বেগজনক তার প্রমাণ, কোথায় সাতসমুদ্রপারের সেই আমেরিকা, সেই সেখানকার উচ্চতম আইন পরিষদেও পর্য্যন্ত ইণ্ডিয়ার এই নির্ব্বাচনের সংবাদ গিয়া সেখানকার গণতন্ত্রী সদস্যদের বিচলিত করিয়া তুলিয়াছে। ভারতের বিভিন্ন পরিষদ গৃহগুলিতে সরকার পক্ষদের ভোটাধিকৃত জয়লাভে যে এদেশের বহু সংবাদপত্র খুসি হইতে পারেন নাই, তাহারও কারণ বোধ হয় এই হাওড়া। হাওড়ার কেরামতি আছে বলিতে হইবে।

কিছুদিন হইতে ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র একটা গুজব উঠিয়াছে শুনিতে পাই যে, শীঘ্রই, মানে এই বছরটাও পার হইতে পারিবে না—আমাদের এই স্বাধীন শিশু-রাষ্ট্রের সর্ব্বাংশ জুড়িয়া নাকি এক বিরাট অভূতপূর্ব্ব ঘটনার অনুষ্ঠান হইবে। সেটি হল আগামী সাধারণ নির্ব্বাচন। গুজবটির সত্য বা মিথ্যা আমরা নিশ্চয় করিয়া কিছু বলিতে পারি না। কথাটি যদি সত্য হয়, তাহা হইলে বলিতে পারি যে, হাওড়ার এই নির্ব্বাচন পালাটির মধ্য দিয়া সেই সম্ভাবিত মহানাটকের একটি সম্পূর্ণাবয়ব 'রিহার্সাল' অনুষ্ঠিত হইয়া গেল। কংগ্রেসের উপরে নানা অকাট্য কারণে যাহারা ইতিমধ্যেই সবিশেষ ঘোষণা করিয়া বসিয়াছেন, তাহারা হয়তো ভাবিতেছেন যে, উক্ত আগামী নির্ব্বাচনে ভারতের অভুক্ত বিবস্ত্র ও কত পীড়িত জনসাধারণ কংগ্রেসের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে যে রায় দিবে, হাওড়ার এই নির্ব্বাচনে সেই অমোঘ ভবিষ্যতেরই ভূমিকা সূচিত হইয়া গেল। দুর্দ্দশায় দুর্দ্দশায় মনটা সকলের খিচড়াইয়া আছে, তাই আপাত-দৃষ্টির বেশী দৃষ্টি চলে না বলিয়া এই একটা বিষয়ই সবচেয়ে প্রকট বলিয়া প্রতিভাত হয়। কিন্তু আরও একটা বিষয় আছে। হাওড়ার নির্ব্বাচনে আজ যাহারা কংগ্রেসকে পরাজিত করিয়া জয়ী হইলেন, মাঝখানে কোনো একটা বিপর্য্যয় না ঘটিয়া গেলে মনে হয় আগামী সাধারণ নির্ব্বাচনেও কংগ্রেসের প্রায় সমকক্ষ প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে ইহারাই আসরে আসিয়া অবতীর্ণ হইবেন। ইতিমধ্যে প্রায় আটমাস সময় থাকিবে। এই আটমাসের মধ্যে হাওড়ার বামপন্থী নির্ব্বাচিত সদস্যদের সক্রিয় প্রমাণ দিতে হইবে যে, তাহারা জনসাধারণের কতখানি আস্থাভাজনের উপযুক্ত। শুধু যে কংগ্রেস বিরোধিতার ঝাণ্ডা উড়াইয়া তাহারা তাহাদের দায়িত্ব শেষ করিতে চান না, একথা তাহাদের কাজেকর্ম্মে সত্যসিদ্ধ করিয়া দেশবাসীকে দেখাইতে হইবে।

সুতরাং হাওড়ার নির্ব্বাচন শুধু যে স্খলিত-আদর্শ কংগ্রেসের বহু-আশঙ্কিত ব্যর্থতারই রিহার্স্যাল, তাহা নয়,

উহা সম্মিলিত বামপন্থীদলের বহু বিজ্ঞাপিত যোগ্যতা ও আদর্শ প্রাণতা প্রদর্শনেরও রিহার্স্যাল।

সংস্কৃতির স্বরূপ

'কালচার' বা 'সংস্কৃতি' শব্দটির মধ্যে যতখানি অর্থ ও অনর্থ ভিড় করিয়া আছে, ততখানি বোধ হয় শব্দব্রহ্মের আর কোনো শব্দেই নাই।

আমাদের বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ আর গান্ধীজী—ইঁহাদের মুখেও আমরা সংস্কৃতির কথা শুনিয়াছি, ইয়োরোপের যে শ', রোলা আর গোর্কি, তাঁহাদের মুখেও শুনিয়াছি। ওদিকে গান্ধীঘাতক গড্‌সেও মৃত্যুর আগে বুক বাজাইয়া বলিয়া গেল যে, মহাত্মাজীকে সে হত্যা করিয়াছে একটি বিশেষ সংস্কৃতিকে রক্ষা করার মহান আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়াই। হিটলারও শ্বেতত্বক 'কুলটুর'-এর জিগীর তুলিয়াছিলেন। মারিয়া খোঁচাইয়া ইহুদি জাতটাকে যে তিনি ইয়োরোপের বক্ষপৃষ্ঠ হইতে নিশ্চিহ্ন করিবার নেশায় মাতিয়া উঠিয়াছিলেন, বেলসেন-এ যে তাঁহার অনুচরবর্গেরা একটি আস্ত নরককুণ্ডের সৃষ্টি করিয়াছিল—হিটলারি দৃষ্টিতে ইহাও ছিল সংস্কৃতির স্বরূপ। আবার হিটলারের মত মুসোলিনিও নিরস্ত্র আবিসিনিয়াবাসীদের উপরে ইটালির বোমারুদের বোমা-বর্ষণের সংবাদ শুনিতেন, আর সংস্কৃতির মাহাত্ম্যে আত্মহারা হইয়া যাইতেন।

সুতরাং ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে, যেকোনো অর্থেই সংস্কৃতি বা কালচার শব্দটি ব্যবহৃত হইতে পারে। বুকভরা দম লইয়া শুধু গাল ভরিয়া উচ্চারণ করিতে পারিলেই হইল।

এই যে যেকোনো অর্থেই 'সংস্কৃতি' শব্দটির ব্যবহার, উহার একটি বড় নিদর্শনের সংবাদ বোম্বাই হইতে পাওয়া গেল,—সম্প্রতি বনমহোৎসব-খ্যাত শ্রীযুক্ত মুন্সী ও শ্রীযুক্ত মাসানির উদ্যোগে যে সেখানে 'ভারতীয় সংস্কৃতি স্বাধীনতা কাগ্রেস' নামে একটি উৎসবের অনুষ্ঠান হইয়াছিল, সেই উৎসব-প্রাঙ্গণ হইতে। প্রকাশ, উৎসবটি নাকি প্রথমে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল খোদ দিল্লীতেই। কিন্তু শ্রীযুক্ত নেহরুর হস্তক্ষেপের ফলে উহা সম্ভব হয় নাই, তাই বোম্বাইতে হইয়াছিল। শুধু তাই নয়, এই সঙ্গে আরও প্রকাশ যে, শ্রীযুক্ত নেহরু কেবল এই অধিবেশনের দিল্লী-প্রবেশ নিষিদ্ধ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, তিনি নাকি ভারত সরকারের সমুদয় কর্ম্মচারীকেই এই অধিবেশনের সঙ্গে কোনোরকমে সহযোগিতা করিতেও প্রত্যক্ষ ভাবে এবং সরকারী নির্দ্দেশ জারি করিয়া নিষেধ করিয়াছিলেন। ফলে এই দাঁড়াইয়াছে যে, পণ্ডিত নেহরু এবং ভারত সরকারের প্রত্যক্ষ বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও যে ভারতীয় সংস্কৃতি ও সেই সংস্কৃতির স্বাধীনতা সম্পর্কে কোনো অধিবেশন হইতে পারে, অধিবেশনের কর্ম্মকর্ত্তারা প্রত্যক্ষ আসরে নামিবার পূর্ব্বেই সে কথা প্রমাণ করিয়া ছাড়িয়াছেন।

কিন্তু আসরে নামিয়া মাত্র একটিই নয়, উক্ত সংস্কৃতি-স্বাধীনতার কংগ্রেস এমন ধরণের অ-ভারতীয় ও ভারত-বিরোধী সংস্কৃতিক তত্ত্ব প্রচার ও প্রমাণ করিয়াছেন একাধিক। দু'একটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করা যায়।

সর্ব্বপ্রথমেই যেমন ধরা যাক্, আমাদের নিরপেক্ষ পররাষ্ট্র-নীতির কথা। বার বার শ্রীযুক্ত নেহরু দেশের লোককে এবং বিদেশের লোককে উদ্দেশ করিয়া বলিয়াছেন যে, ভারতের এই নিরপেক্ষ পররাষ্ট্র নীতি ভারতের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য অহিংসা আদর্শেরই বিবর্ত্তন সৃষ্ট আদর্শ। বহিরাগত আক্রমণের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার প্রয়োজন ব্যতীত ভারতবর্ষ কখনও অস্ত্র ধারণ করিবে না। কিন্তু এই নিরপেক্ষনীতিকে উক্ত স্বাধীন সংস্কৃতি কংগ্রেস কী বলিয়াছে? বলিয়াছে নপুংসক নীতি। অর্থাৎ পরোক্ষভাবে শ্রীযুক্ত নেহরুকেই উহা নপুংসক বলিয়া অভিনন্দিত করিয়াছে।

পররাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে কোনো কথা উঠিবার সঙ্গে সঙ্গে—তাহা যে প্রসঙ্গেই হোক্—রাজনীতির কথাটা স্বতঃই আসিয়া উপস্থিত হয়। এখানে বলিয়া রাখা ভালো যে, রাজনীতির সঙ্গে সংস্কৃতির যে সম্পর্কই থাক,—রাজনীতির কোনো একটা বিষয় যদি কোনো এক বিশিষ্ট রাষ্ট্রেরই একক স্বার্থের বিষয়ীভূত হয়, তা হইলে সেটাকে আর যাহা কিছুই বলা যাক না কেন, সংস্কৃতি পদবাচ্য বলা অবশ্যই যায় না। আধুনিক বিশ্ব-পরিস্থিতিতে এমন একটি বিষয় হইল চীনের সম্প্রতিকার

আভ্যন্তরীণ রাজনীতির রূপ পরিবর্ত্তন। চীনের এই রূপ-পরিবর্ত্তন যেকোনো কারণেই হোক আমেরিকার রাষ্ট্রনায়কদের মনঃপূত নয়, উহাকে তাঁহারা তাঁহাদের ডলারি গণতন্ত্রের বিরোধী নীতি বলিয়া মনে করেন। তা মনে করুন, ইহা তাহাদের নিজেদের স্বার্থের বিষয়ীভূত ব্যাপার। কিন্তু ইহার সঙ্গে ভারতীয় সংস্কৃতির সম্বন্ধ কী? তা ছাড়া উক্ত কংগ্রেস সংস্কৃতির সঙ্গে সঙ্গে যখন স্বাধীনতার কথাটাও উচ্চারণ করিয়া লইয়াছে, তখন চীনের সাম্প্রতিক রূপ বদল ও চীনবাসীদের এক স্বাধীন ইচ্ছার অভিব্যক্তি, একথা মানিয়া লইতে বাধা হইবে কেন?—কিন্তু উক্ত সংস্কৃতি কংগ্রেসের কাছে তাহা বাধার ব্যাপার বলিয়া মনে হইয়াছে। এ বাধা শুধু একা আমেরিকারই কোটিপতিদের নিজস্ব ব্যাপার বলিয়াই হইয়াছে। এবং চীনের প্রতি ভারতের মৈত্রীনীতি বিঘোষিত থাকা সত্ত্বেও হইয়াছে।

এইবারেতে দেখা যাক্ এই অধিবেশনের প্রধানাংশ গ্রহণকারীদের কথা। শুধু ভারতের নয়, সমগ্র বিশ্বের সংস্কৃতিক্ষেত্রে সশ্রদ্ধ স্বীকৃতিতে সমাদৃত এমন কয়জন মানুষ আজও আমাদের এই দেশেতে আছেন? আছেন শ্রীযুক্ত জওহরলাল নেহরু স্বয়ং, আছেন আইনষ্টাইনের সহযোগী শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু, আছেন শ্রীমেঘনাদ সাহা, আছেন নৃত্যভাস্কর উদয়শঙ্কর, ঔপন্যাসিক মুলুকরাজ আনন্দ, ও আইনবিদ্যাবিদ রাধাবিনোদ পাল এবং চিত্রশিল্পী শ্রীনন্দলাল বসু। ইহারা ব্যতীত আরও এমন কয়েকজন আছেন যাহারা বিশ্বখ্যাতি সম্পন্ন না হইলেও ভারতীয় সংস্কৃতির এক একটি প্রোজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক-স্বরূপ। ইহাদের মধ্যে নাম করা যাইতে পারে শ্রীহারীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের, শ্রীকিষণ চন্দরের এবং শ্রীপ্রেমচাঁদ-এর।—এক আধজন হইলে তবু কথা ছিল, কিন্তু সব ক'জনকেই বাদ দিয়া এই ভারতবর্ষেরই বুকের উপর ভারতীয় সংস্কৃতি বিষয়ক কোনো অধিবেশন করার অর্থ যে শিবহীন শিবযজ্ঞেরই সামিল, একথা বোধ হয় নিতান্ত সংস্কৃতিঅজ্ঞ মানুষটিও জানে। কিন্তু জানিতে পারেন নাই, অথবা জানিবার অবসর পান নাই এই সংস্কৃতি কংগ্রেসের অনুষ্ঠান আয়োজন করিয়াছিলেন যাঁহারা তাঁহারা। পরিবর্ত্তে তাঁহারা আমন্ত্রিত করিয়া আনিয়াছিলেন আমেরিকার জেমস্ বার্ণহামকে, যিনি এই কিছুদিন পূর্ব্বেই কোরিয়ার যুদ্ধের অবসানার্থে চীনের উপরে মানব সংস্কৃতির সবচেয়ে ভয়াল ভয়ঙ্করতম যে অভিশাপ সেই আনবিক বোমা নিক্ষেপের উপদেশ জারি করিয়াছিলেন; ফ্রাঙ্কো-স্পেনের অন্তী কবি মাদারিয়াগাকে, যিনি ভারতে পদার্পণ করিয়াই উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছিলেন যে প্রাচ্য-প্রতীচ্যের মধ্যে কখনও সাংস্কৃতিক সঙ্গতি রচিত হইতে পারে না; ইংল্যাণ্ডের স্পেণ্ডার ও অডেনকে—যাহারা একদা গণতন্ত্রী স্পেনের হইয়া ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে লেখনী হইতে স-বেয়নেট বন্দুক ধারণ করিতেও পর্য্যন্ত কুণ্ঠিত হন নাই এবং আজ যারা নিরবিচ্ছিন্ন আত্মপরতাকেই কলাদর্শের পরাকাষ্ঠা বলিয়া মনে করেন।

কিন্তু সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সংবাদটি বোধ হয় এইটাই যে, উক্ত সংস্কৃতি কংগ্রেসে ভারতের সাধারণ জনগণেরও কোনো প্রবেশাধিকার ছিল না।

বিস্ময়ের কিছুই নাই। ১৯৪৬-এর আগষ্টে কলিকাতার রাস্তায় রাস্তায় একদল অন্ধ-মানব নরমুণ্ড লইয়া গেণ্ডুয়া খেলিয়াছিল, সেও তো ধর্ম্ম ও সংস্কৃতির দোহাই পাড়িয়াই।

কোরিয়া

আবার এক নূতন গুরুত্বপূর্ণ ও বিপর্য্যয়গর্ভ পরিণতির সম্মুখীন হইয়াছে কোরিয়া। চীনা স্বেচ্ছা-সৈন্যদের সহ-যোগে উত্তর কোরীয়রা দ্বিতীয়বারের জন্য দক্ষিণ কোরিয়াকে প্রায় দখল করিতে বসিয়াছিল, সেটা প্রায় একমাস-দেড়মাস আগেকার ব্যাপার। বর্ত্তমানে যে কারণেই হোক তাহারা পিছাইয়া আসিয়া নিজেদের রাষ্ট্র সীমার মধ্যে থাপ পাতিয়া বসিয়াছে। বুঝিবার উপায় নাই যে, তাহারা নড়িবে বা সরিবে। এদিকে ৩৮ অক্ষাংশ রেখার এপারে দক্ষিণ কোরিয়ার বুকের উপরে জেনারেল ম্যাক আর্থারের সৈন্যরাও থাপ পাতিয়া বসিয়াছে। এইদলও যে ঠিক কী করিবে তাহা বুঝিবার উপায় নাই, এমন কি নিজেরাও ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছে না।

বিপর্য্যয়গর্ভ পরিস্থিতিটা সৃষ্টি হইয়াছে এই শেষোক্ত ব্যাপারটারই জন্য। ম্যাক্‌আর্থার সাহেব অবশ্য এইসব বিপর্য্যয়-টিপর্য্যয়ের ধার ধারেন না। তিনি ষোল আনা মিলিটারী মানুষ—তাহার মেজাজও যেমন মিলিটারী ধরণের, বুদ্ধিটাও তাই। তাহার ধারণা যে, তাহাকে যদি ঠিক মন খুলিয়া কাজ করিবার সুযোগ দেওয়া হয়, সাহায্য দেওয়া হয়, তাহা হইলে তিন তুড়িতে তিনি কোরিয়া যুদ্ধের সমাধান করিয়া দিতে পারেন। অবশ্য দিন কতক আগেও কোরিয়া-সমস্যাটিকে এমন তিন তুড়ি দিয়া মীমাংসা করিয়া ফেলার মতো বুদ্ধি ও বিবেচনা ম্যাক্‌আর্থার সাহেবের স্বদেশীয় রাষ্ট্রনায়কদেরও সকলেরই ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় হইল, তাঁহারা সকলে ম্যাক্‌আর্থার সাহেবের মতো মিলিটারী মানুষ নন; মাঝে মাঝে ঠেকিয়া শিখিয়া তাহাদের বুদ্ধিটা কখনও কখনও বেশ গেরস্থ মানুষের বুদ্ধির মতো হইয়া যায়। এই ঠেকিয়া-শেখা বুদ্ধিতে আমেরিকার রাষ্ট্রনায়করা দেখিতেছেন যে, কোরিয়া ব্যাপারটা ঠিক তিন তুড়িতে মেটাইয়া দেওয়ার মতন ব্যাপার নয়। অবশ্য তিন তুড়িতে একটা ব্যাপার মেটানো যে যায় না তা নয়। কিন্তু সেটা কোরিয়া বিপর্য্যয়ের মীমাংসা নয়, সেটা হইল তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ। মার্কিন রাষ্ট্রনায়করা দেখিতেছেন যদি এই তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধিয়া যায়, তাহা হইলে তাহারা একটা বিরাট শক্তি জোটের বিরুদ্ধে একেবারে নির্বান্ধব হইয়া পড়েন। কারণ আমেরিকার যে ঘনিষ্ঠতম ও বিশ্বস্ততম বন্ধু বৃটেন সেই বৃটেন ম্যাক্‌আর্থারের মিলিটারী বুদ্ধিতে বিশ্বাসী নয়, তারা এত সহসা একটা বড় রকমের হাঙ্গামায় জড়াইয়া পড়িতেও রাজী নয়। বৃটেন কোরিয়া যুদ্ধের একটা আশু মিটমাটের প্রত্যাশা করে, রীতিমত তাল ঠুকিয়াই করে। সুতরাং মার্কিন রাষ্ট্রনায়করা মতলব ঠিক করিতে পারিতেছেন না, তাঁহারা অতঃপর কী করিবেন।

কিন্তু এদিকে মিলিটারী বুদ্ধি ও মেজাজের মানুষ ম্যাক্‌আর্থারকে আর বিশ্বাসও নাই। তাই নিত্য নতুন সংবাদ আসিতেছে যে, কোরিয়ার আশে পাশে, চীনের গুরুত্বপূর্ণ সামরিক ঘাটিগুলির নিকট দেশে এমন সব সৈন্য সামন্ত আসিয়া ধীরে ধীরে জমায়েত হইতেছে, তারা সকলেই ঠিক চীনের লোক, কোরিয়ার নয়। ইউরোপের বক্ষস্থলও বিক্ষুব্ধ—সেখানে ফ্রান্সের আভ্যন্তরীণ অবস্থা বারুদপূর্ণ বিস্ফোরকের মত, ইটালীতে শ্রমিক বাহিনী বিক্ষুব্ধ, আর সোভিয়েট সুহৃদ অঞ্চলগুলিতেও যেন কিসের একটা থম্‌থমে ভাব।

এখন একমাত্র ভোলা মহেশ্বর আর ম্যাক্‌আর্থারই বলিতে পারেন, এই পরিস্থিতি কোনদিকে মোড় নেয়।—এই প্রবন্ধ লিখিবার পর অকস্মাৎ খবর পাওয়া গেল, ম্যাক্‌আর্থারকে গদিচ্যুত করা হইয়াছে।

মীমাংসার প্রয়াস

পূর্ব্ববঙ্গের মৃত্তিকা হইতে সমূলে উৎপাটিত হইয়া একদল মানুষ সামান্য লোটাকম্বলও সম্বল করিতে না পারিয়া এই পশ্চিমবঙ্গের ধারে আসিয়া আশ্রয়প্রার্থী হইয়াছে। ভারত ও পশ্চিমবঙ্গ আজ যে স্বায়ত্ত শাসনের নিরঙ্কুশ অধিকার লাভ করিয়াছে, সেটা কতকটা এই হতভাগ্যদের মূল্যে। কারণ এই হতভাগ্যদের সম্মতি না থাকিলে আজ হয়তো সমস্ত বাংলা দেশটাই পাকিস্থানের কবলভুক্ত হইত। সুতরাং ইহাদের ঘরছাড়া করিবার মূলেও যেমন আজিকার পশ্চিমবঙ্গই কতকাংশে দায়ী, তেমনই এই ঘরছাড়াদের আশ্রয় দেওয়ার প্রধান দায়িত্বও পশ্চিমবঙ্গের। কিন্তু এতাবৎকাল অন্ততঃ সরকারীভাবে পশ্চিমবঙ্গ সে দায়িত্ব পালন করিতে অপারগ হইয়াছে। ফলে পূর্ব্ববঙ্গের উৎপাটিতবাস্তু এই হতভাগ্যের দল নিজেরাই নিজেদের আশ্রয়স্থল সন্ধানে উদ্যোগী হয় এবং পশ্চিমবঙ্গের এখানে ওখানে প্রায় সর্ব্বত্রই যে সব জমি অব্যবহৃত পড়িয়া থাকিতে দেখে, সে সবের কিছুটা অংশ অধিকার করিয়া সে সবের উপর আশ্রয়-উপনিবেশ গড়িয়া তোলে। কিন্তু ব্যাপারটার ন্যায়ের যুক্তি যতখানি ছিল, আইনের সমর্থন ততখানি ছিল না। ভারতীয় শাসন বিধানে ব্যক্তিগত সম্পত্তি মূল প্রাণীসত্বেরও বিষয়ীভূত। উপনিবেশ গঠনকারী উদ্‌বাস্তুরা অধিকাংশ স্থানেই জমি-মালিকদের এই অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ করিয়াছিল এই সব বঞ্চিত এবং অধিকারক্ষুণ্ণ পরিচালকদের আবেদন অগ্রাহ্য করিতে না পারিয়া পশ্চিমবঙ্গের জমি-মালিকদের এই অধিকার

যাহাতে অব্যাহত থাকে সেজন্ত এক আইন প্রণয়নের পরিকল্পনা করিয়াছেন।

গতমাসে 'উদ্বাস্তু উচ্ছেদ বিল' এই নামে আনীত একটি সরকারী প্রস্তাবকে কেন্দ্র করিয়া পশ্চিমবঙ্গ পরিষদ ও কলিকাতার জনমত যে বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছিল, সে ব্যাপারের মোটামুটি ঘটনাগত ভূমিকাটি হইল এই। আরও একটি ব্যাপার ছিল, সেটি হইল সরকার পক্ষের দুর্মতিজনিত দুর্বুদ্ধি। উদ্বাস্তু সর্বহারাদের সঙ্গে সঙ্গে কিছু মতলববাজ মানুষও যে বিনাশ্রমে একটি সম্পত্তি বাগাইবার আশায় কিছু কিছু জমি দখল করিয়া রহিয়াছে, এটা কিছু অনাবিষ্কৃত গোপন তথ্য নয়। এলোমেলো অবস্থার সুযোগে লুটিয়া-পুটিয়া খাইবার মতো একদল বুদ্ধিমান ব্যক্তি সর্বদেশে এবং সর্বকালেই থাকে। সেই সুযোগ হইতে তাহাদের বঞ্চিত করিয়া অধিকারক্ষুণ্ণ জমি-মালিকদের যদি সেই অধিকার বা সেই অধিকারের বিনিময়মূল্য প্রত্যর্পণ করা হয়,তাহা হইলে তাতে আইনও যেমন অব্যাহত থাকে, তেমন থাকে স্থায় ও নীতির বিধানও। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই অনুদ্বাস্তু মৎলববাজদের উচ্ছন্ন করিতে গিয়া তাহাদের প্রস্তাবিত বিলের এমন একটা নাম করিয়াছিলেন, যাহাতে মনে হইয়াছিল পুনর্বাসনের পরিবর্তে বুঝি পাকিস্থানীদের মতো উদ্বাস্তুদের আসা সমূলে উৎপাটিত করিয়াই তাহারা উদ্বাস্তু সমস্যার মীমাংসা করিতে চান। জনমত এই কারণেই বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছিল।

কিন্তু সুখের বিষয়, শেষ পর্য্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাঁহাদের এই দুর্মতিজনিত অপচেষ্টাটিকে আর শেষ পর্য্যন্ত অটুট রাখিবার জন্ত পণ করিয়া বসেন নাই। জনমতের বিরুদ্ধ অভিমত দেখিয়া তাঁহারা সম্ভবতঃ তাহাদের এই ত্রুটির বিষয়ে অবহিত হইয়াছেন এবং বিলটির নাম পরিবর্তন করিয়া 'উদ্বাস্তুদের পুনর্বসতি ও অন্তান্ত বে-আইনী দখলকারী উচ্ছেদ বিল' এই নামকরণ হইয়াছে। ১৯৪৬-এর অক্টোবর হইতে ১৯৫০-এর ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত যাহারা সাম্প্রদায়িক গোলযোগের জন্ত পূর্ববঙ্গ হইতে পশ্চিমবঙ্গে আসিয়াছেন, তাহাদিগকেই আইনসিদ্ধ উদ্বাস্তু বলিয়া ধার্য্য করা হইবে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ইহাও স্বীকার করিয়া নিয়াছেন। আর স্বীকার করিয়া নিয়াছেন যে, কোনো অবস্থাতেই পৃথক জমির ব্যবস্থা না করিয়া এবং বর্তমান কাজকর্ম ও চাকুরীর ব্যাঘাত জন্মে এমনভাবে কোনো উপনিবেশবাসী উদ্বাস্তুকে সরানো হইবে না।

উদ্বাস্তুরা সহায়হীন ও নিরাশ্রয় বটে, কিন্তু বস্তুতঃ তারা ভারত রাষ্ট্রের একটি বিশেষ সম্পদ ও একটি শক্তিশালী সমাজ গঠনের পক্ষে একটি প্রাণবন্ত উপকরণ। একটুখানি আন্তরিকতা আর একটুখানি সহযোগিতা নিয়া তাহাদের পরিচালিত করিতে পারিলে তাহারা পশ্চিমবঙ্গের চেহারা ফিরাইয়া দিতে পারিবে।

দি মেট্রোপলিটান ইন্স্যুরেন্স কোং লিঃ

সম্প্রতি মেট্রোপলিটান ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী লিঃ চৌরঙ্গীর হোয়াইটওয়ে লেইড্‌ল'র বাড়ীটি কিনিয়াছেন। বাঙালী ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের পক্ষে ইহা যে কত বড় গৌরবের বিষয়, তাহা প্রকাশের অতীত। গত ১৯৩০ সাল হইতে ধাপে ধাপে মেট্রোপলিটান উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছে। ইহার বর্তমান চলতি বীমা ১৭কোটির উর্দ্ধে। আগামী কিছু কালের মধ্যেই যে এই কোম্পানী বীমা জগতের রেকর্ড ব্রেক করিতে পারিবেন, তাহা নিঃসন্দেহ। পুণ্যাত্মা ঋষিকল্প সচ্চিদানন্দের স্মৃতির সহিত এই প্রতিষ্ঠান যুক্ত। মেট্রোপলিটান ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী লিমিটেডের এই শুভ জয়যাত্রার পথে আজ এই নববর্ষে ইহার কর্তৃপক্ষকে আমাদের ঐকান্তিক শুভেচ্ছা ও সাদর অভিনন্দন জ্ঞাপন করি।

'ঋতু পরিক্রমা' ও 'বৈকুণ্ঠের খাতা'

সম্প্রতি বরাহনগরস্থ শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ নিবাসে রবীন্দ্রনাথের 'ঋতু পরিক্রমা' ও 'বৈকুণ্ঠের খাতা' অভিনীত হয়। পারিবারিক পরিবেশের মধ্যে এই অভিনয় দ্বারা এমন একটি মনোরম আবহাওয়ার সৃষ্টি হইয়াছিল—যাহা বাংলার সর্বত্র সচরাচর দেখা যায় না। স্বর্গীয় সচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্যের পরিবারস্থ ছেলে মেয়ে, আত্মীয় স্বজন দ্বারা এই পারিবারিক মঞ্চাভিনয় হয়। 'ঋতু

পরিক্রমা'য় অংশ গ্রহণ করে—পুলিন, মুকুল, ইতু, খুকু ও পূর্ণা। সঙ্গীতাংশে শ্রীপুলিন চৌধুরী বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দেয়। 'বৈকুণ্ঠের খাতা'য় অভিনয় করেন অনাথ চৌধুরী, বীরু ভট্টাচার্য্য, শচীন ভট্টাচার্য্য, পুলিন চৌধুরী, শৈলেন ভট্টাচার্য্য ও সত্যব্রত ভট্টাচার্য্য। বৈকুণ্ঠের ভূমিকায় অনাথ, অবিনাশের ভূমিকায় বীরু, ঈশানের ভূমিকায় শচীন, তিনকড়ির ভূমিকায় সত্যব্রত যথেষ্ট শিল্প-নৈপুণ্যের পরিচয় দেন। অন্যান্য ভূমিকাও উল্লেখ-যোগ্য। ঈশানের মেক্-আপ খুব উৎকৃষ্ট হইয়াছিল। পারিবারিক পরিবেশে এই ধরণের অভিনয় দ্বারা শুধু আনন্দ পরিবেশনই নয়, তাহার সঙ্গে শিক্ষারও একটা বিশেষ ধারা লক্ষ্য করা যায়। আমরা ইহার প্রয়োগ কর্ত্তা ও উদ্যোক্তাগণ এবং সর্ব্বোপরি প্রধান উৎসাহদাতা শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে আমাদের সাদর অভিনন্দন জ্ঞাপন করিয়া মাঝে মাঝে এইরূপ অভিনয়ের ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ করি। অভিনয়ান্তে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণকে বিশেষভাবে আপ্যায়িত করা হইয়াছিল।

প্রাচ্যবাণী মন্দিরের বার্ষিক অধিবেশন

সম্প্রতি মাননীয় রাজ্যপাল ডক্টর শ্রীকৈলাশনাথ কাটজু মহাশয়ের সভাপতিত্বে ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউট হলে প্রাচ্যবাণী মন্দিরের বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। এই সভায় পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী পণ্ডিত রায় শ্রীহরেন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন।

উদ্বোধন বক্তৃতায় ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী বলেন যে, বিগত সাত বছর ধরিয়া প্রাচ্যবাণী মন্দির সংস্কৃত শিক্ষা প্রসারণের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিয়া আসিয়াছে। প্রত্যেক বৎসর বহু সভাসমিতি, সংস্কৃত নাটক অভিনয়, গ্রন্থপ্রকাশ প্রভৃতির মাধ্যমে সংস্কৃত প্রচারে প্রাচ্যবাণীর বিপুল প্রয়াস সার্থকতায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। প্রাচ্য-বাণীর প্রকাশিত গবেষণা ও সার্ব্বজনীন গ্রন্থমালা বঙ্গীয় সুধীমণ্ডলীর আদরের সামগ্রী। প্রাচ্যবাণী পরিচালিত সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র ও ছাত্রী বিভাগের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধিও অত্যন্ত সন্তোষজনক। পরিশেষে ডক্টর চৌধুরী ভারত সরকারকে আর্থিক সহায়তা দানের জন্য ধন্যবাদ প্রদান করেন।

ডক্টর কাটজু বলেন যে, স্বাধীন ভারতে সংস্কৃতের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধিসাধনেই ভারতের উন্নতির মূল অন্ত-র্নিহিত এবং প্রধান অতিথির ভাষণে শিক্ষামন্ত্রী বলেন যে, দেশ যদি একান্তভাবে সংস্কৃত শিক্ষার কামনা করে, নিশ্চয় সরকার তদ্বিষয়ে তৎপর হইবেন।

প্রাচ্যবাণীর পক্ষ থেকে ডক্টর বিনোদবিহারী দত্ত মহাশয় বর্ত্তমান বৎসরে নিখিলবিশ্ব সংস্কৃত সম্মেলন অনুষ্ঠান প্রচেষ্টায় এবং বঙ্গদেশে সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনে প্রাচ্যবাণীর পূর্ণ সহযোগিতা জ্ঞাপন করেন।

LIBRARY THE CALCUTTA

শুভ নববর্ষের ফলাফল

রাজজ্যোতিষী পণ্ডিত হরিশ্চন্দ্র শাস্ত্রী

১৩৫৭ সালের ৩০শে চৈত্র শুক্রবার দিবা ২ ঘ. ৪০. মি. ২৫ সেকেণ্ডের সময় শুক্লসপ্তমী তিথিতে মিথুন রাশিতে পুনর্ব্বসু নক্ষত্রে চন্দ্র থাকা কালে মহাবিষুব সংক্রান্তি। ৮০ গনে সংক্রমণ হেতু "মহোদরী সংক্রান্তি" নামে অভিহিত। সূর্য্যদেব অশ্বিনী নক্ষত্রে মেষ রাশিতে, মঙ্গল ও বুধ মেষ রাশিতে। ভারতবর্ষ মকর রাশির অন্তর্গত দেশ এবং এই রাশির অধিপতি শনি; ভারতের অষ্টমে কেতু। বর্ষগণনায় শনি রাজা, মঙ্গল মন্ত্রী পরস্পর বৈরভাবাপন্ন। শস্যাধিপতি চন্দ্র, বাণিজ্যাধিপতি শুক্র, সেনাপতি শুক্র। ফলে প্রজাক্ষয়, রাজক্ষয়, রাষ্ট্রনায়কগণের কার্য্যপদ্ধতি নানা ভাবে বাধাপ্রাপ্ত ও বিড়ম্বিত হইবে ও নায়কগণ বিব্রত বোধ করিবেন; রাষ্ট্রনায়কগণ রাজনীতি ও সমাজনীতি সংস্কার ব্যবস্থা প্রণয়নে সচেষ্ট হইবেন, কিন্তু প্রবল বাধা পাইবেন ও ক্ষয়-ক্ষতির যোগ-সৃষ্টি হইবে। এই বর্ষে ৪টি বিষয় বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। (১) গ্রহসংস্থান ও মন্ত্রিসভা; (২) বর্ষ-চক্রের গ্রহসমাবেশের ফলাফল; (৩) গোচর ফল ও প্রদেশ ও প্রদেশপালের উপর তাহার প্রভাব এবং (৪) বাস্তুহারা ও খাদ্যসমস্যা।

এই বর্ষে বৃহস্পতি স্বক্ষেত্রী হইলেও স্থানভেদে আধিপত্যহীন; রবির আধিপত্যও কম, শুক্র বিশেষ দায়িত্বপূর্ণ ২।৩টি পদের অধিকর্ত্তা এবং অশুভ গ্রহ শনি রাজপদে আসীন ও রাজ্যপালগণের পরিচালক এবং শুক্র ও মঙ্গল মন্ত্রীদিগের নিয়ন্তা। রাজা বা প্রেসিডেণ্ট শনি শ্রমিক, মিলমালিক, শ্রমবিভাগ ও গণতন্ত্রের কারক। সুতরাং গণতন্ত্রের উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। শ্রমিকের আধিপত্য আরও বিস্তৃত হইবে ও সুমীমাংসা-ব্যাপারে বিভিন্ন মতাবলম্বীদিগকে লইয়া জনমত গঠিত হইবে। বৃষ্টিপাত প্রচুর হইবে; বাণিজ্যের উন্নতি; পাট, তুলা ও গমের উৎপাদন বৃদ্ধি; রৌপ্য ও স্বর্ণের মূল্য বৃদ্ধি; মশলা, ইমারত নির্ম্মাণের দ্রব্যাদির মূল্যবৃদ্ধি ও সময় সময় দুষ্প্রাপ্য হইবে। দেশে অশান্তি, অন্তর্বিদ্রোহ; তীব্র খাদ্যসমস্যা; নূতন দলগঠন ও মতবাদ; মহিলাদের আধিপত্য বৃদ্ধি ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দল প্রবল হইয়া উঠিবে। কোন বিশিষ্ট রাজনৈতিক প্রধানা মহিলার অকস্মাৎ আঘাতপ্রাপ্তি ও গুপ্ত শত্রুর হাতে ক্ষতি; রাজনীতিজ্ঞদিগের মধ্যে কুৎসা ও অখ্যাতি বৃদ্ধি পাইবে; শ্রাবণ ১০ তারিখ হইতে ২৪শে আশ্বিন মধ্যে দুর্ভিক্ষ, বিমান দুর্ঘটনা, রেল দুর্ঘটনা ইত্যাদি ঘটিবে। ১৩১ দিনে শনি বক্রভাবে থাকিবে। ফলে ভারতে বহুবিধ ক্ষয়ক্ষতি যোগ সূচিত হয়; শাসন ব্যাপারে সঙ্কট দেখা দিবে; আশ্বিন হইতে অগ্রহায়ণ মাস মধ্যে শ্রমিক সমস্যার বৃদ্ধি ও খাদ্য সমস্যা তীব্রতর হইবে; আশ্বিন হইতে অগ্রহায়ণের ১০ তারিখের মধ্যে দক্ষিণ ভারতের কোন খ্যাতনামা নায়কের রিষ্টকাল দেখা যায়। এই বর্ষে ভারতে মৃত্যু-সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে। এই বর্ষে শ্রীযুক্ত রাজাগোপাল আচারিয়াজী ও মৌলানা আবুলকালাম আজাদের রিষ্টকাল। শ্রাবণ হইতে ২ মাস মধ্যে নূতন গান্ধী-মন্ত্রীসভা গঠিত হইবে এবং তাহাতে বিশিষ্ট মুসলমান প্রভৃতি থাকিবেন; ভারতের বৈদেশিকনীতি বহুলাংশে সুফল লাভ করিতে পারিবে না। বর্ষের মধ্যভাগে বিহারে বিশিষ্ট আইনজ্ঞের জীবন নাশ সম্ভব; জন-সাধারণের স্বাস্থ্যের পতন ও আশ্বিন হইতে ১৪ই পৌষ মধ্যে বিশেষ অশুভযোগ দেখা যায়।

ভাদ্রমাসে সিংহ রাশিতে ৫টী গ্রহের সমাবেশ। ফলে ঐ সময় ভারতের কোন কোন প্রদেশে যথা উত্তর প্রদেশ, বম্বে প্রদেশ, বাংলাদেশ ইত্যাদি স্থানে অন্তর্বিদ্রোহ, রক্ত-পাত, অরাজকতা ইত্যাদি ঘটিবে এবং কোন হিন্দু নেতার জীবনাবসান ঘটিবে। বর্ষের শেষভাগে নির্ব্বাচনী গণ-ভোট আন্দোলন ও ২।১টী প্রদেশে নির্ব্বাচন হইবে। সম্পূর্ণ ও সর্ব্বভারতীয় নির্ব্বাচন ১৯৫১ সনে হইবে না; বহু কংগ্রেস কর্ম্মী নির্ব্বাচনে পরাজিত হইবে, এমন কি কোন কোন মন্ত্রীপদে আসীন কংগ্রেস প্রার্থীও মনোনীত হইবে না; কংগ্রেস দেশবাসীর ভালবাসা ও বিশ্বাস বহুলাংশে হারাইবে এবং আত্মসম্মান রক্ষা করিতে বিব্রত হইয়া পড়িবে। দিল্লীনগরীর শ্রীবৃদ্ধি ঘটিলেও তথায় চুরি ডাকাতি বৃদ্ধি পাইবে। তুলা রাশিতে মঙ্গল ৬ মাস থাকিবে। ফলে "যুদ্ধং দেহি" ভাব ও কাশ্মীরে বিশেষ

কানাইলাল মিত্রের
সোমরাজ
কবিরাজী কেশতৈল
মাথার রোগের মহৌষধ
সুগন্ধে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ
ফরমুলা :-
* তিল তৈল * ক্যাষ্টর অয়েল
* ক্যান্থারাইডিন
* সোমরাজ বীজ
* মহাভৃঙ্গরাজ
* রক্ত ও শ্বেত চন্দন
* ব্রাহ্মী * আমলা
* মাস্ক (কস্তুরী) * চন্দন তৈল
* বেলা তৈল * চামেলী তৈল
* বার গুমেট * ল্যাভেণ্ডার
* ইত্যাদি বিখ্যাত সেন্ট
উপকারীতা :-
* মাথার রোগে
* চুল ওঠা বন্ধ করিতে
* চুল বাড়াইতে
* অনিদ্রায়, নিত্যস্নানে
'সোমরাজ কেশতৈল'
* সর্ব্বোৎকৃষ্ট *

গোলযোগ ও সঙ্কট দেখা দিবে। বাংলা অশান্তির লীলা-ভূমি হইবে। একজন কংগ্রেস মন্ত্রীর মৃত্যুর সম্ভাবনা আছে। বিভিন্ন দল সমবেত ভাবে শাসন সঙ্কট ঘটাইবার চেষ্টা করিবে। খাদ্য সমস্যার কোনই সমাধান হইবে না; বহু বিষয়ে বাংলা পিছাইয়া পড়িবে।

বহু নেতা থাকিলে একজন সাধারণ জনসেবক ব্যক্তি যিনি ১৩৫৭ সালের অখ্যাতনামা ছিলেন, নিজের কর্ম্ম ও প্রতিভাবলে উচ্চস্থান অধিকার করিবেন ও দেশের আস্থা অর্জ্জন করিয়া নেতৃত্ব করিবেন। চালের মূল্য হ্রাস; নেপালে শাসনতন্ত্রের আমূল পরিবর্ত্তন; উত্তর ভারতে রাজনৈতিক গোলযোগ; যুদ্ধের রব উঠিলেও যুদ্ধ হইবে না। জওহরলালজীর স্বাস্থ্যক্ষতি ও ভ্রমণে বিপদ; শ্রাবণ মাসে রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদজীর বিশেষ শরীর ক্লেশ ও ক্ষতি; আশ্বিনের মধ্যভাগে ঝড় জলের বিশেষ আধিক্য হইবে; ভারতীয় সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি হইবে। বাংলা, আসাম, পাঞ্জাব ও উত্তর প্রদেশে প্রদেশপাল বা প্রধান মন্ত্রীর পরিবর্ত্তনের সম্ভাবনা আছে। সংবাদপত্রের কিছু না কিছু অসুবিধা এবং দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতের দুই জন বিশিষ্ট ও প্রসিদ্ধ সম্পাদকের জীবনাবসান যোগ, বাংলার কোন প্রসিদ্ধ পত্রিকা সম্পাদকের কর্ম্মত্যাগযোগ আছে। আইন, আদালত, পোষ্টাফিস প্রভৃতি স্থানে দুর্নীতি বৃদ্ধি পাইবে। বাস্তহারাদের সংঘঠন ও সংহতি বিশেষ বলবান্ হইবে, কিন্তু তাহাদের দুঃখদুর্দ্দশা বৃদ্ধি পাইবে। সরকার সমস্যা সমাধানে বিফল হইয়া ক্ষমতার অপব্যবহার করিবেন। মহিলাদের সংহতি বৃদ্ধি; কর্ম্ম-ক্ষেত্রে পুরুষ ও স্ত্রীর সমতা প্রদর্শন। বিচার ও শিল্প বিভাগে অধিক মহিলা নিযুক্ত হইবে। জন্মহার বৃদ্ধি পাইবে। শিক্ষা সংক্রান্ত ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি সংস্কার ও উন্নতি সাধনে চেষ্টিত হইলেও ব্যর্থকাম হইবে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালকদিগের অক্ষমতা প্রকাশ পাইবে এবং তাহা প্রধান কর্ম্মকর্ত্তার স্বাস্থ্যের হানির জন্যই প্রধানতঃ হইবে। বাংলায় সেকেণ্ডারি এডুকেশন প্রবর্ত্তিত হইবে এবং পরিচালকগণ জনপ্রিয়তা হারাইবেন। উত্তর প্রদেশে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতে পারিবে। মাদ্রাজে মন্ত্রিসভার পরিবর্ত্তন ও বিশ্ববিদ্যালয় শক্তিশালী হইবে এবং খাদ্য সমস্যা ও আর্থিক পরিস্থিতি খারাপ হইবে

শ্রীকে. ভি. আপ্পারাও কর্ত্তৃক মেট্রোপলিটান প্রিণ্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস্ লিমিটেড
৯০, লোয়ার সারকুলার রোড, কলিকাতা ১৪ হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

অষ্টাদশ বর্ষ জ্যৈষ্ঠ—১৩৫৮ ২য় খণ্ড—৬ষ্ঠ সংখ্যা

শ্রীগীতগোবিন্দ

শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রাক্‌রবীন্দ্রযুগে যদি কোন বাঙ্গালীর রচিত কাব্য সর্ব্বভারতীয় প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া থাকে, তাহা জয়দেবের শ্রীগীতগোবিন্দ। ইহার টীকা ও ব্যাখ্যাকার সম্প্রদায় ভারতের সমস্ত প্রদেশ হইতেই আবির্ভূত। ইহার অনুকরণে সমস্ত প্রদেশেই গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। এই গ্রন্থে যে নূতন ধারা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে তাহা সমুদয় প্রদেশে অনুসৃত হইয়া ক্ষীয়মান সংস্কৃত কাব্য সাহিত্যে নূতন স্রোতোবেগ ও নবীন প্রেরণা সঞ্চারিত করিয়াছে। সর্ব্বভারত-প্রচলিত সংস্কৃত ভাষায় রচিত হইয়া ইহা দেশের সংস্কৃতি ও ধর্ম্মভাবমূলক সম্বন্ধের মধ্যে ঐক্যবোধকে দৃঢ়তর করিয়াছে ও সমস্ত ভারতব্যাপী এক নূতন কাব্যরীতির উৎসমুখ খুলিয়া দিয়াছে।

কিন্তু 'গীতগোবিন্দের' আসল বৈশিষ্ট্য হইল যে, ইহা যুগসন্ধিক্ষণে রচিত ও ভবিষ্যৎ সাহিত্যের গতিপথের নির্দ্দেশক ও নিয়ামক। গীতগোবিন্দ রচনার সময় সংস্কৃত সাহিত্যের মৌলিক দৃষ্টিপ্রেরণা নিঃশেষিতপ্রায় হইয়াছে ও নবজাত প্রাদেশিক ভাষাসমূহ সাহিত্যিক আত্ম-প্রকাশের জন্য প্রস্তুত হইয়া উন্মুখভাবে প্রতীক্ষা করিতেছে। দেশের চিত্ততলে নূতন রস ও ভাবাবেগ সঞ্চিত হইয়া অভিনব বহিঃনিষ্ক্রমণের পথ খুঁজিতেছে। পুরাতন সংস্কৃত ছন্দবিন্যাস মহাদেব-জটার মধ্যে ক্রম-উপচীয়মান ভাগীরথিতরঙ্গধারার ন্যায় এই নবীন প্রাণশক্তির চাঞ্চল্য ও গতিবেগকে আর ধরিয়া রাখিতে পারিতেছে না। নবজাত বাংলা ভাষা ভাব প্রকাশের উপযুক্ত শক্তি, বহু পরীক্ষিত অনুশীলনের আত্মপ্রত্যয় ও অতীত কীর্ত্তিসঞ্জাত আভিজাত্যবোধ এখনও আহরণ করিতে পারে নাই। কাজেই দেশের কবিপ্রতিভা সংস্কৃত ভাষাকে আশ্রয় করিতে বাধ্য হইলেও নিজ

নবোন্মেষিত সৌন্দর্য্যবোধ ও উদ্বেলিত হৃদয়াবেগের জন্ত পুরাতন, পরিমিত কাব্যরীতির অপ্রাচুর্য্য তীব্রভাবে অনুভব করিতেছে। দেশের প্রবহমান ভাবধারা সংস্কৃত ছন্দের চিত্রিত ঘটকে ছাপাইয়া উছলিয়া পড়িতেছে। মিলনের নিবিড় আনন্দ, বিরহের অন্তরদীর্ণ ব্যাকুলতা, প্রবুদ্ধ ধর্ম্মবোধের উদাত্ত উন্মাদনা, প্রতিবেশ সৌন্দর্য্যের মুগ্ধ আবেদন, গীতিকবিতার আকাশ-ছোঁয়া সুর, সর্ব্বোপরি মন-ময়ূরীর পেখম ধরা, ঐশ্বর্য্যরথি প্রতিঘাতী উল্লাসনৃত্য—এত সঙ্গীতমূর্চ্ছনা, এত হিল্লোলিত প্রাণধারা, কল্পনার এরূপ অপরিমিত প্রসার, কি সংস্কৃত সাহিত্যের প্রাচীন, জীর্ণ, প্রথাবিড়ম্বিত ছন্দোরীতির বন্ধনসীমায় ধরা দিতে পারে? তাই মথিত সমুদ্রের গভীরতা হইতে সুধাভাণ্ডহস্তে ধন্বন্তরির ন্যায় এই নব-আশা-আকাংক্ষায় বিক্ষুব্ধ হৃদয়সিন্ধুর অন্তলস্তর হইতে বৈষ্ণব দর্শনের অমৃতকলা পূর্ণ করিয়া উদিত হইলেন শ্রীজয়দেব কবি। তিনি বাংলা ভাষাকে হাতের কাছে পান নাই, কিন্তু বাঙ্গালীর সুকুমার হৃদয়বৃত্তি, তাহার সৌন্দর্য্যপ্রবণ, ভাববিভোর, অধ্যাত্মরসপিপাসু মনটি তাঁহার মধ্যে স্বপ্রকাশ। বাঙ্গালী কবি-কল্পনা, বাঙ্গালীর বিশিষ্ট সৌন্দর্য্যবোধ ও ভাবপ্রবণতা জয়দেবে প্রথম মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া সংস্কৃত সাহিত্যের নেতৃত্ব সবলে অস্বীকার করিয়া এক স্বাধীন, দুঃসাহসিক অভিযানে বাহির হইয়া পড়িয়াছে। মেঘ-মেদুর আকাশ তলে, তমালশ্যাম বনভূমিতে, বর্ষাসন্ধ্যার স্নিগ্ধ গন্ধবিধুর অন্ধকারে, এক অদৃশ্য প্রেরণার সংকেত তাহাকে পরিচিতের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া অপরিচিতের প্রতি রহস্য-মধুর অভিসার-যাত্রার আহ্বান জানাইয়াছে। এইখান হইতেই রবীন্দ্রনাথে যাহার শেষ বাঙ্গালী কবি প্রতিভার সেই জয়যাত্রা সুরু হইয়াছে। বাঙ্গালী আপনার মনকে পাইয়াছে, ভাষাকে পায় নাই—পুরাতন নৌকায় নূতন পাল খাটাইয়া নববায়ুপ্রবাহে হেলিতে দুলিতে সে অসীম সম্ভাবনার পথে প্রথম পদক্ষেপ করিয়াছে। বাংলা ভাষার সূর্য্যোদয় এখনও হয় নাই, কিন্তু এই আসন্নপ্রায় আবির্ভাবের অরুণচ্ছটায় দিংমণ্ডল উদ্ভাসিত। জয়দেব কবির প্রতিভা-প্রদীপ্ত মুখ, তাহার স্বপ্নবিভোর চক্ষুদুটি এই অনাগত আলোক-ধারার উৎসে স্নাত হইয়া অর্দ্ধগূঢ়, লাবণ্যমণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে।

তাই জয়দেবের সত্য ঐতিহাসিক পরিচয়—তিনি বাংলা ভাষার জন্মের পূর্ব্বেই প্রথম বাঙ্গালী কবি। রাম জন্মিবার পূর্ব্বেই রামায়ণ রচনার যেমন প্রসিদ্ধি আছে, তেমনি জয়দেবও বাংলা ভাষার আবির্ভাবের পূর্ব্বসূচনা। তিনি যুগসন্ধিক্ষণে আবির্ভূত হইয়া তাঁহার কাব্যের মধ্যে ভবিষ্যতের নিগূঢ় ও সুদূরপ্রসারী তাৎপর্য্য বীজাকারে বিধৃত করিয়াছেন। সংস্কৃত কাব্যে ভাব-প্রবাহ উদ্দাম হইয়া কখনও শ্লোকের সুষমা বেষ্টনীকে অতিক্রম করিয়া যায় না, স্তরে স্তরে শ্লোক হইতে শ্লোকান্তরে সংক্রামিত হইয়া সৌন্দর্য্যের পূর্ণ, শোভন পরিণতি লাভ করে। প্রতি শ্লোকের মণিকুট্টিমরচিত তটরেখা এই কূলে কূলে পূর্ণ অথচ মন্থরগামী ভাবধারার গতিবেগে ক্ষুণ্ণ বা বিপর্য্যস্ত হয় না—তরুণীর উচ্ছ্বসিত দেহলাবণ্যের মত ইহা শরীরের প্রতি রেখায় প্রকটিত হইয়া নিজ আধারের মধ্যে আপনাকে সংহত করিয়া রাখে। জয়দেবের প্রতি সর্গের সমাপ্তি শ্লোকসমূহে সংস্কৃত শ্লোকের এই সীমায়িত গাঢ়বদ্ধ সুষমা যথাযথরূপে রক্ষিত হইয়াছে। কিন্তু ভাবাবেগের উচ্ছ্বসিত বর্ণনায় দ্রুতগামী শ্লোকপরম্পরার সীমারেখা যেন আর সুস্পষ্ট নাই, ভাবপ্রাবল্যে সব মিশিয়া একাকার হইয়া গিয়াছে। ইহাদের মধ্যে আমরা যেন বাংলা পয়ারের পূর্ব্বসূচনা অনুভব করি। শ্লোকের আত্মসমাহিত গাঢ়তা যেন পয়ারের সমষ্টিগত বৃহত্তর ভাবায়তনের মধ্যে বিলীন হইয়াছে। হ্রদের ক্ষুদ্র লহরীসকল বারিরাশির মধ্যে দ্রুত প্রবাহিনী স্রোতস্বিনীনিচয়ের সম্মিলিত তরঙ্গধারার নৃত্যলীলা জাগিয়া উঠিয়াছে। আর যেখানে এই হৃদয়াবেগ গীতিকবিতার সঙ্গীতোচ্ছ্বাসে উদ্দাম হইয়া উঠিয়াছে, সেখানে সংস্কৃত ছন্দের রীতিবন্ধন সম্পূর্ণরূপেই উপেক্ষিত হইয়াছে। সংস্কৃত সাহিত্যে আমরা মাঝে মধ্যে গানের সাক্ষাৎ পাই, কিন্তু এগুলি অগ্র ও পশ্চাৎবর্ত্তী শ্লোকের সহিত আকৃতি প্রকৃতিতে প্রায় অভিন্ন। অন্তরাল হইতে শ্রুত হংসপদিকার গান শকুন্তলার সর্ব্বব্যাপী রমণীয়তার মধ্যে ইহার বিশিষ্ট আবেদন হারাইয়াছে; ইহা তাহার

হৃদয়ের সমাচার বহন করে সত্য, কিন্তু তাহার রিক্ত জীবনের করুণ নিঃসঙ্গতার সুরটি ইহার মধ্যে ধ্বনিত হয় না। রঘুবংশে তপোবন-পরিত্যক্তা সীতার শোকোচ্ছ্বাস 'যথা ইহা তৎ জননান্তরেঽপি ত্বমেব ভর্ত্তা ন চ বিপ্রয়োগঃ'—শ্লোকের গাম্ভীর্য লাভ করিয়াছে, গানের সুদুঃসহ, মর্ম্মান্তিক তীব্রতা লাভ করে নাই। 'গাথাসপ্তশতী', 'আর্য্যাসপ্তশতী' প্রভৃতি সংগ্রহ গ্রন্থগুলি হয়ত সংগ্রাহকের উদ্দেশ্যের দিক দিয়া সঙ্গীতধর্ম্মী ছিল, কিন্তু রচনা-ভঙ্গীর দিক দিয়া তাহারা শ্লোক সমষ্টি মাত্র। ইহাদের মধ্যে কোথাও কোথাও এক আধ বিন্দু অশ্রু চক্‌মক্ করিয়া উঠে, কিন্তু উহা মুক্তার ন্যায় নিটোল ও উজ্জ্বল; সত্যিকার অশ্রুর পর্য্যাকুলতা ও লবণাস্বাদ উহার মধ্যে অনুভব করা যায় না। মাঝে মধ্যে অন্তর্বেদনার ক্ষীণ প্রতিধ্বনি কানে ভাসিয়া আসে, কিন্তু মধ্য পথেই শব্দালঙ্কারের শিঞ্জিত সমারোহে উহা চাপা পড়িয়া যায়। আদি কবি মহর্ষি বাল্মীকি শোক হইতে শ্লোকের উদ্ভব সাধন করিয়া সমস্ত পরবর্ত্তী সংস্কৃত সাহিত্যেই হৃদয়াবেগের অভিব্যক্তির মাত্রা-ছন্দটি চিরতরে নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছেন—শোক আর কোন দিনই শ্লোককে ছাপাইয়া উঠিতে পারিল না।

শ্লোক বন্ধন হইতে হৃদয়াবেগের মুক্তি ও শ্লোকের অন্তঃপ্রকৃতির রূপান্তর সাধন—ইহাই জয়দেবের কবি-কৃতির প্রধান উপাদান। সংস্কৃত ছন্দকে তিনি গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু উহার চরণের মধ্যে অন্ত্য ও মধ্যস্থানীয় মিল প্রবর্ত্তন করিয়া উহার মন্থর-গম্ভীর গতির মধ্যে নূপুর নিক্বণের ক্রন্তাবর্ত্তিত ধ্বনিতরঙ্গের সৃষ্টি করিয়াছেন। পয়ার ত্রিপদী ও আধুনিক বাংলা কবিতায় পরীক্ষিত নানা বিচিত্র ছন্দের সূচনা তাঁহার কাব্যে মিলে। গীতি-কবিতার উচ্ছ্বসিত সুর-প্লাবনকে তিনিই প্রথম নূতন ছন্দোবন্ধনে স্থিররূপ দিয়াছেন। এই বহিরঙ্গের পরিবর্ত্তন গভীরতর অন্তরানুভূতির পরিবর্ত্তনেরই প্রতীক ও প্রতিরূপ। অভিনব ছন্দোবৈচিত্র্যের পরিকল্পনা তখনই কবির মনে জাগে, যখন অজ্ঞাতপূর্ব্ব নব রহস্যের বিস্ময়মণ্ডিত ভাবা-কৃতি তাঁহার অন্তরে সঞ্চিত হইয়া বহিঃনিষ্ক্রমণের পথ খোঁজে। রসের নূতন আবেদন, অন্তর মধ্যে ভাবের বিচিত্র সঞ্চরণ লীলাই নব ছন্দোময়ী বাণীরূপে আত্ম-প্রকাশ করে। এই দিক দিয়া জয়দেব কেবল যে নূতন ছন্দের প্রবর্ত্তক তাহা নহে, বাঙ্গালীর নূতন মনোজগৎ, অনুভূতি ও রূপানুরাগের বৈশিষ্ট্যেরও সূচনা করিয়াছেন তিনি।

গীতগোবিন্দ সম্বন্ধে একটি প্রচলিত মতবাদ এই যে, ইহা আদৌ বাংলা বা প্রাকৃতে রচিত হইয়া পরে সংস্কৃতে অনুবাদিত হইয়াছিল। এই মত আক্ষরিকভাবে সত্য না হইলেও ইহার মধ্যে নিগূঢ়তর ভাব-সত্য নিহিত আছে। এই কল্পনা অন্ততঃ প্রাদেশিক ভাষার সহিত ইহার আত্মীয়তার ইঙ্গিত বহন করে। রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা জয়দেবের কাব্যে আধ্যাত্ম সত্যের মহিমা স্বেচ্ছায় বিসর্জ্জন দিয়া বিগলিত ভাব-মাধুর্য্যের রূপসত্বায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। যে বৈষ্ণবের দেবতা ঐশ্বর্য্য পরিহার পূর্ব্বক পারিবারিক জীবনের স্নেহপাশে, দাম্পত্য প্রেমের মধুর আত্মবিস্মৃত একাত্মায় বন্দী হইয়াছেন, তাঁহারই প্রথম সূচনা পাই জয়দেবের কাব্যে। সংস্কৃতের অটল, দৃঢ়বদ্ধ গাম্ভীর্য্য হইতে দ্রবীভূত মাধুর্য-রঙ্গিমায় রূপান্তরিত ভাষাই এই ভাবগত পরিবর্ত্তনের সার্থক প্রতিবিম্ব। যে দেবতা ভাগবত ও পুরাণের তত্ত্বপ্রধান ভক্তিকুণ্ঠিত আলোচনার মধ্যে সুদূর, অনধিগম্য সম্ভ্রমে বিবিক্ত ছিলেন, যাঁহার প্রতি মানবিক স্নেহ প্রেমের স্ফুরণ ও দেব ভাষার নির্লিপ্ত শীতলতার স্পর্শে জমিয়া তুষারের মত স্বচ্ছ কঠিন হইয়াছে, জয়দেবের কাব্যে তিনিই সোহাগে গলিয়া, মান-বিরহ-আকুতির তরঙ্গলীলায় আন্দোলিত হইয়া আমাদের হৃদয়ের অতি নিকটে আসিয়া পড়িয়াছেন; জয়দেবের ভাষার ইন্দ্রজালই এই দূরত্বের নৈকট্য বিধানে সহায়তা করিয়াছে। শ্রীচৈতন্যদেব জয়দেবের কবিতায় ঐশী প্রেমলীলার এই অভিনব মাধুর্য্যের রসাস্বাদন করিয়াছেন ও ইহাকে নব ধর্ম্ম সংহিতায় মর্য্যাদা দান করিয়াছেন। স্বয়ং শ্রীচৈতন্যের অন্তঃকৃষ্ণ, বহির্গৌররূপ দ্বৈতমূর্ত্তির ন্যায় গীতগোবিন্দেরও দ্বৈতমূর্ত্তি তাহার বৈশিষ্ট্য-দ্যোতক; বাহিরে সংস্কৃতের কাঠিন্য, অন্তরে বাঙ্গালীর সুকুমার কোমলতা ইহার মধ্যে এক অপরূপ সমন্বয়ে সংসক্ত হইয়াছে।

দুই

এই যুগ সৃষ্টিকারী কাব্যের আদর যে কোন কালেই কমে নাই তাহা ইহার টীকাকারদের প্রাচুর্য্য, ইহার পরম্পরাগত ব্যাখ্যার অবিচ্ছিন্ন ধারার দ্বারাই নিঃসন্দেহ ভাবে প্রমাণিত। সম্প্রতি বাংলার প্রথিতনামা বৈষ্ণব-সাহিত্যবিদ পণ্ডিত শ্রীহরেকৃষ্ণ সাহিত্যরত্ন বাংলা সরকারের অর্থানুকূল্যে ইহার একটি উপাদেয় সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছেন। এই সংস্করণের সুদীর্ঘ, পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভূমিকা বৈষ্ণব সাহিত্য, দর্শন ও ঐতিহ্য সম্বন্ধে বিবিধ মহামূল্য তথ্যের খনিস্বরূপ। সুদূর বৈদিক ও উপনিষদ যুগে বৈষ্ণবধর্ম্মের পূর্ব্বাভাস, ভারতের নানাস্থানে আবিষ্কৃত শিলালিপি, প্রস্তরমূর্ত্তি ও গ্রন্থাদিতে রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ উল্লেখ,ভাগবতে অনুল্লিখিত নাম্নী রাধার সাহিত্যে আবির্ভাব, ক্রমিক প্রসার ও তাহার প্রতি গভীর ভাবময় অধ্যাত্ম তাৎপর্য্যের আরোপ, কবি-সাময়িকী, জনশ্রুতি-তথ্যে মেশান, ভক্ত-কল্পনা রচিত কবি জীবনী—এই সমস্ত জ্ঞানগর্ভ তথ্যালোচনা একত্র সংগৃহীত হইয়া জয়দেবের কাব্য পরিবেশের উপর উজ্জ্বল আলোকপাত করিয়াছে ও কাব্যরসাস্বাদনের নূতন উপাদান ও দৃষ্টিভঙ্গীর সহিত পাঠককে পরিচিত করিয়াছে। বৈষ্ণব দার্শনিক তত্ত্বের সহিত গীতগোবিন্দের সম্পর্ক, একদিকে ভাগবত, অন্যদিকে পরবর্ত্তী বাঙ্গালা সাহিত্যের সহিত ইহার তুলনামূলক বিচার ইতিহাসে গীতগোবিন্দের স্থান নির্ণয়ের পক্ষে অত্যন্ত উপযোগী হইয়াছে। সাহিত্যরত্ন মহাশয় ভূমিকাতে পূজারী গোস্বামীর যে টীকা উদ্ধার করিয়াছেন তাহাতে জয়দেবের প্রাচীন প্রচলিত ব্যাখ্যার বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানলাভের যথেষ্ট সুযোগ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত গীতগোবিন্দের সর্গবন্ধ, রাগ-তাল প্রকরণ ও পাঠভেদ সম্বন্ধে নানা মৌলিক, কৌতূহলোদ্দীপক মন্তব্য সন্নিবিষ্ট হইয়া ভূমিকার মূল্য বৃদ্ধি করিয়াছে। সদুক্তিকর্ণামৃত হইতে উদ্ধৃত জয়দেবের শ্লোকাবলী ও পুরীধামে প্রাপ্ত দ্বিতীয় জয়দেব কবির বৈষ্ণবামৃত বা পীযূষলহরীর সন্নিবেশ জয়দেবের কবি-প্রতিভার স্বরূপ নির্দ্ধারণে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে ও তাঁহার সম্বন্ধে আমাদের প্রচলিত সংস্কারের অনেকটা পরিবর্ত্তন ঘটাইয়াছে। সাহিত্যরত্ন মহাশয় একাধারে বৈষ্ণবদর্শনে সুপণ্ডিত ও কাব্যরসগ্রাহিতায় তীক্ষ্ণ রসবোধ ও বিচারবুদ্ধির অধিকারী; এবং এই উভয় গুণের সংমিশ্রণ তাঁহার ভূমিকার জন্য আমাদের সমালোচনা সাহিত্যের ইতিহাসে একটি সম্মানজনক আসন নির্দ্দেশ করিয়াছে। তাঁহার প্রদর্শিত আলোকে গীতগোবিন্দ পাঠ করিয়া পাঠক ইহার মধ্যে নূতন অর্থ-দ্যোতনা, ভক্তি ও প্রেমরসের সার্থক স্ফুরণের নিদর্শন আবিষ্কার করিয়া মুগ্ধ হইবেন, তাহাতে সংশয় নাই। আমি তাঁহার ভূমিকানিহিত সূত্র অনুসরণ করিয়াই জয়দেবের কাব্যের কিছু আলোচনার চেষ্টা করিব।

সমগ্র সংস্কৃত সাহিত্যকে ঐতিহ্যের মানদণ্ডে বিচার করিলে উহাকে একটি পারম্পর্য্যসূত্রে গ্রথিত পুষ্পমাল্যের সহিত উপমিত করা যাইতে পারে। বিভিন্ন কবি হয়ত নূতন ফুল আহরণ করিয়া থাকিবেন, কিন্তু নব-আহরিত ফুলগুলি প্রাচীন সূত্রেই গ্রথিত হইয়াছে—এবং কবি ও পাঠক সম্প্রদায়ের বিচারে ফুল হইতে সূত্রের মূল্যই অধিক। কবির ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য স্ফুরণের পূর্ব্বে কাব্য রচনা গোষ্ঠীমনোভাব-শাসিত ছিল। যে কোন নূতন কবি আবির্ভূত হইতেন, তাঁহার মৌলিকতা অপেক্ষা তাঁহার প্রথানুবর্ত্তন কুশলতা, অলঙ্কার নির্দ্দিষ্ট রীতির সার্থক অনুসৃতিই অধিক আদরণীয় হইত। কাজেই এই পূর্ব্ব ইতিহাসকে অস্বীকার করিয়া শুধু স্বাধীন রসবোধের আদর্শে কোন প্রাচীন কবির বিচার তাঁহার যথার্থ মূল্য নির্দ্ধারণের সহায়ক না হইয়া পরিপন্থীই হইত। বঙ্কিমচন্দ্র এই ঐতিহ্যের কথা চিন্তা করেন নাই বলিয়াই জয়দেবের কাব্যকে মদন-মহোৎসব আখ্যায় অভিহিত করিয়াছিলেন। আধুনিক রুচি ও সৌন্দর্য্যবোধ অনুযায়ী এইরূপ সংজ্ঞাই যথার্থ বিবেচিত হইবে। কিন্তু কবি ও পাঠকের উদ্দেশ্যের মর্য্যাদা এইরূপ ব্যাখ্যায় রক্ষিত হইবে না। বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং ঈশ্বরগুপ্তের অশ্লীলতা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা যে জয়দেব সম্বন্ধে আরও সার্থকভাবে প্রযোজ্য তাহা তিনি বিস্মৃত হইয়াছিলেন। যে মুহূর্ত্তে ভাগবতকার রাসলীলার মাধ্যমে অধ্যাত্ম সাধনার উন্নততম উৎকর্ষ ব্যঞ্জিত করিয়াছেন, সেই মুহূর্ত্তেই শৃঙ্গার

রসের সহিত ভক্তিরসের অবিচ্ছেদ্য, চিরন্তন সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, কামকলাকুতূহল ভগবল্লীলার রসাবিষ্ট অনুধ্যানের শ্রেষ্ঠ উপায়ের মর্য্যাদা লাভ করিয়াছে। সেইদিন হইতেই দেহসম্ভোগের অনাবৃত বর্ণনা, কেলি বিলাসের অসংবৃত উচ্ছ্বাস কলঙ্কমুক্ত হইয়া ভক্ত ও রসিক হৃদয়ে অবাধ প্রবেশাধিকার পাইয়াছে। উহার ভাবের বিশুদ্ধি উহার বস্তুগত অসংযমের উপর জয়ী হইয়াছে; রতি প্রসাধনের ভিতর দিয়া আরতির ধূপ-সৌরভ উত্থিত হইয়া আকাশকে সুরভি-সমাকুল করিয়াছে। সুতরাং জয়দেবের কাব্যে ও উহার অনুসরণে বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যে রূপমুগ্ধতার আতিশয্য দেখিয়া কাহারও কোন সঙ্কোচ অনুভবের প্রয়োজন নাই—রূপের ভিতর দিয়াই অরূপের স্পর্শ বৈষ্ণব সাধনার সর্ব্বজন স্বীকৃত, ভক্ত-দৃষ্টান্ত-সমর্থিত পন্থারূপে গৃহীত হইয়াছে। জয়দেব যখন তাঁহার কাব্য-প্রারম্ভে হরি স্মরণে চিত্ত-সরসতা ও বিলাসকলাকুতূহলকে সমপর্য্যায়ভুক্তরূপে উল্লেখ করিয়াছেন, তখন টীকাকারের পক্ষে বিলাসকলাকে কেবল হরিলীলা বিষয়ে সীমাবদ্ধ করিয়া উহার ভাব-বিশুদ্ধি রক্ষার চেষ্টাকৃত প্রয়াস অপ্রয়োজনীয় ত বটেই, সমগ্র বৈষ্ণব রসতত্ত্বের বিরোধী বলিয়াই মনে হয়। চিত্তের সৌন্দর্য্য-প্রবণতা যখন মধুর রস ভজনার অপরিহার্য্য প্রস্তুতি, তখন ইহাকে জোর করিয়া ধর্ম্মতত্ত্বমাত্রাত্মক না করিলেও ক্ষতি নাই।

এ বিষয়ে দুইটি প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ অধ্যাত্ম সাধনায় রূপমুগ্ধতা ভারতীয় জীবনে এরূপ প্রাধান্য লাভ করিল কেন? দ্বিতীয়তঃ এই রূপানুরাগ কি সর্ব্বত্র ইন্দ্রিয়বিলাসমুক্ত ভাবতন্ময়তা, উপায় কি কখনই উদ্দেশ্যকে অতিক্রম করিয়া যায় নাই? যাত্রাপথের রমণীয়তা, দেহ-সৌন্দর্য্যের আকর্ষণ কি কবি-সাধককে তাঁহার চরম লক্ষ্য হইতে, রূপাতীতকে লাভ করিবার একান্ত আগ্রহ হইতে কখনও কখনও ভ্রষ্ট করে নাই? মদন মহোৎসব বর্ণনার উচ্ছ্বসিত আতিশয্যের মধ্যে এই শাশ্বত দিব্য অনুভূতি, পারমার্থিক তত্ত্বচেতনা কি মাঝে মধ্যে ক্ষণিক বিস্মৃতির যবনিকান্তরালে অন্তর্হিত হয় নাই? ভোগের মাঝে বৈরাগ্যের, রতির মাঝে আরতির সুর কি সর্ব্বদা অবিসংবাদিতভাবে ধ্বনিত হইয়াছে? পার্থিব সৌন্দর্য্যের নিবিড় মায়া, মানবিক প্রেমের অসংবরণীয় রসবিহ্বলতা কি ইহাদের সূক্ষ্মতর ঐশী অনুরণনকে ছাপাইয়া উঠিয়া আত্ম-ঘোষণা করে নাই! জয়দেবের কাব্য, তথা সমগ্র পদাবলী সাহিত্য সম্বন্ধে এবংবিধ জিজ্ঞাসার অবসর আছে।

প্রথম প্রশ্ন সম্বন্ধে এই উত্তর দেওয়া চলে যে, প্রত্যেক জাতিরই ধর্ম্ম সাধনার একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে, যাহা ইহার জাতীয় জীবনের বিশেষ প্রবণতার উপর নির্ভরশীল। যে জাতির মধ্যে সৌন্দর্য্যপিপাসা ও পরমার্থতত্ত্ব জিজ্ঞাসা সমভাবে প্রবল, তাহার চিন্তাভিব্যক্তির মধ্যে এই দুই বৃত্তির নিবিড় পারস্পরিক সংযোগ নিতান্ত স্বাভাবিক। জীবনে অধ্যাত্ম আকুতি যত তীব্র, যত সর্ব্বাতিশায়ী হইবে ততই ইহা মানবের শ্রেষ্ঠতম অনুভূতি, তাহার প্রেমের মুগ্ধ ভাবাতিশয্যের সমীপবর্ত্তী হইবে; উহারই অর্দ্ধস্ফুট, ভাবরুদ্ধ বাণী, উহারই অপরিমেয় অতৃপ্তি, উহারই কামনার রক্তিম বর্ণাঢ্যতা অনিবার্য্যভাবে এই শ্রেয়ো-সন্ধানের অঙ্গীভূত হইবে। বাইবেলের কোন কোন প্রাচীন অংশে নর-নারীর প্রেমের আবেগবিহ্বলতা ভগবানের প্রতি নিবেদিত হইয়াছে। ভারতে যতদিন ভগবদারাধনা কর্ম্মানুষ্ঠান ও জ্ঞানানুশীলনের পথ অবলম্বন করিয়াছিল, ততদিন ইহার মধ্যে মধুর রসের খুব বেশী প্রভাব ছিল না। কিন্তু যখন হইতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে কেন্দ্র করিয়া মানবিক সুকুমার বৃত্তিসমূহ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল, ভক্তিপ্রেম বাৎসল্যমনন প্রধান ব্রহ্মানুভূতির শৈলদেহে ভাব-মন্দাকিনীর প্রস্রবন ছুটাইল, ধ্যানের আত্মসমাহিত নির্জ্জনতার মধ্যে ব্যাকুল হৃদয়াবেগের বিচিত্র গীতিমূর্চ্ছনা এক অপরূপ সুরলোকের সৃষ্টি করিল, তখন হইতে আমাদের সাধনা পদ্ধতিতে এক বিস্ময়কর, বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইল। ভাবোন্মত্ত কল্পনা, হৃদয়ের গহন গভীরতা হইতে উর্দ্ধোৎক্ষিপ্ত উচ্ছ্বাস, দেহের প্রতি রক্তবিন্দু, মনের প্রতি অনুভূতি-কণিকার মধ্যে পরিব্যাপ্ত উদগ্র আকাঙ্ক্ষা শত ব্যগ্র বাহু বিস্তার করিয়া অপ্রাপণীয়ের দিকে ধাবিত হইল। মানবাত্মার এই অভিযানের পুরোভাগে দাঁড়াইয়া কবি জয়দেব ইহার মধ্যে প্রথম গতিবেগ সঞ্চারিত করিলেন। ভাগবতে যে

অভীপ্সা আভাসে-ইঙ্গিতে অর্দ্ধপ্রচ্ছন্ন ছিল, জয়দেবে তাহাই পূর্ণ, অনাবৃত অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে।

এই কামনার রূপকে অর্দ্ধাবৃত অধ্যাত্ম অভীপ্সার প্রকৃত উৎস শ্রীকৃষ্ণ পরিকল্পনার লোকোত্তর চরিত্র মহিমা ও মাধুর্য্য। জগতের অন্য কোন ধর্ম্মে, এমন কি হিন্দু ধর্ম্মের অন্যান্য অবতারের মধ্যেই শ্রীকৃষ্ণের মত এরূপ অপরূপ আকর্ষণ শক্তি-মণ্ডিত, বিচিত্র ব্যক্তিত্বের অনুরূপ কিছু মিলে না। অবশ্য অবতারবাদের মধ্যে ভগবানে মানবিক গুণের আরোপ ও মানবিক বৃত্তির ভিতর দিয়া তাঁহার সাধনা রহস্য নিহিত আছে। কিন্তু অন্যান্য অবতার সম্বন্ধে তাঁহাদের সহিত মানবিক সম্বন্ধ স্থাপন খুব বড় হইয়া দেখা দেয় নাই। শ্রীকৃষ্ণের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী অবতার রামচন্দ্র পিতৃভক্ত পুত্র ও আদর্শ স্বামী, ভ্রাতা ও প্রজা-রঞ্জক শাসকরূপে প্রতিভাত হইয়াছেন, কিন্তু মোটামুটি এই শ্রেণীগত পরিচয়ই তাঁহার ব্যক্তিসত্বাকে আচ্ছন্ন করিয়াছে। পারিবারিক ও রাজনীতি বিষয়ক ব্যাপারের বাহিরে তিনি যে সমস্ত মানবিক সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়াছেন, তাহাতে তাঁহার উদারতা ও আশ্রিত বাৎসল্যের নিদর্শন মিলে, কিন্তু তাঁহার হৃদয়াবেগের স্ফুরণ খুব উজ্জ্বল হইয়া উঠে না। তিনি গুহক চণ্ডাল,বানর সুগ্রীব ও রাক্ষস বিভীষণের সঙ্গে মিত্রতা-সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছেন,কিন্তু এই সম্বন্ধগুলির মধ্যে সখ্যরসের বিশেষ কোন উচ্ছ্বাস দেখা যায় না। এই সৌহার্দ্দ বন্ধন মুখ্যত রাজনৈতিক ও সামাজিক উদারতা প্রসূত, কিন্তু ইহা যে হৃদয়ের গভীর উৎস হইতে উদ্ভূত বা সহজ প্রীতির মাধুর্য্যে অভিসিক্ত এরূপ ধারনা আমাদের হয় না। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের বেলা দেবের মধ্যে মানবিকতার এক সম্পূর্ণ অভিনব বিকাশ ঘটিয়াছে। দশরথ রামচন্দ্রের শোকে প্রাণ-বিসর্জন করিয়াছেন, কৌশল্যা তাঁহার নির্ব্বাসনে যথেষ্ট খেদ করিয়াছেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকে ঘিরিয়া নন্দ-যশোদার যে অজস্র বাৎসল্যরস শতধারায় উচ্ছ্বসিত হইয়াছে, যে অন্ধ স্নেহাতিশয্য অতি তুচ্ছ আশংকায় উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছে, রামচন্দ্রের ক্ষেত্রে অপত্য স্নেহের সেই অহেতুক ব্যাকুলতা, সেই আত্মভোলা মোহ আমাদের হৃদয়কে স্পর্শ করে না। এ যেন ভালবাসার বাঁধাধরা বরাদ্দ, ঔচিত্যবোধ-নিয়ন্ত্রিত অভিব্যক্তি। রামচন্দ্র তাঁহার বিনয়-নম্রতা, তাঁহার আত্মবিস্মৃত দীনতা, আদর্শনিষ্ঠা ও উদাত্ত চরিত্র-গৌরবের জন্য আমাদের ভক্তি শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেন, কিন্তু তাঁহার আভিজাত্য কোন দিনই সাধারণ মানবের সমতল ভূমিতে নামিয়া আসে নাই। কৃষ্ণ একেবারে আমাদের ঘরের ছেলে; তাঁহার দুরন্তপনা, শৈশবচাপল্য তাঁহাকে আমাদের অন্তরের স্নেহ-প্রেমের রাজ্যে অসপত্ন অধিকারে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। তাঁহার বাঁশীর সুরে বৃন্দাবনের তরু-লতা, পশুপক্ষী, গোপবধূর চিত্ত ও রাধিকার উদ্‌ভ্রান্ত প্রণয়াবেগের সহিত আমরাও একান্তভাবে আত্মসমর্পণ করিয়াছি। তিনি নিজে মধুর রসের মূর্ত্ত বিগ্রহ বলিয়া ভক্তের চিত্তে মধুর রসেরই উদ্বোধন করিয়াছেন। তাঁহার মধুর মুরলী-ধ্বনিতে যেমন শীলা দ্রবীভূত হইয়াছে, যমুনা উজান বহিয়াছে, তেমনি জয়দেবের গীতগোবিন্দেও সংস্কৃত কাব্যের চিরাচরিত রীতির বৈপরিত্য সাধিত হইয়াছে, তাহার শ্বেতমর্মর রচিত মসৃণতার বক্ষ ভেদ করিয়া দুরন্ত ভাব-নির্ঝরিনী চটুল নৃত্যচ্ছন্দে আপনাকে উন্মুক্ত করিয়াছে। ভগবানকে মধুর রসে উপাসনা করিতে হইলে যে সৌন্দর্যময় প্রতিবেশ, যে ভাবাকুলতা, হৃদয়ের মধ্যে যে বিপুল উদ্বেলিত আনন্দোচ্ছ্বাসের প্রয়োজন, গীত-গোবিন্দ সেই প্রয়োজনেরই প্রথম সার্থক বাণীরূপ।

শৃঙ্গাররসের সহিত ভক্তিরসের সম্বন্ধ সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে, কাব্য সাহিত্যে শৃঙ্গার রসের বান ডাকিয়া গেল। সংস্কৃত কাব্যের চিরন্তন সৌন্দর্যপ্রবণতা অধ্যাত্ম ব্যঞ্জনার সমর্থন পাইয়া ভক্তিরসে শোধিত হইয়া আরও নিঃসংকোচে নিজ মায়াজাল বিস্তার করিল। এই সঙ্গম-তীর্থে ভোগরসিক ও ভক্তিরসিক উভয়েই আসিয়া সম্মিলিত হইয়াছে। কামকলার মাধ্যমে ভগবৎ-ভজনার একটি বিশেষ সার্থকতা আছে। কাম মানবের আদিমতম ও প্রবলতম রিপু, এই প্রবৃত্তির দুর্নিবার রমনীয়তাকে যদি ভগবদমুখী করা যায়, তবে সাধনা-পথের প্রধান বিঘ্নকে সিদ্ধির প্রধান সহায়ে রূপান্তরিত করা সম্ভব। মানবচিত্তের প্রবলতম প্রেরণা, তাহার জীবনীশক্তির কেন্দ্রীয় উৎস যদি উর্দ্ধায়িত হয়, তবে তাহার মোক্ষ পথে অগ্রগতি যে বেগবান ও অপ্রতিরুদ্ধ হইবে, তাহা সহজেই

বোঝা যায়। বৈষ্ণব দর্শন ও পদাবলী সাহিত্যে সাধনার এই রূপটিই অনুপম মাধুর্য ও গভীরতম অনুভূতির সহিত চিত্রিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ যেমন বিষধর কালীয়নাগের সহস্র ফণার উপর দাঁড়াইয়া নিজ নৃত্যচপল চরণপাতে এই ফণাগুলি চূর্ণবিচূর্ণ করিয়াছিলেন, তেমনি বৈষ্ণব কবি কামনানাগিনীর বিষদন্ত উৎপাটন করিয়া ইহাকে সাধনার কিঙ্করীতে পরিণত করিয়াছেন। বিষ যদি অমৃত হয়, বাধা যদি সহায়ক হয়, তবে চরম সিদ্ধি সাধকের করতলগত হইতে বিলম্ব হয় না। জয়দেবের কাব্যে বৈষ্ণব সাধনার এই প্রথম সূচনা তাঁহার অতি-পল্লবিত সৌন্দর্য বর্ণনার ফাঁকে ফাঁকে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

তিন

জয়দেব বৈষ্ণব সাধনার উৎস, ইহা সর্বস্বীকৃত। তথাপি তাঁহার কাব্যে যে ইহার চরমোৎকর্ষ,ইহার অবিমিশ্র বিশুদ্ধ রূপটি প্রতিবিম্বিত হইয়াছে, এরূপ দাবী ভক্তজন সমর্থিত হইলেও সমালোচকের সম্পূর্ণ অনুমোদন লাভ করিবে না। গীতগোবিন্দে ভগবানের ঐশ্বর্যরূপ যথেষ্ট প্রাধান্ত লাভ করিয়াছে—তাঁহার মাধুর্য যেন এই চোখ ধাঁধানো ঐশ্বর্যের অন্তরাল হইতে ঈষৎ উঁকি দিতেছে। ঐশ্বর্য-দীপ্তি বিচ্ছুরিত ভাবমণ্ডলে মাধুর্যের স্নিগ্ধ কমনীয়তা যেন কতকটা সসঙ্কোচে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। রাধা-কৃষ্ণের প্রেমবিহ্বল অবস্থার বর্ণনার মধ্যেও শ্রীকৃষ্ণের মহিমাদ্যোতক অলৌকিক শক্তির বারবার উল্লেখ করা হইয়াছে—তাঁহার 'কংসারি', 'কেশীমথন' প্রভৃতি আখ্যার মধ্যেই তাঁহার শক্তিমত্তা সম্বন্ধে সচেতনতা পরিস্ফুট হইয়াছে। জয়দেব যখন রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলার আখ্যায়িকা গ্রহণ করিয়াছেন, তখন কৃষ্ণের ঐশ্বর্য দ্রবীভূত মাধুর্য-ধারায় সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় নাই, উহার মাধুর্যে রূপান্তর সাধন কেবল আরম্ভ হইয়াছে মাত্র। সম্পাদক মহাশয় যথার্থই মন্তব্য করিয়াছেন যে, জয়দেবের 'দেহিপদপল্লবমুদারং' এই অর্দ্ধপংক্তি সংযোজনার সঙ্কোচ সম্বন্ধে যে কিংবদন্তী প্রচলিত আছে তাহাই তাঁহার ঐশ্বর্য-মাধুর্যের মধ্যে দোলায়িত, দ্বিধাগ্রস্ত চিত্তবৃত্তির নিদর্শন ও প্রতীক। শেষে ভগবান স্বয়ং আসিয়া ভক্তের হাত হইতে লেখনী কাড়িয়া লইয়া তাঁহার দ্বন্দ্ব সঙ্কোচের অবসান ঘটাইলেন, নিজ কিরীটরশ্মিমণ্ডিত মস্তক শ্রীরাধার পদারবিন্দে লুটাইয়া আপনার রাজ সম্মান চিরতরে বিসর্জন দিলেন। সমস্ত পরবর্তী বৈষ্ণব কবিতা এই 'দেহি পদপল্লবং'-এর সুরে বাঁধা। শুধু জয়দেব নয়, বিদ্যাপতি ও বড়ু চণ্ডীদাসের কাব্যেও বৈষ্ণব ভাবাদর্শের চরমোৎকর্ষ স্ফুরিত হয় নাই। বড়ু চণ্ডীদাসের গ্রন্থের শেষ পর্যায়ে রাধার বিরহব্যাকুল আত্মনিবেদনের মধ্যে প্রেমের সর্বত্যাগী মহিমার সুরটি প্রথম বাজিয়া । বিদ্যাপতিতে নানা নিম্ন পর্যায়ের ভাবের মধ্যে স্থানে স্থানে বৈষ্ণব সাধনার অপ্রাকৃত ভাব-মাধুর্য আমাদের মনে অসীম ব্যঞ্জনার রেশটি জাগাইয়া তোলে। প্রাক্-চৈতন্য যুগে বৈষ্ণব সাধনার পূর্ণ আদর্শটি যে কবি-চিত্তকে অধিকার করে নাই, ইহা ঐতিহাসিক ক্রমবিবর্ত্তনের দিক দিয়া সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। যাঁহারা চৈতন্য-চন্দ্রের অপরূপ স্নিগ্ধ প্রেম কৌমুদী প্লাবিত, দিব্যোন্মাদে আত্মহারা জীবনলীলা প্রত্যক্ষ করেন নাই, তাঁহাদের নিকট রাধাকৃষ্ণ-প্রেমের মর্মগত তাৎপর্য্য, ইহার মাধুরীর পূর্ণ অনুভূতি উদ্‌ঘাটিত হওয়া সম্ভব ছিল না। যে ভোগলালসা, সৌন্দর্যমোহ এই প্রেমের স্থূল দেহের বহিরাবরণ রচনা করিয়াছিল, শ্রীচৈতন্যের মুগ্ধ দৃষ্টি, তাঁহার ভাবস্বচ্ছ অনুভূতি সেই আবরণ ভেদ করিয়া তাহার মর্ম্মকোষসগ্ন বিশুদ্ধ রূপটি তাহার অন্তরশায়ী অপ্রাকৃত সৌরভটি প্রত্যক্ষ করিয়াছিল, দেহের অন্তর্লীন আত্মাকে রূপ-রসের বন্ধনে বন্দী করিয়া ভক্তের গোচরীভূত করিয়াছিল। জয়দেব ও চৈতন্য পূর্ব্ববর্ত্তী কবিদের মধ্যে এই দেহ ও আত্মার দ্বন্দ্বের পরিপূর্ণ নিরসন হয় নাই।

জয়দেবের প্রাচীন টীকাকার গোষ্ঠী ও তাঁহাদের অনুসরণে সাহিত্যরত্ন মহাশয় জয়দেবকে পদাবলী সাহিত্যের উৎস বলিয়া স্বীকার করিয়া তাঁহার কাব্য-বিচারে পরবর্ত্তী যুগের বৈষ্ণবভাবাদর্শের পূর্ণ পরিণত রূপটিকেই মানদণ্ডরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার কাব্যের প্রতিটি উক্তির প্রতি ভাবোচ্ছ্বাসকে তাঁহারা বৈষ্ণবদার্শনিক সিদ্ধান্তের পরিপোষকরূপে বুঝাইতে চেষ্টা

করিয়াছেন। এই মনোভাব ভক্তের পক্ষে স্বাভাবিক হইলেও ইতিহাসের ক্রমপর্য্যায়রীতির বিরোধী। শ্রীমন্ কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দের মধ্যে বৈষ্ণবতত্ত্ব আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের নিকট শ্রীরাধার সর্ব্বাতিশায়ী শ্রেষ্ঠত্বের যে প্রমাণ ভাগবতে অনুল্লিখিত আছে, তাহা গীতগোবিন্দের একটি শ্লোকের মধ্যে আবিষ্কার করিয়া বৈষ্ণব শাস্ত্র মধ্যে গীতগোবিন্দকে শ্রেষ্ঠতম প্রামাণ্য গ্রন্থের মর্য্যাদা দিয়াছেন। রাধাতত্ত্ব প্রতিপাদনে গীত-গোবিন্দের যে অবদান তাহাই উহাকে চৈতন্যোত্তর যুগে রচিত ভক্তিশাস্ত্রসমূহের পুরোভাগে স্থান দিয়াছে। কিন্তু উভয়ের মধ্যে উদ্দেশ্য ও সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গীর সাম্যসত্ত্বেও ভক্ত-সাধকের দিব্যানুভূতির নিকট যে ভবিষ্যৎ তত্ত্বরহস্য সহজ সংস্কার রূপে প্রতিভাত হয়, ইহা মানিয়া লইলেও, জয়দেব যে যুগপ্রভাব সম্পূর্ণ অতিক্রম করিয়া প্রায় চারি শতাব্দী পরবর্ত্তী লেখকগোষ্ঠীর সহিত একাত্ম হইয়া গিয়াছিলেন, এরূপ ধারণা অনৈতিহাসিক। অবশ্য স্থানে স্থানে কেলিবিলাস বর্ণনার আতিশয্যের মধ্যে গভীর ভাব-দ্যোতনা, অসীমের স্পর্শাভিলাষী চিত্তের একাগ্র আকুতি অনুভব করা যায়। চরিতামৃতকার যে শ্লোকের প্রশস্তি রচনা করিয়াছেন—

> কংসারিরপি সংসারবাসনাবদ্ধ শৃঙ্খলাম্
> রাধা মাধায় হৃদয়ে তত্যাজ ব্রজসুন্দরীঃ।
>
> গীতগোবিন্দ ৩।২

তাহার মধ্যে শঙ্খমধ্যে সমুদ্র স্বননের ক্ষীণ আভাষের মত একটা অনন্তাভিমুখী সংকল্পের দৃঢ়তা, একটা গভীর তাৎপর্য্যপূর্ণ সিদ্ধান্তের অনুরণন বাজিয়া উঠে। "মধুরিপুরহ-মিতি ভাবনশীলা" প্রভৃতি মন্তব্যের মধ্যে চৈতন্যোত্তর যুগের ভাবতন্ময়তা, ধ্যানসমাহিত চিত্তের মধুর আত্ম-বিস্মৃতি আমাদের চিত্তে আকস্মিক দোলা দিয়া যায়। কিন্তু এই সমস্ত দৃষ্টান্ত ব্যতিক্রম। কবিরাজ গোস্বামী রাধার রূপমাধুরী, দেহ প্রসাধন, এমন কি খট্টা পর্য্যঙ্ক প্রভৃতি গৃহসজ্জার উপকরণের যে আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিয়াছেন, জয়দেব তাহাতে সম্পূর্ণ সায় দিতেন কি না সন্দেহ। গীতগোবিন্দের প্রথম শ্লোকের ব্যাখ্যায় 'নন্দনিদেশতঃ' শব্দটার অর্থকে বৈষ্ণবসিদ্ধান্তানুমোদিত ও সমাজ প্রচলিত ঔচিত্যবোধের অনুসারী করিতে টীকাকারগণ কষ্টকল্পনার আশ্রয় লইয়াছেন, তাহা 'সদুক্তিকর্ণামৃত' হইতে উদ্ধৃত সমসাময়িক কবিরচিত অনুরূপ শ্লোকের প্রমাণ হইতে ব্যর্থপ্রতিপন্ন হইয়াছে। রাজসভায় চটুল আমোদপূর্ণ প্রতিবেশে যুগের বিকৃত সৌন্দর্য্যরুচির তৃপ্তির প্রয়োজনে ও সুপ্রাচীন আদিরসপ্রধান কাব্যধারার ঐতিহ্যানুবর্ত্তনে রচিত কাব্যের মধ্যে ভক্তহৃদয়ের সদ্যোজাগ্রত আকুতি, নবধর্ম্ম সাধনার প্রথম বিদ্যুৎস্ফুরণবৎ ইঙ্গিত যতটুকু অনুপ্রবিষ্ট করা যায়, জয়দেব তাহাই করিয়াছেন। গীত-গোবিন্দ রচনার সময় তিনি যে উজ্জ্বল নীলমণি ও ভক্তি-রসামৃতসিন্ধুর নিষিদ্ধ নির্দ্দেশের কথা চিন্তা করেন নাই তাহা নিরাপদে ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। জয়দেবের সম্বন্ধে প্রবাদ আছে যে, তাঁহার সাধনাবলে সুদূর ভাগী-রথির পুণ্যপ্রবাহ উজান বহিয়া কেন্দুবিল্ব প্রান্তবাহী অজয়ের জলস্রোতে মিশিয়া যাইত ও সাধক-প্রবর সেই পবিত্র সঙ্গমতীর্থে স্নান তর্পণ ইষ্টপূজা সমাপ্ত করিতেন। এই কিংবদন্তী তাঁহার সাধক জীবন হইতে কাব্যজীবনেও সংক্রামিত হইয়াছে। চৈতন্য প্রবর্ত্তিত প্রেমধর্ম্ম যে কালের স্বাভাবিক গতির বিপরীত মুখে প্রবাহিত হইয়া দ্বাদশ শতকের কাব্যধারার সহিত মিশিয়া গিয়াছে, পরবর্ত্তীযুগের ভাবস্রোত যে উজান বহিয়া অতীতের দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছে, এই অলৌকিক প্রক্রিয়া ভক্তের দ্বিধাহীন বিশ্বাসের নিকট গ্রহণীয় হইতে পারে, কিন্তু ঐতিহাসিক ক্রমপরিণতির মানদণ্ডে ইহা ঠিক বিচারসহ নহে। জয়দেবের বৈষ্ণব কাব্যরীতির আদিম উৎস ইহা অবিসংবাদিত সত্য, কিন্তু এই ক্রমবিস্তারশীল স্রোতোধারার সমগ্র ভবিষ্যৎ ইতিহাস ইহাদের মধ্যে প্রতিবিম্বিত দেখিবার আশাকে ঠিক সঙ্গত বলিয়া অভিহিত করা যায় না।

ধর্ম্মগ্রন্থ হিসাবে ইহার শ্রেষ্ঠতা ছাড়াও কেবল কাব্য হিসাবে ইহার সৌন্দর্য্যসৃষ্টি অনবদ্য ও ইহার রস-আবেদন চিরন্তন। ইহা বাঙ্গালী প্রতিভার মৌলিকতার বিশিষ্ট নিদর্শন। সংস্কৃত কাব্যের মত প্রথাবদ্ধ, ঐতিহ্যশাসিত সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য নূতনত্ব প্রবর্ত্তন করা অল্প কৃতিত্বের ব্যাপার নহে। সেই অনন্যসাধারণ

কৃতিত্বই জয়দেবের প্রাপ্য। সংস্কৃতের সুসংবত, সুগম্ভীর, মহিমান্বিত পদক্ষেপের মধ্যে তিনি অনাগত বাংলা সাহিত্যের নৃত্যছন্দ, ইহার প্রবল ভাবোচ্ছ্বাস, প্রেমানুভূতির বিপুল আত্মহারা ব্যাকুলতা, ইহার ভক্তিরসের আভাস ব্যঞ্জনাজড়িত উর্দ্ধায়ন প্রবর্ত্তন করিয়া কাব্যের ভাবপরিধি বর্দ্ধিত ও ইহার ভবিষ্যতের পথ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। জয়দেবের মধ্যে বীজাকারে যাহা নিহিত, চণ্ডীদাস বিদ্যাপতিতে তাহাই অঙ্কুরিত ও প্রেমধর্ম্মের অবতার শ্রীচৈতন্যে তাহা জীবন-ছন্দে হিল্লোলিত। জয়দেব-বৃক্ষের অন্তর্গূঢ় রসপান করিয়া তাহার ভাব বর্ষণের অবিরল ধারায় অভিস্নাত হইয়াই শ্রীচৈতন্যের দেহে মনে পুলক-কদম্ব শিহরিয়া উঠিয়াছিল। পদাবলী সাহিত্যে এই পুলক-শিহরণই পুষ্পকোরক মধ্যে সৌরভের ন্যায় কোমলকান্ত ভাষার আলিঙ্গন পাশে চিরকালের জন্য ধরা দিয়াছে। বাঙ্গালীর সমস্ত সংস্কৃতি ও সাধনা তাহার সাহিত্যে ও জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ জয়দেবের আদিম অনুপ্রেরণার নিকট ঋণী। তাঁহারই মাধ্যমে বাঙ্গালী তাহার হৃদয়াবেগের মাধুর্য্য, তাহার কল্পনার রমণীয়তা সমস্ত ভারতে প্রসারিত করিয়াছে। গীতগোবিন্দের আবেদন শাশ্বত, চিরন্তন, সাময়িক রুচি পরিবর্ত্তনের অতীত। এহেন যুগসৃষ্টিকারী গ্রন্থের উপাদেয় সম্পাদনার জন্য পণ্ডিত হরেকৃষ্ণ সমস্ত রসপিপাসু বাঙ্গালীর অভিনন্দনযোগ্য। জয়দেব হইতে যে বাঙ্গালীর মানস জন্মের আরম্ভ, ইহা উপলব্ধি করিলে আমাদের অতীত সংস্কৃতির উদ্ভব রহস্য আমাদের নিকট দিবালোকের ন্যায় স্বচ্ছ হইবে ও আমাদের ভবিষ্যৎ অগ্রগতির পথও সাময়িক উদ্‌ভ্রান্তির কুহেলিকাজাল হইতে মুক্ত হইয়া দিগন্ত প্রসারিতরূপে দেখা দিবে।

মিলনের শেষ—মিলনে

মন্মথনাথ কাব্যভারতী

পথহীন পথে পথ ক'রে ক'রে চলিতে দু'জনে গহনে—
নিদাঘের সাঁঝ আলুথালু ঝড়ে ভেঙে এল সারা গগনে।
দুর্য্যোগ ঢেউ ওঠে মেতে মেতে,
এস তা দু'জনে নিই বুক পেতে,
কেন মোরে ঘিরে সব একা সয়ে ডাকিছ মরণে যতনে?
নিজেরে কি আজ মোর তরে প্রিয়
বলি দিতে চেয়ে হায়—
বিরহের বলি করিবে কি মোরে
চিরকাল বেদনায়?
হেন বলিদান কে বলে মহান্
কাঁদাতে তা মোরে নয় কি পাষাণ?
মরিব বাঁচিব দু'জনে মিলিয়া যা কিছু আঘাত বরণে।
মিলনের যদি থাকে অবসান
বিরহ তা কেন পাবে রূপ প্রাণ,
মিলনের মাঝে মিলনের শেষ হোক্ না দোঁহার মরণে।

নূতন দিন

শক্তিপদ রাজগুরু

বাউরী পাড়ার মধ্যে একা সে রাত্রে জেগেছিল অমূল্যই, আর পুরুষ মানুষ বড় একটা কেউ ছিল না, যারাও বা ছিল তারাও নেশায় বেহুঁস হয়ে।

ময়লা একটা শতচ্ছিন্ন কাঁথায় পড়ে কাতরাচ্ছে কিশোরী। মুখে চোখে ফুটে উঠেছে আগত মৃত্যুর ছায়া, মায়ের পাশে বসে ব্যাকুল ভাবে ডেকে চলেছে অমূল্য—মা—মাগো—মা।

কিশোরীর সাড়া দেবার মত সামর্থ্য নাই, ঘোলাটে চোখ দুটো তুলে একবার যেন চাইবার চেষ্টা করে, অবশ হাত দুটো তোলবার বৃথা চেষ্টা করেও পারে না···লম্পটার আলো কমতে কমতে একেবারে নিভেই গেল! বাউরীর কেরাসিন তেলের কার্ড নাই, টাকু না দিলে কার্ডে তেল পাওয়া যায় না—সামান্য যেটুকু মুনিব বাড়ী থেকে চেয়ে-চিন্তে এনেছিল, সেটুকুও শেষ হয়ে গেল! অস্পষ্ট অন্ধকারে মায়ের গোঙানির শব্দ শোনা যায়, শেষবারের মত মাকে দেখতেও পাবে না।

পা দিয়ে ধাক্কা মেরে দরজার আগড়টা ফেলে দিল অমূল্য...ডুবন্ত চাঁদের একফালি আলো এসে পড়েছে মৃত্যুকাতর ওই বৃদ্ধার মুখের উপর···শেষবারের মত মাকে দেখে নেয় অমূল্য!

ছোট ভাই কালোকে ধাক্কা মেরে তোলে, সারাদিন খেটে খুটে ঘুমে অবশ দেহটা বার কতক অস্ফুট শব্দ করে আবার পাশ ফিরে নীরব হয়ে গেল!

একা অমূল্যই দেখল···মা তার মারা গেল! মাটির কলসী হতে কলাই করা গেলাসে শেষ বারের মত এক ঢোক জল মুমূর্ষু মায়ের মুখে ঢেলে দেবার চেষ্টা ক'রলো ···অন্ধকারে জলটা গড়িয়ে পড়ে গেল!

চাঁদ তখন ডুবে গেছে।

সে বিগত এক সবহারানো রাতের কথা আজও তোলেনি অমূল্য, কখনই সে ভুলবে না।

আজ তার সেই ভাঙ্গা ঘরের রূপ বদলাতে সুরু হয়েছে, সে জানে রূপ বদলানোর দিন আসছে একা তাদের গ্রাম নয়, সারা চাকলা—সারা দেশ জুড়ে।

···মা মারা যাবার পরই বার হয়ে গিয়েছিল অমূল্য গ্রাম ছেড়ে ছোট ভাইকে সঙ্গে করে—অন্নের সংস্থানে—পানাগড়ের মিলিটারী ক্যাম্পের দিকে!

কয়েক বৎসর আগে ত্রিপানী গিয়েছিল গঙ্গাস্নান করতে মায়ের সঙ্গে, রেলে যেতে যেতে দেখেছিল পানাগড়ের মাঠ, লকলকে ধানের শিষে দিক হতে দিগন্ত, একেবারে হাসুয়ার শালবন হতে সুরু করে দামোদরের ধার পর্য্যন্ত কেবল বুকভোর ধান, কয়েক বৎসর পরই সেখানে গিয়ে চিনতে পারে না, রাতারাতি যেন বদলে গেছে দুনিয়াটা! সারি সারি আধপাকা বাড়ী, ইলেক্‌ট্রিকের আলো, বড় বড় যন্ত্রপাতি, হাজার হাজার গাড়ী আর কত শত শত সাহেব! মাথার উপর নীল আকাশে চক্কর দিচ্ছে এরোপ্লেন, দিন রাত কামাই নাই, দু'জনে যেন পথ হারিয়ে ফেলেছে: অমূল্য আর কালো।

দিনে আট ঘণ্টা ঘড়ি ধরে খাটুনি, নোতুন রাস্তার উপর মাটি ফেলা!

খেতে পায় সত্যি, তবু মনের মাঝে কেমন যেন হাহাকার করে ওঠে অমূল্যর। এই অচেনা শত শত মুখ, যন্ত্রের শব্দ, মটরের আওয়াজ, সব কিছু তার গ্রামের কল্পনাকে তার মন হতে একেবারে যেন মুছে ফেলেছে। তারাকিনী রাত্রির অতলে ধীরে ধীরে ফুটে ওঠে কার একখানা মুখ, মা—তার মায়ের সেই হাসিমাখা মুখখানা! গ্রামের বুকে জেগে রয়েছে তার মনে, গ্রাম হতে মাকে সে আলাদা করে ভাবতে পারে না!

আজ বোধ হয় গ্রামে আবার ধানপাকার দিন এসেছে! মাদনাতলার কাচিতে এবার লকলকে ধান দেখে এসেছে, এতদিনে মন্বন্তরে ছেয়ে গেছে মাঠের বুক, কাইবোড়ের

বিস্তীর্ণ জলধারার আশেপাশে বেগুন গাছ এবার নিশ্চয় লাগিয়েছে নিমাই ঘোষ! কুলগাছটা ফলের ভারে নুইয়ে পড়েছে। বাগানের ঝরাপাতার বুকে এবারও বড় শিমুল গাছটা এতদিনে লাল হয়ে গেছে ফুলের রংএ।

কি-যেন দুর্বার আকর্ষণ, এখানের এই কোলাহল, যন্ত্রের বিজাতীয় শব্দ, বিলাসের প্রাচুর্য্য—এসব কিছু তার মনে কোনই দাগ কাটতে পারেনি। চলেই যাবে সে তার ফেলে আসা গ্রামে!

কালো একটু বিস্মিত হয়ে যায় দাদার কথায়, কি বলছে দাদা! মুখ গোজ করে দাঁড়িয়ে থাকে! গ্রামের কেলো আজ বদলে গেছে এখানে এসে! একটা দু' সাইজ বড় পুরোনো মিলিটারী প্যান্ট পরে কোমরের কাছে বেশ খানিকটা গুঁজে সেটাকে সামলাবার চেষ্টা করেছে, একটা মিলিটারী জাকেট—মাঝে মাঝে আধ-পোড়া সিগারেটও জোটে, তা ছাড়া কোন এক মিলিটারী সাহেবকে একটা বাঁদরের বাচ্চা ধরে দিয়ে নাকি বেশ খাতির জমিয়েছে! চাকরীও হয়ত পেয়ে যাবে, এমন সময় দাদা বলে কিনা বাড়ী চল! তাকে ধমক দিয়ে ওঠে অমূল্য। ছোঁড়াটা গজ গজ করতে থাকে।

—"চল যিথানকে যাবা, কিন্তুক সিথানে কি যোজাটা আছে?"

—"খাবাই বা কি—ছটুড়ুম্বা!" হাতের বুড়ো আঙুল দুটো বার করে মুখ বিকৃত করে কালো!

...আজ অমূল্যর হাসি আসে! সেই কালো আজ দেহে মনে বদলে গেছে কয়েক বৎসরের মধ্যে! লম্বা চওড়া যোয়ান হয়ে উঠেছে। তার কোদালের ঘায়ে আলের মাটি কেঁপে ওঠে, হাতের মুঠির চাপে লাঙলের ফলা শক্ত মাটির বুক হতে দু'পাশে ঠেলে তোলে সোঁদা গন্ধভরা সতেজ ভিজে মাটির রাশ! ভোর বেলাতেই কালো বার হয়ে গেছে মাঠে—আঁখ ক্ষেতের সিয়েত করতে! লকলকে আঁখ গাছের পাতায় একটু হলদে আভা এসেছে কি ওর হুঁস হয় জল টান পড়েছে! অমূল্যর সত্যিই আনন্দ হয়—ভাই তার হুঁসিয়ার কৃষাণ!

প্রথম যখন তারা ফিরে এলো পানাগর হতে সেদিনকার কথা মনে পড়ে! সারা বাউরী পাড়ায় একটা ঘরও আস্ত নাই মাঠে মাঠে ধানের রাশি কাটবার লোক পাওয়া যায় না—সবাই অন্নের সন্ধানে গ্রাম হতে চলে গেছে দূরে দূরান্তরে। কেউ ফিরে আসেনি তখনও।

অমূল্য এসে নীরবে দাঁড়িয়ে থাকে ধ্বংসপ্রায় চালা-খানার পাশে। একটা বর্ষার বর্ষণেই গলে গলে খসে মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে তাদের ঘরখানা। মাটির বুকে জন্মেছে অযত্নবর্দ্ধিত ঘাসের বন! ফাঁকা জায়গাটাতে দাঁড়িয়ে কল্পনা করতে পারে অমূল্য—এই মাটিটুকু—এইখানে মা তার শেষ নিঃশ্বাস ফেলেছিল! সন্ধ্যা হয়ে আসছে, চারিদিক নীরব। তারার আলোয় অন্ধকার আকাশের নীচে মাটির বুকে মুখ রেখে অমূল্য যেন পরশ পায় তারই মায়ের পাণ্ডুর ওষ্ঠের! চুপে চুপে শোনায়—

"মা—মা শোন, আমি আবার ফিরে এসেছি মা!"

তার চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়ে অশ্রু। মনটা যেন কেমন হালকা হয়ে আসে।...

রতন মুখুয্যে তার পুরোনো মুনিবের ঘরেই আবার কাজ নিল অমূল্য আর তার ভাইকে নিয়ে। কিন্তু বুঝতে পারে—এই যুদ্ধ-মন্বন্তর তাদিকে গ্রামছাড়া করেছিল, কিন্তু এদিকে জমির ধান ফসল হতে যাদের দিনগুজরান করতে হয়, তাদিকে একেবারে ফোপরা করে দিয়ে গেছে।

রতন মুখুয্যের বড় ছেলে ভুবন সেদিন বাবার বকুনি খেয়ে মাঠে গেছে, আলের মাথায় একটা অর্জ্জুন গাছের ছায়ার নীচে দাঁড়িয়ে দোনী ধরা দেখছে! কালো একাই যোত ধরেছে! পুরুষ্ট হাতের পেশীগুলো দোনীর ভারে চড় চড় করে ফুলে উঠছে, কপাল দিয়ে ঝরছে স্বেদরেখা, একদমে দোনী টেনে চলেছে সে। ওপাশে ভুবন দাঁড়িয়ে দেখছে!

চীৎকার করে ওঠে কালো—"ঠাকুর,—ও ঠাকুর, কোদালটো লিয়ে আড়বাঁধাটায় দু'চাপ মাটি ফেলাই দাও, জলটো বেরিয়ে যাবেক ওই—হাঁ করে দেখছ কি?"

ভুবন বাপের আদরের বকাটে ছেলে, পলাশডাঙ্গার স্কুলে এক ক্লাসে বৎসর কয়েক করে ডিগবাজী মেরে এই-বাবু বাড়ী ফিরে এসেছে, নেহাৎ রতন মুখুয্যের পয়সায় টান ধরেছে বলেই পড়াশোনায় ইতি করে গাঁয়ে এসে বসেছে। এমন হেন বস্তু রতন যে কোদাল ধরবে তা

কল্পনাই করতে পারা যায় না, কালোর কথায় চটে ওঠে, ভুবন চীৎকার করে জবাব দেয়—"দিন গেলে চার সের ধান খেছিস, তোর জল বাগাতে যাব আমি? ব্যাটা বাউরী কোথাকার!"

সারাদিন কঠোর পরিশ্রমে এমনি মেজাজটা রুক্ষ হয়েছিল—তার পরেই এই গালাগাল শুনে তেজী রক্ত কেমন যেন বাঁধন ছিঁড়ে ফেলে দোনী হতে লাফ মেরে নেমে এসে রতনের সামনে দাঁড়িয়ে শাসাতে থাকে—

"মুখ সামলে কথা বলো ঠাকুর, ফুটুনি তুমার হুবুতে রাখো!"

ভুবনও রুখে আসে—"দেখবি ব্যাটা বাউরী!"

আগেই ভুবন বসিয়ে দেয় কালোকে কয়েকটা চড়! প্রথমটা কালো নিজের অজ্ঞাতেই সরে যাবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু ভুবন ছাড়বার পাত্র নয়, ফলে কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখা যায় অর্জ্জুনগাছের নীচে ঘোড়ের জলের ধারে কালো রাগে ফুলছে আর ভুবনকে চেনাই যায় না, এক বুক জলে হাবুডুবু খাচ্ছে—দাঁত দিয়ে পড়ছে রক্ত! জামাখানা পিঠের দিকে অনেকখানি ছিঁড়ে গায়ে বসে গেছে!

গ্রামের ইতিহাসে বাউরীর হাতে বামুনের মার খাওয়া এই প্রথম! একটা বিরাট ইজ্জতের প্রশ্ন! সুতরাং বৈকাল বেলাতেই ষোল আনির ভদ্রলোকদের ডাক হল, আসামী কালো বাউরী ওপাশে আরও কয়েকজন বাউরীর সঙ্গে বসে রয়েছে, রতন মুখুয্যের পায়ের কাছে বসে অমূল্য! ছোট ভাই, যোয়ান বয়স, কি একটা হট ক'রে ক'রে ফেলেছে—এবারের মত মাপ করতেই হবে। রতন মুখুয্যে আরও সবাই একযোগে লেগেছে—বাউড়ীর বিত্তাপ ভাঙতে হবে!

বিচারে দণ্ড হল দশ টাকা!

পাড়ার অদূরে বাঁশঝাড়ের পাশে একপাল শূয়োর চরছিল, ছুটে গিয়ে তার মধ্যে থেকে মাঝারি একটা বড় শূয়োর ধরে এনে টানতে টানতে হাজির করে বৈঠকের মধ্যে।

—"এই লাও ঠাকুর, আজকের বাজারে নাহোক এক কুড়ি টাকা ইটোর দাম হবেক! দশ টাকার মার মেরেছি, বেশী করে আরও যা কতক মেরে বাকী টাকাটাও জরিমানায় পুষিয়ে লুব!"

ভুষণ মুখোটি হাতের হুঁকোটা নামিয়ে সজোরে কালোর গালে এক চড় কসে দেন, গর্জ্জাতে থাকেন তিনি—

"হারামজাদা কোথাকার, যতবড় মুখ নয় ততবড় কথা!"

ব্যাপারটা মুহূর্ত্তের মধ্যে অন্যরকম দাঁড়িয়ে যায়। বাউরীরা সবাই উঠে চলে এল, দেরে বাউরী বলে—"ই কিরকম বিচার তুমাদের! খামোকাই দণ্ড করলে, আবার মারছ কেনে?"

অর্দ্ধসমাপ্ত বিচারের আসরে একা বামুন সজ্জনের দলই পড়ে রইল; যাদিকে নিয়ে বিচার হবে তারা কেউ নাই!

গ্রামের বুকে এককালে পুরুষানুক্রমে যারা চালিয়ে এসেছিল নিজেদের অখণ্ড প্রতাপ—অন্যায় অবিচার, বসে বসে যারা অন্যের পরিশ্রমের মুনাফা খেয়ে এসেছিল, আজ যেন তাদের কঠিন ভিত্তিমূলে কোথায় ফাটল ধরেছে; মাত্র কিছু জমি আছে—আর জমি আছে বলেই যেন অপরকে—যে পরিশ্রম করে তাতে ফসল ফলাল—তাকে বঞ্চিত করবার অধিকার জন্মগত হয়ে গেছে, এই হিসাবে কোথায় একটা মস্ত গলদ ধরা পড়ে গেছে! তখন পড়েনি, যখন গ্রামে গ্রামে ছিল প্রাচুর্য্য, বাইরের পৃথিবীর ঝড় যতদিন পর্য্যন্ত তার বুকে বিক্ষোভ তোলেনি, ততদিন পর্য্যন্ত এই গোজামিল হিসাবের গলদ বার হয়ে পড়েনি; যেদিন সেই শ্যামছায়াঘন দিন বিলুপ্ত হয়ে গেল গ্রামের বুক হতে, তারও মাঝে এল হাহাকারের ছায়া, সেদিন মানুষ নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টা করতে গিয়েই প্রথমে আবিষ্কার করল এই গলদ!

শতমনে যেন এই বঞ্চনার প্রতিবাদই ফুটে ওঠে বিভিন্নরূপে! কালোর প্রতিবাদ করেছিল হয়ত তার অবচেতন মনের এই বিক্ষুব্ধতার প্ররোচনাতেই! সেদিন ভুষণ মুখোটীর চড় খেয়ে চলে এসেছে আর সে কাষ করতে যায় নি, অমূল্যও তাকে মাঠে নিয়ে যেতে পারেনি; বলে অমূল্য—

"কাজে যাবি নাই, চলবেক কি করে?"

—"ঘরে ত খেছি নাই, তুয় কি?"

সারাদিন কোথায় যে থাকে সে, জানে না অমূল্য। সেও মাঠে কায নিয়ে ব্যস্ত, কালোর কোন খবরই রাখতে পারে না।

মাঝে মাঝে কালো অনুভব করে তার গালে যেন এখনও কার হাতের চড়, বিনা অপরাধে ওরা মারবে, দিনান্ত পরিশ্রম করিয়ে নিয়ে মাত্র তিন সের ধান দেবে কেন? হালের গরুও খেতে পায় থাকতে পায় তাদের চেয়ে ভালোভাবে; গাছের পাখীগুলো খাবার পায়, মনের আনন্দে থাকে। তারাও মানুষ, তবে কেন তারা খেটে পরিশ্রম করেও এই ভাবে থাকবে!

রতন মুখুয্যে ভেবেছিল—হয়ত একটা গোলমাল বাধবে, কিন্তু কালোই এলোনা, অমূল্য যথারীতি কাজ করতে আসে। গ্রীষ্মের প্রারম্ভ, পাতাঝড়া গাছে আবার এসেছে কচি পাতার সমারোহ, দিগন্তপ্রসারী মাঠের বুকে খররৌদ্রের পাণ্ডুনীল আভা দূরদিগ্বলয় রেখার প্রান্তে বিকম্পিত হতে থাকে!

এল বৈশাখ! কথায় বলে—

"যোল চাষে মূলো
তার অর্দ্ধেক তুলো,
চার চাষে ধান।
বিনি চাষে পান॥"

চার বার চাষ দিতেই হবে ধানের জমিকে! নাহলে মাটি তৈরী হবেনা, ধানের গোছ বাঁধবে কি করে!

গরু দুটো চলতেই পারে না, শক্ত মাটি জমে পাথর হয়ে আছে স্তূপীকৃত সার, গোবর ছড়িয়ে ভালো করে লাঙল দিয়ে মাটির সঙ্গে তাকে মিশিয়ে দিতে হবে, শক্ত করে লাঙলের মুঠিটা টিপে ধরে গরু দুটোকে চালাবার চেষ্টা করে। কঙ্কালসার গরু দুটো শক্ত মাটি ভেদ করে ধারাল ফলাটাকে টানতে গিয়ে যেন ঘুরপাক খেয়ে যায়। চীৎকার করে ওঠে অমূল্য, "শালা বিজাত কুথাকার, ফালিয়ে যাবেক যি।"

গরুর খুরেই ফলাটা বিঁধে যেতে পারে। লাঙলের জোত একটা আলগা দিয়ে ল্যাজ দুটো মলতে থাকে সে—"তা—তা—!"

সপাসপ ঘা মারতে থাকে, লম্বা গরু দুটো ধনুকের মত বেঁকে যায়, পাঁজরের হাড়গুলো জিল জিল করছে, কালো পাণ্ডুর চোখ দুটো মেলে অসহায় মিনতি জানায়। অমূল্যরও কেমন যেন মায়া হয় ওদের উপর। জিব দুটো বার হয়ে পড়েছে, গ্যাঁজলা ভাঙছে। জোতটা খুলে কাঁধ হতে ওদের জোয়ালটা নামিয়ে নিয়ে নিজেই গ্রামের দিকে বয়ে আনে, গরু দুটো কোন রকমে নড়ে চড়ে গিয়ে পাশেই শিববাঁধের ঘোটালে সামান্য জলে মুখ লাগিয়ে চোঁ চোঁ করে চুমুক দিতে থাকে। অমূল্য দেখে—সাদা হেলেটা, দুধের মত রংএ এসেছে দুর্ব্বলতার ছোঁয়া, কালসিটে মেরে গেছে, ভাগাড়ে ফেলে দিলেই হয়! ওর জীবনের দিন ঘনিয়ে এসেছে। ক্লান্তভাবে কোন রকমে ওরাএগিয়ে চলে ছায়াঘন বটগাছটার দিকে।

এ আছাড় বৃষ্টি হয়ে গেছে।

শক্ত মাটি দিন কয়েক নরম ভুর-ভুরে হয়ে থাকবে! এই সময় যে ক'খানা জমিতে চাষ দিয়ে নিতে পারতো, লাভ ছিল; জমির মাটিতে বর্ষার জলে সোনা ফলত। কিন্তু মুখুয্যের গরু দুটো সেই যে পড়েছে, আর ওঠবার নাম করে নি।

বৃষ্টি ধোয়া আকাশের বুকে প্রভাতের প্রথম আলো, কচি অশ্বত্থপাতার বুকে রংএর ঝিলিমিলি। আমের গুটিগুলো ঝরা পাতার বুকে কুঁকরে খসে পড়েছে। মধুলোভী পোকার দল আমমুকুলের মধুনেশা তখনও কাটিয়ে উঠতে পারে নি! পাশের মহুয়া বনের মিষ্টি গন্ধব্যাকুল পথে সুরু হয়েছে তাদের প্রথম আনাগোনা—

অমূল্যর সারা মনে অশান্তি। বছরটা মাটি হয়ে গেল; রতন মুখুয্যে ক'দিন থেকে প্রাণপনে চেষ্টা করেছে গরু বদলাবার, কিন্তু টাকা কোথায় পাবে, বাইরের পয়সা নাই, এতদিন চাষ হতেই চলেছিল, কিন্তু আর যেন পেরে ওঠে না।

সেদিন অমূল্যর সামনেই ভুবনকে একটা চড় কসে দেয় মুখুয্যে, "ধাড়ি মদ্দ কোথাকার, ঘরে বসে কি করছিস. হাত পা গজিয়েছে, দুপয়সা আনতে পারিস না? অন্য কায না পারিস, বামুনের ছেলে ভাত রাঁধগে কলকাতায়, দশ বিশ্ টাকাও আসবে!"

অমূল্যও শুনিয়ে দিয়েছিল : "শীগ্‌গির যদি গরু না কেন ঠাকুর, আমি লারব তুমার ঘরে খাটতে, অন্ত কুথাও মুনিষ গতে যাব কিন্তুক। প্যাটের জালাত তুমার কথা জানবেক নাই। আমার দেনা পাওনা ফেলে দিবা, আমি চলে যাবো।"

রতন মুখুয্যে জানে জমিতে ধান না হলে তার অবস্থাটা কি হবে; সারা বৎসর তাকে উপোসই দিতে হবে। সুতরাং গরু কিনতেই হবে! সে যেমন কোরেই হোক।

মুখুয্যেগিন্নী কর্তার কথায় পানদোক্তার ছোপ লাগান দাঁতগুলো বিস্তার করে খিঁচিয়ে ওঠে। গহনা পাব কোথায়! কত সোনাদানা আমার দিয়েছ, মাত্র এক গাছি গোট হার আর বাকি আছে, ও আমি ভুবনের বউকে দোব, আর আছে কি, সব ত গেছে গেল বছর বিক্রী করে ধান কিনতে!

চিন্তিত হয়ে পড়ে মুখুয্যে, তাও বটে, সেবার গোঁসাই-এর দোকানে সব বিক্রী করে পঁচিশ মণ ধান কিনেছিল, না হলে সারা গেরস্তই উপোষ দিত। টাকা কেইই বা দেবে, প্রায় তিনশ টাকার এখনও দরকার। অমূল্যর চার মাসের মাইনে বাকী, সেও কাষ করবে না টাকা বা ধান না পেলে। ধীরপদে গোঁসাইএর দোকানের দিকেই রওনা হয়, যদি জমি বন্ধক রেখে শ'চারেক টাকা পাওয়া যায় তারই চেষ্টা দেখতে হবে।

প্রায় চার মাস হয়ে গেল কালো সেই যে বেড়িয়েছে আর ফেরেনি। মাঝে মাঝে অমূল্যর মনটা কেমন হয়ে উঠে, মা মারা যাবার পর হতে মানুষ করছিল ভাইটাকে, কত দুঃখ কষ্টের সাথী, মনে পড়ে পানাগরে গিয়ে কাঁদত কালো—মায়ের কথা মনে এলেই ছেলেটার দুচোখে জল নেমে আসত, তাকে সান্ত্বনা দেবার ভাষা জানা ছিল না তার, ব্যথায় অমূল্যর দুচোখও অশ্রুসজল হয়ে আসত। আজ সে কোথায় জানে না।

সামনে বর্ষা আসছে, রতন মুখুয্যে গরু কিনতে পারে নি, টাকা বেশী যোগার হয়নি, এই সময় যদি কিছু টাকা তার থাকতো সেও একটা গরু কিনে চাষ ভাগে নিয়ে নিতে পারতো। এতদিন পরের গোলামী করে এসেছে আজ তা হলে গ্রামের মধ্যে সেও চাষী বলেই গণ্য হতো। ব্যাটা বাউড়ী বলে গালাগাল হজম করতে তাকে হতো না।

রাত্রি ঘনিয়ে আসে, চারিদিক নীরব। ঝাকড়া বটগাছটার মাথায় 'ভুলকী' তারার তীব্রজ্যোতি পাণ্ডুর আকাশ ছেয়ে ফেলেছে, আগলের ফাঁক দিয়ে শির-শিরে বাতাস নিয়ে আসে ঘুমের পরশ, দূরে একটা কুকুর একবার ডেকে উঠে আবার চুপ করে যায়। রাত্রি কত জানে না।

আষাঢ়ের প্রারম্ভ, নব মেঘে ছেয়ে গেছে আকাশতল। কালো পুঞ্জীভূত জলভরা মেঘ নীচু হ'য়ে গ্রাস করেছে সারা আকাশ, মিলিয়ে গেছে দূরে ওই শালবনের সীমানায়। বৃষ্টি-ধারা-স্নাত বটগাছটার পাতাগুলো নরম হয়ে গেছে, আধোভিজে গুড়ি বয়ে সার ধরে নেমে আসছে টাইপিঁপড়ের দল

পায়ের নখ দিয়ে মাটি খুঁড়ছে অমূল্য আর দেখে চলেছে। পটু হুঁকো টানতে টানতে খাটতে যাচ্ছে, বলে ওঠে, "ওরে অমো, তাহলে আবার মুনিবকেই বলি তুই খাটতে চল, ভাবগতিক দেখে লাগছে ইবার ভালো বর্ষাই হবেক। বর্ষাতোর উখানেই গতবি!'

কি যেন ভাবছে অমূল্য! মাত্র কয়েক কুড়ি টাকা পেলে দুটো যেমন তেমন গরু নিয়ে সে রতন মুখুয্যের চাষ নিজেই ঘরে আনতে পারত। মনের মাঝে সেই দুর্ব্বার আগ্রহই যেন চেপে বসেছে।

বৃষ্টিতে ভিজে কাকে আসতে দেখে একবার মুখ তুলে চায় অমূল্য, আমবাগানের মধ্য হতে একটা লোক এই দিকেই হন হন করে এগিয়ে আসছে! অমূল্যর বুকটা কেমন যেন মোচর দিয়ে ওঠে! হ্যাঁ, সত্যিই ছাতা মাথায় দিয়ে এগিয়ে আসছে লোকটা বাউরি পাড়ার দিকেই। বৃষ্টির মধ্যেই ছুটে যায় অমূল্য, জড়িয়ে ধরে তাকে, "কালো! কালো এসেছিস তুই!"

অমূল্যর শূন্য বুকটা যেন পূর্ণ হয়ে ওঠে, তার শূন্য কুঁড়ে ঘর কি যেন অজানা সম্পদে পূর্ণ হয়ে গেল! কালো অনেক বদলে গেছে, সুরূপ শালগাছের মত সজীবতা ছেয়ে রয়েছে তার সারা দেহে মনে।

কোচড়ের গ্যাঙ্গলা হাতে করে দাদার হাতে তুলে দেয় কতকগুলো নোট, বিশ্বাসই করতে পারেনা অমূল্য—"কোথা পেলি ?"

ঠিকাদারের ওখানে কাম পেয়েছিলাম, নিজেও ছোট ছোট কাম করেছি! নাও—ও টাকা তোমাকেই দিলাম! বর্ষা কাটলেই আবার কাজে লাগব গিয়ে।"

হাতে তার কতকগুলো কড়কড়ে নোট, বিশ্বাসই করতে পারে না অমূল্য! বৃষ্টির মধ্যেই বার হয়ে গেল বেগে, ব্যাপারটা বুঝতে পারে না কালো, দাদার গতিপথের দিকে বিস্মিত দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে।

রতন মুখুয্যের সামনে আজ দুটো পথ, হয় অনাহারে দিন কাটান, নয় জমি জায়গা বিক্রী করে দিয়ে যে কদিন চলে চালান—তারপর অন্ধকার ভবিষ্যৎ-এর হাতে আত্মসমর্পণ করা! সেদিন ভুবনকে জোর করেই বাড়ী হতে বার করে দিয়েছেন—বসে বসে খেতে লজ্জা হওয়া উচিত সোমথ ছেলের! যেখান থেকে পারুক যে ভাবে পারুক তার নিজের সংস্থান সে করবে, করতে হবে!

বৃষ্টির ধারাপাতে পাংশু আকাশ যেন ক্লান্ত হয়ে উঠেছে, খড়ের চালের ধার বেয়ে পড়ছে খড়ভেজা জলধারা! মাটিতে কেমন যেন একটা সোঁদা সোদা গন্ধ, বুড়োর বুক ভরে আসে মিষ্টি আবেসে! এমনি অমৃত ধারার কোন সদ্ব্যবহার এবার সে করতে পারবে না। তাই সময় থাকতেই এই পথ বেছে নিয়েছে।

সনাতন গোঁসাইকে যা হয় কিছু জমি বিক্রী করে দেবে! এই সময় তবুও কিছু দাম পাবে, অন্যসময় যখন লোকে বুঝবে তারই দায়, তখন ন'কড়ায় ছ'কড়ায় তাকে জমি ছেড়ে দিতে বাধ্য করাবে; গোমস্তা হরিহর পত্র বায়না তৈরী করে ফেলেছে!

"কইগো মুখুয্যে—সই সাবুদ একটা নাহয় করেই ফেলাও।" মুখুয্যে কি যেন ভাবছে, হঠাৎ বৃষ্টির মধ্যে অমূল্যকে আসতে দেখে একটু বিস্মিত হয়ে যায় রতন, বিরক্ত হয়ে ওঠে: "বলেছি ত বাপু, দিনকয়েক পরে আসবি, তোর দেনা পাওনা মিটিয়ে দোব।"

অমূল্য আজ ধানের তাগাদা দিতে আসেনি; ব্যাকুলভাবে বলে ওঠে—"ঠাকুর, ও জমি আমিই ভাগে করব, দেবা আমাকে ?"

বিস্মিত হয়ে ওঠে মুখুয্যে—সনাতন দুজনেই।

বর্ষার ঘনঘটা আজ মিলিয়ে গেছে। অমূল্যর সেদিনের স্মৃতিগুলো কিন্তু একটুও মলিন হয়ে যায় নি। যেদিন জমির ভাগচাষী হয়ে এল, সে রাত্রের কথা আজও মনে আছে অমূল্যর।

ভোর হতে মাঠে বার হয়ে গিয়েছিল দু'ভাই। প্রথমেই সমস্ত জমির ভাঙ্গা আল তোলার পাট! মাদনাতলার বড় জমিখানার দক্ষিণের আলে কোপ মারতেই একটা চাপা গর্জন...গরম একঝলক নিঃশ্বাস যেন তার হাতে এসে লাগে! লাফ দিয়ে পিছিয়ে যায় অমূল্য—একটা কালো মিশমিশে সাপ ফণা তুলে মাটির উপরে উঠে দোল খাচ্ছে! ছুটে আসে কালো, অমূল্য তাকে বাধা দেয়—

"মাদনা ঠাকুর, খপরদার মারিস না!"

সেই দিনই দুপুরে মাঠের মাথায় ঝাকড়া শ্যাওড়া গাছটার নীচে চিরে কাচা দুধ এনে ওরা পুজো দেয় মাদনার; কালো বলিদান করে একটা মস্ত মুরগী, নোতুন জমি নিয়েছে—মাদনা পুজো দিয়ে তবে লাঙল ঠেকাবে!

সাদাসাদা দুটো বাছুর গরু কিনে এনেছে অমূল্য কাঁটাবাধের পাইকেরদের ঘর হতে! বলে কালো, 'সাদা গরুই আনলা ?'

অমূল্যও জানে শোনে: "শতেক কুঁইলে হাজার হাঁসা।" কালো গরু একশটার মধ্যে একটা কুঁড়ে হয় আর সাদা গরু হাজারটার মধ্যে একটা, বুঝলি ?'

গোলমাল বাঁধে গরু গোয়ালে তুলবার সময়! মেয়েদের দিয়ে খুয়ে জল দিয়ে শিংএ তেল মাখিয়ে তুলতে হয় প্রথম দিন! ওদের বাউরীর মেয়ে রাজিই আসে জল দিতে: দাদার অসাক্ষাতে কালো রসিকতা ছাড়ে না। "বুঝলি, ঘরের বড়.বৌকে ইসব করতে হয়! তু তাহলে কি হলি বল দেখি ?"

—"ধ্যাৎ" কালোর রসিকতায় রাজি লজ্জায় আনন্দে রাঙ্গা হয়ে ওঠে, ঘটির বাকি জলটুকু কালোর মাথাতেই ঢেলে দিয়ে ছুটে পালিয়ে যায়।

ব্যাপারটা দূর হতে অমূল্যর নজর এড়ায় না! রাঙ্গির সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতার কথা জানে সবাই!

রাত্রি ঘনিয়ে আসে, চারিদিক নীরব নিস্পন্দ! চালার পাশেই ছোট্ট গোয়াল ঘরে নোতুন হেলে ছু'টোর নিঃশ্বাসের শব্দ শোনা যায়, তাতে গোবরের গন্ধ বাতাসে মিশে বেশ একটা সতেজ ঝাঁঝালো পরিবেশ রচনা করেছে। কালো ঘুমুচ্ছে অঘোরে!

অদূরে ছোট পুকুরটার ধারে বহড়া গাছের নীচে এক-ফালি চাঁদের আলোয় দেখা যায় দুটো ছায়ামূর্তি! অমূল্য আর রাঙ্গি! ওদের চোখের তারায় কোন নীড়রচনার স্বপ্ন, তাদের সাধনা দিয়ে তাকে সার্থক মধুময় করে তোলার শপথ!

এমন সুবর্ষা অনেক বৎসরই হয়নি! কানায় কানায় জল টইটই করছে, কালো কালো ধানের গাছে ভরে গেছে জমির বুক, মোটা মোটা গোছ দু'হাতের আঙুল দিয়ে ধরা যায় না! কোদাল হাতে কালো—অমূল্য ওদিকে বার হয়ে যায়! সেদিনকার কথাটা ভুলতে পারে না অমূল্য।

ধানে থোড় এসেছে, কার্ত্তিকের প্রারম্ভ, সোনা রং এবং রোদ সাদা সাদা টুকরো মেঘের ফাঁক দিয়ে আলতো ভাবে এসে পড়েছে মাঠে—সারা সবুজের রাজত্বে! আউস ধান পেকে উঠেছে; আনমনে যাচ্ছে অমূল্য। সারা মাঠে একটা প্রাণের সাড়া, জলের বুকে মাঝে মাঝে লাফ দিয়ে ব্যাঙ পড়ার শব্দ, কোন আল থেকে একটানা জল নীচে পড়ে চলেছে ঝর ঝর শব্দে, ঝিঁঝিঁ পোকা কোথায় যেন ডেকে চলেছে!

হঠাৎ পা পিছলে একটা পাশ-আলে কে যেন ঘাস কাটছিল, তারই ঘাড়ে পড়ে যায়, সেখান থেকে গড়িয়ে একেবারে ধানমাঠে কাদার মধ্যে দুজনেই মাখামাখি হয়ে যায়! উঠতেই দেখতে পায় রাঙ্গি!

রাঙ্গিও আশা করেনি তাকেই দেখবে এইভাবে, সেও হেসে ফেলে, "হা করে পথ চলো নাকি? কি দেখছিলে?"

"—তুকে"

—"চেক্ হয়েছে! থামো এইবার!" হেসে ফেলে দুজনেই! সেদিন অমূল্যর আর মাঠে ফেরা হল না, হেলের জন্য সেও ঘাস কাটতে বসে যায়! বলে অমূল্য—"কেউ যদি দেখে ফেলাই?"

রাঙ্গি হাসতে থাকে, কাস্তের ডগা দিয়ে নিটোল পিঠটা চুলকোতে চুলকোতে বলে, "দেখুক গো, ঘরে গিয়ে চাট্টি বেশী করে ভাত খাবেক!"

আজ অমূল্যর ঘরে এসেছে পূর্ণতার দিন, বাউরী পাড়ার অনেকেরই ঘরে। পৌষমাস—গাড়ী গাড়ী ধান এনে খামারে তুলছে কালো, রাঙ্গি আজ তাদের ঘরেই এসেছে! সেও কাস্তে নিয়ে সমানে ধান কেটে চলেছে, অমূল্য আর সে কাটছে, কালো গাড়ী চালাচ্ছে ধানের।

বামুনপাড়ার রূপ একেবারে বদলে গেছে। অনেকেরই খামারের পাঁচীল বৃষ্টির জলে গলে ধুয়ে পড়েছে। ধানও এবার সেখানে ওঠেনি। উঠেছে তাদের চাষীদের ঘরে। গোয়ালের গরু হেলেও প্রায় শেষ হয়ে এসেছে তাদের।

ভুবন সেই যে বেরিয়েছে এখনও ফেরেনি! রতন মুখুয্যে বলে, "সে নাকি পাটকলে কোথায় চাকরী করছে।" কালো গজরায়—"চাকরী! গেছে মজুরী করতে, আবার চাকরী!"

থামিয়ে দেয় তাকে অমূল্য।

কঙ্কালসার রতন মুখুজ্যে লাঠিতে ভর দিয়ে বামুন পাড়া ছেড়ে এগিয়ে যায় বাউরী পাড়ার দিকে, সেখানেই এবার হতে আসবে ফসলের মধুমাস, তারাই অঞ্জলি ভরে মাটীর বুক হতে নিয়ে আসবে মায়ের আশীর্ব্বাদ! ওদের আগামী বংশধর ভুবন, ভুবনের সন্তান মাটিছাড়া সর্ব্বহারা হয়ে তাদের পূর্ব্বপুরুষের সঞ্চিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবে।

গাড়ীখানা হতে বড় বড় ধানের মঞ্জরীসমেত ধানগুলো বলিষ্ঠ দুটো হাতে ছুঁড়ে ফেলছে খামারের মধ্যে কালো, রাঙ্গি অভ্যস্ত হাতে সেগুলোকে লুফে নিয়ে গাদায় তুলছে!

বুড়ো হাত বোলাতে থাকে ধানের পুরুষ্ট শিষে! চোখ বুজে আসে, নীলচোখের সামনে ফুটে ওঠে তার জীবনে এমনি সোনা ফসলের দিন! আজ সে এর স্পর্শ হতে বঞ্চিত!

...একি! কনকচূড় ধানের ধারাল শিষে লাল হাতটা খানিকটা চিরে গেছে, তার থেকে গড়িয়ে পড়ছে দু'এক বিন্দু রক্ত, সোনা ধানের শিষে লালরক্ত মিশে গিয়ে কেমন যেন এক নোতুন রং ধরেছে!

...অমূল্য, কালো, রাঙ্গি সবাই ধানের গাদা করে চলেছে! রতন ঠাকুর ধীরে ধীরে ওদের খামার হতে বার হয়ে বামুনপাড়ার পথ ধরে; বুড়োর কোটরাগত চোখ হতে গড়িয়ে পড়ে দু' ফোঁটা অশ্রু। খড়ের গাদার উপর অমূল্য আর কালোর চোখে আজ পূর্ণতার আভা, আনন্দের হাসি!

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস "দুর্গেশনন্দিনী"

(পূর্ব্বাভাস)

১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের ৫ই মার্চ্চ তারিখে বঙ্কিমচন্দ্র বারুইপুর যান এবং ১৮৬৯-এর ডিসেম্বর মাসে সেখান হইতে বদলী হইয়া বহরমপুরে যান। এই পাঁচ-ছয় বৎসরকাল মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন দফায় দুই তিনবার আলিপুরে কাজ করা ভিন্ন, অবশিষ্ট সময় বারুইপুরেই থাকিতেন। এই বারুইপুরে থাকিতেই দুর্গেশনন্দিনী সমাপ্ত ও প্রকাশিত হয়, কপালকুণ্ডলা মুদ্রিত ও প্রচারিত হয়, তিনি বি-এল্ পরীক্ষায় পাশ করেন এবং মৃণালিনীও এখানে থাকিতেই সমাপ্ত ও মুদ্রিত হয়। বারুইপুরের নিকটবর্ত্তী মজিলপুরেই বিষবৃক্ষের পরিকল্পনা, এখানেই জগদীশনাথ রায়ের সহিত সখ্যসূত্রে আবদ্ধ হন, এখানেই দুই-একটি কন্যারত্ন তাঁহার গৃহ আলোকিত করে। বঙ্কিম নিজেও স্বরচিত সংক্ষিপ্ত জীবনাখ্যায় লিখিয়াছেন—

"যেদিন বারুইপুর হইতে শেষ বিদায় গ্রহণ করি, আমার জীবনের প্রথম অঙ্কের এবং সর্ব্বাপেক্ষা উজ্জ্বল অঙ্কের যবনিকা পতিত হয়। আমার জীবনে এমন দিন আর কখনও ফিরিয়া আসে নাই।"

এই ঘটনাবহুল বৎসর কয়টির একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা এইখানে দেওয়া সমীচীন মনে করি। ইতিপূর্ব্বে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ হইতে প্রকাশিত বঙ্কিম শতবার্ষিকী সংস্করণের সম্পাদকদ্বয় শ্রীসজনীকান্ত দাস ও শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তৎপূর্ব্বে পূজ্যপাদ শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় পাঠকবর্গকে কোন কোন স্থলে বিভ্রান্ত করিয়াছেন। বঙ্কিম যে কয়বার ছুটি লয়েন, উহার সহিত তাঁহার রচিত সাহিত্যের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ থাকায় ছুটির সময়টি বিশেষ ভাবে অনুধাবনযোগ্য। কিন্তু উক্ত সম্পাদকদ্বয় কেবল 'ক্যালকাটা গেজেটে'র উপর নির্ভর করিয়াছেন। গেজেটে প্রকাশিত ছুটি সব সময় লওয়া হয় না, মাঝে মাঝে ব্যবস্থা করিয়া কাটাইয়া দেওয়া হয়। "History of Gazetted Officers"-এও সব কথা ঠিক উঠে না। কিন্তু গভর্ণমেণ্ট যে Quarterly Civil List প্রকাশ করিত, তাহাতেই কেবল সঠিক খবর পাওয়া যায়। প্রকৃত তথ্য নির্ণয় উক্ত তিনটি বিষয় মিলাইয়া না করিলেই ভুল হইবে, যেমন এক্ষেত্রে হইয়াছে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বলি, শচীশ বাবু লিখিয়াছেন, বঙ্কিম ১৮৬৮, ৫ই জুন হইতে ৫ই ডিসেম্বর ছুটি নিয়াছিলেন। একথা ঠিক নয়। তিনি ছুটি নিয়াছিলেন ১৮৬৯-এর ৫ই জুন হইতে। আবার ১৮৬৮ সেপ্টেম্বর হইতে দুই মাস সময় ছুটি নেওয়ার কথা উভয়ের কেহই উল্লেখ করেন নাই। অথচ সম্পাদকদ্বয় শচীশবাবুর কথা উদ্ধৃত করিয়া উক্ত ছুটি সম্বন্ধে তাঁহারই অনুসরণ করিয়াছেন।*

নিম্নলিখিত তারিখগুলি বঙ্কিম সম্পর্কে বিশেষ অনুধাবনযোগ্য :

১৮৬৪—৫ই মার্চ্চ, বারুইপুরে আগমন।

১৮৬৪—২৪শে অক্টোবর, ডায়মণ্ডহারবার গমন।

১৮৬৫—ফেব্রুয়ারী ডায়মণ্ডহারবার হইতে বারুইপুরে প্রত্যাবর্ত্তন।

১৮৬৫—মে মাসে গেজেটে পদোন্নতি না দেখিয়া বঙ্কিমের মনোভঙ্গ।

১৮৬৫—দুর্গেশনন্দিনী পরিসমাপ্ত ও প্রকাশিত।

১৮৬৬—৫ই মার্চ্চ, তৃতীয় শ্রেণীতে উন্নীত। বেতন মাসিক ৫০০ শত টাকা।

১৮৬৬—২২শে জুন হইতে আগষ্ট ১ মাস ১৬ দিন অসুস্থতা নিবন্ধন ছুটি।

১৮৬৬—নভেম্বর, কপালকুণ্ডলা প্রকাশিত।

১৮৬৭—১লা জুলাই হইতে ৩০শে সেপ্টেম্বর কলিকাতার স্পেশাল কাজ করেন।

১৮৬৭—১লা অক্টোবর হইতে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত আলিপুরে বদলী হন। জুলাই হইতে ডিসেম্বর কোন কোন সময়ে আইন ক্লাসে যান।

মৃণালিনীতে সম্পাদকদ্বয়ের উক্তি

১৮৬৮—জানুয়ারী হইতে পুনরায় বারুইপুর গমন।

১৮৬৮—২১শে সেপ্টেম্বর হইতে ২৪শে নভেম্বর প্রিভিলেজ লিভ গ্রহণ ও আইন পুস্তক পাঠ করেন। নভেম্বরে বি, এল পরীক্ষা দেন।

১৮৬৯—জানুয়ারী হইতে আলিপুরে। "Origin of Hindu Festivals" বাহির হয়।

১৮৬৯—৮ই ফেব্রুয়ারী, গেজেটে পরীক্ষার (বি. এল্) ফল বাহির হয়।

১৮৬৯—* ৫ই জুন হইতে ৫ই ডিসেম্বর ব্যক্তিগত কারণে ছুটি, এই সময়ে কাশী, প্রয়াগ, দিল্লী প্রভৃতি স্থানে যান।

১৮৬৯—মৃণালিনী প্রকাশিত হয়।

১৮৭০—জানুয়ারী হইতে বহরমপুর থাকেন।

সম্পাদকদ্বয়ের উক্তি স্পেশাল কাজে আলিপুরে ১৮৬৭, ১৪ই আগষ্ট হইতে যান, কথা ঠিক নহে; তিনি আলিপুরে ১লা অক্টোবর হইতে ডিসেম্বরে থাকেন। Vide—Quarterly Civil list—1867

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে ৫ই মার্চ্চ তারিখে বঙ্কিমচন্দ্র খুলনা হইতে বারুইপুর মহকুমায় † বদলী হন। এই মহকুমাটি তিনি স্বেচ্ছায় বাছিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু কয়েক মাস মধ্যেই ৪ঠা অক্টোবর বারুইপুর, ডায়মণ্ড-হারবার, কাঁথি প্রভৃতি দক্ষিণাঞ্চলের স্থানসমূহের উপর দিয়া একটা প্রকাণ্ড ঝড় বহিয়া যায়। যেমন ঝড়, তেমনি জলপ্লাবন। সমস্ত গ্রাম, বাড়ী-ঘর, মাঠ-ঘাট জলে ভাসিয়া যায়। ঝড়ে বাড়ী-ঘর পড়িয়া যায়, আবার প্লাবনে তাহা ভাসাইয়া নিয়া যায়। লোকের দুর্দ্দশার অবধি ছিল না, বহুলোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়, খাদ্যাভাব ঘটে এবং ব্যারাম পীড়ার আধিক্য হয়। এই দুরবস্থার সময়ে চব্বিশ পরগণার ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বঙ্কিমচন্দ্রের উপরই সাহায্য ও পুনর্ব্বসতি কার্য্যের ভারপ্রদান করেন।

বঙ্কিমচন্দ্র কালবিলম্ব না করিয়া মজিলপুরে পৌছিলেন এবং তত্রস্থ স্বর্গীয় কালীনাথ দত্ত মহাশয় প্রমুখ ব্যক্তির সহায়তায় সাইক্লোন রিলিফের কাজ বিশেষ প্রশংসার সহিত সমাধা করেন। কিন্তু ডায়মণ্ডহারবারের অবস্থা তখন আরও শোচনীয় হইয়াছিল। সেখানে তখন স্বর্গীয় হেমচন্দ্র কর মহাশয় উক্ত মহকুমার ভারপ্রাপ্ত ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। তাঁহাকে বারুইপুরে দিয়া রিলিফের কার্য্যের সুবিধার জন্য ২৪শে অক্টোবর হইতে বঙ্কিমচন্দ্রকে উক্ত মহকুমার ভারার্পণ করা হয়। ডায়মণ্ডহারবার সমুদ্রের নিকটবর্ত্তী বলিয়া যাবতীয় স্থান একেবারে ভাসিয়া গিয়াছিল এবং অবস্থা দেখিয়া বঙ্কিমচন্দ্র শিহরিয়া উঠেন। তিনি পৌছিয়া দেখিলেন যে, জল সরিয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু জলমগ্ন বালকবালিকাদের, স্থবির বৃদ্ধের এবং গো-মহিষাদির শবে সমগ্র স্থানটি আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে—মাঠে-ঘাটে সর্ব্বত্রই শব, আর বাঁধের উপরে আরও শবাধিক্য। শকুনি গৃধিনী-অধ্যুসিত গলিত শবের দুর্গন্ধে পথে চলাই অসম্ভব হইয়া উঠে।

দ্বিতীয়তঃ পানীয় জলের অভাব, পুকুরে গলিত শব, নদীর জল লবণাক্ত।

খাদ্য দ্রব্যের একান্ত অভাব হইয়াছে, সঞ্চিত যাহা ছিল সবই ভাসাইয়া নিয়াছে, মাঠের শস্য নষ্ট হইয়াছে, রাস্তাঘাট বন্ধ, কোন জিনিষ আমদানি করাও সম্ভব নয়। যাহারা বাঁচিয়াছিল, তাহাদের জীবন রক্ষাই কঠিন হইয়া উঠিল।

পচা জলে, দুষিত বায়ুতে, খাদ্যাভাবে ব্যারাম পীড়া বৃদ্ধি পাইল। অচিকিৎসায় লোক মরিতে লাগিল। সরকারী কর্ম্মচারীরাও পলায়ন করিতে লাগিলেন। এই

* শচীশবাবু যে বলেন—১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের ৫ই জুন হইতে ৬ মাস ছুটি লন, তাহা ঠিক নয়। History of Gazetted Officer-এ এক বৎসর এরূপ বাহির হইয়াছিল, কিন্তু পরে সংশোধিত হয়। Quarterly Civil Lists ও Gazetteতে সঠিক খবর আছে।

আশ্চর্য্যের বিষয়, ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে যে ২ মাসের প্রিভিলেজ ছুটি লওয়া হয় তাহা শচীশবাবু এবং সম্পাদকদ্বয় উল্লেখ করেন নাই। অথচ উঁহারা শচীশবাবুর কথাগুলি উদ্ধৃত করিয়া তাঁহার ভুলেরই সত্যতা স্বীকার করিয়াছেন। উভয়েই ভুল করায় পাঠক মাত্রেই বিভ্রান্ত হইয়াছেন। অথচ এই ছুটিটা না লইলে বি, এল পরীক্ষাই দেওয়া হইত না।

† ১৮৫৮ হইতে ১৮৮৩ পর্য্যন্ত বারুইপুর ২৪ পরগণার অন্যতম সাবডিভিসন ছিল।

অবস্থার কতক পরিচয় পরবর্ত্তীকালে রচিত "আনন্দমঠে" পরিস্ফুট হইয়াছে—

"রোগ সময় পাইল, জ্বর, উলাউঠা, ক্ষয়, বসন্ত। বিশেষতঃ বসন্তের বড় প্রাদুর্ভাব হইল। গৃহে গৃহে বসন্ত রোগে মরিতে লাগিল। কে কাহাকে জল দেয়, কে কাহাকে স্পর্শ করে? কেহ কাহারও চিকিৎসা করে না, কেহ কাহাকে দেখে না; মরিলে কেহ ফেলে না; অতি রমণীয় বপু অট্টালিকা মধ্যে আপনা আপনি পচে। যে গৃহে একবার বসন্ত প্রবেশ করে, সে গৃহবাসীরা রোগী ফেলিয়া ভয়ে পালায়।

"মহেন্দ্র সিংহ পদচিহ্ন গ্রামে বড় ধনবান কিন্তু আজ ধনি নির্ধনের এক দর। এই দুঃখপূর্ণ কালে ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া তাঁহার আত্মীয়স্বজন দাসদাসী সকলেই গিয়াছে। কেহ মরিয়াছে, কেহ পালাইয়াছে।"

প্লাবনে ডায়মণ্ড হারবারেরও এই দশাই হইয়াছিল।

আবার এই গোলমালে চুরি, ডাকাতি, খুন (নরহত্যা) প্রভৃতি অত্যাচার বৃদ্ধি পাইল, বঙ্কিমচন্দ্র মহাসঙ্কটে পড়িলেন। কিন্তু তিনি ইহাতে বিন্দুমাত্র নিরুদ্যম হইলেন না, পূর্ণোদ্যমে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন।

যাহা হউক বঙ্কিমের ন্যায় কার্য্যকুশল, হৃদয়বান ও সাহসী পুরুষসিংহের নিকটে সমস্ত অসুবিধাই অচিরে দূরীভূত হইয়া গেল। ভগবানের কৃপায় ও বঙ্কিমের ক্ষিপ্রকারিতায় অচিরে বিপন্নের প্রাণরক্ষা পাইল। অন্যান্য স্থান হইতে বহু সংখ্যক ডোম ও ধাঙ্গর আমদানী করা হইল। শবরাশি ভূমধ্যে প্রোথিত হইল বা সৎকার করা হইল, প্রায় দ্বিসহস্র পুষ্করিণী হইতে গলিত আবর্জ্জনা ও পচা মৎস্য দূরে নিক্ষিপ্ত হইল এবং অব্যবহার্য্য জল বাহির করিয়া মাঠে ছড়াইয়া দেওয়া হইল, সেই জলে মাঠের উর্ব্বরতা সাধিত হইল। কোন কোন পুকুরের সংস্কার সাধন হইল, আবার পরিষ্কার জল সরোবর পূর্ণ করিল। কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানের সহৃদয় ব্যক্তিগণ নানারূপ সাহায্য সমিতি গঠন করিয়া বিপন্নের সাহায্যার্থ অগ্রসর হইলেন, অনতিবিলম্বে প্রচুর খাদ্যদ্রব্য (চাউল, ডাইল, চিড়া, লবণ, সর্ষপতৈল ও পরিধেয় বস্ত্র, আসিতে লাগিল। অনেকে গৃহাদি নির্ম্মাণের উপকরণও পাঠাইতে লাগিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের আহার নিদ্রার সময় রহিল না।

কিন্তু এই সমস্ত কার্য্য কম কষ্টসাধ্য নয়। বণ্টন আরম্ভ হইলেই অন্নক্লিষ্ট ব্যক্তিগণ নৈরাশ্যে লুট ও আক্রমণে প্রবৃত্ত হয়, তাই সময় সময় বিশেষ কঠোরতারও আবশ্যক হয়। সকলেই প্রার্থী, সকলেরই অভাব, আবার অধিকাংশ সময়ে জিনিষপত্রাদিও সেই প্রচুর অভাব দূরীকরণে প্রচুর নয়। বঙ্কিমচন্দ্র সেইজন্য কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি লইয়া বিতরণ সমিতি গঠিত করিলেন এবং স্বয়ং সমস্ত কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। এই সমস্ত কার্য্য করিয়া আবার তাঁহাকে চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে হইল। গবর্ণমেণ্টের নিকট লিখিয়া তিনি প্রচুর ঔষধ ও পথ্যাদির সামগ্রী আনাইয়াছিলেন এবং নিজেও উপযুক্ত লোক দ্বারা সে সমস্ত বিতরণ করিতে লাগিলেন। এবং ছদ্মবেশে পর্য্যন্ত চোর ডাকাতদের সঙ্গে মিশিয়া তাহাদের চুরি ধরিতে লাগিলেন। এইখানে একবার ডাকাত তাঁহার বাঙ্গলোয়ও আসিয়াছিল, কিন্তু ধমক দিয়া এমন এক ডাক্ হাঁকিয়াছিলেন যে, ডাকাতরা ভয়ে পলাইয়া যায়। কাছারী ও বাহিরে পরিশ্রম করিয়া ঐ সমস্ত অঞ্চলের চুরি ডাকাতি দমন করিতে লাগিলেন। এই সমস্ত কষ্টসাধ্য কাজ করিয়াও তাঁহাকে আবার খাজানার মোকদ্দমার বিচার করিতে হইল। ঐ সময়ে ডেপুটীদেরই খাজনার মোকদ্দমা করিতে হইত।

ব্রজনাথ সেন নামক জনৈক ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট বঙ্কিমচন্দ্রকে সহায়তা প্রদান করিবার জন্য এই সময়ে ডায়মণ্ড-হারবারে প্রেরিত হইলেন। তিনি বঙ্কিমকে বিশেষ সহায়তাও করিয়াছিলেন।

যাহা হউক, তিন মাস অক্লান্ত পরিশ্রম ও অসাধারণ অধ্যবসায়ের পরে বঙ্কিম ডায়মণ্ডহারবার মহকুমার পূর্ব্ব শান্তি প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইলেন। ডায়মণ্ডহারবার আবার পূর্ব্বশ্রী ধারণ করিল। তবে জনসংখ্যা অত্যন্ত হ্রাস পাইয়াছিল। কিন্তু সে অভাব অনিবার্য্য। বঙ্কিম সেখানে প্রায় তিনমাস ছিলেন। এই সময় মধ্যে অতিরিক্ত পরিশ্রমে বঙ্কিমের স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয় এবং তিনি

পুনরায় বারুইপুর ফিরিয়া যাইবার পূর্ব্বে পোনেরদিন বাড়ীতে বিশ্রাম লাভ করেন। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে পুনরায় তিনি বারুইপুর ফিরিয়া আসেন।* বারুইপুরে অবস্থান করিবার সময়ে কালীনাথ বাবুর একটী স্মৃতি কাহিনী † এখানে উল্লেখযোগ্য—

"এই সময় হইতে আমি বঙ্কিম বাবুকে ভাল করিয়া চিনিবার সুযোগ ও অবসর পাইলাম। তিনি যে সকল ফৌজদারী মোকদ্দমা করিতেন, তাহাতে তাঁহার সূক্ষ্ম বিচারশক্তি, ন্যায়পরতা ও স্বাভাবিক দয়ার্দ্র-চিত্ততা প্রকাশ পাইত। এই সমস্ত মোকদ্দমার রায় তিনি অতি সুন্দর ইংরাজী ভাষায় প্রকাশ করিতেন। আমি তাঁহার লিখিত রায়গুলি পড়িতে বড়ই ভালবাসিতাম এবং সমস্তগুলিই পড়িতাম।"

কিন্তু ১৮৬৫ মে মাসে বঙ্কিম সরকারী ক্যালকাটা গেজেটে দেখিলেন Subordinate Executive Service-এর কতকগুলি ডেপুটীর পদোন্নতি ঘোষিত হইয়াছে, কিন্তু সেই তালিকায় তাঁহার নিজের নামের কোন উল্লেখ নাই। ইহাতে তিনি নিতান্তই মর্ম্মাহত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, ডায়মণ্ডহারবারে তিনি যেরূপ অসাধারণ অধ্যবসায় ও অক্লান্ত পরিশ্রমের সহিত কাজ করিয়াছিলেন এবং সেই কার্য্যে এত সাফল্য প্রমাণিত হইয়াছে যে তাঁহার পদোন্নতি অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু গেজেটে নাম না দেখিয়া বঙ্কিম অত্যন্ত বিস্মিত ও হতাশ হইয়া পড়েন। এই অবহেলা তিনি নীরবে সহ্য করিলেন না। এই অবিচার তিনি উর্দ্ধতন রাজপুরুষগণের গোচর করিলেন। উত্তরে তাঁহারা বলিলেন—"যাঁহাদের পদোন্নতি হইয়াছে তাঁহারা উক্ত বিভাগে অধিকদিন কার্য্য করিয়াছেন, তোমার সময় আসুক, তোমারও পদোন্নতি হইবে।"

চাকুরীর প্রতি বঙ্কিমের এই প্রথম বিরাগ জন্মিল। চাকুরীর জন্য সমগ্র সাধনা, সমস্ত উৎসাহ, সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিলেও এই প্রতিদান! তবে আর কেন! যে চাকুরীর জন্য সমস্ত সময় ক্ষেপণ করিয়াও তৃপ্তি মিটে নাই, যে চাকুরীর জন্য এ পর্য্যন্ত সাহিত্য সাধনায় কোনরূপ মনঃসংযোগই করা হয় নাই, যে চাকুরীর জন্য এ পর্য্যন্ত সূর্য্যাস্ত দর্শন হয় নাই, যাহার জন্য স্বাস্থ্য গিয়াছে, যাহার জন্য অমানুষিক ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন, প্রাণভয় করেন নাই তাহার এই পুরস্কার, আর যাহারা অলস, কর্ম্মে অপটু অথচ তোষামোদে অভ্যস্ত—তাহাদের কারণে অকারণে পদোন্নতি! অন্যদিকে আবার কত লোক তাহার ন্যায় বিদ্যাবুদ্ধিতে শ্রেষ্ঠ না হইয়াও কত উপার্জ্জন করিতেছে। আর তাহাকে এইরূপ নিম্নপদে কার্য্য করিয়াই জীবনাতিবাহিত করিতে হইবে। ইহার পর হইতেই চাকুরীকে তিনি জীবনের অভিশাপ মনে করিতে লাগিলেন। কিন্তু ইহাতে দেশের অশেষ হিত সাধিত হইল। চাকুরীতে বঙ্কিমের বৈরাগ্য জন্মিল বটে, কিন্তু আমরা সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রকে লাভ করিলাম।

জগদীশনাথ রায়ও ছিলেন বঙ্কিমের অন্যতম অকৃত্রিম বন্ধু, তিনি পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের কাজ করিতেন। তাঁহার উপরে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল। তিনিও তাঁহাকে প্রকৃতপক্ষে চাকুরীর কিরূপ মর্য্যাদা কম, তাহা বুঝাইয়া দেন। বঙ্কিমচন্দ্র চাকুরী ছাড়িয়া অন্য ব্যবসা অবলম্বন করিতে সঙ্কল্প করিলেন।

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন চাকুরীতে চাটুকারিতা ও তোষামোদ উন্নতির অন্যতম উপায় ছিল। সাহেব রাজপুরুষগণকে অনেকে মধুর সম্বোধনে তুষ্ট করিতেন। বঙ্কিমের আবার একদল শত্রুও ছিল, তাহারা বঙ্কিমের এতাবৎ ক্রমোন্নতিতে খুব ঈর্ষান্বিত ছিলেন। তাহারা কারণে অকারণে বঙ্কিমের নিন্দা করিয়া সাহেবদের কাণ ভারী করিতে লাগিল। ফলে যে সকল উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারিগণ তাহার কার্য্যে ভূয়সী প্রসংসা করিতেন, এখন তাহারাই বিরূপ হইলেন। প্রেসিডেন্সি বিভাগের তদানীন্তন কমিশনার চ্যাপম্যান সাহেব (পরে হাইকোর্টের বিচারপতি) বাঙ্গলা দপ্তরে লিখিয়া পাঠাইলেন—"বঙ্কিমচন্দ্র বড়ই অসন্তোষচিত্ত (discontented) হইয়া পড়িয়াছেন, অতএব তাঁহার উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা যায় না।" শত্রুপক্ষও বঙ্কিমকে ঐ সমস্ত

* History of Gazetted Officers-এ সম্পূর্ণ কথা দেওয়া নাই। Quarterly Civil List-এ আছে।

† প্রদীপ ১৩০৬

রাজপুরুষগণের বিষ নয়নে পড়িতে দেখিতে চেষ্টার ত্রুটী করিলেন না। বঙ্কিমের একদল নিন্দুকও জুটিয়া গেল। এই সকল নিন্দুককে লক্ষ্য করিয়া "দীনবন্ধুর জীবন সমালোচনায়" ভুক্তভোগী বঙ্কিম লিখিয়াছিলেন—(১৮৭৭)

"যেখানে যশ, সেইখানেই নিন্দা, সংসারের ইহাই নিয়ম। পৃথিবীতে যিনি যশস্বী হইয়াছেন, তিনিই সম্প্রদায় বিশেষ কর্ত্তৃক নিন্দিত হইয়াছেন। ইহার অনেক কারণ আছে, প্রথম দোষশূন্য মনুষ্য জন্মে না। যিনি বহুগুণ বিশিষ্ট, তাঁহার দোষগুলি গুণসান্নিধ্যহেতু কিছু অধিকতর স্পষ্ট হয়, সুতরাং লোকে তৎকীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হয়। দ্বিতীয়, গুণের সঙ্গে দোষের চিরবিরোধ, দোষযুক্ত ব্যক্তিগণ গুণশালী ব্যক্তির সুতরাং শত্রু হইয়া পড়ে—তৃতীয়, কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবৃত্ত হইলে কার্য্যের গতিকে অনেকে শত্রু হয়। শত্রুগণ অন্য প্রকারে শত্রুতাসাধনে অসমর্থ হইলে নিন্দার দ্বারা শত্রুতা সাধে। চতুর্থ, অনেক মনুষ্যের স্বভাবই এই, প্রশংসা অপেক্ষা নিন্দা করিতে ও শুনিতে ভালবাসে। সামান্য ব্যক্তির নিন্দা অপেক্ষা যশস্বী ব্যক্তির নিন্দা বক্তা শ্রোতার সুখদায়ক। পঞ্চম, ঈর্ষা মনুষ্যের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। অনেকে পরের যশে অত্যন্ত কাতর হইয়া যশস্বীর নিন্দা করিতে প্রবৃত্ত হয়েন। এই শ্রেণীর নিন্দুকই অনেক—বিশেষতঃ বঙ্গদেশে।"

কথাগুলি বঙ্কিমচন্দ্র নিজের চাকুরীর অবস্থা লক্ষ্য করিয়াই বোধ হয় বলিয়াছিলেন। যাহা হউক, এই চাকুরী বিতৃষ্ণার প্রথম উপাদেয় ফলই প্রসূত হয় বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস "দুর্গেশ নন্দিনীতে।"

ইতি-পূর্ব্বে বঙ্কিম খুলনায় দুইটী পরিচ্ছেদ মাত্র লিখিয়া ফেলিয়া রাখিয়াছিলেন। এই কয়মাস এ সম্বন্ধে একবারও ভাবিতে পারেন নাই। না ভাবিবার আর একটী কারণও ছিল। ইতিমধ্যে জনৈক বন্ধুকে তিনি পাণ্ডুলিপি দেখাইয়াছিলেন তাঁহার সমালোচনা-শক্তির উপরে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল। কিন্তু তিনি প্রথম অধ্যায় দুইটি পড়িয়া বিশেষ উৎসাহ দেন নাই। তাই এ-সম্বন্ধে বঙ্কিমও আর ভাবেন নাই—।

এবার তাঁহার পূর্ব্বোক্ত মানসিক অবস্থায় তিনি ঐ পাণ্ডুলিপি খুঁজিয়া বাহির করিলেন, এবার তাঁহার লেখনী আবার সচল হইয়া উঠিল এবং অল্পদিন মধ্যেই দশবারটি পরিচ্ছেদ একেবারে শেষ করিয়া ফেলিলেন। পূর্ব্বোক্ত বন্ধুটিও পরিচ্ছেদগুলি শুনিয়া খুবই প্রসংসা করিলেন।

এই সময়ে উপন্যাসখানি লিখিতে তিনি কিরূপ তন্ময়চিত্ত হইয়াছিলেন, এ বিষয়ে কালীনাথ দত্ত মহাশয়ের স্মৃতিকথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য—

"এই সময়ের পূর্ব্ব হইতে তিনি 'দুর্গেশনন্দিনী' লিখিতেছিলেন। এই সময়ে সর্ব্বদা তাঁহাকে অন্যমনস্ক দেখা যাইত। এমন কি সাক্ষীর এজাহার লিখিতে লিখিতে তিনি কলম বন্ধ করিয়া ভাবিতে ভাবিতে অন্যমনা হইয়া পড়িতেন এবং হঠাৎ এজলাস পরিত্যাগ করিয়া গৃহাভ্যন্তরে তাঁহার study room-এ প্রস্থান করিতেন, চিন্তিত বিষয়টী লিপিবদ্ধ না করিয়া এজলাসে ফিরিতেন না।" —প্রদীপ ১৩০৬

ইতিমধ্যে সঞ্জীবচন্দ্র দুর্গেশনন্দিনী পাঠ করিয়া এতই পরিতৃপ্ত ও আনন্দে পরিপ্লুত হইলেন যে, তিনি উপন্যাসের অসম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি লইয়া কলিকাতার একটী ছাপাখানায় ছুটিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র এই অসম্পূর্ণ গ্রন্থের খাতা ছাপাখানায় দিতে ঘোর আপত্তি তুলিলেন। কিন্তু সঞ্জীবচন্দ্রের জেদে কোন আপত্তিই টিকিল না। বঙ্কিমের কোন কথায় কর্ণপাত না করিয়া তিনি বলিলেন, "অবশিষ্ট অংশ যে ভাল হইবে তাহা বেশ বুঝিতেছি," সুতরাং প্রথম খণ্ড শেষ হইবার পূর্ব্বেই ছাপা আরম্ভ হয়।"

বাঙ্গলা ভাষার অবস্থা

এই সময়কার বাঙ্গলা ভাষার অবস্থা সম্বন্ধে একটু ধারণা থাকা সঙ্গত, তাই পাঠককে অন্যদিকে একটু লইয়া যাইব।

সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র যে বাঙ্গলাভাষা সৃষ্টি করিয়াছেন, আজও তাহাই পূর্ণোদ্যমে চলিয়াছে—গুরু-গম্ভীর বা চটুলভাষা উভয়ই বর্জ্জিত হইয়াছে। সাহিত্য যেমন সকলের বোধগম্য হওয়া দরকার, তেমনি বিশুদ্ধ এবং শিষ্টতাসম্পন্ন হওয়াও একান্ত আবশ্যকীয়। সেই ভাষার সৃষ্টির জন্যই বঙ্কিমের আসন এখনও অটল

অচল হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু এই ভাষা এক দিনেই সৃষ্টি হয় নাই। এই ভাষার ইতিহাস ও ক্রমবিকাশ বড়ই অদ্ভুত এবং বঙ্কিমের আবির্ভাবের পূর্ব্বে সাহিত্যের অবস্থা সকলের অবগত হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য।

বাঙলাভাষা প্রথম পদ্যেই পরিস্ফুট হয় এবং পদ্য সাহিত্যে বঙ্গদেশ চরমোন্নতি সাধন করে। জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, কৃত্তিবাস, গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস, মুকুন্দরাম, কাশীরাম প্রভৃতি বাঙলার শ্রেষ্ঠ কবি। কবিতা-প্রিয়তা বাঙলার ধর্ম্ম, বাঙলার নিজস্ব বলিয়া ধর্ম্মে, কর্ম্মে, সমাজজীবনে বাঙলার কবিতা বাঙালী হৃদয় আবিষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে। প্রথমেই ধরা যায় বাঙলার আদি কবি জয়দেব। তাঁহার—

"ধীর সমীরে যমুনাতীরে বসতি বনে বনমালী
পীনপয়োধর পরিসমর্দ্দন চঞ্চলকর যুগলশালী।"

বাঙলা কবিতারই অনুরূপ। বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠে তিনি এই জয়দেবের গানই গাহিয়াছেন—

"ধীর সমীরে যমুনাতীরে বসতি বনে বরনারী
মা কুরু ধনুর্দ্ধর গমনবিলম্বন অতি বিধুরা সুকুমারী।"

এই পদটি বাঙলা নয়—কেহ বলিতে পারে না। গীত-গোবিন্দের গানে বাঙলা গানের সৃষ্টি হইল, ইহার ধারায় বাঙলায় গীতিকবিতা রচিত হইতে লাগিল। জয়-দেবেরই অনুরূপ চণ্ডীদাসের অমরগীতি—

বঁধু কি বলিব আমি,
জীবনে মরণে জনমে জনমে
প্রাণনাথ হৈও তুমি।
সব সমর্পিয়া একমন হৈয়া
নিশ্চয় হইলাম দাসী॥

সঙ্গীত—

কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ।

বাঙলাকে একেবারে আকুল করিয়াই ফেলিয়াছিল।

চণ্ডীদাসের পদাবলী রাধাকৃষ্ণ প্রেম অবলম্বনে মধুর রস আশ্রয় করিয়া গড়িয়া উঠে। কিন্তু শ্রীচৈতন্য দেবের পর শ্রীকৃষ্ণের বাল্য লীলা, গোষ্ঠলীলা এবং অন্যান্য রস-লীলাও পদাবলী সাহিত্যের প্রধান বিষয় হইল। শান্ত, দাস্য, বাৎসল্য, ও সখ্য প্রভৃতি রসের প্রসার বৃদ্ধি হয়।

মিথিলার কবি বিদ্যাপতিকেও খাঁটি বাঙ্গলার কবি বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ভাষা বাঙ্গালীরই মত, ভাবও বাঙ্গালীর অনুরূপ। বিদ্যাপতির পরে বাঙ্গলার খাঁটি কবি চণ্ডীদাসের আবির্ভাব হয় শ্রীচৈতন্য দেবের প্রায় এক শতাব্দী পূর্ব্বে (১৪১৭-৭৭)। কৃত্তিবাসও আবির্ভূত হন শ্রীচৈতন্য দেবের প্রায় সমসময়ে। একসময়ে কৃত্তিবাসও সমস্ত বাঙালী-হৃদয় আবিষ্ট করেন। শাক্ত বৈষ্ণব এমন বাড়ী খুব কম ছিল যেখানে পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বেও রামায়ণ পঠিত হইত না। কৃত্তিবাসের প্রভাবে ঘরে ঘরে সকলে রাম সীতার মাহাত্ম্য বুঝিয়াছে। এই দুইজনই (চণ্ডীদাস ও কৃত্তিবাস) বাঙ্গলার আদি কবি।

শ্রীচৈতন্যদেবের প্রভাবে (১৪৮৫-১৫৩৩) বাঙ্গলা সাহিত্য—বিশেষতঃ বৈষ্ণব সাহিত্য প্রকৃতভাবে গড়িয়া উঠিল। শ্রীজীবগোস্বামীর করচা,গোবিন্দ দাসের পদাবলী, জ্ঞান দাসের মুরলী শিক্ষা প্রভৃতি বহুগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজের শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত (১৬১৫), বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য ভাগবৎ (১৫৭৩) প্রভৃতি এই যুগের প্রধান গ্রন্থ।

শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ, কাশীরাম দাস, মুকুন্দরাম কবি-কঙ্কণ (চণ্ডী প্রণেতা), রামেশ্বর চক্রবর্ত্তী (শিবায়ন প্রণেতা), ঘনরাম (ধর্ম্ম মঙ্গল), ক্ষেমানন্দ (মনসার ভাসান রচিতা) কবি রঞ্জন রামপ্রসাদ সেন এবং অন্নদা মঙ্গল ও বিদ্যাসুন্দর রচয়িতা ভারতচন্দ্র মধ্যযুগের কবি।

টপ্পা রচয়িতা নিধুবাবু, রামবসু, হরুঠাকুর, এণ্টনি ফিরিঙ্গি প্রভৃতি কবিওয়ালা অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি। দাশরথি রায় পাঁচালী প্রবর্ত্তক তাঁহাদের পরবর্ত্তী।

তারপরে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। ইংরাজ কবি কাউপারের ন্যায় ইনিও ছিলেন নূতন ও পুরাতনের যোগসূত্র। Critical কবি ড্রাইডেন, পোপ, বাট্লার এবং Romantic কবি Wordsworth, Shelly, Coleridge Southey, Keats, Byron এতদুভয়ের মধ্যবর্ত্তী যেমন ছিলেন কাউপার, সেইরূপ একদিকে পূর্ব্ব কবিগণ, রাম-প্রসাদ ও ভারতচন্দ্র এবং অন্যদিকে মধুসূদন, হেমচন্দ্র,

নবীনচন্দ্র প্রভৃতির যোগসূত্রকারীও ছিলেন কবিগুরু ঈশ্বরচন্দ্র।

ভারতচন্দ্র ছিলেন আদিরসে প্রধান, কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র হাস্যরসে অদ্বিতীয়। তবে সেই হাসিই কশাঘাতের ন্যায় বাঙ্গালী সমাজের অনেক জঞ্জাল দূর করিয়া সমাজ ও সংস্কৃতি রক্ষা করিয়াছে।

গুপ্ত কবির প্রভাব সম্বন্ধে স্বর্গীয় অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় নিম্নলিখিত ভাবে পরিচয় দিয়াছেন—

"তখন বঙ্গ সাহিত্যের সম্রাট ছিলেন কবি ঈশ্বরচন্দ্র। তখন কবিতা চর্চ্চা'র নামই ছিল সাহিত্য চর্চ্চা। পূর্ব্ব হইতেই কাব্য প্রবন্ধ পাঠ আমাদের সাহিত্য চর্চ্চার সীমা ছিল। কেবল পাঠশালা বলিয়া নয়, সকলেই রামায়ণ মহাভারত পাঠ করিত। বৃদ্ধ গঙ্গাতীরে ঘাটে বসিয়া, মুদী মুদীখানার পাটে বসিয়া, মোসাহেব মুখুয্যে মহাশয় বড় মানুষের বৈঠকখানায় বসিয়া অবাধে শ্রোতৃমণ্ডলী মধ্যে কৃত্তিবাস কাশীদাস পাঠ করিতেন। চৈতন্য-চরিতামৃত, চণ্ডী, শিবায়ন, ধর্ম্মমঙ্গল, গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিনী (দুর্গাপ্রসাদ) প্রভৃতিও পঠিত হইত। এইরূপ বহুকাল চলিতেছিল, ঈশ্বর গুপ্ত আসিয়া কাব্য সাহিত্যে একরূপ নূতন ভাব আনিলেন।

"তাহার কর্তৃক বঙ্গ সাহিত্যে ঢল নামিল, স্রোত চলিতে লাগিল এবং জীবন্ত ভাব আসিল। কেবল পৌরাণিক প্রসঙ্গের নাড়াচাড়া করিয়া সাহিত্য আর সন্তুষ্ট নহে। যখন সমাজে যে বিধানের আন্দোলন হয়, গুপ্ত কবি সেই বিষয়েই কবিতা লেখেন, সমাজে সাহিত্যে যে ঘনিষ্ট সম্বন্ধ তাহারই প্রমাণ দেন। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে তাহার সাপ্তাহিক "সংবাদ প্রভাকর" বাহির হয়, এবং নানারূপ উত্থানপতনের পরে ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে উহা দৈনিক কাগজে পরিণত হয়।

"প্রভাকরের পরে বাহির হয় গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশের 'ভাস্কর'; উভয় কাগজের মধ্যে দ্বন্দ্ব বিবাদ খুব চলিত। কিন্তু গুপ্ত কবির ব্যঙ্গে বিদ্বেষ থাকিত না। গুপ্ত কবির আরও দুইখানি কাগজ ছিল, একখানি 'পাষণ্ড পীড়ন' আর একখানি 'সাধুরঞ্জন'। প্রথমখানি যাহারা হিন্দুধর্ম্মের প্রতি আক্রমণ করিত, দ্বিতীয়খানি যাহারা দ্বন্দ্ব বিতণ্ডার কথা পড়িতে চাহিত না। এতদ্ব্যতীত ১৮৫৩ হইতে প্রতি বাঙ্গলা মাসের প্রথম তারিখে একখানি দীর্ঘাকার মাসিক প্রভাকরের বিশেষ সংখ্যা বাহির হইত। ইহাতে গুপ্ত কবির স্বরচিত অনেক কবিতা থাকিত। এই কাগজের এত বেশী আদর ও প্রতিপত্তি ছিল যে নির্দ্দিষ্ট দিনে পাঠক মণ্ডলী কাগজ পাওয়ার অপেক্ষায় না থাকিয়া দলে দলে প্রভাকরের আফিসের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইত।"

তারপরে আসিলেন মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র।

এইরূপে কবিতার উন্নতি হইলেও বাঙ্গলায় গদ্য সাহিত্য প্রথম হইতেই নিতান্ত উপেক্ষিত ছিল, কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেবের সময় হইতেই গদ্য সাহিত্যের প্রথম উন্নতি আরম্ভ হয়। তবে তখন গদ্যেও পদ্যের ছাপ থাকিত। পদ্যের ছন্দোবদ্ধ থাকিত, গদ্যে তাহা থাকিত না। কিন্তু বাক্যবিন্যাস প্রায় একরকমেরই থাকিত। নরোত্তমদাস গদ্যে লিখিয়াছিলেন, "অতএব স্বরূপ রূপ এক বস্তু হয়।" ইহা পদ্যেও ব্যবহৃত হইতে পারে। "তাহাকে জানিব কেমনে"—ইহা গদ্য ও পদ্যে উভয় প্রকারেই ব্যবহার করা যায়। তবে একথা ঠিক যে বাঙ্গলাগদ্যের প্রথম পরিচয় হয় 'বৈষ্ণব-কবিগণের' সহজিয়া সাহিত্যে।

তখন সামান্য চিঠিপত্র, খত্, কবালা, পাট্টা কবুলিয়ত আদালতের বা চাকুরীর জন্য দরখাস্ত, আর্জ্জি, জবাব বা ব্যবসায়ের রোকা ভিন্ন অন্য কিছু বড় গদ্যে লিখিত হইত না। আর তাহাতে উর্দ্দু ফারসী মিশ্রিত কথা থাকিত।* যেমন "আপন আপন রাজি রকবতে স্বইচ্ছাপূর্ব্বক সাবুদ আকলে বহাল তবিয়তে বিক্রয় করিলাম।"

এদিকে সমাজ শিরোভূষণ সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণও বাঙ্গলা ভাষাকে বড়ই অবজ্ঞা করিতেন। তাহারা চিঠিপত্র পর্য্যন্ত সংস্কৃতে ভিন্ন লিখিতে চাহিতেন না, আর তাহাও হইত দুর্ব্বোধ্য সংস্কৃত। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত বাঙ্গলা গদ্য সাহিত্যের এই অবস্থা ছিল।

---

* এইসব দলিলের ভাষার নমুনার জন্য স্বর্গীয় দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য'গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ পাঠকবর্গকে পড়িতে অনুরোধ করি।

তখন মিসনরীরা নানাভাবে ধর্ম্মপ্রচারের ব্যবস্থা করিয়াছে, স্থানে স্থানে ব্যাপটিষ্ট মিশন স্থাপিত হইয়াছে। প্রচারকগণ গ্রাম পর্য্যন্ত বাদ দেয় নাই, বক্তৃতা আলোচনার অভাব নাই, কিন্তু বুঝান যাইবে কিরূপে? কয়জন ইংরাজ জানে? তাহারা বাঙ্গলাভাষার প্রচলনে ব্রতী হইল। ধর্ম্মপ্রচারের সুবিধা উদ্দেশ্য হইলেও তাহাদের দ্বারা বাঙ্গলাভাষার কিছুটা উন্নতি হইয়াছে এবং তজ্জন্য তাহাদের কাছে আমাদের ঋণ স্বীকার করা কর্ত্তব্য। খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার যেমন ইংরাজীতে সম্ভব নয়, এদিকে কোম্পানীর এবং আদালতের কার্য্যনির্ব্বাহও সংস্কৃত বা ইংরাজীতে সম্ভব নয়। ১৭৭৩ খৃঃ রেগুলেটিং য়্যাক্ট পাশ হয়। তারপরেই এই চেষ্টা বিশেষ বলবতী হয়। কোম্পানীর কর্ম্মকর্ত্তাগণ (Writers of the Company) নানাভাবে বাঙ্গলা প্রচারে সচেষ্ট হইলেন।

প্রথমযুগে ইংরাজদের মধ্যে বাঙ্গলা প্রচারের জন্য তিনজন বিশেষ অগ্রণী ছিলেন। হেলহেড, উইলকিন্স এবং ফোরষ্টার। তখন বাঙ্গলা অক্ষরের মুদ্রাযন্ত্র ছিল না, কাঠের অক্ষর হইতে ছাপা হইত। ওয়ারেন হেষ্টিংসের নির্দ্দেশে উইলকিন্স* বহু অধ্যবসায়ে এবং বড়ানিবাসী পঞ্চানন কর্ম্মকারের সহায়তায় এই কার্য্য সমাধা করেন। এই মুদ্রাযন্ত্রেই N. B. Halhedt-এর বাঙ্গলা ভাষায় ব্যাকরণ মুদ্রিত হয়। ব্যাকরণখানির ভিতরের কথা সবই বাঙ্গলায়, তবে সাহেবদিগকে বুঝান হইয়াছে ইংরাজীতে। তবে অক্ষর দৃষ্টে মনে হয় তখন পর্য্যন্ত সংযুক্ত অক্ষর ছেনিকাটা অক্ষরে মুদ্রিত হইতে পারে নাই। কাঠের অক্ষর হইতেই ছাপা হইয়াছে*।

পুস্তকে অনেকগুলি উদাহরণ বাঙ্গলা ভাষায় দেওয়া আছে।

"তার পুত্রে মোর পুত্র জিহুক সমরে
রাজাগণ মধ্যে যেন অপমান করে।"

"মেঘের বিক্রমসম মাঘের হিমানী" ইত্যাদি

সাহেবদের বুঝাইবার জন্যই যে হেলহেড† "বাঙ্গলা ব্যাকরণ" (A Grammar of the Bengal Language) রচনা করিয়াছেন তাহা নিম্নলিখিত বাঙ্গলা অক্ষরে পুস্তকের প্রারম্ভে লিখিত কথায় প্রকাশ পায়—

"বোধপ্রকাশং সর্ব্বশাস্ত্র
ফিরিঙ্গিনামুপকারার্থং
ক্রিয়তে হালেয়াদ্‌ঙ্গ্রেজী।"

হেলহেডের ব্যাকরণই বাঙ্গলা ভাষার প্রথম পুস্তক।* ইহা ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

বাঙ্গলা অক্ষরে দ্বিতীয় পুস্তক ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে ফোরষ্টার কর্ত্তৃক—আইনের বঙ্গানুবাদ উক্ত অক্ষরেই মুদ্রিত হয়। তৃতীয় পুস্তকও ফোরষ্টারের অভিধান ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে প্রথম খণ্ড বাহির হয় এবং দ্বিতীয় খণ্ড বাহির হয় ১৮০২ খৃষ্টাব্দে। ফোরষ্টার খুব ভাল বাঙ্গলা জানিতেন†এবং ইনিই সর্ব্বপ্রথমে সরকারী ও শিক্ষিতের ভাষা বলিয়া বাঙ্গলা ভাষার মর্য্যাদা বাড়াইয়া দেন। আর তাহার কৃত অভিধানই সর্ব্বপ্রথম 'বাঙ্গলা অভিধান।'

---

* তাহাকে বাঙ্গলার Caxton বলা যাইতে পারে। Cal. Review 1850 p. 134.

† হেলহেড (১৭৫১-১৮৩০) বক্তা সেরিডেন ও পণ্ডিতপ্রবর স্যার উইলিয়াম জোন্সের বন্ধু ও সহাধ্যায়ী। ১৭৭৪ খৃঃ হিন্দু আইন অনুবাদ করেন। বাঙ্গলায় আসিবার পরে ওয়ারেন হেষ্টিংস এবং স্যার ইলাইজা ইম্পের সহিতও বন্ধুত্ব হয়। ইংলণ্ডে পৌঁছিয়া ওয়ারেন হেষ্টিংসের স্বপক্ষে সেরিডেনকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলে, সেরিডেন জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তাহার সঙ্গে কথা বন্ধ করেন! এদিকে আবার Richard Brothers নামক এক ব্যক্তি ফরাসী বিপ্লবের সময়ে ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে "গণতন্ত্র শাসন ভিন্ন কোন রাজ্যেই কিছু থাকিবে না"। ব্রাদার্স রাজদ্রোহের জন্য দণ্ডিত হন, কিন্তু হেলহেড ইম্পের অমতেও তাহার পক্ষে সভ্য হিসাবে পার্লামেণ্টে যে বক্তৃতা করেন, ঐরূপ বক্তৃতা পার্লামেণ্টে কচিত হইত। হিন্দু সংস্কৃতির উপর তাহার গভীর শ্রদ্ধা ছিল। চুঁচুড়ার গভর্ণরের কন্যা হেলেনাকে বিবাহ করেন। Vide Calcutta Review 1856 "Warren Hastings Unpublished."

* পৃঃ ১৩৫ রক্ষণ, ১৬৮ অক্ষৌহিনী, ১৯৮ নিবেদনঞ্চ ইত্যাদি।

† ১৭৪৩ খৃঃ রোমান অক্ষরে পাদ্রী মানুয়েল দা—আস্‌সুম্পসাঁও রচিত বাঙ্গলা অভিধান লিস্‌বনে পাওয়া যায়, Vide— Sir George Grierson's Linguistic Survey of India Vol. V, Part I page 23.

১৮১০ খৃষ্টাব্দে অনৈক বাঙ্গালী মোহন প্রসাদ ঠাকুরও একখানা অভিধান বাহির করেন। *

শ্রীসজনীকান্ত দাস যে বলেন, আফজনের অভিধান প্রথম (১৭৯৩) ইহা অনুমান মাত্র। যে প্রমাণ দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে উৎফুল্ল হইয়া ফোরষ্টারের প্রাপ্য সম্মানের হানি করা অসঙ্গত। যে অভিধানখানি পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে আফজনের নাম নাই, বৎসর নাই। কেবল ক্রনিক্যাল প্রেস থাকারই তারিখ ধরিয়া তিনি বলেন, ইহা আফজনের এবং ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে রচিত, কিন্তু আফজনের ছাপাখানার নাম ছিল The Calcutta Chronicle Press, শুধু ক্রনিক্যাল নয়; আর ফোরষ্টার (১৭৯৯), কেরী ১৮৩৫, তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী, ১৮২৮, রামকমল সেন, ১৮৩৪ নিজ নিজ অভিধানে আফজনের নাম করেন নাই। Longman বা ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়ায় ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাসেও আফজনের নাম নাই। সুতরাং সজনীবাবুর অনুমান স্বকপোলকল্পিত, পুষ্ট যুক্তির উপর উহার ভিত্তি নাই। পুর্ব্বে আরও কিছু কিছু গ্রন্থ ব্যাকরণ বা অভিধান মুদ্রিত হইবার কথা অবাস্তব না হইতেও পারে, কিন্তু কথিত পুস্তকখানিতে interpolations (বাহিরের কথা সন্নিবিষ্ট) থাকাতে উহা আমরা স্বীকার করিয়া লইতে পারি না। পুস্তকখানির নাম Extensive Vocabulary of Bengali and English. কিন্তু ইহার পরে কয়েকটি শব্দ পুস্তকের মালিকের হাতের লেখা। ১৭৯৩ অব্দটিও তাহারই হাতের লেখা কিন্তু লণ্ডনে ইণ্ডিয়া আফিসের ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের ক্যাটালগে এই হাতের লেখা কথাগুলিও উঠিয়াছে, তাই গবেষক মহাশয় ১৭৯৩ দেখিয়া একটা অদ্ভুত গবেষণা করিয়া ফেলিয়াছেন।†

উপরোক্ত তিনজন সিভিলিয়ান পত্তন করিলেন, তৎপরে কোলব্রুক, স্যার উইলিয়ম জোন্‌স, ইয়েট্‌স প্রভৃতিও সহায়তা করেন এবং সময় সময়ে পাদ্‌রী কেরী মার্সম্যান ও ওয়ার্ড বাঙ্গলা ভাষার পুষ্টিসাধন করিতে লাগিলেন।

১৮০০ খৃষ্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। দেশীয় পণ্ডিতগণ উচ্চ বেতনে নিযুক্ত হন এবং বাঙ্গলা ভাষায় গ্রন্থ রচিত হইতে লাগিল।

খাঁটি বাঙ্গলার প্রথম পুস্তক মিশনরীদের। ইতিপূর্ব্বে আমরা বিভিন্ন প্রবন্ধ ও সাহিত্যের কথা নামক পুস্তকে দেখাইয়াছি যে শ্রীরামপুরের একটী ছাপাখানার ৮০০পৃষ্ঠার একখানি বহি "ধর্ম্মপুস্তক" ১৮০০ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এই পুস্তক আমরা দেখিয়াছি এবং ইহার প্রথম পৃষ্ঠার প্রতিলিপিও উক্ত পুস্তক 'সাহিত্যের কথা'য় বাহির হয়। ৮০ পৃষ্ঠার পুস্তকখানি প্রায় ২।৩ বৎসর সময় মুদ্রাঙ্কনের জন্য লাগিবার কথা। * এদিকে কেরী সাহেব পঞ্চানন কর্ম্মকারের সহায়তায় ১৮০০ খৃষ্টাব্দেই শ্রীরামপুরে Baptist Mission Press স্থাপন করেন, কেরী সাহেব সম্বন্ধে যাহারা গবেষণা করেন, তাঁহারা পুস্তকখানি সম্বন্ধে কোন উল্লেখই করেন নাই। অথচ পুস্তকখানি ঠিকই আছে এবং ইহার পূর্ব্বে আর কোন খাঁটি বাঙ্গলায় লিখিত পুস্তক নাই। আমরা অন্যান্য গবেষকদিগকে এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়াছিলাম কিন্তু তাঁহারা নীরব। এখানিকে প্রথম খাঁটি বাঙ্গলা পুস্তক বলা যায়। তবে এ সম্বন্ধে আরও আলোচনা বাঞ্ছনীয়।

ব্যাপটিষ্ট মিসন প্রেসে ১৮০১ খৃষ্টাব্দে কেরী সাহেবের বাঙ্গলা ভাষার শিক্ষক রামরাম বসুর প্রতাপাদিত্য প্রকাশিত হয়। প্রতাপাদিত্যের ভাষা—

"নওবৎখানার উপরে ঘড়ি ঘর। সে স্থানে ঘড়িয়ালেরা তাহাদের ঘড়িতে নিরক্ষণ করিয়া থাকে। দণ্ড পূর্ণ হইবা মাত্রই তারা তাহাদের ঝাঁজের উপর মুদগর মারিয়া জ্ঞাত করায় সকলকে।

* Calcutta Review 1852. Vol. XVIII Miscellaneous Notes V.

† সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় ১৪৩ "বাঙ্গলা অক্ষরে মুদ্রিত প্রথম বাঙ্গলা অভিধান" শীর্ষক প্রবন্ধে সজনীবাবু আলোচনা করিয়াছেন।

* দিনেমারদিগের কয়েকটি ছাপাখানা ছিল। পঞ্চানন কর্ম্মকার উঁহাদের দ্বারাই রায় রায়ান উপাধিতে ভূষিত হয়।

† শ্রীরামপুরের ফণীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী উকীল এবং হুগলী জিলার ইতিহাস লেখক শ্রীসুধীরকুমার মিত্র প্রমুখ বহু সাহিত্যিক আমাদিগকে সমর্থন করেন। ফণীন্দ্রবাবুর কাছে পুস্তকখানি আছে।

রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়ের "রাজা কৃষ্ণচন্দ্র চরিত্র" প্রথমে ১৮০১ প্রকাশিত হয়।* ইহার পরে উল্লেখযোগ্য ফোর্ট-উইলিয়াম কলেজের সর্ব্ব প্রধান বাঙ্গলার অধ্যাপক মৃত্যুঞ্জয় তর্কলঙ্কারের রাজাবলী (১৮০৮) এবং প্রবোধ চন্দ্রিকা ১৮১৩, পুস্তক—মৃত্যুঞ্জয়ী ভাষার নমুনা—

"কোকিল কলালাপবাচাল যে মলয়াচলানীল, সে উচ্ছলচ্ছীকরাত্যচ্ছ নির্ঝরাম্ভঃ কণাচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছে।"

পাদরী সাহেবেরা কথোপকথনেও অনুবাদের ভাষা ব্যবহার করিত—যেমন

"একটা সুমানুষের ছুহিতা স্থির করিয়া তিনি লিখিবেন।"

"সমাচার চন্দ্রিকা পত্রিকায়"ও এরূপ বাঙ্গলা অনেক বাহির হইত।

ইহাই বাঙ্গলা ভাষার প্রথম স্তরের ইতিহাস।† তারপর রাজা রামমোহন রায়ের যুগ। তিনি ইংরেজী Brahminical Magazine (১৮২১) ও বাঙ্গলা 'ব্রাহ্মণ সেবধি'তে হিন্দু ধর্ম্মের পোষকতা করেন এবং বহুগ্রন্থ (বেদান্ত গ্রন্থ ১৮১৫, বেদান্তসার ১৮১৭, কেনোপনিষৎ ঈশপোনিষদ্, ভট্টাচার্য্যের সহিত বিচার, সহমরণ বিষয়ক সংবাদ রচনা) এবং "সংবাদ কৌমুদী" (১৮২১) পত্রিকা সম্পাদনা করেন। রামমোহনের প্রচেষ্টা খুবই মহৎ, কিন্তু তথাপি বলিতেই হইবে যে বাঙ্গলা এবং গদ্য সাহিত্য অনেকটা নিয়মবদ্ধ ও অপেক্ষাকৃত সহজ বোধ্য হয় বটে, তবে আশানুরূপ সারল্য ও মাধুর্য্য লাভ করিতে পারিলনা।

ইতিমধ্যে আদালত হইতে ১৮৩৯ খৃঃ হইতে পারস্য ভাষা উঠিয়া যায়। আর ইহার চারি বৎসর মধ্যেই মুদ্রাযন্ত্র স্বাধীন হয়। রামমোহনকে উত্তর দেওয়ার জন্য মিসনরীরা তাঁহার ব্রাহ্মোনিক্যাল ম্যাগাজিনের অনুকরণে বাহির করে "Gospel Magazine" (গস্‌পেল ম্যাগাজিন)।

* লং সাহেবের তালিকায় ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত বলিয়া লিখিত।

† হালহেডের বাঙ্গলা ব্যাকরণ, ফোরষ্টারের অভিধান, প্রতাপাদিত্য কৃষ্ণচন্দ্র চরিত ও মৃত্যুঞ্জয়ের প্রবোধচন্দ্রিকা—

তারপরে সাগরী যুগ। প্রাতঃস্মরণীয় পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় এই যুগের প্রথম ও সর্ব্বপ্রধান। ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বেতাল পঞ্চবিংশতি প্রকাশিত হয়। ইহার প্রথম সংস্করণে বিলক্ষণ শব্দাড়ম্বর থাকিলেও উহা সহনীয়। বাংলা ভাষা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের হাতে বিশেষরূপে মার্জ্জিত হইয়া উঠে। মদনমোহন তর্কলঙ্কার, কাদম্বরী প্রণেতা তারাশঙ্কর, অক্ষয় কুমার দত্ত, সোমপ্রকাশ সম্পাদক দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ প্রভৃতিও—গদ্য সাহিত্যের যথেষ্ট উন্নতি সাধন করেন। মদনমোহনের শিশুশিক্ষা তৃতীয় ভাগ, অক্ষয় কুমার দত্তের চারুপাঠ (১ম, ২য় ও ৩য় ভাগ) ও বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার ১৮৫১-৫২ খুবই সুন্দর, ভাবগর্ভ ও শিক্ষাপ্রদ, কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সীতার বনবাস প্রভৃতির ভাষা আরও গাম্ভীর্য্যপূর্ণ। আর সীতার বনবাস প্রভৃতি গ্রন্থে* একভাবের শব্দ শৃঙ্খলা থাকায় পড়িতে ভাল লাগে। জীবন চরিত, বোধোদয় ও প্রবন্ধাদিতে বিদ্যাসাগর মহাশয় আরও ভাষা সুসংযত করিতেছিলেন, কিন্তু স্বীকার করিতেই হইবে—সাগরী ভাষা বাঙ্গলার প্রাণের ভাষা নহে। বিশেষতঃ গল্পের আখ্যান পাশ্চাত্য সাহিত্য হইতে সংগৃহীত। গুপ্তকবি এ সম্বন্ধে একটু আক্রমণ করিয়াছেন—

"তোমার আছে কি পুঁজি সকলের ধারো
ধার করা ভাব লয়ে যা করিতে পারো
ধেরো হয়ে হেরো হ'লে মুখে বল জিত
জানিতে না পারো কিছু কারে বলে হিত।"

সাগরী ভাষার বিদ্রূপ "প্রভাকরে"ও বাহির হইত। কবিগুরু যে কেবল কবিতাই লিখিতেন তাহা নয়, প্রভাকর পত্রিকা গদ্য সাহিত্যেও বাঙ্গলার প্রধান সম্পদ হইয়া উঠিল। দীনবন্ধু, বঙ্কিম, মনোমোহন বসু ভিন্ন ভিন্ন দিকে গুরুদেব ঈশ্বর গুপ্তের সারল্য আশ্রয় করিয়াছিলেন।

* বেতাল পঞ্চবিংশতি রচিত ১৮৪৬, মুদ্রিত ১৮৪৭, বাংলার ইতিহাস ১৮৪৮। জীবন রচিত ১৮৪৯, শিশুশিক্ষা ৪র্থ ভাগ ও বোধোদয় ১৮৫১, শকুন্তলা ১৮৫৪, কথামালা ১৮৫৬, চরিতাবলী ১৮৫৬, মহাভারতের উপক্রমণিকাদি ১৮৬০, সীতার বনবাস ১৮৬০, আখ্যানমঞ্জরী ১৮৬৩ ভ্রান্তি বিলাস ১৮৬৯।

একদিকে সাগরী ভাষা ও গুপ্ত কবির মৌলিকত্বের আহ্বান! অন্যদিকে সকলকে বুঝাইবার জন্য ভাষার প্রবল চাহিদা। ঠিক এই সময়ে "মাসিক পত্রিকা" বাহির হয়, (১৮৫৭) সম্পাদনা করেন প্যারীচাঁদ মিত্র ও রাধানাথ শিকদার। ইহা সহজ ও প্রচলিত বাঙ্গলায় লিখিত হইল। এই পত্রিকায়ই প্যারীচাঁদ "টেকচাঁদ ঠাকুর" ছদ্মনামে "আলালের ঘরের দুলাল" উপন্যাস বাহির করেন। ইহা এবং হরিনাথ মজুমদারের বিজয় বসন্তই বাঙ্গলার প্রথম উপন্যাস। ইহার অনুকরণেই কালীপ্রসন্ন সিংহে "হুতোম পাঁচার নক্সা" বাহির হয়।

বঙ্কিম আলালের ভাষার খুব প্রশংসা করেন—ইহাকে সকলের বোধগম্য মনে করেন, ভাষায় প্রাণের কথা ব্যক্ত করা যায় বলিয়া ইহাকে অভিনন্দন করেন এবং বাঙ্গলা উপন্যাসের পথপ্রদর্শক হিসাবেও শ্রদ্ধা করেন, কিন্তু ইহাতে অমার্জ্জনীয় গ্রাম্যদোষ এবং ফার্সী শব্দের প্রাচুর্য্য (বেতমিজ, মদৎ, বাকুলা, তজবিজ, ফয়সালা) ইত্যাদি থাকায় তিনি এই ভাষাও আদর্শ হিসাবে বর্জ্জনীয় মনে করেন।

বঙ্কিমের আবির্ভাবের পূর্ব্বে ইহাই বাঙ্গলা গদ্য ও উপন্যাসের সংক্ষিপ্ত পরিচয়। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে গুপ্ত কবি পরলোকগমন করেন এবং সেই বৎসরেই দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অনুপ্রেরণায় "সোমপ্রকাশ" সাপ্তাহিক পত্র সম্পাদনা করেন। যাহা হউক, এই যুগ সন্ধিস্থলে বঙ্কিমচন্দ্র কিরূপে সাগরী ভাষার সংস্কৃত বহুল শব্দ এবং আলালী ভাষার দোষাবলী বর্জ্জন করিয়া মধ্যপথ অবলম্বন করিয়া সাহিত্যরাজ্যে প্রদীপ্ত ভাস্করের ন্যায় অপূর্ব্ব ভাষার প্রবর্ত্তন করেন, ক্রমে আমরা ইহার পরিচয় দিব।

কবিতায় বঙ্কিম

প্রথমে বঙ্কিম কবিতা লিখিতেন। ১৩ বৎসর বয়সে 'সংবাদ প্রভাকরে' রচিত একটী কবিতা কবিগুরুর দৃষ্টি আকর্ষণ করে—

স্ত্রী—কহনা কি হেতু কান্ত শশী অস্তাচলে
পতি—তব মুখ দুখ হ'য়ে চলে অস্তাচলে
স্ত্রী—দশদিক কেন প্রাণ প্রকাশিত হয়
পতি—তোমার মধুর স্বর পাইবার তরে ইত্যাদি

শ্রী ব, চ, চ

ঈশ্বর গুপ্ত মহাশয় কবিতাটি ছাপাইয়া নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশ করেন—

"উক্ত ছাত্রের বয়স অত্যল্প, কিন্তু এই পদ্য অতি প্রাচীন কবির রচনার ন্যায় উত্তমরূপে রচিত হইয়াছে। এইজন্য সকলেই তাহাকে সাধুবাদ প্রদান করিবেন।"

পরের মাসে বসন্ত নামে একটী কবিতা অষ্টমাবস্তায় চট্টোপাধ্যায় নামে বাহির হয় (১৪ই মার্চ্চ, ১৮৫২); ইহার পরে বঙ্কিমের, দীনবন্ধুর ও কৃষ্ণনগর কলেজের দ্বারকানাথ অধিকারীর কবিতা নিয়'মত ভাবে প্রভাকরে বাহির হইত এবং গুপ্ত কবি তিনজনকেই বিশেষ উৎসাহিত করেন। বঙ্কিমের "বসন্তের নিকট বিদায়" কবিতাটিও প্রভাকরে বাহির হয় (১৬ই বৈশাখ, ১২৬০)। এইসব কবিতার জন্য ঐ তিনজন যুব-কবিই বিভিন্ন স্থান হইতে পারিতোষিক লাভ করিতেন। আরেকটি পুরস্কারের* টাকা কবিগুরু বঙ্কিমকে দেওয়ার জন্য হুগলী কলেজের প্রিন্সিপ্যাল মি: জে, কার (J. Kerr)-কে পাঠাইয়াছিলেন। কার সাহেবও এই শুভ সংবাদটি ফোর্ট উইলিয়ামের এডুকেশন কাউন্সিলকে ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের একখানি চিঠিতে রিপোর্ট করিয়াছিলেন।†

---

* ৪২৫৯ সংখ্যা বুধবার, ১৪ ফাল্গুন, ১২৫৮, ফেব্রুয়ারী ১৮৫২।

† To the Secretary to the Council of Education, Fort William, Hooghly the 20th February 1854.

I have the honour to report for the information of Council of Education that I have received twenty rupees to be awarded to Bankim Chandra Chatterjee, a pupil of the first class of the Senior School for some good poetical compositions in Bengalee that appeared in Prabhakar News Paper. The prize of twenty rupees was awarded by Babu Ramanimohan Roy and Kallycharan Roy Choudhury, Zemindars of Rungpore and was sent through Baboo Iswar Chandra Gupta the editor of the above mentioned journal J. Kerr, Principal.

যাহা হউক, বঙ্কিম কেবল কবিতাই রচনা করেন নাই। তৎকালীন প্রথানুসারে কবির লড়াইতেও প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু বালক হইলেও সেই লড়াই হইত অতি সংযত এবং সুসঙ্গতভাবে। প্রভাকরে দ্বারকানাথ, দীনবন্ধু ও বঙ্কিমচন্দ্র পরস্পরকে গালাগালি দিতেন। তখনও দেখাশুনা নাই, পত্রের দ্বারা বন্ধুত্ব জন্মিল। এই গালাগালি "কালেজীয় কবিতাযুদ্ধ" নামে অভিহিত হইত। পূর্ণচন্দ্র বলেন :

"একবার একখানি পত্র পড়িতে পড়িতে বঙ্কিম বড়ই হাসিতেছিলেন। আমি তখন দেখি, দেখি, বলিয়া তাঁহার হাত হইতে লইবার চেষ্টা করিলাম। আমি তখন বালক, আমাকে ধমক দিয়া বাক্স বন্ধ করিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের স্বভাবই এইরূপ ছিল যদি কখনও কাহারও উপর বিরক্ত হইয়া ধমক দিতেন, তাহার পরক্ষণেই আবার সেই ব্যক্তিকে ভাল কথা বলিতেন। একটু পরেই নরমসুরে আমাকে বলিলেন, "তুমি কি বুঝিবে ? ইহা কবিতা। দীনবন্ধু কবিতায় আমাকে গালি দিয়াছে।" আমি বলিলাম "আপনিও গালি দিয়া লিখুন"। তিনি উত্তরে বলিলেন, "লিখিব বই কি।"

এইবার কালেজীয় কবিতা যুদ্ধের একটু পরিচয় দিব—

দ্বারকানাথ দীনবন্ধুকে বলিতেন সহুরে কবি ও বঙ্কিমকে বলিতেন—"চট্টো কবি", আর দীনবন্ধু পাল্টা উত্তর দিয়া দ্বারকানাথকে বলিতেন "বুনোকবি।" একবার দীনবন্ধু দ্বারকানাথকে গালাগালি দিয়া লিখিলেন "শাখায় কুরঙ্গ"। অমনি চট্টোকবি লিখিলেন—(১৮৫৩)

কৃপা করি কহ স্বীয় সরল স্বভাবে
"শাখায় কুরঙ্গ" তুমি বলেছ কি ভাবে।

অমনি সহুরে কবি গাহিলেন—

"হা হা ভাই বুঝতে পারি নি এই গাল
এর ভাব ঠিক যেন পাড়াগেঁয়ে ডাল !
শাখায় কুরঙ্গ আমি এভাবে লিখেছি
কৌশল করিয়া মিত্র বানর বলেছি
আর এক ঠাঁই দেখ, করি অনুমান
কহিয়াছি তারে আমি বীর হনুমান।
বুক চিরে রাম লিখে কে বেঁধেছে বাণে
রামচন্দ্র দীনবন্ধু হনুমান বিনে ॥

চট্টো কবি বুনো কবির বরাবর লিখিলেন—

জান কেন অধিকারী, কবিতা মাঝারে
মোরে আদি কবি বলে দ্বিতীয় তোমারে।
ইত্যাদি

অন্যত্র সহুরে কবি লেখেন—

বুনোরে যদ্যপি আমি বলি কুবচন
তাহাতে ঈশ্বর রুষ্ট হবেনা কখন
কারণ ভূলোক মাঝে ইহা জানে কে না
ঈশ্বর আমার কাছে চিরকাল কেনা।

বঙ্কিমচন্দ্রের "তিন মিত্রের কথোপকথন" কবিতা (প্রভাকর ১৮৫৩, ২০ মে) এবং পরের মাসে লিখিত "দম্পতির রসালাপ"ও সরস কবিতা।

দ্বারকানাথ সম্বন্ধে বঙ্কিম লিখিয়াছেন—

"তাঁহার রচনা প্রণালীটা কতকটা ঈশ্বরগুপ্তের মত ছিল সরল স্বচ্ছ, দেশী কথায় দেশীভাব তিনি ব্যক্ত করিতেন। অল্প বয়সেই তাহার মৃত্যু হয়। জীবিত থাকিলে বোধ হয় তিনি একজন উৎকৃষ্ট কবি হইতেন। দ্বারকানাথ, দীনবন্ধু, ঈশ্বরচন্দ্র সকলেই গিয়াছেন তাঁদের কথাগুলি লিখিবার জন্য আমি আছি।

বঙ্কিমচন্দ্রের "ললিতা ও মানস" কবিতাদ্বয় ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে রচিত হয়। "মানসে" পরিণত মতির পরিচয় পাওয়া যায়—

ভাবিবা ঝটিকা মত ছিল মম মন
এ গভীর সিন্ধুর মত হয়েছে এখন
কারো অনুরাগী নই বিনা সনাতন
জপিয়া পবিত্র নাম হইব পতন ॥
অনন্ত মহিমা স্মরি ছাড়িব এ দেহ,
জানিবে শুনিবে না কাঁদিবে না কেহ
অনিবার জলরব কাঁদিবে কেবল
আছে কি পৃথিবী হেন বিমোহন স্থল ?

বঙ্কিমচন্দ্র প্রভাকরে এই দুইটি কবিতা প্রকাশ করেন নাই এবং অতঃপর প্রতিভামণ্ডিত বালক-হৃদয়ে পাশ্চাত্য কবির প্রভাব পড়ায় প্রভাকর তাহার কাব্য-পিপাসা মিটাইতে সমর্থ হইল না। তাহার ভাবধারা আরও উর্দ্ধে প্রবাহিত হইতে লাগিল। কিন্তু জীবনের শেষ দিন

পর্য্যন্ত গুণমুগ্ধ বঙ্কিমচন্দ্র ঈশ্বরচন্দ্রের ঋণ স্বীকার করিতে বিস্মৃত হন নাই।

ইহার পরে প্রাপ্ত বয়সে রাজার উপরে রাজা, বিরহিণীর দশদশা ও আরও কয়েকটি (বেশী সংখ্যক নহে) কবিতা ছাড়া অতঃপরে বঙ্কিম আর কবিতা লিখিয়াছিলেন বলিয়া আমরা জ্ঞাত নহি।

বঙ্কিমের প্রথম গদ্য রচনা

বঙ্কিমচন্দ্র পদ্যের সঙ্গে গদ্যও যে লিখিতেন না, তা নয়, কিন্তু তাহা হইত দুর্ব্বোধ্য বাঙ্গলা। চতুর্দ্দশ বয়সের সময় তাহার নিম্নবর্ণিত গদ্য বাহির হয়—

"গগনমণ্ডলে বিরাজিতা কাদম্বিনী উপরে কম্পায়মানা শম্পাসকাশ ক্ষণিক জীবনের অতিশত প্রিয় হওত মূঢ় মানব মণ্ডলী অহরহঃ বিষয় বিষার্ণবে নিমজ্জিত রহিয়াছে। পরমেশ প্রেম পরিহার পুরঃসর প্রতিক্ষণ প্রমদাপ্রেমে প্রমত্ত রহিয়াছে। অম্বুবিম্বসম জীবনে চন্দ্রার্কসদৃশ চিরস্থায়ী জ্ঞানে বিবিধ আনন্দোৎসব করিতেছে" শুক্রবার, ১২ই বৈশাখ, ১২৫৯। সংবাদ প্রভাকর

ছাত্র হইতে প্রাপ্ত—

হুগলী কলেজ—শ্রী ব চ চ

সম্পাদক মহাশয় মন্তব্য করেন—

"ইঁহার লিপি নৈপুণ্যের জন্য অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম, কিন্তু যেন অভিধানের উপর অধিক নির্ভর না করেন এবং অক্ষরগুলি স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।"

ইহার পরেও প্রভাকরে গদ্য রচনা 'বর্ষাঋতু' বাহির হয়। স্বাক্ষর থাকে শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—হুগলী কলেজ। সিনিয়ার "বৃত্তিলাভ করিয়া (১৮৫৬) বঙ্কিম "ললিতা ও মানস" মুদ্রাঙ্কিত করেন, কিন্তু পুস্তক বিক্রয় হয় নাই। বঙ্কিম নিজেই লিখিয়াছেন। "প্রকাশিত হইয়া পুস্তক বিক্রেতার আলমারীতে পচে, ছয়খানি পুস্তক মাত্র বিক্রয় হয়।" প্রভাকর বিদ্রূপ করিয়া উহাকে ভুলুয়ার প্রলাপ বলিয়া অভিহিত করিয়াছিল। কবিতা দুইটি বঙ্কিম পরিণত বয়সে সামান্য পরিবর্ত্তন করিয়া পুনর্মুদ্রিত করিয়াছিলেন। বঙ্কিমের পাঠ্যকালে অনুপ্রাসের বড় বাড়াবাড়ি ছিল—কথায় অনুপ্রাস, কবিতার অনুপ্রাস—আর সর্ব্বত্র কবির লড়াই। যাহাহউক ক্রমে হাওয়া ফিরিল।

অতঃপরে তিনবৎসর বিশেষ কিছু লেখেন নাই। তবে কাপ্তেন ডি, এল্ রিচার্ডসন সম্পাদিত Literary Gazetteএ কয়েকটি ইংরাজী কবিতা ও রজিনী নামে ইংরাজী ভাষায় লিখিত একটী গল্প বাহির করিয়াছিলেন।

অষ্টাদশ বর্ষ বয়সে বঙ্কিম একটী ছোট গল্প লিখিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার স্বরচিত জীবন-টীকায় লিখিয়াছেন—"গল্পের নামটি তিনি ভুলিয়া গিয়াছেন এবং পাণ্ডুলিপিও হারাইয়া ফেলিয়াছেন।" তবে "ললিতা ও মানসের" বিজ্ঞাপনটিতে বুঝা যাইবে তিনি তখনও (১৮৫৬) কিরূপ দুর্ব্বোধ্য বাঙ্গলা লিখিতেন—

"সুকাব্যালোচক মাত্রেরই অত্র কবিতাদ্বয় পাঠে প্রতীতি জন্মিবেক যে ইহা বঙ্গীয় কাব্য রচনা রীতি পরিবর্ত্তনের এক পরীক্ষা বলিলে বলা যায়, তাহাতে গ্রন্থকার কতদূর সুত্তীর্ণ হইয়াছেন, তাহা পাঠক মহাশয়েরা বিবেচনা করিবেন, তিন বৎসর পূর্ব্বে এই গ্রন্থ রচনাকালে গ্রন্থকার জানিতে পারেন যে নূতন পদ্ধতির পরীক্ষা পদবীরূঢ় হইয়াছেন। এবং তৎকালে স্বীয় মানস মাত্র রঞ্জনাভিলাষ জনিত এই কাব্যদ্বয়কে সাধারণ সমীপবর্ত্তী করিবার কোন কল্পনা ছিল না, কিন্তু কতিপয় সুরসজ্ঞ বন্ধুর মনোনীত হইবার তাহাদিগের অনুরোধানুসারে এক্ষণে জনসমাজে প্রকাশিত হইল। গ্রন্থকার স্বকর্ম্মার্জ্জিত ফলভোগে অস্বীকার নহেন, কিন্তু অপেক্ষাকৃত নবীন বয়সের অজ্ঞতা ও অবিবেচনা জনিত তাবৎ লিপি দোষের এক্ষণে দণ্ড লইতে প্রস্তুত নহেন।

গ্রন্থকার।"

সুকাব্যালোচক, সুত্তীর্ণ, সুরসজ্ঞ প্রভৃতি শব্দে পণ্ডিতি ঢং আছে। আদালতি ঢংও জাজল্যমান যেমন দণ্ড লইতে প্রস্তুত। সুতরাং রচনা কেবল কঠিন নয়, ভাষা না সাগরী, না মৃত্যুঞ্জয়ী, আদালত ও চতুষ্পাটির উহা অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ।*

এই সময় (১৮৫৭-৫৮) কলিকাতায়, কয়েকজন শ্বেতাঙ্গ (মিসনরী ও সিভিলিয়ান) এবং ডাক্তার রাজেন্দ্র-

* স্বর্গীয় অক্ষয় সরকার মহাশয়ও এরূপই বলিয়াছিলেন।

লাল মিত্র প্রমুখ ২।১জন বাঙ্গালী লইয়া একটি সমিতি গঠিত হইয়াছিল এবং এই সূত্রে বিজ্ঞাপন প্রচারিত হয় যে বাঙ্গলা মৌলিক পুস্তক লিখিতে পারিলে লেখক পুরস্কৃত হইবেন। বঙ্কিম একখানি নভেল লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন, কিন্তু পুস্তকখানি নামঞ্জুর হয়, তবে উক্ত সভার সম্পাদক মহাশয় লেখাটি অনেকটা আশাপ্রদ বলিয়া আরেকখানি গ্রন্থ লিখিয়া পাঠাইতে বলেন। বঙ্কিমচন্দ্র আরেকখানি পাঠান, সেখানিও নামঞ্জুর হয়। ইহাতে ডাকাতি প্রভৃতি ভীষণ ব্যাপার বর্ণিত আছে বলিয়া নাকি পাঠের অযোগ্য বিবেচিত হয়। আরেক জন প্রসিদ্ধ বাঙ্গলা লেখকেরও 'পিটার দি গ্রেটে'র বঙ্গানুবাদ অগ্রাহ্য হয়। এদিকে সম্পাদক মহাশয় কতকগুলি ইংরাজী আষাঢ়ে গল্পের অপদার্থ অপাঠ্য অনুবাদ করিয়া পুরস্কার লইতেন। সভ্যগণ ক্রমশঃ বুঝিতে পারিলেন বাঙ্গলা সাহিত্যের প্রচার না হইয়া বরং উহার সংহার হইতেছে, সুতরাং বুদ্ধির কাজ করিয়া সভাটি তুলিয়া দিলেন।

বঙ্কিমের এই দুইখানি অগ্রাহ্য উপন্যাস বলিয়া উহার দোষগুণ জানাইবার ক্ষমতা নাই, কারণ উহার পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায় নাই।

১৮৫৭ হইতে ১৮৬১ পর্য্যন্ত বঙ্কিমের রচনার কোন পরিচয় নাই। ইতিমধ্যে মধুসূদন, হেমচন্দ্র, দীনবন্ধু নাটক ও কাব্য রচনায় প্রত্যেকে এক একজন দিক্‌পাল হইয়াছেন।

'ইণ্ডিয়ান ফিল্ড' নামক কিশোরীচাঁদ মিত্র সম্পাদিত ইংরাজী সাপ্তাহিক পত্রে ১৮৬৪ খৃঃ অঃ বঙ্কিমের ইংরাজী উপন্যাস Rajmohon's Wife বাহির হয়। ইহা কোন্ সময়ের রচনা তাহা নির্ণয় হয় নাই, তবে ইহাই বোধ হয় ইংরাজী উপন্যাস লিখিতে প্রথম ও শেষ চেষ্টা। ইহাতে পল্লীবাসী বাঙ্গালীর পারিবারিক জীবন বর্ণিত হইয়াছে। অতঃপর বঙ্কিম ইংরাজী রচনা ছাড়িয়া দেন এবং কয়েক বৎসর পরে এই কাহিনীটিই একখানি বাঙ্গলা উপন্যাস আকারে লিখিতে প্রয়াস পান। মাত্র তিনটি অধ্যায় শেষ করেন, পরে বাকী অধ্যায় ভ্রাতুষ্পুত্র শচীশচন্দ্র সমাপ্ত করিয়া 'বারিবাহিনী' নামক পুস্তকে বাহির করেন।

খুলনায় বঙ্কিমচন্দ্র মেঘদূতের বঙ্গানুবাদ এবং অমিত্রাক্ষর ছন্দে দুই সর্গের অনুবাদও করিয়াছিলেন, কিন্তু গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় নাই।

ইংরাজীর মত বঙ্কিমচন্দ্র পদ্য লেখার প্রচেষ্টাও ছাড়িয়া দেন। শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের কথায়ই বলিতেছি—"পদ্যরচনায় সিদ্ধহস্ততা লাভ করিলেও, মধুসূদনের দীপ্ত প্রতিভায় আপনাকে পরীক্ষা করিয়া জানিতে পারিলেন যে সে পথ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে হইবে।"

অতঃপরে শুভক্ষণে গদ্য রচনায় লেখনী নিয়োগ করিলেন। 'দুর্গেশনন্দিনী'র মাত্র দুইটি অধ্যায় খুলনায় শেষ করেন। তারপরে নিরুৎসাহ পাইয়া তাহা ফেলিয়া রাখেন। দুই তিন বৎসরের মধ্যে আর সাহিত্য রচনার অবকাশ পান নাই, এইবার আরম্ভ করিলেন।

দুর্গেশ নন্দিনীর পূর্ব্বকার সময়ের বাঙ্গলা সাহিত্যের এবং বঙ্কিমের সাহিত্য সেবায় ইহাই আনুপূর্ব্বিক সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

চিঠি

পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়

শীতের সন্ধ্যা। মোক্ষদার ঘরে তখনও আলো জ্বলে নি। কম্বল মুড়ি দিয়ে বসে রয়েছে মোক্ষদা ও হরিশ। কম্বল ছেড়ে উঠে আলোর সুইচটা টিপে দিতেও গড়িমসি। বিশেষ মোক্ষদার হাত তখন উল বোনায় ব্যস্ত।

'একটু চা খেলে হত না মা!' বলে ওঠে হরিশ।

একতলা ঘরের ঠাণ্ডা পরিবেশে কম্বলটাকে আরও একটু মুড়ি দিয়ে বসে।

হরিশ মোক্ষদাকে মা বলে সম্বোধন করলেও আসলে সে তার মা নয়। কিছুদিন আগে হরিশের বাপ-মা যখন এক দুর্ঘটনায় এক সঙ্গে মারা যান, তখন হরিশ কাছাকাছি এই পিসিমার বাড়ীই এসে ওঠে। হরিশের আর কেউ ছিল না। পিসিরও এই হরিশই নিকটতম আত্মীয়। সারাটা জীবন সামান্য জমানো পুঁজি ভেঙে দিন চালাতে মোক্ষদা ভরসা পেত না। একটা কর্ম্মক্ষম ভাই-পো তার কাছে এসে আশ্রয় নিলে অবিলম্বেই তার রোজগারটা সে হাতে পাবে—এই ভরসায় মোক্ষদা হরিশকে বোঝা মনে করল না।

বোনা থামিয়ে মোক্ষদা বলে, 'পুরুষ মানুষ, কোথায় কখন কি অবস্থায় থাকতে হবে, এটুকু শীতেই কাবু হয়ে পড়লি যে!'

'শীতে আমি কাবু হইনি মা।' বলে হরিশ। 'সন্ধ্যার সময় চা একটু খাওয়ার ইচ্ছে তোমারও ত থাকতে পারে! বল ত আমিই না হয় ষ্টোভ ধরিয়ে চা করে দিই।'

'তা ত দিবি, কিন্তু চিনি?'

'দেখছিলাম যে কৌটোয় রয়েছে।'

'ওইটুকুনই ত জমিয়ে রেখেছি। চিনির যে অসুবিধে, তাতে যখন তখন চা খাওয়া কি চলে! তার পর কেরোসিন, তাও ত অপচয় করা সম্ভব নয়।'

পিসিমাকে হরিশ জানে। পিসির রোজগার নেই, কিন্তু কোম্পানীর কাগজের সুদটা বড় কম আসে না। তবুও বুড়ী হাড়-কৃপণ। হরিশকে আর স্কুলে পাঠালে না। সোজা এক ডিপার্টমেন্টাল ষ্টোরে ভর্ত্তি করে দিল। কিন্তু মাইনের টাকাটা হরিশ ধরতে পারত না কোন দিন।

হরিশ কিন্তু দমবার ছেলে নয়। কোত্থেকে কিভাবে নিজের চেষ্টায় সে ইলেক্‌ট্রিকের কাজে হাত পাকিয়েছে। যুদ্ধের কাজে যোগ দেওয়ার চেষ্টা করছে। খবরটা পিসির কাছে গোপন নেই। পিসি অবশ্য তাতে খুব খুশি নয়। সে দাবি করছে—'আমার ভরণপোষণের দায়িত্ব তোর। আমাকে দেখবার ত আর কেউ নেই,—তা তুই যুদ্ধে গেলে আমার চলবে কেমন করে, কে আমাকে দেখবে?'

হরিশ গেলে বুড়ীর খরচা কমে ঠিকই, কিন্তু হরিশের মাইনের টাকাটা যে তার কাছে এসে পৌঁছোবে এ ভরসা তার নেই। হরিশ কিন্তু ঠিক করে আছে যে, সে যুদ্ধের চাকরি নিয়ে যাবেই।

কিন্তু তার চেয়েও মুস্কিল হয়েছে—হরিশ বিয়ে করতে চায়। বিয়ে করলে যে সে আলাদা ঘর বাঁধবে এ বিষয়ে মোক্ষদা সুনিশ্চিত। আর একটি পয়সাও হরিশ তাকে দেবে না এর পরে।

হরিশের সঙ্গে আরতির মেলামেশা তাই মোক্ষদা দুচক্ষে দেখতে পারে না। আরতি কোথায় বাহিরে একটা নার্সের কাজ নিয়ে চলে গেছে। আপাতত মোক্ষদা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বেঁচেছে; হরিশের মন থেকে কিন্তু আরতি সরে যায় নি। তার মানস চক্ষে ভাসতে থাকে—কেমন ধবধপে পোষাক পরে আরতি ওয়ার্ডের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কত মুমূর্ষু বেদনায় ম্রিয়মাণ বিপন্ন নরনারী তার স্নেহ-যত্নে জীবন ফিরে পাচ্ছে। হরিশের ইচ্ছে বিয়ে করে বাসা বেঁধে তবে ও যুদ্ধের খাতায় নাম লেখাবে। দশটা দিনও যদি এক

সঙ্গে থেকে যেতে পারে, সেই আনন্দের স্মৃতি নিয়েই ও যুদ্ধের ভয়াবহ পরিবেশেও স্বপ্নের জাল বুনবে।

কিন্তু আশ্চর্য্য লাগে হরিশের, ও যে প্রস্তাব করে আরতিকে চিঠি লিখেছে, তার জবাব আসছে না কেন? খবরের কাগজ থেকে মুখ তুলে হরিশ প্রশ্ন করে, 'দু সপ্তাহের মধ্যে আমার একখানি চিঠিও আসে নি মা?'

'আমি ত কিছু জানি নে বাবা।' হরিশের দিকে চোখ-টেরে মোক্ষদা জবাব করে, 'তোর যত আদেখ্‌লে-পানা, ওই সব উড়ুক্কো মেয়ে, তা আবার হাসপাতালের নার্স হয়েছেন, কত দিন তোকে নাচিয়েছে, এখন আবার কার সঙ্গে নাচছে, কে জানে!'

এত বড় মিথ্যে কথাটা বলতে মোক্ষদার মুখের চেহারা এতটুকুও পরিবর্ত্তন হল না। কথাগুলো বেশ শ্লেষের হাসি মিশিয়েই বললে সে। কি নিষ্ঠুর, অভিসন্ধিমূলক তার এই মিথ্যা ভাষণ।

চিঠি কিন্তু আরতির সময় মতই এসেছে। আরতি লিখেছে:

'তুমি যেদিন বলবে, সেইদিনই তোমার সঙ্গে ঘর বাঁধব। তোমার বলার অপেক্ষায় আমি ত মিনিট ঘণ্টা গুণছি।'

চিঠিখানা যখন এসে পৌছায়, কালবিলম্ব না করে মোক্ষদা তখনই তা খুলে পড়ে। একবার নয়, অনেক বার। শুধু তাই নয়, মোক্ষদা নিজেই সে চিঠির জবাব দিয়ে দিয়েছে। সে লিখেছে:

'দুঃখের কথা তোমাকে কি বলব মা আরতি, ও কোন কথা শুনলে না, যুদ্ধে চলে গেল। বুড়ী পিসির কথা ত ভাবলেই না, তোমাকেও যে একটা কথা জানাল না, এই আশ্চর্য্য লাগছে। যুদ্ধে গিয়ে কি আর সে তোমার কথা মনে রাখবে? সেখানেও ত শুনি কত কেলেঙ্কারী, ছেলে-ধরা মেয়েদের রাজত্ব।'

পাশের বাড়ীর ছেলেটিকে দিয়ে বুড়ী চিঠিটা যেদিন ডাক বাক্সে ফেলিয়েছিল, সে দিন কি তার আনন্দ! 'কেমন জব্দ হয়েছে ছোকরা এবার? যুদ্ধের কাজের মাইনে থেকে নির্ভরশীল কারো কিছু পাওনা যদি হয় তা আমারই হবে।'

হরিশের সামনে বসে বসে মোক্ষদা বোনার কাঠি নেড়ে চলে, আর ভাবতে থাকে সমস্ত ব্যাপারটা। চোখের কোণ থেকে সসঙ্কোচে দৃষ্টি দিচ্ছিল হরিশের দিকে। এই সবল রুক্ষ স্বভাব তরুণের প্রেমের বেদনা সে যে বুঝতে পারছে না, তা নয়—তবু বয়স আছে, সবই সয়ে যাবে।

হরিশ উঠে ঘরের মধ্যে বার দুই পায়চারি করে। "কিছু খেতে দিতে পার মা? এক্ষুণি বেরোব।"

'শুক্‌নো রুটি আর আলুর ছেঁচকি আছে।' জবাব করে পিসি।

"ঠিক আছে, ওই ত রাজভোগ।' বলে হরিশ আলনা থেকে একটা হাফ শার্ট গায়ে চড়ায়। মোক্ষদা রান্না ঘরে গিয়ে ঢোকে। এমন সময় দরজার কড়া নড়ে ওঠে। হরিশ দরজা খুলতেই ঘরে এসে ঢোকে উপরতলার ছ'বছরের ফুটফুটে মেয়েটা। 'মাসিমা কোথায়? মা বললেন, দিদিমার খুব অসুখ। এক্ষুণি তাঁকে সেখানে যেতে হবে। আমার রাত্রের খাবারের জন্যে দুধ আছে, আপনি যদি দুখানা রুটি করে দেন, নইলে মার আবার যেতে দেরী হয়ে যাবে।'

'নিশ্চয়ই', জবাব করে হরিশ। 'তুমি আজ আমাদের প্রধান অতিথি।'

রান্নাঘর থেকে মোক্ষদা আসে হরিশের খাবার নিয়ে। মেয়েটিকে বলে, 'তুমি খাবে তাতে আর কথা কি? একটা কাজ কিন্তু করতে হবে তোমাকে লক্ষ্মীমেয়ে।'

'গান গাইতে হবে বুঝি?'

'না না, গান তোমার গাইতে ইচ্ছে করে—গাইবে। ওই ভাড়ারের কুঠুরিটার মধ্যে অনেক বাজে কাগজ জড় হয়ে আছে, সেগুলি একটু গুছিয়ে দেবে। মাকে বলে এসো আগে।'

'না না, আমি এক্ষুণি গুছিয়ে দিচ্ছি' বলেই মেয়েটি কুঠুরিতে ঢুকে পড়ল।

মিনিট খানেকের মধ্যেই খুকির মা উপর থেকে ডাকলেন। 'যাই মা' বলে বেরিয়ে এল খুকি। মোক্ষদাকে বললে, এগুলো গুছিয়েছি, আমি একটু পরে এসে সবটা গুছিয়ে দেবো।'

রুটি আর আলুর ছেঁচকি মুখে তুলতে তুলতে হরিশ বললে, 'দেখি, হাত দুটো! নোংরা হাত না ধুয়ে মা'র কাছে যেয়ো না, ছিঃ!'

কিন্তু খুকির হাতের কাগজগুলোতে দৃষ্টি পড়তেই হরিশ থমকে গেল, হাতের রুটি ছেঁচকি হাতেই রয়ে গেল। খুকির হাতে একটা খাম, শক্ত মুঠিতে ধরে আছে। তার উপর হরিশের নাম লেখা। সে হাতের লেখা ও চেনে।

'কোথায় পেলে তুমি এটা?'

'কাগজগুলো ঘাঁটতে ঘাঁটতে পেলাম। দাদার জন্যে নিয়ে যাচ্ছি। দাদা চিঠি থেকে টিকেট ছিঁড়ে নিয়ে জমায় কি না।'

হরিশের স্বর কঠিন হয়ে পড়েছে। চিঠিটা ওর হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে পিসির দিকে সে একটা অগ্নিদৃষ্টি হানে। 'এ চিঠির জন্য আমি দিনের পর দিন অপেক্ষা করছি, এ কেমন করে জঞ্জালের মধ্যে গিয়ে পড়ল?'

'তা-তা-তা—আমি ত জানিনে বা-বা।' এ টুকু বলতেই বুড়ী দুবার ঢোক গিল্‌ল। তার মুখের চেহারাটা এক মুহূর্ত্তে কেমন ফ্যাকাশে হয়ে গেল। জিভ দিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে বলতে চেষ্টা করে, 'এই সব দুষ্টু ছেলেরা কেউ পিয়নের কাছ থেকে নিয়ে থাকবে।'

'তোমার মাথা আর আমার পিণ্ডি!' গর্জ্জে ওঠে হরিশ। আলনা থেকে কোটটা টেনে কাবলী জুতোটায় পা ঢুকিয়ে হন হন করে বেরিয়ে যায়। দরজার কাছে এসে এক মুহূর্ত্তের জন্যে ফিরে দাঁড়ায়। 'চলি মা, সম্ভব হলে যুদ্ধের পর এসে সস্ত্রীক তোমাকে প্রণাম করে যাব!'

খুকি এতক্ষণে ছুটে উপরে চলে গেছে!

ঝড় এলো

শ্রীঅসীমকুমার সোম

ঝড় এলো!
আমার মনের শান্তশীল আকাশ নীল—
মুছে গিয়ে দেখা দিল
কালো কালো মেঘে-ঢাকা কুৎসিত জিজ্ঞাসা!
পলাতক মন আমার
ভুলে গেল—
ভুলে গেল ভূগোলের সীমা-পরিসীমা,
আর সবুজাভ কচি ঘাসের মত নির্ম্মল দৃষ্টি
বদলে গেল।
আঁচড়হীন জীবনে আকস্মিক ঝড়
ঢেলে দিল কলঙ্কময় কালির আখর
দ্রুত লয়ে।
পরম সুন্দর সৃষ্টিতে
যে আসর জমে উঠেছিলো—
তার শেষ হ'য়ে গেল, ফেণায়িত উর্ম্মির স্বাক্ষরে
গতিময় শব্দময় তরঙ্গাভিঘাত
আমার জীবনে পঙ্ক-ক্লেদ ঠেলে দিল।
উন্মত্ত আবেষ্টনীর ক্রমায়িত ঝড়
করেছে আমাকে আজ পুঁজিহীন ফেরার—
যার ইতিহাস জানি শুধু হ'বে
কালিমাখা ধোঁয়াভরা নিপট আঁধার।
স্পষ্ট আজ বুঝি—
আমার জীবনে আসা
বৈশাখের কালো ঝড়ের আবেশ কাটিয়ে,—
দেখা দেবে না কখনও দীপ্তি ঢেলে-দেওয়া
সার্থক সবিতা:
মিছে করি আমি
পূর্ব্বাশার প্রান্ত থেকে প্রশান্তির প্রত্যাশা।

ভারতীয় জাহাজ শিল্প

শ্রীহিমাংশু রায়

জাহাজ শিল্পে ভারত একদা সমগ্র পৃথিবীর ঈর্ষার বস্তু ছিল। আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর জাহাজ কোন এক সময় লণ্ডন এবং লিভারপুলের পরিবর্ত্তে কলিকাতা এবং মালাবার উপকূলে নির্ম্মিত হইত। ইহার কৈফিয়ৎ স্বরূপ কোম্পানীকে স্বীকার করিতে হইয়াছিল যে, ভারতে নির্ম্মিত জাহাজ অনেক উন্নত শ্রেণীর। তদুপরি কম ব্যয়ে ইহা নির্ম্মাণ করা চলে। বৃটিশ স্বার্থের ক্রমাগত বিরোধিতার ফলে কোম্পানীকে এই কার্য্য হইতে বিরত হইতে হয় এবং ভারতীয় জাহাজ শিল্পের এক গৌরবপূর্ণ অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটে। জাহাজের জন্য ভারত বৃটিশ তথা বিদেশীদের সম্পূর্ণ মুখাপেক্ষী হইয়া উঠে।

দ্বিতীয় যুদ্ধের পূর্ব্বে আধুনিক জাহাজ নির্ম্মাণ করিবার সামর্থ্য ভারতের ছিল না। যুদ্ধকালীন বৃটিশ এডমিরালটি ভারতে ১,০০,০০০ স্থুল টন জাহাজ এবং পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম ভাসমান ডক নির্ম্মাণ করে। পৃথিবীর মোট ৮১ মিলিয়ন স্থুল টনেজের মধ্যে ভারতের দান ৩,৩৭,০০০ টনেরও কম, অর্থাৎ পৃথিবীর মোট টনেজের শতকরা ৫ ভাগেরও কম। অথচ সামুদ্রিক বাণিজ্যে ভারতের দান শতকরা ৪ ভাগ।

স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেসী সরকার জাহাজ শিল্প সম্বন্ধে উত্তরোত্তর উৎসাহ প্রদর্শন করিতেছেন। ১৯৪৭ সালে রেকনট্রাকসন পলিসি সাব-কমিটি অন সিপিং ১৯৫৪ সালের মধ্যে ২ মিলিয়ন স্থুল টন জাহাজ নির্ম্মাণের কথা উল্লেখ করেন। ইহার উদ্দেশ্য বছরে ১০ মিলিয়ন টন মাল এবং ৩ মিলিয়ন যাত্রী বহন করা। এবং সমগ্র উপকূল বাণিজ্য, ব্রহ্মদেশ ও সিংহলের সঙ্গে বাণিজ্যের প্রায় শতকরা ৭৫ ভাগ, সুদূর বাণিজ্যের শতকরা ৫০ ভাগ এবং প্রাচ্যে অক্ষ শক্তির হৃত বাণিজ্যের শতকরা ৩০ ভাগ ভারতীয় জাহাজের সাহায্যে সম্পাদন করা।

১৯৪৮ সালে ভারত সরকার সর্ব্বপ্রথম জাহাজ শিল্প সম্পর্কিত নীতি ঘোষণা করেন। ইহাতে সরকার তিনটি কর্পোরেশন স্থাপন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। প্রত্যেক ক্ষেত্রে ১০ কোটি টাকা মূলধন থাকিবে। সরকারের মালিকানার অংশ হইবে শতকরা অন্ততঃ ৫১ ভাগ, অবশিষ্টাংশ কোন অনুমোদিত জাহাজ কোম্পানীকে অথবা আংশিক অনুরূপ কোম্পানীকে এবং আংশিক জনসাধারণকে গ্রহণ করিবার জন্য আহ্বান করা হইবে। প্রত্যেক কর্পোরেশনকে ১,০০,০০০ টন জাহাজ নির্ম্মান করিবার দায়িত্ব দেওয়া হইবে, অবশ্য পরীক্ষামূলক ভাবে। ইহাতে কর্পোরেশনকে যদি কোন প্রকার ক্ষতি স্বীকার করিতে হয় তবে তাহা প্রথম ৫ বৎসর পর্য্যন্ত সরকার স্বয়ং গ্রহণ করিবেন। ইহাও স্থিরীকৃত হয় যে, প্রস্তাবিত ৩টি কর্পোরেশনের একটি বহির্বাণিজ্যে যোগদান করিবার জন্য স্থাপিত হইবে। উপকূল বাণিজ্যের পরিবহন ব্যবস্থাও সম্পূর্ণভাবে জাতীয় জাহাজ দ্বারা সম্পন্ন করিবার নীতিও সরকার গ্রহণ করিয়াছেন।

সরকার কর্তৃক নিযুক্ত ফ্রেঞ্চ সিপিং মিশন ১৯৫০ সালে ইহার যে রিপোর্ট দাখিল করেন তাহাতে জাহাজ শিল্পের উন্নয়ন সম্বন্ধে বহু মূল্যবান অভিমত প্রদান করা হইয়াছে। ইহা ভিজাগাপট্টম সিপ ইয়ার্ডের উপযোগিতা সম্বন্ধে উচ্চ আশা পোষণ করে। ইহার প্রসার সম্পর্কে সুপারিশ করা হইয়াছে।

জাহাজ শিল্প যাহাতে কুশলী শিল্পীর অভাবে ব্যাহত না হয় সেজন্য বোম্বাইতে জাহাজ সম্বন্ধীয় বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। ইহার জন্য কলিকাতা এবং বোম্বাইতে ম্যারাইন ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজও রহিয়াছে। কোচিন এবং ভিজাগাপট্টমে জাহাজ সম্বন্ধীয় বিদ্যালয় এবং ম্যারাইন ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপন করা সম্বন্ধেও বিবেচনা করা হইতেছে। জাহাজ শিল্পের সমস্যা বিবেচনা ও ইহার সুনিয়ন্ত্রণের জন্য সম্প্রতি ডিপার্টমেণ্ট অব সিপিং সৃষ্টি করা হইয়াছে।

ভারতের নিজস্ব জাহাজ নির্ম্মাণ করিবার প্রচেষ্টা মাত্র তিরিশ বৎসরের কথা। সিন্ধিয়া ষ্টীম ন্যাভিগেশন কোম্পানীর ইতিহাসের সঙ্গে ইহা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। ১৯২৭ সালে ইহা প্রথম জাহাজ নির্ম্মাণ করে। দ্বিতীয় জাহাজটি নির্ম্মিত হয় ১৯২৯ সালে। কিন্তু জাহাজ দুইটি নির্ম্মিত হয় গ্লাসগোতে। ১৯৪৮ সালের ১৪ই মার্চ্চ ভারতীয় জাহাজ শিল্পের এক

দিবস। সেই দিন ভারতের সিপ ইয়ার্ড ভিজাগাপট্টমে নির্মিত ভারতের প্রথম জাহাজ 'জলউষা' সমুদ্র যাত্রা করে। জলউষার পরিবহন ক্ষমতা ৮,০০০ টন। বর্ত্তমানে সিন্ধিয়া ষ্টীম নেভিগেশন কোম্পানী এবং ইণ্ডিয়া ষ্টীম সিপ কোম্পানীর ৬টি সমুদ্রগামী জাহাজ বহির্বাণিজ্যে নিযুক্ত রহিয়াছে। ইহা প্রয়োজনের তুলনায় অতি নগণ্য। কমপক্ষে ৩০।৩৫টি সমুদ্রগামী জাহাজ ভারতের প্রয়োজন। উপকূল বাণিজ্যে ভারতের অংশ শতকরা ৫০ ভাগ এবং ইহা পরিচালনা করিবার জন্য মোটামুটি ৬০টি আধুনিক মালবাহী জাহাজ আবশ্যক।

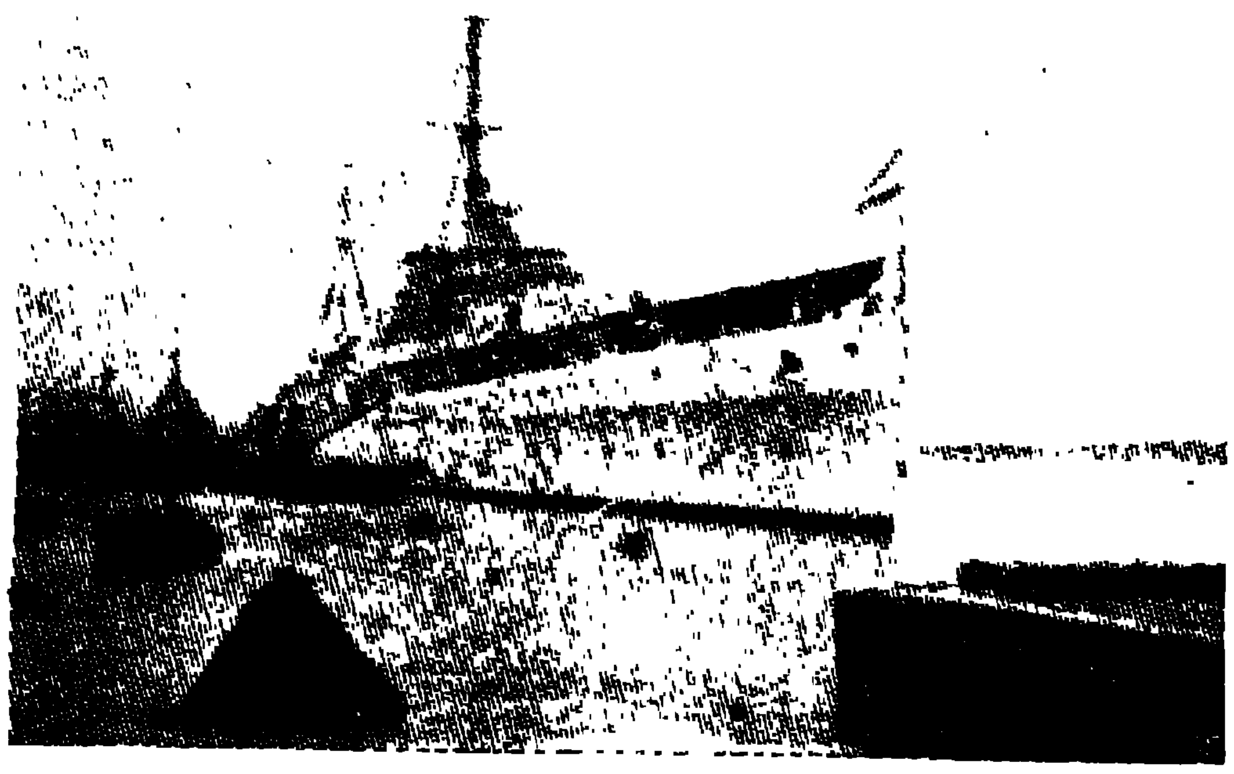

ভারতীয় জাহাজ (১)

অধিকতর ও উন্নততর জাহাজ নির্ম্মাণ করিবার জন্য ভারতীয় বন্দর এবং পোতাশ্রয়সমূহের উন্নয়ন প্রয়োজন। ভারত সরকার এজন্য যে পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন সে অনুযায়ী কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, এবং কোচিন বন্দর ও পোতাশ্রয়ের প্রসার এবং উন্নতি সাধনের জন্য যথাক্রমে ৮,৫০,০০,০০০, ১০,০০,০০,০০০, ৪,৫০,০০,০০০ এবং ৬০,০০,০০০ টাকা ব্যয় করা হইবে। মারমাগাও—কোচিন উপকূলে গভীর সমুদ্র বন্দর নির্ম্মাণ করিবার জন্য স্থান নির্দ্ধারণ করা সম্বন্ধে অভিমত প্রদানের জন্য ভারত সরকার ওয়েষ্ট কোষ্ট মেজর পোর্ট ডেভেলপমেণ্ট কমিটি নিযুক্ত করিয়াছেন।

জাতীয় অর্থনীতিতে জাহাজ শিল্পের স্থান অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ। বহির্বাণিজ্য এবং উপকূল বাণিজ্যের জন্য বৈদেশিক জাহাজের মুখাপেক্ষী হওয়া অশেষ বিপদজনক ও ক্ষতিকর। অর্থনৈতিক দিক দিয়া দেখিতে গেলে জাহাজের মাশুল বাবদ বহু অর্থ দেশের বাহিরে চলিয়া যায়, মাশুলের হার হয় অত্যধিক এবং যুদ্ধবিগ্রহকালীন জাহাজের অভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য ভয়ানক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পক্ষান্তরে জাহাজ শিল্পের উন্নয়ন দ্বারা যে শুধু ব্যবসা-বাণিজ্য অব্যাহত রাখাই সম্ভব তাহা নহে, ডলার সঙ্কটের যুগে ইহা ডলার এবং অন্যান্য মুদ্রা অনায়াসে উপার্জ্জন করিতে পারিবে। বৃটিশের সুস্থ সমৃদ্ধ বহির্বাণিজ্যের মূলে রহিয়াছে ইহার অদৃশ্য উপকরণ। ভারতের পক্ষেও এইরূপ অদৃশ্য উপকরণ গড়িয়া তোলা সম্ভব। ইহাতে বহির্বাণিজ্যের ঘাটতির আশঙ্কা হ্রাস পাইবে। দেশরক্ষা ব্যাপারেও রণতরী তথা জাহাজ শিল্পের দান অসামান্য।

ভারতীয় জাহাজ শিল্পকে সূচনা হইতে আজ পর্য্যন্ত অতিশয় সংগ্রামের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে হইতেছে। নিম্নে ইহার

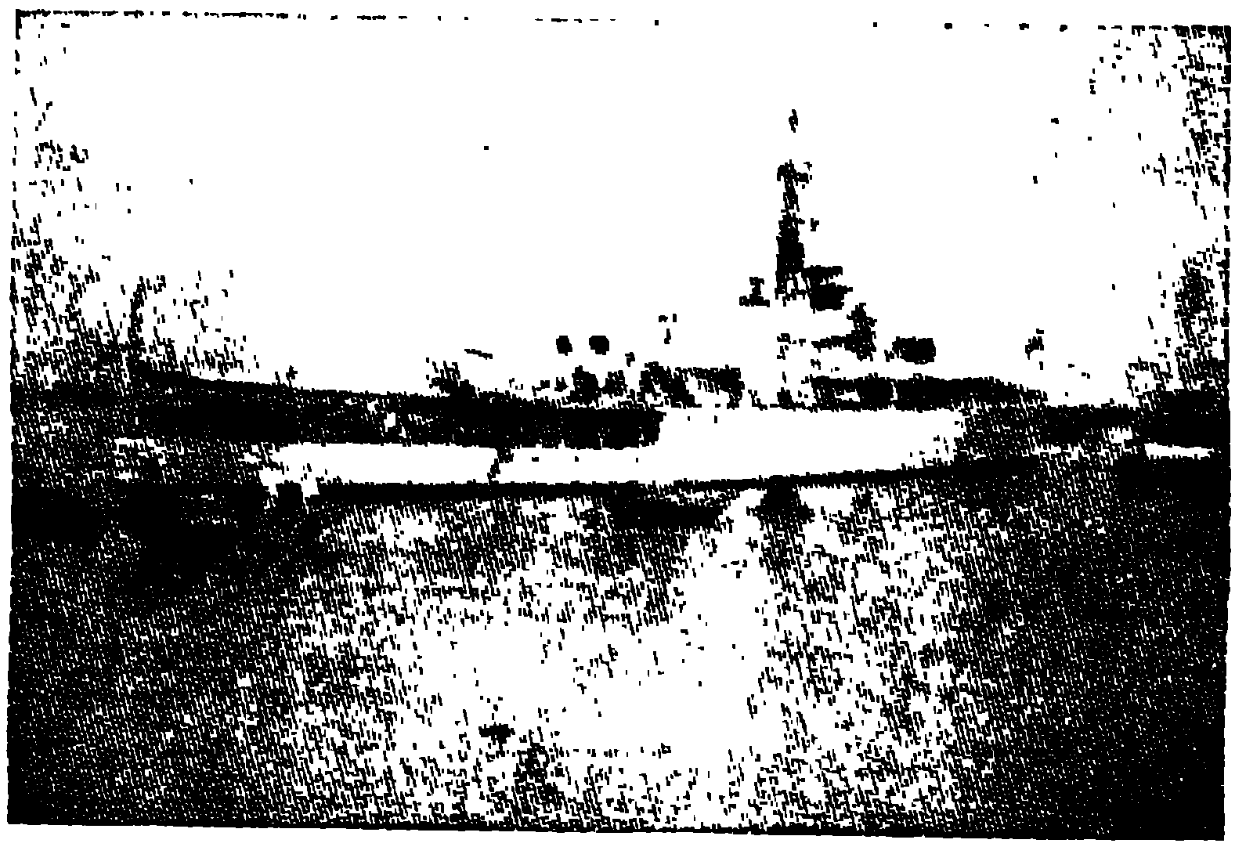

ভারতীয় জাহাজ (২)

অসুবিধাসমূহ উল্লেখ করা গেল।

(ক) বৃটিশের আমলে ভারতীয়দের ভারতে জাহাজ নির্ম্মাণ করিবার অধিকার দেওয়া হইত না।

(খ) ভারতীয়রা বৃটিশ সিপ ইয়ার্ডে জাহাজ নির্ম্মাণ করিতে চাহিলে ইহাকে তাহা গ্রহণ করিতে দেওয়া হইত না। যুদ্ধে ভারতের যত টন জাহাজের ক্ষতি হইয়াছিল তাহাই শুধু নির্ম্মাণ করিবার অনুমতি ছিল।

(গ) ইণ্ডিয়া—ইউ কে—কনটিনেন্টাল কন্‌ফারেন্স-এ সম্প্রতি দুইটি ভারতীয় জাহাজ কোম্পানীকে গ্রহণ করা হইয়াছে। ইহাদের প্রত্যেকটিতে আটটি করিয়া জাহাজ থাকিবে। কিন্তু কন্‌ফারেন্সের অন্যান্য সদস্যদের সমান মর্য্যাদা ইহাদের দেওয়া হয় নাই। ভারত সরকারের সমর্থন ও সম্মতির উপর ভিত্তি করিয়া ব্যবসায়িক ভিত্তিতে কথাবার্ত্তা চালান সত্ত্বেও এই কন্‌ফারেন্সে ভারতীয় জাহাজের সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার অনুমতি দেওয়া হয় নাই। ইহার জন্য দায়ী ভারত সরকারের অদৃঢ় মনোভাব এবং জাহাজ কোম্পানীদের জাহাজ নির্ম্মাণ করার মত অর্থ সামর্থ্যের অভাব। বৃটিশ কোম্পানীগুলি এই সুযোগে নিজেদের স্বার্থ কায়েম

করিতেছে। এই প্রসঙ্গে শ্রীযুত এম, এ, মাষ্টার আক্ষেপ করিয়া বলেন যে, ইটালী, জাপান, জার্মানী—যাহারা কিছুদিন পূর্ব্বেও বৃটিশ তথা মিত্র শক্তিকে ধ্বংস করিবার জন্ম প্রাণান্ত চেষ্টা করিয়াছে তাহাদের জাহাজ নির্ম্মাণ করিবার সুযোগ দেওয়া হইয়াছে ; আর যে ভারত যুদ্ধে বৃটিশ তথা মিত্র শক্তিকে রক্ত দিয়া সাহায্য করিয়াছে, যে ভারত স্বাধীন হইবার পরও কমন্‌ওয়েলথ-এ থাকিতে সম্মত হইয়াছে, তাহার দাবীকে বৃটিশ উপেক্ষা করিয়াছে।

(ঘ) বৃটেনের জাহাজ শিল্পের মালিকগণ কর্ত্তৃক কন্‌ফারেন্সের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য সম্পর্কে পাশ্চাত্য দেশের জাহাজ কোম্পানীর দাবী যত সত্বর গ্রহণ করা হয়, ভারতের অতি সঙ্গত দাবী সম্পর্কেও তাহা করা হয় না।

(ঙ) সরকারী অর্থ সাহায্য ব্যতীত কোন দেশের পক্ষেই জাহাজ শিল্প উন্নয়ন সম্ভব হয় নাই। বর্ত্তমান অবস্থায় ভারত সরকারের পক্ষে প্রয়োজনীয় অর্থ সাহায্য করা সম্ভবপর নহে।

(চ) বৈদেশিক তীব্র প্রতিযোগিতার মুখে সসম্মানে বাণিজ্য করিতে হইলে জাহাজ শিল্পকে কতিপয় বিশেষ সরকারী সুবিধা দেওয়া প্রয়োজন। কিন্তু ভারত সরকারের পক্ষে এইরূপ সুবিধা প্রদান করা সম্ভব কিনা তাহা সন্দেহজনক। লণ্ডনে অনুষ্ঠিত ইণ্টার ন্যাশনাল সিপিং কন্‌ফারেন্সে অনুন্নত দেশের এই মনোভাবকে ফ্ল্যাগ ডিসক্রিমিনেশন বলিয়া কুখ্যাত করা হইয়াছে এবং ইহার বিরুদ্ধে উন্নত দেশসমূহ জনমত সৃষ্টি করিবার প্রবল চেষ্টা করিতেছে। আন্তর্জ্জাতিক চুক্তির বাধ্যবাধকতাও ভারত সরকারকে জাহাজ শিল্প সংরক্ষণের চেষ্টা হইতে বিরত করিতে পারে। হাভানা চার্টার ইহার পরিচয়। বলা প্রয়োজন, ফিসক্যাল কমিশন প্রকারান্তরে ভারত সরকারকে হাভানা চার্টার গ্রহণ করিতে উৎসাহিত করিয়াছেন। ফ্ল্যাগ ডিসক্রিমিনেশন সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত এম, এ, মাষ্টার বলেন যে, জাতীয় সরকার যখন জাহাজ শিল্পের উন্নয়নের জন্য বিশেষ সুবিধার ব্যবস্থা করার চেষ্টা করেন তখন উহা ফ্ল্যাগ ডিসক্রিমিনেশন আখ্যা পায়। কিন্তু সিপিং কনফারেন্সের যখন অসঙ্গত উপায়ে জাতি বিশেষের জাহাজকে আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যে, এমন কি নিজের আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যে অংশ গ্রহণ করিতে বাধ্য করে তখন ইহা ফ্ল্যাগ ডিসক্রিমিনেশন আখ্যা পায় না।

(ছ) ভারতীয় জাহাজ শিল্পের সংগঠন ব্যবস্থা দোষযুক্ত।

(জ) আমদানি এবং রপ্তানি সম্পর্কে সরকারী নীতির ক্রমাগত পরিবর্ত্তন। ইহা মাল বহনের পরিমানকে অনিশ্চিত করিয়া তোলে।

(ঝ) কর বাহুল্য।

(ঞ) মাশুলের হার ক্রমশঃ হ্রাস পাইতেছে।

(ট) নূতন মূলধনের অভাব।

ভারতীয় জাহাজ শিল্প প্রতি পদে পদে বিদেশী স্বার্থ দ্বারা আহত হইতেছে। ইহা হইতে উদ্ধার পাইতে হইলে ভারত সরকারের এমন একটি পরিবেশ সৃষ্টি করিতে হইবে যাহাতে শুধু ভারতীয় জাহাজ ব্যবসায়িগণ নহে, বিদেশীয় জাহাজ ব্যবসায়িগণও সবিশেষ উপলব্ধি করিতে পারেন যে, ভারতীয় জাহাজ শিল্পকে সঙ্গতভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার পশ্চাতে ভারত সরকারের পূর্ণ সমর্থন, সহানুভূতি এবং সাহায্য রহিয়াছে। জেনেভা কনফারেন্সে যে চার্টার তৈয়ার করা হইয়াছে তাহার মূল কথা আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে জাহাজ পরিচালনায় কোন সরকারী বা বেসরকারী স্বার্থের কোন প্রকার প্রভেদাত্মক নীতি চলিবে না। ভারত সরকারের কর্ত্তব্য—যাহাতে সংশ্লিষ্ট দেশসমূহ এই চার্টার গ্রহণ করে তাহার চেষ্টা করা। ভারতের যে প্রাচুর্য্য ও সম্ভাবনা রহিয়াছে, তাহাতে অন্যান্য দেশ প্রভেদাত্মক নীতি পরিহার করিলে কোন প্রকার প্রভেদাত্মক নীতি গ্রহণ না করিয়াও সুপরিকল্পিত সরকারী সাহায্য এবং শিল্প বাণিজ্যের সহযোগিতায় ভারতীয় জাহাজ শিল্পকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা দুঃসাধ্য হইবে না।

F. N. ফোটো : অনিল বিশ্বাস

নবগঙ্গা

রণজিৎ কুমার সেন

তের

দিন দু'য়েক কেটে গেলে অরুণ একদিন কী খেয়ালে বিজনের পড়ার টেব্‌লে এসে ঝুঁকে দাঁড়াতেই আবিষ্কার হয়ে গেল বিজনের কবিতার খাতা, শুধুই খাতা নয়, তার উপর বিজনের দৃঢ় অঙ্গুলিবদ্ধ ব্ল্যাক্‌বার্ড কলমটি পর্য্যন্ত। মেসে এসে অবধি এমন্ ক'রে কোনোদিন খাতার পৃষ্ঠা খুলে কবিতা লিখ্‌তে বসেনি বিজন। তার জীবন থেকে কবিতা একরকম অন্তর্হিতই হ'য়েছিল; আবার যেন খানিকটা নব জোয়ারের স্পর্শ এসেছে এতদিনে! অরুণের এই আকস্মিক দর্শনে প্রথমটা তাই সলজ্জে খাতাখানি লুকিয়ে রাখ্‌তে গেল সে। কিন্তু অরুণ ছাড়বার পাত্র নয়। স্বভাবতঃই কথা সে কম বলে, কিন্তু আজ যেন হঠাৎ বড় মুখর হ'য়ে উঠেছে অরুণ। ব'ল্‌লো, 'ঘরে কবি থাক্‌তে প্রতিদিনের এই দুর্বিসহ জ্বালা তবে ভুগ্‌চি কেন আমরা? নিরানন্দ এই মেস-জীবনে এবার থেকে কিছু সুরের স্পর্শ পাওয়া তবে অসম্ভব কিছু নয়! খাতা বোজালে চ'ল্‌বে না ভাই। কি লিখেছ, প'ড়ে শোনাও।'

কিছুদিন থেকে অরুণ আর বিজন উভয়ে উভয়কে নাম ধ'রে ডেকে 'তুমি' ব'লেই সম্বোধন ক'রছিল।

সসঙ্কোচে বিজন ব'ল্‌লো, 'এ এমন কিছু প'ড়ে শোনাবার মতো নয়। সময় কাটাবার মতো এটা আমার একটা বাজে খেয়াল ব'লতে পারো; তোমাদের মতো তাস-পাশা পেটাতে জান্‌লে এমন ক'রে ব'সে ব'সে আত্মপ্রবঞ্চনায় সময় ব্যয় ক'রতে হ'তো না।

—'আত্মপ্রবঞ্চনা না ব'লে বলো আত্মপ্রসাদ।' অরুণ ব'ল্‌লো, 'কবিতা বনিতাশ্চৈব—কাব্য হ'চ্চে নারীর মতই কমনীয়, রস আর রহস্যময়তা তার প্রতি ছত্রে। এই রস আর রহস্যের যে সন্ধান পেয়েছে, তার কাছে দাঁড়ায় নাকি আবার তাস-পাশা! কি যে বলো! আজ আমি কলেজ যাওয়া ড্রপ ক'রলাম, সারাদিন ব'সে ব'সে তোমার কবিতা শুন্‌বো।'

—'আচ্ছা পাগল তুমি যাহোক্।' মৃদু হেসে বিজন ব'ল্‌লো, 'সারাদিন কবিতা শুনে শেষ পর্য্যন্ত আমারও পার্সেণ্টেজগুলো নষ্ট করাবে?'

—'তাও তো বটে, তোমারও যে কলেজ আছে!' গলার স্বর খানিকটা বিমর্ষ শোনালো এবারে অরুণের।

বিজন ব'ল্‌লো, 'খালি কলেজই নয়, সামনে পরীক্ষা। লেক্‌চারগুলো এ্যাটেণ্ড্ করে যদি নোট না নিই, তবে পস্তাতে হবে শেষে। কবিতা তখন নাগ-কন্যা হ'য়ে দংশন ক'রবে। তুমি বরং অবকাশ মতো কখনও খাতা থেকেই প'ড়ে নিও।'

—'বেশ, খাতাখানি তবে রেখে যেয়ো। দুপুরের একটা রিক্রিয়েশন হবে।'—এসে আবার নিজের পড়ার টেব্‌লে আশ্রয় নিল অরুণ।

কলেজ বন্ধ করা বিজনের পক্ষে সত্যিই সম্ভব ছিল না। তার উপর র'য়েছে ঘড়ি-ধরা ট্যুইশনি। খেয়ে দেয়ে ঘর থেকে বেরোবার মুখে খাতাখানি তুলে দিয়ে গেল সে অরুণের হাতে, সাবধান ক'রে দিয়ে গেল—পড়া শেষ

করে খাতাখানিকে যেন বাক্সে তুলে রেখে তবে কোথাও বেরোয় অরুণ।

—'তথাস্তু' ব'লে সানন্দে সম্মতিসূচক ঘাড় বেঁকিয়ে নিল একবার অরুণ, নতুন কিছু-একটা ব'লে আর কথা বাড়াতে গেল না সে। ...

সমস্ত দুপুরটা কাটিয়ে দিল সে বিজনের 'কাব্য মালিকা'কে নিয়ে। খাতাখানির শিরোনামায় এই নামই রয়েছে, বিজনের অনেক সাধ ক'রে রাখা নাম। ছোট বড় মিত্রাক্ষর, পয়ার আর সনেট মিলিয়ে প্রায় একশোর কাছাকাছি কবিতা। আনন্দের সঙ্গেই বেশ আবৃত্তি ক'রে ক'রে প'ড়লো অরুণ। প'ড়ে মুগ্ধ হ'লো, বিস্মিত হ'লো, অভিভূত হলো। বয়সটা তাদের প্রায় কাছাকাছি, কিন্তু শক্তির কি অদ্ভুত পার্থক্য! বিজনকে আজ একবার মনে মনে নতুন করে চিনতে চেষ্টা ক'রলো অরুণ। খাতার শেষের দিকের একটা কবিতার উপর হঠাৎ তার দৃষ্টি হোঁচট খেয়ে দাঁড়ালো।—'দুটি তারা' :

জীবনের দু'টি তারা তুমি আর তুমি,
আমার হৃদয়াকাশে উঠেছ কুসুমি'।
কমলের মুখ চেয়ে বিজনে কখন্
নীরব সায়াহ্নে এসে দিয়ে গেছ মন,
আবার রাত্রিশেষে প্রভাতের দ্বারে
কখন্ গিয়েছ মিশে এই সংসারে!
আর তুমি, গেছ চুমি' কমলের আঁখি,
ভাবি তবু জীবনের কতদিন বাকী!

দু'টি চঞ্চল সুচারু জীবনকে নিয়ে একটি মুগ্ধ হৃদয়ের ভাবোল্লাস; শেষের দিকে খানিকটা অতৃপ্তিকর কঠিন আত্মজিজ্ঞাসা। ভাবলো কিছুক্ষণ অরুণ, প্রথমটা ঠিক অর্থ বুঝে উঠ্তে পারলো না সে, আবার প'ড়লো, তারপর উপরোক্ত ধরনের একটা অর্থ ক'রে নিল মনে মনে।

ইতিমধ্যে হঠাৎ মিনিট দু'য়েকের জন্য একবার মহেন্দ্র এসে ঘরে ঢুকলো। জিজ্ঞেস ক'রলো, 'ব্যাপার কি, কলেজে যাওনি আজ?'

—'না, কাব্য-মালিকার প্রেমে প'ড়ে আজ আর কলেজে যাওয়া হ'য়ে উঠ্লো না।' স্বাভাবিক কণ্ঠে খানিকটা কৌতুকের সুর মিশিয়ে জবাব দিল অরুণ।

ট্রাঙ্ক থেকে কি একখানি হুণ্ডির কাগজ বার ক'রতে ক'রতে পুনরায় খানিকটা জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মেলে ধ'রলো মহেন্দ্র : 'কাব্য-মালিকাকে আবার জোটালে কোত্থেকে?'

—'এক ঘরে কবিকে নিয়ে বাস ক'রেও তার কাব্য-মালিকার সন্ধান পেলেন না আজ পর্য্যন্ত, মহিনদা! ইউ আর সো রেচেড্, আই সি। এই দেখুন।' ব'লে মহেন্দ্রের চোখের উপর খাতার প্রচ্ছদপৃষ্ঠাখানি মেলে ধ'রলো অরুণ।

মহেন্দ্র প'ড়লো : 'কাব্য-মালিকা'—শ্রীবিজন বন্দ্যোপাধ্যায়। থেমে বল্লো, 'বিজু তবে রবি ঠাকুরের জাতের লোক?'

অরুণ ব'ল্লো, 'তা তো যেন হ'লো, কিন্তু জাত বাচ্তে গিয়ে আমরা একেবারেই বজ্জাত না হ'য়ে দাঁড়াই!'

—'জ্ঞানরাজ্যে আমি তো চিরকালের হরিজন, তোমার তবু পেটে কিল মারলে দু' পাতা পণ্ডিতি বেরোয়। বজ্জাত হ'লে তুমি হ'তে যাবে কেন, সে আমি!' ব'লে ঠোঁট বাঁকিয়ে একবার হাসলো মহেন্দ্র। তারপর থেমে ব'ল্লো, 'আফ্টার অল বিজন ইজ্ এ জিনিয়াস। ওর ভিতরের মানুষটির সন্ধান অন্ততঃ আমি পেয়েছি।'

মুগ্ধ দৃষ্টিতে অরুণ ব'ল্লো, 'আপনার মতো লোক-নির্ব্বিশেষে হৃদয়ে প্রবেশ ক'রতে পারে ক'জন?'

—'পারি নাকি!' ব'লে আর বিন্দুমাত্র অপেক্ষা ক'রলো না মহেন্দ্র। ট্রাঙ্ক থেকে হুণ্ডির প্রয়োজনীয় কাগজ গুছিয়ে নিয়ে ব'ল্লো, 'আচ্ছা, চলি আবার। বাজার আজ কিছু ভালো ব'লেই মনে হ'চ্ছে। বিজুকে আমার সাদর সম্ভাষণ জানিয়ো।'

সোজা আবার পথে নেমে প'ড়লো মহেন্দ্র। তখনও অরুণের কানে তার কথাটা বাজছে : 'আফ্টার অল বিজন ইজ এ জিনিয়াস।' তার জিনিয়াসের কাছে

নিজেকে আজ একেবারেই হেয় ব'লে মনে হ'লো অরুণের।

সন্ধ্যার দিকে একসময় বিজনকে চেপে ধ'রলো সে: 'তোমার কাব্য-মালিকা প'ড়ে সত্যিই মুগ্ধ হ'য়েছি, দুপুরটা বাস্তবিকই ব্যর্থ যায় নি। কিন্তু তোমার দু'টি তারা কারা?'

কিছুক্ষণের জন্য অরুণের মুখের দিকে একবার বিস্ময়ের দৃষ্টি মেলে ধ'র্‌লো বিজন: 'বুঝতে পারলুম না তোমার কথা।'

অরুণ ব'ল্‌লো, 'তোমার হৃদয়াকাশে কুসুমের মতো যারা ফুটে উঠেছে, এমন দু'টি উজ্জ্বলন্ত তারার কথাই ব'ল্‌ছি। কারা তারা?'

সত্যকে চাপা দিতে চেষ্টা ক'রে বিজন ব'ল্‌লো, 'এবারেই হাসালে দেখছি। কাব্যের সঙ্গে ব্যক্তি-জীবনকে জড়িয়ে তুমি দেখছি প্রমাদ সৃষ্টি করতে চাও। দু'টি তারায় নিতান্তই একটা কাল্পনিক রোমান্স্ ফুটে উঠেছে তোমার শঙ্কিত হবার কোনো কারণ নেই।'

কিন্তু এতটুকু যুক্তিতেই নিরস্ত হবার লোক নয় অরুণ, ব'ল্‌লো, 'কল্পনা তো বাস্তবকে অস্বীকার ক'রে কিছু নয়! আসলে তুমি নিজেকে চেপে যাচ্ছ।'

—'ক্রিমিনাল সায়ান্স সম্পর্কে নিশ্চয়ই তুমি কিছু প'ড়ে থাক্‌বে।' থেমে বিজন ব'ল্‌লো, 'তার আওতায় অন্ততঃ নিজেকে ফেল্‌তে পারছি না, অতএব স্বভাবতঃই বুঝতে পারছো—নিজেকে চেপে যাবার কোনো কারণ নেই! ওটা তোমার একটা সাপোজিশন্ মাত্র। কল্পনা কখনও বাস্তবকে অস্বীকার ক'রে নয়, ঠিকই; কিন্তু সে বাস্তব সর্ব্বত্রই যে কবির ব্যক্তি-কেন্দ্রিকতায় আবদ্ধ, এ কথাই বা পেলে কোত্থেকে?'

এবারে কথা কাটবার মতো যুক্তি খুঁজে না পেয়ে প্রথমটা চুপ ক'রে যেতেই চেষ্টা ক'রলো অরুণ, পরে ব'ল্‌লো, 'কবিতাটি খুব এ্যাপিলিং হ'য়েছে। প'ড়তে গিয়ে স্বভাবতঃই মনে হয়—কবি তার নিজের জীবনকেই তুলে ধ'রেছে।'

হেসে বিজন ব'ল্‌লো, 'পাঠকের জীবনও তো হ'তে পারে!'

এ কথার জবাব না দিয়ে অরুণ ব'ল্‌লো, 'মহিন দা তোমাকে তাঁর সাদর সম্ভাষণ জানিয়েছেন।'

—'হঠাৎ?'

—'হঠাৎ নয়, তোমার কাব্য-মালিকার প্রচ্ছদপটের জন্যে।'

—'মহিনদাকেও তবে পড়িয়েছ?' জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চোখের পাতা দু'টো একবার স্থির হ'য়ে দাঁড়ালো বিজনের।

অরুণ ব'ল্‌লো, 'পড়াই নি, শুধু প্রচ্ছদপটটুকু পর্য্যন্তই তাঁর পরিচয় ঘ'টেছে। হঠাৎ এসে গেলেন কিনা! তা ছাড়া মহিনদার কাছে লুকোচুরি ক'রবারই বা কি আছে?'

—'না কিছু নেই।' ব'লে হাত মুখ ধোয়ার অছিলায় একসময় কল-ঘরের দিকে চ'লে গেল বিজন।

অরুণও আর অপেক্ষা ক'রলো না। সকাল থেকে একটি মুহূর্তের জন্যও ঘর থেকে বেরোয়নি সে। এবারে হাফ সার্ট গায়ে দিয়ে কিছু সময়ের জন্য সাম্‌নের পার্ক থেকে ঘুরে আসার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে প'ড়লো অরুণ।

রেবা ব'লেছিল—অন্ততঃ পাঁচটা নতুন কবিতা লিখে নিয়ে তাকে শোনাতে, কিন্তু এ ক'দিনে বিজন অন্ততঃ আটটারও বেশী কবিতা লিখেছে, অধিকাংশই রোমান্টিক্ মনোধর্ম্মী। যথাসময়ে খাতা নিয়ে সে রেবাদের বাড়ীতে গিয়ে উঠ্‌লো। কিন্তু রেবার দেখা পাওয়া গেল না, গঙ্গায় বেরিয়েছে সে হাওয়া খেতে। সহসা সমস্তটা মন একবার বিষণ্ণতায় ভ'রে উঠলো বিজনের। নিশিকান্তের হাতের তৈরী চা খেয়ে মিসেস্ মল্লিকের সঙ্গে উপস্থিত-মতো দু'একটা কথা ব'লে আবার এসে বাস ধ'রলো সে।

একসময় ঠাট্টার সুরে মহেন্দ্র ব'ল্‌লো, 'কবির মুখে শুধু যদি বিষাদের ছায়াই দেখবো, তবে দেশকে হাসাবে কে?'

অরুণ বল্‌লো, 'ডি, এল, রায়ের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই বাংলাদেশ হাস্‌তে ভুলে গেল। এটা জীবন-ধর্ম্মের লক্ষণ নয়।'

বিজন ইচ্ছে ক'রেই কারুর কথার কোনো জবাব দিল না। পাশ কাটিয়ে একসময় অন্য কোথায় একদিকে উঠে গেল।

একটা দিন বাদ দিয়ে আবার গিয়ে উঠলো সে রেবাদের বাড়ীতে। আজও রেবার দেখা পাওয়া গেল না। শুন্‌লো—দিলীপ দত্তদের কি একটা চ্যারিটি ফাংশনে গানের প্রোগ্রাম র'য়েছে তার। কে যেন একবার ভিতর থেকে চাবুক মারলো বিজনকে। মনে হ'লো—রেবা যেন ইচ্ছে ক'রেই তাকে এড়িয়ে চ'ল্‌তে চাইছে। বিকেলের দিকে ভিন্ন ওয়েলিংটন্ ষ্ট্রীট থেকে রাসবিহারী এভিন্যুর এতটা পথ আসা বিজনের পক্ষে সম্ভব নয়। ইচ্ছে ক'রেই যেন ইদানিং এ সময়টাকে এড়িয়ে যেতে চাচ্ছে রেবা। হাতের মুঠোর মধ্যে কবিতার খাতাখানিকে সহসা একখণ্ড প্রস্তর ব'লে মনে হ'লো বিজনের। ফিরে এসে আবার সে পথে দাঁড়ালো। ঠিক ক'রলো, এর পর যেদিন আস্‌বে, খালি হাতেই আস্‌বে; রেবা বাড়ীতে না থাক্‌লেও অন্তত: এমন ব্যর্থতা নিয়ে ফিরতে হবে না।

দিন দুয়েক পরে সময়টা পরিবর্ত্তন ক'রে নিয়ে রবিবারের সকালে বেরিয়ে পড়লো সে রাসবিহারী এভিন্যুর দিকে। এসময়টা ব্রাহ্মসমাজমন্দিরে উপাসনায় আর ব্রহ্মসঙ্গীতে তৎগতমন হ'য়ে ওঠেন আচার্য্য পুরুষ। প্রতি রবিবারে নিয়মিত এ সময়টা উপাসনা সভায় গিয়ে যোগ দেন মিঃ মল্লিক। সঙ্গে যায় দিলীপ দত্ত। বিশেষ কোনো অনুষ্ঠান হ'লে রেবাকে নিয়ে মিসেস্ মল্লিকও গিয়ে কোনো কোনো দিন ঘুরে আসেন সমাজ-মন্দির থেকে। আজ কিন্তু ব্যর্থ হ'তে হ'লো না বিজনকে। রেবা ঘরেই ছিল। দুঃখ প্রকাশ ক'রে বল্‌লো, 'শুনেছি, দু'দিন এসে তুমি ঘুরে গেছ বিজুদা। দোষ তোমার নয়, আমার; দু'দণ্ড সময় ক'রে ব'সে তোমার কবিতা শোনা হ'য়ে ওঠেনি। খাতা সঙ্গে নিয়ে এসেছ তো?'

রেবার এ অনুগ্রহ না আগ্রহ? সংশয়ের দোলায় একবার দোল খেয়ে গেল বিজনের মনটা। বল্‌লো, 'খাতা সঙ্গে আনলে হয়ত আজও তোমার দেখা পেতাম না। দেখলাম—খাতাটা একেবারেই অলক্ষুণে।'

—'এম্‌নি ক'রে বল্‌ছো কেন, বিজুদা?' কিছুটা চঞ্চলতা প্রকাশ ক'রলো রেবা।

বিজন বল্‌লো, 'স্কুল কলেজের মতো তোমার ফাংশন্‌স থেকেও নিশ্চয়ই কখনও ছুটি আছে। ছুটির অবকাশে কবিতার মন নিয়েই কবিতা শুনো, এখন থাক্।'

কিন্তু রেবার গান? গানের মন নিয়েও গান শুন্‌বার অবকাশ চাই কি তেম্‌নি? কথাটা ব'লে হঠাৎ থেমে গেল বিজন।

রেবা বল্‌লো, 'এ তুমি অভিমানের কথা বল্‌ছো বিজুদা। আমার এই দু'দিনের আকস্মিক অনুপস্থিতিকে কি তুমি ক্ষমার চোখে দেখতে পারো না?'

দেখতে দেখতে অভিমানের পাহাড় ভেঙে এবারে কুয়াসাবৃত রাত্রির বুক থেকে বরফ নেমে এলো। বিজন বল্‌লো, 'অভিমানটাই শুধু বোধ ক'রলে, আর কিছু নয়?'

উত্তরে কি একটা ব'ল্‌তে যাচ্ছিল রেবা, ইতিমধ্যে মিসেস মল্লিক এসে সাম্‌নে দাঁড়ালেন। এতক্ষণের কথা তাদের সহসা একটা দম্‌কা হাওয়ার মতই কোথায় যে উড়ে গেল—বুঝ্‌তে পারলো না তারা।

চৌদ্দ

অদৃষ্টের পরিহাস আর কাকে বলে। রাজসাহীর দাম্পত্য-জীবনে অতর্কিতে একদিন সিঁথির সিঁদুর মুছে গেল ছন্দার। শ্যামলকান্তির রোগটা গোড়ার দিকে ধরা পড়ে নি, পরে বোঝা গেল প্লুরিসি। শ্যামলকান্তি নিজে ডাক্তার হয়েও নিজের রোগ সম্পর্কে সচেতন ছিল না। স্থানীয় চিকিৎসকদের মধ্যে নিজেকে সার্থক নামে প্রতিষ্ঠিত ক'রতে দিবারাত্রির অক্লান্ত শ্রমকে সে হাসিমুখেই বরণ ক'রে নিয়েছিল। চৈত্রের খর-রোদ কি শ্রাবণের মুষল-ধারা তাকে ঘরে আবদ্ধ রাখতে পারে নি। তেম্‌নি পারেনি ছন্দা। কতদিন ব'লেছে, 'এত পরিশ্রম তোমার সইবে না। এ সহরে ডাক্তার তো আরও কতই আছে, তোমার এত রোগী ঘাঁটবার দরকার কি?

যা তুমি রোজগার করো, তাতেই আমাদের সুখে স্বচ্ছন্দে সারা জীবন কেটে যাবে।' হেসে জবাব দিয়েছে শ্যামলকান্তি: 'আমাদের তো সরকারী চাকরী নয় যে, বুড়ো বয়সে ঘরে ব'সে পেন্সন ভোগ ক'রবো। এখন থেকে যদি কিছু সঞ্চয় না করতে পারি, তবে বুড়ো বয়সে কিসের উপর নির্ভর ক'রে বাঁচবো বলো তো?' উত্তরে ছন্দা ব'লেছে, 'সবাই যেভাবে যে অবলম্বন নিয়ে বাঁচে!'—'অর্থাৎ?' কৌতুকের দৃষ্টি তুলে তাকিয়েছে শ্যামলকান্তি ছন্দার মুখের দিকে। ছন্দা আর দ্বিরুক্তি করেনি, শুধু মুখ টিপে হেসেছে! অর্থাৎ—সন্তান, তাদের ভবিষ্যতের আশা ভরসা, তাদের একমাত্র বংশধর। অলীক ছিল না এ আকাঙ্ক্ষা ছন্দার জীবনে। কিন্তু বিধাতা সে সম্ভাবনা আজও তার দেহের কোথাও ফুটিয়ে তোলেননি।

কথা রাখে নি শ্যামলকান্তি। যোগ্যতার সঙ্গে আত্মপ্রতিষ্ঠাকে সে বড় ব'লে মনে ক'রেছিল জীবনে। শীতাতপ আর রৌদ্র-তাপকে তাই ভ্রূক্ষেপ করে নি সে। কিন্তু বিধাতা যাকে দুঃখ দেবেন, তাকে রক্ষা করবে কে? অকস্মাৎ একদিন সেই দুঃখই নেমে এলো ছন্দার জীবনে। তার এত সুখের আকাশে কখন্ কৃষ্ণমেঘ ডেকে এলো! শয্যা নিল শ্যামলকান্তি। বৃদ্ধ তারিণীমোহন ছুটোছুটি ক'রে ডাক্তারের পর ডাক্তার জড়ো ক'রলেন ঘরে। অষুধে, পথ্যে, ব্যাণ্ডেজে ঘর ভর্ত্তি হ'য়ে গেল। অলক্ষ্যে হয়ত একবার বিধাতাপুরুষ হাস্‌লেন। অসহ্য যন্ত্রণা বুকে চেপে একসময় শেষ নিঃশ্বাস ফেল্‌লো শ্যামলকান্তি। ছন্দার হাত দু'খানিকে বুকে চেপে ধ'রে একবার শেষ কথা ব'লতে চেষ্টা ক'রেছিল সে: 'নিয়তি। তার উপর মানুষের হাত নেই। তোমার কথা রাখিনি কোনোদিন, সেই অপরাধের হয়ত শাস্তি দিলেন ভগবান। তুমি দুঃখ কোরো না লক্ষ্মীটি।' আরও হয়ত অনেক কথাই বলার ছিল, কিন্তু কণ্ঠ রুদ্ধ হ'য়ে গিয়েছিল শ্যামলকান্তির।

অশ্রুবন্যায় বুক ভেসে গেল ছন্দার। স্থির রাখতে পারলো না সে নিজেকে, শ্যামলকান্তির পরিত্যক্ত দেহের পাশেই কখন্ অলক্ষ্যে সে অজ্ঞান হ'য়ে প'ড়লো। যখন জ্ঞান ফিরলো, দেখলো—চার পাশে তার পাড়া-প্রতিবেশিনীদের ভিড়। শ্যামলকান্তির নশ্বর দেহকে ততক্ষণে শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হ'য়েছে। শোকের আঘাতে নিজের ঘরে তারিণীমোহন ভেঙে প'ড়েছিলেন। পাড়ার লোকেরাই সৎকারের কাজ ক'রে ফিরলো। সংসারের দিক থেকে শুধু ছন্দাই সর্ব্বস্ব হারালো না, নিঃস্ব হ'য়ে গেলেন তারিণীমোহনও। তাঁর বার্দ্ধক্য-জীবনের শেষ অবলম্বন ছিল শ্যামলকান্তি। স্ত্রী সংসার থেকে চক্ষু বুজে গিয়েছেন আজ নয়। দেখতে দেখতে প্রায় পনেরোটা বছরই এক-রকম হ'তে চল্‌লো। শরিকি হিস্তায় জ্ঞাতি-ভাইদের সংসার র'য়েছে, এতদিন আপদে বিপদে তারাই দেখেছে। ছন্দাকে নিজে দেখে নিজের হাতে আশীর্ব্বাদ ক'রে ঘরের বউ ক'রে এনেছিলেন তিনি। সেই থেকে দুঃখেরও কিছু লাঘব হ'য়েছিল তাঁর। স্ত্রীর পরিত্যাক্ত সংসারকে আবার লক্ষ্মীশ্রীতে ভ'রে তুললো ছন্দা। সেবা দিয়ে, শ্রদ্ধা দিয়ে, যত্ন দিয়ে ভ'রে তুল্‌লো সে আবার তারিণী-মোহনের বিষাদক্লান্ত ভাঙা মনখানিকে। হঠাৎ কোথা থেকে একটা ঝোড়ো বাতাস এসে সব কিছুকে অকস্মাৎ ওলট পালট ক'রে দিয়ে গেল। মেরুদণ্ড ভেঙে গেল তারিণীমোহনের, শেষ অবলম্বনের ভিৎ ভেঙে গেল তাঁর জীবনে। এতদিনে তাঁর জীবনে সত্যিকারের সন্ন্যাস-মুহূর্ত্ত উপস্থিত।

দিন কয়েক কেটে গেলে একদিন বিনা কারণেই শ্বশ্রু-মহাশয়ের সামনে এসে পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে আধো অবগুণ্ঠনে দাঁড়ালো ছন্দা।

তারিণীমোহন জিজ্ঞেস ক'রলেন, 'কিছু ব'লবে মা?'

মনের কথা মুখ ফুটে বল্‌তে গিয়ে একবার বাধা পেল ছন্দা। তারিণীমোহনের মুখের দিকে তাকাতে গিয়ে নিজের কথাটাকে কিছুতেই সে প্রকাশ ক'রতে পারলো না। কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ ক'রে ব'ললো, 'ডিস্-পেন্‌সারীটা বিক্রী ক'রে দিলে হয় না বাবা?'

—'হ্যাঁ, দিতে হবে বৈ কি মা!' অভিভূত কণ্ঠে তারিণীমোহন বল্‌লেন, 'কাল সন্ধ্যায় বীরেশ্বর ডাক্তারের কম্পাউণ্ডার এসেছিল তার চিঠি নিয়ে। ওষুধপত্র, ফার্নিচার কি কি আছে, কিরকম দাম, জান্‌তে চায়। কিছু সুবিধেয় ছেড়ে দিলে বীরেশ্বর ডাক্তার নিজেই নিয়ে নেয়। অদৃষ্টের কি পরিণাম, তাই ভাবি মা। এতদিন

এখানে এই বীরেশ্বরই ছিল শ্যামলের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বি।' —কথার শেষে সারা বুকের মধ্যে একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে গেলেন তারিণীমোহন।

আর দ্বিরুক্তি ক'রলো না ছন্দা। সে জান্‌তো, দুর্ব্বল মনকে নাড়া দিতে গেলে না পারবে সে শ্বশুর মশাইকে সান্ত্বনা দিতে, না পারবে নিজেকে। নীরবে তাই কিছুক্ষণ একই ভাবে দাঁড়িয়ে থেকে আবার নিঃশব্দে নিজের ঘরের দিকে ফিরে এলো ছন্দা। কিন্তু তাতেই কি সে শান্তি পেলো? যে অশান্তি নিয়ে তিলে তিলে নিজের মধ্যে নিজে দগ্ধ হ'চ্ছে সে, সে আগুন ক্রমে বাইরে এসেও যে তাকে প্রতিমুহূর্ত্তে পুড়িয়ে মারছে। তা থেকে সে মুক্তি পাবে কেমন ক'রে? ঘরের মধ্যে বিষিয়ে উঠছে সে প্রতিমুহূর্ত্তে। শ্যামলকান্তির স্মৃতি আগুনের শিখা হ'য়ে তাকে দগ্ধে' দগ্ধে' মারছে! খণ্ডকালের একটা বিচ্ছিন্ন মুহূর্ত্তও অসহ্য তার কাছে। কি নিয়ে থাক্‌বে সে, কি দিয়ে সান্ত্বনা দেবে সে নিজেকে? এ ক'দিন ধ'রে কত কান্নাই না কাঁদলো ছন্দা, কাঁদতে কাঁদতে অশ্রু বরফ হ'য়ে গেছে। কেঁদেই কি সান্ত্বনা আছে, কান্নাই কি পরম প্রশান্তি? কিন্তু পথ কোথায়, মুক্তি কোথায়, মনের আশ্রয় কোথায়? মনটা যে বল্‌গা ঘোড়া, সে যে কোথাও বাধা মানে না!

মধ্যে কয়েকটা দিন কেটে গেলে আর-একবার এসে নিঃশব্দে দাঁড়ালো সে শ্বশ্রু মহাশয়ের সাম্‌নে।

আজও সেই একই প্রশ্ন ক'রলেন তারিণীমোহন: 'কিছু ব'ল্‌বে মা?'

আজ আর চেষ্টা ক'রেও নিজেকে চেপে যেতে পারলো না ছন্দা। ব'ল্‌লো, 'আমি ক'দিন মাগুরায় গিয়ে থেকে আসি বাবা?'

আপত্তি করতে পারলেন না তারিণীমোহন। সংসারে নিজের রিক্ততাকে বড় ক'রে দেখতে গিয়ে পুত্রবধূর হৃদয় সম্পর্কে অন্ধ ছিলেন না তিনি। ব'ল্‌লেন, 'তাই এস মা। আমিও ক'দিন ধ'রে ব'ল্‌বো ব'ল্‌বো ভেবেছি। তোমার যে এখানে কত কষ্ট হ'চ্ছে, তা কি বুঝি না? কেউ কি পারে এভাবে নিজেকে মানিয়ে নিতে!'

ছন্দা ব'ল্‌লো, 'কিন্তু—আমি চ'লে গেলে আপনার যে কষ্ট হবে বাবা!'

—'আমার আবার কষ্ট!' অলক্ষ্যে একটা দীর্ঘশ্বাস গোপন ক'রে নিয়ে তারিণীমোহন ব'ল্‌লেন, 'জ্ঞাতি-কুটুমেরা আছে, দরকার মতো তারাই দেখবে। তুমি কিছুদিন থেকে এস'গে কাকার কাছে। এখানে থেকে শুধু কর্ত্তব্য ক'রেই যাবে, মনেরও যে পরিবর্ত্তন দরকার মা!'

কেন যেন এবারে আর কিছু-একটাও ব'ল্‌তে পারলো না ছন্দা।

থেমে তারিণীমোহন ব'ল্‌লেন, 'শ্যামলের মা একদিন তিল তিল ক'রে সাজিয়ে তুলেছিল এই সংসারকে। যেদিকে তাকাতাম, সুস্পষ্ট লক্ষ্মীর ছাপ ভেসে উঠতো চোখের উপর। অবাক বিস্ময়ে ভাবতাম—নারীর কি অসামান্য শিল্পীকুশলতা! কিন্তু থাকলো না, সেও চক্ষু বুজে গেল, তার সাজানো ঘরও ভেঙে গেল একে একে। তারপর এলে তুমি, তোমার স্নেহকোমল হাতে আবার সেজে উঠলো ঘর, দেখে বুক জুড়ালো। সে ঘর যে আবার এম্‌নি ক'রেই ভাঙবে, এও কি ভাবতে পেরে-ছিলাম! অদৃষ্ট মা, সব আমার এই অদৃষ্ট।' ললাটে একবার করাঘাত ক'রলেন তারিণীমোহন। সাথে সাথে দু' ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে গালের দু'পাশ ভিজে গেল তাঁর।

ছন্দাও নিজেকে সম্বরণ ক'রতে পারেনি, অশ্রু-ভারাক্রান্ত কণ্ঠেই সে ব'ল্‌লো, 'আমি যাবো না বাবা।'

হাতের তেলোয় অশ্রু মুছে নিয়ে তারিণীমোহন ব'ল্‌লেন, 'তা হয় না মা। এখানে এই যক্ষপুরি আগ্‌লে এম্‌নি ক'রে তুমি থাকতে পারো না। মন জিনিষটা তো পাথর নয়, সেখানে উত্থান পতন আছে, তাকে আশ্বস্ত হবার সুযোগ দিতে হয়। আমি হাজার হ'লেও পুরুষ মানুষ, দিন আমার একরকম চ'লে যাবেই। তুমি বরং এই বুড়ো বাপটার মাঝে মাঝে খোঁজ নিও, তা হলেই আমার শান্তি।'

নীরবে মাথা নিচু ক'রে নিল ছন্দা। বিকেল গড়িয়ে ক্রমে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আস্‌ছিল। মাটির প্রদীপ জ্বালিয়ে এক সময় সে তুলসীমঞ্চ থেকে প্রণাম সেরে এলো।…

এর পর একটা সপ্তাহও কাটলো না।

মাগুরার কাকার আশ্রয়েই আবার ফিরে এলো ছন্দা। সেই চিরপরিচিত শ্যামল তরুশ্রেণী, ছোটবেলার খেলার সেই প্রাণময় পরিবেশ, নবগঙ্গার সেই ঢেউখেলানো স্নিগ্ধ জলরাশি, মাসীমা নির্ম্মলার সেই বুকভরা স্নেহ, তার সাথে মিশে আছে বিজুদার অনন্ত ভালবাসা। মনটাকে আবার যদি তবু ফিরিয়ে আনা যায় সেই শিশুজীবনের মাঝখানে!

নির্ম্মলা ইতিপূর্ব্বেই সংবাদটা জেনেছিলেন, জেনে অশ্রু বিসর্জ্জন ক'রেছিলেন নিজের মনে: 'হায়রে হতভাগিনী! মানুষকে এত দুঃখও দেন ভগবান!' যে দুঃখের অনলে সারাজীবন পুড়ে ম'রলেন তিনি, সেই দুঃখ-সাগরে অবশেষে ছন্দাকেও ঝাঁপ দিতে হ'লো! এত বড় দুঃসংবাদটা চেষ্টা ক'রেও বিজনকে পৌঁছে দিতে পারেন নি তিনি। নির্ম্মলা জানতেন—ক'লকাতার মেসের ঘরে ব'সে ছন্দার এতবড় শোক বিজন সহ্য করতে পারবে না। ইচ্ছে ক'রেই তাই ছেলের কাছে গোপন ক'রে গেছেন তিনি সংবাদটা। ছন্দা এসে এবারে যখন তাঁর বুকে মুখ লুকিয়ে হু হু ক'রে কেঁদে উঠলো, তখন সান্ত্বনা দেবার ভাষাটুকু পর্য্যন্ত খুঁজে পেলেন না তিনি। সস্নেহে মাথার উপর দিয়ে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে শুধু বললেন, 'এ তোর কপাল পোড়েনি মা, পুড়েছে আমাদের। কাঁদিসনে, কেঁদে তাকে আর ফিরে পাওয়া যাবে না। কাঁদলাম তো এতকাল আমিও, কিন্তু পেয়েছি কি? কপালের সিঁদুর মুছে এলি, এ তোর জীবনের যত বড় সত্য হ'লো, তার চাইতেও বড় সত্য হ'লো—আজ থেকে তুই এই পোড়া বাংলাদেশের হতভাগিনী বিধবা। জানিস তো—এ সংসারে বিধবার কি জ্বালা! কোথাও তার মাথা উঁচু ক'রে কথা বলবার অধিকার নেই।'

ব'লতে গিয়ে নিজেকে সম্বরণ ক'রতে পারলেন না নির্ম্মলা। টশ্ টশ্ ক'রে দু'ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে ছন্দার কপালের এক পাশ ভিজে গেল। থেমে নির্ম্মলা বললেন, 'সংসারের নানা বন্ধনে জড়িয়ে প'ড়ে এপথ যেন ভুলে যাসনে মা। রোজ অন্ততঃ একবারটি এসে মাসিমাকে দেখা দিয়ে যাস্।'

—'না এলে আমিই বা কি নিয়ে বাঁচবো মাসীমা!' বলতে গিয়ে অশ্রুভারে কণ্ঠ রুদ্ধ হ'য়ে গেল ছন্দার।

ঘরে এলে একসময় রসিকলাল কাছে ডেকে নিয়ে বসালেন ছন্দাকে। শরীরে বাত এসে আজ প্রায় একেবারেই পঙ্গু ক'রে ফেলেছে রসিকলালকে। আগের চাইতে বুড়িয়েও গেছেন অনেকখানি। সংসারবৈরাগ্যমন নিয়ে এখনও তবু তাঁকে সকলের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা ক'রতে হ'চ্ছে বাইরের বৈঠকখানা ঘরে ব'সে। সেদিকে এতটুকুও সহানুভূতি নেই অঞ্জনার। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুরধার জিহ্বা তাঁর প্রশমিত না হ'য়ে আরও শাণিত হয়েছে। ছন্দার বিয়ে হ'লে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিলেন তিনি; হতভাগিকে বিদেয় ক'রে নিশ্চিন্ত হ'তে চেয়েছিলেন তিনি চিরদিনের মতো। কিন্তু ভগবান তাতে বাদ সাধলেন। এতদিনে সাশ্রুনেত্রে ছন্দা এসে আবার তাঁকে প্রণাম ক'রে দাঁড়াতেই কপালে চোখ তুললেন অঞ্জনা, মনে মনে অভিসম্পাত ক'রলেন: শ্যামলকান্তি না গিয়ে ছন্দা কেন গেল না চক্ষু বুজে! হাড় তবে জুড়োতো অঞ্জনার। সংসারে বৈধব্যের যে আরও বেশী জ্বালা, তার জন্যে চাল-চুলোর ব্যবস্থা চাই স্বতন্ত্র, ছোঁয়া-ছানার বালাই আছে পদে পদে। এমন জ্বালায় মানুষ পড়ে?

কিন্তু অঞ্জনার জ্বালা কোনোকালেই যেমন রসিকলালকে বেঁধেনি, আজও তেমনি বিঁধলো না। বরং ছন্দার দিকে তাকাতে গিয়ে দুঃখে বুকখানি তাঁর ভেঙে গেল। নিজের হাতে একদিন বিয়ের আসরে তিনি সম্প্রদান করেছিলেন ছন্দাকে, তার পিছনে এমন অভিঘাত লুকোনো ছিল, এও কি জানতেন তিনি?

ছন্দাকে প্রবোধ দিতে গিয়ে কণ্ঠ তাই আর্দ্র হয়ে উঠলো রসিকলালের। বললেন, 'মনকে প্রফুল্ল রাখতে চেষ্টা কর্ মা। হিন্দু জাতি আমরা আত্মায় বিশ্বাসী, আত্মা অমর, তার মৃত্যু নেই। গীতায় ভগবান বলেছেন—বাসাংসি জীর্ণানী, অর্থাৎ ছিন্ন বস্ত্র ত্যাগ ক'রে মানুষ যেমন নতুন বস্ত্র পড়ে, তেমনি জীর্ণ দেহ ত্যাগ ক'রে নতুন দেহ ধারণ করে আত্মা। দেহ পচনশীল, কিন্তু

আত্মা অমর। শ্যামলের সেই অমর আত্মা অমৃতলোকে শান্তিলাভ করুক, এই প্রার্থনা কর্ মা।'

দিনরাত যে সেই প্রার্থনাই ক'রছে ছন্দা। তার কি ভাষা আছে, তার কি অভিব্যক্তি আছে! তিলে তিলে সেই প্রার্থনা যে তার ধমনীর রক্তে রক্তে দোলা দিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু হৃদয় তবু প্রশমিত হ'চ্চে কই? এখানে যাঁর সঙ্গে তার প্রতিমুহূর্ত্তের সম্পর্ক, তাঁর মুখ কালো মেঘের মতো থম্‌থমে, গম্ভীর। তিনি অঞ্জনা। আর যে ছিল, সে সবিতা, কিছুদিন হ'লো তার বিয়ে হয়েছে। রাজসাহীর ঘরে ব'সে সংবাদ পেয়েছিল সে যথাসময়েই, কিন্তু এসে বিয়েতে যোগ দেওয়া হয়নি তার। কাকা নিজেই উৎসাহ দেখাননি। না দেখাবার পিছনে তাঁর যে কতখানি ব্যথা লুকিয়ে ছিল, সে কি জানতে বাকী আছে ছন্দার! দু'চোখের বিষ কি সবিতারই কম ছিল সে! খবর এসেছে—আট ন' মাসের পোয়াতি সে, শীগ্‌গিরই মার কাছে আসবে। এসে আবার কোন্ নজরে দেখবে সে তাকে, ভগবানই জানেন। কিন্তু যাকে দেখলে, যার মুখের দু'টো কথা শুনলে এই থম্‌থমে নিস্তব্ধতার মধ্যেও বুকখানি শান্তিতে ভ'রে যেতো, সে আজ গ্রামে নেই। বিজুদা: বিজন। প্রতি মুহূর্ত্তে আজ তার অভাবটাই বড় ক'রে বাজছে বুকে। মনের শান্তির জন্য মানুষ এমন ক'রেও মাথা খুঁড়ে মরে!

এক কথা ভাবতে গিয়ে সহস্র কথার জাল এসে ঘিরে ধরে সারা মনটাকে। চিন্তাধারা ছিন্নবিচ্ছিন্ন হ'য়ে যায়। রসিকলালের কথার জবাবে একটি কথাও এসে অধরোষ্ঠকে কাঁপিয়ে তোলে না।—বিমূঢ়ের মতো কিছুক্ষণ উদাস দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে মাথা নিচু ক'রে নিল ছন্দা।

ভাঁড়ার ঘরের সাজসরঞ্জাম নিয়ে তখন উদ্দীপ্ত কণ্ঠ জ্ব'লে উঠেছে অঞ্জনার। কাকার পাশ থেকে উঠে ত্রস্তে একসময় কাকিমার পাশে গিয়েই দাঁড়ালো ছন্দা, বল্‌লো, 'আপনি ঘরে গিয়ে বসুন কাকিমা, আমি গুছিয়ে রাখছি সব।'

পনের

ক'ল্‌কাতার জীবনে মহেন্দ্র ততক্ষণে বিজনকে নিয়ে মুক্ত হাওয়ায় মুখর হ'য়ে উঠেছে বোটানিকাল গার্ডেনে। বিজনের 'কাব্য-মালিকা' যথাসময়েই দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রেছিল মহেন্দ্রের। অরুণই উৎসাহী হ'য়ে সংযোগটা ঘটিয়েছিল। সেই থেকে অরুণেরও বিজনের কাব্যসৃষ্টি সম্পর্কে কৌতূহল বেড়ে গিয়েছিল অনেকখানি। মনে মনে সেও কবিতা রচনার প্রয়াস খুঁজছিল, কিন্তু আকাশ-পাতাল ভেবে একটা পংক্তিও কলমের ডগায় ফুটিয়ে তুল্‌তে পারছিল না। শেষ পর্য্যন্ত কাব্যসৃষ্টিকে ঈশ্বরপ্রদত্ত বস্তু ব'লে মনে মনেই কাব্যলক্ষ্মীকে নমস্কার ক'রে আত্মসম্বরণ ক'রেছিল। কিন্তু মহেন্দ্রের দিকটা একেবারেই স্বতন্ত্র। এককালে কবিতা সে ভালোবাস্‌তো, কবিতা রচনায় হাতও ছিল তার; কিন্তু বাস্তবের রূঢ় আঘাতে একদিন সেই কবিতা ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে গেল তার জীবনে। সেটা সে ভিন্ন সংসারের দ্বিতীয় ব্যক্তিটি কেউ জানে না। মাঝে মাঝে স্মৃতির পথ বেয়ে সেই জীবনটা এসে সাম্‌নে দাঁড়ায়, অলক্ষ্যেই আবার সে চঞ্চল কর্ম্মব্যস্ততার মধ্যে কখন্ হারিয়ে যায়। বোটানিকাল গার্ডেনের মনোরম পরিবেশে আবার সেই জীবনটা যেন মনের কোন্ নিভৃত কোণে হঠাৎ এসে উঁকি দিয়ে গেল। নিজেকে সম্বরণ ক'রে যেতে চেষ্টা ক'রলো মহেন্দ্র। বল্‌লো, 'তোমার কবিখ্যাতি একদিন দশ দিকে ছড়িয়ে পড়ুক, এই কামনাই করি বিজন। কিন্তু সংসারের পথ বড় ক্ষুরধার, জীবনে কাব্যকে টিকিয়ে রাখা সেখানে মস্তবড় শক্তি-সাপেক্ষ।'

বিজন ব'ল্‌লো, 'সামান্য একটা খণ্ডকালেই যার সমাধি স্পষ্ট হ'য়ে উঠলো, গোটা জীবনের প্রশ্নটা সেখানে একেবারেই অসার্থক। কবিতা লেখা একরকম ছেড়েই দিয়েছি মহিনদা, তা নিয়ে আমার জীবনে কোনো প্রশ্নই নেই। আপনি লিখ্‌লেই বরং তা শোভা পায়।'

—'ফট্‌কা বাজারের মানুষ হ'য়ে আমি লিখ্‌ব কবিতা, এবারেই হাসালে তুমি।' থেমে মহেন্দ্র ব'ল্‌লো, 'এখন জীবন নেই, শুধু জীবিকা।'

—'কোনোদিন তবে জীবন ছিল বলুন ?' চ'লতে চ'লতে হঠাৎ একবার থ'মকে তাকালো বিজন মহেন্দ্রর মুখের দিকে।

আত্মসম্বরণের বাঁধ বুঝি এবারে একেবারেই ভেঙে যেতে ব'স্‌লো! কিছুমাত্র দ্বিধা না ক'রে মহেন্দ্র বললো, 'অস্বীকার ক'রবার উপায় নেই। তোমার কাব্যমালিকার উপর দিয়ে চোখ বুলিয়ে নিতে নিতে সেই জীবনটার দিকেই হঠাৎ একবার কখন্ দৃষ্টি প্রসারিত হ'য়ে গেল। ফেরাতে পারলুম না।'

—'কবিতা তবে আপনিও লিখ্‌তেন ?'

গাছের ডালে ডালে দক্ষিণা বাতাস একবার দোলা দিয়ে গেল। সেদিকে লক্ষ্য গেল কিনা কারুর ব'লতে পারি না।

মহেন্দ্র ব'ল্‌লো, 'লিখ্‌তুম। উঠ্‌তি যৌবনের জোয়ারে তখন কেবল স্নান ক'রে উঠেছি। কবিতার মতো একটি সুন্দরী মেয়েকে একদিন ভালবাসলাম হঠাৎ, হাসি ছিল তার শরতের শিউলীর মতো। সেই প্রথম জীবনে আমার কবিতা এলো। রোজ একটি ক'রে কবিতা লিখতাম আর তাকে উপহার দিতাম। দু'বছরে প্রায় সাতশো ত্রিশটা কবিতা জমা হ'য়েছিল তার হাতে, সেই সাথে ভালোবাসা দিয়ে ঘেরা দু'একটুকরো চিঠি। কিন্তু আমি কি জানতুম, শূন্যে সৌধ নির্ম্মান ক'রতে চলেছি! আমার জীবনে মল্লিকার অবির্ভাব ঘট্‌লো না। কোথায় একদিন তার মালাবদলের অনুষ্ঠান নির্ব্বিঘ্নে চুকে গেল। মনে মনে ব'ল্‌লাম—সুখী হও তুমি মল্লিকা।'

পা দু'খানি হঠাৎ কেমন আড়ষ্ট হয়ে এসেছিল বিজনের, মুহূর্ত্তের জন্ত একবার থ'মকে দাঁড়িয়ে ব'ল্‌লো, 'ব'ল্‌তে পারলেন একথা মহিনদা ?'

—'পারলুম বৈ কি! তার অকল্যাণ কি কোনোদিন চেয়েছি ?' ব'লে ম্লান একটুকরো হাস্‌লো মহেন্দ্র।

বিজন জিজ্ঞেস ক'রলো, 'আর কোনোদিনই কি তার দেখা পাননি ?'

মহেন্দ্র ব'ল্‌লো, 'পেয়েছি, শুধু একবার এবং শেষবার। ব'ল্‌লাম, 'কবিতাগুলো এবারে ফিরিয়ে দাও, ওগুলো দিয়ে বই ছাপিয়ে তোমার নামে উৎসর্গ ক'রে প্রেমকে আমার অক্ষয় ক'রে রাখবার অন্ততঃ কিছুটাও সুযোগ পাই। কিন্তু সেই মুহূর্ত্তেই যেন বজ্রপাত ঘট্‌লো। বল্‌লো—অতীতের ছেলেখেলাকে এতদিনও কি সযত্নে সাজিয়ে রাখতে বলো ? সংসারদুর্গে প্রবেশ ক'রবার দিন সেগুলোকে পুড়িয়ে ফেলেছি। শুনে স্তম্ভিত হ'য়ে ফিরে এলাম সেদিন মল্লিকার সাম্‌নে থেকে। ভালোবাসা হ'লো ছেলেখেলা, তাই নির্ব্বিবাদে তার বুকে অগ্নি-সংযোগ ক'রে দিতে পারলো সে। ভাবলাম—কবিতা দিয়ে নিজের জীবনটাকে অন্ততঃ আর কোনো-দিনই প্রতাড়না ক'রবো না। বেছে নিলাম পথ, জীবনটা ফট্‌কা ভিন্ন আর কিছুই নয় বিজন, ঢুকলাম তাই এই ফটকার কার্‌বারে শেয়ার মার্কেটে। এ ব্রিলিয়েণ্ট লাইফ্, বেঁচে থাক্‌বার পক্ষে অন্ততঃ চমৎকার জীবন!'

একটা দুরন্ত জিজ্ঞাসা হঠাৎ যেন কেমন রুদ্ধ হ'য়ে গেল বিজনের কণ্ঠে। মনে মনে শুধু একবার উচ্চারণ করলো সে—অদ্ভুত বিচিত্র মানুষ এই মহেন্দ্র। বাইরে কঠিন কর্ম্মব্যস্ততার প্রলেপ দিয়ে প্রশমিত ক'রে রেখেছে অন্তরের ব্যথাদীর্ণ ভালোবাসাকে। স্বল্পক্ষণ থেমে পরে বল্‌লো, 'আপনি শক্তিমান পুরুষ, মহিনদা।'

—'অর্থাৎ ?'

—'অর্থাৎ—এমন ক'রে যে নিজেকে প্রচ্ছন্ন রাখতে পারে, সংসারে সে যথার্থই শক্তিমান বৈ কি ?'

মহেন্দ্র বল্‌লো, 'প্রেমের ব্যাপারে আত্মবলি দেওয়াকে চিরকালই আমি কাপুরুষতা ব'লে ঘৃণা করি। মল্লিকাকে না পেয়ে তাই মনে দাগ রাখতে দিই নি।'

এবারে না হেসে পারলো না বিজন।

মহেন্দ্র জিজ্ঞেস্ ক'রলো, 'হাস্‌লে যে বড় ?'

—'হাসির কথা ব'ল্‌লেন কি না, তাই।' বিজন ব'ল্‌লো, 'যেটাকে দাগ ব'ল্‌লেন, সেটা ঠিকই অন্তরে বিঁধে আছে, তাকে শুধু ছাই চাপা দিয়ে রেখেছেন, এই পর্য্যন্ত।'

—'ধ্যেৎ।' কৃত্রিম বকুনির সুরে হঠাৎই শব্দটা উচ্চারণ ক'রলো মহেন্দ্র। তারপর থেমে ব'ল্‌লো, 'চলো, এবারে ফিরি।'

বিজন বুঝলো, ইচ্ছে ক'রেই নিজেকে চেপে যেতে চাইল মহেন্দ্র। তাই আর কথাটা নিয়ে বড়বেশী ঘাটা-ঘাটি ক'রলো না সে; কথায় তাল রেখে শুধু ব'ল্‌লো, 'চলুন।'

বোটানিকাল গার্ডেনের বুকে তখন চাঁদের আলো এসে ঠিক্‌রে প'ড়েছে। এমন অপূর্ব্ব পরিবেশে চাঁদটাকে আজ যেন নতুন চোখে দেখতে পেলো বিজন। ক'ল্‌কাতায় এসে অবধি এমন ক'রে এর আগে কখনও চন্দ্র-দর্শন ঘটে ওঠে নি। চাঁদের জ্যোৎস্নালোকিত আর্শিতে প্রথম যার মুখখানি তার মনে ভেসে উঠলো, সে ছন্দা। সহসা ছন্দার জন্ম মনটা কেমন অস্থির হ'য়ে উঠলো তার। শ্যামলের অসুখের কথাটাই শুধু শুনেছিল সে, তার নিরাময়ের সংবাদ এসে তার কানে আর পৌঁছায় নি। আর একবার উর্দ্ধাকাশের দিকে তাকিয়ে কি যেন লক্ষ্য ক'রলো সে চন্দ্রাননের মধ্যে! এবারে যার মুখখানি অকস্মাৎ ভেসে উঠলো তার মনে, সে রেবা। চাঁদের মতই শুভ্রকান্তি। মনে প'ড়লো—কিছুদিনের মধ্যে আর বড়একটা যাওয়া হয়নি রেবাদের বাড়ীতে। এই মুহূর্ত্তে এই চন্দ্রালোকিত সন্ধ্যায় মুখোমুখি ব'সে যদি অবকাশ পেতো সে রেবার স্বভাবসুন্দর কণ্ঠের গান শুন্‌বার, আরও শুভ্রসুন্দর হ'য়ে উঠতো না কি তবে এই জ্যোৎস্নাবিধৌত সন্ধ্যা ?

চ'ল্‌তে চ'ল্‌তে মহেন্দ্র ব'ল্‌লো, 'খানিকটা যেন অন্য-মনস্ক হ'য়ে প'ড়লে তুমি, দেখতে পাচ্ছি।'

ছোট্ট ক'রে বিজন শুধু ব'ল্‌লো, 'উপভোগ কর্‌ছি এই সুন্দর সন্ধ্যাটাকে।'

সহসা অদ্ভুত একটা প্রশ্ন ক'রে ব'স্‌লো মহেন্দ্র, 'আজ যদি অমাবস্যা হ'তো ?'

—'শ্মশানে গিয়ে তবে আত্মদর্শন করতাম।' জবাব দিতে এতটুকুও বিলম্ব হ'লো না বিজনের। ব'ল্‌লো, 'অন্ধকারের গর্ত্ত থেকে যখন চিতাগ্নি জ্ব'লে উঠ্‌তো, তার স্ফুলিঙ্গকে তারার মতো উড়িয়ে দিতাম এম্‌নি একটা চাঁদের প্রচ্ছন্ন রূপের উদ্দেশ্যে। অমাবস্যারও একটা আলাদাই রূপ আছে বৈকি মহিন্‌দা ?'

মহেন্দ্র ব'ল্‌লো, 'কবি মানুষ তুমি, তোমার কাছে রূপ আর অ-রূপ এক হ'য়ে গেছে। আমরা বাস্তব জগতের মানুষ, আমাদের কাছে অমাবস্যাটা বিভীষিকা ভিন্ন আর কিছুই নয়।'

ইতিমধ্যে সাম্‌নে এসে বাস দাঁড়াতেই দু'জনে উঠে প'ড়লো। কণ্ডাক্টারের হাঁকাহাঁকিতে কণ্ঠ এবারে তাদের চাপা প'ড়ে গেল। ভঁ্যাপুর কর্ণবিদারি শব্দে দ্রুত বেগে ছুটে চ'ল্‌লো বাস: বোটানিকাল গার্ডেনকে পিছনে ফেলে একেবারে শিবপুর বাজার, তারপর হাওড়া ষ্টেশন, তারপর—

যখন এসে ওয়েলিংটন ষ্ট্রীটে পৌঁছালো তারা, সাম্‌নের একটা বড় টাওয়ার ক্লকে তখন জলতরঙ্গের মতো সাড়ে আটটার ঘণ্টা বেজে যেতে শোনা গেল।...

[ক্রমশঃ

কান্তকবি রজনীকান্ত

শ্রীকালিদাস রায়

আমাদের যৌবনকালে কান্তকবির গান ঘরে ঘরে শুনিতাম। কবি নিজে ভালো গাহিতে পারিতেন, তাঁহার সুর তাল মানের জ্ঞান ছিল অসাধারণ, তাই তিনি আসল গান লিখিতে পারিতেন। আজকাল যেমন নভেলকে নাটকে পরিণত করার মত কবিতাকে গানে পরিণত করা হয়, সে যুগে তাহা ছিল না। সে যুগে যাঁহারা গান লিখিতেন, তাঁহারা গানের নিজস্ব স্বাতন্ত্র্যের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই গান রচনা করিতেন। রজনীকান্ত কবিতা খুব কম লিখিয়াছিলেন—তাঁহার কবিপ্রতিভা ছিল সঙ্গীতময়ী—তাহা অজস্র গানেই অভিব্যক্ত হইয়াছে।—তাঁহার গানগুলি তিনি নিজেই গাহিয়া প্রচার করিয়াছিলেন। বাগ্‌যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়া গানগুলি দেশময় প্রচারিত হইয়াছিল। নিয়তি তাঁহার বাগ্‌যন্ত্রেই মৃত্যুবীজ রোপণ করিলেন; তাঁহার কণ্ঠ অকালে নীরব হইল। এখন তাঁহার গানের বিশেষ আদর নাই। এখন তাঁহার গানগুলি গ্রন্থের পৃষ্ঠাতেই বন্দী হইয়া আছে। আমরা 'বাণী' 'কল্যাণী' ইত্যাদি গ্রন্থে সেই চমৎকার গানগুলির সাক্ষাৎ লাভ করি।

তাহাও সম্ভব হইত না, যদি তিনি বাণী কল্যাণীর গ্রন্থস্বত্ব স্বল্পমূল্যে বিক্রয় না করিতেন। এদেশে গ্রন্থকার বিপন্ন হইয়া অর্থকষ্টের তাড়নায় গ্রন্থস্বত্ব স্বল্পমূল্যে বিক্রয় করেন। প্রকাশকগণ গ্রন্থকারের দারিদ্র্যের সুযোগ পাইয়া স্বল্পমূল্যে গ্রন্থস্বত্ব কিনিয়া ল'ন—সে জন্য আমরা আক্ষেপ করি এবং প্রকাশকদের বিরুদ্ধে আমাদের একটা মস্ত অভিযোগ এই। কিন্তু আমরা নিজেরাও দেশমান্য গ্রন্থকারদের গ্রন্থপ্রকাশের অন্য কোন ব্যবস্থাও করি না—কোন বিদ্বৎ প্রতিষ্ঠান হইতে গ্রন্থ প্রকাশের ব্যবস্থাও নাই। ফলে, প্রকাশকগণ যে সকল পুস্তকের গ্রন্থস্বত্ব কিনিয়া ল'ন—সেই গুলিতেই গ্রন্থকার দেশে জীবিত থাকেন। ভাগ্যে কান্তকবি বাণী কল্যাণীর গ্রন্থস্বত্ব বিক্রয় করিয়াছিলেন একজন সুপ্রতিষ্ঠিত প্রকাশককে, তাই তাঁহার গ্রন্থ দুইখানির বহু সংস্করণ হইয়াছে এবং দেশের লোক কান্ত কবিকে একেবারে ভুলিয়া যায় নাই। গ্রন্থ দুইখানি উৎকৃষ্ট প্রচ্ছদপটে মণ্ডিত হইয়া প্রচারিত হইয়াছে—সহজেই তাঁহার গানগুলির মুদ্রিত রূপ লোকের হাতে হাতে পৌঁছিয়াছে।

কবি কর্কটরোগে আক্রান্ত হইয়া মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে আশ্রয় গ্রহণ করেন—মৃত্যু যখন অনিবার্য্য ও আসন্ন, তখনও কবির লেখনী অবিশ্রান্ত চলিতেছিল। সেই সময়ে দেশে কবির প্রতি একটা গভীর সহানুভূতির ভাব প্রবুদ্ধ হয়। তাহার ফলে তাঁহার অভয়া, আনন্দময়ী, বিশ্রাম, অমৃত ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। অমৃত ছাত্রপাঠ্য গ্রন্থ, সেজন্য ইহার কতকগুলি সংস্করণ হইয়াছে—অমৃতের ছোট ছোট কবিতাগুলির সাহায্যে রজনীকান্ত ছাত্রসমাজে সুপরিচিত। আমাদের দেশে রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত, দাশু রায়, নীলকণ্ঠ, বাউল কবিগণ ও দেহতত্ত্বমূলক গীতি-রচয়িতাদের গানগুলির মধ্য দিয়া দেশে যে সঙ্গীতের ধারা চলিয়া আসিতেছিল, রজনীকান্ত সেই ধারার শেষ কবি।

রজনীকান্তের বৈশিষ্ট্য এই,—পূর্ব্বতন সঙ্গীত-রচয়িতাদের গানগুলির মুদ্রিতরূপ ছন্দোবন্ধের দিক হইতে অনবদ্য নয়, কান্তকবি রবীন্দ্র যুগের কবি, রবীন্দ্রনাথের প্রভাবে কান্তকবির গানগুলিতে ছন্দোবন্ধের পারিপাট্য অনবদ্য। কান্ত কবির রচনাভঙ্গী প্রধানতঃ প্রাক্তন সঙ্গীতরচয়িতাদের মতই—তাঁহাদেরই প্রবর্ত্তিত সুরে তাঁহার গানগুলি রচিত। দুই চারিটি গানে কবি রবীন্দ্রনাথের গানের সুরও সংযোজিত করিয়াছেন। কেবল হাসির গানগুলিতে তিনি তাঁহাদের অনুকারক নহেন। হাসির গানগুলিতে তাঁহাকে দ্বিজেন্দ্রলালের অনুবর্ত্তী বলা যাইতে পারে। অমৃতের ছোট ছোট কবিতাগুলি রবীন্দ্রনাথের কণিকার অনুসরণে Epigrammatic ভঙ্গীতে রচিত। প্রভেদ হইতেছে—রবীন্দ্রনাথের কণিকার কবিতাগুলি প্রধানতঃ শ্লেষব্যঙ্গাত্মক, রজনীকান্তের কবিতাগুলি নীতিমূলক।

কান্ত কবির গান গুলিকে বিবিধ শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। ১। ভগবদ্ভক্তিমূলক ২। দেহতত্ত্বমূলক ৩। বৈরাগ্যমূলক ৪। আগমনী বিজয়ার গান ৫। হাসির গান ৬। নীতিমূলক।

ভগবদ্ভক্তিমূলক গানে তিনি ব্রহ্মের পিতৃরূপ ও মাতৃরূপ দুইই কল্পনা করিয়াছেন। যে গানগুলিতে পিতৃরূপ কল্পিত হইয়াছে—সে গুলিতে ব্রাহ্মসঙ্গীতের অনুস্মৃতি লক্ষ্য করা যায়।

এই শ্রেণীর সঙ্গীতে ভগবানে সম্পূর্ণ আত্ম সমর্পণ করিতে না পারার জন্ত কবিচিত্তের একটা আক্ষেপের সুর ধ্বনিত হইয়াছে—এই আক্ষেপের সুর নরোত্তম দাস, লোচন দাস ইত্যাদি সাধক কবিদের কথা মনে পড়ায়। দুই একটি অংশের উৎকলন করি—

(১) প্রেমিক হৃদয় গলি প্রেমানল শিখা তুলি
জয় প্রেমময় বলি তব পানে ধায়।
সে বহ্নিপরশে মম সিক্ত ইন্ধনসম
হৃদি হ'তে উঠে শুধু ধূম।

(২) —কেন বঞ্চিত হব চরণে
আমি কত আশা ক'রে বসে আছি পাব
জীবনে না হয় মরণে।

বহুগানে তিনি ব্রাহ্মসঙ্গীতের অনুসরণে শ্রীভগবানের মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন। কবি তাঁহাকে কোন মঠমন্দিরে দেখেন নাই—কোন বিশিষ্ট মূর্ত্তিতে দেখেন নাই—কোন দেবদেবীর মধ্যে দেখেন নাই, তিনি দেখিয়াছেন তাঁহাকে বিশ্বব্যাপ্তরূপে—বিশেষতঃ বিশ্বমানবেরই মধ্যে। যেমন—

সাধুর চিতে তুমি আনন্দরূপে রাজো
ভীতিরূপে জাগ পাতকীর প্রাণে।
প্রেমরূপে জাগো সতীর হিয়া মাঝে
স্নেহরূপে জাগো জননী নয়ানে।

সমগ্র বিশ্বই নিরাকার ব্রহ্মের মহিমা প্রচার করিতেছে। তাহাই আবার নিরুপাধিক ব্রহ্মকে উপাধি মালায় মণ্ডিত করিতেছে—

উদ্বেলিত সিন্ধু তরঙ্গ উত্তাল
প্রকাশে তোমার মূরতি করাল
মরীচিকা ঘোষে তুমি ইন্দ্রজাল
শিশির কহিছে তুমি নিরমল।
অনুতাপী কহে তুমি ন্যায়বান্
ভক্ত কহে তুমি আনন্দ বিধান
সুখে শিশু করি মাতৃস্তন্য পান
প্রকাশে তোমার করুণা অতল।

তাই তিনি বলিয়াছেন

অনন্ত দিগন্তব্যাপী অনন্ত মহিমা তব
আমি ক্ষুদ্র দীন কবি কিবা জানি কিবা ক'ব?

কবি হতাশ ন'ন—তিনি জানেন যিনি পতিতপাবন, তিনি একদিন পতিতকে তরিবেনই। তবে যত বিলম্ব হয়, ততই উৎকণ্ঠা বাড়ে কবে সেদিন আসিবে তাহারই অপেক্ষায় কবি বলেন—

কবে—তোমাতে হ'য়ে যাব আমার আমি হারা,
তোমারি নাম নিতে নয়নে ব'বে ধারা।

রামপ্রসাদের 'এমন দিন কি হবে মা তারা, যেদিন তারা তারা তারা ব'লে দুনয়নে বইবে ধারা,' অথবা নীলকণ্ঠের—'কত দিনে হবে আমার প্রেমের সঞ্চার'—এই গান দুইটির কথা মনে পড়ে।

কবি বলেন, তিনি ভক্ত হইতে পারেন নাই—তবু লোকে ভক্ত মনে করে— সেজন্ত তিনি লজ্জিত—

তোমারি ত আমি খাই পরি তবু
তোমারই করি পরিহাস।
তোমার, সেবা নাহি করি তবু কেন হরি
লোকে বলে মোরে হরিদাস।

রবীন্দ্রনাথের অনুসরণে কবি আত্মচৈতন্যসম্পাদনের জন্ত ভগবানের রুদ্র আঘাত প্রার্থনা করিয়াছেন—

(১) ফেলে যাও আর করো না যতন ফিরাও বদন সরাও চরণ।
ছাড় মোর আশা মোর ভালবাসা (বুকে) লাথি মেরে চলে যাও।

(২) প্রভু নিলাজ হৃদয়ে কর কঠিন আঘাত
কর দুষ্ট কলঙ্কিত এ শোণিত পাত।
মৃদু প্রতিকারে ব্যাধি হবেনা নিপাত গে
তীব্র ভেষজ মোরে দেহ বৈদ্যনাথ।

বাংলার বাউল ও সহজিয়া কবিরা তত্ত্বমূলক গানে হেঁয়ালির ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন—ঠারেঠোরে তাঁহারা বক্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন এবং এজন্ত রূপকের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। রজনীকান্তের তত্ত্বমূলক গানে অস্পষ্ট কিছুই নাই, বক্তব্য পরিচ্ছন্ন। তবে তিনিও অনেক স্থলে সঙ্গিরূপক অলঙ্কারের প্রয়োগ করিয়াছেন। এই শ্রেণীর গানগুলির মধ্যে একটি 'পর পার'

ভাসাবে জীবন তরণী ভবের সাগরে।
যাবি যদি ওপারের সেই অভয় নগরে। ইত্যাদি

একটি গানে কবি বলিয়াছেন—

তুই ঘুরে বেড়াস পরিধিতে
সে যে বসে আছে কেন্দ্রটিতে

সাধনা—ব্যাসের রেখায় পা দিলিনে মোহের ঘোরে।

এইরূপ রূপক কবির সম্পূর্ণ নিজস্ব। এরূপ উপমা পূর্ব্বের কবিদের জানা ছিল না। কবি গ্রহরহস্যে জ্যোতির্বিদ্যা দ্বারা

ভগবৎতত্ত্ব বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। 'যোগ' শব্দটিকে শ্লেষে ব্যবহার করিয়া কবি গণিতশাস্ত্রের বিবিধ প্রকরণের রূপকে ভাগবত সংযোগের কথা বলিয়াছেন। এই গানটির মধ্যে যথেষ্ট কলা চাতুর্য্য আছে।

যোগ কর প্রাণ মনে,
আর কাজ কি ভবের ভাব পুরণে?
হয়োনা কাতর বিয়োগে হাসবে লোকে দেখে শুনে।
আগে নে মনকষাকষি করিসনে মন কষাকষি
সরল কররে জটিল রাশি, থাকিস্ নে বসি'
ভবের, মিথ্যা মিশ্র সঙ্কলনে। ইত্যাদি—

দেশাত্মবোধজাগরণে কান্তকবির কিছু দান ছিল। তাঁহার—'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নেরে ভাই', অথবা 'আমরা নেহাৎ গরিব আমরা নেহাৎ ছোট, তবু সাত কোটি ভাই জেগে ওঠে,—তাই ভালো মোদের মায়ের ঘরের শুধু ভাত।' এই তিনটি গান স্বদেশী যুগে সভায় সভায় পথে পথে গীত হইত। কান্তকবির আর একটি গান—তব চরণ নিম্নে উৎসবময়ী শ্যাম ধরণী সরসা। এ গান মাধুর্য্যে দ্বিজেন্দ্র লালের বিখ্যাত গানগুলির সমকক্ষ,—গাম্ভীর্য্যে দ্বিজেন্দ্র সঙ্গীতকেও অতিক্রম করিয়াছে।

বৈরাগ্যমূলক গানগুলিতে মোহমুদ্গরী ভাব আছে। আবার কতকগুলি কেবল প্রমত্তচিত্তে প্রসাদসঞ্চারের জন্য। যেমন 'নশ্বরত্ব' গানে—

১। ভাই এখন দেখরে ভেবে বসা কি উচিত দেবে
কখন টান দিয়ে নেবে (তার) খেয়াল বোঝা সহজ নয়।
সে যে—কি ভেবে কখন কি করে কেন ভাঙ্গে কেন গড়ে
কান্ত, তুই জীবন ভরে ভাব্ না সেটাই ভাবের বিষয়।
২। যা খেলে আর হয় না খেতে
যা পেলে আর হয় না পেতে
তাই ফেলে দিনে রেতে মরিস্ কিসের পিপাসায়।

মোহমুদ্গরী ভাবের গানগুলিতে জরামরণের ভয় দেখানো হইয়াছে। এই শ্রেণীর গানের মধ্যে 'কত বাকি?', 'আর কেন?' 'এখনও' 'বৃথাদর্প' 'পরিণাম' এই শ্রেণীর কবিতা-গুলির মধ্যে 'শেষ দিন'টি চমৎকার রচনা। ভর্ত্তৃহরির বৈরাগ্য শতকের অনুসরণে কবি রক্তমাংসমেদোময় দেহের জঘন্যতা দেখাইয়া জুগুপ্সার সঞ্চার করিতে চেষ্টা করিয়াছেন কোন কোন গানে।

এই দেহটার ভিতর বাহির ছাই
এতে—ভাল জিনিস একটি নাই।
(এইত) অস্থি চর্ম্ম মাংস মজ্জা মেদ
মূত্র বিষ্ঠা পিত্তশ্লেষ্মা দুর্গন্ধময় ক্লেদ?
এটা, পুঁতে রাখে পুড়িয়ে ফেলে
(না হয়) অমনি ফেলে দেয়রে ভাই।

কবির নীতিমূলক গানগুলিতে পরিণামে দণ্ডের ভয় দেখানো হইয়াছে—যেমন—

যত—খুন ডাকাতি প্রবঞ্চনা মদ গাঁজা ভাঙ্ বারাঙ্গনা
এর মজা বুঝবে সেদিন যেদিন যাবে শিঙে ফুঁকে।

বিলাসের অসারতা দেখাইয়া এবং জরায় যৌবনের শোচনীয় পরিণাম স্মরণ করাইয়া সময় থাকিতে তরুণদের সতর্ক করিবার জন্য কবি বৃদ্ধকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়াছেন—

এখন, মরছ মাথা খুঁড়ে,
তোমার সকল আশা ফুরিয়ে গেল পড়ল বালি গুড়ে।
যখন গায়ে ছিল বল,
ক্রোশকে বলতে বিঘত মাটি প্রহর বলতে পল।
এখন ষষ্টি ভিন্ন ষষ্ঠীর বাছা সাতকুঁড়ের এক কুঁড়ে।

× × ×

ছিল দেহের বাহার কি!
সোনার কার্ত্তিক, নধর গঠন, রসের আহারটি।
এখন হাড়ে চামড়া আছে মাংস গেছে উড়ে।

× × ×

দীন কান্ত বলে ভাই,
আগেই আমি বলেছিলাম তখন শোনো নাই।
(আর) কি ফল হবে খুঁড়লে কুয়ো বাড়ীই গেছে পুড়ে।

শেষের সেদিনটিকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া বৈরাগ্য উদ্দীপনের এবং ধর্ম্মের পথে আকর্ষণের একটি চিরপ্রচলিত পদ্ধতি। কবি গাহিয়াছেন—

যেদিন উপজিবে শ্বাসকষ্ট,
বায়ু পিত্ত কফের নাড়ী হয়ে ক্ষীণ হবে নিজ নিজ স্থানভ্রষ্ট।

× × ×

কেবল, বুকের কাছে একটু থাকবে রে ধুকধুকি
আর ঈষৎ নড়বে শুধু ওষ্ঠ।
মলমূত্রে কফে জরে পড়ে রবে সোনার শরীর পরিপুষ্ট।

কান্ত বলে ভ্রান্ত মনরে বলি শোন, এখন, লাগছে না বটে মিষ্ট,
কিন্তু—সকল সত্যের চেয়ে এইটে সত্যি কথা দিনত গেল
ভাবরে ইষ্ট।

পরিণাম কবিতায় কবি বলিয়াছেন—

যেদিন কফের নাড়ী উঠবে জেগে বায়ু পিত্ত ক্ষীণ
সেদিন কস্তুরী ভৈরবে হালে পাবে না আর পানিরে।
বসবে ঘিরে মাগ ছেলে
বল্‌বে—ব'লে যাওগো কোন সিন্ধুকে কি রেখে গেলে।
গুণবে টাকা, কাণে কেউ দেবে না তারকব্রহ্ম বাণীরে।

কবির প্রার্থনাসঙ্গীতের মধ্যে 'তুমি নির্ম্মল কর মঙ্গল করে মলিনমর্ম্ম মুছায়ে'—গানটি খুব বিখ্যাত।

ইহাছাড়া—"এই বধির যবনিকা তুলিয়া মোরে প্রভু দেখাও তব চির আলোক লোক","তোমারি দেওয়া তোমারি লওয়া দুখ—তোমারি দেওয়া বুকে তোমারি অনুভব"; "পূর্ণ জ্যোতিঃ তুমি ঘোষে দিনপতি"; "তুমি সুন্দর, তাই তোমার বিশ্ব সুন্দর শোভাময়।" ইত্যাদি গান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—

আমাদের দেশের সাধক কবিগণ—সকলেই আশাবাদী, তাঁহারা শ্রীভগবানের অনন্ত করুণায় বিশ্বাসী! তাই তাঁহারা মনে করেন—ভক্ত যেমন ভগবানকে চায়—ভগবানও তেমনি ভক্তকে চান। আমি চাই আর না চাই—তিনি আমাকে চান—কাজেই শেষ পর্য্যন্ত আমাকে তাঁহার কাছেই যাইতে হইবে। দুর্ব্বল সসীম জীব আমরা, আমাদের ভুলভ্রান্তি হওয়াই স্বাভাবিক—করুণাময় কি সেজন্য তাঁহার সন্তানকে বর্জ্জন করিতে পারেন ?—এই ভাবধারা রবীন্দ্রনাথের রচনার মধ্য দিয়া রজনীকান্তের রচনায় সঞ্চারিত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে কান্তকবির—"আমিতো তোমারে চাইনি জীবনে তুমি আমারে চেয়েছ"; "(আমি) অকৃতি অধম ব'লেও ত তুমি কম ক'রে মোরে দাও নি।" ইত্যাদি গানের উল্লেখ করা যাইতে পারে।

ভগবান সম্বন্ধে এই আশ্বস্ত মনোভাব স্বতঃই ভগবানকে মাতৃরূপে কল্পনায় প্রণোদিত করে। রজনীকান্ত রামপ্রসাদের অনুসরণে বিশ্বজননীর কাছে আবদার অভিমান জানাইয়াছেন—

১। কোন ছেলে তোর আমার মতন কাটায় জীবন হেলায় খেলায়।
২। আহা, কত অপরাধ করেছি আমি তোমার চরণে মাগো।
৩। (মা আমার) আমারে আদর করোনা নিওনা নিওনা কোলে—
৪। মাগো, সকলি আমার ভ্রান্তি।
৫। কোলের ছেলে ধূলো ঝেড়ে তুলে নে কোলে।

এই গানগুলিতে প্রসাদী বাৎসল্যরস টলটল করিতেছে। কান্তকবির ভগবন্মহিমাবিষয়ক গানগুলির মধ্যে এই গানটি সুন্দর—

তুমি—সুন্দর—তাই তোমার বিশ্ব সুন্দর শোভাময়।
তুমি—উজ্জ্বল তাই নিখিল দৃশ্য নন্দনপ্রভাময়।
তুমি, অমৃত বারিধি হরি হে
তাই—তোমার ভুবন ভরি হে
পূর্ণ চন্দ্রে পুষ্প গন্ধে সুধার লহরী বয়।
ঝরে সুধাজল ধরে সুধাফল পিপাসা ক্ষুধা না রয়।
তুমি—সর্ব্ব শকতি মূল হে,
তাহে—শৃঙ্খলা কি বিপুল হে,
যে যাহার কাজ নীরবে সাধিছে উপদেশ নাহি লয়।
নাহি ক্রম ভঙ্গ পূর্ণ প্রতি অঙ্গ নাহি বৃদ্ধি অপচয়।
তুমি—প্রেমের চিরনিবাস হে
তাই—প্রাণে প্রাণে প্রেমপাশ হে
তাই—মধু মমতায় বিটপিলতায় মিলি প্রেমকথা কয়।
জননীর স্নেহ গভীর প্রণয় গাহে তব প্রেমজয়।

এই গানটির ছন্দে কেবল নাহি ক্রম ভঙ্গ ইত্যাদি চরণে ক্রম ভঙ্গ হইয়াছে—নতুবা ইহা ছন্দের পারিপাট্যে অনবদ্য। এই পর্য্যায়ের গানগুলির মধ্যে 'আকাশসঙ্গীত' সুন্দর রচনা—ইহা রীতিমত গীতিকবিতা।

'চিরশৃঙ্খলা' গানটিতে কবি বলিতে চাহিয়াছেন—এই বিশ্বের অপরিবর্ত্তনীয় শৃঙ্খলাই অনবরত ঘোষণা করিতেছে এই বিশ্বের মূলে একটা বিরাট চিৎশক্তি বর্ত্তমান—এই শৃঙ্খলা দেখিয়া শৃঙ্খলধারীকে কবির দেখিতে ইচ্ছা হয়। ইহা একটি বাউল সঙ্গীত—বাউলিয়া ভাব ইহাতে চমৎকার ফুটিয়াছে।

তত্ত্বমূলক গানগুলিতে কবির মৌলিকতা কিছু নাই, তিনি কোন নূতন তত্ত্বকে বাণীরূপ দেন নাই—ভারতের চিরপুরাতন তত্ত্বগুলিকে বর্ত্তমান যুগোপযোগী অভিনব রূপ দিয়াছেন। এক হইতে বহুত্বের বিকাশ। বহুত্ব শেষে একে বিলীন হয়—এ তত্ত্ব পুরাতন,—কবি 'পর্য্যবসান' ও 'প্রলয়' কবিতায় তাহার নবরূপ দান করিয়াছেন। অপরা বিদ্যায় আমাদের জীবনের প্রশ্নের শেষ পর্য্যন্ত মীমাংসা হয় না—ব্রহ্মজিজ্ঞাসা ছাড়া চরম প্রশ্নের চরম উত্তর পাওয়া যায় না—'নিরুত্তর' নামক গানে কবি সেই তত্ত্বের একটি বাণীরূপ দিয়াছেন—

কান্ত বলে আছে যেন কেনর কেন তস্য কেন
যাও নিখিল কেনর মূল কারণে (সে) রেখেছে
কালের খাতায় লিখে।

আত্মাভিমান নিঃশেষে বিসর্জ্জন না করিলে তাঁহাকে পাওয়া যায় না—এই তত্ত্ব কবি প্রকাশ করিয়াছেন 'শুদ্ধ প্রেম' গানে। আত্মাভিমানবর্জ্জিত প্রেমকেই কবি শুদ্ধ প্রেম নাম দিয়াছেন।

প্রেমে জল হ'য়ে যাও গ'লে।
কঠিনে মেশে না সে মেশে রে তরল হ'লে।
ভেসে যাও ভাসিয়ে নে যাও সেই পরিণাম সিন্ধু জলে।

বহিরিন্দ্রিয় গ্রামকে অন্তর্মুখী করিতে না পারিলে অন্তর্যামীর সন্ধান পাওয়া যায় না। সর্ব্বেন্দ্রিয় দ্বার রুদ্ধ করিলেই তাহা সম্ভব। এই তত্ত্বকে কবি অভয়ার মিলনানন্দ ও কল্যাণীর অন্তর্দৃষ্টি কবিতায় বাণীরূপ দিয়াছেন।

ভাঙ্গাগড়া, ফোটাঝরা, জীবনমৃত্যু, সর্গ-লয়ের মধ্য দিয়াই এই সৃষ্টিধারা চলিয়াছে—এধারা অনন্ত। কবি বলিয়াছেন—

কান্ত কয়, গড়েছে যেই ভাঙ্গবে নিজেই সৃষ্টি বীজেই মৃত্যু ধরে।
চিরদিন, এমনিভাবে হাটটি লাগে সেই তা ভাঙ্গে আবার গড়ে।

রজনীকান্তের রচনায় ভাবের কোন মৌলিকতা নাই, হয়ত সেই জন্যই সাহিত্যক্ষেত্রে রজনীকান্তের স্থান ক্রমে সংকীর্ণ হইয়া আসিতেছে। যে সব কথা বাংলায় গীতরচয়িতারা আগে বলিয়া গিয়াছেন—রজনীকান্ত সেই কথাগুলিই বলিয়াছেন। তবু রজনীকান্ত খুব বড় কবি। পুরানো কথাই এমন চমৎকার ভঙ্গীতে তিনি বলিয়াছেন, যে ভঙ্গীতে এ যুগে আর কেহ বলে নাই। পুরাতনকে অভিনব ভূষণে এমন করিয়া সজ্জিত করিতে পারে কে? মাইকেল দত্ত হইতে সত্যেন্দ্র দত্ত পর্য্যন্ত এ যুগের প্রত্যেকটি কবির কাব্য ইউরোপীয় সাহিত্যের প্রভাবে আবিষ্ট—একমাত্র আমরা রজনী কান্তকেই পাই—বহিঃপ্রভাব-মুক্তরূপে। অবশ্য এ যুগের একজন বড় কবির পক্ষে ইহাই বড় কথা নয়। তবে যাঁহারা খাঁটি বাংলার অন্তরের বাণী এ যুগেও শুনিতে চাহেন —তাঁহাদের রজনীকান্তকে উপেক্ষা করিবার উপায় নাই।

বাংলার বিলীয়মান সংস্কৃতি বিদায়ের আগে তাহার পঞ্চাঙ্গুলির ছাপ রাখিয়া গিয়াছে এই কান্তকবির রচনায়—তাই কান্ত কবির গানগুলিকে আমরা ভালবাসি।

রজনীকান্ত,—রামপ্রসাদ দাশুরায় নীলকণ্ঠ ইত্যাদি কবিদের অনুবর্ত্তী—ইহাদেরই গোষ্ঠীর শেষ সন্তান। ইহাদের রচনার গুণগুলির মত দোষগুলিও সংক্রামিত হইয়াছে কান্ত কবির রচনায়। যেমন দীর্ঘ-তালিকা দেওয়ার অভ্যাস, ক্লিষ্ট সাঙ্গরূপকের (Strained metaphor) অবতারণার ইহলোকবিদ্বেষ প্রচার ইত্যাদি।

প্রাক্তন কবিগণের গভীর আন্তরিকতাও কান্ত কবির রচনায় দৃষ্ট হয়।

ভগবৎ তত্ত্বমূলক কবিতা অভক্তেও লিখিতে পারে—শিল্পী বড় হইলে—ভক্তিভাবও ফুটাইতে পারে—কিন্তু সেগুলির অন্তরালে একটি অকৃত্রিম ভক্ত হৃদয় আছে—কি ভক্ত মস্তিষ্ক আছে তাহা ধরিতে পারা যায় রচনার অন্তর্নিহিত সাক্ষ্যেই। রজনীকান্তের গানগুলি তাঁহার হৃদয়ের আবেগোত্তাপেই উত্তপ্ত। সে উত্তাপ আমাদের হৃদয় স্পর্শ করে—এমন কি হৃদয়কে গলাইতে পারে।

রজনীকান্তের গানের মূল মর্ম্মকথা এই—ব্রহ্ম তিনি মাতৃরূপে বিশ্বকে প্রসব করিয়াছেন, পিতৃরূপে তাহাকে রক্ষা করিতেছেন—একদিন তিনি এই সৃষ্টিকে ধ্বংস করিয়া আবার ইহাকে নবতর রূপ দান করিবেন। তিনিই সত্য, আর সব মিথ্যা। একমাত্র তাঁহাকে আশ্রয় করা ছাড়া জীবের আর কোন ধর্ম্ম নাই, ধ্রুব লক্ষ্য নাই। তিনি নির্বিকার নির্বিকল্প নিরুপাধিক নহেন, তিনি প্রেমময়, করুণাময়, ক্ষমাময়। আমরা তাঁহার কাছ হইতে যতই দূরে যাই না কেন, প্রেম ও করুণার বশে আমাদের সর্ব্ব অপরাধ ক্ষমা করিয়া তিনি আমাদের টানিয়া লইবেন।

এই বিশ্ব তাঁহার মহিমা নিরন্তর প্রচার করিতেছে—তাঁহার অনন্ত শক্তির ক্রিয়াক্ষেত্র এই বিশ্বভূমি—এই বিশ্বেই তিনি অনুস্যূত আছেন। মানবের মধ্যে দয়া, প্রেম, স্নেহ, ক্ষমা ইত্যাদির রূপে তিনি বিরাজ করিতেছেন।

সৃষ্টির মোহে স্রষ্টাকে ভুলিয়া থাকাই অবিদ্যা। এই অবিদ্যা হইতে আত্মরক্ষার নাম ধর্ম্মসাধনা। মনে রাখিতে হইবে আমরা ভাঙ্গনধরা নদীর কূলে অট্টালিকা গড়িয়া তাহাকে চিরস্থায়ী মনে করি—জরামৃত্যুর কথা ভাবি না। ব্রহ্মে আত্মসমর্পণ করিয়া এই সৃষ্টিকে ভোগ করিতে হয় কর—ত্যাগ করিতে হয় কর। প্রেয়ের লোভে শ্রেয়কে বিসর্জ্জন দিও না। শেষ পর্য্যন্ত বৈরাগ্যই আদর্শ—যতদূর সম্ভব চিত্তকে বৈরাগ্যাভিমুখী করিতে হইবে।

রজনীকান্ত মিথ্যা-ঝুঁটামেকীর পরম বৈরী ছিলেন। এই সমাজের ঝুঁটা মেকি নকল ভেজাল যাহা কিছু হাসির গানগুলিতে তাহাকেই আঘাত করিয়াছেন। নানা রূপ পরিস্থিতির বিসদৃশতা

দেখাইয়া তিনি হাসাইতে চেষ্টা করেন নাই—চরিত্র ও আচরণের বিসদৃশতা দেখাইয়া তিনি কৌতুকরসের সৃষ্টি করিয়াছেন। এবিষয়ে তিনি দ্বিজেন্দ্রলালের আদর্শ অনুসরণ করেন নাই, বাচনভঙ্গীর জন্ম তিনি দ্বিজেন্দ্রলালের কাছে সম্ভবতঃ ঋণী। সম্প্রদায়গত দোষত্রুটীকেই তিনি আঘাত করিয়াছেন—ব্যক্তি-বিশেষের অসন্তুষ্ট হইবার কোন কারণ নাই।

সাহিত্যিক উৎকর্ষের দিক হইতে তাঁহার ভজনসঙ্গীত অপেক্ষা হাসির গানের মূল্যই বেশী। হাসির গানগুলিতে তিনি যে উচ্চ শ্রেণীর আর্টের পরিচয় দিয়াছেন তাহা এক দ্বিজেন্দ্রলাল ছাড়া অন্য কাহারো রচনায় নাই। হাস্যরস নিম্নশ্রেণীর রস—কিন্তু আর্ট তাহাকে আশ্রয় করিয়া ১ম শ্রেণীর রচনায় পরিণত করিতে পারে। রজনীকান্তের হাসির গানগুলি তাহার দৃষ্টান্ত। কান্ত কবির গানের ভাষার তুলনা নাই। যে গানে যে ভাব, ঠিক সেই ভাবেরই অনুগামী ভাষা তাঁহার লেখনীতে আসিয়া জুটিত। রবীন্দ্রনাথের ছন্দে সুরে রচিত তাঁহার গানের ভাষা হইত সম্পূর্ণ মার্জ্জিত, বাউলের সুরে রচিত গানের ভাষা হইত নিরক্ষর বাউলের মুখেরই মত। এখানে একটি দৃষ্টান্ত দিই—

আঁকড়ে ধরিস যা কিছু তা ফস্‌কে যায়।
তবু তোর লজ্জা হয় না হায়রে হায়।
কত কি হ'ল পয়দা কিছুতে হয় না ফয়দা
টুস্‌কিটির সয়নাক ভর দেখতে দু'খান হয়ে যায়।
এই আছে এই হাতড়ে পাসনে,
তাই বলি মন আর হাতড়াসনে,
যা হারায় আর তা' চাস্‌নে
নেড়া যায়রে ক'বার বেলতলায়?
অকারণ টানা হেঁছা দু'শ বার খেলি ছেঁচা
বেহায়া ছেঁচড়া হলি কখন যেন প্রাণটা যায়।
যা খেলে আর হয় না খেতে
যা পেলে আর হয় না পেতে
তাই ফেলে দিনে-রেতে মরিস্ কিসের পিপাসায়?

নিরীক্ষা

শ্রীকল্যাণকুমার দাশগুপ্ত

লাঞ্ছিত নরদেবতা কাঁদে
মর্ম্মবিদারী আর্ত্তনাদে।
আভিজাত্যের জীর্ণপ্রতন ইমারত ওঠে নড়ে
সর্ব্বহারার বেদনামথিত দীর্ঘশ্বনন ঝড়ে।
নিদাঘ সূর্য্য শুধু দুই হাতে বহ্নি ছড়ায়,
মাটির সবুজ নিমেষে পাতাল পুরীতে পালায়।
সারা দিনান্তে চলে সে সূর্য্য অস্তাচলে—
লাল সমুদ্র প্রবাহিয়া এই পৃথ্বীতলে।
ঘুমায় সূর্য্য শিশু সূর্য্য যে ক্ষুব্ধ দামাল।
আর কী আসিবে নামিবে নতুন রূপালী সকাল?

ঋক্-প্রার্থনা

শ্রীবিণয়ভূষণ দাশগুপ্ত

সোম-সুধাপায়ী স্বর্গাধিপতি ইন্দ্রদেবতা হে
প্রার্থনা মোর তোমার নিকটে আজি—
অভিষ্টময় কেশরযুক্ত দিব্য তুরগদ্বয়ে
কর হে যুক্ত তব স্যন্দনে আজি।
আমাদের যত স্তুতি ও মন্ত্র সকলি ইহার পর
তোমার যুগল শ্রুতি-সন্নিধ ভরি'
তুষ্টিতে তব ঝঙ্কৃত হ'য়ে যেন বিচরণ করে,
ইহাই কামনা—দাও হে পূর্ণ করি'।*

* ঋক্ অনুসরণে

নাট্যাচার্য্য অমৃতলাল বসু

শ্রীহেমেন্দ্র নাথ দাশগুপ্ত

অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন পাশ হওয়ায় এবং গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের মামলা-মোকদ্দমার পরে বঙ্গরঙ্গমঞ্চের যে অন্ধকার যুগ আসিয়া পড়ে, সেই দুঃসময়ে ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে গিরিশচন্দ্রই অগ্রবর্ত্তী হইয়া উহার কর্ণধারত্ব গ্রহণ করেন। কিন্তু অমৃতলাল সেই সময়ে পোর্টব্লেয়ারে। তাই অমৃতলাল মিত্র, মহেন্দ্রলাল বসু, বেলবাবু ও মতিলাল সুর প্রভৃতি গিরিশচন্দ্রের শিষ্যবর্গ ভিন্ন ভিন্ন ভূমিকায় থাকিলেও মেঘনাদ বধ এবং পলাশীর যুদ্ধে তিনি কোন অংশ গ্রহন করেন নাই।

১৮৮০ খৃষ্টাব্দে প্রতাপ জহুরী নামক জনৈক মাড়োয়ারী ন্যাশনাল থিয়েটার ক্রয় করিয়া থিয়েটার চালাইতে উদ্যোগী হন। এইখানেই গিরিশচন্দ্র পার্কার কোম্পানীর লাভবান চাকুরী পরিত্যাগ করিয়া রঙ্গালয়ে অধ্যক্ষতা গ্রহণ করেন। রঙ্গালয়কে উপজীবিকাস্থল স্থির করিয়া তিনি সমস্ত শিষ্যশিষ্যাগণকে আহ্বান করিলেন এবং নিজেই নানাবিধ নাটক রচনায় প্রবৃত্ত হন। অমৃতলাল এখানে আসিয়া গুরুর সঙ্গে যোগদান করেন এবং হামিরে (১৮৮১) আলমন্ত্রী, আনন্দরহোতে মানসিংহ রাবণ বধে বিভীষণ, রামের বনবাসে কঞ্চুকী ও ভরত, সীতাহরণে সুগ্রীব এবং তিল তর্পণে বাপ্পারাও প্রভৃতির ভূমিকা গ্রহণ করেন। শেষোক্ত নাট্যগ্রন্থ অমৃতলালের নিজের রচিত।

অতঃপরে ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে ৬৮ বিডন ষ্ট্রীটে, গুর্ম্মুখ রায়ের স্বত্বাধিকারিত্বে ষ্টার থিয়েটার স্থাপিত হয় এবং গিরিশ্চন্দ্রের দক্ষযজ্ঞ নাটক লইয়া থিয়েটারের উদ্বোধন হয়। অমৃতলাল হন দধীচি। অভিনয় খুবই ভাল হয়, কিন্তু স্বজাতির তাড়নায় গুর্ম্মুখ রায় বৎসরেকের মধ্যেই থিয়েটার ছাড়িয়া দেয়। গিরিশচন্দ্র নিজে স্বত্বাধিকারী না হইয়া অমৃতলাল মিত্র, অমৃতলাল বসু, হরিপ্রসাদ বসু ও দাশু নীয়োগীকে স্বত্বাধিকারী করিয়া নিজে ম্যানেজার হয়েন। অমৃত বসু নগদ কোন টাকা না দিলেও নাটক লিখিবার অভিনয় ও থিয়েটার পরিচালনার ক্ষমতা দেখিয়া তাহাকে সঙ্গে লইতে গিরিশচন্দ্র অপর তিনজনকে অনুরোধ করেন। তাহারাও সম্মত হন।

ষ্টারে অতঃপর ধ্রুবচরিত্র ও নলদময়ন্তীতে (১৮৮৩) বিদুষক, কমলেকামিনীতে গুরু মহাশয় ও সভাসদ, শ্রীবৎসচিন্তায় বাতুল, চৈতন্য লীলায় প্রতিবেশী, প্রভাস যজ্ঞে বসুদেব, বুদ্ধদেবে শিষ্য ও গণক ও রূপ-সনাতনে সুবুদ্ধির ভূমিকা গ্রহণ করেন। এই কয়টি ভূমিকাই অমৃতলাল কর্ত্তৃক খুব সু-অভিনীত হয়।

এই সময় গোপাল লাল শীল (ধনকুবের মতি শীলের পৌত্র) ষ্টার থিয়েটারের বাড়ী খরিদ করিয়া "এমারেল্ড থিয়েটার" করে। ষ্টার থিয়েটার হাতীবাগানে জমি কিনিয়া বর্ত্তমান ষ্টার যেখানে আছে, সেইখানে ঐ বাটী নির্ম্মাণ করেন। গিরিশচন্দ্র এমারেল্ডে যোগ না দিলে ষ্টার উঠাইয়া দিবে ভয় দেখাইলে গিরিশবাবু কুড়ি হাজার টাকা বোনাস লইয়া যোগদান করেন। তিনি উক্ত টাকা হইতে নিজ বাকী বেতন বাবদ ৪০০০৲ লইয়া বাকী ষোল হাজার টাকাই ষ্টারের বাড়ীর জন্য দান করেন এবং ছদ্মবেশে উদ্বোধন রাত্রিতে অভিনয়ের জন্য ষ্টারকে সেবক প্রণীত আখ্যায় নূতন একখানা নাটক "নসীরাম" লিখিয়া দেন। কয়েক মাস একটু ঘুরিয়া কিছু টাকা উঠাইবার জন্য ষ্টার থিয়েটার অমৃতলালের অধিনায়কত্বে ঢাকা সহরে যায়। কিন্তু সেখানে গিয়া বড় লাঞ্ছিত হয়।

ইতিপূর্ব্বে দুইবার ন্যাশনাল থিয়েটার ঢাকা আসিয়াছিল—প্রথম ১৮৭৩ এবং দ্বিতীয় ১৮৭৯ সালে। অভিনেত্রী না থাকায় প্রথমবারে বাহিরের লোকের সঙ্গে কোন গোলমাল হয় নাই, কিন্তু দ্বিতীয়বার ১৮৭৯—অভিনেত্রী থাকার জন্য Dr. Livingstone, Dr. P. K. Roy প্রভৃতি ঢাকা কলেজের বিশিষ্ট অধ্যাপকগণ

ছাত্রগণকে অভিনয় দেখিতে নিবৃত্ত করেন। তবে চেষ্টা করিয়াও তাহারা বিশেষ কৃতকার্য্য হন নাই। সেবারে একরকম কাটিয়া গিয়াছিল, কিন্তু এবার বড়ই গোল হয়। কেবল অধ্যাপক নয়, সাধারণের দিক হইতেও লোক-দিগকে থিয়েটারে যাইতে নিবৃত্ত করা হয়। তদুপরি কতিপয় ব্যক্তি রাত্রিতে জগন্নাথ কলেজ প্রাঙ্গন হইতে ঢিল ছুড়িয়া অভিনয়ের বিঘ্ন ঘটায়। অল্পদিন মধ্যেই বিশেষ গোলযোগের সৃষ্টি হয়। অমৃতবাবু জিলার জজ সাহেব Mr. Place এর সঙ্গে দেখা করেন, উক্ত জজ সাহেব পুলিসের অধ্যক্ষ মিঃ ক্লার্ককে বলেন। কয়েকটি ছেলে ধৃত হয় এবং আরও গোলযোগ বৃদ্ধি পায়। অতঃপরে জুবিলি স্কুলের শিক্ষকদ্বয়, পরেশনাথ ঘোষ মহাশয় এবং প্রসন্ন কুমার গুহকে স্পেশাল কনেষ্টবল করা হয়। ফলে গোল-যোগ কতকটা শান্ত হইল বটে, কিন্তু কোম্পানী বিশেষ ক্ষতিগ্রস্থ হইয়া কলিকাতা প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হয়।

হাতীবাগানে যে নসীরাম লইয়া ষ্টার থিয়েটার আরম্ভ হয়, অমৃত বাবুই নাম ভূমিকায় অভিনয় করেন এবং নসীরামের ধর্ম্মোন্মাদ এবং লোকশিক্ষার—উভয় ভাবই প্রকট করিতে সমর্থ হন। তিনিই ম্যানেজার হন এবং পরবর্ত্তী নাটক মঞ্চস্থ হয় সরলা। অমৃত বাবু স্বর্ণলতা উপন্যাস নাটকে রূপান্তরিত করিয়া দেন। সরলার ভাব খুব উচ্চাঙ্গের এবং নাটকখানি বিয়োগান্ত। হাসিরঙ্গের দৃশ্যগুলি তিনি আরও সরস করিয়া দেন। নাটকখানি বড়ই জনপ্রিয় হয়। অতঃপরে ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে গিরিশ আসেন ম্যানেজার হইয়া, কিন্তু ১৮৯১ খৃষ্টাব্দেই তাঁহাকে চলিয়া যাইতে হয়, অমৃতবাবু এখন হইতে বরাবর ম্যানেজার থাকেন। ষ্টারে অমৃতলাল যে সমস্ত ভূমিকা গ্রহণ করেন তাহা নিম্নে দিতেছি—প্রফুল্লে রমেশ—অভিনয় অতি উচ্চাঙ্গের হয়। 'চণ্ড' নাটকে পূর্ণ ভাট্—তরু বালায় বেহারী খুড়ো, বাবুতে মিঃ ফিস্ ও হরিশ্চন্দ্রে বিশ্বামিত্র। (১৮৯৮) প্রভৃতি।

কুড়ি বৎসর ষ্টার অপ্রতিহতভাবে চলে, কিন্তু শ্রেষ্ঠ অভিনেতা অমৃতলাল মিত্রের মৃত্যুর পরে উহা প্রায় অচল হয়, তথাপি ২।৩ বৎসর অমর দত্তকে এসিষ্টাণ্ট ম্যানেজার করিয়া চালানো হয়।

১৯১১ খৃষ্টাব্দে অমৃতলাল প্রভৃতি নিজেদের থিয়েটার উঠাইয়া দিয়া অমর দত্তকে লিজ (ভাড়া) দেন। তাঁহারই খাস দখল ১৯১২, ৩০ মার্চ্চ অভিনীত হয় এবং তিনি নাট্যাচার্য্য পদে বরিত হন এবং নিতাইর ভূমিকায় অজস্র প্রসংসা লাভ করেন। ১৯১৩ মিনার্ভায় তিনি অল্পদিনের জন্য নাট্যাচার্য্য হন এবং তাঁহার নবযৌবনে বসন্তের ভূমিকা লয়েন। ১৯১৪ পুনরায় ষ্টারে আসিয়া ক্ষত্রবীরে করেন ধৃতরাষ্ট্র।

১৯২৬ মিনার্ভায় যোগদান করিয়া "ব্যাপিকাবিদায় মঞ্চস্থ করেন এবং ১৯২৮ সনে করেন যাজ্ঞসেনী।

ইহাই অমৃতলালের রঙ্গমঞ্চ সংস্রব, নাটকাবলীর ইতিহাস ও অভিনয়ের পরিচয়। তবে অভিনয় সম্বন্ধে তিনি নিজেই বলিতেন, "দেহপট সঙ্গে নট সকলি ফুরায়", কিন্তু বাকি দুইটি বিষয়ে তাহার অবদান রঙ্গালয়ের ইতিহাসে চিরস্থায়ী থাকিবে।

অমৃতলাল যে থিয়েটারে কিরূপ শৃঙ্খলা রক্ষা করিতেন আমি পূর্ব্বেই আপনাদিগকে বলিয়াছি। সবই আমি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে বলিতেছি। কিন্তু এবিষয়ে আপনাদের আরও প্রতীতি জন্মাইবার জন্য ষ্টারের অন্যতম সুদক্ষ অধ্যক্ষ নাট্যকার অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় —অমরেন্দ্রনাথের প্রশংসা করিতে গিয়া অমৃতলালেরও শৃঙ্খলাশক্তির কিছু পরিচয় দিয়াছেন। তিনি বলেন—

"প্রবীন নাট্যনায়ক শ্রীযুত অমৃতলাল বসুর পরিচালনে বয়স ও প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে ষ্টার যেন একটী সুবোধ বালকবৃন্দের বিদ্যালয়ে পরিণত হইতেছিল। ষ্টারের সব দিকেই ধরাবাঁধা নিয়ম, দর্শকগণকেও আসিতে হইত ভয়ে ভয়ে। বস্তুতঃ—নিয়মনিষ্ঠা, শৃঙ্খলাবদ্ধ কার্য্যপ্রণালী এবং খুঁটিনাটি প্রত্যেকটি বিষয়ে সূক্ষ্ম দৃষ্টি, সর্ব্বোপরি আভিজাত্য—সবই অমৃত বাবুর সুপরিচালনায় নির্ব্বাহ হইত।"—"রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর"।

অমৃতলাল অনেক নাটক ও প্রহসন লিখিয়াছেন। তাঁহার নাটক লিখিবার ক্ষমতা বেশ ছিল, তবে প্রহসন এবং ব্যঙ্গমূলক রচনায় তিনি অদ্বিতীয় ছিলেন। কেবল রসসৃষ্টি ও বিতরণের জন্যই যে বইগুলির বৈশিষ্ট্য তাহা নহে। লোকশিক্ষার এই সব প্রধান উপকরণ। অমৃতবাবু

যে সময়ে থিয়েটারে আবির্ভূত হন (১৮৭২), তখন ইয়ং বেঙ্গলের বিশেষ প্রাদুর্ভাব। লোকে ইংরাজী শিখিয়া বিদেশী আচারসম্পন্ন হইত, উচ্চ কার্য্যভাগে বাপমাকে খাইতে দিতনা, ভণ্ডামি, কদাচার দেশে বিস্তৃত হইতেছিল। বড় লোকেরা ইংরাজী চালে চলিত। সামান্য শিক্ষা পাইয়া স্ত্রী স্বামীকে অবহেলা করিত, গৃহকার্য্যে বীতস্পৃহ থাকিত, বড়লোক পূজা অর্চনার পরিবর্ত্তে সাহেবের স্তুতি করিত। সাহেবদিগের প্রতি চাটুকার বাক্য প্রয়োগ মজ্জাগত হইয়া পড়িয়াছিল। নিয়মতান্ত্রিক অমৃতলালের অসংখ্য রচনাবলীতে মনে হয় যেন স্কুল মাষ্টারের মত বেত্রহস্তে সমাজস্থ লোকদিগকে তিনি শিক্ষা দিতেছেন। সুগঠিত রঙ্গমঞ্চকে আমি জাতীয় শিক্ষা মন্দির হিসাবেই জ্ঞান করি, আর সেই কার্য্য অমৃতলালের দ্বারা সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হওয়ায় তাঁহাকেও জাতীয় বিদ্যামন্দিরের অন্যতম অধ্যাপক বলিয়াই আমি শ্রদ্ধা করি। ষ্টেট্‌সম্যান কাগজে একবার অমৃতলালের প্রহসনাবলীর প্রশংসা করিয়া তাঁহাকে Aristophanes of India বলিয়া অভিহিত করিয়াছিল। বস্তুতঃই সেই কুশিক্ষা ও অশিক্ষার দিকে অমৃতলালের ব্যঙ্গমূলক প্রহসন সমাজ সংস্কারে শ্রেষ্ঠ ভেষজের কাজ করিয়াছিল। এইবার ধারাবাহিক ভাবে তাঁহার নাটক ও প্রহসনের পরিচয় দিব।

"হীরক চূর্ণ" নাটকের পরিচয় ইতিপূর্ব্বেই দিয়াছি। ১৮৭৫ গ্রেট ন্যাশনালে "চোরের উপরে বাটপাড়ি" অভিনীত হয়। যে সব দুশ্চরিত্র লোক ভদ্রলোকের মেয়েদের উপর খারাপ নজর দিত, তাহাদেরই একজন অঘোরকে তার স্ত্রী কিরূপ উপযুক্ত শিক্ষা দেয়—প্রহসন খানিতে তাহা বর্ণিত আছে। প্রথমকার রচনা হইলেও ইহা বেশ কৌতুকপূর্ণ—। অমৃতবাবু নিজে হইতেন কর্ত্তা, নারায়ণ মহেন্দ্র বসু আর গিন্নী তদানীন্তন শক্তিশালিনী অভিনেত্রী ক্ষেত্রমণি দেবী।

১৮৮০ তিলতর্পণ প্রতাপজহুরীর ন্যাশনাল থিয়েটারে অভিনীত হয়। বাপ্পারাওএর ভূমিকা তিনি নিজেই করেন।

এ সময়ে অনেকে নাটক লিখিতে প্রয়াস পাইত, ইতিহাসে মিল নাই, কবিতায় মিত্রাক্ষর কি অমিত্রাক্ষর বুঝা যায় না, রচনা বোধগম্য নয়, এরূপ রচনাই ঐ সব নাটকে বেশী থাকিত; প্রহসনখানিতে তাহাদিগকে ব্যঙ্গ করা হইয়াছে। সমালোচক বলিতেছে—

"মশায়, আপনার নাটকখানির আমিই অনেক স্থান বুঝতে পারিনে, তাই থেকে আমি সিদ্ধান্ত ক'রে নিয়েছি যে, এই নাটকখানি অতি গুরুতর ব্যাপার—কেননা যেমন মাষ্টার পেণ্টারের পেণ্টিং হঠাৎ দেখলে কেবল কালী ন্যাপা বোধ হয়, কিন্তু ভেতরে বোধ হয় কি ভয়ঙ্কর ব্যাপারই আছে, তেমনি যে লেখা সহজে বুঝতে পারা যায় না, তার ভিতরে অবশ্য কোন গুরুতর ভাব আছে।"

প্রতিদ্বন্দ্বী বেঙ্গল থিয়েটারের প্রতিও কটাক্ষ আছে।

নাটকের অভিনয় চলিতে লাগিল, কিন্তু একটু পরেই দর্শকরা অভিনয় বন্ধ করিয়া দিল। আর নাট্যকার রাগিয়া বলিতে লাগিল—

"হায় হায় আমার ভাল সলিলকিটা বলা হ'ল না—জানি এ বেটাদের বড় অহঙ্কার। এরা সব আপনারা বই লেখে। কালই গিয়ে বইখানি ওদের দেব। আহা! ওরা অতি গোবেচারা, যা পায় তাই প্লে করে, ভালও হয়। হবে না কেন? একে half price তাতে অমন অমন বই play করে যেমন বগলে অংশুমালী, বোলতা চাক আমার planchet নাটকখানি পর্য্যন্ত play করেছে। তা বিদ্যা আছে কিনা। ঐ যে শৈলেশ্বর ঘোষ ভারি বই লেখেন, কৈ দুর্গেশনন্দিনীতে কি করলেন? যে ভুল সে ভুল। ওরা বঙ্কিমবাবুর ভুল কেটে আয়েষাকে মেরে ফেলে দিলে, বঙ্কিমবাবুও মলেন।···

ভূমে পদাঘাত করিয়া দৌড়।"

এই নক্‌সাখানিতে গিরিশচন্দ্রকে করা হইয়াছে শৈলেশ্বর

এই পঞ্চরংখানি অভিনীত হইবার পর গিরিশচন্দ্র একদিন হাসিতে হাসিতে অমৃতলালকে প্রশ্ন করেন—

ভুনি, তুই খুব বিষ ছড়াতে পারিস্, কেমন না?

অমৃতলাল তৎক্ষণাৎ উত্তর দেন—

আমি বিষ পাব কোথায় মশায় সব বিষইতো আপনার পেটে, একটু আধটু গুরুদেবের কাছ থেকে ধার ক'রে ছড়াই।

গিরিশ মহাদেবের অপর নাম শৈলেশ্বর অর্থাৎ মহাদেব সমুদ্র মন্থনে উত্থিত সমগ্র বিষরাশি পান করিয়া নীলকণ্ঠ হইয়াছিলেন। নাট্যকার 'তিলতর্পণ' নাম সম্বন্ধেও বলিয়াছেন,—"লোকে মনে করবে নীলদর্পণের উত্তর, আর একটী উদ্দেশ্য আছে একটুখানি তিলে যেমন সাগরপ্রমাণ জল দেওয়া হয়, এতেও তাই সব রসই পাওয়া যাবে।"

তিলতর্পণের ন্যায় এসময়ে রচিত আর একখানি নক্‌সা ডিসমিস্‌ও বেশ উপভোগ্য হয়। প্রমদা চরিত্র স্বল্প কয়টি দৃশ্যে দেখানো হয়, "স্বামীরা স্ত্রীদের সন্দেহ করিলে বুদ্ধিমতী স্ত্রীদের কাছে খুব নাকাল হয়, আর ঘোমটা দিলেই সতী হয় না।"

উভয় নক্‌সাতেই দীনবন্ধুর প্রভাব দৃষ্ট হয়। কিন্তু নবীন তপস্বিনীর জলধর আঁকা সহজ নয়। অমৃতলাল দক্ষ শিল্পী হইলেও তখনও তাঁহার হাত পাকে নাই।

চাটুয্যে বাড়ুয্যে—১৮৮৪, ২৬ এপ্রিল ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত। চাটুয্যে—অমৃতবাবু, বাড়ুয্যে—নীলমাধব চক্রবর্ত্তী। একখানি ঘর দুই জনকেই ভিন্ন ভিন্ন সময়ের জন্য ভাড়া দেওয়া হয়। অথচ ভাড়াটিয়ারা ইহা জানেনা, পরস্পরের সহিতও পরিচিত নয়।

বিবাহ বিভ্রাট—১৮৮৪ ডিসেম্বর মাসে ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত—

এই প্রহসনখানি অতি উচ্চাঙ্গের এবং যে কোন প্রহসনের সঙ্গে তুলনা করা যায়। ইহা সুকৌশলে লিখিত, আর সে সময়ে ইহা সমাজের বিশেষ হিতসাধন করিয়াছিল। ইহার কয়েকমাস পূর্ব্বেই গিরিশচন্দ্রের চৈতন্যলীলা অভিনীত হয়। তাহাতে একদিকে যেমন হিন্দু দর্শকের মধ্যে ভক্তির বন্যা প্রবাহিত হয়, 'বিবাহ বিভ্রাটে' অন্যদিক হইতে আবার বিদেশী আচার ও বিজাতীয় শিক্ষার প্রতি অশ্রদ্ধা জাগাইয়া দেওয়া হয়। সেই যুগে এই প্রহসনখানি জাতির পক্ষে বিশেষ হিতকর হইয়াছিল। গুরুশিষ্য তখন একসঙ্গেই ছিলেন। 'বিবাহ বিভ্রাটে' লোকগুলি তখন বিদেশী আচারে কিরূপ বিভ্রান্ত হইতেছিল, দুই একটি উদাহরণেই পরিচয় দিতেছি—

বিলাসিনী কারফর্ম্মাও উচ্চশিক্ষিতা মহিলা, বিজ্ঞানে এম, এ দিবেন, স্বামীর চাকুরী ছাড়াইয়া একটী প্রেস করিয়া বাড়ীতে রাখিয়াছেন, তিনিই (স্বামী) রান্না করেন, আর পত্নী পুস্তক পাঠে নিরত থাকেন, ক্লাব পিকনিকে যান, আর বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে মেলা মেশা করেন। তাহার স্বামীর নাম গৌরীশঙ্কর কারোফর্ম্মা। উমাচরণ গুপ্তের সঙ্গে বিবাহ হইবার কথা ছিল, কিন্তু উক্ত ব্যক্তি তাহার মাতার মৃত্যুতে হিন্দু আচার পালন করায় তাহাকে বিবাহ না করিয়া মিঃ কারফর্ম্মাকেই অনুগৃহীত করিয়াছে। তাহার বসিবার ঘরে সদ্য বিলাত প্রত্যাগত মিঃ সিং আসিয়াছে।

সিং—গতবৎসর দেশ ছাড়ার পূর্ব্বে অনুমান হয়েছিল আপনি উমাচরণ গুপ্টাকেই সুখী কর্ব্বেন।

বিলাসিনী—হাঁ, একরকম ঠিকই করেছিলুম, কিন্তু তাঁর মার মৃত্যু হওয়াতে কাচা গলায় দিয়ে জুতো খুলে বেড়াতে লাগলেন, সুতরাং অমন অসভ্যকে আমি স্বামী ব'লে কি ক'রে নিই?

সিং—"নেংটা গা? নেংটা পা? লেডীর সাম্‌নে? Horrible"!

গৌরীশঙ্কর—আপনি ছিলেন কদ্দিন হলো?

সিং—এ, এ—ইয়ে যাওয়া আসা নিয়ে—দশমাস।

অন্যত্র গৌরীশঙ্কর—আপনি কোন্ লাইনে ঢুকেছেন?

সিং—Surjeon, Physicians, Accoucher M. M. L. R. C.P.L.R.C.S. (Edin—

গৌরী—খুব আশ্চর্য্য তো! এই মাস আষ্টেকের ভিতর আপনি এতগুলো টাইটেল্ পেলেন? মেলাই examine দিতে হয়েছিল দেখ্‌ছি

সিং—Nothing of the kind, বিলাতে আমাদের মত জেণ্টেল্‌ম্যানকে একজামিন দেবার ইচ্ছা না থাকলে compell ক'রে insult করেনা। আমাদের ইংলিস manners দেখলেই বিদ্যা হয়েছে বুঝে নেয়, ফি দিলেই বুঝতে পারে respectable, আর ডিগ্রী দেয়। আমার প্রাকটিস জমলেই ওভারল্যাণ্ড মেলে এম্-ডিটা আনিয়ে নেবার ইচ্ছা আছে।

গৌরী—বাড়ীতেই আছেন?

সিং—না কাপড় ছাড়তে বলে, ভাত খেতে বলে, আমি ত গোরস্থান লেনে থাকি—

বিলাসিনী—ও বেলা রান্নার কি উদ্যুগ করেছ।

গৌরী—কি খাবে বল? করে দিচ্ছি।

বিলা—বেশী কিছু না, আমি সকাল সকাল খেয়ে বেরুব, আজ আমাদের পুরুষ দমন সভার anniversary. মাছের ঝোল টোল যা হয় পরে কর। আমায় এক প্লেট sago pudding আর খান চারেক কাটলেট ভেজে দিও। বিজ্ঞান মতে রাঁধবে। বুঝেছ—আমি আজ বাদে কাল সায়েন্সে এম্.এ দিব, আমার husband কিনা heat এর theory বোঝে না।

অতঃপর প্রস্তাবিত এক বিবাহের বর নন্দলালের প্রবেশ—

নন্দ—মিঃ সিং, আমি আপনার বাড়ী গিয়েছিলুম—বিলাতের সব কথা জিজ্ঞাসা ক'রবো ব'লে। দশ মাসে সব সাহেবের মত হওয়া যায়?

সিং—তাহা intelligence থাকলে হ'তে পারে। আপনার যাবার ইচ্ছা আছে নাকি?

নন্দ—ইচ্ছা? যাবই। এবার সেকেণ্ড ইয়ারে উঠেছি, খুব আমার intelligence.

সিং—আপনার ফাদারের মত হবে?

নন্দ—আবশ্যক? বুড়োদের মত আবার কোন সৎকাজে হয়?

সিং—টাকার যোগাড় কি রকম হবে?

নন্দ—সে যোগাড় বাবাই করেছেন, এক রকম বাবাই করেছেন।

বিলাসি—কিরূপ পাত্রী? অপবিত্র সেকেলে বে-আইনি মতে বিবাহ হবে?

নন্দ—বাঙ্গলা কথাটা ভুলে যাই কি ক'রে বলুন তো?

সিং—That's secret amongst our fraternity; আগে প্যাসেজ engage করুন, তারপর privately ব'লে দিব।

বিলাসিনী—আপনি গেলে চাদর নিবারণী সভা চালাবে কে?

নন্দ—অনেক আছে, আর আমিও ফিরে আসি, একেবারে ভাত কাপড় নিবারিণী সভা করবো।

আরও চিত্র দেখুন—নন্দের মা নন্দের পিতা গোপীনাথকে আর একস্থানে বলিতেছে—

"এবার চার হাজার নিয়ে কচ্ছো কর—কিন্তু বছরের ভিতর বৌটার যদি ভাল মন্দ হয়—নন্দর তদ্দিনে পাশ বাড়বে। দেখো তখন কিন্তু ফের ছেলের বে দিয়ে এক খানা দোতালা বাড়ী আর আমার গা-ভরা গয়না কর্ত্তে পারি কিনা?

ঝির চরিত্রটি খুবই সরস। নন্দ যখন বিলাসিনীকে নিয়া গয়না ও টাকা সহ পালাইয়া যায়, ঝির উক্তি বড় সরস—

"ছেলে টাকা শুদ্ধ সরেছে। জোচ্চোর বাপ বেটার ছেলে কি সাধু হবে?"

শেষ গোপীনাথের অনুতাপে পরিসমাপ্তি—

"ভিক্ষার ঝুলি আছে, গলায় দেবার দড়ি আছে, সেও ভাল, কিন্তু কেউ যেন ছেলে মেয়ের বিয়েতে টাকা রোজগারের চেষ্টা না করে।"

সব দৃশ্যের অভিনয়ে মনে হয় অমৃতলাল যেন চাবুকের সহায়তায় সমাজের শিক্ষকতায় ব্যস্ত রহিয়াছেন। অভিনয়ের সময়ে অমৃতবাবু নিজে হইতেন মিঃ সিং, মিসেস কারোফরমা বিনোদিনী, ঝি ক্ষেত্রমণি দেবী, কর্ত্তা নীলমাধব চক্রবর্ত্তী, নন্দ—অঘোর পাঠক।

ক্ষেত্রমণির সরস অভিনয় গভর্ণর জেনারেল লর্ড ডাফরীণ ও তৎপত্নী লেডি ডাফরিণকেও স্তম্ভিত করিয়াছিল।

Indian Stage, Vol. II p. 63

"তাজ্জব ব্যাপার" হাতী বাগান ষ্টারে ১৮৮৯, নববর্ষে (১লা জানুয়ারী) অভিনীত হইয়াছিল, বিলাসিনী কারফর্মার অন্যতম সংস্করণই মৃণালিনী মিত্র হাইকোর্টের উকীল, মুক্তাকেশী বক্সী হুগলা জজকোর্টের সেরস্তাদার, অনঙ্গ মঞ্জরী গুহ ঢাকা গেজেটের সম্পাদিকা, নিতম্বিনী ভট্টাচার্য্য ভলান্টেয়ার সৈন্যের কর্ণেল।

স্ত্রীলোকগণ কর্ত্তা কর্ত্রী, পুরুষরা আজ্ঞাবহ মাত্র। সভ্য স্ত্রী লোকগণ সভায় মিলিতা হইয়াছেন—

ননীবালা—স্ত্রী স্বাধীনতা সম্পূর্ণ হয় নাই, হাইকোর্টে হাউসে আফিসে, গুদামে সর্ব্বত্র লোকের আবশ্যক।

গিরিবালা—গোঁফ আঁটি সট্যতেই উঠিতে পারে এবং সঙ্গে সঙ্গে একটা মহৎ উপকারও হইতে পারে, আমাদের ছেলে হওয়া বও হইতে পারে। আমাদের উদরের মধ্যে ovarine.

বিরাজমোহিনী—এই নিয়ে আমেরিকায় মেমোরিয়াল পাঠালে হয়, তাহারা স্ত্রী স্বাধীনতার জন্য যাহা করিয়াছেন জগতে কোন জাতিই করিতে পারেন নাই।

অনঙ্গ মঞ্জরী—(পূর্ব্ববঙ্গবাসিনী শিক্ষিতা মহিলা) বোন্দ করেন, বোন্দ করেন, চুপ দেন, আমিও বক্তৃতা করবো বইলে সভায় আসছি আমারে কিছু বলতে দেন—এই দণ্ডায়মান অইলাম—

মৃণালিনী মিত্র—সভ্যাগণ বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে আদালতে বিলম্ব হওয়ায় আমি সেখান হইতে একেবারে সভায় উপস্থিত হইয়াছি, শ্রীযুক্ত অনঙ্গ মঞ্জরী মহাশয় যথার্থ বলিয়াছেন যে, পুরুষদের স্ত্রী বেশ পরানো নিতান্ত আবশ্যক, আমার বাড়ীতেই অদ্য এইক্ষণে সেই কার্য্য প্রাকটিকেলি আরম্ভ করি। বসন্ত, তুমি বাড়ীর ভিতর যাও এখন, তাদের শাড়ী গহনা-টহনা পরাও গে।

কর্ণেল—অ্যাটেনসন—

"তরুবালা" ষ্টারে অভিনীত হয় ২০ ডিসেম্বর ১৮৯০। ঠাকুরদা হন নীলমাধব বাবু, ঠান্‌দিদি গঙ্গামণি, তরুবালা প্রমদা, অখিল অমৃত মিত্র, বেহারী খুড়ো অমৃত বসু, শান্তা নগেন্দ্রবালা, পারুল মানদা, হীরালাল-অক্ষয় কোঁয়র। ইহা একখানি পঞ্চাঙ্ক সামাজিক নাটক। সাধ্বী স্ত্রী তরুবালাকে পরিত্যাগ করিয়া নায়ক অখিল শিক্ষিতা বারাঙ্গনা পারুলে আকৃষ্ট হয়। ঠাকুর্দ্দার কিরূপ কৌশলে অখিল আবার ঘরে ফিরিয়া তরুবালার সহিত সুখে বাস করে তাহাই দেখান হইয়াছে। পরিশেষে অখিল নির্য্যাতিতা সাধ্বী তরুবালাকে বলিতেছে—

"যে অবজ্ঞা তোমায় করেছি এখন প্রাণ ঢালা ভালবাসায় যদি সে অবজ্ঞার শোধ হয়, ঈশ্বর সাক্ষী—সে ভালবাসা আমি তোমায় দেব।"

নাটকের অনেক চরিত্রই সজীব। বিধবা শান্তর চরিত্র খুব সরস হইয়াছে।

বিলাপ—১৮৯১, ২২ আগষ্ট ষ্টারে অভিনীত ঈশ্বর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরলোক গমনে তাঁহার গুণাবলী স্মরণ করিয়া শোক করা হইয়াছে। শেষ গানটি চমৎকার—

বিদ্যার সাগর ব'লে খ্যাত ছিল মহীতলে
দয়ার সাগর ব'লে স্বর্গে আবাহন।

রাজা বাহাদুর—১৮৯১, ২৫ ডিসেম্বর ষ্টারে অভিনীত হয়। টাইটেলের জন্য মূর্খ জমিদারগণ কিরূপ ব্যগ্র হইত এবং তাহাদের বিদ্যা বুদ্ধির কত দৌড় তাহা এই প্রহসনে দেখানো হইয়াছে। রাজা বাহাদুর হইতেন উপেন্দ্র মিত্র, আর মিঃ ফিস অমৃত বসু নিজে, কালাচাঁদ চরিত্রও সরস গানিক্যধন মণ্ডলে দীনবন্ধুর রামমাণিক্যের ছাপ আছে—

কোলে বন্ধা যার পতি আজ্ঞার অদীন
স্বাধীন বর্ত্তকা তায় কয় সুপ্রবীণ

অয় চলেন। সব চাঁদাই দিমু। রাজা অইমু রাজা অইমু বাঁশী মোহনরে, এতদিনে গানিক্য দনের জন্ম সফল অইল, রাজা অইমু রাজা অইমু।

মাতাল ফিসের চরিত্রটিও খুব সরস।

কালা পাণি—হিন্দু মতে সমুদ্র যাত্রা—১৮৯২ ডিসেম্বর মাসে বড়দিনে ষ্টারে অভিনীত। সমুদ্রযাত্রা সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র এবং পণ্ডিতপ্রবর পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয়ের সঙ্গে অনেক বাদ বিসম্বাদ হইয়া গিয়াছে। শিক্ষাপ্রাপ্তির জন্য বিলাত যাত্রা বঙ্কিমচন্দ্রের অনুমোদিত ছিল।

অমৃতলাল বলেন, "যেতে হয় যাও, কিন্তু ভণ্ডামি ক'রে যেয়ো না।"

১৮৯১, ২১ মার্চ্চ সম্মতিসঙ্কট ষ্টারে অভিনীত হয়। ছোট লাট স্যার চার্লস্ ইলিয়ট ১৮৯১—Age of Consent Bill উপস্থিত করিয়া পাশ করান। ইহাতে ১২ বৎসরের নিম্নে মেয়ের বয়স হইলে তাহার সম্মতি থাকিলেও স্ত্রী-সহবাস অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে।

গানটি হইতেই কতকটা বুঝিতে পারা যায়—

ওলো দেব না সম্মতি, আমি দেব না সম্মতি
দেখবো কেমন আশে পাশে এগারো'র পতি
তিনি নিজেই হন তিনকড়ি মামা।

রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর (তখন কুমার) হিন্দু মতে বিলাত যাইতে চাহিয়াছিলেন, এবং মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন এ বিষয়ে সম্মতি দিয়াছিলেন এবং অন্যান্য পণ্ডিতদিগকে মতানুবর্ত্তী করিতে চেষ্টা করেন। অমৃত বসু তিনকড়ি মামারূপে ব্যঙ্গচ্ছলে যে উপদেশ দেন, এক সময়ে তাহাতে বেশ কাজ হয়। কিন্তু তাই বলিয়া অমৃতলাল সমুদ্রযাত্রার বিরোধী ছিলেন না, ভণ্ডামির বিরোধী ছিলেন। নিম্ন কথোপকথনে স্পষ্টভাবে বুঝা যাইবে—

মাখন—তুমি বিলাত যাওরার উপর এত চট কেন?

তিনকড়ি—চটবো কেন, তুমি যমালয়ে গেলেও চটবার নাই, যেতে হয় তার জন্য মিটিং ফিটিং বহ্বাড়ম্বর কেন? পয়সা থাকে, সাহস থাকে বিদ্যা থাকে, গেলে ভাল হবে বোঝ, সোজা পথ আছে, ঢেউ গুণতে গুণতে চলে যাও।

দুলাল—হাঁ, তারপর ফিরে এলে তোমরা আমাদের একঘরে কর। যেমন সব বিলাত ফেরতদের ক'রে থাক।

তিন—আমরা তাদের একঘরে করি, না তারা আপনারা একঘরে হয়। বাপ মা শিষ্ট শান্ত ছেলেটিকে দিব্যি সাজিয়ে গুজিয়ে টাকার রাশ খরচ ক'রে দুর্গানাম ব'লে ছেলেটিকে বিলাতে পাঠালেন, সখ—যে ছেলে আমার লেখাপড়া শিখে মস্ত লোক হয়ে আসবে। ও বাবা! ছেলে একেবারে জাহাজ থেকে নামলেন, ধুচুনি মাথায় দে গ্যাড্‌ম্যাড্‌ ক'রে। ভাত হ'ল ঘাসকা চীচি মোচা হ'ল কেলাকা ফুল, চলন বলন ও ঢং ঢাং সব বিপরীত, কাজেই ভেতো বাঙ্গালী বাপ মা কি করে, ভয়ে দোরে খিল দেয়, "শৃঙ্গিণাং শত হস্তেন—আর সাহেবেন বিশেষতঃ দেশী সাহেবেন লক্ষ হস্তেন লক্ষ হস্তেন যত তফাৎ থাকে, ততই ভাল।

দুলাল—কেন? ইদানীং আমাদের অনেক বাঙ্গালী তো বিলাত থেকে এসে দেশী চালে চল্‌ছে।

তিনকড়ি—তারা সমাজে মিশেও যাচ্ছে অনেকটা।

বাঙ্গালী নবীশরা সামান্য সামান্য ইংরাজী জানিয়া সে যুগে কিরূপ ইংরাজী বলিত, অমৃতলাল তাহারও ইঙ্গিত করিয়াছেন।

সি সি মাই বাবু—অল্ ব্রামিন মাউথ ওপেন ষ্ট্যাণ্ড হেড্‌, সব বামুন হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছে।

একে একে গোলমাল করোনা one one রাউণ্ড গুডস্ ডু নট

সই না দিলে বিদায় পাবে না, বার্ষিক বন্ধ

Tell, sign no give farewell no get, annual stop.

ভাল হয়েছে Good been

আমি ওকে ঠিক করছি I make him addition.

ঠাণ্ডা হো cold be, কাজ রফা হয়েছে Business compromise.

পাগল—Leg round. পরে বলবো afterwards tell.

এইরূপ ইংরাজী কথা অল্পদিন মধ্যে নাটকান্তরিত "চন্দ্রশেখরে"ও আছে। উহারও নাট্যরূপ অমৃতলালই দেন। উহা ১৮৯৭ সেপ্টেম্বরে ষ্টারে অভিনীত হয়। কথার একটু নমুনা দিতেছি।

He woman বৈত নয় slow slow walk করে গা I masculine man long long পা ফেলেন two leg এ গিয়ে catch করে গা।

You go sir নৌকায় গিয়ে নাকে oil give করে sleep করোগে, I your slave my fourteen masculine generation your slave.

তখন ছাত্রমহলে এইরূপ নকল (caricature) হইত। 'কালাপাণিতে' পণ্ডিত মহাশয় সমুদ্রযাত্রা কিরূপ ব্যাখ্যা করেন, তাহাও আছে; পণ্ডিত মহাশয় সেবারে এসিয়েটিক সোসাইটির মিটিংএ বলেন যে—বিলাতের বড় বড় সাহেব ভট্টাচার্য্যেরা প্রতিপন্ন করেছেন যে, বাল্মিকীর তপোবন তো বিলাতেই ছিল, তমসা তো টেম্‌স্ নদী। আর সমুদ্র-যাত্রায়ই বা দোষ কি; হিন্দুর দেবতা জগন্নাথ সমুদ্রের ধারেই। আর শ্রীক্ষেত্রে অন্নদোষ নাই।

'বাবু' অভিনীত হয় ১৮৯৩, ২৫শে ডিসেম্বর ও ১৮৯৪ ১লা জানুয়ারী আর 'একাকার' হয় ১৮৯৪, ২৫ ডিসেম্বর।

'বাবু'র ষষ্ঠীকুষ্ট বটব্যাল দেশহিতৈষী বাবু, মাকে খাইতে দেন না, কারণ জন্মভূমির জন্যই সব করেন,

সেকেণ্ড ক্লাসে না চলিলে পজিসন থাকে না, নিজের স্ত্রীকে সেলারের হাত হইতে রক্ষা না করিয়া, মিটিং করিয়া স্পীচ দিতে যান।

এ প্রহসনটিতে বেশ শিক্ষা আছে। তিনকড়ি মামা-রূপী অমৃতলাল বলিতেছেন—

"আপন স্ত্রীকে একটা দুর্ব্বৃত্ত মাতালের হাতে ফেলে তোমরা যাচ্ছ কিনা সভা করতে, চাঁদা তুলে বিলেতে গিয়ে পার্লামেণ্টে লেকচার দিয়ে স্ত্রীকে উদ্ধার ক'রবে। ধিক্ ধিক্, আপনার স্ত্রীকে অপমান হ'তে রক্ষা ক'রবার ক্ষমতা নাই, আবার স্ত্রী স্বাধীনতার কথা মুখে আন— আগে আপনারা স্বাধীন হও, আত্মরক্ষা করতে শিক্ষা কর, তারপর স্ত্রীলোককে স্বাধীন করো।

মায়ের প্রতি এই সব তথাকথিত শিক্ষিত দেশ-হিতৈষীরা কিরূপ ব্যবহার করিত তাহাও আছে মাকে ষষ্ঠীকৃষ্ট বলিতেছেন—

"হঠাৎ আমায় পেটে ধরেছিলে, জায়গা না দেবার তোমার একতারই ছিল না, এই হিসাবে তোমাকে মা বলা যায়—তা ব'লে দিবারাত্রি আপনার মার ভাবনা ভাবতে গেলে ভারতমাতার কাজ কখন করবো? আমার ভক্তিশ্রদ্ধা, মায়া, দয়া, এনার্জ্জি এজিটেসন, চাঁদা রোজগার এখন সবই তার জন্য, ভারতমাতা বই আর আমার মা নাই, এখন আমি ভারত সন্তান।"

অন্যত্র গ্রাম্যমণ্ডল ভজহরি যখন গ্রামে লইয়া যাইবার জন্য ইণ্টারমিডিয়েট রিটার্ণ টিকেট কিনিয়া দিতে চায়, ষষ্ঠী উত্তর করিতেছে—

"দেখছি তোমরা অতি অসভ্য জায়গায় থাক, দেশ হিতৈষিকতার কি কি দরকার কিছুই জাননা—তোমাদের গ্রামের দুর্ভিক্ষের প্রতিকার করতে যাব—ইণ্টারমিডিয়েটে গেলে আমায় চিনবে কে—ফার্ষ্ট ক্লাসে যাবার আসার টিকেটের দাম ঠিক কর আর আমি কেলনারের হোটেলে যাব—ফিরিঙ্গি রিপোর্টার দরকার, সাবব্রাঞ্চগুলিতে টেলিগ্রাম করতে হবে আর কলকেতা থেকে যদি একদল সখের কনসার্ট নিয়ে যেতে পার ত ভাল হয়।

একাকার প্রহসনে অভিনীত বড় বাবুদের চাপরাশী, কেরাণীদের চরিত্র চিত্রিত হইয়াছে, জাতব্যবসার কথাও আছে। অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট কোর্টের চিত্র, হাকিমের অজ্ঞানতাপ্রযুক্ত হুকুম, সাহেবের প্রতি কলু অনারারী মাজিষ্ট্রেটের অহেতুকী ভয় ও রাজানুরূপ ভক্তি প্রভৃতির উল্লেখ আছে।

তখনকার আধুনিকা স্ত্রী বা Modern Wife —বৌমা ১৮৯৬—২৫শে ডিসেম্বর অভিনীত হয়। সামান্য কিছু পড়াশুনা করিয়া বৌমা কিশোরী শাশুড়ীকে বলিতেছে, "আপনি আমাকে রান্নাঘরে যেতে ব'লছেন? আমি আলমারি খুলে সমস্ত বই আপনাকে খুলে দিচ্ছি, দেখুন তার মধ্যে যত নায়িকা আছে তারা কে হেঁসেলে গিয়েছেন? তিলোত্তমা কখনও ঘরের কাজ করেছিল না, মৃণালিনী প্রেমের ছবি আঁকা ছাড়া কিছু করেনি, মনোরমা পুকুরের হাঁস দেখা ভিন্ন আর কি করেছিল? সূর্য্যমুখী কখনও রেঁধেছিল? কুন্দ কখনও ভাত বেড়ে দিত?

গ্রাম্যবিভ্রাট ষ্টারে ১৮৯৭, ২৫শে ডিসেম্বর অভিনীত হয়। গ্রামে মিউনিসিপ্যালিটি নেওয়া লইয়া ভোটের বাদবিসম্বাদ সুন্দরভাবে দেখানো হইয়াছে।

সাবাস আঠাস ১৮৯৯, ২৩শে সেপ্টেম্বর ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত হয়। বাঙ্গলার ছোট লাট স্যার আলেকজাণ্ডার ম্যাকেনজি একটী মিউনিসিপাল বিলের সহায়তায় কলিকাতা কর্পোরেশনের জন্য ১২ জন সভ্য লইয়া একটী জেনারেল কমিটি গঠিত করিতে চাহেন এবং তন্মধ্যে ৪জন মাত্র নির্ব্বাচিত হইবেন এবং ৮জন হইবেন সরকার পক্ষান্তর্গত। এই বিলের প্রতিবাদ কল্লে ২৮জন সভ্য পদত্যাগ করেন, কয়েকজন করেন নাই, যেমন রামময় ডাক্তার। তাই প্রহসনে আছে—

তবে অসময় রামময় পাশ দিয়ে তাস
রঙ্গের খেলায় ভ্যালা পেলে উপহাস।
আহা ভাল কটি সুখে থাক
সাবাস সাবাস বলি সাবাস আঠাস।

যাদুকরী অভিনীত হয় ১৮৯৯ ডিসেম্বর, আদর্শ বন্ধু ২০শে এপ্রিল, ১৯০০ পৃথ্বী সিং হন, দানিবাবু, দণ্ডার সিং চুনী দেব, ফুলওয়ালা নিখিল দেব।

১৯০১ অবতার, ২৫শে ডিসেম্বর ষ্টারে অভিনীত হয়। ভণ্ড অবতার হইয়া যে লোক-সমাজে আসিয়া

অনেকে আধিপত্য বিস্তার ও পয়সা রোজগার করে, সেই বিষয়েই হলাহলানন্দ স্বামীকে বিদ্রূপ করা হইয়াছে। ইনি ইংরাজীও জানেন, সংস্কৃতেও কথা বলেন; পূর্ব্বে সে শাখারীদের বুলা ছিল, এখন থেকে মুরিয়া বেড়ায় অনেক টাকা রোজগার করে।

"নবজীবন"—১৯০১ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় যে কংগ্রেসের অধিবেশন হয়, সেই সম্পর্কে রচিত। 'ওই ভুবনমোহিনী' 'বন্দেমাতরম্' 'মলিন মুখচন্দ্রিমা ভারত তোমারি' প্রভৃতি সঙ্গীতে একাঙ্ক নাটিকাটী বেশ রসদায়ক হয়। ভারত সন্তানগণ বলিতেছে—"আবার সকলে একমনে একতানে বঙ্কিমের সেই মধুরগাঁথা বন্দেমাতরম গাইবো।" পূর্ব্বে ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে ন্যাশনাল থিয়েটারে যে ভারতমাতার গান হয়, সে সময় রচিত দেবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের গানটীও সংযোজিত হয়—

দেখগো ভারত মাতা তোমারি সন্তান
ঘুমায়ে রয়েছে সবে শবপ্রায় হীন প্রাণ,

কয়েকজন ভারতবাসীও বলিতেছেন—

"মহাশক্তির অংশে আমাদের রূপ, তবে তার নাম-গানে কেন আমরা যোগ দেব না?"

১৯০৪ ডিসেম্বর বাহবাবাতিকও উপভোগ্য প্রহসন।

১৯০৫ ডিসেম্বর সাবাস বাঙ্গালী অভিনীত হয়।

স্বদেশী আন্দোলন লক্ষ্য করিয়া ইহা রচিত। যাহাতে বিলাতী জিনিসের বয়কট চলে এবং স্বদেশী দ্রব্যাদির প্রসার হয়, সেই উদ্দেশ্যে রচিত এখানিও সরস প্রহসন। চরকা কাটিতে কাটিতে মহিলাগণের ইহাতে শেষ গানটি ইহার সম্বন্ধে খাঁটি পরিচয় দিবে।

"আমরা আবার কাটবো সুতো চরকাতে
যাবনা আর সখী সেজে
সভার মাঝে ফরকাতে;
শুনেছি সেই ঠাকুর মা
দিতেন নিজে ঢেঁকিতে পা
পড়তো নাকো এলিয়ে গতর
কোনও কর্ম্ম করাতে॥
জ্যাকেট বডিস যাক উচ্ছন্ন
আমরা হবনা মতিচ্ছন্ন
দেবো দেশের অন্ন কিসের জন্য
বিদেশীর পেট ভরাতে,
শুনছি এক আছে ছুতো
দেশে নাকি নাইকো সুতো
আমরা ঘরে ঘরে কেটে সুতো
দেবো তাঁতি ভরাতে
যদি বাবুরা হন গো নারাজ
বিলিতী জুতা পরাতে।

নাটক বলি প্রহসন বলি "খাসদখল"ই অমৃতলালের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রচনা। ইহা যেমন সরস, তেমন শিক্ষাপ্রদ। রসাবতারণায় খাসদখল ছিল অদ্বিতীয়। যে দিক দিয়া দেখা যাইত, দর্শক বিমল আনন্দ পাইত। ইহার বিষয়—আলিপুরের ফৌজদারী উকীল লোকেনের স্ত্রী মোক্ষদা কবিতাপ্রিয় ছিল। তাদের বাড়ীতে কবি-উন্মাদ মোহিত, সুরঙ্গিনীর সহকারী সম্পাদক নিতাই, ঠাকুর্দ্দা, লোকেনের জুনিয়ার রমেশ প্রভৃতি বাহিরের লোক আসিত এবং গল্পগুজব হইত। দার্জ্জিলিং আসিবার পরে Landslip এ লোকেন পড়িয়া যায় এবং ঈশ্বর কৃপায় বাঁচিয়া উঠিয়া ধর্ম্মের দিকেই মন সমর্পণ করে। কিন্তু তার অনুপস্থিতিতে প্রচারিত হয় যে তার মৃত্যু হইয়াছে। মোহিত এবং মোক্ষদার বিধবা-বিবাহ হইবে স্থির হয় এবং নিমন্ত্রিত সকলেই উপস্থিত হন, কিন্তু সেই দিনই লোকেন আসিয়া উপস্থিত হইল। মোক্ষদার কাছে গিরিবালা নাম্নী একটি সুশীলা সেবাপরায়ণা গ্রাম্য মেয়ে থাকিত। গিরিবালা মোহিতেরই স্ত্রী, কিন্তু স্বামী-পরিত্যক্তা, এবাড়ীতে মোহিত তাহাকে চিনিতে পারে নাই। কিন্তু পরে চিনিয়া গ্রহণ করে। এইরূপ কবিপ্রেম সুলভতা এবং তজ্জনিত বিধবা-বিবাহ অমৃতলালের অনুমোদিত নয়। কিন্তু নাটকে কয়েকটি সরস স্থানের উল্লেখ করিতেছি। সাময়িক অনেক ঘটনার উল্লেখ আছে, যেমন—রাজধানী কলিকাতা হইতে দিল্লী স্থানান্তরিত হওয়া তাহার মনঃপূত হয় নাই—পার্টিসন উঠিয়া যাওয়ায় মুচিরাম—খুব আনন্দোৎসাহে—England for ever, Bengal for ever.

তপস্বী বলিতেছে—খুব আমোদ যে মুচিরাম, খানিকটে নাচ না হয়।

মুচি—নাচবোই তো, আপনিও নাচুন—সেদিন মা বসুমতী পর্য্যন্ত নেচে উঠেছেন।

এই নাটকে অমৃতলাল নিজে নিতাই করিতেন। নিতাইর ইস দি এত সরস হইত, তখন ইস দি সাধারণের কথার একটা অপভ্রংশে পরিণত হইয়াছিল।

রমেশ বলিতেছে—রামকমলবাবু বিধবা বিবাহ দিবেন না, পিছিয়ে গেলেন ও কত বক্তৃতা দিতেন—যা নিজে করবার সাহস নেই, তা অপরকে করতে বলেন কেন?

ঠাকুর্দ্দা—তুমি উকীল হয়ে আর শামলা চাপকান পরে কাছারী যাও কেন?

নিতাই—বিকজ সেটা ইজ দি কাছারীর পোষাক!

ঠাকুরদা—তা রামকমলবাবুরও সমাজ সংস্কারই ইজ দি, কাছারীর পোষাক। যেমন রমেশ কাছারীর পোষাক পরে ভাতও খায় না, তেমনি রামকমলবাবুও আপনার বাড়ীর ভেতর সমাজ সংস্কার করেন না।

লোকেন—ঠাকুরদার লজিক অকাট্য।

অন্যত্র মোহিত বলিতেছে—"আমি বই নিয়ে পড়ে থাকলে কি এত কাব্য লিখতে পারতুম? বানান সন্ধি হুড়োহুড়ি করে এসে আমার ব্যস্ত মস্তিষ্ক বিলোড়িত করে দিত"—তাই সে বলিতেছে, যে মহিলা এরূপ বিদুষিণী তার স্বামী কিরূপ বিদূষক।

কবিরা যে কিরূপ উদ্ভটভাবে পদ মিলাইত, এই বিষয়ে অমৃতলালের রহস্য আছে—

লুকায়ে চোরের প্রায় নিশীথে ঝরিয়ে হায়
নলিনী মলিনী কেন করিস্ শিশির
ভূমিগতা পদ্ম লতা তার প্রাণে দিলি ব্যথা
কি লাভ হইল ইথে তোমার—।

নিতাই—ষ্টপ ইজ দি থামলেন যে?

মোহিত—মিলটা আস্‌ছে না।

রমেশ—কেন শিশিরের সঙ্গে নিশির তো বেশ মিল হয়।

মোহিত—মানে হয় না।

ঠাকুরদা—পিসীর, কেমন মিলেছে তো?

মোহিত—বড় শ্রুতিমধুর হয়েছে, কিন্তু শিশিরের পিসী কে হ'তে পারে?

ঠাকুরদা—শিশিরের বাপ কে?

নিতাই—আকাশ ইস্ দি শিশিরের পাপা।

ঠাকুরদা—আকাশের বোন কে? সমুদ্রা, দুই নীল সীমাশূণ্য কেমন?

ওরে পাপিষ্ঠ শিশির তুই যদি তোমার পিসীর গর্ভে পড়তিস,তাহ'লে পিসীর ফোটা কতক জল লাভ হত, কিন্তু তা না করে ভূমিলতা পদ্মলতাকে ছোব্‌লালি কেন?

অন্যত্র মোহিত বলিতেছে—

পদ্ম সুন্দরীর তরে বৈদ্য আনিবারে
যেতে পারি বৈদ্যবাটী লঙ্ঘিয়ে সাগর
তুচ্ছ সে গ্রে ষ্ট্রীট গোষ্পদ সমান।

গিরিবালার কথা—

"আমি পাড়াগেঁয়ে মেয়ে, আমি ত জানি না কলকাতায় একটু অসুখ হলেও কি বলতে হয় খুব অসুখ হয়েছে?"

ও ভারী উপভোগ্য—

আবার যখন সকলেই মোক্ষদার জন্য কেউ বেলেডোনা কেউ এসোরিন প্রভৃতি ডাক্তার মিত্রকে প্রম্‌পট করিতেছিল—ঠাকুর্দ্দা বলেন, আপনাদের অন্ন উঠল।

ডাঃ—আজ্ঞে না, বরং সাধারণে ওসব শিখে আমাদের একটু উপকার হচ্ছে। আমরা যদি বলি কলিক, রোগীর আপনার লোক সেটা এ্যাপেন্‌ডিসাইটিস্ না বলিয়ে আপনাকে আর ছাড়ে না।

ডাক্তার কেবল ঘুমুতে বলিয়া যাওয়ায়—১৬৲ টাকার ফির জায়গায় মোক্ষদা—না না, ষোল টাকা নয়, পায়ে ষ্টকিং নেই, তার জন্য ছ' টাকা কেটে নিয়ে দশটা টাকা দিও।

মোক্ষদার কথা—কি মিত্তির ডাক্তারের কথা—আমার temparature কিনা 99· তখন একটা সাধারণ কথাবার্ত্তারও রঙ্গরহস্যে দাঁড়াইয়াছিল।

ব্যাকুলা গিরিবালার মোক্ষদাকে আগ্রহে আলিঙ্গণ দেখিয়া কবি মোহিত বলিতেছে—"কি দেখি, কি দেখি কমলে—কুমুদে আলিঙ্গন। এক দেহে আমি রবিচন্দ্র নই কেন?" কোমলে উজ্জ্বলে বিশালে সৌন্দর্য্যে উক্তিতে নাট্যকারের সরসতার বেশ পরিচয় পাওয়া যায়।

মোহিত—তোমার দিদির সঙ্গে আমার বিবাহ হ'লে তুমি আমায় দাদা ব'লে ডাকবে তো?

গিরি—আপনাদের কি দিদির সঙ্গে দাদার বিয়ে হয়?

অন্যত্র—

মোহিত—আশ্চর্য্য, সেই বর্ব্বরকে আপনি পতি ব'লে মনে করেন?

গিরি—যার সঙ্গে বিবাহ হ'য়েছে তাকে পতি ব'লে মনে কর্ব্বো না তো কি বাড়ীর সরকার ব'লে মনে কর্ব্বো?

মোহিত—সরকার ম'শাই কি! সে গর্দ্দভ আপনার ওই শতদল—কোমল পায়ে জুতো পরাবার পর্য্যন্ত উপযুক্ত নয়!

গিরি—আমার সোয়ামী কি মুচি?

মোহিত—সে মূর্খ, পাজী বা নরাধম, এখানে থাকৃলে তার মুখে আগুন জ্বেলে দিতুম।

গিরি—আর সেই রোসনায়ে সেই আলোয় দাঁড়িয়ে আপনি সদ্য বিধবা মোক্ষদা সুন্দরীকে বিবাহ কর্ত্তেন?

মোহিত—গিরিবালা!

গিরি—ম'শাই!

মোহিত—বিধবা বিবাহ কি মন্দ?

গিরি—আকাশ পিদ্দিম কি চাঁদ?

অন্যত্র আছে—

ঠাকুরদা—কেন হে নিতাই রামকমলবাবু বাইশ বছরের বিধবা মেয়ের বিবাহ দেন নি ব'লে অত চ'টে-ছিলে, তখন—আর তোমার ও বাড়ীর বউমার (মোক্ষদার) বয়স তো ২৫।২৬-এর বেশী হবে না!

নিতাই—রামকমলবাবু is the who is my—

আর এ আমার রেভারেণ্ড অন্নদাতা ফাদার্স ওয়াইফ—

ঠাকুরদা—তা হ'লে তোমারও কাছারীর পোষাক আছে!

অন্যত্র—

লোকেন যে জীবিত,এই খবরটি দিতে আসিয়া ডাক্তার গুণধর ও আমি দু-দুটো কল ভাড়িয়ে আপনার বাঁচার খবর পেয়ে ছুটে এসেছি—কিছুদূর গিয়া প্রত্যাবর্ত্তন।

সারদাবাবু—আজকের এ কল-এর বিলটাও তা হ'লে পাঠিয়ে দেব।

"এ পরাণ চিরি তোমারে দেখাব গিরি
কোমল চরণ তলে নত করি শির,
বধূ লাভ হ'ল আজ নন্দর পিসীর"ও ভারী উপভোগ্য।
"ভাতার কেমন মিষ্টি" অত্যন্ত সুগীত হইত।

এমন পাঁচ সাত দিন আমি এই অভিনয় দেখিয়াছি, আর অভিনয়ান্তে গানটির সময় "হ'ল না ইক দি নতুন বন্দোবস্ত" দর্শকবৃন্দ অমৃতলালকে অজস্র সাধুবাদ দিয়াছেন আর অমৃতলালও হাত জোর করিয়া প্রত্যভিবাদন করিয়াছেন।

অমৃতলাল বিজয়বসন্ত, নবযৌবন নাটকও লিখিয়া-ছিলেন। আমাদের সাহিত্যিকগণ সবিনয়ে সকলেই তাহার আলোচনা করিবেন।

নবযৌবন ৫ই পৌষ, ১৩২০ মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত হয়।

দ্বন্দে মাতনম ভারত সংস্কার (Government of India Act of 1919) বাহির হইবার পরে এবং ১৯২০ খৃঃ হইতে চালু হইবার পরে দ্বন্দে মাতনম প্রহসন রচিত হয়। ষ্টার থিয়েটারে ১০ই নভেম্বর ১৯২৬ অভিনীত হয়।

হিন্দুদিগকে অমুসলমান (Non-Mahomedan) বলিয়া ভোটের কাগজে অভিহিত করা হয় বলিয়া তিনি বিশেষ মর্ম্মাহত হন। দ্বন্দে মাতনমে সেই মনোভাবই প্রতিভাত হইয়াছে।

বিবাহ বিভ্রাটে যে বিবাহের টাকা দিয়া পলাইয়া যায় সেই নন্দের উপসংহারও অমৃত লাল করিয়াছেন - একটী রসযুক্ত গল্পের একটু পরিচয় দিতেছি। নন্দ এন সরকার এখন ব্যারিষ্টার হইয়া আসিয়া হাইকোর্টে প্রাকটিস করিতেছে—কিন্তু এখন আর তেমন জজ নাই যে তার বক্তৃতা বুঝিবে, সুতরাং গত দুই বৎসরের মধ্যে কোন মাম্‌লা নাই—আসা যাওয়া পদব্রজে, ট্রামকার পর্য্যন্ত চড়েন না পাছে ব্যাড়ানের ব্যাঘাত হয়। মাই ডিয়ার মাদারের স্বামী গোপীনাথ ছেলে এলে টাকা দিব বলিয়া এতদিন যাহাদের তালবাহনা করিয়া রাখিয়াছিল, তাহারা হাইকোর্টে বন্ধকী বাড়ী ফোরক্লোজ করিবার জন্য

হাইকোর্টে নালিস করিয়াছে। নন্দ বিনা পয়সায় বাদীর কৌসিলি। প্রতিবাদী পিতাকে প্রশ্ন করিতেছে—

পুত্র—তোমার নাম?

পিতা—তুমিতো জান বাপু

পুত্র—আমি জানি না জানি সেকথা হইতেছেনা, আদালতকে বল।

পিতা—আমার নাম শ্রীগোপীনাথ সরকার।

পুত্র—বয়স কত?

পিতা (বিরক্ত ভাবে)—আন্দাজ বাট বাবটি।

পুত্র—কি জাত?

পিতা—কায়স্থ-পুত্র—বিবাহ হয়েছে?

পিতা (অসহ্য বসতঃ) ও শুওটা, হয়েছে বৈকি? নইলে তোর মত অকাল কুষ্মাণ্ড জন্মাল কোথা থেকে, শুওটা তুই কি ভুই কোঁড়!

সরকার সাহেব Contempt of Court বলিয়া কোর্টের দিকে তাকাইলেন। লর্ড জরিমানা করিবেন এমন সময় ইণ্টারপ্রিটার গোপনে আদালতকে বুঝাইয়া দিলেন ব্যারিষ্টার "সাহেব বুড়োর পুত্র।

আদালতে একটা হাসির রোল উঠিল; ব্রিফ্ ফেলিয়া মিঃ সরকার হাইকোর্ট ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন, বলিয়া গেলেন যাহার self-respect আছে সে এ কোর্টে প্রাক্‌টিস করেনা। সে এখন সাঁওতাল পরগণায় প্রাকটিস করে—আর আমরাও বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হইলাম—তাহারই পিতা পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিয়াছে।

এইভাবে রস বিতরণ করিতে করিতে অমৃতলাল দেশবাসীকে কাঁদাইয়া ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে আমাদের ছাড়িয়া স্বর্গারোহণ করেন।

গান

শ্রীমতী শান্তা ঘোষ

ফুরায় যা দাও ফুরাতে—
কেন যাও মিছে ছিন্ন মালার
ঝরা ফুলগুলি কুড়াতে?
যা ছিল আজি তা নাহি রয় যদি
সেই স্মৃতি কেন কাঁদে নিরবধি—
এসো এ বিজন বন-পথছায়ে
শ্রান্ত হৃদয় জুড়াতে॥
প'ড়ে আছে পথ তুমি যে পান্থ
অস্ত অচলগামী,
সেই পথে চলো—ক্লান্ত চরণ
পরে না ক' যেন থামি।
কী যে হ'লো নাকো মিছে তারি ব্যথা
মিছে ফিরে চাওয়া—মিছে আকুলতা—
মিছে ভয় আজি সকল কামনা
বেদনা অনলে পুড়াতে॥

মায়ের প্রাণ

শ্রীগোপালদাস চৌধুরী

এগার

আমার ঠাকুর্দ্দারা ছিলেন দু'ভাই। দু'জনের একজনও লেখাপড়ার সুবিধে করতে পারেন নি; কিন্তু কারবারে দু'জনই খুব উন্নতি করেন—তখনকার দিনে রাধাবাজারে তাঁদেরই ছিল সব চেয়ে বড় আমদানী কারবার। দু'জনের মধ্যে ছোট ছিলেন বুদ্ধিতে কাঁচা আর মেজাজেও কড়া। ধূর্ত্ত কর্ম্মচারীরা ছোটকে হাত করে এমন অনেক কাজ করিয়ে নিত যাতে তাদের নিজেদের মোটা হাতে লাভ হয়, কিন্তু তাতে কারবারের খুবই ক্ষতি হচ্ছিল। এতে বিরক্ত হয়ে বড় ভাই একদিন আদেশ দিলেন—তাঁর সই ছাড়া যেন কোন মালের অর্ডার আর বিদেশে পাঠান না হয়।

এই আদেশেই একদিন হিতে বিপরীত হল। যে-সব কর্ম্মচারীরা কারবারের স্বার্থের চাইতে নিজেদের স্বার্থকে বড় মনে করত, এই আদেশে তাদের আঁতে ঘা পড়ল। এই শ্রেণীর স্বার্থপর কর্ম্মচারীরা ছোটর দলে যোগ দিল, আর যারা ছিল কারবারের হিতৈষী তারা বলল বড়র পক্ষ টেনে। এই দোটানায় পড়ে' দোকানের অবস্থা দিন দিনই মন্দের দিকেই চলল। এ নিয়ে দু'ভায়ের মধ্যে এক দিন তুমুল ঝগড়া হয়ে গেল। ছোট ঠাকুর্দ্দা ছিলেন স্বভাবতই রগ-চটা। তিনি রাগের মাথায় ঠাকুর্দ্দার পক্ষের একজন পুরনো কর্ম্মচারীকে জবাব দিয়ে বসলেন। ঠাকুর্দ্দারও সেদিন কেমন জিদ চড়ে গেল, তিনিও ছোট ঠাকুর্দ্দার পক্ষের একজন ধড়িবাজ কর্ম্মচারীকে বরখাস্ত করলেন। এই হটকারিতার ফলে ভাইদের মধ্যে কথাবার্ত্তা বন্ধ হল আর কর্ম্মচারী বরখাস্তের অবাধ পালা চলল। এই বিশ্রী কাণ্ড দেখে মুখুজ্জে দাদু ও আরো কয়েকজন হিতৈষী লোক মাঝে পড়ে একটা আপোষ করিয়ে দিলেন। কারবার ভাগাভাগি হয়ে গেল এবং ঠাকুর্দ্দারাও পৃথকান্ন হলেন। পৈত্রিক বাড়ী ছোটর অংশে পড়ায় বড় শ্যামবাজারে বাড়ী কিনে উঠে গেলেন।

পৈত্রিক বাড়ীর তুলনায় নতুন বাড়ীটা ছোট হলেও রোদ-বাতাস ছিল খুব; আর ঘর ক'খানা ছিল বেশ বড় বড়। ঠাকুর্দ্দারা ভিন্ন হলেও ঠাকমাদের মধ্যে বেশ ভাব ছিল এবং আসা-যাওয়াও ছিল। পৃথক হওয়ার পর বছর না ঘুরতেই ঠাকুর্দ্দা গঙ্গালাভ করলেন। এই অকাল মৃত্যু-শোকে ঠাকমা ও বাবা দু'জনই বেশী রকম বিহ্বল হয়ে পড়লেন। কেউ না ডাকলেও আমাদের এই দুঃসময়ে ছোট-ঠাকমাই এসে সংসারের ভার নিয়েছিলেন। ছোট ঠাকুর্দ্দাও রোজই এসে খোঁজ-খবর নিতেন। ঠাকুর্দ্দার কাজের দিনও তিনি উপস্থিত থেকে পরম আত্মীয়ের মতই অন্তরের সহিত সব-কিছু দেখা-শোনা করছিলেন, আদর যত্ন করে লোকজন খাইয়েছিলেন। তাঁর এই আত্মীয়োচিত ব্যবহারে অন্যের ত কথাই নাই, ঠাকুর্দ্দার পক্ষের কর্ম্মচারীরা পর্য্যন্ত মুগ্ধ হয়েছিল। ঠাকমার মুখে শুনেছি মুখুজ্জে দাদু নাকি আনন্দে আটখানা হয়ে ছোট ঠাকুর্দ্দাকে বুকে জড়িয়ে ধরেছিলেন।

এই সময় বাবা হাই কোর্টে বেরুচ্ছিলেন; পসার সবে জমে উঠছিল। তিনি কারবারের কাজ তেমন বুঝতেন না এবং পছন্দও করতেন না। তাঁর অংশটা উচিত মূল্যে ছোট ঠাকুর্দ্দা'কে বেঁচে দিলেন। এই ঘটনার বছর আড়াই পরে ছোট ঠাকুর্দ্দা হঠাৎ 'হার্ট' ফেল করে মারা গেলেন। এই আকস্মিক বিপদে ছোট ঠাকমা যখন শোকে অধীরা হয়ে পড়লেন, সে সময় ঠাকমা, বাবা, মা সবাই দরদী আত্মীয়ের মতই সময়োচিত সমস্ত কাজকর্ম্ম করেছিলেন। ঠাকমা ত শ্রাদ্ধাদি চুকে যাওয়ার পরও রোজই দুপুর বেলায় ছোট ঠাকমার কাছে দু'তিন ঘণ্টা কাটিয়ে আসতেন। এদিকে ছোট ঠাকমার দাদা ও মা দু'জনই এসে জেঁকে বসলেন বাড়ীতে। ঠাকমার নিত্য যাওয়া-আসা এরা পছন্দ করত না এবং এমন হাব-ভাব দেখাত যাতে ঠাকমা অস্বস্তি বোধ করতেন। তিনি জা'য়ের বাড়ী রোজ রোজ যাবেন কিনা এই সমস্যা

সমাধানের জন্য যখন ব্যস্ত হয়ে পড়লেন সে সময় একদিন ছোট ঠাকমার ভাজ এক দঙ্গল ছেলে পুলে, আর বাক্স-তোরঙ্গ বিছানা-পত্র নিয়ে ছোট ঠাকমার বাড়ী হানা দিলেন। সারা বাড়ীতে কিছুক্ষণ হৈ-হুল্লোর চলল; ছোট ঠাকমা তাদের দেখা শোনাতেই আটক পড়লেন। সেদিন আর তিনি ঠাকমার সঙ্গে সুখ-দুঃখের কথা কইবার ফুরসুৎ পেলেন না। এই ঘটনার পরই ঠাকমা যাওয়া-আসাটা ক্রমে কমিয়ে আনলেন।

ছোট ঠাকমার দাদা বাসুদেব বাবু ছিলেন উকিলের ধড়িবাজ মহুরী; ইনি হলেন ছোট ঠাকমার লক্ষাধিক নগদ টাকা আর সমৃদ্ধ কারবারের রক্ষাকর্ত্তা! স্ত্রীর উত্তেজনায় মা'য়ের উস্‌কানিতে আর নিজের অতৃপ্ত অর্থলালসায় অধীর হয়ে কোন কৌশলে বোনের টাকা-কড়ি, কারবার ও বাড়ীটা নিজের নামে লিখিয়ে নিতে পারে কিনা সে চেষ্টায় আদা-জল খেয়ে লাগলেন। দিন রাত নাকি ছোট ঠাকমাকে পাখী পড়াবার মত পড়াতেন —তুই বোন বিধবা মানুষ, তোর অভাবে তোর টাকা-কড়ি বিত্ত-পসার, সে-সবই মধু পাবে। আমরা যে কাঙাল সে কাঙালই থাকব চিরকাল।

দাদার কাঁদুনির সঙ্গে ভাজও নাকি চোখের জল মিশিয়ে বিলাপ করতেন—মধুর অভাব কি ঠাকুর-ঝি? ফি মাসে কম হলেও হাজার টাকা কামাচ্ছে। তার উঠতি সময়—হাজার দু'হাজারে ঠেলে উঠতে ক'দিনের মামলা?

বাসুদেব বাবু—না বোন তেলে মাথায় আর তেল ঢেলে কাজ নেই। তার চাইতে তোর এই ছা-পোষা দাদাকেই লিখে-পড়েদে। দেখছিস ত কি কষ্টে ছেলে-পুলে নিয়ে দিন কাটাচ্ছি।

ছোটঠাকমার ভাজ অনেক করে বিনিয়ে বিনিয়ে বলতেন—তাই করো ভাই ঠাকুর-ঝি; আমার আণ্ডা-বাচ্চাগুলোর একটা হিল্লে হোক।

ছোটঠাকমার মা-বুড়ীও এই কাঁদুনিতে যোগ দিতেন। তিনিও নাকি রোজই চোখের জলে বুক ভাসিয়ে বলতেন—আহা কত কষ্টেই তোদের ভাই-বোনকে মানুষ করেছি, অমু। তোকে বড় ঘরে বিয়ে দিয়ে উনি কত কি সুখের স্বপ্ন দেখতেন। আহা সারা জীবন কী কষ্টই ভোগ করে গেছেন। আজ ভগবানের আশীর্ব্বাদে তুই সুখের মুখ দেখেছিস, লাখ টাকার মালিক হয়েছিস। এখন আর ভাবনা কি আমাদের? তোর যা 'শরীল' তার ওপর মধুর মা মাগীর আবার যা কুনজর, কখন কি হয় তোর তা কি বলা যায় অমু। তার চেয়ে সময় থাকতে বাসুমনির নামেই লিখে-পড়ে দে। তোর কল্যাণে কাচ্চা-বাচ্চাগুলো দুধ-ভাত, মিঠাই-মণ্ডা খাক। আর আমি তোর বুড়ী মা, আমি 'শত্তু'রের মুখে ছাই দিয়ে ফল-মিষ্টি মুখে দি, আর তসর-গরদ পরে রূপোর বাসনে পুজা-আর্চ্চা করি। তাই কর অমু, বাসুকেই লিখে-পড়ে দে। মধুর গুষ্ঠিকে খাইয়ে ভুতের বাপের 'ছেরাদ্দ' করিসনে।

এই ভাবে মাসের পর মাস, বছরের পর বছর পাখী পড়াবার পর পাখী একদিন সত্যসত্যই বোল শিখল। বাসুদেববাবু একটা বয়নামা করিয়ে বাড়ীটা তার স্ত্রীর নামে লিখিয়ে নিলেন। আর ব্যাঙ্কের হিসাবটা ট্রান্সফার করিয়ে নিলেন নিজের নামে। শুধু এই নয়, স্ত্রীর অনুরোধে বাসুদেব বাবু তাঁর দুই শালাকে ছোটঠাকমার কারবারে চাকুরী দিলেন। বড় হলেন 'ক্যাশিয়ার' আর ছোট হলেন 'ম্যানেজার'। এই ভাবে ছোটঠাকমাকে তাঁর দাদা 'অক্টোপাসে'র মত বেষ্টন করে ফেললেন। ফলে নিজের বাড়ীতেই তিনি কার্য্যতঃ অতিথি হয়ে পড়লেন; আর ভাজের হাত তোলা খেয়ে-পরে দিন কাটাতে লাগলেন। এতে তাঁর কোন কষ্ট কি লজ্জা লাগেনি মনে। মেয়েরা চিরদিনই ভাই-গত প্রাণ; আর ভাইরা আ-বিবাহই পত্নী-গত প্রাণ। বোনেরা স্নেহে জড়বুদ্ধি, মোহগ্রস্থ; তারা ভাইদের প্রতারণা দেখেও দেখে না, বুঝেও বুঝে না।

বাবা যে সেদিন ছোটঠাকমাকে কঠিন কথাগুলি শোনালেন তার একটাও মিথ্যে ছিল না। ছোটঠাকমা যে তাঁর সব কিছুই দাদাকে লিখে-পড়ে দিয়েছিলেন সে কথা ঠাকমাও জানতেন, আর আমাদের আত্মীয়স্বজনরাও জানতেন। দাদাকে টাকাকড়ি লিখে দেওয়ায় বাবা বিন্দুমাত্র বিরক্ত হননি ছোটঠাকমার উপর। তবে

বাড়ীটা লিখে দেওয়ায় তিনি সত্যই দুঃখিত হয়েছিলেন। এতে তাঁকে দোষ দেয়া যায় না। যে বাড়ীতে জন্মেছেন, শৈশব, কৈশোর, যৌবনে খেলাধূলা করেছেন, বিবাহিত জীবনের মন্ত্রমুগ্ধ দিনগুলি যেখানে কাটিয়েছেন, সে বাড়ীটার জন্য আইনতঃ দাবী না থাকলেও অন্তরের দরদের দাবী থাকাটা অন্যায় মনে করা যায় না। ছোট-ঠাকমা যদি ন্যায্য মূল্যেও বাড়ীটা বাবাকে দিতে চাইতেন তিনি হয়ত তাতেও খুশির সঙ্গে রাজি হতেন। ছোট-ঠাকমার উপর বিরক্ত থাকলেও বাবা তা কোন-দিনই মুখ ফুটে প্রকাশ করেননি। সে জন্যই বাবার সেদিনকার ব্যাপারে ঠাকমা ও আমি দু'জনই বিস্মিত হয়েছিলাম।

বার

বিয়ের পর আট দিনের মধ্যেই নতুন মাকে নিয়ে বাবা তিন রাত্রি কাটিয়ে এসেছেন শিবতলায়। বিয়ের পর থেকেই তিনি মাছ-মাংস খাচ্ছেন, পেড়ে ধুতি পরছেন, গায় সাবান-এসেন্স মাখছেন।

বাবার এই আকস্মিক পরিবর্ত্তনে শুধু যে মুখুজ্জে দাদুর মত দু'চারজন বুড়োর দলই আশ্চর্য্য হয়েছিলেন তা নয়। বাবার অন্তরঙ্গ বন্ধু ও সহকর্ম্মীদের মধ্যেও কেউ কেউ ঠাট্টা তামাসা করে বাবার নীচেকার বসবার ঘরের নীরস আবহাওয়াকে সরস করে তুলতেন। বাবার ছিল সাদা প্রাণ; তিনি বন্ধুদের ব্যঙ্গ-উপহাসকে বুদ্ধিমানের মতই হেসে উড়িয়ে দিতেন।

নতুন মা যেদিন দ্বিরাগমনের পর ফিরে এলেন, তাঁর সঙ্গে এল তাঁর পোষা বেড়ালটি। হলোই বা বেড়াল কিন্তু কী সুন্দর! গায়ের বারো আনাই ছিল দুধের মত ধব্‌ধবে সাদা; মাথাটি আর কান দু'টি ছিল মিশ কালো। পাঁজরার দু' পাশে ছিল দু'টো দু'টো ক'রে কালো ছোপ, আর লেজের ডগাটি ছিল সাদা-কালোর সঙ্গে সোনালী। বেড়ালটির নাম ছিল 'গোলাপী', সে যে সার্থকনামা ছিল তাতে সন্দেহ নেই; কারণ ঠোঁট দু'খানি ছিল ফিকে গোলাপী—ঠিক যেন স্থলপদ্মের পাৎলা দু'টি পাপড়ি।

এই লোভনীয় নবাগত প্রাণীটিকে আমার বড্ড ভাল লাগল। ইংরেজরা যাকে বলে love at first sight বা প্রথম দর্শনেই প্রেমে পড়া, আমারও ঠিক সে অবস্থাই হয়েছিল। গোলাপীকে দেখা মাত্রই আমি কোলে তুলে নিলাম। মার্জ্জারী হলেও স্বভাবটি ছিল তার ভারি ভদ্র, ভারি শিষ্ট। চেনা-অচেনার ধার সে ধারত না; যে আদর করে কোলে নিতে চাইত, বিনা ওজরে তারই কোলে উঠে পড়ত—যেন কতকালের জানা-শোনা! আমি গোলাপীকে কোলে তুলে নিলাম দেখে নতুন মা খুব খুসী হলেন মনে হল।

কি কারণে জানিনে ঠাকমার প্রসন্নতার কোন আভাস পেলাম না। আমার কোলে বেড়ালটাকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন—এ আপদটাকে আবার কোথ্‌থেকে জোটালি?

—নতুন মা'র সঙ্গে এসেছে। দেখতে খুব সুন্দর, না ঠাকমা? আমি আদর করতে গিয়ে গোলাপীকে বুকে চেপে ধরলাম।

নতুন মাকে উপরে যেতে দেখেই হো'ক বা আমার অতিরিক্ত আদরে বিরক্ত হয়েই হো'ক, ছাড়ান পাবার জন্য মিউ-মিউ করে মিনতি জানাচ্ছিল। প্রার্থনা উপেক্ষিত হচ্ছে দেখে বেশ উসখুস করতে লাগল। যেই আমি একটু আলগা দিয়েছি, অমনি ঝুপ করে লাফিয়ে পড়ে সিঁড়ি বেয়ে উপরে চলে গেল। মনের ভাবটা যেন—মেয়ে বাপের বাড়ী এসেছে, সর্ব্বত্রই তার স্বচ্ছন্দ সাবলীল গতি!

ঠাকমা আপনা-আপনিই অনুচ্চস্বরে বললেন—এ আবার কি রকম সখ বাপু! বেঁচে থাকলে আরো কত কি দেখবো।

শিবুর মা নিকটেই ছিল। সে বললে—এ আবার নতুন কি গিন্নী মা? আমাদের গাঁয়ের কেষ্টো চৌধুরীর নাতনীর খুব সোন্দর একটা কুকুর ছেলো। তার মামা না বাবা কে নাকি আড়াইশ' টাকায় কিনে দেয়।

ঠাকমা বিস্ময়ের সঙ্গে বললেন—বলিস কি শিবুর মা, আ—ড়া—ই—শ' টাকা একটা কুকুরের দাম?

শিবুর মা বললে—এ আর বেশী কি গিন্নীমা, চৌধুরী

আসামের নারী শিল্প

শ্রীবিজয়ভূষণ ঘোষ চৌধুরী, প্রাচ্যতত্ত্বসাগর

প্রাচীনকালে সমস্ত সভ্যাসভ্য দেশে সকলেরই ঘরে চরকার প্রচলন ছিল। রন্ধন এবং সন্তান পালন ভিন্ন চরকা এবং টাকুর সাহায্যে সূতা তৈয়ার করা এবং বস্ত্র বয়ন করা নারীদিগেরই কার্য্য ছিল। সূত্র প্রস্তুত এবং বস্ত্রবয়ন আর্য্যসভ্যতার অতি প্রাচীনতম নিদর্শন। ইহার দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে—ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের একটী মন্ত্রে (১০।৫৩।৬) সূত্র প্রস্তুতের এবং বস্ত্র বয়নের উল্লেখ আছে। ব্রাহ্মণ-মেয়েদের পৈতা কাটার প্রথাটি স্মরণাতীত যুগ হইতে চলিয়া আসিতেছে। পূর্ব্বে কোন ব্রাহ্মণ-কন্যারই সূতা না কটিলে চলিত না। উত্তম কাটুনীরা মিহি পৈতা কাটিতেন। বিগত ১৯০৬ খৃঃ অব্দে ঢাকায় স্বদেশী মেলায় শিল্প প্রদর্শনী হয়। এই মেলায় কতিপয় মহিলা যে মিহি পৈতা উপস্থিত করেন, তাহাতে অপূর্ব্ব নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। ইংরাজী ভাষায় অবিবাহিতা কন্যাকে এখনও SPINSTER (সূতা কাটুনী) বলা হইতেছে। ইংরাজের মেয়েদের মধ্যে শতকরা একজনও বোধ হয় প্রকৃত প্রস্তাবে সূতা কাটার কাজ (Spinning) করেন না, তথাপি তাঁহাদের ভাষায় অবিবাহিত মেয়েকে (বিশেষতঃ একটু বয়স হইলে) Spinster বলিতে ছাড়িতেছেন না। একেই বলে সংস্কার।

আসাম এণ্ডি ও মুগার জন্য চির প্রসিদ্ধ। এণ্ডি বা এড়ি রেশম কীট। যে রেশম কীট এরণ্ড বা ভেরাণ্ডার পাতা খাইয়া গুটি বাঁধে উহা হইতে 'এণ্ডি' (এরণ্ডি) সূতা হয়। এণ্ডির কীট গুটির মুক ঠেলিয়া প্রজাপতির আকারে বাহির হইয়া গেলে গুটিকে (cocoin) ধুইয়া পিষিয়া তুলার সূতার মত টাকুতে কাটিয়া সূতা বাহির করিতে হয়। এণ্ডিসূতা পাইবার জন্য কীটকে মারিবার প্রয়োজন হয় না। 'এণ্ডি' এবং 'পাটের' কীট গৃহের ভিতর পালন করিতে হয়। একই জাতীয় কীট হইতে মুগা এবং তসর—এই উভয় প্রকারের রেশম পাওয়া যায়। সেই কীট যখন বন্য কুল গাছের পাতা খায় এবং সেই গাছে

[৫৪৯ পৃষ্ঠার পর]

বাড়ীর ঝি বউদের কাছে শুনেছি এক একটা কুকুরের নাকি হাজার বারোশ' টাকাও দাম হয়।

ঠাকমা অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে বললেন—দেখছিস কখনও হাজার বারোশ' টাকার কুকুর ?

—না গিন্নী মা! আমি শুধু আড়াইশ' টাকারই দেখেছি। বেশ ছেলো দেখতে। হাতীর কানের মত ঝুল-কাণ, ভেড়ার মত থোকা থোকা কোঁকড়ানো নরম রোঁয়া। আহা কুকুরটার কি মায়াই ছিল মেয়েটার জন্যে।

ঠোঁটের কোণে হাসি টেনে ঠাকমা বললেন—এক মায়ের এক বেটার মত মেয়েটার নেও ছিল বুঝি ?

—ঠিক বলেছ গিন্নীমা। মেয়েটার ত বিয়ে হয়ে গেল। পরের দিন বর-কনে যখন মোটরে উঠল কুকুরটাও ছুটে এসে দু'জনের মাঝখানটায় বসে পড়ল। বাড়ীর লোকজন মায় কর্ত্তা-গিন্নী কত চেষ্টা করল কিন্তু কেউ তাকে নামাতে পারল না। যে-ই নামাতে যায় তাকেই ঘেউ ঘেউ করে ওঠে। মজা দেখে বর ত হেসে কুটিকুটি। কনের মুখখানি কাঁদো-কাঁদো দেখে সে আর কুকুরটাকে নামাতে দিলে না। পরে শুনলাম মেয়ের শ্বশুর বাড়ী কুকুরের সে কি আদর! রোজ আধ সের মাংস আর সেরটেক দৈ নাকি বরাদ্দ হয়ে গেল তার জন্যে।

ঠাকমা শুধু বললেন—বাব্বা ? কুকুর ত নয় বাপের ঠাকুর!

[ক্রমশঃ

গুটি বাঁধে তখন উহা হইতে "মুগা রেশমের সূতা" পাওয়া যায়। আর সেই কীট যখন শাল বা অসন গাছের পাতা খায় এবং সেই গাছে গুটি বাঁধে, তখন উহা হইতে তসরের সূতা পাওয়া যায়। পশ্চিম বাঙ্গলায় মুগার গুটিকে "কুলে গুটি" এবং তসরের গুটিকে "শেলো গুটি" বলে। পাট, মুগা এবং তসরের গুটীর সূতা টানিয়া বাহির করা যায়, কিন্তু এণ্ডির (এড়ির) সূতা টানিয়া বাহির করা যায় না। এণ্ডি, মুগা, পাট এবং কার্পাসের সূতা ভিন্ন ভিন্ন প্রণালীতে প্রস্তুত হয়। এড়ি সূতা মোটা হয় বলিয়া তাঁহারা উহার দ্বারা প্রধানত: শীতবস্ত্র প্রস্তুত করিয়া থাকেন। উক্ত পাটের সংস্কৃত নাম "পত্রোর্ণা" (পত্র+ঊর্ণা)। অসমীয়ারা 'ত' বর্গের স্থানে 'ট' বর্গের উচ্চারণ করায় আমাদের 'পাত' অসমীয়াতে 'পাট' হইয়াছে। রেশমের কীট তুঁতগাছের পাতা খাইয়া যে গুটি বাঁধে উহা হইতে এই 'গরদ' বা 'পাটসূতা' পাওয়া যায়। 'গরদ' শব্দ গরদ হইতে উৎপন্ন—উহার অর্থ হলুদে রঙের। প্রকৃতপক্ষে পত্রোর্ণা শ্বেত এবং হরিদ্রা উভয় বর্ণের হয়। আমাদের গরদ এবং অসমীয়াদের 'পাটর কাপড়' মূলত: একই বস্ত্র।

ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার বহুস্থানে তাঁতের যাবতীয় সরঞ্জাম প্রস্তুত হয়। অসমীয়ারা বুননকে 'রাস' (সানা weaving) বলেন। আমরা বিগত ১৯২৪ খ্রীঃ অব্দে দরঙ্গ জেলার মঙ্গলদৈ অঞ্চলের 'রাস' দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলাম। উজনী আসামের নগাঁও জেলার বহুস্থানে সেখানকার 'রাসের' খ্যাতি আছে। গৌহাটী মহকুমার নাম্বরভাগ মৌজার মাখিবাঁহা গ্রামের (Ry. Stn. Tihn.) রাস ও তাঁতের নানাবিধ সরঞ্জাম চিত্তাকর্ষক। সেগুলিও ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা বিভাগের জেলাগুলিতে প্রশংসিত। অন্যান্য প্রদেশে নারীগণ প্রধানত: পাককার্য্যকেই প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া মনে করেন। আসাম প্রদেশের ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার সর্ব্বত্র কি স্বচ্ছল, কি অস্বচ্ছল অসমীয়া মহিলারা সাধারণত: কোন রকমে পাককার্য্য সমাপন করিয়া থাকেন। অতঃপর তাঁহারা তাঁতশালায় গিয়া কাজ করেন। কেবল নিম্ন-আসামের গোয়ালপাড়া জেলায় বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয়। সেখানকার ধুবড়ী মহকুমার গৌরীপুর, রূপসী, শালকোয়া, ব্রহ্মপুত্র তীরস্থ দলগোমা আদি গ্রামে কোন কোন গৃহস্থের বাটীতে তাঁতশালা আছে। উহা হইতে প্রয়োজনমত কাপড়, চাদর, গামছা, মশারী প্রভৃতি বুনা হয়। গোয়ালপাড়া জেলার মহিলারা যেন বাঙ্গালারই মেয়ে। তাঁহাদের মধ্যে শাড়ী, সেমিজ, জ্যাকেট, ব্লাউজ ব্যতীত রীহা ও মেখেলার প্রচলন নাই। একারণ সে অঞ্চলে এই দুইটী প্রস্তুতের প্রয়োজন হয় না।

সমগ্র ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় মিলের কাপড়ের চলন অধিক বলিয়া নিত্য ব্যবহার্য্য সূতার কাপড় তেমন প্রস্তুত হয় না। এখানকার মহিলারা তাঁতের সাহায্যে শাড়ী কোটের কাপড়, চাদর, গামোছা প্রভৃতি বয়ন করেন। ইহা তাঁহাদিগের গার্হস্থ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম মধ্যে পরিগণিত। এমন কি, ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা বিভাগের (অর্থাৎ গোয়াল পাড়া, কামরূপ, দরঙ্গ, নগাঁও, শিবসাগর ও লখিমপুর অঞ্চলের) খুব বড় ঘরের মেয়েরাও নিজেদের হাতে সূতা কাটিয়া বস্ত্রাদি বয়ন করিতে কিছুমাত্র লজ্জা বোধ করে না। বাঙ্গালা দেশে পাত্রী দেখার সময় যেমন কুমারীদের হস্তাক্ষর পরীক্ষা হয়, আসামে তেমনিই কুমারীর প্রস্তুত রীহা, মেখেলা, রুমাল পরীক্ষা করা হয়। আসামে পুরুষেরা বস্ত্রবয়ন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন না। বর্ত্তমান কামরূপ অঞ্চলের পলাশবাড়ী, সোয়ানকুচি এবং উহাদের নিকটবর্ত্তী যে কয়েকটি গ্রামে ব্যবসায়ের জন্য বস্ত্র বয়ন করা হয়, কেবল সেখানে পুরুষেরা স্ত্রীলোক-দিগকে সাহায্য করিয়া থাকেন। তাঁতের কাপড় বুনিয়া যাহারা জীবিকানির্ব্বাহ করে, কৃষি কার্য্যের দিকে তাহারা তেমন লক্ষ্য রাখে না। শ্রীহট্ট অঞ্চলে একমাত্র যোগীজাতীয় ও মণিপুরী নারীগণ তাঁতে কাপড়, গামছা ও মশারী বয়ন করিয়া থাকেন। নিম্ন-আসামে মশারীকে 'মুহরী' এবং উজনী আসাম অঞ্চলে উহাকে 'আঠুয়া' বলে। পল্লীগ্রামের ও নগরের মহিলারা নিজ নিজ বাটীতে ব্যবহারের জন্য সূতা অথবা এড়ির দ্বারা 'মুহরি' কিংবা 'আঠুয়া' প্রস্তুত করিয়া থাকেন।

পূর্ব্বোক্ত পলাশবাড়ী ও সোয়ানকুচিতে অতি সুন্দর মুগার শাল, কাপড়, শাড়ী, চাদর প্রভৃতি মূল্যবান

পট্টবস্ত্র প্রস্তুত হইয়া ভারতের নানাস্থানে রপ্তানি হইয়া থাকে। মঙ্গলদৈ অঞ্চলের মহিলারা বস্ত্রগুলিকে সুশোভন অথবা চিত্রিত করিবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় গাছগাছড়া এবং ফুলের নির্য্যাস হইতে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের এরূপ উৎকৃষ্ট রঙ প্রস্তুত করিয়া থাকেন যে, সেগুলি দেখিলে বিস্ময়াবিষ্ট হইতে হয়। মধ্য-আসামের তেজপুর ও উপর-আসামের লখিমপুর অঞ্চলের মহিলাদের বস্ত্রবয়ন-শিল্পের পারিপাট্য বিষয়ে কামরূপের উত্তর গৌহাটী, নলবাড়ী, বেলসর, গন্ধিয়া, চামটা, মাহিবাঁহা, বড়পেটা প্রভৃতি স্থানের মহিলাদিগের কৃতিত্ব অধিক। উপর-আসামের শিবসাগর জেলার গোলাঘাটে অবস্থানকালে আসাম-জননীর অন্যতম কৃতিসন্তান বন্ধুবর শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ চলিহা (Excise Inspector) আমাকে বামাহস্তের নানা প্রকার বয়ন শিল্প ও সীবন যন্ত্রের শিল্পনৈপুণ্য দেখাইয়া বিস্ময়াবিষ্ট করিয়াছিলেন। এই মহকুমার নহরাণী মৌজার মুগাজাত বস্ত্রশিল্প সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই গোলাঘাট ও শিবসাগর অঞ্চলের বহুস্থানের মহিলারা তাঁতের সাহায্যে অতি উৎকৃষ্ট 'হাচতি' ও 'চিৎ' বয়ন করিয়া থাকেন। এই দুইটীর আকৃতি রুমালের মত। 'চিৎ'এ তেঁতুল পাতা প্রভৃতির নক্সা থাকে। শিবসাগর জেলার কতিপয় স্থানে অহম বংশীয় মহিলাগণের কৃত নানা প্রকারের নয়নাভিরাম চানেকী—ডিব্রুগড় মহকুমার বহুস্থান আমি পর্য্যটন করিয়াছি কিন্তু কোথায়ও উল্লেখযোগ্য বস্ত্রশিল্প আমার চক্ষে পড়ে নাই। এখানকার ব্রহ্মপুত্র তটস্থ মটকডাইনি গ্রামের অনেক নদীয়াল (আধুনিক কৈবর্ত্ত) জাতীয় রমণী সীবনশিল্পে সিদ্ধহস্তা। আমি তাহাদের তৈয়ারী কতকগুলি কাঁথা (সুচিত্রিত) দেখিয়াছিলাম।

অসমীয়া মহিলারা মুগার সূতার দ্বারা মেজাঙ্করী, রীহা, মেখেলা এবং কার্পাস সূত্রে খনীয়া ও চেলেং নামক চাদর, গামোছা প্রভৃতি বয়ন করিয়া থাকেন। চেলেং ও খনীয়ার মধ্যে পার্থক্য এই যে, চেলেং এক পাট্টা এবং খনীয়া দুই পাট্টা বিশেষ। চেলেংয়ের একদিকে এবং খনীয়ারও একদিকে মুগা অথবা জরীর কাজ থাকে। মুগা হইতে বিশিষ্ট প্রণালীতে প্রস্তুত হরিদ্রা বর্ণের এক প্রকার বস্ত্রকে 'মেজাঙ্করী' বলা হয়। ইহা অনেকটা ঢাকার মসলিম বস্ত্রেরই অনুরূপ। সাদা পাটের কাপড়ের উপর অসমীয়া মহিলারা অতি সুন্দর জরীর কাজ করিতে পারেন। ইহাকে "গুণার বনকরা কাপড়" বলে। বস্ত্র বয়নের সঙ্গে সঙ্গে জরীর কাজ করা হয়—ইহার সহিত সূচীকার্য্যের কোন সম্বন্ধ নাই। এই চিত্তাকর্ষক জরীর কাজগুলি এক প্রকার নিদর্শন বা নমুনা (pattern) দেখিয়া প্রস্তুত হয়। অসমীয়ারা এই নমুনাকে 'চানেকী' বলেন। খুব সরু সরু বাঁশের শলার উপর সূতার দ্বারা নানা রকমের লতা-পাতা-ফুল প্রভৃতির নিদর্শন দেখাইবার উদ্দেশ্যে চানেকীগুলি প্রস্তুত করা হয়। অসমীয়া মহিলারা পাটের কাপড়ে মেখেলা, রীহা ও খনীয়া প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া সেগুলিতে স্বহস্তে সুভূষিতভাবে অতি মনোরম শিল্পকার্য্য করেন।

খাসিয়া ও জয়ন্তীয়া পাহাড়ের পাদদেশে যে সকল নমঃশূদ্রের বিধবারা বসবাস করেন, তাঁহারা নিজ নিজ ব্যবহার্য এড়ি পোকা উঠান ও তাহার সাহায্যে রেশম তুলিয়া বস্ত্র বয়ন করেন। তাঁহাদের প্রস্তুত কোন বস্ত্র বাজারে বিক্রয় হয় না। খাসিয়া পাহাড়ের সীমান্তে 'ভৈ' নামে এক স্বতন্ত্র বন্যজাতি বিশেষের বাস আছে। এই জাতির স্ত্রী-পুরুষেরা খাসিয়া এবং সিংটেনদিগের জন্য এবং নিজ নিজ ব্যবহার্য এণ্ডি ও মুগার কাপড় বয়ন করে। বিগত ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে এই লেখক ভুটীয়া, মিরি, ছুটীয়া, পাকিয়ান আদি বন্য ও পাহাড়ীয়া এবং অর্দ্ধ সভ্য বলিয়া পরিচিত মহিলাদিগের বস্ত্রবয়ন-নৈপুণ্য দেখিয়া চমকিত হইয়াছিলেন। স্বর্গত মহাত্মা লক্ষ্মীকান্ত বড়কাকতি মহোদয় ঐ বৎসর তেজপুরে আমাকে বলিয়াছিলেন—ভোট বা ভুটান অঞ্চলে প্রস্তুত 'কিংখাপ' নামক অপূর্ব্ব কারুকার্য্য সমন্বিত কৌষেয় বস্ত্র (ইহা অত্যন্ত মূল্যবান) সম্ভ্রান্ত ও সম্পন্ন অসমীয়া ভদ্রলোকদিগের বাটীতে স্থান না পাইলে তাঁহারা তৃপ্তিবোধ করিতেন না।

ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় আর্য্য সভ্যতার আলোক প্রবিষ্ট হইবার পূর্ব্বে কামরূপ বা কামরূপ জনপদের মহিলারা তাঁহাদের প্রতিবেশিনী কিরাত রমণীদিগের নিকট হইতে

বস্ত্র বয়নের পদ্ধতি শিক্ষা করিয়াছিলেন, তৎসম্পর্কে বৈচিত্র্য না থাকাই সম্ভব বলিয়া মনে হয়। যেহেতু স্মরণাতীত-কালে নেপাল, ত্রিপুরা, কোচক (বর্ত্তমান কোচবিহার অঞ্চল), উত্তর বঙ্গ আদি দেশের ন্যায় পরবর্ত্তীকালে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা নামে অভিহিত অঞ্চলও কিরাত জাতির অধ্যুষিত ছিল এবং সেই ঐতিহ্যটী কামরূপে উদ্ভূত কালিকা পুরাণেও প্রদত্ত হইয়াছে। কিরাত জাতির মহিলারা (এবং উপর-আসামের থামতি রমণীরাও) স্তন-যুগলের উপরিভাগে যে ধরণে কাপড় আঁটিয়া পড়িত—আজিও নিম্ন-আসামের গোয়ালপাড়া মহকুমার কোন কোন স্থানে এবং কামরূপ জেলার ও দরঙ্গ মহকুমার সর্ব্বত্র অসমীয়া 'গাভরু'রা (যুবতীরা) এবং উত্তর বঙ্গের কোচ ও রাজবংশী যুবতীরা সাধারণতঃ নিজ নিজ বাটীতে সেই ধরণে বস্ত্র পরিধান করিয়া থাকেন। অসমীয়ারা উহাকে 'মেখনী মারা, এবং রাজবংশীরা অঘোরণ (বা আগুরণ) পরা বলেন। 'মেখনী' শব্দ সংস্কৃত 'মেখলা' শব্দ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে এবং উহার অর্থ বেষ্টনী। উক্ত আগুরণগুলি সাধারণতঃ ৪ হাত দীর্ঘ এবং ৮ হাত প্রস্থ। আসামের বন্য, অর্দ্ধসভ্য ও পাহাড়ীয়া জাতির মহিলারাও যে বস্ত্রবয়নে সুনিপুণা তাহা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি। যাহা হউক, অসমীয়া মহিলাদিগের রীহা, মেখেলা ও ও চেলেং পরিধানের পদ্ধতি স্বতন্ত্র প্রকার এবং ইহাতে তাঁহাদের যে জাতীয় বৈশিষ্ট্য আছে, ভারতের আর কোন দেশে তাহার নিদর্শন মেলে না।

বর্ত্তমান কামরূপ অঞ্চলের মহিলারা পুরাতন কাপড়ের পাড় এবং পুরাতন (বা ছিন্ন) কাপড়ের দ্বারা নানা রকমের গালিচা ও সৌখিন কাঁথা প্রস্তুত কার্য্যে সিদ্ধহস্তা। নগাঁও জেলার হিন্দু ও মুসলমান মহিলারা কার্পাস সুত্র দ্বারা বিছনী (ব্যজনী বা পাখা) ও গাডুর তলা'র (বালিসের চাকতির) উপর এরূপ চিত্তাকর্ষক সূচীকার্য্য করেন যে উহা দর্শন মাত্রেই মুগ্ধ হইতে হয়। অসমীয়া ভাষায় বালিসকে গাডু বলে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য পূর্ব্বে পূর্ব্ব বাঙ্গালায় সাধারণ লোকের ঘরে ট্রাঙ্ক নামক বাক্স ছিল না। কাপড়-চোপড় যে বোচকায় বাঁধা হইত, তত্রত্য মহিলারা সেটী সাদা, নীল, লাল আদি সুতায় নানাপ্রকার ছবির দ্বারা চিত্রিত করিতেন এবং তাহার বেষ্টনী প্রয়োজন মত দীর্ঘ-প্রস্থ কাপড় কাটিয়া সুঁচ শিল্পের সাহায্যে উহাতে পাখী, ঘোড়া, হাতী, মানুষ আদির মনোরম মূর্ত্তি আঁকিতেন। যাহা হউক, বিংশ শতাব্দীর প্রথম ও দ্বিতীয় পাদে শ্রীহট্ট অঞ্চলে দেশব্যাপক বস্ত্র শিল্পের সংবাদ পাওয়া যায় নাই। আসামে পুরুষেরা ব্যতীত কোন অসমীয়া মহিলা কোনরূপ বংশ শিল্পের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন না। অসমীয়ারা চাটাইকে 'ধারি' এবং চাঁচকে 'বনে' বলেন। শ্রীহট্ট দেশ আসাম প্রদেশভুক্ত থাকাকালে তত্রত্য নমঃশূদ্র জাতীয়া নারীদের প্রস্তুত চাটাই, চাঁচ, চুপড়ী প্রভৃতি বংশশিল্প গৌরবজনক ছিল এবং সেগুলি কলিকাতা ও অন্যান্য সহরে চালান হইয়া প্রতি বৎসর বেশ অর্থাগম হইত। আসামের দরঙ্গ ও শিবসাগর জেলায় অতি উৎকৃষ্ট শীতল পাটী প্রস্তুত হয়। এই কার্য্যে সেখানকার কোন মহিলা হস্তক্ষেপ করেন না। শ্রীহট্ট অঞ্চলের দাস জাতীয় নারীদের প্রস্তুত বেত্রনির্ম্মিত মূর্ত্তা এবং শীতলপাটিও সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। সেখানকার পুরুষেরা এই শিল্পকার্য্যে নারীদের সহায়তা করেন। আসামে মুর্ত্তাকে 'মুঢ়া' বলে। শ্রীহট্ট সহরে বেতের পেটরা এবং সুটকেশ প্রভৃতি নির্ম্মাণকার্য্যে নমঃশূদ্র জাতীয় স্ত্রীলোকদিগের হাত রহিয়াছে। শ্রীহট্ট জনপদে দেবদাস, দে, সিংহ, ভাণ্ডারী উপাধিধারী লোকেরা নমঃ-শূদ্রজাতীয়। তাহারা বেতের পেটরাকে 'জাফরি' বলে। অসমীয়ারা এই জাফরিকে 'পেটরা' বা 'জপা' বলে। পেটরা অপেক্ষা জপা আকারে একটু বড়। আসামে উচ্চ-নীচ প্রায় সকল জাতির পুরুষেরা এই দুইটি এবং উক্ত ধারি বান প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া থাকেন। আসাম উপত্যকা বিভাগে মোজা বুনার কাজ কিংবা পাতা কাটার কাজ (কাগজের কাজ) হয় না।

স্বর্গত মোহনচাঁদ গান্ধীজী বহু স্বাধীনতাকামী অসমীয়া ভদ্রলোকের আমন্ত্রণে ও কাতর প্রার্থনায় বিগত ১৯২১ খৃঃ অব্দের আগষ্টমাসে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা বিভাগের বহুস্থান পর্য্যটন করিয়াছিলেন এবং তাঁহার পর্য্যটিত স্থানগুলি

হইতে বহু টাকার তোরা উপঢৌকন পাইয়াছিলেন। তৎকালে তিনি ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার কোন কোন স্থানের মহিলাদিগের বস্ত্রশিল্পের পারিপাট্য দেখিয়া বিমোহিত হইয়াছিলেন এবং সেই সংবাদটি ভূয়সী প্রশংসাসহ স্বকীয় "ইয়ং ইণ্ডিয়া" নাম্নী সাপ্তাহিক ইংরাজী পত্রিকায় "Lovely Assam" শীর্ষক প্রবন্ধে প্রকাশ করেন। এই প্রসঙ্গে বাংলা দেশের বস্ত্রশিল্প উল্লেখযোগ্য—ঢাকার মসলিন ভারতের বহির্ভাগে যাবতীয় সভ্যদেশে বিলাস ও শোভার চরম দ্রব্য বলিয়া গণ্য ছিল। সেই মসলিন এখন নাই এবং সেরূপ শিল্পীর সন্ধান এখন আর মিলে না। বঙ্গ বিখ্যাত শান্তিপুরের ধুতি, ত্রিপুরার সরাইলের ধুতি এবং বালুচরের শাড়ীর গৌরবের ভাবিটুকু এখন নির্ব্বাণোন্মুখ। বৃটিশ জাতি যখন বণিক বেশে ভারতে আগমন করিয়াছিলেন, তখন তাঁহারা ভারতের নানাস্থানে বহুবিধ শিল্পকর্ম্ম দেখিয়াছিলেন। তাহার পর কিরূপে সেইগুলি একে একে বিলুপ্ত হইল তাহার ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিয়া কোন কোন বিশেষজ্ঞ বলিয়াছেন যে, বাঙ্গালার বস্ত্রশিল্প প্রধানতঃ ইংলণ্ডের বাণিজ্য নীতির ফলে এখন বিলুপ্ত প্রায় হইয়া গিয়াছে। খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী হইতে সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম পাদ পর্য্যন্ত বাঙ্গালায় মুসলমানদিগের রাজনৈতিক প্রভাব বিশেষরূপ প্রবল ছিল। তাঁহারা হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজ এবং জাতির উপর সর্ব্বপ্রকার ধ্বংসের অভিযান চালাইয়াছেন, কিন্তু তখনও কোন শিল্পের কিছুমাত্র হানি হয় নাই—বরং সমৃদ্ধির পরিচয়ই পাওয়া যায়। বিবিধ কারুকার্য্যে সমৃদ্ধ পূর্ব্ববঙ্গের মৈমনসিংহ, ঢাকা, বরিশাল এবং উত্তরবঙ্গের দিনাজপুর, মালদহ ও আধুনিক পাকিস্থানভুক্ত শ্রীহট্ট অঞ্চলের সে মহিমময়ী শ্রী আজ বিপর্য্যস্ত।

কেবল ইংরাজকে শোষক বলিয়া তাঁহাদের বাণিজ্যনীতির (Commercial policyর) দোষ দিলে চলিবে না। আমরা কখনও কোনও বিষয়ের ভবিষ্যৎ ফলাফল ভাবিয়া দেখি নাই। প্রতিকারের কোন চেষ্টাও করি নাই। মনে পড়ে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আদির প্রচেষ্টার কথা। এবারকার বঙ্গভঙ্গের ফলে পূর্ব্ববাঙ্গলার অধিকাংশ নরনারী অন্ন-বস্ত্রের অভাবে হৃদয়বিদারক হাহাকার রব তুলিতেছে—ইহা আমরা দেখিতে পাইতেছি। পশ্চিম বঙ্গে উহার কম প্রতিক্রিয়া নানা প্রকারে হইতেছে না। সুতরাং কর্ত্তৃপক্ষ সেখানকার শিল্পাদির অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত না করিলে, উহার স্থানবিশেষে এখনও যাহা আছে অদূর ভবিষ্যতে তাহাও লোপ পাইবে। তখন পূর্ব্ববঙ্গের নানাবিধ শিল্পের ন্যায় এদেশের শিল্পের গৌরবকাহিনী একটি কিম্বদন্তীতে পরিণত হইবে সংশয় নাই।

প্রতিধ্বনি

ডাঃ শচীন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

পূর্ব্ববঙ্গে দাঙ্গা চলেছে;

বহু হিন্দু মারা পরেছে মুসলমানদের হাতে। বাড়ি ঘর জ্বালিয়ে দিয়েছে অজস্র। আতঙ্কগ্রস্ত হিন্দুরা ছুটেছে—উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে।

•

আমেদ এসে দাঁড়ালো, হাতে তার রামদা। সঙ্গে এসেছে একপাল উন্মত্ত মুসলমান।

হাত জোর করে কাঁপছে নমিতা, বলছে, রক্ষা কর, বাঁচাও। তোমার ত কোন ক্ষতি করিনি আমরা। তবে কাটবে কেন?

বিকট ভাবে হেসে ওঠে আমেদ, বলে, হ্যাঁ! বাঁচাবো এই দা দিয়ে। হিঃ হিঃ—বীভৎস হাসি হেসে ওঠে আমেদ।

তোমার কি ক্ষতি করেছি যে, কাটবে?

ক্ষতি করনি সত্য। কিন্তু পাকিস্থানে হিন্দু রাখব না। বড্ড বিশ্বাসঘাতক এই হিন্দুজাতি।

বিশ্বাসঘাতকের কি কাজ করেছি বল?

কৈফিয়ৎ দিতে আমেদ আসে নি।

আমাদের বাঁচাও তুমি। চিরদিন তোমায় প্রতিপালন করে এসেছি। আমাদের খেয়েই তুমি মানুষ।

উপায় নেই।

সব নিয়ে যাও, শুধু প্রাণ ভিক্ষে দাও।

সে হয় না। বিবি।

তোমার পায়ে পড়ি, বাঁচাও। তুমি ধর্ম্মের বাপ।

বাপই বল, চাচাই বল, রক্ষা নেই।

রক্ষা কর। রক্ষা কর। খোদার দোহাই, বাঁচাও।

প্রস্তুত হন কর্ত্তারা।

আমরা প্রস্তুতই আছি—আমেদ।

আমেদের রামদা ওঠে। নমিতা আর্ত্তনাদ করে মূর্চ্ছিত হয়ে যায়। তারি সম্মুখে, আমেদ কেটে ফেলেছে তার পিতা মাতাকে। মূর্চ্ছিতা নমিতাকে কোলে করে নিয়ে যায় তার নিজের বাড়িতে।

দুই

আল্লা! আল্লা! বাঁচাও, রক্ষা কর খোদা। মেয়েরা চীৎকার করছে!

বীরেন বললো, চুপ, চেঁচিও না, বল হোসেন মিয়া কোথায়?

মোরা জানি না—হুজুর।

জাননা! উল্লুক কোথাকার। বল কোথায় সে?

অণিমা বিবি বললো, খোদার কসম, মোরা জানি না

ফের মিছে কথা! না বললে এই ছোড়া দিয়ে জবাব বার করবো?

বিশ্বাস করুন সত্যি মোরা জানিনে, হুজুর।

তোদের বিশ্বাস নেই, তোরা বেইমান বিশ্বাসঘাতক।

হুজুর বাপ মা,—রক্ষা করুন।

হুজুর! হুজুর! ওতে ভুলছি নে। এখন বল হোসেন কোথায়। ওকে মোরা চাই।

সত্যি কথাই বলেছি হুজুর।

তুই বলবি নে, দেখছি!

বীরেন ডাকলো, জোত সিং?

জী!

কোতল কর এই উল্লুকদের।

আপনি ধর্ম্মের বাপ। বাঁচান মোদের।

না, না, ধর্ম্ম-টর্ম্ম নাই!

রক্ষা করুন। পায়ে পড়ি!

আল্লার নাম কর তোমরা।

জোত সিং বললো, আমরা মেয়েদের নিয়ে যাই—বীরেন বাবু?

কোথায় নেবে?

মোদের বাড়ী! সাদী করবো এদের?

বেশ নিয়ে যাও, কিন্তু সাবধান!

অণিমা একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললো, খোদা আপনার মঙ্গল করুন হুজুর। একশ বছর পরমায়ু হোক!

মঙ্গল! হা হা—

চারিদিকে মৃত্যুর আর্ত্তনাদ ভেসে উঠছে!

•

আমেদ আর হোসেন পাশাপাশি গালে হাত দিয়ে বসে আছে। হোসেন স্ত্রী কন্যা ফেলে পালিয়ে এসেছে পাকিস্থানে। এরা পিতা পুত্র।

বৈদ্যনাথে সাতদিন

শ্রীসুধীরকুমার মিত্র

গত দুর্গাপূজার ছুটিতে সুসাহিত্যিক শ্রীযুক্ত চাঁদ মোহন চক্রবর্ত্তী মহোদয়ের আমন্ত্রণে বৈদ্যনাথধামে গিয়াছিলাম; সাথে ছিলেন প্রবীন সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক ডক্টর হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত। ইতিপূর্ব্বে ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে একবার বৈদ্যনাথে গিয়া আমার মাসীমা ও মাসতুতো ভগিনীর সহিত তাহাদের 'ডক্টরস্-লজ' ভবনে প্রায় মাসাধিককাল ছিলাম। সেই সময় আমার মাস্তুতো ভগিনীপতি বাগবাজারের সোম্ বংশোদ্ভূত প্রবোধবিহারী সোম আমায় যে ভাবে আদর আপ্যায়ণ করিয়াছিলেন তাহা আজও আমার স্মরণে আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়—প্রবোধ বাবু, আমার ভগিনী এবং আমার মাসীমা সকলেই অকালে পরলোক গমন করিয়াছেন। সেই জন্য বৈদ্যনাথের পুরাণো স্মৃতি পুনরুদ্দীপ্ত করিয়া মনকে ভারী করিবার বাসনা আমার আর ছিল না। কিন্তু তাহা আর হইল না; চাঁদমোহন বাবুর আমন্ত্রণ ও পরমপূজ্য হেমেন্দ্রবাবুর সনির্ব্বন্ধ আগ্রহ আমাকে আবার বৈদ্যনাথের চরণ দর্শন করাইয়া তবে ছাড়িল। মানুষের নিজের হাতে যে কিছুই নাই, প্রত্যেক মানুষ যে এক অজানিত শক্তির দ্বারা পরিচালিত হইতেছে, তাহা নিজ জীবনে আর একবার উপলব্ধি করিলাম।

তবে এবারে বৈদ্যনাথে গিয়া আমার লাভ ও অভিজ্ঞতা যে অনেক হইয়াছে, তাহা সর্ব্বাগ্রে বলা প্রয়োজন; কারণ বাংলা দেশের দুইজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিকের সান্নিধ্যে সাতদিন একত্র বসবাস আমার পক্ষে শ্লাঘার ও অন্যের নিকট যে ঈর্ষার বিষয়, তাহা নিঃসঙ্কোচে বলা যায়। বৈদ্যনাথে সাধারণতঃ লোকে যায় দুইটি কারণে—প্রথমতঃ পুণ্য-সঞ্চয়ের কামনায়, আর দ্বিতীয়তঃ স্বাস্থ্য লাভের আশায়। কিন্তু আমি বা হেমেন্দ্র-বাবু সেইরূপ কোন আশা করিয়া বৈদ্যনাথে যাই নাই বলিয়া, সেখানে কলিকাতার অবিশ্রাম কলরোলের পরিবর্ত্তে যেরূপ নিভৃত বিশ্রাম-সুখ লাভ করিবার অবকাশ পাইয়াছি, তাহা আমার স্মৃতিপথে বহুদিন জাগিয়া থাকিবে।

নন্দন পাহাড়ের উপর মহাদেবের মন্দির

শুনিলাম হেমেন্দ্র বাবু ইতিপূর্ব্বে পাঁচবার বৈদ্যনাথে গিয়াছেন, সেই জন্য বৈদ্যনাথের যাবতীয় বাড়ি ও প্রতিটি রাস্তা তাহার মুখস্থ। তিনি প্রথম বৈদ্যনাথে যান ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে, তখন আমার জন্মই হয় নাই। তার পর যান ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে, দেওঘর

ষড়যন্ত্র মামলায় পণ্ডিত ধরানাথ ভট্টাচার্য্যের পক্ষে উকিল হিসাবে তাঁহার পক্ষ সমর্থনের উদ্দেশ্যে; তখন তাঁহার সহিত গিয়াছিলেন পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস কমিটির বর্ত্তমান সভাপতি শ্রীযুত অতুল্য ঘোষ। এতদ্ব্যতীত আরো বার তিনেক তিনি বৈদ্যনাথে গিয়াছেন, সেইজন্য আজও বহু ব্যক্তির সহিত তাঁহার পরিচয় রহিয়াছে। তাই এবারে হেমেন্দ্র বাবু সঙ্গে থাকায় আমারও তাঁহার মারফৎ বহু ব্যক্তির সহিত আলাপ পরিচয়ের সুযোগ হয়; কেবল আলাপ বলিলে যথেষ্ট হইবে না, কারণ পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিদের সহিত মেলামেশা করিয়া এমন কতকগুলি জিনিষ আমার মনে রেখাপাত করিয়াছে, যাহা বলিবার জন্যই আমি আজ এই ক্ষুদ্র নিবন্ধের অবতারণা করিয়াছি।

ট্রেন ছাড়িবার কথা সকাল সাড়ে দশটায়; আমরা দশটার মধ্যেই হাওড়া ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম। পূজার ভীড় তখনও একেবারে কমে নাই; সেকেণ্ড ক্লাসের যে কয়খানি টিকিট ছিল, তাহা দূরের যাত্রীরা বহু পূর্ব্বেই কাটিয়া রাখিয়াছে। হেমেন্দ্রবাবু প্রথম শ্রেণীর টিকিট কিনিবার জন্য অগ্রসর হইতেছেন—এমন সময় রেলের এক কর্ম্মচারী আসিয়া আমাদের সেকেণ্ড ক্লাসে 'স্লিপিং কোচের' টিকিট কিনিতে বলিলেন। কারণ পূজার সময় রেলওয়ে কোম্পানী যাত্রীদের সুবিধার জন্য ঝাঁঝা ষ্টেশন পর্য্যন্ত ঐরূপ কয়েকখানি গাড়ি জুড়িয়া দিয়াছিলেন। আমরা পূর্ব্বে এ খবরটা জানিতাম না; তাই রেলের সেই কর্ম্মচারীটিকে ধন্যবাদ জানাইয়া দুইখানি সেকেণ্ড ক্লাসের টিকিট কিনিলাম এবং ঝাঁঝার মধ্যেই আমরা নামিয়া যাইব, সুতরাং কোন অসুবিধা হইবে না ভাবিয়া স্লিপিং কোচে গিয়া বসিলাম।

অল্পক্ষণের মধ্যেই নির্দ্ধারিত সময়ে দিল্লী এক্সপ্রেস্ তাহার গন্তব্যপথে যাত্রা সুরু করিল।

কামরার মধ্যে হেমেন্দ্রবাবুর কয়েকজন পরিচিত লোক দেখা গেল, তন্মধ্যে কলিকাতা কর্পোরেশনের ভূতপূর্ব্ব কাউন্সিলার শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ দালাল, উত্তরপাড়ার রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়ের পৌত্র ও জামাতা এবং হাওড়া মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যান শ্রীযুত শৈলকুমার মুখোপাধ্যায়ের ভ্রাতার নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁহারাও শুনিলাম বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য দেওঘরে বা মধুপুরে যাইতেছেন। ট্রেন ছাড়িবার

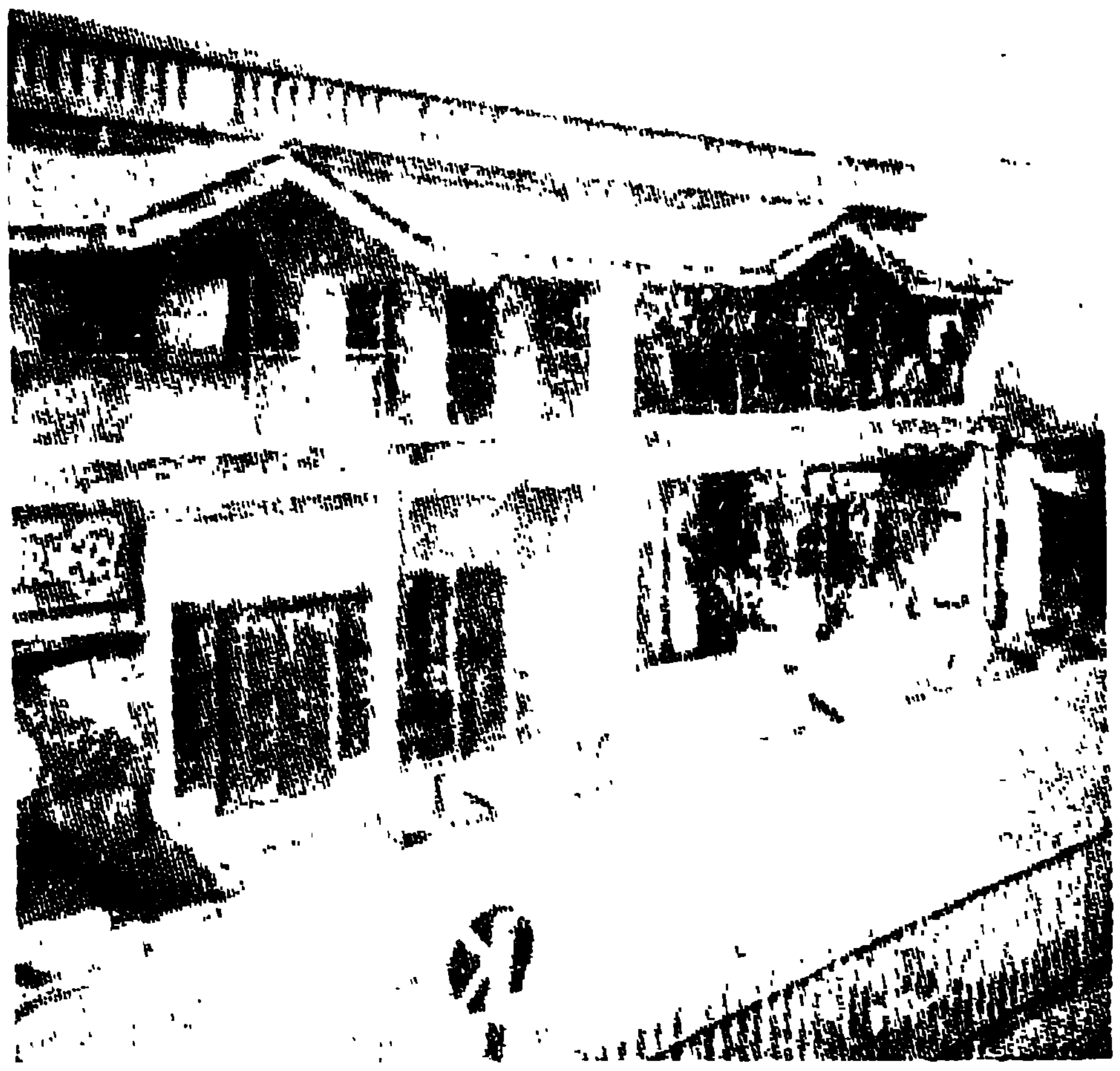

বৈদ্যনাথধাম ষ্টেশনের পার্শ্বে রাস্তার দৃশ্য

অব্যবহিত পরে তাঁহারা হেমেন্দ্রবাবুর সঙ্গে আসিয়া কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিলেন।

হেমেন্দ্রবাবু প্রত্যেকের সহিত আমার পরিচয় করাইয়া দিলেন। সকলেই যেন একটু আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন, মনে হইল যেন—তাঁহারা 'হুগলী জেলার ইতিহাস'-লেখকের বয়স আর একটু বেশী হইবে বলিয়াই আশা করিয়াছিলেন। নরেনবাবু বলিলেন যে, আপনি এই বয়সে এত বড় বিরাট গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, আপনার সহিত আলাপ হওয়ায় ধন্য হইলাম। আমি তাঁহার কথা শুনিয়া চুপ করিয়া রহিলাম।

রাজা প্যারীমোহনের পৌত্রও যথেষ্ট আশ্চর্য্য হইলেন এবং গ্রন্থ রচনা করিতে কত দিন সময় লাগিয়াছে, কেন হুগলী জেলার ইতিহাস রচনা করিলাম, অন্যান্য জেলার ইতিহাস আবার লিখিব কি না—প্রভৃতি নানাবিধ প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। আমি যতদূর সম্ভব সংক্ষেপে তাঁহার প্রশ্নের জবাব দিলাম। পরে তিনি আমাদের

দুইজনকে একদিন তাঁহার উত্তরপাড়ার বাড়িতে যাইবার জন্ত আমন্ত্রন জানাইলেন।

এই সমস্ত প্রারম্ভিক কথাবার্ত্তার পর আরম্ভ হইল রাজনীতির আলোচনা। হেমেন্দ্রবাবু বাঙ্গলা দেশে কংগ্রেসের প্রাচীনতম সেবক, দেশবন্ধুর সহচর এবং এক-সময় কংগ্রেসের নির্দ্দেশে ওকালতি পর্য্যন্ত বর্জ্জন করিয়াছিলেন। আজও তিনি মোটা খদ্দর ছাড়া অন্ত কোন বস্ত্র পরেন না; সুতরাং তাঁহাকে সম্মুখে পাইয়া কংগ্রেস সরকারের বর্ত্তমান নীতি লইয়া যদি কেহ আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়, তাহাতে আর আশ্চর্য্য হইবার কি আছে? যদিও তিনি সরকারের ভিতরের খবর কোন কিছুই জানেন না এবং বর্ত্তমান কংগ্রেস পরিচালকবৃন্দের সহিতও যুক্ত নন, তথাপি তাঁহাকে যাঁহারা পূর্ব্ব হইতে জানেন, তাঁহারা ছাড়িবেন কেন?

চলন্ত ট্রেণের কামরার মধ্যে আলোচনা খুব জোর চলিতে লাগিল, হেমেন্দ্র বাবু কংগ্রেসের ইতিহাস লিখিয়াছেন, সুতরাং কংগ্রেসের বর্ত্তমান কর্ম্মধারা জনসাধারণ যে কেন পছন্দ করিতেছে না, তাহা তিনি উদাহরণ দিয়া বুঝাইতে লাগিলেন; গাড়ীখানি একটি ক্ষুদ্র সভাক্ষেত্রে পরিণত হল। গাড়ীতে যত নরনারী ছিল, সকলেই তাঁহার বক্তৃতা শুনিতে লাগিল। গাড়ীতে তিনজন পাঞ্জাবী ভদ্রলোক ছিলেন,তাঁহারাও কংগ্রেসকে গালাগালি দিতে সুরু করিলেন। দেখিলাম যে, পাঞ্জাবীদের রাগও বাঙ্গালীদের চেয়ে বড় কম নয়।

আলোচনা কোথা হইতে যে কোথায় চলিল—তাহা আজ আর ঠিক স্মরণ নাই। কাশ্মীর, হিন্দু মুসলমানের প্রশ্ন, হায়দ্রাবাদ, বাস্তুহারাদের কথা, চোরা কারবার, বর্ত্তমান কংগ্রেসীদের অসাধুতা,ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষ, ডাঃ বিধান রায়, সুরেন ঘোষ, প্রফুল্ল সেন প্রভৃতি যে কত রকমের আলোচনা চলিতে লাগিল—তার বিস্তারিত বিবরণ দিয়া আর পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটাইব না, তবে মোট কথা, কেহই যে বর্ত্তমান সরকারের প্রতি সন্তুষ্ট নন, তাহাই বুঝিলাম।

আমিও মধ্যে মধ্যে আলোচনায় যোগ দিলাম, কিন্তু প্রত্যেকের প্রতিপাদ্য বিষয় যে সরকারের প্রতি বিরাগ, তাহা অনুরাগে পরিণত করাইতে কোন রকমেই সমর্থ হইলাম না। মনে মনে ভাবিলাম যে, রাষ্ট্রের কর্ণধারগণ যদি জনসাধারণের সহিত সংযোগ সাধন করিয়া চলিতেন তাহা হইলে দেশের অবস্থা বোধ হয় এইরূপ হইত না।

হেমেন্দ্র বাবু কংগ্রেস কর্ম্মিগণকে মহাত্মা গান্ধীর নির্দ্দেশমত সেবা ও গঠনমূলক কার্য্যের ভার লইলে দেশের মঙ্গল হইবে বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিলেন। কিন্তু অর্থই যে হইয়াছে অনর্থের মূল—সেই গৌরী সেনের অর্থ আধা অর্দ্ধশিক্ষিত ও মূর্খ কংগ্রেসীদের হাতে যখন পড়িয়াছে, তখন তাহা ছাড়িয়া ত্রৈলক্য চক্রবর্ত্তীর মত মহাত্মাজীর নির্দ্দেশ মত জন-সেবা করিতে অগ্রসর হইবে এইরূপ বোকা নির্লোভী কংগ্রেস-সেবক আজ আর কেহ আছেন কি? স্বার্থ দুষ্ট, আত্মীয় পোষণকারী, চোরা-কারবারী কংগ্রেসীগণকে দেশের লোক এখন কি ভাবে দেখেন তাহা চিন্তা করিলে দুঃখ হয়।

আলোচনা ও তর্ক-বিতর্কের মধ্যে চার ঘণ্টা যে কোথা দিয়া চলিয়া গেল, তাহা বুঝিতে পারিলাম না; গাড়ী মিহিজামে আসিয়া দাঁড়াইল। মিহিজামের নাম সম্প্রতি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের নামানুসারে "চিত্তরঞ্জন" হইয়াছে। এইস্থানে রেলওয়ে ইঞ্জিন নির্ম্মাণের কারখানা নির্ম্মিত হইতেছে এবং দুই তিন বৎসরের মধ্যে কারখানার নির্ম্মাণ কার্য্য সমাপ্ত হইলে ইহা এশিয়ার বৃহত্তম কার-খানায় পরিণত হইবে। ভারতের সভাপতি ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ এই স্থানের নাম চিত্তরঞ্জন ও কারখানার নাম "চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কস্" বলিয়া ঠিক করিয়া দিয়াছেন। এই কারখানায় নির্ম্মিত প্রথম ইঞ্জিন-খানির নাম হইয়াছে "দেশবন্ধু" এবং দেশবন্ধুর সহধর্ম্মিণী শ্রীযুক্তা বাসন্তী দেবী উক্ত ইঞ্জিনের নামকরণ করেন। হেমেন্দ্রবাবু দেশবন্ধুর বিশেষ ভক্ত, সেইজন্ত তিনি জাতীয় সরকারের এই কার্য্যটি দেখিয়া বিশেষ প্রীত হইলেন এবং দেশবন্ধুর রাজনীতি যে কি তাহা লইয়া আবার আলোচনা সুরু করিলেন। দেশবন্ধুর দান, তাঁহার দেশবাসীর প্রতি দরদ প্রভৃতি বিষয় লইয়া হেমেন্দ্র বাবু এরূপ সুন্দর গল্প আরম্ভ করিলেন যে, গাড়ীর

যাত্রীগণ তাঁহার কথা শুনিতে শুনিতে মুগ্ধ হইয়া গেল। বেলা সাড়ে তিনটার সময় ট্রেন যশিডি ষ্টেশনে আসিয়া পৌছিল; আমরা সকলে অবতরণ করিলাম—যাত্রার প্রথম পর্ব্ব এইখানে শেষ হইল।

দুই

যশিডি ষ্টেশন হইতে একখানি মোটরে করিয়া আমরা চাঁদমোহনবাবুর বাড়ী রওনা হইলাম; ষ্টেশন হইতে তিন মাইলের মধ্যে রোহিণী রোডে 'এসিয়াটিক্ হাউসে' তিনি অবস্থান করিতেছেন, সুতরাং মিনিট পনেরোর মধ্যেই আমরা তাঁহার বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইলাম। এসিয়াটিক-হাউস বৈদ্যনাথের একখানি প্রসিদ্ধ বাড়ী; প্রায় পঞ্চাশ বিঘা জমির উপর এই সুরম্য ভবনটি অবস্থিত, পার্শ্বে আর একখানি ছোট বাংলো আছে—চারিদিকে ফুলের বাগান বাড়ীর পরিবেশকে আরো মনোরম করিয়া তুলিয়াছে।

আমাদের দেখিয়া চাঁদমোহন বাবু আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন এবং আমাদের সাদর অভ্যর্থনা জানাইলেন। বাংলোর সম্মুখে চেয়ার পাতা ছিল—আমরা বসিলাম; তিনি চাকরকে ইঙ্গিত করিলেন—চাকর আমাদের মুখ ধুইবার জন্য জল আনিয়া দিল। তারপর আসিল দুইখানি প্লেটে দুইজনের জলখাবার ও চা।

এসিয়াটিক হাউসের পাশেই 'বড়াল বাংলো'। এই বাড়ীতে এখন পাবনা সৎসঙ্গের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীঅনুকূলচন্দ্র ঠাকুর ও তাঁহার শিষ্যবর্গ অবস্থান করেন। চাঁদমোহনবাবু তাঁহাদের কথা বিস্তারিত ভাবে আমাদের বলিতে লাগিলেন, আমিও মন্ত্রমুগ্ধের মত সমস্ত শুনিতে লাগিলাম। পূর্ব্ববর্ত্তী বারে তিনি একবার আশ্রমে গিয়াছিলেন, এবারেও তাঁহার শিষ্যগণ চাঁদমোহনবাবুকে আশ্রমে যাইবার জন্য বিশেষরূপে আহ্বান জানাইয়াছেন, কিন্তু তাঁহার কথার ভাবে বুঝিলাম যে, এবারে আর তিনি আশ্রমে যাইবেন না।

সেই সময় সৎসঙ্গের "ঋত্বিক সম্মেলন" হইতেছিল; তাই পাঁচটার সময় সৎসঙ্গের অগণিত ভক্ত তথায় উপস্থিত হইলেন। জনবিরল রোহিণী রোড নরনারীর কল্লোলে মুখরিত হইয়া উঠিল।

ইতিমধ্যে সৎসঙ্গের একজন ডাক্তার আসিয়া চাঁদমোহন বাবুর বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। তিনি চাঁদমোহনবাবুর একটি ছোট কন্যাকে চিকিৎসা করিতে আসিয়াছেন শুনিলাম; তিনি আসিতেই আমাদের সৎসঙ্গ প্রসঙ্গ বন্ধ হইয়া গেল, কারণ 'মা ব্রূয়াৎ সত্যম্ অপ্রিয়ম' এই নীতি-কথা আমাদের মানা উচিৎ বলিয়া মনে করিলাম।

ডাক্তারবাবুর সহিত চাঁদমোহন বাবু আমাদের পরিচয় করাইয়া দিলেন; তিনিও অনুকূলবাবুর আশ্রমে যাইবার জন্য আমাদের নিমন্ত্রণ করিলেন। হেমেন্দ্রবাবু পূর্ব্ব হইতেই অনুকূলবাবুকে জানিতেন, কারণ তিনি যখন দেশবন্ধুর সেক্রেটারী ছিলেন, তখন তাঁহার চেষ্টায় আশ্রমের কর্ম্মিগণ দেশবন্ধুকে পাবনায় 'সৎসঙ্গ' দেখিতে লইয়া যান। সে ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের কথা। তারপর দেশবন্ধু মৃত্যুর পূর্ব্বে আর একবার দার্জ্জিলিং যাইবার পথে পাবনায় সৎসঙ্গের আশ্রমে গিয়াছিলেন শুনিলাম।

ডাক্তারবাবু ঔষধপত্র দিয়া চলিয়া গেলেন। আমি চাঁদমোহনবাবুকে বেড়াইতে যাইবার জন্য বলিলাম। তিনি বলিলেন, আজ আপনারা ক্লান্ত, আজ আর বিশেষ বেড়াইবেন না। সন্ধ্যার পর বাড়ীর সাম্‌নেই সকলে একটু বেড়াইব। তখনও সন্ধ্যা হইতে কিছু দেরী ছিল—আমি বলিলাম, তবে চলুন না একটু সাধু দর্শন করিয়া আসি। আপনার বাড়ীর পাশে এত বড় এক সাধু যখন রহিয়াছেন, তখন একবার দর্শন করা উচিৎ। হেমেন্দ্রবাবু রাজী হইলেন, কারণ সাধু তাঁহার পরিচিত; কিন্তু চাঁদমোহনবাবু যাইতে রাজী হইলেন না। তিনি বলিলেন, আপনারা দর্শন করিয়া আসুন—আমি আপনাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছি; আপনারা ফিরিয়া আসিলে আমরা সকলে একসঙ্গে বেড়াইতে যাইব।

চাঁদমোহনবাবুর কথামতই কাজ করা হইল; আমি ও হেমেন্দ্রবাবু "বড়াল বাংলো" অভিমুখে গেলাম। বাংলোর সম্মুখে নরনারীর ভীড় জমিয়াছে—আমরা ভীড় ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলাম। সভাস্থলে প্রায় সহস্রাধিক ব্যক্তি ও বহু নারী সমবেত হইয়াছেন। শ্রীঅনুকূলচন্দ্র যে স্থানে বসিয়া আছেন তাহার তিন দিকে বেড়া দিয়া ঘেরা; বেড়ার চতুর্দ্দিকে অগণিত নরনারী দূর হইতে তাঁহাকে

দর্শন করিতেছেন। আমরা বেড়ার মধ্যে প্রবেশ করিতে যাবো, এমন সময় এক ভদ্রলোক আসিয়া ভিতরে যাইতে আমাদের নিষেধ করিলেন। আমি তাঁহাকে বলিলাম, 'আপনি ভিতরে গিয়ে দয়া ক'রে অনুকূলবাবুকে বলুন যে, কলকাতা থেকে ডাঃ হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছেন।'

ভদ্রলোক ভিতরে গিয়া বলিবা মাত্র তিনি আসিয়া তাঁহাকে ভিতরে নিয়া গেলেন; হেমেন্দ্রবাবু আমাকে ভিতরে যাইবার জন্য বলিলেন, কিন্তু বেষ্টনীর মধ্যে প্রবেশ করিতে হইলে জুতা খুলিয়া যাইতে হয় দেখিয়া আমার ভিতরে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা হইল না, কারণ, পূজার সময় আমার একজোড়া নূতন জুতা সার্ব্বজনীন দুর্গোৎসবে চুরি গিয়াছিল। তা ছাড়া পোষাকটাও সেই সময় দেশী ছিল না—তাই আমার আর সেদিন সাধুসঙ্গ করা হইল না। আমি কেবল ভীড় দেখিতে লাগিলাম।

দেখিলাম ভীড়ের মধ্যে একটি সাহেব কি পুস্তক বিক্রয় করিতেছে। তাঁহার সহিত আলাপ করিবার ইচ্ছা হইল; তাহার কাছে যাইয়া 'গুড ইভনিং' বলিয়া আলাপ সুরু করিয়া দিলাম।

সাহেবটির নাম মিঃ স্পেন্সার (Mr. Spencer), আমেরিকান—তিনিও সৎসঙ্গের সভ্য এবং শ্রীঅনুকূলচন্দ্রের শিষ্য হইয়াছেন। এই কথা তাহার নিকট হইতে শুনিয়া বড় আশ্চর্য্য হইলাম। মিঃ স্পেন্সারের বয়স ত্রিশের মধ্যে হইবে; পূর্ব্বে তিনি সামরিক বিভাগে ছিলেন। গত যুদ্ধের সময় ভারতবর্ষে আসিয়াছেন, পরে এক বাঙ্গালী ভদ্রলোকের সহিত তাহার আলাপ হয় এবং তিনিই সৎসঙ্গে তাহাকে লইয়া আসেন। যুদ্ধ শেষ হইলে তিনি আর আমেরিকায় ফিরিয়া যান নাই—আশ্রমেই রহিয়া গিয়াছেন। কারণ আশ্রমের আদর্শ তাঁহার ভাল লাগে।

সাহেবের কথাবার্ত্তা শুনিয়া আমার তাঁহাকে খুব ভাল লাগিয়াছিল; সেইজন্য তাঁহাকে বহু প্রশ্ন করিলাম, তিনিও হাসিমুখে আমার সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে লাগিলেন। তাঁহার কথাবার্ত্তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এইরূপ:

তিনি তাহার পিতামাতার একমাত্র সন্তান, আমেরিকার একটি বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম.এ পাশ করেন; পরে তিনি বিবাহ করেন। পিতার অর্থও যথেষ্ট আছে। কয়েকমাস পূর্ব্বে তাঁহার স্ত্রী তাহাকে লইয়া যাইবার জন্য দেওঘরে আসিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি আর তাহার স্ত্রীর সহিত যান নাই। বরং তিনি তাহার স্ত্রীকেও আশ্রমে থাকিবার জন্য অনুরোধ করেন, কিন্তু তাহার স্ত্রী আশ্রমে থাকিতে রাজী হন নাই।

মিসেস স্পেন্সার শ্রীঅনুকূলচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার স্বামীকে সৎসঙ্গ আশ্রম হইতে ছাড়িয়া দিতে বলেন; তদুত্তরে তিনি বলেন যে, ইচ্ছা করিলে তিনি তাহার স্বামীকে লইয়া যাইতে পারেন—তিনি তাহার স্বামীকে আটক করিয়া রাখেন নাই। এইভাবে তাহাদের মধ্যে বহু তর্কবিতর্ক হয়; কিন্তু দুঃখের বিষয় তিনি তাহার স্বামীকে লইয়া যাইতে পারেন নাই। অতঃপর তিনি দেওঘর হইতে রাগ করিয়া চলিয়া যান।

ভারতীয় নারী ও আমেরিকান নারীদের মধ্যে কি পার্থক্য তিনি দেখিতেছেন—এই সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে সাহেব বলিলেন যে,ভারতীয় নারী স্নেহ, দয়া, মায়া প্রভৃতি সদগুনে ভূষিতা, কিন্তু তাহাদের দেশের নারীদের এই সমস্ত গুণগুলি আজকাল কুশিক্ষার জন্য একপ্রকার চলিয়া গিয়াছে। সুতরাং ভারতীয় মহিলারা এখনও ঐ পাশ্চাত্য শিক্ষা পান নাই বলিয়া ভাল আছেন, ভারতীয়দের ঘর এখনও ঠিক আছে, কিন্তু তাহাদের ঘরগুলি তত্রস্থ নারীগণ ভাঙ্গিয়া দিতেছেন। ইহার ফল ভবিষ্যতে খুবই খারাপ হইবে বলিয়া তিনি বিশ্বাস করেন—তাই তিনি ভারতীয় শিক্ষা ও তাহার ধারা জানিবার জন্য এই স্থানে অবস্থান করিতেছেন। সাহেবের কথাবার্ত্তায় তাঁহার প্রতি আমার শ্রদ্ধা হইল। এমন সময় একটি কাঁচের গ্লাসে এক কাপ চা একজন তাঁহাকে দিয়া গেল; তিনি আমার জন্য আর এক গ্লাস চা আনিতে বলিলেন। চা খাইতেছি, এমন সময় হেমেন্দ্র বাবু আসিলেন, উভয়ে তখন সাহেবের নিকট হইতে বিদায় গ্রহন করিলাম।

বাড়ি ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম যে চাঁদমোহন বাবু আমাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। হেমেন্দ্র বাবু

অনুকূল বাবুর সহিত তাঁহার যে সমস্ত কথাবার্ত্তা হইয়াছে তাহা বলিলেন। উক্ত কথাবার্ত্তার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম—অনুকূল বাবুর শরীর এখন খুব ভাল নয়—তিনি রক্তের চাপে মধ্যে মধ্যে ভীষন কষ্ট পান। দেওঘরের জল বায়ু তাঁহার খুব ভাল লাগিতেছেনা, সেইজন্য তিনি অন্যত্র যাইবার চেষ্টা করিতেছেন। পাবনা সৎসঙ্গের প্রায় দুই কোটি টাকার সম্পত্তি পাকিস্থানে পড়িয়া রহিয়াছে—বহু পত্র দিয়া উহার কোন ব্যবস্থা তাহারা করিতে পারিতেছেনা, প্রভৃতি। পরিশেষে যে কয়দিন হেমেন্দ্রবাবু দেওঘরে থাকিবেন, যেন মধ্যে মধ্যে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন—এইরূপ অনুরোধ তিনি করিয়াছেন।

আমার সাধু দর্শন হয় নাই শুনিয়া চাঁদমোহন বাবু বলিলেন যে, আপনার অদৃষ্ট মন্দ। তাঁহার কথা শুনিয়া আমি হাসিতে লাগিলাম। চাঁদমোহন বাবুর কন্যা কমলা চা ও খাবার লইয়া আসিল। আবার জলযোগ হইল।

চাঁদমোহন বাবুর মা ও দিদি আসিলেন; আমি তাঁহাদের প্রণাম করিলাম। মায়ের বয়স সত্তুরের কাছাকাছি হইবে বলিয়া মনে হইল; প্রশান্ত মুখ, পুষ্পের ন্যায় হাস্যময়ী। তাঁহাকে দেখিয়া প্রথম দৃষ্টিতেই শ্রদ্ধায় মাথা নুইয়া গেল, বুঝিলাম—চাঁদমোহন বাবুর মধ্যে যে সমস্ত সদ্‌গুণের প্রকাশ প্রত্যক্ষ করি, তাহা তাঁহার দৃঢ়চেতা আদর্শ মাতার শিক্ষার গুণেই সম্ভব হইয়াছে। চাঁদমোহন বাবুর কনিষ্ঠ পুত্র কেষ্ট আসিল, সে ক্লাস সিক্স এ পড়ে; তাহার সহিত হেমেন্দ্র বাবু আলাপ জুড়িয়া দিলেন।

রাত্রি হইয়া গেল বলিয়া সেদিন আর বেড়ান হইল না। যতগুলি সংবাদপত্রের পূজা সংখ্যা বাহির হইয়াছে, সবগুলিই বাড়িতে রহিয়াছে। কেষ্ট বইগুলি আনিয়া দিল, আমি তাহার পাতা উল্টাইতে লাগিলাম। এদিকে হেমেন্দ্র বাবু ও চাঁদমোহন বাবু দুই উকিলে বসিয়া পৃথিবীর বিশেষ বিশেষ ঘটনাগুলির সমালোচনা করিতে লাগিলেন।

রাত্রি দশটার সময় খাওয়ার ডাক পড়িল; ভিতরে গেলাম ও সেখানে রান্নার বহর দেখিয়া স্তম্ভিত হইলাম। ভাত, ডাল, আট দশ রকমের তরকারী, দু-তিন রকমের মাছ, মাংস, দই, সন্দেশ প্রভৃতি। পাশে মা বসিয়া

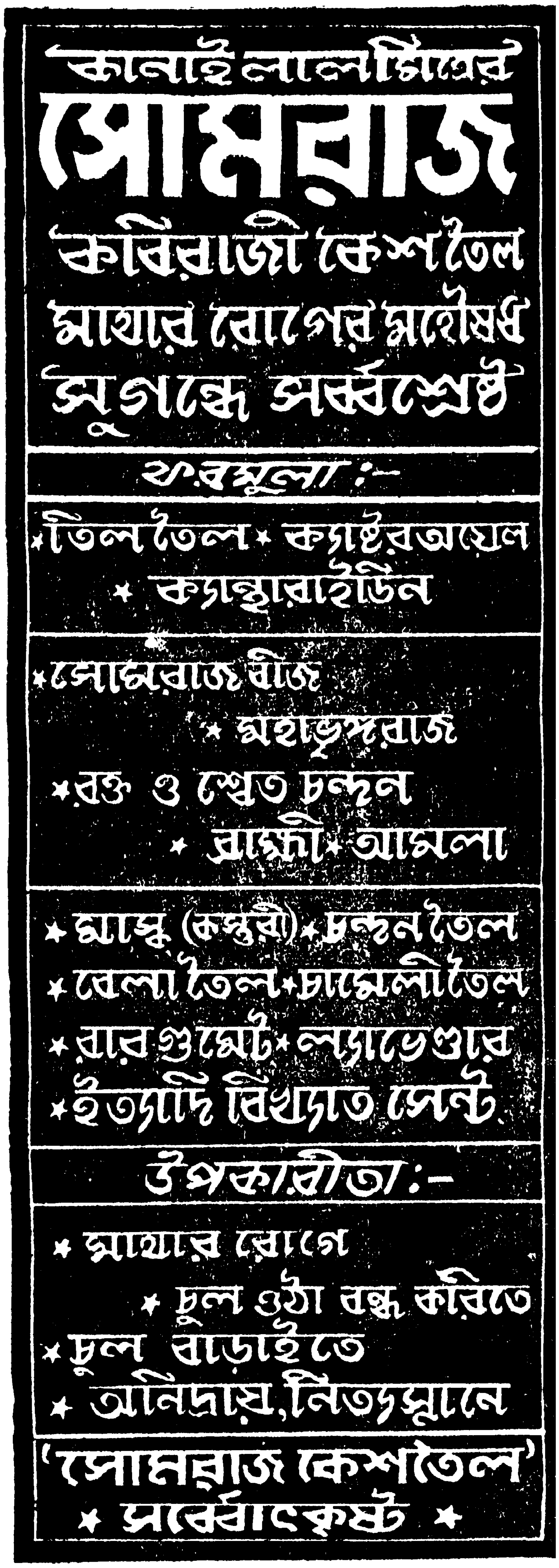

আছেন আমাদের খাওয়াইবার জন্য। এত রাত্রি অবধি বৃদ্ধা মহিলা আমাদের জন্য বসিয়া আছেন দেখিয়া, বিশেষ করিয়া তিনি সেই সময় সামান্য অসুস্থ ছিলেন, তাই আমরা একটু লজ্জিত হইলাম। হেমেন্দ্র বাবু মাকে শুইয়া পড়িতে অনুরোধ করিলেন; কিন্তু তিনি হাসিয়া আমাদের খাওয়া না হইলে শুইবেন না --ইহা জানাইলেন। আমরা তিনজনে খাইতে আরম্ভ করিলাম এবং যতদূর সম্ভব খুব তৃপ্তি সহকারে খাইলাম। কিছু কিছু ভোজ্য বস্ত পাতে পড়িয়া রহিল দেখিয়া মা জিজ্ঞাসা করিলেন যে রান্না বোধ হয় ভাল হয় নাই, তাই সব পড়িয়া রহিল? আমি ও হেমেন্দ্রবাবু অপ্রস্তত হইলাম; হেমেন্দ্রবাবু বলিলেন যে, তিনি বৃদ্ধ হইয়াছেন, রাত্রে ইহার বেশী খাইলে অসুস্থ হইবেন। আর আমি সাধারনতঃ যাহা খাই ঐ দিন তাহার দেড়গুণ বোধহয় খাইয়াছিলাম, কারণ রান্না এত উচ্চাঙ্গের হইয়াছিল যে ঐরূপ রান্না ও অত বিভিন্ন পদ আমি সচরাচর খাই নাই বলিলেও চলে। আমি মাকে সবিনয়ে জানাইলাম যে, রান্না খুবই ভাল হইয়াছে—কিন্তু যাহা খাইয়াছি তাহার চেয়ে বেশী এক দিনে খাওয়া কি করিয়া সম্ভব? তিনি তাহার উত্তরে জানাইলেন যে, পাতে কিছু পড়িয়া থাকিলে তিনি মনে করেন যে রান্না নিশ্চয় খারাপ হইয়াছে। আমি ও হেমেন্দ্রবাবু উভয়েই তাঁহার কথার প্রতিবাদ জানাইলাম। আমি বলিলাম, কাল হইতে খাবার কিছু কম করিয়া দিবেন—তাহা হইলেই সমস্ত খাইব; দেখিবেন পাতে আর কিছু থাকিবে না।—তিনি আমার কথা শুনিয়া হাসিতে লাগিলেন।

খাওয়া শেষ হইল। এইরূপ ভূরিভোজন কদাচিৎ হইয়াছে; এইবার গা এলাইয়া দিয়া শুইতে ইচ্ছা হইল। চাঁদমোহনবাবুর মেজমেয়ে বিমলা পান আনিয়া দিল। চাঁদমোহন বাবুর এই মেয়ে দুইটির (কমলা ও বিমলা) বিবাহ হইয়া গিয়াছে; কমলার একটি ছেলে হইয়াছে—নাম অঞ্জন। হেমেন্দ্রবাবুর হাবভাব দেখিয়া মনে হইল যে তিনি বোধ হয় আবার গল্প সুরু করিবেন। মনে হইল এইবার বিশ্রামের কথা একবার বলি, কিন্তু ভাবিলাম—দেখি কতক্ষণ আর তিনি গল্প করেন? খুব বেশী আর গল্প হইল না, কারণ চাঁদমোহন বাবু নিজেই বলিলেন যে, রাত অনেক হইয়াছে—আপনারা শুইয়া পড়ুন—বিশেষ করিয়া আজ আপনারা ক্লান্ত। হেমেন্দ্র বাবু বলিলেন, না না ক্লান্ত বিশেষ নয়। আমি হেমেন্দ্র বাবুর রকম দেখিয়া ভড়কাইয়া গেলাম। এ কি ব্যাপার! তাহার বয়স প্রায় ৭৩ বৎসর, এখনও তিনি ঠিক আছেন; বলেন আমি ক্লান্ত নই। মনে মনে প্রমাদ গুনিলাম এবং ভাবিলাম—এবারে আর নিস্তার নাই।

চাঁদমোহনবাবু একপ্রকার ঠেলিয়া হেমেন্দ্রবাবুকে তুলিয়া দিলেন; আমরা উভয়ে পাশের একখানি বাড়িতে শুইতে গেলাম। বিছানা পাতাই ছিল; হেমেন্দ্রবাবু আরো গল্প করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন—কিন্তু আমি আর তাঁহাকে কথা বাড়াইতে দিলাম না। কয়েক মিনিটের মধ্যেই গভীর নিদ্রায় মগ্ন হইয়া গেলাম।

[ক্রমশঃ

পরিচয়

শ্রীচারুচন্দ্র সেন

কলিকাতার কোনো এক খ্যাতনামা কলেজের লেডি প্রিন্সিপাল মিস্ ব্যানার্জ্জি সেদিন যখন কাজ হইতে গৃহে ফিরিতেছিলেন, তখন বেলা অনুমান সাড়ে চারিটা হইবে—ডিসেম্বর মাস—, দিনের আলো নিভিয়া আসিতেছিলো। প্রতিদিনের ন্যায় তাহার সঙ্গে ছিলো সেণ্ট্‌জেভিয়ার্স কলেজের শিশুদের পরিচ্ছদে ভূষিত ছয় বছরের ছেলেটি। মাসিক ভাড়া চুক্তি করা রিক্সা, তাই মিস্ ব্যানার্জ্জি আর ভাড়া চুকাইতে রাস্তায় দেরী করিলেন না, নামিয়া ছেলেটির হাত ধরিয়া বাড়ীতে প্রবেশ করিলেন।—ভৃত্য আসিয়া ছেলেটির কাঁধ হইতে বই খাতার হ্যাভারস্যাকটি সরাইয়া নিল।

সন্ধ্যার পর ছেলেটি দৌড়াইয়া ঘরে প্রবেশ করিয়াই মিস্ ব্যানার্জ্জিকে বলিলো—"হ্যাঁ মা, স্কুলে সব ছেলেরা বলে যে তাদের বাবা তাদের কত কি দেয়, কত আদর করে,—আচ্ছা মা আমার বাবাকে ত' দেখিনি।—কই, তিনি ত' কোনও দিনই আমাকে আদর করেন নি। মা, আমার বাবা কোথায়?" মিস্ ব্যানার্জ্জি ছেলেটির গাল টিপিয়া স্নেহভরে বলিলেন—"তোমার বাবা? তিনি যে তাঁর সবকিছু আমার কাছে দিয়ে চলে গে'ছেন। হ্যাঁ বাবা—, আমি তোমায় বড় স্নেহ করি, কত ভালো বাসি।— আচ্ছা, ওদের বাবারা ওদের কি কি দেয়, জেনে এসো, দেখবে আমি তোমাকে তার চেয়ে অনেক বেশী দিই।" বলিয়া শিশুটিকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া বার-বার চুম্বন করিলেন। শিশু সব ভুলিয়া বলিলো—"মা গো, মাষ্টার মশাইকে translation-এর খাতাটা দিয়েই আমি ছুটে এলাম তোমার কাছে।—" শিশু চলিয়া গেলো।—মিস্ ব্যানার্জ্জির বুক হইতে হুস্ করিয়া একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস বাহির হইয়া পড়িল, তিনি চাপিতে একটুও চেষ্টা করিলেন না।

দুই

১৯৪৬ সালের ১১ই আগষ্ট কলেজ হইতে ফেরার সময় সন্ধ্যার প্রাক্কালে মিস্ ব্যানার্জ্জি দুই বৎসরের একটি শিশুকে রাস্তা হইতে কুড়াইয়া গৃহে আনিয়াছিলেন।—সেই শিশুই আজ ছয় বছরের বালক, এবং সেণ্টজেভিয়ার্স কলেজ-স্কুলের ছাত্র।—মিস্ ব্যানার্জ্জির বুভুক্ষ হৃদয়ে এই শিশুই প্রথম মাতৃত্বের স্বাদ আনিয়াছে।— তাঁহার জনহীন গৃহে অজ্ঞাতকুলশীল এই শিশুই গৃহের আলো এবং তাহাকে ঘিরিয়াই মিস্ ব্যানার্জ্জির বৈচিত্র্যহীন জীবনে এখন সব কিছু গড়িয়া উঠিতেছে—নিরুদ্দেশের সংবাদ অথবা শিশুদের হারাইয়া যাইবার সংবাদ যখন রেডিওতে ঘোষিত হয় তখন মিস্ ব্যানার্জ্জি রেডিয়ো বন্ধ করিয়া দেন।—

আতঙ্ক এবং ভয়, যদিবা শিশুর পিতা মাতা এতদিন পর সংবাদ পাইয়া আসিয়া শিশুটিকে দাবী করে।—তিনি শিশুটির নাম রাখিয়াছেন "আনন্দ", এবং স্কুলে সবাই ডাকে "এ ব্যানার্জ্জি।—" মহাভারতের কর্ণও জানিত যে সে রাধার নন্দন, কিন্তু আনন্দকে তাহার বাবার নাম জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিত—"সে কি? আমি মিস্ ব্যানার্জ্জির ছেলে—, আমার মা কলেজের প্রিন্সিপাল, তা জানিস্!" ইহার বেশী পরিচয় সে জানিত না, আর কাহাকে পরিচয় দিতেও পারিত না।—

তিন

কয়েকদিন পর আবার একদিন রবিবার দুপুর বেলায় হাতের লেখা এবং অঙ্ক শেষ করিয়া আনন্দ আসিয়া তাহার মাকে বলিল—"মা, ছেলেরা বলে যে তাদের বাবা তাদের নিয়ে চিড়িয়াখানায় বেড়াতে যান, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল দেখিয়ে আনেন, কিন্তু কৈ, আমার বাবা ত' আমাকে কোন দিনই কিছু দেখাতে নিয়ে যান না।—"

মিস্ ব্যানার্জি উত্তর করিলেন—"আমিই ত' তোমায় সব দেখিয়ে নিয়ে আসি।—আচ্ছা, আমি আর একদিন তোমায় চিড়িয়াখানায় নিয়ে যাবো।" বালক উত্তর করিল—"তুমি ত আমায় সবই দেখিয়ে আনো, এই সেদিন ত' কত দেখিয়ে নিয়ে এলে, কিন্তু আমার বাবা কেন এ সব করেন না?" মিস্ ব্যানার্জি ছেলের মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন—"তোমার বাবা যে স্বর্গে গেছেন।" শিশু আনন্দের সহিত এবার বলিলো—"স্বর্গে ত ভগবান আছেন, তুমি যে আমাকে বলেছো! আমি ভগবানকে চিঠি লিখে দেবো, তিনি যেন আমার বাবাকে পাঠিয়ে দেন্।" মিস্ ব্যানার্জি এবার হাসিয়া উত্তর করিলেন—"বেশ, তাই দিয়ো।" কয়েকদিন পরে একখানা চিঠি ডেড লেটার আপিস্ হইতে বিলি না হইয়া ফেরত আসিলো—, আনন্দ লিখিয়াছিলো স্বর্গে ভগবানকে, তাহার বাবাকে যেন শীঘ্র পাঠাইয়া দেওয়া হয়।—চিঠিখানা মিস্ ব্যানার্জির হাতে পড়িতেই তিনি পড়িয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন।

কয়েক দিন পর আনন্দ বলিলো—"মা, ভগবান ত' বাবাকে পাঠালেন না, আমার চিঠির উত্তরও দিলেন না।" মিস্ ব্যানার্জি কহিলেন, "ভগবানের অনেক কাজ কিনা, তাই সময় করে উঠতে পারেন্‌নি।"

চার

যুগান্তর পত্রিকায় একখানা বিজ্ঞাপন পড়িয়া মিস্ ব্যানার্জি একটু ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। উহাতে লেখা ছিলো—"১৯৪৬ সালের ১৭ই আগষ্ট তারিখে আমার অনুপস্থিতিতে আমাদের বেক্‌বাগান রোডের বাড়ী লুট হয়। আমার স্ত্রী এবং ভ্রাতা গুরুতররূপে আহত হন্, এবং পরে হাসপাতালে মারা যান। আমার একটি দুই বৎসরের শিশু ছেলেকে মুসলমান আয়া লইয়া যায়, এবং পরে সংবাদ নিয়া জানিয়াছি যে, সে তাহাকে গুণ্ডাদের ভয়ে ফুটপাথের উপর ঘুম পাড়াইয়া ফেলিয়া আসে। প্রতি বৎসর এই ১৭ই আগষ্ট আমি যুগান্তরে বিজ্ঞাপন দিয়া আসিতেছি। জানি না সেই শিশু জীবিত আছে কিনা, এবং কে তাহাকে কুড়াইয়া নিয়া আশ্রয় দিয়াছেন। যে কেহ এই বিষয়ে আমাকে সংবাদ দিলে চির কৃতজ্ঞ থাকিব এবং আমার শক্তি অনুযায়ী অর্থ প্রদান করিব। শিশুটির বয়স এখন ছয় বৎসর হইবে। দেখিতে তখন সুদর্শন ছিলো এবং বাঁ কানের নীচে একটি অপারেশনের এক ইঞ্চি চওড়া দাগ ছিলো। ইতি—শ্রীবিমলচন্দ্র রায়, ১১ রাণীভবাণী ষ্ট্রীট, টালিগঞ্জ পোঃ।"

মিস্ ব্যানার্জি তখনই আনন্দকে কাছে ডাকিয়া দেখিলেন, তাহার বাঁ কানের নীচে সেই অপারেশনের দাগটি।—বুকটা তাঁহার দুরু দুরু করিয়া কাঁপিয়া উঠিলো, তিনি শিশুকে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন। কেবলই মনে হইতে লাগিলো, হয়ত বা প্রাতেই দেখিবেন, কোনো রকমে সংবাদ পাইয়া বিজ্ঞাপনদাতা বিমল রায় আসিয়া তাহার ছেলের দাবী জানাইতেছে—বিশেষ পাড়ার লোকে জানিত যে, আনন্দকে তিনি দাঙ্গার সময় কুড়াইয়া পাইয়াছিলেন। আইন আদালতে প্রমাণ হইয়া যাইবে যে, আনন্দের পিতা বিমল রায়, এবং তাহার দাবীর নিকট মিস্ ব্যানার্জির দাবী অগ্রাহ্য। সেই রাত্রে মিস্ ব্যানার্জির ঘুম হইলো না, কিন্তু আনন্দ রোজকার মতই ঘুমাইলো। পরদিন প্রাতে উঠিয়া শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ছবিখানি প্রণাম করিয়া সে যথারীতি তাহার মায়ের পদধূলি গ্রহণ করিয়া পড়িতে গেলো।

পাঁচ

পূজার ছুটি আসিয়া পড়িল। মিস্ ব্যানার্জি যেন আনন্দকে লইয়া কোথায় যাইবেন, সেই ভাবনাই ভাবিতেছিলেন। কোথায় গেলে যে আনন্দের খবর আর কলিকাতাবাসী কেহ পাইবে না, সেই ছিল তাঁর ভাবনা। স্থির করিলেন, এবার যাইবেন গোপালপুর—সে একেবারে বাংলার বাহিরে, তাই আর তেমন ভাবনার কিছু নাই।

গোপালপুর যাইয়া মিস্ ব্যানার্জি এক সাহেবী হোটেলে উঠিলেন। আনন্দকে লইয়া সমুদ্রতীরে বেড়ান এবং সমুদ্র-স্নান করেন—এই হইলো তাঁহার দৈনন্দিন কর্ম্ম। কচিৎ কখনও দুই একটি লোকের সঙ্গে আলাপ করিতেন, কিন্তু বাঙ্গালী দেখিলেই এড়াইতে চেষ্টা

করিতেন। তথাপি, কিছুদিনের ভিতর ঐ হোটেলেই আগত আর একজন বাঙ্গালী ভদ্রলোকের সহিত বেশ হৃদ্যতা হইয়া গেলো, এমন কি সেই ভদ্রলোককে নিজের কলিকাতার বাড়ীর ঠিকানা ও পরিচয়াদিও বলিলেন। ভদ্রলোক অতি অমায়িক এবং সজ্জন, বয়স প্রায় পঞ্চাশের নিকট। মিস্ ব্যানার্জ্জি ইহার সহিত মেলামেশা করিতে তাই একটুও দ্বিধা বোধ করেন নাই। হঠাৎ পরের দিন যখন তিনি লক্ষ্য করিলেন যে, ঐ ভদ্রলোক কেবলই আনন্দের দিকে তাকাইতেছেন, এবং তাহাকে কাছে ডাকিয়া তাহার বাঁ কানের নীচের সেই দাগটা বারংবার হাত দিয়া দেখিতেছেন, তখন মিস্ ব্যানার্জ্জি অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন। পরের দিন হঠাৎ জিনিষপত্র গুছাইয়া মিস্ ব্যানার্জ্জি মাত্র ১০।১২ দিন গোপালপুর থাকার পরই কলিকাতা ফিরিয়া আসিলেন। কারণ কাহাকেও কিছু বলিলেন না।

ছয়

মিস্ ব্যানার্জ্জি নিজে আনন্দকে সেণ্ট্ জেভিয়াস্ কলেজ-স্কুলে পৌঁছাইয়া দিয়া কলেজে যাইতেন, এবং ফিরিবার মুখে আবার তাহাকে লইয়া গৃহে ফিরিতেন। ভৃত্য অথবা বেয়ারা কাহারও উপর আনন্দের ভার দিয়া তিনি নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেন না। আনন্দর পোষাক পরিচ্ছদ, খেলাধূলা, বেড়ান, আহার, বিশ্রাম সবকিছুরই তত্ত্বাবধান মিস্ ব্যানার্জ্জি নিজেই করিতেন। লোকে বলে যে তিনি তখনকার দিনের এক ডেপুটি কালেক-টারকে বিবাহ করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু বিবাহ হয় নাই, এবং সেই ব্যর্থতাই তাঁহার জীবনে তিক্ততা আনিয়া দিয়াছিলো। আর তিনি বিবাহ করেন নাই। দেখিতে তিনি সুন্দরী ছিলেন। বর্ত্তমানে তাঁহার বয়স প্রায় চল্লিশের নিকটবর্ত্তী। মাতৃত্বের ক্ষুধা প্রত্যেক নারীর হৃদয়েই জাগরূক থাকে। হয়ত বা উহা সুপ্ত থাকিতে পারে, যদিও কেহ কেহ উহা আবার গোপন করিতেও চেষ্টা করেন। কিন্তু, প্রকৃতির সহিত লড়াই করা গেলেও প্রকৃতিকে জয় করা যায় না। তাই আনন্দকে পাইবার পর হইতে মিস্ ব্যানার্জ্জির জীবনে আসিলো পরিবর্ত্তন, তিনি পাইলেন মাতৃত্বের আস্বাদ। তাই আনন্দকে হারাইবার চিন্তা তাঁহার মনকে অস্থির করিয়া দেয়। তিনি হইয়া পড়েন চঞ্চল, এবং তাঁহার স্বাভাবিক প্রশান্তিও যেন আর অটুট থাকিতে চায় না।

সাত

হঠাৎ একদিন প্রাতে আসিয়া হাজির হইলেন গোপালপুরের পরিচিত সেই ভদ্রলোকটি।—আদর করিয়া মিস্ ব্যানার্জি তাঁহাকে বসাইলেন।—এ কথা সে-কথার পর ভদ্রলোক বলিলেন—"মিস্ ব্যানার্জি, আপনার নিকট আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নাই।—আপনি আমার শিশু পুত্রকে কুড়াইয়া আপনার গৃহে স্থান দিয়াছিলেন—, আর আজ তাহার বয়স ছয় বৎসর।—"মিস্ ব্যানার্জি হঠাৎ চেয়ার হইতে উঠিয়া পড়িয়া বলিলেন—"আপনি উন্মাদের মত কি বলছেন, আমি বুঝতে পারছি না।—পাগলামী করা অন্যত্র চলতে পারে, আমার পাগলামী শুনবার সময় নেই।—"বলিয়া তিনি অভদ্রোচিত ভাবে সেই স্থান ত্যাগ করিলেন।—ভদ্রলোক ২।৪ মিনিট চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া উঠিয়া পরিলেন।—মিস্ ব্যানার্জি একেবারে সোজা যাইয়া ঢুকিলেন আনন্দ'র পড়ার ঘরে।—সেদিন যতক্ষণ পড়া শেষ না হইল, তাহার নিকটেই বসিয়া রহিলেন। নিজেও কাজে গেলেন না, এবং আনন্দকেও সেদিন স্কুলে পাঠাইলেন না।—ভয় হইতেছিলো যে, যদিবা রাস্তায় রিক্সা হইতে কেহ তাহাকে উঠাইয়া নিয়া যায়!—

সেইদিনই বিকালে আবার আসিলেন সেই ভদ্র লোক।—তিনি সেদিন একটু রূঢ় ভাবেই বলিলেন—"মিস্ ব্যানার্জি, আপনি যদি আপোষে আমার ছেলে দেন তবে ভালো, নচেৎ আমি আদালতের শরণ নিব।—"

মিস্ ব্যানার্জি উত্তর করিলেন—"আদালতের ভয় আমাকে দেখাবেন না।—আপনার ছেলে আমার কাছে নেই, আপনি যা করতে হয় করুন গিয়ে।",—তিনি ইহা বলিয়াই উঠিয়া গেলেন।—ভদ্র লোক চলিয়া আসিলেন।

আট

যথাসময়ে আলিপুর কোর্টে মামলা উঠিলো, এবং কোর্ট বিমল রায়ের পক্ষে রায় দিলেন। যেদিন কোর্টের সাহায্যে বিমল রায় মিস্ ব্যানার্জ্জির নিকট হইতে তাহার ছেলেকে লইয়া যাইতে আসিলেন, সেদিন কিন্তু মিস্ ব্যানার্জ্জি একটি কথাও বলিলেন না। সমস্ত রাত্রি তিনি কাঁদিয়া কাটাইয়াছেন, তাঁহার চোখমুখ দেখিলে তাহা সহজেই বোঝা যাইতেছিলো।—আনন্দ কিছুতেই যাইবে না, কেবলই মিস্ ব্যানার্জ্জিকে বারে বারে জড়াইয়া ধরিতেছিলো। মিস্ ব্যানার্জ্জি তাহার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন—"তাতে কি, তুমি তোমার বাবার কাছে যাবে, সে ত' ভালোই। তুমিও ত' তোমার বাবার খোঁজ ক'রছিলে একদিন। আমি তোমায় গিয়ে দেখে আস্‌বো, আর তোমার যখন ইচ্ছা হবে, আমার কাছে এসে থাকবে। তুমি ত' নিশ্চয়ই তোমার মা'কে ভুল্‌বে না।" কথাগুলি বলিতে বলিতে মিস্ ব্যানার্জ্জির গলা বন্ধ হইয়া আসিতেছিলো, তবু তিনি গম্ভীর ভাবে সব কথাগুলিই বলিলেন। বিমল রায় বলিলেন—"মিস্ ব্যানার্জ্জি, আমায় ক্ষমা করবেন, আমি অতি নিষ্ঠুর কাজ করছি, তা, আমি জানি, কিন্তু কি করবো, আমারও আর কিছুই নেই। আমিই বা কি নিয়ে থাকবো! যদি আপনার আপত্তি না থাকে, তবে আনন্দকে আপনিই সঙ্গে ক'রে নিয়ে আমার বাড়ী পৌছে দিন।" মিস্ ব্যানার্জ্জি একটু নির্ব্বাক্ হইয়া রহিলেন, তারপর ত্রস্তে প্রস্তুত হইয়া লইলেন, এবং আনন্দ'র হাত ধরিয়া গিয়া উঠিলেন গাড়ীতে।

আনন্দকে রাখিয়া মিস্ ব্যানার্জ্জি বাড়ী ফিরিলেন। ধীরপদে উপরে উঠিয়া গেলেন। আনন্দের ঘরে যাইয়া দেখিলেন, সব জিনিষ—বই, ছবি, খেলনা সব ঠিক আছে, আনন্দের ট্রাই সাইকেলটি, চিরপরিচিত সুটকেস্‌টি, সবই ঠিক ভাবেই সাজানো আছে, মনে হইলো যেন আনন্দ স্কুলে গিয়াছে। মিস্ ব্যানার্জ্জি আর সেদিন কাজে গেলেন না। ক্রমে সন্ধ্যা হইলো। সেদিন আর আনন্দ কাছে নেই। এই প্রশ্ন, সেই প্রশ্ন করার লোক নাই। মা, মা, করিয়া ডাকিয়া যে সে একটার পর একটা কথা বলিয়া যাইতো, মিস্ ব্যানার্জ্জি সব কথা শুনিতেন, আর হাসিতেন, আর কখনো বা ছেলেকে বুকে জড়াইয়া ধরিতেন। আজ আর সে সব কিছুই নাই, সমস্ত বাড়ীতে বিদ্যুতের আলো জ্বলিতেছিল বটে, তথাপি সবই যেন অন্ধকার, এবং অভিশপ্ত বলিয়া মনে হইতেছিলো। মিস্ ব্যানার্জ্জি রেডিওটা একবার খুলিয়াই বন্ধ করিয়া দিলেন। নিজের বেহালাটি অনেক দিন পরে পাড়িয়া আনিয়া সেটা বাজাইতে চেষ্টা করিলেন। একটা করুণ সুর উহাতে ফুটাইয়া তুলিলেন বটে, কিন্তু পারিলেন না, সব যেন গুলাইয়া গেলো। বুদ্ধিমতী ও শিক্ষিতা মিস্ ব্যানার্জ্জি বুঝিলেন, কেন তাঁহার জীবনে একটা ওলোট-পালোট হইয়া গেলো। নচেৎ পৃথিবীর সব কিছুই ঠিক একই ভাবে চলিতেছিল।

নয়

পরদিন প্রাতে আবার আসিলেন বিমল বাবু, সঙ্গে আনিয়াছিলেন আনন্দকে। আনন্দ দৌড়িয়া "মা মা" করিয়া উপরে উঠিয়া গেলো। ছুটিয়া আসিলেন মিস্ ব্যানার্জ্জি। সেই কণ্ঠস্বর যাহা আজ চারি বৎসর শুনিয়া আসিতেছেন, তাঁহার কর্ম্মক্লান্ত জীবনে যেন স্নেহধারা বর্ষণ করিয়াছে। তিনি আনন্দকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন—"পড়া ফেলে এলে কেন?" আনন্দ উত্তর করিলো—"আমার বই যে সব এখানে! মা, তুমি আমার সঙ্গে যাবে না? তোমাকে ফেলে আমি কি ক'রে থাক্‌বো। হয় তুমি যাবে, নয় ত বাবা এখানে আস্‌বেন। আমি যে তোমাকে ছেড়ে থাক্‌তে পারবো না—মা!"

মিস্ ব্যানার্জ্জির চোখে জল আসিলো। তিনি বলিলেন—"যাও, তোমার বাবাকে ডেকে নিয়ে এসো!" শিশু ছুটিয়া নীচে নামিয়া গেলো। বিমলবাবু আসিতেই মিস্ ব্যানার্জ্জি বলিলেন—"আনন্দকে ছেড়ে থাক্‌তে পারবো না, তাই আপনার কাছে যাওয়াই স্থির করলাম।"

সভ্যতার অভিসম্পাত

ক্যাপ্টেন ফণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

পণ্ডিতেরা বলে থাকেন 'Man never dies; he kills himself.' কথাটা নিশ্চয়ই আমাদের মনঃপূত হবে না। চারিদিকে অসুখের হাত থেকে প্রাণ রক্ষা করতেই আমাদের প্রাণান্ত; আর আমরা কিনা নিজেকে হত্যা করি। একথা অবান্তর। আত্মহত্যা কেউ কেউ করে বটে, তা সাময়িক উত্তেজনার বশবর্ত্তী হয়ে। এই আমাদের ধারণা। কিন্তু একটু বিবেচনা করে দেখলে আমরা এই নির্ঘাৎ বাণীর যৌক্তিকতা উপলব্ধি করতে পারবো।

ট্রামে বাসে ঝুলতে ঝুলতে যাওয়া অথবা সন্ত্রাসবাদিদের কার্য্যকলাপে যেখানে গুলি, বোমা, এসিড্-বাল্‌ব বেপরোয়াভাবে ব্যবহৃত হয়, সেখানে কৌতূহলের বশবর্ত্তী হয়ে দর্শকের অংশ অভিনয় করায় প্রাণহানীর সম্ভবনা—এ বিষয়ে আমরা সকলেই অবহিত। কিন্তু ঠিক চরম মুহুর্ত্তে আমরা সব বিপদের সম্ভবনার কথা ভুলে গিয়ে মরণের সম্মুখীন হয়ে পড়ি। অখাদ্য কুখাদ্য খেলে পেটের অসুখ হবে—জানা সত্বেও দৃষ্টিমধুর, জিহ্বাতৃপ্তকারী ঐ সব খাদ্য খাবার ফলে পরিপাক শক্তি বিকল করে জীবন্মৃত অবস্থায় এসে পড়ি। হোটেলের চায়ের পেয়ালা "টি. বি" সংক্রামিত করতে অদ্বিতীয় জানা সত্বেও চায়ের দোকানে ভীড় করতে কুণ্ঠিত হইনা। বসন্ত, টাইফয়েড্, কলেরা প্রভৃতি সংক্রামক ব্যাধির প্রতিষেধক সম্বন্ধে সম্যক্ অবহিত থাকা সত্বেও আমরা বেপরোয়া ভাবে আমাদিগকে ঐ সব রোগের সম্মুখীন করে বসি। মোট কথা স্বাস্থ্য রক্ষা সম্বন্ধে আমরা নিজেরা সম্পূর্ণ উদাসীন। আর এই উদাসীনতা অতি প্রকট ভাবে দেখা দেয় আমাদের ছেলে মেয়েদের মৃত্যুর পথে এগিয়ে দেবার কার্য্য কলাপের মধ্য দিয়ে।

আমরা সুসভ্য। শিক্ষার গৌরবে গৌরবান্বিত। অদ্ভুত উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দিয়ে আমরা দিন দিন জগৎকে চমৎকৃত করে দিচ্ছি। দু'শ বছর আগেকার জীবন আজকের তুলনায় অতীব নগণ্য। সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু আমরা Vital Statistics-এর ভীতিপ্রদ সংখ্যা দিয়েও আধুনিক জগৎকে বিস্মিত করতে সক্ষম হয়েছি। "মনে রাখবেন আমাদের দেশে প্রতি মিনিটে একজন করে টি, বি, রোগে প্রাণত্যাগ করে" ইত্যাদি।

দেশ ত এখন এক বিরাট Mental Hospital-এ পরিণত হতে চলেছে। প্রতি ঘরে ঘরে মানসিক বিপর্য্যয়ের প্রতিমূর্ত্তি বর্ত্তমান। কত অসংখ্য রকম নূতন নূতন প্রাণ হত্যাকারী রোগের প্রাদুর্ভাব হয়েছে। নূতন নূতন চমকপ্রদ ঔষধের আবিষ্কার কেবল আমাদিগকে 'ধনে প্রাণে' শেষ করবার পথে এগিয়ে নিয়েই চলেছে। লোক নাকি আগেকার চেয়ে দীর্ঘায়ু হয়েছে বলে শোনা যায়, কিন্তু জীবন্মৃত অবস্থায় থেকে এ দীর্ঘায়ুতায় লাভ কি?

মনের সুস্থতার উপরেই নির্ভর করছে দেহের সুস্থতা সম্পূর্ণরূপে। আর এই ক্রমবর্দ্ধমান সভ্যতার বিকাশ আনছে আমাদের মনের উপর বিষম বিপর্য্যয়, আনছে অনাবশ্যক দ্রব্যের অভাব বোধের পীড়ন; যার সংঘাতে মন নিত্য হচ্ছে কত বিক্ষত। তাই মানসিক স্থৈর্য্য বজায় রাখতে আমরা অপারগ। আমাদের এই দেহ-যন্ত্রের যন্ত্রী হ'লো 'মন'। যেমন চালকের বা Pointsman-এর সাময়িক মানসিক অবনতি অসাবধানতার কারণ হওয়ায় Train disaster ক্রমবর্দ্ধমানরূপ ধারণ করছে, তেমনি দেহের চালক 'মন' সভ্যতার চাপে নিষ্পেষিত হয়ে দেহের অংশ বিশেষের কর্ম্মদক্ষতার অবনতি ঘটিয়ে High blood pressure, diabetis, dyspepsia, heart trouble, headache, defective vision প্রভৃতি রোগ সৃষ্টির কারণ হয়ে পড়ছে। রোগ নিরাময়ের চমকপ্রদ ঔষধ সমূহের আবিষ্কার আমাদের মনের উপর এমন এক

আধিপত্য বিস্তার করেছে—যে রোগের ভয়াবহ দিক সম্বন্ধে আমরা সম্পূর্ণ উদাসীন হয়ে পড়েছি। ফলে স্বভাবের সহযোগিতা থেকে ক্রমেই দূরে সরে যাচ্ছি। দেহের উপর অন্যায় অত্যাচারের মাত্রা ক্রমে বেড়েই চলেছে। রোগগ্রস্ত দেহ ও মনকে ব্যয় বহুল চিকিৎসার নিষ্পেষণে জর্জ্জরিত করে মানসিক অশান্তির মাত্রা বাড়িয়েই চলেছি।

সংসারের ঘাত প্রতিঘাতে মন সতত: বিক্ষুব্ধ চঞ্চল। তাকে সংযত করে তার স্থিরতা বুদ্ধির মধ্যেই হবে আমাদের ব্যক্তিত্বের বিকাশ। এই ব্যক্তিত্ব মহিমান্বিত করেছে আমাদের প্রাতঃস্মরণীয় মনিষীগণকে। ব্যক্তিত্ব বিকাশে 'মন' এক বিরাট অংশ অধিকার করে। আফিসের কাজ করছেন—যা মাইনে পান তাতে ক্ষুদ্র সংসার বেশ ভাল ভাবেই চলে যায়। কোন অভাব নাই—কোন গোলযোগ নাই। অতএব মনেও কোন অশান্তি নাই। হঠাৎ একদিন চিন্তাকাশে মেঘ দেখা দিল। আফিসে গিয়ে হয়ত শুনলেন আপনার দাবী উপেক্ষা করে নিম্নপদস্থ কোন কর্ম্মচারীর পদোন্নতি হয়েছে। তখন আপনার মানসিক অবস্থার বিপর্য্যয় আসবেই। মন কিছুতেই এই পরাজয় মেনে নিতে চাইবে না। ফলে হবে—আপনার উপর যে অন্যায় করা হয়েছে, এই চিন্তাই এত প্রবল ভাবে মনকে আলোড়িত করতে থাকবে, যাতে আপনার মানসিক শান্তি একেবারেই নষ্ট হয়ে যাবে। তখন কোথায় চলে যাবে আপনার সদা-প্রফুল্ল ভাব, স্নেহ মায়া, পরোপকার-স্পৃহা। পরিবর্ত্তে সদা বিমর্ষ ভাব, নির্জ্জন স্পৃহা, অল্পেতেই রেগে উঠা, খাদ্যে অরুচি, নিদ্রাহীনতা, ভদ্রতা-সৌজন্যের অভাব প্রকট হয়ে উঠবে আপনার স্বভাবের উপর। এই চিন্তায় যতই বিভোর হতে থাকবেন, ততই কাজে অবহেলা, ভুল ভ্রান্তির মাত্রা ক্রমবর্দ্ধমান রূপ ধারণ করে মনের অশান্তি আরও বাড়াবার কারণ হয়ে পড়বে। ক্রমে জীবন যেন দুর্বিসহ হয়ে উঠবে। তখনই বিপদের সম্ভাবনা সম্বন্ধে উদাসীন হয়ে ট্রামে, বাসে ঝুলতে ঝুলতে যাওয়া বা বিপদসঙ্কুল স্থানে গমনাগমন, অন্যমনস্ক বা অসাবধানতার জন্য গাড়ীচাপা পড়া, আহারে বিহারে অনিয়ম ও শরীরের প্রতি অত্যাচার করে রোগ-প্রবণতা বাড়ান বিচিত্র নয়। নতুবা ঐ দুঃখ ভোলবার জন্য মাদকদ্রব্য ব্যবহার বা কুসঙ্গ যাপন শ্রেয়: মনে করে ধীরে ধীরে নিজেকে সংসার থেকে, বন্ধু বান্ধব থেকে বিচ্ছিন্ন করে ধ্বংসের পথে এগিয়ে নিয়ে যাবেন। এমন কি আত্মহত্যা করে এ গ্লানির হাত থেকে উদ্ধার পেতে সচেষ্ট হওয়াও আশ্চর্য্যের বিষয় হবে না।

এই গেল পরাজয়ের একটা দিক। এখানে বিপর্য্যস্ত মন পালিয়ে বাঁচবার চেষ্টায় সদামগ্ন। কিন্তু এমনও ত হতে পারে—মন পরাজয়ের গ্লানি মুখ বুজে সহ্য না করে তার সমস্ত আক্রোশ নিয়ে পরিস্থিতির উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে—যার অভিব্যক্তি আমরা দেখতে পাবো তাঁর আফিসকর্ত্তার উপর এক বিরুদ্ধ মনোভাবের মধ্যে দিয়ে। তিনি মন প্রাণ দিয়ে আর কাজ কর্ত্তে চাইবেন না; সকলের সঙ্গে তিরিক্ষি মেজাজে কথা বলবেন; কাজে অমনোযোগী হবেন; ইচ্ছা করেই হয়ত অনেক ভুলভ্রান্তি করে বসবেন। অবাধ্য, উদ্ধত প্রকৃতি, উচ্ছৃঙ্খল ব্যবহার খামখেয়াল প্রভৃতি দোষের অধিকারী হয়ে পড়বেন। এমন কি কর্ত্তার বিরুদ্ধে ষ্ট্রাইকের প্ররোচনা দিয়ে আফিসের শান্তি ব্যাহত করে বসবেন। এমনি করে নিজের আর সঙ্গে সঙ্গে দশজনের মনে শান্তি নষ্ট করবার কারণ হয়ে পড়বেন। সংসারের সুখের নীড় অশান্তির আগুনে পুড়ে ছারখার করবেন।

তাঁর জীবনে কেবল এই একটাই সমস্যা নয়। প্রতি-দিন কত নূতন সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে তাঁকে—যতই সভ্যতার স্বরূপ বাস্তব হয়ে ফুটে উঠছে তাঁর চোখের সামনে। এখানে অশান্তির কবল থেকে বাঁচতে গেলে মনকে সমস্যার সঙ্গে compromise করতে হবে। বিজয়ের গৌরব যদিও এতে নাই, কিন্তু পরাজয়ের গ্লানির হাত থেকেও রক্ষা করবে যথেষ্ট। তখনই আশার ক্ষীণ আলোক পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে আমাদিগকে শান্তির অমৃতময় ক্রোড়ে।

ব্যবহারিক জীবনের প্রত্যেক স্তরেই এই সমস্যাসমূহ বর্ত্তমান। এবং তার পরিণতি ভাবপ্রবণতাযুক্ত মানসিক বিপর্য্যয়ের মধ্যে। ফলে স্কুল কলেজের ছাত্রসমাজের

মধ্যে দুর্নীতি সৌজন্যের অভাব ষ্ট্রাইক প্রভৃতি অসামাজিক কার্য্যাবলির প্রাবল্য বৃদ্ধির অভিব্যক্তি দেখতে পাওয়া যায়। দেশ গঠন, আর্ত্তের সেবা, সমাজ সংস্কার, পল্লী উন্নয়ন প্রভৃতি সৎকার্য্যাবলী কেবল সাময়িক খেয়াল চরিতার্থের উপকরণে পর্য্যবসিত হয় তাদের।

যে শিক্ষা জীবনের পাথেয় সে শিক্ষা এখন আমাদের নাই। ছিল তা একশ বছর আগেও। জ্ঞান বলতে তাঁরা বুঝতেন নিজেকে জানবার স্পৃহা এবং সেটি মানব-হিতার্থে নিয়োগ করা। আর আমরা এ যুগে বুঝি কোন বিষয় সম্বন্ধে কিছু জানা। আর তাকে স্বার্থসিদ্ধির কাজে লাগান। বিজ্ঞান বলতে তাঁরা বুঝতেন 'বিশেষ জ্ঞান'—যা বিশিষ্টরূপে মানবের উন্নতিবিধান করে। আর আমরা বুঝি 'বিকৃত জ্ঞান'—যা সৃষ্টিকে সভ্যতাকে ধ্বংসের পথে এগিয়ে নিয়ে যায়। তখনকার দিনে রামায়ণ, মহাভারত পুরাণ, ভাগবত প্রভৃতি মহাগ্রন্থের মধ্যে দিয়ে চরিত্রগঠন, মনের উৎকর্ষ বিধান, মানসিক স্থৈর্য্য প্রভৃতি উপাদানে নিজেকে মহিমান্বিত করে দেশের ও দশের কল্যাণে জীবন উৎসর্গ করবার শিক্ষা পেতেন। আর আজ আমরা যতই সভ্যতার উচ্চসোপানে আরোহণ করছি, ততই ঐ সব নিছক আজগুবি গল্পের পর্য্যায়ে এসে পড়ছে। কাজেই ও সবের মধ্যেকার অন্তর্নিহিত গুণাবলী আমাদের চোখে হেয় বলেই প্রতিপন্ন হতে চলেছে। সুতরাং আমরা প্রকৃত শিক্ষার বদলে অশিক্ষা বা কুশিক্ষার মোহে মুগ্ধ হয়ে কায়-মন-বাক্যে সংযম হারিয়ে এক অভিনব পর্য্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছি। এই যখন আমাদের মনের অবস্থা—তখন স্বভাবতঃ আমরা ধরে নিতে পারি যে, শিশু মানসিক বিকৃতি নিয়েই জন্মগ্রহণ করে এই বর্ত্তমান আবেষ্টনির মধ্যে।

বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া যেন চির দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ হওয়ার রূপান্তর মাত্র। এই যেন এযুগের যুবক যুবতীর প্রথম শিক্ষা। কেউ স্বেচ্ছায় এ গুরু দায়িত্ব বহনে রাজি হতে চায় না। একদিকে অর্থনৈতিক অসামঞ্জস্য অন্যদিকে পোষ্য বৃদ্ধির আশঙ্কা দুই পক্ষের মনেই এমন এক অসহায় অবস্থার সৃষ্টি করে, ফলে বিবাহিত জীবনের সুখস্বপ্ন দুঃস্বপ্নেই পর্য্যবসিত হয়। তাই ভাবী মায়েদের সন্তানের জননী হবার আকাঙ্ক্ষার পরিবর্ত্তে যতদিন সম্ভব বিবাহিত জীবনের সুখ ঐশ্বর্য্য ভোগ করাই কাম্য হয়ে পড়ে আধুনিক বিজ্ঞানের সাহচর্য্যে। যদি হঠাৎ সন্তান সম্ভাবনা দেখা দেয়, তখন ভাবী জননীর মনে এক নিদারুণ মানসিক বিপর্য্যয়ের সৃষ্টি হয়—যার ফলে Child becomes unwanted. দশমাস দশদিন এই অবাঞ্ছিতকে গর্ভে ধারণ করে নিত্য তার মুণ্ডপাত করাই হয় মায়ের কাজ তখন। শয়নে স্বপনে কিম্বা জাগরণে মন কিছুতেই মত থেকে তাঁর ভাবী সন্তানের প্রতি বিরুদ্ধ ভাব পরিত্যাগ করতে পারে না। গর্ভস্থ সন্তান মায়ের বিকৃত চিন্তাধারায় পুষ্ট হয়ে যথা কালে 'বাঙ্গালী করেছো—মানুষ করনি' এই বাক্যের যৌক্তিকতা প্রমাণ করবে তাতে আর বিচিত্র কি!

এই সব শিশু বিকৃত মন নিয়েই জন্মগ্রহণ করে। মাতৃত্বের সহজাত উৎস যদিও তখন প্রবল হয়ে উঠে, জননী তখন ভুলে যান পূর্ব্বস্মৃতি। শিশু কিন্তু এত শীঘ্র ভুলে যাবার পাত্র নয়। প্রথম থেকেই মায়ের প্রতি বিরুদ্ধভাব প্রকাশ পেতে থাকে—প্রতি পদে পদে তার অন্যায় আব্দারের মাত্রা বাড়ার মধ্যে দিয়ে। মা শত চেষ্টা করেও শিশুর মন জয় করতে অপারগ হন। ফলে হয় একদিকে শিশু যেমন জেদী, অবাধ্য, নিয়ম-শৃঙ্খলা কিছুতেই থামতে চাইবে না। অন্যদিকে তেমনি মাও সন্তানের প্রতি ক্রমেই রূঢ় আচরণ করতে থাকবেন শিক্ষার নাম করে। শিশু ক্রমেই মায়ের ভালবাসা থেকে বঞ্চিত হয়ে নিজেকে অসহায় মনে করতে থাকে। আর মার প্রতি আরও বেশী বিরুদ্ধ ভাব মনে মনে পোষণ করতে থাকে। এদিকে মাও সন্তানের আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে ক্রমেই তার প্রতি উদাসীন হতে আরম্ভ করেন। এমনি করেই সন্তান আর জননীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক বিষময় হয়ে ওঠে। বয়োঃবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিশুর মানসিক বিকৃতি দিন দিন আরও প্রকট হতে থাকে। উত্তরকালে এই সব ছেলেরাই ভাবপ্রবণতার আতিশয্যে মানসিক স্থৈর্য্য রক্ষায় অসমর্থ হয়ে নানা প্রকার অসামাজিক কাজে লিপ্ত হয়ে পড়াও বিচিত্র নয়।

[আগামী বারে সমাপ্য]

শ্রীমদ্ভাগবত

(১০ম স্কন্ধ; ৩৫ অধ্যায়)

শ্রীসুরেশ বিশ্বাস

[শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ম স্কন্ধে ৪টি গীতার উল্লেখ আছে। বেণু-গীতা, গোপিকা-যুগল-গীতা, গোপী-গীতা ও ভ্রমর-গীতা। এই ৪টি গীতারই উদ্গাতা গোপীগণ। তাঁহাদের শ্রীমুখে তাঁহাদেরই আরাধ্য দেবতার কথা পরম রমণীয় ও অনন্ত মাধুর্য্যের খনি। গোপিকা-যুগল-গীতায় দিনভাগে শ্রীকৃষ্ণ গোচারণে বহির্গত হইলে তাঁহারই বিরহে গোপীগণ অতি দুঃখে দিন-যাপন করিতেন, সেই কথা বর্ণিত হইয়াছে।]

১

শ্রীশুক:

যবে বনে যেত কৃষ্ণচন্দ্র তাঁরে মনে অনুসরণ করি
গোপীরা বাসর দুঃখে কাটাত শ্রীকৃষ্ণলীলা স্মরণ করি।

২, ৩

গোপীগণ:

যবে মুকুন্দ বেণু বাজায়—
বামবাহুমূলে বাম-কপোল,
অধরেতে বেণু ভ্রু নাচায়,
অঙ্গুলে ঢাকি' রন্ধ্র-দল;

সখিরে,—তখন ব্যোমযানে—
সিদ্ধাঙ্গনা পতি সহ,
বিস্মিত, ক্ষত স্মর-বাণে,
বেণুরবে আনে সম্মোহ!

নীবীর বসন খুলে যায়,
তুলে দিতে তাহা ভুলে যায়!

৪, ৫

হায় সখি! শোনো নব আলেখ্য-লেখা,
অধরের হাসি স্ফুরিত বক্ষহারে।
উরসে লক্ষ্মী স্থির-বিদ্যুৎ সম,
আর্ত্তজনারে যে জন তরাতে পারে!

দূর হ'তে তাঁর কূজনধ্বনি শুনি'
ঊর্দ্ধকর্ণ বৃষ-মৃগ-গাভীগণ,
অর্দ্ধদষ্ট-তৃণগ্রাস মুখে তুলি'
নিদ্রিত কিবা পটেতে রেখাঙ্কন।

৬, ৭

যবে গৈরিকে ময়ূরপুচ্ছে পলাশে সে চঞ্চল,
বলরাম আর গোপগণ সহ মল্লভূষণ পরি'
ধেনু গোবৎস আহ্বান করে, নদী ভুলে যায় গতি—
পবন-বাহিত কানু-পদাম্বু রজ আকাঙ্খা করি',
হায় সখি! নদী মোদেরই মতন অল্প পুণ্যবতী,
প্রেমে তরঙ্গবাহু মেলে দেয়, ক্ষণ পরে নিশ্চল!

৮, ৯

অনুচরগণ বর্ণনা করে তাঁরি বীর্য্যের গান
অচলালক্ষ্মী আদি পুরুষের,—তুলিয়া মুরলী তান,
বনে পশি' যবে আহ্বান করে গিরিতট ধেনুপাল,
তখনই প্রকাশ তিনি শ্রীবিষ্ণু,—বনচারী এ রাখাল!
বনলতা-তরু পুষ্পে ও ফলে ভারে অবনত হ'য়ে,
মধুধারা করে বর্ষণ প্রেমে পুলকিত-তনু লয়ে।

[ক্রমশঃ

রায়বাঘিনী

শ্রীচুণিলাল মুখোপাধ্যায়

প্রথম অঙ্ক

(রাজা রুদ্রনারায়ণের গুপ্ত মন্ত্রণাগৃহ। রাজা রুদ্রনারায়ণ দুর্লভ দত্ত উপবিষ্ট।)

রুদ্রনারায়ণ—তুমি এ সব খবর তা' হলে ভাল করে জেনেছ? কিছুতেই শুনলে না।

দুর্লভ—আমি ত' রাজা আপনাকে পূর্ব্বেই বলেছি—সব প্রস্তুত রাখ।

রুদ্র—তাই তো! (চিন্তা) গুরুদেব এখনও আসছেন না কেন?

চরণ—(ডাকিলেন)

(হরিদেবের প্রবেশ—উভয়ের প্রণাম—হরিদেব আসন গ্রহণ করিলেন)

হরিদেব—কেন রাজা? এমন সময়ে ডেকে পাঠিয়েছ?

রুদ্র—পাঠান দস্যুরা বাংলার স্থানে স্থানে লুট হত্যা করে প্রজাদের শান্তিভঙ্গ করছে। বাংলার প্রতাপশালী ভূইয়ারা ত কই কিছুই করতে পারছে না গুরুদেব! নিরীহ প্রজাদের ধনসম্পত্তি রক্ষা করা রাজার কর্ত্তব্য; তা' না করে রাজ্যসুখ ভোগ করার অধিকার আমার কই? উপদেশ দিন গুরুদেব।

হরিদেব—তুমি চঞ্চল রুদ্রনারায়ণ। অসীম শক্তিশালী তুমি—এমন সমবেদনা তোমার অন্তরে—ধনসম্পদে পূর্ণ তোমার ভাণ্ডার—বাংলার অসংখ্য বীর সন্তান তোমার সেনানী—সবার উপরে তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালী কুটবুদ্ধিসম্পন্ন সোদর সম বন্ধু যার মন্ত্রী—আমিও নিশ্চিন্ত, তোমার রাজ্যে তস্কর তার অত্যাচারের নিশান নিয়ে আসবে না।

(রুদ্রনারায়ণ উৎসাহিত—দুর্লভ কিছু লজ্জিত হইয়া)

দুর্লভ—গুরুদেব রাজাকে আপনি যা' বললেন সবই ঠিক। এ রাজ্যে সবই আছে। কিন্তু দেব, প্রয়োগের অভাব—আর—আর আমার কথা আর বলবেন না। আমি না :জানি যুদ্ধবিদ্যা—আর রাজনীতি—তা' আর শেখালেন কই?

রুদ্র—দুর্লভ তোমরাই আমার সব। গুরুদেবের আদেশ—তোমার পরামর্শ আর চতুর্ভুজের শক্তি, এর সমন্বয়ে অসাধ্যসাধন হয়। গুরুদেব! বলে দিন আমায় কি করতে হবে? (আগ্রহ)

হরিদেব—প্রিয় তোমার ভাগ্য ভাল—তুমি পারবে। আজ মহাপুরুষ এসেছিলেন, বলে গেছেন- সন্ধান তিনি দিয়ে গেছেন।

(রুদ্রনারায়ণ ও দুর্লভ উদ্বেগে উঠিয়া বসিলেন)

হ্যাঁ রাজা—উতলা হয়ো না, সময়ে সব বলছি—এখন মন্ত্রী বল ত' ভূরসুট রাজ্যের কর্ত্তব্য কোথায়? পাঠান সর্দ্দার তোমাদের সাহায্য চায়। তার লক্ষ্য বাংলায় বা ভারতে রাজ্য স্থাপন নয়। মোগল বাদশা তাদের ছত্রভঙ্গ করেছে। তারা লুণ্ঠন করবে। বল এর প্রতিবিধান কি?

দুর্লভ—(চিন্তিত) ওসমান খাঁর দল গত একমাসের মধ্যে বাংলার বাদশটি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অত্যাচার করেছে। অধিকাংশ স্থলেই বাধা পায় নি। সাহস তার বেড়ে গেছে। এই ভবানীপুরেও দেখা দেবে। সে চায় ভূরসুটরাজ্যের সাহায্য—মোগলশক্তিকে বিধ্বস্ত করতে। হ্যাঁ তা আপনারা যখন বলেছেন একটা ব্যবস্থা করুন। মোগল সম্রাট—হ্যাঁ তিনি একটা গঠনের পথ নিয়েছেন সত্য, কিন্তু বড় বাধা। গুরুদেব! সবই তো আপনার হাত—তৈরী করে নিন। আপনার আশীর্ব্বাদ—আমি কি জানি বলুন।

রুদ্র—ভারতের সাধনা অমর রাখতে এর বিক্ষিপ্ত শক্তি একত্রীভূত করাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য। ধ্বংসাবশেষ পাঠান রাজশক্তির যেটুকু অবশিষ্ট আছে, তা সে চায় না।

হরিদেব—রুদ্রনারায়ণ সব বুঝেছি। মহাপুরুষের আদেশ কৌপীনধারী শৈলচারী সাধক—আজ ভূরসুটের আলো ও বাতাসে জাগরণ দিয়ে গেছেন। তাঁর নির্দ্দেশ মন্ত্রীর বাক্যে প্রতিধ্বনিত হয়েছে। সব প্রস্তুত কর। মহাপ্রাণ দিল্লীর বাদশার আদর্শ সিদ্ধ হোক। সোণার ভারতে সুগঠিত জাতি শাসন করুক। এর জ্ঞান, শিল্প, ধর্ম্ম প্রচারিত হোক বিশ্বে।

(দূরে চরণের প্রবেশ ও প্রণাম)

রুদ্র—(সঙ্কেতে ডাকিল) খবর?

চরণ—মহামান্য মোগল সম্রাটের কাছ থেকে বার্ত্তা নিয়ে এক রাজপুত এসেছেন। বল্লেন কালবিলম্ব করবার উপায় নেই। (তিনজনেই চিন্তিত)

হরিদেব—রাজা?

রুদ্র—অপেক্ষা করতে বলে বিশ্রামাগারে নিয়ে যাও।

(চরণ ইতস্ততঃ করিল)

দুর্লভ—না রাজা। এই রাজপুতের আরও কর্ত্তব্য পালন করার থাকতে পারে। তুমি ত একমাত্র লক্ষ্যস্থল নও। আরও তো রাজারা আছেন। দিল্লীর সম্রাট আদর্শ মানব। গুরুদেব! মনে হয় ইনি পদস্থ রাজপুত।

হরিদেব—যোগ্য অভ্যর্থনা করে তাঁকে এখানে নিয়ে আসুক।

রুদ্র—বেশ চরণ। তুমি, আচ্ছা মন্ত্রী তুমি গিয়ে যোগ্য সমাদরে এখানেই তাঁকে নিয়ে এসো। আমরা এখানেই তাঁর সঙ্গে দেখা কোর্ব্ব।

(দুর্লভের প্রস্থান)

আমি আপনাদের কাছে সব শুনলাম। আমার সঙ্কল্প দৃঢ় করেছি। গুরুদেব! আশীর্ব্বাদ করুন আমার ভুরসুট যেন বাংলার মান বজায় রাখতে পারে।

(মন্ত্রীর রাজপুত যোদ্ধা রামসিংহের সহিত প্রবেশ)

রুদ্র—(সসম্মানে অভ্যর্থনা করিয়া) আসুন বীর। মহামান্য সম্রাট বাহাদুরের সকল কুশল ত? মহারাজা মানসিংহ ও অন্যান্য মান্যবর ওমরাহগণ সব কুশলে আছেন?

রামসিংহ—হ্যাঁ রাজা সমস্তই কুশল।

রুদ্র—আমার পূজনীয় গুরুদেব হরিদেব ভট্টাচার্য্য—আমার মন্ত্রী দুর্লভচন্দ্র দত্ত।

রামসিংহ—(যথাযোগ্য অভিবাদনান্তে) আপনাদের দর্শনে সুখী হলাম। আপনারা সকলেই বিচক্ষণ এবং ভুরসুট রাজ্যের পরম শুভানুধ্যায়ী একথা দিল্লীর সকলেই জানেন।

রুদ্র—এখন সর্দ্দারজী মহামান্য সম্রাটের আদেশ ব্যক্ত করুন। আমরা সকলেই উৎসুক তা' শুনতে।

রামসিংহ—হ্যাঁ (চারিদিকে চাহিয়া) দেখুন আজকের বার্ত্তার গোপনীয়তা বিশেষ আবশ্যক। আমি যা বলবো বড় গুরুত্বপূর্ণ কথা।

রুদ্র—বলুন সর্দ্দারজী—ভুরসুটরাজ্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কল্যাণকামী যাঁরা তাঁদের কাছে আপনার বক্তব্য বলুন—আমরা প্রস্তুত।

রামসিংহ—মহামান্য দিল্লীর সম্রাট বিচক্ষণ অমাত্যগণসহ পরামর্শ করে স্থির করেছেন—সমগ্র ভারতে সর্ব্বজাতি সমন্বয়ে এক মহাজাতি গঠন কর্ব্বেন। ভারতে শাসন হবে সেই জাতির কল্যাণে। তার সভ্যতার আদর্শ সমস্ত পৃথিবীকে দান কর্ব্বে—ন্যায়ের শাসন। বঙ্গদেশ মোগল সাম্রাজ্যের আভ্যন্তরীণ একটি সুবা—এর বীরত্ব এর সম্পদ সাম্রাজ্যের স্তম্ভস্বরূপ পরিগণিত হয়—এই সম্রাট বাহাদুরের ইচ্ছা। ভুরসুট রাজ! আপনি বাংলার একজন রাজা। আপনার আনুগত্য, সহযোগিতা—শাহন্‌শা মূল্যবান জ্ঞান করেন। বিক্ষিপ্ত পাঠান দস্যুরা সম্রাটের কাছে বাধা দানে বদ্ধপরিকর। তাদের শক্তি বিধ্বস্ত হলেও নিঃশেষিত হয় নাই। বাংলায় শান্তি বিধ্বস্ত করেছে তারা নিরীহ গৃহস্থের ধনসম্পদ লুণ্ঠন করে। রাজা! আপনার কর্ত্তব্য স্থির করুন। মহানুভব সম্রাট বাংলাদেশের শান্তি স্থাপনে বদ্ধপরিকর হয়েছেন। এখন আপনাদের মনোভাব জানতে পারলেই তিনি কর্ত্তব্য স্থির করবেন।

রুদ্র—মান্যবর সম্রাটকে আমার সম্মান জানিয়ে বলবেন আমরা দস্যুর অত্যাচারে বিক্ষুব্ধ। সে অত্যাচারের প্রতিবিধান করতে, আমায় প্রিয় প্রজাদের রক্ষা করতে, আমার রাজ্যের শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখতে আমি স্থির-সংকল্প। আমার গুরুদেব মহাজ্ঞানী হরিদেব ভট্টাচার্য্য আমার অশেষ বুদ্ধিশালী দূরদর্শী মন্ত্রী—আমরা সকলে একমত। বাংলা যাতে তার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের সম্ভার নিয়ে তার বীর সন্তানের ত্যাগ ও শক্তির মহিমায় সমস্ত ভারতকে মহিমান্বিত কর্ত্তে পারে, তার জন্য আমরা এই মহাব্রত গ্রহণ করেছি। উদারচেতা বীর সম্রাটের সহানুভূতি আমরা পাবোই।

হরিদেব—বৎস! আমি সর্ব্বান্তঃকরণে আশীর্ব্বাদ করি বাংলা মায়ের সুযোগ্য সন্তানদের তুমি ভারতের মধ্যে যোগ্যস্থানে অধিষ্ঠিত হবার ব্যবস্থায় কৃতকার্য্য হও।

মন্ত্রী—রাজা। সর্দ্দারজী বহুদূর থেকে এসেছেন তার সুযোগ্য বিশ্রামের এবং আদরের ব্যবস্থা করা আমাদের আবশ্যক। মহামান্য সম্রাটের আদেশ—আমাদের কর্ত্তব্য ত স্থির আছে; সবদিক বিবেচনা করে সকল সুবিধা অসুবিধা লক্ষ্য রেখে সম্রাটকে আমরা নিবেদন কর্ব্বো। এখন চলুন মান্যবর আপনার আহারের ব্যবস্থা করি গে।

রামসিংহ—আমার বিশ্রামের অবসর কই?

রুদ্র—তা হয় না সর্দ্দার। সমস্ত ব্যবস্থাই প্রস্তুত। অল্প বিশ্রাম করে যাবেন আমার অনুরোধ।

মন্ত্রী—চলুন সর্দ্দার আপনার কাজের ব্যাঘাত হবে না, সত্বরেই আপনি যেতে পারবেন। আপনার কার্য্য সুসিদ্ধই হবে। (মন্ত্রীর সর্দ্দারকে লইয়া প্রস্থান)

রুদ্র—গুরুদেব! (প্রণাম)

হরিদেব—(আশীর্ব্বাদ করিয়া) তোমার আশা ফলবতী হোক। (উভয়ের উভয়দিকে প্রস্থান)

[ক্রমশঃ

সম্পাদকীয়

মেট্রোপলিটান ইন্‌সিওরেন্স কম্পানীর নবগৃহ উদ্বোধন

গত ২৮শে বৈশাখ শনিবার (১২ই মে ১৯৫১) অপরাহ্নে কলিকাতা মহানগরীর কেন্দ্রস্থলে ৭নং চৌরঙ্গী রোডে অবস্থিত প্রাক্তন হোয়াইটওয়ে লেড্‌-ল এণ্ড কোং লিমিটেডের প্রাসাদোপম এবং বাণিজ্যোপযোগী অট্টালিকায় মেট্রোপলিটান ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেডের নূতন হেড আফিস ভবনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন-কার্য্য মহাসমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে। কোম্পানীর চেয়ারম্যান বাঙ্গলার অন্যতম বাণিজ্যবিশারদ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন এবং ইণ্ডিয়ান লাইফ ইন্‌সিওরেন্স অফিসেস এসোসিয়েসনের সভাপতি শ্রী এস্‌, সি, রায় প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন। কলিকাতার বহু বিশিষ্ট সর্ব্বশ্রেণীস্থ প্রায় চারি সহস্র নাগরিকের স্বাগত উপস্থিতিতে উদ্বোধন ক্রিয়া সর্ব্বতোভাবে সাফল্যমণ্ডিত হয়।

চৌরঙ্গী রোডের উপর হইতে উক্ত প্রাসাদোপম বাটির নবনির্ম্মিত শ্বেত প্রস্তরের অতীব সুন্দর ও মনোহর সোপানাবলীর মধ্যস্থলে সিংহাসনের ন্যায় একটী সু-উচ্চ খিলানের অভ্যন্তরে কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতা কর্ম্মযোগী মহাপ্রাণ সচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সদাহাস্যময় একটি আবক্ষ মর্ম্মরমূর্ত্তি ধূপধুনাদিতে গন্ধামোদিত ও বিচিত্র পত্র-পুষ্প ও মাল্যাদিতে পরিশোভিত হইয়া এক মনোরম পরিবেশের সৃষ্টি করিয়াছিল। একদিন যে ভবন বিদেশী বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্রস্বরূপ ছিল, আজ তাহাতে দেশীয় শিল্পবাণিজ্য স্বাধিকারে আত্মপ্রতিষ্ঠ হইয়াছে, তাই দলে দলে ভারতীয়গণ সেই উদ্বোধন কার্য্যকালে উপস্থিত হইয়া চক্ষু সার্থক করিতে সোৎসাহে ছুটিয়া আসিয়াছিল, আর রক্ত-মাংসে উপস্থিতির ন্যায় সেই অপূর্ব্ব মূর্ত্তি দেখিয়া পরম পরিতোষ লাভ করিয়াছিল। সমাগত নরনারীগণ শ্রদ্ধাবনতচিত্তে সেই মহাপুরুষের উদ্দেশে সিঁড়ি দিয়া উঠিবার সময় সর্ব্বাগ্রে যখন তাঁহাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করেন, সেই অপূর্ব্ব মূক দৃশ্য বর্ণনা করার ভাষা নাই। ক্রমে সকলেই শান্তভাবে বিরাট হলটিতে স্ব স্ব স্থানে উপবেশন করেন।

কোম্পানীর সেক্রেটারী শ্রী অমূল্যভূষণ চট্টোপাধ্যায় সভার কার্য্য আরম্ভ হইবার ঘোষণা করিলে মেট্রো-পলিটান ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টার সচ্চিদানন্দের জ্যেষ্ঠপুত্র, সুযোগ্য পিতার সুযোগ্য সন্তান শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় উপস্থিত অতিথিবর্গকে সাদর সম্ভাষণ জানাইয়া ইংরাজীতে কোম্পানীর ইতিহাস ও আদর্শ সম্বন্ধে একটী নাতিদীর্ঘ সুলিখিত ও মনোজ্ঞ অভিভাষণ প্রদান করেন। কোম্পানীর ইতিহাস এবং আদর্শ সম্বন্ধে যখন তিনি নিবেদন করেন, তখন তাঁহার পাঠের গুণে ও গুরুগম্ভীর স্বরে শ্রোতৃবৃন্দ আনন্দে উল্লসিত হইয়াছিল। সুযোগ্য পিতার সমুন্নত ব্যক্তিত্ব ও কর্ম্মপ্রতিভা যে পুত্রের মধ্যেও সম্যক্‌রূপে স্ফূরণ লাভে সমর্থ হইয়াছে, শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্য্যের ভাষণে প্রতি ছত্রের মধ্যে উপলব্ধি করা যাইতেছিল। হিন্দুশাস্ত্রে আছে, যে ব্যক্তি উপযুক্ত পুত্র অথবা যে গুরু উপযুক্ত শিষ্য রাখিয়া তিরোহিত হন, তিনিই পূর্ণ মানব বা পূর্ণগুরু, সুতরাং অমরত্বের অধিকারী। কারণ তাঁহার কার্য্য ও শিক্ষার ধারা পুত্রে অথবা শিষ্যে অক্ষুণ্ণ থাকে। এক্ষেত্রেও তাহাই হইয়াছে।

অতঃপরে প্রধান অতিথি শ্রীযুক্ত রায় তাঁহার ভাষণ পাঠ করেন, আমরা তাহার সারাংশ নিম্নে প্রদান করিলাম।

রাজা ক্ষিতীন্দ্রদেব রায় মহাশয়, শ্রীযুক্ত চপলাকান্ত ভট্টাচার্য্য, ডাঃ নলিনাক্ষ সান্যাল ও শ্রীযুক্ত বিজয়রত্ন

মজুমদার অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করিয়া প্রতিষ্ঠাতার উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন ও কোম্পানীর অগ্রগতি কামনা করেন। অতঃপরে সভাপতি মহাশয় তাঁহার নাতিদীর্ঘ ভাষণে সচ্চিদানন্দের প্রতি শ্রদ্ধা ও সখ্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন।

রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চৌধুরী, দেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, অমূল্য-ভূষণ চট্টোপাধ্যায়, শৈলেন্দ্রনাথ সেন, সুরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, গৌরমোহন পাল, যোগেন্দ্রনাথ চৌধুরী, অমিয়

প্রতিষ্ঠাতা ম্যানেজিং ডিরেক্টর
৺সচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য

মুখার্জ্জি, ডাঃ ব্রজবল্লভ সাহা, ডাঃ সত্যব্রত ভট্টাচার্য্য, পি, কে, ঘোষ ও কোম্পানীর সহরের এবং বিভিন্ন স্থানস্থ কর্ম্মী ও কর্ম্মসচিবগণ, সমাগত ভদ্রমহোদয় ও মহিলাগণকে আদর আপ্যায়নে পরিতৃপ্ত করেন।

সভায় নানা প্রদেশ ও নানাজাতি ও সম্প্রদায়ের বহুলোক উপস্থিত হওয়ায় ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্য্যের অভিভাষণটি ইংরাজী ভাষায় প্রদত্ত হয়। নিম্নে উহা উদ্ধৃত হইল—

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্যের অভিভাষণ

* * *

On this auspicious day when we are shifting our Head Office from 11, Clive Row to this building, I hope, it will not be out of place to give a short sketch of the life of The Metropolitan Insurance Company Ltd.

Our Institution is only twenty years old. It started its life in a very humble tenanted place at 28, Pollock Street in the year 1930 and from there it shifted to 4B, Council House Street also as a tenant. From there it came to its own building at 11, Clive Row on the 9th of February, 1941, that is practically a decade after its inception. Since then the Company has rapidly grown from stength to strength so much so that the five-storied building at 11, Clive Row, soon became too small for it and we had to think seriously for a place where it could be properly accommodated. This, in short, is the history behind the purchase of this building.

In this context I may also mention that during the twenty years of its existence the Company has acquired an annual premium income of over one crore, a life-fund of nearly two and a half crores and a business-in-force of nearly twenty crores. During this period the Company has paid claims amounting to nearly fifty-five lacs This, ladies and gentlemen, is our modest achievement during the past twenty years, and it is our fervent hope that with the blessings of the Almighty God and with the good wishes of you all we shall be able to give a brighter account of ourselves in future.

While speaking of the progress of the Company my mind naturally goes to my field-workers. The progress of an insurance company depends no less on its field-workers and staff than on its management. As a matter of fact they are the real pillars on which the company stands and unless the field-workers, staff and the management can function as a compact team in complete co-operation and unision of purpose no satisfactory progress can be made. I extend to my field-workers, staff and officers my heartiest congratu-

বামে : ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করিতেছেন। মধ্যে : চেয়ারম্যান রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চৌধুরী (সভাপতি)। দক্ষিণে : প্রধান অতিথি শ্রীযুক্ত এস্. সি. রায়।

lations for the splendid co-operation they have rendered in bringing up the Company to its present position when it has been able to win for itself this historic building(at practically the focal point of Calcutta) and which will henceforth be called "The Metropolitan Insurance House."

But at the same time I should ask them not to feel proud of their achievement. I should rather say that we have just stepped into a position when we can claim that amount of confidence in the minds of the policy-holders and the general public without which the prosperity of an insurance company is not at all possible. But this success is only partial success because in these critical days when the conditions of life are becoming harder and harder, I know, there are members on our staff who cannot even make their both ends meet with what they are earning now. In my opinion the real success will be on that day when I shall feel that at least those

members of our staff who are co-operating with us, have the minimum requirements of their life and for which they will not have to worry at the end of the month which they have to do now. I do not know whether it will ever be possible for us to attain that goal. But I think this is not impossible. Any way this will depend mostly on our own initiative and actions.

If instead of setting ourselves to the realisation of that goal we allow ourselves to be proud of our present achievements and grow complacent, I am sure that in no time the spirit of co-operation that is prevailing among ourselves at the present time, will no more be there and vanity mixed with all sorts of complexes will creep in, which will be suicidal and I do not think any one of us has the moral right to think of such a thing which will be directly against the principle of the Company as laid down by my late lamented father and the Founder Managing Director of this institution, S r i Satchidananda Bhattacherjee.

Speaking of him, I think, I need not go into the past history of this institution which is known to most of you and it also does not look nice for a son to recount the achievements of his father on such an occasion.But I cannot refrain from saying that whatever partial success we have been able to achieve has been possible only by following the path shown by him and but for his spiritual guidance and blessings along with the living inspiration of my Chairman, Rai S. C. Chaudhuri Bahadur nothing could have been possible. I beg leave to take the privilege of this occasion to say that the picture of the country which we are seeing and feeling to-day was mostly predicted by late Sri S. Bhattacherjee as far back as in 1936 when nobody could even imagine of such consequences of the war. It might be that all his predictions might not have been correct; but most of them became true, specially those in respect of the economic condition of the country. So as a mark of respect to the memory of the departed great it has been decided to rename the 'Victoria Chambers', which, as you all know, is the name of the residential portion of this house—as "Satchidananda Chambers".

I will now request the President formally to declare open the 'Metropolitan Insurance House' and the 'Satchidananda Chambers'.

ইহার বঙ্গানুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল :

আজ এই শুভ উদ্বোধন দিবসে ১১ ক্লাইভ রো হইতে আমাদের হেড অফিস স্থানান্তরিত হইল। সুতরাং আশা করি, এমন দিনে মেট্রোপলিটান ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেডের একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস দেওয়া অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

আমাদের এই প্রতিষ্ঠানের বয়স মাত্র ২০ বৎসর। ১৯৩০ সালে ২৮নং পোলক ষ্ট্রীটে এক ভাড়া বাড়ীতে এই প্রতিষ্ঠান জন্মলাভ করিয়াছিল। পরে ঐখান হইতে অফিস ৪-বি কাউন্সিল হাউস ষ্ট্রীটের ভাড়া বাড়ীতে এবং সেখান হইতে আবার ১৯৪১ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারী ১১নং ক্লাইভ রোতে কোম্পানীর নিজ বাড়ীতে অফিস স্থানান্তরিত হয়। সে আজ ১০ বৎসরের কথা। ঐ সময় হইতে কোম্পানীর শক্তি উত্তরোত্তর এতটা বৃদ্ধি পায় যে, ক্লাইভ রো-এর প্রকাণ্ড পাঁচতলা বাড়ীটিও কোম্পানীর অফিসের পক্ষে অতি ক্ষুদ্র বলিয়া বিবেচিত হয়। সুতরাং কোম্পানীর অফিসের উপযুক্ত স্থান সংগ্রহের জন্য বিশেষ চেষ্টা চলিতে থাকে। বর্ত্তমান বাড়ীটি ক্রয়ের পূর্ব্বেকার ইহাই হইল সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, গত ২০ বৎসরে কোম্পানীর প্রিমিয়াম খাতে বার্ষিক আয়ের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১ কোটি টাকারও অধিক, জীবনবীমা তহবিলের পরিমাণ আড়াই কোটি টাকা ও চালু ব্যবসার পরিমাণ প্রায় ২০ কোটি টাকা। এই সময়ের মধ্যে কোম্পানী বীমাকারীদের দাবী পূরণ করিয়াছে প্রায় ৫৫

লক্ষ টাকা, গত ২০ বৎসরের এই প্রচেষ্টার ফলে আমাদের এখন এই আশা হইতেছে যে, ভগবৎ কৃপায় ও আপনাদের সকলের শুভেচ্ছা লইয়া আমরা ভবিষ্যতে কোম্পানীর এক উজ্জ্বলতর চিত্র অঙ্কিত করিতে সক্ষম হইব।

কোম্পানীর এই ক্রমোন্নতির কথা বলিতে গেলেই আমাদের সংগঠন-কর্ম্মীদের কথা মনে পড়ে। কারণ কোন বীমা কোম্পানীর শ্রীবৃদ্ধির অনেকখানিই নির্ভর করে কোম্পানীর সংগঠন-কর্ম্মী ও কর্ম্মচারীদের উপর। বস্তুতঃ তাঁহাদের প্রচেষ্টার উপরই কোম্পানীর ভিত্তি নির্ভরশীল। কাজেই এই সকল সংগঠন-কর্ম্মী, কর্ম্মচারী ও পরিচালকমণ্ডলী একত্রে ঐক্যবদ্ধ হইয়া পূর্ণ সহযোগিতার ভিত্তিতে কাজ না করিতে পারিলে কোন সন্তোষজনক উন্নতি হইতে পারে না। কাজেই যাহাদের প্রচেষ্টার ফলে আজ কোম্পানী ইহার বর্ত্তমান উন্নতির অবস্থায় পৌঁছিয়া কলিকাতার সর্ব্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ স্থানের এই ঐতিহাসিক ভবনটিতে স্থানান্তরিত হইবার সুযোগ লাভ করিয়াছে, আমাদের সেই সকল সংগঠন-কর্ম্মী, কর্ম্মচারীবৃন্দ ও অফিসারদিগকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাইতেছি। এখন হইতে এই ভবনের নতুন নাম হইল 'দি মেট্রোপলিটান ইন্‌সিওরেন্স হাউস'।

তবে এ কথাও আমি স্মরণ করাইব যে, আপনারা অহংভাব পোষণ করিবেন না। এ কথা সত্য যে, আমরা আমাদের কোম্পানীর বীমাকারিগণ ও জনসাধারণের আস্থা অর্জ্জন করিয়াছি। কিন্তু এ সাফল্য আংশিক মাত্র। কারণ দেশ এক গুরুত্বপূর্ণ সঙ্কটের মধ্য দিয়া চলিতেছে। জীবনযাত্রা ক্রমেই কঠোরতর হইতেছে। আমাদের কর্ম্মচারীদের মধ্যে অনেকে আছেন যাঁহারা তাঁহাদের বর্ত্তমান আয় দ্বারা এমন কি দুই বেলা পেট পুরিয়া খাইতে পারেন না। আমাদের এই যে সকল কর্ম্মচারী আমাদের প্রচেষ্টায় সহযোগিতা দান করিতেছেন, তাঁহারা যখন তাঁহাদের ন্যূনতম প্রয়োজনগুলি মিটাইতে সক্ষম হইবেন এবং তাঁহাদের দুশ্চিন্তার কারণ দূর হইবে, সেই দিনই আমাদের প্রচেষ্টা প্রকৃত সফল হইল বলিয়া আমি মনে করি। আর আমাদের চেষ্টা ও উদ্দীপনা দ্বারা এই কাজ আমরা করিতে পারিব—এমন ভরসা রাখি। কাজেই ঐ লক্ষ্যে পৌঁছিবার জন্য চেষ্টা না করিয়া আজ যদি আমরা শুধু গর্ব্ব বোধ করিতে থাকি, তাহা হইলে আমার আশঙ্কা হয় যে, হয়ত আমরা সহযোগিতার মনোভাব হারাইয়া ফেলিব। এবং এই কোম্পানীর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর আমার স্বর্গত পিতা শ্রীসচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য যে আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া এই কোম্পানীর পরিচালনা করিয়া গিয়াছিলেন, সেই আদর্শই ক্ষুণ্ণ হইবে। এই কোম্পানীর জন্য পিতা কি করিয়া গিয়াছেন তাহা আপনাদের অধিকাংশেরই সুবিদিত। সুতরাং পুত্র হইয়া আমার পক্ষে সে অতীত ইতিহাসের পুনরুল্লেখ করা শোভন নহে। তবে একথা আমি না বলিয়া পারিতেছি না যে, তাঁহারই আদর্শ অনুসরণ করিয়া আমরা এই আংশিক সাফল্য অর্জ্জন করিতে সক্ষম হইয়াছি। তাঁহার চিন্তাধারা ও আশীর্ব্বাদ এবং তৎসহ ডিরেক্টর বোর্ডের বর্ত্তমান চেয়ারম্যান রায় এস. সি. চৌধুরী বাহাদুরের সদাজাগ্রত অনুপ্রেরণা ব্যতীত আমাদের প্রচেষ্টা এতখানি ফলবতী হইতে পারিত না। আজ আমরা দেশের যে অবস্থা ও চিত্র সম্মুখে দেখিতেছি, ১৯৩৬ সালেই স্বর্গত শ্রীসচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য মহাশয় এই পরিস্থিতি সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন। তাঁহার সেদিনের ভবিষ্যদ্বাণীর সব কিছুই হয় ত অক্ষরে অক্ষরে সত্য হয় নাই। কিন্তু অধিকাংশই এবং বিশেষ করিয়া অর্থনীতির ক্ষেত্রে তাঁহার অনেক কথাই সত্য প্রমাণিত হইয়াছে। কাজেই সেই মহাপুরুষের পুণ্যস্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শনস্বরূপ এই নূতন ভবনটির পুরাতন আবাসিক অংশ ভিক্টোরিয়া চেম্বার্সের নূতন নাম রাখা হইল "সচ্চিদানন্দ চেম্বার্স"।

এখন আমি মেট্রোপলিটান ইন্সিওরেন্স হাউস ও সচ্চিদানন্দ চেম্বার্সের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ঘোষণা করিবার জন্য এই সভার সভাপতি মহাশয়কে অনুরোধ জানাইতেছি

অতঃপর শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্য্য সভাপতি ও প্রধান অতিথি এবং উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি শ্রীএস, সি, রায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন—ভারতীয় বীমা শিল্পের সভাপতি হিসাবে

আমি এই ব্যবসায়কে সেবা করিবার কার্য্যারম্ভ সুযোগ পাইয়াছি। ভারতীয় বীমা ব্যবসায়ের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া আপনারা আপনাদের নিজস্ব ব্যবসায়কেই জোরদার করিয়াছেন।

মেট্রোপলিটান কোম্পানী তাহার নতুন ভবনে স্থানান্তরিত হওয়ায় এই দিনটিকে 'স্মরণীয়' আখ্যা দিয়া শ্রীযুক্ত রায় বলেন যে, ১৯৩০ সালে প্রতিষ্ঠিত হইয়া মাত্র বিশ বৎসরের মধ্যেই মেট্রোপলিটান কোম্পানী বীমা ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান গ্রহণ করিয়াছে।

তিনি বলেন, ১৯৪৩ সালে কোম্পানী মাত্র দেড় কোটী টাকার ব্যবসা করিত; অথচ ১৯৫০ সালের মধ্যে উক্ত টাকার অঙ্ক ৭ কোটী ৭ লক্ষে পৌঁছে, ইতিমধ্যে কোম্পানীর বীমা ফণ্ড সাড়ে ৪১ লক্ষ হইতে ২ কোটীতে উন্নীত হইয়াছে। আমেরিকার সহিত ভারতের বীমা ব্যবসায়ের তুলনা করিয়া শ্রীযুক্ত রায় প্রত্যেককে বীমা ব্যবসায়কে উন্নত করিয়া তুলিবার কাজে সর্ব্বাঙ্গীন ভাবে সহায়তা করিবার জন্য আবেদন জানান।

জাতীয় জীবনে জীবনবীমার স্থান নির্দ্দেশ করিতে গিয়া শ্রীযুক্ত রায় বলেন যে, ইহা বলা অত্যুক্তি হইবে না যে, বীমা সমাজের প্রত্যেকের নিরাপত্তার প্রতিভূস্বরূপ। শ্রীযুক্ত রায় আশা প্রকাশ করেন যে, পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্য-বাদের প্রভাবমুক্ত হইয়া অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জ্জনে মেট্রোপলিটান কোম্পানী দেশ ও জাতিকে গভীরভাবে সহায়তা করিবে।

সভাপতির ভাষণে কোম্পানীর বর্ত্তমান চেয়ারম্যান রায় শ্রীসতীশচন্দ্র চৌধুরী বাহাদুর বলেন, '১৯৩০সালে যখন আমি আমার বন্ধু স্বর্গগত সচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্যের সহিত এই প্রতিষ্ঠানটি স্থাপন করি, তখন ভাবিতেও পারি নাই যে, আমার সম্মুখ হইতে তিনি চিরকালের জন্য এই পৃথিবী হইতে বিদায় গ্রহণ করিবেন। আজ হইতে এই বাড়ীর নাম হইবে মেট্রোপলিটান ইনসিওরেন্স হাউস এবং আবাসিক ঘরগুলির নাম হইবে 'সচ্চিদানন্দ চেম্বার্স'।

সভায় ভারতের নানা প্রদেশবাসী অসংখ্য বিশিষ্ট ব্যক্তি ব্যতীতও শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ বিশিষ্ট সাংবাদিক ও সাহিত্যিকবৃন্দও উপস্থিত থাকেন।

বক্তৃতা প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত চপলাকান্ত ভট্টাচার্য্য কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া এই আশা প্রকাশ করেন যে, দেশবাসীর সেবায় নিয়োজিত এই প্রতিষ্ঠান ভারতের সর্ব্বত্র জনসাধারণের অকুণ্ঠ সহযোগিতা ও সমর্থন লাভ করিয়া উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধির পথে অগ্রসর হইবে।

অতঃপরে চপলাবাবু পরলোকগত কর্ম্মবীর সচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য ও বর্ত্তমান ম্যানেজিং ডিরেক্টর দেবেন্দ্রনাথের কর্ম্মতৎপরতার সাধুবাদ প্রদান করিয়া পিতা যে উপযুক্ত পুত্রের হস্তে কর্ম্মভার অর্পণ করিয়া স্বর্গধামে গিয়াছেন, ইহাতে তাঁহার পূর্ণ মনুষ্যত্বই প্রতিভাত হয়—"পুত্রে যশসী তোয়ে চ নরাণাং পূর্ণলক্ষণম্" বলিয়া উল্লেখ করেন।

মেট্রোপলিটান ইন্সিওরেন্স হাউসের নূতন ভবন

মেট্রোপলিটান কর্ম্মী-সম্মেলন

মেট্রোপলিটান ইন্স্যুরেন্স্ কোম্পানীর ৭ নং চৌরঙ্গী রোডস্থ নবতম ভবনে কোম্পানীর কর্ম্মীবৃন্দের এক অপূর্ব্ব সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য সমবেত কর্ম্মীবৃন্দকে অভ্যর্থনা জানাইয়া সম্মেলনে পৌরোহিত্য করেন। উদ্বোধন করেন কোম্পানীর সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত অমূল্যভূষণ চট্টোপাধ্যায়। বৃহত্তর ভারতের বোম্বাই, দিল্লী, পাটনা, বিলাসপুর, নাগপুর, বেজওয়াদা, মাদ্রাজ প্রভৃতি বিভিন্ন অঞ্চলের শাখা-অফিসগুলি হইতে শ্রীশান্তনম ভেডেরা, ওম্ প্রকাশ

শ্রীযুক্ত অমূল্যভূষণ চট্টোপাধ্যায়
উদ্বোধনী-ভাষণ দিতেছেন।

গুপ্ত, খগেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী, হীরালাল মুখোপাধ্যায়, সুধীর মুখার্জ্জি, ডি, ভেঙ্কটাপ্পারলু, নরেন্দ্র নাথ চৌধুরী, হৃষিকেশ সেনগুপ্ত, ডি. এন. দত্ত, রাজেন্দ্র সেনগুপ্ত, নীরদ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, মুণীন্দ্রনাথ বসু, টি. আর. বনশাল, এম. এস. পি. রাও, এ. এম্. সুন্দরম্, এস. এন. গাঙ্গুলী, কে. বি. মুখার্জ্জি, সর্দ্দার অভয় সিং প্রমুখ বিভিন্ন এজেন্সী ম্যানেজার, অফিসার, অর্গানাইজেসন অফিস-ম্যানেজার ও হেড্ অফিসের কন্‌ট্রোলার অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকিয়া সম্মেলনকে সার্থক-মণ্ডিত করেন। ম্যানেজিং ডিরেক্টার ও সেক্রেটারীর নাতিদীর্ঘ অভিভাষণের পর উপস্থিত ব্যক্তিবৃন্দের মধ্য হইতে অনেকে বক্তৃতা করেন। গত কুড়ি বৎসরে মেট্রোপলিটান ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী যে অসামান্য কৃতিত্ব দেখাইয়াছে, এবং তাহাতে ৺সচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কর্ম্ম-প্রতিভাই যে বিশেষ ভাবে প্রকটিত হইয়াছে, সকলের বক্তৃতায় তাহাই প্রকাশ পায়। অনুষ্ঠান-শেষে সকলকে জলযোগে আপ্যায়িত করা হয়।

পরের দিন সমবেতভাবে বরানগর লক্ষ্মীনারায়ণ নিবাসে উক্ত কর্ম্মীবৃন্দ সচ্চিদানন্দ ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী সরোজিনী দেবীর স্মৃতিস্তম্ভে পুষ্পস্তবক-সহ শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করেন। পরে তাঁহাদিগকে লইয়া দক্ষিণেশ্বরের মন্দির, বেলুড় মঠ ও গান্ধী-ঘাট প্রদক্ষিণ করা হয়। সন্ধ্যায় মেট্রোপলিটান ক্লাবের উদ্যোগে 'গৈরিক পতাকা' অভিনীত হয়। অভিনয়ে রামদাস স্বামী প্রমুখ প্রত্যেকেই নিজ নিজ ভূমিকায় কৃতিত্বের পরিচয় দেন। এবং পাঁচ হাজার লোকের সম্মুখে অনুষ্ঠিত অভিনয়টি কলাসম্মত ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয়।

আমাদের ধ্রুব বিশ্বাস—ম্যানেজিং ডিরেক্টর, অফিসারবর্গ, ষ্টাফ্ এবং কর্ম্মিগণের মধ্যে এই অপূর্ব্ব প্রীতিবন্ধনই মেট্রোপলিটান কম্পানীর এই বিরাট সাফল্যের প্রধান কারণ। ভরসা করি, চিরকাল ইহা অক্ষুন্ন থাকিবে এবং অচিরেই ইহার প্রভাব সারা ভারতের ন্যায় সমগ্র পৃথিবীতেই পরিব্যাপ্ত হইবে।

ইতিহাস

অনেকগুলি মানুষের এক মিছিল প্রশস্ত রাজপথ ধরিয়া চলিতেছিল। সাঁজোয়া মানুষের মিছিল নয়, সাধারণ মানুষের মিছিল। তাও সাধারণ মানে অতি সাধারণ। যেমন পোষাকে আষাকে, তেমন চেহারায়, তেমনি ভাবে ও ভঙ্গিতে। প্রত্যেকেরই চোখে মুখে কেমন একটা হন্যে কুকুরের মতো ক্ষুধার্ত্ত উদ্‌ভ্রান্তি, যেন লোকগুলি পারে তো পথের ধূলাবালি আর হাওয়া

খাইয়াই পেট ভরায়। বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গিয়াছিল যে মানুষগুলা প্রায় একটানা মাস তিনেক সময় ধরিয়া পেট ভরিয়া খাওয়া তো দূরের কথা, পেটের সিকিভাগ ভরাইয়াও কোনো খাদ্য খাইতে পায় নাই। অথচ উহাদের দলের অর্দ্ধেকেরই বেশী মানুষ কৃষিজীবী শ্রেণীর —যাহারা শুধু নিজেদেরই জন্য নয়, অন্য মানুষেরও পেটের জোগান দিতে গিয়া নিজেদের হাতে খাদ্য ফলায়। এবং সেই পরিমাণের খাদ্যের ফসলও নাকি উহারা এই উল্লিখিত নির্দ্দিষ্ট সালেও ফলাইয়াছিল।—মিছিলটার লক্ষ্য মানুষগুলির তাবৎ ঐহিক ব্যাপারের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা যিনি সেই তাহাদের শাসনকর্ত্তার প্রাসাদের অভিমুখে।

বলা বাহুল্য সারা মিছিলটা ছিল অত্যন্ত নিরামিশ রকমের নিরস্ত্র। উপবাসে উপবাসে একটা ইটের ঢেলা ছুঁড়িয়া মারারই মতো ফুসফুসের জোর ছিল না কাহারো, তার আবার হাতিয়ার চালাইয়া বাহির হওয়া। তা ছাড়া যে আয়োজনে এই মিছিল তার উদ্দেশ্যই ছিল পৃথক।—মানুষগুলি জানিত যে দুইবেলা পেট ভরিয়া খাইবার মতো ফসল এ সালেও তাহারা সমান ভরিয়া তুলিয়াছি, অথচ সেই ফসলই যে কোন্ এক গুপ্তিত অনাবিষ্কৃত সুরঙ্গ ধরিয়া কোথায় উধাও হইয়া গেল, সেই হদিশ উহারা আজও পাইল না। বণ্টনের ভার ছিল রেজ্‌কি-রাজকর্ম্মচারীদের, এই রহস্য তাহাদের জানার কথা ছিল। কিন্তু তাহাদের কাছে এসব কথা জানিতে চাহিবে কেন! কাহার ঘাড়ে ক'টা এমন উদ্বৃত্ত মাথা! জানিতে চাওয়া চুলায় যাক, এই ধরণের কোনো অমার্জ্জনীয় কৌতূহল কাহারো মনে বাসা বাঁধিয়াছে, ইহা কোনোক্রমে জানাজানি হইয়া গেলেই প্রাণ নিয়া টানাটানি হইবার উপক্রম! এই কারণেই নিতান্ত নিরুপায় হইয়াই মানুষগুলি এইভাবে সেদিন পথে বাহির হইয়াছিল—অর্থ হইল জলের আবর্ত্তে পড়িলে স্থলচর জীব ডাঙা পাইবার আকাঙ্ক্ষায় ঠিক যতখানি নিরুপায় হইয়া চলতি স্রোতের খড়াকুটাকেও ভাসিয়া থাকার অবলম্বন বলিয়া আঁকড়াইয়া ধরে—ঠিক সেইরকম নিরুপায় হইয়া। ওরা আজ সরাসরিই গিয়া শাসনকর্ত্তার কাছে দরবার করিতে চায়। নালিশ নয়, বিক্ষোভ নয়, সব কথা জানাইয়া তারা কেবল তাদের সেই মহামহিম শাসনকর্ত্তার সমীপে গিয়া গলবস্ত্রাবস্থায় এই প্রার্থনাটুকু জানাইবে যে—হুজুর, না খাইতে পাইয়া গায়ের হাড়মাংসগুলা আর আমাদের একত্র হইয়া থাকিতে চাহিতেছে না। অন্ততঃ সেটুকুও যাতে বজায় থাকে তেমন একটা কিছু বরাদ্দ মঞ্জুর করিয়া দিন।—এই সামান্য প্রজাকৃত্যটুকুর অনুষ্ঠান ব্যতীত যে আর কোনরূপ উত্তপ্ত উদ্দেশ্যই এই মিছিলবদ্ধ মানুষগুলার ছিল না, তার আর একটি বড় নজির এই মিছিলটার উদ্যোক্তা আর পরিচালক ছিলেন যাঁহারা,তাঁহারা। ইঁহারা সবাই ছিলেন সমাজের সেই বিশেষ গোষ্ঠীর মানুষ, যাঁহারা মানুষের মন হইতে তাহার বহুমুখী পাশববৃত্তিটাকে সর্ব্বতোভাবে উচ্ছিন্ন করার ব্রতই তাঁহাদের আমরণ নিষ্ঠাকে উৎসর্গীকৃত করিয়াছেন।

ঠিক যে কোথা হইতে আরম্ভ হইয়াছিল মিছিলটা সে কথা সপ্রমাণে নিশ্চিত করিয়া বলা শক্ত। তবে যেখান হইতেই হোক্, প্রাসাদের বেশ কাছাকাছি আসিয়া পৌছিতে সে মিছিলের জনসংখ্যা যত ছিল, সুরুতে তার এক দশমাংশ ছিল কি না সন্দেহ। খুব উঁচু পাহাড়ের উপর হইতে খসিয়া পড়া বড় একটা পাথরের চাঁই যেমন নীচে নামিবার মুখে তার গতিবেগের প্রচণ্ডতার বলে তার চলতিপথের আর আর সমুদয় ছোট বড় শিলাখণ্ডকেও সঙ্গে নিয়া এক শিলাস্রোতের রূপধারণ করিয়া নামিতে থাকে, এ মিছিলটাও তেমনি তার চলার পথ হইতে লোক টানিয়া নিয়া আগাইতেছিল। ঠিক এই ভাবে আগাইতে আগাইতে মিছিলটা যখন প্রায় গন্তব্য স্থানের সমীপে আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন উহাতে মানুষের সংখ্যা হইবে প্রায় কয়েক হাজার।

প্রাসাদকূটের কোনো নিভৃত কোটরে বসিয়া এই মিছিলের উদ্দিষ্ট মানুষটি তখন কী করিতেছিলেন কে জানে! তবে এই মিছিলের কথা তিনি জানিতেন। জানিতেন মানে অবশ্য কয়েকটা ঘণ্টা আগেকার কথাই জানিতেন, যখন সর্ব্ব সাকুল্যে মাত্র শ'ছয়েক লোক ছিল সারা মিছিলটায়, সেই তখনকার খবর। মিছিলের আয়তনটা যে এত বড় হইতে পারে তা তিনি কল্পনাও করিতে পারেন নাই। প্রাসাদকূটে বসিয়া তাই তিনি যখন দূর হইতে ভাসিয়া আসা প্লাবননির্ঘোষের মতো একটা কলধ্বনি শুনিতে পাইলেন, তখন বোধহয় তিনি আঁতকাইয়া উঠিলেন। ব্যস্ত আহ্বানে, সভাষদ, পারিষদ সেপাই-সামন্ত যে যেখানে তাহাদের সকলকে ডাকিয়া

অড়ো করিলেন তিনি। তারপর অত্যন্ত অস্ফুট স্বরে সকলকেই কী যেন একটা পরামর্শ দিলেন।

মিছিলটা ততক্ষণে প্রায় প্রাসাদের সম্মুখে আসিয়া থামিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে প্রাসাদের সম্মুখ দিকের নানা অংশেই আসিয়া দাঁড়াইয়াছে অনেকগুলো মানুষ। কতক্ষণ আগে প্রাসাদের নিভৃত কোটরে বসিয়া হুজুর অস্ফুটস্বরে যাহাদের কিছু উপদেশ দিয়াছিলেন, ইহারা তাহারাই। রাজকীয় বেশভূষার দস্তর অনুযায়ী তাহাদের প্রত্যেকেরই হাতে একটি করিয়া আগ্নেয়াস্ত্র। মিছিলের জনতা ভাবিল, সদাশয় হুজুর নিশ্চয়ই আগে ভাগেই তাঁর বশম্বদ প্রজাদের আগমনের কথা জানিতে পারিয়াছেন। তিনি তাহাদের দরবারে নিবেন। রাজকীয় প্রথার অঙ্গ হিসাবে আগ্নেয়াস্ত্রী মানুষগুলি বোধ হয় সেই শুভ-অনুষ্ঠানেরই অগ্রদূত হইয়া আসিয়া প্রাসাদের সম্মুখে দাঁড়াইয়াছে।—জনতা সমস্বরে হুজুরের জয়ধ্বনি করিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল।

হঠাৎ সেই তুমুল হর্ষধ্বনিটাকে ছাপাইয়া আর একটা শব্দ।

আশেপাশের গাছগুলিতে নিরাপদ আশ্রয়ে যত পাখী বসিয়াছিল, সেই আকস্মিক আওয়াজটার আচমকা আঘাত যেন গিয়া তাহাদের ছোবল মারিল। পরক্ষণেই গাছ-টাছ ফেলিয়া প্রাণপণে দিগ্বিদিকে কোথায় ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল পাখীগুলি। আর এদিকে মাটির উপরে দেখা গেল—মিছিলটার সামনের ভাগে কতক-গুলি দেহ রক্তে মাখামাখি হইয়া ধূলার উপরে ছটফট করিতেছে।—বিস্মিত হইবারও সময় পাইল না লোকগুলি—ঘটনাটি এত আচম্বিতে ঘটিয়া যায়।

মুহূর্ত্তকালমধ্যেই আবার সেই শব্দ, আর সঙ্গে সঙ্গেই আবার কয়টি রক্তাক্ত দেহ ধূলায় লেপটাইয়া ধড়ফড় করিতে থাকে। মিছিলের হতভম্ব জনতা এই-বারে বুঝিল এ ব্যাপারখানা কী! প্রাসাদের নানা অংশে দাঁড়ানো মহামান্য হুজুরের সেই সশস্ত্র রক্ষীবাহিনী জনতার উদ্দেশ্যে অভ্যর্থনা জানাইতেছে—যে কোনো অতিথি-রাজপুরুষের শুভাগমন ঘটিলে বন্দুকের পর বন্দুক দাগিয়া যথাযোগ্য আড়ম্বরে যেমন তাঁহাকে সম্বর্দ্ধিত করা হয়, প্রায় ঠিক সেই রাজকীয় আদবেই প্রাসাদরক্ষীদল এই মিছিলকেও অভ্যর্থনা জানাইতেছে। শুধু সামান্য একটু পৃথক ভাবে। রাজপুরুষদের অভ্যর্থনার বেলায় রাজরক্ষীরা বন্দুকগুলা দাগে ব্যারেলগুলি আকাশের দিকে উঠাইয়া; কিন্তু উপস্থিত ক্ষেত্রে সম্ভবতঃ রাজপুরুষদের চেয়েও অধিক সম্মান দিবার জন্য তারা বন্দুকগুলি একেবারে জনতার মাথা আর বুক ঠিক করিয়াই দাগিয়াছিল।—সহসা স্তম্ভিত আতঙ্কের এক দিশাহীন ক্ষ্যাপাটে রোল পড়িয়া যায় সেই মিছিলে। এবং ইহার পরমুহূর্ত্তেই কিছুক্ষণ আগেকার সেই শঙ্কাক্ষিপ্ত ত্রস্ত পাখীগুলির জন্য মিছিলান্তর্গত লোকগুলিও দৌড় দিল যে যেদিকে পারে। চোখের পলক ফেলিতে না ফেলিতেই ছত্রাকার হইয়া গেল সেই হাজার হাজার মানুষের মিছিলটা। অবশ্য রাজকীয় গুলির সম্বর্দ্ধনা লাভ করিয়া যাহারা ধূলায় রক্তে গড়াগড়ি যাইতেছিল, তাহারা সেই অকুস্থলেই রহিয়া গেল।···

উপরে যে বিবরণটি দেওয়া গেল সেইটি পাঠ করিয়া পাঠকদের প্রায় সকলেই সম্ভবতঃ খুব বিস্মিত হইয়া যাইবেন, ক্রুদ্ধও হইবেন কেহ কেহ, এবং আমাদের উদ্দেশে কোনো কটুক্তি করিয়া তাহারা মন্তব্য করিবেন যে, এই যদি কুচবিহারের গুলিবর্ষণের যথার্থ বর্ণনা হয়, তাহা হইলে লেকসাকসেসের পুত্তলিকা পরিষদে দাঁড়াইয়া পাকিস্তানের পররাষ্ট্র সচীবটি মাসের পর মাস ধরিয়া কাশ্মীর সম্পর্কে যে ভাষ্য করিয়া যাইতেছেন সে ভাষ্যকে অকৃত্রিম ও অকাট্য সত্য বলিয়া ধরিয়া নিতে হইবে। সেদিন—কুচবিহারে যে শোচনীয় কাণ্ডটি ঘটিয়া গেল, সেই কাণ্ডের ষোলো আনার চার আনা ঘটনাও আমাদের এই বিবরণে স্থান পায় নাই।

কিন্তু ভুল বুঝিবার এমন কোনো সম্ভাবনা উদিত হইবার আগেই পাঠকদিগকে আমরা জানাইয়া রাখি যে, উপরে যে বিবরণটি আমরা দিয়াছি, সেইটি আদৌ কুচবিচার সম্পর্কিত কোনো ঘটনা নয়—এদেশেরই ব্যাপার নয় কোনো। এবং বর্ত্তমান কেন, কাছাকাছি কোনো অতীতেরও ঘটনা এইটি নয়। এই ঘটনা ঘটিয়াছিল আজ হইতে প্রায় দীর্ঘ ছেচল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে—১৯০৫ সালে, রুশীয় জারের শীত প্রাসাদের সামনে। সেই হইতে পৃথিবীর ইতিহাসে 'রক্তময় রবিবার' এই বলিয়া দিনটি একটি বিশেষ খ্যাতি বহন করিয়া আসিতেছে।

এ-দফায় পাঠকেরা বোধ হয় দ্বিতীয়বার বিস্মিত

হইয়াছেন। এবং মনে মনে বিস্মিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিয়াছেন—আশ্চর্য্য, এ তো দেখিতেছি অবিকল কুচবিহারেরই ঘটনা। ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি এমন হুবহু ভাবে ঘটিতে পারে? এবং ইহার পরেই খতাইয়া চিন্তা করিয়া হয়তো মন্তব্য করিতেছেন,—কিন্তু, কিন্তু—এই রক্তময় রবিবারের সূত্রপাত হইতেই না সারা রুশিয়া দেশটা অতি ভয়াবহ রকমের এক রাষ্ট্রীয় হাঙ্গামায় লিপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল? আর, ১৯১৭ সালেরও না আবির্ভাব হইয়াছিল এই ১৯০৫-এর রক্ত রবিবারের পথ অনুসরণ করিয়াই?—বলিয়া রাখা ভালো, একেবারে শেষের মন্তব্যটি যে পাঠক করিবেন, সেটি অবশ্যই তাঁহার নিজের উক্তি নয়। কারণ আজ হইতে বছর উনিশ আগে ঠিক ঐ উক্তিটিই উচ্চারণ করিয়াছিলেন আমাদের প্রধান মন্ত্রী শ্রী নেহরু স্বয়ং।

কুচবিহারের গুলি সম্পর্কে আমাদের নিজেদের তরফ থেকে বলার কিছু নাই। শুধু একটি বিষয়ের প্রতি আমরা পাঠকদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিব, সে বিষয়টি হয়তো উত্তেজনামুখর বহু সংবাদের হট্টগোলে অনেকেরই নজর এড়াইয়া গিয়াছে। যে বৈশাখী পূর্ণিমার দিনে কুচবিহারের অধিবাসীদিগের উপর গুলি চলিয়াছিল, সেইদিন, ঠিক সেই দিনই ভারত পার্লামেন্টের সমবেত সদস্যদের মধ্যে একটি বিলকে কেন্দ্র করিয়া খুব আন্তরিক আলোচনা চলিতেছিল।—বত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে ঠিক এমনই এক বৈশাখী পূর্ণিমার পুণ্যতিথিতে ভারতীয় পুলিশবাহিনীর এক উন্মত্ত অফিসারের দানবীয় আনন্দের যূপকাষ্ঠে এমনই কয়টি নিরস্ত্র ভারতীয় প্রাণ বলি দিয়াছিল। উল্লিখিত বিলটি দিয়া ভারত সরকার সেই শহীদদের পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশে এক স্মৃতিমন্দির নির্ম্মাণের প্রস্তাব করিতেছিলেন—জালিয়ানওয়ালাবাগের শহীদদের স্মৃতিমন্দির।

মাঝে মাঝে মাথা খারাপ ইতিহাসটা যে কী ঠাট্টাই করিতে পারে!

শান্তি সম্মেলন

সম্প্রতি কলিকাতায় পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক শান্তি সম্মেলন শেষ হইয়াছে। প্রথিতনামা লেখক, শিল্পী, নাট্যকার, নট, গায়ক, জননেতা, ট্রেড ইউনিয়ান, কৃষক কর্ম্মী ও বিভিন্ন বামপন্থীদল ইহাতে অংশ গ্রহণ করেন। শান্তির জন্য দলমতনির্ব্বিশেষে প্রত্যেক মানুষ যে আগ্রহশীল এবং প্রয়োজন হইলে উহার জন্য সংগ্রাম করিতেও ইঁহারা দ্বিধা করিবেন না, এই সম্মেলনের সফলতা ইহার প্রমাণ। গত বৎসরের পশ্চিমবঙ্গ শান্তি সম্মেলনে এই জনপ্রিয়তা বা সর্ব্বদলীয়তা পায় নাই। উহা একটি দলেরই কুক্ষিগত ছিল। কিন্তু এবারে ডাঃ কিচলু প্রমুখ বিভিন্ন নেতারা উহা পরিষ্কার ভাবেই বুঝাইয়া দিয়াছেন। তাছাড়া বার্লিন শান্তিপত্রে যে দেড় লক্ষ সই উঠিয়াছে, তাহার মধ্যে বিশিষ্ট ব্যবসায়ী হইতে বিশিষ্ট কংগ্রেসসেবী শ্রমিক-কৃষক সকলেই আছেন। শান্তির জন্য সকলের উৎকণ্ঠা সমভাবেই প্রকাশ পাইয়াছে। ইহা এই সম্মেলনের সফলতা।

ইংরাজ রাজত্বের ছায়ায় আমরা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ দেখিয়াছি। দেখিয়াছি যুদ্ধের প্রয়োজনে মানুষের যাহা কিছু মহৎ, যাহা কিছু সুন্দর, দেশ গঠনের উপাদান—সমস্তই ধ্বংস হইয়া গেছে। লক্ষ লক্ষ স্ত্রী-পুরুষ-শিশু এক মুষ্টি অন্নের জন্য আর্ত্তনাদ করিয়া ফিরিয়াছে। বোমার ভয়ে মানুষ বাস্তু ত্যাগ করিয়া নূতন ভিটা খুঁজিয়াছে; যুদ্ধের প্রয়োজনে খাদ্য সরাইয়া ফেলা হইয়াছে! তাই অতি স্বাভাবিক ভাবেই সাধারণ মানুষের আজ যুদ্ধের প্রতি দুর্ব্বার ঘৃণা। তাই কোরিয়ায় যে সব বিদেশী সৈন্য রহিয়াছে, তাহাদের অবিলম্বে সরাইয়া আনিবার ডাক সে দিয়াছে। বাহির হইতে গিয়া যাহারা সে যুদ্ধ জিয়াইয়া রাখিয়াছে, সেই আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদীদের সাধারণ লোক দৃপ্তকণ্ঠে যুদ্ধাপরাধী বলিয়া ঘোষণা করে। যদিও তাহাদের কণ্ঠ এখনো খুব বেশী জোরদার হয় নাই, তবু এই শান্তি সম্মেলনগুলি হইতে সেই সম্ভাবনার সূচনা হইয়াছে।

শান্তি সম্মেলন যে প্রস্তাবগুলি লইয়াছেন, তাহা সকল মানুষেরই সমর্থন পাইবে নিশ্চয়। ইংরেজ, মার্কিন, রাশিয়া, চীন ও ফ্রান্স এই পঞ্চ শক্তির শান্তিচুক্তির জন্য দাবী করা হইয়াছে এবং সেই চুক্তির জন্য ভারত চেষ্টা করুক যাহাতে ভারতেই সেই সম্মেলন ডাকা হয়। চীনকে জাতিসংঘে তাহার ন্যায্য আসন দিতে হইবে, যুদ্ধের প্রচার বন্ধ করিতে হইবে, পাকিস্থান ও ভারত মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ হোক, নির্ব্বাচনে প্রতিটি কার্য্যক্রমকে স্থান দান ইহাও সম্মেলন দাবী করেন। জাপানের পুনরস্ত্রসজ্জা

করা চলিবে না। এই যে দাবী, এগুলি পশ্চিমবঙ্গ তথা সমস্ত ভারতই সমর্থন করিবেন সন্দেহ নাই।

সম্মেলনের কয়েকটি দুর্ব্বলতাও চোখে পড়ে। কর্ম্মপন্থা ও কার্য্যক্রম উপস্থিত করার ব্যাপারে মতপার্থক্য,, দলীয় অন্তর্দলীয় অসহিষ্ণুতার প্রকাশ পাইয়াছে। অবশ্য মূল শান্তিপ্রশ্নে বিরোধ না থাকায় আমরা আশা করি অন্যান্য মতপার্থক্যও ধীরে লোপ পাইবে।

ইহা ছাড়া যাহা গুরুতর, তাহা হইল এইবারকার সম্মেলনে শ্রমিক ও কৃষক প্রতিনিধির অংশ অত্যন্ত কম। মধ্যবিত্তের মধ্যেই এবারকার উৎসাহ সীমাবদ্ধ। সাধারণ ভাবে মুসলমান পল্লীতে সম্মেলনের স্থান হইলেও তাঁহারা ইহাতে যোগ দেন নাই

সম্মেলনের শেষে তিনটি দিন যে সাংস্কৃতিক উৎসব হইয়াছে, তাহা প্রচুর লোককে টানিয়াছে। সাধারণ লোকে যেন শান্তি সম্মেলন হইতে এইটাকেই চাহিয়াছে বেশী মনেপ্রাণে। কিন্তু উহাও সফল হয় নাই। কেননা সঙ্গীত বা যন্ত্রসঙ্গীত যাহাই হইয়াছে, তাহা সাধারণ জল্সার রূপ লইয়াছে। ঐগুলির মধ্য দিয়া শান্তির প্রচারের প্রচেষ্টা ছিল না। কলিকাতার প্রখ্যাত শিল্পীরা প্রায় সকলেই আসিয়াছেন, কিন্তু সকলেই নিজ নিজ প্রিয় সঙ্গীত অনুষ্ঠানে করিয়াছেন। হয়ত অর্থ সংগ্রহের জন্য সম্মেলনের পাণ্ডারা ইহা করিয়াছেন, কিন্তু সফল হয় নাই।

এই সম্মেলন হইতেই শান্তি আন্দোলনের এক নূতন পর্য্যায় শুরু হইবে। সমস্ত প্রকার সংকীর্ণতা ও অনৈক্যের বাধা অপসারণ করিয়া সকল দলমতধর্ম্মজাতি-নির্ব্বিশেষে শান্তি-আন্দোলনকে অগ্রসর করার এক কার্য্যক্রম সম্মেলনের আছে। এই কার্য্যক্রমের প্রধান হইল আগামী তিন মাসের মধ্যে শান্তি আবেদনে ৫ লক্ষ সই সংগ্রহ, বিবিধ সংগঠনের সহিত যোগাযোগ বৃদ্ধি, প্রত্যেক জেলাতেই আনুষ্ঠানিক ভাবে শান্তি কমিটি স্থাপন এবং বিশ্ব-শান্তির লক্ষ্য ও বিশ্ব-শান্তি কংগ্রেসের প্রস্তাবগুলির ব্যাপক প্রচার।

শ্রীকৃপালানি ও কংগ্রেস

একটি মনগড়া রূপক উদ্ধৃত করিতেছি।

বৃদ্ধ শ্বশুর আর পুরাতন ঘর জামাইয়ের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইয়াছে।

যে কারণেই হোক্, শ্বশুর মহাশয়ের আর আগের মতো তোয়াজ করিবার প্রবৃত্তি নাই পুরাতন ঘর জামাইকে। উপরন্তু বাবাজীবনের কোন বেয়াদবিতে তিনি তাহার উপর রীতিমত রুষ্ট হইয়াছেন। পারেন তো লোকটিকে তিনি অবিলম্বে সেই প্রবাদ কথিত ধনঞ্জয় জামাইয়ের ন্যায় বিদায় করিয়া দেন। কিন্তু উপায় নাই। অবশ্য এতকাল যে লোকটিকে দিয়া অনেক কাজ কর্ম্ম করাইয়া নেওয়া হইয়াছে সংসারের, কাজেই এখন ঝুটমুট তাড়াইয়া দিতে বসিলে পাড়ার দশজনের কাছে একটা নিন্দনীয় অকৃজ্ঞতার অপবাদে অপরাধী হইতে হইবে—নিরুপায় হওয়ার কারণটি কিন্তু আদতেই তা নয় নিরুপায় হওয়ার আসল কারণ হইল এই যে, লোকটি তো সংসারের একেবারে অভ্যন্তরীন ব্যাপারের সঙ্গেই অনেক দিন ধরিয়া জড়িত হইয়া আছে, সংসারের বহু অপ্রকাশ্য গুপ্ত কথাই তার নখদর্পনে। এমতাবস্থায় মানুষটাকে তাড়াইয়া দিলেই সে বাহিরে গিয়া এই সব গুপ্ত তথ্য পাড়া-পড়শির কানে তুলিবেই। সেটা সমূহ আমাদের কথা। কেননা পাড়া-পড়সির মাতবরি করিয়া বৃদ্ধ শ্বশুরের দিন চলে। পাড়ার লোকের সমর্থন হইতে বঞ্চিত হইলে একবারে অন্নেই টান পড়িয়া যাইবে।

ওদিকে জামাতার অবস্থাটিও বিশেষ কিছু কারাকের নয়। উনি জানেন যে, শ্বশুর মহাশয়ের কাছে তাহার আর দর নাই আগের মতো। বরঞ্চ তাহাকে সরাইয়া দিতে পারিলেই যেন বৃদ্ধ নিশ্চিন্ত হন। এই তাচ্ছিল্যের আঘাতটাই জামাতা-ভদ্রলোকের কাছে সবচেয়ে বেশী দুঃসহ। অথচ তিনিও নিরুপায়। কারণ মর্ম্মে মর্ম্মে তিনি জানেন যে পাড়া-পড়শীর কাছে তাঁহার নিজের যা কিছু আদর কদর সে ওই বুড়া শ্বশুরের জন্যই। ওই বুড়ার সংসার হইতে বাহির হইয়া আসিলে পাড়ার লোক তাহাকে আর ডাকিয়াও পুছিবে না। দু'চার জন যাঁহারা ইতিমধ্যে নানা কারণে বৃদ্ধের উপর বিরূপ হইয়াছেন,তাঁহাদিগকে নিয়া হয়তো একটা বিরুদ্ধ মাতব্বরী, দল টলও গড়িয়া তোলা সম্ভব। কিন্তু ইহাতে বৃদ্ধকে তাঁহার মাতব্বরীর আসন হইতে নামাইয়া সেই আসন দখল করা যাইবে—তাহা মনে হয় না। কাজেই শ্বশুর

মহাশয়ের কাছ হইতে তাঁহার সেই পূর্বতন খাতিরটি পুনরুদ্ধার করার আকাঙ্ক্ষায় তিনি পাড়ার লোকের সামনে দাঁড়াইয়া শ্বশুর মহাশয়কে খালি এই বলিয়া হুমকির পর হুমকি দিয়া চলিয়াছেন—এখনও বলিতেছি ভালোয় ভালোয় মিটমাট করিয়া নিন একটা। নহিলে···

বহু বৎসর ধরিয়া ভারতবাসীর শ্রদ্ধায় পুষ্ট কংগ্রেসকে বৃদ্ধ শ্বশুর, আর শ্রীকৃপালনিকে পুরাতন ঘর-জামাই বলিয়া মানিয়া নিতে পারিলে মনে হয় মনগড়া হওয়া সত্ত্বেও আমাদেরই এই আজগুবি রূপকটিরও একটি বিশেষ অর্থ বেশ স্পষ্ট হইয়া উঠিবে।

মার্কিণ গম

সাম্যবাদের যে সর্বগ্রাসী বিভীষিকা আজ সমগ্র মানববিশ্বকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে, সেই বিভীষিকার কবল হইতে পৃথিবীকে বাঁচাইবার শক্তি আছে শুধু এক পশ্চিমী গণতন্ত্রের। আমেরিকাই হইল এই শক্তির সর্বোত্তম সংহত রূপ। পৃথিবীকে সাম্যবাদের ভয়াবহতা হইতে ত্রাণ করিবার সকল সুমান দায়িত্ব তাই আমেরিকারই। ব্যক্তিস্বাধীনতা ও প্রাচুর্য্যের প্রতীক আমেরিকাও সেই গৌরবান্বিত দায়িত্ব পালন করিতে সর্বান্তঃকরণেই প্রস্তুত—অর্থ দিয়া, সামর্থ্য দিয়া, আহার দিয়া, আনবিক বোমা দিয়া এবং এমন কি এই দায়িত্ব পালনের জন্য সর্বস্বও যদি বিলাইয়া দিতে হয় আমেরিকা তাহাতেও পশ্চাদপদ নয়।

—অনেকটা এই ধরণের এক সঙ্কল্প মার্কিণ রাষ্ট্রনায়করা প্রায় প্রতি নিঃশ্বাসের সঙ্গে উচ্চরণ করিয়া থাকেন, এবং তাঁহাদের অজস্র প্রচারযন্ত্র দিয়া এই সঙ্কল্পের কথা তাঁহারা প্রতি মুহূর্তেই দুনিয়াময় প্রচার করিয়া থাকেন।

দুইশত বৎসর ধরিয়া সাম্রাজ্যবাদ দ্বারা নিপীড়িত ও শোষিত হইয়াছে ভারতবর্ষ। এই প্রচারকার্য্য তাই তাহার কানে যেন গোকুলের বাঁশীর মতো মধু বর্ষণ করিত। আয়ান ঘোষের অন্তঃপুরের মতো বৃটিশ প্রভুর ঘেরাটোপ ছাড়িয়া সবে আত্মনিয়ন্ত্রণের বহিরাঙ্গিণায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে শ্রীরাধা-ভারতবাসী—মার্কিণী গণতন্ত্রের ডলারশিঞ্জীত সুর তাহার বুকে অনুরাগের সুর তুলিত, মনে মনে অনুক্ষণ সে স্বপ্ন দেখিত মার্কিণ শ্যামের শিহরিত মনুষ্যদিগের।—এইরূপ মনে করার মূলে অবশ্য কারণও যথেষ্ট ছিল। ফিলিপাইন, জাপান, ইরাক, তুরস্ক, স্পেন, পর্তুগাল, হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম, গ্রীস এবং গোটা দক্ষিণ আমেরিকার পুত্তলি রাষ্ট্র-নিচয়—ইহারা সব হইল মার্কিণ শ্যামের আলিঙ্গনবদ্ধা গোপিনীর দল। শ্যামপ্রেমের গুণগান করিতে করিতে আবেগে ইহারা রুদ্ধবাক হইয়া যায়, আবেশে ইহাদের গায়ে কাঁটা দিয়া ওঠে।—এই গোপিনীদিগের মুখেই শ্যামের কথা শুনিতে শুনিতেই তো বৃটিশ বন্ধনমুক্ত ভারতের এই Sam-মোহ। ইহার উপরে আবার ছিল ভারতের আপনার জন মার্কিণ সুহৃদরূপী বিন্দে দূতীর দল। ভারতবাসীকে মার্কিণ-শ্যামের আবদ্ধ করিতে তাদের চেষ্টাই কি কম ছিল? ন্যায় ও আইনের সকল সীমা লঙ্ঘন করিয়া তাহাদিগের ৫৪ জন ভারতের হইয়া গোপনে শ্যামের কাছে এক প্রেমলিপি পাঠাইয়াছিল পর্য্যন্ত।

তারপর, আজ হইতে তিন মাস আগে একদিন—তাহারও তিনমাস পূর্ব্ব হইতে তখন ভারতের বাতাসে বাতাসে মুক্তিজীর বন-মহোৎসবের মোচ্ছব-বাদ্যের সঙ্গে সঙ্গে সমানে তাল দিয়া বাজিতে সুরু করিয়াছে দুর্ভিক্ষ দানবের করাল মড়ক বাদ্য। সেই একদা শোনা গেল যে, প্রত্যক্ষ মিলন না ঘটিলেও Sam-প্রেমের প্রসাদ মিলিবে ভারতবাসীর; বিন্দে দূতীদের মুখে বুভুক্ষা-পীড়িত ভারতের বুকফাটা আর্তনাদ শুনিয়া শুনিয়া শ্যামরাগী uncle Sam-এর হৃদয় বিগলিত হইয়াছে; তাই ভারত-প্রেমের প্রথম নিদর্শন স্বরূপ কুড়ি লক্ষ টন গম বিনিময়ে একটি কানাকড়িরও প্রত্যাশা না করিয়া অচিরেই ভারতবাসীর উদ্দেশে প্রেরণ করিতেছে।—মার্কিণ শ্যামের প্রধান প্রতিভু ট্রুম্যান নিজমুখে সে কথা ঘোষণা করিলেন।

ভারতবাসীর মন বুঝি আরও একটু টলিল। Sam-কীর্তনে বিন্দে দূতীরা অধিকতর তৎপর হইলেন এবং ভারতবাসী ক্ষুধিত জঠর চাপিয়া ধরিয়া অধীর আগ্রহে

ট্রুম্যান-প্রতিশ্রুত ২০ লক্ষ টন গম-প্রসাদের পথ চহিয়া রহিল।

তারপর দিন যায়, সপ্তাহ যায়, মাস যায়,—ক্রমে ক্রমে দুর্ভিক্ষ দানবটার তাণ্ডব নৃত্য তাণ্ডবতর লয়ে চড়িতে থাকে—কিন্তু কোথায় সেই মার্কিণ প্রেমের প্রসাদ? প্রসাদের পরিবর্ত্তে ক্ষুধাব্যাকুল ভারতবাসীর কানে খবর পৌছিল যে সেনেট ও কংগ্রেসের গোপবালারা নিজের মধ্যে একটু আলাপ-আলোচনা করিতেছেন এই কুড়ি লক্ষ টন গম-প্রসাদ নিয়া—তাঁহারা খতাইয়া দেখিতেছেন যে ফিলিপাইন, তুরস্ক প্রভৃতি গোপিনীদিগের মতো শ্রীরাধা ভারতের Sam-প্রেমের কোনো সন্তোষজনক প্রমাণ না পাইয়াই এই গম-প্রসাদ তাহাকে সমর্পন করা যায় কিনা!—সে খবর শুনিয়া বিন্দেদূতীরা বলিলেন, তাতো বটেই—সন্দেহটা কি আর কিছু অসমীচীন? ভারত কি সত্যই এখনও কায়-মন-বাক্যে মার্কিণ সখার পায়ে নিজেকে সমর্পিত করিতে পারিয়াছে? অতএব বোম্বাইতে সাংস্কৃতিক স্বাধীনতার কংগ্রেস করিয়া তাহারাই এই সব বিলাইয়া দেওয়া মার্কিণ প্রেমের প্রমাণ দাখিল করিলেন।

মার্কিণ গম কিন্তু তবুও আসিল না—কুড়ি লক্ষ টন তো দূরের কথা, একটি দানাও না, ইতিমধ্যে বিহার রাজ্যে দুর্ভিক্ষ রীতিমত বাধিয়া গিয়াছে, খন্দের দাম হইয়াছে চতুর্গুণ এবং অন্যান্য রাজ্যের খাদ্য মন্ত্রীরাও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জবাব দিয়া বসিয়াছেন যে, কেন্দ্রীয় ভাণ্ডার হইতে খাদ্য আসিয়া না পৌছিলে জনগণকে খাদ্য জোগাইতে তাঁহারা অক্ষম।—'ভারতীয় খাদ্য বিল' নিয়া তখন মার্কিণ সেনেট ও কংগ্রেসের সদস্যরা আলাপ আলোচনার নেবু চটকাইতেছেন আর চটকাইতেছেন।

অবশেষে এইমাত্র দিন কয়েক আগে একদিন এক শুভ প্রভাতে আমেরিকার বার্ত্তা সংভরন বিভাগের (U.S. Information Service) মধ্যস্থতায় আবার এক খবর আসিল যে পাওয়া যাইবে, ভারতের প্রতি অকপট মার্কিণ শুভেচ্ছার অকাট্য প্রমাণরূপে মরণোন্মুখ ভারতবাসীর প্রাণ বাঁচানোর জন্য গম পাওয়া যাইবে। কুড়ি লক্ষ টনই পাওয়া যাইবে এবং পরোক্ষভাবে দেখিলে তাহা পাওয়া যাইবে প্রায় একরকম বিনা মূল্যেই। কিন্তু কয়টি সর্ত্তে। কী কী সেই সর্ত্ত?

তেমন কিছু নয়। অতি সাধারণ, অতি ন্যায্য ও অতি সম্মানজনক এই পাঁচটি সর্ত্ত মাত্র। যথা—

প্রথমতঃ, আমেরিকার দেওয়া যে খাদ্য এদেশে আসিয়া পৌছিবে, সে সমস্ত খাদ্যই ভারতবাসীর মধ্যে জাতিধর্ম্ম ও রাজনৈতিক মতবাদ নির্ব্বিশেষে উপযুক্ত মূল্যে বণ্টন করিতে হইবে।

দ্বিতীয়তঃ, শুধু আমেরিকার দেওয়া খাদ্যই নহে, ভারত সরকার যেখান থেকে যত খাদ্য সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইবেন, সে সমুদয় খাদ্যও ঠিক প্রথমোক্ত পদ্ধতিতে ভারতবাসীর মধ্যে বণ্টন করিতে হইবে।

তৃতীয়তঃ, ভারত সরকারকে আমেরিকার এই বদান্যতার কথা প্রতিনিয়ত সমস্ত উপায়ের প্রচার কার্য্য দ্বারা তাবৎ ভারতবাসীর গোচরীভূত করিতে হইবে

চতুর্থতঃ, আমেরিকার এই খয়রাতি (?) করা খাদ্য উপযুক্ত মূল্যে বণ্টন করিয়া বিনিময়ে যে অর্থ সংগৃহীত হইবে, সেই অর্থ দিয়া এমন একটি বিশেষ ফাণ্ড (Fund) খুলিতে হইবে যে ফাণ্ড শুধু নিয়োজিত হইবে ভারতের অনুন্নত খাদ্য, কৃষি, শিল্প ও অন্যান্য যাবতীয় বিষয়ের উন্নতি বিধানার্থে—এবং ভারত ও আমেরিকার যুগ্মস্বার্থে।

পঞ্চমতঃ, ভারত সরকার কর্ত্তৃক এই চতুর্ব্বিধ সর্ত্ত যথাযথ পালনে যাহাতে না কোনো প্রত্যয় ঘটিতে পারে তাহার উপর কড়া নজর রাখার জন্য ভারত সরকারকে কয়েকজন মার্কিণ সরকার মনোনীত কর্ম্মাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিতে হইবে। এইসব মার্কিণ সরকার মনোনীত কর্ম্মাধ্যক্ষরা ভারত সরকারের কোনো নিয়ম-নিয়ন্ত্রণের এক্তিয়ার ভুক্ত থাকবেন না, কিন্তু তাহাদের বেতন আহার-বিহার যানবাহন প্রভৃতি সমস্ত ব্যয়ভারই ভারত সরকারকে নিজ ব্যয়ে বহন করিতে হইবে।

তার মানে এক কথায় ভারতের যদি মার্কিণ গম খাইতেই হয়, তাহা হইলে ভারত সরকারের পাঁচটি মন্ত্রী-দপ্তর—খাদ্য অর্থ কৃষি ও শিল্প আর প্রচার বিভাগটি মার্কিণ Sam-এর পায়ে বাঁধা রাখিতে হইবে।

শ্যামের শুধু বাঁশিই শুনিয়াছিল ভারতবর্ষ, এইবার সে সেই বিশ্বত্রাতার মোহনরূপ চাক্ষুস দেখিল।

ইতিমধ্যে আরেক ব্যাপার। বিশ্বকে যে দুইজন কুচক্রীর ভয়াল গ্রাস হইতে রক্ষা করার সুমহান স্বেচ্ছাকৃত দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছে মার্কিণ বিশ্বত্রাতারা, সেই কুচক্রী দুইজন কিন্তু কোনোরকম সর্ত্ত আরোপ না করিয়াই ক্ষুধিত ভারতকে সর্ব্বসমেত ১৬ লক্ষ টন খাদ্য দিতে প্রস্তুত হইয়াছে। তাহাদের সব বিশুদ্ধ দোকানদারির সর্ত্ত—আমার যা আছে তুমি নাও, তোমার যা বাড়তি আছে আমাকে দাও—আর কিছু নয়।

কিন্তু এত কাণ্ডের পর, এবারে মার্কিণ-শ্যামের ভারতবর্ষীয় বিন্দে দূতীরা কী বলিবেন?

ম্যাক্ আর্থার জঙ্ বাহাদুর

অনেকদিন ধরিয়াই ম্যাক্ আর্থার সাহেবের নামের ধ্বনির সঙ্গে ধ্বনি মিলাইয়া বোম্বাইয়ের কয়টি সংবাদপত্রের সংবাদ লেখকেরা তাহার সম্বন্ধে একটি বড় মজার বিশেষণ প্রয়োগ করিয়া থাকেন। 'ম্যাক্ আর্থার'কে তাহারা বলেন 'ম্যাড্ আর্থার'—অর্থাৎ কিনা 'পাগলা আর্থার'। কথাটা এতদিন বোধহয় শুধু রসিকতারই বিষয় ছিল। কোরিয়ায় ডলার প্রভুত্ব বজায় রাখিবার জন্য আমেরিকান বাহিনী সেনানায়ক জঙ বাহাদুর ম্যাক্-আর্থারের নেতৃত্বে স্বাধীনতাকামী কোরিয়াবাসীদিগের বিরুদ্ধে লড়াইতে অবতীর্ণ হইয়াছে আজ প্রায় এক বৎসর। এই এক বৎসরের মধ্যে ম্যাক্ আর্থার জঙ বাহাদুর বোধ হয় অন্ততঃ বারো বার ঘোষণা করিয়াছেন যে স্বাধীন কোরিয়ার আয়ু আর মাত্র দুই সপ্তাহের—এই দুই সপ্তাহের মধ্যে দুই থাবড়ায় তিনি কোরিয়াবাসীদিগকে ঠাণ্ডা করিয়া ছাড়িবেনই। কার্য্যক্ষেত্রে কিন্তু ব্যাপারটা উল্টাই ঘটিয়াছে বার বার। কারণ, দেখা গিয়াছে যে, যতবারই তিনি এইভাবে দুই থাবড়ায় কোরীয় বেচারাদের ঠাণ্ডা করিয়া দিবার সাধু সংকল্প ঘোষণা করিয়াছেন, কোরীয়রা আসিয়া স্বয়ং তাঁহারই গণ্ডদেশে পাঁচ থাবড়া বসাইয়া দিয়াছে।—'পাগলা আর্থার' নামকরণটিকে প্রধানতঃ এই কারণেই কৌতুকের বিষয় বলিয়া মনে হইত। আর বোধহয় উক্ত কাগজওয়ালাদেরও ঈর্ষা ব্যতীত দ্বিতীয় কোনো উদ্দেশ্য ছিল না।

এখন কিন্তু দেখা যাইতেছে, বিষয়টি কৌতুকের নয় মোটেই। ম্যাক্ আর্থার যথার্থই উন্মাদ ব্যাধিগ্রস্ত মানুষ। এক ভয়াবহ হত্যা-বিকার তাঁহার সমস্ত চিন্তা অনুভূতি ও আচরণকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে।

নৃতত্ত্ববিদ্ ও ভূপর্য্যটকদিগের লিখিত বিবরণ হইতে জানা যায় যে, মালয়ভূমির জলবায়ুতে অথবা সেখানকার অধিবাসীদিগের রক্তের মধ্যেই কী যেন এক রহস্যময় কিছু একটা আছে, যার ফলে মাঝে মাঝে এই স্থানের কাহারো কাহারো ঘাড়ে সহসা একটা দুর্দ্দম ভয়ঙ্কর 'রোখ্' চাপিয়া বসে।...নিশিতে পাওয়া বিকট দুঃস্বপ্নের মত সেই রোখ্।...কতকগুলি লোক হয়তো একস্থানে বসিয়া দিব্যি জটলা করিয়া হাসিঠাট্টা করিতেছে। অকস্মাৎ দেখা গেল—বলা নাই, কওয়া নাই একটি লোক চকিতে সেই জটলা হইতে উঠিয়া উর্দ্ধশ্বাসে রুদ্ধশ্বাসে যেন কোথায় ছুটিয়া গেল। অপরিচিত নবাগন্তুক গোছের কেহ যদি কাছাকাছি কোথাও থাকেন, তাহা হইলে তিনি ব্যাপারটির আকস্মিকতায় হতভম্ব হইয়া যাইবেন, কিন্তু কিছুই বুঝিতে পারিবেন না। পর মুহূর্ত্তেই তিনি দেখিবেন আরও এক হতভম্বকর ব্যাপার। দেখবেন যে, যে-লোকগুলি বসিয়া জটলা করিয়া গল্প গুজব করিতেছিল, সেই লোকগুলিও কেন যেন হঠাৎ একসঙ্গে উঠিয়া দাঁড়াইল। শুধু তাহাই নয়, চোখের পলক ফেলিতে না ফেলিতেই ভয়ার্ত্ত চিৎকারে স্থানীয় ভাষায় কী একটা বলিতে বলিতে তাদের সকলেই ছুটিতে আরম্ভ করে দিক্‌বিদিকে—যেন কোন খাঁচা-বদ্ধ হিংস্র বন্য পশুর খাঁচা ভাঙ্গিয়া ফেলার খবর পাইয়াছে লোকগুলি।... ইহার পর মুহূর্ত্ত কয়েক সময় অতিবাহিত হইবে বোধহয়—ততক্ষণে রাস্তাটা প্রায় ফাঁকা। দুইচারি জন যে আতঙ্কে বিহ্বল হইয়া উদ্‌ভ্রান্ত অসহায়ের মতো এ দরজায় ওদরজায় ছোটাছুটি করিতে থাকিবে, তার কারণ আশেপাশের সমস্ত দরজাই তখন অর্গলবদ্ধ হইয়া গিয়াছে।—— হঠাৎ সেই অপরিচিত আগন্তুকটি একটা বুকফাটা তীব্র আর্ত্তনাদ শুনিয়া চমকিয়া উঠিবেন। তারপর সেই

আর্তনাদের অনুসরণে দৃষ্টিপাত করিতেই যে দৃশ্যটী তিনি দেখিবেন, তাহাতে তাঁহার শরীরের সমস্ত রক্ত-প্রবাহ যেন একলহমায় শুদ্ধ হইয়া যাইবে—হৃৎপিণ্ডটা দাপাদাপি করিতে করিতে যেন কণ্ঠনালির কাছে উঠিয়া আসিয়া তাহার দম বন্ধ করিয়া দিতে চাহিবে—অক্ষি-পিণ্ডটা যেন চোখের কোটর মধ্যে আর আবদ্ধ হইয়া থাকিতে চাহিবে না। তিনি দেখিবেন—একটি লোক একটা স্থানীয় আকারের রামদা লইয়া আরেকটা লোককে ক্রমাগত কোপাইয়া চলিয়াছে—খানিকক্ষণ আগে হাসি তামাসার জটলা হইতে উঠিয়া সেই যে-লোকটি হঠাৎ ছুটিয়া বাহির হইয়া গিয়াছিল—সে!

কিন্তু এইখানেই শেষ নয় এ-ব্যাপারের।—সেকেণ্ড কয়েক পরেই দেখা যাইবে, রামদা-হাতে লোকটি আক্রান্ত লোকটিকে ছাড়িয়া দিয়া আবার আরেকজনের দিকে ছুটিয়া আসে। আবার একটা তীব্র আর্তনাদ—আর সঙ্গে সঙ্গে সেই দেহের রক্তপ্রবাহ বন্ধ করা অবর্ণনীয় দৃশ্য!—ইহার পরেও যদি সেই অপরিচিত আগন্তুক হতভম্বের মতো দাঁড়াইয়া থাকেন, তাহা হইলে সেই হইবে তাঁহার শেষ দাঁড়ানো। আর যদি পূর্বতর পুরুষদের অর্জিত বহুপুণ্যের ফলে প্রাণপণে দৌড়িয়া গিয়া কোথাও তিনি আশ্রয় লইতে পারেন, এবং সেই আশ্রয়স্থল হইতে যদি বাকি ঘটনাটুকুও দেখিবার সাহস সঞ্চয় করিতে পারেন, তাহা হইলে তিনি দেখিবেন যে, সেই রামদা লোকটি রাস্তার উপর দিয়া সমানবেগে কেবলই ছুটিয়া চলিয়াছে, আর সামনে যাহাকেই দেখিতেছে তাহারই উপর পড়িয়া সেই রামদাখানি দিয়া শুধু কোপের পর কোপ বসাইয়া দিতেছে। অতঃপর এই অপরিচিত আগন্তুক অনুসন্ধান নিয়া জানিতে পারিবেন যে, এই সময়ে যদি না কোনো উপায়ে একেবারে সংজ্ঞা লোপ করাইয়া দেওয়া যায় এই রামদা-হাতে লোকটির, তাহা হইলে উহার এই অপ্রাকৃত হত্যাবিকার-আর কোনো প্রকারেই থামিবে না—একের পর একে, মানুষ দেখিলেই সে তাহার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িবেই। কারণ, হতভাগ্যের উপর 'আমক' (Amok) বিকার ভর করিয়াছে।

ম্যাক আর্থার সাহেবও ঠিক এই 'আমক' বিকারের মতোই এক দুর্নিবার করাল হত্যাবিকারের দ্বারা আক্রান্ত। নহিলে যে দৃশ্য দেখিয়া সাধারণ মানুষ ভয়ে জুগুপ্সায় পাগল হইয়া যায়, বোমাবিধ্বস্ত ছিন্নভিন্ন হাজার হাজার মৃত মানুষের সেই দৃশ্য দেখিয়া কি তিনি বলিতে পারিতেন যে, উপভোগ করিবার মতো দৃশ্য দেখিলাম বটে। নহিলে একটা মহাযুদ্ধের ক্ষতবেদনাই যেখানে এখনও অশুষ্ক, যেখানে মাটির বুকে এখনও রক্তের দাগ জ্বল জ্বল করিতেছে, গলিত শবস্তূপের পুতি-গন্ধে এখনও যেখানকার সমস্ত বায়ুমণ্ডল বিষাক্ত—সেই মুমূর্ষু বিধ্বস্ত পৃথিবীর আঙ্গিনায় দাঁড়াইয়া কি কোনো মানুষ এই বলিয়া তাহার মতো সদম্ভে ঘোষণা করিতে পারিতেন যে—যুদ্ধ চাই, যুদ্ধ করিতেই হইবে, অ্যাটম-বোমার ঘায়ে নিঃশেষে মুছিয়া দিতে হইবে মার্কিণ-প্রভুত্বের মিত্র নয় যারা সেই বেয়াদব এশিয়াবাসীকে। যুদ্ধ না বাধিলে আমেরিকা বাঁচিবে না।

যুদ্ধের শুধু একটাই মানে হয়। যুদ্ধ মানে ব্যাপক হত্যাকাণ্ড। সুতরাং ম্যাক্ আর্থারের রোগের উপসর্গ যে অকৃত্রিম, তাহাতে সন্দেহ করিবার কিছু নাই। প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান কর্তৃক পদচ্যুত না হইলে তাঁহার এই হত্যাবিকার কোথায় গিয়া শেষ হইত ভগবানই জানেন। পৃথিবীর মানুষের এখনও ভাগ্যই বলিতে হইবে যে, আমেরিকার রাষ্ট্রীয় প্রধানচক্রের সকলেই এখনও ম্যাক্ আর্থারের রোগে আক্রান্ত হন নাই।

বর্ষ শেষ

বর্তমান জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার সঙ্গে বঙ্গশ্রীর অষ্টাদশ বর্ষ শেষ হইল। আগামী আষাঢ় সংখ্যা হইতে বঙ্গশ্রীর নব (ঊনবিংশ) বর্ষ আরম্ভ। এই সুদীর্ঘ অষ্টাদশ বর্ষ যাঁহাদের সাহচর্য্যে ও সহযোগিতায় বঙ্গশ্রীর শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইয়াছে, আগামী নববর্ষেও তাঁহারা আমাদের পাশে থাকিয়া বাংলার সংস্কৃতি প্রসারে বঙ্গশ্রীকে সমৃদ্ধ-শালিনী করিয়া তুলিতে সাহায্য করিবেন, এই কামনাই করি। বঙ্গশ্রী আজ বাঙালী মাত্রেরই গৌরবের বস্তু। বঙ্গশ্রীর রচনাসম্ভার শুধু মানুষের অবকাশ-বিনোদনেরই

সামগ্রী নয়, শিক্ষা ও সংস্কৃতিরও বড় সম্পদ। সেই সম্পদকে যাহাতে দিনে দিনে প্রগতিধর্ম্মী পৃথিবীর পথে বাড়াইয়া তুলিতে পারি, তজ্জন্য দেশের আপামর জনসাধারণের সহযোগিতা আমাদের একমাত্র কাম্য। দেশবাসীকে আমাদের আন্তরিক প্রীতি জ্ঞাপন করি ও সকলের সর্ব্বাঙ্গীন সহানুভূতি কামনা করি।

বড় কাজ হাতে এলে অনেকেই বীর হয়, দশ হাজার লোকের বাহবার সামনে কাপুরুষও অক্লেশে প্রাণ দেয়, ঘোর স্বার্থপরও নিষ্কাম হয়,—কিন্তু অতি ক্ষুদ্র কার্য্যে সকলের অজান্তেও যিনি সেই নিঃস্বার্থতা, কর্ত্তব্যপরায়ণতা দেখান, তিনিই ধন্য।

* * *

চাই—সেই উদ্যম, সেই স্বাধীনতাপ্রিয়তা, সেই আত্মনির্ভর, সেই অটল ধৈর্য্য, সেই কার্য্যকারিতা, সেই একতা-বন্ধন, সেই উন্নতি-তৃষ্ণা, চাই—সর্বদা পশ্চাদ্‌দৃষ্টি কিঞ্চিৎ স্থগিত রাখিয়া অনন্ত সম্মুখপ্রসারিত দৃষ্টি, আর চাই—মস্তক, শিরায় শিরায় সঞ্চারকারী রজোগুণ।

—স্বামী বিবেকানন্দ

বঙ্গশ্রীর স্থান পরিবর্ত্তন

এখন হইতে রচনা ও সেই সম্বন্ধীয় চিঠি পত্রাদি সম্পাদকের নামে নিম্নের পরিবর্ত্তিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে—

৭, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-১৩

শ্রীকে. ভি. আপ্পারাও কর্ত্তৃক মেট্রোপলিটান প্রিণ্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস্ লিমিটেড
৯০, লোয়ার সারকুলার রোড, কলিকাতা ১৪ হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

LIBRARY

059/BAN/B
31649